"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৫৯তম বর্ষ
(১৩৬৩-মাঘ হইতে ১৩৬৪-পৌষ)

সম্পাদক
স্বামী নিরাময়ানন্দ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"
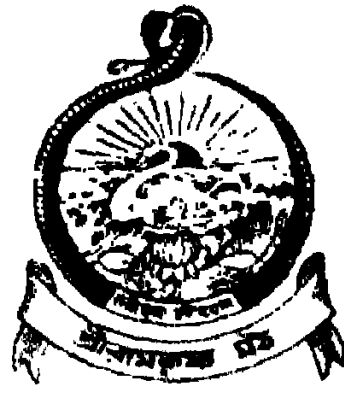
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

র্ষিক মুল্য পাঁচ টাকা

প্রতি সংখ্যা আট আনা

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

মাঘ-১৩৬৩ হইতে পৌষ-১৩৬৪

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

বুদ্ধদেব

উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৬৩

নন্দলাল বসু অঙ্কিত

উদ্বোধন

জীবনযুদ্ধে জয়ের উপায়

যাবন্ন কায়-রথমাত্মবশোপকল্পং
ধত্তে গরিষ্ঠচরণার্চনয়া নিশাতম্।
জ্ঞানাসিমচ্যুতবলো দধদস্তশত্রুঃ
স্বানন্দতুষ্ট উপশান্ত ইদং বিজহ্যাৎ॥
নোচেৎ প্রমত্তমসদিন্দ্রিয়বাজিসূতা
নীত্বোৎপথং বিষয়দস্যুষু নিক্ষিপন্তি।
তে দস্যবঃ সহয়সূতমমুং তমোহন্ধে
সংসারকূপ উরুমৃত্যুভয়ে ক্ষিপন্তি॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।১৫।৪৫, ৪৬

জীবন-যুদ্ধে মানুষের দেহ যেন রথ, আর আত্মবশবর্তী ইন্দ্রিয়গণ তাহার উপকরণ। যতদিন দেহ ধারণ করিতে হয় ততদিন শ্রেষ্ঠ গুরুগণের চরণসেবা দ্বারা শাণিত জ্ঞানরূপ অসি ধারণপূর্বক ভগবান অচ্যুতের শক্তি আশ্রয় করিলেই ত্রিগুণাত্মক রাগদ্বেষ শোক মোহ হিংসা ভয় প্রভৃতি শত্রুগণ পরাজিত হইবে, তখন নিরুদ্বিগ্নচিত্তে আত্মানন্দে অবস্থান করিয়া ঐ রথাদিকে উপেক্ষা করা যাইবে।

ভগবানকে আশ্রয় করিতে পারিলেই শান্তি, যে পর্যন্ত তাঁহার চরণকমলে মতি সে পর্যন্ত কোন ভয়ই নাই। নতুবা, বহির্মুখ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ ও বুদ্ধিরূপ সারথি সেই প্রমত্ত ব্যক্তিকে বিপথে প্রবৃত্তিমার্গে পরিচালিত করিয়া রূপরসাদি বিষয়রূপ দস্যুদলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে; এবং সেই দস্যুগণ অশ্ব ও সারথির সহিত ঐ ব্যক্তিকে অন্ধকারময় জন্মমৃত্যুরূপ সংসারকূপে ফেলিয়া দিবে—যেখানে আছে বারংবার গুরুতর মৃত্যুভয়।

কথাপ্রসঙ্গে

আমাদের বর্ষারম্ভ

এই সংখ্যায় উদ্বোধনের ৫৯তম বর্ষের শুভারম্ভ। আমরা জগদীশ্বরের আশীর্বাদ এবং সুধী পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের আন্তরিক প্রীতি ও সহযোগিতা কামনা করিয়া নূতন বৎসরের কার্যে ব্রতী হইলাম। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ৫৮ বৎসর আগে এই লোককল্যাণব্রতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। সুদীর্ঘকাল আমরা তাঁহারই আদর্শ সর্বদা স্মৃতিপথে রাখিয়া মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত উন্নতির জন্য সত্য, শুচিতা, সংযম, আত্মত্যাগ, মৈত্রী, সেবা, শান্তি ও ধর্মসমন্বয়ের কথা আলোচনা করিয়া আসিতেছি। দেশে ও বিদেশে, সমাজে ও রাষ্ট্রে কত বিপ্লব আসিয়াছে ও গিয়াছে, কিন্তু আমাদের ব্রত ও কর্মধারার পরিবর্তন বা বিরতি ঘটিবার কোন ক্ষেত্র উপস্থিত হয় নাই, কারণ আমাদের কাজ—বাহিরের নানা পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে মানুষের অন্তরে যে চিরন্তন ধর্মবোধ রহিয়াছে—তাহারই জাগরণ ও বিকাশকে লইয়া। আমাদের আবেদন মানুষের শাশ্বত সত্যের নিকট—যে সত্যকে কেহ কখনও প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, যে সত্য সাময়িকভাবে আবরিত থাকিলেও একদিন না একদিন প্রকাশিত হইতে বাধ্য। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু অভিব্যক্তি ও সুসংহত সংরক্ষণ নির্ভর করে এই সত্যেরই উদ্বোধনের উপর। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ—মানুষের আসল কথা নয়, পূর্ণতা-পথযাত্রী মানুষের উহা একটা সাময়িক বিভ্রম। মানুষকে ঐ বিভ্রম কাটাইয়া উঠিতে হইবে, তাহার নিজের এবং জগতের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দিকে মনঃসযোগ করিতে হইবে। তবেই তাহার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের গোঁজামিলগুলি দূর করিয়া সে দাঁড়াইতে পারিবে সর্বাবগাহী সত্য ও কল্যাণের উপর। মানুষ বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় চলুক ক্ষতি নাই, কিন্তু ঐ ব্যবস্থাগুলি যেন এই সত্য ও কল্যাণকে ব্যাহত না করে।

স্বামীজীর যুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জগৎসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব—নবসৃষ্টির প্রতিশ্রুতি-সমন্বিত এক প্রলয়-ঝঞ্ঝার মতো! আটলান্টিকের উভয় তীর আলোড়িত করিয়া ভারতে উহা বহিয়া আনিল প্রলয় প্লাবন—যাহার স্রোতে ভাসিয়া গেল যুগযুগান্ত-সঞ্চিত ধূলিজঞ্জাল—যাহার তরঙ্গাভিঘাতে জাগিয়া উঠিল সহস্রবৎসর-নিদ্রিত এক বিরাট জাতি! মানুষের ধর্মবোধে ও চিন্তাধারায় সংকীর্ণতার যে অচল প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল, গত দুই শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুক্তির আক্রমণে যাহার গাঁথনি শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, বিবেকানন্দের বজ্র-নির্ঘোষে তাহা ধসিয়া পড়িল নূতনতর সর্বজন-মনোগ্রাহী ধর্মভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে।

রাত্রিশেষের আচ্ছন্ন বদ্ধতা ভেদ করিয়া তিনি আসিলেন উচ্ছ্বসিত সূর্যালোকের মতো মুক্তি ও জাগরণের বার্তাবহরূপে—নূতন দিনের আশা ও সমারোহ লইয়া—নবজীবনধারার আশ্বাস ও শক্তি লইয়া! প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে তাঁহার কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল অপূর্ব ঝঙ্কার। মহাসঙ্গীতের সেই সুর দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া রচনা করিয়াছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতী মাঙ্গলিক!

ভারতকৃষ্টির উদয়-উষায় ঋষি-অনুভূত ঔপনিষদ সত্য অন্তরের অন্তরে উপলব্ধির পর বিশ্ববাসীর প্রতি নরঋষি বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান,—শোন শোন অমৃতের পুত্রগণ, অন্ধ তমসার পারে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমি জানিয়াছি, তাঁহাকে জানিলেই

মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, আর অন্য পথ নাই!— অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যামুখে আচার্য বিবেকানন্দ আধুনিক কালের ও এ যুগের মনের উপযোগী, যুক্তি ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, পুরুষকার ও আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল—নূতন এক বিশ্বজনীন ধর্মের সূচনা করিলেন—যেখানে আবার মানবের শাশ্বত মহিমা বিঘোষিত হইল নূতন ভাবে—নূতন ভাষায়। 'মানুষ দুষ্ট হউক, পাপী হউক—মানুষ মানুষ। মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ! মানুষ অমৃতের সন্তান, অনন্তের অধিকারী!' এই পরম স্বীকৃতি অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

'সবার উপরে মানুষ সত্য—তাহার উপরে নাই' সাধক কবির এই গভীর অনুভূতি—চরম সার্থকতা, পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে স্বামীজীর নবধর্মে—যাহার মর্মবাণী—'মানুষই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠমন্দির, মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানুষের অভাব দূরীকরণই মানুষের প্রথম কর্তব্য—পরম পবিত্র উপাসনা। অভাব ক্রমশঃ দূরীভূত হইলেই মানুষ শারীরিক স্তর হইতে শুরু করিয়া মানসিক স্তর ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়। প্রাথমিক অভাব দূরীকরণ হইতে, সর্বশেষ—জ্ঞানের অভাব দূর করা পর্যন্ত ক্রমবিকাশ জীবনসংগ্রাম। বিবেকানন্দের অভিধানে এই সংগ্রামে জয়ী হওয়ার সাধনাই মানুষের ধর্ম।

যাহা কিছু মানুষকে এই ক্রমবিকাশের পথে, জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার পথে, বহিরন্তঃ-প্রকৃতিকে জয় করিতে সহায়তা করিয়াছে তাহাই ধর্ম; আর যাহা কিছু মানুষকে অমানুষ করিয়াছে, দুর্বল করিয়াছে, ভীরু করিয়াছে, ক্রমসংকুচিত, সংকীর্ণ ও স্বার্থপর করিয়াছে, জীবন সংগ্রামে পরাজিত মনোভাব আনিয়া দিয়াছে তাহাই অধর্ম।

স্বামীজীর অভিধানে নাস্তিক সেই, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না। আত্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার নব-ধর্ম। তাই ত তাঁহার বাণী সংগ্রামশীল মানুষের মনে আনে আশা, আনে উৎসাহ; তাই ত তাঁহার আহ্বান এত অমোঘ, এত ব্যাপক।

স্বামীজীর বাণী প্রেরণা দিয়াছে ব্যক্তির মুক্তি-সাধনায়,—মহাজাতির জীবনজাগরণে, বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বস্থাপনে। যেখানেই মানুষের কোন শুভ প্রচেষ্টা, যেখানেই মানুষের উন্নতির আয়োজন, যেখানেই মানুষ সংকীর্ণতার, স্বার্থপরতার শৃঙ্খল ভাঙিতে সচেষ্ট, সেইখানেই স্বামীজীর আবেদন! সত্যই, স্বামীজীর মধ্যে এ যুগের 'বিবেকবাণী' ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

অবনত, পদদলিত, নিপীড়িত, সর্বপ্রকার দুঃস্থ-দুর্গত মানবের জন্য বিবেকানন্দ-হৃদয়ের বেদনা পাষাণকেও বিগলিত করে, তাই ত তাঁহার আহ্বান দেশে দেশে কত হৃদয়কে স্পন্দিত করিয়া জাগ্রত করিয়াছে সংসারের সুখনিদ্রা হইতে,—নিয়োজিত করিয়াছে, করিতেছে নানাবিধ সেবাপ্রচেষ্টায়, শৃঙ্খলমুক্তির সাধনায়, নররূপী নারায়ণের উপাসনায়!

অল্পবুদ্ধি মানব সন্দেহ করে, স্বল্পস্মৃতি মানব ভুলিয়া গিয়াছে—তাই নানা প্রশ্ন করে, তাহার উত্তরে শুধু বলা যায় বিবেকানন্দের এই ধর্ম—নূতন ভাষায় পুরাতন ভাব—সত্য চির-নূতন, চির-পুরাতন—তাই ত সে চিরন্তন। এ যেন, রাত্রিশেষে সনাতন সূর্যের পুনরুদয়! এ যেন 'নূতন পাত্রে পুরাতন সুরা'। স্বামীজী দুর্বলচিত্তের সন্দেহ দূর করিবার জন্য আসন্ন যুগপরিবর্তন ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন 'অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে, সে বুঝিতেছে না।'—'এই নব যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এবং এই যুগধর্মপ্রবর্তক শ্রীভগবান পূর্বগ শ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস ও ধারণা কর।'

'এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব—

যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল—তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।'

অতীতে, যুগে যুগে দেশে দেশে নানা ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে—ভবিষ্যতেও দেশকালের প্রয়োজনে যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ আরও কত নূতন নূতন ভাব লইয়া আসিবেন; অতীত ও অনাগতের সন্ধিক্ষণে, বর্তমানের মহামুহূর্তে আমরা সর্বভাব-সমন্বয়ের যে মহাভাবটি পাইয়াছি—তাহা যেন হৃদয় দিয়া বরণ করি, জীবন দিয়া আচরণ করি। এখানে গ্রহণ আছে—বর্জন নাই, বোধন আছে—বিসর্জন নাই, আবাহন আছে—বিদায় নাই।

মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী কেহ জ্ঞানের, কেহ ভক্তির, কেহ ধ্যানের, কেহ কর্মের অনুরাগী,—যে কোন একটি ভাব অবলম্বনে অথবা একাধিক বা সর্বভাবসমন্বয়ে মানব অন্তর্বহিঃপ্রকৃতি জয় করিয়া মুক্ত হইতে পারে—অনন্তের অনুভূতি, অমৃতত্বের আস্বাদ পাইতে পারে, ইহাই ধর্মের সার কথা। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দ-ঘোষিত সর্বমনের উপযোগী ধর্মের নূতন সনদ! ইহারই সহায়ে সর্বাঙ্গসুন্দর মানবসমাজ গঠিত হইবে, জগৎ এখনও তাহারই জন্য প্রতীক্ষারত।

বিবেকানন্দের ঋষিদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত—শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—যাহা জ্ঞানে গরীয়ান্, ধর্মে মহীয়ান্। অধ্যাত্মশক্তি-সম্পন্ন উন্নততর এক উদার মানবজাতির অভ্যুদয়—ইহাই স্বামীজীর স্বপ্ন—ইহাকে বাস্তবে পরিণত করাই ভারতের বিধিনির্দিষ্ট মহাব্রত। স্বামীজীর এই স্বপ্ন দিবাস্বপ্ন নয়, কবিকল্পনা বা নিছক শুভেচ্ছাও নয়—ইহা শুদ্ধচিত্তে প্রতিভাত সত্য, বিরাট মনের দিব্য অনুভূতি, স্বামীজীর সমাগত জন্মদিনে আমরা যেন বুঝিতে পারি, বিশ্বাস করি—স্বামীজীর যুগ পশ্চাতে নয়, সম্মুখে।

বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম

কথা উঠিয়াছে বিজ্ঞান, তথা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধের রক্তপিচ্ছল পথ দিয়া মানুষ আজ ধ্বংসের পথেই অবরোহণ করিতেছে; দুই যুদ্ধের মাঝে শ্বাসরুদ্ধ আতঙ্ক আরো অনিশ্চিত, আরো দুঃসহ। কে জানে মানুষ আবার আলো-বাতাসহীন আদিম অন্ধ গহ্বরে ফিরিয়া চলিয়াছে কিনা; বুঝিবা গুলিবিদ্ধ বোমারু বিমানের মত তাহার এত সাধের, এত সাধনার বর্তমান সভ্যতা জ্বলিয়া পুড়িয়া নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—শুধুমাত্র ভস্মরাশি উড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবে পৃথিবীর গাত্রে তাহার শেষ নিদর্শনস্বরূপ! হয়ত বা এই জীবধাত্রী বসুন্ধরা, সুনীলসাগরাম্বরা বনকুন্তলা জননী পৃথিবীও নিস্তার পাইবেন না তাঁহার দুরন্ত সন্তানদের পারমাণবিক বিস্ফোরণের হাত হইতে! বিজ্ঞান-সহায়ে ক্রমশঃ উৎকর্ষশীল মারণাস্ত্রসমূহের যে তালিকা মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাষ্ট্রকর্তৃক সগৌরবে প্রকাশিত হয়—আস্ফালনের মত—তাহাতে সাধারণ মানুষের মনে ঐ প্রকার ভয় উৎপন্ন হওয়া বিচিত্র নয়, বরং স্বাভাবিক।

কিন্তু আশ্চর্য রহস্য—যে মনে এই মরণভীতি, তাহাতেই আবার লুক্কায়িত মরণজয়ের সংকল্প ও প্রচেষ্টা! এই মানুষের মনই একদিন সংকীর্ণ ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সত্যের সন্ধানে জয়যাত্রা শুরু করিয়াছিল। নবলব্ধ বিজ্ঞানের বলে মানুষ জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সর্বত্র তাহার বিজয় নিশান উড়াইয়াছে। পৃথিবীর গর্ভে, সমুদ্রের তলদেশে, পর্বতের উচ্চতম শিখরে, কোথায় সে যায় নাই? নদীর উৎস-সন্ধানে শ্বাপদসংকুল ঘনবনে, বিপদসংকুল হিমবাহে—সর্বত্র তাহার গতি অপ্রতিহত। মেরু ও মরুর নির্জনতা ভাঙিয়া সে শহর বন্দর পত্তন করিয়াছে, আবার শান্তরাত্রির নীরব অন্ধকারে মুখর নক্ষত্র-নীহারিকার

ভাষায় সে পড়িয়াছে বিশ্বসৃষ্টির অলিখিত ইতিহাস, জীবাশ্মে শিলারেখায় সে বুঝিয়াছে লক্ষবর্ষব্যাপী প্রাণিজীবনের ক্রমবিকাশের অফুরন্ত সাধনা ও সংগ্রাম,—মানবশরীরের সমগ্র রহস্য অবগত হইয়া সে আজ জন্মমৃত্যু-নিয়ন্ত্রণপ্রয়াসী।

তবু কেন এত ভয়, এত সংশয়—এত দ্বন্দ্ব? কিসের অভাবে আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজ্ঞান ছিন্নমস্তার মত নিজের ধ্বংস নিজেই করিতে উদ্যত? এই প্রশ্নই আজ আবার নূতন করিয়া উঠিয়াছে—মানুষের মনে, যেখানে বিজ্ঞানেরও জন্মভূমি!

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে,—পদার্থ ও শক্তির ধর্ম পর্যবেক্ষণ করিয়া, তাহাকে আয়ত্তে আনিয়া, জল বায়ু বাষ্প তড়িৎ প্রভৃতি শক্তিকে কাজে লাগাইয়া বিজ্ঞান শিল্পে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্রে, সমাজে যুগান্তর আনিয়াছে, তৎসহ আনিয়াছে নব ও অভিনব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ যাহার সমাধান করিতে বিজ্ঞান অক্ষম; পরন্তু, বিজ্ঞান আজ রাজনীতির আজ্ঞাধীনা দাসীর মত।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান—অগ্নি বা বিদ্যুতের মত একটি শক্তি,—মহাশক্তি; ব্যবহারের উপরই তাহার ইষ্টানিষ্ট ফল। সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস প্রকৃতির স্বভাব—চক্রবৎ ঋতুপর্যায়ের মত পর পর ইহারা আসে যায়—ইহার কোনটির উপর প্রকৃতির আসক্তি বা বিরক্তি নাই,—সৃষ্টিস্থিতিলয় মহাশক্তিরই প্রকৃতি, বা প্রকৃতিরই মহাশক্তির বিকাশ ও বিলয়! ইহাতে প্রকৃতির সুখ বা দুঃখ নাই। মানুষই প্রকৃতির নিয়ম জানিয়া সুখার্থে তাহাকে নিয়োগ করে, কিন্তু সুখের সঙ্গে দুঃখও পায়, ইহাই অনুভূত সত্য! মানুষকে আজ বুঝিতে হইবে সুখ ও কল্যাণ এক জিনিস নয়। কল্যাণার্থে প্রকৃতিকে নিয়োজন—শিবশক্তিমিলনের মর্মকথা। শিবহীন শক্তির আরাধনাই আজ মানুষকে অকল্যাণের পথে টানিয়া আনিয়াছে; মৃত্যুর আতঙ্কে জীবনেই তাহাকে অর্ধমৃত করিয়াছে।

তাই আজ প্রয়োজন—বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম তত নয়—যত মানুষেরই নবজন্ম। 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্‌দ্বিজ উচ্যতে', 'Unless ye be born again, ye cannot enter the kingdom of Heaven'—এই সকল শাস্ত্রবাণী, মহাপুরুষবাণী নূতন করিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে। চাই মানুষের মনের পরিবর্তন—যে মন বিজ্ঞানকে শুধু নিজের সুখের জন্য, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিবে না,—ব্যবহার করিবে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়।

আশার কথা—বিজ্ঞানের অন্তস্তলেই, বৈজ্ঞানিকের মনের মধ্যেই, এই প্রশ্ন জাগিয়াছে। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই আজ সত্যের সীমা নয়, অতীন্দ্রিয় মনের অনুভূতিও আজ বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত! দৃশ্যমান জগতের প্রাতিভাসিকত্ব তাহার চোখে ধরা পড়িয়াছে। স্থূল হইতে সূক্ষ্মের প্রতি বিজ্ঞানের এই অভিযান আধুনিক মানবমনের নবতম উদ্‌গতিই সূচনা করিতেছে। শুধুমাত্র 'কি? কেন? এবং কেমন করিয়া?' এই প্রশ্নত্রয়ের সমাধানে সন্তুষ্ট না হওয়ায় বিজ্ঞানের মনে উপনিষদের সেই প্রশ্ন জাগিতেছে 'কাসৌ পুরুষঃ' 'সেই পুরুষ কে, কোথায়?' বিজ্ঞান আজ বস্তু হইতে ব্যক্তির অভিমুখে চলিয়াছে। 'কেন মানুষ চিন্তা করে, কি ভাবে চিন্তা করে—মানুষের মনে বসিয়া কে চিন্তা করে'—বিজ্ঞান আজ তাহাও চিন্তা করিতে শিখিতেছে।

জড়বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ হইতে প্রাণবিজ্ঞানের গবেষণা—প্রাণবিজ্ঞান হইতে মনোবিজ্ঞানের সাধনা আজ বিজ্ঞানকে দর্শনের পর্যায়ে আনিয়া ফেলিতেছে! এই মনোময় সাধনা হইতে চৈতন্যময় জীবনের প্রতি অভিযান—সোপানমাত্র ব্যবধান। এই ঊর্ধ্বমুখী পথ বড়ই কঠিন ও সংকীর্ণ, ক্ষুরধার ও দুর্গম! কিন্তু এই পথ অমৃতের পথ, কল্যাণের পথ,—মৃত্যুভয়শূন্য জ্ঞানের পথ। ইহারই সন্ধানে মানুষ বাহির

হইয়াছে—তাহার জ্ঞানোন্মেষের প্রথম প্রভাতে। এই পথ অতিক্রম করাই মানুষের সাধনা এই পথের প্রান্তে উপনীত হওয়াই মানবজীবনের লক্ষ্য। ইহাই মানুষের ধর্ম!

বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম পরস্পরবিরোধী নয়—একই মানবমনের ক্রমবিকাশ! সত্য শিব ও সুন্দরের সাধনাই মানুষ চিরকাল করিয়া আসিতেছে ও করিয়া চলিবে। স্বামী বিবেকানন্দ অতি অল্প-কথায় এই মহাভাবরাশিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, 'Art, Science and Religion are three readings of the same Truth—একই সত্যকে মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থা হইতে বিভিন্ন মন দিয়া দেখিয়াছে; তাহারই ফলে আমরা পাইয়াছি সাহিত্যকলা, দর্শনবিজ্ঞান ও ধর্ম। কলা ও সাহিত্যের দৃষ্টিতে মানুষ দেখিয়াছে প্রেমময় আনন্দ-স্বরূপ সুন্দরকে, দর্শন ও বিজ্ঞান ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে বিশ্বময় সত্তাস্বরূপ সত্যকে, আর ধর্ম অনুভব করিয়াছে কল্যাণময় চৈতন্যস্বরূপ শিবকে; সত্য শিব সুন্দর এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই নামান্তর!

গ্রাম-উন্নয়ন

সমাজ-কল্যাণ ও গ্রাম-উন্নয়নকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক কালে দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে। জনসাধারণ উহাতে কতটুকু অংশগ্রহণ করিতেছে বা করিতে পারিতেছে এবং উহা দেশকালপাত্রের কতটা উপযোগী হইয়াছে—পরিকল্পনার রূপায়ণকালেই—তাহা বিচার্য। প্রয়োজন হইলে কার্যক্রম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অবশ্য কর্তব্য; নতুবা শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের কল্যাণ অপেক্ষা পরিকল্পনাকারীদের আত্মপ্রসাদের অঙ্কটাই বেশি হইবে।

পরিকল্পনাগুলি যোগ করিলে তাহার মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যায়—আদর্শগ্রামের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ, সুন্দর পথ ঘাট, সুপেয় জল, অধিক খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা, কুটির শিল্পের যোজনা, শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার, চিকিৎসার জন্য ডিস্পেন্সারি ও হাসপাতাল,—ডাকঘর ও সমবায় সমিতি! সঙ্গে সঙ্গে একথাও সর্বজনবিদিত যে দেশের মাত্র শতকরা ২০ জন অধ্যুষিত শহরগুলির জন্য যে মনোযোগ দেওয়া হয় ও অর্থ বিনিয়োগ করা হয়—শতকরা ৮০ জন অধ্যুষিত সাত লাখ গ্রামের জন্য তাহার অর্ধেকও হয় না।

একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, বর্তমান শিল্প বিজ্ঞান ও যন্ত্রের যুগে গ্রামের উন্নতি বহুলাংশে শহরের উন্নতির উপর নির্ভর করে; অতএব শহরের উন্নতি প্রকারান্তরে গ্রামের উন্নতিকে সাহায্য করে,—কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, খাদ্য ও কাঁচামালের জন্য শহরকে চিরদিনই পল্লীর উপর নির্ভর করিতে হইবে। অতএব গ্রামের স্বার্থ বলি দিয়া—বা গ্রামকে ধ্বংস করিয়া আমরা যেন শহর পত্তন না করি। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে শিল্পবিপ্লবের পর হইতে যেখানেই এরূপ হইয়াছে—সেখানে শেষপর্যন্ত তাহা সুখের হয় নাই—ইতিহাসের এ ইঙ্গিত আমরা যেন বুঝিতে পারি। গ্রাম্য কৃষকের সামাজিক ও পারিবারিক সুখশান্তি এবং কারখানার শ্রমিকের অশান্তি ও অসন্তোষের মূলে কি মনোভাব, পরিবেশের কতটা প্রভাব, তাহা সময়মত না বুঝিলে আমরাও পাশ্চাত্ত্যদেশগুলির মত শিল্পযুগের অমৃত বিন্দুমাত্র পান করিয়া উহার গরল তাপে দগ্ধ হইব। কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় করিয়া, গ্রাম ও শহরের সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদের পরিকল্পনা রচিত হওয়া প্রয়োজন। পরিকল্পনার স্রোতে ভাসিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, গ্রাম প্রকৃতির সৃষ্টি—সহজ, সরল, সুন্দর—চিরদিনের; আর শহর নগর বন্দর মানুষের প্রয়োজনে দুদিনের সৃষ্টি; তাহার জীবনধারা কৃত্রিম, কুটিল এবং বহুস্থলে কুৎসিত! আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রামের উন্নয়ন বলিতে আমরা যেন উপনগর বা শহরের সম্প্রসারণ না বুঝি,

উন্নতগ্রাম শহরের অনুকরণও হইবে না। গ্রামের নিজস্ব প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো বজায় রাখিয়া আধুনিক কালের শিক্ষা, সুখসুবিধাগুলি যদি স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে সেখানে সংযোজিত হয় তবেই গ্রামের উন্নতি একটা স্থায়ী কল্যাণমূলক রূপ পরিগ্রহ করিবে, নতুবা অন্তরের আকাঙ্ক্ষার অভাবে শুধুমাত্র বাহিরের প্রেরণায় তাড়াহুড়া করিয়া যাহা গড়িয়া উঠিবে, বাহিরের সরবরাহ বন্ধ বা সংকুচিত হইলেই তাহা সহসা ভাঙিয়া পড়িবে।

শহরে বসিয়া গ্রামসংগঠনের পরিকল্পনা কখনও সঠিক ও সম্পূর্ণ হয় না, হইতে পারে না। গ্রামের উন্নয়ন সম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে গ্রামের লোকের অভাব জানিতে হইবে, তাহাদের অভিযোগ শুনিতে হইবে। নতুবা দেখা যায়—শহরের লোক গ্রামে গিয়া যে সকল অভাব অনুভব করে আমাদের পরিকল্পনায় সাধারণত সেইগুলি দূরীকরণেরই প্রয়াস, তাহাও আংশিকভাবে। কুটিরে কুটিরে বৈদ্যুতিক আলো অপেক্ষা জলনিকাশের ব্যবস্থা, গ্রামের মধ্যে বারোমাস চলাচলের পথ এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বা শহরে বন্দরে যাইবার 'জাতীয় সড়ক' বেশি প্রয়োজন, সকলের আগে প্রয়োজন! শেষের এই একটি হইলেই অন্য অনেকগুলি পরিকল্পনা সার্থক হইবে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও নিরাপত্তার অনেক উন্নতি হইবে। উপযুক্ত পথের অভাবে বৎসরের চারমাস—বিদ্যালয় খোলা থাকা সত্ত্বেও বহু ছাত্র আসিতে পারে না, হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও দূরের রোগী আসিতে পারে না, থানা থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হয়, প্রয়োজন সত্ত্বেও শিল্প-বাণিজ্য স্থগিত থাকে। সেজন্য চাষের পর উপযুক্ত কর্মাভাবে একরূপ নিরুপায় হইয়াই চাষীকে নিরন্ন হইয়া কাল কাটাইতে হয়। কুটিরশিল্পের সহিত সমবায়-সমিতি এবং বারোমাসের চলার পথ এই বিকট অভাব দূর করিতে পারে।

পথঘাটের মত আর একটি মৌলিক অভাব শিক্ষার অভাব, এই একটি অভাব দূরীভূত হইলেই সমাজশরীরে নূতন রক্ত নূতন ভাব সঞ্চারিত হইবে এবং তাহারই সহায়ে অন্য সকল অভাব দূর করিবার ইচ্ছা ও শক্তি গ্রামবাসীদের মধ্যেই জাগিয়া উঠিবে, ইহাই যথার্থ জনজাগরণ, ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে গ্রামের উন্নতি, তথা জাতির উন্নতি। ভুলিলে চলিবে না জাতি বাস করে গ্রামে, জাতীয় জীবনের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে হইবে সেখানেই।

ভারতের বুদ্ধ

গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে পৃথিবীর প্রায় কুড়িটি দেশের বৌদ্ধধর্মের ৭২ জন প্রতিনিধি ভারতের অতিথি হইয়া ভগবান্ তথাগতের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিতেছিলেন। দিল্লীতে সম্বর্ধনার পর সারনাথ নেপাল বুদ্ধগয়া রাজগৃহ নালন্দা দর্শনান্তে বিদায়ের পথে তাঁহারা কলিকাতায় পদার্পণ করেন। মহাবোধি সোসাইটিতে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, বৌদ্ধধর্ম সমগ্র মানবজাতিকে প্রেমের বাণী শুনাইয়াছে এবং এখনও শান্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। বর্তমান পৃথিবীতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব-স্থাপনে ইহা এক মহাশক্তি।

রাজগৃহে বুদ্ধপরিনির্বাণ-সমিতির অভ্যর্থনার উত্তরে প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে সিংহলের মাননীয় থেরো ভাবাবেগে বলিয়াছেন,—"বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে উদ্ভূত শাখা (off-shoot) একথা বলা ভুল, পরন্তু বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ পীড়িত হিন্দুধর্মের প্রতি একটা 'চ্যালেঞ্জ'। জাতিধর্মনির্বিশেষে বুদ্ধ সকলের জন্য তাঁহার ধর্মের দ্বার খুলিয়া দেন।" সম্প্রতি স্বর্গত বৌদ্ধধর্মে নবদীক্ষিত ডক্টর আম্বেদকরও কিছুদিন আগে বলিয়াছিলেন, 'হিন্দুরা যে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে—ইহা ভুল।' শ্রেষ্ঠ হিন্দুমনীষা বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন—তাহার প্রতি

মনোনিবেশ করিলেই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো ধর্মমহাসভায় 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান বক্তৃতার সপ্তাহ পরে ঐ সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ 'বৌদ্ধধর্ম' সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন—তাঁহার বক্তব্যের মর্মার্থ—'বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই পূর্ণ পরিণতি'। বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া ঐ বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হইল। "আপনারা শুনিয়াছেন আমি বৌদ্ধ নই, তবু আমি বৌদ্ধ। চীন জাপান বা সিংহল যদি সেই মহাগুরুর বাণী অনুসরণ করে, ভারত তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া উপাসনা করে।····· (বেদজাত) হিন্দুধর্মের সহিত অধুনাকথিত 'বৌদ্ধধর্মের' সম্পর্ক অনেকটা ইহুদীধর্মের সহিত খ্রীষ্টধর্মের সম্পর্কের মত। যীশুখ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন, শাক্যমুনি ছিলেন হিন্দু। তবে ইহুদীরা যীশুকে প্রত্যাখ্যান করে—উপরন্তু ক্রুশবিদ্ধ করে,—আর হিন্দুরা শাক্যমুনিকে গ্রহণ করে, ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। বর্তমান বৌদ্ধধর্ম ও প্রভু বুদ্ধের শিক্ষার মধ্যে যে পার্থক্য আমরা দেখাইতে চাই—তাহা মোটামুটি এই—শাক্যমুনি নূতন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। যীশুর মত তিনিও আসিয়াছিলেন ধ্বংস করিতে নয়, পূর্ণ করিতে। তবে তফাৎ এই যে—যীশুর ক্ষেত্রে প্রাচীনরা, ইহুদীরা তাঁহাকে বোঝে নাই, আর বুদ্ধের ক্ষেত্রে তাঁহার নিজ শিষ্যেরাই তাঁহার শিক্ষার মর্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহুদীরা বুঝে নাই 'পুরাতন প্রতিশ্রুতি'র পূর্ণতা—আর বৌদ্ধেরা বুঝে নাই হিন্দুধর্মের সত্যগুলির পরিপূর্ণতা। আবার বলি—শাক্যমুনি ধ্বংস করিতে আসেন নাই—তিনি ছিলেন হিন্দুদিগের ধর্মের যুক্তিগত সিদ্ধান্ত, ক্রমবিকাশ, পরিপূর্ণরূপ।

"হিন্দুধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত—ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সন্ন্যাসীরাই বিশেষভাবে অধ্যাত্ম অংশটি অধ্যয়ন করেন। সেখানে কোন জাতিবিচার নাই।······ধর্মাচরণে কোন জাতিবিচার নাই, জাতিবিচার সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র। শাক্যমুনি সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহার গৌরব এই যে, লুক্কায়িত বেদের সত্যকে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিবার মত বিশাল হৃদয় তাঁহার ছিল।···হিন্দুধর্ম বৌদ্ধভাব ছাড়া বাঁচিতে পারে না, আবার বৌদ্ধধর্ম হিন্দুভাব ছাড়া বাঁচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন, উভয়ের বিচ্ছেদ প্রমাণ করিয়াছে যে, বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক ও দর্শন ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না; আবার ব্রাহ্মণ্যধর্মে অভাব বুদ্ধের মত হৃদয়। বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই বিচ্ছেদই ভারতের অধঃপতনের কারণ। এই জন্যই ভারতে ত্রিশকোটি ভিক্ষুক; এই জন্যই ভারতবাসী সহস্রবৎসর বিজেতাদের ক্রীতদাস। অতএব আসুন—ব্রাহ্মণের অপূর্ব মেধার সহিত বুদ্ধের মহান্ হৃদয়—অদ্ভুত মানবিকতা আমরা সংযুক্ত করিয়া দিই।"

"এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, জগতের ধন মান ঐশ্বর্য—এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাঁহারাই যথার্থ জীবিত, যাঁহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

"দোষ কারো নয়"

স্বামী বিবেকানন্দ

[মূল ইংরেজী কবিতাটি "No ono is to blame" শিরোনামে 'Prabuddha Bharat' (March, 1955) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত; অনুবাদক—স্বামী জীবানন্দ। স্বামীজী কবিতাটি নিউইয়র্কে বসিয়া লেখেন; তারিখ—১৬ই মে, ১৮৯৫; সম্ভবতঃ ভগবান বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কোন বন্ধুকে তিনি ইহা উপহার দিয়াছিলেন।]

দিনমণি ডুবে অস্তাচলে,
রেখে যায় রক্তরাঙা কর,
আলোকিতে ক্ষীণ দিনমানে
এই যেন শেষ অবসর!
রাখি আঁখি দেখি সচকিতে
বিজয়ের রাশি পিছে রয়,
জয়ে গণি হীন লাজ ব'লে
আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়।

জীবনেরে গড়ি দিন দিন
কিংবা উহা ক'রে চলি ক্ষয়,
যথাকর্ম সেইরূপ ফল—
শুভে শুভ মন্দে মন্দ হয়।
স্রোত যদি একবার ধায়
রোধ কিংবা নিয়ন্ত্রণ তার
সাধ্য নহে কভু আর কারো
আমা ছাড়া দোষ তবে কার?

আমি হই রূপধারী সেই
ছিল যাহা অতীত আমার,
সৃষ্টিবীজ সুপ্ত-সেখানেই
বিকশিতে ভুবনে আবার।
ইচ্ছা, চিন্তা—সে অতীত ধরি
মনোমাঝে সদা ব্যক্ত হয়,
বাহিরের আকৃতিও তাই
আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়।

প্রেমরূপে ফিরে আসে প্রেম
ঘৃণা আনে ঘৃণা তীব্রতর,
পরিমাপ নিজে তারা করে
রেখে যায় ছাপ মোর 'পর।
জীবনের শেষে মরণেও
তাহাদের দাবি জমা রয়,
এই ভোগ—দায় আমারি তো
আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়।

ত্যজিলাম পিছে ভয়রাশি
বৃথা যত পরিতাপ আর
বুঝিয়াছি গূঢ় অনুভবে
স্বকর্মের কিবা অধিকার।
হর্ষ-ব্যথা অপমান-যশ —
মোর কর্মে জাত প্রেতচয়,
ইহাদের সম্মুখে দাঁড়ানু
আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়।

ভালমন্দ প্রেম আর ঘৃণা
সুখ তথা দুঃখ যাহা বলি
একে ছাড়ি অন্য নাহি থাকে
যুগ্মভাবে বাঁধা তো সকলি।
দুঃখ ছাড়া সুখস্বপ্ন দেখি
ভ্রান্তি শুধু! সত্য নাহি হয়,
আসিল না, আসিবে না কভু
আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়।

অতএব ত্যজিলাম ঘৃণা
তাজিলাম তুচ্ছ ভালবাসা,
দূর করি দ্বন্দ্বের সংঘাত
মিটিয়াছে জীবনের তৃষা।
চিরমৃত্যু—ইহাই তো চাই
—নির্বাণ এ জীবন-শিখার,
—ঘুচে-যাওয়া কর্মের আশ্রয়
রহিবে না দোষী কেহ আর।

একমাত্র নরবর, এক সেই প্রভু
একমাত্র সিদ্ধ আত্মা যিনি
কুহেলী-সন্দেহ ঘেরা যত পথ ছিল
ঘৃণাভরে ত্যজিলেন তিনি,
অসীম সাহসভরে করিয়া মনন,
অসঙ্কোচে উদ্দেশ্য দেখান,—
"মৃত্যু মহা-অভিশাপ, জীবনও তাহাই
শ্রেষ্ঠ বস্তু জানিও নির্বাণ।"

ওঁ নমো ভগবতে সম্বুদ্ধায়
ওঁ নতি মোর ভগবান বুদ্ধ যিনি তাঁয়।

যুগপুরুষ বিবেকানন্দ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌স্ জীবনের নানা সমস্যা সম্পর্কে নূতন নূতন আলোকপাত করেছেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বর্তমান যুগের অন্যতম মনীষী হোয়াইটহেড (Whitehead) বলেছেন: that adorable genius. এ মন্তব্য খুবই লাগসই হয়েছে। সমাজ উন্নয়নের ব্যাপারে জেম্‌স্-এর অভিমত হচ্ছে: The community stagnates without the impulse of the individual. সমাজের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য আনবার জন্যে ব্যক্তির প্রেরণার প্রয়োজন আছে। মশালের শিখার সংস্পর্শে না এলে কাঠের স্তূপ কিছুতেই জ্বলবে না—তা সে যতই শুকনো হোক্। বঙ্কিমচন্দ্র যদি আমাদের কানে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র না দিতেন কতদিনে আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা আসত—কে জানে? নিরস্ত্র নিপীড়িত জাতির হাতে সত্যাগ্রহের অনুপম অস্ত্র দিলেন গান্ধী। নইলে কত দিন লাগত সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলকে চূর্ণ করতে! যুগধর্মের আহ্বানে আমরা যাতে সাড়া দিতে পারি—আমাদের মধ্যে সেই প্রেরণা জাগানোর জন্যে বিবেকানন্দকেও জাতির প্রয়োজন ছিল। প্রত্যেক যুগেরই একটি বিশেষ ধর্ম আছে। আমরা যে যুগে জন্মেছি সে যুগের ধর্ম হচ্ছে যারা সর্বহারা, যারা সকলের পিছে সকলের নীচে, তাদের নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করা। বঙ্কিম যেমন জাতির কর্ণে ঘোষণা করলেন 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র, বিবেকানন্দ তেমনি ঘোষণা করলেন মহামন্ত্র 'দরিদ্র-নারায়ণ'। এই যুগান্তকারী মন্ত্রের আলোয় দিশাহারা ভারতবর্ষ তার গতিপথের সন্ধান পেল। শিক্ষিত ভারতবর্ষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল: ভগবান বহুরূপে সম্মুখেই রয়েছেন। তাঁকে খুঁজবার জন্যে রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের কোণে আসন পাতবার কোনই প্রয়োজন নেই, হিমালয় পাহাড়ের গুহায় যাবারও কোন দরকার নেই। যারা দরিদ্র, যারা মূর্খ, যারা ধূল্যবলুণ্ঠিত তাদের ভালবাসলেই ঈশ্বরের যথার্থ সেবা করা হবে। ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে ছিল। কতকগুলো অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানকে

সে ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিল। ধর্মসম্পর্কে যে ধারণা আমাদের মগজের মধ্যে শিকড় গেড়েছিল তাকে বিবেকানন্দ দিলেন নিষ্ঠুর আঘাত। সেই আঘাতের বেদনায় আমাদের মধ্যে এল চেতনা। নূতনতর চৈতন্যের আলোয় আমরা চিনলাম ধর্মের স্বরূপকে। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে। মানুষকে সম্মান দিলে তবেই ঈশ্বর প্রসন্ন হন। মহাপ্রভু ঠিকই বলেছিলেন: অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।' জীবের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। মানুষকে সম্মান দিতে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। বিবেকানন্দের অগ্নিবচনের কশাঘাতে আমাদের সংবিৎ ফিরে এল। মনীষী রোমা রোলাঁ বিবেকানন্দের জীবনীতে ঠিকই লিখেছেন:

> But the Master's rough scourge made her turn for the first time in her sleep, and for the first time the heroic trumpet sounded in the midst of her dream the forward of march India, conscious of her God.

ঘুমের মধ্যে ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের কণ্ঠে সেই প্রথম শুনল যুগান্তকারী তূর্যধ্বনি 'চরৈবেতি'; চলো, সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে চলো। তার পর থেকে ভারতবর্ষ আর ঘুমায় নি। বিবেকানন্দের তিরোধানের পরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে গণবিপ্লবের গরিমাময় প্রকাশ আমরা দেখেছি—তার মূলে বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠের তূর্যধ্বনি 'চরৈবেতি'। গান্ধীর পরিকল্পিত স্বরাজে রাজমুকুট দরিদ্র কিষাণের, দরিদ্র মজদুরের মাথায়।

গান্ধীর অহিংস গণআন্দোলনের মধ্যে আত্মিক শক্তিরই মহিমময় প্রকাশ। সত্যের জন্যে চরম দুঃখকে বরণ করার শক্তি তখনই আসে যখন মানুষ আপনাকে জানে রক্তমাংসের দেহ বলে নয়, অপরাজেয় আত্মা বলে। আত্মার লাগে না—সে যে আলোর শিখা। রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখ দিয়ে বলেছেন: 'আসল মানুষটি যে, তার লাগেনা, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে।' কর্মবিমুখ নির্বীর্য জাতিকে সাহসে এবং শক্তিতে অপরাজেয় করে তুলবার জন্যে স্বামীজী তাই বেদান্তের আশ্রয় নিলেন। বেদান্তের মধ্যে আত্মার বাণী। স্বামি-শিষ্যসংবাদে স্বামীজীর সেই অবিস্মরণীয় কথাগুলি আজও আমাদের কানে বাজছে:

> 'ভিতরে আত্মা সর্বদা জ্বলজ্বল্ করছে—সেদিকে না চেয়ে হাড়মাসের কিম্ভূতকিমাকার খাঁচা, এই জড় শরীরটার দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি' 'আমি' করছে। ঐটেই হচ্ছে সকল প্রকার দুর্বলতার গোড়া।'

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন জাতিকে সমস্ত প্রকারের ভীরুতা এবং দুর্বলতা থেকে মুক্ত করতে। দেহাত্মবুদ্ধিই সমস্ত ভীরুতার মূলে। তাই তো আত্মার উপরে এতখানি জোর। গান্ধীও চাইলেন জাতিকে ভীরুতা থেকে মুক্ত করতে। অত্যাচারের কাছে বশ্যতা স্বীকারের মূলে তো ভয়। নিরস্ত্র জনসাধারণ তখনই ভয়কে বর্জন ক'রে গণবিপ্লবের পথে আগিয়ে আসবে যখন তারা জানবে: আলোর শিখার তারা, শুধু রক্তমাংসের পিণ্ড নয়। বিবেকানন্দের পথকে অনুসরণ করেছেন গান্ধী। জাতিকে বন্ধনমুক্ত করবার জন্যে গান্ধী আত্মার শক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বেদান্তের মাধ্যমে আত্মার বীজমন্ত্র স্বামীজী দিলেন। একটা বিরাট জাতির রাজনৈতিক সংগ্রামে সেই বীজমন্ত্রকে বাঁধন-ছেঁড়ার অস্ত্রহিসাবে ব্যবহার করলেন গান্ধীজী।

গান্ধী আর বিবেকানন্দ—দু'জনের কণ্ঠেই সংগ্রামগান। বিবেকানন্দ Struggleএর কথা বারে বারে বলেছেন। 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।' বলেছেন:

'যেখানে Struggle, যেখানে Rebellion সেখানেই জীবনের চিহ্ন, সেখানেই চৈতন্যের বিকাশ।'

পত্রাবলীতে আছে :

'বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব, এখানে মেয়েমানুষের মত বসে থাকা কি আমার কাজ ?'

তাঁর নিজের জীবনও কি একটা প্রকাণ্ড সংগ্রাম ছিল না ? রঁলা (Romain Rolland) তাঁর সম্পর্কে ঠিকই লিখেছেন : Battle and life for him were synonimous. শান্তি তো তিনিই চান নি ; তিনি চেয়েছিলেন জীবন—মুক্ত, দীপ্ত, মহাজীবন যার মধ্যে সমগ্র সত্যের স্বীকৃতি। বর্তমান এবং অতীত, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য, কল্পনা এবং কর্ম—এদের কাকে তিনি গ্রহণ এবং কাকেই বা তিনি বর্জন করবেন ? সত্যের এই পরস্পর-বিরোধী বিভিন্নমুখী দিকগুলিকে নিজের জীবনে মেলাবার জন্যে ভিতরে ভিতরে কী দারুণ সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছে ! ঠাকুরের মৃত্যুর পর স্বামীজী মাত্র ষোলো বৎসর বেঁচেছিলেন ; পৃথিবী থেকে যখন তিনি ছুটি নিলেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নি। বিবেকানন্দের জীবনের এই সমর-ভরা, আগুনভরা ষোলটি বৎসরকে রলাঁ বলেছেন : Years of conflagration.

হাঁ, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতোই তিনি মরেছিলেন আর শত বাধাবিঘ্নের সঙ্গে অকুতোভয়ে লড়াই করতে করতে বীরের মতো মরবার জন্যেই দেশবাসীকে তিনি ডাক দিয়েছিলেন। যাতে আমরা জীবনকে একটা অন্তহীন সংগ্রাম ব'লে গ্রহণ করতে পারি এবং সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য দুঃখের পথকে সানন্দে বরণ করি, সেই জন্যেই তিনি আমাদের সামনে রেখেছিলেন গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় আদর্শ।

"বৃন্দাবন লীলাফীলা এখন রেখে দে। গীতা-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।"

অন্তরের এবং বাহিরের বাধাবিঘ্নের কাছে পরাজয় স্বীকার করা মানেই আমার চরম মৃত্যুকে ডেকে আনা, জীবনকে অগৌরবের মধ্যে অবগুণ্ঠিত করে রাখা। স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ জোরের সঙ্গে বাঁচুক, দেহে মনে সে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করুক ; কারণ ইতিহাসে তার কাজ আজও ফুরোয় নি ; পৃথিবী তার বাণীর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। কিন্তু নির্বীর্য, দুর্বল ভারতবর্ষের কথা কে শুনবে ? রলাঁ ঠিকই বলেছেন, গান্ধী সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের উপসংহারে :

We do not fight violence so much as weakness. Nothing is worth while unless it is strong, neither good nor evil. Absolute evil is better than emasculated goodness.

স্বামীজীর কথার সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল : 'The stones and trees ne'er break the laws but stones and trees remain. সে-সাধুতার মূল্য কি যা শান্তির দোহাই দিয়ে অন্যায়কে নীরবে সহ্য করে ? যার মধ্যে বীর্যের আগুন নেই ? পাথর এবং গাছ মিথ্যা কথা বলে না, চুরি করে না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা গাছ এবং পাথরই থেকে যায়। 'শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে, দাও সবে গৃহ-ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে'—কম দুঃখে বাঙালীকে রবীন্দ্রনাথ এই কথা শোনান নি ! 'ভালোমানুষ নইরে মোরা, ভালোমানুষ নই ; গুণের মধ্যে ঐ, আমাদের গুণের মধ্যে ঐ'—'ফাল্গুনী'র এই গানে একই সুর।

স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল, ভারতবর্ষ কণ্ঠে বেদান্তের বাণী নিয়ে দিগ্বিজয়ের পথে বাহির হয়েছে, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী শ্রদ্ধায় উদ্ধত মাথা নত করেছে তার পদপ্রান্তে। পরানুকরণপ্রিয়তা সত্য সত্যই আত্ম-ঘাতী। ভারতবর্ষ অন্য জাতির অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে আত্মহত্যা করবে—ইতিহাসে এর চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি আর কী হ'তে পারে ? তাই তো কণ্ঠে তাঁর শক্তিমন্ত্র। শক্তিমান সবল ভারত-বর্ষই জগৎকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে।

এই শক্তি যাতে ভারতবর্ষ অর্জন করতে পারে তার জন্যে স্বামীজী একদিকে শুনিয়েছেন বেদান্তের বাণী, শুনিয়েছেন দেহাত্মবুদ্ধির মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র, আর একদিকে শুনিয়েছেন গীতার কর্মবাদ। বলেছেন:

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। শরীরে মনে বল না থাকলে এই আত্মা লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে। তবে তো মনে বল হবে।'

ঠাকুরের সেই কথার প্রতিধ্বনি: "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" জনসাধারণের মনে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ তখনই সম্ভব যখন তাদের পুষ্টিকর আহার জুটবে, তার আগে নয়। ঠাকুরের সুরে সুর মিলিয়ে বিবেকানন্দ বললেন:

'ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই, পেট হচ্ছে সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না।'

অনেক দিন পরে গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় রামকৃষ্ণের এবং বিবেকানন্দের কথাটাই আবার নূতন ক'রে বললেন:

To a people famishing and idle the only acceptable form in which God can dare appear is work and promise of food as wages.

গান্ধী ক্ষুধার্ত ভারতবর্ষকে শোনালেন অন্নের কথা এবং একই সঙ্গে কর্মের কথা। কাজ না থাকলে মজুরি মিলবে কোথা থেকে আর অন্ন কিনতে হ'লে মজুরি তো চাই। বিবেকানন্দও অন্নের কথা বলে ক্ষান্ত থাকলেন না। দেশবাসীকে শেখাতে হবে অন্ন কি ক'রে সংগ্রহ করা যাবে এবং আরও শেখাতে হবে অন্ন সংগ্রহ করতে হ'লে নিজেরা কাজ করা চাই। স্বামীজীর সেই কথাগুলি এতকাল পরে আজও কত সত্য!

"একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্যে কি হাহাকার উঠছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা—অন্নের সংস্থান কর। চাকুরী গুখুরী ক'রে নয়—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানসহায়ে নিত্য নূতন পন্থা অবিষ্কার ক'রে।"

গান্ধীর বুনিয়াদীশিক্ষার মধ্যেও এই মাটি খোঁড়ার কথা। স্বামীজী কত আগে দেখেছিলেন, যে শিক্ষা ইংরেজ প্রবর্তিত করেছে তাতে বড়জোর কেরানীগিরি, ডেপুটিগিরি চলতে পারে, কিন্তু ঐ শিক্ষার দ্বারা জাতির অন্নের অভাব কখনোই পূর্ণ হবার নয়। তার জন্যে চাই নূতনতর শিক্ষাপদ্ধতি যার কেন্দ্রে থাকবে কায়িক শ্রম এবং যে শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীকে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত জীবনের সকলক্ষেত্রে পাকা ক'রে তুলবে। বিবেকানন্দ যে শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধী সেই শিক্ষারই স্বপ্ন দেখে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা দিলেন।

বিবেকানন্দ আমাদিগকে শোনালেন কর্মের মন্ত্র। বললেন, মাটি খুঁড়তে লেগে যা। ঠিক একই মন্ত্র শোনালেন রবীন্দ্রনাথ:

"রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি,
কর্মযোগে এক হ'য়ে তাঁর সাথে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে'।" (গীতাঞ্জলি)

গান্ধী যখন নিরন্ন জাতির হাতে সত্যাগ্রহের অনুপম অস্ত্রের সঙ্গে চরকাকেও তুলে দিলেন তখন কর্মবিমুখ পেট-রোগা জাতিকে তিনি কর্মমন্ত্রেই দীক্ষা দিলেন। বিবেকানন্দের জীবনীর এক জায়গায় রোমাঁ রল্যাঁ লিখেছেন: অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী have grown, flowered and borne fruit under the double constellation of the Swan and the Eagle—a fact publicly acknowledged by Aurobindo and Gandhi পরমহংস এবং বিবেকানন্দের প্রেরণায় অরবিন্দের, রবীন্দ্রনাথের এবং গান্ধীর প্রতিভার উন্মেষ এবং বিকাশ। রলাঁর সঙ্গে আমরা কি এই ব্যাপারে এক মত নই?

বিবেকানন্দ সত্যই চিরনূতন। তিনি আমাদিগকে শুনিয়েছেন শক্তির কথা, মহাবীর্যের কথা। বঙ্কিমও কৃষ্ণচরিত্র লিখলেন শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে অবনত ভারতবর্ষকে। আনন্দমঠে সন্তানের বিষ্ণু শ্রীচৈতন্যের প্রেমময় বিষ্ণু নন, তিনি সুদর্শনচক্রধারী শক্তিময় বিষ্ণু। বঙ্কিম নব্য ভারতের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন যাত্রাদলের শিখিপুচ্ছধারী কৃষ্ণকে নয়, কুরুক্ষেত্রের গীতাসিংহনাদকারী কৃষ্ণকে। খোলকরতালে বঙ্কিমের বিতৃষ্ণা। সত্যানন্দ আনন্দমঠে মহেন্দ্রকে নূতন ক'রে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। খোলকরতালে বিবেকানন্দেরও অনুরূপ বিতৃষ্ণা: খোলকরতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প ক'রে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। ভাবাবেগে উন্মত্ত জাতি রসচর্চায় ডুবে থাকবে; ত্যাগের পথে, বীর্যের পথে পা বাড়াবে না—এ জিনিস রবীন্দ্রনাথও চান নি।

"ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে ক'রে দাও সক্ষম স্বাধীন।" (নৈবেদ্য)

একটা বিপুল সত্য আমাদের আজ উপলব্ধি করবার প্রয়োজন আছে। কথাটা মার্কিন পণ্ডিত উইলিয়াম জেম্‌সের ভাষাতেই বলি:

Sporadic great men come everywhere but for a community to get vibrating through and through with intensely active life, many geniuses coming together and in rapid succession are required * * Blow must follow blow so fast that no cooling can occur in the intervals,

সব দেশেই কখনোসখনো মহাপুরুষ এসে থাকেন। কিন্তু একটা কর্মকীর্তিহীন নির্বীর্য জাতিকে কর্মসাগরে ঝাঁপ দেওয়াবার জন্যে দরকার হয় সেই জাতির মধ্যে একই সঙ্গে বহু প্রতিভার অভ্যুদয়। উত্তপ্ত লোহাকে ঠাণ্ডা হ'তে দিতে নেই। ঘায়ের পর উপর্যুপরি ঘা মারতে হয়। জাতকে গড়ে তুলবার বেলাতেও একই কথা। প্রতিভার পর প্রতিভার আবির্ভাব চাই দ্রুততালে। তবেই জাতির জড়তা কাটে, তার শিরায় শিরায় বৈদ্যুতিক প্রবাহের তরঙ্গ খেলে যায়। তার মধ্যে মহা উদ্যম প্রকাশ পায়।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভারতবর্ষ জাগছে, ভারতবর্ষ উঠছে, ভারতবর্ষ সত্য ও প্রেমের মন্ত্র নিয়ে দিগ্বিজয় করবে। এরই জন্যে তিনি এদেশে উপর্যুপরি প্রেরণ করলেন মহাপুরুষের পর মহাপুরুষ। সবাই এসে শোনালেন মানবাত্মার মহিমার কথা; শোনালেন মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাবীর্য, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুভ-বুদ্ধি সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশের কথা; শোনালেন পরানুকরণপ্রিয়তার মোহ পরিত্যাগ করে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির পথকে অকুতোভয়ে অনুসরণ করবার কথা। আমাদের যদি কান থাকে এঁদের কণ্ঠস্বর হৃদয়ের মধ্যে ঠিকই শুনতে পাব; যদি স্বচ্ছ বুদ্ধি থাকে এঁদের যুগান্তকারী বাণীর তাৎপর্য ঠিকই উপলব্ধি করবো; যদি দুর্জয় সংকল্প থাকে এঁদের প্রদর্শিত পথে মহাবীর্যের সঙ্গে ঠিকই আগিয়ে যাব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ঈশোপনিষদ্

অনুবাদক—শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এম্-এ

(সন্ন্যাসীর কর্তব্য)

চরাচর মাঝে ক্ষণিক যা কিছু
ঢাকো সব ঈশ-আচ্ছাদনে,
ত্যাগেতে মুক্ত করিও আত্মা
লোভ করিও না কাহারও ধনে। ১।

(গৃহীর কর্তব্য)

যদি কেহ চাও বাঁচিতে ধরায়
সুখেতে শতেক বর্ষ ধরি',
কামনা তোমার করিও পূর্ণ
শাস্ত্রবিহিত কর্ম করি'।

শতায়ু-ইচ্ছু দেহাভিমানিন্,
অন্য ধর্ম তোমার তরে,
নাহিক কিছুই যাহা না তোমায়
অশুভ কর্মে লিপ্ত করে। ২।

(আত্মজ্ঞানহীনের গতি)

অন্ধ-আঁধারে আবৃত যে লোক—
অসুরদিগের বাসস্থান,
আত্মহন্তা মানব যাঁহারা
মৃত্যুর পরে সেখানে যান। ৩।

(আত্মার স্বরূপ)

আত্মা একক, অচল অথচ
মনের গতিও ছাড়ায়ে যান,
অগ্রগামী এ-আত্মতত্ত্বে
ইন্দ্রিয়গণ কভু না পান।
স্থির থাকিয়াও তিনি দ্রুতগামী
অতিক্রমণ করেন সবে,
সত্তায় তাঁর বিশ্ববিধাতা
সকল কর্ম করান ভবে। ৪।
স্বতঃ গতিহীন হয়েও চলেন
অচল তবুও চলন আছে,
অবিদ্বানের অতিদূরে তিনি
আত্মস্বরূপ জ্ঞানীর কাছে।
সারা জগতের অন্তরে তিনি
মহাকাশ সম অনুস্যূত,
সারা জগতের বাহিরেও তিনি
সর্বব্যাপী ও সূক্ষ্মভূত। ৫।

(আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ)

আত্মার মাঝে সকল বস্তু,
সবেতে আত্মা যে জন হেরে
সেই দর্শন-বলেতে সে জন
কাহাকেও ঘৃণা করিতে নারে। ৬।

সকল বস্তু যে কালে জ্ঞানীর
আত্মাতে এক হইয়া যায়,
ঐক্যদর্শী সে লোক তখন
শোক-তাপ-মোহ কভু না পায়। ৭।

(আত্মার স্বরূপ)

অকায়, অব্রণ, শিরাহীন তিনি
অপাপবিদ্ধ, জ্যোতির্ময়,
শুদ্ধ, মনীষী, স্বয়ম্ভূ, কবি,
সর্বোত্তম, সর্বময়।
কল্পায়ুজীবী, প্রজাপতিদের—
—সংবৎসর-অধিপ—যাঁরা,
বিধান করেন যথাযথ তিনি
করণীয় যত কর্মধারা। ৮।

(কর্ম ও উপাসনা)

উপাসনাহীন কেবল কর্মী
প্রবেশ করেন অন্ধতমে,
কর্মবিহীন, দেব-উপাসক
তার চেয়ে গাঢ় আঁধারে ভ্রমে।
উপাসনা আর কর্মের কথা
ব্যাখ্যা করিয়া ধীমান্‌গণ,
'উভয়ের ফল ভিন্ন ভিন্ন'—
শুনিয়াছি তাঁরা এ-কথা কন। ১০।
উপাসনা আর কর্মকে যিনি
একই সঙ্গে করিয়া যান,
কর্ম-সহায়ে লঙ্ঘি' মৃত্যু
উপাসনাফলে অমৃত পান। ১১।

(প্রকৃতি ও ব্রহ্মের সমন্বয়)

শুধু কারণের উপাসকদল
নিবিড় আঁধারে প্রবেশ করে,
শুধু কার্যের পূজক আবার
তার চেয়ে গাঢ় আঁধারে চরে। ১২।

কারণ-ব্রহ্ম কার্য-ব্রহ্ম
ব্যাখ্যা করিয়া ধীমান্‌গণ,
'উপাসনা ফল দুয়েরই ভিন্ন'—
শুনিয়াছি তাঁরা এ-কথা কন। ১৩।
কারণ-ব্রহ্মে কার্য-ব্রহ্মে
একই সঙ্গে পূজেন যিনি,
কার্য-সহায়ে লঙ্ঘি' মৃত্যু
কারণপ্রসাদে অমর তিনি। ১৪।

(মার্গ-প্রার্থনা)

সোনার পাত্রে রেখেছে ঢাকিয়া,
সত্যের মুখ গোপন করে
পূষন্‌, সে পথ করো হে মুক্ত
সত্যস্বরূপ দেখাও মোরে। ১৫।
পূষন্‌, সূর্য, একাকী সাক্ষী
প্রজাপতিসুত, হৃদয়যামী
রশ্মিসমূহ সংহত কর
কল্যাণরূপ দেখিব স্বামী।
তোমার মাঝারে ঐযে পুরুষ
সেই ত স্বরূপ, সেই ত আমি। ১৬।
এখন আমার প্রাণবায়ু যাক,
মহাবায়ু সাথে বিলীন হয়ে,
এ-দেহ আমার অগ্নিতে পড়ি'
ভস্মের মাঝে যাক তো ক্ষয়ে।
ওংকাররূপী মানস অগ্নি,
স্মরণীয় সব আমার স্মর,
যাহা কিছু আমি করেছি জীবনে
তাহাও তুমি হে স্মরণ কর। ১৭।
তুমি হে অগ্নি, ফলভোগ লাগি
সুপথে মোদের বহিয়া আনো।
সর্বপ্রাণীর কর্ম ও জ্ঞান
হে দেব, তুমিই সকল জানো।
দূর করি' পাপ কুটিল যতেক
নিষ্পাপ কর মোদের তুমি,
প্রণাম তোমায় বারবার করি,
মনে মনে তব চরণ চুমি। ১৮।

(শান্তিপাঠ)

ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম যা-কিছু
ব্রহ্মের দ্বারা পূর্ণ হয়,
ইন্দ্রিয় মাঝে যা-কিছু গোচর
তাহাও ব্রহ্মে পূর্ণ রয়।
পূর্ণ হইতে ব্যক্ত পূর্ণ
ব্রহ্ম ব্যক্ত জগৎ-বেশে,
পূর্ণতা হতে পূর্ণটি নিলে
পূর্ণই পড়ে থাকেন শেষে।

ব্রহ্মানন্দ-শিবানন্দপ্রসঙ্গ

শ্রীকালীসদয় পশ্চিমা

ইংরেজী ১৯২১ সালের ফেব্রুআরি মাস হইতে আমি পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত পত্রব্যবহার আরম্ভ করি। ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুআরি তারিখে বাগবাজার ৫৭, রমাকান্ত বসু ষ্ট্রীট (বলরাম মন্দির) হইতে তিনি আমাকে যে পত্রখানি লিখেন তাহাতে স্পষ্ট নিষেধ নাই—মনে করিয়া ফেব্রুআরি মাস শেষ হইবার পূর্বেই বেলুড় মঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণেশ্বরের রাস্তায় কুটিঘাটের খেয়ায় গঙ্গা পার হইয়া যখন মঠে পৌছিলাম, তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। জনৈক সাধু আমাকে অতিথিশালায় পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর (স্বামী শিবানন্দ) সকাশে পাঠাইলেন। মহাপুরুষজী কামরার ভিতরে গভীর মনোযোগ সহকারে পত্র লিখিতেছিলেন, অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা প্রবেশ

করিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—কি চাই? বিনীতভাবে বলিলাম,—আমি মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) চিঠি পেয়ে এসেছি।

—মহারাজ পত্র দিয়েছেন, তাঁর কাছে যাও। এখানে কি? আমি ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। মনে মনে ভাবিলাম, তাই ত, বলরাম-মন্দিরেই আমার প্রথমে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে, আর তৎক্ষণাৎ বলরাম-মন্দিরে ছুটিয়া যাইবার উপায়ও নাই। অপরাধীর ন্যায় আস্তে আস্তে কহিলাম,—কিন্তু এখন যে দুপুর বেলা।

—ও, প্রসাদ পেতে চাও? বেশ ত, ভাণ্ডারীর কাছে যাও।

পূর্বোক্ত সাধুটি অদূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তিনি আমাকে চলিয়া আসিতে ইঙ্গিত করাতে আমি বাহির হইয়া আসিলাম। শুধু দুপুরে নয়, রাত্রিতেও মঠে অবস্থান করিয়া দু'বেলা প্রসাদ পাইলাম।

পরদিন সকালবেলা আমাকে বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে জনৈক সন্ন্যাসী একটি চলতি নৌকা ডাকিয়া মঠের ঘাটে ভিড়াইলেন। কিন্তু কলিকাতায় আমার এই প্রথম আগমন, পথঘাট কিছুই জানা নাই, একাকী কেমন করিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হইব—মনে মনে এরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক সেবক-সঙ্গে ঘাটে আসিয়া সেই নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। পূর্বরাত্রিতে তাঁহার অনুমতি না লইয়াই মঠে অবস্থান করিয়াছি—উহাতে অবশ্যই অপরাধ হইয়াছে, এবং তিনিই বা কি মনে করিতেছেন—ভাবিয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলাম। তাঁহার সম্মুখে যাইতেই যেন সঙ্কোচবোধ হইল। কিন্তু বাগবাজারে ত আমাকে যাইতেই হইবে। সুতরাং নিরুপায়ভাবে নৌকায় উঠিলাম এবং নিজেকে লুকাইবার উদ্দেশ্যে অপরিচিতের ন্যায় মঠের দিকে মুখ ফিরাইয়া এক কোণে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু যেখানে ভয়, সেখানেই বিপদ। মহাপুরুষজী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া এবং ঠিক আমাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন—তোমার বাড়ী না সিলেট? তুমি রাত্রিতে মঠে ছিলে?

—হাঁ মহারাজ।

—মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চলেছ? তা হ'তে পারে না। তাঁর শরীর অসুস্থ—জ্বর। তোমার সঙ্গে মহারাজের দেখা হ'তে পারে না; বুঝেছ?

আমি নীরব থাকিয়া মনে মনে ভাবিলাম কি আর করব। দীক্ষাদির আকাঙ্ক্ষা করে কি আর হবে। সামনে মঠ দেখছি, আর গঙ্গার উপরে একই নৌকায় মহাপুরুষজীর সান্নিধ্যে বসে রয়েছি; এতেই সব হ'য়ে গেছে। এর বেশী আমার ভাগ্যে নেই। জয় ঠাকুর!

উপরিলিখিত কথাগুলি একবার মাত্র বলিয়াই মহাপুরুষজী ক্ষান্ত রহিলেন না। কমপক্ষে পাঁচ ছয় বার আমাকে বলিলেন,—বুঝেছ, মহারাজের সঙ্গে তোমার দেখা হতে পারে না।

যথা সময়ে নৌকা কুমারটুলীর ঘাটে পৌঁছিলে, মহাপুরুষজীর সেবক ব্যাগটি আমার হাতে দিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন, আর আমি মহাপুরুষজীর অনুসরণ করিলাম। তিনি হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন এবং এক এক বার পশ্চাৎ ফিরিয়া, আমার দিকে তাকাইয়া সেই একই কথা খুব জোরের সহিত বলিতেছেন। পথিমধ্যে একবার শুধু জনৈক ভক্তের বাড়ীতে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং একটি কালীবাড়ীতে বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। তদ্ভিন্ন আর কোথাও না থামিয়া সোজা বলরাম-মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নিষেধাত্মক বাক্য কানে বর্ষিত হইলেও এমন পথপ্রদর্শক পাইয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম বিধি হয়ত বাম নহেন। দোতলায় উঠিয়া মহাপুরুষজী আমার হাত হইতে ব্যাগটি লইলেন, এবং মহারাজের প্রকোষ্ঠে

প্রবেশপূর্বক আমাকে কোন কিছু না বলিয়াই দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

জুতা, ছাতা ও বিছানাপত্র এক কোণে রাখিয়া নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণভাবে পাশের হলঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। তথায় কয়েকজনকে দেখিয়া মনে হইল তাঁহারাও যেন কাহার আগমনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই বুঝিতে বাকী রহিল না, ইঁহারা মহারাজের দর্শনাকাঙ্ক্ষী এবং অবিলম্বে মহারাজ তথায় দর্শন দিবেন। আমার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। দরজার কাছে একটুখানি সুবিধাজনক স্থান বাছিয়া লইতে না লইতেই দেখি বারান্দার উপর দিয়া তেজঃপুঞ্জ-কলেবর স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ—নেত্রযুগল কখনও অর্ধনিমীলিত, কখনও বা প্রসারিত করিয়া—ভাবাবেশে ধীর মন্থর গতিতে হলঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমার নিকটে আসিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। এই আমার প্রথম দর্শন! তিনি কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিলেন,—যাও বাবা! মহাপুরুষের কাছে যাও, আমার শরীর অসুস্থ।

আমি ত শুনিয়াই অবাক্ । তবে কি ইতিমধ্যেই আমার সম্পর্কে উভয়ের কথাবার্তা হইয়াছে! ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমি মহারাজের ঘরের দিকে যাইয়া দেখিলাম প্রবেশপথে মহাপুরুষজী একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। অতি সহজে তাঁহাকে পাইয়া মহা আনন্দে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন,—এই যে, তোমায় আবার দেখছি এখানে।

—মহারাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—মহারাজ পাঠিয়েছেন? কেন? তোমার কি চাই?

—দীক্ষা চাই।

—দীক্ষা চাই! সে আবার কি? তোমার নাম জানি না, ধাম জানি না, কিছুই জানি না,—দীক্ষা কি করে হয়! একি বাজারের মাছ পান বিক্রি, যে পয়সা ফেলে দিলে, আর নিয়ে গেলে।

আমি তখন তাঁহাকে আমার নাম-ধাম বলিলাম, মিউনিসিপ্যাল আফিসে চাকুরি দ্বারা জীবিকার্জনের এবং করিমগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাসমিতির সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা যথাসম্ভব বিবৃত করিলাম। ঐ সমস্ত শুনিয়া তিনি কহিলেন,—ঐ যা করছ—ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ—তৃষ্ণার্তকে জলদান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান—ঐ আমাদের দীক্ষা। ক্রীং ফ্রীং, ঐ সব ভট্চাযদের কাছে, আমাদের কাছে নয়।

দীক্ষা সম্পর্কে আমি কিছু কিছু শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলাম। আমার ঐ বুদ্ধিতে আঘাত করা হইতেছে ভাবিয়া নীরব রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি কহিলেন,—তুমি দীক্ষা চাও? আমি তোমায়···এই মন্ত্র দেব। তুমি নেবে?

হাত জোড় করিয়া উত্তর করিলাম,—হাঁ মহারাজ! তাই নেব।

তখন নাটকীয় ভঙ্গীতে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন,—শুধু ঐটি দেবো, আর কিছুই দেবো না। তুমি নেবে?

আমি পূর্ববৎ উত্তর করিলাম—হাঁ মহারাজ! তাই নেব।

তখন কহিলেন,—তবে দীক্ষা কি, আমায় বল।

আমি মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। এই সংকট মুহূর্তে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) তথায় আসিয়া উপস্থিত। আমার মুখের ভাব দেখিয়াই সম্ভবতঃ বুঝিলেন যে আমি বিপন্ন, তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ! ও কি চায়?

মহাপুরুষজী কহিলেন,—দীক্ষা চায়।

তখন কৃষ্ণলাল মহারাজ সানুনয়ে বলিলেন,—দিন্ না মহারাজ, দিন্।

মহাপুরুষজী উত্তর করিলেন,—হাঁ, তাই দিতে বসে আছি আর কি!

কৃষ্ণলাল মহারাজ এর পর চলিয়া গেলেন; কিংকর্তব্যবিমূঢ়বৎ আমি মেজের উপর বসিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে সৌম্যদর্শন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ধীরপাদবিক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া শয্যার উপর স্থিরাসনে উপবেশন করিলেন। তখন মহাপুরুষজী আমাকে দেখাইয়া বলিলেন,—মহারাজ, ও ত দীক্ষা চায়। একথা শুনিয়া মহারাজ যেন একটু শ্লেষভরে এবং বেশ জোরে জোরে কহিতে লাগিলেন,—এই ত নাম জাহির করতে এসেছে: রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি। আমি ভিতরে ভিতরে যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি আমার দিকে বিস্ফারিতনেত্রে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন,—বাবা! তোমাদের পূর্ববঙ্গের লোক—সব আমার জানা আছে, দীক্ষার সময়ে খুবই আগ্রহ দেখায়, শেষে আর কিছু করতে চায় না; তাদের দল বাড়াতে এসেছ?

প্রতিবাদের সুরে আমি উত্তর করিলাম,—না মহারাজ! ওদের দল কেন বাড়াব? বিপরীত দলই বাড়াব। তখন আবার একটু শান্তরূপ ধারণপূর্বক কহিলেন,—উপযুক্ত হলে আমরা ডেকে এনে দীক্ষা দিই। আমি বলিলাম,—আমি কি এমন উপযুক্ত হব মহারাজ, যে আমায় ডেকে এনে দীক্ষা দেবেন? উহাতে তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—বল্‌ছি হবে, বল্‌ছি হবে। তখন মহাপুরুষজী একবার আমার দিকে একবার মহারাজের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ! ওকে আশীর্বাদ করুন, ও করিমগঞ্জে ঠাকুর স্বামীজীর কাজ করছে, ওকে আশীর্বাদ করুন। মহারাজ অতিশয় শান্ত ও সমাহিতভাবে আশ্বাসভরে বলিলেন,—হাঁ হাঁ, আশীর্বাদ ত করাই রয়েছে। তখন মহাপুরুষজী আমাকে অভয় দিয়া বলিলেন,—এই ত তোমার দীক্ষা হয়ে গেল! আর formal (আনুষ্ঠানিক) তা হয়ে যাবে। ক্ষণকাল পরে মহারাজ করুণাপূর্ণ স্বরে আমাকে বলিতে লাগিলেন,—বাবা, সমস্ত বিশ্ব-জগৎ থেকে মনটাকে গুটিয়ে কূটের উপর নিয়ে রাখা, সে কি একটুখানি কথা, সে কি একটুখানি কথা!

বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। "কূটস্থমচলং ধ্রুবং" গীতার শ্লোকটি মনে পড়িল, কেবলি ভাবিতে লাগিলাম 'দীক্ষা' 'দীক্ষা' করিয়াছি, কিন্তু উহার আসল তাৎপর্য কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছি? ঐ চিন্তাধারায় আমি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া দেখিলাম ঘরে আমি একাকী বসিয়া রহিয়াছি, মহারাজ কিংবা মহাপুরুষ কেহই তথায় নাই।

ঘরের বাহিরে আসিয়া আমি বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতে শুনি, পাশের একটি কক্ষ হইতে মহাপুরুষজী আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, ওহে! শুনে যাও, মহারাজকে বল, তিনি যদি অনুমতি করেন তো আমি ঢাকায় গিয়ে তোমায় দীক্ষা দেব। অপর-দিকের বারান্দায় মহারাজ পায়চারি করিতেছিলেন; তাঁহাকে যাইয়া বলিতেই তিনি উত্তর দিলেন,—হাঁ হাঁ, অনুমতি ত করাই রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঐদিন রাত্রির ট্রেনে মহাপুরুষজী স্বামী অভেদানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া কিছুদিনের জন্য ঢাকা যাইতেছিলেন। মহারাজের উত্তর মহাপুরুষজীকে জানাইলে তিনি আমাকে সুবিধামত ঢাকায় যাইতে বলিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া আমি তাঁহার সঙ্গেই যাইতে চাহিলাম। উহাতে মহাপুরুষজী খুব হাসিতে হাসিতে কহিলেন, কি, আমায় পাকড়াও করে নিয়ে যাবে, আমায় পাকড়াও করে নিয়ে যাবে! এই সময়ে মহারাজ আমাকে ডাকিয়া কহিলেন,—ওহে, মহাপুরুষ তোমায় ঢাকায় নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দেন, সে ইচ্ছা

আমার নয়। বুঝেছ? এ কথা মহাপুরুষজীকে নিবেদন করিতেই তিনি কহিলেন,—তবে আমি কি করতে পারি বল। দীক্ষার ব্যাপার ওখানেই আপাততঃ চাপা পড়িল। মহাপুরুষজীর সঙ্গে আমার আর ঢাকা যাওয়া হইল না।

মহারাজ আমাকে বারংবার খাওয়া-দাওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়াতে মহাপুরুষজীর নির্দেশানুযায়ী আমি বেলুড় মঠে ফিরিয়া গেলাম। পরদিন ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ স্বয়ং আমাকে লইয়া গিয়া বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাসে কয়েক দিন থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তথা হইতে বলরাম-মন্দিরে যাতায়াত খুব সহজ, সুতরাং নিত্য মহারাজের দর্শন ও সঙ্গ লাভের অতি উত্তম সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া গেল। আট দশ দিন আমি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে কাটাইলাম। কখনও শিশুর ন্যায় সরল চপল, আবার কখনও অতিশয় গুরুগম্ভীর, কত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছি। একদিন দক্ষিণ হস্তের তর্জনী উপরে তুলিয়া লীলায়িত ভঙ্গীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বলি কেমন আছ? আবার পরমুহূর্তেই দীক্ষা-সম্পর্কে আমার মনের ভিতরে যে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহা বুঝিয়া অতি কঠোর ভাব অবলম্বনপূর্বক কহিলেন,—আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। পরস্পরের মধ্যে আমরা সচরাচর যেমন করিয়া থাকি, তেমনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কি খেয়েছ?

আমার উত্তর শুনিয়া খুশী হইয়া বলিলেন—বাঃ, তবে ত বেশ খেয়েছ।

অপর একদিন থাকিয়া থাকিয়া তিনবার আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার সঙ্গে ত দেখা হয়ে গেছে—আর কেন, এখন ওকে চলে যেতে বল। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। আমার উত্তর শুনিয়া পরে চুপ করিয়া রহিলেন। আমার নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ সম্পর্কে একদিন পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন—তাতে কি হয়েছে, অত তাড়াতাড়ি কেন রে বাপ! বিদায়ের পূর্বরাত্রে এ বিষয় আমি আবার উত্থাপন করিলে উত্তর পাইলাম,—মহাপুরুষ ফিরে না এলে ত কিছু হবার নয়, বাবা। দিন কয়েক মাত্র মহারাজের সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাই আমাকে জীবনে অপূর্ব শিক্ষা ও প্রেরণা দিয়াছে।

আমার বেলুড় আসার মূল উদ্দেশ্য আপাততঃ সিদ্ধ না হইলেও মনে প্রভূত আনন্দ লইয়া কর্মস্থলে ফিরিলাম এবং পৌঁছানোর সংবাদ মহারাজকে পাঠাইলাম। তদুত্তরে তিনি তাঁহার স্নেহাশীর্বাদ আমাকে জানাইলেন। উহার কিছু কাল মধ্যেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

মহারাজের তিরোধানের পর স্বামী শিবানন্দের সহিত আমি পত্রব্যবহার আরম্ভ করি। ১৯২২ ইংরেজীর ১২ই মে তারিখের একখানি চিঠিতে তিনি লিখেন যে, যথার্থই মহারাজ আমায় কৃপা করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, মহারাজের অন্তর্ধানের ফলে তাঁহার তখন দীক্ষাদানাদি ব্যাপারে উদ্যম কিংবা উৎসাহ নাই, কিন্তু আমি যেন নিরুৎসাহ না হইয়া মহারাজের উপদেশানুযায়ী জীবনযাপন করি ইত্যাদি।

২১. ৬. ১৯২২ তারিখের পত্রে তিনি আমাকে লিখিলেন—"......আমার দীক্ষাদান আর কিছুই নহে: কেবল সেই জগন্নাথ, জগৎপতি, কলিকলুষ-নাশক, যুগধর্মসংস্থাপক, যুগাচার্য, যুগগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি এখন পূর্বোক্তরূপে ঐ নাম ভক্তি-প্রীতির সহিত জপ করিবে।......"

১৩. ৭. ২২ তারিখের পত্রে তিনি আমায় জানাইলেন যে ৩রা আগস্ট একটি দীক্ষার দিন আছে, তবে ঐ দিনটিতে আমার সুবিধা হইবে কি না, এবং তিনিও মঠে থাকিবেন কি না নিশ্চয় বলিতে পারেন না। যাহা হউক, চিঠিপত্রে ও

তারযোগে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া নির্দিষ্ট দিনে আমি মঠে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গাতে অবগাহনপূর্বক মন্দিরে যাইয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, এবার যেন প্রত্যাখ্যাত না হই। কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ মহারাজের সেবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি কালীসদয় বাবু? আপনি মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চান? তবে আসুন।

তাঁহাকে অনুসরণপূর্বক মহাপুরুষ মহারাজের কক্ষে উপনীত হইলাম। মহাপুরুষজী একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই প্রহৃষ্টভাবে হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—তোমায় ত আমি খুব জানি, তোমায় ত আমি খুব চিনি, তোমায় ত আমি অনেক দেখেছি। তাঁহার এরূপ প্রফুল্লভাব দর্শনে আমি মহা আনন্দিত হইয়া বলিলাম, মহারাজ! গত ফেব্রুআরি মাসে বলরাম মন্দিরে মহারাজ ও আপনার সহিত আমার অনেক আলাপ হয়েছিল। একথা শুনিবামাত্র তিনি অত্যন্ত বিষাদগ্রস্তভাবে কহিলেন,—সে কথা কি আর বলতে! মহারাজ আজ স্থূল শরীরে নেই, আমরা সব কি আর বেঁচে আছি, এখন আর কথা বলব কার সঙ্গে।

আমার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য মনে মনে অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া পুনরপি শান্তভাব ধারণকরত তিনি আমাকে আশ্বাসদানপূর্বক বলিলেন—এসেছ, বেশ হয়েছে, এখন মঠে থাক, দীক্ষা হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট দিনে দীক্ষা হইয়া গেল। বিদায় লইবার কালে বলিয়া দিলেন যেন চিঠিপত্র লিখি। তদবধি নিয়মিতভাবে আমি তাঁহাকে পত্র লিখিতাম, তিনিও উত্তর দিতেন।

১২. ৮. ২৬ তারিখের একখানি পত্রে তিনি লিখেন—"তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সংসারে থাকিয়া সহস্র সম্পদের ভিতরে যে মনে করে আমি বেশ আনন্দে ও শান্তিতে আছি সে বড় ভ্রান্ত। ক্ষণিকের জন্য হয়ত কেহ ওরূপ মনে করিতে পারে, কিংবা একেবারে যার দূরদৃষ্টি নাই সেও হয়ত ওরূপ মনে করিতে পারে; কিন্তু ভগবৎকৃপায় বা বহুজন্মের সুকৃতির ফলে যার উপর গুরুকৃপা হইয়াছে, সে কখনই যে কোন অবস্থাতেই হউক সংসারকে সুখময়, শান্তিময় স্থান মনে করিতে পারে না এবং সেজন্য সে সততই মোহের পারে ভগবৎনিকেতনে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে। তোমার পত্রগুলি যখনই আমি পাই ও পড়ি, আমার খুব আনন্দ হয়—কারণ তোমার মন সংসারে কখনও শান্তিসুখ অনুভব করে না,—ইহাই মুমুক্ষুর লক্ষণ।... ..."

মহাপুরুষ মহারাজের মহাসমাধির পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরেই আমি মঠে দু'একবার যাতায়াত করিতাম, এবং তথায় অবস্থানকালে সাধু মহারাজদিগের সহিত যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার চেষ্টা করিতাম। কখনও কখনও দু' তিন মাস একটানা থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছে,—যদিও শেষের দিকে কি জানি কেন, মহাপুরুষজী আমার দীর্ঘকাল মঠে থাকা অনুমোদন করিতেন না, করিমগঞ্জে ফিরিয়া যাইবার জন্য কেবলি তাড়া দিতেন। আমার সহিত তাঁহার সদয় ব্যবহারের অনেক মধুময় স্মৃতি চিত্তভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। সামান্য দু' একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, যদ্দ্বারা পাঠকবর্গ মহাপুরুষজীর দিব্যজীবনের গভীরতা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

একদা আমি মঠে পৌঁছিয়া সঙ্গের টাকাকড়ি আফিসঘরে জমা রাখিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। ঐ দিন সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে জপধ্যান সারিয়া যখন নীচে নামিয়া আসিতেছি তখন (আগেকার দিনে চা-পানের স্থানরূপে ব্যবহৃত) পুরাতন মঠের ভিতর দিকের বারান্দায় হেলান-দেওয়া বেঞ্চের উপর মহাপুরুষ মহারাজ ক্ষীণ

আলোকে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়াই চলিয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বেশ চিনিতে পারিয়া ডাকিয়া কহিলেন,—কালীসদয়, তোমার সঙ্গে যা টাকা পয়সা আছে, আফিসে রেখে দিও। আমি বলিলাম,—হাঁ মহারাজ! রেখে দিয়েছি। উত্তর শুনিয়া তিনি কহিলেন, রেখে দিয়েছ! তবে ত তুমি ভারী চালাক! আরও বলিলেন, আমি যখন তোমার চিঠি পাই ও পড়ি, আমার খুব আনন্দ হয়, বুঝেছ? কিন্তু আমি ত তোমায় সব দিয়ে দিতে পারি না। Religion must come from within (ধর্মভাব ভেতর থেকে আসবে) এ ত বাজারের মাছ পান নয় যে পয়সা ফেলে দিলে, আর কিনে নিয়ে গেলে। স্বামীজীর বই পড় নাই? তাতে লেখা রয়েছে—Religion must come from within, and not from without. বুঝেছ? আমি মাথা নাড়িলাম। তিনি আবার বলিলেন, স্বামীজীর বই পড় নাই? তাতে লেখা রয়েছে—Religion must come from within, and not from without.—পড় নাই? আমি উত্তর দিলাম—হাঁ মহারাজ, পড়েছি। কিন্তু তিনি আমার কথায় যেন একেবারেই কর্ণপাত না করিয়া ভাবের ঘোরে হেলান ছাড়িয়া আমার দিকে ঝুঁকিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন,—পড় নাই? পড় নাই?

তখন স্বামীজীর 'মদীয় আচার্যদেব' অবলম্বনে উত্তর দিলাম,—মহারাজ! আপনি যা বলেছেন তা অবশ্যই পড়েছি, আবার এও পড়েছি, 'that a great soul can transmit religion to others either by a touch or by a look' (মহাপুরুষগণ স্পর্শ বা দৃষ্টি দ্বারা অন্যের ভিতর ধর্মভাব সঞ্চারিত করতে পারেন)। আমার মুখ হইতে একথা শুনিয়াই তিনি পুনরায় বেঞ্চে হেলান দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন, তারপর সোজা হইয়া উত্তর করিলেন,—না, আমি তা পারি না। একটু থামিয়া থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—না, আমি তা পারি না, পারলেও তোমায় দিব না, দিলেও তুমি রাখতে পারবে না।

পর পর এই তিনটি বাক্য আমার অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া আমাকে সন্দেহাতীতরূপে বুঝাইয়া দিল—আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আত্মগোপনের প্রয়াস,—আর চরম সত্যের উপলব্ধির নিমিত্ত আমাদেরও পক্ষে আত্মপ্রস্তুতি প্রয়োজন।

একে একে তথায় আরও জনকয়েক আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়া অন্যদিকে কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়া গেল। 'Religion must come from within' এই মহাবাক্য হৃদয়ে অনুধ্যান করিতে করিতে আমি আস্তে আস্তে তথা হইতে সরিয়া পড়িলাম।

বারান্তরের কথা। মঠে কিছুদিন যাবৎ বাস করিতেছি। প্রত্যহ যেমন করিয়া থাকি, সেদিনও তেমনি সকালে ৮।৯ ঘটিকার সময়ে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কক্ষে গিয়াছি। আপনাতে নিমগ্ন অবস্থায় তিনি চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি প্রণাম করিয়া উঠিলে পর আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কালীসদয়, তুমি কবে করিমগঞ্জে যাচ্ছ? মহাপুরুষজীর শরীর তখন রোগক্লিষ্ট, অতিশয় দুর্বল। মঠ ছাড়িয়া শীঘ্র চলিয়া যাইবার ইচ্ছা আমার এতটুকুও ছিল না। তাই উত্তর দিলাম,—মহারাজ! আপনার শরীরের যে রকম অবস্থা, তা'তে ছেড়ে যেতে মন চায় না,—আমার একান্ত ইচ্ছা আরও কিছুদিন এখানে থাকি। একথা শুনিয়া নিজের শরীর দেখাইয়া কহিলেন,—এই পাঞ্চভৌতিক দেহ, এটা ত যাবেই, এটাতে কি দেখছ, ভিতরে দেখ। আমার মনে বিষম ধাক্কা লাগিল, বলিলাম—না মহারাজ, ভিতরে ত কিছুই দেখতে পাই না। উত্তর শুনিয়া তিনি

কহিলেন, দেখবে আবার কি? এই চোখ দিয়ে গাছপালা দেখছ, তাই ত দেখবে। তবে কিনা ঠাকুর দয়া করে আমাদের লাইফ (জীবন) তৈরী করে দিয়েছেন। তোদেরও হয়ে যাবে, ভাবনা কি? পুনরপি কহিলাম, মহারাজ! শাস্ত্রে ত দিব্যদর্শনের কথাও রয়েছে। তখন উত্তর করিলেন—হাঁ; তাও রয়েছে, তাও রয়েছে। এই কথাগুলি বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন; আমিও প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

একবার আমি মহাপুরুষ মহারাজকে কাতরভাবে প্রার্থনা জানাই যে, যদি তিনি দয়া করিয়া অনুমতি দেন তবে কয়েকদিন তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিয়া কৃতার্থ হই। উহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, ওটা আবার কি! তাঁর নাম করা, তাঁর ধ্যান চিন্তা করা ঐটিই আসল।

আমি নীরব রহিলাম এবং ঐ কথার গভীরতা চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু পরে তিনি স্নেহার্দ্রস্বরে কহিলেন,—বেশ ত, তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে, সন্ধ্যার পর এস।

সন্ধ্যারতির পর তাঁহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দেখিলাম তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন, আর সুবিখ্যাত মৃদঙ্গ-বাদক ভগবানচন্দ্র সেন তাঁহার দক্ষিণপদে, এবং সেবক তাঁহার বামপদে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। ঘরে আগন্তুকের সাড়া পাইয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? নিজের নাম বলিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। খানিক পরে সেবককে তিনি কহিলেন—ওকে ঐ পা'টা ছেড়ে দাও ত! নিজের অনভিজ্ঞতা ও অপটুত্বের কথা চিন্তা করিয়া আমার মনে দারুণ ভয় হইল। মনে হইল মহাপুরুষ মহারাজ যেন নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। আমি এখন কি করি তৎসম্পর্কে ভাবনায় পড়িয়া গেলাম। আমাকে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় দেখিয়া ভগবানবাবুর দয়া হইল। তিনি খুব ভরসা দিলেন এবং কি করণীয় তাহা বুঝাইয়া দিলেন। সতর্কতার সহিত আমি কাজে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রায় অর্ধঘণ্টা পদসেবায় অতিবাহিত হইলে মহাপুরুষজী আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—কালীসদয়! তুমি আর কতদিন মঠে আছ?

উত্তর করিলাম,—মহারাজ! আর মাসখানেক মঠে থাকার ইচ্ছা। উহা শুনিয়াই তিনি তর্জনী খাটের উপর ঠুকিয়া ঠুকিয়া কহিতে লাগিলেন,—এই আজ থেকে মাস খানেক? আমি বলিলাম,—হাঁ মহারাজ! তদুত্তরে তিনি কহিলেন,—না, সে ইচ্ছা ত আমাদের নয়, আজ থেকে তুমি মাস-খানেক এখানে থাক, সে ইচ্ছা ত আমার নয়, তুমি ওদিকে (অর্থাৎ করিমগঞ্জে) চলে যাও, এদিকে তোমার বেশী ঘোরাঘুরি করার দরকার নেই।

সহসা এই কঠোর আদেশে আমার মনে প্রবল ঝড় উঠিল। কতক বিচলিতভাবে বলিলাম,—মহারাজ! অনুমতি করেন ত, না হয় আমি কলকাতায় কিছুদিন থেকে যাই। তিনি দৃঢ়তার সহিত কহিলেন,—না, তুমি কলকাতায়ও থাকতে পাবে না,—ওদিকে চলে যাও। এর পরেও নানা যুক্তির অবতারণা-পূর্বক মঠে কিছুদিন থাকিবার নিমিত্ত আমি কাতরভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলাম। আমার বোধ হইল যেন তিনি সম্মত হইয়াছেন।

পরদিন রাত্রিতে মহাপুরুষ মহারাজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া মনে হইল তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। আমি অতি সন্তর্পণে পদসেবা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর তিনি বলিয়া উঠিলেন,—কালীসদয়! আমার কথা শুনছ না কেন? আমি উত্তর করিলাম,—শুনছি ত মহারাজ! তিনি কহিলেন,—কোথায় শুনছ, ওদিকে চলে যাও।

—এখানে ক'টা দিন থেকে আমার চোখের চিকিৎসা করিয়ে যাবার অনুমতি দিন।

—তবে বল, তুমি চোখের চিকিৎসা করাতে এসেছ?

—মঠেও থাকা, আর চোখেরও চিকিৎসা দুই-ই।

—Do you know your future? (তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জান?)

—না, মহারাজ!

—তবে আমার কথা শুনছ না কেন? একথা মনে করো না যে তোমাকে মঠে থাকতে দেওয়া হ'ল না; but for your good, (তোমার ভালর জন্য)—but for your good… কথাটি দু'বার বলিয়া এবং অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি গাত্রোত্থানপূর্বক শয্যার উপরে ধ্যানস্তিমিতলোচনে বসিয়া রহিলেন, আর আমি নিজেকে মনে মনে অপরাধী গণ্য করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাকে কহিলেন,—তুমি গান পছন্দ কর না? যাও সাধুদের গান শোন গে। মাঝে মাঝে এলে, প্রণাম করলে, সেই ত ভাল।

অতঃপর বাহিরে আসিয়া গানের আসরে যাইয়া বসিলাম বটে, কিন্তু মন সঙ্গীতে নিবিষ্ট হইল না। পরদিন প্রাতে বাগবাজারে গমনপূর্বক একটা থাকিবার জায়গা ঠিক করিয়া মঠে ফিরিলাম।

কলিকাতায় কয়েকদিন থাকাকালে মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে আসিয়া মহাপুরুষজীর পূত-সঙ্গলাভে প্রভূত আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম। এখন ভাবি, মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছার স্রোতে আমার ইচ্ছা কোথায় বা ভাসিয়া গেল! তিনিই হাত ধরিয়া আছেন, তাই নির্ভাবনায় আছি, আর পুরাতন ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া

স্মরিষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।

মনের মানুষ কেঁদে ওঠে কেন?

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কে জানে কোথায় অকূলের কূল, আকাশের কোথা শেষ!
রূপের অতীত আনন্দ কেহ পেয়েছি কি পথ খুঁজে
মৃত্যু-অভেদ প্রেমে?
চির অনন্ত চিৎপ্রকর্ষে আছে কি সুরের রেশ?
যার মীড় টেনে গান গাওয়া হোলো ব্যথার অশ্রু মুছে
পার্থিবলোকে নেমে!

অনাদি প্রেমের পীযূষ-পুষ্ট পৃথিবী প্রমোদে রহে
মিলনে মিলনে হৃদি মন্থনে বন্ধন সংসারে
ঊর্ণনাভের জালে।
নিগূঢ় গোপন আত্মারে লয়ে রসের সাগর বহে,
ভোগের ভিতরে ভগবানে পেতে প্রাণ চায় বারে বারে,
ধ্যানের অন্তরালে।
কামনা কামের কুহকে তনুতে তন্তুর উদ্ভব
তারি জাল রচি অতনুসেবায় জড়ায়েছি মোর সব।

মায়ার মধুপ করে গুঞ্জন জীবনের মধু লোভে,
মাধবী রাতের শশধরসুধা অধরে তুলিয়া পান
করিতে চকোর আসে।
মনের মানুষ কেঁদে ওঠে কেন ক্ষোভে আর বিক্ষোভে?
মুক্তিপাগল আপনার মনে গেয়ে যায় তার গান
প্রকৃতিপুরুষ পাশে।

সূর্যের পানে সূর্যমুখীর সুন্দর আঁখি দুটি,
প্রভাতবেলায় প্রার্থনা সম কেন ওঠে ধীরে ফুটি?
সব নদী আর সব জলধারা ছুটিতেছে অবিরত—
সিন্ধু যেথায় উছলিয়া সদা করিতেছে ক্রন্দন
অসীম বার্তা বয়ে।
কঠিন পৃথ্বী ভেদ ক'রে বীজ-অঙ্কুর জাগে যত
তরুবীথিকার রূপ ধরে ওরা করে ঋতু আবাহন
কিশলয় কোলে লয়ে।
মহা আকাশের প্রতিবিম্বিত ঢেউয়ের চতুর্দোলে
দুলিয়া দুলিয়া কোন্ জন নিতি কার কথা যায় বলে?

সত্যের সাধনা

শ্রীমতী নলিনী ঘোষ, এম্-এ

'সত্যং শিবম্ সুন্দরম্'—এই হ'ল ভগবানের আসল রূপ। 'সত্য' ভগবানের আর একটি নাম। সত্যের সাধনাই ভগবৎসাধনা—সত্যের প্রতিষ্ঠাই জীবনে ভগবদনুভূতির আস্বাদলাভ। উপনিষদের মতে সত্য ও ভগবান এক। বুদ্ধদেব বলেছেন,—'যিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনিই সুখী। সত্য মহান্ ও সুন্দর। সত্য ভিন্ন জগতে অন্য ত্রাণকর্তা নাই।' কায়, মন, বাক্য ও ভাব এই চার রকম উপায়ে সত্যকে পালন করতে পারলে তবেই সত্যের সাধন সম্ভব ও তখন সত্য ধীরে ধীরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে একটি ধর্মরাজ্য গড়ে তোলে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমহংসদেব একে একে মায়ের চরণে সবই নিবেদন করলেন, বললেন, 'এই নে মা তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম ; এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য' ; কিন্তু বলতে পারলেন না, 'এই নে তোর সত্য'।' সব দিলেন কেবল নিজের জন্য রইল সত্য। সত্য দিলে কি নিয়ে থাকবেন ? সামান্য মানুষের তো দূরের কথা, যিনি ভগবানের অবতার তাঁরও সত্য ছাড়া অবলম্বন নেই। সত্য এমনি জিনিস যে তা ভগবানকেও দেওয়া যায় না, ভগবানও একে পরিত্যাগ করতে পারেন না। ঠাকুরের কি আঁট ছিল সত্যের উপর ! যে কথা মুখ দিয়ে একবার বেরিয়েছে, তা পালন করতেই হবে প্রাণপণে, তা না হলে যে সত্য রক্ষা হয় না। বাড়ীর ভিতর একখানি পা গলিয়ে দিয়েও 'যাব' উচ্চারিত শব্দের সত্যকে রক্ষা করতে হয়েছে। একি সাধারণের কাজ ?

মানুষ যখনই এই সত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই যুগে যুগে মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সত্যের বাণী প্রচার করেছেন। গীতায় শ্রীভগবান নিজে বলেছেন,—"দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" এই আশ্বাসবাণী স্মরণে থাকলে মানুষের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। হয়ত জীবনে বারে বারে সত্যচ্যুতি ঘটবে, তবুও একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করেই তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এই সাধনার ভিতর দিয়েই জীবনে ব্রহ্মের রসাস্বাদ ঘটবে। সত্যকে আশ্রয় করলে জীবনে হয়ত দুঃখ বিপদ শতগুণে বেড়ে যাবে, সত্য সব সময় আপাত-সুখ দিতে পারে না, কিন্তু দুঃখের দরজা দিয়েই তো মঙ্গলময়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সত্যকে আমরা খণ্ডিতভাবে দেখি বলেই আমাদের সংসারকে দুঃখময় মনে হয়। যদি কোন রকমে একবার বুঝতে পারা যায় যে আমাদের যা কিছু অভাব ও দুঃখ, সবই কেবল সত্যের অভাবের জন্য তা হলে দুঃখের চেহারা একেবারে সম্পূর্ণ বদলে যায়। তাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়।" 'অসৎ হতে আমাকে সত্যে লয়ে যাও' ; সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই ভগবান লাভ হল, আর তখন সর্বত্রই আনন্দ। যেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যায় সর্বত্রই সেই আনন্দময় রূপজ্যোতি, জগৎময় আনন্দ-লহরী বয়ে যায়। সর্বত্রই দেখা যায়—"আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি" কারণ তিনি যে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্'; তিনি সত্য, জ্ঞান, তিনিই অনন্ত আনন্দ। এই আনন্দময় আপনাতে আপনি এমনি পরিব্যাপ্ত যে তাঁকে ধারণা করা যায় না—শাস্ত্র বলেছেন, তিনি 'অবাঙ্মনসোগোচরম্', তিনি বাক্য ও মনের অতীত। সংসারের মাপকাঠিতে তাঁকে

পাওয়ার বিচার চলে না, তবুও তিনি ধরা দেন। ঋষি বলেছেন—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য-মনসা সহ', মনের সহিত যাহাকে না পাইয়া বাক্য যাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। সেই অনন্ত আনন্দ যিনি পাইয়াছেন, তাহার কোন ভয় থাকে না। এই আদর্শই ভারতের আদর্শ। দুঃখের ভিতর দিয়েই যদি তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তাতেই বা ভয় পাবার কি আছে? দুঃখের আগুনেই তো সত্যের প্রকাশ, এর ভিতর দিয়েই মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে প্রার্থনা উত্থিত হয়—'আবিরাবীর্ম এধি'—তুমি প্রকাশিত হও, আবির্ভূত হও।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইতেছ, সেই যে উদ্ধারের পথ, সে তো আরামের পথ নয়। সে যে পরম দুঃখের পথ।' এই দুঃখরূপ স্তর অতিক্রম করেই তো যেতে হবে পরম সত্যের সান্নিধ্যে। সেখানে একবার গেলে সব আনন্দ, কেবল আনন্দ।

সত্য নির্বিশেষ। কিন্তু কালের, সময়ের ও অবস্থা বিশেষে একই সত্যের বহু পরিবর্তন দেখা যায়, কাজেই মনে হতে পারে সত্য আংশিক ও পারম্পরিক। কিন্তু যে কালের যা সত্য তাই মেনে চলাই ধর্ম। সত্য যে চরম ও নির্বিশেষ তার বহু প্রমাণও আমরা মহাপুরুষদের বাণী ও জীবনাদর্শে দেখতে পাই। একজন খ্রীষ্টধর্ম-সংস্কারক বলেছেন—"Peace if possible, but truth at any rate." শান্তি সম্ভব হলে ভালই, কিন্তু যে করেই হোক সত্য চাই-ই। সত্য হচ্ছে সমাজ ও মানব জীবনের ধারক। যে পরম ও চরম সুন্দর ভিত্তির উপর মানুষ দাঁড়াতে ও বাঁচতে পারে, তা হচ্ছে সত্য। সত্য কল্পিত নয়। সত্যের পরিচয় বাস্তবের সঙ্গে বাস্তবের। গান্ধীজীর মতেও সত্যই ভগবান, ভগবানই সত্য। ভগবান যেমন বিশ্বের ধারক, তেমনি সত্য জীবনের ধারক। "Truth is the treasure of all men." সত্য মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ। তাই ভগবৎ সাধন ও উপলব্ধির সহজ উপায় সত্যের সাধনা।

প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

শ্রীনীরদবরণ বসু

একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। তারই বিভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন দিনের টুকরো টুকরো সবাক্ ছবি। ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপার, কিন্তু অনেক বড় বড় ব্যাপারের চেয়ে এইগুলিই মনে যেন বেশী দাগ রেখে যায়। এ যেন মল্লিকাফুল—ছোট্ট, কিন্তু অনেক অভাব মেটাতে পারে।

৩৬৫র একটি দিন। শ্রেণীতে তখন পড়া ধরার পালা চলছিল। ইস্কুল থেকে 'পড়া' নিয়ে যাওয়া, বাড়ীতে 'পড়া করা' এবং সেই 'পড়া' পরদিন (বা পর পর কিছু দিন) মাষ্টারমশাইকে ধরতে দেওয়া—এই তিনটি ক্রিয়া একত্র হয়ে ছাত্রদের মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটাতে থাকে। আজ ছাত্রেরা পড়া দেওয়ার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এতেই বুঝতে হয় যে, তারা আজ ভাল পড়া করে এনেছে। এটা তারাও বুঝতে পারে। শুধু মাষ্টার মশাইএর 'বল' বলার অপেক্ষা,—মাষ্টারমশাই বলা মাত্রেই ছাত্রেরা পর পর গড় গড় করে পড়া মুখস্থ বলে গেল :—

বড় ভাল লাগে আমার পাড়া-গাঁয়ে বাস,
কতই সুখে সেথায় লোকে কাটায় বারমাস।

সেথায় গগন সুনীল বরণ, বিমল সেথায় হাওয়া,
হীরের মত তারায় সেথা রাত্তে আকাশ ছাওয়া।

বহুপঠিত পদ্য, নাম 'পাড়া-গাঁ'। প্রথম চার চরণই আজকের পড়া। পড়া-বলা থামল। বলতে ভুলও দু-একজন করল; কিন্তু মাষ্টারমশাই কাউকে তা জানতে দিলেন না। সবাই জানল—আমার ভাল পড়া হয়েছে। ক্ষণকাল মৌন থেকে মাষ্টার-মশাই শ্রেণীকে প্রশ্ন করলেন, 'পাড়া-গাঁ দেখেছ ?'

শ্রেণী স্তব্ধ হয়ে গেল। অবস্থা দেখে মাষ্টার-মশাই নিজেকে একটু বদলে নিলেন। বললেন, 'কে কে পাড়া-গাঁ দেখেছ—হাত তোলো।'

দ্বিতীয় শ্রেণী। উপস্থিত ছাত্রসংখ্যা ১৫। গড় বয়স প্রায় ৯। ১৫ জনের মধ্যে ৩ জন হাত তুলল। শিবু, চঞ্চল ও দীপা।

শিক্ষক—হাত নামাও। (শিবুকে) তুমি কোথায় দেখেছ ?

শিবু—মামার বাড়ীতে।

শিক্ষক—কোথায় তোমার মামার বাড়ী—?

শিবু—ভাঙামোড়া-বৈকুণ্ঠপুর।

শিক্ষক—আচ্ছা, পাড়া-গাঁ দেখতে কেমন ?

শিবু—(নিরুত্তর)।

শিক্ষক—(চঞ্চলকে) তুমি কোথায় দেখেছ ?

চঞ্চল—আমাদের ওখানে।

শিক্ষক—তোমাদের ওখানে—কোন্‌খানে ?

চঞ্চল—আমাদের পাড়ায়।

শিক্ষক—তোমাদের পাড়ার কোন্‌খানে ?

চঞ্চল—আমাদের বাড়ীর পাশে।

শিক্ষক—তোমাদের বাড়ীর কোন্‌পাশে ?

চঞ্চল—আমাদের বাড়ীর দক্ষিণদিকে, যেখানে অশথ গাছটা আছে।

শিক্ষক চঞ্চলকে এইখানে ছেড়ে দিলেন। দীপাকে জিজ্ঞাসা করলেন। দীপা উত্তর দিল, আমাদের এই গ্রামটা।

এখানে বলে রাখি যে, চঞ্চল ও দীপার দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় বছর চলছে। চঞ্চলের বয়স ৮, দীপার ১০ আর শিবুর ৯।

শিক্ষকটি চিন্তাশীল, ধীর, সংযতবাক্‌। একদিন বলছেন,—দেখুন অভাব আছে, হাজার ঝামেলা আছে, বহু বাধাবিপত্তি আছে—সব সত্যি, কিন্তু যখন শ্রেণীতে ঢুকি তখন আর কিছু মনে থাকে না—সব ভুলে যাই।

আদর্শ শিক্ষকের উপযুক্ত কথা। কিন্তু দুঃখ এই, এ দেশে এই সমাজে এই রকম শিক্ষকদের একটু স্বীকৃতি, একটু সমর্থন, তাঁদের প্রতি একটু শ্রদ্ধার নিবেদন, তাঁদের উন্নতির কোন পথ চোখে পড়ে না। এঁরা এখনও স্বকীয় ধারায় কাজ করে চলেছেন; কিন্তু আর কতদিন যে মনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, কে জানে!

বইএর জগৎ থেকে নিজের পরিবেশকে পৃথক্‌ করে অগণিত ছাত্র বছর বছর পাস করে হাসিমুখে ক্লাসে উঠছে। কত চকচকে লেবেল পাচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে জীবনের প্রথম সাত-আটটা বছর কাটিয়ে দেওয়ার পরও যে 'পাড়াগাঁ কী ও কেমন' এ বিষয় অজানা থেকে যেতে পারে, শিশুর জগতের সঙ্গে শিশুর পুস্তক জগতের একটা দুস্তর ব্যবধান ক্রম-বর্ধমান হয়ে যেতে থাকে, 'পাড়াগাঁ দেখেছ' বাক্যটিও যে প্রশ্ন হতে পারে এবং হওয়া উচিত, এ আমরা কয়জনে ভাবি ?

আর এক টুকুরো ছবি দেখাই।

তৃতীয় শ্রেণী। আর একজন শিক্ষক। আজ তিনি 'পুরীর মন্দির' নামে একটি অংশ পড়াবেন। গতকাল এই অংশটি ভাল করে টানা পড়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সবাই পড়ে এসেছে। শিক্ষক সকলকে পর পর টানা পড়ে যেতে বললেন। সবাই পড়ল। এবার মর্মগ্রহণ। অংশটি ছোট। কয়েকজনের তো প্রায় জল হয়ে গেছে। শিক্ষক কিন্তু প্রথমে সে-জলে নামলেন না; তিনি অংশটুকুর নাম থেকে প্রশ্ন করলেন: আজ তাহলে পুরীর

মন্দির সম্বন্ধে পড়া হচ্ছে, কেমন? আচ্ছা আগে বল—পুরীর মন্দির কোথায়?

শ্রেণী ম্লান হয়ে গেল। সবাই নীরব।

—এ আবার কেমন কথা! পুরীর মন্দির তো একটা মন্দিরের নাম, তা, সেটা যে কোথায় তা বলে না দিলে আমরা বলব কেমন করে? আচ্ছা দেখি বইটা আর একবার ভাল করে।···

বই তো খোলা, সামনেই প্রসারিত। সবাই বইএর মধ্যে খুঁজতে লাগল।

শিক্ষক অবস্থাটা বুঝলেন এবং চিন্তিত হয়ে পড়লেন: কী করে এটা ওদের নাগালের মধ্যে এনে দেওয়া যায়?···এমন একটা উপলক্ষ্য চাই, যা থেকে ওরা নিজেরাই লুকোচুরি খেলার এই খেলুড়েটিকে খুঁজে নিতে পারবে। 'পুরী একটা জায়গার নাম' এইরকম করে কথার সাহায্যেই বোঝাতে হবে নাকি শেষ পর্যন্ত!···

শিক্ষক প্রস্তুত হলেন। ছাত্রেরা তখনও ছাপালেখার অলিতে গলিতে 'খুঁজি খুঁজি নারি' করে বেড়াচ্ছে। তিনি তাদের ডেকে বললেন, বইএ খোঁজা এখন থাক; আগে আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর দাও: বল, হাঁসনানের পুল কোথায়?

এ তো জানা কথা, কেননা দেখা বস্তু। শ্রেণীর অধিকাংশই সানন্দে বলে উঠল, হাঁসনানে; এবং এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই দু' একজনের সামনে থেকে কালো পর্দাটা সরে গেল।

শিক্ষক যেই বলতে গেলেন, তাহলে পুরীর মন্দির?—

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়েই তিনজন সমস্বরে বলে উঠল, পুরীতে, মাষ্টারমশাই, পুরীতে।

সব তখন সত্যিই জল হয়ে গেছে।

এর পর মানচিত্র এল, দেখা হল পুরী কোথায় অবস্থিত, কি করে যেতে হয়, কখন যেতে হয়—সব আলোচনা হল।

বিভিন্ন ছাত্র সম্পর্কে শিক্ষকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা থাকে, যাকে তাঁর পূর্বজ্ঞান বলা যায়। নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ধারণা গড়ে ওঠেই। অন্যের মুখে কোন ছাত্র সম্পর্কে শুনে এক রকম ধারণা জন্মায়। কিন্তু এই পূর্বজ্ঞানকে ধরে থাকা সব ক্ষেত্রে সমীচীন নয়।

আচ্ছা, আরও একটা ছবি দেখা যাক।

চতুর্থ শ্রেণী। নদী নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। সহসা একটি ছাত্র প্রশ্ন করল,—মাষ্টারমশাই, নদীতে বারো মাস জল থাকে কী করে?

আমাদের এই শিক্ষক প্রশ্নটি শুনে বললেন: ভাল কথা, নদী কাকে বলে—বল।

ছাত্র বলল, যে নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে সাগরে পড়ে তাকে বলে নদী।

ধারণাবিহীন মনের ছবি ফুটে উঠল এই অপরিচ্ছন্ন প্রকাশে।

শিক্ষক—প্রশ্নটা, যেটা তোমায় এখন জিগ্যেস করলাম, সেটা বল দেখি।

ছাত্র—আপনি তো বললেন, 'নদী কাকে বলে?'

শিক্ষক—হ্যাঁ। এবার বল, ঐ 'নদী কাকে বলে' বলতে হলে কথাটা 'যে নদী' দিয়ে শুরু করলে ঠিক হয় কি?

ছাত্র—(চিন্তিত অবস্থায়) না, ওখানে 'নদী' হবে না। (একটু থেমে) তাহলে কী হবে মাষ্টার মশাই?

শিক্ষক—বলছি। আচ্ছা, (বাকী সকলকে) তোমরা পর পর বলে যাও তো।

কিন্তু সকলেরই সূচনায় বিভ্রাট বেঁধেছে। ভাষা মিলছে না। শিক্ষক বললেন, বল, 'যে জলের স্রোত' বা 'যে জলধারা'—তারপর মাঠের মাঝ দিয়ে গ্রামের পাশ দিয়ে নদীর বয়ে যাওয়া শিক্ষক বোঝালেন।

এখন শিক্ষক বললেন—আচ্ছা, এবার বলি শোনো। পাহাড় থেকে নদীর এই যে বেরিয়ে

আসা বলতে কে কি বোঝো—পর পর বলে যাও, আমি শুনব। যার যা মনে হয়, সে তাই বলবে।

শ্রেণী নির্বাক্। শিক্ষক তখন অন্যভাবে প্রশ্নটি প্রকাশের প্রয়াস পেলেন। যেন টেনে এনে নাগালের মধ্যে ফেলতে চাইলেন: 'নদীর পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা' আর 'আমার এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া' এই দুটি কি এক?

ছাত্র—হ্যাঁ।

শিক্ষক—আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে এই ঘরে আমার আর কিছু থাকে কি?

ছাত্রটি—না।

শিক্ষক—নদী পাহাড় থেকে বেরিয়ে এলে পাহাড়ে নদীর আর কিছু থাকে কি?

ছাত্রটি—না। সে তো বেরিয়ে এল, আবার কী থাকবে?

শিক্ষক পর পর সকলকেই জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, এ বিষয়ে সবাই একমত।

—ঘোরতর কাণ্ড বাধাল নদী: সে পাহাড় থেকে বেরিয়ে চলে এল, পিছনটা তো তার খালি হয়ে যাবে। নইলে সে যে পাহাড় ছেড়ে চলে এল, এটা ধরে নিই কোন্ যুক্তিতে?... ভাল কথা। যেমন খুশি সে চলে যাক, আমাদের তাতে কিছু বলবার নেই, কিন্তু পিছনে তার জল থেকে যাচ্ছে কেন? এ আবার কেমন তরো চলে যাওয়া?—

এখন মাটি ও পাথরের পাহাড় তৈরী করে জল ঢেলে নদীর উৎপত্তি, নদীর চলে যাওয়া প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করালে তবে হয়।

স্কুলে রিলিফ ম্যাপ নেই। দরকার মত উপকরণ কেনার অধিকার ও অর্থ শিক্ষকদের নেই। বেতনভোগী প্রাইমারী মাষ্টারের দায়িত্ব আছে, কর্তৃত্ব নেই। খুচরা খরচ বাবদ স্কুল মাসে যা পায় তাই দিয়ে অফিস খরচ, কৃষি-শিল্পের ব্যয়, মায় মাসিক পত্রিকা বাঁধানো পর্যন্ত সকলই সমাধা করতে হয়।

কিছু না থাক, প্রধান উপকরণ আছে; শ্রেণী পিছু একটি করে বোর্ড ও খড়ি। শিক্ষক খড়ি দিয়ে সাধ্যমত পাহাড় নদী এঁকে ছাত্রদের ধারণা গড়ে তোলায় সাহায্য করলেন; তৃপ্তি পেলেন না।

আমরা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ঢাল-তলোয়ার-বিহীন নিধিরাম কী করে অভিজ্ঞ যোদ্ধা হতে পারে? অনুরাগী অধ্যবসায়ী শিক্ষক—দেশে আছেন, দারিদ্র্যে অশ্রদ্ধায় অসুবিধায় তাঁরা ক্রমক্ষীয়মাণ; আমরা তাঁদের কোন খোঁজ রাখি না!

বয়স বাড়লেই জ্ঞান বাড়ে, অনেকদিন মাষ্টারি করলেই অভিজ্ঞ শিক্ষক হওয়া যায়, এ সিদ্ধান্ত বিশেষ ক্ষেত্র ও পাত্র ছাড়া মানি না। সবার মূলে শুদ্ধ প্রাণ, ব্রতবুদ্ধি। শুদ্ধ প্রাণে প্রশান্তি থাকে, জ্ঞানমুখী চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়। এই চিন্তা-শীলতার পথে আসে উপলব্ধি, আর অভিজ্ঞতা আসে উপলব্ধির পথ ধরে।

পারস্পরিক অভিজ্ঞতা-বিনিময়, মনোবিজ্ঞানীর সংস্পর্শ, পর্যাপ্ত পুস্তকপাঠ প্রভৃতিই প্রকৃত শিক্ষক-শিক্ষণ। আঞ্চলিক বৈঠক এক প্রধান দিক। তারপর পত্রিকা। কয়েকটি শিক্ষামাসিক দেখেছি বটে, কিন্তু তাতে প্রয়োজন মেটে কি?

বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবেশে শিক্ষকের চিন্তাশীল হয়ে ব্রতবুদ্ধি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ক্রমোন্নতির সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কি?

আমরা শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথা, ছেলেকে মানুষ করার কথা বলি; তার সর্বপ্রকার দায় ও দায়িত্ব স্কুলের উপর ছেড়ে দিয়ে সংসার করি, রাজনীতি করি, সমাজনীতি করে বেড়াই। অথচ প্রতিদিন পিতামাতার কাছে বাড়ীতে—যেখানে ছাত্র উনিশ ঘণ্টা থাকে সেখানে—তার জীবনগঠনের কোন চিন্তা বা ব্যবস্থা করি না।

স্কুলে কি হয়? পড়াটা পড়ার কথাই বলি। মুখস্থ ধরা ও শক্ত দেখে দু'একটা বানান জিগ্যেস করা বা লিখতে বলা। আর ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন

নামে এক জাতীয় প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নই পরীক্ষায় আসে, তার থেকে দু'একটা ধরা ; তাও সব দিন নয়, সর্বত্র নয়, সবাইকে নয়।

নদী কাকে বলে—এ তো সংজ্ঞাটা মুখস্থ বলতে পারলেই সব ঠিক আছে, ধরে নিই। আর গ্রামের পাশের নদীটার সঙ্গে পরীক্ষার কোন সম্পর্ক রাখি না।

কিন্তু এতে হয় কি ? ছাত্র বছর বছর বা দু'তিন বছর অন্তর পাস করে ক্লাসে ওঠে ; স্কুলে ও বাড়ীতে আনন্দের হাট বসে যায়।

একটি নামকরা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থানীয় ছাত্রের 'কিশলয়' পড়ার খাতা দেখছিলাম। সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তরে খাতাটি ঠাসা। ছেলে স্কুল থেকে রাফ-খাতায় লিখে লিখে এনেছে, বাড়ীতে পিতা সযত্নে পাকা খাতা করে দিয়েছেন। ছেলের জন্য সার্থক শ্রমের গর্বভরে খাতাটি পিতাই আমায় দেখিয়েছিলেন। ছেলে দুই বেলা বাড়ীতে ও এক বেলা স্কুলে সেই খাতা মুখস্থ করে, প্রয়োজন স্থলে বমন করে। বইটা আর দরকার হয় না। আর বইই কি সব ভাল ? বিশেষ করে শিশু শ্রেণীর বইগুলি কি শিশুপাঠ্য ?

প্রশ্নোত্তরের খাতা বই আকারে ছাপা হয়ে বাজারে বিক্রয় হয়। রূপায় তার দাম তেমন না হলেও, তার গুণ অনেক, আদরও খুব। এর দাম যেন মুদ্রায় নয়—মুদ্রাদোষে। এই ভাবেই দেশের 'জনগণমন' তৈরী হচ্ছে।

জীবনানন্দ

শ্রীমতী বিভা সরকার

জীবন মধ্যাহ্ন হ'ল চেয়ে দেখি প্রভু,
ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই, কোনো ব্যথা নাই !
সুখ দুঃখ অভিমান অন্তর বেদনা,
মিছে সে ত, সে ত শুধু ভুলের বালাই।
সকল শূন্যতা ছাড়ি প্রাণ আজ পূর্ণ শক্তিময়,
জীবনের পদে পদে পাই তার সত্য পরিচয় !

বিলাইয়া দিনু আজ আনন্দের দানে
আমার যা কিছু ছিল প্রভাতের গানে।
সকলের মাঝখানে আপনারে হেরিলাম আমি,
আনন্দ আনন্দময় সর্বব্যাপী মোর অন্তর্যামী।
হ'ল মোর নব জন্ম তমসার পারে—
হৃদয় উদ্বেল হ'ল অমৃত পাথারে।

মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্তমান তাহারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা ; সুতরাং শিক্ষকের কর্তব্য কেবল পথ হইতে বাধাবিঘ্নগুলি সরাইয়া দেওয়া।

* * * *

ছেলে নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে। তবে তোমরা তাহাকে তাহার নিজের ভাবে উন্নতি করিতে সাহায্য করিতে পার।...জ্ঞান স্বয়ংই তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

'আমি' ও 'আত্মা'*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

স্বামীজী নিজের 'আমি' ভগবানের পায়ে সঁপে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎটাকে মুগ্ধ করে এলেন, কেমন করে? কিসের জোরে? ঠাকুরের ভাব নিয়ে, ঠাকুরের আশীর্বাদে। এত করে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল, দেশে ফিরে এলেন; একজন শিষ্য বললেন,—স্বামীজী, আপনি অনেক করেছেন, বড় পরিশ্রান্ত হয়েছেন, এবারে একটু বিশ্রাম নিন। স্বামীজী বললেন,—বিশ্রাম নেওয়ার কি আর জো আছে? দেখনা ঠাকুরের ঐ কালী যে আমার ঘাড়ে চড়ে বসেছেন, ঘোরাচ্ছেন খালি আমায়।

স্বামীজী নিজেকে, তাঁর অহংকে ঠাকুরের যন্ত্র-স্বরূপ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে যন্ত্রস্বরূপ হ'তে বলেছেন। শুধু কি সন্ন্যাসীকেই যন্ত্র হ'তে হবে? তা নয়, গৃহীদেরও হ'তে হবে, সকলকেই তাঁর যন্ত্র হ'তে হবে। 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' নিমিত্তমাত্র হ'য়ে তাঁর কর্ম করে যেতে হবে সকলকে। যতই আমিটাকে ডুবিয়ে মারতে পারবে ততই তাঁর দিকে এগোবে।

ঠাকুর বলতেন,—ছটো আমি, কাঁচা আমি আর পাকা আমি; মোক্ষের পথে যে শত্রু সেই কাঁচা আমি। একে মারতে পারলে তবে পাকা আমি আসবে; এই আমিই মানুষের বন্ধন মুক্ত করে। ভক্তির ভিতর দিয়ে, জ্ঞানের ভিতর দিয়ে, যোগের ভিতর দিয়ে আমিটাকে মারতে হবে। কাঁচা আমিতে রাগ, দ্বেষ, হিংসা; আর পাকা আমিতে মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া, তাঁর আমি হয়ে তাঁকে আস্বাদন করা। অর্জুন এই কাঁচা আমি নিয়েই বলেছিলেন—'আমি যুদ্ধ করব না।' শ্রীকৃষ্ণ দেখালেন,—তিনি পূর্বেই সব মেরে রেখেছেন। অর্জুন নিমিত্তমাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বার চরণে সব দিয়ে দিয়েছিলেন, নিজে কিছুই করেন নি; তাঁর কালীই সব করছেন, করাচ্ছেন। তিনি বলতেন—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী—আমি রথ, তুমি রথী—আমি ঘর, তুমি ঘরনী।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনেও দেখি আমিত্বের পূর্ণ বিসর্জন। দেখনা যীশু কেমন বলছেন—আমি স্বর্গীয় পিতার সন্তান, রামপ্রসাদ বলছেন, কালীর বেটা রামপ্রসাদ। কি অহংকার! ঠাকুর বলতেন—এ অহং কার? ঠাকুর যন্ত্রস্বরূপ হ'য়েছিলেন বলেই ভগবানের আবির্ভাব হয়ে ছিল তাঁর মধ্যে—তাই সকলে তাঁকে ভালোবাসতেন। সব রকম লোকেই তাঁর কাছে এসে আনন্দ পেত, ব্রাহ্মসমাজে তাঁকে নিয়ে যেত।

বেণীপাল বলেন,—আপনার কাছে এসে আপনার কথা শুনে কি গভীর আনন্দ যে পেলুম! ঠাকুর বললেন,—আমি ও সব জানি না বাবু, মা যা বলিয়েছেন তাই বলেছি, আমার আবার কি? বাস্তবিক তিনি তো সকলের ভেতরেই আছেন কিন্তু যার মধ্যে তাঁর বিশেষ প্রকাশ তিনি বালকের মতো হ'য়ে যান।

ঠাকুর জগন্মাতার যন্ত্র, স্বামীজী ঠাকুরের যন্ত্র। আধার প্রস্তুত করতে হবে, ধর্মকে পেতে হবে ভেতরে, তখনই পরিবর্তন আসবে জীবনে। কাঁচা আমি মরে গিয়ে পাকা আমি আসবে।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন—পতির জন্য

---

* গত ২৬. ৩. ৫৫ তারিখে কুমিল্লায় পূজ্যপাদ মহারাজজীর একটি ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীমতী সুধা সেন, এম্-এ কর্তৃক সঙ্কলিত।

পতি প্রিয় হন না, প্রিয় হন আত্মার জন্য। পত্নী বা সন্তানও প্রিয় হন আত্মারই জন্য। এই আত্মার জন্যই লোক ছুটছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, এই একটিই বস্তু আছেন—তিনি আত্মা—তাঁকেই শ্রবণ মনন করতে হবে।

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ দেবীসূক্তে বলেছেন—'যা কিছু দেখছ, দেবদেবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সব কিছুরই মূলে রয়েছি আমি।' তাঁর শক্তিই সব, কিন্তু আমরা সে শক্তির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে অবিদ্যাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হই বলেই কাঁচা আমির উদ্ভব হয়।

কেনোপনিষদে আছে: একবার দেবতা আর অসুরে যুদ্ধ হয়। দেবতাদের জয় হল। দেবগণ আনন্দে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে জয়ের উৎসব আরম্ভ করলেন। অসুরদের কে পরাজিত করেছেন তাই নিয়ে খুব অহঙ্কারের—আমিত্বের প্রকাশ চলছে। ইন্দ্র বলছেন, আমিই মেরেছি। অগ্নি বলছেন তাঁর শক্তিতেই দেবতাদের জয় হয়েছে। এমনি প্রত্যেকে নিজের গৌরব খুব প্রকাশ করছেন। ঈশ্বর ভাবলেন, দেবতাদের শিক্ষা দিতে হবে। তিনি অত্যদ্ভুত জ্যোতির রূপে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না, শেষে ইন্দ্র উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন সেখানে সেই পুরুষ নেই,—আছেন এক অপরূপ দেবী। ইন্দ্র সভয়ে শ্রদ্ধায় দেবীর পদে প্রণত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে ঐ পুরুষ মা? দেবী তখন বলেন, আমিই সেই, আমিই সব। আমার শক্তিতেই তোমরা জয়লাভ করেছ। তোমাদের শক্তির মূলেও আমিই—আমি ছাড়া তোমরা শক্তিহীন—শূন্য। বৃথা অহঙ্কারে আর মত্ত হয়ো না—তোমরা নিজের শক্তিতে শক্তিমান্ নও, আমার শক্তিতেই শক্তিমান্। দেবতাদের কাঁচা আমি দূর হয়ে গেল।

ভগবান সব সহ্য করতে পারেন—কিন্তু অহংকে নয়। কাজেই আত্মসমর্পণ কর, কাঁচা আমিটাকে ডুবিয়ে ডুবিয়ে মারো। গুরু হওয়া কি সহজ কথা? গুরু কে হন? ঠাকুর বলতেন—গুরু হচ্ছেন ঘটক, যিনি বর ক'নেকে মিলিয়ে দেন। আত্মার সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেন পরমাত্মার। কাঁচা আমিকে নিয়ে যান—পাকা আমির মধ্যে। এই যে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এই যোগসূত্রটি ধরে চলতে হবে। সেইটের জন্যই গুরুশক্তি সহায় হবেন। আত্মকৃপা কর আগে—না হলে গুরুকৃপা মিলবে না। আত্মকৃপা হলে গুরুকৃপা মিলবে, গুরুকৃপা হলে পরে তবে তাঁর কৃপা। তখন তাঁর প্রকাশ হবে।

মা আর ঠাকুর সবই ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন। যত তাঁকে দেবে তত তাঁকে পাবে। তাঁর থেকে আর দূরে থেকো না। মা সকলকেই ভালোবাসতেন। তিনি ঈশ্বরকে সব দিতে পেরেছিলেন, তাঁর হতে পেরেছিলেন বলেই—জগতে সকলের মধ্যে নিজেকে তিনি দেখতে পেতেন; তাঁর এই আত্মবিকাশ সকলের মধ্যে তিনি দেখতেন, তাই সকলের মধ্যেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

চণ্ডীতে আছে 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'—যে দেবী সর্বভূতে মা রূপে আছেন তাঁকে নমস্কার। মা বহু নন—একই মা সর্ব্বভূতে আছেন। আমাদের মা সেটি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই অনায়াসে তিনি গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়েছিলেন; বহু নয়, বহুর মধ্যেই এককে, নিজেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

সাধারণ মা-ও নিজেকে বিলিয়ে দেন, কিন্তু সে ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডীর মধ্যে, আপন সন্তানদের মধ্যে। কিন্তু মা এই রকম আবেষ্টনীর মধ্যে থাকেন নি—তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গণ্ডীর বাইরে সকলের মধ্যে। সংসারী মা যেমন নিজের ছেলের মধ্যে নিজের সত্তা দেখেন—মা তেমনি সকলের মধ্যেই আপন সত্তা বিকশিত দেখতেন। আমাদের গণ্ডী-ভাঙ্গা মা, সকলের মা।

আমরা খালি নিজেকে ভালোবাসি। কাঁচা

আমিটাকেই ভোগ করব বলে, আস্বাদন করবো বলে বেঁচে আছি। কিন্তু মায়ের 'আমি' কি বৃহৎ 'আমি'! তাই তাঁর কাছে আমজাদে আর শরতে কোনও প্রভেদ ছিল না।

সেই যাজ্ঞবল্ক্যের কথা—আত্মাকে তোমার মধ্যে দেখি বলেই তুমি আমার প্রিয়। সেই আত্মা এক, সর্বভূতেই. এক। 'ক্ষুদ্র আমি'র গণ্ডী যখন ভেঙ্গে যায়, 'বিরাট আমি'র প্রসার হয়, তখন কি আনন্দ! এক ঈশ্বর কেন বহু হলেন? নিজেকে আস্বাদন করবার জন্য!

মা-ও তেমনি ভাব নিয়েছিলেন। শক্তি তো একটা রূপ নিয়ে আসেন। মা ঠিক মাতৃ-রূপেই এসেছিলেন। চণ্ডীতে আছে যদিও তিনিই সারা জগতে আছেন,—সবই তাঁরই প্রতিমা, তবুও তিনি দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য শরীর নিয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকেন। তিনি নিত্য, কিন্তু লীলায় তিনি আবির্ভূত হন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরেও মা ৩৪ বৎসর ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন—দৃষ্টান্তের জন্য। বাস্তবিক, স্থূল ভাবে না প্রকাশ হ'লে—আমাদের মধ্যে নেমে না এলে আমরা তাঁকে বুঝি না। তিনি আমাদের মতো নীচে নেমে আসেন—আমাদের তুলে নেবার জন্য। তুলে নেন, শাসন দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।

বুদ্ধ আর চৈতন্যের কি গভীর প্রেমে ভরা হৃদয়! চৈতন্য নিজে কেঁদে জগৎকে কাঁদালেন। জীব উদ্ধার ক্রোধের দ্বারা নয়, প্রেমে। গরম লোহা দিয়ে গরম লোহা কাটে না, কাটে ঠাণ্ডা লোহা দিয়ে।

রামপ্রসাদ বলেন—

'সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, এ কথা বিদিত সব,
কুপুত্র হইলে জননী কি ফেলে একথা কি করে কব।'

কুপুত্রের মধ্যেও মা নিজেকে দেখেন।

শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণদেশে গিয়েছিলেন তখন দেখেছি—ঘর ভর্তি লোক বসে আছেন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। মাও বসে রয়েছেন চেয়ারে নির্বাক্ স্নেহ-কোমল চোখে। কেউ কারো ভাষা জানে না; তাই কথা নেই কারো মুখে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে দক্ষিণ দেশের সেই লোকেরা বলতেন—নাই বা শুনলুম কথা! তবুও তো হৃদয় ভরে গেছে। পূর্ণ আনন্দ পাচ্ছি তো। মা নিজেকে বিস্তার করতে পেরেছিলেন সকলের মধ্যে, তাই তাঁর মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেয়েছিল সকলে। শুধু দর্শনেই এ আনন্দ! ডাকাত বাবাকে একবার মাত্র ছেলে বলে সম্বোধন করলেন, ডাকাত ভুলে গেল। কেন? মূলে কি ছিল! প্রেম। আমাদের কেবল স্বার্থ, চারদিকেই স্বার্থের ছড়াছড়ি। মায়ে ছেলেতে পর্যন্ত স্বার্থ!

ঠাকুরের কাছে অশ্বিনীবাবু এসেছেন একদিন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, গিরিশবাবুকে জানো? অশ্বিনীবাবু বললেন,—কোন্ গিরিশবাবু? থিয়েটার করে? মদ খায় যে, সে? ঠাকুর অমনি বলে উঠলেন,—আহা থাক না, কত দিন খাবে?

জীবনে এই শিক্ষাটিই নিতে হবে, দোষ না দেখা—অহৈতুকী ভালোবাসা। শুধু শুনে কি হবে যদি মনটাকে ঠিক করতে না পারি? শুধুই শোনা, ও তো একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্মরণ মনন ধ্যান করতে হবে। সর্বদা মায়ের জীবন, ঠাকুরের জীবন সামনে রেখে চলতে হবে। যা ফুটে উঠেছে ওঁদের জীবনে সেটি ধরতে হবে। আমরা চলছি উল্টো পথে, মায়া বা অজ্ঞানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আমাদের জীবন কেটে যাচ্ছে। বিরাটের প্রকাশ হচ্ছে না, তাই এঁরা আসেন; ডেকে বলেন—না, এ পথ নয়।

শাস্ত্র পড়ে কাঁচা আমির নাশ হয় না; মহাজনদের জীবন সামনে রাখলে তবে কাঁচা আমিটা যায়। মায়ের কথা কি বলব, চোখে ভাসছে শুধু তাঁর চেহারাটি; তাঁর মুখখানি মনে পড়ে, কি প্রেম—কি নিঃস্বার্থ ত্যাগ! বহুর মধ্যে আপনাকে দেখাই

আত্মার বিস্তার ; তাই তো মায়ের মধ্যে এত প্রেম, এত ত্যাগ। একটির সঙ্গে আর একটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত। এই প্রেম, এই অহৈতুকী ভালোবাসার কথা শুধু শুনলেই হবে না—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

খালি শুনে এ প্রেম পাওয়া যাবে না। এঁকে গ্রহণ করতে হবে নিজের মধ্যে। নিজেকে বিস্তার করতে হবে বহুর মধ্যে, সকলের মধ্যে।

শ্যামদেশের শ্যামলিমায়

(ভ্রমণ-কথা)

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এম্-এ

১৯৫৪, ১৭ই আগস্ট মঙ্গলবার, ভোর ৫·২০ মিনিটে কে. এল. এমের বাস এল। আমি তৈরী ছিলাম—গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। নীরব নির্জন পথে অন্ধকার ও আলোর মাঝে চলল বাস রেঙ্গুনের মিংলাডন এয়ার পোর্ট, ১০।১২ মাইল দূর। ঠিক ছয়টায় পৌঁছে গেলাম। ওরা খেতে দিল লেমন-স্কোয়াস। শুল্কপরীক্ষায় কোন হাঙ্গামাই হ'ল না—ঠিক সাতটায় বিমান ছাড়ল।

বনরাজিনীলা সমুদ্রবেলা—পাহাড় ও প্রান্তর পার হয়ে উড়ো জাহাজ ব্যাঙ্ককে নামল ঠিক বেলা নয়টায়। থাই-ভারত লজে যাওয়ার জন্য কে. এল. এমের বাসকে বললাম। তারা নিয়ে চলল পুরাতন ঠিকানায়—সেখানে দৈবাৎ এক ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হল। স্বামী স্বয়ম্প্রভানন্দ রেঙ্গুনে যে ঠিকানা দিয়েছিলেন—সেটিই ঠিক ; তখন বাস চলল সেখানে। পৌঁছাতে সাড়ে দশটা বাজল।

এখানে আই. এন. এ'র দেবনাথ দাশ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমাদরে সংবর্ধনা করলেন ; দূতাবাসের রায় চৌধুরীকে আমার আগমনবার্তা ফোনে জানিয়ে দিলেন—তারপর শেঠ জগৎরামের ওখানে দুপুরের খাওয়া খেতে নিয়ে চললেন। শেঠজী এখানকার ধনী ব্যবসায়ী। ওখান থেকে পণ্ডিত রঘুবীর শর্মার দোকানে এলাম। পণ্ডিতজী থাই-ভারত লজের পরিচালক। মানুষটি চমৎকার।

বিকালে এলেন কে. করুণা এবং রায়চৌধুরী। তাঁরা দুজনেই দূতাবাসে কাজ করেন। তাঁরা কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করলেন। সন্ধ্যায় রঘুবীর শর্মার বাড়ীতে পরিপাটী ভোজ হল।

বুধবার ১৮ই আগস্ট। রাজেন্দ্র পাণ্ডা থাই-ভারত লজের কাজকর্ম করে। মানুষটি ভাল। সকালে আমাকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে চলল। প্রথমে আমরা দেখলাম ওয়াট-পো—ওয়াট হল মঠ। এখানে ঘুমন্ত বুদ্ধের প্রতিমূর্তি রয়েছে। তথাগত এনেছিলেন যে সদাচরণ এবং সৎজীবনের বাণী, দেশের ও কালের ব্যবধান ভেঙে তা সর্বকালের এবং সর্বদেশের হয়ে উঠেছিল, শ্যামদেশে তার বিপুল পরিচয় পাওয়া যায়।

তারপর খেয়া-ঘাটে গেলাম। ঘাটের দুধারে বাজার, বাজারে নানা অচেনা ফল দেখলাম—ওপারে ওয়াট অরুণ—'অরুণ মঠ'—কলনাদিনী তটিনীর তীরে প্রভাতের আলোকে শান্ত ও সমাহিত মঠ—খুবই ভাল লাগল। সেখান থেকে মেমোরিয়াল ব্রিজের উপর দিয়ে বাসে বাসায় এলাম। ১১টায় রঘুবীরজীর দোকান হয়ে তার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম সানন্দ তৃপ্তিতে। ওভার সীজ,

ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙ্গিয়ে বি. ও. এ. সি. এয়ার লাইনে যাওয়ার ব্যবস্থা করে বাসায় এলাম আড়াইটায়। থাই-ভারত লজের গ্রন্থাগারটি মোটা-মুটি ভাল। তাদের অনেক বই এনে জড় করেছি বিছানায়—বসে বসে সেগুলি পড়লাম।

বিকালে শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশ ও আমি একটি বৌদ্ধ বিহারে গেলাম। সমাধি শেখাবার আয়োজনটি ভাল করে দেখলাম। এই সমাধি লাভের প্রচেষ্টার মধ্যে যেন এক শুষ্কতার ও পরাজয়ের ভাব রয়েছে—আমার কাছে এটা তত ভাল লাগল না। সন্ন্যাস ও ত্যাগ ভাল, কিন্তু সেটা যদি জোর করে হয়, তবে সেটা মানুষকে করে নির্জীব এবং মৃতকল্প। যিনি মঠের অধিনায়ক তাঁর নাম ভিক্ষু বিমলধর্ম, তিনি আলাপী এবং উদার। বললেন—ভারতবর্ষ ও শ্যামের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা একান্তভাবে কর্তব্য। তিনি আরও জানালেন যে ভারতবর্ষ থেকে যদি শিক্ষার্থী আসে, তবে তাঁরা তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবেন। আলাপের সময় বন্ধুবর করুণা দোভাষীর কাজ করলেন।

বৃহস্পতিবার। আজ সকালে একাই চললাম। থাই-ভারত লজে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে, তারই নিমন্ত্রণের ভার রাজেন্দ্রের উপর। প্রথমে গেলাম স্বাধীনতা-তোরণ দেখতে। স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের স্মৃতির জন্য এই আয়োজন। বিস্তৃত স্থানে সুন্দর মনুমেণ্ট—সেখান থেকে বোভরনিবেশ মঠ ও স্বর্ণ মন্দির দেখে বাসায় ফিরলাম। স্বর্ণ মন্দিরকে ওরা বলে ওয়াট সাকেত।

শুক্রবার সকালে উঠে মর্মর মঠে গেলাম—একে এরা বলে ওয়াট বেনচামা বোপিতর। একটি ছেলে বাসের নাম ও নম্বর বলে দিল। তারই সহায়তায় যাত্রা সুগম হল। সেখানে গিয়ে ভিক্ষু আনন্দের সঙ্গে দেখা। ভিক্ষু সব তন্ন তন্ন করে দেখালেন। তারপর গেলাম Institute of National Culture, থাই সংস্কৃতি প্রচারের কেন্দ্র।

বিকালে ৫॥টায় বক্তৃতা দিলাম—ফিয়া অনুমান রাজধন সভাপতি হলেন। ইনি ডি. লিট। সরকারি নানা কাজের শেষে বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করছেন। আমার বক্তৃতাটি জন-প্রিয় হয়েছিল।

শনিবার সকালে উঠে গেলাম ওয়াট রাজ-বোপিতর ও ওয়াট রাজপ্রদিস্থ দেখতে। প্রথমটিতে রয়েছে মুক্তা খচিত দরজা—দ্বিতীয়টি খেঁর জাতির তৈরী। পথে চলবার পূর্বে একটি চীনার দোকানে টিকিট কিনে চিঠি পাঠালাম দেশে এবং জাপানে। তারপর দেখলাম—রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন মঠে পান্নার তৈরী বুদ্ধমূর্তি, এখানে রামায়ণের সুন্দর চিত্রাবলী আছে। তারপর রাজপ্রাসাদ দেখার জন্য গেলাম। সেখানকার দ্বারীরা বলল—পাবলিক রিলেশনস্ বিভাগ থেকে অনুমতি আনতে হবে। সেখানে দৌড়ালাম, তারা বলল, ৩০ টিকল দক্ষিণা লাগবে—তাই ফিরে এলাম। এসে শুনলাম আজ ভারতীয় দূতাবাস থেকে লোকজন প্রাসাদ দেখতে আসবে, আমি যদি তাদের সঙ্গে যাই তাহলে অসুবিধা হবে না। বসবার ঘরে তাদের অপেক্ষায় রইলাম। দূতাবাস থেকে এল দেশাই, তার পরিবার ও কয়েকজন ভারতবাসী। একজন ছিল বোম্বেওয়ালা——সে এসেছে Transport কোম্পানীর পক্ষ থেকে। ওদের সঙ্গে ভিতরে গিয়ে রাজপ্রাসাদের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি দেখে নিলাম।

বেলা দুইটায় বৌদ্ধ বিহারে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছিল—আমি ইংরেজীতে বলে গেলাম আর দূতাবাসের করুণা তার অনুবাদ করে চলল। করুণার এ বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা। এই বিহারের অধ্যক্ষ সংঘের পক্ষ থেকে বই উপহার দিলেন।

থাই-ভারত-লজের সঙ্গেই ভারত-বিদ্যালয়,

সেখানে আজ জন্মাষ্টমী উৎসবের বিরাট আয়োজন। শ্যামপ্রবাসী বহু ভারতীয় সমবেত হলেন এবং বৈচিত্র্যময় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসব সমাপ্ত হল। তারপর নিকটের এক বিষ্ণুমন্দিরে গেলাম—সেখানকার পূজারী ব্রাহ্মণ।

রবিবার ২২শে আগষ্ট। আজ সকালে ঘরে বসে রাধাকৃষ্ণনের ভারতীয় দর্শন পড়লাম। সাড়ে দশটায় এলেন আসাম থেকে ভুলেশ্বর কোঙার—ভদ্রলোক এম্-এ, বি-টি Unesco থেকে বৃত্তি পেয়ে এখানে গবেষণা করতে এসেছেন। ১১টায় এলেন সংঘবাসী, প্রথমে ন্যাশনাল লাইব্রেরী দেখাতে নিয়ে গেলেন—তারপর বৃদ্ধা রাজকুমারী পুণা দিস্‌কুলের ওখানে গেলাম—তিনি নিজের চেষ্টায় পাণ্ডিত্য লাভ করেছেন। আমি আমেরিকায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে চলেছি রাজকুমারী সেখানে ছিলেন, সেখানকার দু'চারটি গল্প বললেন। বিকালে খুব বৃষ্টি হল। সন্ধ্যায় দূতাবাসের রায় চৌধুরীর বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল। অমরনাথজী তাঁর গাড়ী করে দাশগুপ্ত, দেবনাথ দাশ এবং আমাকে নিয়ে চললেন। আহারের বেশ চমৎকার আয়োজন হয়েছিল। বিদেশে একদিন দেশের মত করে খাওয়া গেল স্ফূর্তিতে এবং হাস্যমুখর আলাপ আলোচনার সাথে। বাসায় ফিরতে রাত হল।

সোমবার পুরাতন রাজধানী অযোধ্যায় যাওয়া স্থির ছিল। রঘুবীরজীর ভাইপো বিজয় যাবে আমার সাথে। খুব ভোরেই এল ছেলেটি, তার সাথে সামলো (মোটর রিকসা) করে বড় ষ্টেশনে গেলাম। সাতটায় গাড়ী ছাড়ল। থাইজাতি প্রথমে ইয়াংসী নদীর অববাহিকায় বাস করত—তারপর শত্রুর প্রতিবন্ধকতায় ওরা নেমে আসে তাদের প্রতিষ্ঠিত নান-চাও রাজ্য ছেড়ে শ্যামদেশে—চাও ফিয়া নদীর ধারে ধারে ওরা নেমে আসে এবং একাদশ শতাব্দীতে সুকথাই নগরে ওদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এক শতাব্দীর পরে ফ্রা চাও উথং এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বর্মারাজের অত্যাচারে এখানকার রাজা পলায়ন করেন এবং তার এক অনুচর ব্যাঙ্ককে রাজধানী স্থাপন করেন।

গাড়ী চলল—দুধারে দিগন্তবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র; শ্যাম শোভা দেখে এদেশের শ্যাম নাম সার্থক বলে মনে হল। চলতে চলতে মনে হল এই সবুজ মায়া যেন দক্ষিণ বাংলার প্রতিচ্ছবি।

বেলা নয়টায় অযোধ্যা পৌঁছে গেলাম। ষ্টেশনের পাশেই নদী—খেয়ায় সে নদী পার হয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে গেলাম রঘুবীরের পরিচিত ভগবান দাসের ওখানে—ওরা চা খাওয়াল। তারপর আমরা প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে রওনা হলাম—কিছুই নেই—শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথরের ভাঙ্গা ভাঙ্গা টুকরা অতীতের ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য বহন করছে। একটি মাত্র মন্দিরের মাঝে বুদ্ধমূর্তি আছে—এ মন্দিরটিও আস্ত নেই।

বাসায় ফিরে সন্ধ্যা ছয়টায় এখানকার অভিজাত প্রতিষ্ঠান শ্যাম-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে গেলাম—লোকজন বেশী হয় নি; জন কুড়ি পঁচিশ, তবে তারা শহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি।

মঙ্গলবার সকালে ভারতীয় দূতাবাসে গেলাম—তখন দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের পদে কেউ ছিলেন না, শেঠী বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী,—বেশ আলাপী; কোকাকোলা খাওয়ালেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক সেট বই দিলেন। সে বইগুলি থাই-ভারত লজে দিয়ে এলাম, এতে প্রচারের কাজ হবে।

ওখান থেকে রঘুবীরের দোকানে গিয়ে কিনলাম ঝাঁপি, পুতুল ও কুরুনি। শ্রীযুক্ত দাশ দেশে ফিরবেন, তিনিই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। দেবনাথবাবুর সৌজন্যে এখানকার স্মৃতিচিহ্ন কিছু দেশে পাঠানো সম্ভব হল।

সংঘবাসী এলেন ৪-১৫ মিনিটে—এদের একটি বৌদ্ধসভা আছে, তিনি তার সহ-সভাপতি; সেখানে বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন। আমি অমিতাভের অমের প্রভাবের কথা বললাম। ফিরে এলাম লজে। রাত্রে রঘুবীর খুব খাওয়ালেন। ওদের যাত্রী-প্রশস্তির খাতায় লিখলাম একটি বাংলা কবিতা, অবশ্য তার ইংরেজী অনুবাদও সঙ্গে সঙ্গে করে দিলাম। রঘুবীর খুব খুশী হয়ে বললেন—আবার যেন আসি। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা এ জীবনে ঘটবে কিনা জানিনা, কিন্তু শ্যামদেশে ফিরবার ইচ্ছা বারবার মনে জাগে, কারণ ব্রহ্মদেশের ব্যবধানে শ্যামে রয়েছে সংস্কৃতভাষার এবং ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন। শ্যামদেশের রাজাদের নাম—প্রথম রাম, দ্বিতীয় রাম; অযোধ্যা, লবপুরী, রামায়ণের চিত্রাবলী বুঝিয়ে দেয় যে এখানে একদিন রামায়ণ আপন অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

বুধবার খুব সকালেই উঠলাম; স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে চা খেয়ে মোটরে বি. ও. এ. সি. অফিসে এলাম—শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশ বা দুলেশ্বর কোণ্ডার কেউই সঙ্গে আসতে পারলেন না। অফিসে পৌঁছালাম ৭-১৫ মিনিটে—অফিস খুলবে ৮টায়; কাজেই পাশের দোকানে বসে রইলাম। এখান থেকে বাসে করে এরোড্রোমে পৌঁছলাম ৯-১৫ মিনিটে।

বিমান ছাড়ল ১০-২৫ মিনিটে। বিমান থেকে দেখলাম শ্যামের শ্যামল কান্তি। মনে জাগল এই দেশের মানুষের প্রেমময়, মধুময় ব্যবহার; সংঘবাসী এবং করুণা কি সজ্জন এবং অমায়িক! আমার কয়েকদিনের প্রবাসজীবনকে তাঁরা আনন্দে, শিক্ষায় পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন। তাদের সেই মৈত্রী স্মরণ করে হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল শ্যামে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বীর সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মীদের বীরত্ব ও ত্যাগের কথা। শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাশের সংস্পর্শে সেই অতীত মহাগৌরবের কাহিনী কিছু কিছু শুনেছিলাম, বিমানে সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে কি যেন এক স্বপ্নে মগ্ন হয়ে পড়লাম!

তোমার কৃপা*

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কেমন ক'রে মিলল কৃপা—জনে জনে আজ শুধায়
জানি চরণচিহ্ন শুধু, চরণদিশা কেউ কি পায়?
কেমন ক'রে চোখের জলে
ভয় ভাবনা যায় যে গ'লে,
অভিমানের ছলাকলা লাজ পেয়ে নাথ, মুখ লুকায়—
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্রার্থনায়

* জন্মাষ্টমীর দিন রচিত

স্বজন কারা—নিত্য সাথী—তীর্থপথে ধরে হাত,
কার নাম উষার সাধন—দেখায় কৃপার সুপ্রভাত।
মনের মানুষ আসে কাছে
কেমন ক'রে মনের মাঝে,
মিথ্যা মিতা কারা ভাবের ঘরে চুরি করতে চায়—
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্রার্থনায়।

সত্য ভেবে অসত্য যেই করি ঘোষণ রোখ ক'রে
দুঃখ আসে আকাশ ছেয়ে—কৃপার আলো যায় স'রে।
কুতর্কে হায় হারিয়েছি কী—
অনুতাপে দেখতে শিখি,
দূরে গিয়েও কেমন ক'রে আরো কাছে পাই তোমায়—
দেয় দেখিয়ে তোমার কৃপা শুধু সরল প্রার্থনায়।

তোমার কৃপার মহাপ্রসাদ—যে পেয়েছে সেই জানে,
হাসির আলোয় কান্না কালোয় তারি অভয় পাই প্রাণে!
তোমার জন্মদিনে প্রিয়,
ডাকি—তুমিই চিনিয়ে দিও
কৃপার স্বরূপ—যার বরে আজ চাই শুধু ঠাঁই চরণছায়,
বাঁশির সুরে বৃন্দাবনের পাই ঠিকানা নির্দিশায়॥

স্বামীজীর দান

'পথিক'

স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী কোন পণ্ডিত একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, স্বামীজীর বিশেষ দান কি? আমি বলিলাম, জগতের উপর তাঁহার কি প্রভাব তাহা বলা আমার অসাধ্য: এজন্য আমার জীবনে স্বামীজীর কি দান, তাহাই মাত্র কথঞ্চিৎ বলিতে পারি। তবে সেই বর্ণনায় দেশের ইতিহাসে তাঁহার দান কি, তাহারও সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

ভাব-বিনিময়

স্বদেশী যুগের পূর্বে (১৯০৩-১৯০৪) ইংরেজের নিকট সংকুচিত হওয়া, নত হওয়া, ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ববিষয়ে অধিনায়কত্ব মানিয়া লওয়া আমার মত অনেকের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

স্বদেশী যুগের সূচনায়, স্রোত, একেবারে উল্টা বহিতে লাগিল—অর্থাৎ যাহা কিছু আমার দেশের তাহাই সমগ্রভাবে ভাল এবং যাহা কিছু ইংরেজের

তাহাই মন্দ—এই ধারণা জন্মিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এই ভাব নিছক ভাবপ্রবণতা। আমাদের দেশের বিশেষত্ব কি, শ্রেষ্ঠতাই বা কি, দোষ ক্রটি কোথায়—বিদেশীর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, ন্যূনতাই বা কিসে, তদ্বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকায়, উক্ত দ্বিবিধ অপসিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

স্বামীজীর রচিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত' নামক গ্রন্থত্রয়, এই কালে পাঠের সুযোগ হওয়ায় পাশ্চাত্ত্যের বহু সদ্‌গুণ আমাদের নিজস্ব করা আবশ্যক বুঝিলাম। অপরপক্ষে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া পরিষ্কার অনুভব করা সম্ভব হইল যে সংকুচিত হওয়া, নত হওয়া, সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া, পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণ করিবারও হেতু নাই। পাশ্চাত্ত্যকে দিবার মত এক অতি আবশ্যকীয় অমূল্য বস্তু আমাদের আছে, অধিকন্তু অনেক বিষয়ে আমরাও দাতা হইতে পারি।

আদান-প্রদানের ব্যাপার সঠিক ধরিতে বুঝিতে পারিলেই, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও মেলামেশা সহজ হইবে, এবং বহু অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। পরস্পরকে ভুল বুঝিয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক মনোমালিন্য ঘটে। অতএব যিনি ভুল বুঝিবার মহাবিপদ হইতে নিষ্কৃতিদানের সহায়ক তিনি মহাত্মা। যেমন জাতিগতভাবে, তেমনি ব্যক্তিগতভাবেও, যাহাদের সহিত মেলামেশা করিতে হয় তাহাদের চিন্তাধারার সহিত সম্যক্ পরিচয় হইলেই অনেক অনর্থ হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

এই উভয় ক্ষেত্রে স্বামীজীর দান অমূল্য।

শাস্ত্রানুশীলনে দিগ্‌দর্শন

শিক্ষকবিহীন অবস্থায় যোগসূত্র বা পাতঞ্জল দর্শন পড়িতে গিয়া আমার মত অনেকেই স্বামীজীর রচিত "রাজ-যোগ" গ্রন্থকে শিক্ষকরূপে পাইয়াছেন। এত বড় সুদক্ষ শিক্ষক পাওয়া মহাভাগ্য! জটিল বিষয় সরল করিতে উপলব্ধিমান্ স্বামীজী তাঁহার গুরুদেবের ন্যায় সুদক্ষ।

উপনিষদ্ পাঠকালেও আচার্যবিহীন অবস্থায় ভাগ্যবলে স্বামীজীর "বেদান্ত চিন্তা" (Thought on Vedanta) নামক পুস্তক হাতে আসিল। এই গ্রন্থ পাঠে জীবনের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইল। কিছুকাল পরেই তাঁহার "ধর্মবিজ্ঞান" (Science Philosophy of Religion) পাঠের সুবিধা হয়। এই দুই গ্রন্থ আমার "বেদান্ত" পাঠের শিক্ষক; গ্রন্থদ্বয়ের প্রাঞ্জলতা, গাম্ভীর্য্য ও প্রাণবত্তা শিক্ষা-ব্যাপার সহজ ও নির্ভুল পথে চালিত করে।

বস্তুতঃ স্বামীজীর রচিত পুস্তকাদির সহায়তা না পাইলে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম অনেকেই ঠিক ঠিক ধরিতে বুঝিতে পারিবেন না। উদার ও উপলব্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিই শাস্ত্রাধ্যাপক হইবার যোগ্য, কিন্তু এবংবিধ আচার্য সুদুর্লভ।

শাস্ত্রাধ্যয়ন জীবনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া উহাকে সুন্দর শোভন এবং অতীব আনন্দময় করিয়া তোলে। এখানে স্বামীজীর নিকট ঋণ অপরিশোধ্য।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—উভয় দর্শনে সুপণ্ডিত কোনও সাধুকে এক সভায় বলিতে শুনিলাম, "স্বামীজীর গ্রন্থ পাঠের সুবিধা না পাইলে আমি শাস্ত্রমর্ম বুঝিতে পারিতাম না।"

বাংলা ভাষার অনুশীলন

মনোভাব প্রাঞ্জল ও পরিষ্কাররূপে প্রকাশার্থ বাংলাভাষার কিঞ্চিৎ অনুশীলনকালে স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' 'পরিব্রাজক' 'বর্তমান ভারত', কয়েকটি কবিতা এবং কয়েকখানি পত্র পাঠের সৌভাগ্য হইয়াছিল। পড়িয়া বুঝিলাম, এ সাধারণ ভাষা নয়—এ যেন কেহ আবেগপূর্ণভাবে ছন্দে কথা কহিতেছে! এমন রচনাভঙ্গী প্রাণে আঘাত করিয়া উন্মাদনা আনয়ন করে! গভীর ভাব, অকপট ও প্রাঞ্জল প্রকাশ—যেন বাধাহীন নির্ঝরের

প্রবাহ! ফলে, অকপটভাবে আত্মপ্রকাশের একটি বিশেষ প্রণালী খুঁজিয়া পাইলাম।

চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা! মতবাদ বা পূজাপদ্ধতি গৌণ

চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা—ইহা স্বামীজীর জীবনালোচনায় এবং তাঁহার বক্তৃতাদি পাঠে প্রথম সুস্পষ্ট হইল। এমন কি, যে ব্যক্তি আদৌ মিথ্যা ব্যবহার করে না, অহংকারী নহে, সর্বদা সংযমী—সেই প্রকৃত ধার্মিক—তা সে সাধনভজন জপতপ করুক বা না করুক—ইহা বিশ্বাস হইল।

কে কী কার্য করিতেছে—এ প্রশ্ন অবান্তর; কে ভাবশুদ্ধ, তাহাই মাত্র সারকথা। এই মহৎ ও উদার তত্ত্ব স্বামীজী শুনাইলেন।

স্বামীজীর জীবনে, প্রচারে ও রচনায়—চরিত্রবলই যে আধ্যাত্মিকতা তাহা বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শাস্ত্রবর্ণিত সিদ্ধের লক্ষণসকল, জীবনে আচরণ করিয়া নিজস্ব করাই আধ্যাত্মিক সাধনা; ইহা তিনিই প্রথম ধরাইয়া দিলেন। ধর্মচর্চা—পোষাকী কাপড়ের ন্যায়—কখনও, কদাচিৎ ব্যবহার্য ব্যাপার নহে, অত্যন্ত আটপৌরে ব্যাপার। সকল চিন্তায় ও কার্যে ইহার নিরন্তর অনুশীলন আবশ্যক। এই ভাব তাঁহার জীবনালোচনায় ও গ্রন্থাদি পাঠে বুঝিতে পারিলাম।

সৎসাহস, পবিত্রতা, সংযম, স্বার্থত্যাগ, কর্তৃত্বাভিমান-শূন্যতা চরিত্রবান্ ব্যক্তির লক্ষণ। স্বামীজীর সৎসাহস দুর্জয়, পবিত্রতা অনন্যসাধারণ, সংযম ও স্বার্থত্যাগ এবং বিশেষভাবে কর্তৃত্বাভিমান-শূন্যতা অতুলনীয়!

ধর্মযাজক, ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মজীবন গঠনকল্পে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত গুণাবলী কিছুটা বিকশিত থাকিলে সামাজিক জীবনের তিক্ততা ও ঈর্ষাদ্বেষ অনেক হ্রাস পাইত।

সর্বজীবে দেবত্ব

শাস্ত্রে পড়িয়াছি "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যাহা কিছু আছে সকলই ব্রহ্ম; কিন্তু—প্রত্যেক জীবের মধ্যেই যে সমভাবে "দেবত্ব" (ব্রহ্মভাব) বিদ্যমান—এই তত্ত্ব আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন স্বামীজী। তাঁহার পূর্বে কেহই এই তত্ত্ব এত প্রবলভাবে এবং অকুণ্ঠিত মনে খুলিয়া বলিতে পারেন নাই। "বনের বেদান্ত"কে তিনি বিচিত্র ও বহু বিবদমান সমাজে আনিবার বিপুল প্রয়াস করিয়াছেন। নানাভাবে, চতুর্দিকে লোকসেবার ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার প্রচার ক্রমশঃ সফল হইতেছে।

আমরা অল্পাধিক সকলেই আত্মবিস্মৃত। নিজ নিজ দেবভাবে বিশ্বাস নাই। আত্মপ্রত্যয় জন্মান মহৎ কার্য। আত্মবিস্মৃত জীবকে ও আত্মবিস্মৃত জাতিকে আত্মপ্রত্যয়ী করিবার সুমহৎ দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করিয়াছেন তিনি দেব-মানব। স্বামীজীর এই অবদান শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞান দানই সর্বোত্তম।

লোকসেবা ও সৎকার্যের মধ্যে যে বহুবিধ ফাঁকি থাকিতে পারে, তাহা স্বামীজী বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে সাধক, কর্মী ও সেবকগণ সতর্ক হইতে পারেন!

প্রকৃত লোকসেবকের মনোভাব কীদৃশ, তাহা তিনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া পরিস্ফুট করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। দেশবাসীর প্রতি কি দরদ তাঁহার ছিল সে সম্বন্ধে একটি মাত্র ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিলেই তাহা স্পষ্ট হইবে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন কালে এডেন বন্দরে জাহাজ থামিলে, স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশের শিষ্য ও শিষ্যাসহ ভ্রমণকালে, উহাদিগের সহিত কথোপকথনের মধ্যে, উহাদিগকে কিছুই না বলিয়া, হঠাৎ সমীপস্থ একটি দোকানে প্রবেশ পূর্বক ভারতীয় দোকানীদিগের সহিত মহা আনন্দে নানা বিষয়ক আলাপ করিতে

লাগিলেন—উহাদের ধূলিধূসরিত চাটাইয়ের উপরই বসিয়া উহাদেরই খেলো হুঁকায় তামাকু সেবন করিতেছেন! অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত করিয়া শিষ্যদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা অবাক্ হইয়া পূর্বস্থানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। উহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক স্বামীজী বলিলেন, "দেখ বাপু, দেশের লোক দেখিলে আমি আত্মহারা হইয়া যাই: রীতিনীতি, ভদ্রতা ও আদব-কায়দার দিকে খেয়াল থাকে না।" স্বদেশবাসীর প্রতি প্রবল অনুরাগ ঢাকিয়া চাপিয়া চলা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক।

নারীজাতি ও সাধারণজন

মাতৃজাতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর প্রতি দরদ যদি আজ যৎকিঞ্চিৎ আমাদের হইয়া থাকে, তাহা স্বামীজীর প্রভাবে। উক্ত দুই ভাবের পুষ্টিসাধনে অনেক মনীষী সহায়ক হইলেও, পত্তন স্বামীজীই করিয়াছেন। বিশিষ্ট নেতারাও ঐ বিষয়ে তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। স্বামীজীর গুরুভাই এবং সহকর্মী পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দজী একদিন রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহারা নেতৃস্থানীয় তাঁহাদের কিছু প্রশংসা করিয়া অবশেষে কহিয়াছিলেন, আমরা বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, তাহার ফল হইতেছে এই জাতীয় জাগরণ।

নারীর ন্যায্য অধিকার-প্রাপ্তি এবং পতিত ও অপমানিত জাতির মঙ্গলসাধনের বিপুল প্রয়াস দেখিয়া স্বামীজীর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ বলিতেন—"নেতারা স্বামীজীর আরব্ধ কার্যই করিতেছেন।"

বস্তুতঃ স্বামীজী যাহা সূত্রাকারে বলিয়া এবং সবেমাত্র সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরবর্তিগণ সেই সকলেরই বহুবিস্তার করিতেছেন।

মাতৃজাতি ও জনসাধারণ, এতদুভয়ের উন্নতির জন্য স্বামীজীর ব্যাকুলতা অতীব অসাধারণ। সারা-জগতেই ইঁহাদের প্রতি অবহেলা অত্যধিক। তাই কি তিনি নারীজাতি এবং জনসাধারণের মূর্তিমান্ দরদী হইয়া আসিয়াছিলেন?

ব্যথিতের দুঃখে তাঁহার হৃদয় মথিত হইয়াছিল। শূদ্র-সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং মাতৃ-জাতিকে স্বাভাবিক মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, তিনি ব্যাকুল হইয়া দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন—গিরিগহ্বরে তপস্যা করিতে যাইয়াও স্থির থাকিতে পারেন নাই।

স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে, জনসাধারণ ও মাতৃজাতির দুঃখময় অবস্থার উন্নতি-প্রচেষ্টা এক অপরিহার্য বিধি। বিদেশে থাকাকালে যতবার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, ততবারই তাঁহার শিষ্য ও সেবকগণকে বলিয়াছেন, "কখনও ভুলিও না, নারী ও জনসাধারণ।"

আমেরিকা হইতে ক্ষেত্রীর রাজার নিকট, ফনোগ্রাফ সহায়ে স্বামীজী যে বাণী প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাহাতেও ঐ একই কথা। ঐ সময় তাঁহাকে নূতন করিয়া ভাবনা চিন্তা করিতে হয় নাই। যাহা হৃদয়ে পূর্ব হইতেই দৃঢ়মুদ্রিত ছিল, স্বতই তাহা বাণীরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

কিভাবে মাতৃজাতির নূতন শিক্ষা-দীক্ষা হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি সূত্রাকারে তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক কথায়, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সকল নৈসর্গিক ও আরোপিত প্রতিবন্ধক বিদ্যমান, সে সকলের সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যই শিক্ষা আবশ্যক। ইহাই ছিল তাঁহার সিদ্ধান্ত। তাঁহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, উদার এবং অগ্রগামী। প্রাচীন হইলেও যাহা কল্যাণকর তাহা রক্ষণীয়, তাহা রাখিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন এবং অতীতের সহিত যাহাতে বর্তমানের যোগধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে, সে দিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। দুই একটি উদাহরণ দিলে এই ভাব পরিষ্কার হইবে। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও শিক্ষার বহুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধারা অনুযায়ী

পতির প্রতি একনিষ্ঠ সৌহার্দ্য ও পতির পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার রীতি পরিত্যক্ত না হইয়া যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। নির্জনে আত্মচিন্তারতা কিংবা পরহিতপরায়ণা নারী তাঁহার নিকট ত্যাগ, পবিত্রতা ও সরলতার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হইতেন।

আধুনিক পদার্থবিদ্যা (Science) প্রভৃতি স্ত্রী-শিক্ষায় অত্যাবশ্যক, কিন্তু প্রাচীন অধ্যাত্মবিদ্যাও আয়ত্ত করিতে হইবে। অধ্যাত্মবিদ্যা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিজ্ঞানাদি অবশ্য পঠনীয়, ইহাই ছিল স্বামীজীর অভিমত। শারীরিক শক্তিবৃদ্ধি, আত্মরক্ষায় সুপটু হওয়ার জন্য যথোচিত বিধান, বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগেরও সমভাবে আবশ্যক। কিন্তু তাহাদের কোমলতা যেন কদাপি নষ্ট না হয়, ইহা অবশ্য দ্রষ্টব্য; বীরের দৃঢ়তার সহিত মাতৃহৃদয়ের স্নেহশীলতার একত্র অবস্থিতি—তিনি অতীব বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন।

এ বিষয়ে স্বামীজীর শেষ অভিপ্রায় ছিল, নারী-শিক্ষা ঠিক কিরূপ হইবে, নারীই তাহা নির্ধারণ করিবে। এখানে পুরুষের অধিকার নাই।

জনসাধারণকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে তাহারও বিস্তারিত ইঙ্গিত স্বামীজী দিয়াছেন পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে।

সাধু

কাজী মোঃ হাশমৎউল্লাহ এম্-এ, বি-এল্

স্বল্পাহার, স্বল্পনিদ্রা, স্বল্পভাষা আর
সাধু—যে সংকল্প করে অভ্যাস সাধা'র।
চিত্ত হয় শক্তিশালী হেন সাধনায়
বিত্ত তারা জগতের, নমস্য ধরায়।

অন্তর একাগ্র রাখে প্রভুর চরণে—
কল্যাণ-প্রেরণা জাগে শত রূপায়ণে—
স্বতই সাধনধারা বহে অবিরত
মজিয়া মজায় ধরা দেবতার মত।

ক্ষণেকের সাধুসঙ্গ জীবনে সম্পদ—
বন্দনা অর্চনা হ'তে শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মানস-ভূমি

শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্-এ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভারতবাসীর সাধারণজীবনেও অধ্যাত্মচেতনার সঞ্চার এত গভীরভাবে ঘটেছে যে, দৈনন্দিন জীবনের অজস্র দৈন্য সত্ত্বেও তাদের ঐতিহ্য ঐশ্বর্যময়। তাই 'পশ্চিমের দরিদ্র জনসাধারণের তুলনায় ভারতবর্ষের দরিদ্ররা তো দেবশিশু' স্বামীজীর এই উক্তিটির যথার্থতা সম্বন্ধে অরবিন্দবাবু যতই সন্দিহান হোন কথাটি অতি সত্য। তবে এই দেবশিশুরা যখন অধ্যাত্ম-সম্পদটুকুও হারাবে তখন কি হয় বলা কঠিন। এই দরিদ্র জনসাধারণকে বিদ্যাবুদ্ধিতে সমুন্নত করে পরম সত্যের অভিমুখী করে তোলাই ছিল স্বামীজীর আদর্শ। অরবিন্দবাবু লিখেছেন—"স্বামী বিবেকানন্দ নিজস্ব মতের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছিলেন এই বলে যে, তাঁদের (পাশ্চাত্ত্যের) ধর্মের ইতিহাস রয়েছে এবং থাকবেই, কারণ মানুষ

তার স্রষ্টা, কিন্তু হিন্দুধর্মের ইতিহাস নেই, থাকতেও পারে না, কারণ তা ঈশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত।" একথা তিনি কোথায় পেয়েছেন তা জানাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অপৌরুষেয় বেদ সম্বন্ধে স্বামীজীর স্পষ্ট উক্তি, "The Hindus have received their religion through revelation, the Vedas. They hold that the Vedas are without beginning and without end. *But by the Vedas no books are meant. They mean the accumulated treasury of spiritual laws discovered by different persons in different times.*"

সুতরাং বেদ অর্থে অনন্ত অধ্যাত্ম-জ্ঞান, যা যুগে যুগে সাধকহৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। বেশির ভাগ ধর্মই কোন বিশিষ্ট দেবমানবকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল উৎস, কোন ব্যক্তি নয়, অনন্তজ্ঞান বেদ। বেদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করেই সকল দেশের সকল কালের সাধকদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি। এই মনোভাবের উপরেই বহু শাখাবিশিষ্ট হিন্দুধর্মের ও ভারতসংস্কৃতির ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠিত।

স্বামীজী উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনগুলিকে খুব বেশী মর্যাদা দেন নি। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক মনে করেছেন—"তাঁর (স্বামীজীর) মতে ধর্মই ভারতের সমাজ জীবনের মূল উৎস। এইজন্যই পূর্বগামীদের সমাজসংস্কারমূলক আন্দালনকে তিনি সমর্থন তো করতে পারেনই নি, সুনজরেও দেখেন নি।" প্রথমেই বিবেচ্য স্বামীজী কোথাও ধর্ম ও সমাজকে এক করে দেখেছেন কি না এবং সমাজসংস্কারকদের প্রতি তাঁর 'সুনজর' না থাকার হেতু কি। এ বিষয়ে স্বামীজীর মতামত পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি—

"Beginning from Buddha down to Rammohun Roy, everyone made the mistake of holding caste to be a religious institution and tried to pull down religion and caste all together, and failed."

উনবিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সংস্কার-আন্দোলন (সহমরণ-নিবারণ, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা) —এ সবের উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়েও স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন, এ সমস্তই তো উচ্চবর্ণের সমস্যা। দেশের শতকরা ৯০ জন সাধারণ মানুষের জীবনকে এই সমস্যা স্পর্শ করেছে কি? নিম্নবর্ণের মানুষের ওই সব আন্দোলনের দ্বারা কী উপকার হয়েছে? তাই স্বামীজীর প্রশ্ন—"......Where are those who want reform? where are the people? ......First educate the nation, create your legislative body, and the law will be forth coming".

শিক্ষার বিস্তার না হ'লে সমাজের সংস্কার উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে—জাতির অন্তরে তা প্রবেশ করতে পারবে না।

সুতরাং ধর্ম এবং সমাজকে স্বামীজী কোথাও এক করে দেখেন নি, সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করেন নি। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দুসমাজেই গলদ রয়েছে এমন অশ্রদ্ধেয় অত্যুক্তিকে অস্বীকার করেছেন। অতীতের এবং বর্তমানের ভারতবর্ষের যে দুটি ছবি আমাদের চোখে ভাসে, স্বামীজী ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনার আলোকে তার মধ্যে প্রাণের যোগ দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতের সর্বপ্রকার অধঃপতন সত্ত্বেও ধর্মের মধ্যেই তিনি জাতির পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। অবশ্য ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় ঐহিক জীবনের উন্নতি চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু,

কেশবচন্দ্র প্রমুখ পূর্বগামী সকলেরই লক্ষ্য এক। তবে কর্মপ্রচেষ্টার সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে স্বামীজীর মধ্যে। অরবিন্দবাবু বলতে চান—যে স্বামী বিবেকানন্দের মানস-পরিমণ্ডল এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মানস-পরিমণ্ডল "সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের"—কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য—ওই পূর্ববর্তী যুগের অভ্যন্তরেই স্বামীজীর সম্ভাবনা নিহিত ছিল। ইউরোপকে যারা সর্বাংশে গ্রহণ করেছিল, তারা মুষ্টিমেয় অনুকরণকারী। আমাদের কোন জাতীয় নেতাই ইউরোপের সব কিছুকে গ্রহণ করেন নি। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সঙ্গে ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমন্বয়সাধনই ছিল তাঁদের আদর্শ। এই সমন্বয়-সাধনাই সে যুগের সঙ্কেত।

কিন্তু অরবিন্দবাবুর চোখে পড়েছে শুধু "ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শন থেকে পাওয়া সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, ব্যবহারিক জীবনাচরণের সার্বভৌম অঙ্গীকার ···· " তাঁর মতে স্বামীজীর মানস-পরিমণ্ডলে এদের আর কোন মূল্য নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে "ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা এবং ন্যায়শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা থেকে যে বুদ্ধিবাদী যুক্তিবাদী মানস গড়ে উঠেছিল" তাকে স্বামীজী নাকি অস্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক স্বামীজীর নিম্নোদ্ধৃত লেখার বাঁকা অক্ষরের অংশটুকু উদ্ধৃত করে দেখাতে চেয়েছেন যে, যুক্তি বা বুদ্ধির চর্চাকে তিনি এড়িয়েই গেছেন। স্বামীজী দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশে বলছেন: ভালবাসার প্রেরণাই দেশপ্রেমের প্রথম কথা। বুদ্ধি বা যুক্তির চেয়ে প্রেমই বিশ্বরহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান দেয়।

"I believe in patriotism, and I also have my own ideal of patriotism. Three things are necessary for great achievements. First feel from the heart. *What is in intellect or reason? It goes a few steps and there it stops. But through the heart comes inspiration. Love opens the most impossible gates; love is the gate to all the secrets of the universe.* Feel, therefore, my would-be reformers, would-be patriots! Do you feel that millions and millions of the descendents of gods and of sages have become next-door neighbour to brutes."

এই উদ্ধৃতি সম্পূর্ণভাবে পড়লে এই মনে হয় যে দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে স্বামীজী হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। এই জ্বলন্ত দেশপ্রেমও তো মানুষের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার যুক্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে! স্বামীজী বলেছেন, বুদ্ধি বা যুক্তির দৌড় বেশীদূর নয়, হৃদয়ের পথেই অনুপ্রেরণা আসে। একটি অনুচ্ছেদের সামান্য অংশ তুলে দিয়েই অরবিন্দবাবু স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করেছেন যা সত্যবোধকে পীড়া দেয়।

যুক্তিবাদী মনন সম্বন্ধেও স্বামীজীর চিন্তাধারার পরিচয় তাঁর রচনাবলীর নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। যদি দেখতে না পাই তাহলে লজ্জার কারণ ঘটে। একটি মাত্র উদাহরণ তুলে দিচ্ছি—

"For it is better that mankind should become atheist by following reason than blindly believe in two hundred millions of gods on the authority of anybody."

স্বামী বিবেকানন্দ এই যুক্তির পন্থা অনুসরণ করেই দুর্গত মানুষকে প্রথমে অন্ন, তারপরে শিক্ষা, এবং তারপরে জ্ঞান দান করতে বলেছেন। কিন্তু একথাও স্মরণীয়, প্রচলিত শিক্ষার অভাবেই অধ্যাত্মজ্ঞানের অভাব ঘটে না। যুগ যুগ ধরে এ দেশের নিঃসম্বল সাধারণ মানুষের মধ্যে অধ্যাত্ম সাধনার ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। মধ্যযুগের

বেশির ভাগ মরমিয়া কবিই এই নিরক্ষর সাধারণ মানবসমাজ থেকে উদ্ভূত। বাংলাদেশের বাউল গানও কোন পণ্ডিতের রচনা নয়।

ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা কি বুঝতে না পেরেই অরবিন্দবাবু লিখেছেন—"রাজা রামমোহন প্রভৃতির মধ্যে যে কালসচেতন দূরদৃষ্টি এবং প্রবাহিত হতে-থাকা ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে নির্ভুল উপলব্ধি আমরা লক্ষ্য করেছি, বিবেকানন্দে তার কোনরূপ স্বাক্ষর নেই।" কোন মন্তব্য পেশ করার আগে আমরা 'ব্যবহারিক' জীবনের ক্ষেত্রে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি—তিনি চিঠিতে লিখছেন—

"শশী* তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করিতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। ····· গোটা কতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু Chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' উপদেশ কর—কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে তাই চেষ্টা কর পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও।" (পত্রাবলী প্রথম ভাগ পৃঃ ১৯৭) উদ্ধৃতাংশটুকুর মধ্যে লক্ষণীয়, স্বামীজী ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় ধরণের শিক্ষার কথাই বলেছেন।

'পরিব্রাজক' বইটিতে স্বামীজী যে ভবিষ্যৎ ভারতের ছবি এঁকেছেন, আজকের দিনের ব্যবহারিক জীবনবোধসঞ্জাত গণ-আন্দোলনের তাই তো প্রকৃত রূপ—"তোমরা (ভারতের উচ্চবর্ণেরা) শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে; জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে,—তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে—তাতে পেয়েচে অটল জীবনীশক্তি।" উনবিংশ শতাব্দীর শেষ মুহূর্তে এই দর্শন কি 'কাল সচেতন দূরদৃষ্টি'র স্পষ্ট স্বাক্ষর নয়?

স্বামীজীর 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পত্রাবলী' পড়বার পরে কেউ যদি অরবিন্দ বাবুর মন্তব্যটি পড়েন—"ধর্মসম্পর্কহীন ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর (স্বামীজীর) অনুসন্ধিৎসা খুবই সামান্য, নেই বললেই চলে—" তিনি অনায়াসেই বুঝবেন এ মন্তব্যের মূল্য কি। বহু বিচিত্র ব্যবহারিক জীবনকে স্বীকার করেও অধ্যাত্ম আদর্শেই তিনি ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি দর্শন করেছেন। ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা শুধু স্বামীজী নয়, ভারতের প্রত্যেক মনীষী ও মহাপুরুষ করে গেছেন। এ ব্যাখ্যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন, তা স্বীকার করি। কিন্তু একটা প্রশ্ন তবু থেকে যাবে, অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যা যদি অচল হয়, বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকেই বা চিরসচল মনে করার কারণটা কি? অধ্যাত্মবাদের অনুরক্তি অনেক সময় গোঁড়ামি আনে বটে, কিন্তু যে বস্তুবাদী দর্শন জীবনের গভীরতম প্রশ্ন ও বেদনার কোন উত্তরই দিতে পারে না, তার প্রতি অন্ধবিশ্বাসও সমান গোঁড়ামি। বস্তুবাদই একমাত্র সত্য দর্শন এমন কথা আজও প্রমাণিত হয় নি। ভারত যে চিরন্তন চরম সত্যকে উপলব্ধি করেছিল, অরবিন্দবাবু তাকে বস্তুজগতের নিয়ত পরিবর্তনশীল সত্যগুলির সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। "Truth is one, truths are many" স্বামীজীর এই

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

সংজ্ঞাটিই ব্যবহারিক জগতের পরিবর্তনশীল সত্যের সঙ্গে অপরিবর্তনীয় মূল সত্যটির পার্থক্য সূত্রাকারে বুঝিয়ে দেয়। অরবিন্দবাবুর মতে স্বামী বিবেকানন্দ "ধর্ম এবং অধ্যাত্ম মুক্তিচিন্তাকে অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, পরম জাতীয় প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন।" এবং তার সঙ্গে নাকি "কালের গরজের সম্পর্ক খুব কমই ছিল।" আমাদের দেশের জাতীয় জীবনের প্রেরণা যে আধ্যাত্মিক এ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন এখানে নেই, কারণ সেটা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। কিন্তু ধর্ম আর মুক্তিচিন্তা ঠিক এক জিনিস নয়। ভারতবর্ষে জীবনের উদ্দেশ্যকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মোক্ষের স্থান সর্বশেষে এবং সবার উপরে। ধর্ম আর মোক্ষ এক জিনিস নয়। ধর্ম ক্রিয়ামূল; ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে; আর মোক্ষমার্গ শেখায় সুখের জন্য কর্ম করাও দুঃখ, দাসত্ব, বন্ধন। মোক্ষ নিয়ে যায় প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ইহ-পরলোকের সুখ-দুঃখের পারে। ভারতের ইতিহাস থেকে স্বামীজী বুঝেছেন "এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। বৌদ্ধধর্মের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হ'ল, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হ'ল। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষ অনুশীলন করে সে ত ভালই; কিন্তু ভোগ না হ'লে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর—তবে ত্যাগ হ'বে।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে ধর্ম এবং মোক্ষসাধনা এক নয়। ভোগেই ভোগের সমাপ্তি নয়—ত্যাগের মধ্যে ভোগের পরম অবসান। ভোগে অতৃপ্ত মানুষই চিরদিন ত্যাগের মধ্য দিয়ে সত্যলাভের আদর্শকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার এই চেতনা কোন এক বিশেষ কালে উদ্ভূত হয় নি, এই চেতনা তো চিরদিনই মানুষের মনে জেগেছে, জাগছে, ভবিষ্যতেও জাগবে। এইজন্যই এ চেতনাকে স্বামীজী "অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়, পরম জাতীয় প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন।" এই প্রেরণার বশেই বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপীয় বস্তুবাদ সত্ত্বেও আমাদের এই অন্তরের পরম প্রয়োজনের দিকটি শূন্য ছিল বলেই আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসে সত্যকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। এই আত্মানুসন্ধানই বিশেষভাবে উনিশ শতকের শেষার্ধের "কালের গরজ"—নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দেওয়াটা অথবা ইউরোপের বস্তুবাদকে সর্বাংশে স্বীকার করাটা তখনকার কালের গরজ নয়। এই আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ফিরে পেয়ে 'ভারতীয়' হয়ে থাকতে পেরেছি। নইলে ইংরেজী শিক্ষার ফলে মেকলের স্বপ্নই আমাদের পরিচয় হয়ে দাঁড়াত—"a class of persons Indian in blood and colour; but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect." উনিশ শতকের গোড়া থেকে আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মমতকে জানবার জন্যে এদেশে এবং ইউরোপে আগ্রহ প্রকাশ পেতে থাকে। ভারতবাসী এবং বিশ্ববাসীর এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার দায়িত্ব স্বামীজী অতি সুষ্ঠুভাবে পালন করে গেছেন। বাইরের সভ্যতার যত চাকচিক্যই থাক অন্তরের ত্যাগ ও শান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হলে যে আমরাও আগ্নেয়-গিরির উপরেই নব সভ্যতার নগরী প্রতিষ্ঠা করে বসবো—এমন আশঙ্কা তাঁর ছিল। সেইজন্যই অধ্যাত্মসত্যকে ভিত্তি করেই তিনি নূতন ভারত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্য তিনি হিন্দুধর্মকে একমাত্র ভিত্তি করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এমন কথা মনে করা ভুল, অথচ লেখক এই ভুলই করে বসেছেন। স্বামীজীর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে তিনি কত খানি ভুল চোখে দেখেছেন তার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃতি

দিই—"তিনি (স্বামীজী) সম্ভবতঃ একথা কখনও উপলব্ধি করেন নি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভারত শুধুমাত্র হিন্দু-ভারত নয় ; বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান এবং বহু অগণিত জাতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম-সম্প্রদায়ের আবাস-স্থল এই ভারতবর্ষ। এ পরিবেশের হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে 'জাতীয় ঐক্য' প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম তাই হিন্দু ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়কে ক্ষুণ্ণ না করে এবং দূরে না সরিয়ে রেখে পারে না। তত্ত্ববিচারে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা সম্ভব হলেও সমস্ত ভারতকে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসার কার্যক্রম একটা অবাঞ্ছনীয় সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ এবং ঐক্যের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না করে পারে না, মানুষের মানবতার স্বীকৃতি সে ধর্মে যতই থাক না কেন।" স্বামীজী ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কোন্ আদর্শের কথা বলেছেন তাঁর নিজের কথায় দেখা যাক—

Whether we call it Vedantism or any ism, the truth is that Advaitism is the last word of religion and thought and the only position from which one can look upon all religions and sects with love......Yet practical Advaitism, which looks upon and behaves all mankind as one's own soul, is yet to be developed among the Hindus universally.

On the other hand, our experience is that if ever the followers of any religion approached this equality in an appreciable degree in the plane of practical work-a-day life—it may be quite unconscious generally of the deeper meaning and the underlying principle of such conduct, which the Hindus, as a rule, so clearly perceive—it is those of Islam and Islam alone......For our motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam ; Vedanta brain and Islam body– is the only hope. (Vol VII)

হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা স্বামীজী কোথাও বলেন নি বরং তিনি সকল মতের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমন্বয় করতেই বলেছিলেন। তাঁর গুরুও বলেছেন "যত মত তত পথ," তিনি তার ব্যাখ্যা করেছেন,—"Sects are not signs of decay, they are a sign of life. Let sects multiply, till the time comes when everyone of us is a sect, each individual." (Vol VIII) তিনি বুঝেছিলেন, সব ধর্মই মূলতঃ এক অদ্বৈত ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ঐক্যবুদ্ধিকে তিনি সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রচারিত সমন্বয়-ধর্ম আচরণ না করাতেই সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয় ; আর এই সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতি-সঞ্জাত। আদর্শ বিশ্বধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর উক্তি স্মরণীয়—"If there is ever to be a universal religion, it must be one which will have no location in place or time ; which will be infinite, like the God it will preach, and whose sun will shine upon the followers of Krishna and of Christ, on saints and sinners alike ; which will not be Brahmanical or Buddhist, Christian or Mohammedan, but the sum total of all these, and still have infinite space for development."

রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যেই স্বামীজী কেন ভারতবর্ষের উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পান নি—এ নিয়ে অভিযোগ করে লেখক বলছেন—"তাঁর নিকট রাজনীতির অর্থই হলো, বস্তুবাদী জীবনদর্শনের উপর জাতির জীবন ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস যে, বস্তুভিত্তিক সভ্যতা কখনো বাঁচে

না।" ইউরোপীয় পলিটিক্যাল উন্নতি যেখানে অপর দেশকে শোষণ করেই সমৃদ্ধ হচ্ছে, সেখানে রাজনীতিকেই উন্নতির সোপান বলে আঁকড়ে ধরার সার্থকতাটা কী? আর বস্তুভিত্তিক সভ্যতার চেয়ে অধ্যাত্মভিত্তিক সভ্যতা যে বেশী টেঁকে, সে কথ তো গ্রীস আর ভারতকে দিয়েই ইতিহাস প্রমাণ করেছে। ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি স্বীকার করেও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আগিয়ে যাওয়াই ভারতের আদর্শ। এ আদর্শ উপলব্ধি করতে না পেরেই অরবিন্দবাবু মন্তব্য করেছেন—"এই তত্ত্বজ্ঞান চলমান জীবনের বোধ থেকে আসে নি, অথবা সঠিক সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের পথেও নয়। এবং আসেনি বলেই জাতীয় জাগরণের বিবেকানন্দীয় পরিকল্পনার ব্যবহারিক উপযোগিতা বিন্দুমাত্রও নেই।··· তাই বিশ্ববিজয়ের তাঁর অধ্যাত্ম পরিকল্পনা এবং রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের জাতীয় জীবনের মূলপ্রবাহ থেকে দূরে গেল, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগসূত্রও আর কিছু রইল না।"

চলমান জীবনের বোধ থেকে যে একমাত্র বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত হয়, একথা বেশীর ভাগ ভারতীয় দার্শনিক চিরকালই অস্বীকার করে এসেছেন, বরং তাঁরা বলেছেন বস্তুই বুঝিয়ে দেয় যে বস্তুর দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। আর "সঠিক সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ" বলতেই বা কী বোঝায়? সমাজের বিশেষ একটা অবস্থাতেই ধর্মচেতনার উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীকালে ধর্মের আর উপযোগিতা থাকে না—এমন কোনো যুক্তি? তাহলে বলতে হয়, সে যুক্তিও মানব-অভিজ্ঞতার দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যন্ত্রের জটিলতা যতই বাড়ুক, সভ্যতার জয়ঢাক যতই নিনাদিত হোক, বস্তুবাদী এই যন্ত্র-সভ্যতা মানুষের অন্তরের শান্তি-পিপাসা মেটাতে পেরেছে কি? তার জন্য প্রয়োজন—আত্মোপলব্ধি। এদিক থেকে ভেবে দেখলে নিষ্কাম সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে মোক্ষ-সাধনার যে আদর্শ স্বামীজী প্রচার করেছেন সে আদর্শ সঠিক সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের পথেই দেখা দিয়েছে। মুক্তির পরম আদর্শকে মনে রেখেই আমাদের সেবাধর্মকে গ্রহণ করে বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। "Do you not remember what the Bible says,—If you cannot love your brother whom you have seen, how can you love God whom you have not seen? If you cannot see God in the human face, how can you see him in the clouds, or in images made of dull, dead matter, or in mere fictitious stories of your brain?" (Vol II, Page 324) এইটিই ভারতীয় জীবনের মূলপ্রবাহ। সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি সে তুলনায় বহিরঙ্গ এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল। ঐ সব আন্দোলনে জড়িয়ে না পড়ে রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় জীবনের এই মূল প্রবাহকেই সমৃদ্ধ করে চলেছেন। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির জগাখিচুড়ির বিষাক্ত পরিণাম সবদেশের ইতিহাসেই পাওয়া যাবে। ব্যবহারিক জীবনেও স্বামীজীর সেবাধর্মকে গ্রহণ করতে পারলে ভারতের বর্তমান জীবনধারা বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। ইউরোপীয় রাজনৈতিক শিক্ষা তো মানুষকে দলগত স্বার্থে বিভক্ত করে চলেছে।

স্বামীজীর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এর পর অরবিন্দবাবু আর একটি মারাত্মক ভুল করেছেন—"স্বামী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথ দত্তর নির্বিকল্প সমাধিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাতির সম্মুখে অনুসরণীয় আদর্শরূপে তুলে ধরলেন। ···ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে শুধু নয়, জাতীয় ক্ষেত্রেও জীবন-সাধনার লক্ষ্য যেখানে এই, সেখানে ভারত স্বাধীন কি পরাধীন, ইংরেজ দেশ শাসন করবে, কি করবে না, অথবা তাদের এ দেশে থাকাটা বাঞ্ছনীয় কিনা

—এসব সমস্যা মূল্যহীন। স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ উচ্ছ্বাসে অস্থির হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কখনো বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখায় নি।" এই ধরণের মন্তব্য যেখানে বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসে, সেখানে এই মন্তব্যের সারবত্তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ নির্বিকল্প সমাধি ভারতের অধ্যাত্ম জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ; সুতরাং জাতির সামনে সে আদর্শ তুলে ধরে স্বামীজী কিছুমাত্র ভুল করেন নি। কিন্তু এই আদর্শ যে সকলের জন্যে, এমন কথা তিনি বলেন নি। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে—কি ভাবে তাঁর গুরুদেব তাঁকে শিখিয়েছিলেন—ঐ শ্রেষ্ঠ সুখও ত্যাগ করে বহুজনহিতায় জীবন সমর্পণ করা আরও উচ্চ আদর্শ।

তবে উচ্চ আদর্শের ধুয়া ধরে ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে নিমজ্জিত হতে চলেছে, এ কথা তিনিই ভালোভাবে বুঝেছিলেন। তবু ভারতবাসীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন—"ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে?" অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। ইউরোপের এত উন্নতি সত্ত্বেও তার ব্যর্থতার স্বরূপটি স্বামীজী ভোলেন নি—"Social life in the west is like a peal of laughter, but underneath, it is a wail. It ends in a sob. The fun and frivolity are all on the surface: really, it is full of tragic intensity." আজকের ইউরোপের বস্তুবাদী চেতনার মর্মান্তিক বিয়োগনাট্যের এমন সত্য পরিচয় খুব কম লেখকই দিতে পেরেছেন। ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের এই বেদনা ও ব্যর্থতাকে উপলব্ধি করেই স্বামীজী ভারতবাসীকে অধ্যাত্মচেতনাসঞ্জাত শান্তির আদর্শে বিশ্বকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন। এইখানেই তাঁর বিশ্ববিজয়ের পরিকল্পনার সার্থকতা। ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর যেমন নির্মোহ দৃষ্টি, তেমনি সত্যদৃষ্টি ছিল ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে—"British rule in modern India has only one redeeming feature, though unconscious. It has brought India out once more on the stage of the outside world; it has forced upon it the contact of the outside world.

"A few hundred modernized, half-educated, and denationalized men are all that modern English India has to show—nothing else. Indian labour and produce, can support five times as many people as there are now in India, with comfort, if the whole thing is not taken off from them."

এই জন্যই স্বামীজীর নির্দেশ ছিল—"For the next fifty years this alone shall be our key-note—this our great Mother India. Let all other vain gods disappear for that time from our mind." বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরে ভারতের ইতিহাসে সেই সাধনাই হয়ে এসেছে। স্বদেশীযুগ থেকে আরম্ভ করে এ দেশের নেতৃবৃন্দ স্বামীজীর কাছেই বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন—ইতিহাস সে কথা ভোলে নি। স্বাধীনতা এবং স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা যে স্বামীজীর অন্তরের সুর, এ কথা কে না জানে? তিনিই কি বলেন নি, 'Freedom is the song of the Soul'! তিনিই কি গেয়ে ওঠেন নি, ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে—"Oh Sun, to-day thou sheddest liberty!" ধর্মসমন্বয়েরও মূল ভাব ধর্মের স্বাধীনতা। সকল ধর্মের মূল সত্যে পৌঁছেই সব মানুষকে একতাবদ্ধ করা সম্ভব। বৈচিত্র্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই,

অন্তর্নিহিত ঐক্যে পৌঁছুতে হবে। অধ্যাত্মবাদের চিরন্তন সত্যে এই প্রতিষ্ঠাই তাঁর কণ্ঠে অমিত তেজ ও চিন্তায় অমিত বীর্য এনে দিয়েছে। অরবিন্দবাবুর মতে—"অধ্যাত্মবাদ তার সে শক্তি, বীর্য ও উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে।" যে অধ্যাত্মবাদের দ্বারা বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ অবধি এত মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব হ'ল তার শক্তি, বীর্য ও উপযোগিতায় বিশ্বাস করবো, না, ভগ্নস্তূপে পরিকীর্ণ মৃতপ্রায় ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিশ্বাস করবো? ভোগসাম্যকে অন্তরের আলোকে উপলব্ধি না করে বাইরে থেকে জোর করে চাপালে কী দশা ঘটতে পারে, তা সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির একনায়কত্বের পরিণাম দেখেই বুঝতে পারা যায়। প্রাচ্যের এই অধ্যাত্ম-অনুভূতি নিয়েই নূতন সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে।

ভারতের ব্যবহারিক রাষ্ট্রিক জীবনধারাকে কোন্ পথে পরিচালিত করতে হবে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। স্বামীজী ভারতবাসীকে তার আত্ম-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে বলেছেন—তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে তারই সাধনা। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নিজের পন্থায় প্রতিষ্ঠিত থেকেই যে অপরাপর পন্থার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া চলে—রামকৃষ্ণ মিশনে তারই প্রকাশ। সমাজনীতি বা রাজনীতি যে পথেই চলুক জীবনের মূলসত্যকে ধরে থাকতে হবে; স্বামীজীর কাজই ছিল ভারতের প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে দেওয়া, তারপর অন্যান্য আবর্জনা আপনি সাফ হয়ে যাবে। অরবিন্দবাবু মন্তব্য ক'রেছেন—"বিবেকানন্দ যে আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন, তা ভারতের ব্যবহারিক রাষ্ট্রিক জীবনধারার মূল প্রবাহের বাইরে।" কিন্তু ভারতীয় জীবনধারার মূলপ্রবাহ তো কেবলমাত্র রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়। অথচ এই সীমাবদ্ধতাকেই ভারতীয় জীবনসাধনার সার্থকতা ধরে নিয়ে তিনি আরো বলেছেন—"সম্ভবতঃ প্রথমবারের বিদেশ-প্রবাসের সময়টাতেই বিবেকানন্দ তাঁর ভাবী কার্যক্রমের সীমা-বদ্ধতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৮৯৫ সালের একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, 'I have no ambitions beyond training individuals' বিশ্ববিজয়ের সংকল্পের পাশাপাশি এ কথগুলো নিতান্তই বেমানান।" কেন বেমানান? বিশ্ববিজয় সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা আগেই আলোচনা করেছি। বস্তুবাদের অত্যাচারে উদ্বাস্তু প্রতীচ্যের জন্য অধ্যাত্ম শান্তির বাণী প্রচারই স্বামীজীর বিশ্ববিজয়। পারমার্থিক ক্ষেত্রে, একজনকেও সেই শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারাও বড় রকমের সার্থকতা। একটি 'পল' থেকেই সমগ্র ইয়োরোপ খ্রীষ্টের বাণী শুনেছে।

ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে যে আমাদের অনেক কিছুই নতুন করে শিখতে হবে সে বিষয়ে স্বামীজীর সন্দেহ ছিল না। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যকেও গ্রহণ করতে হবে ত্যাগ ও শান্তির বাণী। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এমনি করেই ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনের সংযোগ ঘটেছে। তিনি চেয়েছিলেন একদল আদর্শ যুবক যাদের দ্বারা তিনি স্বদেশে ও সারা বিশ্বে নবজাগরণ এনে দিতে পারবেন। তাঁর বিশ্ব-বিজয় আধ্যাত্মিক অর্থেই গ্রহণীয়। ব্যক্তিকে গড়ে তোলার যে সঙ্কল্প তিনি করেছিলেন, তার দ্বারা তিনি বিশ্বকেই উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। "উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমি" প্রবন্ধটিতে অরবিন্দ-বাবু সুন্দরভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের মানস-দ্বিধাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের শুভবুদ্ধির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস কেমন করে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে দোলায়িত করেছিল, সে কথা তিনি নানা উদাহরণ সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ঐতিহ্য থেকে কোন কিছু যে নেবার আছে একথা তাঁর একবারও মনে হয় নি। তাই গ্রন্থশেষে মন্তব্য করেছেন—

"বর্তমান কাল ও ইংরেজকে অস্বীকার করেও ইংরেজের কাছ থেকে যেটুকু বস্তু-আরাধনা ও বুদ্ধিবাদ সমাজ-মানস আয়ত্ত করেছিল, তাই নতুন বাংলা, নতুন ভারতবর্ষ জন্ম দিয়ে গিয়েছে। প্রাচীনের আকর্ষণ তার এখনো কাটে নি অবশ্য, কিন্তু পুরাতন অভ্যাসের মতোই তা হৃদয়সম্পর্কহীন, নিষ্প্রাণ।" বেশ বোঝা যায়, উনিশ শতকেই স্বামীজী বস্তুভিত্তিক সভ্যতার যে সঙ্কট দেখতে পেয়েছিলেন, বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে লেখক অজ্ঞাতসারে সেই আবর্তেই পড়েছেন!

বস্তুতঃ আধুনিক জীবনের সমস্যা—ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্যসাধনের সমস্যা। ইউরোপের বস্তুভিত্তিক সভ্যতার সর্বব্যাপী কর্মচাঞ্চল্যের আদর্শকে স্বীকার করে সন্তুষ্ট থাকলে ভারতবর্ষ ইউরোপের মতোই সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। অধ্যাত্ম-চেতনাসঞ্জাত যে ধ্রুব শান্তি (তাকে নির্বাণই বলি, আর মোক্ষই বলি), তার মধ্যে এসে যদি সব কর্মধারা না মেলে, যদি কামনার নিরন্তর স্রোত মানবাত্মার পিপাসাকে কেবল বাড়িয়েই চলে—তাহলে মহাযুদ্ধের মল্লভূমিতে প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একথা মনে রাখতেই হ'বে—"ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ।" উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পটভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের চিন্তাধারার এই সংঘাত এবং সম্মেলনের কথাই রয়েছে। এই দুই সভ্যতার মহামিলনের মধ্যেই ভবিষ্যতের সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা নিহিত। উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ইতিহাসে সেই সম্ভাবনারই শুভ-সূচনা। (সমাপ্ত)

সমালোচনা

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ—শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার প্রণীত। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—।৵০+২২৪, মূল্য ৪॥০। আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার লিখিত পরিচয়-সম্বলিত।

বর্ষীয়সী লেখিকা বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার কোন কোন গুরুভ্রাতার ও ভগিনী নিবেদিতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পরিস্ফুট।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সূচনা ও ক্রমবিকাশ বিবেকানন্দ-জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই লেখিকা স্বামীজীর জীবনবিকাশের পটভূমিকায় গ্রন্থারম্ভ করিয়া বিষয়বস্তুকে ন্যায্য মর্যাদা দিয়াছেন। স্বামীজীর ভারতভ্রমণ ও পরবর্তী জীবনের প্রেরণা-লাভ সম্পর্কে অতিপ্রয়োজনীয় অনেক ঘটনা বাদ গিয়াছে, এদিকে অপ্রয়োজনীয় বহু বিষয় সবিস্তারে লিখিত। আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে সংগ্রামশীল প্রচারকের চিত্রাঙ্কনের পর ভারতে তাঁহার আদর্শ রূপায়িত করিতে তাঁহাকে যে কঠোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাহারও সার্থক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতের নবজাগরণে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব ও স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর উহার প্রসার নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়া ১৯২৬ খৃঃ মহাসম্মেলনের পর লেখিকা গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। কিন্তু প্রসঙ্গ হইতে সহসা প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য বহু স্থলে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং নানা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় আসিয়া স্বল্পপরিসরে ভিড় করিয়াছে। এত খুঁটিনাটি কথার উল্লেখ ইহাতে আছে যে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়াছে—যাহাতে নূতন পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন। ইহাদের অনেকগুলি হয়তো ছাপার ভুল, তথাপি অন্য ভুলও যথেষ্ট আছে, চোখে পড়িয়াছে এমন কতকগুলি ভুল নিম্নে দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠা ১, 'স্বামী মাধবানন্দ…যে জীবনী লিখিয়াছেন,' তিনি প্রকাশক মাত্র (পৃঃ ৫ দ্রষ্টব্য), পৃঃ ৫ পঙ্‌ক্তি ১০—উক্ত জীবনীতে সতেরো জনকে সন্ন্যাসী শিষ্য বলা হইয়াছে কি? ইঁহারা সকলে একদিনেই সন্ন্যাসগ্রহণ করেন নাই।

পৃঃ ৩২, ১৮৯৪ খৃঃ 'এই সময় তিনি নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন।' পৃঃ ৪২—১৮৯৬ খৃঃ ঐ সমিতি স্থাপনের কথা আছে।

পৃঃ ৭৬—স্বামীজীর ভ্রাতা মহেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন '১৮৮৫ খৃঃ…বাবার হঠাৎ মৃত্যু হয়', ঐ ঘটনার কাল ১৮৮৪ খৃঃ।

পৃঃ ৮১—পং ১৩ : "স্বামীজীর 'ট্রিপলিকেনে' নামক এক শিষ্য"—'ট্রিপ্লিকেন'—মাদ্রাজ শহরের একটি পাড়া।

পৃঃ ৮৩—পং ২৫ : 'আলমবাজারের' এই শব্দটি প্রক্ষিপ্ত। ঐ পৃষ্ঠায় পং ২৬ : 'ইহার আনুষঙ্গিক সমুদয় মঠকেই'। মঠের নিয়মাবলীতে আছে 'ইহার অধীনস্থ সমুদয় মঠকেই', এই পরিবর্তন করা হইয়াছে কেন?

পৃষ্ঠা ৯৪ : 'স্বামীজীর দুইজন শিষ্য…তাঁহার সহিত প্রেরিত হন',—স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রব্রজ্যাক্রমে একাই মহুলায় গিয়াছিলেন, দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য আরম্ভ হইলে পর স্বামীজীর দুইজন শিষ্য প্রেরিত হন। পৃঃ ৯৬,—১৮৯৭ খৃঃ গভর্ণমেণ্টের জমি দেওয়ার সংবাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে কে দিয়াছিল জানা নাই। সারগাছিতে অনাথ আশ্রমের পঞ্চাশ বিঘা জমি হয় অনেক পরে ১৯১২ খৃঃ। ঐ পৃষ্ঠায় স্বামীজীর পত্রখানির তারিখ জুলাই ২৯শে নয়, ২৪শে।

পৃঃ ১১৪ পং ২—৪ : বিরজাহোমের সময় শরচ্চন্দ্রকে পাহারা দিতে পাঠানোর কথা তাঁহার 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' নাই।

পৃঃ ১২১, পং ২১—২২ : মঠের নিয়মাবলীতে মুদ্রিত শুদ্ধপাঠ 'তাঁহার চরিত্র রামকৃষ্ণরূপ মুষায় প্রকৃষ্টরূপে দ্রুত হয় নাই'; আলোচ্য পুস্তকে মুদ্রিত অর্থহীন অভিনব পাঠ লেখিকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন?

পৃঃ ১৩৭, পং ১ : 'একই দিনে' নয়, নিবেদিতা বিদ্যালয় পরদিন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে বার কালীপূজা হইয়াছিল ১২ই নভেম্বর নয়, ১৩ই নভেম্বর।

পৃঃ ১৬৫, পং ২৯ : এখানে 'বৃদ্ধ' মানে 'শ্রীরামকৃষ্ণ'; লেখিকার ব্যাখ্যা 'বৃদ্ধ অর্থাৎ পূজা অর্চনা সম্বন্ধে চিরদিনের সংস্কার'—উদ্ভট কল্পনা!

পৃঃ ১৮৭, পং ৪ : শুধু মিশনই রেজেষ্ট্রি হইয়াছিল, মঠ নয়। পং ৬, মঠ মিশনের ওয়ার্কিং কমিটি এই সময় (১৯০৯ খৃঃ) গঠিত হয় নাই। মহাসম্মেলনের পর গঠিত হয় ১৯২৬ খৃঃ। (পৃঃ ২১২, পং ১ দ্রষ্টব্য) পং ১৩, 'এক বিভাগের ভার লইলেন সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামী, অন্য বিভাগের ভার লইলেন সেক্রেটারী স্বামী সারদানন্দ'— একথা ঠিক নহে।

পৃঃ ১৯১, পং ৭ : 'কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করিবার চেষ্টা চলিতেছে' হইতে পারে না, কারণ তখন উহা প্রতিষ্ঠিত।

পৃঃ ১৯৪, পং ১২ : 'মায়ের বাড়ীতে উদ্বোধন কার্যালয় ও প্রেস স্থাপিত হয়'—শেষাংশটি ভুল।

পৃঃ ১৯৬, পং ৫—৮ : ঘটনা অন্যরূপ। স্বামী সারদানন্দকে গভর্ণর কলিকাতায় দেখা করিতে ডাকিয়াছিলেন—'বম্বেতে' নয়। 'পি. সি. লায়নের সহিত' নয়—মিঃ গুর্লের সহিত কলিকাতাতেই তাঁহার কথাবার্তা হয়।

পৃঃ ২০১, পং ১৭ : 'রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প বিদ্যালয় (বেলুড়)' পৃথক হেডিং হইবে না, এটি একটি শাখা কেন্দ্র।

পৃঃ ২০৪, পং ২ : 'সন্ন্যাসী মহাসম্মেলন' নয়—শুধু মহাসম্মেলন হইবে, পং ৩১—২, দুইটি বাক্য পরস্পর বিরোধী।

পৃঃ ২০৬, পং ১৬—১৮ : বিবরণ ঠিক হয় নাই।

পৃঃ ২১২ প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই কার্যকরী সমিতির

উদ্দেশ্যের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। ২১৫ পৃঃ বিবৃতিপত্রের ৩য় অনুচ্ছেদে উহা পাওয়া যাইতেছে।

পুস্তকখানির বিষয়ের গুরুত্ববশতঃ পৃষ্ঠা ও পঙ্‌ক্তি ধরিয়া ঘটনা ও বিষয়ের ভ্রান্তিগুলি প্রদর্শিত হইল। এই প্রকার ইতিহাসধর্মী পুস্তকে ব্যক্তির নাম ও স্থান-কালের ভুল গুরুতর ভুল—আগে পৃষ্ঠা পরে পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করিয়া ঐরূপ কয়েকটি ভুলও সংশোধিত হইল।

পৃঃ ৫।১৫ বিশ্বেশ্বরানন্দ—বীরেশ্বরানন্দ, ৩৩।১৪ জ্যোতিমাতা—যতিমাতা, ৪৩।২৯ স্বামীজী—ষ্টাডি, ৪৯।১৬ দেবসেনা—দেবসেন, ১৩০।১৭ সারদানন্দ—সদানন্দ, ১৫৬।২৯ বোল্ডগেট—রজেট, ১৯৪।২০ সান্ত্বনানন্দ—শান্তানন্দ, ২০৩।৩ কৃশ্চীনা—কৃষ্টীন, ২০৫।৪ জ্যোতিশ্বরানন্দ—যতীশ্বরানন্দ, ৩৭।১৭ মঠ—কাশী অদ্বৈত আশ্রম, ২০০।২৩ ময়ালপুর—মায়লাপুর, ২০০।২৯ মুন্সীগঞ্জ—মুট্‌ঠীগঞ্জ, ১৭৯।২৯ দুই মাস—দুই সপ্তাহ হইবে।

ভুল আরও অনেক আছে, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। এই সকল ত্রুটি হেতু পুস্তকখানিকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, যদিও অল্পের মধ্যে ইহাতে অনেক কথা সংগ্রহ করা হইয়াছে; বইএর ছাপা ভাল, কিন্তু অক্ষর ছোট ও কাগজ সাধারণ। অনেকগুলি ছবি থাকায় পুস্তকটি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

আগামী বৎসর রামকৃষ্ণ মিশনের ষাট বৎসর পূর্ণ হইবে, তদুপলক্ষ্যে স্বামী গম্ভীরানন্দ ইংরেজীতে মঠ মিশনের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন, এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহা হইতে সংঘের অনেক তথ্য অবগত হইবেন।

পরিশেষে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভূমিকায় 'অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ ও কর্মবিবরণীর সাহায্যে'র উল্লেখ আছে। ঐ সাহায্যের পরিমাণ এত অধিক যে, সকল বইগুলির নাম থাকিলে ভাল হইত। দেখা যাইতেছে, সাধারণের অপ্রয়োজনীয় ও প্রকাশের অযোগ্য মঠ মিশনের বিস্তর ভিতরের খবর বইখানিতে আছে। উহাও কি শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-মঠের স্বামী ত্রিপুরানন্দের প্রদত্ত? সে ক্ষেত্রে লেখিকার ঐ মঠের উৎপত্তির ইতিহাস স্মরণ করা উচিত ছিল। যিনিই উহা দিয়া থাকুন, ঐ সকল খবর কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, পুস্তকে তাহার একটু বিবরণ থাকিলে উহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে ধারণা হইত। লেখিকা ঐগুলি মঠ মিশনের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ছাপিয়াছেন—এরূপ কোন স্বীকৃতি ভূমিকায় নাই। ইহাতে শিষ্টাচারের প্রশ্ন ছাড়া, স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা কতটা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও বিবেচ্য। গ্রন্থশেষে উদ্ধৃত—স্বামী নির্মলানন্দকে লিখিত পত্রগুলিও পুস্তকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগায়। পরবর্তী সংস্করণে এই সকল বিষয়ে মনোযোগ বাঞ্ছনীয়।

স্বামী অবিনাশানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অবিনাশানন্দজী (শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'শিবুদা' নামে পরিচিত) গত ১লা পৌষ (১৬ই ডিসেম্বর, '৫৬) রবিবার বেলা ৭টার সময় ৭০ বৎসর বয়সে বিশাখাপত্তনম্ কে. জি. হাসপাতালে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি রক্তচাপবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছিলেন। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইলে ২৩শে নভেম্বর তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্বামী অবিনাশানন্দজী বহুগুণসম্পন্ন ছিলেন, এবং অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা জানিতেন। প্রথম-জীবনে তিনি কালিকট জ্যামোরিন কলেজে অধ্যাপক ছিলেন এবং কিছুদিন মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ 'হিন্দু'

পত্রিকার সহ-সম্পাদকের কাজও করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া ১৯১৯ খৃঃ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তিনি পরবর্তী তিন বৎসর (১৯২০-২২) সুরাট জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও উত্তর প্রদেশের কাংড়ী গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৬ খৃঃ উতকামণ্ড আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া উতকামণ্ড, মায়াবতী, সিংহল, ফিজিদ্বীপপুঞ্জ ও বিশাখাপত্তনম্ প্রভৃতি শাখাকেন্দ্রে বহু কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মভার লইয়া অবিনাশানন্দজী জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী এবং শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবী-শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যথাক্রমে প্রকাশিত 'ভারতসংস্কৃতির উত্তরাধিকার' (Cultural Heritage of India) এবং 'ভারতের মহীয়সী নারী' (Great Women of India) নামক অমূল্য গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশনার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শতবর্ষ-উৎসব-পরিকল্পনা-রচনাতেও তাঁহার দান চিরস্মরণীয়। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব—গত ৮ই পৌষ রবিবার (২৩শে ডিসেম্বর) শুভ কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১০৪তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৭৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে উৎসব—৮ই পৌষ, শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সুদীর্ঘ শেষ একাদশ বৎসরের বহু পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত বাটীতে (১, উদ্বোধন লেন) শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির পর সমবেত-কণ্ঠে বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। অতঃপর বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-পাঠ হোম, ভোগারতি দিবসব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। প্রায় ১৫০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পরেও বহু ভক্তের সমাবেশ হয়।

শ্রীসারদা মঠে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি—গত ৮ই পৌষ, রবিবার শ্রীসারদা মঠে (দক্ষিণেশ্বর) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া বিশেষ পূজা এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ভোর ৫টা হইতে ব্রহ্মচারিণীগণের দেবীসূক্ত পাঠ এবং উপনিষদ্ আবৃত্তির সঙ্গে উৎসব আরম্ভ হয়। ৭॥ টা হইতে ষোড়শোপচার পূজা এবং চণ্ডীপাঠ কালে ভক্ত মহিলারা সমবেত হইতে থাকেন।

মঠপ্রাঙ্গণে একটি নাতিবৃহৎ সুশোভিত মণ্ডপে শ্রীশ্রীমার প্রতিকৃতি পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বাগবাজার নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ ৮টা হইতে ১০টা পর্যন্ত ভজন করে। তারপর জনৈকা ব্রহ্মচারিণী সুদীর্ঘ ২ ঘণ্টা ধরিয়া শ্রীশ্রীমার জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন; সমবেত ভক্তমণ্ডলী সাগ্রহে নিবিষ্টচিত্তে উহাতে যোগদান করায় একটী সুন্দর শান্ত পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল। সুগায়িকা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় দুইটি মাতৃসঙ্গীত গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। দক্ষিণ কলিকাতার "দেব গীতাঙ্গীসঙ্ঘ" কর্তৃক নাম-

সঙ্কীর্তনে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। প্রায় আট শত ভক্ত মহিলা এবং বালক বালিকা বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যারতির পর শান্তি ও আনন্দের মধ্যে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কল্পতরু উৎসব—কাশীপুর উদ্যানবাটীতে, যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরি ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ দ্বারা 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তাহারই পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি মঙ্গলবার 'কল্পতরু দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। পরবর্তী দুই দিন ২রা ও ৩রা বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, প্রসাদবিতরণ, ধর্মসভা, শ্রীশ্রীকথামৃত-ব্যাখ্যা, রামায়ণ গান প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম দিন বৈকালে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বোধাত্মানন্দ, বক্তা ছিলেন স্বামী অজয়ানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ গায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী এতদুপলক্ষ্যে দুই দিন রামায়ণ গান করেন, প্রথম-দিন 'ভরত-মিলন' এবং দ্বিতীয় দিন 'দক্ষযজ্ঞ'। স্বামী পুণ্যানন্দ দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যলীলা অবলম্বনে সঙ্গীত সহযোগে কথকতা এবং স্বামী ওঁকারানন্দজী শেষ দিন 'শ্রীশ্রীকথামৃত' ব্যাখ্যা করেন। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে কয়েকদিনের উৎসবে বহু সহস্র ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন, নগরীতে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানেও 'কল্পতরু' দিবস উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব—২০শে পৌষ (৭ই জানুআরি) সোমবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, বেদ ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ, হোম, ভোগরাগ, পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের জীবনী-পাঠ ভজন ও প্রসাদ বিতরণাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

বারণসীধামে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব—বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব ৮ দিন (২৩শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর) ধরিয়া সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, বেদপাঠ, ভজন, তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ, কীর্তন, কথকতা, ধর্মসভায় বক্তৃতা ও মায়ের জীবনী আলোচনা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি এই উৎসব কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

Vedarthasamgraha—আচার্য শ্রীরামানুজের 'বেদার্থসংগ্রহ' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। মূল সংস্কৃতও প্রদত্ত। অনুবাদক—এস্. এস্. রাঘবাচার, এম্-এ। স্বামী আদিদেবানন্দ লিখিত মুখবন্ধ সন্নিবিষ্ট আছে। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মহীশূর। পৃষ্ঠা—১৯৬+৮/০ ; মূল্য—৩৷০।

ভক্তিপ্রসঙ্গ—স্বামী বেদান্তানন্দ প্রণীত ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়াম, রাঁচি হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১৭৪ ; মূল্য—১।০।

দেবর্ষি নারদ বিরচিত ভক্তিসূত্রের মূল, অন্বয়ার্থ, অনুবাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ অবলম্বনে সূত্রগুলির মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা সম্বলিত।

Chandogya Upanishad—স্বামী স্বাহানন্দ অনূদিত ; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ময়লাপুর, মাদ্রাজ-৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৬২৩+৬০ ; মূল্য—৮৲ টাকা।

দেবনাগরী হরফে মূল সংস্কৃত অন্বয়ার্থ, ইংরেজী অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা সম্বলিত। স্বামী বিমলানন্দ লিখিত ৫৮ পৃষ্ঠার তথ্যপূর্ণ একটি বহুমূল্য ভূমিকাও আছে।

বিবিধ সংবাদ

নানাস্থানে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব—জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১০৪তম জন্মোৎসব বিভিন্ন-স্থানে সাড়ম্বরে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানসমূহের বিস্তৃত উৎসব-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি:—তেজপুর (আসাম), খেপুত ও বলরামপুর (মেদিনীপুর)।

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের জন্মোৎসব—গত ২৭শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর বারাসত শহরে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে তাঁহার ১০১তম শুভ জন্মোৎসব ষোড়শোপচারে পূজা, শিবমহিম্নস্তোত্র ও চণ্ডীপাঠ, চণ্ডীর কথকতা, ছায়া-চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী আলোচনা, রামনামকীর্তন ও ভজন, শোভাযাত্রা, কালীকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিপাঠ, জনসভায় বক্তৃতা ও প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

পরলোকে উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গত ২৯শে ডিসেম্বর, শনিবার রাত্রি ১০টার সময় কলিকাতায় ১২।১ রামকান্ত বসু স্ট্রীটে ভ্রাতার বাস-ভবনে ৯০ বৎসর বয়সে উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বেলুড় মঠে যাতায়াত করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং মঠে 'বাহাদুর' নামে পরিচিত ছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রারম্ভিক যুগে তিনি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পূজ্যপাদ ত্রিগুণাতীত মহারাজের ও স্বামী শুদ্ধানন্দের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমরা তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ রায়—বিগত ৩রা জানুআরি রাত্রি ১০॥ ঘটিকার সময় কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠে কল্পতরু উৎসবক্ষেত্র হইতে কাশীপুরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুক্ষণ পরেই নড়াইল জমিদারবংশের পরমভক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রথম জীবনেই ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সংস্পর্শে আসেন এবং শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির সহিত তাঁহার নিকট সম্পর্ক ছিল, বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি ছিলেন আজীবন সভাপতি। তাঁহাদেরই প্রদত্ত প্রায় দশ বিঘা জমির উপর ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। ধীরেনবাবু অকৃতদার থাকিয়া চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল রামকৃষ্ণ মিশনের নানাবিধ কল্যাণকর্মে ব্রতী ছিলেন। ১৯২১ খৃঃ তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া স্বদেশীব্রত গ্রহণ করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কিছুকাল বিধানসভার সদস্য ছিলেন। সরল অনাড়ম্বর জীবন, উচ্চচিন্তা, কল্যাণচেষ্টা ও চরিত্র-মাধুর্যের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। এই ভক্ত ও নিষ্কাম কর্মীর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ভ্রমসংশোধন—১৬ পৃষ্ঠায় 'ব্রহ্মানন্দ-শিবানন্দপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধের ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে 'রমাকান্ত' স্থানে 'রামকান্ত' হইবে।

বিজ্ঞপ্তি:—

আগামী ৯ই মাঘ, ২২শে জানুআরি মঙ্গলবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে।

উদ্বোধন

লীলাবতরণ

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪।৬, ৯।১১, ১২।৫

জন্মহীন ঈশ্বরের মানবশরীরে জন্মগ্রহণ, বিশ্বব্যাপী ভগবানের পৃথিবীতে অবতরণ ও অবস্থান, আপাতবিরোধী মনে হয়; কিন্তু যুগে যুগে দেশে দেশে অপার্থিব উদ্দেশ্যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহামানবগণের আবির্ভাব ঐতিহাসিক ঘটনা। অধিকাংশ লোকই ইহার মর্ম বুঝে না—কিন্তু মানুষের নিজের কল্যাণের জন্য, উন্নতির জন্যই ইহা বুঝিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। গীতামুখে শ্রীভগবান্ স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিতেছেন :

আমি জন্মরহিত, বিকার-রহিত আত্মা, সর্বভূতের ঈশ্বর, তথাপি আমার সত্ত্বরজস্তমোগুণময় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যোগমায়াশক্তিতে আমি জন্ম পরিগ্রহ করি।

আমি যখন মানুষ দেহ ধারণ করিয়া আসি সংসার-মায়ামুগ্ধ মানব আমার সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ঈশ্বরভাব এবং তদতীত পরমাত্মভাব বুঝিতে না পারিয়া আমাকে তাহাদেরই মত প্রকৃতির অধীন সাধারণ মানুষ মনে করিয়া অবজ্ঞা করে; আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হয় না।

অব্যক্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মভাবের সাধককে সগুণ সাকার ঈশ্বরভাবের উপাসক অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া সাধনা করিতে হয়, কারণ দেহবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে নিরাকার ভাবে স্থিতিলাভ করা অতিশয় কঠিন।

তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে অরূপের সাধনা অপেক্ষা ঈশ্বরের কোন রূপের ধ্যান করা সহজ; মানুষের পক্ষে শ্রীভগবানের কোন মানবমূর্তি অবলম্বন করিয়া সাধনায় অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিক। ঈশ্বর যখন মানবদেহে অবতীর্ণ হন—তখন সেই দেবমানবের দিব্যজীবন ও চরিত্র অনুধ্যান করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া বহু সাধক তাঁহার সত্তা লাভ করেন এবং স্ব স্ব জীবন সার্থক করিয়া জগৎকেও ধন্য করেন।

কথাপ্রসঙ্গে

নূতন মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ

শীতের কুহেলী ভেদ করিয়া তপস্যাপূত শিব-রাত্রির পর ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়ার নূতন চন্দ্রকলা বহিয়া আনে এক নবজীবনের আমন্ত্রণ, পরিপূর্ণতার এক সুস্পষ্ট সম্ভাবনা।

সহস্রবৎসরব্যাপী নানা ঘাত-প্রতিঘাতের দুর্যোগে ঘনায়মান অন্ধকারে ভারতপ্রতিভা নানা স্থানে সাধক মহাপুরুষদের জীবন ও সাধনার মধ্য দিয়া তারকার মতো জ্বলিতেছিল, এবং দিগ্‌দর্শনে সহায়তা করিয়া জাতীয় জীবনাদর্শ অব্যাহত রাখিয়াছিল। কিন্তু রাত্রিশেষে যখন তারকাও নাই, সূর্যও উঠে নাই—নূতন দিনের আলোর জন্য মানুষ যখন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষমাণ, চারিদিকে শ্রুতিগোচর হয় শুধু বিহগের কল-কাকলি—এমনি শুভ মুহূর্ত ভারতের পূর্ব দিগন্তে দেখা দিল উষার অরুণোদয়!

ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়ার ক্ষীণচন্দ্ররেখা আভাস দিয়া গিয়াছে এক পরম পরিপূর্ণতার! মানব-সমাজকে, তথা তাহার নিয়ামক ধর্মকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া নহে, আগামী যুগের শান্তি উন্নতি কল্যাণের জন্য আজই একান্ত প্রয়োজন,—এক অখণ্ড মানব-সমাজ—এক উদার-ভাব-সমন্বয়ে গ্রথিত, প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ একটি মানব-পরিবার। একের ক্ষতিতে সকলের ক্ষতি—একের সার্থকতায় সকলের সার্থকতা, চাই এই সমগ্র-জীবন-বোধ—যথা মানব-শরীরে তথা মানব-সমাজে।

উষার অরুণরেখার সোনার কাঠির স্পর্শে সহস্র বৎসরের নিদ্রা মোহ আলস্য কাটাইয়া জাগিয়া উঠিল—একটি দেশ—একটি জাতি, জগৎকে নূতন বাণী শুনাইতে—যে বাণী চিরপুরাতন, যে বাণী তাহার প্রচারিত সেই আত্মার মতই অজর অমর অক্ষয়—সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিসম্পন্ন!

রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর পাশ্চাত্ত্য শক্তি যখন শিক্ষার মাধ্যমে ভারতে তাহার কৃষ্টির অভিযান শুরু করিয়াছে, ঠিক তখনই রাজধানী হইতে দূরে—শিক্ষার কেন্দ্র হইতে অতিদূরে, পাশ্চাত্ত্য নগর-সভ্যতার বিষবাষ্প-বিনির্মুক্ত পল্লী-জননীর শ্যামল কোলে ভারতাত্মা দেহ পরিগ্রহ করিল—বর্তমান যুগের দুই মহাপ্রয়োজনে, প্রথম ভারতকে রক্ষা করিতে হইবে জড়বাদী ভোগ-সর্বস্ব জীবনাদর্শের গ্রাস হইতে, দ্বিতীয়—জাগ্রত ভারতের মাধ্যমে জগৎকে শিখাইতে হইবে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নূতন জীবনাদর্শ।

অপূর্ব অদ্ভুত এই আবির্ভাব! সভ্য-জগতের দৃষ্টির অন্তরালে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল একটি কিশোর, তথাকথিত শিক্ষা ও সভ্যতার স্পর্শমুক্ত—কিন্তু জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। অভাবনীয় অশ্রুতপূর্ব সাধনাপরম্পরায় যৌবন কাটাইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় যখন তিনি এই সভ্যতার মর্মস্থলে আবির্ভূত হইলেন—তখন তাঁহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে—তাহাই সঞ্চারিত হইয়া সূচনা করিয়া গিয়াছে এক নূতন সমাজাদর্শের—যেখানে দেহ-কেন্দ্রিক ক্ষণিক ভোগসুখকে অতিক্রম করিয়া মানুষ চাহিতেছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অচঞ্চল আনন্দ,—যেখানে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সীমা লংঘন করিয়া সমাজ চাহিতেছে এক উদার উন্নত ভাবাদর্শ!

শ্রীরামকৃষ্ণ 'পুরুষঃ পুরাণঃ', তিনিই আবার নূতন মানুষ! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন সেই পুরাতন কথা—কিন্তু নূতনভাবে, নূতন ভাষায়! শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের তত্ত্বও অতি প্রাচীন, কিন্তু তাঁহার সাধনার পদ্ধতি অতি নবীন,—পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানসম্মত পথেই তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনা ও

অনুভূতি। তাহা যদি না হইত তবে তিনি নবযুগের মনোহরণ করিতে পারিতেন না।

সাধনার শেষে যখন তাঁহার অন্তঃশক্তি বাহিরে প্রসারোন্মুখ তখন তিনি চলিয়াছেন—বেলঘরিয়ার উদ্যানে নববঙ্গের ধর্মগুরু কেশবের সন্নিধানে, তাহার 'মন ভুলাইতে'! কেশবের মন 'ইয়ং বেঙ্গল' এর মানসকেন্দ্র! ইতিহাস-অনভিজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে সম্পূর্ণ সচেতন আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। কেশবের মন ভুলিল ভাবমগ্ন পুরুষের আনন্দপূর্ণ হাসি দেখিয়া, অন্তর্মুখী মনের বহিঃসচেতন দৃষ্টি দেখিয়া। কেশবের আচরণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার তন্ময়তা দেখিয়া যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝাইয়া দিলেন, সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে কেশবই 'লেজ-খসা বেঙাচি'র মত জলে স্থলে থাকিতে পারেন,—অর্থাৎ সংসারে ও ঈশ্বরে উভয়ত্র মন দিতে পারেন, তখন তাহার কথার অর্থগৌরবে ও অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতায় মানুষটির নূতনত্ব অনুভব করিয়া 'ইয়ং বেঙ্গল' সেদিন সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলটির প্রতি তাহাদের আকর্ষণ বাড়িতে লাগিল। কলিকাতার অধিবাসীরা সানন্দে সকলকে আহ্বান করিয়া গাহিয়া উঠিল :

'এসেছে নতুন মানুষ—দেখবি যদি আয় চলে!' যাহারা আসিল—তাহারা দেখিল—এক নূতন মানুষ—সর্বদা ভাবে বিভোর—ঈশ্বরকথায় মত্ত—কামকাঞ্চন-সম্পর্ক-শূন্য! সকল মতের সকল পথের সাধক এই নূতন মানুষটিকে তাহাদের অতি আপন মনে করিয়া ভালবাসে।

তাহারা শুনিল—নূতন মানুষের নূতন কথা,—'হ্যাঁ ঈশ্বরকে দেখা যায়, আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি'। তাহারা শুনিল নূতন কথা—'সকল ধর্মই সত্য, সকল মত সকল পথ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়েছে; আমারটি ঠিক, আর তোমারটি ভুল—এইরূপ মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়।'

এই সব অপূর্ব কথায় বজ্রহৃদয়-গোমুখী হইতে যে ভাবগঙ্গাধারা প্রবাহিত হইল—সেই গঙ্গাবতরণের প্রবল প্রপাত জটাভারে ধারণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইল আর একটি নূতন মানুষের। তিনি আসিলেন 'অখণ্ডের ঘর' হইতে—জ্যোতির্ময় ধ্যানলোক হইতে!

শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে উপহার দিয়া গেলেন—নর-ঋষি নরেন্দ্রনাথ, যাহার মাধ্যমে জগৎ শুনিবে—তাঁহার মহাবাণী, বুঝিবে তাঁহার অপূর্ব জীবনের উদার গভীর মর্ম! আর রাখিয়া গেলেন—এই বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো, দৃষ্টির বাহিরে বৃক্ষমূলের মতো, সর্বশরীরে অদৃশ্য প্রাণশক্তির মতো—তাঁহারই উদ্বোধিতা—তাঁহারই সাধনশক্তির জীবন্ত জাগ্রত প্রতিমা—শ্রীসারদা দেবীকে—তাঁহার দেব-মানবতার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান!

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্ব এক দিক দিয়া যেমন চির পুরাতন, অন্য দিক দিয়া নিত্য নূতন; অতি সহজ সরল, অথচ অতি কঠিন গভীর গম্ভীর! সহজতাই ইহার নূতনত্ব নয়, নূতনত্ব ইহার সরলতায়, এবং সুগভীর ব্যাপকতায়!

'ঈশ্বর আছেন' একথা ত আমরা বাল্যাবধি বহু মুখে বহুভাবে শুনিয়াছি, বহু শাস্ত্রে পড়িয়াছি,—অর্ধসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছি, কিন্তু যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে শুনি—'হ্যাঁ গো, ঈশ্বর আছেন, তাঁকে দেখা যায়—আমি তাঁকে দেখেছি—যেমন তোমাকে দেখছি' তখন সংশয়সংকুল যুক্তিবাদ ভাসিয়া যায়।

'তুমিও তাঁকে দেখতে পাবে'—তবে তাঁর জন্য চাই ত্যাগ তপস্যা সাধন ভজন। ইহারও কত কাহিনী পুরাণের পাতায় পাতায় বর্ণিত। নূতন আশার কথা শুনাইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ,—'কলিতে অন্নগত প্রাণ, বেশি কঠোর সহ্য হয় না—ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তিন দিনেই হয়।' এই তীব্র ব্যাকুলতার সাধনা তাঁহার নিজ জীবনেই প্রদর্শিত, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পথে সুদীর্ঘ সাধনার পূর্বেই তীব্র

ব্যাকুলতা সহায়ে মাতৃ-দুগ্ধ-পিপাসু শিশুর মতো ব্যাকুল কাতর আহ্বানেই তাঁহার জগজ্জননী-দর্শন—নূতন করিয়া প্রমাণ করিয়াছে, 'ষড় দরশনে তাঁর না পায় দরশন,'—কিন্তু কাতর ব্যাকুল আহ্বানে ঈশ্বর-দর্শন সম্ভব।

'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি,' 'In my Father's house there are many mansions'—এ কথাও পুরাতন; কিন্তু সেই এক সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ—সাধনার দ্বারা একই জীবনে অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, পরমপিতার ভবনের সব ঘরের সংবাদ রাখেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যকেও তাহার মনের মত ঘরে, তাঁহার ইষ্টলোকে লইয়া যাইতে পারেন,—যার যা ভাব তাহাকে সেই ভাবেই আগাইয়া দিতে পারেন—এরূপ মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন মানুষ!

শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন মানুষ—বলিয়া বুঝাইতে গেলে মনে পড়ে তাঁহারই কথিত কয়েকটি গল্পের নায়ককে, তাঁহাদের ভিতরেই যেন তিনি নিজের স্বরূপ লুক্কায়িত রাখিয়া গিয়াছেন।

বহু পরিচিত বহুরূপীর গল্প। বহুরূপীকে কেহ দেখিল লাল, কেহ নীল, কেহ সবুজ, কেহ হলদে; প্রত্যেকেই সত্য দর্শন করিয়াছে, প্রত্যেকেই ভিন্ন দর্শন করিয়াছে। তর্ক-বিবাদের পর সকলে উপনীত হইল সেই বৃক্ষ-সন্নিধানে, যেখানে তাহারা বহুরূপীকে দেখিয়াছে। সেখানে বৃক্ষতলবাসী একটি সাধু স্বীয় দর্শন ও অনুভূতি দ্বারা তাহাদের আংশিক-সত্য-দর্শনজাত তর্কের অবসান করিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ আমি এই গাছতলায় সর্বদা থাকি—সেই বহুরূপীকে সর্বদা দেখি—সে কখন লাল, কখন নীল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন আবার তার কোন রঙই থাকে না!'

এই ঈশ্বরাশ্রয়ী, সদা ভগবচ্চিন্তানিমগ্ন, বিভিন্ন সময়ে বহুরূপী সত্যের বিভিন্নরূপদ্রষ্টা সাধুই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি!

শহরের উপকণ্ঠে এক অদ্ভুত রঞ্জক আসিয়াছে; একটি পাত্রে রঞ্জন দ্রব্য রাখিয়া সে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে, 'ধৌত পরিষ্কৃত বস্ত্র রঙ করাইয়া লও, যার যে রঙে ইচ্ছা।' আশ্চর্য, একের পর এক—একই পাত্র হইতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী কাপড় রঙাইয়া লইতেছে! ধৌত বস্ত্র শুদ্ধ মন; বিভিন্ন রঙ ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টভাব, কিন্তু কে ঐ অদ্ভুত রঞ্জক? কি তার ঐ অদ্ভুত রঞ্জন-দ্রব্য?

বুঝিতে বিলম্ব হয় না উপমার অন্তরালে নিজেকে লুকাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ—নিজেরই সমন্বয় মূর্তি প্রকাশ করিয়াছেন! জীবনের শেষে নরেন্দ্রের সন্দেহ নিরসনে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিতেছেন 'যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ'। নিজের কোন নূতনত্ব দাবি তিনি করেন নাই; তিনি পুরাতন সত্যের নবতম বিকাশ, বহুধা অনুভূত সত্যের সমন্বিত মূর্তি, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ চিরপুরাতন হইয়াও নিত্য নূতন!

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য

মধ্যযুগের অন্ধকারে বহিরাগত নানা জাতি যখন ভারতদেহ অধিকার করিয়া ভোগে প্রমত্ত, ভারতের কৃষ্টি ও ধর্ম লাঞ্ছিত, অবমানিত, বুঝি বা লুপ্ত হইবার উপক্রম, তখন শ্রীভগবানের অমিয় প্রকাশ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সেই ঘনঘোর অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া ভারতকে সচেতন করিয়াছিলেন স্বধর্ম রক্ষা করিতে। যুগোপযোগী ভাবপ্রবণ ভক্তি-ধর্ম প্রচার করিয়াই তিনি বন্যাবেগে সমাগত উগ্র বিশ্বাসপ্রবণ পরমতাসহিষ্ণু ধর্মের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

শংকরাচার্য-প্রবর্তিত অদ্বৈত বেদান্ত জ্ঞানমার্গের শেষপ্রান্তে অনুভূতির তুঙ্গশীর্ষে অবস্থিত তুষারশিখরের মতো। কিন্তু সাধনচতুষ্টয়হীন সাধারণ সাধক সে পথের শেষে যাইতে না পারিয়া অদ্বৈততত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া যখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্যের মহাভাবকে অহংকারে পর্যবসিত করিয়া বসিল, আবার ওদিকে বৌদ্ধধর্মের নানা সম্প্রদায়

উচ্চতর রীতিনীতি ভুলিয়া কতকগুলি তন্ত্রের আচারে দেশকে ভরিয়া তুলিতেছিল, তখন ভারতীয় সাধনায় নিশ্চয় একটি শূন্যের উদ্ভব হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারত হইতেই আচার্য রামানুজ ও মধ্ব ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া ঐ শূন্য পূর্ণ করিতে প্রথম প্রয়াসী হন, কিন্তু উহাকে মহাভাব ও প্রেমানুভূতি দিয়া পরিপূর্ণ করিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী। তিনি ভারতকে দিলেন—তার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক চৈতন্য। ভারত চিনিল—তাহার স্বরূপ কি, তাহার প্রাণপুরুষ কে, বুঝিল যুগোপযোগী ধর্ম কি, বুঝিল যুগ-যুগব্যাপী তাহার সাধনার মর্মই বা কি।

বহুবিস্তৃত ও বহুবিকৃত তন্ত্রসাধনার ধার দিয়া না গিয়া, দর্শনের দুর্ভেদ্য তর্কজালে জড়িত না হইয়া সহজ সরল জনসাধারণের জন্য তিনি প্রচার করিলেন সহজ সরল ভক্তিধর্ম, কলিযুগপাবন নামধর্ম। 'শিক্ষাষ্টকে'র প্রধান শিক্ষায় তিনি বলিলেন :

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবান, তোমার বহু নাম তো তুমিই করিয়াছ, প্রত্যেকটি নামে নিজের সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দিয়াছ, যে শক্তির বলে জীবের সংসারমোহ কাটিয়া যায়—যে নাম করিলে ভববন্ধন টুটিয়া যায়; যে মাত্র নামটুকু আশ্রয় করে সেই যথার্থ ভক্ত হইয়া জীবন ধন্য করিতে পারে। তোমার এই নাম স্মরণ করিবার নিয়মিত কোন স্থান-কাল নাই—যখন যেখানে খুশি অনুরাগভরে নাম করিলেই হইল; তোমার এত কৃপা, তুমি নিজেকে এত সহজলভ্য করিয়াছ, কিন্তু হায়! আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে তোমার এত নামের একটিতেও আমার অনুরাগ হইল না।

জীবের ভাব নিজেতে আরোপ করিয়া প্রেম-স্বরূপ প্রেমাবতারের এই আক্ষেপ, এই আর্তি—জীবকে শিখাইবার জন্য। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—এই আদর্শও যে তাঁহারই মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই নাম-ধর্ম, উচ্চ সংকীর্তন আপামর জনসাধারণকে আকর্ষণ করিল ঈশ্বরের দিকে, ধর্মের অবনতির গতি রুদ্ধ হইল। যাহাদের ধর্ম ছিল না—তাহারা পাইল নূতন সহজ ধর্ম, উচ্চবর্ণের অত্যাচারে ও দুর্ব্যবহারে যাহারা অন্য ধর্মের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছিল তাহারা বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়ে হিন্দুসমাজেই থাকিয়া গেল। যাহারা স্বীয় স্বার্থে ধর্মকে বিকৃত করিতেছিল তাহারা সমাজ হইতে বিদূরিত হইল, যাহারা যুক্তি তর্কের গোলক-ধাঁধায় পথ হারাইয়া ঘুরিতেছিল, তাহারা প্রশস্ত সরল রাজপথে উপনীত হইয়া লক্ষ্যবস্তু দেখিতে পাইয়া স্বচ্ছন্দমনে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর যাহারা অযথা ভারতের ধর্মকে আক্রমণ করিতেছিল, এদেশের ধর্মভাব বুঝিতে না পারিয়া, তাহাকে হীন মনে করিয়া তাহার উচ্ছেদ-সাধনই নিজেদের পবিত্র ব্রত মনে করিতেছিল তাহারাও শুদ্ধ হইল; ভাবিতে শিখিল—বুঝিতে শিখিল—এদেশের ধর্মেরও মূলমন্ত্র ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস ও শরণাগতি—এ গুলি প্রত্যেক ধর্মেরই সাধারণ সম্পদ কোন ধর্মের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। নাম বিভিন্ন হইলেও ঈশ্বরতত্ত্ব বস্তু এক। মধ্যযুগে এই ভক্তির ধর্ম, প্রেমধর্ম নানাভাবে নানা নামে—ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম সর্বত্র প্রচারিত ও আচরিত হইয়া ভারতের ভাবজগতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সংকটকালে যুগধর্ম রক্ষা করিয়া শ্রীচৈতন্য শ্রীভগবানের 'ধর্মগোপ্তা' নাম সার্থক করিয়াছেন। সেই রাত্রির ঘনান্ধকারে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় না হইলে ভারতে ধর্মের কৃষ্টির সভ্যতার ও সাহিত্যের কি দশা হইত—তাহা অনুমানের অতীত। কিন্তু ভারতাত্মা অমর, তাই যথাসময়ে চৈতন্যচন্দ্ররূপে

উদিত হইয়া অমৃতক্ষরণ দ্বারা ম্রিয়মাণ ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া অনন্তযাত্রার পথে তাহার দেহে প্রাণে তিনি নব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন।

জাতি ও জাতিভেদ

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানকংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীনিবাস তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে ভারতে জাতিভেদের নূতন ও পুরাতন রূপ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ কুফলের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জাতিভেদ যদি দূর করিতেই হয় তো সংস্তরে ইহাকে অস্বীকার করিবার সময় আসিয়াছে, এক জায়গায় অস্বীকার করিয়া অন্যত্র ইহাকে স্বীকার করিলে চলিবে না।

তিনি বলিতেছেন,—'জাতিভেদের প্রতি সকলের এমন একটা নীরব সমর্থন আছে যে—যাঁহারা জাতিভেদের প্রচণ্ড বিরোধী তাঁহারাও ইহাকে সর্বত্র সমাজ-বৃত্তির মৌলিক উপাদান বলিয়া স্বীকার করেন। অনেক নেতার মতে, যে সকল ধর্ম-সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছে—তাহাদের ক্ষতিকারক মনে করা উচিত নয়। রাজনৈতিকরা চান—জাতিভেদ উঠিয়া যাক্‌, কিন্তু ইহার ভোটসংগ্রহ-শক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন; এই খানেই উভয় সংকট! সমাধানের পথে প্রথম পদক্ষেপ—জাতিভেদের ব্যাপকতা স্বীকার করা, এবং ইহার অন্তর্নিহিত স্বরূপ বুঝিতে পারা।'

ইতিহাস আলোচনার সূত্রে তিনি বলিয়াছেন,—"বৃটিশপূর্ব যুগ-অপেক্ষা গত শতাব্দীতে জাতিভেদ শক্তিশালী হইয়াছে। সার্বজনিক বয়স্ক ভোটাধিকারে অনগ্রসর উপজাতিদের রক্ষাকবচ এই ভেদ-ভাবকে আরও শক্তি দিয়াছে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির বিঘোষিত উদ্দেশ্য—'জাতিহীন শ্রেণীহীন সমাজ'। তাহার সহিত আধুনিককালে এই জাতি-ভেদভাবের শক্তিসঞ্চয় বড়ই বিসদৃশ লাগে।"

বৃটিশপূর্ব ভারতে জাতিভেদ আঞ্চলিক সীমায় নিবদ্ধ ছিল। একই অঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তি-অনুসারী ব্যক্তিগণ নিজেরা জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া অপরাপর বৃত্তি-অনুসরণকারী জাতির সহযোগিতায় সমাজ-জীবন গড়িয়া তুলিত। বৃটিশ অধিকারের পর রেল টেলিগ্রাফ ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্বেকার সীমা ভাঙিয়া গেল। বৃটিশ শাসনে নূতন আইন ও নূতন বৃত্তি—নূতন অর্থ-নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ওলট পালট করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে জাতিভেদ দুর্বল হয় নাই, কারণ যাহারা নূতন শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া যুগোপযোগী বৃত্তি অনুসরণ করিয়া নূতন ধনী হইল—তাহারা পূর্বজাতির মধ্যেই সমাজের উচ্চস্তরে উঠিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বণিকশ্রেণীর ব্যক্তিরাই সর্বাগ্রে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও রীতি আয়ত্ত করিয়া চাকুরি, শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে লাগিল—তাহারাই শিক্ষিত নূতন মধ্যবিত্ত সমাজ গঠন করিল। বৃটিশ কিন্তু ইহাদের চাহিয়াও চাহে নাই; তাই মানবিকতার নাম করিয়া তাহারা অনুন্নত জাতিদের জন্য রক্ষাকবচ সৃষ্টি করিয়া, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা দিয়া ভেদনীতির সূত্রপাত করিল; ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নেতৃবর্গও ইহাতে জড়াইয়া পড়িলেন, শাসন ব্যবস্থায় ইহাকে মানিয়া লইলেন।

বর্তমান ভারতে সকলেই চায়—অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হউক, অবহেলিত নিম্নবর্ণেরা সকলের সহিত সমান স্তরে এক হইয়া যাক,—কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে নাম পরিবর্তন হইলেও তাহাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না।

'অস্পৃশ্য' না বলিয়া 'হরিজন' বলিলাম—এবং তাহাদের জন্য পৃথক্ কলোনি করিয়া সেই ত সভ্য ও শিক্ষিত সমাজ হইতে তাহাদের দূরেই রাখিলাম। নিম্নবর্ণ না বলিয়া 'পশ্চাৎপদ' বলিয়া তাহাদের জন্য

যে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহা কি তাহাদের ঐ নামের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে প্রলুব্ধ করিতেছে না?

জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে, সমাজে সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা স্থাপনের পথে, যদি জাতিভেদই প্রধান অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়—তবে আবার 'তপশীলী,' 'অনুন্নত' 'অনগ্রসর' 'উপজাতি' প্রভৃতি নূতন নূতন নামাবলী সৃষ্টির কি প্রয়োজন? বৃটিশের দায়স্বরূপ এই ভেদব্যবস্থা কতদিন জীয়াইয়া রাখিতে হইবে এবং কেন? ইহাতে কি জাতি দিন দিন দুর্বল হইতেছে না? ইহাতে কি 'অনগ্রসর' নামাঙ্কিত ব্যক্তিবর্গকে সুখসুবিধা লাভের আশায় দীর্ঘকালের জন্য অনগ্রসর থাকিতেই প্রকারান্তর উৎসাহ দেওয়া হইতেছে না? ইহাতে কি অনুন্নত নয়—এমন ব্যক্তিকেও সুবিধার জন্য বিশেষ তালিকায় নাম লেখাইতে প্রলুব্ধ করা হইতেছে না? উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় হয়তো তাহারা দুইদিন পিছাইয়া থাকিবে, কিন্তু তৃতীয় দিন হইতে নিশ্চয় তাহাদের সঞ্চিত শক্তি সহায়ে বর্ধিত গতিবেগে তাহারা আগাইয়া চলিবে; স্বোপার্জিত অগ্রগতি তাহাদের স্থায়ী ও যথার্থ উন্নতি আনিয়া দিবে।

জাতি হিসাবে 'পশ্চাৎপদ' প্রভৃতি নাম না রাখিয়া, এবং সেইভাবে সাহায্য-ব্যবস্থা ও জাতীয় সেবায় নিয়োগ-ব্যবস্থা না করিয়া শিক্ষা, জমি, স্বাস্থ্য, বয়স, আয় প্রভৃতির তারতম্যে প্রয়োজন ক্ষেত্রে সাহায্য করিলে এবং জাতীয় সেবার সকল ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে যোগ্যতম ব্যক্তি নিযুক্ত করিলে জাতীয় জীবনের মান এবং কর্মের ও কর্মক্ষমতার মান—অবশ্যই উন্নত হইবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির ঐক্য এবং দেশের সামগ্রিক উন্নতি দ্রুত সাধিত হইবে। ভেদনীতিপরায়ণ বিদেশী-শাসক-নির্মিত প্রকোষ্ঠগুলি ভাঙিয়া দিলে ঐ সকল নামাঙ্কিত ব্যক্তিরা ভারতীয় জনতার সহিত মিশিয়া যাইবে, এবং আসন্ন অগ্রগতির স্রোতে তাহারা আপনিই আগাইয়া যাইবে। তথাকথিত উচ্চ-জাতি ব্রাহ্মণ-কায়স্থের এখন আর এমন অর্থনৈতিক সামাজিক শক্তি নাই যে তাহারা ইহাতে বাধা দিতে পারে। সমগ্র দেশে অধিকার-সাম্যদ্বারাই খণ্ডবিখণ্ড জাতি-ভেদ বিগলিত বিলুপ্ত হইয়া নূতন এক শক্তিশালী মহাজাতির অভ্যুদয় হইতে পারে; নতুবা নানাবিধ জাতিভেদবোধ, প্রাদেশিকতা এবং নিত্যনূতন অর্থ-নৈতিক স্বার্থবোধের ছদ্মবেশে ঐ সকল ভেদভাব আবির্ভূত হইয়া জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবে, জাতীয় জীবনের রক্তধারা বিষদুষ্ট করিবে।

প্রাকৃতিক জাতিবিভাগকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টানিয়া না আনিয়া ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়া যদি আমরা সমাজ হইতে ইহার দূষিত ভেদভাবটি দূরীভূত করিতে পারি তবেই কল্যাণ, নতুবা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ও প্রতিক্রিয়ায় একই সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ বিভিন্ন জাতি পরস্পরকে বিদ্বেষ করিয়া সমগ্র জাতীয় জীবনকেই দুর্বল ও কলুষিত করিবে যাহার ফলে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতি আরো খণ্ড বিখণ্ড হইতে বাধ্য; তাহার আভাষ বিভিন্ন স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, যথা ভারতের পূর্বপ্রান্তে নাগা সমস্যা, ছোটনাগপুরের আদিবাসী-আন্দোলন ও দক্ষিণে দ্রাবিড়-চেতনা। এই সকল খণ্ডচেতনার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া যদি যথা-সময়ে ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিয়া বৃহতের ভাব তাহাদের মধ্যে আমরা সঞ্চারিত করিতে না পারি তবে মহাজাতির স্বপ্ন স্বপ্নেই পর্যবসিত হইবে।

তরঙ্গসংকুল ঘটনাসমুদ্রে জাতীয় তরণী ঠিক পথে চলিতেছে কিনা, স্বামী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার দিগ্দর্শন হইতে তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, এবং প্রয়োজন হইলে দিক পরিবর্তন করিয়া সেই লক্ষ্যে তরণীর মুখ ঘুরাইতে হইবে।

স্বামীজীর স্পষ্টোক্তি: 'জাতিবিভাগ যথার্থ কি, তাহা লক্ষে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে

এমন কোন দেশ নাই—যেখানে জাতি নাই। ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়া উহার অতীত অবস্থায় গিয়া থাকি। জাতিবিভাগ ঐ মূলসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতি-বিভাগ করার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ, তবে দেখিবে এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হইয়াছে এবং আরো অনেককে হইবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হইবে। কাহাকেও নামাইতে হইবে না,—সকলকে উঠাইতে হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিবিভাগের চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ অনেক ভাল। ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে? ইহা সর্বদাই গতিশীল। তবে আধুনিক জাতিভেদ ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক; উহা সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডী কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।'

চিন্তার উন্নতি শিক্ষাসাপেক্ষ; এমন কোন সামাজিক ব্যাধি নাই, যাহা শিক্ষার মোহন স্পর্শে বিদূরিত না হয়। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূর করিবার জন্য ও নিষেধাত্মক বা রক্ষাকবচমূলক পন্থা অপেক্ষা ব্যাপক শিক্ষাপ্রচারের প্রশস্ত রাজপথই যে প্রকৃষ্টতর, এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতের আসন্ন জনজাগরণ মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াই কি স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া যান নাই—'উচ্চবর্ণেরা শূন্যে বিলীন হইয়া যাও, ঐ সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত!'

কেন?

'অনিরুদ্ধ'

নিস্পন্দ মর্মর-দেহে উঠিছে কি কোন প্রাণ-বাণী
গঙ্গার কল্লোল সনে? স্থিরাসনে বসি বদ্ধপাণি
কোন্ সিদ্ধি অভীপ্সায় রহ আজ—জাগে কৌতূহল।
অর্ধ-নিমীলিত আঁখি আজো কি গো হতেছে বিহ্বল
মর্ত্যের বেদনা বহি? অথবা কি শুধুই পাষাণ?
শুধুই কল্পনা-রাশি আমাদের স্তুতি পূজা গান?

কত তো কাঁদিয়া গেলে তপস্যায় করি' ক্ষীণ দেহ
কি যে তব প্রাণে ব্যথা, কেন ব্যথা—বুঝিল কি কেহ?
বুঝিল কি কেন এলে, কি রাখিলে ভবিষ্যৎ লাগি
কেন মাতৃ-অঙ্ক ছাড়ি শত শত সাজিল বৈরাগী?
তবু মিটিল না সাধ? তবু এই মানুষের হাটে
দুর্লভ সঞ্চয় দিতে অযাচিত ফির বাটে বাটে?
কেহ তো দর্শক নাই, কেন তবে আর নৃত্য-গাওয়া
ব্যাকুল প্রতীক্ষা লয়ে কেন আর পথপানে চাওয়া?

যাও যাও রামকৃষ্ণ ফিরি যাও আপনার স্থানে
মায়ার একান্ত ঊর্ধ্বে বস গিয়া স্বরূপের ধ্যানে।
এ পৃথিবী নহে তব গেহ, এ পৃথিবী বড়ই নিষ্ঠুর
যত দিবে, রূঢ় প্রত্যাঘাতে হবে তুমি ততই বিধুর।
তোমার সারল্য স্নেহ আত্মভোলা লোকহিতৈষণা
শুধুই আনিবে টানি ক্রূর স্বার্থ নির্দয় বঞ্চনা।

জানি তুমি বোধিসত্ত্ব ছাড়িবে না হেথা নিজ পণ,
যত ক্ষরে হৃদয়-রুধির তত তব বাড়ে আকর্ষণ
মানব-কল্যাণ প্রতি। তাই আজো নাহি অবসর
মর্মর-মূরতি তাই প্রাণবান—কতই মুখর!
যে আসে তাহারে কয়, "আছি, আছি তোদেরি তো তরে
তোদের মূঢ়তা দম্ভ দৃষ্টির অন্ধতা যদি সরে
আমার নয়নে চাহি। আমার নয়ন-লোর দিয়া
যদি ধুয়ে দিতে পারি কারো কালি, রয়েছি বসিয়া
তাই সুর-নদীতটে; এই মোর জীবন-আকূতি
বালক-সঙ্গীরে ডাকি দিয়াছি যে এই প্রতিশ্রুতি।"

স্বামী প্রেমানন্দের দুইখানি পত্র

(জনৈক ব্রহ্মচারীকে লিখিত)

(১)

৺কাশীধাম

স্নেহভাজনেষু্ ৪.১২.১৯১৬

ন—তোমার শরীর নর্মদাতীরে ভাল আছে জেনে সুখী হইলাম। যেখানে থাক, প্রভু তাঁর ভক্তদের দেখবেনই দেখবেন। তুমি যখন লিখছ জব্বলপুরে plague (প্লেগ) আরম্ভ হয়েছে তখন আমাদের ঐ স্থানে গমন উচিত নয়। যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হয় তথায় কোন সময় লইয়া যাইবেন। শ্রীযুক্ত শৈ—র কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ভগবান তাহাকে শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে পূর্ণ রাখুন—ইহাই প্রার্থনা। যদি সুবিধা হয় শৈ—কে আগামী বড় দিনের ছুটিতে এখানে আসিবার জন্য বলিও। বোধহয় ঐ সময়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিমহারাজ আলমোড়া হইতে এস্থানে আসিবেন। তাঁর দেহ তত ভাল নয়, আবার তার উপর আমাশয় হয়েছে লিখেছেন।

ঠাকুর চরাচর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যে যেখান হতে তাঁকে ডাকিবে সেই প্রভুর অনন্ত কৃপা লাভ করিবে। অশরীরী ভগবান ভক্তের জন্য দেহধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। অশেষ দুঃখকষ্ট অকাতরে আমাদের জন্য সহ্য করেন—এসব প্রত্যক্ষ করেছি, অনুভব করেছি। তাঁকে একান্ত মনে অন্তরে অন্তরে ডেকে যাও—তবেই শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে। বলা ভাল, মিহিজামের মত বাড়াবাড়ি করিও না। কলির জীব, অধিক ভাবভক্তির বেগ ধারণ করতে পারবে না। সময়ে আহার করবে, নিয়মমত নিদ্রা যাবে। কখনও কখনও ভাল সাধুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবে। তর্ক করা ভাল নয়, ওতে ভক্তির হানি হয়। বৃথা তর্ক সর্বত্র পরিত্যাজ্য।

অভিমান ত্যাগ করা অতি কঠিন। নজর রাখবে যাতে ঐ মহাবৈরী নিকটে আসতে না পারে। উহা বহুরূপী—কত রকম বেশেই যে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তার শেষ নাই। সাবধান—খুব সাবধান!

আমার দেহ এখানে ভালই আছে ও শিবানন্দ মহারাজ সুস্থ আছেন। শ্রীযুক্ত মহারাজ বাঙ্গালোর হইতে কন্যাকুমারী দর্শন জন্য গিয়াছেন।...এখানকার কুশল। তুমি কেমন থাক মাঝে মাঝে জানাবে। তুমি আমাদের স্নেহাশীর্বাদ জানিবে এবং শৈ—প্রভৃতি ভক্তদের আমাদের ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে। হও অতি মহৎ, হও অতি উদার।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রেমানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ
বেলুড়
১২.৩.১৯১৭

স্নেহভাজনেষু

শ্রীযুক্ত ন—, তুমি ভাল আছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। এখন মঠে অনেক লোক, তাই বলি তুমি কিছুদিন ৺কাশীধামে বাস কর, আমাদের ইচ্ছা। একান্ত স্থান—এ সময়ে মঠে আদৌ নাই বলিলেই হয়। তুমি চঞ্চল হইবে না এ সময়। আমাদের মনে ভগবদ্‌ভক্তি-বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই যখন নাই তখন কাহাকে ভয় করিব? কেন করিব? ভালবাসায় জগৎ জয় হয়, বিশ্ব জয় হয়। চাই পবিত্র নিষ্কাম ভালবাসা। ঐ ভালবাসাই ভগবান, ভক্তিবিশ্বাস।

শরৎ মহারাজের সঙ্গে গত শনিবার লাট সাহেবের দেখা হয় লাটভবনে। এক আসনে বসাইয়া কথা হয় প্রায় দুই ঘণ্টা। বিশেষ খাতির করেছিল।··· জজ উডরফ কল্য মঠে আসিয়াছিলেন সস্ত্রীক,···খুব খুশী হইয়া গিয়াছেন বোধ হয়। তোমরা সকলে কেমন আছ? আমার ভালবাসা সকলকে জানাইবে এবং তুমি জানিবে। ভগবান তোমাদের পবিত্রতায় পূর্ণ রাখুন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত তুরীয়ানন্দ স্বামী ও শিবানন্দজী ভাল আছেন, আর সকলেও ভাল। মাঝে গিয়াছিলাম মেদিনীপুর। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

ধ্যান ও প্রার্থনা

স্বামী পবিত্রানন্দ

'আমাদের সব প্রার্থনাই কি পূর্ণ হয়?' কোন না কোন সময়—প্রায় সকলের মনেই এই প্রশ্ন জাগে। এক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন ঠিক এমন প্রশ্নই করিয়াছিলেন, প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "আমি একশত বার বলিব যে, প্রার্থনা পূর্ণ হয়।" যাঁহাদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতি হইয়াছে তাঁহারা বিনাদ্বিধায় এইরূপ আশ্বাস-বাণীই উচ্চারণ করিবেন। তাঁহারা বলেন, আমরা যাহা চাই তাহা অক্লেশেই পাইতে পারি। এখন দেখিতে হইবে প্রার্থনার কত প্রকার ভেদ ও স্তরবিন্যাস আছে, কি কি শর্ত পালিত হইলে ঈশ্বর আমাদের সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করেন, এবং সাধু-সন্তগণের এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নিজ নিজ জীবনে আমরাও উপলব্ধি করিতে পারি।

প্রথম প্রশ্ন: প্রার্থনা কি, এবং কিরূপেই বা ইহা পূর্ণ হয়? দর্শনের ভাষায় বলা যাইতে পারে, তীব্র চিন্তার দ্বারা আমরা ব্যক্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করি, সর্বব্যাপী সত্তার সহিত একীভূত আমাদের হৃদয়স্থিত সত্য বস্তুকে স্পর্শ করি। যে বিশ্বমন হইতে জগতের যাবতীয় বস্তু শক্তি আহরণ করিতেছে তাহার সহিত আমাদের মন একীভূত হইয়া যায়, এবং সেই বিশ্বমনই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর দেন।

ভক্তিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা সেই একই

সত্যবস্তুকে, সাকাররূপে কল্পনা করি, এবং বলি, আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং তিনিই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছেন। আমাদের ধারণা-অনুযায়ী ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, অতএব তিনি সমস্ত প্রার্থনাই পূর্ণ করিতে সক্ষম। আমরা তাঁহাকে আমাদের পিতা অথবা মাতা-রূপে কল্পনা করিয়া থাকি। মনুষ্য-সমাজে সকল পিতা-মাতাই যেমন তাঁহাদের সন্তানকে স্নেহ করেন, এবং তাহাদের সকল অভাব দূর করেন, তেমনি ঈশ্বরের নিকটও আমরা যাহা চাহিব, তাহা নিশ্চয়ই পাইব ; তিনি আমাদের কোন অভাবই অপূর্ণ রাখিবেন না।

প্রার্থনা কত প্রকার হইতে পারে? আমরা প্রার্থনাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম প্রকার আবেদনমূলক, ইহাতে আমরা ঈশ্বরের নিকট 'এই দাও, ঐ দাও' বলিয়া প্রার্থনা করি। দ্বিতীয় প্রকার প্রশংসামূলক। ঈশ্বর চন্দ্র, সূর্য, ছয় ঋতু প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করি। তৃতীয় প্রকার প্রার্থনায় আমরা কেবল ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপস্থিতিই প্রার্থনা করি। শেষোক্ত প্রার্থনাই সর্বোৎকৃষ্ট।

অনেকে চীৎকার করিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ঈশ্বর যেন নিশ্চয়ই তাঁহাদের কথা শুনিতে পান। এক সময়—যখন আমি কলিকাতায় কোন এক আশ্রমে থাকিতাম, তখন ঠিক পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক প্রতিবেশিগণের যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করিয়া রাত্রিকালে জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। উচ্চৈঃস্বরে আমরা যাহা খুশি বলি না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না; অন্তরের সহিত যেটুকু বলিব সেইটুকুই ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য হইবে। সাধনার প্রারম্ভে—সাধরণতঃ আমরা বাক্যের দ্বারা প্রার্থনা করি, ক্রমে বাক্যের যে কোনই প্রয়োজন নাই আমাদের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা জন্মায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টধর্মের অনেক মরমী সাধকের মতে : আভ্যন্তরীণ প্রশান্তিই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ; তখন বাহিরের গ্রহণযোগ্য সকল বস্তু হইতে, আমাদের চিত্ত সরিয়া আসে পবিত্র নির্জনতায়, জ্বলন্ত বিশ্বাসে এবং বিনীত আত্মনিবেদনে। সাধক তখন ঐশ্বরিক সান্নিধ্যলাভের জন্য ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করে। পবিত্র আত্মার, অমূল্য প্রভাব লাভ করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। অবিরত অধ্যবসায়ে লভ্য এইরূপ অনুভূতির জন্য তুমি যখন একান্তে সরিয়া আস, তখন চিন্তা করিবে—তুমি যেন সেই ঐশ্বরিক সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছ, এবং তোমার সমস্ত দৃষ্টি কেবল তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মনে করিবে—তুমি তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছ এবং তিনি যাহা দিবেন তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ। সেই সঙ্গে ধীরভাবে, তোমার চিত্তকে অপূর্ব প্রশান্তি এবং শুদ্ধতায় ভরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। তোমার সমস্ত যুক্তি-তর্ক বিসর্জন দিবে, এবং স্বেচ্ছায় কোন কিছুর উপর চিত্তকে নিবদ্ধ করিবে না সে বস্তু তোমার নিকট যতই ভাল এবং কল্যাণকর বলিয়া মনে হউক না কেন। অনাবশ্যক কোন চিন্তার উদয় হইলে, মনকে ধীরভাবে সরাইয়া লইবে এবং এইরূপ বিশ্বাস ও ধৈর্য-সহকারে সেই ঐশ্বরিক সান্নিধ্য অনুভব করিবার জন্য অপেক্ষা করিবে।

সকল ধর্মশাস্ত্রেই প্রার্থনার নির্দেশ আছে, তবে প্রার্থনার কয়েকটি বিশেষ প্রকার ভেদকে অধিক মূল্য দেওয়া যাইতে পারে। যেমন বেদে বিভিন্ন দেবদেবী অথবা একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের নিকট, বহু প্রকার প্রার্থনার ইঙ্গিত আছে। বেদের জ্ঞান-কাণ্ড উপনিষদে ধ্যানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ধ্যান হইল অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় চিত্তকে সেই সত্যবস্তুর সহিত যুক্ত রাখা। সমগ্র আধ্যাত্মিক জীবন-বিকাশের এই যে সার কথা উপনিষদের একটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে : সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহের যিনি অধিকর্তা

এবং যিনি আমাদের হৃদয়ে আসীন, তাঁহাকে আমরা মনের দ্বারা জানিতে পারি। যিনি সমাহিত চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সেই সর্বব্যাপ্ত কল্যাণপ্রদ অজরামর অখণ্ড সত্তার মহিমা উদ্ভাসিত হয়।

এই অংশে প্রার্থনার কোন উল্লেখ নাই। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যখন আমরা হৃদয়স্থিত ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করি তখন দেখি—তিনি কল্যাণমূর্তিতে সমগ্র বিশ্ব চরাচর আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন। অবশ্য এখানে এই 'জ্ঞান' কথাটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা আমরা যে কোন জ্ঞানই লাভ করি না কেন, তাহা অজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। সেই সত্য বস্তুর জ্ঞান সাধারণ মানুষের মন ও বুদ্ধির অতীত। "তাহা হইলে মনের দ্বারা, আমরা তাঁহার জ্ঞান লাভ করি" এই কথাটির অর্থ কি! উপনিষদ এস্থলে সেই সর্বকলুষমুক্ত শুদ্ধ মনের কথা বলিতেছেন, যে মন আধ্যাত্মিক সাধনায় উৎসর্গীকৃত। যে মুহূর্তে আমরা হৃদয়স্থিত চরাচরব্যাপ্ত সেই অখণ্ড সত্তার জ্ঞান লাভ করি, সেই মুহূর্তে আমরা নিজেদের জন্মমৃত্যুর পারে, অবিনাশী আত্মা বলিয়া অনুভব করিতে থাকি। উপনিষদ এই ভাবটিকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, অবশ্য দু'এক স্থলে প্রার্থনার কথাও বলিয়াছেন।

বুদ্ধও আবেদনমূলক প্রার্থনা অপেক্ষা এই ধ্যানের কথাই বেশি বলিয়াছেন। কিন্তু মূলতঃ ধ্যান ও প্রার্থনায় কি কোন প্রভেদ আছে? উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারি, হৃদয়স্থিত সত্য বস্তুতে চিত্ত সন্নিবদ্ধ করাই ধ্যান। আবার সর্বোত্তম প্রার্থনায় আমরা সেই একই অন্তর্নিহিত জ্ঞানাতীত সত্যবস্তুকেই সাকাররূপে কল্পনা করি, এবং তাঁহাকে লাভ করিবার এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত হইবার প্রার্থনা জানাই। আধ্যাত্মিক উন্নতির ঐ পর্যায়ে আমরা কখন জাগতিক বা বৈষয়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করি না। তিনি আছেন—এইটুকু জ্ঞানই তখন যথেষ্ট। অর্থাৎ প্রার্থনা এবং ধ্যান, সেই অখণ্ড সত্তারই নিকট উপনীত হইবার বিভিন্ন পথ মাত্র। সর্বোচ্চ স্তরে উভয়েই সমান।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের মধ্যে কয় জন বুদ্ধের মত বা উপনিষদের আদর্শে ধ্যান করিতে পারে। অধিকাংশ ব্যক্তিই বহু শিক্ষার পর ধ্যান করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশ্য যাঁহাদের চিত্তে সেই সত্যবস্তু প্রতিফলিত হইয়াছে, তাঁহারা স্বভাবতই সেই উচ্চভাবে অবস্থান করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ধ্যানমগ্ন থাকিতেন তখন তাঁহার চিত্ত উচ্চ জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করিত, এবং তিনি কেবল আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যাইতেন। সেই সময় বহির্জগতের সহিত তাঁহার কোন রূপ যোগ থাকিত না; কিন্তু তিনি যখন আবার সাধারণ-জ্ঞানভূমিতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি, দ্বৈত এবং অদ্বৈত—উভয় ভূমিতেই বিচরণ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ সাধককে, বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া ধ্যানী হইতে হয়।

একটি সংস্কৃত কবিতায় সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে চারিটি সোপান অতিক্রম করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় কিছু কিছু ধর্মাচরণ করিতে হয় যেমন—সন্ধ্যা, পূজা প্রভৃতি; ইহা ধর্মের বাহ্য রূপ। পরবর্তী অবস্থায় ভগবদনুরাগের জন্য প্রার্থনা করিতে হয়, এবং সেই সঙ্গে ভজন সঙ্গীত। তৃতীয় পর্যায়ে ধ্যান; অর্থাৎ চিত্তকে বিশেষ একটি চিন্তায় নিবদ্ধ রাখিবার অভ্যাস সাধন করিতে হয়। চতুর্থ অবস্থায়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপস্থিতি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হয়। ঐ অবস্থায় আমাদের ধ্যান করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না; বস্তুতঃ ধ্যান করা তখন অসম্ভব হইয়া

পড়ে, কারণ যে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্ম আমাদের এই উত্তম, তাহাই আমরা লাভ করিয়াছি।

এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে, আমাদের কতকগুলি শর্ত অবশ্যই পালন করিতে হইবে। জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রেই—বিশেষত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এইরূপ কতকগুলি শর্ত মানিতে হয়। যথার্থ প্রণালী অনুসরণ এবং শর্তগুলি যথোপযুক্ত-ভাবে পালন করা না হইলেই ফললাভে তারতম্য ঘটে। ঋষিগণ যখন নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতে বলেন, 'প্রার্থনা সহজেই পূর্ণ হয়' তখন তাঁহারা ধরিয়া লন—শর্তগুলি ইতঃপূর্বেই যথাযথরূপে পালিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ প্রার্থনাকালে যথার্থ ব্যাকুলতা আনা চাই। সাধারণ লোকে প্রার্থনা করে না এবং প্রার্থনায় তাহাদের কোন আস্থাও নাই, কারণ তাহারা অহঙ্কার ছাড়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ আমরা মনে করি—আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই আমরা সব কিছু করিতে পারি, ততক্ষণ আমাদের প্রার্থনার সাহায্য নিষ্প্রয়োজন; এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে না পারিলে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার কোন আশা নাই। অন্তরের অন্তস্তল হইতে প্রার্থনা করিবার জন্ম ব্যাকুলতা আনিতে হইবে।

মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে দুইটি প্রধান সমস্যা মানুষকে পীড়িত করে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল অসহায়ভাব এবং দ্বিতীয়টি হইল পাপবোধ। যদি প্রকৃতই আমাদের এই বোধ জন্মে যে, জীবনের সমস্ত কিছুই কোন স্থির লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবার পূর্বেই আমাদিগকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখনই আমরা একটি নির্ভর আশ্রয়ের জন্ম ব্যাকুল হই। পাপবোধের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রতি পদে সত্য ও শান্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যখন বিরক্তি ও নিরাশায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়, তখন আমরা এমন একটি আশ্রয়ের জন্ম ব্যাকুল হই—যাহা আমাদের শক্তি জোগাইবে, তখন প্রার্থনার জন্ম যথার্থ ব্যাকুলতার উদয় হইবে।

ঐ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলেই আমরা একাগ্র হই। যখন আমাদের এই জ্ঞান হয় যে এমন একটি শক্তি আছে, যাহা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে—তখনই আমাদের প্রচেষ্টা একনিষ্ঠ হয়। অনেকের নিকট 'ঈশ্বর' সামান্য একটি শব্দ মাত্র, কিন্তু প্রকৃত উপাসক যতক্ষণ না তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তিনি বিচ্ছেদের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। যখন এই প্রকার ব্যাকুলতার উদয় হইবে, তখনই আমরা আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি করিতে পারিব। নিদারুণ বেদনার জ্বালায় জীবন যখন আমাদের নিকট দুর্বিষহ হইয়া উঠে—তখন বুঝিতে হইবে, সেই শ্রেয় বস্তু নিশ্চয় আমরা লাভ করিব। বস্তুতান্ত্রিক জগতেও, সাফল্য লাভ করিতে হইলে ঠিক এইরূপ ব্যাকুলতার প্রয়োজন হয়। অকপটে আমরা যাহা চাহিব তাহাই পাইব। চিত্ত যখন দৃঢ় হইয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিও ব্যয় করিয়াছি, তখন ফল আমরা নিশ্চয়ই লাভ করিব। সে সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছুই করিতে হয় না। কেবল প্রারম্ভেই কিছু উত্তমের প্রয়োজন, তাহার পর তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে অবশিষ্টটুকু আপনিই হইয়া যায়।

অপর আর একটি শর্ত হইল—প্রার্থনার নিয়মানুবর্তিতা। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করা উচিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে "ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজমান এবং কালাতীত, অতএব যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে তাঁহাকে ইচ্ছামত প্রার্থনা করা চলিবে না কেন?" কিন্তু প্রকৃত বিষয় হইল, যদি অন্ত আমরা প্রাতরাশের পর প্রার্থনা করি, এবং আগামী কল্য শয্যাগ্রহণের প্রাক্কালে, এবং তৃতীয় দিনে কর্মস্থলে কাজের ফাঁকে, তাহা হইলে প্রার্থনা ক্রমশঃ বাহ্য হইয়া পড়ে। উপরি-উক্ত পন্থায় অগ্রগতির আশা অতি অল্প।

মনকে নিয়মনিষ্ঠ করিতে হইবে, এবং প্রার্থনার অভ্যাস অনুশীলন করিতে হইবে। অনেকে বলেন তাঁহারা প্রার্থনা করিতে পারেন না। প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের এই কথাই বলা যাইতে পারে, নিরাসক্ত ভাবে প্রার্থনার চেষ্টাটুকু মাত্র করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য আর কোন পথ নাই।

অধিকন্তু স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সারাদিন ধরিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রাতঃকালে অর্ধঘণ্টার জন্য পবিত্রভাব অবলম্বন করিয়া বাকি দিন তাহার বিপরীত আচরণ করিলে চলিবে না। সর্বসময় আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা না হইলে আমাদের সকল প্রার্থনা বাহ্যাড়ম্বরে পর্যবসিত হইবে।

উপরন্তু, প্রার্থনায় আমাদের আস্থাবান্ হইতে হইবে। অবশ্য বিশ্বাস—একবারেই আসে না। প্রথমে কিছু অবিশ্বাস লইয়াই দৈনিক নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে বিশ্বাস জন্মাইবে। ইহা একপ্রকার আধ্যাত্মিক বিকাশ, এবং যাহারা নিত্যশুদ্ধ প্রকৃত বিশ্বাসীর সঙ্গ করিয়াছে, তাহারা প্রকৃতই ভাগ্যবান্। ধর্মোপদেশের অন্তর্নিহিত সত্য যে ঋষি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গ করিলে আমাদের অবিশ্বাস দূরে পালায়। সাধুসঙ্গ ছাড়াও—আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন বিকশিত করিবার চেষ্টা করিতে পারি এবং বিশ্বাসও লাভ করিতে পারি।

অনুশীলনের দ্বারা বিশ্বাস বর্ধিত হয়। আমাদের আস্থা যতই বাড়িবে, আধ্যাত্মিক নিয়মপালনেও আমরা ততই একনিষ্ঠ হইব। যতই ফল লাভ করিতে থাকিব, ততই আমাদের আকাঙ্ক্ষা বাড়িবে। উষাকালে পূর্বাকাশের রক্তিমাভা যেমন সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ঘোষণা করে, তেমনি আধ্যাত্মিক উন্নতির সামান্যতম স্ফুরণে, চরম সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা বিশ্বাসবান্ হই, এবং সেই সত্য বস্তু লাভ করিবার জন্য নব প্রেরণা লাভ করি। একনিষ্ঠ ও অকপট চেষ্টায় আমরা চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি, পূর্ণতার আস্বাদ লাভ করিতে পারি।

কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়—এতক্ষণ তাহাই আমরা আলোচনা করিলাম। প্রার্থনায় কি হয়? ইহা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু কেবলমাত্র কলাকৌশলের দ্বারাই সর্বসময়ে উন্নতি করা সম্ভবপর হয় না। বন্যা হইলে চতুর্দিক জলে ভাসিয়া যায়, তখন আর কূপ খনন করিবার প্রয়োজন হয় না। তেমনি গভীর আধ্যাত্মিক পিপাসা এবং অকৃত্রিম অনুরাগ জাগিলে কলা-কৌশল অনাবশ্যক হইয়া যায়। আমাদের সমস্ত অন্তর ঈশ্বরানুভূতির জন্য ধাবিত হয় এবং সত্যবস্তু লাভ করে।

পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়, ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়, ভাবের চেয়ে মহাভাব, প্রেম বড়। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

যতপ্রকার অবস্থা আছে, তন্মধ্যে ধ্যানাবস্থাই জীবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। যতদিন বাসনা থাকে, ততদিন যথার্থ সুখও আসতে পারে না। যখন কোন ব্যক্তি ধ্যানাবস্থা হইতে সমুদয় বস্তু সাক্ষী-ভাবে পর্যালোচনা করিতে পারেন, তখনই কেবল তাঁহার প্রকৃত সুখলাভ হয়। ইতরপ্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে। মানুষের সুখ বুদ্ধিতে, আর দেবমানব আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

"লহ মোর প্রণতি আভূমি"

অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পঞ্চতীর্থ

অরুণের অরুণিমা দিলে দেখা, পূর্বদিগঞ্চলে
অমার আঁধার ভেদি, মাতৃমন্ত্র গেয়ে উচ্চরোলে।
অগণিত মানবেরে জাগাইতে এসেছিলে তুমি,
অমরার প্রিয়পুত্র! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ১

আষাঢ়ের সন্ধ্যাকাশ—লুপ্ত রবি-শশি-তারাগণ—
আনিল আঁধার চক্ষে। দৈন্য-আর্তি-ব্যথা অনুক্ষণ
আশ্রিতের বক্ষ হতে বিদূরিলে নিজগুণে স্বামি,
আশ্রিতপালক প্রভো! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ২

ইহধামে এলে যবে কৃপা করি ত্যজি দিব্যধাম
ইতরজনের লাগি, হ'ল তারা পূর্ণমনস্কাম।
ইতিকথা শুনিবারে এল ছুটি কত জ্ঞানী গুণী
ইন্দিরার প্রাণধন! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ৩

ঈশান হে! এসেছিলে ল'য়ে সঙ্গে তোমার ঈশানী,
ঈক্ষণে যাহার জানি মুছে যায় সর্বক্লেদগ্লানি,
ঈর্ষা দ্বেষ মলিনতা দূর করি কোলে নিলে টানি
ঈপ্সিত সেবকজনে; লহ দেব! প্রণতি আভূমি ॥ ৪

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত" বাণী
উমানাথ! দিলে কর্ণে মানবের; জাগালে আপনি।
উদ্ধার করিলে সবে অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি দানি'
উত্তুঙ্গ আলোকতীর্থে—লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ৫

ঊষার আলোক নামি সুবিশাল জলধির বুকে
ঊর্মিমালা সাথে দোলে, হেরি তোমা আপনার সুখে।
ঊর্ধ্বগ হইয়া ধায় ধোয়াইতে শ্রীচরণখানি
ঊর্মিলা-প্রাণের প্রাণ! লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ৬

ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাদেবী পেয়ে পূজা নানা উপচারে
ঋষিগণে দেখা দিয়া করে বাস তাঁদের অন্তরে।
ঋত্বিক হে ! সেই দেবী এসেছিল সারদারূপিণী
ঋষিরাজ ! তব সাথে ; লহ দোঁহে প্রণতি আভূমি ॥ ৭

এল ছুটে বিবেক রাখাল—লাটু হরি—শরৎ সারদা
এল কত ভক্ত যারা, জন্মে জন্মে সঙ্গে ছিল সদা।
একান্ত আপন জানি সকলেরে বুকে নিলে টানি
এ অধমে কর কৃপা ; লহ লহ প্রণতি আভূমি ॥ ৮

ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ভক্তি কারে বলে, কিবা শুদ্ধ মন—
ঐশীশক্তি কি সে বস্তু, জানি নাই ওহে তপোধন।
ঐতিহ্য হারায়ে গেছে, ফিরিতেছি আমি দিবা-যামী
ঐহিক সুখের লাগি ; ক্ষমি, লহ প্রণতি আভূমি ॥ ৯

ওপারে আলোর তীর্থ, এপারেতে ঘন অন্ধকার
'ওঠ চল' বলি কেবা ল'য়ে যাবে পঙ্গুরে এবার।
'ওখানে যে তোর ঠাঁই, কেন মিছে কাঁদিস বাছনি ?'
ওহে নাথ ! কে বলিবে ? লহ দেব ! প্রণতি আভূমি ॥ ১০

ঔদ্ধত্য মাৎসর্য ঈর্ষা ক্রোধ আর ক্রূরতা নীচতা
ঔদাসীন্য, আধিব্যাধি নাশিয়াছে চিত্তের স্থিরতা।
ঔষধ প্রদানি তীব্র, কর দূর যত পাপ-গ্লানি
ঔচিত্যের করহ বোধন, লহ মোর প্রণতি আভূমি ॥ ১১

তিনি মানুষ হয়ে—অবতার হয়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়। বাউলের দল হঠাৎ এলো ;—নাচলে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো গেল, কেউ চিনলে না।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংসদেব ও সংসার-জীবন

ডাঃ এস্. আহাম্মদ চৌধুরী

এই সংসার-জীবনে মানুষের দুঃখকষ্ট ভাবনা-চিন্তা অভাব অভিযোগ রোগশোক এই সকলের বিরুদ্ধে সতত সংগ্রাম করে চলতে হচ্ছে। এই যে বেঁচে থাকার সংগ্রাম এই তো জীবন! এমন দুঃখময় সংসারে বাস করা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি? তবু "কম্বলকে আমি ছাড়ছি, কম্বল তো আমায় ছাড়ছে না" বলে গল্পের সেই ভল্লুকের মত সংসারে আমরা জড়িয়ে আছি। অষ্টপাশ যেন বেতের কাঁটা, সর্ব শরীরে আঁকড়ে ধরে আছে। ঠাকুর তাঁর স্বাভাবিক সরল কথায় উটের উপমা দিয়েছেন, "উট কাঁটা ঘাস খেতে খুব ভালবাসে। মুখ দিয়ে দর্ দর্ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তবু সে কাঁটা ঘাস খাচ্ছে। সংসারী লোক এত কষ্ট ভোগ করছে, তবুও তার চৈতন্যোদয় হচ্ছে না।"

এই সংসারে শান্তি কোথায়? এখানে এলাম কেন? সৃষ্টিকর্তা কি তবে নিষ্ঠুর? আমাদের দুঃখ দেওয়াই কি তাঁর উদ্দেশ্য? মন যখন এই সকল কথার বিচার করতে বসে তখন তাঁর ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে এই সকল কথার সমাধান খুঁজে পায় না। নিরাশার স্রোতে ভেসে যায়। কিন্তু মনকে যাঁরা আরও উর্ধ্বে চালিত করে সকল কারণের মূল কারণ ভগবানের সাথে যোগ করেছেন, তাঁরাই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, সমস্যার সমাধান করে গেছেন। পরমহংসদেব কথাটা এমন সুন্দর করে উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, বিদ্বান ও মূর্খ উভয়েরই তা বোধগম্য। তিনি বলেছেন, "সংসার শুধু কর্মক্ষেত্র, এটা চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। এখানে কাজ করে স্বধামে অর্থাৎ ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হবে। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কলকাতায় কর্ম করতে আসা।" কর্ম কি? যা কিছু ভগবানের উদ্দেশ্যে করা যায় তাই কর্ম। শ্রীগীতার কথায়—কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা না করে, ভগবানে তা সমর্পণ করে কর্ম করতে হবে। এ ছাড়া অন্য ভাবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাজ করলে তাহা অকর্মে পরিণত হবে; যেন ভস্মে ঘৃতাহুতি। কোরানে আল্লা বলেছেন, "আমি জীবকে আমার উদ্দেশ্যে, আমার আরাধনা-জ্ঞানে কর্ম করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করে জগতে পাঠাইনি।" তাই প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে "বিছ্ মিল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি" এই কথা বলে কাজে হাত দেওয়ার নির্দেশ আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমায় দিয়ে তোমার লীলা হবে
তাই তো আমি এলাম ভবে"

এমনি ভাবে ভগবানে সমর্পণ করে কাজ করলে জীবের ভাবনা অহংকার কমে যায়, কর্মে উৎসাহ হয় এবং সাফল্যে আত্মাভিমান ও বিফলতায় অবসাদ বা নৈরাশ্য আসে না। ঠাকুর বলেছেন, "সংসারে বাড়ীর দাসীর মত থাকবি; মনিবের ছেলেকে সে বলে আমার 'হরি', আমার 'যদু', কিন্তু মনে মনে জানে যে, এরা তার কেউ নয়। মনিবের বাড়ীতে চাকরি করে, কিন্তু মন পড়ে থাকে তার দেশের নিজ বাড়ীতে। হাঁস আর পানকৌড়ী জলে থাকে, কিন্তু জল তাদের গায়ে লাগে না। পাঁকাল মাছ কাদায় থাকে, কিন্তু তার গায়ে কাদা লাগে না। সংসারে চিনিতে বালুতে মিশে আছে। পিঁপড়ের মত চিনিটুকু বেছে নিতে হবে।"

ঠাকুর ছুতোরের মেয়ের উপমা দিয়েছেন, "ও দেশে ছুতোরের মেয়েরা এক হাতে ঢেঁকিতে ধান নেড়ে দেয়, চিঁড়ে কোটে;

আবার সময় সময় উনুনের কাঠ ঠেলে দিচ্ছে, ছেলেকে মাই দিচ্ছে, আবার পাওনাদারের কাছে পয়সা নিচ্ছে। এত যে কাজ এক সঙ্গে করছে তবু মন রয়েছে মুশলের দিকে।" ও দিকে একটু অন্যমনস্ক হলে হাত থেঁতলে যাবে। নষ্ট মেয়ের উপমা দিচ্ছেন, "নষ্ট মেয়ে সারাদিন সংসারের কাজ করছে, কিন্তু মন রয়েছে উপপতির দিকে। এমনি করে ভগবানের দিকে মন রেখে নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকতে পারলে তবেই সংসারের দুঃখ কষ্ট মনকে স্পর্শ করতে পারে না। এমনি ভাব মনে আনতে পারলে তবেই ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদের ভাষায় বলা যায়—

"এই সংসার মজার কুঠি
আমি খাই দাই আর মজা লুটি"

তা না হলে "এই সংসার ধুখের টাটি।" বদ্ধ জীবের সংসারজীবনকে ঠাকুর তাই আমড়ার সাথে তুলনা করেছেন, 'আমড়ার শুধু অাঁটি আর চামড়া, খেলে হয় অম্লশূল।' তিনি বলেছেন, "মন নিয়েই কথা। মনের যেমন ভাব, যেমন লাভ। মন ধোপা ঘরের কাপড়ের মত। যে রঙে রঞ্জিত করবে সেই রঙই ধারণ করবে।" কোরান বলেছে "আল্লার রঙে রঞ্জিত হও।" যীশুখ্রীস্ট বলেছেন "Be perfect as thy father in heaven is perfect" অর্থাৎ স্বর্গীয় পিতা ভগবানের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন হও, ইহাই আসল Baptism (দীক্ষা)। যদি বলা যায় "হে রঙের মালিক, তোমার নিজের রঙে আমায় রঙিয়ে দাও" তবেই দোলপূজার আবির মাখা সার্থক হয়।

কৃচ্ছ্রসাধনার দরকার, তীব্র বৈরাগ্য ব্যাকুলতা হলে তবেই তাঁর দয়া হয়। তাঁর কৃপা হলেই ত সকল দুঃখের শেষ হয়। পরমহংসদেবের ভাষায় "যেন বহুকালের অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কেউ আলো জেলে দিল।" মনকে আত্মমুখী করতে না পারলে সংসারের দুঃখ কষ্টে নির্বিকার ভাব হতে পারে না। স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, "তুমি মনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সুখকে দুঃখে এবং দুঃখকে সুখে পরিণত করতে পার।" তাই সংসারমুখী মনকে বিবেকরূপ লাগামে বেঁধে, জ্ঞান ও প্রেমের দিকে টেনে আনতে হবে। সংসারী লোকের কি কোন গতি নেই? ঠাকুর তাই ভক্ত অধরকে আশার বাণী শুনাচ্ছেন: "সংসারে থেকে হবে না কেন? তিনিই পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা দীন দুঃখী প্রতিবেশী হয়ে তোমার সেবা গ্রহণ করছেন। জীবের সেবায় তাঁরই সেবা করা হচ্ছে, এই জ্ঞান নিয়ে সংসারে সকল কাজ করে যাবে। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে নির্জনে প্রার্থনা করবে,—মা, আমার কর্ম কমিয়ে দাও। এক হাত তাঁর পাদপদ্মে রাখবে, আর এক হাতে সংসারের কাজ করবে। যখন অবসর পাবে তখন দুখানি হাতই তাঁর চরণে রাখবে। তাঁর প্রতি ভালবাসা এলে সংসারের সুখ আলুনি লাগবে।" সংসারের দুঃখ ও যাতনা মনকে স্পর্শ করে আর বিচলিত করতে পারবে না। মনকে যে এই ভাবে নির্লিপ্ত করে সংসারের কাজ করে যেতে পারে কর্ম তার বন্ধনের কারণ হয় না। শ্রীগীতার সার কথা এই নিষ্কাম কর্ম। কর্মে কর্তৃত্বাভিমান থাকলে সে কর্ম দুঃখের কারণ হয়। কিন্তু তোমার কাজই আমি করছি, আমার আবার ইচ্ছা কি? তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ঠাকুর বলতেন "আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার। যেমন করাও তেমনি করি।" আগুনের তাপে চাল, ডাল, আলু, পটল উনুনের উপর হাঁড়ির মধ্যে লাফালাফি করছে কিন্তু উনুনের নীচে থেকে জ্বালানি কাঠ টেনে নিলেই সব নিস্তব্ধ। ঠাকুরের এই কথার ভাবটি মনে রেখে কাজ করলে কাজ করতে বেশ উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপন ব্যাখ্যার বস্তু নহে, অনুভূতির আনন্দ। মনে সেই আনন্দ এলে সংসার আর দুঃখময় থাকে না। সংসারী লোকের পক্ষে ঠাকুরের কথামৃত তাই নবজীবন-রসায়ন-স্বরূপ।

দক্ষিণেশ্বর

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় ভাস্বর,
স্মৃতির মূর্ত তীর্থধাম ঐ নিত্যধাম ঐ চিরাবিনশ্বর
দক্ষিণেশ্বর !

শাক্তধর্ম্মের মহাপীঠস্থান আদ্যাশক্তির হোথা অধিষ্ঠান
হোথা জগন্ময়ী জগ-বিধাত্রী হোথায় চিন্ময় মহাযোগেশ্বর,
দক্ষিণেশ্বর !

শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়-ঋদ্ধির সিদ্ধ-পীঠ ঐ সাধন-সিদ্ধির
'মা' মহামন্ত্রের অমৃত-ঝঙ্কার বহে অনর্গল নিতি-নিরন্তর,
দক্ষিণেশ্বর !

পাবনী গঙ্গার মুক্তি-কল্লোল রম্য তীর্থের মর্মে দেয় দোল
শ্রীমন্দিরে মার অভয়া মূর্তি, দ্বাদশ মন্দির মাঝে মহেশ্বর,
দক্ষিণেশ্বর !

পঞ্চবটীতল জ্ঞান ও ভক্তির জ্বাল্‌ল মঙ্গল বতি মুক্তির,
সর্বধর্মের মিলন-ক্ষেত্র সর্বপন্থার সাম্যে ভাস্বর,
দক্ষিণেশ্বর !

সাকার-ভক্তের ভক্তি-মার্গের জ্ঞানানুরক্তের জ্ঞানের স্বর্গের
নিত্য-সত্যের সর্বতত্ত্বের ঐক্য-মন্ত্রের মহাধামেশ্বর,
দক্ষিণেশ্বর !

সত্রী-দণ্ডীর ব্রহ্মানন্দের বেদ ও চণ্ডীর ছন্দোবন্ধের
সকল ভাষ্যের মহারহস্যের সাম্য-ঐক্যের তথ্যে ভাস্বর
দক্ষিণেশ্বর !

ধর্ম-ধাম ঐ সাম্যসন্ধির, মৈত্রী-পীঠ ঐ ভিন্ন পন্থীর,
শৈব-শাক্তের ব্রাহ্ম-বৌদ্ধের জৈন-খ্রীষ্টের হোথা একেশ্বর
দক্ষিণেশ্বর !

বিবেকানন্দের তিনটি ফটো

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, এম্-এ

বিবেকানন্দ কেবল পুরুষশ্রেষ্ঠ নন, সুপুরুষেরও শ্রেষ্ঠ। এ যুগে ভারতের অগ্রগণ্যদের মধ্যে সুপুরুষের অভাব ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের কথা মনে আসে; তবু বিবেকানন্দের মূর্তিতে একটা বিশেষত্ব আছে।

মানব-ঐশ্বর্যের একটা বড় ঐশ্বর্য দেহরূপ। কেবল বৈষ্ণব নয়, সব মানুষই প্রথমে রূপ দেখে ভোলে। যাঁরা নরোত্তম, তাঁরা যখন দেবোত্তম হয়ে দাঁড়ান, তখন তাঁদের অর্চনার একটা ধারা বয়ে যায় ঐ রূপসাগরের দিকে। কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে ঘিরে ভারতের শিল্পচেতনার পরিস্ফূর্তি। "নীরদ নয়ন" চৈতন্যের রূপের বন্দনা করেছেন বৈষ্ণব কবি অপরূপ ভাষায়।

বিবেকানন্দের রূপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় আসা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমরা তাঁকে দেখিনি। তাঁকে দেখেছেন এমন লোকও বিরল হয়ে আসছে। একজনকে বলতে শুনেছি, 'আর কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে দুটি আশ্চর্য কমল চোখ।' অন্য একজন বললেন, 'বক্তৃতা করছিলেন, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করে ফিরছিলেন প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, মেঘধ্বনির মত গম্ভীর অথচ সঙ্গীতময় কণ্ঠ গুরুগুরু করে উঠছিল।'

আমার বক্তব্য অন্যতর। বিবেকানন্দের খুব বেশি না হলেও কতকগুলি ফটো আছে। তার মধ্যে তিনটি সর্বাধিক পরিচিত। পরিব্রাজক, হিন্দু সন্ন্যাসী এবং ধ্যানস্থ—এই ত্রিমূর্তিতে বিবেকানন্দকে আমরা পথে ঘাটে ঘরে সর্বত্র দেখে থাকি। আরো নানা উৎকৃষ্ট ছবি তাঁর আছে, আরো সুদৃশ্য, তবু ঐ তিনটি ছবিই জনচিত্তে স্থান পেয়েছে।

জনতার বিচারবুদ্ধির উপর আমরা আস্থা রাখি না, বিবেকানন্দের বিপুল প্রত্যাশা ছিল কিন্তু তাদেরই উপর। তারাও ভালবেসে শ্রদ্ধা করে তাঁর যে তিনটি ছবিকে নির্বাচন করেছে, তার মধ্যে বিবেকানন্দের চরিত্র সম্বন্ধে তাদের বিচার ও সিদ্ধান্তের ঘোষণা আছে। সে সিদ্ধান্ত অত্যাশ্চর্য-রূপে সত্য। বিবেকানন্দ-জীবনের সংক্ষিপ্ততম টীকা তাঁর ঐ চিত্র তিনটি।

হুবহু প্রতিকৃতি, বিশেষ করে ফটোগ্রাফ এতই ব্যক্তিগত, যে তার মধ্যে আমরা সাধারণতঃ কোনো ব্যঞ্জনা অনুভব করি না। সেই কারণে বড় আর্টিস্ট যখন প্রতিকৃতি আঁকেন, তখন তার মধ্যে তিনি অতিরিক্ত কিছু যোগ করে দেন। তাঁদের আঁকা প্রতিকৃতি সত্যকার শিল্পচিত্র হয়ে ওঠে। ফটো সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। ক্যামেরার চোখ মিথ্যে দেখে না, কিন্তু সত্য দেখে কি? অন্ততঃ সর্বাঙ্গীণ সত্য? পরমাশ্চর্য, বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে জড় ক্যামেরা সত্য দর্শন করেছে। বিবেকানন্দের ফটো প্রতীকচিত্র হয়ে উঠেছে।

প্রতীকচিত্র আমরা তাকেই বলব, যখন ছবি নিছক মানুষটিকে নয়, ব্যক্তির অতীত একটা ভাবকে ফুটিয়ে তোলে। ব্যক্তিগত মানুষটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা সংস্কার যা কিছু আছে, সব মুছে দিয়ে প্রতীকচিত্র নিখিল মানুষের চিরন্তন হৃদয়া-বেগের কাছে আবেদন জানায়। খুব পরিচিত মানুষের ছবি হতে সাধারণভাবে এই নৈর্ব্যক্তিক ভাব জাগান কঠিন হয়। শিল্পীর মডেল তাই অজ্ঞাত-কুলশীল। সে একটা মানুষ মাত্র। বিবেকানন্দের মত পরিচিত মানুষ ভারতে কম আছে। তত্রাচ তাঁর ছবি জনচিত্তে একটা বিশেষ ভাব উদ্দীপিত

করে। এইখানেও তাঁর সম্বন্ধে জনতার রায়: বিবেকানন্দ যতখানি জীবন, ততখানি আইডিয়া।

এইবার উপরোক্ত বক্তব্য ছুটিকে সংযুক্ত করতে হবে—ছবি তিনটি কেন জীবনভাষ্য এবং সমভাবে ব্যক্তি-পরিচ্ছিন্ন ভাবপ্রতীক।

প্রথম পরিব্রাজক। যথার্থতঃ বিবেকানন্দের প্রথম প্রকাশ পরিব্রাজকরূপে; বিলে নয়, নরেন নয়, নরেন্দ্র নয়—বিবেকানন্দ। ঐ নামটিও পরিব্রাজক অবস্থায় নেওয়া। তার পূর্বে—

এখনো বিহার' কল্পজগতে
অরণ্য রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্মবিহীন বিজন সাধনা
বসে বসে শুধু আনমনে শোনা
আপন মর্মবাণী।

বিবেকানন্দ যখন পথে বেরিয়ে পড়লেন আপন মানসগুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে, তখন তিনি স্রষ্টার হাতের শেষ ছোঁয়াটুকু পেয়েছেন। বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হবেন না? যে অকূলান্ত মহাসাগরের তল থেকে বিবেকানন্দ-মহাদেশের জন্ম এবং তা যে কারণে—সেই মহাকারণই তাঁকে ঐ সমুদ্র-গভীরের অপার শান্তি ও স্তব্ধতা থেকে বঞ্চিত করেছে। ধারণ করতে হবে, বহন করতে হবে, তাই তো বেদনাক্ষুব্ধ বারিধি হতে হিমালয়শীর্ষ ভারত-ঊর্ধ্বাঙ্গের সমুন্নতি; রামকৃষ্ণ-সাগর হতে বিবেকানন্দের উন্নয়ন। পৃথিবীতে দুঃখ আছে, কান্না আছে, আছে নিষ্ঠুর শাসন ও নিঃসীম অত্যাচার; বিবেকানন্দ তা জানেন, কিন্তু পথে নেমে জনতার জন হয়ে তা বুকে বিঁধে উপলব্ধি করতে হবে, তাই বিবেকানন্দ ভারতের পথে। আর এই উপলব্ধি যেন খণ্ডিত না হয় আসক্তি ও অভিমানে, বিকারে বা বাসনায়—ভারতসত্তার পূর্ণরূপ সন্ন্যাসের সত্যদর্শনের আলোকে গ্রহণ করতে হবে—বিবেকানন্দ তাই পর্যটক নন, তিনি পরিব্রাজক।

আরো এক কারণে প্রথম পরিস্ফুট বিবেকানন্দকে পরিব্রাজক-রূপেই পাই। নরেন্দ্রের বড় ইচ্ছা ছিল সমাধি-সমুদ্রে ডুবে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সবলে তাঁকে ব্যক্তিমুক্তির গহন থেকে ছিন্ন করে আনলেন। বিশ্বের মধ্যে বিবেকানন্দকে বিশ্বরূপ দেখতে হবে, শুধু আপনার মধ্যে নয়। পরিব্রাজক-রূপে সেই নবসাধনার সূত্রপাত। কর্মসমুদ্রের তরঙ্গ চূড়ায় দাঁড়িয়ে পরবর্তীকালে একদিন স্বামীজী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "সেই কৌপীন, মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন, ভিক্ষান্ন ভোজন, হায় ইহারাই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়"—কর্মযোগীর কঠোর বৈরাগ্যের জীবন এই কালেরই; আবার তীর্থে তীর্থে বৈদান্তিক তাঁর ক্ষুধার্ত নারায়ণকে যখন দেখছেন—সেই পরম প্রেমিকও প্রকাশিত হয়েছেন এখনই; বিবেকানন্দের এই দুই রূপই সত্য; এবং পরিব্রাজক অবস্থায় সবচেয়ে সার্থকভাবে উভয়ে মিলিত হয়েছে; তার পরে বা পূর্বে নয়। হয়ত কখনো কর্মী বড়, কখনো বা ধ্যানী।

কেবল ঐ দুই রূপই নয়, আরো একটি প্রকাশ—সেই চিরসংগ্রামী—সেও এসেছে এই লগ্নে; ভারতের গ্রামে তীর্থে নগরে জলদ-মনীষা বিবেকানন্দের জয়ধ্বজা উড়েছে। নরেন্দ্র জয় করে, বিবেকানন্দ করে উপলব্ধি। তাই বলি পরিব্রাজক হ'ল বিবেকানন্দের প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব মূর্তি, হয়ত শেষও।

এইবার দেখতে বলি সেইরূপ—দাঁড়িয়ে আছেন এক সন্ন্যাসী, পদপল্লব থেকে মুণ্ডিত মস্তক অবধি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেহ, করোদ্ধৃত চিরসঙ্গী যষ্টি, ঈষৎ পার্শ্বীকৃত উন্নত মুখ, উদার আঁখি সুদূর দিগন্তে বিলগ্ন—এ রূপ কি শুধুই বিবেকানন্দের?

'তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।'

বিবেকানন্দ কি সেই লক্ষ্যে, সেই পথে এসে দাঁড়ান নি? বিবেকানন্দ কি বিলীন হয়ে যাচ্ছেন না 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'র 'যুগযুগ-ধাবিত যাত্রী' দলের মধ্যে? ঐ পদধ্বনি, ঐ ভ্রমণ-যষ্টির মৃদুস্থির আঘাত কি অনাদিকালের বিচিত্র পথচলার ঐকতানে মিলিত হচ্ছে না?

ঐ পরিব্রাজক মূর্তি চিরন্তন যাত্রীর!

স্মরণে আনবার চেষ্টা করছি পথ-চলার শ্রেষ্ঠ ছবি আর কি আছে আমাদের। বাস্তব ও কাল্পনিক!

বুদ্ধের কথা মনে আসে, মনে আসে শঙ্কর এবং চৈতন্যের কথা। তাঁদের ভারত-পরিক্রমণের সঙ্গে বিবেকানন্দের ভারত-পর্যটনের প্রভেদ আছে। বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্য আগে সিদ্ধ হয়েছেন, এবং সেই সিদ্ধির দুর্লভ সত্য জনে জনে বিতরণ করতে ভারতের পথে পথে ফিরেছেন। বুদ্ধ তাই পথ চলেন যখন, পরম বরাভয় ও করুণার মুদ্রায় দক্ষিণ-করতালু পৃথিবীর পানে উত্তোলিত উন্মুক্ত থাকে। শঙ্করের চিত্রের কথা মনে করতে পারছি না, কল্পনা করতে পারি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার দুঃসহ দীপ্তিকে, সে যেন জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের মর্ত্যাবেষ্টন! আর দুই বাহুর আন্দোলিত আকুলতা ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত করে সংবিৎ-হারা ছুটে চলেন যিনি, তিনিই প্রেম-দেহ শ্রীচৈতন্য!

এঁরা নয়, বিবেকানন্দই যথার্থ পরিব্রাজক, কারণ এ তাঁর সাধনার ক্ষণ। গুরুর নিকটে আত্ম-সিদ্ধি যদি বা হয়ে থাকে, ভারত-সিদ্ধি অথবা বিশ্ব-সিদ্ধি তখনো তাঁর হয় নি। বিবেকানন্দ যে পরবর্তী জীবনে বলেছিলেন, আমি অশরীরী বাণী (I am a voice without a form)—সে কথা তিনি বলতে পারতেন না, যদি ঐ বাণীর শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ না করতেন সমগ্র ভারতদেহে। এর জন্য তাঁকে সন্ধান করতে হয়েছে কাশ্মীর থেকে কন্যা-কুমারিকা, বঙ্গ থেকে গুজরাট; এই পরিক্রমার পথেই দেখা যায়—রাজা যাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে আছে, তাঁকেই আবার পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছে নর্তকীর নিকটে।

ও তো গেল অতীতকালের চিত্র, পরিব্রাজকের নিকট কালের ছবি মেলে কি? প্রথমেই যেটির কথা মনে আসে সেও আর্টিস্টের কল্পনার ধন—নন্দলালের আঁকা গান্ধীজীর ডাণ্ডী-অভিযান চিত্র। 'হাম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে, তব তামাম হিন্দুস্থান উথল যায়েঙ্গে'—আত্মবিশ্বাসের অয়স্কঠিন মূর্তি—প্রতিটি পদক্ষেপ পড়ে আর ভারত উথলে উথলে ওঠে—সে ছবি নন্দলালের; সেই কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত যষ্টিসম্বল, ঈষৎ নত দুর্গমপথযাত্রীর অভ্রান্ত চিত্র। এ ছবি যত অপূর্ব হোক, যথাযথ পরি-ব্রাজকের নয়। দুঃসাধ্য এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে লাভ করবার যে সুকঠোর দৃঢ়তা ফুটেছে প্রত্যেকটি দেহসন্ধি এবং মাংসপেশীতে—সে দৃঢ়তা এবং তপস্যার কাঠিন্য পরিব্রাজকেরও আছে—সেই সঙ্গে আরো আছে মুক্ত আকাশতলে আত্মবিকীরণের উদার প্রসন্নতা। পরিব্রাজক পথ চলবেন, ভূমিতলে আসন পাতবেন, ডুবে যাবেন নিশীথিনীর গভীর গম্ভীরে, উত্থিত হবেন অরুণোদয়ের সঙ্গে, চলতে চলতে ঘনপ্রসন্ন কণ্ঠে আবার ডাক দেবেন গৃহস্থ প্রাঙ্গণে—ভবতি, ভিক্ষাং দেহি। বিবেকানন্দের মূর্তিতে সেই প্রকাশ।

আরও একটি ছবি, সে এখনও শিল্পীর তুলিতে ধরা পড়ে নি—সমর্থ প্রতিভার প্রতীক্ষায় রয়েছে এক শ্রেষ্ঠ অভিযাত্রীর ভাবরূপ। "দূরে বহুদূরে ঐ নদী ছাড়াইয়া, ঐ পাহাড় পর্বত অরণ্য ছাড়াইয়া ঐ আমাদের দেশ"—সে যেন এক অশরীরী কণ্ঠ বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির অনুসরণের মত মনপ্রাণ উচ্চকিত করেছিল একদা—আমার দেশ আছে দূরে অনেক-দূরে—অতএব পথিক চল। এ আমার মাটির দেশ, এ আমার স্বপ্নের দেশ, কত দিবসরাত্রির দ্বার অতিক্রম করে ঐ আনন্দলোকের সিংহদুয়ারে উত্তীর্ণ

হতে হবে—"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা"—যিনি ডাকছেন তাঁর দূরাগত কণ্ঠই শুনেছি, দর্শন করিনি তাঁকে, সে বাণীরূপের সঙ্গে চিরযাত্রীর মূর্তি কি সংযুক্ত করতে পারি না ?

স্বামীজীর দ্বিতীয় চিত্র—আমেরিকায় হিন্দু সন্ন্যাসীর; মোহিতলাল যে বিবেকানন্দের কথা বলেছেন,—"পুরুষসিংহ, জগতের মহত্তম মহাকাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত, তাঁহার চক্ষে জ্বলদর্চি, কণ্ঠে পাঞ্চজন্য" স্বামীজী-চরিত্রের সেই দ্বিতীয় প্রকাশও এই রূপে। বিপ্লবী সন্ন্যাসী পূর্ণপ্রভায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমেরিকার মানুষ সে অসহ্য রূপ দেখে বলেছে—সাইক্লোনিক হিন্দু-মঙ্ক। ভারতের মানুষ বলে, "মূর্তমহেশ্বরমুজ্জলভাস্কর"। ভাষা ভিন্ন, কিন্তু বক্তব্য এক। এইরূপেই বিবেকানন্দ সর্বাধিক মনোহরণ করেছেন। পশ্চাত্যবিজয় এবং প্রাচ্যপ্রতিষ্ঠা এর পরেই ঘটেছে। পরিব্রাজক মূর্তির পরে কোন্ দৈববলে এই বিজয়ী রাজবেশ, তা আমাদের ধারণার অতীত, অথচ বিবেকানন্দের কথা চিন্তা করতে—মাঝের আর কোন চেহারার কথা মনেই আসে না।

বিবেকানন্দ জীবননাট্যের ক্লাইম্যাক্সও এইখানে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দকে প্রথম এবং শেষ সম্পূর্ণায়ব প্রকাশ বলেছি। পরিব্রাজক জীবনের অন্তে সন্ন্যাসী সংগ্রামীরূপে দেখা দিলেন। সংগ্রামীরূপের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঐ বৈশাখী ঝঞ্ঝার মূর্তিতে। কর্মী নেতা যোদ্ধা বিবেকানন্দ সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছেন এখানে। আগ্নেয় পর্বত যেন সচল হয়ে পৃথিবী পর্যটন করেছে। অতঃপর স্বাভাবিক ভাবেই আসবে শান্তভাব, জীবনের সত্য লক্ষ্য সম্বন্ধে নবভাবনা—তাই সংগ্রামী হতে সন্ন্যাসীতে প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ ঝটিকোত্তর শান্ত শুদ্ধ সমুদ্র। ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পরেও যে বিবেকানন্দ 'কলম্বো থেকে আলমোড়া' গর্জন করে ফিরেছেন, সে অভ্যাসবশে—আরো সঠিকভাবে—নিছক প্রয়োজনবশে। বাহ্যতঃ উন্মাদনার স্পন্দন বজায় থাকলেও অন্তরে "বিপুল বিরতির" সন্ধ্যাসঙ্গীত শুরু হয়ে গিয়েছে।

এইবার চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করতে বলি। অপরূপ! অপরূপ! সেই বীরমূর্তি! পরিব্রাজকের সমতুল মিলবে, ধ্যানী বিবেকানন্দের সমতুল মিলবে, মিলবে না ঝঞ্ঝারূপী বিবেকানন্দের। স্পর্ধা ঘোষণা করে বলা চলে এ চিত্র দ্বিতীয়রহিত। ঐ বীরমূর্তি কোথায় এ দেশে? ঐ সমুন্নত উষ্ণীষ, দীপ্তায়ত নয়ন, সুদৃঢ় চিবুক, বিশাল আনন, ঐ বিস্তৃত বক্ষ—বক্ষোপরি স্থাপিত যুগল বাহু—অমেয় দর্প ও মহিমার এ কি তুঙ্গ মূর্তি! ভারতে বীরের অভাব ঘটেছে ইদানীংকালে, বীরমূর্তির ততোধিক। বিবেকানন্দের একটি চিত্র শূন্যস্থানের অনেকখানি পূরণ করেছে। বিশাল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে পিষ্ট করে দুই বাহুর বেষ্টনী, মুখ ঈষৎ সাচীকৃত, পদ্ম-নয়ন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, অধরোষ্ঠ সম্বদ্ধ অথচ মেঘ-মন্দ্রিত হতে উন্মুখ—

'Sinners? It is sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep.'

*	*	*

'মহা spiritual tidal wave আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

ঐ মহাক্ষত্র-বিবেকানন্দ-চিত্র যে বীর্যের প্রতীক চিত্র, তা আর না বললেও চলবে। আমাদের আলোচ্য বিবেকানন্দের তৃতীয় এবং সর্বশেষ চিত্র হ'ল ধ্যানমূর্তি।

ভারতে বুদ্ধের ধ্যানমূর্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ; এবং তার পরেই সম্ভবতঃ বিবেকানন্দের। দেবতা

শিবকে বাদ দিলে ভারতের শিল্প-চৈতন্যকে সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ করেছে দুটি মানুষ—কৃষ্ণ ও বুদ্ধ। একটি আকর্ষণ করেছে রসচেতনার পথে, অন্যটি ধ্যানগভীরতায়। ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ঐ দুই রূপই সত্য। কদম্বতলে এবং বোধিদ্রুমতলে দুই পুরুষশেখর আমাদের আনন্দিত করে বিরাজ করছেন যুগ হতে যুগান্তরে।

ভারতীয় শিল্পদৃষ্টি যে ধ্যানদেহকে গৌতমদেহে আবিষ্কার করবে—সে কিছু আশ্চর্য নয়। ভারতে বোধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষের অভাব কোনদিন ঘটেনি, কিন্তু বুদ্ধ একজনই। অর্থাৎ বুদ্ধ আর কিছু নন, কোনো মানবীয় সত্তা নন, তিনি বোধিদেহ। বুদ্ধের বোধি ধ্যানে—সেই ধ্যান তনুধারণ করে বুদ্ধ হয়েছে। সন্দেহ হয় বুদ্ধ রক্তমাংসের কোন মানুষ কি না! পতিত মানুষের জন্য তাঁর অমেয় করুণা, মৈত্রীর বাণী-শতদল নিয়ে ভারত-পরিক্রমণ? জানি—সবই মানি। কিন্তু সে করুণা কি অপার্থিব নয়? ঐ যে মানুষটি ভারতের পথে পথে পরিভ্রমণ করছেন, তাঁর চরণ কি মৃত্তিকা স্পর্শ করেছে? বুদ্ধের যেন ধ্যানসঞ্চরণ—তাঁর যে উপদেশ, সে ঐ ধ্যানলোক থেকেই আসছে; নইলে বাস্তব সমাজবিধিকে অস্বীকার—সর্বমানুষের জন্য বাসনা-ত্যাগের পরমা নিবৃত্তির নির্দেশ?

তাই বুদ্ধ ধ্যানদেহে সর্বোত্তম!

তারপরেই বিবেকানন্দ, কেন?

অপরূপ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন তাঁর এক সমাধি দর্শন। রূপলোকের পারে অরূপলোকে যে সপ্ত ঋষি সমাধিস্থ, এক জ্যোতির্দেহ শিশু ধ্যান ভাঙিয়ে তাঁদের একজনকে মর্ত্যভূমিতে আকর্ষণ করে এনেছেন।

রামকৃষ্ণ সেই শিশু, বিবেকানন্দ সেই ঋষি!

শিশু ঋষির ধ্যান ভাঙিয়েছে,—ধ্যানোত্থিত বিবেকানন্দ কর্মী ভক্ত সংগ্রামী প্রেমী।

ঋষি আবার সমাধিতে হারিয়ে যাবেন, গিয়েছেন অচিরকালে। ঐ তাঁর সত্যরূপ: মৌনগম্ভীর পরমহংস শ্রীমৎ বিবেকানন্দ!

বুদ্ধের এবং বিবেকানন্দের ধ্যানমূর্তি পাশাপাশি রাখতে ইচ্ছা হয়। সদ্য বোধিপ্রাপ্ত বুদ্ধের সে কি কৃশকঠিন স্তব্ধতা—ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সার বাহুল্যহীন আধার। বিবেকানন্দের বিশাল গম্ভীর মূর্তি, হিমগিরির মৌনমহিমা। এমন কেন হয়! বুদ্ধের যে নির্বাণ, দুঃখহীন সর্বশূন্যতায় নিঃশেষ বিলয়। বিবেকানন্দের নির্বিকল্প সমাধি,—চিরানন্দ অমৃত-স্বরূপে আত্মসংহরণ। প্রাপ্তির চরম লোকে হয়ত উপলব্ধির পার্থক্য নেই, কিন্তু মর্ত্যসাধনায় সাধন পথের ভিন্নতা থাকে। তপস্যার সেই বিশেষরূপই আমরা সাধকের ভাবরূপে আরোপ করি। যেমন বুদ্ধ-বিবেকানন্দের ধ্যান, তেমন চৈতন্য-রামকৃষ্ণের দিব্যোন্মাদ।

নিবাত নিষ্কম্প আত্মস্তব্ধ বিবেকানন্দ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট; তুষারশিখরের মত তাঁর উষ্ণীষ; শৃঙ্গচ্যুত স্রোতস্বিনীর মত স্কন্ধ ও বক্ষোবিলগ্ন উষ্ণীষ-প্রান্ত; বিশাল বিস্তৃত প্রান্তরতুল্য দেহাবয়ব, ঐ বিস্তারকে আকার দান করে দুই বাহুতট; বাহুপ্রান্তে শিথিল মুক্ত করতলের পদ্ম প্রসন্নতা—উপরে অন্তর্মুখী নয়নের শান্ত সংহরণ—এ মূর্তি ধ্যানী বিবেকানন্দের না ধ্যানী ভারতের? অনাগত যুগের শিল্পী—বিবেকানন্দের ধ্যানদেহের প্রত্যেকটি রেখা অনিবার্য-ভাবে একই বিন্দুতে কেমন করে মিলিত হয়েছে, সেই আশ্চর্য সামঞ্জস্যই দেখবেন না—বিবেকানন্দের ধ্যানরূপে ভারতরূপকেও আবিষ্কার করবেন তিনি।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।' কিন্তু বিবেকানন্দের জীবনকাব্য—সে তো কোন রোমান্টিক কবির রচনা নয় যে 'অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে' থেকে কোন একস্থানে সে তার স্থান খুঁজে পাবে; ঝঞ্ঝারূপী বিবেকানন্দ ফিরে আসবেন আপন চিরনৈঃশব্দ্যের আসন'পরে। তাঁর সেই

'নিজ নিকেতনে' প্রত্যাবর্তনের ছায়া-ইতিহাস তাঁরই পত্র-মুখে শুনতে ইচ্ছা করে :

২৪শে জানুআরি, ১৮৯৫—প্রাণ ঢেলে খেটেছি।......বক্তৃতা ও অধ্যাপনাতে বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে।......একটি লেখবার খাতা আমার আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরছে। দেখছি সাত বৎসর পূর্বে লেখা রয়েছে—'এবার একটি একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে।' কিন্তু তাহলে কি হয়, এইসব কর্মভোগ বাকি ছিল।

১লা ফেব্রুআরি, ১৮৯৫—হৃদয় শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও।......জীবন কিছুই নয়, মৃত্যু ভ্রম মাত্র। এই সব যাহা কিছু দেখিতেছ সে সকলের অস্তিত্ব নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, হৃদয় ভয় পাই'ও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনি, পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প, আবার সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে, আমায় শীঘ্র গৃহে ফিরিতে হইবে।

* * *

নিশীথ রাত্রির স্তব্ধ আসনে নীলাকাশ! 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।' অমাব্যাপ্ত আকাশ, আকাশব্যাপ্ত তপস্যা। বিবেকানন্দ তপোমগ্ন! এই বিবেকানন্দই কি একদা বৈশাখের মেঘ হতে চেয়েছে, হয়েছে কি ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুৎ? কবি, তোমার বীণা থামাও; নন্দী, তোমার প্রহরা সরাও; ঘুমাও ঘুমাও তরু লতা পশু পাখী, অনির্বাণ সত্য শুধু জাগো! পরিনির্বাণের পূর্বে বিবেকানন্দের শেষ প্রার্থনা—"ভগবান্ সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলে মায়ামুক্ত হোক, ইহাই আমার চির প্রার্থনা।"

চাঁদ ও পৃথিবী

শ্রীরবি গুপ্ত

যাত্রী আমি, বসুন্ধরা, বাসি তোমায় ভালো—
আঁধার তব তাইতো করি আলো!
গোপন সুরে নামিয়া আসি,
ছড়াই গানের লহররাশি,
স্বর্ণ-শিখার বর্ণে মুছি তোমার ছায়া কালো।

গহন রাতে মেঘলোকের তোরণখানি খুলি'
মন্ত্রে সোনার বুলাই পরশ তুলি!
অচিন্তনের বহ্নিবুকে—
চলা মোদের যুগে যুগে,
কোন্ সে আলো মূর্তি লভে ধন্য করি ধূলি!

অচিন্তনের যাত্রা-পথে আমি তোমার সাথী
উজল করি তাইতো তোমার রাতি!
নিদ্রাহরা সঙ্গীতনে
স্নিগ্ধ কিরণ-বিচ্ছুরণে
নীরবতার গোপন-তারে স্বপ্নমালা গাঁথি।

কত কালের এই যে মোদের মিলন-অভিসার—
পার হয়ে যাই কালের পারাবার!
হে পৃথিবী, বক্ষে তব
আনি মধুর দীপ্তি নব,
লহ পাবক-লগ্নে আজি আপন অধিকার।

তোমায় ঘিরে আঁধার রাতের বাঁধন যত মিছে,
থাক না তারা থাক না পড়ে পিছে!
মুক্ত তোমার মুক্তি-পথে
আসে উদয় স্বর্ণ-রথে
কোন্ গভীরের খোলে দুয়ার ছড়ায় সুরভি যে!

বিত্ত তোমার তোমার মাঝেই, ফেরাও সেথা আঁখি
গহন-মণি আনি তোমার লাগি
অতন্দ্র এই চলার তালে
চাই যে রবি তোমার ভালে—
অকূল খেয়ায় একলা তরী—সঙ্গী যে তাই জাগি।

যাত্রী ওগো বসুন্ধরা, বাসি তোমায় ভালো—
আঁধার তব তাইতো করি আলো!
গোপন সুরে নামিয়া আসি
ছড়াই গানের লহররাশি
স্বর্ণ-শিখার বর্ণে মুছি তোমার ছায়া কালো।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীমতী ঊষা বসু, এম্‌-এ

লক্ষ্মীরূপা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পত্নী। তিনি ছিলেন সতীকুল-চূড়ামণি। প্রাচীন ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন করলে দেখতে পাই সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, চিন্তা, প্রভৃতি মহীয়সী নারীগণ সতীত্বের দিব্য বিভায় প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কেহই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। তিনি ত্যাগ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত বিকাশ—অনাবিল পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রতিমা। মনে হয় জগতের যত মধুরিমা তিল তিল করে সংগ্রহ করে বিধাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সমস্ত নারীকুলের আদর্শস্থানীয়া। তাঁর অশেষ গুণের মাধুর্যে তিনি অপরূপা। অন্যান্য পৌরাণিক নারীদের মত তাঁর চরিত্রের সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। মুগ্ধ ভক্তগণ চিরদিনই এই মহীয়সীকে তাঁদের অন্তরের নিভৃত মন্দিরে পূজা করেছেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনের অমৃতময় আনন্দকাহিনী স্বল্পসংখ্যক লোকেই জানেন। জনসাধারণ আজও এই আনন্দ হতে বঞ্চিত।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন যেন একখানি করুণ কাব্য—একটা চাপাকান্না, একটা বুকফাটা দীর্ঘ-শ্বাস। সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন অপরূপ লাবণ্যবতী, লজ্জাবতী ও ভক্তিমতী। একদিন গঙ্গার ঘাটে শচীদেবী এই সৌন্দর্যময়ী কিশোরীকে দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি বাড়ী ফিরে গিয়ে প্রিয়তম পুত্র নিমাইয়ের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের প্রস্তাব করে পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের নিকট লোক পাঠালেন। তখন নিমাইয়ের অগাধ পাণ্ডিত্যের যশোগাথায় সমগ্র নবদ্বীপ নগরীর আকাশ বাতাস মুখরিত। নিমাইকে জামাতারূপে লাভ করার সৌভাগ্যে উৎফুল্ল সনাতন মিশ্র সানন্দে শচীদেবীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যথাসময়ে যথোচিত আড়ম্বরে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ সুসম্পন্ন হ'ল। বিবাহের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া বেশী দিন স্বামীকে নিজের কাছে পান নাই। যতটুকু তিনি পেয়েছিলেন ততটুকু সময়েরও অধিকাংশ ভাগ নিমাই নাম-সংকীর্তনে মাতোয়ারা থাকতেন; কখনও কখনও কীর্তন-রসে বিভোর হয়ে যেতেন। ভগবদ্‌ভক্তিতে তাঁর নয়নযুগল হতে দরদর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ত—

নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর!

কিশোরী বধূ স্বামীর এরূপ ভাব দেখে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। শচীদেবীর কাছে গিয়ে বধূ উপস্থিত হতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু ঘরের বধূ। সকলের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশিত করবার কোন অধিকার তাঁর ছিল না। তাই বিকশিত কুসুমের মত ষোড়শী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজের অন্তরের রঙীন কামনা-বাসনার স্বপ্নকে সবলে অবদমিত করে যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, জগতের ইতিহাসে তা বিরল। স্বীয় অবরুদ্ধ বেদনা সহ্য করে বিষ্ণুপ্রিয়া কত বিনিদ্র রজনী প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় চোখের জলে একাকী রাত্রি প্রভাত করেছেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব লোকশিক্ষার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি মানবের চিত্তক্ষেত্রে ভক্তিবারি সেচন করে প্রেম ও করুণার শস্য ফলিয়েছেন। তিনি সর্বত্যাগী, তিনি সন্ন্যাসী। তিনি প্রেম-করুণা-ত্যাগের মূর্ত অবতার। তাঁর ত্যাগে সেদিনের জগতের গ্লানি বিদূরিত হয়েছিল।

কিন্তু নিমাইয়ের সন্ন্যাস-ধর্ম-অবলম্বনে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে যে নিদারুণ আঘাত লেগেছিল—সেই বেদনার ছবি প্রকাশিত করা কঠিন। ভাবী অশুভের ছায়া তাঁরা দু'জনেই যেন চারিদিকে দেখতে পেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পাগলিনীর ন্যায় সিক্ত বস্ত্রে বাড়ী ফিরে শচীদেবীর কাছে গিয়ে অধীর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। শচীদেবী সস্নেহে বধূকে কাছে আকর্ষণ করে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন—আমি চারদিকেই আজ অমঙ্গল দেখতে পাচ্ছি। মায়ের অনুরোধে নিমাই কয়েক দিন মাত্র সংসারে বাস করেছিলেন। এই কয়েকটি দিনের মধুর স্মৃতি অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনা-কাতর অন্তরের এক অমূল্য সম্পদ। সংসার পরিত্যাগ করবার পূর্বরাত্রে নিমাই শ্রীমতী বিষ্ণু-প্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করলেন: বিষ্ণুপ্রিয়া মালা ও চন্দন দিয়ে প্রিয়তমকে সজ্জিত করলেন; নিমাইও বিষ্ণুপ্রিয়াকে অপরূপভাবে সাজালেন। এইভাবে গভীর সুখে রাত্রির মধ্যভাগ অতিবাহিত হ'ল। স্বামি-সুখ-গরবিনী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর কোলে মাথা রেখে গভীর ঘুমে নিমজ্জিতা,·· সেই গভীর নিশীথে নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে ধীরে ধীরে বহির্গত হলেন আপন অভীষ্ট-সাধনার পথে। খোলা দ্বারপথে বাতাস যেন আকুল আর্তনাদ করে উঠল। বৃক্ষ-পত্রের মর্মরধ্বনি যেন করুণসুরে শোক প্রকাশ করে কেঁদে উঠল। কলস্বনা গঙ্গার স্রোত যেন থেমে গেল। ত্রিযামা-সুন্দরীর নক্ষত্রের কণ্ঠহার যেন অকস্মাৎ খসে পড়ল। বিষ্ণুপ্রিয়া চমকে জেগে উঠলেন। দেখতে পেলেন—উন্মুক্ত দ্বার ও শূন্য পালঙ্ক! বিষ্ণুপ্রিয়ার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। আলুলায়িতকুন্তলা শ্রীমতী কাঁদতে কাঁদতে শচীদেবীর দ্বারের কাছে এসে বসে পড়লেন। শোকাকুলা মাতা প্রদীপ জেলে বধূর সঙ্গে পথে বাহির হয়ে "নিমাই! নিমাই!" বলে কাঁদতে লাগলেন। সমস্ত নদীয়া নগরী যেন বিষাদের সমুদ্রে পরিণত হ'ল। বিষ্ণুপ্রিয়া পার্থিব বিলাসিতা সমস্তই পরিত্যাগ করলেন—

"যে দিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া,
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥"

কিন্তু প্রিয়বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়ার আকুলভাবে ক্রন্দন করবার অবকাশ কোথায়? পুত্রবিরহে কাতরা শচীদেবী বধূর কান্নায় অধিক শোকে অভিভূতা হবেন—এই ভয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া আপন দুঃখের দুর্বার বেগ সবলে অন্তরে চেপে শচীদেবীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেই শুষ্ক পাষাণ-প্রতিমার ভাবলেশহীন মুখ দর্শন করলে পাষাণও গলে যায়।

নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেন। ভক্তগণ এই নবীন সন্ন্যাসীর প্রেমে মুগ্ধ। ভক্তগণের সকাতর অনুরোধে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন যাবার পথে সকলকে দর্শন দিতে শান্তিপুর এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রশ্ন করলেন—"প্রভু! সকলেই আসতে পারবেন তো?"

শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর দিলেন—"যিনি আসতে চান তাঁকেই আনবে। আমি সকলের নিকটই আনন্দের সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করবো।" অকস্মাৎ বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মনে উদয় হ'ল। কিছুক্ষণ তিনি কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি বললেন—"যে আসতে চায় তাকেই আনবেন, কেবল একজন ছাড়া।" সজলনয়নে নিত্যানন্দ এই বার্তা নবদ্বীপে প্রচার করে দিলেন—"মহাপ্রভু সকলকে যেতে বলেছেন—কেবল একজন ছাড়া।" এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনে সমস্ত নবদ্বীপ-বাসী নির্বাক্ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন-বার্তা সমস্ত নগরে প্রচারিত হ'ল। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হ'ল আনন্দের সুর। পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। নবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দর্শন-মানসে শান্তিপুরে

যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁদের প্রাণের নিমাই ফিরে এসেছেন। শচীদেবীও তাঁর প্রিয়তম পুত্রের জন্য আনন্দ-ব্যাকুল অন্তরে ধাবিত হলেন। শুধু একটি নারী—অবগুণ্ঠনবতী তরুণী বধূ অশ্রুসজল নয়নে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর যাওয়ার কিংবা দর্শনের অধিকার নেই, কারণ নিমাই সন্ন্যাসী। শাস্ত্রানুসারে তাঁর বিষ্ণুপ্রিয়াকে দর্শন করা নিষিদ্ধ। বেদনাহতা নারী সেদিন চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন স্বামীর পাদুকা পূজা করে তাঁর ধ্যানে মগ্ন থেকে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন। এই মহীয়সী নারীর জীবনের ইতিকথা বড়ই করুণ, বড়ই মধুর !

শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের একদিক

অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী আমাদের হতাশ প্রাণে আশা আনে এবং অবিশ্বাসীর অন্তরেও সঞ্চারিত করে গভীর বিশ্বাস। আবার তা ভক্তি ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের সুপ্ত বহ্নিকে উদ্দীপিত করে, অনেককেই সাধকের আকাঙ্ক্ষিত জগতে যাবার প্রেরণা দেয়। যাঁরা সাধনপথে প্রথম পদক্ষেপ করেছেন, কিংবা যাঁরা সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে গেছেন তাঁদের শুভ-যাত্রা-পথের সুপেয় প্রাণবারি হয়ে উঠেছে এই ভাষারূপে প্রবাহিত ভাব-মন্দাকিনী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের আধ্যাত্মিক মূল্য স্বতই নির্ধারিত। তাঁর উপদেশের পারমার্থিক মূল্য আপনা-আপনিই ব্যাখ্যাত হয়েছে, নানা সহজবোধ্য গল্প ও উদাহরণের সাহায্যে। যেখানে কোন গল্প-উপমা নেই, সেখানেও তাঁর উপদেশ কোন টীকাকারের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না করে সাধারণ-বুদ্ধিবিশিষ্ট মানুষের অন্তরে উপলব্ধির গভীর স্তরে পৌঁছে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে শ্রীভগবানের যুগোচিত বাণীপ্রচারের এইটিই হচ্ছে বিশিষ্ট ধারা। তাই যুক্তি তর্ক ও উদাহরণের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের তত্ত্বমূল্যনির্ধারণের কোন অবকাশ বা প্রয়োজন দেখতে পাই না। তবে তাঁর উপদেশাবলীর একটি দিক সচরাচর আমাদের সচেতন লক্ষ্যের বাইরে থেকে যায়। সে বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ আছে বলে মনে হয়।

কাব্য-সাহিত্য পড়তে ও আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় অনেক শক্তিশালী কবি তাঁর রচনার ভাষাসম্পদকে কাব্যের মূল প্রয়োজন সিদ্ধ করেও অন্য কাজে লাগাতে পেরেছেন। শ্রেষ্ঠ কবির রচনা প্রবাদবাক্যরূপে বা অন্য আকারে কাব্যের বাইরেও মানুষের ব্যবহারে এসেছে। কবি কালিদাসের 'ন যযৌ ন তস্থৌ,' ভারতচন্দ্রের 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন,' মধুসূদনের 'একে একে নিবিছে দেউটি' প্রভৃতি অসংখ্য উদাহরণ এই কথাই প্রমাণ করে যে রচয়িতার প্রতিভা তাঁর রচনাকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ও প্রয়োজনে মানুষের ব্যবহারে এনে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলী পাঠ করলে অনেক সময়ই উক্ত বিষয়টি আমাদের মনে পড়ে যায়। আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতবাণী ভক্ত ও সাধকের পরম পাথেয় হয়েছে ; আবার এই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেও তা অনেক উল্লেখযোগ্য গৌণকার্য সফল করেছে তাও আমরা পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে পারি। ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগবৈরাগ্যের আদর্শকে উজ্জ্বলতম বর্ণে ফুটিয়ে তুললেও সংসারী ভক্তেরা তাঁর কাছে পেয়েছে পরম প্রশ্রয় ও আশ্বাস। কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে এই যে তাঁর উপদেশ সংসারীকে শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেই সাহায্য করে না ; তাঁর উপদেশের কথাগুলি থেকে সংসারে বেঁচে থাকার মত মানসিক বলও সংসারীরা পেয়ে থাকে। তাঁর উপদেশের বহু স্থল আছে যেখানে তাঁর প্রধান

উদ্দেশ্য মানুষকে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করা, কিন্তু তার মধ্যে এমন অর্থও প্রকাশ পায় যা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে মানুষ একজন শ্রেষ্ঠ সংসারীরূপে সমাজে বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। কবিদের রচনায় আনুষঙ্গিক অর্থের মতো ঠাকুরের উপদেশের এইপ্রকার অর্থগুলিও যে নগণ্য নয় তা বিশেষ বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যায়। এগুলির দ্বারা মানুষ জীবনযুদ্ধে পায় উৎসাহ, বৈষয়িক উন্নতিতে পায় প্রেরণা এবং হতাশা ও হীনম্মন্যতা থেকে পেয়ে থাকে চিরস্থায়ী মুক্তি। তাঁর এই প্রকার অসংখ্য অমূল্য উপদেশের কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করলে বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে।

তিনি বলেছেন—'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়। * * * যারা হরিনামে মত্ত হয়ে নৃত্যগীত করতে পারবে না, তাদের কোনকালে হবে না। ঈশ্বরের কথায় লজ্জা কি, ভয় কি? * * *" দেখতে পাচ্ছি এই উপদেশের তাৎপর্য সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাত হচ্ছে তাঁরই নিজের কথায়। লজ্জা-সঙ্কোচাদি সাধনপথের কত বড় বিঘ্ন তাই তাঁর মুখ্য বক্তব্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লজ্জা-ঘৃণা-ভয় আমাদের সাংসারিক উন্নতির পথেও যে বিঘ্নস্বরূপ হয়, গৌণ হ'লেও সেই অর্থ এখানে উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটে উঠেছে। বিত্তাদি-লাভ বা জাগতিক উন্নতিলাভ করতে ইচ্ছুক মানুষ কত সময়েই মনের লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ের জন্য অভীষ্ট বস্তুকে আয়ত্তাধীন করতে পারছে না—এ উদাহরণ অহরহই আমাদের নজরে পড়ছে। সে-ক্ষেত্রে ধর্মোপদেশের জন্য উচ্চারিত বাণী—'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়' লৌকিক জীবনেও মানুষকে শিক্ষা দিয়ে জনকল্যাণ সাধন করে থাকে।

আবার কখনও তিনি বলেছেন—"বিষয়ী লোকদের রোক্ নাই। হোলো হোলো, না হোলো না হোলো। জলের দরকার হয়েছে কূপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন পাথর বেরুলো, অমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে! আর এক জায়গায় খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল, কেবল বালি বেরোয়; সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছে, সেখানেই খুড়বে, তবে তো জল পাবে। * * * * যা মিথ্যে বলে জেনেছ, রোক্ করে তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ কর। যখন আমার ভারী ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বল্লে স্বর্ণপটপটি খেতে হবে; কিন্তু জল খেতে পাবে না; বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে করলে জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকবো! আমি রোক্ কল্লাম, আর জল খাবো না।" —ধর্মকথা শুনে এবং সৎপথে চলার নির্দেশ পেয়েও বিষয়ী ব্যক্তিরা ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় অভাব সংকল্পের দৃঢ়তার। শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প বলে এবং নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে ভক্তকে উপদেশ দিয়েছেন সেই রোক্ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে। কিন্তু এই সমস্যা তো কেবল অমৃতপথের পথিকদের নয়। সংসারে থেকে ভগবানকে আশ্রয় করার জন্য যে অবিচল নিষ্ঠা প্রয়োজন, যে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যই তার উপযোগিতা স্বীকার করতে হয়। জাতি, সমাজ ও দেশকে উন্নত করার ইচ্ছা থাকলেও অব্যবস্থিতচিত্ততা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার অভাব আমাদের সফলকাম হতে দিচ্ছে না—এর পরিচয় কি আমরা অনেক সময়েই দেখতে পাই না? যা যা মন্দ, অশুভ ও জীবনপথের কণ্টকস্বরূপ তাকে দলিত মথিত করার দৃঢ়সংকল্প করতে কি আমরা কুণ্ঠিত হই না? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের অভিব্যঞ্জনা এদিক দিয়ে আমাদের প্রভূত সাহায্য করে।

"কেউ কেউ মনে করে আমার বুঝি জ্ঞানভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কৃপা হলে কিছুই ভয় নাই।" এই উপদেশ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাগলের পালে প্রতিপালিত ব্যাঘ্র-শাবকের গল্প বলেছেন। কি ভাবে একটি বাঘ এসে সেই

ঘাস-খেকো বাঘকে রক্তের স্বাদ, তথা ব্যাঘ্রস্বরূপ বুঝিয়েছিল—এ গল্প ভক্তদের কাছে খুবই পরিচিত। গল্প বলার পর তিনি আবার বলেছেন—"তাই গুরুর কৃপা হলে আর ভয় নাই। তিনি জানিয়ে দেবেন, তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।" এই স্বরূপবোধ বা আত্মোপলব্ধি শুধু ঈশ্বরস্বরূপ-উপলব্ধি নয়; এই উপদেশে পরমেশ্বর-নির্মিত আমাদের দেহ ও জীবন কত কর্মক্ষম তা উপলব্ধি করবার প্রেরণা আমরা পেয়ে থাকি। মানুষ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে আস্থাশীল নয় বলেই জীবনযুদ্ধে তাকে পশ্চাৎপদ হতে হয়। সদ্গুরু বা আদর্শ শিক্ষক আমাদিগকে সেই বিশ্বজয়ী ক্ষমতায় বিশ্বাসী করে তোলেন। এই বিশ্বাস অর্থসম্পদ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে আমাদের ধারণাতীত সাফল্য এনে দেয়। স্বামীজী পরবর্তীকালে বলেছেন যে, আমাদের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বকে বিকশিত করে দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা। তিনি বলেছেন, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসই হচ্ছে নাস্তিকতা। "বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—আপনার উপর বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।"

সাধনরাজ্যে ক্রমোন্নতিতে ভক্তদের প্রেরণা দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কাঠুরের গল্প বলেছেন। জনৈক ব্রহ্মচারীর উপদেশে কাঠুরে এগিয়ে গিয়েছিল বলে ক্রমে ক্রমে মূল্যবান বস্তুর সন্ধান পেয়েছিল। নিষ্ঠাসহকারে এগিয়ে গেলে ভক্ত পরমবস্তু লাভ করেন—এই হচ্ছে এই উপদেশের প্রধান তাৎপর্য। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে সংসারী ব্যক্তিও লাভবান্ হয়। মানুষের অফুরন্ত কর্মশক্তির ছেদ টানতে নেই। এই কর্মময় জীবনে কর্মের সফলতার সীমা পরিসীমা নেই। তাই 'এগিয়ে পড়ো'—এই উপদেশ আশা ও উৎসাহের প্রেরণায় সকলকেই উজ্জীবিত করে দেয়।

ঈশ্বরভক্ত সংসারীকে সংসারের নিবদ্ধ পরিবেশে থাকতে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সব উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলি বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। যথা—পাঁকাল মাছের মত থাকা, নিজেকে বড়লোকের বাড়ীর দাসীর মত মনে করা, ইত্যাদি। পথের অন্তরায়সমূহ দূর করার জন্যই এই সুচিন্তিত উপদেশগুলি দেওয়া হয়েছে। এগুলি বর্তমান ক্ষেত্রে আলোচ্য উপদেশগুলির মতো দুইপ্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কথিত হয়নি। কিংবা বলা চলে যে, এই উপদেশগুলিতে একাধারে দুই প্রকার অর্থগৌরব পাওয়া যায় না।

নিম্নলিখিত বহুবিখ্যাত উপদেশগুলিতে আলোচ্য দুই প্রকার গুণ বর্তমান:

"ডুব দাও। ডুব না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না, জলের উপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।"

"যত মত, তত পথ।"

"যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি।"

"শ, ষ, স।"

উদাহরণের শেষ হবে না। তাঁর এই ধরণের বহুমূল্য বাণী সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে নিজ জীবনে রূপ দিয়েছেন। তাই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জনমানসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের গুরুত্ব যে নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল—তা আমরা ভালভাবে বুঝতে পেরেছি। শত-শতাব্দী ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত ভারতবাসী জড়বিজ্ঞানচর্চা ও বৈষয়িক উন্নতিতে পিছিয়ে পড়েছিল। তাই স্বামীজী অধর্ম ও নাস্তিক্যের সাময়িক গ্লানি দূর করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে কার্যে পরিণত করেছেন, আবার এদেশের মানুষের বৈষয়িক দৈন্যকে দূর করার জন্য উৎসাহের সিংহনাদ তুলেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী তাঁর মূল প্রেরণা জুগিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের এই দুই যুগ প্রয়োজনই ছিল। তাঁর বহু উপদেশও তাই দুইপ্রকার অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ। সেই কারণে তাঁর ভাবগম্ভীর বাণী ঈশ্বরভক্তকে যেমন পথ দেখায়—সৎপথাশ্রয়ী সংসারী ব্যক্তিকেও তেমনি জীবনযুদ্ধে জয়ী করে তোলে।

বিশেষ্য ও বিশেষণ

শ্রীদ্বারকানাথ জ্যোতির্ভূষণ

বিশেষ্য, তোমারে আমি খুঁজি কতবার,
নির্ণয় করিতে শক্তি হ'ল না আমার ;
বাল্যে বিদ্যালয়ে গিয়া
ব্যাকরণ হাতে নিয়া
পড়েছি বুঝেছি কত শিক্ষকের কাছে,
বস্তু, ব্যক্তি, জাতি, গুণ, দ্রব্য যাহা আছে ;
সেইগুলি 'নাম' তব,
এবে দেখি ভুল সব,
বিশেষণে বিশেষ্য যে বুঝেছি তখন,
কি আশ্চর্য ভ্রান্ত শিক্ষা পেয়েছি এমন !

নয়ন মেলিয়া যাহা দেখিবারে পাই,
সকলি তো বিশেষণ, বিশেষ্য যে নাই ;
সবাই কহিছে এসে,
বিশেষ্য নাহিক দেশে,
চন্দ্র-সূর্য নদ-নদী গ্রহ-তারাগণ—
এক মহা বিশেষ্যের নানা বিশেষণ !
নয়ন যাহার আছে,
দেখিতে সে পাইয়াছে ;
এক আদি অদ্বিতীয় বিশেষ্য-সাগরে
অগণন বিশেষণ সদা খেলা করে।

ঘুমন্ত তারকারাজি জীয়ন্ত জোছনা—
মধুর চাঁদিমা-নিশি নীলিম-বসনা,
ললিত লতিকা দল,
কুসুমের পরিমল,
শীতল সমীর চারু, বালার্ক-কিরণ ;
গভীর সাগর আর জীবের জীবন,
শ্যামল পাদপ-দল,
কাদম্বিনী সচঞ্চল,
সব সেই বিশেষ্যের বহু বিশেষণ—
গুণের বাচক তাঁর নিখিল ভুবন।

করিয়াছি আবিষ্কার বিশেষ্য তোমারে,
বিশেষণ-পরিপূর্ণ রাজ্যের মাঝারে
তোমার সত্তার মাঝে,
ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া আছে,
একাকী পুরুষ তুমি, একাই বিশেষ্য—
এ জগতে তুমি দেব, জীবের নমস্য।
প্রকৃতি আনন্দ ভরে
তব গুণ গান করে,
হে বিশেষ্য ! বিশেষণ সকলি তোমার !
তাই তব পদে করি কোটি নমস্কার।

দুই আমি

শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এক 'আমি,' নিশিদিন মত্ত এক পুতুল খেলায়,
আর 'আমি,' একা একা কেঁদে মরে মর্মের গভীরে।
এক 'আমি,' তাকে ঘিরে রূপরস প্রপঞ্চমায়ায়,
আর 'আমি,' নিশিদিন আমার সত্তারে খুঁজে ফিরে।
এক 'আমি,' কী বিস্ময় ! সে আমার অন্তকে চেনে না,
আর 'আমি,' মনে ভাবে কবে হবে ওর সাথে চেনা।

শ্রদ্ধার শক্তি

(একটি পুরানো গল্প অবলম্বনে)

স্বামী জীবানন্দ

সম্ভ্রান্ত ধনীর গৃহে এক মহাপুরুষ এসেছেন। লোকে লোকারণ্য। দলে দলে সকলে সাধুদর্শন করে ধন্য হচ্ছেন।

'কিন্তু এ কী! কেবল ধনীরাই কি এই মহাপুরুষের কৃপা লাভ করবেন? যারা গরীব তাদের ভাগ্যে কি দর্শনও নেই?' দরিদ্র পরান চাষীর মনে উঠল এই কথা।

দূরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে পরান জনস্রোতের দিকে এক দৃষ্টে, আর ভাবে: 'কত রয়েছে আমারই মত গরীব চাষী, তাঁতি, চামার, মুচী, দিনমজুর। সর্বহারা রিক্তের দল না পায় পেট পুরে দুবেলা দুমুঠো খেতে, না পায় পরনের কাপড়। কিন্তু তা না হয় হল, সাধুদর্শনে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য থাকবে কেন? সুন্দর বসনভূষণে সুসজ্জিত সম্ভ্রান্ত লোকদের কি এখানেও একচেটে ব্যাপার!'

দূরে পরানের ভাঙা কুটীর। গ্রীষ্মের রৌদ্র আর বর্ষার জল রোধ করবার ক্ষমতাও হারিয়েছে এ কুটীর। উপরি উপরি দুতিন বছর অজন্মা, ক্ষেতে খড় হয়নি, তাই ঘরও ছাইতে পারেনি।

কিন্তু গরীব হলে কি হয়! শিক্ষা-দীক্ষা না থাকলে কী হয়! পরানের ভক্তিবিশ্বাস ছিল খুব। প্রাণে তীব্র অভিলাষ হল—সাধুদর্শন করবেই। তার ফলে দারিদ্র্য ঘুচে যাবে, অভাব-অনটনের অবসান হবে।

দৃঢ় সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করবার জন্যে সুযোগ খুঁজতে থাকে শুভ মুহূর্তের।

বহুদিন পর সুবৃষ্টি হয়েছে। বোধহয় মহাপুরুষের আগমনের সুফল। সকলের দৃঢ় বিশ্বাস তাই। মরুভূমির মত শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল মাটি সূর্যের খরতাপে। ধরণী সুশীতল হয়েছে দেবতার অকৃপণ বর্ষণে। লোকের প্রাণে আর আনন্দ ধরে না, বিশেষ করে চাষীদের। এবার চাষ করলে ধান হবে প্রচুর। শস্যপূর্ণা হবে বসুন্ধরা।

পরানের প্রাণও আনন্দে ভরপুর। সে কাঁধে লাঙল, মাথায় বোঝা নিয়ে আর হাতে বলদ দুটির দড়ি ধরে ক্ষেতের দিকে চলেছে আপন মনে গাইতে গাইতে—

"মনরে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত' সোনা।"

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল: তার বহুআকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাসী তারই ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলেছেন; তবে তো ভগবান্ তার কথা শুনেছেন।

আহা কি সৌম্যদর্শন! অপরূপ রূপ—নয়ন জুড়িয়ে যায়।

বলদ দুটির দড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তোরা ঘাস খা, আমি আসছি।' পরান ছুটে গিয়ে করজোড়ে প্রণাম করে সাধুর সামনে দাঁড়াল, যেন কিসের প্রতীক্ষায়! সাধুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তার উপর। পরানের বহুদিনের সাধ সাধুসঙ্গ করবার, আজ সেই সাধ পূরণের সুযোগ এসেছে—এ সুযোগ যাতে বিফলে না যায়, এই ভয়ে মাথার বোঝা আর কাঁধের লাঙল নামাবারও তার অবসর হল না। আবেগ ভরে বলল,—'প্রভু, আমাকে কিছু উপদেশ দিন, যাতে আমার সব দুঃখ ঘুচে যায়।'

পরানের সর্বাঙ্গে ব্যাকুলতার তরঙ্গ খেলে চলেছে। সাধু দেখলেন, ব্যাকুলতা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর সামনে উপস্থিত। তিনি কত লোকের সংস্পর্শে এসেছেন এমনটিতো দেখেন নি; বললেন,

'তুমি উপদেশ নেবে, উপদেশ কি তুমি পালন করতে পারবে? কত কাজের মানুষ তুমি; সারাদিন চাষের কাজ, নয় ঘরের কাজে ব্যস্ত থাক। এই বৃষ্টি হয়েছে, এখন কাজ আরও বেড়েছে, সময়মত আবাদ না করলে যে ফসল হবে না।'

পরান বলল,—'প্রভু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ঠিক ঠিক আপনার উপদেশ পালন করব, একটুও ত্রুটি হবে না। আমি অশিক্ষিত, দরিদ্র চাষার ঘরে আমার জন্ম, ছোটবেলায় লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা ছিল খুব, কিন্তু সুযোগ হয়নি। অল্প বয়সে বাপ মা মারা গেলেন—সারা সংসারের ভার পড়ল আমারই ওপর। তবু রামায়ণগান কীর্তন-ভজন কোথাও হচ্ছে শুনলে ছুটে যাই, যদি কিছু মনের খোরাক পাই, যদি মনের ময়লা কাটে। শুনে শুনে কত গান আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, আপন মনে নির্জনে বসে সেই সব গান গাই অবসর সময়, আর কাজের সময়েও গানের সাথে সাথে কাজ করে চলি। মূর্খ আমি, আপনার কঠিন উপদেশ ধারণা করবার যোগ্যতা আমার নেই, যাঁরা জ্ঞানী গুণী তাঁদের সে শক্তি আছে; তাই আমার উপযোগী করে এমন একটি সহজ উপদেশ দিন যার মর্ম বুঝতে কোন কষ্ট না হয়। প্রাণও যদি যায় তবু আপনার উপদেশ পালন করব।' পরানের মুখ থেকে ঐকান্তিকতার সঙ্গে কথাগুলো বেরিয়ে এল। সন্ন্যাসী মুগ্ধ হলেন, বুঝলেন—জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলেই এমন ব্যাকুলতা, এমন সরলতা, চরিত্রের এমন দৃঢ়তা সম্ভব হয়েছে।

সত্যই আজ পরানের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ সমুপস্থিত। কখন যে কার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে কে জানে? দুর্লভ মহাপুরুষের সংশ্রয়! দুর্লভতর তাঁর কৃপা!

ক্ষণকাল নীরব থাকার পর সাধু প্রসন্ন গম্ভীর মুখে বললেন, 'মনের কথা শুনো না।' পরান গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে নিল। সাধু চলে গেলেন তাঁর তীর্থযাত্রার পথে।

'মনের কথা শুনো না' আকাশে বাতাসে এই কটি কথা অনুরণিত; পত্রের মর্মর-শব্দের মধ্যে যেন এই বাণীই প্রতিধ্বনিত। যে দিকে কান যায় এই একই ধ্বনি। কর্ণকুহরে যে শব্দ প্রবেশ করে তাই শ্রীগুরুর বাণী। ধন্য পরান, সার্থক তার জীবন!

পরানের মন বলল, 'এখনতো তোর সাধুসঙ্গের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, এইবার কাঁধের লাঙ্গল নামা, মাথার বোঝা মাটিতে রাখ—আর কতক্ষণ এভাবে থাকবি?' পরান উত্তর দেয়,—'ওরে মন, তোর কথা আর শুনবো না, এযে আমার গুরুর আদেশ। গুরুর কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তাঁর উপদেশ কখনও লঙ্ঘন করব না।' মন যুক্তি দেখায়—'কাজ না করলে খাবি কি? ছেলেমেয়ে মানুষ করবি কি করে? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে? জমিতে চাষ দিতে হবে, বীজধান ফেলতে হবে। ঐ দূরে বলদ জোড়া চরছে, ধরে নিয়ে এসে চাষে লেগে যা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে। সব লোক কাজ করে চলেছে, দেখতে পাচ্ছিস্ নে।'

পরান বলে, 'তোর কথা আর শুনছি না, এই পঞ্চাশ বছর ধরে তোর কথামত চলে আসছি—কিন্তু কী লাভ হয়েছে আমার? যে দুঃখ সেই দুঃখই তো রয়েছে, বরঞ্চ আগের চেয়ে বেড়েছে। তুই যখন যা বলেছিস্ তাই করেছি, কখনও তো অবহেলা করিনি। তোর কথা শুনে আমার কিছুই উপকার হয়নি। এখন থেকে আর তোর মতে চলব না।'

তামাক খাওয়া পরানের খুব প্রিয়। যখনই পরিশ্রান্ত বোধ করে তখনই তামাক খায়। অনেকক্ষণ তামাক খায় নি, খুব ইচ্ছা হল তামাক খেতে। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেতেই মিলিয়ে যায়, এমনি তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

বহুক্ষণ একভাবে মাথায় বোঝা, কাঁধে লাঙ্গল নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তার পা অবশ হয়ে আসে; বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু গুরুবাক্যে অটল পরান স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—যেন সুমেরুর মতো অচল! দ্বিপ্রহর অতীত হতে চলেছে, আহারের সময় হল। ক্ষুধা-তৃষ্ণাও পেয়েছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। বাড়ি যাবার উদ্যোগ করে না। মন বলে, 'বাড়ি চল্।' মনের সঙ্কল্প মনেই লীন হয়ে যায়, যেখানে উৎপত্তি সেখানেই লয়!

এতো দেরি হচ্ছে কেন? অন্যদিন তো এমন হয় না,—স্ত্রী চিন্তিত হয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছে। ছেলে এসে কত ডাকাডাকি করে। পরান কিন্তু এক পাও নড়ে না। একভাবে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অগত্যা ছেলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দেয়। বাড়ির লোকেরা ও পাড়াপড়শীরা—ব্যাপার কি—দেখতে ছুটে আসে। পরানকে নিয়ে যাবার জন্যে কত সাধ্য সাধনা করে, সবই বিফলে যায়। সংসারের মায়া যেন তাকে আর বাঁধতে পারে না। এইরূপে একভাবে তিন দিন তিন রাত্রি কাটল। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, প্রাণসংশয় হবে নাকি? তবু সে বিচলিত হয় না। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন! শরীরতো যাবেই, দুদিন আগে আর দুদিন পরে;—তবে গুরুর আদেশ-পালনে যাওয়াই ভাল।

ভক্তের দৃঢ়তায় আর গুরুবাক্যে নিষ্ঠায় ভগবানের আসন টলল। ভক্তেরই যে ভগবান্! ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান লক্ষ্মীদেবীকে খাদ্যপানীয় নিয়ে গিয়ে পরানকে দিতে বললেন।

বৈকুণ্ঠ থেকে স্বয়ং লক্ষ্মী আহার্য নিয়ে সামনে উপস্থিত। অহো ভাগ্যম্! মা লক্ষ্মী বললেন, 'বাবা, তুমি তৃষ্ণায় কাতর, তোমার জন্য সুশীতল পানীয় এনেছি—এই নাও, আর এই খাবার খাও। তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা সব চলে যাবে, মনে শান্তি পাবে।'

দিব্যাভরণভূষিতা দেবীর হাতে অপূর্ব খাদ্যপানীয় দেখে ক্ষুধার্ত পরানের মন খাদ্যগ্রহণে অভিলাষী হল। কিন্তু সে যে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করবে না, তাই লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধও রক্ষা করতে পারল না।

লক্ষ্মীদেবী তাকে আবার বললেন 'আমার কথা শুনলে তোমার ভাল হবে বাবা, সামনের মঙ্গলকে ছেড়ে কেন অনিশ্চিতের আশায় আছ?'

পরান কাতরস্বরে বলে, 'মা, তোমার কথা শোনবার জন্যে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল, কিন্তু কি করব উপায় যে নেই।'

মা লক্ষ্মী অবাক্ হয়ে বলেন, 'উপায় নেই, সে কি কথা '

পরান আবেগভরে বলে যায়, "মা, গুরু আমায় বলেছেন, 'মনের কথা শুনো না' আমি কেমন করে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করি। প্রাণ যায় তাও স্বীকার, আমি গুরুর আদেশ অমান্য করব না। তুমি অসন্তুষ্ট হয়ো না মা, আমি নিরুপায়।"

লক্ষ্মীদেবী এই অদ্ভুত ভক্তের অভূতপূর্ব গুরু-ভক্তির কথা ভগবানের কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন। ভগবান বিষ্ণু তখনই চতুর্ভুজ মূর্তিতে আহার্যহস্তে উপস্থিত হলেন। পরান শ্রীভগবানের অপরূপ রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কে আপনি, কেন এখানে এসেছেন?' ভগবান্ উত্তর দেন, 'দেখছ না, আমি স্বয়ং বিষ্ণু। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তোমার গুরুভক্তিতে আমি মুগ্ধ, তোমার শ্রদ্ধায় আমার চিত্ত পুলকিত। আমি তোমাকে বর দিতে এসেছি। তোমার মন যা চায়, তাই প্রার্থনা কর। অতুল ঐশ্বর্য, অমিত বিক্রম, পুত্র পরিজন যা তোমার ইচ্ছা চাও, কোন প্রার্থনাই তোমার অপূর্ণ রাখব না। আর এই অমৃততুল্য আহার্য গ্রহণ কর।'

শ্রীভগবানের দিব্য মূর্তি তাঁর অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী ও সুগন্ধি খাদ্য পরাণের মন হরণ করল। আজ তিন দিন সে উপবাসী, পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, পানীয়-গ্রহণের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হল। মন বলে, 'পরান, অমৃত গ্রহণ করে জীবন ধন্য কর'।

শ্রীগুরুর উপদেশ স্মরণ হতেই মনে মনে বলে, 'না কিছুতেই কথা শুনছি না, যা হয় হোক্।' পরান ভগবানকে মিনতি করে জানায়, 'ঠাকুর আপনার আহার্য পানীয় বর কিছুই আমি চাই না। আমার মন এগুলি চায়, কিন্তু গুরুর আদেশ—'মনের কথা শুনো না'। আপনি আমার উপর রুষ্ট হবেন না, আমি কিরূপে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করি?'

ভগবান্ দেখলেন, গুরুগতপ্রাণ ভক্ত গুরুবাক্যে হিমাদ্রির মতো অচল অটল। কিন্তু এভাবে বেশীক্ষণ থাকলে প্রাণ তো থাকবে না। তাই প্রসন্ন হাস্যে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে তার বহু প্রশংসা করে বললেন, 'গুরু যা বলেন তা তো শুনবে? তাতে তো কোন বাধা নেই।'

পরান সানন্দে বলে ওঠে, 'নিশ্চয়ই, তিনি যে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তাঁর কথা শুনব না তো কার কথা শুনব।'

এইবার ভগবান স্বয়ং তার গুরুকে নিয়ে এলেন। সাধু পরানকে প্রাণভরে আলিঙ্গন করলেন। গুরু-শিষ্য উভয়েরই দরদর ধারায় প্রেমাশ্রু নির্গত হচ্ছে। সম্মুখে শ্রীভগবান্ স্বয়ং। কী সুন্দর চিত্তবিমোহনকারী দৃশ্য!

গুরু শিষ্যকে সম্বোধন করে বলেন, 'পরান, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার সাধনা, আজ তোমারই পুণ্যফলে আমিও ভগবানের দর্শন পেলাম। এখন যাও, স্নান করে এস।'

গুরুভক্ত বীর গুরুর আদেশ পেয়ে তৎক্ষণাৎ স্নান করে এল। তখন গুরু শিষ্যের সঙ্গে ভগবানের পূজা করে প্রণাম করলেন—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শিষ্য গুরুর আদেশে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করল। ভগবান গুরুশিষ্যকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন। গুরুশিষ্য উভয়েরই জীবন সার্থক হল।

অশিক্ষিত কৃষকের প্রাণে গুরুর বাক্যে অচলা শ্রদ্ধা ছিল বলেই তার পক্ষে ভগবান বিষ্ণু-প্রদত্ত বর এবং লক্ষ্মীদেবীর আহার্যও প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়েছিল, তথাপি তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি ভক্তকে প্রত্যাখ্যান করা। গুরুবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাসই শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধাই সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার শক্তি দেয়। পরান মনের বশ্যতা অস্বীকার করে যে মুহূর্তে বাসনাশূন্য হল, অমনি তার নির্মল অন্তঃকরণে ভগবানের আবির্ভাব হল।

বাসনাই তো সংসার; বাসনার নাশেই সংসারের নাশ। বাসনার নাশ হলেই ভগবদ্দর্শন হয়। গুরুনির্দিষ্ট পথে শ্রদ্ধা নিয়ে সাধনা করলে শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত অতি সাধারণ মানুষও ভগবৎকৃপা-লাভে ধন্য হয়।

ঈশ্বরকে পেতে হলে খুব উদার সরল হতে হবে। বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না।

সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়। সরল হলে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাটকরা জমি—কাঁকর কিছু নাই; বীজ পড়লেই গাছ হয় আর শীঘ্র ফল হয়।

অবতার

৺যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এ, রায় বাহাদুর

(পূর্বানুবৃত্তি)

[বিগত পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির প্রারম্ভে সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য। উঃ সঃ]

ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম—যিনি দিক্‌কালের অতীত, সুতরাং সর্বতোভাবে অচিন্তনীয় (কারণ মানবের চিন্তাশক্তি দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ) —তিনি পরিমিত মানবদেহে রোগ শোক জরা বার্ধক্যাদি ভোগের জন্য কেন আবদ্ধ হইবেন? সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য ?

সাধুও ঈশ্বরের সৃষ্ট, অসাধুও ঈশ্বরের সৃষ্ট। যাহার উচ্চ প্রবৃত্তিগুলির এখনও বিকাশ হয় নাই সেই ত অসাধু ; যখন বিকাশ হইবে, তখনই সে সাধু হইবে। সেই হতভাগ্যদের বিনাশের জন্য স্বয়ং পরমেশ্বরের দেহধারণ করিবার কি প্রয়োজন? আর যদি মনুষ্যরূপই ধারণ করিলেন, তবে দুষ্কৃতকারী-দিগকে সাধু করিয়া তাহাদের উদ্ধারসাধন করিলেই তো হইত, বিনাশে কি বেশী বাহাদুরি? অসাধুর সংখ্যা তো বেশী। সকলের বিনাশ করিতে হইলে তো ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হইবে। পক্ষান্তরে, সাধুদিগের উদ্ধার করা—তেলা মাথায় তেল দেওয়া, সেজন্য ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন ?

ভগবান যদি বহু শতাব্দী পরে পরেই অবতীর্ণ হন, তবে মধ্যবর্তীকালের যত সাধু ও অসাধু লোক তাহাদের উদ্ধারের ও বিনাশের জন্য কি ব্যবস্থা হয়? তাহাদের জন্য যে ব্যবস্থা, অবতারকালের সাধু ও অসাধুদের জন্য সেই ব্যবস্থা হইলেই বা ক্ষতি কি ?

কেবল মানুষের জন্যই ভগবানের এত কষ্ট স্বীকার কেন? কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী আদি কত অনন্ত কোটী প্রাণী রহিয়াছে। পৃথিবীর মত কত অনন্ত কোটী গ্রহ রহিয়াছে। পরমেশ্বরের কাছে সকলই সমান। মনুষ্য-অবতার স্বীকার করিলে ভগবানকে পশু পক্ষী কীট সরীসৃপ ইত্যাদি সর্ববিধ অবতারই স্বীকার করিতে হয়। পৌরাণিক মৎস্য-কূর্মাদি অবতারও মনুষ্যের উপকারার্থে হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, তাহাতে মৎস্য-কূর্মাদি প্রাণীর কোন উপকার হয় নাই। পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহে এবং সর্ববিধ প্রাণীর মধ্যে যদি তাঁহাকে জন্ম স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরকে কেবল অবতাররূপেই ঘুরিতে হয়। সৃষ্টির অন্য সমস্ত অংশ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর কেবল মনুষ্যের প্রতিই ভগবানের পক্ষপাতিত্ব কেন ?

আর তাঁহার অখণ্ডনীয় অপরিবর্তনীয় নিয়মেই তো ধর্ম সংস্থাপিত রহিয়াছে। এই অখণ্ডনীয় নিয়মেই তাঁহার লীলা চলিতেছে। যেমন যন্ত্র দ্বারা কোন স্থানের বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া লইলে চতুর্দিক হইতে নৈসর্গিক নিয়মের বলে আপনিই সেই স্থানে বায়ু প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে,—যেমন দুইটি তরল পদার্থ এক আধারে রাখিলে লঘুটি প্রথমতঃ নীচে থাকিলেও উপরে উঠিতে চেষ্টা করে,—সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টির ক্রমশঃ বিকাশের যে বিধান রহিয়াছে, কোনও কারণে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, (ভগবদ্গীতার কথায়—কোনও কারণে ধর্মের গ্লানি হইলে), প্রাকৃতিক নিয়মের বলেই যেখানে যেটির থাকা উচিত, সেটি সেইখানে আসিবে, এই নিয়মেই সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত আছে, আর এই নিয়ম বা বিধানের নামই ধর্ম।

এই ধর্ম সনাতন—অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভ হইতে প্রলয় পর্যন্ত একই ভাবে থাকিবে। জগতের প্রতি পরমাণু এই বিধানে বা ধর্মে চালিত : যেমন অগ্নির

ধর্ম দাহ করা, জলের ধর্ম সিক্ত করা, মেঘের ধর্ম বর্ষণ করা, আলোকের ধর্ম প্রকাশ করা, সেইরূপ জীবের ধর্ম বিকাশের বা উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া। এই বিকাশোন্মুখী প্রবৃত্তির স্ফুরণেই ক্রমে কীটাণু হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং কালে মনুষ্য হইতেও মহত্তর জীবের সৃষ্টি হইবে। যে কার্য এই বিকাশ বা অভিব্যক্তির মুখ্য-ভাবে বা গৌণভাবে অনুকূল, তাহাই পুণ্য কার্য; আর যাহা মুখ্যভাবে প্রতিকূল তাহাই পাপ। ধর্মাধর্ম প্রভৃতি কথাগুলি সংকীর্ণভাবে সচরাচর মনুষ্যের কার্যকলাপের প্রতি প্রযুক্ত হয়, কিন্তু জড় জগৎ এবং ইতর প্রাণিগণও যে, ধর্ম দ্বারা চালিত সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। জড় জগতের জড় ধর্মগুলি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। চেতন জগতের ধর্মগুলি মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। জড় জগৎ যেমন অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন, চেতন জগৎ বা অন্তর্জগৎও সেইরূপ অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন। কি জড় জগৎ, কি চেতন জগৎ, কোথাও ধর্ম অসংস্থাপিত হইতে পারে না। এক মুহূর্ত অসংস্থাপিত হইলে তখনই সমস্ত সৃষ্টি বিনষ্ট হইবে। যতদিন সৃষ্টি আছে—(সৃষ্টির আরম্ভ বা বিনাশ মনুষ্যের চিন্তা-শক্তির অতীত)—ততদিন ধর্ম অসংস্থাপিত হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। সুতরাং তাহা পুনঃ-সংস্থাপন করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানের মানবদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা কি?

একটি লোককে আজন্ম কোন গৃহমধ্যে এমন ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, সে জীবন-ধারণোপযোগী যাবতীয় কার্যই করিতে পারে, কিন্তু আকাশ দেখিতে পায় না। সে হয়তো মনে করিবে যে আকাশে সূর্য নামক কোন পদার্থ নাই। যদিও লোকের মুখে শুনিয়া অথবা নিজের অনুমান দ্বারা সে স্থির করে যে সূর্য আছে, এবং তাহারই আলোকে সে গৃহমধ্যস্থ সকল পদার্থ দেখিতে পাইতেছে—তখনও হয়তো সে মনে করিবে যে, সূর্যটা মাঝে মাঝে নিভিয়া যায়, আবার জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু সূর্য নিভেও না, জ্বলেও না। অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীনে সূর্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে। আজন্ম গৃহবদ্ধ ব্যক্তি তাহা প্রত্যক্ষ করে নাই, অথবা অনুমান দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই বলিয়াই সূর্যালোকের আবির্ভাবের ও তিরোভাবের ব্যাপার লইয়া গোলযোগে পড়িয়াছে। সেইরূপ পরিমিতবুদ্ধি মানুষ আমরা সংসারের দুঃখকষ্ট, জ্বালাযন্ত্রণা, রোগশোক, জরামরণাদি দেখিয়া মনে করি—বুঝিবা ধর্ম এ জগতে নাই, বুঝিবা ভগবান অবতীর্ণ হইয়া আবার ধর্মকে কিছুদিনের জন্য জগতে স্থাপিত করিয়া দিয়া যাইবেন—ধর্মের কল কিছুদিন চলিবে, যখন দম ফুরাইবে, তখন ভগবান আসিয়া আবার দম দিয়া যাইবেন। ভগবানের কলের শক্তি যে অফুরন্ত, এ কল যে চিরকালই চলিতেছে এবং চিরকালই চলিবে, এ কল যে থামিতে পারে না, তাহা আমাদের মনে হয় না। ভগবানের কল যদি থামিলই তবে তাঁহার ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল? বিশ্বকর্মার কলে খুঁত নাই, মেরামতের দরকার হয় না। কলের এমনই গুণ, যে ভগ্ন স্থান আপনিই জোড়া লাগে। যখন যেটির দরকার তাহা আপনিই হয়। জন্মিবার পূর্বেই মাতৃস্তনে খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই কি পশুপক্ষী, কি মানুষ সকল প্রসূতির বুকেই সন্তান-স্নেহের আবির্ভাব হয়। কেবল তাহাই নহে, মানুষের অব্যক্ত শক্তিগুলি ক্রমশই ব্যক্ত হইতে চেষ্টা করে। মাধ্যাকর্ষণ যেমন নৈসর্গিক নিয়ম, এগুলিও তেমনই নৈসর্গিক নিয়ম। সৃষ্টি-রক্ষার জন্য—সৃষ্টিবিকাশের জন্য অনন্ত কৌশল।

এই যে সৃষ্টির বিকাশোন্মুখিতা, ইহা কোথায় গিয়া পরিণত হইবে, মানুষ তাহা বলিতে পারে না, ভাবিতেও পারে না। যেমন পদ্মকোরক হইতে পদ্মের বিকাশ, যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের বিকাশ,

সেইরূপ সৃষ্টি ক্রমেই ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততর হইতেছে। পূর্ণ অভিব্যক্তি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, যাঁহার এই লীলা তিনিই তাহা জানেন।

এ জগতে কিছুই স্থির নহে। সকলই গতিশীল। সায়ংকালের দীপশিখা, নিশীথসময়ের দীপশিখা এবং প্রভাতের দীপশিখা একটি বস্তু নয়। প্রতি নিমিষে দীপশিখার পরিবর্তন হইতেছে; কিন্তু লোকে দেখে যে ঠিক একটি দীপই সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্যন্ত অপরিবর্তিত-ভাবে জ্বলিতেছে। নদীর স্রোতে প্রতি মুহূর্তে নূতন জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু তুমি আমি দেখি যে, দশ বৎসর পূর্বেও যে গঙ্গা ছিল, আজও সেই গঙ্গা। মানব-শরীরের পুরাতন পরমাণুগুলি প্রতি সেকেণ্ডে অন্তর্হিত হইতেছে, আবার খাদ্যাদির সাহায্যে নূতন পরমাণু তাহার স্থান অধিকার করিতেছে; অথচ আমার মনে হইতেছে যে, আমার শরীরটা কালও যাহা ছিল, আজও তাহাই রহিয়াছে। বনের পুরাতন বৃক্ষগুলির স্থানে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, অথচ দর্শক মনে করিতেছে যে, বনটা বিশ বৎসর পূর্বেও যাহা ছিল, আজও তাহাই রহিয়াছে। জগতে সকলই গতিশীল সকলই পরিবর্তনশীল; ভাঙ্গিয়া গড়িয়া পুরাতন সর্বদাই নূতন হইতেছে। যাহা কিছু অচল হইল, তাহারই তখন বিনাশ আরম্ভ হইল। স্রষ্টা যে উদ্দেশ্যে তাহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সৃষ্টি-প্রবাহ প্রবাহিত রাখিবার জন্য, সৃষ্টির বিকাশের জন্য আরও নূতন কিছু চাই। যাহা চাই তাহারই আবার সৃষ্টি হইতেছে। সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক বিষয় কি জড় কি চেতন, সকলই মহাবেগে বিকাশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, দাঁড়াইবার উপায় নাই। যে দাঁড়াইল, সেই পড়িল; যে পড়িল সেই মরিল। হয় চলিতে হইবে, নয় মরিতে হইবে। যে মরিল—তাহার স্থানে তাহারই উপাদানে আবার নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইবে।

অপরিবর্তনীয় সৎপদার্থ কেবল একটি। অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায়, মনুষ্য তাহা কেবল অসম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে। তাহার স্বরূপ ধারণা করিতে মনুষ্যবুদ্ধি অক্ষম। সৃষ্ট পদার্থ সকলই অসৎ, অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল—মরণশীল। এই সৃষ্টিই ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতার দিকে যাইতেছে। জগতের অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও যে কথা, মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধেও সেই কথা। মনুষ্যের একটা অপরিবর্তনীয় আদর্শ থাকিলে, সেইখানে পঁহুছিয়া মনুষ্যসমাজ স্থিতিশীল হইত। কারণ সম্মুখে আর নূতন আদর্শ নাই। কিন্তু সৃষ্টির নিয়ম সেরূপ নহে। সৃষ্টির অন্যান্য অঙ্গের মত, মনুষ্য-সমাজও ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যখনই এই বিকাশের বাধা হয়, যখনই সমাজের প্রাচীন—সুতরাং বর্তমান অবস্থার অনুপযোগী রীতিনীতিগুলি অপরিবর্তিত এবং অপরিমার্জিত থাকিয়া বিষাক্ত রক্তের ন্যায় সমাজশরীরের ধ্বংস সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই স্বাভাবিক নিয়মের বলে সেই সমাজে এমন কোন মহাপুরুষের উৎপত্তি হয়, যিনি স্বীয় জীবনের কার্য দ্বারা এবং উপদেশ দ্বারা চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান-পূর্বক তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগকে উন্নতির পথ, বিকাশের পথ দেখাইয়া দেন।

হিমালয়ে এবং বল্মীকে যে পার্থক্য, দিবাকর এবং খদ্যোতে যে পার্থক্য, অশ্বত্থবৃক্ষ এবং দূর্বাঘাসে যে পার্থক্য, চক্ষুষ্মান্ ও জন্মান্ধে যে পার্থক্য, সেইসব মহাপুরুষ এবং সমসাময়িক অপরাপর মানুষের মধ্যে সেই পার্থক্য। মহাপুরুষের মহাশক্তি দেখিয়া লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পদানুসরণ করে। কখনও কখনও তাঁহার জ্ঞানের জ্যোতি এত প্রখর থাকে যে, লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, লোকে তাঁহার দিকে চাহিয়া সব অন্ধকার দেখে। সে মহাসূর্যের দিকে অনেকের চাহিতেই সাহস হয় না। তখন লোকে তাঁহাকে বোঝেও না, চিনেও না;

তাঁহাকে আগুনে পোড়ায়, ক্রুশে বিদ্ধ করে, কারাগারে বদ্ধ করে, দেশছাড়া করে। তারপর যখন সে মহাপুরুষ পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন লোকে তাঁহার উপদেশ এবং কার্য একটু একটু বুঝিতে আরম্ভ করে। তখন পৃথিবীর যত সম্রাট, যত সিজার, যত বাদশাহ তাঁহার একগাছি চুলের উপর, একখানা অস্থির উপর বা একটি দন্তের উপর পিরামিড বা মন্দির নির্মাণ করিতে বসেন। তিনি যে নদীতে স্নান করিতেন, তাহার এক ফোঁটা জল মস্তকে দিয়া মানুষ মনে করে যে, তাহার অন্তঃশুদ্ধি বহিঃশুদ্ধি, সব হইল। তিনি যে স্থানে বসিতেন, তাহার ধূলি অঙ্গে মাখিয়া আমরা পবিত্র হই; তাঁহার উপদেশ বা জীবনচরিত যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, সেই গ্রন্থের পূজা আরম্ভ করি। এই সব মহাপুরুষ তখন স্বয়ং পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচারিত হন। ইঁহারা ইঁহাদের সমসাময়িক মানুষের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর, অনেক বিকাশ-প্রাপ্ত। ইঁহাদের আবির্ভাবও প্রাকৃতিক অন্যান্য ব্যাপারের মত অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন। যে নিয়মে গ্রীষ্মের পর বর্ষা, নির্বাতের পর তুমুল ঝড়, রাত্রির পর দিবস, সেই নিয়মেই ইহাদের আবির্ভাব। যখন তাঁহাদিগের অত্যন্ত আবশ্যকতা যখন তাঁহারা না আসিলে সমাজ যায় যায়, তখনই তাঁহারা আসেন। আর যদি আবশ্যক সময়েও না আসেন, তবে সে সমাজ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। সে সমাজের যখন আর বিকাশ হইল না, তখন তাহার বিনাশ নিশ্চিত। এ সংসারে অপ্রয়োজনীয় পদার্থের স্থান নাই।

চিকিৎসক বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্য-শরীরের এমনই গঠন যে, যাহা কিছু শরীরের পক্ষে অপকারী, তাহা বিদূরিত করিবার চেষ্টা সৃষ্টির নিয়মানুসারে স্বতই হইয়া থাকে। সমাজশরীরে এই চেষ্টার বহির্বিকাশ—মহাপুরুষের আবির্ভাব। শরীরের বিষ-নিষ্কাশিকা শক্তি বিষের শক্তি অপেক্ষা দুর্বল হইলে যেমন শরীরের বিনাশ নিশ্চিত, সেইরূপ আবশ্যক সময়ে মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইলেও সমাজের বিনাশ নিশ্চিত। সে বিনষ্ট সমাজের স্থান শূন্য থাকিবে না। বিকাশের উপযোগী অন্য নীরোগ নূতন সমাজ তাহার স্থান অধিকার করিবে। সৃষ্টির এই যে অখণ্ডনীয় নিয়ম, এই নব নব বিকাশ,—ইহাই ধর্ম। এই বিকাশশীলতা-রূপ ধর্মের যখনই কোন প্রতিবন্ধক হয়—অর্থাৎ যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়—তখনই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। যিনি স্রষ্টা--তিনি কিরূপে স্বয়ং সৃষ্ট হইবেন, তাহা বুঝা যায় না। জগদীশ্বর সকলই পারেন, কেবল একটা জিনিস পারেন না,—তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য লোপ করিতে পারেন না। ঐশ্বর্যহীন জগদীশ্বর, বৃক্ষত্বহীন বৃক্ষ, ঘটত্বহীন ঘট, ত্রিভুজত্বহীন ত্রিভুজ ইত্যাদির সত্তাই অসম্ভব; অন্ততঃ মনুষ্য-বুদ্ধিতে ইহাদের অস্তিত্বের ধারণা হয় না। ঈশ্বর যদি সৃষ্ট হইলেন, তবে তাঁহার ঐশ্বর্য লোপ হইল; তিনি দেশকালে আবদ্ধ হইলেন; তিনি ত্রিগুণের বিষয়ীভূত হইলেন।

জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে প্রতিদেশেই সময় সময় মহাপুরুষগণের আবির্ভাব দেখা যায়। তাঁহাদের উৎপত্তির আবশ্যকতা না থাকিলে তাঁহাদের আবির্ভাব হইত না। বৈদিক কর্মকাণ্ড-মূলক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে যখন দেশ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রায় তিরোহিত, তৎস্থলে আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞাদির বহুল অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যজ্ঞস্থলে লক্ষ লক্ষ পশু হত হইতেছে, পশুরক্তে বসুন্ধরা কর্দমাক্ত, তখনই করুণাঘন বুদ্ধ-দেবের আবির্ভাব হইল; বিশ্বজনীন মৈত্রী বিঘোষিত হইয়া পৃথিবীময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আবার বীরাচারী তান্ত্রিকদের পাশব আচারে যখন দেশে মদ্য-মাংসাদির স্রোত বহিতেছে, প্রেম ও ভক্তি তিরোহিত, তখনই প্রেমঘনমূর্তি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইল। প্রেম ও ভক্তির

স্রোতে নাস্তিকতা, পশুত্ব সব ভাসিয়া গেল। ইহুদী পুরোহিতদিগের বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানে, জগজ্জয়ী রোমকদিগের দাম্ভিকতা, অত্যাচার এবং বিলাসিতায়, ষ্টোইক্ এবং ইপিকিউরিয়ান-দিগের শুষ্ক দার্শনিক মতে যখন পাশ্চাত্ত্য জগৎ শুষ্ক সাংসারিকতার এবং ভক্তিবিশ্বাস-হীনতার চরম সীমায় আসিয়া পহুঁছিয়াছিল, তখনই যীশুখ্রীষ্ট আবির্ভূত হইলেন। আবার খ্রীষ্ট ধর্ম যখন বাহ্যক্রিয়াকাণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, আরবীয়দিগের পৌত্তলিকতা অতি কদর্য আকার ধারণ করিল, তখনই হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাব। ধর্মজগতে ইয়োরোপ-খণ্ডে—এইরূপে উইক্লিফ্, ইগ্নেশিয়াস, ফ্রান্সিস্, লুথার, ওয়েসলি, এবং ভারতে শঙ্করাচার্য, নানক, কবীর, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ—যখন যাঁহার আবশ্যক হইয়াছে, তাঁহারই আবির্ভাব হইয়াছে। চিন্তা-জগতেও সক্রেটিস, গ্যালিলিও, কাণ্ট; রাজনীতি-ক্ষেত্রে ক্রমওয়েল, ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, ম্যাটসিনি, গারিবলডি, উইলবারফোর্স, হাওয়ার্ড—যখন যাঁহার আবশ্যক হইয়াছে তাঁহারই আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই নৈসর্গিক নিয়মের ফলভূত মনুষ্য; সমাজের উন্নতির জন্য, বিকাশের জন্য মনুষ্য-সমাজ হইতেই উদ্ভূত।

মহাপুরুষদের যখন আবশ্যক হয় তখনই তাঁহারা আবির্ভূত হন—এ কথার অর্থ এই নয় যে, যদি যজ্ঞভূমিতে অসংখ্য পশুহত্যা না হইত, তবে শাক্যসিংহ জন্মিতেন না; যদি ফরাসী দেশে বহু শতাব্দী যাবৎ রাজা রাজকর্মচারী এবং অভিজাত-গণের অত্যাচার চরম সীমায় না পহুঁছিত—যদি ফরাসী বিপ্লব না হইত, তবে নেপোলিয়ন নামক কোন ব্যক্তিরই জন্ম হইত না। যে কারণে শাক্যসিংহের বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির আবশ্যক হইয়াছিল অথবা নেপোলিয়নের নররক্তপাত করা আবশ্যক হইয়াছিল, সেই সব কারণ না থাকিলে, তাঁহাদের জীবনচরিত হয়তো তাঁহাদের সমসাময়িক অপর দশ জনের ন্যায় হইত। তাঁহাদের যে শক্তির বিকাশে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল সেই শক্তি তাঁহাদের মধ্যে অবিকশিত অবস্থায়ই থাকিত। সমাজের যে রোগের চিকিৎসা তাঁহাদিগকে করিতে হইয়াছিল, সমাজ রুগ্ণ না হইলে—তাহাতে গ্লানি না হইলে—তাঁহাদের সে প্রতিবিধানশক্তির কথা জনসমাজে চিরকাল অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত।

এই সব সাধারণ লোকশিক্ষক অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর আর এক শ্রেণীর লোকগুরু পৃথিবীতে আসেন—যাঁহারা ঈশ্বরের অবতার! তাঁহারা স্পর্শমাত্র ইচ্ছামাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। অতি নীচ জঘন্য প্রকৃতির মানুষও তাঁহাদের আদেশে নিমেষে মহাসাধুতে পরিণত হয়। তাঁহারা আচার্যদের আচার্য; মানুষের মধ্য দিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। তাঁহাদের ভিতর দিয়া ছাড়া আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পারি না। তাঁহাদের উপাসনা না করিয়া আমরা পারি না; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই উপাসনার একমাত্র পাত্র—তাঁহাদের উপাসনা করিতে আমরা বাধ্য। ......যতক্ষণ আমাদের মনুষ্যদেহ ততক্ষণ মানুষের ভিতর দিয়াই মানুষের ভাবেই আমাদের ঈশ্বরকে পূজা করিতে হইবে। যতই আমরা কথা বলি না কেন, যতই চেষ্টা করি না কেন ঈশ্বরকে মনুষ্যমূর্তি ছাড়া অন্যভাবে আমরা চিন্তা করিতে পারি না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

নবধা ভক্তি

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য শ্রীভগবানকে লাভ করা—একথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বার বার বলিয়াছেন। ভগবান লাভ হইলেই চিত্তের প্রসন্নতা আনন্দ বা শান্তি লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে সূত মুনিগণকে এই কথাই বলিতেছেন :

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

(১।২।৩-সূতঃ)

"মহাভাগ মুনিগণ! ভগবান নারায়ণে যে অহৈতুকী ঐকান্তিকী ভক্তি, যাহার দ্বারা আত্মা বিশেষরূপে প্রসন্নতা লাভ করেন, তাহাই পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে "অহৈতুকী" ও "অপ্রতিহত" এই দুইটি বিশেষণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ঐকান্তিকী ভক্তি ভগবানের প্রতি ভালবাসা আনয়ন করে, ভালবাসা হইতে আকর্ষণ; ভগবানে আকর্ষণ মনকে সংসার হইতে সরাইয়া লইয়া যায়। এই আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়—অর্থাৎ মনুষ্য সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। স্বার্থ-বিজড়িত নহে বলিয়া অহৈতুকী ভক্তি ভগবানের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করে। ঐ প্রীতি হওয়ায় ভক্ত ভগবানকে স্বস্বরূপে দর্শন করে; এবং ভগবদ্দর্শনের ফলে যে জ্ঞান হয়, তাহা লাভ করিয়া ভক্ত ধন্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে:—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

(১।২।৭ সূতঃ)

"শ্রীভগবান বাসুদেবে ঐকান্তিকী ভক্তি হইতে শীঘ্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং অহৈতুকী ভক্তি হইলে অচিরেই জ্ঞানের উদয় হয়।"

ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করার উপায় ও ক্রম প্রহ্লাদবাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতে সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে, যথা :—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।

(৭।৫।২৩-প্রহ্লাদঃ)

"শ্রীবিষ্ণুর বিষয় শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ, তাঁহার চরণসেবা অর্চনা বন্দনা, তাঁহাতে দাস্য ও সখ্যভাব এবং তাঁহাকে আত্মনিবেদন এই কয়টি উপায়ে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ হয়।"

এই বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে যথা :—

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

(৭।৫।২৪-প্রহ্লাদঃ)

"এই নয় প্রকার ভক্তি যদি সাধক বিশ্বস্ত হৃদয়ে শ্রীভগবান বিষ্ণুর প্রতি অর্পণ করে, তাহা হইলে তাহাকেই (ভক্তিবিষয়ক) উত্তম শিক্ষা বলিয়া মনে করি।"

সাধারণ দৃষ্টিতে কথাগুলির এই অর্থ হয় : কর্ণ দ্বারা জাগতিক অন্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া শ্রীভগবান অচ্যুতের ও ভক্তগণের কথা শ্রবণ, বাক্য দ্বারা বৈষয়িক কোন কথা না বলিয়া নারায়ণের গুণকীর্তন, মন দ্বারা সাংসারিক চিন্তা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ও লীলা স্মরণ, হস্ত দ্বারা জাগতিক কর্ম না করিয়া শ্রীভগবানের মন্দিরাদি মার্জনা করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও তাঁহার বিগ্রহের সাজ-সজ্জা সাধন এবং তাঁহার ভক্তের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান দ্বারা তাঁহার সেবা, উপচারাদি দিয়া তাঁহার বিগ্রহের এবং আসনাচ্ছাদনাদিদানে তাঁহার ভক্তের পূজা, সংগীত স্তব স্তুতি সাহায্যে তাঁহার বন্দনা, তাঁহাকেই সর্ব-কর্মের প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিয়া সর্বক্ষণ তাঁহার

অন্য দাসভাবে অবস্থান, জীবনে মরণে অন্তরে বাহিরে তিনিই একান্ত আপনার এই চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রতি সখ্যভাব অবলম্বন; তাঁহা হইতেই জন্ম হইয়াছে, তিনি জীবন পরিচালিত করিতেছেন, শেষে তিনিই টানিয়া লইবেন, এই চিন্তা করিয়া তাঁহার কাছেই আত্মসমর্পণ। ইহাই নবধা ভক্তি, বা ঐকান্তিকী ভক্তি লাভের নয়টি উপায়।

অথবা সাধক মনে করিতে পারেন,—শ্রীভগবান ভিন্ন আর কেহই সংসারে নাই, সংসারে যাহা কিছু শোনা যায় সব তাঁহারই বাণী, যাহা কিছু বলা যায় সব তাঁরই কীর্তন, যাহা কিছু চিন্তা করা যায় সব তাঁহারই বিষয়, অতএব নিত্য তাঁহারই স্মরণ হইতেছে, হস্ত দ্বারা যাহা কিছু করা যায় সব তাঁহারই সেবা, বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁহারই বিভিন্ন মূর্তি অতএব যাহাকে যাহা দেওয়া হয় সব তাঁহাকেই নিবেদন, সব তাঁরই পূজা। এই ভাবেও ভক্ত সাধনা করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই নবধা ভক্তির প্রত্যেকটির কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। যথা শ্রবণ-বিষয়ে :—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্ ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

(১০।৩১।৯-গোপ্যঃ)

"হে নাথ! তোমার কথা অমৃতস্বরূপ, সংসার তাপে তপ্ত ব্যক্তির জীবনস্বরূপ, জ্ঞানীরাও ইহার গুণ গান করিয়া থাকেন, ইহা হৃদয়ের কালিমা নাশ করে। শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হয়, শান্ত হৃদয় ভক্তগণ চারিদিকে ইহার প্রচার করেন, এই প্রচারই শ্রেষ্ঠ দান স্বরূপ এবং তাঁহারাই অজস্রদানকারী যাঁহারা ভগবৎকথা প্রচার করেন।"

গৃহেষ্বাবিশতাং চাপি পুংসাং কুশলকর্মণাম্।
মদ্বার্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥

(৪।৩০।১৯-শ্রীভগবান্)

"গৃহে থাকিয়াও যাহারা অনিন্দিত কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম করে না, এবং আমারই কথা কীর্তন করিয়া কালযাপন করে, গৃহ তাহাদের বন্ধনের কারণ হয় না বলিয়া আমি মনে করি।"

স্মরণ-বিষয়ে গোপীগণের প্রতি উদ্ধবের বাক্য স্মরণীয়।

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ॥

(১০।৪৭।২৩-উদ্ধবঃ)

"অহো সাধ্বীগণ! শ্রীভগবান বাসুদেবে আপনাদের মন সমর্পিত হইয়াছে, আপনাদেরই মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে; আপনারাই সকলের পূজনীয়া।"

পাদসেবন-বিষয়ে ভগবান কপিল দেবহূতিকে বলিয়াছেন।

"জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্॥

(৩।২৫।৪২-কপিলঃ)

"মা! জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া নিজ কল্যাণার্থ যোগিগণ আমার ভয়শূন্য চরণযুগল আশ্রয় করিয়া থাকেন।"

অর্চনা বিষয়ে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন :

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্॥

(১১।২৭।৪৯-শ্রীভগবান্)

"কর্মযোগ, বৈদিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি যে কোন পথ অবলম্বন করিয়া মনুষ্য যদি আমার অর্চনা করে, তাহা হইলে আমার কৃপায় উভয় লোকে (ইহলোক ও পরলোকে) সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।"

ভগবানের শ্রীচরণবন্দনা-বিষয়ে অক্রূরের নিম্নোক্ত কথাও অতি সুন্দর :

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্॥

(১০।৩৮।৬-অক্রূরঃ)

"যোগীদের ধ্যানগম্য শ্রীভগবানের চরণকমলে

আমি আজ প্রণাম করিব, ইহাতে আমার যাবতীয় অমঙ্গল নষ্ট হইবে এবং মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে।"

উদ্ধব দাস্য ও সখ্য ভাবের কথা এইভাবে বলিয়াছেন :

"কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠ॥"
(১১।২৯।৪-উদ্ধবঃ)

"হে অচ্যুত! তোমার মিত্রতার শেষ নাই, এই জন্য তোমার যাহারা দাস তাহারা আর কাহাকেও আশ্রয় করে না, আপনাতেই তন্ময় হইয়া থাকে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। রাজা দিগেরও কিরীট আপনার আসনে লুণ্ঠিত হয়। এইরূপ নিখিলজনপূজ্য হইয়াও আপনি শ্রীরামচন্দ্র অবতারে সামান্য বানরের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে আপনি সখ্যভাবের জন্য কত ব্যগ্র।"

সখ্যভাবের কথা আরও সুন্দর ভাবে ব্রহ্মা বলিতেছেন :

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্॥
(১০।১৪।৩২-ব্রহ্মা)

"নন্দগোপ এবং অপর ব্রজবাসীদিগের আহা কি সৌভাগ্য। আহা কতই না ভাগ্য! স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, নিরতিশয় সুখস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সখা।"

আত্মনিবেদন-বিষয়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন :

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপাদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥
(১১।২৯।৩৪-শ্রীভগবান্)

"মনুষ্য যখন সমস্ত কর্মের কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া আমাতে আত্মনিবেদন করে এবং মৎকর্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমারই কর্ম করিবার ইচ্ছা করে, তখনই সে অমৃতত্ব লাভ করে এবং আমার আত্মস্বরূপ হইবার যোগ্য হয়।"

এই ভাবে নবধা ভক্তি সহায়ে শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হইলে সংসারের প্রতি মনুষ্যের অতি স্বাভাবিক ভাবে বৈরাগ্য হয়, এবং সে বৈরাগ্য অতি শীঘ্রই হয়। তখন বিষয়ের কথা শুনিতে, বৈষয়িক কথা বলিতে, বিষয় চিন্তা করিতে, বিষয়ীর পূজা বন্দনা দাসত্ব তাহার সহিত মিত্রতা ও তাহার হস্তে নিজেকে সমর্পণ করিতে একেবারেই ইচ্ছা হয় না। সে সকল কথা চিন্তা করিতেও তাহার ভাল লাগে না। উহাদের প্রতি ঘোরতর বিতৃষ্ণার উদয় হয়। এইরূপে স্বার্থবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে চলিয়া গেলে তখন অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া সূত বলিয়াছেন।

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥
(১।২।২২-সূতঃ)।

"এই সকল কারণবশতই পণ্ডিতেরা সানন্দে শ্রীভগবান বাসুদেবকে সেই প্রকার ভক্তি করিয়া মনের নির্মলতা সাধন করেন।" কোন হেতু নাই, স্বার্থবুদ্ধিরূপ মলিনতার লেশমাত্র নাই মনের এইরূপ ভক্তির ভাব, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে।

এই প্রকার ভক্তি হইলে সাধক অনুভব করে—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
(১।২।২৮-সূতঃ)

"বেদসমূহ শ্রীভগবানের ভাবই প্রকাশ করিতেছে, যজ্ঞ ও যোগ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আর ক্রিয়াকর্মেরও লক্ষ্য তিনি, সব তাঁহাকে ঘিরিয়া।"

বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥
(১।২।২৯-সূতঃ)

"জ্ঞানবিষয়ক যাবতীয় ভাবসকলের মধ্যে ভগবানেরই প্রকাশ, লোকে সেই প্রকাশ উপলব্ধি করিবার জন্যই তপস্যা করিয়া থাকে, ধর্ম ভগবানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাবতীয় সাধনার গতি একমাত্র সেই ভগবান।"

অতএব যিনি যে ভাবে পারেন সেই ভগবানের আরাধনা করুন,—এই কথা শ্রীশুকদেব বলিতেছেন :

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকামঃ উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
(২।৩।১০-শুকঃ)

"কাম্যবস্তু লাভের ইচ্ছায় অথবা কোনও প্রকার বাসনার বশবর্তী না হইয়া, অথবা উদারচিত্তে মোক্ষ মাত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায়, তীব্র (নিরন্তর প্রবাহশীল) ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার পরম লাভই হইবে।"

তখন শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয় ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য হয়, এ কথা কপিল তাঁহার মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন :

পশ্যন্তি মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি।"
(৩।২৫।৩৫-কপিলঃ)

"হে মাতঃ! এই সকল সাধকগণ, রক্তিমবর্ণ-নয়ন-শোভিত সহাস্যবদন-সমন্বিত আমার মনোজ্ঞ দিব্য ও বরদান-মূর্তি দর্শন করিয়া থাকেন। শুধু দর্শন করেন তাহা নয়, মনের সাধে আমার সঙ্গে কথাও বলেন।"

এমন পরম কারুণিক শ্রীভগবানের গুণেরও সীমা নাই, মহিমারও অন্ত নাই। তাই সেই পরম প্রেমিক পরম দয়ালকে মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধুরাও ভক্তি করিয়া থাকেন। সূত বলিতেছেন,

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
(১।৭।১০-সূতঃ)

"যে সকল মুনিরা নির্বিকল্প সমাধিযোগে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সর্ববন্ধন ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাদের আর সাধনার কোন প্রয়োজন নাই—তাঁহারাও পরম প্রেমিক বলিয়া যাঁহার কীর্তি বিশ্ববিশ্রুত—সেই ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বন করিয়া কালাতি-পাত করেন। শ্রীহরির এমনই মহিমা।"

এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন শ্লোক হইতে, বিভিন্ন লোকগুরুর বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানকে ভক্তি করিয়া সংসারের দুঃখসমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে গেলে, নিজের জীবনে শান্তি পাইতে গেলে নবধা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা সকলের বিশেষ কর্তব্য। ভক্তির আচার্যগণ সকলেই একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই নবধা ভক্তি এক পরম প্রকৃষ্ট পথ। ইহা অবলম্বনে জ্ঞানী পুরুষেরা, পরম ভক্তেরা এমনকি যাঁহারা শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাও আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের ভজনা করার নাম ভক্তি। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা; পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কাণে তাঁর ভাগবত ও নামগুণ কীর্তন শোনা। চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন,—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তবস্তুতি, তাঁর নামগুণ কীর্তন—এই সব করা।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

সমাজ-জীবনে ভোগ ও ত্যাগ

শ্রীবলাই দেবশর্মা

সমাজের প্রাচীন বিন্যাস-প্রথায় বিশেষ বিপর্যয় ঘটিতেছে। ইহাকে কালধর্মের অপরিহার্য পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া পরাজিত মনোবৃত্তিরই লক্ষণ। যে বিবর্তনকে প্রগতি বলিয়া অভিনন্দন করা হইতেছে, তাহা স্বৈরাচারের রূপান্তর মাত্র। হিন্দু-সমাজ-মানসিকতায় আসিয়াছে একটা লৌল্য। সুখের হিল্লোল। এই সুখ সেই 'ভূমা' নহে, ইহা 'অল্প'। ইহা পশু-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি। বর্তমান মানব নচিকেতার ন্যায় শ্রেয়ঃপন্থী না হইয়া—প্রেয়োবিলাসী হইয়াছে। জার্মান দার্শনিক নিট্‌শে তাহার মনের কথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন—We want the best food and the fairest woman.

প্রেয়পন্থার একটা অপরিহার্য কুপরিণতি আছে। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন—'জাতিগঠনের জন্য, সমাজ-সংহতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন—আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ মেধাবী মানব।' ক্ষুরধার শ্রেয়ঃপথে চলিতে না পারিলে মানুষ অন্ধতমে প্রবেশ করে, মহতী বিনষ্টির সম্মুখীন হয়।

ভোগলোলুপ আধুনিক সভ্যতা এই পথেই ধাবমান। ইহা কল্পনা নহে, ইহাই বর্তমান কালের বাস্তব ইতিহাস। এই যযাতি-মানসিকতার ভোগৈকলক্ষ্য সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়া সংসার অধঃপাতের শেষ সীমায় উপনীত। রাজনীতিবিৎ জনৈক পাশ্চাত্য মনীষীর ভাষায়—All Europe is rattling back into barbarism. বর্বরতা শব্দটার যথার্থ প্রয়োগ হয় নাই। বর্বরতা আপনার মূঢ়তায় আপনিই আচ্ছন্ন; আর আসুরিকতা নিজের সহিত অপরেরও অনিষ্ট-সাধনে তৎপর। বর্তমান মানব আসুরিক; এক দিকে ভোগে প্রমত্ত, অন্য দিকে অভিচারে ব্রতী। তাহার এক হাতে সহস্র কামনার সুরা-পাত্র, অন্য হাতে আণবিক বজ্র—অ্যাটম বম্‌।

মানবতার মহিমা রক্ষার জন্য প্রয়োজন চরিত্রের কাঠিন্য, ধর্মের ক্ষুরধার পথে চলিবার সংকল্প ও শক্তি। পশু ও মানবে জীবত্ব সাধারণ; জীবনের সহিত যে জীবত্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহা স্বভাবতই ভোগকাতর। সন্তানের যৌবন লুণ্ঠন করিয়া অনন্ত যৌবন ভোগের জন্য যযাতির মতো সকলেই ব্যাকুল। ভারত ভোগকে সংযমের বাঁধে বাধিতে চাহিয়াছে। তাই তপস্যায় অতন্দ্রিত থাকিবার বিধি, পদে পদে ব্রত নিয়ম, সংযম ও সদাচারের অনুসরণ। উপনিষৎ এই কারণেই উদাত্ত কণ্ঠে কহিয়াছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। জাগ্রত হও শুভ বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রেরণায়। গীতায় ইহারই ব্যাখ্যা ও নির্দেশ,—যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ। এই যুদ্ধ মনুষ্যত্ব-হীনতার বিরুদ্ধে। দম-শক্তি প্রয়োজন সংসারের স্থিতি ও শান্তির জন্য। অবৈধ কামনা মানুষকে ধ্বংসের ও অশান্তির পথে লইয়া যায়। ভোগপ্রমত্ত আধুনিক জগৎ ইহার দৃষ্টান্ত। সেদিন লণ্ডনের কতকগুলি খ্যাতনামা সংবাদপত্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিয়াছেন—লণ্ডন নগরের শিক্ষিত যুবকেরা নানা প্রকার কদর্য কর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অভিজাত বংশের পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নানা দুষ্কার্যের অনুষ্ঠাতা-রূপে অভিযুক্ত হইতেছেন।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা মানুষের মনুষ্যত্বকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই নানা ব্রত নিয়মের বিধান দিয়াছেন। শ্রুতি ব্রহ্মচর্যকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতুভূত বলিয়াছেন—এই ব্রহ্মচর্যের নিত্য নিরন্তর অনুষ্ঠানে মনুষ্যত্বের অগ্নি অনির্বাণ থাকে।

আমাদের বর্তমান সমাজ সেই ব্রহ্মচর্যের

আদর্শচ্যুত হইয়া ঘোরতর লাস্যভাবে ভাবিত হইয়া পড়িতেছে। চারিদিকে তাহার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। স্বাধিকার-প্রাপ্ত ভারতবর্ষ সমাজগঠনে, যে বিধি-ব্যবস্থাকে অনুসরণ করিতেছে, তাহা একান্ত ভাবে পরানুকরণ। বিবেকানন্দের কণ্ঠে ভৎ'সনা-বাক্য ধ্বনিত হইয়াছিল 'এই দাসসুলভ পরানুকরণ সহায়ে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা লাভ করিবে?' পরানুকৃতি আজ শ্লাঘার কারণ, প্রগতির লক্ষণ। স্বামীজী ভবিষ্যৎ ভারতকে প্রার্থনামন্ত্র দিয়া গেলেন, 'মা আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা! আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর।'

সমাজের প্রাচীন রীতিনীতি কুসংস্কার, অতএব তাহা পরিহার পূর্বক যে পুনর্গঠননীতি অবলম্বন করা হইতেছে, তাহাতে ইওরোপের ইন্দ্রিয়ভোগের পদ্ধতিই অনুসরণ করা হইতেছে। কোথায় নব্য-ভারতের অধিনেতা বিবেকানন্দের সতর্কবাণী, 'ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিওনা তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর,'—আর কোথায় জীবনের মান-বৃদ্ধির নামে ভোগবাহুল্য। সাধ্বী অরুন্ধতী ও তপস্বিনী উমার উত্তরসাধিকাগণ আজ কি ভাবে ভাবিতা? যে যযাতিবুদ্ধি হিন্দু সমাজে নিতান্ত অবজ্ঞেয় ছিল, তাহাই আজ হইয়া উঠিয়াছে পরম কাম্য!

অবশ্যই হিন্দু সমাজের যুগোপযোগী পুনর্গঠন প্রয়োজন, কারণ পাশ্চাত্ত্যের আধিব্যাধি হিন্দু সমাজে প্রবলভাবে সংক্রমিত হইতেছে। যাঁহারা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর উত্তরাধিকারিণী হইবার ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সিনেমার অভিনেত্রী হইবার জন্য ব্যাকুলা। যে ভারতভুবনের জনপদপতি একদিন শ্লাঘাসমৃদ্ধ কণ্ঠে কহিয়াছিলেন—

> ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপঃ।
> নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ?

সেই জনপদ বিস্তারে কদর্যতার প্লাবন বহিতেছে, কামনার বহ্নি জ্বলিতেছে।

সমাজের পুনর্বিন্যাসের জন্য আজ একান্তই প্রয়োজন আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ভাবের অনুশীলন। বিবেকানন্দের বীরবাণীকেই এখন মন্ত্ররূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে—"জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন"।

সন্ন্যাসীর অনুশাসন বাক্য অবজ্ঞা করিলে আমাদের মহতী বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী। দেশের দেহে মনে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

'বিবেকবাণী'কে উপেক্ষা করিয়াই আমরা সর্বনাশের সমীপবর্তী হইতেছি। দেশে অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিন যাহারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে জীবনকে তুচ্ছ করিয়াছে, তাহাদেরই পরবর্তিগণ আজ উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী। যে বুদ্ধি বোধি, মেধা মনীষা বিশ্ব জয় করিয়াছিল, তাহাই আজ পরমুখাপেক্ষী, পরানুকারী। প্রতীচ্যের সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসরণ করিয়া আমাদের আধুনিকতা এক বিকট ভাবদাস্যে মগ্ন হইতেছে।

ভারতবর্ষের বেদ-সম্মত সংস্কৃতি—ত্যাগের পথকেই জীবনাদর্শ বলিয়া বরণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য-ভাব-ভাবিত দেশ জীবনের মান উন্নয়নে আগ্রহশীল হইয়া ভোগপ্রতিযোগিতায় লিপ্ত—এই জন্যই রাষ্ট্রে, সমাজে, গৃহে প্রতিষ্ঠানে, জাতিতে জাতিতে, নর-নারীতে, শিক্ষকছাত্রে—নিরন্তর সংঘর্ষ। বিচার বিবেচনা করিয়া ভোগসাম্য লক্ষ্যে রাখিয়া পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই পুনর্বিন্যাস-পদ্ধতি কেমন হইবে, তাহা বিবেকানন্দ বারংবার বহু ভাবে বলিয়াছেন: "হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকা পরিত্যাগ করিও না। উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর। বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইহা প্রয়োজন। আমাদিগকে 'ত্যাগ' অবলম্বন করিতেই হইবে। এই ত্যাগ ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ।" এই ত্যাগের অনুসরণেই হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন সম্ভব হইবে। ঈশোপনিষদে সেই পরম আদর্শই উদ্ঘোষিত হইয়াছে—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

ত্যাগের পথেই ভোগসাম্য!

মায়ের পরিচয়*

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মায়ের পরিচয় তিনি মা। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র মায়ের আসন বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট। মা বহু কষ্ট সহ্য করেন তাঁর সন্তানের জন্য—কুপুত্র হলেও মা চিরদিন মা হয়েই থাকেন; সন্তানকে মানুষ করতে, তাকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, মায়ের ত্যাগ মায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আমাদের দেশে প্রবাদেই ফুটে উঠেছে:

কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।

আজ থেকে এক শত চার বছর আগে এই বাংলা দেশের এক অজ্ঞাতনামা গ্রামে আমাদের একটি মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মায়ের জন্মস্থান বলে জয়রামবাটি আজ প্রসিদ্ধ পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত।

শ্রীশ্রীমা বাল্যকাল থেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ আদর্শে গঠিত করেছিলেন। নিজে তিনি ছিলেন পরম-প্রভাময়ী, মূর্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা; স্বামীরূপে যে পরমপুরুষকে তিনি পেয়েছিলেন, সেই দেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশে নারীজাতির ধর্মজীবনের শুধু নয়, কর্মজীবনেরও আদর্শ এবং সাধনার পথ নির্দিষ্ট করে দেখাবার জন্যই মা তপস্যা ও সাধনা করে গেছেন।

নিজের জীবনে তিনি সেই মহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন যা সমগ্র ভারতীয় নারীর জীবনে কর্ম-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করতে পারে। বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতার আবহাওয়ায় নারীর মহান আদর্শ বিকৃত থেকে বিকৃততর হয়ে ধ্বংস হতে চলেছিল। ভারতীয় নরনারী ত্যাগ ভুলে কেবলমাত্র ভোগকেই গ্রহণ করেছিল, নিবৃত্তির কথা ভুলে প্রবৃত্তিকেই উচ্চ আসন দিয়েছিল। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মতই তারা ভেসে চলেছিল, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব; জ্ঞানের প্রদীপ হাতে করে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে-ছিলেন অন্ধকারে দিশাহারা জনগণকে পথ নির্দেশ করতে। সেইদিনকার দুর্নীতি ও অনাচারের মধ্যে তিনি প্রচার করেছিলেন—'ভোগে সুখ নাই—নিবৃত্তিতেই আছে শান্তি।' পথভ্রষ্ট জনগণের সামনে সত্যযুগের নির্দেশ দিয়েছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ।

জনগণের কল্যাণে, বিশেষ করে নারীজাতির কল্যাণের জন্যই মায়ের আবির্ভাব। স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী—শিবের শক্তি—পরমকল্যাণী শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে দেখেছিলেন দিব্য ভাবময় প্রজ্ঞাপূর্ণ এক মহাপুরুষ রূপে; শ্রীমায়ের মধ্যে ঠাকুর দেখতে পেয়েছিলেন পরমকল্যাণী জগজ্জননীকে—যার পরিচয়—তিনি মা, পরম স্নেহময়ী মা। তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে চিনেছিলেন—তাই তাঁদের মধ্যে ছিল না কোন আসক্তি, তাঁদের প্রেম ছিল অপার্থিব। ঠাকুর অনাসক্তভাবে দিয়ে গেছেন ধর্মসম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি শিক্ষা এবং মা ভক্ত শিষ্যার মতই সেই শিক্ষা গ্রহণ করে ভারতীয় নারীর ধর্মাদর্শ নিজের জীবনে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন।

সমগ্র নারীজাতির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণের ভার ঠাকুর তাঁর মাথায় তুলে দিয়েছিলেন, আর মা ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করে চলেছিলেন সারাজীবন।

ঠাকুর বারবার বলেছিলেন—'মেয়েদের আমি আর কয়জনকে দেখেছি। তোমার কাছে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আসবে—তোমাকে তাদের পথ দেখাবার ভার নিতে হবে।'

শ্রীমা প্রায় চল্লিশ বৎসর ঠাকুরের এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। নিজের কর্তব্য

* জয়নগর-মজিলপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাসংঘে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ।

হতে তিনি কোন দিন মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হন নি। পুরুষ, নারী ; ব্রাহ্মণ, শূদ্র ; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ; ভারতবাসী, ইংরেজ প্রভৃতি কোন বর্ণ বা জাতির মধ্যে তিনি ভেদ রাখেন নি। তাঁর কাছে সবাই ছিল সমান, মাতৃস্নেহে সকলকে সমান আদরে তিনি কোলে টেনে নিয়েছেন, অমৃতবাণী সকলকে দান করেছেন। সকলের মুক্তি এবং কল্যাণই ছিল সন্তানবৎসলা, সর্বসন্তাপহারিণী মায়ের প্রাণের একান্ত কামনা।

কেবলমাত্র ভক্তিমান গৃহস্থ বা ত্যাগী সন্ন্যাসীই নয়, কেবলমাত্র উচ্চবর্ণই নয়, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, সমাজের ঘৃণ্য পতিত বা পতিতা বহু নরনারী তাঁর পূত স্নেহধারায় অভিষিক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করেছে।

মায়ের মনে অপার স্নেহ ভালবাসা থাকলেও মা কোন দিনই অন্যায় সইতে পারেন নি। বাইরে তিনি ছিলেন ধীর, স্থির—বাঙ্গালীর ঘরের লজ্জানত বধূ, বাইরে হতে দেখে কেউ বুঝতে পারত না—এই মানুষটির ভিতরে রয়েছে অফুরন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি—অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই শান্তপ্রকৃতি নারীই দাঁড়াতেন অতি উগ্র ভীষণ মূর্তিতে—যার কল্পনাও অনেকে করতে পারে না।

নারীজাতিকে গঠন করা ছিল তাঁর পরম লক্ষ্য। তিনি মেয়েদের লক্ষ্য করে বহু উপদেশ দিয়ে গেছেন—যেমন "সহ্য গুণ বড় গুণ। মেয়েদের লজ্জা থাকা ভাল। ঝগড়াটে হওয়া ভারী অলক্ষণ—ওতে সংসারের শ্রী নষ্ট হয়ে যায়।"

"সবাইকে ভালবাসতে শেখো"—এই ছিল মায়ের প্রধান উপদেশ ; কেউ যেন কারও দোষ-ক্রটি না দেখে, কারও মনে কষ্ট না দেয় ; সংসারের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভগবানকে স্মরণ করুক, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

মা বলেছেন—সব মানুষই শান্তি চায়, কিন্তু শান্তি কি সহজে পাওয়া যায় ? মন হতে ভোগ-বাসনা দূর না হলে শান্তি পাওয়া অসম্ভব। ভুলেও ভগবানকে একটিবার ডাকবে না, এতে আর কি করে শান্তি হবে ?

কর্মফল ভোগ করতে হবেই—তবু ঈশ্বরের নাম করলে যে বোঝা ভারী মনে হতো, সে বোঝা হবে হাল্কা—এই ছিল মায়ের শিক্ষা।

আমাদের পরম পুণ্য যে, আমাদের মাকে আমরা এই বাংলার বুকেই পেয়েছি। এই বাংলার কৃষ্টি সভ্যতা ও ধর্মের আবেষ্টনীর মধ্যে এই বাংলার মাটিতে এসেছিলেন আমাদের জগন্মাতা—আমাদের কম গৌরবের কথা নয়।

মায়ের সুন্দর সুন্দর উপদেশ আমরা যেন না হারিয়ে ফেলি। মায়ের আদর্শ শুধু আমাদের নয়, আমাদের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের সামনে জ্যোতির্ময় হয়ে ফুটে থাকবে, এই কামনাই আজি করছি। পরমা প্রকৃতি স্নেহময়ী মায়ের পূত আশীর্বাদ অক্ষয় অভেদ্য বর্মের মতই তাঁর সন্তানদের আচ্ছাদিত করে থাক—তাদের সকল আপদ বিপদ হতে রক্ষা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিক, আজ মায়ের জন্মদিনে আমি তাঁর কাছে সেই প্রার্থনাই করছি।

বিজ্ঞপ্তি :—আগামী ১৯শে ফাল্গুন (৩.৩.৫৭) রবিবার বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ও বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম শুভ জন্মতিথি-পূজা এবং পরবর্তী রবিবার ২৬শে ফাল্গুন (১০.৩.৫৭) বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব (সাধারণ উৎসব) অনুষ্ঠিত হইবে।

সমালোচনা

(১) ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ (২) গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) (৩) দীন মহারাজ (স্বামী সচ্চিদানন্দ)—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। 'মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটী' কর্তৃক ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে—১৲ টাকা, ॥০ আনা ও ॥০ আনা।

(১) যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আগমনে ধর্মের নূতন নূতন ভাব প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার কোন্ ভাবটি কোন্ ভক্তের মধ্যে কি ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা জানা যায়—তাঁহার ভক্তদের জীবন আলোচনা করিলে। ৺দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ছিলেন ঠাকুরের একজন গৃহী ভক্ত। সামান্য অবস্থার লোক, সামান্য ভাবে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে ঠাকুরের পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়া নিজের দৈন্য দশা ভুলিয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে সেই আনন্দ তিনি দুই হাতে বিলাইয়াছেন, তাহা লাভ করিবার জন্য অনেক ভক্ত তাঁহার নিকট ছুটিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থত্রয়ের প্রথমটিতে তাঁহারই বৈচিত্র্যময় জীবনের কয়েকটি ঘটনা গ্রন্থকার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বেশ সরল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা পাঠে ভক্তগণের উপকার ও আনন্দ হইবে।

(২) স্বামী বিবেকানন্দকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা নিজ নিজ জীবন ধন্য করিয়াছেন—গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) তাঁহাদের অন্যতম। স্বামীজীর হৃদয় কত বিশাল ছিল, তাহা গুপ্ত মহারাজের জীবন আলোচনা করিলে জানা যায়। একবার যাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন তাহাকে সর্বভাবে রক্ষা করিতে হইবে—গুপ্ত মহারাজের জীবনে স্বামীজীর এই ভাবটি পরিস্ফুট। ফলে সারাজীবন ধরিয়া আধ্যাত্মিক তেজ ও ত্যাগ-সম্বলিত সেই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জীবন কাটাইয়া কি ভাবে তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় পুস্তকের কয়েকটি ঘটনায় বেশ বোঝা যায়। কাহিনীর ন্যায় বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার সুন্দরভাবে আলোচ্য জীবনটি সকলের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

(৩) সম্পূর্ণভাবে নিজের উদ্যমে চরিত্র গঠিত করিয়া দীন মহারাজ (স্বামী সচ্চিদানন্দ) গৃহী জীবনে যে অধ্যবসায়ের সহিত ব্যবসায়-পরিচালনা এবং অর্থোপার্জন করিয়া নিজের ব্যয় নির্বাহ করিতেন,—কাহারও দ্বারস্থ হইয়া বা কাহারও কর্ম স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা বিসর্জন দিতেন না—সন্ন্যাসী হইয়াও সেই উদ্যম ও অধ্যবসায় বজায় রাখিয়া তিনি কিরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তৃতীয় পুস্তকে সেই বিবরণ পাঠ করিয়া সকলেই শিক্ষা লাভ করিবেন।

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—(প্রথম খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ; শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত; প্রকাশক—মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি; পৃষ্ঠা—২০৭, মূল্য—দুই টাকা বারো আনা।

গ্রন্থকার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে লণ্ডনে যান। তখন সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা করিতেছিলেন। স্বামীজীর সহিত ঐ সময়ে গ্রন্থকারের কিছুকাল থাকিবার সৌভাগ্য হয়। তখনকার কিছু ঘটনা এই গ্রন্থে লিখিত। স্বামীজীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের কথা এই গ্রন্থে আছে—যথা মিঃ গুডউইন, স্টার্ডি, মিঃ ফক্স, মিস্ মুলার, মিস্ ম্যাকলাউড, মিসেস লেগেট, মিঃ ম্যাক্সমুলার এবং স্বামী সারদানন্দ। স্বামীজীর সহৃদয়তা, বাগ্মিতা, প্রতিভা, তেজস্বিতা, স্বদেশপ্রেম, পাণ্ডিত্য, শিশুসুলভ সরলতা প্রভৃতি অনেকগুণের পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া স্বামীজীকে স্বগৃহে, শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সন্নিধানে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে দেখিয়া থাকিলেও, লণ্ডনে দেখার বৈশিষ্ট্য আছে; যুগের আচার্যরূপে স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রন্থকার ফুটাইয়া তুলিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টায় তিনি সফল হইয়াছেন। এরূপ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে বাহির হইবার সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল, ইহা বিশেষ দুঃখের কথা। আশা করি সকলে, বিশেষতঃ ছাত্র ও যুবকগণ ইহার যথেষ্ট আদর করিবে।

নৃত্যকলা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত; প্রকাশক—মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি; মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকারের 'বৃহন্নলা' নামক কাব্য হইতে ইহা সঙ্কলিত। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট রাজার রাজপ্রাসাদে 'বৃহন্নলা' বেশে আত্মগোপন করিয়া রাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারই কতক বিবরণ কাব্যের ভঙ্গীতে ইহাতে দেওয়া আছে। নৃত্যকলা যে একটি উচ্চাঙ্গের বিষয়—ইহা সকলকে জানানোই এই গ্রন্থ ছাপিবার উদ্দেশ্য।

—অচিন্ত্যানন্দ

Tantraraja Tantra—সার্ জন্ উড্রফ্ প্রণীত। গণেশ এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, মাদ্রাজ—১৭ হইতে প্রকাশিত। ১১৭ পৃষ্ঠা + ১৩; মূল্য ৬৲ টাকা।

তন্ত্রশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সার্ জন্ উড্রফ্ ইহাতে ইংরেজী ভাষায় "তন্ত্ররাজ তন্ত্রের" সারমর্ম উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে ছত্রিশটি অধ্যায় ছত্রিশ তত্ত্ব অনুসারে অভিহিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে তন্ত্রসার সংকলন করিয়াছেন এবং তন্ত্রের সাধনরহস্য গভীরভাবে আলোচনা করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত কুণ্ডলিনী শক্তি কিভাবে জাগরিত হয় তাহা দেখাইয়াছেন। মানবদেহের প্রতি তত্ত্বের পশ্চাতে অধিষ্ঠাত্রী দেবী রহিয়াছেন, সেই সব দেবীর মন্ত্র, যন্ত্র ও চক্র ইহাতে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কাশ্মীর সম্প্রদায়ের সুভগানন্দ নাথের 'মনোরমানাম্নী' টীকা এই পুস্তকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। মহাশক্তির কাদি, হাদি, ও কহাদি নামে বিভিন্ন রূপের মন্ত্র ও পূজা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই তন্ত্রে ললিতা, ত্রিপুরাসুন্দরী, মহামঙ্গলা প্রভৃতি দেবীর স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ রূপের পূজার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে বিবিধ রঙে অঙ্কিত একটি শ্রীযন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে, এবং শ্রীচক্রের পূজা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শিত হওয়ায় তন্ত্রমতের সাধকবর্গ অনেক ইঙ্গিত পাইবেন। পুস্তকখানি খুব কৃতিত্বের সহিত সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত।

—মৈথিল্যানন্দ

অন্তরাগে আলাপন (দ্বিতীয় ভাগ)—স্বামী বাসুদেবানন্দ কর্তৃক লিপিবদ্ধ এবং পি ২৩৬।১ লেক রোড, কলিকাতা-২৯ হইতে শ্রীশুভেন্দু রায়চৌধুরী ও শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। পৃষ্ঠা (ডিমাই)—১৩০; মূল্য—২৷৷৹ টাকা।

বেলুড় মঠের অন্যতম সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী স্বামী বাসুদেবানন্দজী (দেহত্যাগ—২২শে মে, ১৯৫৬) নানা স্থানে শাস্ত্রের ক্লাস লইবার সময় ধর্মসাধনা এবং বিবিধ দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রসঙ্গ করিতেন, তাহার কিছু কিছু তিনি নিজের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। 'অন্তরাগে আলাপন (প্রথম ভাগ)' এবং 'দিব্য-বাণীর প্রতিধ্বনি' নামক দুইটি পুস্তকের আকারে ইতঃপূর্বে ঐ আলোচনাগুলির অনেক অংশ তাঁহার উৎসাহী বিদ্যার্থিবৃন্দকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থ ১৯৪৬ হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ঐরূপ আরও কতিপয় প্রসঙ্গের সংকলন।

প্রসঙ্গগুলিকে ৫২টি বিভাগে সুন্দরভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার পটভূমিকায় পাশ্চাত্ত্যের ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদ-সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও বিচারে বক্তার গভীর পাণ্ডিত্য এবং অন্তর্দৃষ্টি সুপরিস্ফুট। চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকারা পড়িয়া উপকার লাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী—শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত-প্রণীত। প্রকাশিকা—শ্রীমতী বিজয়া দাশগুপ্ত, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট-২, গবর্ণমেণ্ট হাউসিং এস্টেট্, এণ্টালী, কলিকাতা-১৪ ; পৃষ্ঠা (ডিমাই) —৫২৪ ; মূল্য—৬৲ টাকা।

দুই বৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তীর সময় বেলুড় মঠের জয়ন্তী-কমিটির উদ্যোগে স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত এবং উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত জননীর বৃহৎ প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থ ‘শ্রীমা সারদাদেবী’ ব্যতীত বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন লেখক-লেখিকা এই সর্বজন-পূজ্যা মহীয়সীর অদ্ভুত জীবন-কথা অবলম্বনে ছোট বড় অনেকগুলি বই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্তমান পুস্তকটিও শ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তীর সময়ে প্রকাশের জন্য রচিত হইয়াছিল—‘লেখকের নিবেদন’ হইতে জানিতে পারা যায়। অনিবার্য কারণে প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের সঙ্কলনে লেখক ‘পরিশিষ্টে’ যে পঁচিশটি উপাদান-পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন তাহার অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রকাশন। উপাদানের দিক দিয়া পুস্তকটির বেশী মৌলিকতা না থাকিলেও মায়ের জীবনের ঘটনাবলীর বিভাগ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণে অভিনবত্ব স্পষ্টই চোখে পড়ে।

গ্রন্থকার সারদাদেবীর ৬৭ বৎসরের জীবনকে তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম স্তর খ্রীঃ ১৮৫৩ সাল হইতে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত—তাঁহার জীবনের প্রথম ৩৩ বৎসর লইয়া; দ্বিতীয় স্তর খ্রীঃ ১৮৮৬-৮৭ সালের ‘বৃন্দাবনে এক বৎসর’ এবং তৃতীয় স্তর খ্রীঃ ১৮৮৭ হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত শ্রীমায়ের জীবনের অন্তিম ৩৩ বৎসর অবলম্বনে আলোচিত। প্রথম স্তরে ১৮টি এবং তৃতীয় স্তরে ৩৩টি উপবিভাগ আছে। বিভাগ এবং উপবিভাগ-গুলির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকে ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপিত করিতে গিয়া লেখককে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আমাদের বিচারে তাঁহার এই পরিশ্রম সার্থক। সারদাদেবীর জীবনের কোন ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিবেশিত বিবরণীতে যে সকল অসামঞ্জস্য তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন গবেষকের দৃষ্টিতে তাহাদের বিচারও এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থের ভাষা সাবলীল, আবেগ সংযত, ঘটনার বিশ্লেষণধারা যুক্তিপূর্ণ।

—শ্রদ্ধানন্দ

The Gist of Religions:—স্বামী নারায়ণানন্দ। প্রকাশক—মেসার্স এন. কে. প্রসাদ এ্যাণ্ড কোম্পানী, পোঃ ঋষিকেশ, (উত্তর প্রদেশ)। পৃষ্ঠা—১৩৮ ; মূল্য ২৲ টাকা।

বাংলায় পুস্তকখানির নামকরণ করা যাইতে পারে ‘সর্বধর্ম-সার’। ধর্মসাহিত্যের কিছুটা ব্যাপক সংবাদ যাঁহারা রাখেন তাঁহাদের নিকট সুপণ্ডিত স্বামী নারায়ণানন্দের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম-তত্ত্বের উপর তাঁহার বিশেষ দখল রহিয়াছে এবং এই তত্ত্ব পরিবেশনেরও যে তিনি যোগ্য অধিকারী, সমালোচ্য পুস্তকখানিতে পুনরায় তাহারই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, শিখধর্ম, ইসলামধর্ম, সুফীধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতি মুখ্য ধর্মগুলির সারমর্ম ধর্মের ধারক শাস্ত্রাদির বহু মূল্যবান উক্তিসহ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং মাত্র ১৩৮ পৃষ্ঠার সীমায়িত পরিধির মধ্যে বলিতে গেলে অসম্ভবকে সম্ভব করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের সার্থক ভূমিকারূপে পুস্তকখানি ধর্মানুরাগী কিংবা জ্ঞানান্বেষী পাঠকের নিকট অপূর্ব হইবে। স্থানে

স্থানে তত্ত্বের ব্যাখ্যায় সহজ ছোটখাট ও ঘরোয়া দৃষ্টান্তের আশ্রয় লওয়ায় উহা আরও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ধর্মের ঠিক ঠিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম বা উপলব্ধি না করিয়া উহার খোলস লইয়া বিতর্কসৃষ্টির ঝোঁক এখনও অনেক মহলেই প্রবল। সকল ধর্মের সারবস্তুর মধ্যে বা অন্তর্নিহিত ভাবের মধ্যে যে সুমহৎ ঐক্য রহিয়াছে তাহা বুঝিবার পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ সাহায্য করিবে।

—শ্রীমনকুমার সেন

শ্রীশ্রীবুদ্ধযশোধরা—ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী প্রণীত। ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীটস্থ প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১৫৫; মূল্য আড়াই টাকা।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ-জয়ন্তী-উপলক্ষ্যে যে সকল গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রায় সমস্তই বুদ্ধদেবের জীবনচরিতমূলক। ভগবান বুদ্ধ ও জননী যশোধরার জীবনালেখ্য, বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য, এবং পরবর্তী যুগের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিষয়ে "শ্রীশ্রীবুদ্ধযশোধরা"র মতো এমন সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ অতি বিরল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও দর্শনে পরম পণ্ডিত ডক্টর চৌধুরী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ইংরেজী বা সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত না করে মাতৃভাষা বাংলাতেই যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ তাঁর কাছে ঋণী থাকবেন।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে ডক্টর চৌধুরীর সংস্কৃতে রচিত বুদ্ধস্তুতি, বুদ্ধধ্যান, যশোধরাস্তুতি প্রভৃতি সাতিশয় ভক্তি-প্রণোদিত। তৎপর বুদ্ধযশোধরার জীবনাদর্শ, বুদ্ধবাণী ও তার মূলানুসন্ধানপূর্বক বঙ্গানুবাদ, গৌতমের সাধনা, নির্বাণ, বৌদ্ধ নারী-কবি, বুদ্ধপরম্পরা, 'বুদ্ধবংশ' নামক পালি গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ অংশের বঙ্গানুবাদ, পালি ত্রিপিটকের মনোরম পুস্তকানুক্রমিক সমালোচনা, ত্রিপিটক প্রচারের ইতিহাস, সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য এবং সর্বশেষে "শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতি পাণ্ডিত্যমূলক নিবন্ধ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এখানে জননী যশোধরার জীবন দিব্যালোকে হয়েছে পরিস্ফুট; নির্বাণের জটিলতত্ত্ব সরস বিকাশ লাভ করেছে; বহু পালি গ্রন্থের বিশিষ্ট অংশ এখানে মাতৃভাষার যাদুমন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুক্ত। গবেষণায় সিদ্ধহস্ত ডক্টর চৌধুরী যেমন ভাবের উচ্ছ্বাসে কোনও স্থলে ইতিহাসের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন নি, তেমনি শত কথাকে সামান্য কয়েকটি কথার সার্থক ব্যঞ্জনায় করেছেন সুব্যক্ত। তাঁর রচনাশৈলীও একেবারে নিজস্ব। ভাষার ফেনিল উচ্ছ্বাস নেই; অথচ সাবলীলতা ও মাধুর্য সর্বত্র সংপ্রসারিত হয়ে রয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে ডক্টর চৌধুরীর এই সার্থকতম নবাভিযান আরো মধুময় হয়ে উঠুক, তাঁর গমনপথ পুষ্পিত ও সুরভিত হোক্—ভগবান্ বুদ্ধের কাছে এই প্রার্থনা করি।

—শ্রীধর্মাধার মহাস্থবির

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

OUR EDUCATION—স্বামী নির্বেদানন্দ প্রণীত। পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। শিক্ষাবিষয়ক সুচিন্তিত সমালোচনা ও শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রবন্ধাবলী। পৃষ্ঠা ১৭২; মূল্য—৩৷৷০। প্রকাশক—রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস্ হোম, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

অতীতের স্মৃতি (স্বামী বিরজানন্দ ও সমসাময়িক স্মৃতিকথা)—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। পরিশিষ্টে স্বামী বিরজানন্দের কতকগুলি রচনা ও পত্র সন্নিবিষ্ট। প্রকাশক—স্বামী অভয়ানন্দ, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পৃষ্ঠা ৫৭০; মূল্য—৬৲, আশীটিরও অধিক চিত্র সম্বলিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ৯ই মাঘ (২২শে জানুআরি) মঙ্গলবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৯৫তম আবির্ভাব-উৎসব সারা দিন ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভের পর বেদপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যা, কালীকীর্তন, ভজন-গান, হোম, ভোগরাগ প্রভৃতি হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির ও তাঁহার ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী স্বামীজীর চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। দ্বিপ্রহরে ছয় সহস্রাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ছায়াতলে গঙ্গাতীরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সভায় বাংলায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং ইংরেজীতে স্বামী গম্ভীরানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করিলে পর সভাপতি স্বামী ওঁকারানন্দ বলেন,—শ্রীরামকৃষ্ণদেব সূত্র, এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিশদ ভাষ্য; বৈদান্তিক বিবেকানন্দের মনীষা অসাধারণ, কিন্তু মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের তুলনা আর কোথাও দেখা যায় না। তিনি শুধু বেদান্তের প্রচারকই ছিলেন না, দুঃখী ও আর্ত মানুষের জন্য তাঁহার বাণীর মধ্যে যে অপরিসীম সহানুভূতি ও প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের চিন্তানায়কদের প্রভাবিত করিবে।

সন্ধ্যারতির পর স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

বেলুড় মঠে দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামা—গত ৫ই মাঘ (১৯.১.৫৭) শনিবার বেলা ১১টায় বৌদ্ধধর্মগুরু পরমপূজ্য দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামা তাঁহাদের সহযাত্রী সহ বেলুড় মঠ দর্শনে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরটি দর্শন করান। দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিমূর্তির সম্মুখে কিছুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁহাদের দলের একজন প্রবীণ সদস্য শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উত্তরীয় প্রদান করেন। লামাদ্বয় বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ ও দোভাষীর সাহায্যে কিছুক্ষণ আলাপ ও ধর্মপ্রসঙ্গ করার পর স্বামী বিবেকানন্দের মন্দিরে স্বামীজীর মর্মরমূর্তি ও 'ওঁকার' দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। মঠ পরিদর্শনকালে তাঁহাদের সঙ্গে বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সিকিমস্থ ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি শ্রীআপ্পা সাহেব পন্থ ছিলেন। ধর্মগুরুদ্বয়কে ভারত-সংস্কৃতি ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া হয়।

রাজপুর (২৪ পরগনা) ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন—গত ১৪ই জানুআরি পৌষ-সংক্রান্তির শুভদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজ ভিত্তিস্থানে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রার্থনা করিয়া আসিলে পর গত ১৬ই জানুআরি বহু সাধু ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভারতের পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। আশ্রমের (বর্তমানে ১৮, যদুমল্লিক রোড, পাথুরিয়া-

ঘাটা, কলিকাতায় অবস্থিত) পরিচালক-সমিতির সভাপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস—ছাত্ররা যাহাতে আশ্রমিক পরিবেশের ভিতরেই কলেজের শিক্ষা-লাভের সুযোগ লাভ করিতে পারে তজ্জন্য একটি আবাসিক কলেজের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। আমেরিকার কন্সাল জেনারেল শ্রীমতী কে. ব্র্যাকেন্স বলেন, যে সব প্রতিষ্ঠান মানুষ তৈয়ারী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, কল-কারখানার তুলনায় তাহাদের দাম অনেক বেশী। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ ডি. এম্. সেন বলেন, যুবকদের শিক্ষাদানই হউক বা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনই হউক এই কাজগুলির সুষ্ঠু সম্পাদনের দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশন যেন গ্রহণ করেন। শ্রীখান্না বলেন যে, উদ্বাস্তুদের অবস্থার উন্নতিকল্পে স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও শিক্ষণকার্যের মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ মিশন যে সেবা করিতেছেন, তাহার প্রতি তাঁহার দপ্তরের আন্তরিক সহানুভূতি আছে। এই ছাত্রাবাসে উদ্বাস্তুদের দুইশত ছাত্র স্থানলাভ করিবে, পুনর্বাসন দপ্তর এই আবাসের নির্মাণ-কার্যে ৪,৮৭,০০০, টাকা সাহায্য করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে সমবেত সকলে বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব—ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে গত ৮ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর) পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ এবং ১৩ই পৌষ অপরাহ্নে মহিলাদিগের একটি সভায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়গুলির কয়েকজন ছাত্রী স্তোত্র, আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে। সভান্তে সমবেত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়।

বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির ছাত্রা-বাসের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা—গত ২২শে জানুআরি, ১৯৫৭, মঙ্গলবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি-দিবসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজ মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি ও বেদ-পাঠের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরের নূতন ছাত্রাবাসের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। বেলুড় মঠের অনতিদূরে এবং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সন্নিকটে প্রায় ২০ বিঘা জমির উপর এই ছাত্রাবাসটি নির্মিত হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ, অন্যান্য বহু প্রাচীন সন্ন্যাসী ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে শিল্পমন্দিরের উপকারিতা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়া ছাত্রদিগকে স্বামীজীর ভাবাদর্শে জীবন গঠন করিয়া নিজের ও দেশের উন্নতিবিধান করিতে আহ্বান করেন।

বেলুড় বিদ্যামন্দিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী-উৎসব—বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে গত ২০শে হইতে ২৮শে জানুআরি পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নয়দিনব্যাপী যে শিক্ষাপ্রদ বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহা অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-কল্পে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিদ্যামন্দিরের পতাকা উত্তোলন করেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। তাহার উপদেশপূর্ণ ভাষণের পর বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দ মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

এতদুপলক্ষ্যে ২১শে জানুআরি বিদ্যামন্দিরে যে সংস্কৃতি-সভা আহূত হয়, তাহাতে সভাপতি ডাঃ

কালিদাস নাগ ও প্রধান অতিথি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এবং বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ ভারত সংস্কৃতির ধারা, মূল উৎস ও আদর্শ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। সভান্তে ডক্টর নাগ বিদ্যামন্দিরের সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে বিদ্যার্থীর সাংস্কৃতিক জীবন, শিক্ষা ও কার্যাবলী বিস্তারিতভাবে দেখান হয়।

২৫শে জানুআরি বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী তাঁহার ভাব-গম্ভীর ভাষণের মাধ্যমে বাল্মীকি-রামায়ণ, তুলসীদাসকৃত রামচরিতমানস ও সংস্কৃত নাট্যকার ভাস-রচিত 'প্রতিমা' নাটক অবলম্বনে শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীভরতের আদর্শ জীবন ও চরিত্র-মহিমা বর্ণনা করেন। ২৭শে জানুআরি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিদ্যামন্দিরের পুরস্কার-বিতরণী সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার স্বরূপ, শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তাৎপর্য ও ছাত্রগণের আদর্শ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

ক্রিকেট, ভলিবল, ফুটবল প্রভৃতি বিবিধ খেলাধূলা ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শন শতবার্ষিক উৎসবের অঙ্গস্বরূপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহা আরও চিত্তাকর্ষক ও আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। সারদাপীঠের সমাজ-শিক্ষা-শিক্ষণ বিভাগ (Social Education Organisers' Training Centre) এর অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 'College of Physical Education' এর ভূতপূর্ব প্রধান পরিদর্শক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ রায় যথাক্রমে ছাত্রগণের বিতর্ক-সভা ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা সভার পৌরোহিত্য করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে বিদ্যামন্দির-গৃহ আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়। শেষ দিন বিদ্যামন্দিরে যে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়, তাহাতে কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের বহু খ্যাতনামা শিল্পী যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন এবং বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথের দুইটি হাস্যরসাত্মক একাঙ্কিকা অভিনয় করিয়া সকলকে খুব আনন্দ দেয়।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-পূর্তি—এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে পৃথিবীর নানা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পঁচিশ জন প্রতিনিধি শুভেচ্ছার বাণী বহন করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ২০শে জানুআরি একটি জনসভায় উৎসবের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য শুধু তাহার প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, আধুনিক ভারতের মানসিক ভিত্তি-গঠনে, সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে ও জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ-সাধনে এই মহৎ প্রতিষ্ঠান এক অসামান্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই উপলক্ষ্যে আশুতোষ-ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের নানা তথ্য ও চিত্র সংগ্রহ এবং শিক্ষা-বিষয়ক পরিসংখ্যান-সম্বলিত প্রাচীর-চিত্র এবং সেনেট ভবনে পুরাতত্ত্বের ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী কয়দিনের জন্য শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের ও ছাত্রবৃন্দের আকর্ষণ-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস—এই বৎসর কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪৪তম অধিবেশনের অনুষ্ঠান ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি ও সার্থকতার গৌরবপূর্ণ ইতিহাসের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছে। বিজ্ঞানকে বর্তমান ভারতের উন্নতির অন্যতম প্রধান সহায়করূপে জাতীয় কর্মোদ্যমে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইতেছে দেখিয়া আমরা ইহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

লণ্ডনে কমনওয়েলথ শিশুশিল্প-প্রদর্শনী—লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনসটিট্যুটে বর্তমানে যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালয় ও হংকং প্রভৃতি ২০টি বিভিন্ন দেশের শিশুদের অঙ্কিত দুই শতাধিক চিত্র ও ড্রইং প্রভৃতি শিল্প-নিদর্শনের সমাবেশ করা হইয়াছে। শিল্পীদের বয়স ৭ হইতে ১৭-র মধ্যে।

নানাস্থানে জন্মোৎসব—ইম্ফল (মণিপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব-সংবাদ এবং কাটোয়া (বর্ধমান) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা—শিকরা-কুলীন গ্রামে (২৪ পরগনা) গত ১লা ফেব্রুআরি, শ্রীমৎ-স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মস্থানে মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষ্যে ঐ দিন পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভজন এবং ৩রা ফেব্রুআরি একটি ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমহারাজের জীবনী ও বাণী আলোচনা, রামনাম-সংকীর্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। বহু সাধু ও ভক্ত সমাগমে ও বিবিধ অনুষ্ঠানে গ্রামখানি আনন্দ-মুখর হইয়া উঠে।

দরিদ্র-বান্ধব-ভাণ্ডারের সেবাকার্য—কলিকাতার ৬৫।২ বি, বিডন স্ট্রীটস্থ দরিদ্র-বান্ধব-ভাণ্ডার একটি জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান। আমরা ইহার ৩৩তম বর্ষের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে দাতব্য চিকিৎসালয়, চেস্ট ক্লিনিক, যক্ষ্মা সেবায়তন, গ্রন্থাগার, দুর্গত-সেবা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কার্যে উন্নতি লক্ষণীয়।

আজমীরে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব—স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে নবনির্মিত বিবেকানন্দ পাঠাগারে স্বামীজীর এক মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পরলোকে ভবতোষ ঘটক—গত ১৫ই জানুআরি মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে ৬৮ বৎসর বয়সে কলিকাতার বিখ্যাত লৌহব্যবসায়ী এবং বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের অন্যতম পরিচালক হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মুঙ্গেরে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভবতোষবাবুর নেতৃত্বে ঘটক প্রপার্টি কম্পানির সত্ত্বাধিকারিগণ বাগবাজার উদ্বোধন লেনে উদ্বোধন অফিসের সংলগ্ন বাড়ীটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠকে দান করিয়া মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই শোকসন্তপ্ত-পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার—শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য প্রাচীন ভক্ত শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মজুমদার গত পৌষ মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে ভুবনেশ্বর-ধামে পরলোক গমন করিয়াছেন। বীরেনবাবু শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী কিন্তু তাঁহার কর্মজীবন শিলঙেই কাটিয়াছিল। ওখান হইতেই তিনি কলিকাতা এবং জয়রামবাটী গিয়া বহুবার শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন। শেষ বয়সে শ্রীভগবানের স্মরণ-মনন লইয়া তিনি রাঁচিতে থাকিতেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যপ্রসঙ্গে সকলকে আনন্দ দিতেন। জগদম্বার প্রিয় সন্তান এই ভক্ত-প্রবরের আত্মা মাতৃ-অঙ্কে পরমা শান্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা।

উদ্বোধন

প্রার্থনা

সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি
সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
ভবে ভবে নাতিভবে
ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥

ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং।
ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতি-
র্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবোম্॥

শাশ্বত পুরাতন হইয়াও যিনি নিত্য নূতন সেই সদ্যোজাতকে আশ্রয় করিতেছি, আমি যেন তাঁহাকে প্রাপ্ত হই। সেই সদ্যোজাত পরমেশ্বরের উদ্দেশে নমস্কার। হে শিব, অজ্ঞান-অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন নানা জন্মের পথে আর আমাকে প্রেরণ করিবেন না; যাহাতে আমি ঐরূপ জন্ম অতিক্রম করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারি তজ্জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করুন। সংসারদুঃখনাশকারী শিবকে আমি বার বার প্রণাম করিতেছি।

যিনি সমস্ত বিদ্যার নিয়ামক, সকল প্রাণীর প্রভু, বিশেষরূপে যিনি বেদের অর্থাৎ জ্ঞানরাশির পরিপালক, সূক্ষ্মজগতের প্রাণস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের অধিপতি সেই ব্রহ্মা, সেই প্রবৃদ্ধ পরমাত্মা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত শান্তরূপে আবির্ভূত হউন। যেন বুঝিতে পারি—আমি সেই সদাশিব, সদাশিবই আমার স্বরূপ।

কথাপ্রসঙ্গে

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব

সম্প্রতি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শতবার্ষিকী-উৎসবানুষ্ঠান উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে দেশবাসীকে নূতন করিয়া সচেতন করিয়াছে, এবং স্বভাবতই শিক্ষাব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রশ্ন ও সমালোচনা শুরু হইয়াছে। স্বাধিকার লাভের পর ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছে—তাহা শিক্ষার ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে।

শিক্ষার সমস্যাগুলি নূতনরূপ পরিগ্রহ করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য ও সরকারের দায়িত্ব বাড়িয়াছে। জাতীয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রে—কি শাসন-বিভাগে, কি শিল্পে, কি ব্যবসায়ে—সর্বত্র এখন স্বাধীন চিন্তা ও স্বকীয় চেষ্টার প্রয়োজন। কোথা হইতে ইহা আসিবে? অবশ্যই উচ্চ-শিক্ষিত যুবকদের ভিতর হইতে। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক—সকলের জন্য, এবং উচ্চতম বিশেষ শিক্ষা বা গবেষণা মুষ্টিমেয় প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্য,—অতএব ঐ উভয় স্তর আলোচনার বাহিরে রাখিয়া এখানে মধ্যবর্তী শিক্ষার কথাই আমরা বলিতেছি।

শিক্ষার এই স্তরে সাহিত্য, বিজ্ঞান, যন্ত্র, কৃষি, সব কিছুই অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সর্ববিধ না হইলেও বহু অভাব দূরীভূত হইতে পারে। ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ, ভারতবাসী আজ নবজীবনসম্পদে ভরিয়া উঠিতেছে। শিক্ষাসহায়ে তাহার জীবনের মান বাড়াইবার—এই তো উপযুক্ত সময়।

জগৎ জুড়িয়া আজ যে সকল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত আসিতেছে, মানব-সমাজ ও মানবমনের মূলগত বিশ্বাস লইয়া যে টান পড়িয়াছে—কোথায় তাহার পরিণতি? যুক্তির পরীক্ষায় পুরাতন ধর্মবিশ্বাস গিয়াছে, প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা যাইতে বসিয়াছে; কিছুদিন আগেও মনে হইত—এগুলি বুঝি হিমালয়েরই মতো অচল! কিন্তু হিমাচলও আজকাল চঞ্চলতার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে।

ভারত আজ জগৎ-প্রশ্নের সম্মুখীন! দিনে দিনে প্রাচীন-নবীন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য, ধর্ম-বিজ্ঞানের সংঘর্ষ বাড়িতেছে—আরো বাড়িবে। শান্তি ও সমাধানের জন্য কোন দিকে তাকাইব?

যাহারা বর্তমানের প্রয়োজনেই আত্মহারা, তাহাদের কি চিন্তা করিবার সময় আছে? যাহারা সুবিধাবাদী তাহারা তো ভাগ্যান্বেষণেই ব্যস্ত! রাজনীতি ও অর্থনীতি, সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টিই করিতে পারে—সমাধান করিতে পারে না; প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিতে পারে—উত্তর দিতে পারে না, বাক্যজালের ও হিসাবের গোলক-ধাঁধায় পথ হারাইয়া—মানব-সমাজকে যুদ্ধ হইতে যুদ্ধান্তরেই লইয়া যাইতে পারে, শান্তি দিতে পারে না।

উত্তরের জন্য, সমাধানের জন্য, শান্তির জন্য মানুষ আজও চাহিয়া আছে—উচ্চস্তরের সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক শিল্পী সাধক ও কবির দিকে—যাঁহারা সভ্যতার স্রষ্টা ধারক ও বাহক, উচ্চশিক্ষার নিভৃত-মন্দিরে যাঁহাদের চিন্তা ও সাধনা নীরবে চলিতে থাকে—সত্য শিব ও সুন্দরকে ঘিরিয়া।

* * *

জীবনের উদ্দেশ্য না জানিলে জীবনের উন্নতি-সাধন কিরূপে সম্ভব? আজকাল অনেক লেখকের একটা 'ফ্যাশন' হইয়াছে—উদ্দেশ্যবিহীন জীবনবাদ প্রচার করা। হয়তো ব্যক্তিগত বিফলতার ভিত্তির উপর যুক্তির বালুকা-সহায়ে নিজ নিজ সৌধ রচনা করিয়া তাঁহারা আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। 'জীবন বড় জটিল, জীবনের মূলরহস্য দুর্জ্ঞেয়, মানুষ বড়

অসহায়—তাহার কোন দায়িত্ব নাই, উদ্দেশ্য নাই; ধর্ম একটা ভাবের নেশা, রাজনীতি একটা জুয়াখেলা। সব কিছু সন্দেহ কর, কিছুই বিশ্বাস করিও না, যতটা পার ভোগ করিয়া যাও!' এই জাতীয় উদ্দেশ্যশূন্য দায়িত্বহীন স্বার্থকেন্দ্রিক মনোভাব বর্তমান মানবকে আচ্ছন্ন করিতেছে ও বহুক্ষেত্রে ইহাই তাহার নানাবিধ অবনতির কারণ। গত দুই মহাযুদ্ধ ভিক্টোরিয়া-যুগের প্রসন্নতা নষ্ট করিয়াছে, মানবের নিরাপত্তা ভাঙিয়া দিয়াছে; উপরি-উক্ত মনোভাব তাহারই অন্যতম বিষময় ফল। এই বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করিবার, প্রতীকার করিবার রসায়ন—নূতনতর চিন্তা, নূতনতর শিক্ষা।

সকল শিক্ষারই উদ্দেশ্য হইল—জগৎ ও জীবনের একটি সমগ্র ও সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্র চোখের সামনে তুলিয়া ধরা। এক বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিতে করিতেই সকল বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে থাকিলে একটি সমন্বয়ের দৃষ্টি খুলিয়া যায়; নতুবা শিক্ষা কতকগুলি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের (information-এর) যোগফলে পরিণত হয় ও মনকে অশান্ত বিভ্রান্ত করে। অন্তরের অন্তরে মানুষ চায় সর্বত্র একটা নিয়ম, শৃঙ্খলা ও শান্তি। জীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা নানা কিছু শিখিতে পারি, কিন্তু যাপন করিবার সময় বুঝি জীবন এক ও অখণ্ড। উচ্চশিক্ষা মানবকে সেই জীবনের জন্যই প্রস্তুত করিবে।

উপনিষদে স্বীকৃত হইয়াছে, 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈব অপরা চ'—প্রাচীনকালে আরণ্যক গুরুরা বিশেষ বিশেষ (অপরা) বিদ্যা শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত শিষ্যের হৃদয়ে জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দিতেন স্বীয় হৃদয়ের জ্বলন্ত শিখা হইতে! জীবনের স্পর্শেই জীবন জাগিয়া উঠে, শুধু বই পড়িয়া বা কথা শুনিয়া মন ভারাক্রান্তই হয়। বহু বিষয় শিখিয়াও জ্ঞান হইল না, আবার দর্শন বিজ্ঞান কিছু না পড়িয়াও কাহারও চোখে মুখে জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান, চরম জ্ঞান, সকল জ্ঞানের ভিত্তি! এই উচ্চতম জ্ঞানলাভও অবশ্যই শিক্ষার শেষ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। 'কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?'—এমন কি আছে যাহা জানিলে সব জানা হয়? ইহাও উপনিষদের বাণী, ঋষি-বালকের প্রশ্ন!

জীবনের স্তর-বিভাগ থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বলা চলে না—একটা লৌকিক (Secular), বাকীটা আধ্যাত্মিক (Spiritual)। যে জ্ঞানলাভের পথে চলিবে সে কাজ করিবে না, যাহারা আধ্যাত্মিক হইবে তাহারা সামাজিক হইবে না—এ কথাও যেমন সত্য নয়, তেমনি ইহার বিপরীতও সত্য নয়। শিক্ষার যুগ্ম উদ্দেশ্য সত্যানুভূতি ও জীবনগঠন। লৌকিক স্তরে ইহারই প্রতিরূপ—নূতন নূতন প্রাকৃতিক সত্য আবিষ্কার ও জীবিকার উপযোগী করিয়া নিজেকে গড়িয়া তোলা। কোনটিকেই আমরা অবহেলা করিতে পারি না। জীবনেরই প্রয়োজনে, যুগের তাগিদে, মনুষ্যত্বের দাবিতে আজ শিক্ষার্থীদের একান্ত প্রয়োজন—পল্লবগ্রাহিতা বর্জন করিয়া উৎকর্ষ অর্জন, নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীরও উন্নতি-সাধন; এবং প্রতিবেশীর পরিধি আজ ক্রমবর্ধমান।

সমাজ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সংসার কল্যাণে বিধৃত—এ কথা মুখে উচ্চারিত হইলেও ব্যবহারে অন্তর্হিত। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শক্তি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া স্ব স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া একদিন সমাজসেবা করিত; আজ তাহার অভাবে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক জীবন ও দলীয় স্বার্থ রাষ্ট্রজীবন চালিত করিতেছে। জাতীয় উন্নতির জন্য, যথার্থ কল্যাণের জন্য—কি চিন্তার জগতে কি রাষ্ট্রপরিচালনায়, কি ব্যবসাবাণিজ্যে আজ একান্ত প্রয়োজন নূতন নেতৃত্ব, যাহা ভারত-প্রতিভার অনুসরণে, ত্যাগ ও সেবার প্রাচীন ভিত্তির উপর আধুনিক উপকরণে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ গড়িয়া

তুলিবে। সেই আয়ত আদর্শও এই উচ্চ-শিক্ষার অঙ্গীভূত। এক জাতীয় খাদ্য শরীরকে রোগগ্রস্ত করে, এক-বিষয়ক শিক্ষাও মনকে ভারাক্রান্ত করে। স্বাস্থ্যের জন্য যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য (balanced diet) প্রয়োজন, তেমনি সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সর্বাবয়ব বিদ্যাও বর্তমানের অন্যতম প্রয়োজন।

শুধু খাপছাড়া শিক্ষা, প্রতিযোগিতা ও বিশেষ অভিজ্ঞতা দ্বারা দুই চার জনের মানসিক ও আর্থিক উন্নতি হইতে পারে ; কিন্তু সমষ্টি-উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—সর্বাঙ্গসুন্দর প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে সহযোগিতা ও জীবিকা-উপযোগী বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন। আয়তভিত্তির উপরেই গগন-স্পর্শী চূড়া নির্মিত হইতে পারে। গবেষণা, আবিষ্কার ও বিশেষত্ব-অর্জনের বিভাগগুলি উচ্চতম স্তরে আবদ্ধ থাকিতে পারে—উপযুক্ত ছাত্রদের জন্য। গবেষণার কৃতিত্বে ও যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হয় বটে, কিন্তু সাধারণ শিক্ষা দ্বারা সমগ্রজাতির প্রাণশক্তির জাগরণ না হইলে জাতির উন্নতি হইল না। শরীরের একটি অঙ্গ—যথা মস্তিষ্ক—পুষ্ট হইলেই তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। রক্তাল্পতা ও রক্তদুষ্টি দূরীভূত হইয়া সারা শরীরে সতেজ রক্ত সঞ্চালিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্যের উন্নতি অসম্ভব। ব্যাপক নিরাশা ও দুর্দশার কারণগুলি দূরীভূত না করা পর্যন্ত দেশ কখনও উন্নতির পথে নিশ্চিত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

প্রাথমিক ও উচ্চতম শিক্ষার মধ্যস্তরেই আমরা উচ্চ শিক্ষার বিকাশ দেখিতে চাই—যাহা দ্বারা জাতির জীবন ও কৃষ্টির মান ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবে। প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার্থীর চোখে জীবনের এমন একটি ছবি ফুটিয়া উঠিবে যে, সে বুঝিবে ছাত্রজীবন কখনও শেষ হয় না, সারাজীবনই শেখা চলিবে—সঙ্গে সঙ্গে শেখানোও চলিবে, আদান-প্রদানের প্রবাহ ব্যতীত জীবন-ধারা পঙ্কিল পল্বলে পরিণত হয়। মনের প্রসারই জীবনের প্রসার, হৃদয়ের উদারতাই জ্ঞানলাভের চরম ফল। যথার্থ শিক্ষা মানুষকে দেয় ভয়শূন্য পৌরুষ ও আত্মনির্ভরতা এবং অপরের সহিত তাহার ব্যবহারে ফুটিয়া উঠে সহানুভূতি ও সেবার প্রবৃত্তি।

ইহা সর্বজন-সুবিদিত যে, ভারতবর্ষে এখনও যে শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছে তাহা মেকলের প্রবর্তিত পন্থারই অনুসরণ। শাসন-কার্য পরিচালনার জন্য, ভারতকে পরাধীন রাখিবার জন্য বিদেশী শাসকদের ইহা প্রয়োজনীয় ছিল; কিন্তু এখন ভারতের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য, নূতন জাতি সংগঠনের জন্য নূতনতর শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় আসিয়াছে। শিক্ষা শুধু নাগরিকতা-অভ্যাস বা নানা চিন্তার চর্বিত-চর্বণ নয়। প্রকৃত শিক্ষা জীবনাবেগকে সত্য ও সুনীতির পথে চালিত করে, শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও সেবায় উৎসাহিত করে।

* * *

স্বদেশের উন্নতিচিকীর্ষু মনীষী বয়োজ্যেষ্ঠেরা শিক্ষাব্যাপারে খুবই চিন্তামগ্ন; বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে তাঁহাদের অনেকেই নানাবিষয়ে আলোকপাত করেন, বিশেষত বর্তমানে উচ্চশিক্ষার মানের অবনতির যে সকল কারণ তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন—সেগুলি প্রণিধানযোগ্য। ছাত্র এবং শিক্ষকের ব্যক্তিগত যোগাযোগের অভাব, ছাত্রদের অসংযত আচরণ এবং শিক্ষকের বৃত্তি ও বেতন সম্মানজনক না হওয়াই তাঁহাদের মতে শিক্ষার মান অবনতির বিশেষ কারণ। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যতীত কৃষ্টির ও আদর্শের আদান-প্রদান সম্ভব নয়। এতদুদ্দেশ্যে নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রয়োজন, পুরাতনগুলি বিদ্যার দোকানে পর্যবসিত হইতেছে। শিক্ষকের বৃত্তি সম্মানজনক করিতে হইলে সমাজে সসম্মানে তাঁহার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে ; নতুবা উপযুক্ত যুবকেরা কেহ এ পথে আকৃষ্ট হইবে না। নানাবিধ অভাব ও অভিযোগের দরুণ জনসাধারণের বিক্ষোভ ও

উচ্ছৃঙ্খলভাব অবশ্যই ছাত্র-সমাজে প্রতিফলিত হইবে; আবার ইহাও সত্য যে সুশৃঙ্খল যুবশক্তি ছাড়া জাতির উন্নতি অসম্ভব। যুবকেরই স্বপ্নদৃষ্টি ও আদর্শনিষ্ঠা দেশকে আগাইয়া লইয়া চলে। এই প্রচণ্ড যুব-শক্তিকে সংযত ও সংহত করিবার উপায় সমষ্টি-কল্যাণের ভিত্তিতে শারীর শিক্ষার সহিত সামরিক শিক্ষা। ইহাতে তাহাদের বজ্রদৃঢ় শরীরের ভিতর সুসংযত মন বাস করিবে; তবেই সম্ভব ব্রহ্মতেজের সহিত ক্ষাত্রবীর্যের মিলন।

গত দুই মহাযুদ্ধ জগৎ জুড়িয়া শিক্ষার মান ও জীবনের মান যথেষ্ট অবনত করিয়াছে—তথাপি দেখা যায় পাশ্চাত্য দেশগুলি পূর্ব মান ফিরিয়া পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; তা ছাড়া দেখা যায় শিক্ষার ব্যাপারকে তাহারা বেশি ব্যাহত হইতে দেয় নাই। তাহারা মনে করে শিক্ষার ব্যাপারে খরচ খরচই নয়, উহা তো মূলধনকে খাটানো—অধিকতর লাভের আশায়। আমাদের দেশে শিক্ষা ও শিক্ষকের জন্য—কি সরকারের, কি জনসাধারণের মুক্তহস্তে ও মুক্তমনে খরচ করা উচিত। কারণ শিক্ষাই গণতন্ত্রকে নিরাপদ করে, স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। এখন প্রশ্ন, ব্যয় হইবে কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে? প্রচলিত পদ্ধতির সময়োপযোগী পরিবর্তন করিতে হইলেও অনেকখানি চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন, নতুবা বহু জীবনের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। তাই সর্বক্ষেত্রেই নেতাদের আজ যথেষ্ট বিশ্লেষণী শক্তি, ঐতিহাসিক চেতনা ও ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি প্রয়োজন। তার জন্যও চাই নূতনতর অনুভূতি।

যা কিছু পুরাতন তাই চিরন্তন, যেহেতু চিরাচরিত অতএব ভাল—এই মনোভাব অগ্রগতির অন্তরায়। অতীতের স্মৃতি যেন একটা পাহাড়ের মত সামনের পথ রুখিয়া না দাঁড়ায়। জীবনের পথে যদি গতিশীল থাকিতে হয় তবে একদিকে যেমন পুরাতনের মুগ্ধপূজা ছাড়িতে হইবে—আবার অন্যদিকে যা কিছু নূতন—তাহাই ভাল, এরূপ ভাবিলেও চলিবে না। পুরাতনের মধ্যে যা কিছু কল্যাণকর তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিয়া নূতনের ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে পুরাতন ও নূতনের ঢেউএর দোলায় দুলিতে দুলিতে তরুণচিত্ত আগাইয়া চলিবে।

কিরূপ সমাজ-ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা দিতেছি—শিক্ষাপদ্ধতি-রচয়িতাদের এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। জাপান ও জার্মানি তাহাদের অবস্থা বুঝিয়া সামরিক শিক্ষার উপর জোর দিয়াছিল। রাশিয়া ও চীন তাহাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যাপক শিল্পায়নের পথে লইয়া চলিয়াছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা জানে তাহাদের বর্তমান অবস্থা, সেই অনুযায়ী তাহারাও চলিয়াছে শিল্পের পথে, কৃষ্টিকে ব্যাহত না করিয়া। আমাদেরও আজ বুঝিতে হইবে—কি আমাদের প্রয়োজন? কোথায় আমরা চলিয়াছি—কোন্ লক্ষ্যে? এই লক্ষ্য সম্বন্ধে যদি আমরা একটা সিদ্ধান্তে না আসিতে পারি তো আমরা কোন না কোন একটা ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যাইব। দুইটি বিপরীত ভাবের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হালছাড়া তরণী শেষে না বিপন্ন হয়! ভারতের শিক্ষাদর্শ কাহারও অন্ধ অনুকরণ না হইয়া তাহার জাতীয় প্রতিভার অনুসরণেই রচিত হওয়া উচিত।

ভারতের গঠনতন্ত্রে অবশ্য সমাজ-দর্শনের একটি ধারা নির্ণীত হইয়াছে—যদ্দ্বারা তাহার শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। সেখানে স্বীকৃত হইয়াছে:

—সকল অধিবাসীর জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ন্যায়বিচার,

—সকলের চিন্তা ভাষা বিশ্বাস ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা,

—সকলের সমান সম্মান ও সমান সুযোগ,

—সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বিস্তার, প্রত্যেকের মর্যাদা ও জাতির একত্ব।

অতএব আমরা উক্তভাবগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য

শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করিতে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা বিস্তার করিতে প্রতিশ্রুত।

শরীর, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সামঞ্জস্য-পূর্ণ বিকাশের নিমিত্ত ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সমাজ নয়, আবার সমাজকে ছাড়িয়া ব্যক্তি নয়। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ব্যক্তিগত দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য অশিক্ষা দূর করিতেই হইবে। অসাম্য থাকিলে অন্যায় অবশ্যম্ভাবী। মানুষের মধ্যে পরস্পর প্রীতির সম্বন্ধ, পাঁচজনে একযোগে কাজ করিবার ক্ষমতা, মতবিরোধ জয় করিবার শক্তি, এ সমস্তই অনুশীলন করিতে হইবে। উপযুক্ত নেতৃত্ব ও জ্ঞানসমৃদ্ধ পদ্ধতিতেই ইহা সম্ভব। এ সকলই আজ শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলি হইতে একদিক দিয়া যেমন বিভিন্ন-বিজ্ঞানবিদ্‌, নানাবিধ শিল্পী, সর্বসমাদৃত সাহিত্যিক বাহির হইবে—অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজের নেতা এবং অভিজ্ঞ শাসনকুশলী বাহির হইবে। আবার জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী পথ ধরিয়া শাসকমণ্ডলী কখনও ভুল করিলে ভুল ধরাইয়া দিবার জন্য যে নিরাসক্ত মুক্তমনের প্রয়োজন—তাহাও আসিবে এই সকল আলোক-কেন্দ্র হইতেই! দলীয় স্বার্থের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন সমুদ্রে সেই আলোই পথ দেখাইয়া জাতীয়-তরণীকে নিরাপদ পোতাশ্রয়ে টানিয়া আনিবে। তার জন্য যে চিন্তা ও ভাষার স্বাধীনতা প্রয়োজন তাহাও শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়া আর কোথায় অনুশীলিত হইতে পারে? বিদ্যালয়গুলি মিস্ত্রি ও কেরানির কারখানা না হইয়া হইবে অফুরন্ত বিদ্যুৎ শক্তির ডায়নামো।

* * *

শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারই আজ সকলের প্রথম ও প্রধান দাবি! পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের দুঃখদুর্দশায় মর্মাহত হইয়া এবং পাশ্চাত্ত্যদেশে শিক্ষার অপূর্ব বিকাশ দেখিয়া বজ্রনির্ঘোষে বারংবার বলিয়া গিয়াছেন, 'শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা—শিক্ষাই সেই সর্ব-রোগহর মহৌষধি—যাহা দ্বারা মৃতকল্প ভারত সঞ্জীবিত হইবে!' শিক্ষার যাদুস্পর্শেই ভারতের অভাব দূরীভূত হইতে পারে—অন্নাভাব বস্ত্রাভাব ভিক্ষার দ্বারা মেটানো অসম্ভব, স্বাস্থ্যাভাবও বিদেশী ঔষধ-পথ্য দ্বারা মিটিবে না—কিন্তু শিক্ষাই মানুষকে আত্মসম্মানসম্পন্ন করে, স্বাবলম্বী করে—যাহা দ্বারা সকল অভাব দূরীভূত হয়।

সকলেই ভাবিয়াছিল, বয়স্ক ভোটাধিকারের পূর্বেই সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে; কিন্তু তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই। ইহার জন্য এখনও আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে! বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-জনিত দুঃখ যেমন আমরা যুদ্ধকালীন উদ্যোগের সাহায্যে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করি, দেশব্যাপী অশিক্ষা ও অজ্ঞান-জনিত দুঃখ ও অভাব দূর করিবার জন্য কবে আমরা অনুরূপ উদ্যম করিব?

দেশের আনাচে কানাচে নূতন শিক্ষার বন্যায় কুসংস্কারের পচা ডোবা ভাসিয়া গেলে দেশ একদিনে নূতনরূপ ধারণ করিবে—জনসাধারণ বুঝিবে তাহাদের দাবি-দাওয়া ও দায়িত্ব। তখনই স্বাধীনতা-সূর্যের আলোক ও উত্তাপ কুটিরে কুটিরে অনুভূত হইবে। শিক্ষাবিষয়ে সাম্য অবশ্য স্বীকার্য, তথাপি একথাও অতি স্পষ্ট, যাহারা পুরুষানুক্রমে নিরক্ষর তাহাদের দাবিই সর্বাগ্রে! উচ্চশিক্ষিতেরা এতদিন তাহাদের বঞ্চিত করিয়া আভিজাত্য অর্জন করিয়াছে। আজ ঋণ-পরিশোধের সময় উপস্থিত! স্বেচ্ছায় সেবার ভাবে প্রাপ্যটুকু মিটাইয়া দিলে সমাজের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্তরের মধ্যে প্রীতির একটি সংযোগসেতু রচিত হইয়া সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। নতুবা উচ্চবর্ণদের শূন্যে বিলীন হইতে হইবে—ইহাই সেই যুগপ্রবর্তকের ভবিষ্যদ্বাণী। ভারতের শান্তিপূর্ণ উপায়ে উন্নতি নির্ভর করিতেছে শিক্ষার এই আদান-প্রদানের উপর। বায়ুমণ্ডলে চাপের তারতম্য

হইলে যেমন ঝড় অবশ্যম্ভাবী, সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে ও ধনবিভাগে সাম্য রক্ষিত না হইলে উপরিস্তর নীচে নামিবে এবং নিম্নস্তর উপরে উঠিবে, সমাজ-বিপ্লবের পথে।

ইতিহাসের মোড় ফিরিতেছে—বর্তমান যুগের ছাত্রেরা ভাগ্যবান্। আজ কোটি কোটি লোকের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্য শত শত উপযুক্ত উৎকৃষ্ট কর্মী চাই, সহস্র বৎসরের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক চাই। উচ্চ শিক্ষিত যুবকেরা বুঝিয়াছে শিক্ষার কি শক্তি—তাহারা কবে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ছড়াইয়া পড়িবে? শিক্ষার আলো, স্বাস্থ্যের উত্তাপ বিকীরণ করিবে? এবং নূতন শক্তিশালী ভারত গড়িয়া তুলিবে? সমস্যা অনেক, বাধাও প্রচুর। জাতিগঠনের কাজে দলাদলি ছাড়িয়া সহযোগিতার পথে শান্ত ও সহিষ্ণুভাবে অগ্রসর হইলে নিশ্চয় এই তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতি শীঘ্রই জাগিয়া উঠিবে,—বুঝিবে কি তাহার কৃষ্টি, কি তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বুঝিবে—বিশ্বের দরবারে কি তাহার করণীয়।

পল্লীভারত যুবশক্তিকে আহ্বান করিতেছে—সাদরে আহ্বান করিতেছে—সংগ্রামে আহ্বান করিতেছে! পল্লীজননী তাঁহার শ্যামল কোমল কোলে তাঁহার সন্তানকে ফিরিয়া চাহিতেছেন; দুঃখ দারিদ্র্য রোগ অশিক্ষার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য—স্বীয় সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। সে কি সাড়া দিবে না? সে কি আজও মাতিয়া থাকিবে—শহরের স্বার্থ-প্রতিযোগিতায়? সে কি সেখানেই তাহার সারা জীবন ও সর্বশক্তি নিয়োজিত করিবে? কবে সে ফুটাইয়া তুলিবে মনোময় ভারত? দিকে দিকে ফুটিয়া উঠিবে সুশ্রী ছবির মত শান্ত তপোবন—শিক্ষায় স্বাস্থ্যে সুন্দর, কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ! এ সকলের জন্য আজ শিক্ষাভিমানী যুবকদের হইতে হইবে ত্যাগী কর্মানুরাগী, নিরলস স্বার্থশূন্য ও সংঘবদ্ধ! অন্ধকার নিরাশার মাঝে তাহারাই বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে আশার আলো।

কেহ আমাদের শত্রুও নয় বা বন্ধুও নয়—আলস্য আত্মপ্রসাদই আমাদের শত্রু, আত্মনির্ভর কর্মশক্তিই আমাদের বন্ধু। আমরা নিজেরা না করিলে অপর কেহ আসিয়া রাতারাতি আমাদের উন্নত করিয়া দিবে না। অশিক্ষিত অর্ধভুক্ত জনসাধারণ কখনও মহাজাতিতে পরিণত হয় না; রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনে নাই। শিক্ষা-সহায়ে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া—আমাদেরই আমাদের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্যশিল্প প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যে চেতনার অভাবে একটা জাতি পরাধীন হয়, অবনত হয়—শিক্ষাসহায়ে সেই অভাব দূর করিতে না পারিলে, জাতি বারংবার কোন না কোন প্রকার স্বৈরাচারের পদানত হইবে।

*　　*　　*

ব্যক্তিগত, জাতিগত উন্নতি ছাড়া উচ্চশিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য আছে সেটি প্রায়ই সর্বত্র উপেক্ষিত; সেটি বিশ্বগত, মানবতাবোধের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত। সমাজদর্শনে যে ভ্রাতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহারও তিনটি স্তর—প্রথম ব্যক্তিগত বা পারিবারিক, দ্বিতীয় ভাষা বা কৃষ্টিগত, দেশগত বা জাতীয়—অতঃপর আন্তর্জাতিক বা বিশ্বমানবিক! এই বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত করাও উচ্চশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতি ধর্ম জীবিকা বৃত্তি—সব কিছুর ঊর্ধ্বে, সব কিছুর মূলে, মনে রাখিতে হইবে—'আমরা মানুষ'। এই বোধই সমগ্র মানব-জাতিকে এক পরিবারে পরিণত করিতে পারে।

রাজনীতিক্ষেত্রে কখনও বিশ্বশান্তি স্থাপিত হইবে না, কৃষ্টির ক্ষেত্রেই ইহা সম্ভব। 'বিশ্বশান্তির জন্য যুদ্ধ' নিত্যনিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে—কৃষ্টিকেন্দ্রে, স্কুলে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষাভাষীর পরস্পরকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টার মধ্যেই উহার বীজ নিহিত। ব্যক্তি-গত জাতিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করিয়াও অপরকে গ্রহণ করা সম্ভব—বর্তমান যুগে এই উদারভাব

হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই ভাবের অভাবেই সকল ভাবসংঘর্ষ ; এই ভাবের প্রতিষ্ঠাতেই শান্তি।

মানব-জীবন ও ব্যক্তির মূল্য স্বীকার করাই ঐ ভাবের ভিত্তি। যাহা কিছু ইহাকে খর্ব করে তাহাই বর্জন করিতে হইবে। জীবনের বিভিন্ন দিক যেখানে অবহেলিত, কৃষ্টির বিভিন্ন বিকাশ যেখানে অসম্মানিত, সমষ্টির নামে ব্যষ্টি যেখানে উপেক্ষিত উৎপীড়িত, ক্ষুদ্র যেখানে বৃহৎযন্ত্রের অংশমাত্রে পরিণত, এরূপ ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাদর্শের বহির্ভূত।

মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেকটি জীবন এক একটি নূতন অভিযান। এই জীবন ও ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করিতে শেখামাত্র বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তরুণ মনের তাল মিলাইয়া দেওয়া—উন্নততর জীবনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করাই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য—মাত্র বুদ্ধির বিকাশ নয়, শুধু জীবিকার উপায়ও নয়, অন্তর্নিহিত শক্তি কল্পনা ও ভাবাবেগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া যথার্থ পথে চালিত করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য ;—হৃদয়ের বিকাশেই, সহানুভূতিতেই এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবায় উহার চরম সার্থকতা !

'Love thy neighbour as thy self'—'প্রতিবেশীকে ভালবাসো—নিজের মত করিয়া'—কথাটি কত ছোট—অথচ কত বড় ! শিক্ষার সকল আদর্শ ও উদ্দেশ্য এই মহাবাক্যে নিহিত রহিয়াছে। পাশের মানুষটিকে ভালবাসার মধ্যে যে সত্য, যে কল্যাণ নিহিত—তাহারই ব্যাপক প্রয়োগে বিশ্বশান্তি—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এতদিনেও ইহা সম্ভব হইল না কেন ? এবং কখনও যে সম্ভব হইবে বলিয়াও ত মনে হয় না। তবু বলিতে হয়, শিক্ষার ভিতর দিয়াই ঐ অসম্ভবের সাধনা !

শিক্ষার সফলতা নির্ভর করিতেছে শিক্ষকের উপর। শিক্ষক মানবজাতির নীরব সেবক, ইতিহাসের অদৃশ্য অভিনেতা। শিক্ষকের আদর্শে ও সাহচর্যে শিক্ষা জীবনের পরতে পরতে মিশিয়া যাইবে। শিক্ষা কেনাবেচা না হইয়া হইবে অন্তরের আদান-প্রদান। শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইবে সেই দিন—যে দিন শিক্ষার্থী একটি পরিপূর্ণ 'মানুষ' রূপে বিকশিত হইয়া উঠিবে। পুরাকালে ছাত্র-জীবনের আরম্ভে ও শেষে যে উপনয়ন ও সমাবর্তন-প্রথা ছিল—সেখানে ছাত্রদের জীবনের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হইত। বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া তাহার পুনঃপ্রবর্তন করিলে ছাত্র জীবনের প্রারম্ভেই শিক্ষার্থী বুঝিবে—কি তাহার উদ্দেশ্য, আর শেষে বুঝিবে—কি তাহার দায়িত্ব। জীবন ও জগতের প্রকৃত রূপ তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিবে—শান্ত সমাহিত মনে সে সংসারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, সমাজের সেবা করিতে। উপযুক্ত শিক্ষক ও গুরুর আদর্শেই সে ধীরে অথচ ধ্রুবগতিতে জীবনের পথে আগাইয়া চলিবে। ঊর্ধ্বমুখী শিক্ষার অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলিতে থাকিবে।

তাহাদের ঘরে আলো নাই, শিক্ষা নাই। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কে তাহাদের ঘরে আলোক ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে ?

—বিবেকানন্দ

শরণাগতি*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

'বেড়াল-ছানা হবি, বানর-ছানা হবি না।' বানর-ছানা মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে, এ গাছ থেকে ও গাছে লাফিয়ে যাবার সময় তার পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। মাকে ধরে থাকলেও তার পতনের সম্ভাবনা বেশি। তাই ঠাকুর বলতেন 'বানর-ছানা হবি না, বেড়াল-ছানা হবি—মা যেখানে রাখেন, হেঁসেলে বা আঁস্তাকুড়ে, কিংবা বিছানায় যে অবস্থায় মা তাকে রাখেন, বেড়াল-ছানা সেই অবস্থাতেই খুশী থাকে। সে মাকে ডাকে মিউ মিউ করে। মায়ের ওপর তার পূর্ণ নির্ভরতা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরতা বোঝাবার জন্য ঠাকুর এই উদাহরণটি দিতেন। এটি সকল শাস্ত্র ও সাধনার শেষ কথা: ভগবানে আত্মসমর্পণ। কি নির্ভরতা! বেড়াল-ছানার কোন অভিযোগ নেই, সে শুধু মাকে ডাকে। সংসারে আমাদের থাকতে হবে এই বেড়াল-ছানার মত, ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। পূর্ণ শরণাগতি চাই।

এই নির্ভরতা আসে তাঁকে ভালবাসলে। পাঁচ বছরের ছেলে, সে জানে একমাত্র মাকে। সে মায়ের ওপর পূর্ণ নির্ভর করে চলে। খিদে পেলে মাকে জড়িয়ে ধরে, ভয় পেলেও মা-ই তার আশ্রয়। মা বই সে আর কিছু জানে না। মায়ের ওপরই তার সব নির্ভর। এটি আমাদের বুঝতে হবে, এতেই আসবে শান্তি। বালক যেমন মার ওপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে সেই রকমটি হতে হবে।

ভগবানকে এইভাবে সব সমর্পণ করলে, তিনিও আমাদের খাওয়া-পরার সব ভার নেন। গীতায় ভগবান একে অনন্যা ভক্তি বলেছেন। সংসারে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে হলে এই ভক্তি চাই। মায়ের ওপরেই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥'

যার মন তাঁতে সমাহিত, তার সব দায় সব ভার তিনি মাথায় করে বয়ে পৌঁছে দেন, লোক মারফৎ পাঠিয়ে দেন না। তাঁতে সব সমর্পণ করলে কত বড় দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। আর আমরা বেশী বুদ্ধিমানের মতো নিজের বুদ্ধি খরচ করে ভগবানের ওপর ভরসা না করে নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে চলি আর প্রতি পদে আঘাত পাই।

'যোগ' শব্দের অর্থ—না পাওয়া জিনিস পাওয়া, আর 'ক্ষেম' শব্দের অর্থ—পাওয়া জিনিস রক্ষা করা। ভক্ত ভগবানের এই যে সম্বন্ধ এটি বড় অদ্ভুত, সব ভার তিনি নেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কাশীর এক পণ্ডিত অর্জুন মিশ্র শাস্ত্রজ্ঞ, নিত্য ভোর-রাত্রে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সেরে পূজা করে গীতা পাঠ করতেন। গীতা পড়বার সময় উক্ত শ্লোকটি তাঁকে নিত্য ব্যাকুল করত। তাঁর মনে সংশয় এলো, ভগবান মাথায় করে সব ভার বয়ে দেন, কি আশ্চর্য! সংশয়াকুল মনে শেষে তিনি স্থির করলেন, ভগবান বয়ে দেবেন কি? তিনি দান করেন। এটা 'দদাম্যহম্' হবে, 'বহাম্যহম্' নয়। এই ভেবে শ্লোকের ঐ জায়গাটি লাল কালি দিয়ে কেটে 'দদাম্যহম্' লিখে দিলেন। তার পর তিনি দ্বিপ্রহরের স্নানে গেলেন। তাঁদের সাংসারিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না, তাঁর গৃহিণী স্নানাহ্নিক শেষ করে মহা চিন্তায় পড়েছেন, কি রান্না হবে আজ!

* আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পূজ্যপাদ মহারাজের ১৮.১১.৫৬ তারিখের একটি ধর্মপ্রসঙ্গ।

ঘরে তো কিছুই নেই, স্বামী ফিরে এলে তাঁকে কি খাওয়াবেন। শেষে চিন্তার কোন কূল না পেয়ে, 'ভগবান যা করেন',—ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ কে যেন তাঁদের দরজায় ঘা দিল। তিনি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখলেন, দুটি অপূর্ব সুন্দর বালক, পরনে তাদের সুন্দর ধুতি, মাথায় করে তারা দু'ঝুড়ি ভরতি নানান রকম তরকারি, ফলমূল এনে ডাকাডাকি করছে। আর অদ্ভুত ব্যাপার তাদের দুজনের বুক রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত, দর দর ধারে দুজনেরই বুক বেয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি আকুল হয়ে তাদের এই রক্তপাতের কারণ জানতে চাইলেন, আর জিজ্ঞেস করলেন, এই তরিতরকারিই বা কে দিল। তারা কিন্তু কোন কথার বিশেষ উত্তর না দিয়ে, ঘরের মধ্যে ঝুড়ি নামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। মহিলা ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। তবু বার বার ছেলে দুটির বুকের সেই রক্তের কথা তার মনে উঠে তাকে আকুল করে তুলতে লাগল। ক্রমে যখন তাঁর স্বামী ঘরে ফিরে এলেন, তখন তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বলে ছেলে দুটির বুকে ছুরিকাঘাত জনিত সেই রক্তপাতের কথাও বললেন। স্বামী ভক্ত, তিনি শুনেই সব বুঝতে পারলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, মহাভাগ্যবতী তুমি, ভগবান বালকবেশে এসে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার সংশয় সন্দেহ মিটাবার জন্য, তিনি মাথায় করে আমার বোঝা বয়ে দিয়ে গেলেন। আমার কলমের লাল কালির আঁচড় রক্তের স্বাক্ষর হিসাবে তিনি বুক পেতে নিয়েছেন। আজ সব সন্দেহের আমার অবসান হ'ল—'দদাম্যহম্' নয় 'বহাম্যহম্'ই ঠিক।

সত্যই—শরণাগতের তিনি অনন্যশরণ, অভয় আশ্রয়। ঠাকুরও তাই বলেছেন, 'বেড়াল-ছানা হও।' তিনি সব ভার মাকে দিয়েছিলেন। মা-ও তাই সব যোগালেন তার জন্য। তাঁর পঞ্চবটী ঘেরবার কঞ্চি, দড়ি মায় পেরেকটি পর্যন্ত তিনি যুগিয়েছিলেন। তাঁর অবর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য মথুরবাবু একবার তাঁকে ষাট হাজার টাকার জমিদারী লিখে দিতে চেয়েছিলেন। তাতে ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমার মা, আবার আমার জমিদারী, কটা জিনিস আমার হবে। মা থাকলে সব হবে। ও সব চাই না!' শরণাগতি—ভগবানে পূর্ণ নির্ভরতা—আত্ম-সমর্পণ—এই হচ্ছে অনন্যচিন্তা।

'সংসারে থাকবি, ঝড়ের এঁটো পাত হয়ে'—হাওয়া যেদিকে নিয়ে যায় তাকে, সে আঁস্তাকুড়ও হতে পারে কিংবা বড় লোকের দালানেও হতে পারে, যে দিকে হাওয়ার খুশি সেই দিকেই সে নিয়ে যাবে পাতাকে। পাতার কোন নিজস্ব সত্তা নেই, সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে সে। সাধনার শেষে আসে এই অবস্থা। সম্পদ ঐশ্বর্যের মধ্যে যে ভালবাসা, তার শেষ নেই; আরো চাই, আরো দাও এই ভাবে চাওয়া ক্রমশঃ বেড়েই চলে। এতে শান্তি মেলে না। এই ঐশ্বর্য সম্পদ ডেকে আনে অশান্তি আর দুশ্চিন্তা। এর থেকে মুক্তি পেলে তবে আসে শান্তি। ঠাকুর চিলের উদাহরণ দিতেন, মাছটি ফেলে দিলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারবে। বাসনা ত্যাগ করলে তবে শান্তি। নইলে টাকা, গয়না, অসুখবিসুখের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। আসল জিনিস সত্য ধর্ম ভগবান। সব ছেড়ে যদি তাঁর ওপর টান হয়, ভালবাসা হয়, তবে তো সব চেয়ে সুন্দর! তার দিকে তুমি যদি এক পা এগিয়ে যাও, তিনি তোমার দিকে একশো পা এগিয়ে আসবেন।

এই সমস্ত বিষয়-বাসনা নিয়ে মনের স্বাভাবিক চঞ্চলতা আরও বেড়ে যায়। এর মধ্যেও শান্তির পথ আছে; কিন্তু আমরা সে পথে যাই না। এই দেহসুখের আসক্তিতেই আমরা নোঙর ফেলে আছি। চারটি মাতাল মদ খেয়ে একবার নৌকা

বিহার করবে ঠিক করলে। নদীতে গিয়ে একটি নৌকা নিয়ে চারজন তাতে উঠে বসলো—একজন গেল হালে, আর তিনজন ধরলো দাঁড়। ভাবছে বেশ নৌকা চলছে, সারা রাত ধরে তারা দাঁড় টেনেছে। ভোর যখন হ'ল, তাদের নেশাও তখন একটু ফিকে হয়ে এসেছে। হঠাৎ তাদের হুঁশ হ'ল যে সারা রাত তারা একই জায়গায় রয়েছে। কি ব্যাপার, না দেখলে নোঙর তোলা হয় নি। সারা রাত তারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড় বেয়েছে। এই আসক্তি নোঙর, ঐটি না তুলতে পারলে কিছুই হবে না, সব পরিশ্রমই ব্যর্থ। যত সাধন-ভজন জপ-তপ করো না কেন, আসক্তি থাকলে কিছু হবে না। আসক্তি-নোঙর আগে তুলে ফেলো।

ঠাকুর এক চাষীর গল্প বলতেন। সে সারাদিন পরিশ্রম করে নালা কেটে ক্ষেতে জল সেচেছিল। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমের পর সে অবাক হয়ে দেখলে তার ক্ষেত যেমন শুকনো ছিল তেমনিই রয়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুজির পর সে দেখতে পেল নালার মুখে ইঁদুরের কতকগুলি গর্ত। সমস্ত জল ঐ গর্ত দিয়ে মাটির নীচে অন্যদিকে চলে গিয়েছে। সাধকেরও ঐ রকম কামনা-বাসনার গর্তে সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়।

আত্মসমর্পণ আপনা থেকে আসে না। মন চঞ্চল, তাকে স্থির করতে হবে। অর্জুন পর্যন্ত বলেছেন, বায়ুকে যেমন নিগ্রহ করা যায় না, মনকেও তেমনি বাঁধা যায় না। এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মনকে বশে আনবে, কি করে শোন: "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়, বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" অনাসক্তভাবে অভ্যাস করলে সব সম্ভব হয়।

চাই সাধন। সব কিছু হয় এই সাধন থেকে। কিন্তু সেই সাধন সম্ভব হয় আবার কৃপা থেকে। কৃপা পেতে হলে কিছু করতে হয়। কৃপা মানে—করে পাওয়া। 'কৃ'-মানে করা, 'পা'-মানে পাওয়া। সাধনার শেষে আসে আত্মসমর্পণ। যার মন ভগবানে সমাহিত হয়েছে, সেই পারে আত্মসমর্পণ করতে। যে সব তাঁকে দিয়েছে সেই পারে নিশ্চিন্ত হতে।

ঠাকুর দুই বেয়ানের গল্পে এটি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। আমরাও সংসারে, ভগবানকে ডাকি এক হাত তুলে। ঠাকুর বলতেন, আমি দুহাত তুলে নাচি। সংসারের কামনা-বাসনা বগলে চেপে, এক হাত তুলে নাচলে আনন্দ হয় না। তাই সব ছেড়ে দিয়ে, দুহাত তুলে তাঁতে নির্ভর না করলে আনন্দ হয় না। এই নির্ভরতা আসে মন শুদ্ধ হলে, তখন সব বাসনা যায় তাঁর দিকে। বিল্বমঙ্গল সমস্ত মন দিয়ে চিন্তামণিকে ভালবেসেছিল, কিন্তু একটি কথায় সব পালটে গেল। ষোল আনা মন—যা চিন্তামণিকে দিয়েছিল তার মোড় ফিরিয়ে দিলে ভগবানের পায়ে।

তুলসীদাস, যিনি আজ প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি বিবাহিত জীবনে বড় স্ত্রৈণ ছিলেন, স্ত্রীর আঁচল ধরে বেড়াতেন। তাঁরও পরিবর্তন হল একটি কথায়। স্ত্রীকে একবার তাঁর অনুপস্থিতিকালে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুমতি নিয়ে বাপের বাড়ী যেতে হয়। বাড়ী ফিরে এসে স্ত্রীকে না দেখে তুলসীদাস মায়ের কাছে কারণ জানতে পেরে মাকেই প্রথমে খুব ধমক দিলেন, তারপর নিজেই ছুটলেন স্ত্রীর পালকির উদ্দেশে। বহুদূর ছুটে গিয়ে যখন স্ত্রীর পালকি তিনি ধরলেন, তখন তাঁর অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত মুখ রৌদ্রে লাল, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। এই অবস্থায় তাঁকে দেখে তাঁর স্ত্রী হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'এই দেহের অস্থি-চর্মের প্রতি তোমার যে ভালবাসা, তা যদি শ্রীরামকে দিতে তবে নিশ্চয়ই ভব-বন্ধন হতে মুক্ত হতে।' এই ভর্ৎসনায় তাঁর চেতনা হ'ল। তিনি সমস্ত মন ফিরিয়ে নিয়ে ভগবানকে দিলেন। সাধনার অন্তরায় এই আসক্তি। এর থেকে মুক্ত হতে হ'লে ভক্তি নিয়ে সংসারে চলতে হবে।

ঠাকুর মাস্তুলের পাখীর উদাহরণ দিয়ে শরণাগতদের অবস্থা বোঝাচ্ছেন। জাহাজটি যখন মাঝ দরিয়ায় এসে পড়েছে তখন পাখী আশ্রয়ের জন্ম ব্যাকুল হয়ে একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে, একবার পূর্বে, একবার পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত ঘুরেও কোন কূলকিনারা না পেয়ে শেষে শ্রান্ত হয়ে আবার সেই মাস্তুলের ওপরই বসল। মানুষও এই রকম সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে কোন নিস্তারের পথ না পেয়ে বুঝতে পারে,—ভগবান ভিন্ন তার গতি নেই, তাঁর শরণ নিলেই শান্তি।

গীতায় শ্রীভগবান বলছেন, তুমি স্থিরচিত্তে শোন: তোমাকে সর্বগুহ্যতম কথা শোনাচ্ছি—তুমি আমার অতি প্রিয়, তোমার কল্যাণের জন্য, তোমাকে বলছি, যে আমার ভক্ত শুধু তারই জন্ম এ উপদেশ দিচ্ছি। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে বিশ্ববাসী সকলকেই তিনি বলেছেন, সকলকে মায়া-যন্ত্রে ফেলে তিনি ঘোরাচ্ছেন। সকলের ভেতরেই তিনি রয়েছেন। আমরা ঘুরছি অবিরত। কিন্তু এর থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি? পূর্ণ নির্ভরতা আর আত্মসমর্পণ। 'আমার' ও 'আমি'তে বদ্ধ হয়ে সবাই ঘুরছে। এর থেকে নিস্তারের উপায় তিনি বলছেন, 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত'। কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাগত হও। এতটুকু ভাবের ঘরে চুরি থাকবে না। সব আসবে ভালবাসার ভেতর দিয়ে। যে যত নিজের জন্ম ভাববে, ভগবান তার থেকে তত দূরে সরে যাবেন।

সংসার মানে যাতায়াত। 'পরিশ্রান্ত হয়েছি, আর পারি না দীর্ঘ পথ চল্‌তে, এইবার রেহাই দাও প্রভু—এই ভাব মনে না এলে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাই মন মুখ এক করো, তবেই "ত্বৎ প্রসাদাৎ পরা শান্তিঃ", এই পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। তাঁর পা জড়িয়ে ধরো, কামনা-বাসনার মোড় ফিরিয়ে তাঁর সঙ্গ কামনা কর। আসক্তি হোক তাঁতে। শান্তি পেতে হ'লে বাইরের মন গুটিয়ে এনে তাঁর পাদপদ্মে সমর্পণ করো। 'অকামো বিষ্ণুকামো বা'। ঠাকুর বলতেন, "হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়।" যাকে পেলে সব পাওয়া যায় তাঁকে চাও, যার থেকে শ্রেষ্ঠ লাভ আর নেই, সেই অন্তর্যামীকে আশ্রয় করো।

তিনি বলছেন, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ',—তোমাকে আমি ধুয়ে মুছে সাফ করে নেব, সব কিছু পরিত্যাগ করে যদি তুমি আমার শরণ নাও তবে তোমাকে মালিন্যমুক্ত করে আমার যোগ্য করে নেব। আবার তিনি বলছেন, 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো, মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'। আমাকে ভালবাসো, আপনার জ্ঞান করো, বাইরের অনিত্য জিনিস দেখে ভুলে থেকো না, আমার উপাসনা করো, আমার ভক্ত হও, সংসারের কাজ করো আমাকে অবলম্বন করে, তাহলে আমাকেই লাভ করবে। শ্রীভগবান নিজে প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন। আমরা 'আমিত্ব'কে খোঁটা করে কাজ করি। কিন্তু 'আমি'র পেছনে যে তিনি রয়েছেন সেটি দেখি না। তাই তিনি বলেছেন, 'অহম্' ছেড়ে তাঁকে ধরো। শরণাগত হও। আমি পশ্চাতে রয়েছি আমাকে নমস্কার করো। জীবনের লক্ষ্য যদি শান্তিলাভ হয়, তুমি আমাকেই লাভ করবে। এই তার রাস্তা। এই জীবন গঠনের আদর্শ পাবে গীতায়, কথামৃতে। কিন্তু শুধু বই পড়ে কিছু বিশেষ হয় না। 'সাধন কর্‌না চাহিয়ে' মীরা যেমন বলতেন, সাধন চাই। আকুলতা চাই, আর চাই তাঁতে সব সমর্পণ। ভার লাঘব করতে হ'লে, বোঝা হালকা করতে হ'লে তাঁকে ভার দিয়ে দাও। ভক্ত কবীর বলতেন: "চলতি চাক্কী সব কোঈ দেখে, কীল না দেখে কোঈ।" জাঁতার আশে পাশে সব ছোলা পিষে যায়, কিন্তু কীলের কাছে যে দু'একটি পড়ে যায় তারা আর পেষাই হয় না। ভগবান হচ্ছেন এই কীল। যারা তাঁকে আশ্রয় করে তারা অভী হয়, তাদের কোন চিন্তা থাকে না, তাদের ধ্বংস নেই। তাই তাঁর শরণাগত হও।

কারে আমি হেরিলাম সহসা নিভৃতে!

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কর্মচক্র আবর্তনে আনন্দের করি অন্বেষণ
ধরণীর এ ধূলিতে জন্ম লয়ে আমি!
অলীক সম্ভোগ-সুখে কানে আসে মায়ার ক্রন্দন,
সঙ্কীর্ণ জীবনে মোর পরিকীর্ণ ভ্রান্তি-ভরা মন।
সংখ্যাতীত কামনায় আজো অধোগামী!
স্বপনের মধুকর গুঞ্জরিছে আশার সৌরভে,
বস্তুবিশ্বমাঝে কোথা চিরস্থিতি বিভূতি-গৌরবে!

বিচিত্র তর্কের জালে জড়ায়েছি সন্দেহ-সংশয়,
ইন্দ্রিয়-বিলাসে কোথা আনন্দ-সম্পদ?
কল্পনা-বিভ্রম লয়ে পলে পলে হ'ল ক্ষতি ক্ষয়,
ঘুরে ঘুরে অন্তরীক্ষে উড়ে-যাওয়া পাখী পেলো ভয়,
ক্লান্ত হয়ে পেল কিগো আশ্রয়ের পথ?
সীমাহীন ভবার্ণবে পণ্যবাহী তরণীরা দোলে,
কূলহারা হয়ে তারা প্রকম্পিত তরঙ্গের কোলে।

রূপোন্মত্ত সুষমার এষণায় ব্যর্থ পরিক্রমা,
পার্থিব ঐশ্বর্যতরে উদগ্র লালসা?
রহস্যের একি লীলা! দিনে দিনে অশ্রু হ'ল জমা,
মধুরিমা লয়ে আসে মরীচিকা হয়ে মনোরমা;
মরুবক্ষে কেন মোর সহস্র দুর্দশা?
কোথায় গাহন করি জুড়াইতে অজস্র যাতনা,
চিদানন্দরসে ডুবি কবে আর হবে গো সাধনা?

নরদেহে ব্রহ্মপুরে যেথা শোভে জ্যোতি পদ্মাকার
সেথা যারে হেরিলাম সহসা নিভৃতে,
সে যেন আনন্দময়! শুধাইনু, 'কে তুমি আমার?'
কিছু তার কথা নাই; আত্মভোলা গান গেয়ে গেয়ে—
অনাহত সুরে তার কি চাহিছে দিতে!
প্রেমসূত্রে সে কি মোর গেঁথে দিবে মৌন মন-মালা,
বিবেক-বৈরাগ্য-দীপ ওই ঘরে কার পাশে জ্বালা?

তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

'A spark disturbs our clod.' ব্রাউনিং ঠিক কথাই বলেছেন। আমাদের এই মাটির দেহের মধ্যে আলোর একটা শিখা আছে। এই শিখা আমাদিগকে না দেয় বসে থাকতে, না দেয় দাঁড়িয়ে থাকতে। ওর কাজ আমাদের রক্তের মধ্যে একটা জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া। সেই জ্বালায় অস্থির হয়ে দিগন্তের ডাকে আমরা ঘর থেকে পথে এসে দাঁড়াই চলার দুরন্ত নেশায়। এই যে 'Sting that bids nor sit nor stand but go!' (এই যে যন্ত্রণা যা বসতে দেয় না, দাঁড়াতে দেয় না, শুধু চলায় প্রেরণা দেয়) এই অশান্তি কেবল মানুষেরই মধ্যে। অন্নে তার সুখ নেই, তার কাছে ভূমাই সুখ। তার মর্মের গভীরে অনন্তের জন্যে কী অপরিমেয় পিপাসা! ব্রাউনিংএর ভাষায় আমরা যদি হ'তাম 'Finished and finite clods, untroubled by a spark' (অগ্নিকণা-দ্বারা অস্পৃষ্ট সীমাবদ্ধ রূপায়িত মৃত্তিকাখণ্ড)—তবে ছিল স্বতন্ত্র কথা। কোকিলের মতো আমের মুকুল খেতাম, বসন্তের আকাশে সুরের ঢেউ তুলতাম, গরুর মতো গোগ্রাসে গিলতাম এবং শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটতাম। সুদূরের জন্যে তাদের মনে কোন দুঃখ নেই; ঈশ্বর আছেন

কি নেই—এ নিয়ে ওদের মনে সংশয়ের কোন বালাই নেই।

মানুষের বেলায় কিন্তু ওটি হবার যো নেই: বাইরে থেকে মনে হচ্ছে বেশ দিব্যি আছে; খাচ্ছে দাচ্ছে, মোটর হাঁকিয়ে দিব্যি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, দামী চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ছে, গল্‌ফ্‌ খেলছে, দু-বেলা পোষাক বদলাচ্ছে, মূল্যবান গহনায় দেহ সাজাচ্ছে, চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে রসনাকে তৃপ্ত করছে। কিন্তু ঈর্ষা করবার কিছু আছে কি? খুব সুখে আছে ওরা—এমন কথা মনে করবার সত্যই কি কোন হেতু আছে? ঠাকুর বলতেন:

> কামিনী-কাঞ্চনের সুখ—এই আছে, এই নাই; ক্ষণিক! কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর আছে কি? আমড়া, আঁটি আর চামড়া; খেলে হয় অম্লশূল। সন্দেশ, যাই গিলে ফেললে আর নাই।

ওই আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান, হাসি-ঠাট্টা এবং সাজ-সজ্জার অন্তরালে আর একটি মানুষ রয়েছে যে নিঃশব্দে বহন করে চলেছে প্রচ্ছন্ন আত্মগ্লানির এবং নৈরাশ্যের দুর্বহ বোঝা। এই আসল মানুষটিকে বাইরে থেকে বুঝবার কোনই উপায় নেই। হাক্সলীর ভাষায়, এই যে insufferable boredom, এই যে secret silent loathing and despair—হুইট্‌ম্যানের ভাষায়,—এই অন্তহীন ক্লান্তির এবং হতাশার কথা স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে বলে না, বন্ধু বন্ধুর কাছে ব্যক্ত করে না। মার্কিণ কবির ভাষায়: No husband, no wife, no friend, trusted to hear the confession. মানুষ বাইরে ভোগ্যবস্তুর পিছনে যতই ছুটাছুটি করুক, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কসরৎ নিয়ে যতই প্রমত্ত থাকুক—the soul of man is still athirst for essential things—ঐতিহাসিক টয়েনবীর ভাষায়। চরম সত্যের জন্যে মানুষের অন্তরে যে পরম তৃষা রয়েছে সে তৃষা তো যাবার নয়। অতীতে যেমন সে চেয়েছে, আজও সে তেমনি চাইছে সত্যকে, সুন্দরকে, ভগবানকে।

Principles of Social Reconstruction (পুস্তক)-এর উপসংহারে ইংরেজ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখেছেন:

> Life devoted only to life is animal, without any real human value, incapable of preserving men permanently from weariness and feeling that all is vanity. If life is to be fully human, it must serve some end which seems, in some sense, outside human life, some end which is impersonal and above mankind, such as God or truth or beauty.

অনুবাদ: শুধু বাঁচার জন্যে বাঁচা মানবেতর প্রাণীর জন্যে। ওর মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্বের কোন গৌরব নেই। ঐ জান্তব জীবনের কোন সাধ্য নেই মানুষকে বরাবরের জন্যে বাঁচায় ক্লান্তির হাত থেকে, 'সমস্তই নিশার স্বপ্ন'—এই হতাশার ভাব থেকে। জীবনকে পরিপূর্ণ মানুষের জীবন হতে গেলে বাঁচতে হবে এমন একটা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে যা নৈর্ব্যক্তিক, যা মানুষের জীবনের বাহিরে, যা সুদূরের—যেমন ঈশ্বর অথবা সত্য অথবা সুন্দর।

এ হচ্ছে এমন একজন মানুষের মন্তব্য যাঁর বইগুলিকে কোনমতেই রামকৃষ্ণ-কথামৃত অথবা চৈতন্য-চরিতামৃতের পর্যায়ে ফেলা চলে না, যিনি গণিতশাস্ত্রের জটিল সমস্যা নিয়ে বই লিখেছেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিমা থেকে কথা বলেছেন, নিঃশঙ্ক চিত্তের স্বাধীন চিন্তার প্রদীপ্ত আলোকে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন। সত্যের প্রতি একটা জ্বলন্ত অনুরাগ নিয়ে জীবনকে তলিয়ে

বুঝবার চেষ্টা করলে রাসেলের সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই হবে। কেবল জান্তব স্তরে প্রবৃত্তির জীবনকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করলে সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের ব্যাবিটের (Babbit) মতো একদিন না একদিন তাকে নিরাশ হতেই হবে, Dodsworth (সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের অপর একখানি উপন্যাসের নায়ক) এর মতো বলতেই হবে : And I am tired (আমি ক্লান্ত). আমেরিকার অতুল ঐশ্বর্যের চমক্‌লাগানো আড়ম্বরের মধ্যে মানবাত্মার প্রচ্ছন্ন নৈরাশ্যের কথা লুইসের উপন্যাসগুলিতে নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে।

আমার বলবার কথা : ইওরোপ এবং আমেরিকা বুদ্ধির ক্ষেত্রে চোখ-ঝলসানো সফলতা অর্জন করেছে—সন্দেহ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ওদের বিফলতার কথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। ওরা 'রক্তকরবী'র সেই রাজার মতো, যে পুঞ্জীভূত সোনার তালের উপরে বসে বলছে : 'আমি রিক্ত, আমি তপ্ত, আমি ক্লান্ত।' আর মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক দিকটা কোন মতেই উপেক্ষা করবার নয়। উপেক্ষা করে পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীতে ইতিমধ্যে নিয়ে এসেছে দুটো মহাযুদ্ধ; তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে এখন পাঁয়তারা ভাঁজছে। ইওরোপ আমেরিকা সারা-পৃথিবী চুঁড়ে চুঁড়ে বেড়াচ্ছে তেলের জন্যে, সোনার জন্যে, কাঁচামালের জন্যে—যাতে ওরা সিগার, শ্যাম্পেন আর মোটর নিয়ে বিলাসব্যসনে মত্ত থাকতে পারে। আফ্রিকা ওদের মৃগয়াক্ষেত্র। ওরা যা করছে তা আনন্দেরই জন্যে। মানুষের স্বভাবই আনন্দকে অন্বেষণ করা। ওদের ভুল হচ্ছে একটা জায়গায়। ভাবছে বিদ্যুৎকে বশ করতে এবং জড়প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব কায়েম করতে পারলেই সব-পেয়েছির দেশে পৌঁছে যাবে। তা হবার নয়। চরম সত্য—ঈশ্বরের মধ্যে সেই শান্তি, যার সম্পর্কে বাইবেলে বলা হচ্ছে, 'the peace of God that passeth all understanding'—ঈশ্বরীয় যে শান্তি বুদ্ধির অগোচর এবং আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'যতো বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' —যাকে না পেয়ে বাক্য ফিরে এল মনের সঙ্গে। এই পরম সত্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে তবেই মানুষকে ভালবাসা সম্ভব হয়। কিন্তু মনটাকে সিগারে শ্যাম্পেনে মোটরে লাগিয়ে রাখলে সে মনকে ঈশ্বরে দেওয়া তো সম্ভব নয়। এমন কথা বলা হচ্ছে না যে আমাদের মধ্যে যে জন্তুটা রয়েছে তার দিকে মন দেবার কোনই প্রয়োজন নেই ; প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। খালি পেটে তো ধর্ম হবার নয়। কিন্তু মন যদি সর্বক্ষণের জন্য বাহিরের বিষয়বস্তুতে লেগে থাকে—ফল কখনই শুভ হবে না।

ইওরোপ এবং আমেরিকা ভুল করেছে বুদ্ধির দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে এবং আধ্যাত্মিক দিকটাকে উপেক্ষা করে। ঐতিহাসিক টয়েন্‌বী ঠিকই লিখেছেন :

Man has been a dazzling success in the field of intellect and 'know-how' and a dismal failure in the things of the spirit ; for the spiritual side of man's life is of vastly greater importance for man's well-being than is his command over non-human nature. (বুদ্ধির ও বিজ্ঞানের জগতে মানুষের সাফল্য বিস্ময়কর, কিন্তু অধ্যাত্মবিষয়ে তার ব্যর্থতা ভয়াবহ। মানুষের কল্যাণের জন্য জীবনের অধ্যাত্ম দিকটির প্রয়োজনীয়তা জড়প্রকৃতি-জয়ের থেকে অনেক বেশি।)

পাশ্চাত্ত্য যদি বাঁচতে চায় এবং পৃথিবীকে বাঁচাতে চায় তবে তাকে জোর দিতেই হবে জীবনের আধ্যাত্মিক দিকটার উপরে। কেবল জড়প্রকৃতিকে নয়, তাকে আত্মজয় করতে হবে। ওয়েল্‌স্ (H. G. Wells)এর ইতিহাসে পড়ছিলাম : We

have tamed and bred the beasts ; but we have still to tame and breed ourselves. (আমরা পশুদের পোষ মানিয়ে শিক্ষিত করে তুলেছি, কিন্তু নিজেদের সুশিক্ষিত করতে বাকি)।

পরানুকরণপ্রিয়তার মোহ থেকে ভগবান তরুণ ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন। কামিনীকাঞ্চনের বিরুদ্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিযান ঐতিহাসিক গুরুত্বে পরিপূর্ণ। টয়েন্‌বী-র A study of History তরুণ-তরুণীদের পড়া উচিত। রাসেলকেও পড়া দরকার। হাক্সলি (Aldous Huxley)-র বই-গুলির মধ্যেও কথামৃতের সুরকে আমরা খুঁজে পাব। পাশ্চাত্ত্যের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে একদল মনীষী জড়বাদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে তর্জনী তুলেছেন। তাঁদের এই বিদ্রোহ উপেক্ষা করবার নয়। তাঁদের চিন্তাধারার পটভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনার বৈশিষ্ট্য আরও পরিষ্কার করে বোঝা যাবে।

ইতিহাস-পর্যটক কবি আমি

শ্রীনারায়ণ পাত্র

আমি এক ইতিহাস-পর্যটক—কবি,
অনেক সভ্যতা আর অনেক শতাব্দী পার হয়ে
এসেছি দেখিতে বিংশ-শতাব্দীর ছবি,
অনেক বিস্মৃতি স্মৃতি আনিয়াছি সংগে মোর বয়ে।

গিয়েছি হস্তিনাপুরে, সেখানের যা কিছু বৈভব
দেখেছি হৃদয় ভরে, ইন্দ্রপ্রস্থ—নব রাজধানী,
দেখেছি সেখানে স্বল্পদিনের উৎসব,
কুরুক্ষেত্রে সব শেষ, দুদিনের মিছে হানাহানি !

গিয়েছি পাটলিপুত্রে, মগধের শ্রেষ্ঠ নগরীতে,
বৈভবে গৌরবে ভরা বৈচিত্র্যের পূর্ণ সমাবেশ—
সেখানেও কদিনই বা ? ভায়ে ভায়ে ভাগ ক'রে নিতে
বৈভব, বৈদূর্য আর বৈচিত্র্যের হয়ে গেছে শেষ !

রাজ্যও যায় নি রাখা, ধনরত্ন সেও গেছে চলে,
কীর্তি শুধু পড়ে আছে আপনার উজ্জ্বল গৌরবে !
ইতিহাস-রথচক্র বাহুবল পরাক্রম দুই পায়ে দলে—
আপন নিয়মে চলে তুচ্ছ করি' সকল বৈভবে।

তারপর আরও কত সভ্যতার পরিক্রমা পথে
এলাম দিল্লীতে, যবে হিন্দুত্বের অন্তিম-লগন—
পৃথ্বীরাজ অস্তমিত আত্ম-কলহেতে ;
বাহুবলে হয় নাই পাঠানের রাজত্ব-স্থাপন।

অতঃপর একই পথ : অনিবার্য সেই পথ ধরে
মোগলের উত্থান পতন, হয়েছে কবে তা জানি।
এসেছে পশ্চিম তার সদাগরী বুদ্ধিতরী ভরে,
করায়ত্ত ক'রে পৃথ্বী শোনায়েছে মদমত্ত-বাণী।

এতো বুদ্ধি, অহঙ্কার, তীক্ষ্নদৃষ্টি, শাসন পীড়ন,
বণিক সভ্যতা সেও টিকিল না আপন নিয়মে।
একে একে নিভে গেল, দর্পবুদ্ধি হোলো সমাপন—
তারো তার গেল ছিঁড়ে, তাল আর ফিরিল না সমে।

সত্যের লাঞ্ছনা দেখি অসত্যের তীব্র অট্টহাস
শুনেছি, দেখেছি আমি অনর্থ নিরীহ-রক্তপাত ;
ধর্মের পীড়ন দেখি অধর্মের অযথা উল্লাস—
থেমেছে যখন বজ্র পড়েছে সে শিরে অকস্মাৎ !

ইতিহাস-পর্যটক, আমি কবি ভারতবর্ষের,
ধর্ম মোর ন্যায়-ধর্ম, আমি সত্য-শিব-উপাসক ;
কতো রাজা এল গেল, শেষ হ'ল কত রাজত্বের—
আমি সব দেখিতেছি, যুগে যুগে সত্যের সাধক !

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী ও তদীয় কীর্তি

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কবি কর্ণপূর বাল্যাবধি পিতৃদৃষ্টান্তে ছিলেন গৌরানুগত। অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিবলে অতি অল্পবয়সেই শাস্ত্ররাশি তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। প্রেমপ্রবণ চিত্তকে মধুরভাবের অনুভবে নিষিক্ত করে পরবর্তী কালে তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী শক্তিমান্ ভক্তপুরুষরূপে পরিচিত হন। বিভিন্নগ্রন্থে তিনি তাঁর অসামান্য শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর বহুবিধ সৃষ্টির মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বিদ্বৎসমাজে সম্পদ্রূপে আদৃত হয়ে আসছে; সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়েছে একথা অনেকেই অবগত নন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ-কৃত বঙ্গভাষার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব ও মাধুরী শ্রীচৈতন্যের যাবতীয় চরিতগ্রন্থকে অতিক্রম করে বিরাজমান রয়েছে। এর পূর্বে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, তদানীন্তন কালের মহাপ্রভুর লীলাবিষয়ে প্রমাণপুরুষরূপে পরিচিত শ্রীল মুরারি গুপ্ত-রচিত সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃতই একমাত্র গ্রন্থ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল; কিন্তু সে-কথা অল্প লোকেই আলোচনা করেন। এই মূল গ্রন্থকে সহায় করে কবি কর্ণপূর গোস্বামীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনচরিত রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষীকৃত ও সাক্ষাৎকারী গৌরভক্তদের নিকট যথাশ্রুত বিষয়াবলী অবলম্বন ক'রে। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের ভাষা অতিশয় সরল ও উদার। এতে কবি দুরূহ শব্দের প্রয়োগ প্রায় বর্জনই করেছেন। যথাযথ লীলাকাহিনী বর্ণনাই এ কাব্যের মুখ্য উপজীব্য। এজন্য এতে দার্শনিক তত্ত্বাদির গভীরতম বিচার অত্যন্ত বিরল। আদ্যোপান্ত মহাপ্রভুর লীলা-বিন্যাসের চেষ্টা থাকাতে দুরূহ তত্ত্বোদ্ধার ও বিতর্ক বিষয়ে ফলাফল জ্ঞাপন করেই কবি অগ্রসর হয়েছেন। মূলতর্কগুলি এতে আভাসে প্রকাশ করে গেছেন মাত্র। কিন্তু এই সরল পন্থার কৌশল সত্ত্বেও কর্ণপূর গোস্বামীর স্বভাবসিদ্ধ গুণের ছায়া প্রথম জীবনের এই রচনাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শত সরলতার মধ্যেও অপূর্ব কবিত্ব-চমৎকারিতা স্থানে স্থানে প্রকটিত হয়েছে। যেমন দৃষ্টান্তরূপে বলা যেতে পারে,—শ্রীবাসাচার্য এক সময়ে মহাপ্রভুকে তাঁর পূর্বলীলা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন,—প্রভু, পূর্বকালে আপনি মৃগনয়না তরুণীদের সঙ্গে বিলাস-পূর্বক প্রেমাবিষ্ট হ'লে যে মহাপ্রেমসম্পদের উদয় হয়েছিল, তাতে আপনিও তৃপ্তিলাভ করতে পারেন নি, তা না হ'লে হে নাথ, বলুন, অতিহর্ষে এই বিভব নিত্যই কেন নব নব রূপে প্রতীত হয়েছিল?—

> "পুরা বৃন্দারণ্যে তরুণহরিণাক্ষীভিরনিশং
> ত্বয়ি প্রেমাবিষ্টে বিলসতি য আসীৎ স বিভবঃ।
> ত্বয়ৈবাতৃপ্তেনাজনি ন যদি তন্নাম রভসঃ
> কথঙ্কারং নিত্যং নব নব ইবায়ং সমভবৎ॥" ৮।৬১

পরমানন্দপুরী স্বামী ও শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণসহ রামানন্দ-ভবনে উপনীত হ'লে ভক্তগণকে উদ্যান দেখান হ'ল, তাতে উদ্যানবর্ণনা স্থলে কবিত্ব-চমৎকারিতা ফুটিয়েছেন কবি—

> "পরমানেন ললিতা পরমানেন সর্বতঃ।
> রাজীবনস্য সা জীবরাজীবযুগমবভৎ॥" ১৯।১৯

অর্থাৎ সুবৃহৎ পরিমাণশালী 'পরমান' অর্থাৎ অন্যান্য বৃক্ষের পরিমাণে যা সমধিক সুন্দর (ললিতা) বনরাজী, (রাজী বনস্য) জীব অর্থাৎ জীবিত বা সজীব রাজীবগণযুক্ত হয়েছিল।

মহাপ্রভুর রূপবর্ণনায় কবি আবির্ভাবের কারণ-রূপে যে সম্ভাবনা প্রকাশ করেছেন মঙ্গলাচরণ শ্লোকে

তা যেমন অপূর্বভাবদ্যোতক, তেমনি ভক্তির প্রকাশেও উজ্জ্বলতর। কবি বলেছেন,—

"যঃ বৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তরপরীরম্ভসংভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ॥"

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন শ্যামকান্তি শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্বে বৃন্দাবনভূমিতে সদৃশকান্তি গৌরাঙ্গী গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে নৃত্যবিলাস করতেন, তিনিই কি তাঁদের নিরন্তর আলিঙ্গন-জনিত দৃঢ়তর আলিঙ্গনে গৌরাঙ্গ হয়ে নবদ্বীপ ধাম অবলম্বন করে বিরাজমান রয়েছেন?

এভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম থেকে অন্তর্ধানাবধি জীবনলীলার রূপায়ণে এই অনবদ্য মহাকাব্যটি নানা-রত্নে ভূষিত করেই কবি রচিত করেছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়।

সৎ-শীলতার দিক্ থেকে কবি যে কত বড় উদারহৃদয়, মহচ্চরিত্র ও অকপট ছিলেন তা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গীতে শুধু যে প্রমাণিতই হয় তা নয়, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করে। মাত্র গ্রন্থের সাহায্য-লাভ নিবন্ধন গ্রন্থকর্তার প্রতি ঋণ স্বীকারের মাধ্যমে এত বড় মহিমা অনুস্মরণ করে মুক্তহৃদয়ে প্রণতি নিবেদন প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত গুণেরই সমুদার নিদর্শন, যা আজকালকার জগতে স্বপ্নের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব-কবি মুরারি গুপ্ত-রচিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্" থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন বলে কবি মুক্তকণ্ঠে বলছেন,—

"আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ
কৈশ্চিন্মুরারিরিতি মঙ্গলনামধেয়ৈঃ।
যদ্‌যদ্বিলাসললিতং সমলেখি তত্তত্-
গুত্তদ্ বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এবঃ॥"

পূর্ব কবির নিকট নিজের শিশুত্ব স্বীকার করে উপকারের জন্য প্রণতি নিবেদন জানিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে বলছেন,—

"বদ্ধাঞ্জলিঃ শিরসি নির্ভরকাকুবাদৈ-
র্ভূয়ো নমাম্যহমসৌ স মুরারিসংজ্ঞঃ॥"

এই সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যটি ১৪৬৪ শকাব্দে রচিত হয়। কবি নিজেই বলে গেছেন—"বেদা রসা শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে। শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি" ॥......সুতরাং ৪+৬+৪+১=১৪৬৪ শকাব্দে রচিত। মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪০৭ শকাব্দে। তিনি ৪৭ বৎসর জীবিত থেকে লীলা অপ্রকট করেন। সুতরাং তাঁর তিরোধানের ৯ বৎসর পরেই কবি এই গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করেন। যা দেখেছেন ও প্রমাণ সহ শুনেছেন, তাই কবি সাজিয়ে দিয়েছেন। কবি বলেছেন—"যদ্দৃষ্টং শ্রুতমপি চ যত্তস্য লীলাবিলাসৈঃ.........ক্ষুদ্রোঽহম্ তৎ কথয়তি কিঞ্চিৎ কৃপায়া বশঃ সন্॥"

এই গ্রন্থটি বহরমপুর থেকে পণ্ডিত রামানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সম্পাদনায় বঙ্গাব্দ ১২৯১ সালে প্রথম মুদ্রিতরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক মহাশয় তাতে নিবেদনপত্র লিখেছেন—"এ পর্যন্ত এ গ্রন্থের এই ভারতভূমিতে প্রকাশ নাই, এবং ইহা যে আছে, অদ্যাবধি তাহা কেহ অবগত নহে, আমি বহু অনুসন্ধানে এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রন্থ স্বয়ং অবলোকন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রমাণস্বরূপ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে দ্বিধা নাই।"

কিন্তু ভক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সমুদয় অভিমতের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। কারণ এই গ্রন্থের প্রথমেই বলা হয়েছে, মহাপ্রভু এভাবে লীলাবিলাসাদি লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে আস্বাদন করে অন্তর্হিত হ'লে তদীয় ভক্তগণমধ্যে অনেকে জীবন বিসর্জন দিলেন, কেহ কেহ শোকে আর্তনাদ করতে লাগলেন,—

"ইত্থং তত্তদ্বিলসিতসুধাপূরমাস্বাদ্য ভূয়ঃ।
শিক্ষাব্যাজাৎ প্রথিতকরুণে হন্ত হার্দ্দর্ধানে॥" ইত্যাদি (১।১৪)

তাঁরা বলেছিলেন,—

"জগচ্ছূন্যং মন্যে ক্ষিতিরপি চ দুঃখাগ্নিনিবহে
বিলীনা লীয়ন্তে সকলমনুজাস্তত্র বিকলাঃ।" ইত্যাদি (১।২৬)

গ্রন্থের অন্তিম পর্যায়ে একথাও বলা হয়েছে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের বিরহ সহ্য করতে অক্ষম হয়ে রায় রামানন্দ দেহত্যাগ করেন,—"রামানন্দস্তদ্বিয়োগাধিপীড়াক্ষীণক্ষীণস্তত্যজেহসূন্ মহাত্মা।" গ্রন্থকার আরো লিখেছেন,—

"সদা শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা সততমনুভূয়াপি চ সুখং।
বিনা তং জীবামঃ শিব শিব মহদ্দুষ্কৃতমিদম্॥"

"সর্বদা তাঁর কথা শুনে, তাঁকে দেখে, নিরন্তর সে সুখ অনুভব করেও আজ তাঁর বিরহ-দশাতেও জীবিত রয়েছি। হায়, হায়, এর চাইতে মহাপাপের ভোগ আর কি থাকতে পারে!"

সুতরাং গ্রন্থটির আরম্ভ-সময়ের উল্লেখ না থাকলেও সমাপ্তি-কালের স্পষ্ট উল্লেখ এবং মহাপ্রভুর তিরোধানাদি বিন্যস্ত থাকাতে তিনি এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ দেখেছিলেন—এরূপ অভিমত যথার্থ বলে মনে হয় না, অথচ পূর্বোক্ত সম্পাদক মহাশয় কোন্ প্রমাণসূত্র অবলম্বন করে যে এ কথা লিখেছেন, বোঝা গেল না।

এই চরিতকাব্যে দুরূহ তত্ত্বমূল বিচারবহুল সিদ্ধান্তাদি গভীরভাবে বর্ণিত না হলেও কবি তাঁর নাটকে তার অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, নানাবিধ সূক্ষ্ম দার্শনিক সিদ্ধান্তাদি বিন্যস্ত করে। এজন্যও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকটি কবি কর্ণপূর গোস্বামিপাদের এক অপূর্ব গ্রন্থ। অলঙ্কার-কৌস্তুভ-গ্রন্থে কবি কাব্যের চমৎকারিত্ব-নিরূপণে যে প্রণালীর সমুল্লেখ করেছেন, তার যথাযথ প্রয়োগ স্বয়ং দেখাবার চেষ্টা করেছেন এই সমুদয় নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থে। গ্রন্থের অবতারণাতেই কবি অনুপ্রাস-বহুল রচনা এবং ভক্তির অপূর্ব রীতি প্রকাশ করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাব দুঃখে আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় সর্বশূন্যতাবোধ এমনকি আনন্দময় পুরুষোত্তমের রথযাত্রার ন্যায় মহামহোৎসবেও মহাপ্রভুর অভাবে চরম বিষণ্ণতা ব্যক্ত করে কবি কৌশলে ভক্তহৃদয়ে মহাপ্রভুর অনন্যসুলভ অধিকারের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই জন্যই মহাপ্রভুর প্রতি কবির "রসময়বপুঃ" বিশেষণটি সার্থক হয়ে উঠেছে। ঐ সঙ্গে সেই বিশাল কল্পদ্রুমের শাখাসমূহের অর্থাৎ ভক্তগণের, ব্রহ্মানন্দ ভেদ করে তদূর্ধ্বে বিরাজমানতা ব্যাখ্যা করে কবি প্রারম্ভেই তাঁর অভিমত ভক্ত সাধকের লক্ষ্য ও সফলতাময় সিদ্ধান্ত বিষয়ে অভিনব সঙ্কেত প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ কবি ছিলেন মধুরভাবে ভাবান্বিত। এই জন্য দেখা যায়, কবি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সচ্চিদানন্দ নির্বিশেষ-ব্রহ্মমাত্ররূপে ব্যাখ্যায় বক্তব্য সমাপ্ত না করে, লীলাময় শ্রীকৃষ্ণরূপতা ব্যক্ত করেও, লীলাবৈচিত্র্য ও প্রকৃত রসময়তা বোঝাবার জন্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগ্মাত্মকতা প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছায় 'খগমিথুন'শব্দের প্রয়োগ করেছেন এবং "ভিন্নভাবেন হীনম্" বলে বস্তুতঃ অভেদরূপতা জ্ঞাপন করেছেন।

পূর্বেই আমরা বলেছি যে, এই নাটকে বহুক্ষেত্রে অপূর্ব অপূর্ব সিদ্ধান্ত নির্ণীত হয়েছে, যা বিদ্বজ্জন-মাত্রেরই অপরিসীম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে নাটকের ভিতর দিয়ে এত সব দুরূহ ভক্তির উদ্ঘাটন, কঠিন সমস্যার সমাধান, পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্তজ্ঞাপন ও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি যথোচিত সুসঙ্গত উত্তর দান—এই সমুদয় উল্লেখযোগ্য রত্নরাশি বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে এক অপরূপ সম্পদ দান করেছে। অথচ রসরীতির বৈশিষ্ট্য অণুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়নি, মূল উপজীব্য মহাপ্রভুর লীলাবিন্যাসটিও ব্যাহত হয়নি; তবে নাটক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে নাটকীয় রীতির অনুরোধে লীলাবিন্যাসের ক্রমপরম্পরা হয়ত সর্বত্র রক্ষিত হয়নি।

কাব্যগত রসসৃষ্টিতেও ধ্বনির ধ্বন্যন্তর সূচনায় যে মহাচমৎকারিতা তাঁর স্বকীয় অলঙ্কারগ্রন্থে বিশেষ-ভাবে বলা হয়েছে, তার যথাযথ প্রয়োগ দেখিয়ে কবি এখানে তা সপ্রমাণ করেছেন। এজন্যে এঁর গ্রন্থ কাব্যরসিক, ভাবুক এবং কবিদেরও পরম আস্বাদযোগ্য। এ রীতির রসসৃষ্টিতে ইনি অনন্য। এ

নাটকের পদ্য এবং গদ্য উভয়ক্ষেত্রেই কবি এ কৌশল বিন্যস্ত করেছেন। প্রথমেই সূত্রধারের উক্তিতে, পারিষদের উক্তিতে এবং অন্যত্রও বহুলপরিমাণে রয়েছে। যেমন সূত্রধার……"ভো ভোঃ অদ্যাহং রত্নাকরবেলাকন্দলিত দলিতকজ্জলোজ্জলমহানীলমণি-কন্দলস্য নীলগিরিদরী-দরীদৃশ্যমান-ঘনদলমালতমাল-তরুকড়ম্বস্য"—ইত্যাদি, তেমনি পারিষদ—"এতাবতাপি ভগবতঃ শ্রীনীলাচলচলদানন্দকন্দস্য স্যন্দনযাত্রা-পরমানন্দে কতিপয়ে সুখোপরম-পরম বিমনস্কান্ত-ময়স্কান্ত ভাণ্ডমিব ব্রহ্মাণ্ডং মন্যমানা বিলপন্তঃ সন্তি"—অর্থাৎ শ্রীনীলাচলের আনন্দকন্দস্বরূপ ভগবান্ পুরুষোত্তমদেবের মহানন্দজনক রথযাত্রা-মহোৎসব সমাগত হ'লে অনেকে মনোদুঃখে নিতান্ত বিমনস্ক হয়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অন্ধকারাবৃত ক্ষুদ্রভাণ্ডের ন্যায় মনে করে নিয়ত এই বলে বিলাপ করেছিল।

এ নাটকে ভক্তি ও জ্ঞানের পার্থক্য বিশ্লেষণ—একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বলা যায়, যা সাধারণতঃ কোন দর্শনবিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থে নিবদ্ধ থাকাই স্বাভাবিক। ভক্তিতেই ভগবানে অনুরাগরূপ রতি আসে, তাতেই রতিবশতঃ ভগবৎপার্ষদ-প্রাপ্তিরূপ মুক্তি সাধিত হয়। জ্ঞানে ব্রহ্মনির্বাণ আসতে পারে কিন্তু তা প্রকৃত মুক্তি নয়, এই বিষয়-নির্ণয়ে যে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা বেশ উপভোগ্য। কবি বলেছেন, দিবানাথের পূর্ব দিগঙ্গনে আবির্ভাবের পূর্বেই অরুণপ্রকাশে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়ে যায়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের সাক্ষাতের পূর্বেই তাঁর অনুগ্রহে হৃদয়ের অজ্ঞানরাশি বিলুপ্ত হয়ে যায়!

"পুরোঽনুগ্রহ এবাস্য স্বোদয়াধারধারণঃ।
উদয়াৎ পূর্বমর্কস্য বিনিহন্তি তমোঽরুণঃ॥"

এই ভক্তির ব্যাখ্যাতে এ-থেকে একটি অপূর্ব সংবাদ আমরা জানতে পারি যে, জননী বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর জীবনে কতখানি ছিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রভৃতি ভক্তদেরও সেই সর্বত্যাগিনী জননীর প্রতি কি সুগভীর শ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল।

শ্রীঅদ্বৈতের পরিহাসোক্তি, যে ভগবান নবদ্বীপে রয়েছেন বলে শুধু আমারই এখানে থাকার অভিলাষ তা নয়, শ্রীবাসও এইজন্যে এখানে রয়েছেন। আচার্য শ্রীবাস একথার ভঙ্গান্তরে উত্তর করেন—"শ্রীবাস" শব্দে 'শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা সহবাসো যস্য—শ্রীবাসঃ ভগবান্'। কিন্তু লক্ষ্মী দেবী যে গত হয়েছেন, সুতরাং অদ্বৈতের উক্তি টিকল না। শ্রীবাসের এই অসঙ্গতির অভিযোগ খণ্ডন করে দেন মহাপ্রভু, তিনি বলেছিলেন,—'শ্রী' হ'ল বিষ্ণুভক্তি, তা তো ভক্তদের সকলের মধ্যেই রয়েছে। এখানেই শ্রীঅদ্বৈতের সেই অপূর্ব উক্তি—এই বিষ্ণুভক্তি তো এখন মূর্তিমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—"ইদানীং সা বিষ্ণুপ্রিয়া"। ভগবানের উক্তিটিও সুমধুর এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে অর্থপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন,—"হাঁ, জ্ঞানাদি নানা উপায় সত্ত্বেও ভক্তিই বিষ্ণুর প্রিয়া বটে। অদ্বৈতাচার্য সুন্দর উত্তর দেন—"অতএব ভগবানপি তামঙ্গীচকার।"

লীলাবর্ণনার মাধ্যমেও কবি নাটকীয় রীতি রক্ষা করে যে, মহাপ্রভুর তত্ত্ব সুকৌশলে প্রকাশ করেছেন, তা অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় অনবদ্য। শ্রীঅদ্বৈতের শ্যামরূপ দর্শনাভিলাষ পরিপূরণের জন্য মহাপ্রভু যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা ভক্তমাত্রকেই অনুরক্ত করে। ভগবান গৌরচন্দ্র মুখে বলেছিলেন, 'সেরূপ ত আমার অধীন বা আয়ত্ত নয়, কি করে তা সম্ভব!' তারপর বললেন, 'আচার্য, মানসনেত্রে তা চেয়ে দেখ'। অদ্বৈত ধ্যানস্থ হয়ে এক অপূর্ব মূর্তি দেখলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গের শরীর থেকে এক অপরূপ নীলজ্যোতিঃ নির্গত হয়ে অদ্বৈতের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠল, আবার শ্রীগৌর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এ ভাবে কবি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরে—লীলায় ভিন্ন হলেও তত্ত্বতঃ অভেদ জ্ঞাপন করলেন। কেবলমাত্র অভেদই নয়, কবি সমুদয় বিরুদ্ধ ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গে গীতোক্ত পুরুষোত্তম-তত্ত্বের পরাকাষ্ঠাও

দেখিয়েছেন। যে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে সর্ববিধ ভেদ-অভেদ সবিশেষ-নির্বিশেষ ভাব, ক্ষর-অক্ষরদ্বন্দ্ব অর্থাৎ সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মরূপতার পরম পরিণতি,—একেতেই জগতের বিরুদ্ধরীতির অতীত অচিন্ত্য শক্তিময় পুরুষোত্তমে থাকাতে যা অবিরুদ্ধ—সে পরম সিদ্ধান্ত-তত্ত্বটিতে স্বকীয় অভিমত জ্ঞাপন করেছেন :

"আনন্দোঽপি চ মূর্তো ব্যাপী চ তথা পরিচ্ছিন্নঃ।
তদ্বন্নিত্যবিলাসোঽপি চ বৈরাগ্যাশ্রয়ো ভগবান্॥"

এ জন্যেই কবি মহাপ্রভুর ভক্তভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য প্রকাশের সংবাদে ঈশ্বর-ভাবের মহিমাটিও ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে তদ্দর্শনমাত্রই যবনের আনন্দবিহ্বলতা, সঙ্কর্ষণ-মূর্তি ধারণ, রুদ্র, বরাহ, নৃসিংহ অবতারাদির অনুকরণ, ষড়্‌ভুজ মূর্তি ধারণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এ ভাবে ঐশ্বর্য-প্রকাশ বর্ণনা করেও কবি সন্দেহবাদীদের বিরুদ্ধ যুক্তিকে উপেক্ষা না করে সদুত্তর দানের চেষ্টা করেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ-ব্যাপার নিয়ে তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে অনেকের মনে হয়তো নানা প্রশ্ন জাগত, এত সব মহিমা ও গুণরাশি অবগত হয়েও সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে মেনে নিতে অনেকেই হয়ত কুণ্ঠিত হ'ত। কবি এ সম্বন্ধে যুগরাজ কলির মাধ্যমে উত্তর দিয়েছেন—অপূর্ব যুক্তি আশ্রয় করে। কলি অধর্মকে বলছেন, "তিনি বিবাহ করেছেন, তাতে কি হয়েছে ? ঈশ্বর অবতীর্ণ হলে তদীয় শক্তিও অবতীর্ণা হন। যখন ভগবান দেবতারূপে, তখন তদীয় শক্তিও দেবীরূপে ; যখন তিনি মানুষের মধ্যে,. তখন তাঁর শক্তিও মানবী—তদীয় শক্তি লক্ষ্মী—পৃথিবীর অংশরূপা সর্বংসহা বিষ্ণুপ্রিয়া। এ-কে আবার গ্রহণ করেছেন, বর্জন করে বৈরাগ্য শিক্ষা দেবার জন্যে।

"অবতরতি জগত্যামীশ্বরে হন্ত তস্যা-
প্যবতরতি হি শক্তিঃ কাপ্যসৌ রূপিণী শ্রীঃ।" ইত্যাদি

আবার যুগরাজ কলি বলছেন—শুধু তাই নয়, আরো লীলা রয়েছে ; লক্ষ্মী-শক্তির অন্তর্ধানের পর পৃথিবীর অংশরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া আসবেন এবং পরিত্যক্তা হবেন—

"ভুবোঽংশরূপামপরাঞ্চ বিষ্ণু-
প্রিয়েতি নিত্যাং পরিণীয় কান্তাং।
বৈরাগ্যশিক্ষাং প্রকটীকরিষ্যন্
হাস্যত্যথৈনাং স নবাং নবীনঃ॥"

লীলাবর্ণনার মাধ্যমে কতক সংবাদ আমরা এ থেকে পাই, যা পরবর্তীকালের লেখকদের সঙ্গে সর্বদা ঐক্যবদ্ধ নয়। এ থেকে জানা যাচ্ছে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মদিবস পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল এবং তাতে সকলে হরিগুণগানে মত্ত হয়েছিল—এই হরিপ্রমত্ততার মুহূর্তে গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব।

"জায়মানঃ পূর্ণিমায়ামুপরাগচ্ছলেন যঃ।
গ্রাহয়ামাস যুগপদ্ধরের্নাম জগজ্জনান্॥"

এ সংবাদ আমরা শ্রীবৃন্দাবন দাস-কৃত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'গ্রন্থেও পাই। শ্রীল মুরারি গুপ্ত মহোদয়ের গ্রন্থেও এ সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে।

আর একটি সংবাদ সম্বন্ধে আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বরাত্রের কাহিনী বর্তমানে নানাভাবে বিকৃত হয়েছে,—মনে হয়। এখানে দেখা যায়, সন্ন্যাসের পূর্বদিন মহাপ্রভু আচার্যরত্নের গৃহে সারারাত্রি কীর্তনানন্দে কাটিয়েছেন এবং রাত্রির শেষযামে আচার্যরত্নের সঙ্গে অন্যান্য সকলের অলক্ষিতে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে নিত্যানন্দ-সঙ্গে মিলন হয়েছিল। এঁরা দু'জন সঙ্গী মহাপ্রভুর সঙ্গেই ছিলেন। সেখান থেকে শ্রীমন্নিত্যানন্দই সন্ন্যাসদীক্ষার পর পথ ভুলিয়ে বৃন্দাবনযাত্রী প্রেমবিহ্বল মহাপ্রভুকে শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। পূর্বরাত্রে মা শচী দেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কিছুই জানতে পারেন নি। এ জন্যে পরে মহাপ্রভু ক্ষমা ভিক্ষা করে ভক্তজন ও জননীর অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন যে, "আমার এই ত্রুটির ফলে বিঘ্ন হয়েছে,

বৃন্দাবন যাওয়া হ'ল না। আপনারা অনুমতি দিন"। মহাপ্রভু বলেছিলেন,—

"ভো অদ্বৈতপ্রভৃতয় ইদং শ্রূয়তাং যজ্জনন্যা
যুষ্মাকঞ্চ প্রণয়িসুহৃদামাজ্ঞয়া ন প্রযাতং।
বিঘ্নস্তেন ব্রজনি মথুরাং গন্তুমীশে ন তস্মা-
দাজ্ঞাং সর্বে দদতু কৃপয়া হন্ত যায়ামিদানীম্॥"

অথচ চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে গৃহত্যাগের পূর্বরাত্রে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ও দুঃখবিষাদের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, রচনা মনোহারিণী হলেও ইতিহাসের দিক থেকে এর সত্যতা বিবেচ্য।

আমরা পূর্বেই বলেছি, নাটক হলেও মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এ জন্য এতে তিনটি রীতি অবলম্বিত হতে দেখা যায়। কোথাও প্রভু স্বয়ং প্রকাশিতরূপে দর্শন দিয়েছেন, কোথায়ও অন্যেতে আবিষ্ট হয়ে স্ব-প্রকাশ হয়েছেন, কোথায়ও বা যোগীর ধ্যানবলে আবির্ভূত হয়ে তার তৃপ্তিবিধান করেছেন। এ সব লীলামাধুরী এবং ঐশ্বর্যপ্রকাশ যেন ক্ষুদ্র হয়ে গেছে রায় রামানন্দের প্রসঙ্গে অবতরণ করে। এখানে মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে দিয়ে যে তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন, তা নরজগতে অভাবনীয় ও বোধাতীত সুখময় বলে প্রতীত হয়। ঐ তত্ত্বটির উদ্‌ঘাটনে কবির চাতুর্যও প্রশংসনীয়।

রামানন্দের সঙ্গে তত্ত্ব-আলাপনে মহাপ্রভুর এভাবে বিমুগ্ধ হয়ে রামানন্দ স্বকীয় অনুভূতির কথা অকপটে প্রকাশ করতে লাগলেন, মহাপ্রভুর প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রামানন্দ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আবার মহাপ্রভু প্রশ্নের উত্তর চান, যেন হৃদয়-জুড়ানো সে অপার্থিব রত্নটি, রামানন্দ কোন বক্তব্য খুঁজে না পেয়ে অন্তরে অনুসন্ধান করেন আর বলেন,— এভাবে দু'বার তিনবার চারবার বলেও প্রভুকে তুষ্ট করতে পারেন না। প্রভু কেবলই বলেন— "সমানার্থকঞ্চেৎ" অর্থাৎ—পূর্বকথারই পুনরাবৃত্তি হয়ে গেল, নূতন শোনাও,—চৈতন্যচরিতামৃতের মধুর ভাষা—"এহ বাহ্য আগে কহ আর"। এভাবে মহাপ্রভুই যেন তাঁর মুখ দিয়ে সেই পরম গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করাচ্ছেন। পরিশেষে সে তত্ত্ব প্রকাশিত হ'ল—মধুর রসময় প্রেমের এক অপূর্ব অভিব্যক্তি, যা নিঃশেষে তল্লীনতা, তাঁর প্রেমে আপন-সত্তা হারিয়ে তন্ময়তা, সর্বভেদ বিস্মৃত হ'য়ে মধুরতম একাত্মতা। শ্রীরাধার উক্তি অনুসরণ করে রামানন্দ অনুভূত সে পরমতত্ত্ব শোনালেন,—

"সখি, ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥"

"হে সখি, সে রমণ আর আমি রমণী, এই ভেদবোধ পূর্বে আমাদের ছিল না ; কারণ দুরন্ত মদন বলপূর্বক প্রেমরসে উভয়ের চিত্তকেই নিষ্পেষণ করেছিল।"

তারপর বললেন,—

"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূ-
ন্মনোবৃত্তিলুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা ;
ভবান্ ভর্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি—
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্॥"

কিন্তু তখন "আমি কান্তা ও তুমি কান্ত"—এরূপ বুদ্ধি ছিল না। যেহেতু তখন চিত্তবৃত্তি লুপ্ত—'তুমি ও আমি' এই ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছিল। এক্ষণে— 'তুমি ভর্তা ও আমি ভার্যা' এরূপ বিসদৃশ বুদ্ধি হয়েও আমার জীবন বেঁচে আছে। এর চাইতে আশ্চর্যের বিষয় আর কি আছে ?

এ কথার পর ভগবান্ রামানন্দের মুখ হস্তদ্বারা আবৃত করে দিয়েছিলেন। কারণ, পূর্বার্ধে রাধা-কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত প্রেমের স্বরূপ প্রকটিত হয়েছে, তাকে বিশ্লেষণ করে লঘু করা বা তার রহস্য এ ভাবে ভাষার ব্যাখ্যায় কর্দমাক্ত করা অসঙ্গত এজন্য তাতে অসম্মতি জানালেন। রামানন্দ কি দেখেছিলেন—তা তিনিই জানেন, প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

এ ভাবে এই অপূর্বতত্ত্ব যে সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্পর্শ

ব্যতীত কারো দ্বারা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়, দৃঢ়ভাবে তা বোঝাবার জন্যে, এবং যাঁরা তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন বা এই মানুষী তনুতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সবিশেষ ও সাকার মূর্তরূপে আবির্ভাবে অবিশ্বাস করেন, তাদের প্রতি কটাক্ষ করে কবি কর্ণপূর ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মুখে অপূর্ব তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত শুনিয়েছেন; যুক্তি দিয়েছেন, যে ধনবান নয় সে অপরকে কখনো ধনী করে দিতে পারে না, নিজে আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দপ্রচুর না হলে [আনন্দময়—এখানে প্রাচুর্যার্থে ময়ট্—বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে] তাঁর দর্শনে অপরের সে আনন্দোদয় সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং মূর্ত কি অমূর্ত—সে বিচার অযোগ্য। কেবল অমূর্তই তত্ত্ব হলে অমূর্ত পদার্থমাত্রই—দম্ভ অসূয়া প্রভৃতিও ভগবত্তত্ত্ব হোক। ব্রহ্মানন্দ ভারতী বলছেন,—

> "অমূর্তত্বং তত্ত্বং যদি ভগবতস্তৎকথমহো
> মদাসূয়াদীনামপি ন ভগবত্তত্ত্বগণনা।
> ন মূর্তামূর্তত্বে ভবতি নিয়মঃ কিন্তু পরমো
> য আনন্দো যস্মাদপি স চ স ঈশো মম মতম্॥"

তাই দেখা যায় পরম বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুক্তহৃদয়ের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি-স্বাক্ষর এ নাটকে অঙ্কিত রয়েছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্তুতি করে শ্রীগৌরাঙ্গকে জানালেন পত্রসহ শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রসাদ পাঠিয়ে—

> "বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
> শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী
> কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

ঐ বেদান্তকেশরী ভট্টাচার্য ভগবদ্‌বিশ্বাসে প্রণতি জানালেন আত্মসমর্পণ করে,—

> "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
> প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
> আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
> গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

কবি এ নাটকে লীলাকাহিনী যা দেখেছেন ও যা শুনে অবগত হয়েছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন, কোনরূপ কল্পনার আশ্রয় নেন নি, এ কথা সত্য। তিনি নিজেই এ কথা প্রকাশ করে গেছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কোন সূত্র খোঁজা হীনতার পরিচায়ক। কবি বলেছেন,—

> "শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতম্।
> জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া॥"

এ গ্রন্থটি সমাপ্ত হয় ১৪৯৪ শকাব্দে; "তস্মিংশ্চতুর্ণ-বতিভাজি তদীয়লীলা-গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ"। মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দে আবির্ভূত হয়ে ৪৮ বৎসরে অন্তর্ধান করেন। সুতরাং তিরোধানের ৩৯ বৎসর পরে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

কবির 'অলঙ্কার-কৌস্তভ', 'কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী' প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনা সময়ান্তরে প্রকাশ্য।

অপরূপ

শ্রীশৈলদেব চট্টোপাধ্যায়

তুমি আছ শুধু এই কথা জেনে
　　কেমনে নীরব রহিব?
না খুঁজিয়া মন বোঝে কি কখন;
　　নীরবে কত বা সহিব?
কুসুমের মালা গেঁথেছি হে কত,
　　ডেকেছি যে কত ইসারায়;
হয়তো বুঝেছ, সাড়া দাও নাই;
　　তবু কেন প্রাণ তোমা চায়?

মনোমন্দিরে আছ শুনিয়াছি:
　　নিত্য নিয়ত কাজে
আমারি মাঝারে আমি-ময় তুমি
　　রাজো বিচিত্র সাজে।
আমারে করেছ মুগ্ধ মৌন,
　　স্তব্ধ করেছ বাণী,
অপরূপ তব রূপের মাঝারে
　　রূপহীন ছায়াখানি!

অবতার-প্রসঙ্গে 'শ্রীম'

ডাঃ শ্রীশান্তিকুমার মিত্র

['কথামৃত'-কার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথোপকথন হইতে সংকলিত]

জনৈক ভক্ত। মহাশয় গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে শ্রীভগবানের উপদেশ তো দেওয়া আছে, তবে তিনি কষ্ট করে আবার অবতার হয়ে আসেন কেন?

শ্রীম। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশে আছে। টীকা টিপ্পনী করতে গিয়ে ভাষ্যকারেরা ভগবদ্-বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাব ঢুকিয়ে দেন—শ্রীভগবান যা বলে যান—তাঁর লীলাসংবরণের পর কিছুকালের মধ্যেই সব গোলমাল হয়ে যায়। তিনি না এলে শাস্ত্র কে বোঝাবে? আর গীতাতেও তো তিনি নিজে বলেছেন, 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয়, তখনই আমি নিজে আবির্ভূত হই।' অবতার আর কে? Highest manifestation of Divinity in man (মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ বিকাশ)। ফিলিপ যীশুকে বললেন 'Rabbi show me the Father' (গুরুদেব, পিতাকে দেখিয়ে দিন)। যীশু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'Phillip, thou hast seen me and not seen the Father? I and my Father are one' (ফিলিপ, তুমি আমাকে দেখেছ, আর পিতাকে দেখনি? আমি আর আমার পিতা এক)। শ্রীশ্রীঠাকুরও বলতেন, 'এখন আর এর ভিতরে আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। এক একবার ভাবি আমিই তিনি, আর তিনিই আমি।' ঠাকুর আমাদের বলতেন, ব্যাকুল হয়ে তার জন্য কাঁদলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, ছুটে এসে দেখা দেন। যীশুও শিষ্যদের বলেছিলেন, Knock and it shall be opened unto you, seek and thou shalt find, (আঘাত কর—দরজা খুলে যাবে, খোঁজ—তাহলেই পাবে)।

কাশীপুরের বাগানে একদিন তিনি বললেন, 'কই রামলাল শিবরাম এদের কথা তো মনে পড়ে না। ভক্তদের জন্যই ভাবনা—এরাই আপনার লোক।' যীশুও শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন। একজন এসে বললে, 'আপনার মা ভাই—এঁরা সব এসেছেন' তিনি শিষ্যদের দেখিয়ে বললেন, এরাই আমার বাপ মা ভাই বন্ধু।

জনৈক ভক্ত। মহাশয়, আলবার্ট হলে একজন বক্তৃতা দিচ্ছেন; তিনি নাকি অবতার—সকলে বলছিল। অনেক আশ্চর্য কাজ করতে পারেন।

শ্রীম। ভাল কথার মন্দও ভাল। আজকাল কি যে হয়েছে—একটু হয়তো সাধন-ভজন করেছে, অমনি সে অবতার। অবতার কি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ এত ঘন ঘন আসেন না। They are not so frequent as blackberries. ধর্মের গ্লানি কি অধর্মের উত্থান হলে তিনি আসেন। সাধারণ জীব কর্মফলে দেহাদি ধারণ করে, কিন্তু তাঁর দেহ ধারণ,—কর্মফলের জন্য নয়। "ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি, ন মে কর্মফলে স্পৃহা"। আর সিদ্ধাই-এর কথা যদি বল—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলেও তাঁকে পাওয়া শক্ত। ওগুলোতে তাঁকে ভুলিয়ে দেয়। কাশীপুরের বাগানে দেহরক্ষার কিছুদিন আগে স্বামীজী উত্তম আধার বলে, ঠাকুর তাঁকে ঐ সব ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজী যেই শুনলেন, ঐগুলিতে তাঁকে পাওয়া যাবে না, বরং ভুলিয়ে দিতে পারে, তখন তিনি ঐ সব ক্ষমতা নিতে অস্বীকার করলেন।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, কলকাতা—সব যেন এক হয়ে যাচ্ছে! তিনি এসেছিলেন কিনা—তাই এত! এখন ডাঙ্গায় একবাঁশ জল, যেমন বন্যার সময় হয়—যেখান সেখান দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাও—কোনও বাঁধাধরা রাস্তা নেই। The atmosphere is surcharged

with spirituality (বায়ুমণ্ডল আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ) সাঙ্গোপাঙ্গ এখনও অনেকে বর্তমান।

জনৈক ভক্ত। তাই তো বলি, এত সাধুসঙ্গ পেয়েও যদি কিছু না হয় তো আমাদের দুর্ভাগ্য।

শ্রীম। সাধারণতঃ ভোগের শেষ না হলে তাঁর দিকে মন যায় না। তবে সাধুসঙ্গ কি সংকাজের ফল কিছুই নষ্ট হয় না; সব তোলা থাকে, জন্মান্তরে ঠিক ফুটে বেরুবে। আর এখন—সব নিয়ম-কানুনের সীমারেখার বাইরে। যেমন বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যে General amnesty (মার্জনা) দিয়ে অনেক কয়েদীকে সরকার একবারে মুক্তি দিয়ে দেন। এই সুযোগ যে নিতে পারবে তার হয়ে যাবে।

জনৈক ভক্ত। মহাশয়, কিছু ত বুঝতে পাচ্ছি না। এক একবার ভয় হয়, মনে হয় মৃত্যু তো আসছে, আর বয়সও হ'ল, এখন না হ'লে আর কবে হবে?

শ্রীম। ওগো! সত্যি বলছি, তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন। গিন্নি জানে—কোন হাঁড়ির উপর কোন সরা রাখতে হয়, কেন ভেবে মরছ? কেমন জান? টিকিট কেটে একজনকে কাশী যাওয়ার জন্য ট্রেনে বসিয়ে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ বাদে লোকটির ঘুম এসে গেল। কাশীতে পৌঁছেও ট্রেনে শুয়ে শুয়ে সে মনে করছে কলকাতাতেই রয়েছি, কিন্তু সত্যই সে কাশী পৌঁছে গেছে।

ভক্ত। আজ্ঞে, কাশীতেই যদি পৌঁছে গেলুম, ঘুমটা একটু আগে নেড়েচেড়ে ভেঙ্গে দিলেই তো হয়।

শ্রীম। ঘুমও ভাঙ্গবে, সবই হবে, তাঁর কাছে যে শরণাগত তার আবার ভয়-ভাবনা কি? তবে মন মুখ এক করতে হয়। প্রার্থনা যদি আন্তরিক হয় তিনি একশ বার শুনবেন। ভক্ত আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে ভাবলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, ছুটে এসে তাঁকে দেখা দিতে হয়—তাই তো বলে—তিনি ভক্তাধীন। দেখ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য-মনের অতীত, তাঁকে ধরা ছোঁয়া যায় না, তিনি কিন্তু ভক্তিতে ভক্তের কাছে বাঁধা। তাই তিনি নিরাকার আবার সাকারও বটে।

ভক্ত। এটা কি করে সম্ভব?

শ্রীম। তিনি সাকার নিরাকার আরও কত কি? Intellect was weighed in the balance and found wanting. (বুদ্ধিকে ওজন করা হয়েছে—দেখা গেছে কম পড়ে যায়)। তাঁকে কি গজ ফিতে নিয়ে মাপা যায় গা? অনন্ত কাণ্ড! আর দেখ না স্কুলেও Algebra (বীজগণিত) কষেছ: $x^2=16$, সমাধান করলে, $x=+4$ আবার $x=-4$, এটি কি করে সম্ভব—(একই জিনিষের দুরকম এবং বিপরীত সমাধান)? তিনি অবতার হয়ে এলেও নিজে ধরা না দিলে কি কেহ তাঁকে ধরতে পারে? শুভ সংস্কারও দরকার।

(সহাস্যে) বেগুনওয়ালার গল্পটি মনে পড়ছে। একজন হীরে নিয়ে বেগুনওয়ালার কাছে গেছে। হীরের বদলে সে ন' সেরের বেশি বেগুন দিতে কিছুতেই রাজী হল না। তার পর কাপড়ওয়ালার কাছে গেল, সে ন'শো টাকা পর্যন্ত উঠল।

শেষে এক জহুরীর কাছে গেল। সে কিন্তু একেবারেই একলাখ টাকা দিতে চাইলে, জহুরী না হলে কি হীরে চিনতে পারে? সংস্কারও খানিকটা থাকা চাই।

যীশু যেতে যেতে দেখলেন—কতকগুলি লোক মাছ ধরছে; 'কি করছ?' জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, 'মহাশয়, মাছ ধরছি।' তাদের অনেকেই যে শুভ-সংস্কারবান্ পুরুষ—যীশু তা বুঝতে পেরেছিলেন; বললেন, 'তোরা চলে আয়, কি করে মানুষ ধরতে হয় আমি তাই তোদের শেখাব।' (I will make you fisher of men) অমনি তারা সব ছেড়ে দিয়ে যীশুর পিছন পিছন চলতে লাগল। এরাই হচ্ছে pillars of Christianity—(খ্রীষ্টধর্মের খুঁটি)। ঠাকুরের

কাছে যারা এল, তাদের সকলেই তো সাধু হয়ে যেতে পারলে না—যারা পারল, তারাই জগৎটাকে তোলপাড় করে দিল। তাদের বিশ্বাস ভক্তি জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য দেখে লোকে অবাক হয়ে গেল!

অবতার না এলে এ সব কথা ধারণা করা যায় না, আর তিনি যখন আসেন সঙ্গোপাঙ্গদেরও সঙ্গে নিয়ে আসেন—তাঁর কাজের সহায়তার জন্য। অবতার যেন সূর্য—পার্ষদরা যেন চন্দ্র। চাঁদের ত আলাদা আলো নেই, সূর্যের আলোতেই চাঁদের আলো। অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করা যায় না,—এক নির্বিকল্প সমাধিতে ছাড়া। Finite (সীমাবদ্ধ) মন দিয়ে কি Infinityর (অসীমের) ধারণা হয়? একসেরা ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? তবে তিনি বলতেন—শুদ্ধ আত্মা ও শুদ্ধ বুদ্ধি এক, তাই দিয়ে তাঁকে ধরা যায়। এ সব বিচার করে বোঝা যায় না, তাই তিনি কৃপা করে অবতার হয়ে আসেন। তাঁকে দেখলে, তাঁকে ভালবাসলে সংশয়শূন্য হওয়া যায়। দেখ না গোপীদের: উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এসেছেন শুনে ছুটে যাচ্ছে—কাঁটায় পা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে, গা কেটে রক্ত পড়ছে—সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শ্রীমতী নীল রঙের মেঘ দেখে বাহ্যজ্ঞানশূন্য—কেননা শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রঙ এই রকম,—কি টান! এতটা সাধারণ মানুষে সম্ভব না হলেও এর অন্ততঃ খানিকটা টান আর দৃঢ় বিশ্বাস চাই। কিন্তু তার কৃপাও অনেক তপস্যার জোর না থাকলে হয় না। বিশ্বাস হ'ল last stage (শেষ অবস্থা)।

কবীর-বাণী

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

("রাগকী চোট লগী হ্যায় তন মে"—ভাবানুবাদ)

প্রেমের রাগিণী গাহিয়া চলেছ
হে মোর প্রেমিক স্বামী,
তনু মন মোর হ'ল যে বিকল
কি আর কহিব আমি!

সুখ নাহি মনে সুখ নাহি ঘরে
সুখ নাহি বন মাঝে।
খুঁজে খুঁজে সারা আমি তোমা হারা
মন নাহি কোন কাজে!

বেদনার লাগি ঔষধ কত
করিনু সেবন প্রভু,
রোগী মম সম বৈদ্য তোমা সম
দেখি নাই আর কভু।

দরশন বিনা বিরহীর প্রাণ
কিরূপে বাঁচিবে আর,
কবীর কহিছে সদ্‌গুরু যিনি
দেখা যদি পাও তাঁর—
নয়ন ব্যতীত দেখাবেন প্রিয়
কিবা সে চমৎকার!

'আমি' কে ?

স্বামী জীবানন্দ

যেদিন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম সেদিন জগৎ তার বিচিত্র রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিল। ধরণীর সেই প্রথম স্পর্শ, আলোর হাসি, বাতাসের সেই আলিঙ্গন কতই না ভাল লেগেছিল সেদিন! চারিদিকে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি—সৌন্দর্যের পূজারী হয়ে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে—ভুলে গিয়েছি আপনার স্বরূপ! মাটি জল আগুন বায়ু আকাশ—এই পঞ্চভূতের তৈরী পৃথিবীতে পেলাম স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, প্রাণের বন্ধু, আরো কত কি! মাটিতে গন্ধ, জলে রস, অনলে রূপ, বাতাসে স্পর্শ, আকাশে শব্দ জানিয়ে দিয়েছে তাদের অস্তিত্ব। চক্ষুতে রূপের, কর্ণে শব্দের, জিহ্বায় রসের, ত্বকে স্পর্শের অনুভূতির পর অনুভূতি হয়ে চলেছে। এই পাঁচটি সহজবোধের শক্তি নিয়েই জন্মেছি। মোটামুটি কাজ চালিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এই বোধের সম্বন্ধই যথেষ্ট। চারিদিকে যা কিছু রয়েছে তার সাধারণ খবর এই সহজবোধের ভিতর দিয়েই পাই—কিন্তু এ সবই তো বাইরের খবর; তাই ভিতরের খবর জানবার জন্যে বোধের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ক'রে জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়েই চলেছি।

বাইরের জগতে তৃপ্ত হয় না মন—প্রশ্ন জাগে: আমি কে? কোথা হতে এসেছি, যাবই বা কোথায়? এ প্রশ্ন শুধু আমারই নয়, যুগ যুগান্তর ধরে—এই হ'ল মানুষের শাশ্বত জিজ্ঞাসা। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত ক'রে কত ভাবে যে এর সমাধান করতে চেষ্টা করেছে তার অন্ত নেই।

ছোটবেলায় ছিলাম যে আমি—বড় হয়েও তো সেই একই আমি—শরীর মনই বড় হয়েছে, 'আমি'র তো কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে এ 'আমি' কে?

ঘরের মধ্যে ছিলাম—বাহির থেকে বন্ধু ডাকল, 'ঘরে কে?' সাড়া দিলাম, 'আমি'। আর একদিন বাহিরে ছিলাম, ঘরে ছিল বন্ধু। ডাকলাম,—ঘরে কে? উত্তর এল—'আমি'। উভয়ের এই সাধারণ 'আমি'টি কে? এই উভয়ের সাধারণ আমি যে সকলেরই সাধারণ 'আমি'! কে এই 'আমি'?

দিনের বেলায় জেগে থাকি—কত কি দেখছি, কত কি চোখে পড়ছে। রাত্রে যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন কোথায় থাকে দিনের বেলার এই দৃশ্য জগৎ? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম—পুষ্পক-রথে চড়ে দেশ বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গে পৌঁছে গেছি—সেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। ঘুম ভেঙে গেল—জেগে উঠলাম—কোথায় মিলিয়ে গেল পুষ্পক-রথ, স্বর্গলোক, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ! তবে স্বপ্নে কে সৃষ্টি করেছিল এই সব? জাগ্রতের জিনিস স্বপ্নে অদৃশ্য হয়—স্বপ্নের জিনিসও জাগরণে হয় বিলুপ্ত, তবে তো দুই-ই সমান অস্থায়ী! আবার যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হই, তখন তো কি জাগ্রতের জগৎ, কি স্বপ্নের জগৎ সবই অন্তর্হিত! গভীর ঘুম থেকে উঠে বলি,—আঃ, কী ঘুমই ঘুমিয়েছিলাম! এই যে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অনুভবিতা কে ইনি? কে জেগে জগৎ দেখেছিল? আমি! কে স্বপ্নে স্বর্গাদি দেখেছিল? আমি। কে সুষুপ্তির সুখভোক্তা? আমি। তিনটি অবস্থারই দ্রষ্টা সাক্ষীস্বরূপ 'আমি'! কে এই 'আমি'?

স্কুলে শিক্ষকতা করি, সেখানে সকলের কাছে মাস্টার মশায় ব'লে পরিচিত। বাড়ীতে হোমিও-প্যাথিক প্রাকটিস্ করি—যাদের চিকিৎসা করি তারা ডাক্তার বলে। মাঝে মাঝে ইন্‌সিওরেন্সের কাজও করি—অনেকে তাই ইন্‌সিওরেন্সের এজেণ্ট মনে করে। বাড়ীর ছেলেরা কেউ দাদা বলে, কেউ কাকা। একই 'আমি' কোথাও শিক্ষক, কোথাও ডাক্তার, কোথাও এজেণ্ট; কখনও দাদা, কখনও

কাকা। একই আমি—কারো পিতা, কারো পুত্র; কে এই 'আমি'?

দেখছি দুটি 'আমি' রয়েছে—একটি 'আমি' শরীর-মনকে কেন্দ্র ক'রে কেবল আমার আমার ক'রে মরছে—ধন-জন-মানের চিন্তায় সদাই ব্যস্ত, কাম-ক্রোধ-লোভে পর্যুদস্ত, অনবরত শোকগ্রস্ত, মূঢ় মোহাচ্ছন্ন। আর একটি 'আমি' সর্বদা একভাবে থেকে আগের 'আমি'টি কি করে লক্ষ্য ক'রে চলেছে—কেমন সে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায় লাফালাফি করে। কে এই সাক্ষী দ্বিতীয় 'আমি'?

প্রথম 'আমি'টি তো দ্বিতীয় 'আমি'র সঙ্গে মিলতে পারছে না—মিললেই যা-কিছু গোলমাল মিটে যায়, কিন্তু পারছে কই? সময় সময় মেলবার যে চেষ্টা করে না, তা নয়—যখন অতি প্রিয়জন ছেড়ে যায়, কাল যখন ছিনিয়ে নেয় তাকে, তখন মনের টনক নড়ে ওঠে, তখনই সে বুঝতে চেষ্টা করে—কে আমি। সে চেষ্টার মূল্য আর কতটুকু? আবার যে কে সেই। মন যেন স্প্রিংএর গদি।

যে শরীরটিকে এত ভালবাসি তা কত দিনই বা থাকবে! আজ হয়তো কোন অঙ্গ বিকল হ'ল, ক'দিন পরে অপর একটি অঙ্গও জবাব দেবে শক্তি নেই ব'লে। একটি একটি ক'রে চোখ কান নাক হাত পা সবই হয়তো শক্তিহীন হয়ে পড়বে কিংবা এক দিনেই একসঙ্গে সব অসাড় হবে। তবু তো শরীরে আমিত্ব-বুদ্ধি যাচ্ছে না। একটি কাঁটা ফুটলে—শরীরটি একটু অসুস্থ হলে সব বিচার গুলিয়ে যায়—আসল 'আমি'কে ধরার চেষ্টা যেন ব্যর্থ হয়। এমনি মায়া!

সুখ-দুঃখ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলার পথে এগিয়ে চলি—উঠে পড়ে থেমে আবার উঠি, জীবনের পথে অবিরাম চলি, কখনো বা কাঁদি কখনো হাসি। বিচারও একবারে থামে না, চলতে থাকে:

স্থানকে মানুষ সীমাবদ্ধ করেছে, স্থানও মানুষকে সীমাবদ্ধ করেছে: এটি আমার বাড়ী, প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছি; ওটি তোমার, তুমিও তোমার বাড়ীর সীমানা সম্বন্ধে সচেতন। এটি আমার গ্রাম—আমার প্রদেশ—আমার দেশ। তোমারও এইরকম। সময়েরও মানুষ গণ্ডী টেনেছে নানা-ভাবে—সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা মাস বছর যুগ ইত্যাদি নাম দিয়ে। অনন্তকালের মধ্যে আমার আয়ু মাত্র কয়েকটি বছর—এই বৎসর কয়টির আগে সময়ের কত বছর ছিল জানি না, পরে যে কত আছে তাও জানা অসম্ভব। শুধু আমার জীবনের এই সময়টুকুর সম্বন্ধেই আমার জ্ঞান—এর আগে পরে সবই অন্ধকার! সাক্ষী 'আমি'টি কিন্তু—সব দেশে সব কালে একই ভাবে রয়েছে, দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ হচ্ছে না। সর্বস্থানে সর্বকালে একই প্রকার। দেশে কালে অপরিবর্তনীয় এই 'আমি'টি কে?

সংসারের সব কিছুরই স্রষ্টা আছে, কিন্তু দেশ-কালে অপরিচ্ছিন্ন 'আমি'টির স্রষ্টা কে? যা কিছু দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ তারই সৃষ্টি—তারই স্রষ্টা। তবে তো সাক্ষী 'আমি'র সৃষ্টি হয় নি,—তার সৃষ্টি-কর্তাও নেই। কে এই দ্রষ্টা 'আমি', যার স্রষ্টা নেই?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'আমি কে?' ভালরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় 'আমি' ব'লে কোন জিনিস নেই। হাত পা রক্ত মাংস ইত্যাদি—এর কোন্‌টা 'আমি'? যেমন পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে 'আমিত্ব' ব'লে কিছু পাইনে! শেষে যা থাকে আত্মা—চৈতন্য।

বিচারের ফলে দেখা যায় দেশ-কালে সদা একরূপ—এই সাক্ষী 'আমি'ই আত্মা বা ব্রহ্ম।

তবে এই 'আমি'কে আত্মস্বরূপ ব'লে উপলব্ধি হচ্ছে না কেন? অজ্ঞানে স্বরূপ ঢাকা রয়েছে যে!

আচ্ছা অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে চলেছি—পথে একটি দড়ি পড়ে আছে, লাফিয়ে উঠলাম—সাপ!

কিন্তু যখনই ভ্রম ভেঙে গেল—বুঝলাম—একটা দড়িকে ভুল ক'রে সাপ মনে করেছি, তখন কী লজ্জা! সেইরূপ নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবটিকে ভুলে আজ এই দশা হয়েছে। কবে এই ভুল ভাঙবে?

আত্মা সূর্যের মত সদা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। দেহে আমিত্ববুদ্ধি-রূপ অজ্ঞান-মেঘ সেই স্বয়ং-প্রকাশকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। মত্ত অবস্থায় মাতাল অনেক কিছু দেখে, প্রকৃতিস্থ অবস্থার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। মত্ততা চলে গেলে নেশার ঝোঁকে দেখা সবই মিথ্যা হয়ে যায়। রূপাদি বিষয়ভোগে মত্ত হয়ে কত ভুল দেখে চলেছি—শত্রুকে বন্ধু, আবার বন্ধুকে শত্রু মনে করছি—ত্যাজ্যকে গ্রহণ করেছি, আর গ্রহণীয়কে ত্যাগ করেছি। এ মত্ততা—এ ভ্রম যাবে কবে, ও কিভাবে?

মরুভূমিতে তপ্ত বালির উপর বায়ুমণ্ডলে সূর্য-কিরণের প্রতিসরণের ফলে হয় মরীচিকার সৃষ্টি, বৃক্ষচ্ছায়া দেখে মনে হয়, দূরে ঐ শীতল জল টল টল করছে, ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কত আশায় তৃষ্ণার্ত পথিক ছুটে যায় বুক-ফাটা পিপাসা নিয়ে জলপানের জন্যে! কিন্তু জল কোথায়? রঙীন আশার সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে, যা সত্যই নেই, তার পিছনে এমনিভাবে ছুটে ছুটে পরিশ্রান্ত হয়ে মূর্ছাহত হয়ে পড়ে যায়। জীবন পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী জেনেও এই ছোটার বিরাম নেই! নাম-রূপের পারে, মায়ামরীচিকার পারে শুদ্ধ 'আমি'টিকে উপলব্ধি ক'রে এই ছোটার অবসান হবে কবে?

জ্ঞান

শ্রীকালীপদ কোঙার

জেন্দাবেস্তা অনেক পড়েছ
কোরান করেছ শেষ,
বাইবেল, ত্রিপিটক ও পুরাণ
নাহি কিছু অবশেষ।

বন্ধু, আজকে শোনো:
পুঁথিপাঠ থাক বাকী,
জীবন-বেদের পাতা উল্টাও
'আত্মা'কে জান দেখি।

তোমার সকল জানাজানি জেন
শেষ হয়ে যাবে তবে,
সকল জানার সর্বশ্রেষ্ঠ
নিজেরে জানিবে যবে।

দর্প ছাড় এবার;
জ্ঞান-অগ্নিতে দগ্ধ হউক
তোমার অহঙ্কার।

দৃষ্টি ফিরাও

ওমর আলী

ফিরাও ভ্রান্ত দৃষ্টি তোমার
শূন্য আকাশ হ'তে!
হেথা চেয়ে দেখ—এ মাটির বুকে
কত না ক্ষুণ্ণ মন,
কত সুরম্য খেলার আবাস
ভেসেছে জটিল স্রোতে,
দুঃসহ ব্যথা ভগ্ন জীবনে,
তাপের দুর্দহন।
হে বীর সাধক তোমার দৃষ্টি
নিবদ্ধ হোক হেথা
তোমার দুহাত টানিয়া তুলুক
পতিত সর্বজনে
তোমার শৌর্য বীর্য দেখাও
অত্যাচারীরা যেথা
সুদূর পিয়াসী তোমার ছায়াটি
পড়ুক নিকট মনে।

মহাতপস্বিনী গৌরী-মা

শ্রীসুবোধ রায়

রবীন্দ্রনাথের একটি গান এই প্রার্থনার মধ্যে শেষ হয়েছে—

'বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা,
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে।'

মহাতপস্বিনী গৌরী-মার কথা যখন ভাবি, তখন কবির উদাত্ত সঙ্গীতের এই প্রার্থনাটি যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ভাস্বর হয়ে ওঠে। মহাজাগতিক প্রাণ-প্রবাহ অসংখ্য জীবন প্রত্যহ বুদ্‌বুদের মতই ভেসে উঠে, দুদণ্ড পরে আবার মহাসমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। এরি মধ্যে আবার দু'একজন আসেন, যাঁরা উত্তাল সমুদ্রে বিভ্রান্ত ও বিপন্ন যাত্রীদের দিগ্‌দর্শনে সাহায্য করার জন্য 'আলোক স্তম্ভের' মত আলোক-ধারা বিকীরণ করে, ধর্ম-স্থাপন-কার্যে এঁরাই ভগবানের লীলাসহচর। এঁরাই যুগস্রষ্টা, সমাজকে জাতিকে দেখান নূতন পথ, যুগোপযোগী নবব্রত উদ্‌যাপনে মানুষকে করেন উদ্বুদ্ধ।

কিন্তু একাজ তো সুখের নয়। ঘরের আরাম-শয্যা ত্যাগ করে কণ্টক-বন্ধুর দুর্গম পথে এঁদের যাত্রা করতে হয়। বিধাতার যজ্ঞশালায় দুশ্চর তপস্যার হোমকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়ে এঁরা এঁদের জীবনব্রত সমাপন করেন। মহাতপস্বিনী গৌরী-মা আমাদের সামনে, বাংলার নারীকুলের সামনে এই আত্মাহুতির আদর্শই রেখে গেছেন।

সুপবিত্র ভারততীর্থে যুগে যুগে যে সব অবতারের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মহাজীবন-কথা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে—তাঁরা যখন আসেন, তখন তাঁদের লীলা-সহচরদের সঙ্গে করেই নিয়ে আসেন। এই সব শুদ্ধাত্মা বাল্যকাল থেকেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অথচ যেন অনিবার্যভাবে কোন এক অতিলৌকিক জীবনের আকর্ষণ অনুভব করেন। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মোহ কিছুতেই তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। কোন এক মহতী অভীপ্সা তাঁদের ব্যাকুল করে, পাগল করে এবং পরিশেষে তাঁদের অন্তরে অদম্য সাহস ও অচলা নিষ্ঠার সঞ্চারপূর্বক ত্যাগের ব্রতে দীক্ষিত করে।

গৌরী-মার জীবন ও সাধনার মর্মকথা বুঝতে হলে এই আলোকে তাঁর তপস্যা ও কর্মের পর্যালোচনা প্রয়োজন। তাঁর জীবনের আলোচনায় এই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নজরে পড়ে।

এক নিষ্ঠাবান আদর্শ গৃহস্থের ঘরে ব্রাহ্মণের কুলে তাঁর জন্ম। তাঁর জননী গিরিবালা দেবীর মমতাময় ভক্তিনিষ্ঠ অথচ তেজস্বী স্বভাব তাঁর চারিদিকে একটি উন্নত জীবনের উপযোগী পরিবেশ রচনা করেছিল। অতি অল্প বয়সে বোধ হয় তখন তাঁর বয়স দশেরও কম—মিশনারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী কুমারী মিলম্যানের সহিত ধর্মবিষয়ে তাঁর মতানৈক্য এবং প্রতিবাদে বিদ্যালয় ত্যাগ থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর মনে ইতিমধ্যেই পারিবারিক আদর্শানুযায়ী স্বধর্মনিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন ঘটেছে।

দশ বৎসর বয়সে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে রামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহার আশীর্বাদ 'কৃষ্ণে ভক্তি হউক'—তাঁহার হৃদয়ে মহৎ জীবনের বীজ বপন করে। এক অদৃশ্য মহাভাবের বাঁধনে গুরু শিষ্যার হৃদয়কে বাঁধলেন। তাই এক অলক্ষ্য আকর্ষণে তিনি কয়েকদিন পরে নিমতে ঘোলায় উপস্থিত হয়ে ভাব-সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আবার দেখলেন এবং তাঁর কাছে পরদিন দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সেই দিন থেকেই তিনি মহৎ জীবনের জন্য চিহ্নিত হলেন।

তের বৎসর বয়সে বিবাহে অসম্মত হয়ে বিবাহের দিনেই মাতার সাহায্যে তাঁহার গৃহত্যাগ থেকেই

প্রমাণিত হয় মাতা তাঁর ধর্মজীবন-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কত বড় সহায় ছিলেন।

তার কিছুদিন পরেই আবার গঙ্গাসাগর-তীর্থ থেকে যে ভাবে তিনি আত্মীয়স্বজনের দৃষ্টি এড়িয়ে নিঃসম্বল ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দুঃসাহসিক তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন—তা থেকেই বোঝা যায় ইতিমধ্যেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে—তাঁর স্বভাব ইস্পাতকঠোর সাহস নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসে সুগঠিত ও সুরক্ষিত হয়ে গেছে। দুর্গম পথের অসহনীয় দুঃখকষ্ট, অনাহার, বিপদ প্রভৃতি কিছুই তাঁকে তাঁর সংকল্পচ্যুত করতে পারে নি।

এর পর থেকে অসংখ্য বাধা অতিক্রম করে তপস্যার দ্বারা আত্মসিদ্ধি লাভ এবং দীর্ঘকাল পরে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে আবার গুরুশিষ্যার অভাবিত মিলন সে এক বিস্ময়কর অলৌকিক কাহিনী। এর পর তিনি ক্রমে ক্রমে কিভাবে গুরুর নির্দেশ অনুসারে বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে প্রাচীন ধর্মানুপ্রাণিত আদর্শের ভিত্তির উপরে নারীশিক্ষার যুগোপযোগী ইমারত প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, সে অপরূপ জীবনকথা ঘরে ঘরে যদি আলোচিত হয়, তাহলে আমাদের অশেষ কল্যাণ হবে বলেই মনে করি।

আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি বলে আমাদের মনে একটি মূঢ় বাস্তববোধের অহংকার জেগেছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে কোনও সত্যকেই আমরা সহজে স্বীকার করি না। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন, জগদীশ বসু. সি. ভি. রামন্ প্রভৃতি সকলেই স্বপ্নদ্রষ্টা। যে সত্য তাঁরা প্রতিষ্ঠা করবেন, প্রথমে তাঁর একটি জ্যোতির্ময় প্রতিভাস জাগে তাঁদের অন্তরে। তাঁরা আহার নিদ্রা ভুলে, কঠোর সাধনা করে সেই অস্পষ্ট নীহারিকা-মণ্ডলী থেকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার করেন। গৌরী-মার অন্তরে গুরুর আদেশে নারীশিক্ষার যে স্বপ্নাদর্শ জেগেছিল, একক নিঃসম্বল অবস্থায় নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে নীরবে লড়াই করে সেই স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করেন; শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম সেই মহাজীবন স্বপ্নের ভাস্বর মূর্ত বিগ্রহ। যুগাবতার রামকৃষ্ণ এবং যুগমাতা সারদামণির দিব্যাশিস্‌দীপ্ত প্রাতঃস্মরণীয়া পূতচরিত্রা মহাতপস্বিনী গৌরী-মাকে আজ বারে বারে প্রণতি জানাই।

গৌরী-মাতা

শ্রীগৌরী সিংহ

এ ভারত তপোভূমি; প্রতি ধূলিকণা
প্রতি জনপদ বন করিছে ঘোষণা,
অমর আনন্দবাণী। গম্ভীর উদার
প্রসন্ন ত্যাগের মন্ত্র প্রেমে বারংবার
উচ্চারে জীবন-যজ্ঞে। ছাড়ি রাজ্যধন
তপস্বী সে বারবার করেছে ভ্রমণ
দুর্গম প্রান্তরে বনে। ভূমানন্দ লাগি
পথে পথে ফিরিয়াছে, নিঃসঙ্গ বৈরাগী।
সঞ্চিত তপস্যা তার রেখে গেছে দান,
গৃহে, পথে, কর্মমাঝে—অমৃত সন্ধান।

যে তপস্যা মূর্তি ধরি এলো আরবার
তোমার জীবন মাঝে। অসীম অপার
কঠিন সাধনা তব। দুর্গম বনানী,
নির্ঝর, প্রান্তর, গিরি, কহিছে কাহিনী;
তোমার তপের কথা। তব পুণ্যব্রত—
অর্জিত তপস্যা তব, রেখে গেছ যত
নারীর কল্যাণ তরে। হোমানল-শিখা
জ্বালিয়াছে গৃহাঙ্গনে কল্যাণবর্তিকা।
অমৃতের বার্তা লয়ে এসেছ জননী,
গৌরী তুমি, মাতা তুমি, মহা তপস্বিনী।

'বিল্বমঙ্গলে' গিরিশ-পরিচিতি

শ্রীকাম্যেশ্বর মিশ্র

উচ্ছৃঙ্খল শিষ্য গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে গুরু রামকৃষ্ণের প্রভাব ক্রমপরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ভক্তির উপ্ত বীজকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও পুষ্পিত করিয়াছিল। গিরিশ-রচিত 'বিল্বমঙ্গলের' অভিনয় ভক্তিসৌরভে একদিন বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতাকে মাতাইয়াছিল। 'বিল্বমঙ্গল' বাদ দিলে গিরিশচন্দ্রের জীবনীও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

পরমহংসদেব গাহিতেন—

'শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই
শ্যাম বাজালে বাঁশী আমার প্রাণ করে উদাসী।'

বিল্বমঙ্গলে গিরিশচন্দ্রের পাগলিনী গাহিতেছে—

'যাইগো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথপানে চায়
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মান ভরে।'

পাঠকের বুঝিতে বাকী থাকে না এ পাগলিনী কাহার স্বরূপ। এই গান চিন্তামণিকে উদাসিনী করিয়াছিল; আর সেই চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বলিয়াছিল, 'আমার মত অপদার্থের প্রতি তোমার এই তীব্র প্রেম কৃষ্ণে অর্পণ করিলে তোমার সদ্গতি হইবে।' স্বহস্তে চক্ষু বিদ্ধ করিয়া বিল্বমঙ্গল অন্ধ সুরদাস হইলে তাহার পথপ্রদর্শক হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। রাখাল বালক বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে গাহিল—

'আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব
খেলব কত ছুটোছুটি বাঁশী বাজাব।'

বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে পথ দেখাইয়া সে অন্ধকে বৃন্দাবনে পৌঁছাইয়া দিল। সেখানে সুরদাস সাধনা আরম্ভ করিলেন।

সাধনার প্রতিবন্ধক বলিয়া পরমহংসদেব কামিনী-কাঞ্চন সর্বথা ত্যাগের উপদেশ দিতেন। গিরিশচন্দ্র গুরুর প্রতীক উদাসীন সাধু সোমগিরিকে অবতরণ করাইয়া শিষ্যবর্গকে উপদেশ দেওয়াইতেছেন:

'কামিনী-কাঞ্চন—এক মায়া দুইরূপে করে অন্বেষণ
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হয়ে।
সেই মহাজন, এ বন্ধন যে করে ছেদন—
অবহেলি কামিনী কাঞ্চন, নিরঞ্জন করে আশ।'

শেষে এই সোমগিরির সহিত বিল্বমঙ্গলের মিলন হইল। বৃন্দাবনে সেই মিলনে অন্ধের দিব্যচক্ষু উদ্‌ঘাটিত হইল, গোলোকে কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া সশিষ্য গুরুদেব সোমগিরির সহিত সুর মিলাইয়া বিল্বমঙ্গল গাহিতেছেন—নাটকের শেষ দৃশ্যে :—

জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা, জয় গোবর্ধন চেতনশিলা
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
চেতন যমুনা, চেতন বেণু, গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত ধেনু,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
খেলা খেলা, খেলা মেলা, নিত্য নিরঞ্জন ভাবুক ভেলা,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।

পূর্বে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয় করিয়া ও রঙ্গমঞ্চে তাহা অভিনীত হইতে দেখিয়া সাধারণ ভাবেই তৎকালে এই গানের ভাব গ্রহণ করিয়াছি।

বৃন্দাবন-লীলা, গোবর্ধন-পর্বত কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ধারণ, বনে ও কুঞ্জে কৃষ্ণের মুরলী বা বেণু ধ্বনির ব্যাপ্তি, তাঁহার বালক সহচরগণের ও কিশোরী গোপিকাগণের সহিত নানারূপ চতুরালী খেলা যেন খেলারই মেলা। গানে এই সমস্ত বর্ণনা করিয়া শেষে, কবি বলিলেন, এ সমস্তই নারায়ণেরই খেলা—তিনিই নিত্য, অব্যক্ত, বিবেকী ভাবুকের ভবার্ণব তরণের তরণী। এই গানটি দ্ব্যর্থবোধক।

তত্ত্বজ্ঞ গুরুর প্রসাদে যখন দ্ব্যর্থবোধক এই গানটির অন্তর্নিহিত মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন গিরিশচন্দ্রকে নূতনরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্বগুণান্বিত কোন কোন মানব-শ্রেষ্ঠের বা কোন সম্রাটের জয়গান লোকে করে, সেইরূপ যে অনাম কারণসত্তা বা আধার হইতে জাগতিক এই বিভিন্ন রূপের উদ্ভব হইয়া সৃষ্টি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—সেই উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তিরই জয়গান করা হইয়াছে এই সঙ্গীতে। জীবজগতের মূল বা আধারকে নারায়ণ বলিয়া সাধারণের বোধগম্য করানো হইয়াছে। গ্রামে গৃহস্থদের বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে, সর্বত্র প্রথমে নারায়ণ বা শালগ্রাম শিলার স্থান। তাহার পার্শ্বে গোবিন্দ, শ্যামসুন্দর, রাধাবল্লভ, গোপাল ইত্যাদি নানা মূর্তিধারী বিগ্রহের সমাবেশ দেখা যায়। মূল কিন্তু সেই নারায়ণই এবং তাঁহারই পূজা আরাধনা হয়। তিনিই চেতন সত্তা-রূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন; অন্যত্র যাইবার অতিরিক্ত স্থান নাই, তাই অচল গোলাকার পাষাণ শিলা তাঁহার প্রতীক। এই অচল কারণ চেতনভাব হইতেই বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ উদ্ভূত হইয়া উৎকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বেদে দেবীসূক্তে বলা হইয়াছে—'মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে'—সমুচ্চয় দ্রবপদার্থে আমার যোনি—যেখান হইতে সমস্ত সৃষ্টি প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রথমে জলজ উদ্ভিদ্ রূপ আহার্য ও জলজ প্রাণী সৃষ্ট হইল। তারপর স্থল হইলে, তাবৎ স্থলজ ক্ষুদ্র তৃণ হইতে বৃহৎ বৃক্ষে পরিপূর্ণ বনবৃন্দে যে কারণসত্তা প্রকাশিত হইলেন, তিনিই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী হইতে তাঁহারই সৃষ্টি নররূপে রূপান্বিত হইলেন। তাই কবি বলিয়াছেন—'সবার উপর মানুষ সত্য।' নর জন্মেই রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতাররূপে অভিহিত পুরুষোত্তমগণ পূর্ণ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গো অর্থে পৃথিবী। পৃথিবীর মৃত্তিকা হইতেই ক্রমবর্ধনে পর্বতের উদ্ভব তাই গোবর্ধন অর্থাৎ পর্বতও চেতন এবং শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ বন বৃন্দাবন, শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা নর কৃষ্ণও পুরুষোত্তম। এই তিনের জয়গান করিয়া বলিলেন, এই তিনই নারায়ণের বিভিন্নরূপে বিকাশ। যমুনার সলিলও চেতন—কুলু কুলু শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, আর সেই জল হইতেই জীবন্ত উদ্ভিদের জন্ম। তাহার পুলিনের রেণু বা মৃত্তিকার কণাও চেতন, যাহার পরস্পর সংহতিতে কত মূর্তির আবির্ভাব হইয়াছে। কৃষ্ণের বাঁশী বা বেণুধ্বনি যেমন বৃন্দাবনের গহনবনে ও তাহার উপবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ব্যাপ্ত, তেমনি সমস্ত শব্দের শেষ রেশ যে "ওঁ" রাগিণীতে পরিণত হয়, তাহাই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। যেমন সমস্ত বাদ্য যন্ত্র হইতে ও কণ্ঠ হইতে উদ্ভূত শব্দ একতালে লয় প্রাপ্ত হইয়া সুরজ্ঞের কর্ণে সঙ্গীত রূপে শ্রুত হয়, তেমনই সমস্ত উদ্ভিদ হইতে উত্থিত মর্মর-শব্দ সমস্ত প্রাণীর কণ্ঠ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন রূপ কোলাহল, সমুদ্রের কল্লোল, নদীর কুল কুল ধ্বনি সমস্ত মিলিয়া যে শব্দ তাহাই গহন বনে ও উপবনের কুঞ্জে ধ্বনিত হইয়া ব্যাপ্ত হইতেছে। আর—'মহাসিংহাসনে বসিয়া বিশ্বের পিতা, নিজ ছন্দে রচনা করিয়া সেই মহান গীত শুনিতেছেন।'—তাহাই সাধক নিজের হৃদয়-কুঞ্জে বাজিতে ও শুনিতে পাইয়া থাকেন। 'নাদ' রূপে সমস্ত দেহের শিরা ও ধমনীর রক্ত-প্রবাহ হইতে উত্থিত শব্দ জীবাত্মারূপে—দেহী আত্মারূপী নারায়ণ হইতেই উত্থিত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নারায়ণের খেলা। যেন এ সবই খেলার মেলা—খেলা ভাঙিলেই মেলা ভাঙে। খেলা শেষ হইলেই জীবের ও জাগতিক পদার্থেরও অন্ত হয়। নারায়ণেরও সেই লীলার শেষ হয়। যাহা পুনঃ পুনঃ যায় তাই জগৎ। তাই কবি গাহিয়াছেন—"খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এ জগৎখানা।" স্থির থাকেন সেই নিরঞ্জন—(অন্জ = ব্যক্তৌ, ব্যক্ত হওয়া) যাহা ব্যক্ত হয় নাই সেই অব্যক্ত নিত্য কাল স্থায়ী নিরঞ্জন নারায়ণ—যিনি বিবেকী ভাবুক বা সাধকের হৃদাকাশে "সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং" রূপে প্রতিভাত, তিনিই নরের আধারে নারায়ণরূপে

বিরাজমান। পাঠক গিরিশচন্দ্রের 'ভ্রান্তি' গ্রন্থে দেখিবেন রঙ্গলাল বলিতেছে—'অমন পাথুরে মাকে মানি, না মানি—তাতে বড় আসে যায় না……মানুষ আমার দেবতা—ভগবানের অংশ। আমার দেবতা প্রাণের মানুষ—তাকে সেবা করলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, যার সেবা করে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, ভাল করেছি কি মন্দ করেছি।'

একাধারে ভক্তি ও পরমার্থ-তত্ত্বের সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য গিরিশচন্দ্র এই 'বিল্বমঙ্গল' গ্রন্থে তাঁহার নিজেরই প্রকৃত পরিচয় রেখে গেছেন।

উৎসবের তাৎপর্য

শ্রীহারাধন রক্ষিত

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি' আনন্দ হইতেই সমগ্র জীবজগতের উৎপত্তি, আনন্দেই স্থিতি, আনন্দেই লয়। তাই আনন্দ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং মানুষ সর্বদা সর্বত্র আনন্দ খুঁজিয়া বেড়ায়; সেইজন্যই তার গতানুগতিক জীবনের পথে বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠান। উৎসবের দিনটি বড় মধুর, কারণ ইহা অত্যন্ত নূতনভাবে মানুষের কাছে আসে। জীবনের প্রতিদিনের ধার উৎসবের দিন ধারে না, এই দিনে মানুষের জীবনে স্বার্থের হীন সংঘাত থাকে না, উৎসবের দিন নবীনতা উপলব্ধির দিন। ঘাতমুখর একটানা জীবনের মাঝে মানুষ সামান্য সময়ের জন্য হইলেও চায় দ্বন্দ্বের বিরাম, চায় শান্তি। মানবমনই শুধু নয়, পশুপক্ষী সকলেই উৎসবের অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

দেশে দেশে উৎসবের অন্ত নাই। বাংলা দেশে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। শুধু তেরো নয়, আরও বেশী। এখানে বৎসরের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া নববর্ষ, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, মনসাপূজা, জন্মাষ্টমী, দুর্গা লক্ষ্মী ও কালী পূজা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রী ও কার্তিক পূজা, নবান্ন, সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, বাসন্তী পূজা ও চৈত্র-সংক্রান্তি—উৎসবের পর উৎসব চলিতে থাকে। ইহা ছাড়া শনি ও সত্যনারায়ণ পূজা এবং মেয়েদের বিভিন্ন ব্রত উপবাস তো লাগিয়াই আছে। মুসলমানদের ঈদ, সবেবরাত, সবেমেরাজ, মহরম, মিলাদ্ শরীফ প্রভৃতি উৎসব—মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

নববর্ষ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। পারস্যে এই উৎসবটি অত্যন্ত জমকালভাবে উদ্‌যাপিত হয়। পারসীকরা ইহাকে 'নওরোজ' উৎসব বলেন। বাংলায় বর্ষ বিদায় চৈত্র-সংক্রান্তি, পাশ্চাত্ত্যে বড়দিন: খৃষ্টজন্ম ও নববর্ষকে ঘিরিয়া তাহাদের উৎসব।

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ—জীবনে এ তিনটিকে ঘিরিয়াও উৎসব। জন্মদিনের উৎসব আজকাল সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। ব্যক্তিগত জন্মদিন ছাড়া, বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন আজকাল ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে উদ্‌যাপিত হয়। পূজনীয় প্রিয়জনের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধানিবেদনের আয়োজন—যে শ্রাদ্ধ, সেও উৎসব। সকল দেশের সভ্য সমাজেই ইহা প্রকারভেদে বিদ্যমান। সমাজব্যবহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিবোধ মার্জিত হইয়া বিবাহ ব্যাপারটিও এখন উৎসবের মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হয়। যাঁহারা পূজাপার্বণের উৎসব করেন না—বসন্ত, বর্ষা, শরতে ও শীতে তাঁহারা ঋতু-উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন, কারণ প্রকৃতির উৎসবে সাড়া না

দিয়া মানুষ পারে না। একদিক দিয়া সব উৎসবই ঋতু-উৎসব; প্রকৃতির রূপান্তরের আনন্দ-উল্লাস।

উৎসবের ছড়াছড়ি দুনিয়া জোড়া। ইহার তাৎপর্য কি? মানুষ যুক্তিবাদী। তাৎপর্যবিহীন কোন কিছু যেন তাহাদের মধ্যে নাই। উৎসবের তাৎপর্য অপূর্ব। উৎসবের দিনে মানুষ আত্মপর ভেদশূন্য হইয়া বিশ্বজনকে আপনার করিয়া লইতে পারে। উৎসব মিলনের সেতু। অন্যদিন গৃহের সীমায় মানুষ মাতা-পিতা, পত্নী-পুত্রকে আপন করিয়া বিশ্বের আর সকলকে পর করিয়া রাখে। কিন্তু উৎসবের দিনে বিশ্বের সকল লোক মানুষের আপন হইয়া যায়। 'উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম।' উৎসবের দিনে মানুষ প্রেমের অপরাজেয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ছোট-বড় সকলে পরমপিতার প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে। প্রতিদিন মানুষ ঠিক ঠিক তাহা অনুমান করিতে পারে না। মানুষ স্বভাবতঃ সঙ্কীর্ণ পরিবেশে পরিবর্ধিত; মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টি খুবই সীমাবদ্ধ। উৎসবের দিনে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া দূরাতিদূরে অনন্তের পানে চলিয়া যায়। সেই দিন তাহারা সেই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে, 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'; ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্র এই প্রেমের প্রবাহ। তাই উৎসবের দিনে ধনী দরিদ্রকে সম্মান করিয়া দান করিয়া, পণ্ডিত মূর্খকে স্বীয় আসন ছাড়িয়া দিয়া তৃপ্তি বোধ করে। 'প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে এক হইয়া বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।' এই জন্য মানুষ উৎসবের দিনে সমস্ত কার্পণ্যের অতীত হইয়া থাকে—সেদিন সে মিতব্যয়িতার কঠোর নিয়মকে অতিক্রম করিয়া প্রাচুর্যের আয়োজন করিয়া থাকে। উৎসবের দিনে মানুষ ঘাতমুখর দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, বেদনা, দারিদ্র্য, সহায়-সম্বলশূন্যতা ভুলিয়া —"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এই দিন মানুষের মনুষ্যত্বের শক্তির সম্যকভাবে উপলব্ধির দিন। এই দিনে মানুষ সকল ক্ষুদ্রতা, অজ্ঞতা, অন্ধতা বিসর্জন দিয়া মহামহিমোজ্জ্বল সত্য-শিব-সুন্দরের অভিসারী হইয়া উঠে। তাই উৎসবের দিন মানুষের কাছে, চাতকের কাছে বৃষ্টির দিনের মত উৎসব অবসন্ন জীবনে শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করিয়া মানুষকে করিয়া তুলে চির উদ্ভিন্ন বিকচ কুসুমের মত। মানুষের ছোট ছোট জীবনের বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি উৎসবের দিনে সম্মিলিত হইয়া মহান্ মঙ্গলের দুর্বার গতি প্রাপ্ত হয়।

নববর্ষ আমাদের দেশে মহাসমারোহের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যেও এই দিবসটিতে উৎসবের মহানন্দে প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠে। পারস্য দেশে এই উৎসবের আড়ম্বর খুব বেশী। এই দিনে মানুষ বিগত দিনের কালিমা হইতে মুক্ত হইয়া সৌন্দর্য ও পবিত্রতায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া লয়। এই দিবসে মানুষের চিত্ত প্রফুল্ল; হৃদয় পূর্ণ, পবিত্র, সুন্দর। মানুষের শত্রুমিত্র আজকের দিনে লোক-পিতার প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত। আজ মানুষ সমগ্র জীবজগতের জন্যে বাহু বাড়াইয়া দেয়, বক্ষ প্রসারিত করিয়া সকলকে আপন করিয়া লয়। ছোটরা বড়দের প্রণাম করে, বড়রা ছোটদের স্নেহসিঞ্চিত করিয়া উপহার দান করেন; তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মহাশক্তির দুয়ারে অন্তরের অন্তস্তল হইতে প্রার্থনা জানান। এই দিনে মানুষ প্রতিজ্ঞা করে—অভাবে বিক্ষুব্ধ না হইয়া, দারিদ্র্যে কুণ্ঠিত না হইয়া, সরল ভাবের আড়ম্বরশূন্যতায় লজ্জিত না হইয়া জীর্ণকুটিরে তৃণাসনে বসিয়া উত্তরীয় পরিধানে সহজ সুন্দরভাবে কর্ম করিবার। আজকে তাহারা প্রতিজ্ঞা করে "তিনশত-পয়ষট্টিদল বর্ষপদ্মের"

প্রতিটি পাপড়িকে সার্থক করিয়া তুলিতে। আজই তাহারা প্রস্তুত হয় তাহাদের আশা-কুমুদিনীকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে। বাংলা দেশে নানাস্থানে এই দিনে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে ছোট বড়, সকলে এক হইয়া যায়। এই দিনে তাহারা অনুভব করিতে পারে যে, একই অমৃতের তাহারা সহস্র সন্তান।

বর্ষ-বিদায় উৎসবও আমরা উদ্‌যাপন করি। পুরাতন বৎসর আমাদের কাছে জীর্ণ; কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহা মূল্যহীন? মানুষ সারাজীবন খুঁজ করিয়া যৌবন হারায়, বার্ধক্যে উপনীত হয়। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। তাই বলিয়া মানুষের জীবনের কর্মপন্থা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। পুরানো বছরের কর্মসূচীর দিকে তাকাইয়া দেখিবার মুহূর্ত—বর্ষবিদায়-উৎসব-দিবস। রাত্রি আগামী দিনের প্রসূতী। অন্ধকার রাত্রির গর্ভজাত ঊষা কত সুন্দর—কত মনোরম! তেমনি জীর্ণ বর্ষশেষের গর্ভ হইতেই নব বর্ষের জন্ম হয়। যাহাকে পাইয়া আমরা হৃষ্ট হই—সেই নূতনের মাতা এই পুরাতন বৎসর। তাই সে সার্থক। বর্ষাবসান আমাদের আগামী বৎসরের আশা-মুকুলকে লালন পালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। এই দিবসে আমরা খতিয়ান করিয়া দেখি আমাদের বিগত বর্ষে জীবনের আয়-ব্যয়, ভাল-মন্দ। এই উৎসবের দিনে আমরা অন্যায়কারীকে ক্ষমা করি। কোন আশাকে যদি বিগত বৎসরে উৎপাটিত করিয়া থাকি, তবে আবার ভগবানে সব অর্পণ করিয়া সেই আশাবৃক্ষের গোড়ায় শত উদ্যমে জল-সিঞ্চন দ্বারা তাহাকে ফলবতী করিয়া তুলিব—এই প্রতিজ্ঞা আমরা বর্ষবিদায় উৎসবের দিনে করিয়া থাকি। দ্বিধাবিহীনচিত্তে সকলে সমবেত হই। বিভিন্ন উৎসবকে অবলম্বন করিয়া বহু প্রাচীনকাল হইতে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সমাজের ক্ষেত্রে ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের ভূমিকায় উৎসবের তাৎপর্য অপরিমেয়।

শুধু আমাদের দেশে নয় সকল দেশেই জন্মোৎসবের রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। জন্মদিন কতই যায় আসে। কিন্তু তাহা আমাদের জীবনে কোনও আলোক সম্পাত করে না, যদি না আমরা উৎসবের মধ্য দিয়া তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি। জন্মোৎসবের মধ্য দিয়া আমরা উপলব্ধি করিতে পারি আমাদের জন্মের মাহাত্ম্য, মহত্ত্ব। এই উৎসবের দিনে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া মানুষ মনুষ্য-জন্মের একটি অপরিমেয় মূল্য অনুভব করিয়া থাকে। মানুষ বুঝিতে পারে—সে একা নয়, তাহার জন্ম সৌন্দর্যমণ্ডিত, সে নিজে মহান। এই দিনে জীবনের সেই অনির্দেশ্য অনন্ত প্রত্যাশায় মানবচিত্ত বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে। জন্মোৎসবের দিনে মানুষ সবাইকে আপন করিয়া লয়। 'তুমি আমার আপন'—এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলিতে পারে না—এতে সৌন্দর্যের সুর ঢালিয়া দিতে হয়। সৌন্দর্যপ্রসূতী উৎসব। জন্মোৎসবের দিনে বৃদ্ধ বার্ধক্য ভুলিয়া তাহার জন্মমুহূর্তের তারুণ্যে চঞ্চল হইয়া উঠে। জন্মমুহূর্তের সুন্দর দর্শন তাহার উপলব্ধিগম্য হয় জন্মোৎসবের দিনে। 'সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টন হইতে বহুর সাথে মিলনে মানুষের পুনর্জন্ম; তেমনি স্বার্থের আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি।' জন্মোৎসবের দিনে কবি বলিয়াছেন, 'দেশলাইয়ের কাঠির মুখে যে-আলো একটুখানি দেখা দিয়েছিল, সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জ্বলে উঠেছে।' জন্মোৎসবের দিনে মানুষ ভাবিতে শিখে—কেন, কোথা হইতে এবং কি জন্যে তাহার জন্ম। আজকের দিনে মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে নিখিল মানবের এবং নিখিল মানব তাহার। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সে (বালক) যদি ফল হয়, তার বাপ-মা কেবল বৃন্তমাত্র। সমস্ত মানব-বৃক্ষের সঙ্গে একে-বারে শিকড় থেকে ডাল পর্যন্ত তার মজ্জাগত

যোগ।' উৎসববিহীন জন্মদিনে এই সব অনুভূতি আমাদের হয় না। তাই জন্মোৎসবের এত সার্থকতা।

মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া হিন্দুদের মধ্যে শ্রদ্ধানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শ্রাদ্ধ উৎসব নয়, ইহা দুঃখের দিন; কিন্তু ইহা ঠিক নয়। উৎ—সু ধাতুর যোগে উৎসব: যাহাতে ঊর্ধ্বজন্মের বার্তা তাহাই উৎসব। শ্রদ্ধা হইতে শ্রাদ্ধ শব্দের উৎপত্তি। এই দিনে মানুষ মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং তাহাতে তাঁহার আত্মিক উন্নতি হয়। আত্মা অবিনশ্বর—এই উপলব্ধি সার্থক হইয়া উঠে শ্রাদ্ধের দিনে। প্রতিদিন ইহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা যাহাকে মৃত বলিয়া বোধ করি, শ্রাদ্ধের দিনে আমরা তাহার অবিনশ্বরত্ব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।

'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীঃ॥' ইত্যাদি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই আনন্দ-মন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সব অমৃতে অভিষিক্ত ক'রে, মধুময় ক'রে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন।' এই দিনে অন্তর্হিত ব্যক্তির গুণাবলী আলোচনা করিয়া আমরা উদার মহৎ হইয়া উঠি। জীবনে যে মানুষকে আমরা আনন্দের মধ্যে দেখি না, মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধের দিনে তাহাকেই আমরা অমৃতের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। তাই শ্রাদ্ধোৎসব এত তাৎপর্যপূর্ণ।

বিবাহ-উৎসবের ব্যাপারটিতে স্বভাবের উদ্দামতাই প্রবল বটে, কিন্তু সামাজিক বন্ধন সেই উদ্দামতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। নারী-পুরুষ প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মানুসারে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সামাজিক বন্ধনের দ্বারা বিবাহে উৎসবের নিয়ম না থাকিলে নরনারীর মিলন পশুপক্ষীর মিলনের চাইতে কিছুই নূতন হইত না, কিছুই উন্নততর হইত না। সকল দেশের সকল লোকেদের মধ্যেই ভাব-সমৃদ্ধ নিয়ম-প্রণালীর মধ্য দিয়া বিবাহ-উৎসবটি উদ্‌যাপিত হয়। হিন্দুদের বিবাহ সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়, এই সময় স্বামী-স্ত্রী ব্রাহ্মণ বিগ্রহ ও অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া যে ভাবে পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা করে তাহাতে নিশ্চয়ই তাহাদের ভাবী জীবন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সুন্দর ও সুখময় হয়।

স্বাধীনতা দিবসে, খাঁচায় বদ্ধ পাখী খাঁচা হইতে বহু চেষ্টার পর বাহির হইতে পারিয়া যে অনাবিল আনন্দ বোধ করে, মানুষ সেই আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। এই দিনে জাতি তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ হয়; দেশকে সমাজকে সুষ্ঠু সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার ব্রত গ্রহণ করে। এই উৎসবের দিনে মানুষ ব্যষ্টি-স্বার্থ বিসর্জন দিয়া দেশের ও জাতির সমষ্টি-স্বার্থের জন্য জীবন ও সর্বস্ব পণ করে। এই দিনে তাহারা সমবেতভাবে—চিন্তা করে, আনন্দ করে।

বিভিন্ন উৎসবের সম্পর্কে বলিতে গিয়া মিলনের কথাটি বার বার বলিয়াছি। উৎসবের দিনেই শুধু মানুষ একত্র মিলিত হয় তাহা নয়, বাজারেও মানুষ মিলে। কিন্তু উৎসবের মিলন ও বাজারের মিলনের পার্থক্য দিবারাত্রির পার্থক্যের মত। বাজারের মিলনে অন্তরের মিলন হয় না, ইহা বাহিরের মিলন। এখানে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থের পঙ্কিল চিন্তায় মগ্ন থাকে। একত্র মিলিত হইয়াও পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায় না, স্বার্থ-চিন্তার প্রাচীর উহাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। কিন্তু উৎসবের মিলন অন্য প্রকার। ইহাতে স্বার্থ-চিন্তার লেশমাত্র থাকে না, তাই সেই দিন মানুষ নিজের সঙ্গে সকলকে এবং সকলের সঙ্গে নিজেকে উপলব্ধি করিয়া থাকে।

উৎসবের দিনের ইহাই বড় সার্থকতা যে, এই অন্ততঃ একদিনের জন্য হইলেও মানুষ নিজেকে বড় করিয়া সুন্দর করিয়া জানিতে পারে। এইরূপে

উৎসব মনুষ্য-জীবনকে সুন্দর ও সুগঠিত করিয়া তুলে। উৎসবের আনন্দে মানুষের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই মানুষ উৎসবপ্রিয় বলিয়া গৌরবের ভাগী। উৎসবের তাৎপর্যগুলি জীবনে সার্থক হইয়া উঠিলে মানুষ প্রতিদিনের চিন্তায় ভাবিতে শিখিবে যে, তাহারা সকলে "অমৃতস্য পুত্রাঃ", একই পিতার স্নেহ-চ্ছায়াতলে তাহারা বর্ধিত ; তবেই মানুষ হইবে পূর্ণ, মানুষ হইবে বিরাট্, মহান্।

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ*

স্বামী গম্ভীরানন্দ

'কথামৃত'-কার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন, "ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাহিলেন। যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন! দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে বসে বসে কাঁদেন; নিজের অন্তরঙ্গ দেখবেন বলে ব্যাকুল। রাত্রে ঘুম নাই! মাকে বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আসতে পারে, তা হলে মা আমায় সেখানে নিয়ে যাও, আমি দেখে আসি!' তাই বলরামের বাড়ি ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেমন বলেন, 'বলরামের জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন!' যখন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান। বলেন, 'যাও, নরেন্দ্রকে, ভবনাথকে, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এসো। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়; এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে।' বলরামের ঘরেই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে প্রথম বসে আলাপ। এখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ। এই খানেই কতবার প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা হইয়াছে!" ইহা ১১ই মার্চ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের কথা। (কথামৃত ১ম ভাগ, ২৩ পৃষ্ঠা)

পরম পূজনীয় লাটু মহারাজের মতে ঠাকুর এই গৃহে শতাধিক বার আসিয়াছিলেন।

পরম পূজ্যপাদ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার লিখিয়াছেন, "এই ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ বাটীতে ঠাকুরের যে কতবার শুভাগমন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কত লোকই যে এখানে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীকে ঠাকুর কখন কখন 'মা কালীর কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিতেন। কলিকাতার বসু পাড়ার এই বাটীকে তাঁহার 'দ্বিতীয় কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঠাকুর বলিতেন 'বলরামের পরিবার সব একসুরে বাঁধা।' কর্তা-গিন্নী হইতে বাটীর ছোট ছোট মেয়েগুলি পর্যন্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত; ভগবানের নাম না করিয়া জলগ্রহণ করে না এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেবা, সদ্বিষয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ; কাজেই এই পরিবারবর্গই যে ঠাকুরের দ্বিতীয় কেল্লাস্বরূপ হইবে এবং এখানে আসিয়া ঠাকুর যে বিশেষ আনন্দ পাইবেন, ইহা বিচিত্র নহে"। (গুরু-ভাব, উত্তরার্ধ, ২৮৬ পৃঃ)

'লীলাপ্রসঙ্গে' আরও আছে—"বসুজ মহাশয়ের

* বলরাম-মন্দিরের গত ১৩.২.৫৭ তারিখের ধর্ম-সভায় পঠিত।

কোঠারে জমিদারি ও শ্যামচাঁদ-বিগ্রহের সেবা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ ও শ্যামসুন্দরের সেবা আছে এবং কলিকাতার বাটীতেও ৺জগন্নাথদেবের বিগ্রহ ও সেবাদি আছে। ঠাকুর বলিতেন, 'বলরামের শুদ্ধ অন্ন—ওদের পুরুষানুক্রমে ঠাকুর-সেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা—ওর বাপ সব ত্যাগ ক'রে শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম করে—ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলে যেন আপনা হতে নেমে যায়। বাস্তবিক ঠাকুরের এত ভক্তের ভিতর বলরামবাবুর অন্নই (ভাত) তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির সহিত ভোজন করিতে দেখিয়াছি। কলিকাতায় ঠাকুর যেদিন প্রাতে আসিতেন, সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজন বলরামের বাটীতেই হইত। ব্রাহ্মণ-ভক্তদিগের বাটী ব্যতীত অপর কাহারও বাটীতে, অন্নগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ—তবে অবশ্য নারায়ণ বা বিগ্রহাদির প্রসাদ হইলে অন্য কথা"। (ঐ, ২৮১-৮২ পৃঃ)

অতঃপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে আমরা ভক্ত-প্রবর বলরাম এবং তাঁহার গৃহ, যাহা পরে ভক্তমহলে বলরাম-মন্দির নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে এবং তীর্থরূপে পূজিত হইতেছে, ঐ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাই—

ধীর নম্র বিনয়ী সংসারী ভক্তবর।
বিভূষিত সর্বগুণে গুণের সাগর॥
আস্যে মৃদুমন্দ হাস্য খেলে অবিরাম।
মিতব্যয়ী সন্তোষ-অন্তর বলরাম॥
গোপনে গোপনে আনে প্রভু ভগবানে।
মহাপুণ্যময় তীর্থ নিজ নিকেতনে॥
ভবনে মহিমা কিবা না যায় বর্ণন।
গৌর-অবতারে যেন শ্রীবাস-প্রাঙ্গণ॥
জগন্নাথ-প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ঘরে।
ভোগ-রাগ নিতি নিতি অতি প্রীতিভরে॥
সেই মহাপ্রসাদে প্রভুর সেবা হয়।
শ্রীপ্রভুর অন্নভিক্ষা যথা তথা নয়॥
ভাগ্যধর বলরাম যাঁর এই বাড়ি।
তিনি একজন গোটা প্রভুর ভাণ্ডারী॥
বলরাম জন্ম জন্ম ভক্ত অবতারে।
অন্ন-ভিক্ষা শ্রীপ্রভুর এই তাঁর ঘরে॥
প্রভুর গমনে বহু আড়ম্বর তথা।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রাঁধে ভামিনীর মাতা॥
মহাভাগ্যবতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে।
বড় খুশী প্রভুদেব তাঁর রান্না খেয়ে॥

(৩০৬ পৃষ্ঠা)

পূর্বোক্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি হইতেই বলরাম-মন্দিরের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়। অতঃপর আমরা যথা-সম্ভব বিস্তৃত উদ্ধৃতির সাহায্য-ব্যতিরেকে প্রধানতঃ পূর্বোদ্ধৃত তিনখানি মহামূল্য গ্রন্থ অবলম্বনে এই তীর্থস্থলে সংঘটিত কয়েকটি লীলার আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে আমরা যে পনেরটি চিত্রের সন্ধান পাইয়াছি, তাহার ১ খানি প্রথম ভাগে, ১ খানি দ্বিতীয় ভাগে, ৪ খানি তৃতীয় ভাগে, ৩ খানি চতুর্থ ভাগে, এবং ৬ খানি পঞ্চম ভাগে। ইহার মধ্যে সাতখানি আলেখ্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের, একখানি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের, তিনখানি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের এবং একখানি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের। সময়ের পরম্পরা হিসাবে ঐ ছবিগুলির রেখাচিত্র মাত্র অঙ্কন করিতেছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় আমরা বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রথম উপনীত হই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ; সেদিন দোলপূর্ণিমা। রাত্রি আটটা-নয়টায় শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয় বলরাম-মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন রাম, মনোমোহন, রাখাল, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণ ঠাকুরকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতেছেন, সকলেই হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে মত্ত হইয়াছেন। কয়েকটি ভক্তের ভাবাবস্থা হইয়াছে। নৃত্যগোপালের

বক্ষঃস্থল রক্তিমবর্ণ, রাখালের দেহ ভূমিতে অবলুণ্ঠিত—তিনি ভাবাবিষ্ট ও বাহ্য সংজ্ঞাহীন। ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত দিয়া বলিতেছেন, "শান্ত হও, শান্ত হও"। মাষ্টার মহাশয়ের মতে রাখালের এই প্রথম ভাবাবস্থা। পরে ভক্তেরা যখন বারান্দায় প্রসাদ পাইতে বসিলেন, তখন দাসের ন্যায় বলরাম করজোড়ে একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দেখিলে মনে হয় না যে, তিনি বাড়ির কর্তা; এমনি ছিল তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচেন' দীনভাব। সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুর বলরামের আহ্বানেই ঐ গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের নিকট পূর্বমুহূর্তে সংবাদ পাইয়া এবং তাঁহারই নির্দেশে মাষ্টার মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা প্রথম দিককার কথা। পরে ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহুবার সেখানে আসিয়াছিলেন এবং ভক্তেরাও তখন মুখে মুখে সংবাদ পাইয়া স্বেচ্ছায় অথবা বলরামের নিমন্ত্রণে সাগ্রহে সেখানে উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত 'কথামৃত'-কার উল্লেখ করিয়াছেন যে, এইভাবেই মহাকবি গিরিশচন্দ্র বলরাম-মন্দিরে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত প্রথম আলাপ করেন। বস্তুতঃ ইহা প্রথম আলাপ হইলেও প্রথম সাক্ষাৎকার নহে, ইহা দ্বিতীয় দর্শন। তিনি ঠাকুরের প্রথম দর্শন পাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুর বাড়িতে। দ্বিতীয় দর্শন সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নিজে রামকৃষ্ণ মিশনের এক সভায় যাহা পাঠ করিয়াছিলেন তাহার মর্মার্থ:

"ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষ্যে ভক্তচূড়ামণি বলরাম পল্লীর অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশও নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, যোগী ও পরমহংসেরা কাহারও সহিত কথা বলেন না; এবং কাহাকেও নমস্কার করেন না, তবে কেহ সাধ্যসাধনা করিলে পদসেবা করিতে দেন মাত্র। এই পরমহংস কিন্তু তাহার বিপরীত। ইনি সাগ্রহে বন্ধুভাবে কথা বলেন, আর দীনভাবে ভূমি স্পর্শ করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করেন। পৌরাণিক চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত নাট্যকার দেখিলেন, বাস্তবের নিকট কাল্পনিক চিত্র যেন কেমন মলিন হইয়া গেল—তিনি চমকিত হইলেন। কিন্তু সেই চকিত দর্শন পরিচয়ে পরিণত হইল না! সেইদিন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা ২য় ভাগ—২৫৫ পৃঃ)

সময়-পরম্পরায় কথামৃতে পরবর্তী উল্লেখ পঞ্চম ভাগের ১৮ পৃষ্ঠায়, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বর। ঠাকুর গড়ের মাঠে উইলসনের সারকাস দেখিতে গিয়াছিলেন এবং আট আনার অর্থাৎ সর্বশেষ শ্রেণীর বেঞ্চির উপরে বসিয়া আনন্দে বলিয়াছিলেন, "বাঃ, এখান থেকে বেশ দেখা যায়!" পরে গাড়িতে চড়িয়া তিনি মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ভক্তের সহিত বলরাম-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

ঠাকুর দোতলায় বৈঠকখানায় বসিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গে বলিলেন, "এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। গৌর-নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আচণ্ডালে কোল দিলেন। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্যজাতি ভক্তি থাকলে পবিত্র হয়।" সেদিন তিনি সংসারীদের জীবনের কথাও বলিয়াছিলেন: "তারা যেন গুটিপোকা। মন করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে; কিন্তু অনেক যত্ন করে গুটি তৈয়ার করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না। তাতেই মৃত্যু হয়।" আর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন—ঘুনির মধ্যে মাছের, "যে পথ দিয়ে ঢুকেছে সে পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু জলের মিষ্ট শব্দ আর অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে; বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে না।...দু একটা দৌড়ে পালায়; তাদের বলে

মুক্ত জীব।" মায়া ও সংসারের বর্ণনাত্মক দুইটি গানও তিনি গাহিয়াছিলেন; আর ভাবভক্তিহীন হইয়া সাধুসঙ্গ করার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার জন্য। সাধুরা গাঁজা খায় কিনা, তাই তাঁদের কাছে এসে গাঁজা সেজে দেয়, আর প্রসাদ পায়।"

তারপর চতুর্থ ভাগের ১৬-১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিলের ঘটনা। সেদিন সকালে আসিয়া ঠাকুর বলরাম-ভবনেই দ্বিপ্রহরে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন ঠাকুরের আগ্রহে ও বলরামের নিমন্ত্রণে নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এবং আরও দুই একটি ভক্ত সেখানে আহার করিয়াছেন। আহারান্তে বৈঠকখানায় উত্তরপূর্বের ঘরে বসিয়া আলাপ হইতেছে। ঠাকুরের আদেশে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেদিন অনেকগুলি গান গাহিয়াছিলেন, ভবনাথও গাহিয়াছিলেন। গানের পর নরেন্দ্রনাথ যখন সহাস্যে বলিলেন যে, ভবনাথ পান-মাছ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন ঠাকুর সকৌতুকে বলিলেন, "সে কি রে! পান-মাছে কি হয়েছে! ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।" ঠাকুরের শিক্ষাপ্রদ রসিকতায় একটি দৃষ্টান্ত সেদিন পাওয়া গিয়াছিল। ভবনাথের সহিত কথা শেষ করিয়া তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাখাল কোথায়?" তখন উত্তর পাইলেন "আজ্ঞা, রাখাল ঘুমুচ্ছেন।" ইহাতে ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "একজন মাদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে বসেছিল। যাত্রার দেরি দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন উঠলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে।"

বিকালে চারিটার সময় ঠাকুর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে আসিয়া বসিলে কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত হইলেন। একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়ের 'পঞ্চদশী' দেখা আছে?" ঠাকুর উত্তর দিলেন 'ওসব একবার প্রথম প্রথম শুনতে হয়—প্রথম প্রথম একবার বিচার করে নিতে হয়। তারপর

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিনী শ্যামা মাকে।
মন তুই দেখ্ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ না দেখে।"

তিনি আরও বলিলেন—"শাস্ত্র শুধু পড়লে হয় না। কামিনী-কাঞ্চন থাকলে শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়।

"সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত।
কালার পীরিতে পড়ে সব হইল হত।"

(সকলের হাস্য)।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন আমরা আর একবার বলরাম-ভবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যদর্শন পাই। সেদিন শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাড়িতে তিনি মনোহর সাঁই কীর্তন শুনিতে যাইবেন এবং পরে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের গৃহে কথকতা শুনিবেন। অধর-ভবনে যাইবার আগে তিনি বলরাম-গৃহে শুভাগমন করিলেন এবং সেখানে ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন, 'মা, একি দেখাচ্ছ! থাম; আবার কত কি! রাখাল-টাখালকে দিয়ে কি দেখাচ্ছ? রূপ-টুপ সব উড়ে গেল। তা মা, মানুষ তো কেবল খোলটা বই তো নয়! চৈতন্য তোমারই। মা, ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা মিষ্ট রস পায় নাই। চোখ শুকনো, মুখ শুকনো! প্রেমভক্তি না হ'লে কিছু হ'ল না।" (৫ম ভাগ, ৪৮ পৃষ্ঠা)। সেদিনকার লীলা অতি অল্পকাল-ব্যাপী; অতএব কথামৃতের চিত্রও ক্ষুদ্র, যদিও উহা ভাবগম্ভীর।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুনের ছবিখানিও অনুরূপ ক্ষুদ্রায়তন; কিন্তু ইহারও সৌন্দর্য অনুপম। ঠাকুর সেদিনও বলরামভবনে ভাবাবিষ্ট। পার্শ্বে মাস্টার এবং রাখাল বসিয়া আছেন। ভাববিহ্বল ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ, আন্তরিক ডাকলে স্বস্বরূপকে দেখা যায়! কিন্তু যতটুকু বিষয়ভোগের বাসনা থাকে, ততটুকু কম পড়ে যায়।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, "দেখ, সকলেরই আত্মদর্শন হতে পারে।" ক্রমে অবতার-

লীলার কথা উঠিল। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, " 'নিত্য' দর্শনের পর নিত্য থেকে লীলায় এসে থাকতে হয়—ভক্তি ভক্ত নিয়ে। এইটি পাকা মত। তাঁর নানা রূপ, নানা লীলা—ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎ-লীলা। তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন—প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য। দেখ না চৈতন্যদেব। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেমভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্তলীলা। কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর। অবতার গাভীর বাঁট।" (৫ম ভাগ ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা)

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগস্টের লীলাও স্বল্প-কালস্থায়ী। সেদিনও ঠাকুর বলরামের বাটীতে আসিয়াছেন। সেখান হইতে অধরের বাটীতে কীর্তন শুনিতে যাইবেন। বলরামবাবুর গৃহে পদার্পণ করিয়া তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গে বলিলেন, "অবতার লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকেন। যেমন ছাদে উঠে সিঁড়িতে আনাগোনা করা।" কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "বাগানের মালিককে খোঁজা, আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করা—এইটেই কাজ। ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য।" (৫ম ভাগ, ৬৯ পৃষ্ঠা)

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার দিনে শ্রীযুক্ত বলরামবাবুর বৈঠকখানায় ভক্ত-পরিবেষ্টিত আনন্দময়মূর্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের নয়নাভি-রাম পুনর্দর্শন আমরা পাই। রথের দিনে এবং পুনর্যাত্রার দিনে ছোট একখানি রথ দোতলায় বহির্বাটীর চকমিলানো বারান্দায় চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভক্তগণ নৃত্য-গীতাদিসহকারে রথের অগ্রপশ্চাতে চলিতেন। আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে এইরূপ একটি রথযাত্রার বিবরণ দিতেছি, "সকলই ভক্তির ব্যাপার। বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই। বাড়ী সাজানো, বাদ্যভাণ্ড, বাজে লোকের হুড়াহুড়ি, গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি—এ সবের কিছুই নাই। ছোট একখানি রথ বাহির বাটীর দোতলায় চকমিলানো বারান্দার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত, একদল কীর্তনিয়া আসিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিত, আর ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণ ঐ কীর্তনে যোগদান করিতেন। কিন্তু সে আনন্দ, সে ভগবদ্ভক্তির ছড়াছড়ি, সে মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য—সে আর অন্যত্র কোথা পাওয়া যাইত? সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ ৺জগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে আবির্ভূত—সে অপূর্ব দর্শন আর কোথায় মিলিবে? সে বিশুদ্ধ প্রেমস্রোতে পড়িলে পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া নয়নাশ্রুরূপে বাহির হইত—ভক্তের আর কি কথা! এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কীর্তনের পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পাইতেন। এবং পরে অনেক রাত্রে এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিত, এবং ভক্তেরা দুই চারিজন ব্যতীত যে যার বাটীতে চলিয়া যাইতেন।" (গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২৮৭ পৃঃ)

এইটুকু ভূমিকার পর আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে বর্ণিত (৪র্থ ভাগ, ১৮৮ পৃঃ) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের উল্টারথের দিনেই ফিরিয়া যাই। সেদিন বৈঠকখানায় ঠাকুরের পার্শ্বে বসিয়া আছেন—রাম, মাস্টার, বলরাম, মনোমোহন, কয়েকটি ছোকরা-ভক্ত, বলরামের পিতা প্রভৃতি। বলরামের পিতা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। আপনমনে আপনভাবেই থাকেন। পরমত-সম্বন্ধে উদারতা প্রকাশের অবকাশ নাই। ঠাকুরকে দর্শন করাইবার জন্য বলরাম নিজের পিতৃ-দেবকে পত্রের উপর পত্র লিখিয়া বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছেন। বলরামের পিতাকেই প্রধানতঃ উদ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।···যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই

একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই একতে লয়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ।··· বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। তাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।··· সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণবশাস্ত্রেও আছে, কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।" (ঐ ১১৯-২০ পৃষ্ঠা)

ঠাকুর বারান্দার দিকে গিয়া আবার ঘরে ফিরিলেন এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরের ৬।৭ বৎসরের কন্যার সহিত রসিকতা করিয়া গান গাহিলেন, সকলেই হাসিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের ছেলেবেলার সরলতার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "পরমহংস বালকের ন্যায়—আত্মপর নাই, ঐহিক সম্বন্ধেও আঁট নাই। রামলালের ভাইও (শিবু) একদিন বলেছিল, 'তুমি খুড়ো না পিসে ?' পরমহংসের বালকের ন্যায় গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে। কোথায় যাচ্ছে, কোথায় চলছে, হিসাব নাই।" (১২২ পৃঃ)

ঠাকুরের নির্দেশমত বলরাম ঐ দিন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর অন্তঃপুরে গিয়া ৺জগন্নাথ দর্শনান্তে আবার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলে পণ্ডিত শশধর দুই একজন সঙ্গীর সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুর পণ্ডিতকে বলিলেন, "জ্ঞানের চিহ্ন—প্রথম শান্ত স্বভাব, দ্বিতীয় অভিমানশূন্য স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণই আছে।· জ্ঞানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্মস্থলে—যেমন লেক্‌চার দিবার সময় সিংহতুল্য, স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসপণ্ডিত। বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা—যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ।" (ঐ ১২৬-২৮)

পরে স্বয়ং গান গাহিলেন ও বৈষ্ণবচরণের গান শুনিতে শুনিতে তিনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গ হইলে আরও একটু কথাবার্তার পর ছোট রথখানি বারান্দার উপর আনা হইল। ঠাকুর রথের দড়ি ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ টানিলেন ; একটু পরে গান ধরিলেন,

"যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে,
তারা, তারা দুভাই এসেছে রে।"

গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরাও তাহাতে যোগ দিয়াছেন এবং বৈষ্ণবচরণও নিজের সম্প্রদায়ের সহিত উহাতে মিলিত হইয়াছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারান্দা পূর্ণ হইয়া গেল। মেয়েরাও নিকটস্থ ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ দেখিতেছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ঠাকুর সকলের সহিত বৈঠকখানায় গিয়া আবার ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর সেই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন, তাই তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া জলযোগ করানো হইল। জলযোগান্তে বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনর্বার কীর্তনে যোগ দিলেন ও পরে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। (ঐ ১২৯-৩১ পৃষ্ঠা)।

এই প্রসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গের একটি বিবরণের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঐ গ্রন্থের গুরুভাব-উত্তরার্ধের ২৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে যে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৺জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ঠন্‌ঠনিয়ায় ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া অপরাহ্নে পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যান। সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত বলরামবাবুর বাটীতে রথোৎসবে যোগদান করেন এবং ঐ রাত্রি সেখানে কাটাইয়া পরদিন প্রাতে কয়েকটি ভক্ত-সঙ্গে নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরেন।

কথামৃতের বর্ণনানুসারে কিন্তু ইহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের পুনর্যাত্রার ঘটনা। এই বিষয়ে ৪র্থ ভাগ ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তবে পার্থক্য এই যে, কথামৃতের মতে ঠাকুর ঐ রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন, লীলাপ্রসঙ্গ-মতে পরদিন। ইহা ১৮৮৪ অথবা ১৮৮৫

খৃষ্টাব্দের ঘটনা হউক বা উভয় বৎসরের বিভিন্ন ঘটনার একত্র মিলনের ফলেই হউক 'লীলাপ্রসঙ্গে' উল্লিখিত আছে যে, শ্রীশ্রীঠাকুর রথযাত্রার পরদিবস নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কালে দুইটি স্ত্রী-ভক্তও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। স্ত্রীভক্ত দুইজনের নামোল্লেখ নাই। তথাপি বর্ণনার ভঙ্গি হইতে স্বতই মনে হয় ইঁহারা শ্রীযুক্তা যোগীন-মা ও গোলাপ-মা।

নৌকা প্রস্তুত আছে জানিয়া ঠাকুর অন্তঃপুরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম করিতে গেলেন এবং স্বয়ং পুরনারীদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া গোঁ-ভরে বাহিরে আসিলেন। অপর স্ত্রীভক্তেরা অন্দরমহলে থাকিয়া গেলেও একজন যেন আত্মহারা হইয়া ঠাকুরের সহিত বাহির মহলে আসিয়া পড়িলেন। ঠাকুরের দৃষ্টি হঠাৎ ঐ দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি দাঁড়াইলেন এবং "মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী" বলিয়া বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-ভক্তটি তাঁহার চরণে প্রতি-প্রণাম করিলে ঠাকুর বলিলেন "চ না গো চ।" সেই আকর্ষণে যোগীন-মা অন্দরমহলে খবর দিয়াই দ্রুত দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। তিনি যাইতেছেন দেখিয়া গোলাপ-মাও তাঁহার সঙ্গ লইলেন। (ক্রমশঃ)

স্বামীজীর কবিতার পটভূমি

অধ্যাপক শ্রীপ্রণব ঘোষ, এম্-এ

শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন করে মহাবিস্ময়ে অর্জুন বলেছিলেন—

> অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
> পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

"আমি দেখছি তোমার আদি-মধ্য-অন্তহীন রূপ, অনন্তবীর্য তুমি, অনন্ত তোমার বাহু, চন্দ্রসূর্য তোমার দুই নেত্র, মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ, আপন তেজে তুমি নিখিল জগৎ সন্তপ্ত করে তুলেছ। হে বিষ্ণু, নভস্পর্শী অনেকবর্ণ তেজোময় তোমার ব্যাত্ত মুখমণ্ডল আর দীপ্ত বিশাল নেত্র দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত, দূরে গেছে আমার ধৈর্য ও শান্তি। মরণের আহ্বানে যেমন করে পতঙ্গেরা মহাবেগে ছুটে চলে প্রদীপ্ত অগ্নির অভিমুখে, তেমনি এই সকল প্রাণী মৃত্যুর জন্যই তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করতে চলেছে।" (গীতা ১১।১৯, ২৪, ২৯)

জগৎ-কারণের এই মহাকালমূর্তির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য অর্জুনের মনকে অভিভূত করে প্রশ্ন তুলেছিল—"আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো" (উগ্রমূর্তি—কে আপনি আমায় বলুন)। উত্তর এল—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ—আমি লোক-ক্ষয়কারী কাল! তুমি যদি যুদ্ধ নাও কর, তবু বিপক্ষদলে যে বীরেরা আছেন তাঁরা কেউ বেঁচে থাকবেন না।" "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।"—অতএব, তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, যশোলাভ কর এবং শত্রুবর্গকে পরাজিত করে নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্যভোগ কর।

বৃন্দাবন ও কুরুক্ষেত্র—এ দু'য়ের পটভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন পূর্ণাঙ্গ। মনে হয়, চিরায়ত-সাহিত্যেরও এই লক্ষণ; জীবন ও মৃত্যু, প্রেম ও বৈরাগ্য, কুসুম ও বজ্র সেখানে পাশাপাশি দেখা দেয়। তা না হলে জীবনের পরিপূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না। অবশ্য—"রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুরূপা এলোকেশী।" কিন্তু রুদ্রের তো বামমুখও আছে। মঙ্গল ও অমঙ্গল—এ দুয়ের মধ্য দিয়েই ভগবান আত্মপ্রকাশ

করেন। দুঃখ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়, দুঃখের মুখোমুখি হয়েই তার অন্তরালে দুঃখমূর্তি ভগবানকে চিনে নিতে হবে।* তাই জীবনের বেদনা, ব্যর্থতা, সংগ্রামের উপরে মানবাত্মার জয়-ঘোষণাই স্বামীজীর কবিতার ব্যঞ্জনা। "তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ"—"জাগো বীর"—এই তাঁর কবিতার মূল সুর, এর ছন্দ "প্রাণ" এবং দেবতা "মহাকালী।"

বাংলার ঐতিহ্যে অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনের মতো ব্যাপ্ত সমগ্রানুভূতি দেখা দিয়েছিল তন্ত্রের ধ্যানে। বাংলা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ উনিশ শতকের আগে বৃন্দাবন লীলার বাইরে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই তাঁর জীবন কাহিনী পুনরালোচনা করে, সমগ্র শ্রীকৃষ্ণজীবনকে আমাদের মানসলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকে তন্ত্রের সাধনার মধ্য দিয়ে বাঙালী পরমাশক্তির ধ্যান করে এসেছে—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গ-বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃপাণিকাং॥ ২

দুর্গা, চণ্ডী ও কালিকামূর্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি ও সংহাররূপা জগজ্জননীর পালনীশক্তির উদ্দেশে বাঙালী-হৃদয় যুগ যুগ ধরে প্রণাম জানিয়েছে। একদিকে বৈষ্ণব সাধনা, অন্যদিকে শাক্ত সাধনার যুগ্ম ধারায় বাঙালী-হৃদয় অভিসিঞ্চিত।

অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে যাঁরা মানবকল্পনার ইতিহাস লক্ষ্য করে থাকেন, তাঁরাও বাঙালীর এই কালিকাপূজার মধ্য দিয়ে একটি নূতন সত্যের ইঙ্গিত পাবেন। মাধুর্যমণ্ডনের দিকে বাঙালী মনের সহজাত প্রবণতা রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখ-দহনের মধ্য দিয়ে জীবনের পূর্ণতর সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টাও তার জাতীয় ঐতিহ্য। দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠের মূলকারণটিও এইখানে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যেও আমরা জীবনানুভূতির সকল বিকাশে পরম সত্যের প্রকাশকেই অনুভব করতে চেয়েছি। আমাদের কালিকামূর্তি একদিকে খড়্গ-মুণ্ডধরা বিভীষণা, আর একদিকে বরাভয়করা অপরূপা।

ভগবানের এই মাতৃরূপ-বন্দনার পিছনে আমাদের অতীত ইতিহাসের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা অথবা পারিবারিক জীবনে মায়েদের প্রাধান্য নিশ্চয় কাজ করেছে। তাই আমাদের কবি দেখতে পেয়েছেন—'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি!' এই মাতৃ-সাধনার অগ্রদূত কবি রামপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবকে সূচিত করে গিয়েছেন আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি যেমন 'চৈতন্য'-ভাবনার পরিমণ্ডল রচনা করে গিয়েছিলেন, রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতির গানে তেমনি 'রামকৃষ্ণ'-ভাবনার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকে এই সংগীতের ব্যাকুলতা সাধনার মন্ত্রবলে মূর্ত হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তারপর একে একে সকল মতের পথ পরিক্রমা শেষ করে অদ্বৈতজ্ঞানের সঙ্গে দ্বৈতজ্ঞানের রাখীবন্ধন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের একটি মাত্র দিক—নিরাকার-সাধনার দিক—শিক্ষিত-সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। অদ্বৈতজ্ঞানের আলোকে সাকার থেকে নিরাকারে, আবার নিরাকার থেকে সাকারে—'ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'-র পরিপূর্ণতা এনে দিলেন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী। ভগবানের অনন্ত বৈচিত্র্যকে যাঁরা বুদ্ধির নিগড়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁরাও অনন্তলীলাময়ের

* ...God manifests through evil as well as through good......the true attitude of mind and will, that are not baffled by the personal self, was in fact that determination, in the stern words of the Swami Vivekananda, to seek death, not life, to hurl oneself upon the sword's point, to become one with the Terrible for evermore. (The Master as I saw Him—Sister Nivedita.)

মাতৃসত্তাকে প্রণাম জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আসবার পর থেকে।

এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে গীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতিপ্রিয় সঙ্গীতগুলি স্মরণীয়: যেমন—'আমায় দে মা পাগল করে', 'চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় হে', 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি', 'অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী'। সাকার নিরাকার বোঝাতে গিয়ে অপূর্বসুন্দর উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিয়ে দিলেন—"আমি শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মত হলো। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ; অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনও বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মত হ'ল।"

(আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী)

সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রেই জানেন গভীর অনুভূতি বাক্যমনের অগোচর—'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্।' আমরা তার আভাস পাবার চেষ্টা করি মাত্র। সুতরাং অনুভূতির কোন মৌল সত্যই সাহিত্যানুরাগীর কাছে উপেক্ষণীয় হ'তে পারে না; অধ্যাত্ম অনুভূতি তেমনি একটি সাহিত্যিক উপাদান—শ্রেষ্ঠ এবং দুষ্প্রাপ্য উপাদান। কেবল যে প্রাচীন কালের সাহিত্যেই এই উপাদান পাওয়া যায় তা নয়, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায়ও এর কম বেশি অনুরণন কান পাতলেই শোনা যায়। অধ্যাত্ম-চেতনাপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথই অগ্রগণ্য। তাঁর পরেও রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ, কালিদাস রায়, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নজরুল ইস্‌লাম, দিলীপকুমার রায়, নিশিকান্ত এবং অমিয় চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কল্পনালব্ধ সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতির পার্থক্য থাকবেই।

এই অধ্যাত্ম অনুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরে কতখানি প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে ধরা দিয়েছিল, তার সাক্ষ্য রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পাঁচটি খণ্ডে। তা ছাড়া আরো বহু জনের স্মৃতিতে তাঁর বাণী চিরমুদ্রিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিতে পাই—"একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল, 'মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না'। তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন'।" এই অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়ে তিনি সমাধিমগ্ন হতেন, সমাধি থেকে অভ্যুত্থানের সময় নানা উপমা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে অসীম-রাজ্যের সংবাদ পৌঁছে দিতে চাইতেন, সসীম-রাজ্যের কানে।

নরেন্দ্রনাথের সন্দিগ্ধ জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবদুপলব্ধির নিশ্চিন্ত অভিজ্ঞান তুলে ধরতে পেরেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্রনাথের অন্তরের দ্বার চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু পদে পদে সংশয়, সঙ্কট ও জিজ্ঞাসার ক্ষুরধার পথে নরেন্দ্রনাথকে বিচরণ করতে হয়েছে। অবশেষে একদিন যখন তিনি মহাজীবনের মোহনায় এসে ভূমা-সমুদ্রে মিশে যেতে চাইলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন—"কোথায় কালে বটগাছের মত শত শত লোককে শান্তির ছায়া দিবি, তা না, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্; এত ছোট আদর্শ তোর!" কিন্তু তবু অনুভূতির স্পর্শ চাই—তা না হলে কল্যাণকর্মের পরিপূর্ণ প্রেরণা জাগে না। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের ব্যাকুল অনুরোধে শেষ অবধি সম্মতি দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—"আচ্ছা যা, নির্বিকল্প সমাধি হবে।"

'একদিন সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক জড়পুঞ্জ যেন মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল; দেশ-কাল-নিমিত্তের পরপারে অবস্থিত নিজবোধস্বরূপ আত্মা স্ব-মহিমায়

বিরাজ করিতে লাগিলেন। ......বহুক্ষণ পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহার মন ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে কামশূন্য হইলেও একটা অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যজগতে নামাইয়া লইয়া আসিতেছে। অনুভব করিলেন, "বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায় কর্ম করিব, অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিব" এই মহতী কামনার সূত্র ধরিয়া তাঁহার মন নির্বিকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল।'*

ব্রহ্মকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে তিনি সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শন করলেন। উচ্চারিত হ'ল নবযুগের নূতন মন্ত্র—"পড়েছ—'মাতৃদেবো ভব', 'পিতৃদেবো ভব', আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব' : দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।' 'And may I be born again and again, and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum-total of all souls.

অপরোক্ষানুভূতির গভীরতম গুহা থেকে মন্দ্রিত হ'ল 'প্রলয় বা গভীর সমাধি'র সুর :

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত না থেকে সে ধারা নেমে এল বিশ্বজনের সেবামন্ত্র নিয়ে—

ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর, সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।
(সখার প্রতি)

বেদান্তের এই কর্মপরিণত রূপদানই মানবাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। সমাধিলোক থেকে নেমে এসে যাঁরা মানবকল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করবেন তাঁরা সংখ্যার দিক থেকে মুষ্টিমেয়। সাধারণ মানুষ সেই উচ্চতম অধ্যাত্ম-সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যেই নিষ্কাম সেবাব্রত গ্রহণ করতে পারে। এই সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে পার্থিব সত্যের সঙ্গে অপার্থিব সত্যের যোগসূত্র স্থাপন করা চলে। সুতরাং নবযুগের বেদান্ত-সাধনা ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার গুহা ছেড়ে সর্বমানবের কল্যাণব্রত গ্রহণ করলো। এই সাধনার ইতিহাসই স্বামীজীর জীবনের পটভূমি।

*　　*　　*

স্বামীজীর কবিতা আলোচনার আগে তাঁর মনন-ধারার উৎস সম্বন্ধে আলোচনায় এতক্ষণ নিবিষ্ট ছিলাম। এবারে তাঁর সময়কার বাংলা কাব্য ও কবিতার প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন।

মধুসূদনের আবির্ভাব যে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কত বড় যুগান্তর—সেকথা তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মনীষী-মাত্রেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 'মেঘনাদ-বধ-কাব্য'কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেকালের সেরা মনীষিবৃন্দ। রাজনারায়ণ বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহারথীদের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু একদিকে এই অভিনন্দনের সমারোহ থাকলেও গতানুগতিকতা-পরায়ণ পণ্ডিত-সমাজে এ কাব্যের নিন্দারও অবধি ছিল না। "ছুছুন্দরী-বধ"—রচনা করে জগবন্ধু ভদ্র যে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছিলেন সেটি আসলে বাঙালী জাতির আত্মব্যঙ্গ। সবচেয়ে আশ্চর্য এই, কিশোর রবীন্দ্র-

* বিবেকানন্দ চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (পৃঃ ৭৭-৭৮)

নাথও 'মেঘনাদবধকাব্যে'র চেয়ে 'বৃত্রসংহারকাব্য'কে বড় স্থান দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যে মত বদলেছিলেন তাতে এই প্রমাণিত হয় যে, মেঘনাদবধকাব্যের রস উপলব্ধি করতে হলে পরিণত মনের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালি-গালাজ।" (জীবনস্মৃতি)

পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে মেঘনাদবধকাব্যের অভিনবত্ব ধরা পড়েছিল এইভাবে—"মেঘনাদবধ-কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। ···তিনি (মধুসূদন) স্বতঃস্ফূর্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। ···এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। ··যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন-মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

এখন মেঘনাদবধকাব্য সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত স্মরণ করা যাক্। মধুসূদন-প্রসঙ্গে তিনি বলে-ছিলেন—"ঐ একটা অদ্ভুত genius (মনস্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙালা ভাষাতে ত নাই-ই; সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।" ···"তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই, তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল করে দেখ্, লোকটা কি বলছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হ'ল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধকাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কি না ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হ'ল! তা যত পারিস লেখ্ না, তাতে কি? কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব criticদের (সমালোচক-দিগের) মত ও লেখা কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায়, যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝবে?"

মেঘনাদবধকাব্যের কোন্ অংশটি স্বামীজীর সবচেয়ে প্রিয় ছিল, তাও এক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য—"যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী শোকে মুহ্যমানা হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য বহির্গমনোন্মুখ—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা। 'যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি ভুলবো না, এতে দুনিয়া থাক, আর যাক'—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ওই অংশ লিখেছিলেন।"

মেঘনাদকাব্যের সপ্তম সর্গের ওই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃতির যোগ্য—

> রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষকুলপতি;—
> হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
> চৌদিকে রথীন্দ্রদল! বাজিছে অদূরে
> রণবাদ্য; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
> অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
> হেনকালে সভাতলে উতরিলা রাণী
> মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
> আকুলা কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে
> সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।

যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরী?

বাঙ্গালীর জাতীয় আদর্শে এমন একটি বলিষ্ঠ প্রতিজ্ঞার সেদিন প্রয়োজন ছিল। আত্মবিশ্বাস—বিবেকানন্দ-জীবনের ভিত্তিভূমি। সমগ্র জাতির জীবনে তিনি এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

বেদান্তের আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠা স্বামীজীর মনে যে বলিষ্ঠ আশাবাদ সঞ্চার করেছিল, তার সঙ্গে এসে মিশেছিল দেশপ্রেমের দীপ্তি। বস্তুতঃ যা কিছু চলন্ত ও জীবন্ত তার মধ্য দিয়েই তিনি ব্রহ্মের প্রকাশ দেখতে পেতেন। পত্রাবলীতে তাই তিনি লিখেছেন"—যদি জন্মেছ ত' একটা দাগ রেখে যাও।" "Avalanche-এর মত ছুনিয়ার উপর পড়—ছুনিয়া ফেটে যাক চড়চড় করে···।" তাই মেঘনাদবধকাব্য স্বামীজীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার পরিচয় আছে তাঁর কবিতার ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে।

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে বিবেকানন্দের তরুণ-বয়সে মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট কবিদের কাব্যে বীররসের প্রেরণাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখনকার নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ কবিদের কাছে উৎসাহ ও প্রেরণার দাবি ক'রত। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাসত্রয়ী (আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম) এবং নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যত্রয়ী (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) জাতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবনেরই সাহিত্যিক প্রকাশ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে হিন্দুমেলার জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন 'পুরুবিক্রম', 'অশ্রুমতী' 'সরোজিনী' প্রভৃতি নাটক লিখে চলেছেন। কাব্যে নাটকে উপন্যাসে—বাংলাসাহিত্যের পরিমণ্ডলে সর্বত্র তখন পরাধীনজাতির নব-উৎসাহ-সঞ্জাত বীরত্ববোধই স্থায়ী ভাব। বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে এই স্থায়ী ভাবের সঙ্গে এসে মিলেছে তাঁর দৃপ্ত-পৌরুষে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

মানুষ হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনা-বোধ এবং জাতিগত দিক থেকে অপরিমেয় দৈন্য-দুর্দশার উপলব্ধি তাঁর অনুভূতিকে স্পন্দিত করেছে। আবার আত্মস্বরূপে অচল প্রতিষ্ঠার ফলে সর্ববন্ধন-মুক্ত আত্মার জয়ঘোষণা তাঁকে দেশকালের ঊর্ধ্বে সর্বমানবের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করে তুলেছে। জীবনরহস্যের আলোছায়াসম্পাতে বিবেকানন্দের মানসতরঙ্গ তাই এত সুন্দর, এত মহনীয়।

তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা বলতে জীবনের লাভ ক্ষতির সূক্ষ্ম অংশভাগের কথা বলছি না। সেই বেদনার কথাই বলছি যে বেদনায় সকল যুগের সব মহামানবই আলোড়িত হয়েছেন, যে বেদনার বশে স্বামীজী বলেছিলেন—"যতদিন এ দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততদিন আমার মুক্তি চাই না। সেদিন অলক্ষ্যে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় হাসি বিবেকানন্দের হৃদয়-আকাশকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের আগে রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করে ভবিষ্যৎ ভারতকে এই দুই সভ্যতার মিলনকেন্দ্ররূপে গঠন করবার কল্পনা বোধ করি স্বামীজীরই প্রথম। এই

বিশ্ব পরিক্রমার ফলে বিবেকানন্দের কবিতাও সর্ব দেশের সর্ব মানবের বাণী বহন করে এনেছে; সমগ্র মানবজাতি তাঁর কবিতার উদ্দিষ্ট পাঠক।

(৩)

ভাব, ভাষা ও ছন্দ—এ তিনটিই ভালো কবিতার ক্ষেত্রে "অপৃথগ্-যত্ন-সম্পাদ্য" অর্থাৎ আলাদা আলাদা ভাবে চেষ্টা করে এদের যুক্ত করতে হয় না। কবিমানস থেকে সৃষ্টির ঘূর্ণাচক্রে এরা এক সঙ্গেই আকার লাভ করে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তার মধ্যেও ব্যক্তির নিজস্ব মানসভঙ্গী কাজ করে বৈকি—তাছাড়া পূর্বপুরুষাগত ঐতিহ্যও অনেকখানি প্রেরণা জোগায়।

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা কবিতার ভাষা ও ছন্দে তাঁর গভীর আবেগের সঙ্গে সঙ্গে অটল সংযমের পরিচয় রয়েছে। বিলম্বিত পয়ার ছন্দে তিনি "সখার প্রতি" ও "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতা দুটি লিখেছেন। এ দুটি কবিতার ভাষায় তিনি সংস্কৃত শব্দের সুচারু প্রয়োগ করেছেন। ঐ শব্দ সম্ভারের দ্বারা বক্তব্যের গভীর গাম্ভীর্যই ধ্বনিত হয়েছে।

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম, সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার॥
(নাচুক তাহাতে শ্যামা)

ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন,—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
(সখার প্রতি)

উপরের এই দুটি উদাহরণেই তাঁর ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য বুঝা যাবে। সংস্কৃত শব্দের সুগম্ভীর ব্যঞ্জনা ও সংস্কৃত ভাষাসুলভ সংযমেই তাঁর বক্তব্য আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। আর এই ছন্দের মধ্যে যে তরঙ্গিত গতি দেখতে পাই,—তা' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। চরণের শেষে নির্দিষ্ট যতি থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্য চলমানতা রয়েছে এই ছন্দে। পয়ারের চরণান্তিক যতি অক্ষুণ্ণ রেখে এমন গতিবেগ সঞ্চারের উদাহরণ সেকালে খুব বেশি ছিল না। ভাষার ক্ষেত্রেও স্বামীজী মধুসূদনের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। যে পৌরুষদৃপ্ত জীবনাদর্শ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল মধুসূদনের কাব্যভাষায় সেই আদর্শের প্রথম প্রকাশ—সে প্রকাশের ফলে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যুগান্তর সূচিত হয়েছিল। মধুসূদনের মহাকাব্যের কল্লোলধ্বনি স্বামীজীর কবিতায় আরও সুগম্ভীর মহিমায় সঞ্চারিত হয়েছে। মিলের প্রতি স্বামীজী যে বেশী মনোযোগী হন নি—তার কারণও ওই অমিত্রাক্ষর।

গিরিশচন্দ্র এই অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে নিয়ে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যে নূতন রূপ দিয়েছিলেন, সেই গৈরিশ ছন্দ 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে প্রযুক্ত। এ কবিতায় যে গীতি-কাব্যের স্পর্শ পাই—ছন্দ ও ভাষা তারই অনুযায়ী। 'সখার প্রতি' ও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'-র মন্ত্রধ্বনি চিরায়ত সাহিত্যেরই উপযুক্ত। 'সৃষ্টি' এবং 'প্রলয়' মূলতঃ গান—কিন্তু এ দুটি গানের কাব্যসৌন্দর্যের তুলনা একমাত্র উপনিষদেই মেলে। স্বামীজীর ইংরেজি কবিতা "Peace" (শান্তি) ঐ গান দুটিরই সমগোত্র।

স্বামীজীর বাংলা কবিতায় যে বলিষ্ঠ দৃপ্তভঙ্গীর পরিচয় পাই, তাঁর ইংরেজী কবিতায়ও সেই মনোভঙ্গীর পরিচয় মেলে। এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে বাংলা কবিতার পটভূমিই আলোচিত হয়েছে। স্বামীজীর ইংরেজী কবিতার পটভূমি মূলতঃ এক হলেও সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্বামীজীর ব্যক্তি-চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রচিত "চৌঠা জুলাইয়ের প্রতি" (To the Fourth of July) কবিতায় তার প্রকাশ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশসাধন তাঁর আন্তরিক আগ্রহের বস্তু ছিল। পত্রাবলীতে তাই তিনি লিখেছেন—"...স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক। স্বাধীনতা

হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অবনতি।" (পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা) To the Awakened India (প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি), The Song of the Free (জীবন্মুক্তের গীতি) প্রভৃতি কবিতায় ভারতবর্ষের ও নিখিল মানবাত্মার চিরস্বাধীন সত্তার জয়গান ধ্বনিত। কিন্তু মুক্তি পথের যাত্রীর হাতে স্বামীজী তুলে দিয়েছেন জীবন-মথিত বেদনাবিষের "পেয়ালা" (The cup) এ কবিতার ঘননিবদ্ধ আঙ্গিক কাব্যোৎকর্ষের দিক থেকেও লক্ষণীয়। "My play is done" (খেলা মোর হলো শেষ) কবিতায় সৃষ্টির উৎসমূলে প্রত্যাবর্তনরত জীবনতরঙ্গের বিলীয়মান ধ্বনিটুকু ফুটে উঠেছে। সমগ্র ইংরেজী ও বাংলাসাহিত্যে তুলনারহিত কবিতা-তাঁর "Kali the Mother" (জননী কালিকা—"মৃত্যুরূপা মাতা")—নবযুগের ঋষিকবির ধ্যাননেত্রে জগজ্জননীর যে চিত্রচেতনাময় রূপ ফুটে উঠেছে তার অপার বিস্ময়রস সাধক ও সাহিত্যিকমাত্রের কাছেই অমূল্য সম্পদ বলে মনে হবে। এর আগে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছি, বিবেকানন্দের কবিতার দেবতা—"মহাকালী"।

"হয়ে বাক্য মন অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।"
(সখার প্রতি)

Kali the Mother কবিতায় বিবেকানন্দের জীবনোপলব্ধির কেন্দ্রচেতনা রূপ পেয়েছে এ কয়টি চরণে—

Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance
To him the Mother comes.

সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।
(মৃত্যুরূপা মাতা—অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

এই সুখদুঃখে সম-অধিষ্ঠাত্রী, জীবনমৃত্যুর লীলা-বিভঙ্গে শাশ্বতরূপিণী, মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে সংস্থিতা। তাই বিবেকানন্দের কাব্যসৃষ্টি, বাংলা কবিতার জগতে এক অভিনব সত্য ও সৌন্দর্যের আদর্শ তুলে ধরেছে,—এ আদর্শ সাহিত্যরসিক পাঠকমাত্রেরই সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে।

নিঃসংশয়

শান্তশীল দাশ

সকলের তরে উতলা আমার মন,
শুধু চঞ্চল হই না তোমার তরে;
তুমি কাছে নাই, পাই নাকো দরশন,
তবু বেদনায় আঁখি-বারি নাহি ঝরে।

তুমি তো আমার বড় আপনার জন,
তবু তো তোমায় পাই নাকো কাছে কাছে;
সকলের সাথে কী নিবিড় বন্ধন,
তোমায় বাঁধার মন্ত্রটি জানি না যে।

কত জন আসে—কত হাসি, কত গান;
ভালবাসাবাসি, শেষ হয় নাকো তার।
তুমি আস নাকো, তবু কই অভিমান
জাগে নাতো মনে, ঝরে নাকো আঁখিধার।

সব শেষ হবে, থেমে যাবে কোলাহল,
নীরব রাতের নির্জন পরিবেশে
দেখা দেবে তুমি ওগো চির চঞ্চল,
বক্ষে আমায় টেনে নেবে ভালবেসে।

সমালোচনা

মায়াবতীর পথে—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি—৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা—৫৩; মূল্য—১৲ টাকা

সম্প্রতি-পরলোকগত গ্রন্থকার বাংলা ১৩২১ সালে হরিদ্বার হইতে হিমালয়স্থিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম দেখিতে যান। আলোচ্য পুস্তকে তাঁহার ঐ ভ্রমণের মনোজ্ঞ বিবরণ বর্ণিত। প্রবীণ জ্ঞানতাপসের তত্ত্বদর্শী মন রচনার ভিতর একটি সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

মহিমবাবু—ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার প্রণীত। লেখক কর্তৃক ৩৯, দেব লেন, ইটালী, কলিকাতা-১৪ (শ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চনালয়) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১১৮; মূল্য—২৲ টাকা

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম অনুজ বহুগ্রন্থপ্রণেতা বিশিষ্ট দার্শনিক শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের (মহিম বাবু) সহিত লেখকের বারো বৎসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের স্মৃতি বর্তমান পুস্তকে লিপিবদ্ধ। কলিকাতা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, পাঞ্জাব, অযোধ্যা এবং আরও কয়েকটি স্থানে মহিমবাবুর সঙ্গ করিবার সুযোগ লেখক লাভ করিয়াছিলেন। বর্ণনাগুলি সুখপাঠ্য। শেষের দশ পাতায় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থাবলীর ও দার্শনিক মতবাদের আলোচনা আছে।

যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ — শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত প্রণীত, প্রকাশক—নবভারতী, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা (ডিমাই) —৪৮৮; মূল্য—সাতটাকা আট আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের জীবন ও চরিত্র চিত্রণে যে মনোযোগ, ধৈর্য, অধ্যয়ন, অন্তর্দৃষ্টি ও মনীষার প্রয়োজন হয় এই বৃহৎ পুস্তকের লেখক তাহার কোনটিরই প্রমাণ দিতে পারেন নাই। স্বামীজীর উপর তাঁহার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাভক্তি নিঃসন্দিগ্ধ, কিন্তু সাহিত্যকীর্তির মাধ্যমে উহার সার্থক রূপায়ণ স্বতন্ত্র কথা। সাময়িক কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাসের আকারে ঐ রূপায়ণের অপচেষ্টা এই বইটিতে দেখিয়া আমরা মর্মপীড়া অনুভব করিলাম। শ্রুতি-মধুর অনেক আধুনিক বাংলা শব্দের সহিত অর্থহীন ব্যাকরণদুষ্ট শব্দের জগাখিচুড়ি লেখকের কাঁচাহাতের পরিচয়কে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

—শ্রদ্ধানন্দ

(১) কিং জ্যোতিঃ? (২) অনাত্ম-শ্রী-বিগর্হনম্ বা ততঃ কিম্—আচার্য শঙ্কর-বিরচিতম্। অধ্যাপক শ্রীদেবকুমার দত্ত কর্তৃক অনূদিত। এ, আই, সি, প্রেস্, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। যথাক্রমে পৃষ্ঠা—২২ ও ১২ এবং মূল্য ॥০ ও ।০ আনা।

(১) শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত পূজ্যপাদ আচার্য শঙ্করের "কিং জ্যোতিঃ?" শিরোনামে একটি মাত্র শ্লোকে সংক্ষেপে বেদান্তের মূল তত্ত্ব প্রকাশিত। কি তোমার জ্যোতি? অর্থাৎ কি তোমার দৃষ্টির সহায়ক? দিবসে সূর্য, রাত্রে চন্দ্র প্রদীপ প্রভৃতি। চক্ষুর সাহায্যেই সূর্যাদি দৃষ্ট হয়; চক্ষু মুদ্রিত করিলে বা চক্ষু না থাকিলে বুদ্ধির সহায়তায় বস্তুজ্ঞান হইয়া থাকে। বুদ্ধি আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত। অতএব আত্মাই পরম-জ্যোতি। এই শ্লোকে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তত্ত্বজ্ঞ গুরু একান্ত অনুগত উপযুক্ত শিষ্যকে অন্য-নিরপেক্ষ সর্বপ্রকাশক স্বয়ংপ্রকাশ আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।

(২) **অনাত্ম-শ্রী-বিগর্হনম্**—মন স্বভাবতই চঞ্চল, চঞ্চল মনকে স্থির করিতে না পারিলে সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সাংসারিক ভোগসুখ, বিষয়-বাসনা, মানযশ—এই অনাত্ম বস্তুগুলি হইতে মন উঠাইতে পারিলে তবেই নিত্য

বস্তু 'আত্মা'র জন্য ব্যাকুলতা আসে। 'অনাত্ম-শ্রী-বিগর্হনম্'—১৮টি শ্লোকের এই পুস্তিকাখানিতে আচার্য শঙ্কর আত্মা-ব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুর ক্ষণ-স্থায়িত্ব প্রতিপাদন করিয়া সাধক-মনকে আত্মাভিমুখী করিতেছেন।

পুস্তিকা দুইটির বাংলা কাব্যানুবাদ প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। আচার্য-শঙ্কর-কৃত প্রকরণ-গ্রন্থগুলি সহজ অনুবাদের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় বেদান্ত জনপ্রিয় হইতেছে—এ বিষয়ে প্রকাশক-গ্রন্থাকারের সাধু প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পথের কথা (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী এম্-এ প্রণীত; প্রকাশক: মেসার্স বি. কে. রায় চৌধুরী এণ্ড সন্স, পোঃ মিহিজাম, জেলা সাঁওতাল পরগনা। পৃষ্ঠা—১৭৯; মূল্য দুই টাকা।

বিবিধ সমস্যাসঙ্কুল বাঙলার অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রধান। মানুষ যদি অন্নচিন্তার দুঃসহ জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পায় তবে নব নব চিন্তায় অন্যান্য সমস্যারও সমাধান করিতে যত্নশীল হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব। বাঙালী যুবকেরা কি উপায়ে স্বাধীনভাবে অন্নসমস্যার সমাধানে ব্রতী হইতে পারে আলোচ্য পুস্তকটিতে তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। শহরমুখী মনোভাব ত্যাগ করিয়া পল্লীতে থাকিয়া পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ অনাবাদী জমিগুলিতে কিভাবে সোনা ফলানো যায়, পাঁক ও পানায় ভরা খাল-বিল-পুকুরগুলির সংস্কার-সাধন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৎস্য-চাষ করিয়া কিরূপে লাভজনক ব্যবসা করা যায়—তাহার নানা তথ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লেখক এই পুস্তকখানিতে পরিবেশন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধসমস্যা, গোপালন, গরুর খাদ্য, ফলের আবাদ, রেশমশিল্প, স্বাস্থ্য ও খাদ্য, কলকারখানা ও জগতের প্রগতি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বহু কথা ইহাতে আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বইটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

—জীবানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩০৭, মূল্য ২।০

স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক রচনা, পত্র, কথোপকথন, বক্তৃতা প্রভৃতি হইতে অনেকগুলি নির্বাচিত অনুচ্ছেদ পর পর নিবন্ধাকারে ছাব্বিশটি বিষয়ানুযায়ী অধ্যায়ে সংগৃহীত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক সামাজিক ব্যক্তিগত জাতিগত নানাপ্রশ্নের সমাধানের সহায়করূপে পুস্তকখানি গ্রথিত।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ১১৯, মূল্য ১।০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত প্রথম 'নিবেদিতা লেকচার'। দিবসত্রয়ে পরিবেশিত বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত। ভগিনী নিবেদিতার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত, তৎসহ যথাস্থানে তাঁহার চিন্তাধারার নূতনত্ব এবং ভারতের মুক্তিসাধনায় তাঁহার দান সম্যগ্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা—স্বামী তেজসানন্দ। প্রকাশক স্বামী বিমুক্তানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃঃ ১৬৮, মূল্য ২৲। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে কয়টি সাধিকার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাঁহাদের কেন্দ্রে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে রাখিয়া গ্রন্থখানি রচিত। বিভিন্ন অধ্যায়ে জননী সারদামণি, রাণী রাসমণি, যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী, গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, গৌরী-মা ও লক্ষ্মী-দিদির জীবন সুন্দর ও তথ্যপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ।

জীবন বিকাস—'জীবন বিকাস' পত্রিকা—নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত নূতন মারাঠী মাসিক পত্রিকা ; প্রতি সংখ্যা ৷৷০, বার্ষিক ৫৲।

জীবনের উচ্চতর মূল্যমান নির্ণয়ের জন্ম অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাব বিকীরণের প্রয়োজন, রামকৃষ্ণ মিশনের এই ভাব মারাঠা-ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচারকল্পে এই নব উদ্যম। আত্মজ্ঞান ও ও সেবার মাধ্যমে মানবের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়া ব্যক্তিগত ও জাতিগত সামগ্রিক উন্নয়নই ইহার লক্ষ্য। ইহাতে খ্যাতনামা মারাঠী-লেখক-লিখিত ধর্ম দর্শন শিক্ষা সমাজবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সাহিত্য ভ্রমণ ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদপটে দক্ষিণেশ্বরের জ্যোতির্ময় পঞ্চবটীর ছবি তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পাদকীয় সহ ১৭টী প্রবন্ধে কবিতায়, সমালোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, গীতা, কবীর, রাজা রামমোহন রায়, সাহিত্য, সন্তজীবন প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি-উৎসব—গত ১৯শে ফাল্গুন (৩. ৩. ৫৭) রবিবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম শুভ জন্মতিথি-উৎসব বিপুল আনন্দপূর্ণ ও শুচিসুন্দর অনুষ্ঠান-সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ভোর ৪-৩০ মিঃ মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হইলে পর একে একে উপনিষদ্‌পাঠ, চণ্ডীপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা ও হোম এবং দশাবতারের পূজা, 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা, 'কথামৃত' পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিন ভক্তহৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামাধুরী সিঞ্চিত হইতে থাকে। বৈকাল ৪ ঘটিকায় স্বামী বোধাত্মানন্দের নেতৃত্বে এক সভায় স্বামী পুণ্যানন্দ বাংলায় ভাবপূর্ণ ভাষায় ও ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বিবৃত করেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ইংরেজীতে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান সভ্যতার সম্মুখে একটি 'চ্যালেঞ্জ' —তাঁহার শিক্ষার দ্বারাই বর্তমান যুগব্যাধির প্রতীকার হইতে পারে। সভাপতি মহারাজ এই পুণ্য তিথির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইয়া ভারতীয় চিন্তাধারায় সর্বধর্মসমন্বয়ের তাৎপর্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে তাঁহার রূপায়ণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরো বলেন, আধ্যাত্মিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীজাতির জাগরণ একান্ত প্রয়োজন—তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীগুরুগ্রহণ দ্বারা প্রমাণিত। সকাল হইতে প্রায় ৫০ হাজার নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসেন। ভক্তবৃন্দ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া পবিত্র ভাবধারায় বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রায় এগারো সহস্র নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোমের পর রাত্রিশেষে পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ২৯ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ২৪ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ১০ই মার্চ সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এই দিন মন্দিরের পূর্বদিকে গঙ্গাতীরস্থ প্রাঙ্গণে নির্মিত মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ তৈলচিত্র ও তাঁহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। মণ্ডপে ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন কীর্তনের দল সারা দিন ভজন-কীর্তনের দ্বারা উৎসব-ক্ষেত্র মুখরিত করেন। উষাকাল হইতেই সারাদিন ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ এবং ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা বিদ্যুৎ-সহায়ে সম্প্রচারিত হয়। প্রধান মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

বিভিন্ন কার্যে বহু স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত থাকেন। সন্ধ্যারতির পর বাজী পোড়ানো হইলে উৎসবের সমাপ্তি হয়। সারাদিনে পঞ্চাশ হাজার নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ পান, তিন লক্ষের উপর লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বর মঠঃ ব্রহ্মানন্দ-জয়ন্তী—গত ১৯ মাঘ (১লা ফেব্রুআরি) ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ৯৪তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকালে মঙ্গলারতি হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, শ্রীরাম-নামসংকীর্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি অধিক রাত্রি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় স্বামী অসঙ্গানন্দ-প্রমুখ বিভিন্ন বক্তা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপূর্ব ভাগবত জীবন সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। শ্রীমহতাব তাঁহার বাল্যস্মৃতি উদ্‌ঘাটিত করিয়া বলেন, ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পূত সান্নিধ্যে আসেন, সেই সময় পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহাকে শরীর সুগঠিত ও শক্তিশালী করিতে উপদেশ দেন। এই উপদেশের তাৎপর্য তিনি তখন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, পরে তিনি উহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমহতাব তাঁহার আর একটি উপদেশের উল্লেখ করেন, জাতীয় জীবন গঠন করিতে গেলে নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা অপরিহার্য।

বোম্বাইঃ আশ্রম-ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন—গত ২৭শে জানুআরি খার (বোম্বাই) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী স্মারক-ভবনের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। এতদুপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে পূজ্যপাদ মহারাজজী বলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি-স্বরূপা ভারতীয় নারীজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীই রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী কল্যাণ-কর্মের বিগ্রহাধার। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহারই শুভাশীর্বাদে সতত শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিতেন।

স্বামীজীর জন্মোৎসব

দক্ষিণেশ্বরঃ গত ৯ই মাঘ শ্রীসারদামঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব—বিশেষ পূজা, হোম, উপনিষদ্‌পাঠ, চণ্ডীপাঠ এবং ভজনাদি দ্বারা উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত মহিলা-সভায় সভানেত্রী হইয়াছিলেন সুলেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী সরকার, অধ্যাপিকা বেলা দে এবং মঠের ব্রহ্মচারিণীগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভায় প্রায় চারি শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

শিলচর (আসাম): শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ২৭শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত রসময় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী জনসভায় স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী শিবরূপানন্দ প্রভৃতি।

বালিয়াটী (ঢাকা): শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজা পাঠ ও নারায়ণসেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

নিউইয়র্কঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার

স্বামী ঋতজানন্দ প্রতি মঙ্গলবার গীতা ও স্বামী নিখিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন, এবং রবিবারের বক্তৃতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল।

নভেম্বরঃ শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, হিন্দুধর্মে আত্মার ধারণা, প্রকৃত সুখলাভের উপায়, ধ্যানের অভ্যাস।

ডিসেম্বরঃ ভক্তির সাধনা, ঈশ্বরকে খুঁজিও না: তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর, ঈশ্বর যখন দেবমানব-

রূপে আসেন, শ্রীশ্রীমা : ভারতীয় নারীর আদর্শ, কর্ম ও ধ্যান।

জানুআরি : নির্ভয়ে জীবনের সম্মুখীন হও, সাধু-সন্তের ভক্তি, অহঙ্কার জয় কিভাবে হয়? যুক্তি ও ধর্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দ।

এতদ্ব্যতীত ২৫শে ডিসেম্বর: 'খৃষ্ট ও বর্তমানে মানুষের অবস্থা' সম্বন্ধে বক্তৃতার পর খৃষ্টম্যাস-সংগীত সমস্বরে গীত হয়।

সানফ্রান্সিস্কো ঃ উত্তর কালিফর্ণিয়ার বেদান্ত সোসাইটি

স্বামী অশোকানন্দ এবং স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ প্রতি রবিবার (বেলা ১১টায়) এবং প্রতি বুধবার (রাত্রি ৮টায়) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বেদান্তের সাধারণ তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দেন। বিষয়সূচী :—

নভেম্বর : প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মভাব, কর্মের নিয়ম, ঈশ্বরকে খুঁজিও না—তাঁহাকে দর্শন কর, আমাদের কে এরূপ করিয়াছে, শক্তির সাধনা, আত্মার চারি অবস্থা, ঈশ্বর আছেন—তার প্রমাণ, সমাধি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রকৃতি।

ডিসেম্বর : অনাসক্তি কিভাবে আচরণ করা যায়? অহং ও আত্মা, অন্তরে চেতনা ও তাহার জাগরণ, আমার দেখা মহাপুরুষ, মন পবিত্র করা যায় কিভাবে? সত্য ও মিথ্যা জগৎ, ঈশ্বরাবতারের রহস্য, যীশুর দিব্যজীবন।

জানুআরি : আগামী বৎসর কতটা অগ্রসর হইবেন? চিন্তা বনাম ধ্যান, জীবন ও মৃত্যুর পারের জীবন, মনের রহস্যময় প্রকৃতি, ঈশ্বরে ভক্তি কিভাবে বর্ধিত হয়? ভাগবত ভক্ত ও ভগবান, বিশ্বমানব বিবেকানন্দ, শরণাগতি-ধর্ম।

প্রতি রবিবার সকালে শিশুদের ক্লাস হয়, সেখানে তাহাদের সর্ব ধর্মকে সম্মান করিতে শেখানো হয় এবং বেদান্তের সাধারণ জ্ঞানের ও পৃথিবীর ধর্মগুরুদের জীবনের সহিত পরিচয় করানো হয়।

বিবিধ সংবাদ

নানাস্থানে উৎসব

সালেপুর (কটক) ঃ গত ১লা জানুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 'কল্পতরু' উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে পূজা, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, হোম, কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুনামগঞ্জ (শ্রীহট্ট) : কলেজ হলে গত ১৮ই মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মুন্সেফ মি: সি. এফ. করিমের সভাপতিত্বে একটি সভায় শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক বিনয়কৃষ্ণ দে এবং প্রিন্সিপ্যাল মো: দেওয়ান আজরফ্ যুগাচার্য স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কলিকাতা ঃ কিশোর-কল্যাণ-পরিষদ গত ১১ই হইতে ১৭ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আলোচনা-সভার মধ্য দিয়া স্বামীজীর সপ্তাহব্যাপী জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিয়াছেন। ১১ই কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমিতে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ১২ই কলিকাতা বিবেকানন্দ বালিকা বিদ্যালয়ে স্বামী সাধনানন্দ, ১৩ই কলিকাতা ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে স্বামী জীবানন্দ এবং ১৪ই সাঁতরাগাছি কেদার-নাথ ইনষ্টিটিউশনে ও আন্দুল ছাত্রাবাসে স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং ১৫ই ভবানীপুরে মাদ্রাজী ন্যাশনাল হাইস্কুলে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

উদ্বোধন

কল্যাণ-ভাবনা

সব্বে সত্তা সব্বে পাণা সব্বে ভূতা চ কেবলা।
সব্বে ভদ্রাণি পস্সন্তু মা কঞ্চি পাপমাগমা॥

* *

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

একটি প্রাণীর প্রকৃত সুখ শান্তি কল্যাণ ও আনন্দ—সব কিছুই নির্ভর করে তাহার চারিপাশের প্রতিটি প্রাণীর সুখ শান্তি কল্যাণ ও আনন্দের উপর। এই সত্য যিনি যে পরিমাণে উপলব্ধি করেন তাঁহার হৃদয় হইতে সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধি সেই পরিমাণে দূর হইয়া যায়; সেই মহৎ হৃদয়ে ক্ষুদ্রত্ব বাসা বাঁধিতে পারে না, সেখানে শুধু একটি বাণীই অহরহ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে—যাহার মূল সুর সকলের কল্যাণ।

সর্বদেশের সর্বকালের উপলব্ধিমান্ পুরুষের অনুভূতি একই সত্য বস্তু অবলম্বন করিয়া; তাই একই প্রকার ভাষায় প্রকাশ পায় তাঁহাদের প্রাণের কথা:

কেহ যেন কোনও প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত না হয়, কাহাকেও যেন কোন পাপ স্পর্শ না করে। যে যেখানে আছে সকলে সুখী হউক, নীরোগ হউক। সকলে মঙ্গল দর্শন করুক; সত্য উপলব্ধি করুক।

এই কল্যাণ-ভাবনা যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতের আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়াছে, বর্তমান যুগকেও ইহা অনুপ্রাণিত করুক।

কথাপ্রসঙ্গে

নূতন 'বর্ষ' গণনা

গত ২২শে মার্চ ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ, পুরাতন ৮ই চৈত্র ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ,—নূতন ১লা চৈত্র ১৮৭৯ শকাব্দ হইতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নূতন 'বর্ষ' গণনা শুরু হইল।

১লা বৈশাখ তার পূর্বগৌরব হইতে বিচ্যুত হইল—১লা চৈত্র আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে নববর্ষের উৎসব হইবে ১লা চৈত্র, এবং বর্ষশেষ অনুষ্ঠিত হইবে ৩০শে ফাল্গুন। অনেকের কাছে এ পরিবর্তন অসুবিধাজনক; সাধারণের ধারণা এ পরিবর্তন নিষ্প্রয়োজন।

ঠিক এই কারণেই আমাদের বুঝিতে হইবে—কেন এই পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়, এবং বুঝিতে হইবে—ইহার অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক রহস্য, জানিতে হইবে—ইহার পিছনের ইতিহাস।

ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী (astrophysicist) ডক্টর মেঘনাদ সাহা বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন—রাশিচক্রে সঞ্চরণশীল বিষুব-বিন্দু প্রায় ২০।২১ ডিগ্রি আগাইয়া আসার দরুন এখন আর ৩০ চৈত্র বিষুব সংক্রান্তি হয় না, ২০।২১ দিন পূর্বে ৯ই চৈত্র হয়; এই দিনই সূর্যকে বিষুবরেখা লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিতে দেখা যায়। ৩৬০° ডিগ্রিতে ৩৬৫ দিন হওয়ায় কৌণিক মাপে দিন গণনায় প্রায় ১° ডিগ্রিতে ১ দিন হয়, অতএব সংক্রান্তিদিবস ২০।২১ দিন আগাইয়া আসিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে এইরূপ আগাইয়া আসার নাম precession of equinoxes, ভারতে ইহাকে বিষুববিন্দুর অয়ন বা গতি বলা যায়। ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়া আসিতে সময় লাগে প্রায় ২৬,০০০ বৎসর, অর্থাৎ আজ ১লা চৈত্র—যে নক্ষত্রে বিষুববিন্দু ধরা হইল—ইহা ক্রমশঃ সরিতে সরিতে ১৩,০০০ বৎসর পরে ১৮০° বা ছয় মাস সরিয়া ১লা আশ্বিনে গিয়া দাঁড়াইবে, আরো ১৩,০০০ বৎসর পরে পূর্ণ আবর্তন করিয়া আবার ১লা চৈত্র ফিরিয়া আসিবে।

এই বিরাট কাল গণনায় কত ইতিহাস নিশ্চিহ্ন হয়, কত জাতি কত সভ্যতার আদি অন্ত হয়, অতএব আমাদের দৈনন্দিন বা শতাব্দ বা সহস্রাব্দ গণনায় ইহা কোন কাজে লাগে না। তার জন্য বিষুববিন্দুর এই গতি স্বীকার করিয়া মাঝে মাঝে পঞ্জিকা-সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। নতুবা ব্যবহারিক বর্ষগণনায় নানা ভুল আসিয়া যায়।

ইয়োরোপে পোপ গ্রেগরির সময় যে সংস্কার হইয়াছিল তাহাতে লীপ ইয়ার সংশোধন শুরু হয়। ইহা গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার নামে পরিচিত। ভারতেও নানা সংস্কার বহুবার হইয়াছে। বহু পূর্বে ভারতে অগ্রহায়ণ হইতে বর্ষ গণনা হইত, লোকমান্য তিলক তাঁহার বিখ্যাত ORION পুস্তকে এতদ্দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন।

ইহা সর্বজন-বিদিত, বেদের অঙ্গ হিসাবে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ পূর্বকালে অবশ্য পাঠ্য ছিল, কারণ ইহারই সাহায্যে যাগযজ্ঞাদির কাল নির্ণয় করা হইত। বৈদিক জ্যোতিষ প্রাগৈতিহাসিক। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে সূত্রাকারে গণনার নিয়ম পাওয়া যায়: নক্ষত্রের নামে তিথি বা দিনের পরিচয়, চান্দ্র মাস এবং সৌর বৎসর। মকর-সংক্রান্তি হইতেও বৎসর গণনার নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইয়োরোপ-খণ্ডে এখন যে বড়দিন—উহা যীশুখৃষ্টের জন্মদিন কি না—এ বিষয়ে আজকাল গবেষক-মহলে সন্দেহ উঠিয়াছে; উহা প্রকৃতপক্ষে উত্তরায়ণ উৎসব (winter solstice) সূর্য দক্ষিণের যাত্রা শেষ করিয়া উত্তরে আসিতে আরম্ভ করিলে দিন ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে, শীত কমিয়া তাপ বাড়িতে থাকে, নবজীবনের

স্পন্দন অনুভূত হয়—শীতপ্রধান দেশে নব-বর্ষ আরম্ভের ইহাই প্রকৃষ্ট কাল। পরবর্তীকালে নববর্ষের এই জাতীয় উৎসবের সহিত যীশুর জন্মোৎসব মিশিয়া গিয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে ভারতে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষই সমধিক উন্নত হইয়াছে—তন্মধ্যে সূর্য-সিদ্ধান্তই ভারতে সর্বত্র গৃহীত। সূর্য-সিদ্ধান্তীরা বাসন্তী বিষুব সংক্রান্তি (উত্তরায়ণে যে দিন দিনরাত্রি সমান) হইতে বর্ষ-গণনা প্রচলন করেন। ইঁহারাই লক্ষ্য করেন এক সৌর বৎসরে ১২ চান্দ্র মাস ও ১১ দিন—অর্থাৎ তিন বৎসরে ৩৬ মাস না হইয়া ৩৭ মাস হয়, তাই তিন বৎসর অন্তর মলমাস পরিত্যাগ বিধেয়; এইভাবে তাহারা চান্দ্র ও সৌর মাসের সামঞ্জস্য রাখিয়াছিলেন। যাহারা তাহা করে না তাহাদের চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসর অপেক্ষা গণনায় ক্রমবর্ধমান।

বিষুববিন্দুর অয়ন জন্য প্রায় ৭০ বৎসর অন্তর বিষুব-সংক্রান্তি (vernal equinox) এক ডিগ্রি বা একদিন করিয়া আগাইয়া আসে—তাহা বিশেষ ধরা যায় না, কিন্তু এই পার্থক্য এক মাস হইলে বেশ ধরা পড়ে। এক মাস, এক রাশি বা ৩০ দিন সরিতে প্রায় ৩০°×৭০=২১০০ বৎসর লাগে। এখন ২০° সরিতে ২০×৭০ মোটামুটি ১৪০০ বৎসর লাগিয়াছে। অর্থাৎ মনে করা যাইতে পারে বঙ্গদেশে প্রচলিত বঙ্গাব্দ ১৩৬৩ এইরূপ পঞ্জিকা-সংস্কারের ফলেই একসময় শুরু হইয়াছিল। কাহারও মতে আকবরের সময় চান্দ্র হিজরি সাল অনুসারেই ইহার শুরু হয়। চান্দ্র সাল বাড়িয়া এখন ১৩৭৬ হিজরিতে পরিণত হইয়াছে।

বিষুব নক্ষত্র-বিন্দু আগাইয়া আসার কারণ মানুষ অনেক দিন ধরিতে পারে নাই। বিষুব অঞ্চলে পৃথিবীর স্ফীত অংশে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহাদির আকর্ষণের ফলেই বিষুববিন্দু বৎসরে ৫০" আগাইয়া আসে।

ভারতে প্রথম লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এই পঞ্জিকা-সংস্কারের কথা উত্থাপন করেন; কিন্তু বহু দিন কেহ কর্ণপাত করে নাই। ১৯৫২ খৃঃ কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিক্ষা-গবেষণা-পরিষদ—ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে পঞ্জিকা-সংস্কার কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি সারা ভারতের প্রচলিত পঞ্জিকা ও অব্দ-গণনা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, প্রায় ত্রিশ প্রকার পঞ্জিকা ও অব্দ গণনা প্রচলিত আছে। সমগ্র ভারতের উপযোগী পঞ্জিকা, নববর্ষ ও অব্দ-গণনা সম্বন্ধে এই কমিটি—১৯৫৫ খৃঃ ভারত সরকারকে এই সিদ্ধান্ত দেন—যে বসন্তকালীন বিষুবসংক্রান্তি হইতে বর্ষ গণনা হউক, (উহা এখন ২২শে মার্চ ৮ই চৈত্র হয়) উহাকে ১লা বৈশাখ না বলিয়া ১লা চৈত্র বলা হউক, আর বিভিন্ন অব্দ-গণনা-মধ্যে শকাব্দই বহুল প্রচলিত, অতএব তাহাই গৃহীত হউক। ভারত সরকার ১৯৫৭ খৃঃ ২২শে মার্চ হইতে ইহা চালু করিয়াছেন। সরকারী ব্যাপারে এখন পাশ্চাত্ত্য অব্দ মাসও চলিবে—আর ধর্ম কর্ম ব্যাপারে নিজ নিজ পঞ্জিকা কিছুদিন চলিবে। অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায় এই শোধিত পঞ্জিকা এবং সর্ব ভারতীয় অব্দ-গণনা সর্বত্র গৃহীত হইবে।

অসঙ্গত সমালোচনা

পূর্বগামীদের সমালোচনা করার অধিকার লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে—এই আলোচনা সমালোচনার উপরই নির্ভর করে পরবর্তী যুগের অগ্রগতি। ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি সেই সকল দেশের ইতিহাসে—যেখানে চিন্তার, কথা বলার ও লেখার স্বাধীনতা আছে।

বৌদ্ধধর্ম বেদকে অস্বীকারও করিয়া ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং বুদ্ধ ও ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট সংঘ স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে আবার দেখিয়াছি আচার্য শংকর সেই বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়া বেদান্তমত ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পরবর্তী আচার্য রামানুজ আবার

শংকরের অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত স্থাপন করেন, তাহাও আবার খণ্ডিত হইয়াছে মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ দ্বারা। অদ্বৈতবাদ আবার এই সকল মতের যথাযথ উত্তর দিয়া দার্শনিক ক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শংকরও এক স্থানে অতি সুন্দরভাবে এই সকল বাদ-প্রতিবাদ নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, প্রবলতর যুক্তিসহায়ে আমা-অপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি আমার মতবাদ উড়াইয়া দিতে পারে—কিন্তু অদ্বৈত-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার অনুভূতিকে পরিবর্তন করিতে পারে না!

কি ধর্মক্ষেত্রে, কি দার্শনিক ক্ষেত্রে এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে—মত, মতবাদ, তাহার খণ্ডন মণ্ডন—এই ভারতে চিরদিন আছে ও থাকিবে, সেইজন্য ঐ উভয় ক্ষেত্রে ভারতের এত বৈচিত্র্য, জনমানসের এত সচেতনতা।

যেখানে ইহার অভাব—সেখানে অগ্রগতি স্তব্ধ; সেখানে ধর্ম গোঁড়ামিতে পরিণত, দর্শন মতবাদে। অতীত ভারতে এই খণ্ডন মণ্ডন বা আলোচনা সমালোচনা যথেষ্ট সশ্রদ্ধভাবে হইয়াছে। পূর্ব পক্ষের মত সম্পূর্ণরূপে জানিয়া বুঝিয়া তবে তাহাকে খণ্ডন করা চলে—বা তাহার সমালোচনা করা চলে।

সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করিতেছি, স্বামী বিবেকানন্দকে পূর্ব পক্ষ করিয়া অনেকে সমালোচনা শুরু করিয়াছেন এবং নিজ নিজ সিদ্ধান্তও পেশ করিতেছেন। চিন্তাস্বাধীনতার যুগে ইহা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই, তবে আমাদের মনে হয়—গাড়ী যেন তাহার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ছাড়িয়াছে। দু-একটি সমালোচনা পড়িয়া আমাদের এইরূপই মনে হইয়াছে, তাড়াতাড়িতে সমালোচক স্বামীজীর বক্তব্য ভাল করিয়া পড়িবার বা বুঝিবার সময় পান নাই, পত্রাবলীতে ব্যক্তি-বিশেষকে লেখা পত্র হইতে বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর মত সঙ্কলন করা চলিতে পারে, কিন্তু দার্শনিক বক্তৃতাবলীতেই তাঁহার মতবাদের যথার্থ বিকাশ। যে কোন কারণেই হউক স্বামীজীর এই সকল সমালোচক তাঁহার মহদুদার কল্যাণকর বিচিত্র ভাবরাশির মর্ম যেন ধরিতে পারেন নাই, স্বামীজীকে বুঝিবার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন—তাহা তাঁহাদের নাই। স্বামীজী সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা আমাদের চোখে পড়িলে তাহার সমালোচনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য—শুধু সমালোচনার খাতিরেই নয়, স্বামীজীর ভাবরাশি যাহাতে সমাজে যথার্থভাবে প্রকাশিত হয়—তাহার বিকৃতরূপ যাহাতে প্রচারিত না হইতে পারে—তাহার জন্যও বটে। বিখ্যাত ব্যক্তির বা উক্তির সমালোচনা করিয়া বিখ্যাত হইবার সুলভ পন্থা ও সহজ প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পাইলে কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হইবে।

যে সকল সমালোচক স্বামীজী সম্বন্ধে লিখিতে বা বলিতে গিয়া সম্প্রতি এক প্রকার পল্লব-গ্রাহিতার এবং গভীর চিন্তার অভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য—সেগুলি একাধিক ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সমাজের এক স্তরে—স্বামীজীর এই ভাব গ্রহণে অনিচ্ছা বা অক্ষমতা রহিয়াছে। ইহার কারণ নিজ নিজ সমাজ বা ধর্মের দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত 'যত মত তত পথ'—কথার অর্থ, সর্ব ধর্মমতই ঈশ্বর লাভের এক একটি উপায়—এ-কথা তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেননা। তাঁহাদের মতে ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি শুভেচ্ছামাত্র, সাধন-লব্ধ কোন সিদ্ধান্ত নয়; পরবর্তী কালে তাঁহার শিষ্যগণ—বিশেষতঃ তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ঐ উক্তিকে সর্বধর্মসমন্বয়ের মূলসূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মতকেই সত্য বলিয়া সমান গ্রাহ্য মনে করেন নাই।

এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বক্তব্য,

সত্যের সন্ধানে শুধু মুদ্রিত পুস্তকের অক্ষর-সমষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না—এবং সুবিধামত মনের মত দু-একটি বাক্য উদ্ধৃত করিলেও চলিবে না। শাস্ত্রবচন অপেক্ষা শাস্ত্রের ভাবই গ্রহণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সহজ কথার সরল অর্থ এই যে, আজ পর্যন্ত মানুষ নানা দেশে নানা ভাবে সত্যকে জানিবার জন্য নানা পথে নানা উপায়ে যাত্রা করিয়াছে। কেহ ভক্তি-পথে, কেহ জ্ঞানবিচারের পথে, কেহ যোগধ্যানের পথে। একাগ্র সাধনাবলে বহু সাধকই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন নিজ নিজ ভাবে; যাত্রাকালের পথের বর্ণনা পৃথক্ হইলেও চরম লক্ষ্যে যাঁহারা পৌছিয়াছেন তাঁহাদের ভাষার ঐক্যও দেখা যায়, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'সেখানে সব শেয়ালের এক রা'—সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ-জীবনে বিভিন্ন মতে ও বিভিন্ন পথে সাধনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন; এবং কত দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন: ছাদে উঠার নানা উপায়, কালীঘাটে কত প্রকারে যাওয়া যায়, এক পুকুরের চারিটি ঘাটের বিভিন্ন ভাষাভাষী একই জলের বিভিন্ন প্রকার নাম দেয়, এক বহুরূপীর নানা বর্ণ। 'অন্ধের হাতী দর্শন' গল্পটিতে বুঝাইয়াছেন আংশিক সত্য উপলব্ধি হইতেই যত বিভেদ। মধ্য পথের এই দ্বন্দ্ববিরোধ অতিক্রম করিয়া আমাদের কর্তব্য যে কোন একটি পথ অবলম্বন করিয়া সরল বিশ্বাসে এবং একাগ্র ভাবে সাধনা করা; শেষ পর্যন্ত যাইলে সত্যানুভূতি বা ঈশ্বরদর্শন হইবেই—মধ্যপথে পথ পরিবর্তন করিলে কখনই সিদ্ধিলাভ হইবে না। দৃষ্টান্ত: কূয়ো খুঁড়ে জল পেতে হলে এক জায়গায় খুঁড়ে যেতে হয়। আজ এখানে, কাল ওখানে খুঁড়লে পরিশ্রমই সার হয়, জল কখনও পাওয়া যায় না। নিষ্ঠা সহকারে যে কোন একটি ধর্ম আচরণ করিলেই ধর্মস্বরূপ ভগবান নিজেই ভক্তকে টানিয়া লন। প্রত্যেক ধর্মই ঈশ্বরসৃষ্ট, অতএব সত্য; এই উদার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে তবেই সর্বধর্মসমন্বয়, 'যত মত তত পথ' প্রভৃতি কথার অর্থ বুঝা যায়। নতুবা ধর্ম-সম্প্রদায় অশান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে শান্তি বিতরণ না করিয়া নূতন অশান্তির কারণ হয়। অনর্থক প্রতিযোগিতা ও বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি করে। যথার্থ সত্যধর্ম যখন জনসমাজে প্রচারিত হয় তখন উহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী সূর্যের মতই অন্ধকার বিদূরিত করিয়া মানব-মনকে জাগ্রত করে, আকর্ষণ করে।

আর একটি ভাবও এই জাতীয় সমালোচনার বিষয়বস্তু, সন্ন্যাসবাদ! সমালোচকদের ধারণা বৈরাগ্য জীবনবিমুখ, এবং স্বামীজী-প্রচারিত সন্ন্যাসবাদ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির এই প্রকার ভাব দেখিয়া বিস্ময় ছাড়া আর কি হইতে পারে? ইহাদের অজ্ঞতা শুধু ধর্ম সম্বন্ধেই নয়, —ইতিহাস সম্বন্ধেও!

মানব জীবন দেহ-মন-নিয়ন্ত্রিত; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয় বৃত্তিই দেহ মনকে চালিত করে। একটানা ভোগ—অনুভূত সত্যও নয়, কাম্যও নয়। ভোগের তৃপ্তি বা সমাপ্তির পর ত্যাগ স্বাভাবিক ও সর্বানুভূত সত্য। ফলটি পাকিলেই গাছ হইতে পড়িয়া যায়; বৎসরান্তে প্রাকৃতিক নিয়মবশতই গাছের পাতা ঝরিয়া যায়—গাছ ফল ও পাতাকে আটকাইয়া রাখে না, এবং ফল বা পাতাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় গাছে সংলগ্ন থাকে না, বা থাকিতে পারে না। গ্রাম্য দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ঘায়ের মামড়ি জোর করিয়া তুলিয়া দিলে আবার হয়, ঘা শুকাইয়া গেলে মামড়ি আপনি খসিয়া যায়। সংসারবৃক্ষ হইতে সুখ-দুঃখ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া মানব-মন সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়া শান্তি ও জ্ঞান-লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অনন্তের পথে বাউল দরবেশ ভিখারী ফকিরের বেশে যাত্রী হইয়াছে, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

বুদ্ধ, খৃষ্ট ও বিবেকানন্দ মানুষের এই সংসার-বিমুখ ভাবকে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন। সন্ন্যাস সংসার-বিমুখ বলিয়া জীবন-বিমুখ নয়—জীবনের উদ্দেশ্য সংসারে শুধু স্বার্থ-ভোগেই পর্যবসিত নয়, জীবনের উদ্দেশ্য নিজের মধ্যে সকলকে, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা, এবং তাহার শ্রেষ্ঠ উপায় ত্যাগ বা সন্ন্যাস।

বুদ্ধ ও শংকর

বৈশাখের পুণ্য মাসে আমরা স্মরণ করি বুদ্ধকে, স্মরণ করি শংকরকে—ভারত-আকাশের দুই জ্যোতির্মণ্ডলকে; একজন পূর্ণিমার চন্দ্রের মত পূর্ণ ও স্নিগ্ধ—আর একজন মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত উজ্জ্বল ও তেজস্বী।

ভারতেতিহাসের বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা ভারত-কৃষ্টিকে বিশ্ব-কৃষ্টিতে পরিণত করার পথে লইয়া গিয়াছেন—একজন হৃদয়ের পথে, আর একজন মস্তিষ্কের পথে।

যুগপ্রয়োজনে এক এক ভাব এক এক সময় প্রবল হয়, এবং ধর্মে ও সমাজে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য এক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব—স্মরণাতীতকাল হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পরবর্তী মহাপুরুষ বুঝি পূর্ববর্তীর বিপরীত, একজন বুঝি আর একজনের সব নিয়ম নীতি শিক্ষা ধ্বংস করিবার জন্যই জন্মিয়াছেন; কিন্তু গভীরতর দৃষ্টি দ্বারা ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—একজন আর একজনের পরিপূরক।

শ্রুতি বা বেদে ঋষি-অনুভূতির পর ভারতে দর্শনের প্রথম প্রকাশ আমরা পাই কপিলমুনির সাংখ্যে; তাহাতে আছে জগৎ দুঃখময়—এই দুঃখ অতিক্রম করিতে হইবে—জ্ঞানের সহায়ে পুরুষ-প্রকৃতি বিবেক দ্বারা, জড় ও চৈতন্য পৃথক করিয়া।

অতঃপর আসিলেন যোগদর্শনের পতঞ্জলি মুনি। তিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধ-দ্বারা মন স্থির করিবার সাধনপন্থা নির্ণয় করিলেন; বহু সাধক সেই পথেই কৈবল্য বা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

গীতাতেও লক্ষ্য করা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—সাংখ্য এবং যোগ পৃথক নয়—একই। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বেদের সকাম কর্মীকে নিষ্কাম কর্মের পথে আনিয়া জ্ঞান ভক্তি কর্ম এবং যোগের মহাসমন্বয় করিয়া গিয়াছেন।

কালক্রমে এই যোগধর্ম নষ্ট হইয়া যায়,—কারণ মানুষ স্বভাবত ভোগপ্রবণ, বেদের পূর্ব-মীমাংসার পথে যাগযজ্ঞ করিয়া যখন স্বর্গলোভে উচ্চবর্ণেরা 'যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ' এই বেদবাক্যকেই সার করিয়াছিল, তখন প্রকৃত ধর্ম কি—বুঝাইবার জন্য আবির্ভূত হইলেন শাক্যমুনি। জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর প্রত্যক্ষ দুঃখ দর্শন করিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় আবিষ্কারের জন্য তিনি বিচার-সহায়ে ধ্যানের সাধনায় নির্বাণ লাভ করিয়া অগণিত মানবের জন্য সদ্ধর্মের দ্বার খুলিয়া দিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ—সকলের জন্য তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত!

অত্যধিক উদারতার জন্য অভাবনীয় বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সংঘে আর্য অনার্য কৃষ্টি অবাধে আসিয়া মিশিয়া একটা সমোচ্চসীমা প্রাপ্ত হইবার পর ধীরে ধীরে শুরু হইল অবনতি—দর্শনে, কৃষ্টিতে, নীতিতে। শকহূনাদি ভারতবহির্ভূত জাতিরও কৃষ্টি ভারতে আসিয়া বৌদ্ধভাবে প্রভাবিত হইল বটে, সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ কদর্য রীতিনীতিও তাহারা ভারতের প্রবাহে ঢালিয়া দিল।

সর্ববিধ অবনতি রোধ করিবার জন্য, ভারত কৃষ্টির শুদ্ধস্বরূপ রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইল নূতনতর এক শক্তির। আচার্য শংকরই সেই মহাশক্তি—যিনি পুরাতনের যাহা কিছু ভাল গ্রহণ করিয়া—নবাগতের মন্দটুকু বর্জন করিয়া—ভারত-কৃষ্টিকে এক নূতন রূপ দিয়া গেলেন। বুদ্ধের নীতি ও সাধনা তাহার প্রবর্তিত সন্ন্যাসধর্মে গ্রহণ করিয়া, বৌদ্ধ দর্শনের বুদ্ধিপ্রধান মতবাদকে খণ্ডন করিয়া

তিনি তাঁহার অবিরোধী অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। এই অদ্বৈতভাব দার্শনিক চিন্তাধারার সর্বোচ্চশিখরে অবস্থিত, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই সেখানে যাইবার অধিকারী—সকলে নহে। ইহা শংকরের সংকীর্ণতা নহে—ইহা এই উচ্চতম দর্শনের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার উপায় নির্দেশ।

বুদ্ধের দৃষ্টিতে জগৎ দুঃখময়, ইহা হইতে নির্বাণ লাভ করিতে হইবে—অষ্টাঙ্গিক মার্গে। যুক্তি-নির্ভর বৌদ্ধদর্শন ক্রমশঃ অনাত্মবাদের মধ্য দিয়া শূন্যবাদে আশ্রয় লইয়াছিল।

শংকরের দৃষ্টিতে জীবজগৎ ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম আনন্দময়; অদ্বৈততত্ত্ব শূন্য নয়—পূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের ভিত্তির উপর শ্রুতির উপাদান-সহায়ে শংকর তাঁহার দর্শন-সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। তাই শংকরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ না বলিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—বুদ্ধেরই পরিপূরক। বুদ্ধ দিয়া গেলেন নীতি—শংকর দিলেন দর্শন। এই দুই মহামানব ও মহামনীষা—যেন ভারতবর্ষের দুইটি নেত্র; দক্ষিণামূর্তি গুরুর করুণাদৃষ্টিতে তাঁহারা আমাদের দিকে আজও চাহিয়া রহিয়াছেন; আমাদিগকে জ্ঞানে ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। ভারতের কৃষ্টি ও দর্শন বলিতে আজও আমরা বুঝি—বুদ্ধ ও শংকর।

স্বামী অরূপানন্দজীর দেহত্যাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অরূপানন্দজী (রাসবিহারী মহারাজ) গত ৫ই চৈত্র, (১৯শে মার্চ) মঙ্গলবার বেলা ৯টা ৩৫ মিনিটের সময় রক্তের চাপজনিত (এপোপ্লেক্সি) রোগে ৭০ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯১৯ খৃঃ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। তিনি শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহার সাক্ষাৎ সেবাধিকার পাইয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ১লা ফেব্রুআরি জয়রামবাটীতে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম পুণ্যদর্শন লাভ করেন—এ বিষয়ে তাঁহার মনোজ্ঞ বিবরণী এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ "শ্রীশ্রীমায়ের কথা"—২য় খণ্ডে তিনি পরিবেশন করিয়াছেন, ঐ পুস্তকের ভূমিকায় শ্রীশ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনকথাও তাঁহারই রচনা। শ্রীশ্রীমায়ের তিরোধানের পরে "শ্রীশ্রীমায়ের কথা"—১ম খণ্ড তাঁহারই উৎসাহে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। মিশনে যোগদান করিবার পরেই কিছুকাল তিনি মিশনের বন্যাসেবাকার্য করেন; পরবর্তীকালে জয়রাম বাটীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নূতন গৃহনির্মাণ কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্ধানের পর কাশী অদ্বৈত আশ্রমেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা মাতৃ-অঙ্কে পরা শান্তি লাভ করিয়াছে।

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর দেহত্যাগ

গত ২রা এপ্রিল ৫৯ বৎসর বয়সে ফ্রান্সের গ্রেজ শহরে রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী (গোপাল মহারাজ) দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯২০ খৃঃ ২২ বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া বেদান্ত-কেশরীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ১৯২৪ খৃঃ তিনি শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। মহীশূরে প্রেরিত হইয়া সেখানে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন, বাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষ থাকাকালে—১৯৩৭ খৃঃ বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বেদান্ত-প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্সে প্রেরিত হন, তদবধি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সেখানকার কাজকে একটি স্থায়ীরূপ দিয়াছেন। ১৯৪৭ খৃঃ একবার তিনি দেশে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা চির-শান্তিলাভ করুক।

বোধি-পূর্ণিমা

শ্রীপ্রণব ঘোষ

আবার আসন পাতো বোধিদ্রুমতলে।
বলো দৃপ্তস্বরে ঃ
'অস্থিমাংসময় দেহ হয় হোক লয়,
সুদুর্লভ বোধি যদি লব্ধ নাহি হয়,
এ আসন কোনদিন ছাড়িব না আমি।'
সবিস্ময়ে থামি
মুগ্ধচিত্তে বিশ্ববাসী জানাবে প্রণাম।
তোমার প্রশান্ত ধ্যানে আর বার দীপ্ত হবে
তব জন্মধাম।
এই পুণ্য বৈশাখের প্রাণের পূর্ণিমা
খুঁজে পেয়েছিল ধ্যানে জীবনের সীমা।
অবিদ্যার রূপময় অন্ধকার হ'তে
রোগ শোক জরা মৃত্যু যে তৃষ্ণার স্রোতে
ভাসিতেছে চিরদিন,—তাহারি সন্ধান
এনে দিল চিত্তে তব পরম নির্বাণ।
আজ তাই মনে প্রাণে জানে বিশ্বলোক—
তুমি তো দিশারী নও, তুমিই আলোক।

ধ্যানমগ্ন বোধিদ্রুম। পাশে কলস্বনা
আজো বহি চলে ধীরে নদী নিরঞ্জনা।
সেও তো তোমারি প্রেম নিত্য বহমান,
শ্যামশোভাময় করি' রাখে মর্ত্য প্রাণ।
ঊর্ধ্বে অধে পরিব্যাপ্ত সর্বচরাচরে
জাগায় করুণামন্ত্র নিখিল-অন্তরে।
সর্ব কোলাহল ভেদি' সে করুণা-গাথা—
যখনি অন্তরে শুনি—সে মহা-বারতা
প্রাণে প্রাণে বলে যায় ঃ শুভ জন্ম তব
প্রেমরূপে প্রজ্ঞারূপে নিত্য নব নব।
সে পরম-ক্ষণে তুমি বোধিদীপ জ্বালো,
দুঃখ হয় প্রেম, আর প্রেম হয় আলো।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে তথাগত বুদ্ধ

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃঃ রাত্রি কয়েক দণ্ড হইয়াছে। অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের উদ্যান-বাটিকায় দ্বিতলের বড় ঘরে শয্যায় উপবিষ্ট। নরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন, শশী রাখাল এবং আরও দু একটি ভক্ত আসিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ কয়েক দিন পূর্বে কালীপ্রসাদ (পরে স্বামী অভেদানন্দ) ও তারকনাথ (পরে স্বামী শিবানন্দ) সমভিব্যাহারে বোধগয়া গিয়া তথায় বুদ্ধদেবের মন্দির, মূর্তি ও বোধিদ্রুম দর্শন করিয়াছিলেন। মূর্তির সম্মুখে ও বোধিদ্রুমতলে তাঁহার গভীর ধ্যান হইয়াছিল, তথা হইতে তিনি সবে ফিরিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা উঠিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(মাষ্টারের* প্রতি সহাস্যে) ওখানে গিছ্‌লো।

মাষ্টার—(নরেন্দ্রের প্রতি) বুদ্ধদেবের কি মত?

নরেন্দ্র—তিনি তপস্যার পরে যা পেলেন, তা মুখে বলতে পারেন নি। তাই সকলে বলে নাস্তিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(ইঙ্গিত করিয়া) নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারেন নি! বুদ্ধ কি জান? বোধস্বরূপকে চিন্তা ক'রে তাই হওয়া—বোধস্বরূপ হওয়া।

নরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ; এদের তিন শ্রেণী আছে, বুদ্ধ, অর্হৎ আর বোধিসত্ত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ তাঁরই খেলা—নূতন একটা লীলা। নাস্তিক কেন হতে যাবে? যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা।

নরেন্দ্র—(মাষ্টারের প্রতি)—যে অবস্থায় contradictions meet (বিপরীতের মিলন)। যে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন-এ শীতল জল তৈয়ার হয়, তা'তেই আবার oxy-hydrogen blow-pipe (জ্বলন্ত অত্যুষ্ণ অগ্নিশিখা) উৎপন্ন হয়। সে অবস্থায় কর্ম, কর্মত্যাগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম দুইই সম্ভবে।...যারা সংসারী ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে রয়েছে, তারা বলছে সব 'অস্তি'; আবার মায়াবাদীরা বলছে 'নাস্তি', বুদ্ধের অবস্থা এই 'অস্তি' 'নাস্তি'র পরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক, সেখানে অস্তি নাস্তি ছাড়া।

ভক্তেরা কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছে। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(নরেন্দ্রের প্রতি) ওদের কি মত?

নরেন্দ্র—ঈশ্বর আছেন কি—না আছেন, এ সব কথা বুদ্ধ বলতেন না। তবে দয়া নিয়ে ছিলেন।... কি বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হয়ে সব ত্যাগ করলেন।...যখন বুদ্ধ হয়ে নির্বাণ লাভ করে বাড়ীতে একবার এলেন, তখন স্ত্রীকে ছেলেকে রাজবংশের অনেককে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে বললেন। কি বৈরাগ্য। গাছতলায় তপস্যা করতে বসলেন আর বললেন, 'ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরম্' অর্থাৎ যদি নির্বাণ লাভ না করি, তা'হলে আমার শরীর এইখানে শুকিয়ে যাক, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!...

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বুদ্ধদেবের কথা ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—(নরেন্দ্রের প্রতি) (বুদ্ধদেবের) কি, মাথায় ঝুঁটি?

নরেন্দ্র—আজ্ঞে না; রুদ্রাক্ষের মালা অনেক জড় করলে সে রকম হয়, সেই রকম মাথায়।

* কথামৃত, ৩য় ভাগ, ২৫।১

শ্রীরামকৃষ্ণ—(নরেন্দ্রের প্রতি) (বুদ্ধের) চক্ষু (কি রকম) ?

নরেন্দ্র—চক্ষু সমাধিস্থ।

* * *

এই ঘটনার কতদিন পরে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন : বুদ্ধের প্রতি স্বামীজীর অগাধ ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার সেই বিশ্বমানবের জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলির সহিত তাঁহার গুরুদেবের জীবনের ঘটনা পরম্পরার মধ্যে প্রায়ই তিনি মিল দেখিতে পাইতেন। বুদ্ধের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বুদ্ধকে তিনি দেখিতেন। কখন কখন এই চিন্তাধারা চকিতের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পাইত।

একদিন বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন : শেষ সময় আগত দেখিয়া সেই বিশ্বমানবের শিষ্যেরা একটি বৃক্ষতলে কম্বল বিছাইয়া দিলেন—তাহার উপর শয়ন করিয়া তিনি সিংহের ন্যায় দক্ষিণপার্শ্বে ফিরিয়া রহিলেন। চারিপার্শ্বে শিষ্যেরা বিষণ্ণবদনে অবনতমস্তকে বসিয়া আছেন। তাঁহারই ভাষায় কথিত 'নশ্বর দেহের' অবসানের অপেক্ষায়—হতাশ মনে ভগ্ন হৃদয়ে কেহ বা সাশ্রু-নয়নে অপেক্ষমাণ। এমন সময়ে সহসা বহুদূর হইতে এক ব্যক্তি উপদেশপ্রার্থী হইয়া আসিলেন। শিষ্যেরা পথরোধ করিলেন, কিন্তু পুণ্যপুরুষের কাণে তাহার আকুল আবেদন পৌছিল। 'না না! পথরোধ করিও না, আসিতে দাও—তথাগত সব সময় প্রস্তুত, কারণ এই কার্যের জন্যই তিনি এ সংসারে আসিয়াছেন'—এই বলিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়া, হস্তের উপর ভর দিয়া তিনি তাহাকে একবার দুইবার করিয়া চারবার উপদেশ দিলেন। এই কার্য শেষ করিবার পরই তাঁহার জীবনের অবসান হইল।

কাশীপুরেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। সে-বার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ক্ষেত্রে। সে অদ্ভুত ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঐদিনও শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় একব্যক্তি একশত মাইল দূর হইতে আসিয়া উপস্থিত তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে। সাশ্রুনয়নে শিষ্যেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। কাহারও ইচ্ছা নয়—সে ব্যক্তি তাঁহার নিকট যায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সেই নবাগতের পক্ষ লইলেন। তাহাকে নিকটে আসিতে দিবার জন্য ও উপদেশ দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। সে নিকটে আসিলে তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া হস্তের উপর রাখিলেন এবং তাহাকে শিক্ষা দিলেন।

* * *

তথাগত বুদ্ধ-বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যয়ন ও অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞান অপরিসীম। বুদ্ধ ছিলেন তাঁহার চক্ষে—মানবতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। বুদ্ধসম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী-সঙ্কয়ন এ বিষয় বুঝিতে আমাদের সহায়তা করিবে। স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন পত্র প্রবন্ধ ও বক্তৃতা হইতে নিম্নলিখিত বাণীগুলি সংকলিত হইল :

গৌতম বুদ্ধ ছিলেন ২৫তম বুদ্ধ ; তাঁহার পূর্বে ২৪ জন বুদ্ধ আসিয়াছিলেন।

তিনি ছিলেন আদর্শ কর্মযোগী, তিনি বলিতেন, 'ঈশ্বর বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ জানিবার প্রয়োজন নাই, অন্যে যাহা 'সৎ' বলে তাহা বিচার করিয়া দেখ, উহা যথার্থই 'সৎ' হইলে গ্রহণ কর, জীবনে প্রতিফলিত কর, মুক্তি লাভ কর, পরে অন্যকে গ্রহণ করিতে বলিও।'

বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের প্রচারক, জাতিভেদ-ভঙ্গকারী, অধিকারভেদ-ধ্বংসকারী, 'সকল জীবই সমান' এই বার্তা প্রচারকারী ; জনসাধারণের মধ্যে একত্বের প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ দুর্বোধ্য ভাষার মাঝে লুক্কায়িত সত্যকে সরল সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার করিয়া জনসাধারণের দ্রুত উন্নতির পথ সুগম করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ আসিয়াছিলেন ধর্মের পূর্ণতা-সাধনের জন্য, তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য নহে। হিন্দুরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করেন।

কাঙাল, গরীব, পতিত, চণ্ডাল সকলের প্রতি ছিল তাঁহার করুণা; তাঁহার মহান চরিত্র, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার উচ্চতম নৈতিক আদর্শ, তাঁহার নিত্য-সত্যের জ্ঞান—সকলের শৃঙ্খল বন্ধন ও গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়া চারিদিকে সহস্র-বর্ষব্যাপী প্রচণ্ড তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল।

সর্বত্যাগী বুদ্ধ ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। "জগতের মধ্যে বাঁধা পড়িও না, স্বার্থের মূলোচ্ছেদ কর, তখনই তুমি যথার্থ মানবতার সন্ধান পাইবে, প্রকৃত মুক্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিবে" এই কথা তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

"কোন ধর্মই বলে না—ঈশ্বর কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হন, কাহারও অনিষ্ট করেন; সব ধর্মই বলে—তিনি মঙ্গলময়, তিনি সৎস্বরূপ, তিনি পরম কারুণিক; এজন্য সকলেরই উচিত—সৎ হওয়া, সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা; সকলের মঙ্গল করা, তাহা করিলেই ঈশ্বরকে জানা সম্ভব" এই কথা বুদ্ধ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন।

বুদ্ধ বলিতেন, "কেহ কাহারও সহায়তা করিতে পারে না, নিজের সহায়তা নিজে কর, নিজের মুক্তির সাধন নিজে কর। আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞানকে বোধ বলে, আমি গৌতম সেই বোধ লাভ করিয়াছি, চেষ্টা করিলে তোমরা সকলেই সেই বোধ লাভ করিতে পার।" এ কথা তিনি সকলকে বলিতেন।

তিনি এমন কি একটি পশুর জন্যও নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারকে বলিয়াছিলেন, "ছাগসমূহ বলি দিলে যদি আপনার স্বর্গলাভ হয়, নরবলি দিলে আরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে, অতএব উহাদের পরিবর্তে আমায় বলি দিন।" রাজা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া রাজ্যে পশুবলি বন্ধ করিয়া দিলেন।

বুদ্ধ সেই সত্যে পৌঁছিয়াছিলেন—যে সত্যে অপরে ভক্তি, জ্ঞান, বা যোগপথ অনুসরণ করিয়া পৌঁছায়। ইহা ত্যাগের পথ, হৃদয়ের পথ, কর্মের পথ।

যাবতীয় বিধি-নিষেধমূলক ধর্মের পারে—ইন্দ্রিয়-সমষ্টি, পাঞ্চভৌতিক জগৎ, মন প্রাণ বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত ইত্যাদিরও পারে তাঁহার 'প্রজ্ঞাপারম্'—যাহা লাভ করিলে অজ্ঞানের নাশ হয়, মুক্তি ও আনন্দ লাভ হয়।

ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্তি লাভ কর, অশরীরী দেবতাদির উপর নির্ভর করিও না। আত্মার অনুসন্ধান কর, তাঁহারই উপর নির্ভর কর, ইহাই হইল যথার্থ মুক্তি, ইহাকেই বলে নির্বাণ—সকলে এই নির্বাণের দিকে অগ্রসর হও—এই উপদেশ তিনি সকলকেই দিতেন।

বুদ্ধ বলিতেছেন, "আমার উপর নির্ভর করিও না, ইহাও এক প্রকারের বন্ধন; আমার এই নশ্বর দেহ চলিয়া যাইবে ইহাকে মহান মনে করিও না। বুদ্ধ ব্যক্তি-বিশেষ নহেন, অনুভূতি-বিশেষ—নিজের মুক্তি সাধন নিজে কর।"

দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায়—আত্মার বন্ধনমুক্তির উপায়—তিনি জানিয়াছিলেন, জানিয়া ছোট বড় নির্বিশেষে সকলকে জানাইয়াছিলেন, অজ্ঞান দূর হইলে যে শান্তি লাভ হয়—তাহা তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন।

সব মানুষই সমান, সকলেরই ধর্মলাভে সমান অধিকার—ইহাই তিনি শিক্ষা দিতেন।

আমিত্বের স্বপ্ন হইতে স্বার্থের উৎপত্তি, স্বার্থ-ই দুঃখ আনয়ন করে। আমিত্ব স্বার্থ ও দুঃখ—স্বপ্নের ন্যায় আসে ও যায়, চিরস্থায়ী নয়। এই স্বপ্ন ভাঙিলে কষ্টের অবসান হইবে। ইহাও তাঁহার শিক্ষা। তিনি আরও বলিতেন মেঘমুক্ত আকাশেই

সূর্যের প্রকাশ দৃষ্ট হয়, মোহমুক্ত হৃদয়েই সত্যের প্রকাশ হয়। ‘আমিত্ব’রূপ, স্বার্থরূপ—মোহ দূর কর, যথার্থ সত্যের সন্ধান পাইবে।

দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য বা পুরস্কার লাভের জন্য কর্ম করিও না। আমিত্বকে নষ্ট করিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা কর।

সকলের প্রতি সেই ভালবাসা অর্জন কর যাহা উদারচরিত্র হৃদয়বান ব্যক্তিগণকেও বিশেষরূপে অভিভূত করে এবং সকলের সেবায় নিযুক্ত করে।

সত্যের প্রকাশ অক্ষুণ্ণ থাকিতে দাও। কুসংস্কারের অনুষ্ঠানের বা প্রতিপত্তির প্রভাবে ইহাকে কোমল করিও না, অথবা ক্ষুণ্ণ করিও না।

ঈশ্বরের বিষয়ে যে সকল ধারণা লোককে দুর্বল করে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে, পরনির্ভরশীল অকর্মণ্য ও অলস করে, সে সকল ধারণা তিনি পছন্দ করিতেন না।

মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি নিহিত আছে, সে তাহা অনুভব করিতে পারে। সে তাহার অনন্তস্বরূপ জানিতে পারে। ইহাই ছিল তাঁহার মত।

তিনি বলিতেন—স্বাধীনতা মাত্রেই সুখ, অধীনতা মাত্রেই দুঃখ।

সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। অন্তরতম প্রদেশে যে শক্তি নিহিত আছে তাহার সন্ধান লইতে হইবে। কি ধনী, কি দরিদ্র—সকলের মধ্যেই এই শক্তি বর্তমান—ইহা তিনি মনে করিতেন।

তিনি বলিতেন যে আমরা আমাদের শক্তি অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া তাহার কৃপাভিখারী হইয়া ফিরিতেছি। তিনি চাহিতেন, আমরা যেন অপরের অনুগ্রহপ্রার্থী না হইয়া নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াই।

বুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছেন—অজেয় সাহস, নিত্য-অভয়, আর জীবের প্রতি অদম্য প্রেম। লোককে সহায়তা করিবার জন্যই যেন একমাত্র চেষ্টা থাকে, ইহাই ছিল তাঁহার ভাব।

তিনি বলিতেন, “করুণায় ভরা হৃদয় লইয়া জগতে বিচরণ কর। ক্ষুদ্র জীবটির প্রতিও করুণা প্রদর্শন কর।”

বুদ্ধ তাঁহার মতবাদ প্রচারের জন্য নানা স্থানে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন।

খৃষ্টের আবির্ভাবের ছয়শত বৎসর পূর্বে ভারত তাঁহার ভাব লইয়াছিল। তখন এদেশের লোকেরা বিশেষরূপে শিক্ষিত ও স্বাধীন-চিন্তা-সম্পন্ন ছিলেন। এ হেন লোকেরা—আপামর সাধারণ—কি রাজা, কি রানী, দলে দলে তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উন্মুক্ত উদারতা ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য। ফলে এই ধর্ম স্বল্পকালমধ্যেই তিব্বত, পারস্য, মধ্যপ্রাচ্যে রুশ প্রভৃতি পাশ্চাত্যের অনেক দেশে এবং চীন, কোরিয়া, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম ও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ধর্ম। কারণ জগতের মধ্যে ধর্মের অসাধারণ প্লাবন আনিয়াছিল এই ধর্ম। আবার এই ধর্ম হইতেই আধ্যাত্মিকতার প্রচণ্ড তরঙ্গ মনুষ্যসমাজের উপর প্রবল বেগে আঘাত করিয়াছিল। জগতে এমন কোনও সভ্যতা নাই যাহার উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করে নাই।

বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল; আর ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাহার সর্বোচ্চ গৌরব-শিখরে আরোহণ করিল।—ইহাই রহস্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শেষ কোথা কাল-আবর্তনে ?

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মঞ্জুল বাতাসে আজি নববর্ষ নিয়ে এলো বাণী,
আনন্দের দোলা লাগে বনে বনে কুসুমে পল্লবে ;
প্রাণের অঙ্গন-তলে বৈশাখের উদয়-উৎসবে,
তোমারে প্রণাম করি ধ্যানে ধরি তব চিত্রখানি,
পরমপুরুষ ! মহাকরুণার হে লীলাসুন্দর !
বিন্দুরে করেছ সিন্ধু পাষাণেরে প্রেমের নির্ঝর ।
একটি আয়ুর পাতা গেল ঝরে অনন্তপ্রবাহে,
সন্ধ্যার কবরী-চ্যুত কুসুমের সম । নব আশা-
আকিঞ্চন লয়ে জাগে অন্তরের শত ভাব ভাষা
আশাবরী সুরে সুরে, স্তোত্র তব সুরধুনী গাহে
ভবতারিণীর দিব্য আয়তনে উল্লাসে কল্লোলে,
উষার আলোকে আজি স্মৃতি তব নববর্ষে দোলে !
দুর্গমের পথ বেয়ে চলিয়াছে তীর্থযাত্রীদল,
মানস-বলাকা-শ্রেণী উড়ে যায় মহাশূন্যমাঝে,
সীমা হোতে অসীমের পানে। তুমি এসো মোর কাছে ,
রাতুল চরণ তব ধুয়ে দেবো ঢেলে অশ্রুজল ।
তোমার পরশে প্রভু ! শুদ্ধ হোক চীনাংশুক মন,
নিভৃতে নির্জনে বসি করি আজ তব আবাহন ।
ভাববিপ্লবের যুগে যুক্তিবাদী নিখিলজনেরে
দিলে মহাভাব। নানারূপে বিচিত্র আধারভেদে
দাও দেখা। পরম প্রেমের পুরে হৃদিমাল্য গেঁথে
তোমারে পরাবো প্রভু ! পদে তব সঁপিয়া মনেরে ।
সংখ্যাতীত প্রত্যূষের অভ্যুদয় তব উদ্বোধনে,
বর্ষ আসে বর্ষ যায়,—শেষ কোথা কাল-আবর্তনে ?

বুদ্ধের ধর্ম

'দীপঙ্কর'

চারিদিকে দুঃখ-বেদনা হাহাকার, জরা-ব্যাধি শোক, হিংসা-দ্বেষ-লোভ প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধার্থের কোমল প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল; দুঃখের নিবৃত্তির জন্য তিনি ইহার কারণ-সন্ধানে ব্রতী হইয়াছিলেন। কঠোর তপস্যার পর যে জ্ঞান ও অমৃত তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং লোককল্যাণের জন্য অকাতরে যাহা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহাই সদ্ধর্ম বা বুদ্ধের ধর্ম।

এই ধর্মের মূলকথা দুঃখবাদ। বুদ্ধ দেখিয়াছিলেন, জীবন দুঃখময়—জন্মগ্রহণে দুঃখ, জীবনধারণে দুঃখ, অপ্রিয়ের মিলনে দুঃখ, প্রিয়ের বিরহে দুঃখ। দুঃখকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই—দুঃখের জন্য কাহারও উপর কোন অভিযোগ নিরর্থক। আমাদের যত কিছু দুঃখের পশ্চাতে রহিয়াছে আমাদেরই কৃতকর্ম। কিন্তু যত দুঃখই থাক, যত দুঃখই আসুক—সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব। হতাশ হইবার কারণ নাই—আমরা নিজেদের কর্মদোষে বদ্ধ হই, আবার নিজেদের প্রচেষ্টাতেই মুক্ত হইতে পারি। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিয়া পুরুষকার-সহায়ে জীবনের পরম শ্রেয়, পরম কাম্য লাভ করিতে পারি—ইহাই বুদ্ধের আশ্বাস।

বুদ্ধ তাঁহার শিক্ষা চারিটি আর্য সত্যের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম আর্য সত্য, দুঃখ আছে—দ্বিতীয় সত্য, দুঃখের কারণ আছে—তৃতীয়, দুঃখের নিরোধ করা যায়, এবং চতুর্থ আর্য সত্য—দুঃখ নিরোধের উপায়।

দুঃখস্বরূপ এই সংসারের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বিতীয় আর্য সত্যে ১২টি কারণ বা দ্বাদশ (প্রতীত্যসমুৎপাদ) নিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়: জরা-মরণ, জাতি, ভব, উপাদান, তৃষ্ণা (তন্হা), বেদনা, স্পর্শ (ফস্সো), ষড়ায়তন (সলায়তন), নামরূপ, বিজ্ঞান (বিঞ্ঞান), সংস্কার (সঙ্খার), অবিদ্যা (অবিজ্জা)।

জীবন আমাদের কত না প্রিয়! এই অত্যন্ত প্রিয় জীবনকে ধরিয়া রাখার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, যখন জরা ও মরণ তাহাকে গ্রাস করে। জরা-মরণই ভোগসুখের প্রধান অন্তরায়, জীবনের প্রধান দুঃখ।

জাতি বা জন্মই (যে অবস্থায় ব্যক্তিভাবাপন্ন চৈতন্য ক্রিয়াশীল থাকে) জরা-মরণ বা জাগতিক দুঃখসমূহের কারণ। জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়াই মৃত্যুর কবলিত হইতে হয়—সেই জন্য মরণের কারণ জন্ম।

তাহা হইলে জন্মের কারণ কি? জন্মের কারণ পুনর্জন্মের জন্য প্রখর ইচ্ছা বা 'ভব'। ভবের কারণ পার্থিব জীবনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বা 'উপাদান'। উপাদানের কারণ 'তৃষ্ণা'—ভোগ করিবার ইচ্ছা বা লালসা।

তৃষ্ণার উদ্ভব হয় কোথা হইতে? 'বেদনা' হইতে। দর্শন শ্রবণ আঘ্রাণ আস্বাদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জ অনুভবের নাম 'বেদনা'। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্বস্তুর সংযোগকে বলা হয় 'স্পর্শ'—এই 'স্পর্শ' হইতেই 'বেদনার' উৎপত্তি। স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন—অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) ও অন্তঃকরণ। ষড়ায়তনের কারণ নামরূপ। নামরূপের কারণ 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ প্রাণের স্পন্দন।

সৎ অসৎ সম্বন্ধে ধারণা এবং বাক্য কর্ম ও চিন্তাপ্রসূত কর্মফলকে বলা হয় সংস্কার। প্রাক্তন

সকাম কর্ম বা সংস্কারই 'বিজ্ঞানের' কারণ। অবিদ্যা হইতেই সংস্কারের উদ্ভব। জ্ঞানের অভাব বা অবিদ্যা—আমাদের বদ্ধাবস্থার এবং এই দুঃখ ক্লেশপূর্ণ সংসারগতির মুখ্য কারণ। অবিদ্যাগ্রস্ত অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন আমরা বারংবার জন্মমৃত্যুর কবলে পড়িয়া কতই না ভুগিতেছি! তাই অবিদ্যা-নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধের সাদর আহ্বান :

'অভিচরেথ কল্যাণে পাপং চিত্তং নিবারয়ে।
দন্ধং হি করতো পুঞ্‌ঞং পাপস্মিং রমতী মনো ॥'

কে কোথায় আছ, তোমরা সকলে কল্যাণকর্মের জন্য ছুটিয়া এস। শীঘ্র ধাবমান হও। অসৎকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সৎকর্মের অনুশীলন কর। যে কর্মের ফলে বন্ধন হইয়াছে তাহার বিপরীত কর্ম করিলেই বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ হইবে। আলস্যের সঙ্গে পুণ্য কর্ম করিলে চিত্ত পাপেই রত থাকে, অতএব অনলসভাবে নিরন্তর সৎকার্যে জীবন অতিবাহিত কর।

'সব্বপাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা।
সচিত্ত পরিয়োদনং এতং বুদ্ধানুশাসনং ॥'

সর্ব পাপ হইতে বিরতি, পুণ্যকর্ম ও চিত্তশুদ্ধি—ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন। বুদ্ধবাণীতে হতাশার সুর নাই। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে—নিজের শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে বুদ্ধের উপদেশ অপূর্ব।

দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ—অতি কঠোর নয়, অথচ সহজও নয়—মধ্যপন্থা অবলম্বনীয়; ইহাই বুদ্ধোপদিষ্ট প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গিক আর্যমার্গ :

১। সম্যক্ দৃষ্টি (সম্মা দিট্‌ঠি),
২। সম্যক্ সঙ্কল্প (সম্মা সঙ্কল্প),
৩। সম্যক্ বাক্ (সম্মা বাচা),
৪। সম্যক্ কর্মান্ত (সম্মা কম্মন্ত),
৫। সম্যক্ আজীব (সম্মা আজীব),
৬। সম্যক্ ব্যায়াম (সম্মা ব্যায়াম),
৭। সম্যক্ স্মৃতি (সম্মা সতি),
৮। সম্যক্ সমাধি (সম্মা সমাধি),

যে দৃষ্টি বা জ্ঞানবিচার সহায়ে দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও তাহার উপায় এই চতুরার্য সত্য সম্বন্ধে ধারণা হয় তাহাই সম্যক্ দৃষ্টি বা সদ্দৃষ্টি। প্রকৃত দৃষ্টির অভাবই সকল বিভেদ, সংঘাত ও অনৈক্যের মূলে। যেখানে সত্য দৃষ্টি প্রকাশিত, সেখানে জীবন ও জগতের মিথ্যা দৃষ্টি থাকিতে পারে না।

সম্যক্ দৃষ্টি বা জ্ঞান বিফল হইয়া যায়, যদি জীবনের বন্ধুর পথ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত না হয়। সেই জন্য প্রয়োজন সম্যক্ সঙ্কল্প। শুধু বিচার করিলে কী হইবে?—চাই দৃঢ় সঙ্কল্প। সৎ সঙ্কল্প মনে আনিয়া দেয় দুর্জয় সাহস। 'মার'-রূপী প্রলোভন বা পাপপুরুষ নিরন্তর আমাদের প্রলুব্ধ করিয়া বিপথে টানিতেছে। সন্দেহ ভয় নৈরাশ্যে চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে,—মৃত্যু সর্বদা আয়ুকে গ্রাস করিতে উন্মুখ! দৃঢ় সৎসঙ্কল্প ব্যতীত ইহাদের সম্মুখীন হইতে পারা যায় না। কামনাশূন্যতা, অবিদ্বেষ, অহিংসা প্রভৃতি সংকল্পের নাম সম্যক্ সঙ্কল্প। এই অহিংসা ও অবিদ্বেষ বৌদ্ধধর্মের প্রাণস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বুদ্ধ-উচ্চারিত শান্তির ললিত বাণী :

'অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদারিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং ॥'

ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা, অসাধুকে সাধুত্ব দ্বারা কৃপণকে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় করিতে হইবে।

দৃঢ় সঙ্কল্প কণ্ঠে ধ্বনিত করে সুন্দর ভাষা—সম্মা বাচা বা সদ্বাক্য। সৎসঙ্কল্পের প্রকাশ সদ্বাক্যে। সম্যক্ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে পরনিন্দা, মিথ্যা-কথন, প্রগল্‌ভতা চিত্তাকে কলুষিত করিতে পারিবে না। সম্যক্ বাক্ অর্থে সত্য ও প্রিয় বাক্য বলা এবং অসত্য পরুষ পিশুন ও প্রলাপ-বাক্য পরিহার।

কর্ম বিনা সঙ্কল্প বা বাক্য যেন ফলহীন বৃক্ষ।

সেই জন্য সৎসঙ্কল্প ও সদ্বাক্যের সার্থক রূপায়ণে প্রয়োজন কর্মের। সম্যক্-কর্মান্ত হইতে পারিলেই নব নব কর্মধারায় জীবন ও জগৎ সুন্দরতর ও সুখকর হইয়া উঠিবে, চিত্ত নির্মল এবং সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে। প্রাণবিনাশ না করা, অদত্ত বস্তু না গ্রহণ করা, কামভোগ হইতে বিরত থাকা—এইগুলি সম্যক্ কর্ম। সৎকর্ম জীবজগতে হিংসার স্থানে স্থাপন করিবে করুণা, দ্বন্দ্বের পরিবর্তে আনয়ন করিবে মৈত্রী আর দ্বেষের স্থানে বসাইবে প্রেম।

'ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।'

ঘৃণার দ্বারা কখনও ঘৃণার লোপ হয় না, প্রেমের দ্বারাই বিদ্বেষ হয় শমিত—বৈর হয় পরাজিত। ইহাই সনাতন ধর্ম।

জীবিকার সংস্থান জীবজগতের একটি বিশেষ নিয়ম। মানুষ খাদ্যের জন্য কত অসদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। নিষিদ্ধ কর্মের দ্বারা জীবন-ধারণ করিলে চিত্তে কলুষ-ভাব আসে। তাই বুদ্ধের অনুশাসন, আদর্শের অনুকূল কর্মের দ্বারা জীবিকা অর্জন—সম্মা আজীব। সম্যক্ আজীব অর্থে অন্যায় উপায়ে উপার্জন না করিয়া ন্যায়-সঙ্গত ভাবে উপার্জনের দ্বারা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন।

চিত্ত সদা চঞ্চল। অশান্ত অশ্ব বা মদমত্ত মাতঙ্গের মত মন সদাই বিদ্রোহ করে, বাধা মানিতে চায় না। মনের বিক্ষিপ্ত বাসনাসমূহ মানুষকে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। মনকে বশীভূত করিবার জন্য আবশ্যক সম্মা ব্যায়াম। ব্যায়াম অর্থ—চেষ্টা বা শ্রম। সম্যক্ ব্যায়াম—সৎ চেষ্টা। সম্যক্ প্রচেষ্টা মনকে অসৎ চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিয়া তাহাকে সবল উচ্চ চিন্তার অধিকারী করিয়া তুলে ও পূর্ণতার দিকে আগাইয়া দেয়। স্বভাবতঃ নিম্নাভিমুখী মানব-মনে স্বতই অসৎ ভাবের উদয় হয়, অসৎ কর্মে স্পৃহা জাগে—মনকে সদা জাগ্রত রাখিবার জন্য, অন্তরে ধর্মভাব স্থায়ী করিবার জন্য সম্যক্ ব্যায়ামের অনুশাসন।

ইহার পরে আবশ্যক সম্যক্ স্মৃতি। শারীরিক মানসিক—সর্ব বিষয়ে স্মৃতি জাগ্রত রাখার নাম সৎস্মৃতি। মনে শ্লথভাব আসিলেই বাসনার তরঙ্গ খেলিতে থাকিবে—কিন্তু 'সম্মা সতি'র অনুশীলনে মনকে পাপপুণ্যের চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিতে পারিলে কোন ভয়ই থাকে না।

ভয়শূন্য চিত্তই লাভ করে 'সম্মা সমাধি'—অষ্টাঙ্গিক মার্গের শেষ সোপান। সম্যক্ সমাধির জন্য সাধককে পর পর চারটি রূপ-মূলক ধ্যানের অভ্যাস করিতে হয়।

বিতর্ক ও বিচারের দ্বারা ধীরে ধীরে সাধক-চিত্ত সত্যের সন্ধান পাইতে থাকে। ইহাই ধ্যানের প্রথম সোপান—যেখানে আছে নির্জনতামূলক ও অসঙ্গজনিত আনন্দ—'মুদিতা' ভাবনা।

বিতর্ক ও বিচারের রাজ্য অতিক্রম করিয়া প্রীতি-সুখপূর্ণ ভাবে দ্বিতীয় ধ্যান—প্রীতির অতীত অবস্থায় 'উপেক্ষা' অবলম্বনে স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞ হইয়া তৃতীয় ধ্যান—ইহার পরে সুখদুঃখকে অতিক্রম করিয়া চতুর্থ ধ্যান। বৌদ্ধশাস্ত্রে ধ্যানাবস্থায় মৈত্রী-সাধনার কথা আছে। 'মৈত্রী' ভাবনার স্বরূপ :

'মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবংপি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং॥'

স্নেহময়ী মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করেন, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি হৃদয়ে অপরিমিত ভালবাসা পোষণ করিতে হইবে। বিশ্বের সকল প্রাণীর উপর প্রীতির ভাবই বিশ্বমৈত্রী। ঊর্ধ্বে নিম্নে চতুর্দিকে সমগ্র বিশ্বের প্রতি বাধাহীন অপরিমেয় এই 'করুণা'ভাব। আরও :

'যদা মম পরেসং চ তুল্যমেব সুখং প্রিয়ম্।
তদাত্মনঃ কো বিশেষো যেনাত্রৈব সুখোদ্যমঃ॥'

আমার নিকট সুখ যেমন প্রিয়, অন্যের সুখও

তাহার কাছে তেমনি প্রিয়। অতএব অন্য হইতে আমার পার্থক্য কোথায়? কেন আমি কেবল নিজের সুখের জন্য চেষ্টা করিব? সত্যই অতুলনীয় এই ভাব—এই সাধনা!

মুদিতা উপেক্ষা মৈত্রী ও করুণা-ভাবনা বৌদ্ধ-ধর্মের সাধন-পন্থায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এইবার পাঁচটি অরূপ ধ্যানের প্রসঙ্গ আসে। এইগুলি—পূর্বোক্ত রূপ-মূলক ধ্যান অপেক্ষা উচ্চতর। সাধক যথাক্রমে 'অনন্ত আকাশ', 'অনন্ত বিজ্ঞান' এবং 'অনন্ত শূন্যের' জ্ঞানলাভ করিয়া সেই সেই আয়তনে বিহার করেন। সর্বশেষ অরূপ ধ্যানে সর্বাবস্থাতেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

বৌদ্ধ-শাস্ত্রানুমোদিত এই সকল সাধন-প্রণালী যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে নির্বাণ লাভ হয়। নির্বাণের অর্থ—সংসার-বাসনার নির্বাণ, ব্যবহারিক সত্তা ও উপাধির নির্বাণ। দুঃখ-নিবৃত্তির পর যে অবস্থা হয় তাহাই নির্বাণ—তখন অনিত্য সংসারের সব কিছু হইতেই নিবৃত্তি। নির্বাণই—নিত্যাবস্থা, পরমাবস্থা। যিনি সুখে দুঃখে, নিন্দাস্তুতিতে, আসক্তি-বিরাগে—সকল অবস্থায় সমভাবাপন্ন, তাঁহার তৃষ্ণা রাগ দ্বেষ মোহ—সব ক্ষয় হইয়া যায়। এই নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষের শান্তি ও সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য।

জ্ঞানলাভ ও তৃষ্ণা-ক্ষয় সম্বন্ধে বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণীয়:—

'অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্‌পুনং।
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
ভগ্‌গা তে ফাসুকা সব্বা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তন্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা॥'

গৃহকারক (শরীররূপ গৃহের নির্মাতা) কে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বার বার এই সংসারে জন্মলাভ করিলাম। দুঃখকর এই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ! হে গৃহকারক, এইবার আমি তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি—আর তুমি গৃহ-নির্মাণ করিতে পারিবে না, গৃহে সকল পঞ্জরাস্থি ভাঙিয়া গিয়াছে, গৃহকূট ধ্বংসপ্রাপ্ত। আমার চিত্ত বিগতসংস্কার হইয়াছে—আর কামনার মোহঘোরে বাঁধা পড়িবে না। আমার সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত।

মানবপ্রেমিক বুদ্ধের ত্যাগ তপস্যা সাধনা ও সিদ্ধির সমুদয় ফল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায়' নিয়োজিত ছিল। তাই তাঁহার কণ্ঠ হইতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া নির্গত হইয়াছিল: অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে—যতদিন সেই সব জীব মুক্তিলাভ না করে ততদিন আমি তাহাদের সেবা করিব।

'এবমাকাশনিষ্ঠস্য সত্ত্বধাতোরনেকধা।
ভবেয়মুপজীব্যোহং যাবৎ সর্বে ন নির্বৃতাঃ।'

দুঃখের পারে

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

দুঃখের তরে বিধাতারে শুধু
মিছে দুষিও না নিত্য;
দোষ তাঁর নয়, হয়তো হয়েছে
তোমারি মলিন চিত্ত।

দুঃখ-পারের দ্বার খোলা আছে
সকলের তরে সতত;
সেই পারে শুধু প্রবেশ করিতে
যত্ন করে যে নিয়ত।

বুদ্ধবাণী

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী

(১)

চিত্ত

চিত্ত যাহার মুক্ত বাসনা হতে—
নাহি হয় চঞ্চল,
পাপ ও পুণ্য করে সে অতিক্রম,
হয় চির নির্ম্মল !
প্রশান্তি আর আনন্দ-রসে ডুবে
রহে সে সকল ক্ষণ,
দুঃখ ভুলিয়া করে এ ভুবন মাঝে
নির্ভয়ে বিচরণ !
চিত্ত যখন বিপথের পানে ধায়,
হয় সে অতীব ক্রুর,
শত্রুর চেয়ে হয় সে ভীষণতর—
নির্ম্মম নিষ্ঠুর !

(২)

নির্ব্বাণ

যে প্রদীপ নিভে যায়, তৈল যায় নিঃশেষে ফুরায়ে,
আলোকের ছটা তার হয় লীন, আর নাহি জ্বলে !
গভীর শান্তির মাঝে আপনারে দেয় সে ডুবায়ে,
অস্তিত্ব থাকে না তার কোন দিকে আকাশে ভূতলে!
সেইরূপ এ ভুবনে যে পুণ্যাত্মা লভেছে নির্ব্বাণ,
নাহি থাকে অস্তিত্বের কোন ঠাঁই—একটু স্পন্দন।
ক্লেশ তার ধরণীতে ধীরে ধীরে হয় ক্ষীয়মাণ,
পরম-শান্তির মাঝে ডুবে যায় তাহার পরাণ !*

* মহাকবি অশ্বঘোষ রচিত কাব্যাংশের ভাবানুবাদ।

বৌদ্ধধর্ম্মে সাধনতত্ত্ব

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বিদ্যাবিনোদ

ভগবান্ তথাগত রাজগৃহের বেণুবন বিহারে অবস্থানকালে একদা তাঁহার ধর্ম্মের সাধনমার্গ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন,—

বাচানুরক্খী মনসা সুসংবুতো
কায়েন চ অকুসলং ন কয়িরা,
এতে তয়ো কম্মপথে বিসোধয়ে
আরাধয়ে মগ্‌গমিসিপ্পবেদিতং। (ধম্মপদ, ২৮১)

বাক্যে সংযম রক্ষা করিবে, মনে সংযত থাকিবে এবং কায়দ্বারা অকুশল কর্ম করিবে না। এই ত্রিবিধ কর্ম্মপথকে বিশুদ্ধ রাখিবে। এইরূপে ঋষিগণ প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিবে।

বাক্য, দেহ ও মন—এই তিনটি কর্ম্মপথের সম্যক্ পরিশুদ্ধি সম্পাদিত হইলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা নির্বাণ লাভ হয়—ইহাই বুদ্ধদেশিত ধর্ম্মের সারতত্ত্ব। এই তিনটি কর্ম্মপথের বিশুদ্ধিবিধানার্থ তিনি যে সাধনার সুবিন্যস্ত সোপান পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা "আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ" নামে অভিহিত। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—"মগ্‌গানট্‌ঠঙ্গিকো সেট্‌ঠো"—নির্বাণগামী যতগুলি পথ রহিয়াছে তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এসো ব মগ্‌গো নত্থঞ্ঞো দস্‌সনস্‌স বিসুদ্ধিয়া,
এতং হি তুম্হে পটিপজ্জথ মারস্‌সেতং পমোহনং। (ঐ ২৭৪)

দর্শন-বিশুদ্ধির জন্য এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই একমাত্র পথ, অন্য পথ নাই। তোমরা এই মার্গই অবলম্বন কর; ইহাই মার (পাপের অধিদেবতা)কে মূর্চ্ছিত অর্থাৎ পরাভূত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া এই মার্গকে "আর্য" বলা হয়; অথবা নির্বাণকামী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কর্তৃক নিষেবিত বলিয়াও ইহার নাম "আর্য"। আচার্য বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে (বিসুদ্ধিমগ্‌গো) 'আর্য' শব্দের উভয় প্রকার নির্বচনই নির্দেশ করিয়াছেন।

ভগবান্ তথাগত কর্তৃক উপদিষ্ট অষ্টাঙ্গ সাধন-মার্গ প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি বা চিত্ত—এই তিনটি বর্গ বা স্কন্ধে বিভক্ত। সম্যক্ সংকল্প 'প্রজ্ঞা' স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত; সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত ও সম্যক্ আজীব 'শীল' স্কন্ধ এবং সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি 'চিত্ত' (বা 'সমাধি') স্কন্ধের অন্তর্গত।

'প্রজ্ঞা' স্কন্ধের সাধনা দ্বারা সাধককে জাগতিক বিষয়ের প্রতি লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করিয়া নিত্যানিত্য কুশল অকুশল বিচারপূর্বক সত্যদৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে হয়—ইহারই নাম 'সম্যক্‌দৃষ্টি' (সম্মা দিট্‌ঠি)। তৎপর অনিত্য ও অকুশলকে বর্জনকরত নিত্য ও কুশলকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতে হয়—ইহাই 'সম্যক্ সংকল্প' (সম্মা সঙ্‌কপ্পো)।

শুধু বিচার বা সংকল্প করিলেই হইল না, সাধককে তদনুযায়ী জীবনযাপন করিতে হইবে, বিচারকে আচারে পরিণত করিতে হইবে,—ইহাই 'শীল'স্কন্ধের সাধনা। মিথ্যা কঠোর ও অনর্থক বাক্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সত্য প্রিয় ও সার্থক বাক্যপ্রয়োগ করিতে হইবে,—ইহার নাম 'সম্যক্ বাক্' (সম্মা বাচা)। প্রাণিহিংসাদি অশুভ কর্মত্যাগ ও সতত কুশল কর্মের অনুষ্ঠান,—ইহাই 'সম্যক্ কর্মান্ত' (সম্মা কম্মন্তো) নামে অভিহিত। কাহাকেও প্রতারণা না করিয়া সাধু উপায়ে জীবিকার্জন করার নাম 'সম্যক্ আজীব' (সম্মা আজীবো)। সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত ও সম্যক্ আজীব—এই তিনটি শীলস্কন্ধের সাধনা দ্বারা সাধকের বাক্য ও দেহ-পরিশুদ্ধি সংসাধিত হয়।

তৎপর 'চিত্ত বা সমাধি'স্কন্ধের অর্থাৎ চিত্তদর্পণ মার্জনের সাধনা আরম্ভ হয়। এই সাধনার তিনটি অঙ্গ যথা সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। সর্বদা অকুশল বিষয়ে চেষ্টা পরিহার করিয়া কুশল বিষয়ে দৃঢ় প্রচেষ্টা,—ইহার নাম 'সম্যক্ ব্যায়াম' (সম্মা ব্যাযামো)। বহির্মুখীন দৃষ্টিকে অন্তর্মুখীন করিয়া দেহ ও মনের স্বরূপ অবস্থা চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ করার যে সাধনা তাহাই 'সম্যক্ স্মৃতি' (সম্মা সতি) নামে অভিহিত। তৎপর 'সম্যক্ সমাধি' (সম্মা সমাধি) বা ধ্যানযোগের সাধনা আরম্ভ হয়। সকল কামনা বাসনা এবং পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধককে ক্রমশঃ ধ্যানের উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে হয়। ধ্যানের নয়টি স্তর। নবম ধ্যানে অধিরূঢ় সাধকই নির্বাণের সাক্ষাৎকার (সচ্ছিকিরিয়া) লাভে সমর্থ হন এবং ঐ অবস্থাতেই সাধকের অন্তরে বোধির দিব্য আলোক প্রকাশিত হয় এবং অবিদ্যার (অবিজ্জা) অন্ধকার চিরতরে নিরাকৃত হইয়া যায়। নির্বাণপ্রাপ্ত অর্হৎ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,

ছন্দরাগবিরত্তো সো ভিক্‌খু পঞ্‌ঞাণবা ইধ,
অজ্‌ঝগা অমতং সন্তিং নিব্বানপদমচ্চুতং। (সুত্তনিপাত, ২০৪)

তৃষ্ণা ও আসক্তি বিবর্জিত প্রজ্ঞাবান্ ভিক্ষু এই জগতেই অক্ষয় নির্বাণের অমৃত শান্তি প্রাপ্ত হন।

পূর্বোক্ত শীলস্কন্ধের সাধনার সহিত (সমাধি বা) চিত্তস্কন্ধের সাধনার কিরূপ সম্পর্ক, নির্বাণের পথে ইহারা সাধককে কিভাবে কতদূর অগ্রসর করিয়া দেয় তাহা 'মিলিন্দপ্রশ্ন' (মিলিন্দ পঞ্‌হো) গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেন শিষ্য যবনরাজ মিলিন্দকে (Menander) একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত সাহায্যে এই ভাবে বুঝাইয়াছেন,—

"যথা মহারাজ নগরবড্ঢকী নগরং মাপেতুকামো পঠমং নগরট্‌ঠানং সোধাপেত্বা খাণুকণ্টকং অপকড্ঢাপেত্বা ভূমিং সমং কারাপেত্বা ততো অপরভাগে বীথিচতুক্ক-সিঙ্ঘাটকাদি পরিচ্ছেদেন বিভজিত্বা নগরং মাপেতি, এবমেব খো মহারাজ যোগাবচরো সীলং নিস্সায় সীলে পতিট্‌ঠায় পঞ্চিন্দ্রিয়ানি

ভাবেতি সদ্ধিন্দ্রিয়ং বিরিয়িন্দ্রিয়ং, সতিন্দ্রিয়ং, সমাধিন্দ্রিয়ং পঞ্ঞিন্দ্রিয়ং' তি।" (মিলিন্দ পঞ্‌হো)

—অরণ্য কাটিয়া নগর পত্তন করিতে হইবে। প্রথমতঃ নগরবর্ধকী (ইঞ্জিনিয়ার) বৃক্ষাদি কর্তন করিয়া স্থানটি পরিষ্কার করেন, তৎপর স্থাণু কণ্টকাদি উৎপাটন করিয়া জমিকে সমতল করিয়া প্রস্তুত করেন। এই সকল কার্য শেষ হইয়া গেলে নক্সা অনুযায়ী বীথি, চতুষ্ক, রাজপ্রাসাদ, নাগরিকদের বাসভবন ইত্যাদি নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। শীল-স্কন্ধের সাধনা হইল চিত্তের বনভূমিকে পরিষ্কৃত করিয়া তাহাকে বোধিচিত্তরূপ নগর নির্মাণের উপযুক্ত করিয়া তোলা শীলস্কন্ধের সাধনা দ্বারা পরিষ্কৃত ভূমির উপর সমাধি বা চিত্তস্কন্ধের সাধনা অবলম্বনে বোধিচিত্তরূপ নগর নির্মাণ করিতে হইবে।

সমাধি বা চিত্তস্কন্ধের সাধনার প্রথম কথাই হইল, বহির্মুখীন চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করিয়া অন্তর্মুখীন, একাগ্র, স্থির ও প্রশান্ত করা। বুদ্ধদেব এই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন,—

ফন্দনং চপলং চিত্তং দূরক্খং দুন্নিবারয়ং,
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারোব তেজনং। (ধম্মপদ, ৩৩)

যেমন তীর নির্মাণকারী তীরকে সোজা করিয়া প্রস্তুত করে, তেমনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্পন্দনশীল, চপল, দুরক্ষণীয় ও দুর্নিবার্য চিত্তকে সরল করেন অর্থাৎ নিজবশে আনয়ন করেন।

চঞ্চল ও অবশীভূত চিত্ত যেমন পরম শত্রুর ন্যায় সর্বনাশ ঘটায়, তেমনি সংযত ও বশীভূত চিত্ত পরম মিত্রের ন্যায় হিতসাধন করিয়া থাকে;—

দিসো দিসং যং তং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং,
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিয়োনং ততো করে। (ঐ-৪২)

একজন দোষকারী ব্যক্তি অপরের, কিংবা একজন শত্রু অপর শত্রুর যতটা ক্ষতি করিতে পারে, বিপথ-গামী চিত্ত মনুষ্যের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে। আবার,—

ন তং মাতা পিতা কয়িরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা,
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে। (ঐ-৪৩)

সম্যক্ নিয়ন্ত্রিত চিত্ত মনুষ্যের যেমন উপকার করে, মাতাপিতা বা অন্য কোন আত্মীয়ই তেমন করিতে পারে না। বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট 'সম্যক্ ব্যায়াম' অভ্যাস-যোগেরই সাধনা, আর 'সম্যক্ স্মৃতি' হইতেছে বৈরাগ্যের সাধনা। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহার সাধক-জীবনে কি প্রকারে "সম্যক্ ব্যায়ামের" সাধনা করিয়াছিলেন, অগ্নিবেশ নামক জনৈক ভিক্ষুর নিকট তাহা এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন;—

দন্তে দন্তে সংলগ্ন করিয়া তালুতে জিহ্বা সংশ্লিষ্ট করিয়া এমন ভাবে বলের সহিত চিত্তকে নিগ্রহ করিতাম যে, আমার শরীর হইতে ঘর্ম বিগলিত হইত। (মজ্‌ঝিম নিকায়, মহাসচ্চক সুত্ত)

সম্যক্ ব্যায়ামের সাধনাতে সাধককে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দৃঢ় বীর্য সহকারে লক্ষ্যাভি-মুখে অগ্রসর হইতে হয়। আলস্য, অবসাদ, হীনমন্যতা সর্বতোভাবে পরিবর্জন করিতে হয়। বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে আচার্য শান্তিদেব ইহাকেই 'বীর্যপারমিতা' সাধনা নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'বীর্য' কাহাকে বলে?

কিং বীর্যং কুশলোৎসাহস্তদ্বিপক্ষঃ ক উচ্যতে।
আলস্যং কুৎসিতাসক্তিবিষাদাত্মাবমন্যতা॥
(বোধিচর্যাবতার—৭।২)

বীর্য কি? কুশল বিষয়ে উৎসাহ। বীর্যের প্রতি-বন্ধক কি?—আলস্য, কুৎসিত বিষয়ে আসক্তি, বিষাদ এবং আত্মাবমাননা।

সাধক কোন কিছুতেই মনকে দুর্বল হইতে দিবেন না। মন দুর্বল হইয়া গেলে সামান্য বাধা-বিঘ্নও তাঁহাকে পরাভূত করিবে।

মৃতং ডুণ্ডুভমাসাদ্য কাকোঽপি গরুড়ায়তে।
আপদাবাধতেঽল্পাপি মনো মে যদি দুর্বলম্॥ (ঐ—৭।৫২)

আমার মন যদি দুর্বল হয় তবে সামান্য আপদও আক্রমণ করে, যেমন মৃত ঢোঁড়া সাপকে পাইয়া কাকও গরুড়ের মত বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে।

নির্বাণের সাধককে দিগ্বিজয়ী বীরের সাহসি-কতা ও আত্মপ্রত্যয় অবলম্বন করিয়া সাধন-সমরে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তাঁহাকে অন্তরে এই আত্ম-

প্রত্যয়ের বহ্নি উদ্দীপিত করিতে হইবে যে, আমি জিন (বুদ্ধ)-সিংহসুত, আমিই সকলকে জয় করিব, আমাকে প্রতিহত করিতে পারে এমন কে আছে ?

ময়া হি সর্বং জেতব্যমহং জেয়ো ন কস্যচিৎ।
ময়ৈষ মানো বোঢ়ব্যো জিনসিংহসুতোহহম্॥ (ঐ—৭।৪৫)

'আমাকেই সমস্ত জয় করিতে হইবে, আমি কাহারও দ্বারা জিত হইব না'—এই সম্মান আমাকে বহন করিতেই হইবে—কারণ আমি যে সর্বজয়ী বুদ্ধরূপ সিংহের সন্তান।

এই ভীষণ সাধনসমরে সাধককে বিশেষ সাবধানতা সহকারে কামক্রোধাদি রিপুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এবং সুযোগ বুঝিয়া প্রতিপক্ষকে আঘাত হানিয়া নিপাত করিতে হইবে।

ক্লেশ-প্রহারান্ সংরক্ষেৎ ক্লেশাংশ্চ প্রহরেদ্ দৃঢ়ম্।
খড়্গাযুদ্ধমিবাপন্নঃ শিক্ষিতেনারিণা সহ॥ (ঐ—৭।৬৭)

সুশিক্ষিত শত্রুর সহিত খড়্গযুদ্ধে প্রবৃত্ত যোদ্ধার ন্যায় 'ক্লেশে'র প্রহার হইতে আত্মরক্ষা করিবে এবং ক্লেশ সমূহকে দৃঢ় প্রহার করিবে। 'ক্লেশ' সাধন পথের কণ্টক ; ইহা পঞ্চবিধ যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

আচার্য শান্তিদেব নির্বাণের সাধককে এই বলিয়া উদ্দীপিত করিতেছেন যে, বুদ্ধদেব প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে কেহ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনা গ্রহণ করিবে সে নিশ্চয়ই বোধিপ্রাপ্ত হইবে। তাঁহার কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, অতএব অবসাদ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হও।

নৈবাবসাদঃ কর্তব্যঃ কুতো মে বোধিরিত্যতঃ।
যস্মাৎ তথাগতঃ সত্যং সত্যবাদীদমুক্তবান্॥ (ঐ—৭।১৭)

'আমার কিরূপে বোধিলাভ হইবে'—এইরূপ চিন্তা করিয়া অবসন্ন হওয়া কখনও উচিত নহে। তথাগত সত্যবাদী, তিনি যখন বলিয়াছেন—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনা দ্বারা বোধিলাভ হয়, তখন অবশ্যই তাহা লাভ করা যাইবে।

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী গম্ভীরানন্দ

এবারে আমরা কথামৃত প্রথম ভাগে (২২৩—২৩৩ পৃঃ) উল্লিখিত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চের ঘটনার অনুসরণ করিব। ঐ দিন আন্দাজ বেলা দশটার সময় দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে প্রসাদ পাইয়াছিলেন, আহারান্তে বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় বিদ্যালয়ের অবসরকালে মাষ্টার মহাশয় দ্বিপ্রহরে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অল্পবয়স্ক ভক্তেরা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "হাঁগা, এটা আমার কদিন ধরে হচ্ছে কেন বল দেখি—ধাতুর কোন জিনিসে হাত দেবার যো নাই।" কিছু পরে মাস্টার বিদ্যালয়ে চলিয়া গেলেন।

বিকালে পুনর্বার আসিয়া তিনি দেখেন ঠাকুর পূর্ববৎ বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন—পার্শ্বে রহিয়াছেন শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ, সুরেন্দ্র মিত্র, বলরাম, লাটু, চুনিলাল প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথের ধর্মভাব ও তৎকালীন সাংসারিক দুরবস্থা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা হইল। অতঃপর ঠাকুর গান শুনিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত তারাপদ গাহিলেন, 'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ-কাননচারী।'

পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কথা উঠিলে ঠাকুর বলিলেন, 'শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে ? ...যার সংসারে আসক্তি আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—মিছে পড়া।' পরে ঠাকুরও গান গাহিলেন। কথা কহিতে কহিতে

সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন ও সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছেন। ঠাকুর লোক-শিক্ষার্থ প্রার্থনা করিলেন, "মা, আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না; (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না। কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই; তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়; মা, তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধন-হীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।" (ঐ ২৩৪ পৃষ্ঠা)। পরে শ্রীযুক্ত গিরিশের নিমন্ত্রণে সেই রাত্রেই তাঁহার বাটীতে গেলেন, পথে নরেন্দ্রনাথও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সেদিন গিরিশভবনে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তি বিতরণ করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন।

৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে (৩য় ভাগ, ১৫০ পৃঃ) ঠাকুর বলরাম-ভবনে আসিয়াছেন। এখান হইতে ভক্তবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের গৃহে যাইবেন। তার আগে বসুপাড়ার ভক্তমন্দিরের বৈঠকখানায় বসিয়া ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। বিশেষতঃ মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। পূর্ণ, ছোট নরেন, বাবুরাম, রাখাল, পল্টু, বিনোদ প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। পরে ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের গৃহে চলিলেন।

কথামৃতের ৩য় ভাগে সংরক্ষিত—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ)-এর বিবরণটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং মনোহর (১৬১—১৮৯ পৃষ্ঠা); ইহার বিষয়বস্তুও বিবিধ। সেদিন রবিবার এবং বৎসরের প্রথম দিন। তাই ভক্ত-সমাগমও বেশ হইয়াছে। সেখানে আছেন—গিরিশ, মাস্টার, বলরাম, ছোট নরেন, পল্টু, দ্বিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুখুয্যে প্রভৃতি; ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি একে একে অনেকেই আসিয়াছেন। মেয়ে ভক্তেরা অনেকে চিকের আড়ালে বসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর সেদিন নিজের সাধনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। ধ্যানের সময় তিনি দেখিতেন, শূল-হাতে একজন বসিয়া আছে এবং শাসাইতেছে, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন না রাখিলে বুকে শূল বসাইয়া দিবে। মন কখনও মায়ের ইচ্ছায় নিত্য হইতে লীলায় নামিয়া আসিত, আবার লীলা হইতে নিত্যে উঠিয়া যাইত। লীলায় অবস্থান-কালে সীতারামের চিন্তা দিনরাত চলিত, আর সীতারামের রূপদর্শন হইত। রাম-লালা (গোপালকে) লইয়া সর্বদা বেড়াইতেন, তাঁহাকে নাওয়াইতেন খাওয়াইতেন। আবার কখন রাধা-কৃষ্ণের ভাবে থাকিতেন—পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের এই মিলন অবস্থায় সর্বদা শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন হইত। আবার যখন মন লীলা হইতে নিত্যে উঠিয়া গেল, তখন সজনে তুলসী সমান বোধ হইত। যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলিয়া ফেলিলেন—কেবল সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, সেই আদি পুরুষকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ষট্‌পদ্মের উন্মীলন দেখিয়াছিলেন—মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত সমস্ত পথ কিরূপে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া উঠিল। ধ্যানকালে তিনি নিবাত দীপশিখার আরোপ করিতেন।

এই সব বহু অপূর্ব আত্মকথার পর সেদিন আরও বলিয়াছিলেন (১৬১—১৬৪ পৃঃ): —সিদ্ধাই (অলৌকিক শক্তি)কে মা দেখাইয়া-ছিলেন বুড়ি বেশ্যার মলত্যাগরূপে। পাপপুরুষ লড়ায়ে গোরার রূপে আসিয়া টাকা, মান, স্ত্রী-সম্ভোগ ও নানা শক্তি দিতে চাহিয়াছিল। ঠাকুর জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা ওকে কেটে ফেল।" মায়ের ভুবনমোহন রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন। ভক্তদিগকে উহা বলিতেও

চাহিলেন; কিন্তু মা বলিতে দিলেন না। বটতলায় ধ্যানকালে তিনি দেখিয়াছিলেন একজন মুসলমান সানকিতে ভাত লইয়া সামনে আসিলেন। তিনি সানকি হইতে ম্লেচ্ছদের খাওয়াইয়া ঠাকুরকেও দুইটি দিয়া গেলেন। জগদম্বা তাঁহাকে দেখাইলেন, "এক বই দুই নয়। সচ্চিদানন্দই নানারূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।" এই সব দর্শন ও অনুভূতির কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবস্থ হইলেন। ভাবসংবরণ হইলে তিনি পূর্ণকে দেখিতে চাহিলেন। তাই পূর্ণকে আনিতে লোক গেল। (১৬৮ পৃঃ)

ইহার পরে ঠাকুর নিজের মহাভাবের কথা বর্ণনা করিলেন: "আমি এই অবস্থায় তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। নড়তে চড়তে পারতাম না—এক জায়গায় পড়েছিলাম। হুঁশ হলে বামনী আমায় ধরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার যো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিছল। গায়ে যেসব মাটি লেগেছিল পুড়ে গিছল। যখন সেই অবস্থা আসত শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে দিত। 'প্রাণ যায়, প্রাণ যায়' এই করতাম। কিন্তু তারপর খুব আনন্দ। ···এতদূর তোমাদের দরকার নাই। আমার অবস্থা নজিরের জন্য।"

এইরূপ নানা কথাবার্তার পর ত্রৈলোক্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার গান আরম্ভ হইল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সন্ধ্যা আগতপ্রায়—এমন সময় গান থামিল। ত্রৈলোক্য আসার পূর্বে তাঁহার রচিত 'কেশব-চরিত' পড়া হইতেছিল। ত্রৈলোক্য লিখিয়াছেন—কেশবের সংস্পর্শে আসিয়া সংসার-সম্বন্ধে ঠাকুরের মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। এখন সুযোগ বুঝিয়া গিরিশ ত্রৈলোক্যকে বলিলেন, "আপনি যা লিখেছেন —যে সংসার-সম্বন্ধে এঁর মত পরিবর্তন হয়েছে, তা বস্তুতঃ হয় নাই।" ত্রৈলোক্য সংসারের নিজস্ব সার্থকতা দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাঁহার মত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বলিলেন যে, সংসার এবং ভগবান দুই একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। "ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। ···তখন ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়, টাকা ফাকা কিছুই ভাল লাগে না।" (১৮৩ পৃঃ)

গিরিশ আবার বিচার তুলিলেন অবতারবাদ সম্বন্ধে। ত্রৈলোক্য ইহা মানেন না। একটু পরে বলরাম ত্রৈলোক্য প্রভৃতিকে মিষ্টিমুখ করাইবার জন্য কক্ষান্তরে লইয়া গেলে ঠাকুর গিরিশকে বলিলেন, "ওদের সঙ্গে বকচো কেন? ওরা দুইই নিয়ে আছে। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ না পেলে সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না।" অবতারতত্ত্ব লইয়াই সে রাত্রির প্রসঙ্গ শেষ হইল। ঠাকুর বলিলেন, "সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে আছে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্চে। তারা কখনও সংসারে বদ্ধ হয় না—বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোটা 'আমি নয়'—সংসারী লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহংকার, সংসারী লোকদের 'আমি'—যেন চতুর্দিকে পাঁচিল, মাথার উপর ছাদ। বাহিরে কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদির আমি পাতলা আমি। এ আমির ভেতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে—পাঁচিলের দুইদিকে অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে, পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে আনাগোনাও হয়। অবতারাদির আমি ঐ ফোকর-ওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়—এর মানে দেহধারণ করলেও তারা সর্বদা যোগেতেই থাকে। আবার ইচ্ছা হলে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে—সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারে"। (১৮৮-১৮৯ পৃঃ)

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল গিরিশ-ভবনে উৎসব হইবে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে আসিয়া দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টার মহাশয় আসিলে তাঁহাকে তিনি নিজের গলরোগের আরম্ভের কথা জানাইয়া বলিলেন। "কে জানে বাপু, আমার গলায় বিচি হয়েছে। শেষ রাত্রে বড় কষ্ট হয়। কিসে ভাল হয় বাপু?" (তৃতীয় ভাগ, ৩৮ পৃঃ)। সেদিন সেখানে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র, বাবুরামও ছিলেন। পরে নরেন্দ্র, ছোট নরেন, রামবাবু প্রভৃতিও আসিয়াছিলেন। বেলা পড়িলে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গিরিশ-ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। বোস-পাড়ার গলিতে প্রবেশ করিতে করিতে মাস্টার মহাশয়কে বলিতেছেন, "হ্যাঁগা, কি বলে? 'পরমহংসের ফৌজ আসছে?' শালারা বলে কি?" (সকলের হাস্য)

৯ই মে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ আজও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সেখানে আছেন—নরেন্দ্র, মাস্টার, ভবনাথ, পূর্ণ, পল্টু, ছোট নরেন, গিরিশ, রামবাবু, দ্বিজ, বিনোদ প্রভৃতি। কিন্তু বলরাম নাই। তিনি বায়ু-পরিবর্তনের জন্য মুঙ্গেরে গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ঠাকুর ও ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। উপদেশ প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন, "কি জান, একটি কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের সূক্ষ্ম-গতি। ছুঁচে সূতা পরাচ্ছে, কিন্তু সূতার ভিতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর প্রবেশ করবে না। ত্রিশ বছর মালা জপে; তবু কেন কিছু হয় না?"

কথায় কথায় অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে গিরিশের সহিত নরেন্দ্রের বিচার আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে পল্টু, ভবনাথ ও স্বয়ং ঠাকুর যোগ দিতে লাগিলেন। পরে নরেন্দ্র কয়েকখানি গান গাহিলেন; শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা! মনের নাশ হলেই হয়। মনের নাশ হলেই অহংনাশ—যেটা 'আমি' 'আমি' করছে। এটা ভক্তিপথেও হয়; আবার জ্ঞানপথে, বিচারপথেও হয়। ...সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে কি দেখেছে বলতে পারে না"।

সন্ধ্যার পরে ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে—হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে। এখানকার যারা লোক তারা সব জুটে গেছে। আর সব এখন যারা যাবে, তারা বাহিরের লোক। তারাও এখন মাঝে মাঝে যাবে। (মা) তাদের বলে দেবে, 'এই কোরো, এই রকম করে ঈশ্বরকে ডাকো।"

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দিবসে বলরাম-ভবনে যে ক্ষুদ্র অথচ হৃদয়স্পর্শী আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা পূর্বে পাইয়াছি। এবারে আমরা ১৮৮৫-এর ১৪ই জুলাই-এ অনুষ্ঠিত রথোৎসবের অনুসরণ করিব। বলরামের আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্বদিন ১৩ই জুলাই বলরাম-মন্দিরে শুভাগমন করিয়া সকালে ৯টায় ভক্তসঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। মাস্টার মহাশয়ের সহিত অল্পবয়স্ক ভক্তদের সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন—নরেন্দ্র, ছোট নরেন, পূর্ণ, ভবনাথের বিষয়ে। বলিলেন, "তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ...রণজিৎ রায়ের ঘরে ভগবতী কন্যা হয়ে জন্মেছিলেন।"

সন্ধ্যা ছয়টার দিকে অতুল ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা আসিয়াছেন। কৃষ্ণধন নামক এক রসিক ব্রাহ্মণকে ঠাকুর বলিতেছেন, "কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি দিনরাত ফষ্টিনষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ। ঐটি ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। যে নুনের হিসাব করতে পারে, সে মিশ্রির হিসাবও করতে পারে।" কৃষ্ণধন (সহাস্যে)—"আপনি টেনে নিন।"

ঠাকুর "আমি কি করব ? তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে। 'এ মন্ত্র নয়—এখন মন তোর'।" পাশের পশ্চিমের ঘরে ঠাকুর সে রাত্রি যাপন করিবেন ; তাই সাড়ে দশটায় শয্যা গ্রহণ করিলেন।

পরদিন, ১৪ই জুলাই রথযাত্রা। সকালে শ্রীযুক্ত হরিনাথ (পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ) আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "কি গো, তুমি অনেক দিন আস নাই। ···তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে ? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য। 'আমি' যখন তিনি পুঁছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে। মুখে বলা যায় না। যতক্ষণ 'আমি' রেখে দিয়েছেন ততক্ষণ সবই নিতে হবে।" হরি মহারাজ তখন একলা ঘরে বসিয়া বেদান্ত চর্চা করিতে ভালবাসিতেন।

বেলা দশটায় কাশীর মণিকর্ণিকার শিবদর্শনের কথায় ঠাকুর বলিলেন, "সেজ বাবুর সঙ্গে যখন কাশী গিয়াছিলাম, মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিবদর্শন। আমি নৌকার ধারে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। মাঝিরা হৃদেকে বলতে লাগল, 'ধর ধর'—পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত 'গম্ভীর' নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখলাম দূরে দাঁড়িয়ে, তারপর কাছে আসতে দেখলাম, তারপর আমার ভেতরে মিলিয়ে গেলেন।······ভাবে দেখলাম, সন্ন্যাসী হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি ঠাকুর বাড়িতে ঢুকলাম—সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হ'ল।" শালগ্রাম পূজার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবসমাধিস্থ হইলেন। সমাধি-ভঙ্গে বলিলেন, "কি দেখছিলাম, ব্রহ্মাণ্ড একটা শালগ্রাম।"

ক্রমে নরেন্দ্র আসিলেন, কামারহাটির বামনী (গোপালের মা)ও আসিলেন। ঠাকুর বলরামকে লোক পাঠাইয়া বামনীকে আনিতে বলিয়াছিলেন। (পৃঃ ২৫৮) বেলা একটা হইয়াছে। ঠাকুরের কথায় নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন। পরে বৈষ্ণব-চরণের সম্প্রদায় কীর্তন গাহিলেন। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি-ভঙ্গে ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন। কীর্তন চলিতে লাগিল। পরে বনোয়ারীর কীর্তনও হইল। ইতিমধ্যে রথ বাহির হওয়ায় ঠাকুর কীর্তন ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ন। দোতলার বারান্দায় রথ টানা হইল। ঠাকুর রথের রজ্জু ধরিয়া নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিলে ভক্তেরাও তাহাতে যোগ দিলেন। ইহার পর তিনি ঘরে আসিয়া বসিলে নরেন্দ্র গান ধরিলেন। রাত্রি নয়টায় আবার বৈষ্ণবচরণের গান হইল এবং দশটা এগরটার সময় ভক্তেরা একে একে বিদায় লইলেন।

পরদিন ১৫ই জুলাই। প্রভাতে ঠাকুর নাম করিতেছেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ, গোপীকৃষ্ণ ; গোপী গোপী, রাখাল-জীবন কৃষ্ণ, নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ", তারপর নারায়ণের নাম কীর্তন করিয়া নাচিতেছেন। অবশেষে ভক্ত সঙ্গে ছোট ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। বসিয়া বলিতেছেন, অতি গুহ্যকথা : কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র এদের সব এত ভালবাসি। জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে "তুমি শরীর ধারণ করেছ—এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য বাৎসল্য এই সব ভাব লয়ে থাক।" (২৬৬ পৃঃ)

এইরূপে বেলা আটটা নয়টা বাজিয়া গেলে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাইতে উদ্যত হইলেন। বাগবাজারে ৺অন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকা আছে। ঠাকুর দুই একটি ভক্তের সঙ্গে নৌকায় গিয়া বসিলেন। গোপালের মাও ঐ নৌকায় উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে তিনি হাঁটিয়া কামারহাটি যাইবেন।

এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কথামৃত ৫ম

ভাগে ১৭৭ পৃষ্ঠায় এই রথযাত্রায় পরদিবসের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। উহাতে শ্রীমুখকথিত নরেন্দ্রের গুণাবলী স্মরণে মাষ্টার মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন।

কথামৃতের সর্বশেষ বর্ণনার তারিখ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই (৩য় ভাগ, ৮ম খণ্ড ২৩৫-২৫৫ পৃঃ)। সেদিন পূর্বাহ্নে বলরাম-ভবনে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের সহিত ৺জগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বিকালে তাঁহার আহ্বানে অনেক যুবক ভক্ত বলরাম-ভবনে আসিয়াছেন। একটু পরেই তিনি পালকি করিয়া নন্দ বসুর বাড়িতে গেলেন। সেখান হইতে সদলবলে শোকাতুরা ব্রাহ্মণী অর্থাৎ গোলাপ-মার গৃহে পদার্পণ করিলেন। ঐ বাড়ী হইতে তিনি আবার গণুর মার বাড়ীতে গেলেন এবং রাত্রি প্রায় পৌনে এগারটায় বলরাম-গৃহে ফিরিয়া বৈঠকখানার পশ্চিম পার্শ্বের ঘরে বসিয়া ভক্তদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি এক ব্যক্তি।" ঠাকুর সমর্থন করিয়া বলিলেন, "এক এক। এক বই কি।"

ইহার পর আমরা লীলাপ্রসঙ্গের দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্বেও দুই একটির প্রাসঙ্গিক অবতারণা করিয়াছি। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের পুনর্যাত্রায় ঘটনাটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেদিন প্রাতেই ঠাকুর বলরামবাবুর বাটীতে আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া ভক্তেরাও কেহ কেহ উপস্থিত হইয়াছেন। অন্দর মহলে জলযোগের সময় তিনি গোপালের মার বিশেষ প্রশংসা করিলেন। বলরাম বাবু তাঁহাকে আনাইতে কামারহাটিতে লোক পাঠাইলেন। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় বলরামগৃহের বৈঠকখানায় উপস্থিত ভক্তগণ দেখিলেন, ঠাকুর অকস্মাৎ বাল-গোপাল-মূর্তি ধারণ করিলেন। দুই জানু ও এক হাত ভূমিতে হামা দেওয়ার ভাবে রাখিয়া ও এক হাত তুলিয়া উর্ধ্বমুখে যেন কাহারও মুখপানে সাহ্লাদে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে ও কি চাহিতেছে।.........ঠাকুরের এই ভাবাবস্থা আরম্ভ হইবার একটু পরেই গোপালের মার গাড়ী আসিয়া বলরামবাবুর বাটীর দরজায় দাঁড়াইল এবং গোপালের মা উপরে আসিয়া ঠাকুরকে আপনার ইষ্টরূপে দর্শন করিলেন। উপস্থিত সকলে—গোপালের মার ভক্তির জোরেই ঠাকুরের সহসা এইরূপ গোপাল ভাবাবেশ হইয়াছে জানিয়া তাঁহাকে বহু ভাগ্যবতী-জ্ঞানে সম্মান ও বন্দনা করিলেন। গোপালের মা সসংকোচে বলিলেন, "আমি কিন্তু বাপু, ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালবাসি না। আমার গোপাল হাসবে, খেলবে, বেড়াবে, দৌড়ুবে—ওমা ও কি! একেবারে যেন কাঠ। আমার অমন গোপাল দেখে কাজ নেই।" সে-বারে শ্রীশ্রীঠাকুর বলরাম-গৃহে ভক্তসঙ্গে সানন্দে দুই দিন দুই রাত কাটাইয়া তৃতীয় দিন সকালে আটটা নয়টার সময় নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন; গোপালের মাও তাঁহার সহিত একই নৌকায় গেলেন। এতদ্ব্যতীত গোলাপ-মাও ছিলেন, আর সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত কালী (বা স্বামী অভেদানন্দ)ও ছিলেন। গোপালের মার সেবার জন্য এদিন বলরামবাবুর বাটী হইতে তাঁহাকে অনেক জিনিসপত্র দেওয়া হইয়াছিল—হাতা, বেড়ি, কাপড় ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গলরোগ বৃদ্ধি হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় লইয়া আসেন। কিন্তু তাঁহার বাসের জন্য দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রীটে যে ক্ষুদ্র বাড়িখানি ভাড়া লওয়া হইয়াছিল উহা দেখিয়া ঠাকুর উহাতে বাস করিতে অস্বীকার করেন এবং তখনই পদব্রজে বলরাম মন্দিরে চলিয়া আসেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে সপ্তাহকালের মধ্যেই শ্যামপুকুর স্ট্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাটী ঠাকুরের জন্য ভাড়া লওয়া হয়

এবং ঠাকুর সেখানে চলিয়া যান। সুতরাং এই মতে ঠাকুর সে-বার এক সপ্তাহের কিছু কম সময় বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। (দিব্য ভাব ও নরেন্দ্র নাথ—২৫৩ পৃঃ)। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত কিন্তু তাঁহার রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বমরামবাবুর বাটীতে এক পক্ষের অধিক বাস করিবার সুবিধা হইল না।" (১৬৬ পৃঃ)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতেও লিখিত আছে, "এক পক্ষ হৈল গত বসুর ভবনে" (৫৭৭ পৃঃ)।

যাহা হউক, আমরা লীলাপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ ও এই সময়ে বলরামভবনে সংঘটিত একটি লীলার বিবরণই পরিবেশন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ঠাকুর কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন জানিয়া চারিদিক হইতে পরিচিত ও অপরিচিত বহু ভক্ত সেখানে আসিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের অসুখের কথা ভুলিয়া ঐ বাটীকে উৎসবক্ষেত্রে পরিণত করিলেন। ডাক্তারের নিষেধ এবং ভক্তদের সকরুণ প্রার্থনায় ঠাকুর যথাসম্ভব নীরব থাকিলেও আগতদের আর্তি তাঁহাকে বারংবার বিচলিত করিত এবং করুণায় বিগলিত হইয়া তিনি অকাতরে জ্ঞান, ভক্তি ও কৃপা বিতরণ করিতেন। ঐ সময় একদিন পূজ্যপাদ লীলাপ্রসঙ্গকার বলরামবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঘরখানি লোকে পরিপূর্ণ। পূর্ণ, গিরিশ ও কালীপদ মহোৎসাহে গান ধরিয়াছেন—

আমায় ধর নিতাই।
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।
(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে
উঠল যে ঢেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভেসে যাই।
(নিতাই) খত লিখেছি আপন হাতে
অষ্ট সখী সাক্ষী তাতে
(এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন।
(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল
তবু ঋণের শোধ না হ'ল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।

ঠাকুর ঐ ঘরের পশ্চিমাংশে পূর্বাস্যে বসিয়া আছেন—মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব ছটা। তাঁহার দক্ষিণ চরণ উত্থিত ও সম্মুখে প্রসারিত। একব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত সন্তর্পণে উহা বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন। গীত সাঙ্গ হইলে অর্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, 'বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' তিনবার নাম গ্রহণ করাইয়া তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিকভাবে কথামৃত বিলাইতে লাগিলেন। সেদিনের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী। ইনি ঢাকার কোন কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। ঠাকুরের অসুস্থতার সংবাদে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া এই অভাবনীয় কৃপালাভ করেন।

এই সময় লোকসমাগম দেখিয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবস্থায় বলিয়াছিলেন—'এত লোক কি আনতে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস্। লোকের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই না। একটা তো এই ফুটো ঢাক। রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতেও বলরাম-মন্দিরে শ্রীপ্রভুর লীলার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রহিয়াছে, উহা এখানে সবিস্তারে উপহার দেওয়া সম্ভব নহে। তবু দুই চারি পঙ্‌ক্তি তুলিয়া ধরিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বসুর ভাগ্যের কথা নাহি হয় ইতি।
যাঁহার ভবনে এত প্রভুর পীরিতি॥

শ্রীপ্রভুর আগমন বসুর ভবনে।
সাধারণে রাষ্ট্র কথা হৈল কানে কানে॥

লোকারণ্য হৈল লোকে ভবন-ভিতরে।
অগণন সাধ্য কার সংখ্যা তার করে॥
মঙ্গল-উৎসব-ধ্বনি উঠে দিবারাত্র।
বসুর ভবন ঠিক জগন্নাথ-ক্ষেত্র॥ (৫৭৬ পৃঃ)

পুঁথি হইতে আরও দুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। বলরামবাবুকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন,

"অন্যে দিতে দ্রব্য যদি আনে কোন জন।
সেই দ্রব্য দেয় যদি খাইতে আমারে।
তখন না পারি তাহা স্পর্শ করিবারে॥"

পরীক্ষার জন্য বলরাম একদিন ঠাকুরের জন্য আনীত মিষ্টান্নের সহিত নিজ হাতে অপরের নামীয় মিষ্টান্ন মিশাইয়া দিলেন। কিন্তু আহারকালে দেখিলেন, শ্রীপ্রভু অপরের উদ্দেশ্যে আনীত মিষ্টান্নে মোটে হস্তক্ষেপ করিলেন না—

যে ভোজ্য নিজের তাঁর, তাঁর নামে আনা।
প্রত্যেকের লয়ে প্রায় দুই এক দানা।
খাইলেন প্রভুদেব ভরিল উদর।
বুদ্ধিহারা বলরাম দেখিয়া রগড়॥ (৩০৭ পৃঃ)

পুঁথির আর একটি বর্ণনা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রকে লইয়া। সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুর নন্দ বসুর বাটী হইতে বলরাম-ভবনে যাইতেছেন। সঙ্গে আছেন নারাণচন্দ্র, প্রভু তাঁহার হাত ধরিয়া চলিয়াছেন। গিরিশ স্বগৃহের সম্মুখেই এক রকে বসিয়াছিলেন, ঠাকুর তাঁহার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আগাইয়া চলিলেন। গিরিশের ইচ্ছা হইল, সঙ্গে যাব। কিন্তু অভিমান বাধা দিল। তখনও প্রভুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত আছেন, এমন সময় নারাণচন্দ্র সহাস্যে আসিল।

"অমৃতবরষী ভাবে কহিল তাঁহায়।
দেখিতে তাঁহারে ডাকিলেন প্রভু রায়॥
তিল নহে দেরি তেঁহ চলিল অমনি।
মহামন্ত্রে বিমোহিত যেইরূপ ফণী॥

বসু-ভবনে উপস্থিত গিরিশের মনে এক সমস্যা ছিল "গুরু কে?" ঠাকুর তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "গুরু কি, কেমন জান? যেমন কোটনা।

মিলাইয়া ইষ্ট—গুরু নাহি রহে আর।
তোমার হয়েছে গুরু, কি চিন্তা তোমার॥"

গিরিশের আর এক চিন্তা ছিল—তাঁহার মনের বাঁক যাইবে কবে? ঠাকুর অভয় দিয়া বলিলেন—

"অচিরে হইবে দূর চিন্তা কিছু নাই॥" পুঁথির আর একটি আলেখ্য সমধিক চিত্তাকর্ষক। সেদিন নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিতে ঠাকুর হাটখোলায় গিয়াছিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে যাত্রা-দর্শনে আগত ব্যক্তিরা যাত্রা ছাড়িয়া তাঁহাকে দেখিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যাত্রার পরিবর্তে তখন হরিনাম কীর্তন আরম্ভ হইল এবং শ্রীপ্রভু আসন হইতে উঠিয়া সমাধিস্থ হইলেন।

দেখিবারে গোলযোগে যাত্রা যায় প্রায় ভেঙ্গে,
ভক্তিমান গায়ক প্রধান।
আপনার দলে দলে সহ খোল করতালে
গায় যুগ্ম রাধাকৃষ্ণ নাম।
শুনিয়া যুগল নাম নিম্নদেশে ভগবান
নামিতে লাগিলা ক্রমে ক্রমে।

তখন ভক্তগণ তাঁহাকে পুনঃ আসনে বসাইলে যাত্রা আরম্ভ হইল। কিন্তু ভাবাবেশে তিনি আবার কৃষ্ণপ্রেমে গাঢ়তর নিমগ্ন এবং বিকলাঙ্গ হইলেন।

সেহেতু লইয়া তাঁয় সত্বর বাহিরে যায়
ভক্তগণে ভীত অতিশয়।
সেবাশুশ্রূষার পরে সুস্থ করি প্রভুবরে
পলাইল শকটারোহণে।
বাগবাজারেতে ধাম ভক্ত বসু বলরাম
ভাগ্যবান্ তাঁহার ভবনে॥

এই পর্যন্ত আমরা তিনখানি প্রধান গ্রন্থ অবলম্বনে বলরাম-মন্দিরে শ্রীপ্রভুর লীলা কিঞ্চিন্মাত্র আস্বাদন করিয়াছি। অন্যান্য গ্রন্থেও আরো কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

শৃঙ্খলমুক্তি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

নব নব বন্ধনে
নিজেরে বাঁধিতে ভব সংসার সনে
তৃষা কামনায় শৃঙ্খল শুধু পরিয়াছি নিশিদিন
শতেকের কাছে খাতক হইয়া করিয়া কত না ঋণ।

শৃঙ্খলে আমি ভাবিনু অলঙ্কার
দিনে দিনে ঐ শৃঙ্খলই মোর হ'ল দুর্বহ ভার।
ভূষণ বলিয়া পরেছিনু যাহা হরিল তা মোর বল,
জীবনের পথে আগাতে দিল না পায়ে বাঁধা শৃঙ্খল।

আসিতেছে আজ সুদূরের আহ্বান,
ছেড়ে যেতে চাই ছিঁড়ে যেতে চাই পঞ্জরে পড়ে টান।
জানি তুমি দেবে কঠোর আঘাত হানি
সব বন্ধন করিবে ছেদন হে প্রভু বজ্রপাণি।
শিথিল করিয়া দাও বন্ধন, দূর কর মায়া মোহ
করিতে শিখাও বন্দীরে বিদ্রোহ।

সব শৃঙ্খল আপনার হাতে ছিঁড়ে
সম্মুখে ভব-বৈতরণীর তীরে
দাঁড়াইতে যেন পারি
হে আমার কাণ্ডারী—
সেই বল মাগি জুড়ি মোর দুটি পাণি,
বিনা সাধনায় মিলে নাকো তাহা জানি।
তবে যে শুনেছি তোমার কৃপায় সবি সম্ভব হয়,
সেই কৃপা আমি—পাব না করুণাময়?

পথ কই ?

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী

সহস্র বাধা বিঘ্ন ও প্রয়োজনের জটিলতার মধ্যে পড়িয়া আমাদের জীবনযাত্রার পথ আজ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। দিনের পর দিন নূতন সমস্যায় পড়িয়া—আদর্শ কি ভাবিয়া দেখিবার সময়ও পাইতেছি না। সর্বদা শুনিতে পাই আগাইতে হইবে। কিন্তু কোথায় যাইব ? পথ কই ?

পাশ্চাত্ত্য রীতি-নীতির সহিত ভারতের সামাজিক জীবন মিলাইবার সার্থকতা কোথায় ? তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবার বহু জিনিস আছে জানি, কিন্তু সামাজিক জীবনে নিজের ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াও তাহা লইতে পারা যায়। তাহাদের সাহস, স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রিয়তা, তাহাদের আত্মনির্ভরতা ও নারীজাতির প্রতি সম্মান, তাহাদের একতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এ সমস্তই অনুকরণীয় ; তাই বলিয়া—যথেচ্ছ বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও আনুষঙ্গিক সামাজিক জীবনযাত্রা গ্রহণ করিলে আমরা আমাদের ঐতিহ্য ও জাতীয় গৌরব হারাইব।

তাহাদের সদ্‌গুণরাশি আয়ত্ত করিয়া আমাদেরই পথে আমাদের আগাইতে হইবে। চরিত্র গঠিত হইলে মনোবল দৃঢ় হয়, মনোবল দৃঢ় হইলেই পথ চলিবার—অগ্রসর হইবার সামর্থ্য আসে। এ সকলের মূল হইতেছে সত্য ও স্বার্থ ত্যাগ। সত্যাশ্রয়ী না হইলে কি চরিত্রবল দৃঢ় হয় ? শত শত বৎসরের পরাধীনতার চাপে ও অনুকরণের ফলে জাতির ঐক্যবোধ আজ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, স্বতন্ত্র-ভাবও বিলুপ্ত। তাহাকে স্বধর্মে ফিরাইতে হইলে বিবেকানন্দের মত নিঃস্বার্থ, নির্ভীক কর্মবীর চাই। সত্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচারীই সকলকে আপন আদর্শে আকর্ষণ ও সংহত করিতে পারেন।

সমাজ-জীবন সুসংস্কৃত না হইলে জনসাধারণের চলার পথ সুগম হইবে না, পদে পদে তাহারা বিভ্রান্ত হইবে। ভারতের সমাজ চিরদিন ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে রাজচক্রবর্তীরও হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। প্রজানুরঞ্জক লোকপ্রিয় রাজাধিরাজ রামচন্দ্রকেও ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইয়াছে ; অপাপবিদ্ধা লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবীকেও সমাজনীতির শাসনে বনবাসিনী হইতে হইয়াছে।

মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্বন্মণ্ডলীর দ্বারা সমাজ পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। ধনীর হাতে নয়, ব্যবসায়ীর হাতে নয়, রাজনীতি-বৃত্তিপরায়ণের হাতেও কোন ক্ষমতা থাকা উচিত নয়,—কারণ তাহাদের স্বার্থপূর্ণ একদেশী দৃষ্টির ইঙ্গিতে সকল মানব মিলিত হইতে পারে না। যাঁহারা অবনতমস্তকে সমাজনীতি মানিয়া চলিবেন—তাঁহাদেরই শাসনপ্রণালী জনসাধারণ মানিয়া চলে। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের প্রতি পাতায় লিখিত আছে।

আমাদের গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতের বহুল প্রচার ও আলোচনা আজ বড়ই প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও তাহার প্রতি আনুগত্য, সত্যপালন ও স্বধর্মরক্ষা-বিষয়ক অসংখ্য দৃষ্টান্ত সেখানেই আছে। প্রতি পল্লীর মধ্যে ১০।১২টি গৃহকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন সমবেত পাঠে বা আলোচনায় সকলের উপস্থিতি চাই, পল্লীর আস্থা-ভাজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিই পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন। ঘরে ঘরে আলোচনা সর্বদা সর্বত্র সম্ভব নয়। আদর্শ চরিত্র আলোচনার দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি ও পবিত্র চিন্তার খোরাক জুটিবে, মানসিক শক্তি সঞ্চিত হইয়া চরিত্রবল সুদৃঢ় করিবে।

যুব-সমাজ স্বার্থভোগের পঙ্কেই দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। জীবিকার জন্য স্কুল-কলেজের পরীক্ষা পাশ করাই ছাত্রদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মুখস্থ

করিয়াই হউক, নকল করিয়াই হউক বা যে কোন উপায়ে হউক ক্লাস প্রমোশন ও ডিগ্রি লাভ করিয়া যেন তেন প্রকারে একটি চাকরি সংগ্রহ করিতে পারিলেই সর্বসিদ্ধি লাভ হইল, তারপর গতানুগতিকতার স্রোতে ভাসিয়া চলা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তরুণেরা জনসেবার শিক্ষা না পাইলে জাতির জাগরণ কেমন করিয়া সম্ভব ? ধনী, বিদ্বান ও বলিষ্ঠ সকলে হয় না ; কিন্তু ইচ্ছা করিলে সচ্চরিত্র সেবক সকলেই হইতে পারে। সংসারে স্বার্থের তাড়নায় কতই ঘুরিয়া মরিতেছি। পঙ্কিল চিন্তায় অবিরত মানসিক কালিমায় মলিনতর হইতেছি। ক্ষণিক অবসরে একটু চিন্তাধারা যদি কোনও নিঃস্বার্থ মহৎ প্রচেষ্টায় ব্যয় করিতে পারি, তাহা হইলে সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে, এবং শান্তি ও আনন্দলাভ হইবে।

আমরা ভাবিয়া দেখি না—জীবনের শেষ পরিণতি কোথায় ? সমস্ত দিনের মধ্যে সচ্চিন্তা ও সৎপ্রসঙ্গ কতটুকু করিলাম ? সংসার ও সমাজের সমস্ত দায়িত্ব প্রত্যেকের উপর নির্ভর করিতেছে। আদর্শ পিতা মাতা না হইলে সুসন্তান কেমন করিয়া জন্মিবে ? সুসন্তানের সমষ্টিই তো উন্নত জাতি। তাই আজ শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন দেশের পুণ্যভূমিতে দাঁড়াইয়া আমাদের আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা নিজেদের সংশোধন করিয়া চরিত্র উন্নত করিতে হইবে। সর্ব স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সন্তানদের জীবন-গঠন করিতে হইবে, তাহারাই দেশের ভবিষ্যৎ ও আমাদের গৌরব।

ইংরেজের শাসনে ও অনুকরণে অভ্যস্ত হইয়া নিজেদের ঐতিহ্য ভুলিয়া খণ্ডিত হইতে হইতে আমরা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছি। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছি, ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি। কাহাকেও সাহায্য করিবার মত প্রবৃত্তি নাই, কাহারও সাহায্য পাইবার উপায় নাই। উদার অতিথিবৎসল ভারতের সাধারণ মানবসমাজ আত্মকেন্দ্রিক হইয়া আজ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

আজ আমরা পরশ্রীকাতর ও শ্রমবিমুখ, তাই আমাদের উত্তরাধিকারী সন্তানগণ উচ্ছৃঙ্খল। আমরা আত্মবিস্মৃত, তাই তাহারা বিপথগামী। নিজেদের জীবন গঠন করিতে পারি নাই, তাই ইচ্ছাসত্ত্বেও সন্তানদের সুনিয়ত ও চরিত্রবান করিতে পারি না। সৃষ্টি করিয়া পশু-পক্ষীও সন্তান পালন করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। সন্তানকে জ্ঞান, বিবেক ও মনুষ্যত্বের সন্ধান দিয়া উন্নতজীবনের অধিকারী না করিলে জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিবার অর্থ কি ?

গীতা, ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের আদর্শ জীবন ও চরিত্রের আলোচনার দ্বারা আত্মবিচার করিয়া ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তিকে ও জাতিকে টানিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের অতীত জ্ঞানগরিমায় সমুজ্জ্বল, সেবা ও পরোপকারের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। কত বলিব ? কি নাই ? দধীচির অস্থিদান, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যদান, রামচন্দ্রের সত্যপালন ও সীতার পবিত্রতা, কর্ণের কবচ কুণ্ডল দান, পাণ্ডবের ভ্রাতৃত্ব, এ সকল মহারত্নের অধিকারী আমাদের সন্তানগণ। সচ্চিন্তা কোনও প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত না হইলে আদর্শ কেমন করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিবে ? তাই সংঘবদ্ধ আলোচনা প্রয়োজন।

বহু বিলম্ব হইয়া গেলেও এখনও সময় আছে। জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হইয়াও আমরা যদি স্বার্থে ও ভোগে ডুবিয়া থাকি, তবে আমাদের সন্তানগণ মানুষ হইবে কেমন করিয়া ? পিতামাতার আদর্শ—তাহাদের জন্মগত সংস্কার ও অধিকার ; তাহা হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিলে আমরা কর্তব্যচ্যুত হইব, তাহারা আদর্শভ্রষ্ট হইবে। চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। উন্নত চরিত্র গঠিত হইলে আর পতনের ভয় নাই। অতএব আমাদের প্রত্যেক পিতামাতার কর্তব্য হইতেছে মহাজন-সেবিত উপায়ে নিজেদের

জীবন গঠিত করিয়া সন্তানের চরিত্র গঠন করা। শুধু বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়, আদর্শের উত্তরাধিকারী করিতে পারিলেই সন্তানধারণ সার্থক। মহাজন-প্রদর্শিত পথই পথ; সন্তানদের সেই পথ ধরাইয়া দিতে পারিলেই আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত, তাহাদেরও জন্ম এবং জীবন সার্থক!

তারাই তো মানব মহান

বেগম সুফিয়া কামাল

যাহারা সাম্যের গানে আনে প্রাণে চেতনার বাণী,
সত্যের সেবায় যারা মুছে দেয় তুচ্ছতার গ্লানি
তারাই ত মানব মহান—
তাহাদের পুণ্য নামে এ পৃথিবী হয় তীর্থস্থান।
ভঙ্গুর মৃত্তিকা-পাত্রে হয় যবে অমৃত-সঞ্চয়
সে অমৃত-বিন্দু পানে যাহারা হইল মৃত্যুঞ্জয়—
তুচ্ছ করি দেহের বিলাস,
আত্মার ঐশ্বর্যরাশি পুষ্পসম করিয়া বিকাশ
সুন্দরে সঁপিল যারা সে প্রেম-সুরভি,
তারাই তো কালজয়ী আনন্দ-অমৃত-স্বাদ লভি।
কালচক্র আবর্তিয়া কত যে কীর্তিরে করি লয়
বহিয়া চলিয়া গেছে, হেরিয়াছে অপূর্ব বিস্ময়।
সংসারের সিন্ধু হতে হংস নভোচারী
ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে ওঠে অলৌকিক আনন্দ বিথারি।
তবু ও মর্ত্যের মায়া আর্ত ক্লিষ্ট ব্যথিতের লাগি
স্নেহার্তা জননী সম অহরহ রহিয়াছে জাগি,—
'সেবা-ধর্ম' বাণী করি দান
অযুত ভক্তেরে দেয় কর্মময় পথের সন্ধান।
বিগত শতাব্দী তবু আজও সেই মৃত্যুহীন প্রাণ
অযুত ভক্তের কণ্ঠে উঠিতেছে সেই নাম-গান।

আচার্য শঙ্করের শিক্ষাপদ্ধতি

অধ্যাপক শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য, এম্-এ, বি-টি

প্রাচীন ভারত শ্রদ্ধাভরে বেদের সনাতনত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়াছে। আরণ্যক যুগে উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন ঋষি-কর্তৃক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহর্ষি বাদরায়ণ শ্রুতিসিদ্ধান্ত যুক্তি অনুযায়ী সঙ্কলন করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। তিনি পূর্ববর্তী ঋষিগণের মত সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে বিভিন্ন মতের একটি সুদীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাতময় ইতিহাস রহিয়াছে। বৌদ্ধোত্তর যুগে ভগবান্ শঙ্করাচার্য বেদের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য এক নবজীবন-দর্শনের সূচনা করে।

নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম-প্লাবনের পরে জ্ঞানপ্রধান বেদান্তের ভিত্তিতে ভারতে বৈদিক ধর্মের নব-জাগরণ হয়। আচার্য শঙ্কর এই আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া অখণ্ড ভারত গঠন করিবার মহতী প্রচেষ্টা করেন। মৌলিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রস্থানত্রয়ের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ভারতের ইতিহাসে তথা নিখিলমানব-সংস্কৃতিতে তিনি যুগান্তর আনয়ন করেন। আচার্য যুক্তি ও শ্রুতির প্রামাণ্য গ্রহণ করিয়া স্থির করিলেন যে একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য এবং জীব তত্ত্বতঃ ব্রহ্মই। জীব ও জগৎ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সত্য নহে। ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ এবং সর্ববিধ দ্বৈত-রহিত বিভু বস্তু। ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেবকে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিলে বা নিষ্কামভাবে কর্ম করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখনই শুদ্ধচিত্ত সাধক তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন। সতত পরিবর্তনশীল সংসারের ধন-জন-যৌবনের ভোগবাসনা ত্যাগ করিলে নিত্যবস্তুর ধ্যানেই আত্ম-স্বরূপ লাভ হয়, এই আদর্শ প্রচার করিয়া আচার্য শংকর মানবজীবনকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য সর্ব জীবের ঐক্য উপলব্ধি করিলেন, জীবমাত্রের ব্রহ্মরূপতা ও একত্ব-বাদের নীতির ভিতরেই নিহিত রহিয়াছে—সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের সত্যতা। আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন দুইটি প্রাণীর মধ্যে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য কখনও দেখিতে পাই না; অথচ আমরা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানবের সমানাধিকারের কথা শুনিতে পাই। আচার্য শঙ্করের পারমার্থিক ঐক্যদৃষ্টির প্রতি বিশেষ প্রণিধান করিলে জীবের পারমার্থিক ঐক্য ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারের দাবির মধ্যে একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাগত শঙ্কর বৌদ্ধধর্মপ্লাবিত উত্তরাপথে বৈদিক ধর্মপ্রচারে বিশেষ সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করেন। শঙ্কর দক্ষিণাপথে ভারতের সনাতন প্রথায় শিক্ষালাভ করেন। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি নূতনভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মপ্রচারে সচেষ্ট হন। শঙ্করের দুর্জয় প্রতিভাশক্তি ও তাঁহার বিভিন্নমতের প্রতি উদার ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, ভারতীয় মনে এক নব-ভাবের উদ্বোধন করিয়া নূতন এক জাতীয়তা-বোধের সূচনা করিল। শঙ্করের প্রবর্তিত আন্দোলনে তাহার পূর্ববর্তী দর্শন ও ধর্মমতগুলির এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইল।

শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত নবধর্মের জাগরণের সহিত প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের শিক্ষা-পদ্ধতিও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। বৌদ্ধযুগে বৈদিক শিক্ষানীতি ও বর্ণাশ্রমধর্ম গ্রামাঞ্চলে কোনরূপে টিকিয়া ছিল, শঙ্করাচার্য কর্তৃক বৈদান্তিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বৈদিক শিক্ষানীতিও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের শিক্ষাপদ্ধতির সহিত বৌদ্ধোত্তর যুগের

শিক্ষানীতির মূল কাঠামো একরূপ হইলেও কালের প্রভাব বৌদ্ধোত্তর যুগের শিক্ষানীতির উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য পরবর্তী যুগের শিক্ষানীতিতে প্রাচীন শিক্ষানীতি ও বৌদ্ধ শিক্ষানীতির একটি সমন্বয়-প্রচেষ্টা সূচিত হইয়াছে। শঙ্কর তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য-প্রভাব ও বাগ্‌দক্ষতায় সমস্ত ভারতে বৈদান্তিক ধর্ম প্রবর্তন করিয়া ভারতের চতুঃসীমায় চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার চারজন সন্ন্যাসী শিষ্যের উপর মঠগুলির পরিচালনা-ভার অর্পিত হয়। তিনি দক্ষিণ ভারতে বৃহত্তম 'শৃঙ্গেরী' মঠ, উত্তর ভারতে হিমালয়ে 'যোশী' মঠ, পশ্চিম ভারতে 'সারদা' মঠ এবং পূর্ব ভারতে 'গোবর্ধন' মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ভারতে বৌদ্ধমত ছাড়া শৈব বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক মতও প্রচলিত ছিল। এই বিভিন্ন বৈদিক মতগুলিকে তিনি একটি অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। প্রত্যেকটি উপাসক সম্প্রদায় যে সম-মর্যাদা-সম্পন্ন এবং পরমতত্ত্বলাভে প্রত্যেকটি উপাসনামতেরই যে প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা তিনি প্রচার করিয়া শৈব বৈষ্ণব শাক্ত গাণপত্য সৌর প্রভৃতি পঞ্চদেবতা-উপাসক সম্প্রদায়ের মিলন প্রচেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য-দেবতাসমূহ যে একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, শঙ্কর তাহাই প্রমাণ করেন। প্রতিটি উপাসক-সম্প্রদায়ই যে সম-মর্যাদা-সম্পন্ন শঙ্কর তাহাও স্বীকার করেন। শঙ্করাচার্যের এই সমন্বয়-দৃষ্টি বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠিতে বিভক্ত ভারত-ভূমিতে একটি মহান ভারতীয় বোধ ও ঐক্যের সূচনা করে। শংকরই বর্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্মের ভিত্তি রচনা করিয়া যান। এই উদার সর্বভারতীয় দৃষ্টি অনুসরণ না করিলে মধ্যযুগের ইতিহাসের ধারা অন্যরূপ হইত। হিন্দু ভারত হয়তো ইসলামের আক্রমণে পারস্য প্রভৃতি দেশের মতো সম্পূর্ণরূপে স্বধর্ম হারাইয়া ফেলিত।

শঙ্করাচার্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শূদ্রের বেদপাঠের অধিকার, সাধারণভাবে স্বীকৃত না হইলেও 'মোক্ষধর্মে' শূদ্রের অধিকার তিনি স্বীকার করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও সুললিত শাস্ত্রের মাধ্যমে শূদ্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিত। শঙ্করাচার্য মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮৭ সূত্র উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে শূদ্রের ভজনা উপবাস পূজার্চনাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ হয়। এই উপায় গুলির সাথে বর্ণাশ্রমধর্মের কোন প্রকার সংস্রব নাই, মানুষ মাত্রেই এই সকল সাধনা করিয়া আত্মোন্নতি করিতে পারে। মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির অন্তর্গত আদর্শ-চরিত্র-বহুল আখ্যানগুলি, শূদ্রের জ্ঞানভক্তিলাভের সহায়ক। পরবর্তী যুগে রামানুজাচার্য শূদ্রের মোক্ষধর্মে অধিকার আরও ব্যাপকভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠে অনুসন্ধান করিলে শঙ্করের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি সম্বন্ধে নূতন জ্ঞানলাভ করা যায়। এই যুগের শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধে জ্ঞান—কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের কাব্য হইতেও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আচার্য শঙ্কর তাঁহার প্রচার-কার্য সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই করিয়াছেন। ইহাতে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং নিখিল ভারতীয় একত্ব-বোধ বিশেষ-ভাবে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষায় দর্শনের চরমতত্ত্ব প্রকাশিত না হওয়ায় ঐ ভাষাগুলি বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য কাব্য ও পুরাণের পথ ধরিয়াছে। শঙ্করবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনে বর্ণাশ্রমধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চবর্ণ দ্বিজ-শ্রেণীসমূহের ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমে শিক্ষা—ধর্মের অঙ্গস্বরূপে গৃহীত হয়। প্রাচীন যুগের যজ্ঞ-প্রথা, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আবির্ভাবে লুপ্ত হইয়া যায়। শঙ্কর-পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণগণ শিক্ষাদান-বৃত্তি গ্রহণ করেন; অধ্যয়ন ও অধ্যাপন পরবর্তী যুগের

ব্রাহ্মণগণের দৈনন্দিন এবং আবশ্যক কর্মের মধ্যে নির্ধারিত হয়।

বর্ণাশ্রমের ঊর্ধ্বে আচার্য শঙ্কর মোক্ষধর্ম ও সন্ন্যাসধর্মের বিশেষ প্রচার করেন। বর্তমান যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা লক (Locke) এর ভাবপ্রভাবে সম্মোহিত। "মন পরিষ্কার শ্লেট" এই ভাব গ্রহণ করিয়া বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানদান-বিধির প্রাধান্য হইয়াছে। তাই দিনের পর দিন পাঠ্য তালিকায় ছাত্রের মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। মনীষী কাণ্ট (Kant) মনের সৃষ্টিমূলক স্বভাব স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষাসূচী (Curriculum)-এর প্রতি লক্ষ্য করিলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শিক্ষাবিদের অবচেতন মনে এখনও সেই লক্-এর 'ভূত' বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে। কিন্তু আচার্য শঙ্কর জ্ঞানের পরিসমাপ্তি যে "মোক্ষে," তাহা অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি নহে—পরন্তু প্রাপ্ত বস্তুর উপলব্ধি, তাহা জানিতেন বলিয়াই তিনি তথ্যের জন্য ব্যস্ত না হইয়া চতুরাশ্রমের অন্তর্গত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দেহ মনের সংযম শৃঙ্খলা ও চরিত্র গঠনের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন। অনেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে বর্তমান যুগের ছাত্রাবস্থার সহিত এক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বর্তমান যুগের ন্যায় ছাত্রদিগকে তথ্য প্রদান অপেক্ষা তখন তাহাদের চরিত্র ও মানসিক গঠনের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইত, যাহাতে শিক্ষার্থী তাহার অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে উপলব্ধি করে। শঙ্করের মতে চরম জ্ঞান ভিতরে—বাহিরে নহে, এ জন্য জ্ঞানোপদেশের পূর্বে শিক্ষার্থীর চরিত্র সংগঠন করা হইত—যাহাতে সে তাহার অন্তরেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বহির্জ্ঞানের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়া আত্মজ্ঞানের পারমার্থিক নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে—এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতিতে। শঙ্কর-প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি পরবর্তী ভারতের শিক্ষাধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। হিন্দু ভারত ধর্মকে জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে—তাই শঙ্কর-প্রবর্তিত শিক্ষাধারাই হিন্দু ভারতকে বহুদিন স্বধর্মনিষ্ঠ রাখিয়া তাহার জাতীয় জীবন কৃষ্টি ও ধর্ম রক্ষা করিয়াছে।

ওই সুন্দর আসে!

শ্রীমুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যভারতী

শালবনে কার আগমনে মন
পুলকিত অনুরাগে,
হৃদয়-বীণার তারে তারে কোন্
মীড়-মূর্ছনা জাগে।

পিয়াল-কুঞ্জে, মহুয়ার বনে
ও কে সুন্দর আসে?
প্রাণের মধুর গন্ধ ছড়ায়ে
বন-কুসুমের বাসে।

ঊষার উদার গগন-ললাটে
অরুণ-কিরণ-রাগ—
আম্র-মুকুলে, পলাশে, শিমুলে,
অশোকে ছড়ায় ফাগ।

ধরণীর এই প্রাণ-প্রাচুর্যে
রূপ-রস-মধু-গন্ধে,
উলসিছে প্রাণ মধুর লয়ে
ভাষা-ছন্দের দ্বন্দ্বে।

রবীন্দ্রকাব্যে দুঃখতত্ত্ব

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দুঃখতত্ত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কবিমানসের আনন্দ-বৈচিত্র্যের অন্তরালে রহিয়াছে বিরাট ও গভীর দুঃখের অনুভূতি, যাহা তাঁহার কাব্যে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। এই দুঃখবোধের উৎস—তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ও অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের মত ভাগ্যবান পুরুষ পৃথিবীতে কমই জন্মিয়াছেন; আবার তাঁহার মত ভাগ্যহত ব্যক্তিও অতিশয় বিরল। বহুদিক হইতেই তিনি ভাগ্যবান, কিন্তু সুদীর্ঘ জীবনে তিনি যে কত কঠোর দুঃখদাহন পাইয়াছেন তাহারও ইয়ত্তা নাই। তাহার বিশ্ব-বিশ্রুত বিপুল খ্যাতি, তথাপি তাঁহাকে কত গঞ্জনা বেদনা পাইতে হইয়াছিল। মর্মান্তিক মৃত্যুশোক তাঁহাকে বারংবার সহিতে হইয়াছে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, নিকটতম আত্মীয়স্বজন বন্ধু—একে একে তিনি হারাইয়াছেন। তারপর আসে নানা ব্যর্থতা, মানুষের কত রকমের কপটতা, কৃতঘ্নতা, নির্মম নিন্দা, গ্লানি, সব রকমের দুঃখই তিনি পাইয়াছিলেন। কোন দুঃখই তাঁহার জীবনে বাদ যায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই দুঃখকে দেখিয়াছেন সৃষ্টির মূলে। শিশুকাল হইতেই উপনিষদের মন্ত্র নানাভাবে তাঁহার চিত্তকে অনুরণিত করে। তিনি বিশ্বাস করিতেন বিশ্বস্রষ্টা আনন্দময়। বিশ্ব জগৎ সেই স্রষ্টার আনন্দেরই প্রকাশ। জীব-জগতে, প্রকৃতির ফুলে ফলে পল্লবে সর্বত্রই সেই অমৃতধারা প্রবাহিত। বহুর মধ্যে সেই আনন্দময় নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আনন্দতত্ত্বকে স্বীকার করিয়াও দুঃখকে দেখিয়াছেন সৃষ্টির মূলে। তিনি বলেন "দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টিতত্ত্ব একেবারে এক সঙ্গে বাঁধা। কারণ অপূর্ণতাই ত দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।" তারপর তিনি দুঃখতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'অপূর্ণের মধ্য দিয়া না হইলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া? জগৎ অপূর্ণ বলিয়া তাহা চঞ্চল, মানব সমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, চেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম। অতএব মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা, কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে। ...সেই জন্যেই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেই জন্যেই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে।' সুতরাং দুঃখ মায়া বা বিকার নয়। দুঃখ সৃষ্টির অপূর্ণতারই অপরিহার্য অঙ্গ, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত অর্থকে প্রকাশ করিবার জন্য, পূর্ণের অর্থকে প্রকাশ করিবার জন্য এ দুঃখের প্রয়োজন। সৃষ্টি-লীলার সার্থকতাকে প্রকাশ করিতে এ দুঃখের প্রয়োজন।

বিশ্বস্রষ্টার আনন্দের প্রকাশ দুঃখের মধ্য দিয়া। মানবজীবনেও আনন্দের অভিব্যক্তি দুঃখের অভিঘাতে। মানুষের প্রাণের মধ্যে আনন্দকে গোচর করিয়া ধরিয়াছে দুঃখই। তাই রবীন্দ্রনাথ বার বার এই সহজ সত্যের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, 'মিলনের আনন্দ অর্থহীন হ'ত যদি বিরহের দুঃখ না থাকত; মুক্তির আনন্দ নিষ্প্রভ হ'ত যদি বন্ধনের বেদনা না থাকত; অরূপের বার্তা ও অসীমের আকুতি ব্যর্থ হ'ত যদি রূপের ও সীমার বেদনার মধ্যে তারা ধরা না দিত।'

কবির দুঃখতত্ত্বকে অসামান্য সৌন্দর্যমণ্ডিত

করিয়াছে দুঃখের কল্যাণতম মহিমা। বহুরূপে ও বহুভাবে দুঃখের এই কল্যাণরূপ রবীন্দ্রকাব্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বার বার তিনি বলিয়াছেন, 'মানুষের আত্মা চিন্ময়, যুগে যুগে তার অভিসার অনন্তের পানে সত্য শিব ও অদ্বৈতের পানে। সে দুর্গম পথে মানুষের শ্রেষ্ঠ পাথেয়—তার দুঃখ।' কবি আরও বলিয়াছেন আত্মাকে উপলব্ধি করবার, ভূমাকে স্পর্শ করবার বন্ধুর পথ—দুঃখের মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে, তপস্যার মধ্যে। বলাকার একটি কবিতায় তিনি এই তপস্যার অপূর্ব প্রকাশ দেখাইয়াছেন—

'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।'

'মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত, বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ। তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ। ···দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা কিছু নির্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি, সুখের দ্বারা আরামের দ্বারা নয়।' দুঃখের এই কল্যাণতম রূপের প্রকাশ কবি করিয়াছেন তাঁহার গীতাঞ্জলির গানে, 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান!'

'এই করেছ ভালো নিঠুর, এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জ্বালো।'

—এইরূপ বহু কবিতায় ও গানে।

আর একটি অনুভূতি কবির কাব্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, কবির ভাষাতেই বলা যাক: 'মানুষ সত্য পদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়া তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া পায়। আর যত কিছু ধন, সে ত তাহার নহে—সে সমস্ত বিশ্বেশ্বরের। কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয়, তবে কি দিব, কি দিতে পারি? তাঁহারই ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই—আমাদের একটি মাত্র যে আপনার ধন—দুঃখ ধন আছে, তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়।'

দুঃখের এই কল্যাণতম মহত্তর রূপ যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির কল্পনায়, তাহা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—দুঃখের অনুভূতিপূর্ণ রবীন্দ্রকাব্যে, তেমনই আবার মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে রুদ্ররূপ কল্পনায়, মানব ও বিশ্বজীবনের বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে। কবি দেখিয়াছেন দুঃখকে 'যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে, বজ্রের আঘাতে কত জাতি, কত রাজ্য, কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে—যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ মারী, অন্যায় অত্যাচার তাহার সহায়······।' কিন্তু এখানেও দেখি দুঃখের কল্যাণরূপ, পাপ-কল্পনা এখনও দুঃখতত্ত্বে স্থান পায় নাই। দুঃখ ও পাপের বাস্তব রূপ সুস্পষ্ট আমরা দেখিতে পাই বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে লিখিত "পাপের মার্জনা" নিবন্ধটিতে। বিশ্বব্যাপী হিংসা ও রক্তপ্লাবনের গভীর বেদনা এই প্রবন্ধের প্রতি ছত্রে ছত্রে। পাপের গ্লানি ও কলুষ আজ প্রথম স্তিমিত করিয়াছে দুঃখের দীপ্ত মূর্তি। সমগ্র মানবের করুণ প্রার্থনার মধ্য দিয়া কবির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দুঃখ ও পাপের চিত্র আঁকিলেন:

দুখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে। ···
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ
জাতি-অভিমান।

মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

আবার 'পরিশেষের' "প্রশ্ন" কবিতাটিতেও ভীরুর ভীরুতা, প্রবলের উদ্ধত অন্যায় আচরণ, লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, মানবের দেবতার বহু অসম্মানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন:

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

সেঁজুতি-কাব্যে "প্রশ্নোত্তর" কবিতায়ও পাই:

মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে
ঘটেছে তা বারে বারে।······

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে মানুষের শ্রেষ্ঠ আত্মিক সম্পদ ও ঐশ্বর্য বলিয়া মানিয়াছেন, দুঃখের কল্যাণরূপ দেখিয়াছেন। তারপর ধীরে ধীরে দুঃখের নগ্ন কদর্য রূপ, পাপের কুৎসিত রূপ তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইল। কিন্তু পাপকে স্বীকার করিয়াও সত্যের পূর্ণতা ছিল তাঁহার কামনা, পূর্ণতর সত্যের ও অমৃতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি চির নিবদ্ধ।

মৃত্যুর অন্তরে বসি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়, আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহঙ্কার ভেঙ্গে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে, অন্তরের কি আশ্বাস রবে,
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত?

কবির শেষ জীবনের আশ্বাস-বাণী—

······তবুও শ্রবণ বধির করিনি কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়াছে সুর আনি;
পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু,
চির দিবসের শান্ত শিবের বাণী।

কবির শেষ বাণী, অন্তিম জীবন-দর্শনের বিরাট অভিব্যক্তি—নবজাতক-কাব্যে 'জয়ধ্বনি' কবিতার শেষাংশে:

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ,
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু,
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা—
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহা-গহ্বরের ভাঙা-চোরা রেখাগুলো তারে
পারেনি বিদ্রূপ করিবারে,
যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষ কাব্যে আজ তারে দিব জয়ধ্বনি।

দুখ হবে মোর মাথার মানিক
সাথে যদি দাও ভকতি।
—রবীন্দ্রনাথ।

বেদান্তে কাহার অধিকার ?

৺শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
[স্বামি-শিষ্য-সংবাদ-রচয়িতা]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে নিখিল ধর্মমতের সমন্বয় পুনঃপ্রকটিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে বৈদান্তিক সন্ন্যাসিগণের অভ্যুত্থান হইয়াছে, সনাতন ধর্মে নবজাগরণের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছে; বিবেক-বৈরাগ্যবান্ মেধাবী প্রচারকগণ বেদান্তবিজ্ঞান-বিস্তারকল্পে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই শুভ মুহূর্তে বঙ্গদেশও বেদান্তের ধর্ম বুঝিতে অবশ্যই যত্ন করিবে। এই বঙ্গভূমি পবিত্র করিতে—বঙ্গবাসীর মোহনিদ্রার অবসান করিতে—ভগবান্ শঙ্কর যেন বেদান্তের মহিমা পুনঃ প্রচার করিতে নরশরীরে স্বামী বিবেকানন্দরূপে আবার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যদি এই শুভমুহূর্তে আমরা শ্রীস্বামীজী-প্রচারিত বেদান্ত-ধর্মের নবীনত্ব উপলব্ধি করিতে না পারি—তবে ব্যক্তিগত, সমাজগত ও সর্ববিধ অকল্যাণ আসন্ন। ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের সারমর্ম আত্ম-বিশ্বাস। আত্মসংবিৎহারা ভারতবাসী—আমরা আমাদের স্বাভাবিক আত্মশ্রদ্ধা হারাইয়া বহুকাল যাবৎ জগতে ধিক্কৃত ও ঘৃণিতপ্রায় দাসজীবন অতিবাহিত করিয়াছি। দাসসুলভ হিংসা-দ্বেষ সমাজের মেরু-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। আত্মপ্রত্যয়ী পাশ্চাত্ত্য দেশ আমাদের উপর অতুল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আত্মপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান বেদান্ত-শাস্ত্র যে দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, সে দেশে ক্লীবতা গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। এই মহামোহ ও ক্লীবতার নিধনসাধনে বেদান্তমূর্তি ভগবান আবার নরদেহে আবির্ভূত হইয়াছেন। আত্মপ্রত্যয়ের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা—জড়তা ও ক্লীবতা দূরীকরণ—সত্য সংযম ও তপস্যা-সাধন—ইহাই নবযুগযজ্ঞের বিধি-বিধান। জীবন ক্ষণস্থায়ী—মহাকালের তুলনায় এক নিমেষও নহে। ব্যক্তিগত, সমাজগত, দেশগত ও জগদ্-ব্যাপী ওজঃশক্তিসঞ্চারে বেদান্তশাস্ত্রের ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন আর কোন শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবের বিবেক বৈরাগ্য উৎপাদন দ্বারা—স্বার্থে যে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও পরার্থে যে নিষ্কাম কর্মপ্রবণতা উৎপন্ন হয়—তাহা জীবহিত-চিকীর্ষায় অমৃত-নিস্যন্দিনী গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় কেবলি পরার্থে প্রবাহিতা। আমরা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী হইলেও আনুষঙ্গিক যোগকর্ম-ভক্তি-তত্ত্বের সামঞ্জস্য-বিধানে যত্নশীল।

বেদান্ত বুঝিবার পূর্বে অন্যান্য দার্শনিক মতেরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানসংগ্রহ আবশ্যক। এইজন্য উপক্রমণিকায় আমরা এই মূলতত্ত্বগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ঋগাদি ভেদে ত্রিধা এবং যজ্ঞার্থে চতুর্ধা সংকলিত বেদ আবার দুই প্রস্থানে প্রবিভক্ত। সংহিতা-ভাগে স্তোত্রমন্ত্রাদি, ব্রাহ্মণভাগে তাহাদেরই প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। উভয় ভাগের শেষ অধ্যায়গুলি যাহা আরণ্যক বা উপনিষদ্ বলিয়া কথিত হয় তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের ও উপাসনার উপদেশাদি বর্ণিত আছে। প্রতি বেদের অন্তভাগে ব্রহ্মজ্ঞানমূলক উপদেশ থাকায় উহা বেদান্ত শাস্ত্র বলিয়া কথিত। উপনিষদ্ই বেদান্ত।

ব্রহ্ম ও আত্মা এতদুভয়ের ঐক্য-সাক্ষাৎকার-বিষয়ক প্রমাণাত্মক শাস্ত্রের নাম 'উপনিষদ্'। যাহার অনুশীলন দ্বারা অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া অতি নিকটস্থ অন্তরাত্মাই স্বরূপব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত হয়—তাদৃশ ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্। উল্লিখিত প্রমাণের অনুকূল বলিয়া শারীরকসূত্রাদিও বেদান্ত বলিয়া কীর্তিত।

যে সকল উপনিষদ্ অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রে রচিত

হইয়াছে তন্মধ্যে দশোপনিষদ্‌ই প্রধান। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের উল্লেখ থাকিলেও নিম্নলিখিত দশখানি উপনিষদ্‌ই প্রধান বলিয়া অবলম্বিত হয়: (১) ঈশ (২) কেন (৩) কঠ (৪) প্রশ্ন (৫) মুণ্ডক (৬) মাণ্ডুক্য (৭) তৈত্তিরীয় (৮) ঐতরেয় (৯) ছান্দোগ্য এবং (১০) বৃহদারণ্যক —এই দশোপনিষদের উপর প্রধানতঃ ভিত্তিস্থাপন করিয়াই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদান্ত-সূত্রের পরিপাটি উত্তুঙ্গ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন, শঙ্করভাষ্য পড়িলে ইহাই বোধ হয়। এই বেদান্ত-সূত্রে উপনিষদ্-উপবনে সংগৃহীত ফুটন্ত কুসুমের মালিকা —মহর্ষি বেদব্যাস যেন অতি সন্তর্পণে গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষ্য, টীকা, বৃত্তি, বার্তিক টিপ্পনীতে ইহা সমাবৃত হইলেও, ব্রহ্মসূত্রমালায় চমৎকার রচনানৈপুণ্য ও সুষ্ঠু সিদ্ধান্তগুলি অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

শঙ্করাচার্যের পূর্বেও উপবর্ষ ও বোধায়ন মুনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। রামানুজাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে বোধায়ন মুনির মত উদ্ধৃত করিয়া তৎকথিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। উপবর্ষ মুনি পাণিনির গুরু বলিয়া কথিত হন; এবং তিনিও দ্বৈতাদ্বৈত-মতের সমর্থক বলিয়া অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের পরবর্তী রামানুজ, মধ্বাচার্য বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শুনা যায় ইদানীন্তন কালে রাজা রামমোহন রায়ও ব্রহ্মসূত্রের একখানি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের গুরু ও প্রবর্তক শ্রীশঙ্করাচার্য এই ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন তাহা 'শারীরক' ভাষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। শরীর শব্দ 'শৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'শৃ' ধাতুর অর্থ শীর্ণ হওয়া। যাহা ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া অন্তে শীর্ণ হইয়া যায় তাহার নাম শরীর। তদুত্তর তুচ্ছার্থে 'ক' প্রত্যয় যোগে 'শরীরক' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। 'তত্র ভব' ইত্যর্থে 'শারীরক' ইহাদ্বারা ভাষ্যকার এই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, হে জীব! যে দেহ অবলম্বনে তুমি 'আমি আমি' করিয়া বেড়াইতেছ—ইহা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ-জ্বালায় প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতেছে; এইজন্য এই শরীর অতি তুচ্ছ পদার্থ। এই মানব-শরীর লাভ করিয়া তুমি আত্মজ্ঞানলাভে কৃতপ্রযত্ন হও; নতুবা জন্মমৃত্যুর দুঃখময় পথে তোমাকে বারংবার পরিভ্রমণ করিতে হইবে।

ভারতীয় প্রতি দর্শনেই চারিটি অনুবন্ধ দৃষ্ট হয়। সে অনুবন্ধগুলির নাম (১) অধিকারী (২) বিষয় (৩) সম্বন্ধ (৪) এবং প্রয়োজন। কঠোপনিষদ্ ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন:—"এবমুপনিষন্নির্বচনেনৈব বিশিষ্টোঽধিকারী বিদ্যায়ামুক্তঃ। বিষয়শ্চ বিশিষ্ট উক্তো বিদ্যায়াঃ পরং ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মভূতম্। প্রয়োজনঞ্চাস্যা উপনিষদ আত্যন্তিকী সংসারনিবৃত্তির্ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণা। সম্বন্ধশ্চৈবম্ভূতপ্রয়োজনেনোক্তঃ।" অর্থাৎ মুমুক্ষুই এই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। সর্বভূতের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মই উপনিষদের বিষয়। অত্যন্ত সংসার-নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার প্রয়োজন; আর ঐ প্রয়োজনের সহিত উপনিষদের প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকত্বই সম্বন্ধ।

অতি-দুরবগাহ্য ব্রহ্মতত্ত্বে যে সে লোক প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ ব্রহ্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মপুরঃসর সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হওয়া চাই; মুক্তির তীব্র ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তিই বেদান্ত-সাধনার অধিকারী। সে—যে জাতি, যে সমাজ, যে শাস্ত্রানুশাসন ও যে বিভিন্ন আচারাদি-সম্পন্ন বর্ণাশ্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুযায়ী অনুশাসন মানিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম করিয়া চলিলে প্রত্যেকেই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইতে পারেন; এবং তার পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়। বেদান্তে দেখা যায় ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকেরই বেদবিদ্যাধিকার আছে।

সমাজ ও স্মৃতিশাসন কালচক্রে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া যায়—ইতিহাসই তাহার প্রমাণ।

গীতামুখে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং"। পরাগতি অর্থে ব্রহ্মজ্ঞতা। ভাষ্যকারের অভ্যুদয়কালে সমাজে শূদ্রাদির অনধিকারিত্ব সূচিত হইলেও তাহা ইদানীন্তন সমাজে প্রযোজ্য কি না বিবেচনার বিষয়। ইতিহাস পুরাণ ও জনশ্রুতি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, সকল জাতির মধ্যেই মহা মহা ধর্মবীর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছে। যদি এরূপই হয়, তবে বলিতে হইবে—গণ্ডীবদ্ধ অধিকারবাদ সর্বকালে সমানভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। বেদান্তশাস্ত্রেও দৃষ্ট হয় নিতান্ত নির্মলস্বভাব হইলেই তাহার ব্রহ্মবিবিদিষা জন্মে। নির্মলস্বভাবত্বলাভ নানাপথে জন্মাইতে পারে। একদিন স্বামীজী আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "অধিকারীবাদের বিতণ্ডায় অনর্থক শক্তিক্ষয় না করে এই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শুনাতে লেগে যা। দেখবি, হয়তো সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকেও মহা মহা বীরের অভ্যুত্থান হবে।"

শংকরাচার্য-জীবন-পরিক্রমা

'আনন্দ'

সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে—করুণাবতার ভগবান অমিতাভ বুদ্ধ তাঁহার সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন। ভিক্ষু ভিক্ষুণী সংঘ আরামে দেশ ভরিয়া গিয়াছে; মহারাজ অশোক আসিয়া প্রচারক ও শিলালিপি সহায়ে ভগবান তথাগতের বাণী চতুর্দিকে বিকীরণ করিয়াছেন। তাহার পরও কতদিন কাটিয়া গেল। কাল-প্রভাবে অমিতাভের অমিত আভাও দূর দিগন্তে ম্লান হইতে লাগিল; ত্যাগ ও অহিংসার উচ্চ আদর্শ ধরিতে না পারিয়া জনসাধারণ বুদ্ধবাণীর বিকৃত অর্থ করিতে লাগিল। সারা দেশ—বৈদিক ও বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া—যেন 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়া—কিম্ভূতকিমাকার কদাচার অনাচারের আবর্জনাস্তূপে পরিণত হইল!

* * *

তখনও ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটি স্তিমিত প্রদীপ-শিখা জ্বলিতেছিল! মালাবর প্রদেশের কালাডি গ্রামে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ-বংশে শিবগুরু নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; এই বংশে প্রাচীন বেদাচার সযত্নে রক্ষিত ছিল। শিবগুরু-পত্নী বিশিষ্টাদেবীও স্বামীর সহিত জপতপেই দিন কাটাইতেন। সন্তানসন্ততি না হওয়ায় এই দিব্যদম্পতী পুত্রলাভের জন্য শিবের আরাধনা করেন। আশুতোষ সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'কিরূপ পুত্র চাও?' পিতা জ্ঞানী পুত্র চাহিলেন, মাতা পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করেন। শিব বলেন, 'দুই প্রার্থনা একসঙ্গে পূর্ণ হইবে না।' মূর্খ দীর্ঘায়ু পুত্র অপেক্ষা জ্ঞানী অল্পায়ু পুত্রই সর্বাংশে শ্রেয়—পত্নীকে বুঝাইয়া শিবগুরু তাহাই প্রার্থনা করিলেন। ৬০৮ শকাব্দ (৬৮৬ খৃঃ) ১২ই বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সেই আকাঙ্ক্ষিত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। শিব-বরে পুত্র হইয়াছে, তাই পিতামাতা নাম রাখিলেন শংকর। শৈশব হইতেই শংকরের অলৌকিক প্রতিভা সকলকে মুগ্ধ করিত। অতি অল্প বয়সেই বালক কথাবার্তা তো শিখিলই, উপরন্তু—পিতামাতার মুখে পুরাণের গল্প শুনিয়া অবিকল পুনরাবৃত্তি করিতে পারিত। শ্রুতিধরত্ব ছিল তাহার জন্মগত গুণ।

শিবগুরু শুধু এইটুকু দেখিয়াই চলিয়া গেলেন। পিতৃহীন বালককে বিশিষ্টাদেবী যথাসাধ্য মানুষ

করিতে লাগিলেন। বংশের রীতি অনুসারে পঞ্চম বর্ষে উপনয়নের পর বালক বেদপাঠের জন্য গুরুগৃহে প্রেরিত হইল। গুরু বাল-শংকরের অসামান্য মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন, অতি অল্প সময়ে শংকর বেদবেদাঙ্গ পাঠ সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে, সাত বৎসরের বালক অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছে—দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল—কেহ কৌতূহলী হইয়া, কেহ বিদ্যা পরীক্ষা করিতে, কেহ বা ভক্তির অর্ঘ্য লইয়া বালকের কাছে শাস্ত্রার্থ শিখিতে।

কিন্তু একদিন দুঃখের তমসাচ্ছন্ন ছায়া আসিয়া বিশিষ্টাদেবীর জ্যোতির্ময় কুটিরখানি ছাইয়া ফেলিল। শংকরের অপূর্ব প্রতিভার কথা শুনিয়া কয়েকজন জ্যোতির্বিদ্ আসিয়া বালকের কোষ্ঠী দেখিতে চাহিলেন, মাতাও এরূপ পুত্রের ভবিষ্যৎ জানিবার আগ্রহে জন্মপত্রিকা বাহির করিয়া দিলেন। জ্যোতির্বিদ্‌গণ মহা উৎসাহে গণনা করিতেছেন, বলিতেছেন, এমন রাশি-নক্ষত্রের যোগাযোগ মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। মাতাও উৎফুল্লা। সহসা পণ্ডিতগণ বিমর্ষ ও গম্ভীর হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। মাতৃহৃদয় ভয়ে ভাবনায় কাঁপিয়া উঠিল। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর জ্যোতিষীরা ভবিতব্য প্রকাশ করিলেন—শংকরের আয়ু মাত্র আট বৎসর, তবে তপস্যায় আরো আট বৎসর বাড়িতে পারে।

যাহার মৃত্যু এত সন্নিকট—তাহার ও তাহার মাতার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। শংকরও শাস্ত্রাদিপাঠে জানিয়াছেন, আত্মজ্ঞান লাভ না করিয়া দেহত্যাগ—অশেষ দুঃখের হেতু, এরূপ জীবন বৃথা—বিড়ম্বনা। অতএব সন্ন্যাসের সংসংকল্প লইয়া বাকী জীবনটুকু তপস্যায় কাটাইতে পারিলেই সর্ববিধ কল্যাণ! একদিকে মৃত্যু, অপরদিকে সন্ন্যাস—আর মধ্যে দারুণ উদ্বেগে মাতাপুত্রের দিন কাটিতে লাগিল।

এমন সময়—শংকর একদিন স্নানার্থে নদীতে নামিয়াছেন—এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার পা কামড়াইয়া ধরিল, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—কিন্তু সাহস করিয়া কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে আগাইয়া অসিল না, বিমূঢ়া জননী আসিয়া নিমজ্জমান মুমূর্ষু পুত্রকে দেখিয়া ভাবিলেন—এইভাবেই বুঝি জ্যোতিষীদের গণনার ফল ফলিবে। শংকর তখনও হাত তুলিয়া চীৎকার করিতেছেন—'মা সন্ন্যাসের অনুমতি দাও, অনুমতি দাও!' আর ভাবিবার সময় ও সামর্থ্য নাই, মাতা অনুমতি দিয়া মূর্ছাপন্না হইয়া পড়িয়া গেলেন!

এদিকে শংকর মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবামাত্র কুম্ভীর তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। এ যেন সংসার-মায়া—সন্ন্যাসমন্ত্র স্মরণমাত্র বিদূরিত হইল! কুম্ভীরগ্রাসমুক্ত শংকর তীরে উঠিয়া সেবাশুশ্রূষা করিয়া জননীর মূর্ছাভঙ্গ করিলেন। বিশিষ্টা দেবী পুনরায় পুত্রমুখ দেখিয়া নবজীবন ফিরিয়া পাইলেন, ও শংকরকে লইয়া গৃহে ফিরিতে চাহিলেন। বালসন্ন্যাসী বলিলেন—'না মা, তা আর হয় না, জীবন ফিরিয়াছে, কিন্তু সংকল্প ফিরিবে না।' বিশিষ্টা দেবীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না, শংকর অনেক বুঝাইলেন, শেষে প্রতিশ্রুত হইলেন,

(১) মৃত্যুকালে মায়ের কাছে থাকিবেন,

(২) তখন তাঁহাকে ইষ্টদর্শন করাইবেন,

(৩) স্বয়ং তাঁহার সংকার করিবেন। বৃদ্ধা কিছু পরিমাণে শান্ত হইলেন। শংকরও মাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শলাভের জন্য কঠিনতম পথে যাত্রা করিলেন।

* * *

গুরুগৃহে পাঠকালে শংকর শুনিয়াছিলেন—নর্মদাতীরে যোগীদের সাধনার স্থান, এখনও সেখানে বহু সাধক সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। যোগী গোবিন্দপাদ নামে এক সিদ্ধপুরুষ বহু বর্ষ যাবৎ সেখানে এক গুহায় ধ্যানমগ্ন, তিনিই মহর্ষি

পতঞ্জলি—এইরূপ কিংবদন্তী! জগৎকল্যাণে তাঁহার সাধনা ও জ্ঞানরাশি উপযুক্ত আধারে অর্পণ করিবার অপেক্ষাতেই তিনি সমাধিস্থ। সেই অলৌকিক আধাররূপী দেবপ্রতিম শিষ্যের স্তবগানেই নাকি তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইবে।

শংকর গোবিন্দপাদকেই মনে মনে গুরুরূপে বরণ করিয়া চলিয়াছেন—নদনদী গিরি কান্তার অতিক্রম করিয়া দক্ষিণভারতের এক প্রান্ত হইতে মধ্যভারতের হৃদয়গুহায়! কত অনিদ্রা অনাহার বিপদ বাধা সহ্য করিয়া শংকর শেষে উপনীত হইলেন তাঁহার বাঞ্ছিত ভূমি নর্মদানদীতটে! দেখিলেন, অনেক সাধক—যোগীর সমাধিভঙ্গের আশায় অপেক্ষা করিতেছেন, সমাধিস্থ যোগীর গুহা প্রদক্ষিণ করতঃ ভিতরে প্রবেশ করিয়া শংকর অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, 'নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্'—স্থিরজ্যোতির মত যোগিরাজ ধ্যানমগ্ন—দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি হইল না, উদ্বেলিত হৃদয় ছন্দোবেগে আকুল হইয়া গাহিয়া উঠিল—

শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং
যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্?
ষড়ঙ্গাদিবেদা মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্?

অনাহতধ্বনিসদৃশ সুললিত স্তব শুনিতে শুনিতে গোবিন্দপাদ ব্যথিত হইলেন, শান্তনেত্রে দেখিলেন, বুঝিলেন—'এই সেই, যার জন্য আমি যুগ যুগ ধ্যানমগ্ন'; শংকরও আনন্দে আত্মহারা হইয়া গুরু-চরণে তনুমনপ্রাণ—সব সমর্পণ করিলেন। সমবেত সকলে এই দিব্যদৃশ্য দেখিয়া নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিতে লাগিল।

লোকলোচনের অন্তরালে গুরু ও শিষ্যের কি আদানপ্রদান হইল কে তাহা জানিতে পারে? বাহির হইতে শুধু দেখা গেল—শিষ্য গুরু-সেবায় প্রাণ পণ করিয়াছেন, আর গুরু ও শিষ্যকে অধ্যাত্ম বিদ্যার অমৃতসুধা সযত্নে পান করাইতেছেন। পরিশেষে একদিন দেখা গেল গুরু উপদেশ শ্রবণমাত্র শুদ্ধচিত্ত শিষ্য সমাধিমগ্ন; গভীর হইতে গভীরতর সমাধির সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া শংকর আজন্ম পিপাসার বারি নির্বিকল্প সমাধিসুখে নিমজ্জিত। কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন—কে তাহার সংবাদ রাখে? এই আত্মানন্দের আতিশয্যই ঝঙ্কৃত হইয়াছে তাঁহার জীবন বীণার তারে তারে—

অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুর্ব্যাপ্য সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

এই অদ্বৈত অনুভূতি, 'অনাদিমধ্যান্তম্' 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' ভাব শংকরকে বিভোর করিয়া তুলিল, তিনি গাহিতে লাগিলেন,—

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
　ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞা।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
　চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

সমাধি-সাগরে অনন্ত আনন্দ-রসে নিমজ্জিত শংকরের মনকে গুরু গোবিন্দপাদ আবার টানিয়া আনিলেন এই শোকদুঃখময় জগৎপ্রপঞ্চে কি এক নূতন লীলা বিকাশের আশায়। শংকর বোধে বোধ করিতে লাগিলেন—

'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' অতএব কে কাহাকে জ্ঞান দিবে? অজ্ঞান বা বন্ধন কাহার? ধীরে ধীরে গুরু তাহাকে বুঝাইলেন—কি উদ্দেশ্যে তাঁহার শরীর ধারণ, বলিলেন, 'স্মৃতি বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির অভাবে উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা লোপ পাইলে ব্যাসদেব বেদবেদান্তের মর্মকথা ব্রহ্মসূত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া শিষ্যদের শিক্ষা দেন—আমি

গুরুপরম্পরা সেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর বেদ উদ্ধারের জন্য তুমি আবির্ভূত! তুমি ব্যাসসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া শিষ্যমধ্যে শিক্ষা দাও, ও নূতন ধর্মভাবে ভারতকে প্লাবিত কর। আমার জীবনোদ্দেশ্য শেষ হইল, তোমার জীবন জয়যুক্ত হউক।'

* * *

গুরুর মহাসমাধি-লাভের পর তাঁহারই আদেশে শংকর কাশীধামে উপনীত হইলেন। বালসন্ন্যাসী শংকর বৃদ্ধপ্রৌঢ়যুবা-শিষ্য-পরিবৃত হইয়া বেদান্ত-ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই অপূর্ব অপার্থিব দৃশ্য দেখিয়া কাশীবাসীরা আশ্চর্যান্বিত হইল। বৌদ্ধপ্রভাবে বৈদিক ধর্ম লুপ্ত, তীর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছিল; সহসা এ দৃশ্য তাহাদের প্রাণে এক নূতন আশার সঞ্চার করিল। মুখে মুখে এই কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শংকরকে দেখিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল।

কাশীধামে যে দুইটি ঘটনা শংকরের জীবনে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা আনয়ন করে, তাহা যেমনই মধুর তেমনই মানবিকতায় পরিপূর্ণ। শংকর ভাবিতেন,—নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সব কিছু মিথ্যা, এই যে সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী শক্তি উহাও মায়ামাত্র!

একদিন মণিকর্ণিকার পথে চলিয়াছেন, দেখেন—এক যুবতী স্বামীর মৃতদেহ কোলে করিয়া বসিয়া আছে, শায়িত শবদেহে সরুগলির যাতায়াতের পথটুকু জোড়া। শংকর যুবতীকে বলিলেন—'ওটাকে সরাও, পথ দাও' যুবতী বলিলেন 'তুমি ওটাকেই সরতে বলনা' —শংকর বুঝিলেন, স্বামিবিয়োগ-বিধুরার বুদ্ধিও বিলুপ্ত; বলিলেন 'ওর কি শক্তি আছে?'—তখন যুবতী বলিলেন, 'শক্তি না হলে কি একটুও নড়াচড়া যায়না?' শংকর হাসিয়া উঠিলেন 'কি অসম্ভব কথা!' এবার যুবতীও হাসিয়া উঠিলেন, 'কেন অসম্ভব? শক্তি আবার কি? শক্তি তো মায়া মিথ্যা!'—

শংকর নিজেরই চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইলেন, তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল; বুঝিলেন—শক্তি মিথ্যা নয়, মায়া নয়—মহামায়া ব্রহ্মা-ভিন্না শক্তি অনির্বচনীয়া! আশ্চর্য এই জ্ঞানোন্মেষের পর পথিমধ্যে সেই শব বা যুবতী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না! জ্ঞানী শংকর ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া চলিলেন অন্নপূর্ণার মন্দিরে, মাকে দর্শন করিতে, মায়ের কাছে জ্ঞান ভক্তি ভিক্ষা করিতে:

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী।

দিব্যভাবে বিভোর হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানগুরু শংকর কাশীধামে বিচরণ করিতেছেন—গঙ্গাতীরে একদিন এক চণ্ডাল তাহার কয়েকটি কুকুর লইয়া আসিতেছে, স্পর্শভয়ে সংকুচিত শংকর বলিলেন, 'দূরমপসর রে চণ্ডাল!'—চণ্ডাল হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, আত্মা ত 'অখণ্ডমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'—কে কাহাকে স্পর্শ করে—কে কাহাকে অশুচি করে? শংকর লজ্জিত হতবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—সত্যই তো তাঁহার অদ্বৈতবোধ ও দ্বৈত-ব্যবহার অত্যন্ত অসঙ্গত। গুরুজ্ঞানে চণ্ডালকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন রজতগিরিনিভ মহেশ্বর! শংকর দেখিলেন, নিখিল জগৎ শিবময় চৈতন্যময় ব্রহ্মময় 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'—এই ব্রহ্ম ওত এবং প্রোতভাবে—সব কিছু ব্যাপ্ত করিয়া, সব কিছু অতিক্রম করিয়া—তরঙ্গের তলে সমুদ্রের মত, মৃদ্জাত পদার্থের ভিতর মৃত্তিকার মত! এই নূতন অনুভবে শংকর আবার আত্মহারা হইলেন। ভাব একটু সংবৃত হইলে মহাদেব শংকরকে আশীর্বাদ করিলেন এবং নিভৃত হিমালয়ে ভাষ্য রচনা করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

কিন্তু বিভিন্ন ভাবাবেগে কাশীধামে আরো কিছু কাটিয়া গেল, শংকর কখন বালকের মত 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকেন—কখন অদ্বৈতব্রহ্মবোধে নিস্তব্ধ থাকেন।

শংকরের আর কোন বাসনা নাই, উদ্দেশ্য নাই—

কোন কার্যে অনুরাগ নাই, বিরাগও নাই—ঈশ্বর-ইচ্ছায় তিনি যেন ভাসিয়া চলিয়াছেন,—তাঁহারই হাতের পুতুল হইয়া, যন্ত্র হইয়া। কত শিষ্য কত ভক্ত আসিয়া জুটিতেছে তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই—অবিরাম তাঁহার কথামৃতপানে তাহারা মুগ্ধ—তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহে না। চিৎসুখ আনন্দগিরি, সনন্দন বা পদ্মপাদ তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিল। কত পণ্ডিত আসিল তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিতে, তাহারা বালকের মাধুর্যে ও গাম্ভীর্যে মুগ্ধ হইয়া বুঝিল—এ বালকের কণ্ঠে সরস্বতী, মস্তকে সদাশিব, হৃদয়ে সাক্ষাৎ জগজ্জননী মহামায়া! দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে আর মানুষ বলিয়া মনে হইত না। বয়সের পার্থক্য ভুলিয়া আবাল-বৃদ্ধবনিতা—সকলেই তাঁহার চরণে প্রণত হইত।

* * *

গুরু ও মহাদেবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া কাশীর কোলাহল ছাড়িয়া সশিষ্য শংকর চলিলেন তপোভূমি হিমালয়ের নিভৃত মণিকোঠা বদরিকাশ্রমে! কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চবর্ষকাল জোশীমঠ ও বদরিকাশ্রমাঞ্চলে থাকিয়া ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও দশখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এদিকে ষোড়শবর্ষ সমাগত, আয়ুষ্কাল নিঃশেষ। কাশীধামে শরীরত্যাগের উদ্দেশ্যে শংকর বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আবার লোকজন, আবার তর্ক বিচার আলাপ আলোচনা।

একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লইয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিতে লাগিল। বালক ও বৃদ্ধের তর্ক ক্রমশঃ জমিয়া উঠিতেছে—উভয়েরই বেদবেদান্ত কণ্ঠস্থ, উভয়েরই বুদ্ধি কুশাগ্র-তীক্ষ্ণ। নিত্যকর্মের সময় ব্যতীত আট দিন এইভাবে চলিতেছে, সকলে শুনিতেছে, ক্রমে তর্ক এমন সূক্ষ্ম হইয়া উঠিল যে—আর কেহই কিছু বুঝিতেছে না।

পদ্মপাদ বুঝিলেন, এ ব্রাহ্মণ সামান্য নহেন—ধ্যানযোগে জানিলেন ইনি ব্যাসদেব, শংকরও তখন ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেব আর আত্মগোপন না করিয়া তাঁহার আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন—শংকরকে স্নেহরসে অভিষিক্ত করিয়া বহু আশীর্বাদ করিলেন, এবং আরো ১৬ বৎসর আয়ুর্বৃদ্ধি করিয়া বলিয়া গেলেন, 'এইবার তোমার নূতন ভাবধারা ভাষ্যসহায়ে প্রচার কর। বৌদ্ধপ্রভাবে বেদমার্গ লুপ্ত, বেদান্তার্থ অপ-ব্যাখ্যাত। কুমারিল ভট্ট বেদের কর্মকাণ্ড দ্বারা বৌদ্ধমতবাদ কিঞ্চিৎ খণ্ডন করিয়াছেন সত্য—তুমি জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা সকল মত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ বেদান্ত-মত স্থাপন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন কর! শুধু তর্কের দ্বারা ইহা সম্ভব নয়, ইহা অনুভূতির জন্য যে মহাশক্তি প্রয়োজন তুমিই তাহা সকলের প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত করিবে! অতএব ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার ও প্রদানের জন্য তুমি আরো কিছুকাল মানবদেহে থাক ও সর্বত্র বিজয়ী হও!' কর্মবিষয়ে শংকরের কোন প্রবৃত্তিও ছিল না, অপ্রবৃত্তিও ছিল না। তিনি দেহত্যাগের জন্য যেমন প্রস্তুত ছিলেন—আবার ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণের জন্য তেমনি উদ্যোগী হইলেন।

* * *

কুমারিলের সঙ্গে বিচার করিবার জন্য প্রয়াগে আসিয়া শংকর দেখেন—তর্ক-প্রতিশ্রুতির জন্য গুরুহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কুমারিল ভট্ট তুষানলে প্রাণ বিসর্জন করিতে কৃতসংকল্প। তিনি শংকরের কথা শুনিয়া বলিয়া দিলেন—তাঁহার মেধাবী শিষ্য মণ্ডনমিশ্রকে পরাজিত করিতে পারিলেই তাঁহার মত খণ্ডিত হইবে।

ঐ নির্দেশ-অনুসারে আচার্য শংকর মাহিষ্মতী নগরে মণ্ডনগৃহে আসিয়া দেখেন দাসদাসী শুক-পাখীও বেদবিষয় আলোচনা করিতেছে। মণ্ডন পিতৃশ্রাদ্ধে ব্যস্ত, সন্ন্যাসী দেখিয়া একটু বিরক্ত হইলেন। যাহাই হউক মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতীর

মধ্যস্থতায় তর্ক হইবে, স্থির হইল। বেদের তাৎপর্য কর্মকাণ্ড না জ্ঞানকাণ্ড—ইহাই ছিল বিচারের বিষয়। মণ্ডনমতে বৈদিক মন্ত্রে যাগযজ্ঞ করিয়া স্বর্গপ্রাপ্তিই জীবের মুক্তি, জীবনের উদ্দেশ্য। শংকরমতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই—মায়ায় নানা প্রতীয়মান; 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এবং 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—এই জীবব্রহ্ম অভেদজ্ঞানেই মুক্তি, ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য—ইহাই সমগ্র বেদবেদান্ত উপনিষদের মর্মকথা। সপ্তদশ দিবস ধরিয়া তর্ক চলিল, অবশেষে মণ্ডনের যুক্তি ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে—লজ্জায় ক্ষোভে তাহার মুখ শীর্ণ বিবর্ণ হইল, গলার মালা শুকাইয়া গেল। অতঃপর উভয়-ভারতী শংকরকে বলিলেন, আপনার জয় সম্পূর্ণ করিতে হইলে আমাকেও তর্কে পরাস্ত করিতে হইবে। তিনি স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। শংকর এ বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ, তাছাড়া সন্ন্যাসী বলিয়া এ বিষয়ে আলোচনাও তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। যাহাই হউক পরকায়-প্রবেশ দ্বারা তিনি এ প্রশ্নেরও সমাধান করিয়া এক মাসের মধ্যে উভয়-ভারতীর হস্তে লিখিত উত্তর দিলেন।

তর্ক-প্রতিশ্রুতি-অনুযায়ী স্বামীর সন্ন্যাস নিশ্চিত জানিয়া উভয়ভারতী দেহত্যাগ করিলেন, সন্ন্যাসের পর মণ্ডনের নাম হইল সুরেশ্বর।

মণ্ডনের ন্যায় মহাপণ্ডিত এক বালক সন্ন্যাসীর নিকট পরাজিত এবং তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, এই অদ্ভুত সংবাদ ভারতের সর্বত্র ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়া পড়িল। শংকরও চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সকল মত খণ্ডনপূর্বক অদ্বৈত মত স্থাপনে তৎপর হইলেন। শংকর যেখানেই যাইতেন সেখানেই আনন্দের হিল্লোল খেলিয়া যাইত, বেদপ্রথা উজ্জীবিত হইত, পুরাতন তীর্থ নূতনভাবে জাগিয়া উঠিত। অধিকারী ভেদে চরম জ্ঞানের সঙ্গে পরম ভক্তির কথা বলিয়া শংকর পঞ্চদেবতার পূজাও প্রচলিত করিলেন—হিন্দুধর্ম এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হইল। কেহ তাঁহার স্পর্শে অদ্বৈততত্ত্বের আস্বাদ পাইল, কেহ 'তত্ত্বমসি' শুনিয়া ইহা বোধে-বোধ করিল, কেহ তর্ক বিচার করিয়া উহা বুঝিবার চেষ্টা করিল, কেহ বা তাঁহার দর্শনেই ইষ্টের সন্ধান পাইল। বহু জিজ্ঞাসুর জন্য শংকর বহুভাবে বিভিন্ন দিক দিয়া সরল করিয়া বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতেন—কখনও বা ভক্তিরস-পরিপূর্ণ স্তবস্তুতি তাহার সুললিতকণ্ঠে বাজিয়া উঠিত—ভক্তেরা সেগুলিও লিখিয়া লইতেন। এইভাবে মধ্যাহ্ন ভাস্করের মত আচার্যদেব ভারতের আকাশে বিরাজ করিতে লাগিলেন। আজন্ম জ্ঞানী হস্তামলক, গুরুগতপ্রাণ তোটক প্রভৃতি শিষ্যগণও তাহার আশ্রয়ে মিলিত হইল। আবার উগ্রভৈরব প্রভৃতি দুর্মতি কাপালিকও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া স্বীয় সিদ্ধাই-সাধনে তাঁহাকেই নিধন করিতে উদ্যত। আচার্য নির্বিকার, স্বেচ্ছায় ঐ দুর্মতির খড়্গাঘাতে মস্তক বলি দিতে যাইতেছেন—এমন সময় পদ্মপাদ নৃসিংহমূর্তি ধরিয়া বাধা দিল এবং উগ্রভৈরবেরই মস্তক ছিন্ন করে।

তুঙ্গভদ্রাতীরে শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গেরিতে মঠ-স্থাপন করিয়া আচার্য শিষ্যগণ সহ শাস্ত্রচর্চায় মগ্ন; এমন সময় একদিন মুখে মাতৃদুগ্ধের আস্বাদ পাইয়া বুঝিলেন, মৃত্যুকালে জননী তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন। যোগবলে আকাশমার্গে তিনি মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। মাতাও দশ বার বৎসর পরে পুত্রমুখ দেখিয়া অপরিসীম আনন্দলাভ করিলেন—শংকর ভগবতীজ্ঞানে তাঁহার সেবা যত্ন করিতে লাগিলেন। মায়ের সকল দুঃখ দূর হইল। পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে শংকর তাঁহাকে তাঁহার ইষ্টমূর্তি দেখাইলেন এবং তাহা দর্শন করিতে করিতে বিশিষ্টাদেবী ইহলোকে গমন করিলেন।

জ্ঞাতিদের কাহারও সাহায্য না পাওয়ায় তিনি একাই মায়ের সৎকার করিলেন। তাহাদের ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত মর্মাহত হইয়া তাহাদের

দণ্ড দিবার জন্য অভিশাপ দিয়া গেলেন—গৃহপ্রাঙ্গণে তোমাদের মৃতদেহ সৎকার করিতে হইবে। কোনও সন্ন্যাসী কোনদিন তোমাদের অন্নগ্রহণ করিবে না। তোমরা বেদবহির্ভূত হইবে! জ্ঞাতিরা প্রথম ভাবিয়াছিল বালকের কথার কি মূল্য। কিন্তু শংকরাগমন-বার্তা শুনিয়া দলে দলে লোক আসিতে লাগিল, দেশের রাজাও আসিলেন শংকরের অপমানের কথা শুনিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন—এবং শংকরাদেশ শিরোধার্য করিয়া তিনি ঐ জ্ঞাতিদের সাবধান করিয়া দিলেন। শাপ-মোচনের জন্য তখন তাহারা আসিয়া শংকরের পাদমূলে পতিত হইল। করুণারসের বরুণালয় শংকর তৃতীয় অভিশাপটি মোচন করিয়া তাহাদের বেদাধিকার দিয়া গেলেন, কিন্তু বাকী দুটি দণ্ড এখনও বলবৎ। কেরলদেশে নানা সদাচার প্রবর্তন করিয়া, প্রচারকার্য শেষ করিয়া শংকর শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইলেন।

সেতুবন্ধের নিকট মধ্যার্জুনের এক প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ছিল। সশিষ্য শংকর সেখানে আসিয়া স্বীয় মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, দেশের সকলে শুনিয়া মুগ্ধ ও শ্রদ্ধান্বিত হইতে লাগিল। অকাট্যযুক্তিবলে শংকর সকলের মন অদ্বৈত-মুখী করিতেছেন, কয়েকজন বৃদ্ধ কিন্তু কিছু মানিতেছেন না। অবশেষে একজন বলেন, এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যদি বলেন অদ্বৈতমতই সত্য, উহাই বেদের তাৎপর্য—তবে আমাদের সন্দেহ দূর হয়। শংকর বলিলেন—বিশ্বেশ্বরেরই ইচ্ছায় আমি এই মত প্রচারে উদ্যোগী, যদি আপনাদিগকেও ঐ মতে চালিত করা তাঁহার ইচ্ছা হয়—অবশ্যই তিনি আমার বাক্য সমর্থন করিবেন। এই বলিয়া তিনি মুখে-মুখেই স্তব রচনা করিয়া মধুরকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন, তাহার প্রতিধ্বনিতে মন্দির কাঁপিতে লাগিল, সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মন্দির উজ্জ্বল করিয়া মহাদেব আবির্ভূত হইয়া তিনবার, 'অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সকলে স্তম্ভিত, শংকরের মতের সত্যতা প্রাণেপ্রাণে উপলব্ধি করিয়া সকলে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে করিতে চরণে পতিত হইল।

কর্ণাটরাজ্যে এক কাপালিকদলের নেতা ক্রকচের বিশেষ প্রভাব, আচার্যদেব বিদর্ভ বিজয় করিয়া সেখানে যাইতে চাহিলে সকলে নিষেধ করে। কর্ণাট-রাজ সুধন্বা পূর্বেই শংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি গুরুদেবের ইচ্ছা বুঝিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে নিজরাজ্যে লইয়া আসিলেন। ক্রকচও দলবলসহ আক্রমণ করিলে খণ্ডযুদ্ধের পর উন্মত্ত ভৈরবের মত ঐ কাপালিক নিহত হয় এবং তাহার দলবল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করে।

উত্তরভারতের পর দক্ষিণভারত বিজয় করিয়া শংকর শুনিলেন, ভারতের পূর্বপ্রান্তে তন্ত্রমত বিশেষ প্রবল। কামরূপে অভিনব গুপ্ত বেদান্তের এক শাক্ত-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শংকর সেখানে আসিয়া তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। অভিনব পরাজিত হইয়া কপটভাবে শংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং অভিচারক্রিয়া দ্বারা আচার্যের নিষ্পাপ শরীরে ভগন্দর প্রবেশ করায়। তোটক প্রাণপণ সেবায় নিযুক্ত, পদ্মপাদ যোগশক্তিবলে জানিতে পারিলেন রোগের কারণ কি। তিনিও মন্ত্রজপ দ্বারা অভিচারকারীর দেহে রোগ ফিরাইয়া দিলেন। অভিনব রোগযাতনায় ছটফট করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আচার্য সুস্থ হইলেন, কিন্তু পদ্মপাদের কাণ্ড জানিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন।

অতঃপর কাশ্মীরে সারদাপীঠের মন্দির-রক্ষক পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়া তিনি উক্ত পীঠে আরোহণ করিলেন এবং 'সর্বজ্ঞ' বলিয়া গণ্য হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কাশ্মীরে তাঁহার মত গৃহীত হইল। এবার ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র তাঁহার মত গৃহীত, চারিকোণে চারিটি মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত, চারিজন শিষ্য উহাদের ভার প্রাপ্ত।

বত্রিশ বৎসর বয়সে সমাগত আচার্য লীলাবসান সন্নিকট বুঝিয়া শিষ্যদের সকলকে সঙ্গে লইয়া কিছু-কাল কেদারধামে কাটাইলেন। সেখান হইতে শিষ্যগণকে চারিটি মঠে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং কৈলাস-ধামে গিয়া মহাসমাধিযোগে শিবস্বরূপে বিলীন হইলেন। আসমুদ্র হিমাচল—নদনদী গিরিপ্রান্তর জনপদ অরণ্য—সর্বত্র ধ্বনিত হইল—'শংকরঃ শংকরঃ সাক্ষাৎ'; সে ধ্বনির শেষ নাই, বিরাম নাই—উহা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে যুগ হইতে যুগান্তরে।

মরুযাত্রী

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়

সংসার-মরুর যাত্রী! দীর্ঘ রাত্রি হও পার,
হও পার দীপ্ত মরীচিকা।
খুলে ফেলো আবরণ, স্তরে স্তরে টুটে যাক
তিমিরের ঘন যবনিকা।

পিছনেতে পড়ে থাক স্বপ্ন-সম এ সংসার
ছুটে চলো অন্ধকার চিরি,
মায়া-মৃগ-রূপে ভুলি ছুটিও না বৃথা আর,
ছুটে চলো মোহজাল ছিঁড়ি।

ধরিত্রীর রূপ-জালে কেন আর মিছামিছি
আপনারে আপনি জড়াও,
মিথ্যারে পাইবে বলে সত্যেরে ঠেলিয়া দূরে
বারে বারে নিজেরে ঠকাও।

বাসনায় লালসায় দগ্ধ হয়ে যাবে দেহ,
অবশেষ থাকিবে যে ছাই,
মিটিবে না কোন ক্ষুধা, হৃদয়ের যত আশা
চিত্তে শুধু জ্বলিবে সদাই।

মরুযাত্রী—হে পথিক! কেন অবসন্ন মন?
সংশয়ের নীহারিকা টুটি—
ওই দেখো অবিদূরে উদয়ের মহাক্ষণ
ধীরে ধীরে উঠিতেছে ফুটি!

সমালোচনা

The Philosophy of Truth or Tattwagnana—By V. Subrahmania Iyer. Published by Rukmani Kuppanna, 'Sudha,' Rajagopalachari Road Extension, Salem. Pp—460 ; Price—Rs. 9/-.

মহীশূরের সুপরিচিত প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রী ভি. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের (৮১ বৎসর বয়সে মৃত্যু, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯) বক্তৃতামালা ও প্রবন্ধাবলীর এই সঙ্কলন-গ্রন্থ অদ্বৈত বেদান্তের অনুরাগী পাঠকবৃন্দের সমাদর লাভ করিবে। পুস্তকটির সম্পাদনা করিয়াছেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর টি. এম্. পি. মহাদেবন্। শ্রীআয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর এস্. রাধাকৃষ্ণন্ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

'Truth' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক 'তত্ত্ব' ও 'মতবাদের' পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা দিয়া অসংখ্য মত সৃষ্টি করিতে পারে, এক মত অন্য মতকে খণ্ডন করে, মতবাদের অরণ্যে মানুষ পথ খুঁজিয়া পায় না।

তত্ত্ব কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। ইহা মানুষের কল্পনার অপেক্ষা করে না। উহা 'পুরুষতন্ত্র' নয়—বস্তুতন্ত্র। উহা দেশ, কাল, কার্যকারণেরও অধীন নয়। আত্মবস্তুই তত্ত্ব। আত্ম-ব্যতিরিক্ত আর যাহা কিছু তাহা দৃশ্য, মানুষের কল্পনার এলাকার মধ্যে। আত্মা 'অকল্প্যম্'। আত্মাই জীব ও জগতের আশ্রয়—সংশয়াতীত সত্য। এই সত্য কিন্তু একটি 'আকাশ কুসুম' নয়, প্রাত্যহিক জীবনে নিত্য অনুভবযোগ্য। ঐ সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিলে মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও কর্মে একটি বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হয়—যাহার মর্মকথা পরমা শান্তি ও বিশ্ব-কল্যাণ।

'Religion and Philosophy'—প্রবন্ধে লেখক পাশ্চাত্যে ঐ দুটি শব্দ কি অর্থে প্রয়োগ করা হয় তাহার বিচার করিয়া উহা হইতে ভারতীয় দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন। 'Man's interest in Philosophy', 'What is philosophy', 'The Latest and the oldest philosophy' এবং আরও কয়েকটি প্রবন্ধে বেদান্ত-নির্ণীত 'তত্ত্বজ্ঞানে'র মৌলিকতা ও শক্তি কোথায় তাহা পরিষ্কারভাবে লেখক বুঝাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ভারতবর্ষেও বহু 'মতবাদ' আছে। উহাদের প্রত্যেকটিরই স্বকীয় সার্থকতা অনস্বীকার্য, কিন্তু অদ্বৈত-বেদান্ত-নির্ণীত তত্ত্ব—যাহা ভারতবর্ষেই প্রথম আবিষ্কৃত, উহা ঐ সকল মতবাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। উহার মর্যাদা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৈদান্তিক সত্য পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম ও দর্শনে প্রযুক্ত হইতে পারে, কেননা উহা একটি বিশ্বজনীন 'বিজ্ঞান' (Science). বেদান্তের আত্মবিজ্ঞানই সকল মানবজাতির জন্য ভারতের মহত্তম দান। 'Reason and Intuition' এবং 'On Causality' প্রবন্ধে বৈদান্তিক তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালী বিশ্লেষিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক, ঐতরেয় এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদে উপন্যস্ত 'অবস্থাত্রয়ের' বিশ্লেষণ ও বিচার 'Avasthatraya' নামক প্রবন্ধে লেখক অতি সক্ষমভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ জাগ্রত অবস্থাতেই আমাদের সারা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি। উহার ফলে এই জগৎকে আমরা অতি-বাস্তব মনে করি এবং সংসারের নিত্য পরিবর্তনশীলতার দিকে আমাদের হুঁশ থাকে না। জাগ্রতের ন্যায় স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিও মানুষের একটি সার্বজনীন অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাকে যথাযথ বিশ্লেষণ করিতে পারিলে বৈদান্তিক সত্যলাভে অনেক সহায়তা হইতে পারে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি

তিন অবস্থার যিনি দ্রষ্টা নিত্যসাক্ষী সেই সনাতন আত্মাকে জানাই তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য।

সাতটি প্রবন্ধে ('Shankara's Philosophy', 'Shankara and his view of life', 'Shankara: from the modern standpoint of Philosophy', 'Shankara and our times', Shankara and his modern critics', 'Shankara's Philosophy and Action', 'Shankara : Reason or Revelation') লেখক অদ্বৈত-বেদান্তের ব্যাখ্যান ও প্রসারে আচার্য শঙ্করের মহতী কীর্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ঐ কীর্তি পুরাতনের প্রকোষ্ঠে রাখিবার জন্য নয়, বর্তমানকালের যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সর্বজয়ী বিপ্লবের বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্যকে সংহত ও সুসমঞ্জস করিবার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচারযোগ্য। গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'Sri Ramakrishna and the modern outlook' ভূয়োদর্শী দার্শনিক-প্রবরের অদ্বৈত-বেদান্তের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর একটি চমৎকার বিশ্লেষণ।

—শ্রদ্ধানন্দ

পঞ্চদশী-প্রদীপ (প্রথম আরতি)—স্বামী সত্যানন্দ প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীনিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম, হালিসহর (২৪ পরগণা)। পৃষ্ঠা—১৬৭; মূল্য ১॥০ টাকা।

স্বামী বিদ্যারণ্য প্রণীত 'পঞ্চদশী' বেদান্তশাস্ত্রের অপূর্ব প্রকরণগ্রন্থ। আলোচ্য পুস্তকে মূল পঞ্চদশী হইতে কতকগুলি শ্লোক নির্বাচন করিয়া অধ্যায়ক্রমে সাজাইয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বেদান্তের তত্ত্বসম্বন্ধে নিজের চিন্তাধারা গ্রন্থকার সরলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চদশীর নিজস্ব বিভাগ অনুসৃত না হওয়ায় যুক্তি ও বিচার-শৃঙ্খলা দুর্বল হইয়াছে মনে হয়।

জনগণের উপনিষৎ (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত এবং গোরাবাজার (বহরমপুর) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৮৮; মূল্য এক টাকা।

শ্বেতাশ্বতর মুণ্ডিকা ও কৈবল্য এই তিনখানি উপনিষদের পদ্যানুবাদ আলোচ্য পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদ অধিকাংশ স্থলেই প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য; মূল উপনিষদের ভাব ও তাৎপর্য রক্ষার উদ্যম অনেকাংশে সফল হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা—দশম বর্ষ, ১৩৬৩। সম্পাদক শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী ১০৬, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত এই শিক্ষালয়ের বার্ষিক পত্রিকাটি গল্পে ভ্রমণে প্রবন্ধে কবিতায় ও চিত্রসম্ভারে তাহার পূর্ব মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। রসরচনায় 'মশকস্তুতি' বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। পরিশেষে বিভিন্ন বিবরণী হইতে প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই শিক্ষালয়ের ও পত্রিকাটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

গীতি-অর্ঘ—শ্রীশ্রীমৎ যোগজীবনানন্দ স্বামী —সত্যায়তন-প্রচারক-সংঘ, কলিকাতা-৪০, পৃঃ ১২৪; মূল্য দেড় টাকা।

সাধক-কবি গ্রন্থপ্রকাশে উদাসীন। ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় গীতি-অর্ঘ প্রকাশিত। ১৫১টি গান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। ভাব-সাধনা, দেশপ্রেম ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় অনেকগুলিতেই বিদ্যমান। লেখক প্রাচীন কবিদের সাধন-সঙ্গীতের অনুরাগী এবং তাঁর চিত্ত পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের সুরে। উভয়ের সঙ্গতে বাজিয়া উঠিয়াছে এই গীতি-অর্ঘ।

সাধন-পন্থা (প্রথম বল্লী)—শ্রীশ্রীমৎ স্বামী যোগজীবনানন্দ, প্রকাশক—সত্যায়তন-প্রচারক-সংঘ পোঃ সত্যায়তন, বাঁকুড়া। পৃঃ ১৯৭; মূল্য ৩৲।

সত্যাশ্রয়ী মানবগণকে শান্তির পথে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি রচিত। শাস্ত্রের

অরণ্যে যাহাতে মানব পথহারা না হইয়া যায়—তাই লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে সহজ সরল পথের ইঙ্গিত দিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত কর্তব্য সংগৃহীত হইয়াছে। সাধন সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ অনেক কথা শিষ্যসম্প্রদায়ের জন্যই সীমাবদ্ধ থাকা সমীচীন; জনসাধারণের জন্য সাধারণতত্ত্বই যথেষ্ট।

সদ্ধর্ম রত্নমালা—শ্রীধর্মপাল ভিক্ষু সঙ্কলিত; প্রকাশক: ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সী, ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা—২২৯; মূল্য—৩৲ টাকা।

বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক সকল প্রকার নিয়মপদ্ধতি-বিষয়ক বহু তথ্য যথা—বন্দনা, পূজা, দান, ত্রিশরণ, শীল, প্রার্থনা বৌদ্ধধর্মালম্বীর অবশ্য করণীয় দৈনন্দিন এই কৃত্যসকল সুযোগ্যতার সহিত পরিচ্ছেদক্রমে সাজাইয়া আলোচ্য পুস্তকখানি সংকলন করা হইয়াছে। প্রত্যেক বৌদ্ধ গৃহস্থের নিত্যপাঠ্য সুত্তসমূহ ও তাহাদের সুখপাঠ্য বঙ্গানুবাদ পুস্তকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

দাও ত্রিশরণ (কবিতা পুস্তক)—শ্রীশশাঙ্ক-মোহন বড়ুয়া প্রণীত প্রকাশক—ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সি, ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—২৩, মূল্য—ছয় আনা।

তথাগত ভগবান বুদ্ধের সার্ধদ্বিসহস্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভক্তহৃদয়ের আকৃতিসম্বলিত কাব্য; পয়ারের ছন্দে ৯০টি চার-পঙ্‌ক্তি স্তবকে পরিসমাপ্ত। দুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে বৈরাগ্যপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া লেখক ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা করিয়া অবশেষে বুদ্ধ-বাণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারই নিকট 'অপ্রমেয় শান্তিসুধাভরা' ত্রিশরণ মন্ত্র প্রার্থনা করিয়াছেন।

মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

The Cultural Heritage of India—Vol IV—The Religions. শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য দর্শনসাগর সম্পাদিত—ডক্টর শ্রীভগবান দাস 'ভারতরত্ন'-লিখিত ভূমিকা সহ। প্রকাশক স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিট্যুট অব্‌ কালচার; ১১১ রসা রোড, কলিকাতা-২৬। পৃষ্ঠা ৭৭৫+১৯, মূল্য ৩৫৲।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর অব্যবহিত পরেই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই মহাগ্রন্থ (ভারত-কৃষ্টির উত্তরাধিকার) তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে উহারই পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ বাহির হইতেছে। প্রতিটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমান খণ্ডে ব্যাপক-ভাবে ধর্মের কথাই আলোচিত হইয়াছে; প্রতিটি অধ্যায় বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত। এই খণ্ড ছয়টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে—ধর্মের সম্প্রদায় ও কৃষ্টিরূপ; তেইশটি সুনির্বাচিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। দ্বিতীয় ভাগে—সাধু মহাপুরুষগণ ও তাঁহাদের শিক্ষা—ছয়টি প্রবন্ধ। তৃতীয় ভাগে—ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম—নয়টি প্রবন্ধ। চতুর্থ ভাগে—ভারত-সীমার বাহিরের ধর্ম—ছয়টি প্রবন্ধ। পঞ্চম ভাগে—আধুনিক কয়েকটি ধর্মান্দোলন—তিনটি প্রবন্ধ। ষষ্ঠ ভাগে—শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ লিখিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ।

এতৎসহ ১০ পৃষ্ঠা পুস্তকসূচী ও ৩৫ পৃষ্ঠা বিষয়-সূচী পুস্তকখানিকে নিত্যব্যবহার্য গ্রন্থে পরিণত করিয়াছে। ধর্ম ও কৃষ্টি ব্যাপারে ইহা একটি তথ্যমূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Maha-narayanopanisad — স্বামী বিমলানন্দ প্রণীত। মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪০২, মূল্য—৫৲ টাকা।

মাদ্রাজ মঠ হইতে ইংরেজীতে প্রকাশিত উপনিষদ্‌ গ্রন্থমালার পূর্বতন ১১খানি সর্বত্র বহুল প্রচারিত। বর্তমান মহানারায়ণোপনিষদ্‌খানি অন্য রীতিতে সম্পাদিত। ইহাতে হ্রস্ব-দীর্ঘ-পাঠের মাত্রা, ভূমিকা, অনুবাদ, সংস্কৃত ভাষ্য রহিয়াছে। ইংরেজী ব্যাখ্যায় ধর্মজীবনের উপযোগী জ্ঞানভক্তির নানা প্রয়োজনীয় কথা আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামীজীর জন্মোৎসব

কালিম্পঙ্: গত ৩রা ফেব্রুআরি কালিম্পঙ্ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে স্থানীয় টাউন হলে একটি জনসভায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজী, বাংলা হিন্দী ও নেপালী প্রভৃতি ভাষায় বক্তাগণ স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাশিয়ার খ্যাতনামা পণ্ডিত ডক্টর জর্জ রোরিক্ (Roerich) সভাপতির ভাষণে—রাশিয়ার জনগণ স্বামীজীর লেখা পড়িয়া এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বের প্রতি দিন দিন কিভাবে আকৃষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনা করেন। ডক্টর রোরিক্ সর্বপ্রথম স্বামীজীর কথা শুনেন দক্ষিণ সাইবেরিয়ার অন্তর্গত সুদূর আলতাই উপত্যকার একটি প্রদেশে। তিনি বলেন, বিখ্যাত রুশীয় সাহিত্যিক ইল্যা ইহারুন্‌বার্গ (Ilya Eherunburg) তাঁহার লেখার মধ্যে বিবেকানন্দের গভীর মানবতার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, ইহাই রোমা রঁল্যাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সভাপতি আরও বলেন, যদিও স্বামী বিবেকানন্দ সক্রিয় রাজনীতি হইতে দূরে ছিলেন, তথাপি তিনি ভারতের যুগান্তরকারী একজন মহান্ নেতা। তিনি মানসচক্ষে গভীর দূরদৃষ্টি-সহায়ে জগতের ঘটনাচক্রের ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং শক্তির হস্তান্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গৌতম-বুদ্ধের মত স্বামীজী সকলকে জীবনের প্রতিকর্মে আত্মবিশ্বাসী ও নির্ভীক হইতে উপদেশ দিতেন।

রহড়া (২৪ পরগনা): গত ১১ই হইতে ১৭ মার্চ সপ্তাহব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচী সহায়ে রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পরিপালিত হয়। শিক্ষা-প্রদর্শনী, শিক্ষক-ছাত্র-সম্মেলন, সঙ্গীত ও ক্রীড়ানুষ্ঠান, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পুরস্কার বিতরণ ও ছাত্রদের নাট্যাভিনয় এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রথম দিন পূজা পাঠ হোম অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্বোধন সভায় বহু সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা পরিকল্পনাটির মৌলিকতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। বৈকালের সভায় প্রধান বক্তা শ্রীতামস-রঞ্জন রায় বর্তমান শিক্ষার ধারা বিশ্লেষণ করেন।

দ্বিতীয় দিন সকালে আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের সম্মিলিত সভায় ছাত্রবক্তাগণ স্বামীজীর 'জীবন ও বাণী'র বিভিন্ন দিক আলোচনা করে। বৈকালে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 'রামায়ণে ভরত' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

পর দিন শিশু দিবসে প্রাতে ক্রীড়া-প্রতি-যোগিতা হয় ও বৈকালে 'স্বপন বুড়ো'র সভাপতিত্বে শিশু সাহিত্যিকদের এক বৈঠকে শিশুগণ 'রাখাল রাজা' অভিনয় করিয়া সকলকে আমোদিত করে।

১৪ই—কর্মী-সম্মিলনে সকল বিভাগের কর্মী নিজ নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন এবং আশ্রম সম্পাদক স্বামী পুণ্যানন্দ কর্মীদের দায়িত্ব বুঝাইয়া দেন।

১৫ই প্রাতে বেতার-কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথকতা ও বৈকালে সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ই প্রাতে হোলির আনন্দোৎসব এবং নগর সংকীর্তনে সকলে মাতোয়ারা হয়। বৈকালে ধর্মসভায় স্বামী বোধাত্মানন্দ ও সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস—শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও সাধনার তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন।

শেষ দিন রবিবার মাননীয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভার পর আশ্রম-বালকগণ 'চক্রী' যাত্রাভিনয় করিয়া সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসব সমাপ্ত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

কাশী ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে গত ৩রা মার্চ হইতে ১১ই মার্চ পর্যন্ত নয়দিন-ব্যাপী বিভিন্ন গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তিথিপূজার দিন অতি প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক, স্তবাদি গান ও ভজন-সঙ্গীতাদির পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা আরম্ভ হয়। আশ্রম-মণ্ডপে পঞ্চবটী-চিত্রিত পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ প্রতিকৃতি পত্র পুষ্প ও মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। আশ্রম-প্রাঙ্গণ ভজন কীর্তন ও বেদ-গানে মুখরিত হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ এবং পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পাঠ ও আলোচনা হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ২৫০০ শত নরনারী প্রসাদ পান। রাত্রে কালীকীর্তন সকলকে আনন্দ দিয়াছিল।

৪ঠা মার্চ হইতে প্রতিদিন বৈকালে ও রাত্রে গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে 'রামপ্রসাদের' গান, উচ্চাঙ্গের সংগীত, বাংলা ও হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও আলোচনা, তুলসীদাসী রামায়ণ-ব্যাখ্যান, রামায়ণ-কীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনা, কালীকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টোত্তর শতনামকীর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন মনোরম কার্যসূচী অনুসারে উৎসব উদযাপিত হইয়াছিল।

১০ই মার্চ বৈকালে সাধারণ অধিবেশনে বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় এবং স্বামী ভূতেশানন্দ বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের আলোচনা করেন, শেষ দিন বৈকালে পণ্ডিত শ্রীগিরিধর শর্মার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ শ্রীরামচরিতব্যাখ্যান সকলকে মুগ্ধ করে। রাত্রে 'বাউল কীর্তনের' পরে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

ঐ সকল অনুষ্ঠানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭ শত লোক যোগদান করিয়া উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করে।

ঢাকা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী লইয়া স্বামী বিবেকানন্দের ৯৫তম ও শ্রীরামকৃষ্ণের ১২২তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিন পূজা পাঠ ও প্রার্থনার পর শ্রীরাম-কৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়, স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আলোকচিত্র সহায়ে ঐ বিষয়ে বক্তৃতা দেন, ছাত্রদের 'সিরাজের স্বপ্ন' নাটক এবং সখের দলের যাত্রাভিনয় সকলকে আনন্দ দেয়।

৭ই—ছাত্রসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীমনোরঞ্জন ধর 'শিক্ষা ও সেবা' বিষয়ের অবতারণা করেন। ডঃ হুসেন, অধ্যাপক গুহ, ছাত্র শ্রীঅমিতাভ মণ্ডল ও স্বামী সত্যকামানন্দ আলোচনায় যোগ দেন। পরিশেষে সভাপতি—তাঁহার ছাত্রজীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শের অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করেন।

৮ই—৫০০০ নরনারায়ণ প্রসাদ পান।

৯ই—মিশন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভার পর পূর্বপাকিস্তান বিধানপরিষদের সভাপতি জনাব আবদুল হাকিমের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্তা আশালতা সেন প্রভৃতি 'বিশ্বকৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দান' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ চিরশিশু, শিশুর সরলতা দ্বারাই তিনি বিশ্বের জটিল রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জ ঃ গত ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার হইতে ৩রা চৈত্র রবিবার পর্যন্ত (১৩ই মার্চ— ১৭ই ১৯৫৭ ইং) পঞ্চ-দিবস-ব্যাপী নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক বৈদিক স্তোত্র পাঠ, ভজন, বিশেষ ও নিত্যপূজা, হোম এবং শাস্ত্রাদি পাঠ হয়। অপরাহ্ণে "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পাঠ, শ্রীগীতা আলোচনা এবং সন্ধ্যায় রামায়ণ গানের

ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৪ই মার্চ শ্রীযুক্তা আশালতা সেন মহাশয়ার নেতৃত্বে এক মহিলা-সভায় সহস্রাধিক শ্রোতার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র জীবন বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচিত হয়। ১৫ই মার্চ ৮ ঘটিকায় 'বালক-সম্মেলনে' শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি-ভবনের বালক শ্রীপ্রীতিময় কর সভাপতিত্ব করে; শেষে ৫ শত বালক বালিকার মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ হয়। বৈকাল ৪॥• ঘটিকায় এক ধর্মসভায় হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ সকল ধর্মের মূলবাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন 'আলহাজ মৌলানা' ফজলুল করিম এম, এ. বি, এল। সভায় প্রায় চারি হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ১৬ই মার্চ বৈকাল ৪॥ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাময় বসু এম, এ (সহ অধ্যক্ষ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা) মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ছাত্র-সভায় চট্টগ্রামের শ্রীদেবেন্দ্র দাস চৌধুরী ও কুমিল্লার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্তী শাস্ত্রী মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়া সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পরে বেলুড় মঠের স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আশ্রমে তিনদিবস ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সম্বন্ধে বলেন। প্রতিদিন প্রায় চারি হাজার শ্রোতা সমবেত হইত। উৎসবের শেষ দিবস ৩রা চৈত্র রবিবার (১৭ই মার্চ) প্রায় ছয় হাজার নরনারী বসিয়া এবং হাতে হাতে প্রসাদ পান। সারাদিন সঙ্গীত, ভজন, গীতা-কথামৃত প্রভৃতি পাঠ ও কীর্তনাদি হয়।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, সোনারগাঁ প্রভৃতি মিশনকেন্দ্রের সাধুগণ উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধন করেন।

ময়মনসিংহ ঃ গত ২৫শে হইতে ২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সুষ্ঠু ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিবসত্রয় সন্ধ্যারতির পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী ও স্বামীজীর পুণ্য জীবনী আলোচনা উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

সেবাকার্য ও বিবরণী

মাতৃভবন ঃ ৭এ, শ্রীমোহন লেন (কলিকাতা-২৬)-এ অবস্থিত প্রসূতি-সেবাসদনের ৭ম বার্ষিকী কার্যবিবরণী (১৯৫৬) আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা: নূতন—১৮১২, পুরাতন—৫৬১৫; অন্তর্বিভাগের সংখ্যা: ১১০১। বর্তমানে মাতৃভবনে ১৬টি শয্যা (Bed) আছে, ইহার মধ্যে ৮টি ফ্রি—দরিদ্র রোগিণীগণের জন্য সংরক্ষিত।

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন: বাত্যা-দুর্গতদের সেবা—মাদ্রাজের সাম্প্রতিক ঘূর্ণি-বাত্যায় নিরাশ্রয় ২০০ দুঃস্থ পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন বেদারণ্যমে রামকৃষ্ণপুরম্ নামে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। এখানে প্রার্থনাগার, মন্দির ও শিশু-উদ্যান নির্মিত হইয়াছে। গত ১০ ফেব্রুআরি মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রী এ. জে. জন উপনিবেশের ২০০টি পাকা বাড়ীর মধ্যে ১২৮টির উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, বাস্তুপূজা, নবগ্রহ-হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, হরিকথা, পুতুলনাচ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নূতন গৃহে প্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলিকে বস্ত্র ও মাদুর প্রভৃতি প্রদত্ত হয়।

এই পুনর্বাসন-কার্যের জন্য মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং মিশনের রিলিফ ফাণ্ড হইতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হইতেছে।

চিঙ্গেলপুট (মাদ্রাজ) শাখাকেন্দ্র: বার্ষিক কার্যবিবরণী—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম মুদ্রিত বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৫৬) পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার

মধ্য দিয়া চিঙ্গলপুটে সর্বপ্রথম মিশনের কার্য শুরু হয় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯৪০ খৃঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রে ২টি উচ্চ বিদ্যালয় (১টি বালিকাদের জন্য), ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১টি সম্প্রসারিত প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়), ১টি ছাত্রাবাস, ১টি গ্রন্থাগার ও ১টি ছাপাখানা নিয়মিতভাবে পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে (১৯৫৬) বিদ্যালয়গুলিতে মোট ১০৬০ (বালিকা ৪৪১)—ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছে। বিদ্যার্থিভবনে ৩৫ জন ছাত্র ছিল।

বলরাম-মন্দির (কলিকাতা): সাপ্তাহিক ধর্মসভা: নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়—

জানুআরি—'৫৭: ভাগবত ও প্রেমধর্ম, শিবানন্দ-বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ (ছায়াচিত্র-যোগে), বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দান (ছায়াচিত্রযোগে)।

ফেব্রুআরি—'৫৭: ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামীজীর জীবনী ও বাণী, বলরামমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ।

মার্চ—'৫৭: ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপলীলা, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে মহাপ্রভুর মহাভাব।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী, রামায়ণ, গীতা। বিভিন্ন দিনের বক্তা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী জীবানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, শ্রীগৌরগোবিন্দ গুপ্ত, শ্রীনন্দলাল দে, স্বামী দেবানন্দ।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আমেরিকা যাত্রা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গত ২৭শে মার্চ বেদান্ত-প্রচারকার্যে আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। রাত্রি সাড়ে দশটায় বি. ও. এ. সি. বিমান দম দম ছাড়ে; তৎপূর্বে বিমানঘাঁটিতে সাধুসন্ন্যাসী ও ভক্ত নরনারীর সমাবেশে বিদায় সংবর্ধনার আনন্দ-বেদনাময় দৃশ্য—উপস্থিত সকলের হৃদয়ে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আমেরিকার প্যাসিফিক উপকূলে ভারতকৃষ্টি ও বেদান্তপ্রচারের বিশিষ্ট কেন্দ্র—সান ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটিতে স্বামী অশোকানন্দজীর সহায়করূপে যাইতেছেন। নূতন দেশে নূতন কর্ম-পরিবেশে 'উদ্বোধনে'র প্রাক্তন ও প্রিয় সম্পাদকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যলাভের জন্য আমরা আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।

বিবিধ সংবাদ

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্বোধন—গত ২৭শে ফেব্রুআরি কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের নিজস্ব (নদীয়ার মহারাণী কর্তৃক প্রদত্ত) জমিতে নবনির্মিত ঠাকুরঘরের শুভ উদ্বোধন করেন বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ। এতদুপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, হোম ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৩রা মার্চ এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে।

স্বামীজীর জন্মোৎসব

বিবেকানন্দ কর্ম-মন্দিরের উদ্যোগে গত ২৪শে ফেব্রুআরি ৪৫নং সাম্সুল হুদা রোডে স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্ণেই মাঙ্গলিক ভজনের সুরে একটি পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত স্বামীজীর আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে একটি সভায় ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর পৌরোহিত্যে শ্রীনৃত্যগোপাল রায় 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ'শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ 'স্বামীজীর ভাব-ধারা' সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় শ্রীমেঘনাদ বসাক ও তাঁহার সম্প্রদায় 'লীলাকীর্তন' করেন।

নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম জন্মোৎসব পূজা পাঠ ও আলোচনা-সভার মাধ্যমে সুন্দরভাবে উদ্‌যাপনের পূর্ণ বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি :

আজমীর, ঘামাপুর (জবলপুর), ঝাড়গ্রাম ও খেপুত (মেদিনীপুর), সাহেবগঞ্জ (সাঁওতাল পরগনা), ফলতা (২৪ পরগনা), কদমতলা ও বেলাড়ি (হাওড়া), কুমিল্লা।

মানব-পরিবার চিত্র-প্রদর্শনী

ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের (USIS) উদ্যোগে কলিকাতায় রনজি স্টেডিয়ামে 'মানব-পরিবার' (Family of man) নামক নূতন ধরনের এক আলোকচিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে।

পৃথিবীর ৬৮টি দেশের ২৭৩ জন (নর-নারী) শিল্পীর ২০ লক্ষ আলোক চিত্র হইতে প্রথমে নির্বাচিত দশহাজার, পরে তাহার মধ্য হইতে সুনির্বাচিত ৫০৩ খানি চিত্র এডোয়ার্ড ষ্টাইকেন বিষয়ানুযায়ী গ্রথিত করেন—নিউইয়র্ক নগরীর 'মিউজিয়ম অব্ মডার্ন আর্টে'র জন্য।

বিভিন্ন দেশের ভাষার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সব দেশের মানুষের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ভালবাসা ঘৃণা সুখ দুঃখ যে একই প্রকার, জন্ম জীবন ও মৃত্যুর তালে তালে অখণ্ড মানব-সংহতি যে আগাইয়া চলিয়াছে,—বাহিরের শত বিভেদ সত্ত্বেও মানব-জাতি যে অন্তরে এক ও অবিভাজ্য—নীরব ছবিগুলি তাহারই মুখর সাক্ষী।

জীবিকার জন্য মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা কখনও একক—কখনও সংঘবদ্ধ ; যন্ত্রযুগেও মানুষের কায়িক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা, সমাজ-জীবনে মিলনের আনন্দ ও সংঘর্ষের বেদনা চলচ্চিত্রের ভঙ্গীতে প্রকাশমান। যুযুৎসু পৃথিবীতে জিজীবিষু মানব আণবিক শক্তিকে ধ্বংস হইতে কল্যাণের পথে চালিত করিবে, শত বাধা বিপদের মধ্য দিয়া মানুষের অগ্রগতি অব্যাহত, মাঝে মাঝে এই আশার সুর বাজাইয়া 'বাঁশরিয়া' (piper) মানুষের বংশধরকে ভবিষ্যতের পথ দেখাইয়া দেয়।

ভ্রমসংশোধন

উদ্বোধনের গত (চৈত্র ১৩৬৩) সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিল্বমঙ্গলে' গিরিশ-পরিচিতি—প্রবন্ধের লেখকের নাম শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিশ্র। পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্বক ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

স্ব-রচিত নাট্যে—

ত্বং শক্তিরেব জগতামখিলপ্রভাবা
ত্বন্নির্মিতঞ্চ সকলং খলু ভাবমাত্রম্।
ত্বং ক্রীড়সে নিজ-বিনির্মিত-মোহজালে
নাট্যে যথা বিহরতে স্বকৃতে নটো বৈ ॥

(দেবীভাগবত—১৭।৪২)

জগজ্জননি! তুমিই—সৃষ্টি স্থিতি লয়—সকল ক্রিয়ার শক্তিস্বরূপা ; কি জন্মদানে, কি লালন-পালনে, কি ধ্বংস-সাধনে, জীবজগতে সর্বত্র তোমারই প্রভাব অনুভূত হয়। এই অনন্ত বিশ্বে, স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু—সকলই তোমা হইতে তোমারই দ্বারা নির্মিত ; তুমিই একাধারে সব কিছুর উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ ; তুমি মাতা, তুমিই নির্মাতা।

[ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) যেমন স্বনির্মিত স্ব-শরীরজাত জালে থাকিয়া প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি] তুমি তোমারই নির্মিত সংসার-মায়া-জালে থাকিয়া তুমিই খেলা করিতেছ ; যেন নাট্যকার নিজেরই রচিত নাটকে নিজেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া বিভিন্ন চরিত্রে নানা রূপে, সুখে দুঃখে নানাভাবে অভিনয় করিয়া নিজেও আনন্দ পাইতেছেন, আবার নিজেরই নানারূপ সকলকে আনন্দ দিতেছেন ; সর্বদা কিন্তু স্বরূপে অবিকৃত, স্বরূপ অবিস্মৃত!

কথাপ্রসঙ্গে

জগৎ কি ধ্বংসের পথে?

সম্প্রতি জনৈক ভারতীয় ভূ-পর্যটক দ্বিচক্র-যানে ৫৩টি দেশের মধ্য দিয়া ৮৩,০০০ হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া অবশেষে কানাডায় উপনীত হইয়াছেন। ভারত-প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহার অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন, 'যখন যে দেশেই গিয়াছি সর্বত্র দেখিয়াছি সাধারণ মানুষ শান্তি চায়, এমনকি আফ্রিকার জঙ্গলের সিংহও স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়!' মাত্র এক জায়গায় একটি বন্যমহিষ তাঁহাকে অকারণে—হয়তো ভয়ে আক্রমণ করিয়াছিল। নতুবা সর্বত্র মানুষ পশু পাখী সর্বংসহা জননী পৃথিবীর বক্ষে সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেই চাহে। অবশ্য জীবন-ধারণের জন্য খাদ্যসংগ্রহার্থে যতটুকু সংগ্রাম প্রয়োজন তাহা একান্তভাবেই জীবের ধর্ম। জীবন-বিস্তারের জন্য, স্বজাতি-প্রসারের জন্য দ্বন্দ্ব-মিলন সংহতি-সংঘর্ষ তাহাও জীবধর্ম! কিন্তু জীবন-রক্ষার্থেই জীবনান্ত করা—নিশ্চয় জীবধর্ম নয়।

অতএব আজ সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্যকুল যখন দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া—পরস্পরকে একই দোষে অভিযুক্ত করিয়া—আত্মরক্ষার নামে একে অপরকে ধ্বংস করিবার অপকৌশলে আত্মঘাতী হইবার উপক্রম করিয়াছে, তখন বিশেষভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে—জীবন-সংগ্রামের সীমা কোথায়? অসহায় মানবের জীবন-সংগ্রামের সার্থকতাই বা কি? আরও প্রশ্ন জাগিতেছে এই 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে' অবস্থিত আমাদেরই বা কর্তব্য কি?

গত দেড় শতাব্দী ধরিয়া ক্রমবিকাশবাদী জীববিজ্ঞানীরা মহামন্ত্রের মতো দুইটি মূলসূত্র শিখাইয়াছেন—'জীবনের জন্য সংগ্রাম' ও 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'। বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ক্রমোন্নতিশীল মারণাস্ত্র সহায়ে মারমুখী সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্ত্য-জাতিসমূহকে দেখিয়া তাহাদের প্রচারিত বিজ্ঞানের ঐ সত্যতায় আমরা সন্দিহান হইতেছি। জীবন-ধারণ ও জীবন-বিস্তারকেই একমাত্র উদ্দেশ্য ধরিয়া লইলে কিছুদিন পর পর এই প্রকার আসুরিক সংগ্রাম অনিবার্য, এবং কোটি কোটি জীবক্ষয়ের পর স্বাভাবিক নিয়মেই পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও খাদ্যে একটা সাম্য স্থাপিত হইয়া (equilibrium of food and population) সাময়িক শান্তি দেখা দেয়। কিছুদিন পরে আবার একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী বা মনুষ্যকৃত বিপর্যয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা যুদ্ধ-বিপ্লব আসিয়া লোকক্ষয় করে। ইহারই পুনরাবৃত্তি কি পৃথিবীর প্রকৃত ইতিহাস? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে—বিচিত্র মানবজাতি ও তাহার বিচিত্র কৃষ্টি নানাদেশে নানাভাবে বিকশিত হইত না।

'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'য়—মানবযাত্রী চলিয়াছে পুনরাবর্তনের সর্পিল গতিতে (spiral movement) কখন উঠিয়া কখন নামিয়া। উচ্চতর জীব মানুষের ক্ষেত্রে উদ্বর্তনের উচ্চতর কোনও নীতির প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। বিরামহীন একমুখী ক্রমবিকাশ প্রত্যক্ষ সত্য নয়। আজ তাই চিন্তানায়কদের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে, 'মানুষের উন্নতি হইতেছে, না অবনতি হইতেছে?' আজ সমাজ-বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়: অনন্ত জীবন-যাত্রার পথে মানুষের সঠিক অবস্থান কোথায়? মানুষের নিরপেক্ষ মূল্য—কিছু আছে কি? মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যথার্থ সম্বন্ধ কি? মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃত সম্বন্ধই বা কি হওয়া উচিত?

গত চার শতাব্দী ধরিয়া আমরা শুনিতে শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, খৃষ্টধর্ম গ্রীকো-রোমান

ইওরোপে অন্ধকারযুগ আনিয়াছিল,—এবং ১৬শ শতাব্দীর তথাকথিত স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞান-গবেষণা 'নব জাগরণ' আনিয়াছে। আজ আবার কি দেখিতেছি? ঐ জাগরণ-স্রোত ধর্মচেতনাহীন যৌথ বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-প্রসূত মারণাস্ত্র—রাজনীতি ও অর্থ-নীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ সমগ্র মানব-জাতিকে মহামৃত্যুর গহ্বরে টানিয়া ফেলিতেছে। একপ্রকার মতবাদের কুসংস্কারের পরিবর্তে মানুষ আজ আর এক প্রকার মতবাদের কুসংস্কারের গর্তে নিপতিত। কে বলিবে কোন্‌টি ভাল, কোনটি মন্দ? উন্নততর সমাজচেতনা সহায়ে রাজনীতি ও বিজ্ঞানের এই অবৈধ সম্বন্ধ দূর করিতে না পারিলে, বা ঐ সম্বন্ধ কল্যাণজনক মঙ্গলসূত্রে বাঁধিতে না পারিলে এ যুগের মানুষের সম্মুখ যে বিপদ আসন্ন—অনুরূপ ভয়াবহ বিপদ মানবজাতির ইতিহাসে কখনও আসিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই!

সকল দেশের পুরাণেই অবশ্য পড়া যায় দৈত্য ড্রাগন প্রভৃতির অত্যাচার,—পরবর্তী যুগে তাহাই আবার রূপান্তরিত হইয়াছে—অসুর বর্বর প্রভৃতির প্রভৃতির দুর্ধর্ষ আচরণে। যখনই ঐ প্রকারে মানুষের শান্তি বিনষ্ট হইয়াছে—তখনই মানুষের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে বীর্যবান্ অশেষ-কল্যাণমূর্তি, যাহা অলৌকিক শক্তি-সহায়ে ঐ অশুভ শক্তিকে পরাভূত দূরীভূত করিয়াছে! সাধারণ মানবকুল ভয়ার্ত হইয়া দৈবশক্তির আবির্ভাবের জন্য আকুলভাবে ঊর্ধ্বদিকে তাকায়। দিব্যশক্তির আবির্ভাব হয় মানুষেরই হৃদয়ে সুপ্ত শুভ-চেতনার জাগরণ হইতেই! আমরা আজ তাহারই জাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছি।

আশার কথা—জাগরণের সূচনা হইয়া গিয়াছে—বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে নয়—তাহারই মনো-মন্দিরে! পরমাণুতত্ত্বের যাঁহারা দ্রষ্টা তাঁহারা প্রথম লক্ষ্য করিলেন—তথাকথিত জড়পদার্থ অনির্দেশ্য গতি-শীল হইয়া প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে; তাঁহারা বুঝিলেন জড় ও শক্তির রূপান্তর-লীলাই অহরহ সৃষ্টিপ্রলয় ঘটাইতেছে,—কি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অণুজগতে, কি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড নক্ষত্র নীহারিকার জগতে! বিজ্ঞানী স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন বুঝি বা এতদিনে সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। এই মহা আবিষ্কারের আনন্দেই সেদিন বিজ্ঞানী মগ্ন ছিলেন। তখন কি তিনি জানিতেন—সৃষ্টির 'জীয়ন কাঠি'র মধ্যেই লুক্কায়িত আছে প্রলয়ের 'মরণ কাঠি'? তিনি কি জানিতেন—এই আণবিক শক্তি একদিন পৃথিবী-ধ্বংসে নিয়োজিত হইবে? জানিলেও তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বুদ্ধিমান্ মানুষ এই মহাশক্তিকে কল্যাণের কাজে না লাগাইয়া আত্ম-ধ্বংসে ব্যবহার করিবে!

তাই ত দেখা যায় মানবপ্রেমিক মহামনীষী আইনস্টাইন জীবনসায়াহ্নে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, আজ যদি বৃত্তি-নির্বাচন করিবার প্রশ্ন উঠিত—বৈজ্ঞানিক না হইয়া রাজমিস্ত্রী হইতাম। তাই তো তিনি মৃত্যুর পূর্বে (১৮. ৪. ৫৫) আণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে সকল জাতিকে সতর্ক করিয়া একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া যান! আণবিক বোমার অন্যতম আবিষ্কর্তা ওপেনহেমার বিবেকের দংশন অনুভব করিয়াছেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দেই নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ স্বাক্ষরিত-পত্রে ঘোষণা করিয়াছেন:

"বিজ্ঞান মানুষকে আত্মঘাতী পথে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা শংকিত। পরমাণুকে মারণাস্ত্র করিলে রেডিওরশ্মি এরূপভাবে পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিবে যে সমগ্র মানবজাতির বিলোপ ঘটিবে।" (রয়টার: ১৫.৭.৫৫)

বৈজ্ঞানিকগণের এই সকল সতর্কবাণী সত্ত্বেও রাজনীতিকগণ অবোধ শিশুর মত এই আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন। আত্মরক্ষার নামে সামরিক অস্ত্রসজ্জার মান আধুনিকতম করিয়া কল্পিত শত্রুর সমতুল হইবার জন্য তাঁহারা বলিতেছেন,—

আণবিক অস্ত্র অপরিহার্য! কেন? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কি ইহা এককালে সকলেরই অব্যবহার্য বলিয়া ঘোষণা করা চলে না? না, তা চলে না—কারণ, মানুষ আজ মানুষের প্রতিই বিশ্বাস হারাইয়াছে। একদল মানুষ আর একদল মানুষকে বিশ্বাস করেনা। অতএব দেখা যাইতেছে—আণবিক বোমা নয়, ভ্রান্ত-মতবাদ-মূঢ় দুই দল মানুষের পরস্পরের প্রতি দরদহীন অবিশ্বাসই আজ সর্বনাশের মূল। তাই, প্রতীকার-কল্পে বলা যায় এই মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচাইবার একমাত্র মহামন্ত্র 'মানুষ, নিজেকে বিশ্বাস কর, নিজেকে জানো, নিজেকে ভালবাসো।' আত্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মানব-প্রীতিই আজ বিশ্বগ্রাসী মহামৃত্যু রোধ করিতে পারে।

এ কথা অবশ্য সত্য, মানুষ মূলত: এক হইলেও জাতি ও প্রকৃতি হিসাবে বিচিত্র, বিভিন্ন। এত দিন এই বিভেদের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে; তাহার ফলস্বরূপ আমরা পাইয়াছি সম্মিলিত জাতি-সংঘ, যাহা শক্তিমান জাতিগুলির সংঘর্ষের মল্লক্ষেত্র। আজ সময় আসিয়াছে, যখন আর এই প্রতীয়মান ভেদের উপর জোর না দিয়া অন্তর্নিহিত একত্বের উপর জোর দিতে হইবে। তথাপি যে প্রকৃতিগত শুভ ও অশুভ শক্তির (forces of good and evil) বিভিন্নতা থাকিবে, তাহা দূরীভূত হইবে—অপরিহার্য ন্যায়-যুদ্ধে। নিজেদের স্বার্থে যে কোন যুদ্ধকেই ন্যায় যুদ্ধ বলিয়া চালাইয়া পূর্বে ক্ষত্রিয়শক্তি রাজগণ, অধুনা বৈশ্যশক্তি ব্যবসায়িগণ শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে যুদ্ধে মাতাইয়া পৃথিবীকে রক্তাক্ত করিয়াছে।

বর্তমানের ব্যাপার একটু স্বতন্ত্র, এখন আর স্থানবিশেষে রক্তারক্তি নয়—এ যুদ্ধে বিজয়ী বিজিত উভয়েই নিশ্চিহ্ন হইবে, অথবা নিকৃষ্টতর জীবে বা দুর্বল পঙ্গু মানবে পরিণত হইবে। এই সকল দিক্ চিন্তা করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসী আজ সমস্বরে বলিতেছে, 'এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র সম্বরণ কর।' রাজনীতিকগণ অবশ্য বলিতেছেন, এতটা ভয়ের কিছু নাই—একপক্ষ নিজেরা আণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বিপক্ষকে ঐ সুযোগ না দিবার জন্যই শান্তির নামে এই আতঙ্কের ধূয়া তুলিয়াছেন। কাহাকে বিশ্বাস করিব? রাজনীতিকগণকে, ব্যবসায়িগণকে?—না বৈজ্ঞানিকগণকে, মানব প্রেমিকগণকে?

বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক জোলিও-কুরি বলিতেছেন (রয়টার: ২৩. ৪. ৫৭) 'নাগাসাকি ও হিরোশিমায় আণবিক বোমা যে প্রলয় ঘটাইয়াছে—তাহার ভয়াবহ স্মৃতি আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারি না; তদপেক্ষা সহস্রগুণ শক্তিশালী উদজান বোমার পরীক্ষাকালের স্মৃতিও দুরপনেয়।'

তাঁহার মতে এই বিস্ফোরণের ফলে আকাশ বাতাস, জল ও মাটি—সকলই তেজস্ক্রিয়ভাবে দূষিত হইয়া যাইতেছে। বিশেষত ঐ বিস্ফোরণে প্রচুর পরিমাণে জাত ষ্ট্রন্‌শিয়াম-৯০ নামক পদার্থ আকাশে ভাসমান থাকিয়া ধীরে ধীরে, ৩০ বৎসর ধরিয়া ধূলা ও বৃষ্টির সহিত মাটিতে নামিয়া উদ্ভিদ্ জগতে, মানুষের খাদ্যশস্যে, এমন কি দুগ্ধে পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া অস্থিমজ্জায় গিয়া স্থিতিলাভ করিবে; এবং দুরারোগ্য ক্যানসার টিউমার প্রভৃতি রোগের প্রবণতা লইয়াই ভবিষ্যৎ মানব-শিশু জন্মগ্রহণ করিবে।

এই ভয়াবহ চিত্র আঁকিয়া বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন: পরীক্ষার ক্ষেত্র হইতে দূরে আছেন বলিয়া অনেকে এ বিষয়ে উদাসীন, কিন্তু তাঁহারা ভুল। আমরা প্রত্যেকেই এই মহা বিপদের মধ্যেই রহিয়াছি এবং যদি আণবিক অস্ত্রের জন্য এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ এখনই বন্ধ করা না হয়—আমাদের বংশধরগণকে আমরা আরও বিপদের মধ্যে ফেলিয়া যাইব।

অসলো হইতে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ দার্শনিক

ও মানব-সেবক ডক্টর সোয়াইটজার (নোবেল শান্তি-পুরস্কার-প্রাপ্ত)—এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরীক্ষা বন্ধ করার জন্ম জনসাধারণের দাবী তুলিবার আবেদন জানাইয়া বলিয়াছেন: বিস্ফোরণ-তেজস্ক্রিয়তা মানব জাতির পক্ষে এক চরম দুর্ঘটনা। তিনি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন—যে দেশগুলি পরীক্ষা চালাইতেছে সে সকল দেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই পরীক্ষা বন্ধ করার কোন কথা এখনও উঠে নাই। কিন্তু তাহাদের নেতাগণ ইহার ফলাফল সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত।

খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ ইষ্টার-উপলক্ষে তাহার বাণীতে সকল দেশের সকল ধর্মের নেতাদের নিকট আবেদন করিয়াছেন, মৃত্যুর জন্ম ব্যবহার না করিয়া আণবিক শক্তিকে সংযত সংযত করিয়া মানব-সেবায় লাগানো হউক।

ভারতের প্রবীণ চিন্তানেতা শ্রীরাজাগোপালাচারী সুন্দরভাবে নিষ্ঠুর সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন 'আণবিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধ ত আরম্ভ হইয়াই গিয়াছে। এই যুদ্ধে শুধু শত্রু ধ্বংস হইবে না; শত্রু মিত্র নিরপেক্ষ, এমন কি ভবিষ্যৎ বংশ পর্যন্ত ধ্বংস হইবে। যে পরীক্ষায় সমগ্র বিশ্ব, মানবজাতি ধ্বংসের সম্মুখীন—তাহা বন্ধ করিতে বলার অধিকার—যুদ্ধে অনিচ্ছুক জাতিগুলির আছে কিনা—এ বিষয়ে আইনজ্ঞদের মত জানিতে চাহিয়া শ্রীনেহেরুর যে প্রস্তাব, তাহা তিনি সমর্থন করেন।

আমরা নিরাপদে আছি, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আসন্ন পরীক্ষা বিষয়ে উদাসীনতা সম্পর্কে সাবধান করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এখন আর নিরাপদ এলাকা বলিয়া কিছু নাই—আকাশের বাতাসই ক্রমশঃ বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার ডক্টর ইভ্যাট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, বারংবার প্রশান্ত-মহাসাগরে বিস্ফোরণ দ্বারা ঐ অঞ্চলের জীবন বিশেষ-ভাবে বিপন্ন হইতেছে। অষ্ট্রেলেসিয়ার, দক্ষিণ আমেরিকার, জাপানেও সমুদ্রের মাছে তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়িতেছে। সম্প্রতিকালে অস্বাভাবিক উষ্ণতা ও গলিত তুষার-জনিত বন্যা, অসময়ে ঘূর্ণিবাত্যা, অপরিমিত বৃষ্টি, গ্রীষ্মকালে তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিতেছেন, তদুপরি তেজস্ক্রিয়তার ফলে হিরোশিমার ভাগ্যহত নরনারীর শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—তবে কি আমরা বিশ্ব-নাট্যের শেষ অঙ্কে উপনীত? তবে কি এইভাবেই সৃষ্টি ধ্বংস হইবে? মানুষের সভ্যতার গর্ব আজ ধূলি-ধূসরিত, বিজ্ঞানের দম্ভ আজ চূর্ণ! তাহারা আণবিক শক্তিকে আজ কাজে লাগাইয়াছে, কিন্তু সে আসুরিক স্বার্থ-সাধনে! আজ একান্ত প্রয়োজন মানবিক জাগরণ, মানুষের মন না জাগিলে—মানুষ নিজের মনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হইলে কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। স্পষ্টই প্রতীয়মান, ইয়োরোপের ভোগমুখী স্বার্থান্ধ জড়বাদই আজ মানুষের এই দুরবস্থার জন্ম দায়ী! আত্ম-সচেতন মানুষ জাগিয়া উঠিলেই আত্মঘাতী সকল প্রকার প্রচেষ্টার সার্থক প্রতীকার করিতে পারে এবং সর্ববিধ শক্তিকে সে কল্যাণের উদ্দেশে নিয়োজিত করিয়া মানবজাতির উন্নতির পরবর্তী অধ্যায় শুরু করিতে পারে। আমরা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি, এইরূপই হইবে।

ষাট বৎসর পূর্বে জড়বাদের লীলাক্ষেত্র পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত প্রচারের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অদূর ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন নেপথ্যে থাকিয়া যে কথা বলিয়া গিয়াছেন—কালপ্রবাহে যবনিকা উত্তোলিত হওয়ায় আজ তাহাই রূঢ়সত্যরূপে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান:

"Materialism and all its miseries can never be conquered by materialism. Armies when they attempt to conquer

armies only multiply and make brutes of humanity. Spirituality must conquer the West. ....The whole of the western world is on a volcano which may burst tomorrow, go to pieces tomorrow. They have searched every corner of the world and have found no respite. They have drunk deep of the cup of pleasure, and found it vanity. Now is the time to work, so that India's spiritual ideas may penetrate deep into the west."

কাদা দিয়া কাদা ধোয়া যায় না। জড়বাদ-জাত দুঃখকষ্ট জড়বাদ দ্বারা দূর করা যায় না। চৈতন্যবাদ —অধ্যাত্মবাদ দ্বারাই ইহা সম্ভব।

'সমগ্র পাশ্চাত্ত্য দেশ যেন একটি আগ্নেয়-গিরির উপর অবস্থিত, আগামী কাল উহা ফাটিয়া যাইতে পারে—খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য জাতিরা পৃথিবীর কোণে কোণে খুঁজিয়াছে, —কোথাও শান্তি পায় নাই, ভোগের পাত্র পূর্ণমাত্রায় পান করিয়া জানিয়াছে, ইহা বৃথা। এখনই সময়, পাশ্চাত্ত্যের হৃদয়ে ভারতের অধ্যাত্মভাবধারা সঞ্চারিত করিবার।' ইহাতেই কল্যাণ, ইহাতেই অভয়, ইহাতেই শান্তি।

কিন্তু শক্তিমদমত্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রচালকগণ কি সত্যই শান্তির জন্য ব্যগ্র? মতবাদের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন-দৃষ্টি নেতৃবৃন্দ কি সত্যই জগতের কল্যাণ-কামী? তবে তাঁহারা মতবাদের মোহ কাটাইয়া, কূটনৈতিক দ্বিমুখী আচরণ ত্যাগ করিয়া ঘোষণা করুন, 'আমরা শান্তি চাই, আমরা কল্যাণ চাই।'

সকল দেশের সকল জাতির প্রতিনিধি লইয়া বিশ্ব-শান্তি-সম্মেলন বা বিশ্ব-কল্যাণ-সংস্থার মাধ্যমে আজ একান্ত প্রয়োজনে এমন একটি কার্যসূচী, যাহা দ্বারা দেশ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে—শুধু মাত্র মানবতার ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল শুভশক্তি সংঘবদ্ধ হইতে পারে। এই মহাশক্তিই অশুভ-বুদ্ধি-চালিত অপর শক্তিকে পরাভূত করিয়া পৃথিবীর শান্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে শরীরে নূতন শক্তির আবির্ভাবে যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়—সংযত না হইলে তাহা ধ্বংসের কারণ হইতে পারে—তাহাই শান্ত সংযত হইয়া কল্যাণময় পৌরুষশক্তিতে পরিণত হয়। মনে হয় মানবজাতি আজ সেইরূপ এক বয়ঃসন্ধিতে উপনীত। জল ও বায়ুর শক্তি কাজে লাগাইয়া মানুষ একদিন ভীত ত্রস্ত পদে সভ্যতার পথে পা বাড়াইয়াছিল; পরবর্তী যুগে বাষ্প ও বিদ্যুৎকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সে দ্রুতপদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে; আজ আণবিক শক্তির আবির্ভাবে সে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মানুষের অন্তর্নিহিত চৈতন্য-শক্তিতে বিশ্বাস করি, তাই আশা করি—আগামী যুগের মানুষ শুভবুদ্ধি সহায়ে জড় আণবিক শক্তিকে কল্যাণ-কর্মে নিয়োজিত করিয়া সভ্যতাকে নূতন এক স্তরে উন্নীত করিবে।

প্রশ্ন ও উত্তর

সাংবাদিক : আণবিক শক্তি কি সত্যই মানুষের চরম ধ্বংস টানিয়া আনিবে?

আইনস্টাইন : মনে হয়—মানুষের স্বভাবেরই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বিদ্বেষ, ঘৃণা ও হিংসার স্থানে জয়ী হইবে—শুভেচ্ছা, সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক বুঝাপড়ার প্রচেষ্টা।

ভাবী সভ্যতার দিঙ্‌নির্ণয়

স্বামী বিবেকানন্দ

শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের দুঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে। অন্য যে কোন জ্ঞান—কিছু সময়ের জন্য মাত্র আমাদের অভাব মিটাইতে পারে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই অভাববোধ চিরতরে বিদূরিত হয়।

দৈহিক শক্তির বিকাশ অবশ্যই বড় কথা; বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধী যন্ত্রসমূহের মধ্য দিয়া মনীষার যে অভিব্যক্তি, তাহাও অদ্ভুত বটে; তবুও আত্মিকশক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার তুলনায় এই সব শক্তি নগণ্য।

যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। যাহারা যন্ত্রসভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করে তাহাদের মতে যন্ত্রের মধ্যেই সুখ নিহিত। বাস্তবিক কিন্তু সুখের উদ্ভব ও স্থিতি মনেই। মন যাহার বশে, সে-ই কেবল সুখী—অপর কেহ নহে। সমস্ত পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি যদি পাও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পরমাণুকে যদি করতলগত করিতে পার, তাহাতেই বা তোমার কি লাভ?

বাস্তবিক প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই মানুষের জন্ম; পাশ্চাত্ত্য জনগণ 'প্রকৃতি' বলিতে স্থূল অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকেই বুঝিয়া থাকে। অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমাবেশে এই বহিঃপ্রকৃতি সত্যই বিরাট! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও এক মহত্তর প্রকৃতি—মানুষের অন্তর্জগৎ! এই অন্তর্জগতের সমীক্ষণেই প্রাচ্য-প্রতিভা সম্যক্ বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য-প্রতিভা।

পাশ্চাত্ত্য দেশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্যে অতীন্দ্রিয় জগৎ সেইরূপ। মানবজাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্ত্য আদর্শের মত প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে; বোধ হয় সে প্রয়োজন আরও বেশী।

পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি ভাবিয়া বসে যে, ঐ শক্তিই একমাত্র কাম্য, উহাই প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিত্ত-লালসা নাই, ঐহিক প্রতাপ নাই—তাহারা বাঁচিয়া থাকার অযোগ্য। পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি মনে করিতে পারে—নিছক জড়বাদী সভ্যতা একান্ত নিরর্থক। প্রত্যেকটিরই নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুইটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংসা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১) বচনসম্বল

কহে পণ্ডিত: "সূর্য যেমন দেয় তাপ আলো সবারে ভবে,
আমাদেরো ঠিক্ তেম্‌নি সবারে জ্ঞান ও শিক্ষা দিতেই হবে।"
পুছে জ্ঞানী: "প্রভু, পরকে জ্ঞান ও শিক্ষা যে দেবে বক্তৃতাতে—
খাসা কথা; শুধু, পেয়েছ কি তাঁর আদেশ সবারে জ্ঞান বিলাতে?"
পণ্ডিত করে ভ্রূকুটি: "আদেশ কার নাম? আমি পেয়েছি প্রাণে
যে-জ্ঞানের আলো—তাকে বিলাতেই হবে পরার্থে শিক্ষাদানে।"
জ্ঞানী হাসে: "হায়! জোনাকিও চায় দিতে পরার্থে আলো নিয়ত!
শুধু, স্ফুলিঙ্গ নাশে না আঁধার—দেখায় আঁধার গভীর কত।"

(২) ভুল বোঝা

কহিল শিষ্য সহর্ষে: "প্রতি জীবে রাজে হরি কৃপাধার?
তবে কোথা ভয়? নির্ভরে তাঁর ভরিব অকূল এ-পাথার।"
ছোটে পথে এক ক্ষ্যাপা হাতী। "পালা পালা"—সবে কহে সভয়ে।
শিষ্য অচল, বলে: "নির্ভর কই রে তোদের হৃদয়ে?"
মাহুত হাঁকিল: "সাধু! স'রে যাও—ক্ষ্যাপা হাতী!" সাধু হাসিল।
হাতীর পায়ের তলে সে আহত হ'য়ে দৈবাৎ বাঁচিল।
কাঁদে বিষণ্ণ: "প্রতি জীবে হরি, কেন গুরু তবে বলিলে?"
"মাহুতেও হরি নাই কি? তাহার নিষেধ কেন না শুনিলে?"

(৩) ফোঁস

গুরু কয়: "হিংসারে ত্যজি' সাপ, ধন্য হ সাধি' প্রেম ভক্তি।"
হরি-প্রেমে মজি' সর্পের তাপ ঘুচে যায়—জয় নাম-শক্তি!
বালকের দল তারে পথে হায় বার বার কত কশা হানে যে!
হরিনাম জপি' সাপ স'রে যায়, হিংসারে ভুলেও না মানে সে।
মূর্ছিতে সেবি' আনি' চেতনায় গুরু পুছে: "ও কী দশা তোর ভাই।"
কহে সে: "কিছু না কশা-বেদনায়,—তার তরে গুরু কোনো ক্ষোভ নাই।
শুধু ভাবি—অহিংসা সেবিলাম, তবু কেন হ'ল ব্যথা বরিতে?"
গুরু হাসে: "হিংসা নিষেধিলাম, মানা তো করি নি ফোঁস করিতে!"

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এসেছিলেন ?*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ
(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

ভগবানের আবির্ভাবের মূল কারণটি কি? প্রলয়ের পর কিছুই থাকে না, এই সংসার স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণে, কারণ থেকে মহাকারণে লয় হয়! তিনি নিজেকে আবার সৃষ্টি করেন: 'একোঽহম্ বহু স্যাম্ প্রজায়েয়' ; নিজেকে বহুরূপে আস্বাদ করার জন্য বহু রূপ সৃষ্টি করেন। এই হলো সৃষ্টিতত্ত্ব। একলা তৃপ্তি হচ্ছে না। তারপর সৃষ্টি করে কি করলেন? সকলের মধ্যে রইলেন।

তুমি আমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি সব তাঁরই সৃষ্টি, তাঁতেই স্থিতিলাভ করছে; আবার অন্তে তাঁতেই লয় পাচ্ছে। তিনি আত্মারূপে সকলের মধ্যে অবস্থান করছেন। তিনি নিজেকে কি ভাবে সৃষ্টি করছেন? 'সম্ভবামি আত্মমায়য়া'—ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করে নিজের মায়ার দ্বারা নিজেকে সৃষ্টি করছেন। এই শ্লোকে আগেই বলছেন—'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা'—আমি জন্ম-রহিত, অলুপ্ত-জ্ঞানশক্তি-স্বভাব। এই ভাবটা নিরাকার, নির্গুণভাব। এই থেকেই সব কিছু। তারপর বলছেন—'ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্'—আমি ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সর্বভূতের ঈশ্বর। নিজেই নিজেকে আস্বাদনের জন্য সৃষ্টি করছেন। তাই আমরা বলি—তুমি ঈশ্বর, আমরা জীব।

আর এক ধাপ নেমে এসে বলেছেন, যখনই ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান তখনই আমি আবির্ভূত হই। যিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, তিনিই আবার সগুণ সাকার, তিনিই ঈশ্বর। কোন গোলমাল নেই। ঠাকুর একটা ছোট উপমায় কেমন বুঝিয়েছেন দেখ: বাড়ীতে মাছ এলো, তিন চারটি ছেলে, মাকে নানা রকম ব্যঞ্জন করতে হয়; যে ছেলের লিভার বেশ ভাল, তার জন্য মাছের কালিয়া পোলাও; যার লিভার একটু খারাপ তার জন্য হয়তো মাছের ঝাল; আবার যার লিভার একেবারে খারাপ তার জন্য হলুদ দিয়ে ঝোল; যার যেমন পেটে সয়। সগুণ রূপেই ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক করে নিতে হয়। তবে অধিকারী ভেদে সাকার নিরাকার সাধন। ত্রিগুণাত্মিকা জগদম্বার সঙ্গে রামপ্রসাদের কেমন একটা সম্বন্ধ; মার সঙ্গে ঝগড়া করতেন। ভগবান ভক্তদের আপনার করে নেন। ঠাকুর নানাভাবে তাঁকে আস্বাদ করেছেন। ব্রাহ্মরা, আর্যসমাজীরা এ সব মানতো না। খ্রীষ্টানরা তাদের অবতার ছাড়া অন্য আর কিছু মানতো না। এই ঝগড়া মেটাবার জন্যই তাঁর আগমন। 'যত মত তত পথ' এই বাণী দিয়ে গেলেন। স্বামীজী এই বাণীটুকু চিকাগো ধর্মসভায় গিয়ে বলেন। স্বামীজী হলেন বর্তমানের প্রতীক, আর ঠাকুর প্রাচীন ভারতের যত সাধনা আছে বেদ বেদান্ত উপনিষদে—সব তিনি সাধন করেছেন, আবার বর্তমানের যত সাধনা তাও করেছেন। তিনি প্রাচীন ও নবীনের যোগসাধন করলেন। ঠাকুর সেই প্রাচীন কৃষ্টির মূর্ত প্রতীক, আর স্বামীজী এ যুগের দর্শন-বিজ্ঞানের ও বর্তমানের মূর্ত প্রতীক। এই দুই প্রতীকের মিলন করে, ধর্মস্থাপনের জন্য যে তাঁর আবির্ভাব—তাই বোঝালেন।

* লক্ষ্ণৌ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ২২.৯.৫৬ তারিখে প্রদত্ত পূজ্যপাদ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীজয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত।

১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধ হয়, তারপর থেকেই ইংরেজেরা আস্তে আস্তে ঢুকলো ভারতবর্ষে। ১৮৩৬ খৃঃ ঠাকুরের জন্ম হ'ল। এলেন দক্ষিণেশ্বরে তারপর চললো তাঁর সাধনা; এ সাধনার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। Challenge (জোর) করে বলতে পারি সর্বধর্মের সাধনার দ্বারা সত্য অনুভূতি করে সমন্বয় তিনি করে গেছেন। তিনি কোন সম্প্রদায় স্থাপন করতে আসেন নি। বাহ্য-দৃষ্টিতে তিনি কি ছিলেন? পূজারী মাত্র। ৫৲ মাহিনা আর ২ খানা কাপড় বছরে ছিল বরাদ্দ। সভ্য জগতের অপাঙ্‌ক্তেয়—আর আজ দেখ, সভ্যজগতের বড় বড় দার্শনিকরা তাঁর ভাব নিচ্ছেন, তাঁর নাম জপ করছেন। কেউ বিশ্বাস করবে? দেখ, পাগল পূজারী তাঁর মধ্যে কি শক্তির আবির্ভাব! সাক্ষাৎ ভগবান যে কথা বলছেন—লোকে মাথা পেতে নেবে না?

কলিকাতায় সে সময় ধর্মের খুব আন্দোলন চলছে। কলিকাতার মনীষীদের ভেতর খৃষ্টান মিশনারিদের খুব প্রভাব। মিশনারিরা—শুধু ধর্ম প্রচার করতেন না, আবার কলেজে প্রফেসারিও করতেন। যুবকবৃন্দ তাঁদের পড়ানোতে একেবারে মেতে যেত। তাঁরা যা বলতেন ছেলেরা তাই করত। কত ছেলে খৃষ্টান হয়ে গেল। আর তাদের কাছে শিখতো, ভারতের ধর্মে যা কিছু আছে—সব কুসংস্কার। ব্রাহ্ম সমাজে আবার একটা ফরম্ সই করতে হত, ফরমে লেখা থাকত 'আমি মূর্তি পূজা মানি না, ইত্যাদি।' এদিকে আবার আর্যসমাজ। চারিদিকে নানা সম্প্রদায়। খৃষ্টান ডাকছে, মন্দির ছেড়ে এসো আমাদের গীর্জায়, মন্দিরে কিছু নেই। মুসলমানরা ডাকছে, আমাদের মসজিদে এসো। শিখেরা ডাকছে, আমাদের গুরুদ্বারে এসো। যখন ধর্মের এই সব বিরোধ চলেছে, গ্লানি হয়েছে, ঠাকুর এলেন মায়ের পূজারী হয়ে। বলছেন, মা দেখা দে। সরল ভাবে, ব্যাকুলতার সঙ্গে ডাকছেন। বারো বছর সাধনা করে কত দেব-দেবীর দর্শন পেলেন। অদ্ভুত তাঁর সাধনা। যখন যে ভাবের সাধনা চলেছে তখন সেই ভাবের গুরু আসছেন। এত সাধনা করে তিনি কি পেলেন? দেখলেন 'যত মত তত পথ'। কেশব সেনকে বলছেন, এই যে মূর্তিপূজা নিয়ে ঝগড়া, এ সব অজ্ঞানের কথা।

স্বামীজী ঠাকুরের কাছে এসে আগে কত তর্ক করতেন, মতের সঙ্গে মিলত না বলে। প্রথমে এসে বললেন, মশায় এ কথা মানি না—'সব ব্রহ্মময়' ঘট ব্রহ্ম, বাটি ব্রহ্ম! ঠাকুর চুপ করে আছেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ করে দিব্যচক্ষু দিলেন, তখন দেখছেন সব চিন্ময়। স্বামীজী মূর্তি-পূজা প্রথমে মানতেন না। পরে দুঃখ করে বলতেন, 'আমি তাঁকে কতবার বলেছি মূর্তি-পূজা ভুল'। কত বক্তৃতায় বলেছেন, 'আমি এমন একজনের পায়ের তলায় বসে শিক্ষা করেছি যিনি মূর্তি-পূজা থেকে সব পেয়েছেন, মূর্তি-পূজা করে যদি তাঁর মত হতে পারি, আমি একটা কেন একশোটা মূর্তি পূজা করতে পারি। স্বামীজী বললেন, 'Man is not travelling from error to truth, but from truth to truth from lower to higher truth'—(মানুষ ভুল থেকে সত্যে যায় না, সত্য থেকে সত্যে, নিম্ন সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে যায়)। ঠাকুর দ্বাদশ বৎসরর সাধনা করে কি দিয়ে গেলেন? শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে কথা বলে গেছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি। ঠাকুরের জীবনই এর দৃষ্টান্ত। তিনি ধর্মের পরিপূর্ণ রূপ।

আমাদের এত কৃষ্টি রয়েছে, কিন্তু বিলেতের একটু ছাপ না হলে আমরা নিই না। মনীষীদের নাম করতে বললে Huxleyর নাম করবে অনেকে। ঋষিদের নাম কেউ করবে? স্বামীজী যখন ঠাকুরের

কথা ধর্ম-মহাসভায় বললেন তখন লোকে আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগলো কে এই সন্ন্যাসী! আগে তাঁর সম্বন্ধে কত রটিয়েছিল। এখন বিবেকানন্দের কথা মাথা পেতে নিল।

ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়ে সাকার নিরাকার কেমন বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চারজন লোক জঙ্গলে গিছলো। একজন দেখলে গিরগিটিটা লাল। আর একজন বললে, ও লাল কেন হতে যাবে? সবুজ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর একজন বললে, তুমি মিথ্যাবাদী, আমি বেশ জানি—লালও নয়, সবুজও নয়, আমি দেখেছি নীল। আর একজন বললে, ও নীল কেন হতে যাবে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি হলদে। এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। সকলে জানে, আমি যা দেখেছি, তাই ঠিক। এই রকম সম্প্রদায়ের নামে কত রক্তপাত হয়েছে। ঠাকুর তো নিজের নাম করবেন না। সেইজন্য বলছেন তাদের ঝগড়া দেখে একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপার কি? সব শুনে বললেন, এই ব্যাপার? আমি ঐ গাছতলাতেই থাকি; আর ঐ জানোয়ারটাকে আমি চিনি। তোমরা তো মাত্র একবারই দেখেছ। তোমরা প্রত্যেকেই যা বলছ, তা সব সত্য; ও গিরগিটিটা কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন আবার কোন রঙ নেই। নির্গুণ। ওই লোকটি কে? স্বয়ং তিনি।

অরূপ থেকে রূপে আসা, কেশব সেনকে কেমন বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বাঁশীর সাতটা ফোকর আছে তা থেকে কত রাগ রাগিনী উঠছে—আর একটাতে কেবল একটি সুরই উঠছে। কেশব সেনকে বলছেন, ওই হ'ল তোমার নিরাকারের ভোঁ। আমার কি ভাব জানো? আমি সাতটা ফোকরে সানাই বাজাই। আমি এক থেকে বহুতে যাই; বহু থেকে একে আসি। আবার এক দুইএর পারেও যাই।

একটা লোক গামলায় রঙ গুলে রেখেছিল তার কাছে কেউ রঙ করাতে আসলে জিজ্ঞাসা করতো তুমি কি রঙে ছোপাবে? সে হয়ত বলতো লাল। অমনি গামলার রঙে ডুবিয়ে লাল রঙ করে ফেরত দিত। আবার কেউ হয়তো বলত, নীল। ওই গামলার রঙে ডুবিয়ে নীল করে দিত। একটি লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি রঙে ছোপাবে? সে বললে, তুমি যে রঙে ছুপেছ, আমায় সেই রঙে ছুপিয়ে দাও। তাঁর কাছে শাক্তরা আসছে, ব্রাহ্মরা আসছে, বৈষ্ণবরা আসছে। তিনি গামলায় রঙ গুলে বসে আছেন, যে যা ভাব চাইছে, যা রঙ চাইছে—তাই দিচ্ছেন।

তাঁর ওই সমন্বয়ের ভাবটি এগিয়ে আসছে। চারিদিকেই একটা আলোড়ন চলেছে। জমি পরিষ্কার হয়ে গেলে সমন্বয়-ভাব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। সকলেই আমরা ভাই ভাই। সকলের ধর্মকে জানতে হবে, মানতে হবে, সহ্য করে নিতে হবে। এখন দিন দিন এই সব হচ্ছে। কেবলমাত্র মুখে, 'আমরা এক' বললে হবে না। শুধু বাহিরে পাতা পেতে একসঙ্গে বসে খেলেও হবে না। ভেতর থেকে এক হতে হবে।

*　　*　　*

তাঁর আর একটি ভাব—"মাতৃত্ব-জাগরণ"। এই মাতৃভাবের জাগরণের জন্য তিনি এসেছিলেন। দেখ প্রথমে 'মা মা' করে কেঁদে অস্থির। জোর করে মাকে দর্শন করলেন। দর্শন করে কত আনন্দ হ'ল। এই আনন্দ যাতে অবাধে থাকে সেই জন্য অস্থির হলেন। সে কি ব্যাকুলতা! চন্দ্রামণির প্রাণ অস্থির হ'ল। তিনি গদাধরকে কামারপুকুরে নিয়ে এলেন। ছেলে 'ধর্ম ধর্ম' করলে অন্যান্য মায়েরা যেমন ছেলের বিয়ে দিতে চান তিনিও তাই চেষ্টা করলেন। মা চারিদিকে পাত্রী খুঁজছেন। তিনি টের পেয়ে বললেন, মা কোথায় খুঁজছ, দেখগে জয়রামবাটীতে রামমুখুজ্জ্যের মেয়ে 'কুটো বাঁধা' আছে।

দেখ ওই পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে কত অভিনয় করলেন। বুদ্ধদেব নারীকে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি কি করলেন? মেয়েমানুষে মাতৃত্ব-বুদ্ধি জাগালেন। এই ভাবটা চলে গিয়েছিল; কোন জাতির মধ্যে নেই। অভিনয়ে কি করলেন? নিজে সন্তান হয়ে মাকে 'ষোড়শী'রূপে পূজা করলেন। এর উদ্দেশ্য মাতৃত্ব-জাগরণ। ছেলেবেলায় ধনী-কামারনীকে ভিক্ষা-মা করলেন। তারপর ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরু করলেন।

একমাত্র স্বামীজী তাঁর 'ষোড়শী'পূজার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন—নারীশক্তির জাগরণ; তাই নিবেদিতাকে আনলেন। নিবেদিতা মেয়েদের নিয়ে স্কুল করবেন। মা বেঁচে থাকতে থাকতে স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে মার কাছে রেখে শিক্ষা দেবেন। স্বামীজী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। মা গড়ে তুলবেন কতকগুলি আদর্শ ব্রহ্মচারিণী। সমাজ তখন দিলে না এমন মেয়ে। কিন্তু স্বামীজী বলেছিলেন—এমন দিন আসবে যেদিন গঙ্গার অপর পারে মেয়েদেরও একটি মঠ হবে। তিনি সত্য-সঙ্কল্প পুরুষ ছিলেন। এখন সেই মঠ হয়েছে। কত qualified (গুণসম্পন্ন) মেয়েরা এসে যোগদান করছেন। ভবিষ্যতে তাঁরা আত্মনির্ভর হয়ে দাঁড়াবেন। তাঁরাও ভারতে ও বাহিরে বেদান্ত প্রচার করবেন।

ঠাকুর মাকে পূজা করে কুণ্ডলিনী জাগালেন। এই যে স্ত্রীকে পূজা করা, মেয়ে মানুষকে গুরু করা—এর দৃষ্টান্ত আর কোথায়? এই মাতৃত্ব-ভাবটি সকল নারীজাতির মধ্যে জাগানো চাই। আজকাল মেয়েরা বাহিরে এসে অনেক বড় বড় কাজ করছেন, উচ্চ পদও অধিকার করছেন, কিন্তু মাতৃত্ব কোথায়?

* * *

ঠাকুরের তৃতীয় ভাব—"শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা"।

ঠাকুর বঙ্কিমবাবুকে বলছেন, এক হাতে টাকা আর এক হাতে মাটি নিয়ে বলতাম, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা', এই রকম কয়েকবার বলে দুই-ই গঙ্গার জলে ফেলে দিতাম। বঙ্কিমবাবু শুনে বললেন, 'বলেন কি মশায়, চারটা পয়সা থাকলে লোকের কত উপকার করা যায়!' ঠাকুর একটু চুপ করে থেকে ভাবে বলছেন, 'কার উপকার? সর্বভূতে হরি রয়েছেন। সেই হরির সেবা—নিজের উপকারের জন্য। এই সেবার পিছনে যদি নাম-যশ আকাঙ্ক্ষা না থাকে তবেই এতে চিত্ত-শুদ্ধি হয়।' বঙ্কিমবাবু শুনে অবাক!

ঠাকুর আর একদিন বলছেন, 'বৈষ্ণব সেবা, জীবে দয়া'। 'জীবে দয়া! জীবে দয়া! জীবে দয়া?' 'জীবে দয়া' কথাটি তিন বার বললেন, তারপর ভাবে বলছেন—'জীবে দয়া কিরে? শিব-জ্ঞানে জীবের সেবা।' স্বামীজী শুনলেন, বেরিয়ে এসে গুরুভাইদের বললেন, 'আজ একটা নূতন আলো পেলাম। ভগবান যদি দিন দেন জগৎকে দেখাব। তাঁর সত্য সঙ্কল্প দেখ, মিশন সেবাশ্রম সব হ'ল। 'দয়া' কথাটা একেবারে উঠিয়ে দাও। তিনি একটা নূতন আলোক দিয়ে গেলেন, —'সেবা, সেবা'।

ঠাকুর এবার জগৎকে তিনটি ভাব দিয়ে গেলেন —সর্বধর্মসমন্বয়, নারী-জাতিতে মাতৃবুদ্ধি, আর শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা।

এক ঈশ্বর, তাঁর নানা নাম। সকলে এক জিনিসকেই চাইছে—তবে আলাদা পাত্র, আলাদা নাম।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রশস্তি

শ্রীদিব্যপ্রভা ভরালী

কবিতার অর্ঘ্য রচি নিবেদিব চরণে তোমার
নাহি সে শকতি মোর, দুর্বল এ হৃদয়-বীণার
মূর্ছনা অবশ ক্ষীণ, বেদনা-বিধুত সুর-ধ্বনি
চির জনমের রুদ্ধ বাষ্পাবেগ সেথা দিব আনি ?
মূর্ছিত সংগীত সুরহারা মূক নিঃস্বতায়
অনাদি কালের গীতি লুটে যায় চরণ-ধূলায়।
নির্বাক্ যেখানে কবিপ্রাণ, বৃথা যত গুঞ্জরণ
ক্ষণিকের কাব্যোচ্ছ্বাস, ব্যথাহত হৃদয়-স্পন্দন।
কবি কাব্য শ্রোতা ও উদ্‌গাতা যেথা এক, বহু নহে—
যেথা শান্তি সুবিমল অক্ষয় আনন্দ-ধারা বহে !

কবি তুমি, প্রথম পুরাণ বাজায়েছ বাঁশী তব
কত তানে, কত সুরে, কত ছন্দে নিত্য নব নব,
এ বিশ্বভুবনে কত অবিরাম সংগীত-হিল্লোল,
অনন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ, অন্তহীন জীবন-কল্লোল !
রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে সৃষ্টি তব স্বরূপ-বিকাশ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি, উদ্বেলিত আনন্দ-বিলাস !
অরূপ অমৃত ভাতি ! বিরাজিছ স্বীয় মহিমায়
কত রূপে কত স্থলে জ্যোতির্ময় দীপ্ত গরিমায়।
তব লীলা নৃত্য-ছন্দে—জাগে বিশ্ব, নাচে বসুন্ধরা,
তব তেজে দীপ্তিমান্ জ্বলে নভে চন্দ্র সূর্য তারা !
সে কোন্ বিস্মৃত যুগে আলোকের নব উন্মেষণে
ছুটিল তৃষিত প্রাণ হে অমৃত ! তোমার সন্ধানে ;
কোন্ সেই মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষির হৃদয়-গুহায়
বিচ্ছুরিলে দিব্যজ্যোতি হে অসীম জ্ঞানের সীমায় ?

তমসার অন্তরালে দেখা দিলে আদিত্যবরণ,
কবে তুমি পুরুষপ্রধান, নিত্য শুদ্ধ সনাতন ?

তনু ধরি এলে পুনঃ এ মরতে যুগ-অবতার,
জেনেছি তোমায় আজি, তুমি প্রেম-করুণা-আধার !
অমৃতের বার্তাবাহী ! জাগাইলে তুমি সুপ্ত প্রাণ
চৈতন্যের দিব্যালোকে, যুগান্তের শোনালে আহ্বান !
ক্ষুরধারা সম পথে সুকঠিন সাধনায় রত,
বরে নিলে জীবনের দুঃসহ কঠোর তব ব্রত।
দুখী, তাপী, পাপী কত নিল তব চরণে শরণ
গুরু, ইষ্ট, পিতৃরূপে করিলে করুণা বিতরণ।
যুগের দেবতা ওগো পরমপুরুষ ভগবান
যুগে যুগে আসিয়াছ জীবেরে করিতে পরিত্রাণ।

অচিন্ত্য অব্যক্ত তত্ত্ব, ওগো দীপ্ত চৈতন্য অদ্বয়,
অখণ্ড জগৎ-সত্তা, পূর্ণ হতে পূর্ণের উদয় !
জাগো মম হৃদয়-মন্দিরে আজি হে অমর-জ্যোতি !
জাগো জগতের প্রাণে সত্য শিব সুন্দর মুরতি
অনন্ত সংগীত-ছন্দে রন্ধ্রে রন্ধ্রে মানব-হিয়ার—
শোনাও অভয়-মন্ত্র 'মাভৈঃ মাভৈঃ'—অমোঘ ঝঙ্কার !
জাগো আলোকের বর্ত্মে সদা জন্ম-জরা-মৃত্যুহীন,
বিশ্বের বিপুল ব্যথা করো আজি ভূমানন্দে লীন !
দূর করো অমানিশা অন্ধকার মানব-হিয়ার,
চির তমসার গ্লানি জীবনের দীন হাহাকার।

বুদ্ধ

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী
(সম্পাদক, 'জগজ্জ্যোতি')

শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। এই তিথি ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব, তিরোভাব ও সিদ্ধি এই তিনটি প্রধান ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। এইভাবে পূর্ণিমার সহিত বুদ্ধজীবনের যোগ পূর্ণতারই সংকেত বলিয়া আমরা মানিয়া লইতে পারি। সহজ কথায় বলিতে গেলে, বুদ্ধত্ব সকল প্রকার পারমী বা পূর্ণতারই অভিব্যক্তি। এমন পূর্ণ বিকশিত জীবনের উপলব্ধি সহজসাধ্য নয়। তাই বুদ্ধের সমসাময়িক এক পরিব্রাজক উক্তি করিয়াছিলেন,—

> 'কোচাহং ভো সমণস্স গোতমস্স পঞ্ঞাবেয্যত্তিয়ং জানিস্সামি, সো পি নুন'স্স তাদিসো যো সমণস্স গোতমস্স পঞ্ঞাবেয্যত্তিয়ং জানেয্য।' (মজ্‌ঝিম নিকায়)

অর্থাৎ বুদ্ধকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্য এক বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন। এইজন্য তিনি মানবসমাজের কাছে এক চিরদুর্জ্ঞেয় মহারহস্য হইয়া আছেন। মানুষের উপলব্ধির অতীত হইলেও মানুষ তাঁহাকে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জানিতে চাহিয়াছে। এই জানার আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হইয়াছে—শিল্পে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে, দর্শনে এবং ইতিহাসে। তাঁহাকে জানার এই সমারোহের মধ্যে তাঁহার যে খণ্ড পরিচয় মানুষের মনে বাজে, তাহা তাহার মনকে অভিভূত করে; তাই সে তাঁহাকে জানার আকাঙ্ক্ষা রোধ করিতে পারে না। এই জানার প্রয়াস দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বুদ্ধ-জীবনের পূর্বে তাঁহার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বুদ্ধাঙ্কুর বা বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থরূপে। তাঁহার সেই জীবন তাঁহার কথায় স্পষ্ট—

> 'পুব্বেব মে ভিক্খবে সম্বোধা বোধিসত্তস্সেব সতো অহম্পি সুদং অনরিয পরিযেসনং অনুযুত্তো বিহরামি।' (অরিযপরিযেসন সুত্ত)।

অর্থাৎ 'সম্বোধি লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্বাবস্থায় আমিও অনার্য সন্ধানে রত ছিলাম।' এই বাক্যের তাৎপর্য এই—বোধিসত্ত্ব-জীবনে তিনি সংসারধর্ম মানিয়া সংসারী লোকের মত স্ত্রী-পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও ধনসম্পদ লইয়া বিষয়ভোগে মগ্ন ছিলেন, এই মগ্নভাব বেশীদিন রহিল না; নেশা কাটিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন নিজের কথা, ভাবিলেন বন্ধুবান্ধবের কথা, ভাবিলেন ভোগসম্পদের কথা—আমি তো জন্ম জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন; আবার বন্ধুবান্ধবগণও জন্ম জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-পরিবৃত, এই ভোগসম্পদের পরিণতিও তাহাই; তবে কেন আমি জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়া জরা-মৃত্যুর অধীনকেই খুঁজিতেছি—জন্ম-জরা ইত্যাদি হইতে মুক্তির পথ খুঁজিতেছি না কেন? এইখানেই তাঁহার জীবনের মোড় ফিরিয়া গেল। অন্তরে এমন একটি জীবনের ছায়াপাত হইল, যে জীবন জন্ম জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অতীত, নির্মল, নির্ভয় এবং অনুত্তর। তাই তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 'অজাতং অনুত্তরং যোগক্খেমং নিব্বাণং পরিযেসিস্সামি·········।' এইখানেই তাঁহার ভোগ-জীবনের উপর যবনিকাপাত হয়।

সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ভারতের তৎকালীন সাধনা-পদ্ধতির সঙ্গে একে একে তাঁহার পরিচয় হইতে লাগিল। তিনি কোনটিকে উপেক্ষা করেন নাই, প্রত্যেকটিকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করিলেন। উচ্চতম ধ্যানপদ্ধতি হইতে খেচরীমুদ্রা পর্যন্ত তাঁহার সাধনায় কিছুই বাদ পড়ে নাই। এই সমস্ত সাধনাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাঁহার মনে জাগিল—বিশিষ্টতর সাধনা এখনও সম্মুখে। একটির পর একটির সহিত পরিচিত হইয়া তিনি শুধু এই কথা বলিয়াছেন,

'অনলং' অর্থাৎ ইহা যথেষ্ট নয়, আরও চলিতে হইবে। মনের এই উন্নতিশীল ভাব লইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে চির-আকাঙ্ক্ষিত শুভ মুহূর্ত আসিয়া পড়িল সেই বৈশাখী পূর্ণিমায়। তাঁহার মনে জাগিল এক অপূর্ব আলোকের অনুভূতি। তিনি চক্ষু মুদিয়া বসিলেন সেই অশ্বত্থ-তরুর ছায়ায়। মন ক্রমশঃ ধ্যানের বিভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইল। তাঁহার সমাহিত চিত্ত পূর্বনিবাসানুস্মৃতির দিকে অগ্রসর হইয়া জন্ম-জন্মান্তরের যবনিকা ছিন্ন করিল। তিনি দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর মত জন্ম-জন্মান্তরের চিত্র দেখিতে লাগিলেন। রাত্রির দ্বিতীয় যামে চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান তাঁহার আয়ত্ত হইল—জন্মমৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। তৃতীয় যামে হইল আস্রবক্ষয় জ্ঞানের উদয়-অন্তরের সমস্ত মারসৈন্য বা রিপু দলকে নির্মূলিত করিয়া চিত্ত হইল মুক্ত, বন্ধনহীন। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে, 'অনুত্তরং যোগক্খেমং নিব্বাণং অজ্ঝগমং' অর্থাৎ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ অধিগত হইলাম। এইখানেই তাঁহার বুদ্ধজীবনের বিকাশ, সাধনার পরিপূর্ণতা, কর্তব্যের অবসান—'নত্থি উত্তরি করণীয়ং'। এই অবস্থাকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, ভাষা এইখানে মূক, মানবের চিন্তাধারা এইখানে স্তব্ধ।

বুদ্ধত্ব একা বুদ্ধের জন্য নহে, বিশ্ব-মানবের জন্য। তাঁহার মহাসাধনা শুধু নিজের জন্য নহে, সকলের জন্য। তাঁহার হৃদয় গলিয়াছে বিভ্রান্ত বিশ্বজনের দুর্দশায়। যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া আত্মমুক্তির আবেগে ভাবিয়াছিলেন; 'অনন্ত শান্তির অনন্ত আনন্দের নির্ঝর স্বরূপ যে সত্য আমি কঠিন সাধনায় উপলব্ধি করিলাম, সেই সত্য ভোগবিলাসমগ্ন মানুষের মধ্যে প্রচার করিয়া কি লাভ হইবে? কামনা ও বিদ্বেষে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষ এই দুর্জ্ঞেয় গভীর সত্য কি উপলব্ধি করিতে পারিবে?' তিনিই পরক্ষণে আত্মমুক্তির চেতনা অতিক্রম করিয়া বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'অপারুতা তেসং অমতস্‌স দ্বারা' অর্থাৎ তাহাদের জন্য অমৃতের দ্বার উন্মুক্ত হউক। এইখানেই তাঁহার মুক্তি বিশ্ব মানবের মুক্তির সঙ্গে এক হইয়া গেল। সেই হইতে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিলেন সকলের কল্যাণে। নির্জনে মুক্তির আনন্দভোগ পরিহার করিয়া জনসঙ্ঘের মধ্যে তিনি আপনাকে টানিয়া আনিলেন। যে সন্ধানীরা তাঁহার সান্নিধ্যলাভে আলোকের সন্ধান পাইলেন, তাঁহাদের অন্তরেও সেই উদার চেতনা জাগাইয়া দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিলেন, 'চরথ ভিক্‌খবে চারিকং বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় ·····।' এই নির্দেশের মধ্যে ইহা পরিস্ফুট—মুক্তি শুধু নিজের জন্য নহে, পরকেও মুক্ত করিতে হইবে।

এই বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র পৃথিবীর বুকে আনিয়াছিল এক আলোকময় জাগরণ। দুর্লঙ্ঘ্য গিরি, দুস্তর সমুদ্র তাহার প্রসারকে ব্যাহত করে নাই। সংকীর্ণ দেশাচারের প্রাচীর তাহাকে বাধা দান করিতে পারে নাই। অনায়াসে সমগ্র এশিয়াখণ্ডে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রভাব। এই মহামন্ত্রের উদ্‌গাতা ভগবান বুদ্ধ মানুষের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করেন নাই, সমগ্র মানবগোষ্ঠিকে এক করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষ স্বকৃত কর্মের জন্য উচ্চনীচ হয়; কর্ম মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে এবং কর্ম মানুষকে পশুস্তরে নামাইয়া দেয়। অতএব মানুষের চরিত্রগঠনের ভার মানুষেরই হাতে। এইজন্য তিনি নিজেকে ত্রাণকর্তা বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং স্পষ্ট কথায় ভিক্ষুদের বলিয়াছেন—

> 'অত্তদীপা ভিক্‌খবে বিহরথ, অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা,
> ধম্মদীপা ভিক্‌খবে বিহরথ ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা।
>
> —(মহাপরিনিব্বাণসুত্ত)

অর্থাৎ 'হে ভিক্ষুগণ, নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে গড়, নিজের দীপ নিজে জ্বাল, নিজের মধ্যে আশ্রয় লও, অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইও না; ধর্মকে

ভিত্তি কর, ধর্মের দীপ জ্বাল, ধর্মের আশ্রয় লও।' তিনি মানুষকে শুধু আত্মনির্ভর হইতে বলেন নাই, তাহার যুক্তিবিচারকে—চিন্তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইতেও নির্দেশ দিয়াছেন। পরের পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতার মায়াজালে আবদ্ধ না হইয়া যথাযথভাবে শাস্ত্রোক্তকে বিচার করিয়া গ্রহণের নির্দেশ 'অঙ্গুত্তর নিকায়ে'র 'কালাম সূত্রে' সুস্পষ্ট।

বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, প্রচারকগণ সাধারণতঃ পরের আদর্শ ও পরের ভাবকে খর্ব করিয়া নিজের আদর্শ ও নিজের ভাবকে বড় করিয়া দেখান; কিন্তু ইহা তথাগত-গর্হিত। তিনি প্রচারকগণের এই মনোবৃত্তিকে অন্ধতা, অজ্ঞতা এবং বিপদের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় এই মনোবৃত্তিকে 'ইদমেব সচ্চং মোঘমঞ্‌ঞং' বলা হয়; অর্থাৎ আমি যাহা ভাবি, মানি ও অনুসরণ করি, তাহাই একমাত্র সত্য, অন্য সমস্তই তুচ্ছ অর্থহীন। তাঁহার মতে এই হীন মনোবৃত্তি হইতে মানবের মন মুক্ত না হইলে মানবের অন্তরে সত্যের আলোক সম্পাত হয় না। সত্য উদার অনন্ত, সংকীর্ণতার মধ্যে তাহার স্থান নয়। তাঁহার কথায় ধর্ম পন্থা মাত্র, চরম লক্ষ্য নহে। 'মধ্যম নিকায়ে'র 'উল্লুম্পুপম সুত্তে' ধর্মকে তিনি তুলনা করিয়াছেন ভেলার সঙ্গে। যাহা অবলম্বন করিয়া নদী পার হয়। ভেলার উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাবশতঃ লোক যেমন উহাকে কাঁধে বহন করে না। তেমন ধর্মও আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য নহে। মোক্ষলাভই তাহার লক্ষ্য। মোক্ষলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় এবং তখন ধর্মও বর্জনীয়। কারণ, অহংভাব বা 'আমি আমার' ধারণা যখন অন্তর হইতে নিশ্চিহ্ন হয় তখন ধর্ম ও অধর্ম উভয়কে অতিক্রম করিয়া শুদ্ধ মুক্ত পুরুষ মহাশান্তিতে ও মহানন্দে মগ্ন থাকেন।

বুদ্ধ-বাণী উদ্ধৃত করিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। বলা বাহুল্য, এইরূপে তাঁহার বাণীর ভিতর তাঁহার বিষয় সন্ধান করিতে গেলে সন্ধানী নূতন নূতন আলোকের সঙ্গে পরিচিত হন বটে, কিন্তু তাহার অন্ত খুঁজিয়া পান না। এই অন্ত না পাওয়ার মধ্যে সন্ধানী তাঁহাকে নূতন নূতন বিশেষণ দিয়া পরিতৃপ্ত হন এবং মনে মনে ভাবেন—তিনি বুদ্ধ।

বিবেকানন্দ

শ্রীজলধর বিশ্বাস

বেদান্তের বহু ঊর্ধ্বে মহা বৈদান্তিক,
অনন্ত জ্ঞানের শুভ্র উজ্জ্বল প্রতীক,
অখণ্ড চৈতন্য শুদ্ধ! তব ভগবান
সবার সম্মুখে সত্য, কোটি কোটি প্রাণ;
নরনারায়ণ সেথা যুক্ত মহাযোগে—
ব্রহ্ম হেথা জীবরূপে সুখ-দুঃখ-ভোগে।

পাপ-পুণ্য, দুঃখ-দৈন্য, অশুচি ও শুচি,
স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, ধনী-দীন, ব্রাহ্মণ কি মুচি,
ইংরেজ, জার্মাণ কিবা আমেরিকাবাসী—
হিন্দু ও অহিন্দু সব এক সঙ্গে আসি
মিলিতেছে তব তীর্থে—পরিপূর্ণতায়,—
'মহামানবের তীরে' শান্তি-কামনায়।

সমাজ-উন্নয়নে বিবেকানন্দ-শক্তি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক টয়েন্‌বীর (Arnold J. Toynbee) A study of Historyর তৃতীয় খণ্ড পড়ছি। এই প্রথিতযশা পণ্ডিতের মতে 'In all acts of social creation the creators are either creative individuals or, at most, creative minorities ....' সমাজের সৃজনধর্মী সকল ক্রিয়া-কলাপে স্রষ্টার ভূমিকায় দেখা যায়, হয় ব্যক্তিবিশেষকে—নয়তো মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে, যাঁদের মধ্যে জ্বলছে সৃষ্টির আগুন। কিন্তু এইটুকু বলেই টয়েন্‌বী ক্ষান্ত থাকেন নি। সত্যের আর আধখানা তিক্ত অংশ এর সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন। টয়েন্‌বী বলছেন: প্রতিভাবান্‌ পথিকৃতেরা সভ্যতাকে যখন উন্নতি থেকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিচ্ছেন—তখন কিন্তু 'The great majority of the members of the society are left behind'—সমাজের বেশীর ভাগ লোক পিছনে পড়ে থাকে নিস্ক্রিয়তার মধ্যে, যখন প্রজ্বলিত মশালহস্তে পথিকৃতের দল আগিয়ে যান সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে।

কোন creative personality (সৃজন-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি) যখন সত্যকে উপলব্ধি করেন, তখন সেই উপলব্ধির বিপুল আনন্দকে কেবল নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তিনি খুশী থাকতে পারেন না। প্রাণের প্রাচুর্যে তাঁর চিত্ত কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে যায়। নব নব কর্মোদ্যমের মধ্যে সেই প্রাণপ্রাচুর্য সার্থক হ'তে চায়। সূর্য যেমন তার কিরণজালকে গুটিয়ে রাখতে পারে না নিজের মধ্যে, তেমনি তিনিও তাঁর উপলব্ধিগত সত্যকে সকলের মধ্যে প্রকাশ না ক'রে পারেন না। অতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কণ্ঠ থেকে তখন উৎসারিত হয়:

তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

creative genius (সৃজনী প্রতিভার) এই উদার আহ্বান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু অরণ্যে রোদনের কথা মনে করিয়ে দেয়। কেন? কারণ টয়েন্‌বীর ভাষায়: The creator, when he arises, always finds himself overwhelmingly outnumbered by the inert uncreative mass of his kith and kin, even when he has the good fortune to enjoy the companionship of a few kindred spirits. নয়া সমাজের স্রষ্টা যেন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপরে নিঃসঙ্গ প্রভাতী তারার মতো জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছেন। কণ্ঠে তাঁর ধ্বনিত হচ্ছে, 'একলা চলো রে'।

যাঁদের আমরা প্রতিভাবান্‌ বলে থাকি, তাঁরা তো আসলে সাধারণের পর্যায়ে পড়েন না। তাঁদের মগজে নূতনতর চিন্তাধারা, চোখে নূতনতর জগতের স্বপ্ন, কণ্ঠে নূতনতর ভাষা। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সংঘর্ষ অনিবার্য। এই জন্য যখনই সমাজে কোন মহামানবের আবির্ভাব হয় তখনই একটা আভ্যন্তরীণ লড়াই অপরিহার্য হ'য়ে দাঁড়ায়। টয়েন্‌বীর ভাষায়: The emergence of a Superman or a great mystic or a genius or a superior personality inevitably precipitates a social conflict. এই সামাজিক সংঘর্ষকে ভয় করার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মিথ্যা এবং সাঁচ্চায়—এ বিরোধ তো বাধবেই। পুরাতন সংস্কারের সুখতপ্ত কোটরের মধ্যে নিরুদ্বেগে যারা জীবন কাটাচ্ছিল, প্রতিভার কাছ থেকে বৈপ্লবিক

চিন্তার খোঁচা খেয়ে তারা তো তেড়ে আসবেই। যেখানে এই লড়াই নেই, সেখানে বুঝতে হবে জীবনেরই দীনতা রয়েছে। ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলালে একটা সত্য খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, মহাপুরুষরা যখনই আসেন লড়ায়ের ঝড়কে তাঁরা সঙ্গে বহন করে নিয়েই আসেন। যীশুখৃষ্টের সেই মৃত্যুহীন বাণী :

> Think not I am come to send peace on Earth : I came not to send peace but a sword.
>
> For I am come to set a man at variance with his father, and the daughter against his mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law.
>
> And a man's foes shall be they of his own household.
>
> "মনে কোরোনা আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি ; আমি এসেছি তরবারি দিতে।
>
> আমি এসেছি বাপে-ছেলেতে, মায়ে-ঝিয়ে পুত্রবধূ ও শাশুড়ীতে বিরোধ বাধাতে, আর মানুষের শত্রু হবে তার নিজেরই আত্মীয় স্বজনেরা।"

এ কথা আজও কত সত্য ! জড়ের রাজ্যে যারা প্রাণের প্রবাহ আনবার চেষ্টা করবে, আঘাত তো তাদের খেতেই হবে। শরৎবাবুর 'পণ্ডিত-মশাই'কে কি কম আঘাত পেতে হয়েছে ? গ্রামকে আগিয়ে নেবার জন্যে তিনি যখন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন প্রবীণ এবং 'পরম পাকা'রা তখন তাঁকে আঘাতের পর আঘাত হানছে আর সাধারণ গ্রামবাসীরা এই সংগ্রামের সামনে একেবারে নিষ্ক্রিয়। এই নিষ্ক্রিয়তা-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে টয়েন্‌বী লিখেছেন : This stagnation of the masses is the fundamental cause of the crisis with which our western civilisation is confronted in our day. (আজ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সামনে যে সঙ্কট তার মূল কারণ—জনগণের এই নিশ্চলতা)। যাঁরা প্রাচীতে জনসাধারণের মধ্যে উন্নয়নের কাজ করছেন তাঁদের সামনেও প্রবলতম বাধা জন-সাধারণের আত্মঘাতিনী জড়তা। আর এই সর্বনেশে জড়তাকে অপসারিত করতে না পারলে প্রগতিমূলক সমস্ত পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পঙ্গু হয়ে থাকবে। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হ'তে হবে শিক্ষাব্রতীদের। 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে শরৎবাবু এই সত্যের প্রতিই অঙ্গুলিসঙ্কেত করেছেন।

যাঁরা গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাব্রতীর কাজ নিয়ে রয়েছেন তাঁদের সামনে সকলের চেয়ে বড় কাজ জড়প্রায় গ্রামবাসীদের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য জাগানো। এই কাজে তাঁরাই হবেন নূতন নূতন আদর্শের পতাকাবাহী সৈনিক। আর এই আদর্শ-প্রচারের কাজে তাঁরা বাধা পাবেন বিস্তর—এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে অসীম ধৈর্যকে সহায় ক'রে তাঁরা যদি গ্রামোন্নয়নের কাজে অবিচলিত থাকতে পারেন—তবেই জয়ের মুকুট শেষ পর্যন্ত উঠবে তাঁদের মাথায়। গ্রামাজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে এইটুকু বুঝতে পেরেছি, জাতির মূল ব্যাধি হচ্ছে Stagnation, জড়তা। এ জড়তা দূর ক'রে জাতির জীবনে প্রাণের গতিবেগ সঞ্চারিত করতে না পারলে জনসাধারণের দুঃখ যাবার নয়। আর এর জন্যে দরকার টয়েনবীর ভাষায় creative minority (মুষ্টিমেয় সৃষ্টিশীল কর্মী) যারা নিজেদের বৈরাগ্যপূত জীবনের প্রোজ্জ্বল হোমানল-শিখার স্পর্শে সৃজনবিমুখ বিরাট জনতার মধ্যে প্রাণোদ্যমের আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন :

"দুর্ভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের

ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নেই, কারণ সে সব দেশে 'মানুষ' আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে।"

এ জড়তা যাবে কি ক'রে? স্বামীজী বলছেন: "পচা পুরানো লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে; তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন করতে পারা যাবে। এদেশে জ্বলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখালে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের life আগে তয়ের করে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।"

যারা হবে creative minority (সৃষ্টিধর্মী মুষ্টিমেয়), যাদের জীবনের স্পর্শে জীবন জেগে উঠবে তাদের তৈরী করবার পথ কি?

স্বামীজী এর উত্তরে আবার বলছেন:

"তাঁকে দেখে তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক, তবে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আসবে।"

স্বামীজীর এ কথা যে কত মূল্যবান্ যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি। মানুষ তৈরী করতে হ'লে আগে তার অন্তরে উচ্চ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে হবে। আর এর জন্যে জানা দরকার শ্রীরামকৃষ্ণকে—যিনি নরেন্দ্রের মতো প্রতিভাবান্ তরুণদের ত্যাগের পথে টেনে এনেছিলেন, যাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কত জীবন রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

দরকার গ্রামাঞ্চলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রচার, দরকার গ্রামের তরুণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অগ্নিবচনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া; তবেই গ্রামাঞ্চলে তৈরী হবে সেই আদর্শবাদী যুবসম্প্রদায়, যারা নিজেদের জীবনের গতিবেগ দিয়ে জড়প্রায় জনসাধারণকে প্রাণচঞ্চল ক'রে তুলবে।

মা ভবতারিণী

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

নমো ভবতারিণী, তাপ-তমোহারিণী, নমো মা নারায়ণী, নমো জগ-ধাত্রী।
গদাধর-জননী, সন্তানপালনী নমো মা ত্রিনয়নী, নমো জ্ঞানদাত্রী॥
মুনিমনোহারিণী, হৃদিলোকচারিণী, নমো মা মহামায়া, নমো মহালক্ষ্মী।
যোগী-হৃদিবাসিনী, তিমিরবিনাশিনী, নমো মা গায়ত্রী, নমো বিশালাক্ষী॥
এলায়িত কুন্তলা, দিগ্বলয়াঞ্চলা, নমো দিব্যাঙ্গনা, নমো মহাভক্তি।
দনুজ-বিমর্দিনী, দেবাভয়বর্ধিনী, নমো নিস্তারিণী, নমো মহাশক্তি॥
শশধর-ভালিনী, শ্যামরূপশালিনী, মহাযোগেশ্বরী, বরাভয়দাত্রী।
বরতনুধারিণী, অতনুবিদারিণী, নমো মহেশ্বরী, বিশ্ববিধাত্রী॥

কালীমূর্তি-রহস্য

বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার

এ যুগের শক্তিসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন :

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। ব্রহ্ম শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম; সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী; একেক মানলেই আর একটিকে মানতে হয়—যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; সূর্য আর সূর্যের রশ্মি; দুধ আর তার ধবলত্ব; মণি ও মণির জ্যোতি। দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা-শক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না, আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। মণি না ভাবলে মণির জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না, মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।

লীলাময়ী আদ্যাশক্তি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন, তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। এক সচ্চিদানন্দ—শক্তিভেদে উপাধিভেদ; তাই নানারূপ। যেখানে কার্য সেখানেই শক্তি; কিন্তু জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি (বুদ্বুদ) হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ। যিনি শ্যামা তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। একই বস্তু; যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না,—একথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। যতক্ষণ 'আমি' আছে—ভেদবুদ্ধি আছে, ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ পুরাণ তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে। ব্রহ্ম আর কালী অভেদ—ওকেই শক্তি, ওকেই কালী আমি বলি।"

শ্রীরামপ্রসাদের উপলব্ধিও ঐরূপ,—'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।' অবতার ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যুগে যুগে এই ব্রহ্মশক্তি বা কালীকেই জগৎকারণ আদ্যাশক্তি বলে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁদের প্রত্যক্ষানুভূতি ছিল এই আদ্যাশক্তিই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নিরাকার, নির্বিকার, নির্গুণ, মায়াতীত, ভাবাতীত এবং ওতপ্রোতভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত; আর সক্রিয় অবস্থায় সাকার সগুণ, সর্বদেবদেবীবিভূতিস্বরূপা, ইচ্ছাময়ী, অনন্তরূপে বিরাজিতা, অনন্তভাবময়ী ও ভাবগ্রাহী, ত্রিগুণাত্মিকা মায়াপ্রকৃতি ও মায়াধিশ্বরী, সর্বারাধ্যা, সর্বাভীষ্টা এবং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তাছাড়া দশ-মহাবিদ্যার মধ্যে প্রথমস্থানীয়া হওয়ায় কালীই প্রথমাবিদ্যা বা আদ্যাশক্তি। এই আদ্যাশক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ—উভয়ই।

সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্যের 'প্রাধানিক রহস্যে' জগৎকারণ আদ্যাশক্তির বর্ণনা এইরূপ :

পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী (শিবপুরাণাদিমতে শিবা-শক্তি) ত্রিগুণময়ী ও সকলের আদ্যাপ্রকৃতি। তিনি লক্ষ্যা (সগুণা) ও অলক্ষ্যা (নির্গুণা) এবং জগৎ-প্রপঞ্চ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এই পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব শূন্য দেখিয়া কেবল তমোগুণ অবলম্বনে অপর এক (নারী) রূপ ধারণ করিয়া মহাকালীরূপে পরিণতা হইলেন। মূলাদেবী মহালক্ষ্মী হইতে অভিন্না সেই মহাকালী অঞ্জনতুল্য গাঢ়নীলবর্ণা, দশনপীড়িতাননা, বিশালনয়না এবং

মধ্যমবয়সা। তাঁহার চারি হাত খড়্গ, পানপাত্র, শির ও খেটদ্বারা অলঙ্কৃত। তিনি বক্ষঃস্থলে কবন্ধ- (শিরোহীন দেহ) মালা এবং মস্তকে মুণ্ডমালা ধারণ করেন।

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সেই তামসী (মহাকালী) দেবীকে মহালক্ষ্মী বলিলেন,—তোমার যে যে কর্ম তৎ তৎ অনুযায়ী তোমার বিভিন্ন নাম দিতেছি:

"তুমি (ব্রহ্মাদিরও মোহক বলিয়া) মহামায়া, মহাকালী, মহামারী (মহামৃত্যুরূপা), ক্ষুধা (সর্ব অবিদ্যাদি ভক্ষণেচ্ছাবতী), তৃষা (সর্ব অবিদ্যাদি পানেচ্ছাবতী), নিদ্রা (যোগনিদ্রা বা সমাধিরূপা), তৃষ্ণা (ভক্তকৃত ভক্তি-ইচ্ছাবতী), একবীরা (প্রপঞ্চ মধ্যে অদ্বিতীয়া ও অলঙ্ঘ্যবীর্যা), দুরত্যয়া (বিনাশ-রহিতা), (কালনাশক বলিয়া) কালরাত্রি—যাহাতে ব্রহ্মার লয় হয়, মহারাত্রি—যাহাতে জগতের লয় হয় এবং মোহরাত্রি—যাহাতে জীবের নিত্য লয় হয়। তোমার এই সকল নাম কর্মানুসারে প্রতিপাদ্য (প্রসিদ্ধ)।"

পদ্মাসন ব্রহ্মা মধুকৈটভ বধার্থে যে দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন তিনিই প্রলয়জলধিজলে অনন্ত নাগশয্যায় শায়িত ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপা তামসী মহাকালী। ব্রহ্মা ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এই মহাকালীর দশমুখ, দশহস্ত ও দশপদ। তিনি অঞ্জনপ্রভা ও বিশাল ত্রিশটি নয়নমালার (ত্রিনয়না বলিয়া দশটি আননে ত্রিশটি নয়ন) সহিত বিরাজমানা। তিনি দশহস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনু, লগুড়, শঙ্খ, শূল, ভুষণ্ডী ও নরমুণ্ড ধারণ করেন। ইহার সর্বাঙ্গ অলঙ্কারে সুশোভিত এবং নীলকান্তমণিতুল্য প্রভা-বিশিষ্ট।

হিমাচলশৃঙ্গে সিংহোপরি সমাসীনা অম্বিকা-দেবীকে যখন চণ্ডমুণ্ড প্রমুখ দৈত্যগণ আক্রমণ করিয়াছিল তখন সেই শত্রুগণের প্রতি ভীষণ ক্রোধে অম্বিকার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল এবং তাঁর ভ্রূকুটী-কুটিল ললাটদেশ হইতে তৎক্ষণাৎ খড়্গধরা ও পাশহস্তা ভীষণবদনা কালী বিনিঃসৃতা হইলেন। সেই কালিকাদেবী বিচিত্র নরকঙ্কাল-ধারিণী, নরমুণ্ডমালিনী, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, অস্থিচর্ম-মাত্রদেহা, অতিভীষণা, অতিবিশালবদনা, লোল-জিহ্বায় ভয়প্রদা, কোটরগত আরক্তচক্ষুবিশিষ্টা এবং বিকট শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল-পূর্ণকারিণী। অসুর সেনাগণ-সহ চণ্ডমুণ্ডকে বধ করিয়া তিনি চামুণ্ডা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শারদীয়া দুর্গাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে এই চামুণ্ডা কালিকাদেবীরই ধ্যান ও পূজা হয়।

সৃষ্টিপ্রকরণ-সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন:

"আদ্যাশক্তি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী ও নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না; নিবিড় আঁধার; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়ীতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতি-বৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশান-কালীর সংহার-মূর্তি—শব-শিবা ও ডাকিনী-যোগিনীর মধ্যে শ্মশানের উপরে থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ-সকল কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন, জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন—যেমন মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপরে থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই-ই।"

উপরি-উক্ত বর্ণনাগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ব্রহ্মশক্তি অথবা পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি প্রলয়কালে একবার চারিহস্তে এবং বারান্তরে দশ

হস্তে খড়্গ, শূল, চক্র, পাশ ইত্যাদি বহুবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া এবং কবন্ধ-মুণ্ডমালাদি পরিহিত হইয়া ভীষণাকারে আবির্ভূতা হইলেও তাঁর নয়নাভিরাম, মনোমুগ্ধকর, কল্যাণময়ী মাতৃভাব প্রচ্ছন্ন ছিল না—যেহেতু তিনি অঞ্জনতুল্য গাঢ়নীলবর্ণা, নীলকান্তমণিতুল্য প্রভা-বিশিষ্টা, বিশালনয়না, উজ্জ্বলদন্তপঙ্‌ক্তিযুক্তা এবং সর্বাঙ্গে অলঙ্কার-বিভূষিতা মধ্যমবয়সা ছিলেন। আবার ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে মহাকালীর ঐ কল্যাণময়ী মাতৃভাব সম্পূর্ণরূপেই লুক্কায়িত ছিল—যখন তিনি দ্বিভূজে খড়্গ ও পাশ ধারণ করিয়া চণ্ডমুণ্ড এবং রক্তবীজাদি অসুরবধার্থে অতিভীষণা করালবদনা মূর্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া সৈন্যগণ ও যুদ্ধসম্ভারসহ তাহাদিগকে বিরাট মুখগহ্বরে চর্বণ ও ভক্ষণ করিয়া বিপুল রক্তপানে উন্মত্তা হইয়াছিলেন এবং রক্তদন্তিকা, রক্তকেশা, রক্তনয়না, রক্তাক্ত লোলজিহ্বা ও সর্বাঙ্গ রুধিরচর্চিতা হইয়া অসুরকুলকে সন্ত্রাসিত ও নিধন করিয়াছিলেন। একাধারে এতাদৃশ ভীষণ ও মধুরের সমাবেশ কেন? ইহার রহস্য এবং তাৎপর্যই বা কী?—এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা সর্বকালে শুধু দেবতাদের নয়, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ঋষিকুলের এবং অবতারাদি সাধক ও সিদ্ধব্যক্তিগণের মনে অবিরাম অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তাহাদিগকে গভীর চিন্তা, অনুভূতি ও উপলব্ধির রাজ্যে আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি ও আত্মসন্তুষ্টিলাভে সমর্থ করিয়াছে ও করিতেছে।

ইতিহাসের যখন জন্ম হয় নাই—জগতের সেই প্রাচীন যুগ হইতেই পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি যুগপ্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নারীরূপে প্রকট হইয়া অতুলনীয়া নারীশক্তিরই নানাভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাই দেবতারা এই মহাশক্তিকে সর্বভূতে উপলব্ধি করিয়া স্তব করেছিলেন:—

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

ভারতের ঋষিরা বহুর ভিতরে একের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আদ্যাশক্তিকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং বাহ্য ও আন্তর জগৎ একই শক্তি-প্রসূত দেখিয়া শক্তিকে শক্তিমানের সহিত নিত্যযুক্ত দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে দেবী নিত্যস্বরূপা, জগৎই তাঁহার মূর্তি, তিনি অখিলব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, তাঁহা হইতেই জীবজগৎ নিঃসৃত হইতেছে এবং তিনিই সকলের উৎপত্তির কারণস্বরূপিণী হইয়া পরমব্রহ্মে নিত্য বিদ্যমান। কালের আবর্তে প্রগতিশীল মানব এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল—যেখানে তাহারা ঋষিদের এই উপলব্ধির কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়া নারীপ্রতিমায় জগদম্বার হ্লাদিনী-শক্তির উপাসনা করিতে শিখিল, এবং ত্রিজগৎ-প্রসবিনীশক্তিকে বিরাট নারীমূর্তিস্বরূপ কল্পনা করিয়া তদবলম্বনে জগন্মাতার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইল। এইরূপে জগৎকারণ ঈশ্বরকে জগজ্জননী, জগদম্বা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া মাতৃভাবের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। এ যুগে আবার শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার ভিতর দিয়া জগৎ এক নূতন আলোকে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেখিল যে শিশুসুলভ মাতৃগতপ্রাণ ও অনন্যশরণ হইয়া একাগ্রচিত্তে জগজ্জননীকে শুধু 'মা-মা' বলিয়া ডাকিতে পারিলেই মাতৃভাবের উপাসনার চরমসিদ্ধি করায়ত্ত হয়।

সাধনেতিহাসে তন্ত্রসাধনা ভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধকগণের ধ্যানদৃষ্টিতে মা কালী যে মূর্তিতে প্রতিভাত হইয়াছিলেন তাহা তন্ত্রোক্ত দক্ষিণ-কালিকাদেবীর প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে বর্ণিত:—

"ওঁ (বীজ) করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥
সদ্যশ্ছিন্ন-শিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজাং।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃপাণিকাং॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চিতাং॥
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্মভয়ানকাং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাং॥

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং ॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাং ॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং।
শবরূপমহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতাম্ ॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাং
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাং ॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্মকামার্থসিদ্ধিদাম্ ॥"

এই ধ্যানমন্ত্রপাঠে ইহাই মনে হয় যে ভারতের তন্ত্রকারেরাও প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় অসিমুণ্ডবরাভয়-করা, সৌম্যকঠোর, জীবন-মৃত্যুরূপ সর্বপ্রকার বিপরীতভাবের সম্মিলনভূমিস্বরূপা মাতৃমূর্তিগঠনেই সহায়তা করিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধক শ্রদ্ধা ও সংযম সহায়ে ভক্তিপূরিতচিত্তে ঐ মূর্তির পূজা করিতে করিতে কালে সমাধিস্থ হইয়া দেখিলেন যে বাস্তবিকই সে মূর্তি জীবন্ত, জাগ্রত এবং বিশ্বের সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত। সমাধিসহায়ে তিনি স্থূল বিশ্ব হইতে পরোক্ষভাবে দূরে অবস্থিত হইয়া আরো উপলব্ধি করিলেন যে ঐ মহাশক্তি কালীই অনন্ত স্থূলব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপাকৃতি এক বিরাট শব-শিবা মূর্তিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন। ইত্যাকার প্রত্যক্ষদর্শনের ফলে হর্ষ বিস্ময় ভয় প্রভৃতি বহুভাবে ঐ সাধকহৃদয় এককালে উদ্বেলিত হওয়ায় তাঁহারই মুখ হইতে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল উপরি-উক্ত ঐ গভীর রহস্যপূর্ণ ধ্যানমন্ত্র।

এখন আমরা ঐ মন্ত্রের বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব যে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের প্রতীক ঐ অনন্তভাবময়ী মূর্তি হইতে সাধককুল কীদৃশ অনুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। চিরকালই মায়ের রূপ—'সৌম্যা, অসৌম্যতরা, অশেষ সৌম্যেভ্যঃ তু অতিসুন্দরী'। তাই তান্ত্রিক সাধকেরাও দর্শন করিলেন—সুখপ্রসন্নবদনা, স্মেরাননা, পীনোন্নত-পয়োধরা, মহামেঘপ্রভাবিশিষ্টা, দক্ষিণা, দিব্যা শ্যামামূর্তি—যাহা জগন্মোহিনী মাতৃমূর্তির চন্দ্রকোটি-সুশীতল রূপের দ্যোতক।

শ্যামা রূপটি কেন হ'ল—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন: "সে দূরে বলে, কাছে গেলে কোন রঙই নাই—যেমন দূরের আকাশ নীলবর্ণ, কিন্তু কাছের আকাশের কোন রঙ নাই। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে ততই ধারণা হবে—তাঁর নাম রূপ নাই। পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার আমার শ্যামা মা—যেন ঘাস ফুলের রঙ।"

মায়ের দক্ষিণ করদ্বয়ে বর ও অভয়, এবং বাম করদ্বয়ে অসি ও মুণ্ড। সবল দক্ষিণ হস্তদ্বয় দ্বারা মা জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও পালন করছেন, সুতরাং বিশ্বকল্যাণার্থে একদিকে তাঁর সৃজনী ও পালনী-শক্তির যেমন অপূর্ব সমাবেশ তেমনি অন্যদিকে একই উদ্দেশ্যে বিশ্বের সর্ববিধ দুষ্কৃতিনাশের দ্যোতকস্বরূপ তাঁর বাম হস্তদ্বয়ে অসি ও মুণ্ড ধারণ। জগতের সৃষ্টি ও কল্যাণের জন্য করুণাময়ী মাতৃশক্তির বিকাশ যে পরিমাণ প্রয়োজনীয়, মায়ের পালনী শক্তির সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য নিত্য ধ্বংস বা লয়ের বিধানও সেই পরিমাণেই অপরিহার্য। অসুর-মুণ্ডমালা গলে ধারণ করার তাৎপর্য এই যে—দেবভাবের বিঘ্নস্বরূপ অসুরকুল প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া যখনই শান্তি বিনষ্ট করে তখনই মা অতিভীষণা, ঘোরা করালবদনা মূর্তিতে নির্মমভাবে তাহাদিগকে দলিত, মথিত ও বিধ্বস্ত করিয়া শান্তি সংস্থাপন ও দেবভাবগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং দেবাসুরের নিত্য সংগ্রামস্থল অর্থাৎ দেবতা ও পশুভাবের অদ্ভুত সংগ্রাম-ক্ষেত্র মানবহৃদয়ে—তথা মন-বুদ্ধি-চিত্তে—মহামায়া অনুরূপ শান্তির প্রতিষ্ঠাই করিয়া থাকেন—যখনই দেবতাদিগের ন্যায় সাধকগণ তাঁদের অন্তর্নিহিত পশুভাবগুলির ধ্বংস সাধন করিয়া দেবভাবগুলির মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল অন্তরে ও আগ্রহে মায়ের অভয়পদে একান্ত শরণাগত হইতে সক্ষম হন।

শ্যামার অন্যান্য ভাবগুলির তাৎপর্যও অতি চমৎকার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। মা শ্মশানবাসিনী, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, নরকরকটিবেষ্টিতা; উজ্জ্বলদশনপঙ্‌ক্তি দ্বারা সংযত, রক্তাক্ত লোলজিহ্বা; স্নিগ্ধ প্রভাতসূর্যকরোজ্জ্বলা ত্রিনয়না, শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি দণ্ডায়মানা এবং মহাকালের সহিত বিপরীত-রতাতুরা। ভারতের ঋষিগণ সর্বভূতস্থিত চৈতন্যের সহিত শক্তির নিত্যমিলন সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়াই শব-শিবার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বিশ্বব্যাপী বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থমাত্রই তাঁহাদের নিকট সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়ীরও প্রতীক-স্বরূপ হইয়া তাঁহার 'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা' মূর্তি প্রকাশ করিত। অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার, মৃত্যুর নিষ্ঠুর ছবি, শ্মশানের কঠোর উদাসীনতা, কালের সংহার ছায়া—সকলই আবার সেই করালবদনার ভিতর কোমল কঠোর ভাবের এককালীন একত্র সমাবেশ নয়নগোচর করাইয়া তাঁহাদিগকে মোহিত করিত। শ্মশানে শবসাধনা অথবা শ্মশানকালীর আরাধনা সার্থক হয়—যদি শ্মশানের কঠোর উদাস-ভাব সাধক মানবের মনে তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন করিয়া তাহাকে কামকাঞ্চন-প্লাবিত সংসারের কামনা, বাসনা, আসক্তি হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত করিতে পারে। যেহেতু এতাদৃশ নির্মল ও মায়ামুক্ত মানব-হৃদয়ই শ্মশানবাসিনীর নিত্য আবাসস্থলে পরিণত হইয়া থাকে।

মায়ের দিগম্বরী ও মুক্তকেশী অবস্থা ঘোর দেবা-সুরের যুদ্ধে উন্মাদিনী ভাবের দ্যোতক এবং শান্তিকালে উদাসীনতারই পরিচায়ক। আদ্যাশক্তি নারীমূর্তিতে আবির্ভূতা হইলেও অষ্টপাশ-বিবর্জিতা বলিয়া তাঁর দেহ বসনাবৃত করিয়া রাখার কোন প্রয়োজন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণসাধনেতিহাস-পাঠে জানা যায় যে আহার নিদ্রাদি দেহজ্ঞান-বর্জিত হইয়া যে সাধক তীব্র বৈরাগ্য সহকারে অনন্যশরণ হইয়া অনন্যচিত্ত মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং তদ্ধেতু লোকব্যবহারাদিতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া বিসদৃশ আচরণাদির জন্য সাধারণতঃ লোকচক্ষে উন্মাদবৎ প্রতীয়মান হয় তাহার পক্ষেও পরিধেয় বস্ত্রের খবর রাখা সম্ভবপর হয় না; উন্মাদ-ভাব ও উদাসীনতা দুটিই তাঁর অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

মা কটিদেশে নরকরমালা কোমরবন্ধের মত পরিধান করিয়াছেন। ইহা কি লজ্জাপটের দ্যোতক, না অন্য কোন গভীর ভাবোদ্দীপক? পূর্বে বলা হইয়াছে যে লজ্জা সহ অষ্টপাশ-বিবর্জিত নারীদেহ আবৃত করিয়া রাখার জন্য কোন বসন বা লজ্জাপট প্রয়োজনীয় নহে। তাহা ছাড়া সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রী-পুরুষ-বোধ-রহিত বা কামগন্ধহীন মনোভাবাপন্ন শিশু বালক বালিকারা একান্ত নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা ও খেলাধূলা করে। তাহাদের সর্বক্ষণ বসনাবৃত থাকার প্রয়োজন হয় না। মা কালীর কটিদেশে নরকরমালা ধারণ লজ্জাপটাবৃতা হইয়া থাকার উদ্দেশ্যে নহে। সদানন্দময়ী কালীর সৃষ্টি ও পালনে যে পরিমাণ আনন্দ ও উৎসাহ, লয়েতেও তদ্রূপ, যেহেতু তিনি কোন কালে কোন অবস্থাতেই নিরানন্দ নহেন, সদা লীলাময়ী।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন জগজ্জননী মহামায়ার স্বরূপ অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া ভাবে দেখিয়াছিলেন—অনুপমা সুন্দরী নারী সর্বাঙ্গ-সুন্দর একটি পুত্র প্রসব করেন; লালন-পালনে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া আবার তাহাকে কিছুকাল পরে সহর্ষে গ্রাস করিলেন। শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে শক্তি যে একাধারে প্রসব ও প্রলয়রূপ বিপরীত গুণধারিণী একথাই পরমসত্য বলিয়া অনুভূত হয়। সুতরাং বাহ্যদৃষ্টিতে উপরি-উক্ত চিত্র অতীব নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবের পরিচায়ক হইলেও ইহা যে জগৎপ্রপঞ্চ পরিচালনায় মা কালীর সম্পূর্ণ নির্বিকার, অনাসক্ত ও মায়ারহিত ভাবের সুস্পষ্ট দ্যোতক—তাহা সন্দেহাতীত। অতএব গলে লম্বমান সৃষ্টিবীজ

মুণ্ডমালার ন্যায়, নিধনপ্রাপ্ত সন্তানগণের করমালা কটিদেশে ধারণ করিয়া সদানন্দময়ী শ্যামা সাধক মানবকে কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, কর্মফল অনুসারেই তিনি জীবের জন্ম দেন ?

সম্মুখের নয়ন দুইটিতে শ্যামা মা স্থূল সূক্ষ্মজগৎ পরিদর্শন করেন এবং তদূর্ধ্বে ললাটে স্থিত তৃতীয় জ্ঞাননেত্রটিতে কালী স্বরূপ দেখিয়া থাকেন। তাঁহারই কৃপায় সাধকমানবগণ যখন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট হয়—তখনই তাহারা করুণাময়ী শ্যামার স্বরূপ দর্শনলাভে সমর্থ হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে।

শ্যামা মূর্তির অন্যতম দিক্—দাঁতে জিব কাটিয়া মা শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি দণ্ডায়মানা এবং মহাকালের সহিত বিপরীত-রতাতুরা। কোন কোন মাতৃসঙ্গীতে এই চিত্রটির উপর জাগতিক ভাব আরোপ করা হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে মায়ের ভক্ত উপাসকরা নিজ নিজ রুচি এবং ভাবানুযায়ী এই চিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; যদিও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইহার অন্তর্নিহিত রহস্য ও তাৎপর্য অন্যরূপ। শ্যামার এই রূপ ও ভাবের ব্যাখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যা কিছু দেখছ সবই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন, শিব শব হয়ে পড়ে আছেন ; কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন, এ সমস্তই পুরুষপ্রকৃতি-যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন।" এই পুরুষপ্রকৃতি-যোগ গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে যেহেতু স্থাবরজঙ্গম যা কিছু পদার্থ—সবই এই সংযোগে উৎপন্ন হয়। আবার গুণত্রয়বিভাগ-যোগেও শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—'হে ভারত, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি (মহদ্‌ব্রহ্ম) আমার গর্ভাধানের স্থান, তাহাতে আমি সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করি। সেই গর্ভাধান হইতে সর্বভূতের সৃষ্টি হয়।' সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত পরমব্রহ্মের প্রতীক নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত শবরূপী মহাদেবের হৃদয়ই ব্রহ্মশক্তির সৃষ্টিস্থিতিলয়-লীলার একমাত্র উপযুক্ত স্থল। মহাকালের সহিত অভিন্ন হওয়াতে পরস্পরের অতুলনীয় অবিচ্ছেদ্য প্রেমানুরক্তির উন্মাদনা শ্যামাকে বিপরীত-রতাতুরা করিয়াছে ; এই শান্ত অথচ মধুর ভাবের নিত্যলীলা মহাকালের সংযোগে অবিরাম গতিতে পরিচালিত ; ইহা দেখিয়া তিনি যেন অবাক্-বিস্ময় দৃষ্টিতে ঈষৎ সলজ্জ ও সঙ্কুচিতভাবে এই অনাদি অনন্ত লীলায় মুগ্ধ ও মত্ত রহিয়াছেন। সাধক মন এই অদ্ভুত চিত্রের অনুধ্যানে রসনা ও বাক্‌সংযম এবং তাহার ফলে উপস্থ সংযত করিয়া শুদ্ধ শান্ত মনে আদ্যাশক্তির লীলা-রহস্য উপলব্ধি করিবে এবং যুগপৎ প্রেমভক্তিতে বিগলিত হইয়া শ্যামার পাদপদ্মে একান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া মানবজীবন সার্থক করিবে।

কালীমূর্তির ব্যাখ্যা

জগজ্জননী—তাঁকে প্রকৃতি বা কালীও বলা হয়। একটি নারী-মূর্তি একটি পুরুষ-মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে আছেন—তার অর্থ, মায়ার আবরণ উন্মোচিত না হলে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না। ব্রহ্ম স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নন, তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তিনি যখন নিজেকে অভিব্যক্ত করেন তখন নিজেকে মায়ার আবরণে আবৃত করে জগজ্জননী-রূপ ধারণ করেন ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন। যে পুরুষ মূর্তিটি শয়ানভাবে রয়েছেন তিনি শিব বা ব্রহ্ম, মায়াবৃত হয়ে শবরূপ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে নারীর স্থান

শ্রীমতী দীপালী মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর বিচিত্র লীলাময় জীবনে যে সকল পূতস্বভাবা ধর্মপ্রাণা নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন—তাঁদের কথা বলার আগে জানা দরকার শ্রীরামকৃষ্ণ নারীজাতিকে কি চোখে দেখতেন? সবাই বলবেন, মায়ের মতই দেখতেন সকল মেয়েকে। কিন্তু সেই মা-টি কেমন? কোন্ মায়ের ছবি তিনি দেখতে পেতেন সকল মেয়ের মধ্যে?

"মা-মা-মা"—যে ডাকে দক্ষিণেশ্বর মুখরিত হয়ে উঠেছে; যাকে পাবার জন্য অশান্তচিত্তে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন তিনি গঙ্গার কিনারে কাদার উপর পড়ে লুটোপুটি খেয়েছেন—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, ভবতারিণীর সম্মুখে মর্মভেদী কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিয়েছেন—নিদারুণ হতাশায় খড়্গ নিয়ে নিজেকে বলি দিতে গিয়েছেন যে মায়ের চরণে; আর সেই মুহূর্তে যে মা তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন—পরম-কল্যাণময়ী সেই জগন্মাতারই প্রতিচ্ছবি দেখতেন তিনি সকল মেয়ের মধ্যে।

তাঁর বিচিত্র লীলাপূর্ণ জীবনে নারীজাতি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

জননী চন্দ্রামণির নয়নের মণি শৈশবে চঞ্চল ছিলেন—কিন্তু কখনও জননীর অবাধ্য হননি তিনি। গ্রামের মেয়েরা যখন পুকুরঘাটে স্নান করতেন তখন বালকও যেতেন স্নানে—দুষ্টামিও করতেন তাঁদের সঙ্গে। কেহ কেহ তাঁর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন, আসতে বারণ করেছিলেন তাঁদের স্নানের সময়। কিন্তু সে নিষেধ বিশেষ ফলদায়ক হয় নি। চন্দ্রামণি যখন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—স্নানের সময় মেয়েদের দেখতে নেই—তাতে মেয়েদের সম্মানের হানি হয়—সেই সঙ্গে নিজের জননীকেও অপমান করা হয়, তখন থেকে আর কখনও তিনি সে কাজ করেন নি।

আবার উপনয়ন-কালে জননীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা না নিয়ে নিলেন ধনি-কামারিনীর কাছ থেকে। সত্যাশ্রয়ী পিতার পুত্র; সত্যভঙ্গ যে তিনি করতে পারেন না। কামার-কন্যা ধনি—তাঁর ধাত্রী মাতা। জীবনে প্রথম সেবা, প্রথম শুশ্রূষা তিনি তার কাছ থেকেই পেয়েছেন। সেই নন্দরাণীর তিনি যে আদরের দুলাল। তিনি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, উপনয়ন-কালে তার কাছ থেকে তিনি প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। জন্ম থেকে নয়টি বৎসর পর্যন্ত মায়ের মতই সে তাঁকে যত্ন করে এসেছে; কোন কিছু ভাল খাবার তৈরী করলে তার গদাধরকে না দিয়ে সে গ্রহণ করতে পারে না। কোন অংশেই সে তার গর্ভধারিণীর চেয়ে কম নয়। সে কি একদিনের জন্যে মায়ের দাবি করতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। কেন, শূদ্রাণী কি মানুষ নয়?

কোন নিষেধই তিনি শুনলেন না। অবশেষে তাঁর মতেই সকলকে মত দিতে হল।

গৈরিক বসন পরে, হাতে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বালক এসে ভিক্ষা চাইল—ভবতি ভিক্ষাং দেহি—ভিক্ষা দাও মা, ভিক্ষা দাও।

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ধনি, নত মস্তকে এগিয়ে এল। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও এই নয়টি বৎসরে সে যত কিছু সঞ্চয় করেছিল—সবই সে উজাড় করে ঢেলে দিল তার গোপালের ঝুলিতে।

সে-ই ঠিক চিনেছে গদাধরকে। সেই জন্যে তার একান্ত বাসনা—গদাধর তাকে 'মা' বলে ডাকুক, তাকে প্রথম ভিক্ষা দিয়ে সে নিজে ধন্য হোক। কী আনন্দ! আজ তার সকল আশা পূর্ণ করেছে গদাধর।

আর গদাধর সেই ভিক্ষা গ্রহণের সময় তাঁর গর্ভধারিণীকেই প্রত্যক্ষ করলেন ধনির মধ্যে। তাকে মায়ের সম্মানে ভূষিত করে অধিকতর সম্মানিত করলেন নিজের জননীকেই।

পিতৃবিয়োগের পর বালক হলেও অন্তর দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন জননীর ব্যথা। তাই তিনি প্রায় সকল সময়েই থাকতেন মায়ের কাছে—সাহায্য করতেন তাঁর কাজে। তাঁর সেই বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হতেন।

দক্ষিণেশ্বরে যখন তিনি 'রামকৃষ্ণ' নামে পরিচিত হয়েছেন; তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধি-লাভও করেছেন, তখন অদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ তোতাপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প করলেন। বেদান্ত সাধন করতে হ'লে আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ বিধেয়, রামকৃষ্ণ কিন্তু সে কাজটি গোপনে সম্পন্ন করতে অনুরোধ করলেন তোতাপুরীকে। কারণ চন্দ্রামণি তখন দক্ষিণেশ্বরে। শোকতাপ ও দুঃখকষ্টে তাঁর মনে শান্তি ছিল না। গঙ্গাতীরে প্রাণাধিক পুত্র গদাধরের কাছে শেষ কয়টা দিন কাটাবেন মনস্থ করে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণও মথুর বাবুকে বলে তাঁর থাকবার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই জননীর মনে তাঁর মস্তকমুণ্ডন ও গৈরিক-ধারণে যদি ব্যথা লাগে—তাই প্রকাশ্য সন্ন্যাসগ্রহণ ও বাহ্যচিহ্ন-ধারণে আপত্তি করেছিলেন।

মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণকালে বৃন্দাবনে এসেছেন রামকৃষ্ণ। সেখানে পরম ভক্তিমতী বর্ষীয়সী সাধিকা গঙ্গামায়ীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরও ভাবাবেশ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের মত। সুতরাং অচিরেই উভয়ের মধ্যে অন্তরের যোগ স্থাপিত হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণ আর ফিরবেন না দক্ষিণেশ্বরে—গঙ্গামায়ীও তাঁকে ছাড়বেন না। ভাগিনেয় হৃদয়রামও সঙ্গে গিয়েছিলেন—কোনও মতে মামাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না, অবশেষে চন্দ্রামণির কথা মনে করিয়ে দিলেন হৃদয়রাম—দক্ষিণেশ্বরে তাঁরই মুখ চেয়ে তিনি রয়েছেন। জননীর মুখখানি স্মরণ করে রামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তাঁকে দেখবার জন্য ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

সন ১২৮২ সাল, ১৬ই ফাল্গুন ৮৫ বৎসর বয়সে ইহলীলা সংবরণ করলেন চন্দ্রামণি। গঙ্গাতীরে প্রাণাধিক পুত্র গদাধরের কাছেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তাঁকে সেবা করলেন রামকৃষ্ণ। পরমারাধ্যা জননীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ বলে শেষ কার্যাদি করলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল। তবুও তো তিনি মানুষ—তাই তর্পণ করতে নামলেন গঙ্গায়। অনেক চেষ্টা করেও অঞ্জলিতে জল রাখতে পারলেন না; তিনি যে পরমহংস—শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকরণের উর্ধ্বে, সেখান থেকে তো আর নেমে আসতে পারেন না। একদিন ছুটে গেলেন পঞ্চবটীর দিকে, গঙ্গার কিনারে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন।

* * *

অপূর্ব সাধনার স্থান দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত না হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হতেন না, আর শ্রীরামকৃষ্ণ না হ'লে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দও হতে পারতেন না,—পাশ্চাত্ত্য দেশে হিন্দুধর্মও প্রচারিত হ'ত না। অতএব সমস্ত ব্যাপারটির গোড়ায় রয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে নির্মিত একটি মন্দির। আর সেই মন্দির ছিল একজন ধনবতী মাহিষ্যজাতীয় মহিলার পরম ভক্তিপরায়ণতার ফল।

প্রাতঃস্মরণীয়া এই রাণী রাসমণি।

গদাধর শিবমূর্তি গড়ছেন। বৃষভে আসীন শিবের শিরে জটারাশি, হাতে ডমরু ও ত্রিশূল, কটিদেশে বাঘছাল। অপূর্ব বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছেন রাসমণি। সহজাত শিল্পপ্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন! প্রশংসার ভাষা খুঁজে পেলেন না রাণী।

রাধাগোবিন্দজীর পা ভেঙ্গে গেছে; পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন—গঙ্গায় তা বিসর্জন দিয়ে নূতন বিগ্রহ এনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাণীমা ছুটে এলেন গদাধরের কাছে।

"তোমার জামাই-এর যদি পা ভেঙ্গে যায়—যথাযথ চিকিৎসায় নিরাময়ের ব্যবস্থা না ক'রে তাঁকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে পারবে?" অপূর্ব বিধান দিলেন গদাধর। আর নিজেই নিপুণভাবে জুড়ে দিলেন সেই ভাঙ্গা পা।

সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বাসই যে সব কিছুর ওপর। সেই বিশ্বাসে ভর করেই রাসমণি গদাধরের কাছে এসেছিলেন। তাই ফলও পেয়েছিলেন মনোমত।

ভবতারিণীর সম্মুখে গান গাইছেন গদাধর—রাসমণি বসে শুনছেন সে সুর-লহরী। সহসা তাঁকে একটা চড় মেরে বললেন গদাধর, "ছিঃ এখানেও বিষয়-চিন্তা।" অন্তর্যামী ঠিকই জেনেছেন—ঠিকই বলেছেন! সত্যই রাণী গান শুনতে শুনতে কোন এক ফাঁকে বিষয়-চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

গদাধরের ব্যবহারে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হলেন না। সেই আঘাতকে তিনি তাঁর প্রাপ্য বলেই মেনে নিলেন; এবং এই ব্যাপারের জন্য পূজারী ঠাকুরের উপর অত্যাচার হতে পারে বুঝে কর্মচারীদের বলে দিলেন—ভটচায মশাইয়ের কোন দোষ নেই—তাঁরা যেন তাঁকে কিছু না বলেন।

এমনই কত ঘটনা। শেষ দিনটি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের পুরোভাগেও আমরা দেখতে পাই আর এক নারীকে। বৈষ্ণব ও তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্না ভৈরবী যোগেশ্বরী তাঁকে আপন সন্তানজ্ঞানে তন্ত্রসাধনায় দীক্ষা দিলেন। আর রামকৃষ্ণ? প্রথম দর্শনেই তাঁকে মাতৃ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করলেন—যেন কত কালের চেনা! বহুদিনের অদর্শনের পর মাতা-পুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ। দুই বৎসরের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সেই মহীয়সী নারীর সহায়তায় চৌষট্টি প্রকার তন্ত্র-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন।

ভৈরবী তাঁকে 'অবতার' বলে ঘোষণা করলেন। এক প্রকাশ্য সভায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সকলে এক-বাক্যে তাঁর সিদ্ধান্তে সম্মতি দিলেন। জগতের কাছে তিনি অবতার-রূপে স্বীকৃত হলেন—বিশ্বের নিকট ছড়িয়ে পড়ল পবিত্র 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম।

* * *

ভক্ত-সমাগম হতে লাগল দক্ষিণেশ্বরে। নারী-ভক্তগণের মধ্যে প্রথমদিকেই এলেন মনোমোহন বসুর জননী শ্যামাসুন্দরী। এই শ্যামাসুন্দরীর জামাতা শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখালচন্দ্র, যিনি পরবর্তী-কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে খ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রাখালচন্দ্রের যাতায়াত তিনি অতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন—নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করতেন জামাতার এই মহাপুরুষ-সঙ্গলাভে।

জনৈক ভক্তের বিধবা ভগিনী ধ্যান করতে বসেন, কিন্তু মন স্থির হয় না। নিরুপায় হয়ে সেকথা বললেন ঠাকুরকে। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কে? উত্তরে বুঝলেন তাঁর এক শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। তখন ঠাকুর তাঁকে বললেন, "এই শিশুটিকেই তুমি বালগোপাল জ্ঞানে ধ্যান কর।" অচিরেই সেই ভক্তিমতী মহিলা সেই বালকের মধ্যেই তাঁর ইষ্টকে খুঁজে পেলেন।

যোগীন-মা অর্থাৎ যোগীন্দ্রমোহিনী ডাক্তার প্রসন্ন কুমার মিত্রের কন্যা। কিন্তু স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতায় অতৃপ্তচিত্ত হয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে ছুটে এলেন। প্রথম দর্শনেই তাঁর সকল জ্বালা জুড়িয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে জপতপের

সাহায্যে সাধনার উচ্চ সোপানে তিনি আরোহণ করলেন।

একদিন যোগীন-মার সঙ্গে এলেন এক সন্তান-হারা ব্রাহ্মণ মহিলা। একটি মাত্র কন্যাকে ধনী সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরেই সে মারা যায়। তাই জ্বালা জুড়াতে এলেন ঠাকুরের কাছে। অর্ধবাহ্যদশায় ঠাকুর তাঁকে বললেন, "পরম ভাগ্যবতী তুমি! সংসারে যার আপনার বলতে কেউ নেই, ভগবান নিজেই তার ভার নেন।" দেবতার অভয়বাণী যেন শুনলেন তিনি—লুটিয়ে পড়লেন দেবতার চরণে। ঠাকুরের কৃপায় আধ্যাত্মিকতার স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে গেলেন তিনি। ইনি হলেন গোলাপসুন্দরী—গোলাপ-মা বলেই পরিচিতা। তাঁর বাড়ীতে যেদিন ঠাকুর পদার্পণ করেন সেদিন নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন তিনি।

*　　*　　*

"ওঃ তুমি এসেছ; দাও দেখি আমার জন্য কি খাবার টাবার এনেছ। এযে দেখছি কিনে এনেছ। কেনবার কি দরকার? নিজেই নারকেলের নাড়ু করে রাখবে; আর যখন এখানে আসবে সেই নাড়ু দু-চারটি সঙ্গে করে আনবে, অথবা নিজের জন্য যা রান্না কর—তা থেকেই একটুখানি নিয়ে আসবে; তোমার হাতের রান্না খেতে আমার বড়ই সাধ যায়।"

কে সেই ভাগ্যবতী নারী—যাঁর হাতের খাবার খেতে ঠাকুরের এত আগ্রহ?

ইনি হলেন অঘোরমণি—শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে 'কামারহাটির বামনি' বলতেন—গোপালের মা বলেই ইনি বিশেষ পরিচিতা।

ষাট বৎসর বয়স। অল্প কিছুই সঞ্চয় ছিল—তাতেই তাঁর চলে যেত। অতি সাধারণ তাঁর জীবন-যাত্রা। একখানি রামায়ণ ও একটি জপ-মালা—এই দুটিই তাঁর জীবনের পাথেয়। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর জপধ্যান ও এই দুটি নিয়েই তিনি অতিবাহিত করেন। তাঁর ছিল বাৎসল্যের ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি তাঁর গোপালকেই দেখতে পেলেন—তাই যখন আসেন কিছু খাবার নিয়ে আসেন, আর নিজ হাতে গোপালকে খাইয়ে দেন। সারদামণিকে 'বৌমা' সম্বোধন করেন।

একদিন এক বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করলেন অঘোরমণি—দেখলেন তাঁর ইষ্ট দেবতা শ্রীশ্রীবাল-গোপালকে।

এর পরে একদিন মালা জপ করে ইষ্ট-দেবকে প্রণাম করবেন, এমন সময় সম্মুখে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। ইষ্টই বুঝি সশরীরে তাঁর প্রণাম নিতে এলেন!

বিস্মিত অঘোরমণিকে বললেন তিনি, 'আর এত মালা জপ কেন? যা পাবার তা কি এখনও পাওনি?'

'আমার কি সাধন ভজন সব সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে?' জিজ্ঞাসা করলেন অঘোরমণি।

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই'—প্রত্যুত্তরে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

তবুও জিজ্ঞাসা করলেন অঘোরমণি, 'তুমি কি ঠিক ঠিক বলছ, আমার সকল কর্ম শেষ হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত বলছি—তোমার নিজের জন্য সাধনার আর কিছুই আবশ্যক নেই।' নিজেকে দেখিয়ে আবার বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ—'তবে এই খোলটার জন্য প্রার্থনা করতে পার।'

ভাগ্যবতী অঘোরমণি স্বয়ং ইষ্টের কাছ থেকেই তাঁর সাধনার অভিজ্ঞান পেয়ে ধন্য হলেন। জপ-মালা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে অঙ্গুলি-পর্বেই শুধু জপ করতে লাগলেন তাঁর গোপালের মঙ্গলের জন্য।

*　　*　　*

প্রসন্নময়ী, ভানুপিসি, গৌরী-মার সম্বন্ধেও কত কথাই বলা যায়। তাঁরাও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-নাট্যে একে একে এসেছেন। তাঁদের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রীশ্রীমাতা সারদামণি সম্বন্ধে কিছু বলে

শেষ করি। রাণী রাসমণি, ভৈরবী যোগেশ্বরী ও জননী সারদামণি—এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের তীর্থরাজে পরিণত।

রাসমণি সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন, যোগেশ্বরী দ্বারা সাধনার সূত্রপাত, সারদামণিতে তার পরিসমাপ্তি। শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী; নারী-ভক্তবৃন্দের মধ্যমণি। জয়রামবাটীতে প্রথম দেখতে পাই তাঁকে পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহের সময়, তার পরে কামারপুকুরে চৌদ্দ বৎসর বয়সে।

অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন রামকৃষ্ণ। গুরু তোতাপুরী কর্তৃক পরমহংস উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এতদিনে অবকাশ পেয়েছেন কিছুটা। বহুদিন জন্মভূমি দর্শন করেন নি—তা ছাড়া বৎসরে পর বৎসর কঠোর তপস্যায় শরীর ভেঙ্গে গেছে—স্বাস্থ্যলাভের আশায় স্বগ্রাম কামারপুকুরে বেড়াতে এলেন। জয়রামবাটী থেকে সারদামণিও এসে উপস্থিত হলেন। কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ, স্ত্রীকে কিন্তু গ্রহণ করলেন—সাদরে তাঁর পাশে স্থান দিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পরম বিস্ময় এই দেব দম্পতী। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে যত মহাপুরুষ, যত সাধক জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের দেখতে পাই—দাম্পত্য জীবনের পরে তাঁদের সাধক জীবন শুরু। গৃহত্যাগ করে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের অভীষ্ট-সন্ধানে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন একমাত্র ব্যতিক্রম; সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর শুরু হল তাঁর দাম্পত্য জীবন—বিচিত্র, অপূর্ব!

সমস্ত স্নেহ ভালবাসা উজাড় করে তিনি ঢেলে দিলেন সারদামণিকে। সংসারের কত খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন—প্রদীপের সলিতা তৈরী, অতিথি অভ্যাগত পরিচর্যা—এমনকি কেমন করে রাঁধতে হয়, কোন্ তরকারির কি মশলা দিতে হয় তাও তিনি শেখালেন।

রাত্রিতেও শয়ন-কালে কত কথা, কত সদালোচনা। "চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুরই মামা—ঈশ্বরও তেমনই সকলের আপনার। ডাকলেই দেখা দেন। তোমার ডাকেও আসবেন তিনি"—এমনই কতভাবে তিনি শিক্ষা দিলেন তাঁর সহধর্মিণী ভক্তপ্রধানা পরমা শিষ্যাকে।

আর একবার—শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে। জয়রামবাটী থেকে সারদামণি এসে উপস্থিত হ'লেন তাঁর কাছে পথশ্রমে জ্বরে অবসন্ন হয়ে। রামকৃষ্ণ তাঁকে নিজের ঘরে রাখলেন, এবং তিন চারদিনের মধ্যেই সেবা ও পরিচর্যায় তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুললেন।

সারদামণি অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন তাঁর পরমারাধ্যের আন্তরিকতা। জয়রামবাটীতে তাঁকে সকলে 'পাগলের বৌ' বলে ঠাট্টা করত। সেই উপহাসের অসারতা তিনি বুঝতে পারলেন। আরও বুঝলেন—দুর্লভ দেবতাকেই তিনি বরণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণিকে নহবত-ঘরে জননী চন্দ্রামণির কাছে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিন্তু মনে পড়ে গেল গুরু তোতাপুরীর কথা, স্ত্রীকে কাছে রেখে যে ব্রহ্মচর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে সেই প্রকৃত সিদ্ধ।

ডেকে পাঠালেন সারদামণিকে। নিজের কক্ষেই তাঁরও শয্যা রচিত হল।

'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিয়ে যেতে এসেছ?' জিজ্ঞাসা করলেন রামকৃষ্ণ।

'না—তোমাকে ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন সারদামণি।

এ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ পরে বলেছিলেন—'বিবাহের পর মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম—ওঁর মনে যেন পার্থিব ভোগবাসনা স্থান না পায়। কাছে রেখে বুঝতে পারলুম—মা সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন।'

সারদামণি একদিন সরল কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেন রামকৃষ্ণকে 'আমি তোমার কে?'

তেমনই সরলভাবেউত্তর দিলেন রামকৃষ্ণ, 'তুমি সারদা, সরস্বতী। এবারে রূপ ঢেকে এসেছ—পাছে অশুদ্ধ মনে দেখলে লোকের অমঙ্গল হয়। এসেছ বিদ্যা নিয়ে। তুমি জ্ঞানদা, জ্ঞান দিতে এসেছ।'

আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করছেন, জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা, আমাকে তোমার কী বলে মনে হয়?'

রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'যে মা মন্দিরে রয়েছেন, যিনি এই দেহের জন্ম দিয়েছেন এবং এখন নহবতে বাস করছেন, আর এক রূপে তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সত্যই আমি তোমাকে মা আনন্দময়ীর প্রতিমূর্তি বলে জ্ঞান করি।'

এর পরে এঁদের দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় না। মাসের পর মাস এইভাবে কেটে গেল। এক মুহূর্তের জন্য তাঁরা পার্থিব জগতে নেমে এলেন না।

একদিন ভক্ত যোগেন-মাকে দিয়ে সারদামণি শ্রীরামকৃষ্ণকে জানালেন—ঠাকুরের মত তাঁর যদি একটু ভাব টাব হয়—বড় ভাল হয়।

শুনে রামকৃষ্ণ চিন্তামগ্ন। তারপরেই নহবৎ ঘরে হাসছেন সারদামণি, আবার কখনও বা কাঁদছেন। শেষে হাসি নেই, কান্না নেই, সম্পূর্ণ সমাধিস্থা।

সন ১২৮০ সাল, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, অমাবস্যা—ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রি। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ সাধনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে শ্রীশ্রীমা এক আলিম্পিত পীঠে উপবেশন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেবীজ্ঞানে 'ষোড়শী'রূপে যথাবিধানে পূজা করলেন। পূজা-অন্তে উভয়েই সমাধিমগ্ন; এক হয়ে গেলেন পূজক ও পূজিতা। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্জিত সমস্ত সাধন-ফল, জপমালা, দেবীর শ্রীপাদপদ্মে চিরকালের জন্য সমর্পণ করে প্রণাম করলেন। শেষ হল তাঁর সাধনা; এক অপূর্ব পূর্ণতায় রূপায়িত হল দেবদম্পতীর দিব্য জীবন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই একটি রাত্রির নবতম পূজানুষ্ঠানে নারীত্বকে যে সম্মান দিলেন, বিশ্বের কোন দেশ, কোন জাতিই তা কল্পনা করেনি কখনও। ধন্য বাংলা—ধন্য তার ক্ষুদ্র গ্রাম কামারপুকুর ও জয়রামবাটী। আর শত ধন্য দক্ষিণেশ্বর—সেই লীলা-সাধনার নীরব সাক্ষী।

সঞ্চয়ন

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কবীর

প্রেম ফোটে নাক ফুল-বাগিচায়
প্রেম না বিকায় হাটে।
রাজা আর প্রজা অথচ সবারই
প্রেম পেলে দিন কাটে।
প্রেম প্রেম প্রেম—সবাই চেঁচায়,
প্রেম কে চিনিল হায়!
অষ্ট প্রহর সিক্ত যে জন
প্রেমিক বলিব তায়।

দাদূ

সাধু-সন্তের শুধায়ো না জাতি
শুধাও তাহার জ্ঞান,
খাপ দূরে থাক, তরবারি দেখে
দাম করো অনুমান।

রবিদাস

তুমি যেন প্রভু চন্দন আর
আমি যেন তাহে বারি,
উভয়েরি নাথ নিবিড় মিলনে
সুবাস উঠেছে ভরি।
তুমি যেন প্রভু ঘন অরণ্য,
আমি যেন সেথা কেকী,
চকোর যেমন চন্দ্রকে দেখে,
আমি যে তোমারে দেখি।
তুমি যেন প্রভু অমূল্য মোতি,
গাঁথিবার সুতা আমি
সোনা-সোহাগার শুদ্ধ মিলনে,
দুজনে মিলেছি স্বামী!

'কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাম্…'

শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ

গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর প্রিয়সখা অর্জুনকে স্বীয় বিভূতি, অর্থাৎ ঐশ্বরিক ভাবের কথা শোনাচ্ছেন—তখন তিনি কোথাও সম্বন্ধে ষষ্ঠী, আর কোথাও বা নির্ধারে ষষ্ঠী ব্যবহার করেছেন। তিনি যখন বলছেন, 'তেজস্তেস্বিনামহম্,' তখন বুঝতে হবে তিনি সম্বন্ধে ষষ্ঠী ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ 'আমি তেজস্বী পুরুষদিগের অন্তঃকরণস্থিত তেজ।' আবার যখন তিনি বলছেন, 'পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ,' তখন বুঝতে হবে তিনি নির্ধারে ষষ্ঠী ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ, 'আমি পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে মাত্র একজন, যার নাম ধনঞ্জয় বা অর্জুন'।

নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে সর্বত্র সম্বন্ধে ষষ্ঠী ব্যবহার করা হয়েছে :—

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।

জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥

'আমি ছলনাকারীদের খেলিবার পাশা, তেজস্বীদের তেজ, জয়শীল ব্যক্তিদের জয়, অধ্যবসায়ী ব্যক্তিদের অধ্যবসায় এবং সত্ত্বগুণী ব্যক্তিদের সত্ত্বগুণ'।

আবার নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে কেবল নির্ধারে ষষ্ঠী ব্যবহার করে গেছেন :—

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥

'আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিদের মধ্যে একমাত্র দেবর্ষি, যার নাম হচ্ছে নারদ ইত্যাদি'।

সুতরাং এই অধ্যায়ের এক স্থানে, শ্রীভগবান যখন আমাদের জানাচ্ছেন, 'কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা', তখন এই শ্লোকার্ধের—দ্বিবিধ অর্থই ব্যাকরণসঙ্গত হতে পারে। প্রথম অর্থ হচ্ছে—আমি নারীদিগের মধ্যে এই সাতটি নারী,—যাদের নাম হ'ল, কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে—আমি নারীদের জন্মগত এই সাতটি গুণ, যথা,—কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা।

প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে কত সন্দেহ ও অসঙ্গতি দেখা দেয়, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্।

এই সাতজন নারীর মধ্যে তিন জন দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা। দক্ষপ্রজাপতির যে কন্যাটির জগৎ-জোড়া নাম, যাঁকে আমরা সতী বা দাক্ষায়ণী বলে সকলেই জানি তাঁকে বাদ দিয়ে অপর তিনটি অখ্যাত অজ্ঞাত কন্যা ভগবানের বিভূতির মধ্যে গণ্যা হলেন; মূলেই যেন ভুল হয়েছে বলে মনে হয় না কি? কেহ শ্রীকে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী এবং বাক্‌কে ব্রহ্মার শক্তি সরস্বতীরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তা হলে মহেশ্বর-শক্তি—দুর্গা বাদ পড়ল কেন? কি কারণে যে এই সাতজনের মধ্যে ভগবানের ঐশী শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকটিত হয়েছিল তা কেউ বোঝান নি। কেবল নাম কয়টির অভিধানগত অর্থ উল্লেখ করেছেন।

এঁরা সকলেই হচ্ছেন যমরাজের পত্নী—শ্রীভগবান্ স্বর্গ মর্ত্য ছেঁকে অনেক দেবমানবের নাম বাহির করেছেন, কিন্তু তখনকার কালের সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রচলিত মহীয়সী মহিলাদের নাম করেন নি।

প্রাণী অপ্রাণী প্রভৃতির বেলায় ভগবান এক এক দল হতে মাত্র এক এক জনকে বা বস্তুকে বেছে নিয়েছেন, যেমন বৃক্ষসকলের মধ্যে একটি মাত্র বৃক্ষ, যথা অশ্বত্থ, সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে একজন মাত্র সিদ্ধপুরুষ, যথা কপিল। কিন্তু নারীর বেলায় একেবারে তিনি সাতজনকে বেছে নিয়েছেন।

কিন্তু যদি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা যায় তবে কোন দোষ থাকতে পারে না, এবং একটি সোজা

অর্থ আমাদের চিত্তে প্রবেশ করতে পারে। তা ছাড়া শ্লোকার্ধটি যে একবার পড়বে সে-ই বলতে বাধ্য হবে—উহার দ্বিতীয় অর্থই যুক্তিযুক্ত এবং ভগবান দ্বিতীয় অর্থেই ঐ উক্তি প্রয়োগ করেছেন। পুরুষদের বেলায় দেখা যায়, তিনি পুরুষদের নানা দলে বিভক্ত করেছেন এবং এক এক দল হতে এক একটি গুণ বেছে নিয়ে সেই গুণে বিভূতির আরোপ করেছেন, কিন্তু নারীদের আর দলে বিভক্ত না করে সাধারণভাবে—তাদের জন্মগত সাতটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নারীদের চরিত্রগত এই সাতটি গুণ অতিরঞ্জনের আভাস দিয়েছে কি না। একটু অনুধাবন করলেই দেখা যায় নারীমাত্রেই এই সাতটি গুণের অধিকারিণী। এই সাত্বিক বৃত্তিসকল কারো মধ্যে কম, কারো মধ্যে বেশি পরিমাণে থাকতে পারে; কিন্তু ইহারা কম-বেশিভাবে সকল নারীতেই বর্তমান।

অভিধানে বলে, 'একদিগ্‌ব্যাপিনী কীর্তিঃ অর্থাৎ কীর্তি সমগ্র একটা দিক্ ব্যেপে থাকে। নারীর কীর্তি বা সুখ্যাতি বলতে তার সতীত্বকেই বুঝায়। যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার শিক্ষা দিয়েছেন সেই সময় সীতা সাবিত্রী দ্রৌপদী সুভদ্রা শকুন্তলা অরুন্ধতী প্রভৃতির সতীত্ব-কাহিনী ঘরে ঘরে প্রচারিত, সুতরাং নারীর সতীত্বেই যে ভগবানের বিভূতি বিশেষভাবে প্রকটিত, তাহা ভগবান সর্বাগ্রে উল্লেখ করলেন। তারপর শ্রী। নারীর যৌবনশ্রী বাদ দিলেও, তার বাহ্য আকৃতিতে যে একটা শ্রীর ভাব সর্বদাই ফুটে থাকে, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। ইহার উপর ভাষ্য-টীকার প্রয়োজন নেই। বাক্ অর্থাৎ বাক্যে, ধৃতি অর্থাৎ সহ্য করবার শক্তিতে এবং ক্ষমা অর্থাৎ অপকারীর অপকারকে উপেক্ষা করার শক্তিতে—নারী যে পুরুষ অপেক্ষা এক ধাপ উপরে, একথা বললে বোধ হয় কেহ আপত্তি করবেন না; কিন্তু নারীর স্মৃতি ও মেধা কি সত্য সত্যই পুরুষের স্মৃতি ও মেধা অপেক্ষা বেশি? অনেকের এ বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু এই স্ত্রীশিক্ষার যুগে আজকাল মেয়েদের লেখা-পড়া ও পরীক্ষার ফল দেখে মনে হয়, স্মৃতিশক্তি ও মেধাশক্তি পুরুষ অপেক্ষা নারীর কম তো নয়ই বরং বেশি। কিন্তু এখানে ভগবান পুরুষ ও নারীর মধ্যে তো কোন তুলনামূলক আলোচনা করছেন না—নারীর চিত্তের যে কয়টি সাত্বিক বৃত্তি লক্ষ্য করেছেন—সেই কয়টির উল্লেখ করেছেন মাত্র।

অনেকে মনে করেন, ভগবান গীতায় নারীকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। তাঁরা গীতার আর একটি শ্লোকার্ধ উল্লেখ করে—এই বিষয়ের প্রমাণ দেখাতে চান। শ্লোকটি হচ্ছে—"স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।" অনেকে বলেন, এখানে স্ত্রীজাতিকে বৈশ্য ও শূদ্রের সহিত এক পর্যায়ে ফেলায় নারীর উচ্চাসন অস্বীকার করা হয়েছে। বাহ্যতঃ দেখতে তাই বটে, কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত বিচার করলে এ ধারণাকে খণ্ডন করা যায়। তুলনায় দেখা যায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অবসরযুক্ত জীবন যাপন করে থাকেন, সুতরাং তাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের বা সমাধি-সাধনের সুযোগ পান; কিন্তু ব্যবসায়ী বৈশ্য, সেবাবৃত্তিপরায়ণ শূদ্র আর গৃহকর্মে নিযুক্তা নারী অধ্যাত্ম-সাধনার বড় একটা সুযোগ পান না। এরূপ স্থলে বৈশ্য, শূদ্র বা স্ত্রীজাতি যদি ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করতে চান, তবে তাঁদের আয়াসসাধ্য যোগ-সমাধি-পথের পরিবর্তে গীতোক্ত সহজ ভক্তিপথ অবলম্বন করতে পারলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে এবং ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হবে। এই ভাবটিই ঐ শ্লোকের নিহিতার্থ। সর্বজনবন্দিতা সুভদ্রার ভ্রাতা, মহীয়সী দ্রৌপদীর সখা মাতৃজাতিকে অনাদর করতে পারেন না। তিনি দ্রৌপদী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে নারীহৃদয়ে যে সাতটি গুণ দেখেছেন তাতেই ঐশ্বরিক ভাবের আরোপ করেছেন।

শ্রীভগবান যে এখানে সাতটি নারীর নামোল্লেখ করেন নি, পরন্তু নারী মাত্রেরই সাতটি জন্মগত গুণের বর্ণনা করেছেন—তা আর একদিক দিয়ে প্রমাণ করা যায়। সকলেই জানেন গীতা ও চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয় একই, তবে উপাসনার দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ উভয়ের পৃথক্ পৃথক্। অনেক সময়ে গীতা পড়তে পড়তে মনে হয়, এ কথা চণ্ডীতে পড়েছি। আবার অনেক সময় চণ্ডী পড়তে পড়তে মনে হয়, এ কথা যেন গীতাতেও পড়েছি। চণ্ডীতেও বহুবার নর-নারীর অন্তঃকরণস্থিত কতিপয় সাত্ত্বিক বৃত্তিতে ঐশী শক্তি বা বিষ্ণুমায়ার বিভূতি আরোপ করা হয়েছে। স্মৃতি, শ্রী, মেধা ও ক্ষমা (চণ্ডীতে ক্ষান্তি) ভাগবতী শক্তির এক এক কলাবিশেষ,—ইহা দেবতাদের স্তবে বহুবার প্রকাশ করা হয়েছে।

'ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তি ক্ষান্তিরেব চ॥'

দেখা যাচ্ছে এখানে নর-নারীর চিত্তস্থিত কতিপয় দৈবীবৃত্তিকে মহামায়ার বিভূতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

'মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।'

এখানেও মেধাশক্তি যে ভাগবতী শক্তির অংশবিশেষ তা বোঝান হয়েছে।

'যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।'
'যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।'

এখানেও স্মৃতি এবং ক্ষমা ভগবতীর অংশবিশেষ বলেই বর্ণিত।

সুতরাং গীতাকারও কীর্তি শ্রী প্রভৃতি নারীর সাতটি উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে দেবত্বের আরোপ করে নারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন—ইহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়।

গীতা ও চণ্ডী যখন একই ভাবে অনুপ্রাণিত তখন চণ্ডী নারীকে যে উচ্চাসন দান করবে গীতাও নারীকে সেই পদবী দান করবে—ইহাই স্বাভাবিক। অতএব চণ্ডীতে যখন দেখতে পাই—

'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—অর্থাৎ জগতে যত স্ত্রী আছে সকলেই ভগবতীর অংশস্বরূপ, তখন গীতাতে নারীর যে সাতটি গুণ ভগবানের বিভূতিরূপে বর্ণিত হবে—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

আমাদের বাংলাদেশ সেদিন পর্যন্ত পুরাণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। সুতরাং বিগত শতকে এবং বর্তমান শতকের প্রথমপাদে অনূদিত বহু গীতায় শ্লোকটির পুরাণ বর্ণিত প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ কীর্তি প্রভৃতি সপ্ত নারীকে পৌরাণিক দেবীরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলার প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি গীতার সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত, কিন্তু সকলেই পকেট-সংস্করণ পাঠে অভ্যস্ত। ঐ শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ কি তলিয়ে বোঝেন না, পুস্তকে যা আছে তাই মুখস্থ করে যান।

কিন্তু চণ্ডী ও গীতার ঐ দুটি উক্তি অর্থাৎ—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' এবং 'কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাম্' নারীজাতির পক্ষে magna charta বা মহাধিকার-পত্র বলেই স্বীকৃত হওয়া উচিত।

অন্ধ

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

আমি যারে চাই,
খুঁজে নাহি পাই,
আঁধারে ঘুরিয়া মরি সারাটি জীবন।

হয়তো সে আশে পাশে
নিয়তই যায় আসে
দেখিতে না পাই তায়, নাই সে নয়ন।

প্রকৃতি-সন্ধানী বিভূতিভূষণ

শ্রীনীলকান্ত রায়, এম-এ

'জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠঘাট ·········অস্ত সূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্যতা······জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়······

সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সাধারণের প্রাণে পৌঁছে দেওয়া। তারা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দ-বার্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে······এই কাজ তাদের করতে হবেই······তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা······'

ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে ভাগলপুরে 'পথের পাঁচালী' রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সেদিনকার দিনলিপিতে তাঁর উক্তরূপ চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

বস্তুতঃ সাহিত্যিকের এই মহৎ অনুভূতি তাঁর জীবন দিয়েই তিনি অনুভব করেছিলেন। আনন্দ-লোকের বার্তা তিনি দিকে দিকে প্রেরণ করবার আগে আপনার অন্তরলোকেও তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। চক্ষের সম্মুখে সহস্র আনন্দবস্তু তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজমান থাকলেও, সবার কাছে সহজে তারা ধরা দেয় না—দৃষ্টির বন্ধনে তাদের বাঁধা সহজসাধ্য নয়। বিভূতিভূষণ তাঁর অনন্যসাধারণ দৃষ্টি-প্রাখর্যে সেগুলি নিজে দেখেছিলেন আর দেখিয়েছিলেন বিদগ্ধ সমাজকে। সেই হিসাবে সাহিত্যিকের কঠোর সাধনা তাঁর জীবনে সিদ্ধির সাফল্য আনতে পেরেছে।

বার্নাড শ তাঁর Sanity of Art গ্রন্থে Montaign সম্পর্কে এক মন্তব্য করেছেন, 'He was the greatest artist of all—he knew the art of living. (তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় শিল্পী—তিনি জানতেন জীবনযাপনের কৌশল)। শরৎ-রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে বিভূতিভূষণের প্রতি এই কথা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাঁর অন্তরের কবিধর্ম—তাঁর জীবনের অনুভূতি, প্রেরণা ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর শিল্পায়ন—তাঁর জীবনায়নকে কেন্দ্র করেই গ্রথিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অন্তঃপুরুষের আত্মপ্রকাশ তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এক বিশিষ্ট আসন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। বিভূতিভূষণের চক্ষে, হৃদয়ে ও লেখনীতে ছিল অসীম কৌতূহল—সেই কৌতূহলের দুর্বার আকর্ষণী তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে প্রকৃতির অনন্ত-বিস্ময়ভরা চিরন্তন সৌন্দর্যভাণ্ডারের দিকে। বিশ্বরহস্য সন্ধানের জন্যে অভিযান শুরু হয়েছিল তাঁর মর্মের নিভৃতলোক থেকে। সেই রহস্য-সন্ধান-অভিযানে কী পেয়েছিলেন তিনি?—তাঁর কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের কল্পনা, পরিণত জীবনের উপলব্ধি। সেগুলির প্রত্যেকটিই ছিল তাঁর সমস্ত বিস্ময়-বোধের দৃষ্টির প্রেরণার কেন্দ্রীভূত। বিভূতিভূষণের কবি-মানস তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এমনই সাবলীলভাবে জড়িত ছিল যে তাঁর জীবনের পূর্ণ প্রকাশ অনবদ্য রসোপলব্ধির মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছিল। ব্যক্তি ও কবিমানসের যুক্ত প্রয়াস-প্রেরণা-সাধনার মধ্যে তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনের চিরজাগ্রত স্বপ্ন ও অসীম কৌতূহলের সঞ্জীবনী-সঞ্জাত পরিবেশ তাঁর কল্পলোকের মূর্ত ছবি নিয়ে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে অক্ষয় স্পর্শ রেখে গেছে।

এমার্সন বলেছেন, 'Every literary man should embrace solitude as a bride—' (প্রত্যেক সাহিত্যিক নির্জনতাকে বরণ করে নেবে বধূর মতো)। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে আছে "এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে, মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। গ্রামপ্রান্তের সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হ'ল ওদের সঙ্গে কতদিনের কত স্মৃতি যে জড়িত—সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আদুরী-ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা, ইন্দির-ঠাকৃরুণের কথা,…কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি,…… সেই পিটুলিগোলা-পানকারী দরিদ্র বালকের, পল্লী-বালা 'জোয়ানের', কতকাল আগের সে সব ইংরেজ বালক-বালিকার কথা—গাংচিল পাখীর ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল, Cape Wanএর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি,……কত কি, কত কি!" প্রকৃতির অসীম রূপ-রস-লীলা বিভূতি-ভূষণের শিল্পী-কবির চক্ষে এক স্বপ্নমাধুরী-ভরা মায়া-অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছিল। তাই তাঁর সাহিত্য-তীর্থযাত্রায় তাঁর লেখনীর প্রসন্নতা ও রসমধুরতা এক অপরূপতার আবেশে ভরপুর। আধুনিকতার চলার পথে তাঁর ব্যতিক্রম এইখানেই—তাঁর তীর্থযাত্রা ছিল শাশ্বত-সন্ধানী। তার মধ্যে বিতর্কের অসিখেলার রোমাঞ্চ নেই, বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংশয় নেই, জীবন-সমস্যার বিরাট জিজ্ঞাসা নেই; আছে শুধু প্রকৃতির লীলা-নিকেতনের দ্বার-বাতায়নের উন্মুক্ততার মধ্যে রহস্য-বস্তুর বিন্যাস, চির বিস্ময়ের রসপাত্র দুরধিগম্য আনন্দলোকের প্রাণপ্রাচুর্য। প্রকৃতি-প্রেমের সুরলোকের আনন্দ-সঙ্গীতের ঝঙ্কার তাঁর জীবনরসে মুক্তির আস্বাদ এনেছে, তাঁর অনুভূতির জগৎকে কানায় কানায় পূর্ণ করে রেখেছে।

মূর্ছিত মানবাত্মাকে জাগ্রত করতে প্রকৃতির চেয়ে শক্তিময়ী আর কেউ নেই। প্রকৃতির সাথে পরিচয়ের ছত্রে ছত্রে শুধু আপন আত্মার, অন্তরের সত্তার বোধই যে জেগে উঠে তা নয়, প্রকৃতি প্রেমের মাধুরী-স্পর্শ জীবনে অনন্তের উপলব্ধি আনতেও সক্ষম। বিভূতিভূষণের জীবনেও তার সম্যক্ সংঘটন হয়েছিল। তাঁর কবিদৃষ্টির সামনে প্রকৃতি তার অতিপ্রাকৃত-লোকের রহস্য-মহলের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। একদিন আকাশে কালবৈশাখীর ঝড় দেখে ইছামতীর জলে তিনি তরঙ্গের উল্লাস উপভোগ করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল, —"এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহ্ণ ও নীরন্ধ্র অন্ধকার-ময়ী রাত্রির কথা—প্রকৃতির মধ্যে এমনি মিশে হাত ধরাধরি করে চলা, ঐ শ্যামল ডালপালা-ওঠা শিমূল গাছ, সাঁই-বাবলা গাছ—এই তো আমি চাই। ……নদীজলে নেমে কেমন একটা ভক্তির ভাব এল। সমস্ত দেহমন যেন আপনা আপনি নুইয়ে পড়তে চাইল। এই ধরনের ভক্তি একটা বড় Bliss, জীবনে হঠাৎ আসে না।………আমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই তাঁর ঐ লক্ষ বিরাট রূপের মধ্য দিয়ে।" আবার তিনি সূর্যের প্রখর দীপ্তির মাঝে, অনন্ত আকাশের নীল শূন্যতার মাঝে অসীম অখণ্ডের সন্ধান পেয়েছিলেন! 'মাথার ওপরকার ঐ ময়ূরকণ্ঠী রঙের আকাশ, ঘাসের নিচে এই বিচরণশীল পোকামাকড়, ছোট ছোট ঘাসের ফুল, ঐ উড়ন্ত চিল, বটের ডালে লুকানো ঐ 'বউ-কথা-কও' পাখীর ডাক, কত বিচিত্র বনলতা, বনফুল—ঐ সূর্য থেকে পাচ্ছে এদের জীবন, রঙ ও আলো। কিন্তু এই সবের পিছনে, সূর্যেরও পিছনে এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীর সব রূপ-রস-গন্ধের পিছনে যে বিরাট অতিমানস শক্তির লীলা—তার কথা কেবলি এমনই দুপুরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে।……তখন যেন মনে হয়, এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক তারে গাঁথা……অদৃশ্য যে লতার এই সব ফুল নিয়ে মালা গাঁথা হয়েছে, আমি

তাদের দল থেকে বাদ পড়িনি, তাদেরই একজন, বিশ্বের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপিত হয় মনে মনে।"

প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে একেবারে লীন করে দেওয়ায় যে অসীম অব্যক্ত আনন্দ আছে, তা' তিনি মর্মের নিভৃত লোকেই অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে পল্লীতে, গ্রামে—বাংলার শ্যামল পরিবেশের মধ্যে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ তিনি গভীরভাবে পেয়েছিলেন বলেই তাঁর সাহিত্যদৃষ্টির প্রয়াস অকৃত্রিমভাবে মানবহৃদয়কে মুগ্ধ করতে পেরেছে। বিভূতিভূষণ তাঁর ইছামতীকে ভালবাসতেন; সে ছিল তাঁর বাল্য কৈশোরের এবং বোধ করি বা যৌবনেরও খেলার সাথী। ইছামতীর প্রবাহধারার কলধ্বনিতে মুগ্ধ বালক; কৈশোরের অবিরাম কলোচ্ছ্বাস-মুখরিত তীরভূমি তাঁর সৃষ্টি-প্রবাহে স্থিতি আনতে পেরেছে—প্রশান্তি আনতে পেরেছে। পল্লীর জীবনধারা তাঁর সাহিত্যের জীবনবেদ; প্রকৃতির বহুপ্রকাশ, তরুলতা ফল ফুল, পাখীর কূজন, বন জঙ্গল, শান্ত পরিবেশ তাঁর সৃজনী শক্তির মন্দাকিনী। পরিণত জীবনে 'পথের পাঁচালী'র 'অপরাজিত' পথিক 'ইছামতী'র তীরে তীরে বেড়িয়েছেন, বনপ্রান্তে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে কবিচিত্তের তৃষা মিটিয়েছেন, কঠোর নিষ্ঠাচারীর ব্রত নিয়ে 'হে অরণ্য কথা কও' বলে 'আরণ্যকে'র ন্যায় 'বনে পাহাড়ে' অনুনয় করে ফিরেছেন, তাঁর 'দৃষ্টি প্রদীপ' প্রকৃতি-রচিত মনোরম ব্রততী-বিতানের তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ রশ্মির আলোকমায়া রচনা করতে পেরেছে, 'তৃণাঙ্কুর'ও কবি-দৃষ্টিতে মনোহারিত্বের অমরাপুরী সৃষ্টি করেছে।

বিভূতিভূষণের কবিমানস সর্বতোভাবে ছিল প্রকৃতির রূপ-রস-সন্ধানী। তাঁর এই সন্ধানী মানস-ধর্ম তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য-তীর্থ পরিক্রমার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে আর এক প্রকৃতির সন্ধান ক'রে। সে অনুসন্ধানের কেন্দ্র হচ্ছে শিশুর প্রকৃতিবোধ, শিশুর মানসিক গতি-প্রগতি-পরিবেশ-বোধ। তাঁর অপরিসর জীবনের বহু অধ্যায় এই রসে ভরে রয়েছে। শিশুর মনের গভীর কোণে তিনি প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিশুর হৃদয়রাজ্য তাঁর কাছে অনধিকৃত ছিল না। শিশুরা কী ভাবে, কী বোঝে, কী বুঝতে চায়, তার তত্ত্ব তাঁর কাছে দুরধিগম্য ছিল না। অসম্ভাব্যতার অবিশ্বাস—শিশুর মনে কখনও সংশয় আনতে পারে না—তার বহুদূর-প্রসারী কল্পনার তীব্রালোকে সবকিছুই তার কাছে সম্ভব বলে ধরা দেয়। পাখী-ডাকা গ্রামের মুগ্ধমতি বালক 'অপু'র রামায়ণ-মহাভারতের দেশের পথ-পরিচয় তাই নিছক কবি-কল্পনা নয়। শিশুমনের কাছে তা' একান্ত বাস্তব বলেই তার অনুভূতির মধ্যেও রোমাঞ্চ আছে। মনোজগতের 'নিশ্চিন্দি-পুরে' অপু, পটু, রাণী, সুনীল, নীরেন ও দুর্গা নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে।

বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনের কর্মধারার মধ্যে শিশুর সান্নিধ্য ছিল। সে নৈকট্যের মধ্যে থেকেই তিনি পরম বিস্ময় ও আনন্দ আহরণ করতে পেরেছিলেন। শিশুদের সঙ্গে মেলা-মেশা তাঁর জীবনে আনন্দের স্পর্শ সঞ্চার করেছে; সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে প্রেরণা যুগিয়েছে। অতি সাধারণভাবে তিনি তাদের সঙ্গে মেশেন নি—অতি অসাধারণ-ভাবে তিনি নিজেকে তাদের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তিনি শিশু-মনোরাজ্যের গভীর গহনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন—এটা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে—তার প্রধান কারণ শিশুর প্রতি তিনি ছিলেন দরদী, অপরিসীম সহানুভূতির প্রকাশে উচ্ছ্বসিত। শিশুর মনের ভীরুতা দূর করার জন্যে, চিত্তে সাহসিকতা সঞ্চারের জন্যে, নিবিড় নির্মল আনন্দ সৃষ্টির জন্যে—তিনি তাঁর শিশু-সাহিত্যে বহু খোরাক রেখে গেছেন। জানিয়েছেন তিনি তাদের স্নিগ্ধশ্যামল পল্লীগ্রামের আনন্দবারতা, শহর-জীবনে সে সরল সাবলীলতার একান্ত অভাব।

নাগরিক জীবনকে স্বাভাবিক করতে গেলে অধিক পরিমাণে মুস্কিল বাঁধে, কল্পনায় বাস্তবের প্রলেপ দিয়ে 'চাঁদের পাহাড়' পাওয়া সম্ভব, 'হাজরি খুড়ির টাকা'কে কেন্দ্র কেমন গ্রাম্য মানুষগুলি ঘুরেছে, সাহসের উত্তেজনায় শিশুমন সতেজ হয়ে কেমন বিপদ হতে উদ্ধার পায়,—এমনই বহু সরস তথ্যের 'হীরামাণিক' শিশুর মনের মণিকোঠায় ভরে দিয়েছেন,—যেগুলি চিরদিন চিরন্তন শিশুমনের কাছে নিরন্তর জ্বলজ্বল করবে। শিশুর প্রকৃতি-বোধের প্রয়াসে তিনি কোথাও অলীক কল্পনার আশ্রয় নেন নি। শিশুমনকে বৃহত্তর কিছুর দিকে অনুপ্রাণিত করবার বাসনা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ছত্রে ছত্রে, এইখানেই শিশুদের প্রতি তাঁর অপূর্ব নিবিড় আন্তরিকতা। মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দিতে, সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্তে সাহায্য করতে তিনি সব সময়েই তাঁর শিশু-সাহিত্যে এক রহস্যময় উন্মাদনা ও প্রেরণার সন্ধান দিয়েছেন। বালকমন বোঝে—যা কিছু অভিনব, যেটা তার অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই বালক-মন যাতে জগতের কল্যাণমুখী প্রবৃত্তিতে সার্থকভাবে রূপান্তরিত হতে পারে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিস্ময়কর স্পর্শ যাতে লাভ করতে পারে, তার জন্তে তাঁর সাধনা ছিল ক্লান্তিহীন। অতি সহজে, অতি স্বাভাবিকভাবে, শিশুর পরিচিত অভিজ্ঞতা-লব্ধ পরিবেশের মধ্যে তার মনে অনুভূতির তীব্রতা জাগিয়ে তোলবার জন্তে যে বিন্যাস সেটাই হচ্ছে বিভূতিভূষণের শিল্পতুলিকার রঙের বর্ণচ্ছটা। এই পৃথিবীটা যে আশাতীত সুন্দর, অত্যন্ত প্রিয়, অতিশয় মধুর—এই উপলব্ধির ব্যাকুলতা, ব্যাপকতা, মনের কোণে এই গোপন সত্য, যাতে সঞ্চার হ'তে পারে তারই ইঙ্গিত তাঁর লেখনীর ছত্রে ছত্রে। এই জগতের আশ্চর্য লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হ'লে বাইরের পরিচয়-পত্রের দরকার নেই—অন্তরের পরিচয়-পত্র পেলেই হ'ল। আর সেই পরিচয় শিশুর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যেমন হয়, তেমনি বড় বয়সে ঘটে না। সৌন্দর্য-শিল্পের মোহনরূপকে যদি নিজের চৈতন্যের সঙ্গে একাঙ্গীভূত করতে হয় তাহলে শৈশবই মানবজীবনের আদি পীঠস্থান। অপরের মনে অনুভূতি জাগিয়ে তোলবার সত্যি-কারের শিল্পী মনোভাব বিভূতিভূষণের ছিল বলেই তাঁকে প্রকৃত আর্টিষ্ট বলা যেতে পারে। প্রকৃতি-প্রেমের সঙ্গে মানবহৃদয়ের ভালবাসা—পাশাপাশি থাকলেই মানুষের জীবনের রথ স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলে। শান্ত সরল ও সাবলীল শিশুর মানসপ্রকৃতি, কিন্তু তবুও তাকে ঠিকভাবে গড়তে হ'লে প্রয়োজন—প্রকৃতির প্রেম এবং মানবহৃদয়ের ভালবাসা। বিভূতিভূষণের সৃজনী প্রতিভা এদের থেকে বঞ্চিত ছিল না।

বিশ্বপ্রকৃতির নিসর্গশোভা আর মানবপ্রকৃতির আন্তর সৌন্দর্য সন্ধান করে বিভূতিভূষণ তাঁর অনেক পরিচয়ের মধ্যে আপন পরিচয়কে দৃঢ় ও সুসমঞ্জস করে গেছেন। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার বিশ্লেষণ সমাজ-জীবনের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন হ'তে ভিন্নতর—তাই সে বিতর্ক অকথিত থাকুক। মানুষের হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে আনন্দের লহরী তুলতে তিনি পেরেছিলেন, সেই সত্যটাই চিরজাগ্রত হয়ে থাকুক। অধিকাংশ মানুষের জীবন তার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়, কিন্তু অল্পসংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে তার দেহাতীত জীবন নূতন পরিচয়ের সূচনা দেয়। সেই সব মনীষীদের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের, প্রতি পরিচয়ের, প্রতি পদক্ষেপের জীবনে যা দেখা যায়, যাকে চেনা যায়—তাকে অতিক্রম করে আরও এক নব পরিচয় ফুটে উঠে। মৃত্যুর আলোক জীবনের অপ্রকাশিত অন্ধকারের দিককে উদ্ভাসিত করে তোলে। বিভূতিভূষণের তাই মৃত্যু ঘটেনি, তাঁর নশ্বর জীবনের অন্তে মৃত্যু তাঁর অতি পরিচিত সত্যকার মানুষকে প্রকাশ করে দিয়েছে। সম-

সাময়িক সাহিত্যিকগণের সমকক্ষতাকে ছাড়িয়ে তিনি আজ মুক্ত মনের ধ্রুবলোকের যাত্রী। তাঁর সাহিত্যে তিনি রেখে গেছেন আনন্দ-চঞ্চল প্রাণবন্যা, এক আলোকোজ্জ্বল আদর্শ, অনেক বেদনা-দুঃখ-বিরহের মাঝে আনন্দের জ্যোতি ও সুখের বার্তা। তিনি যে সম্পদ দিয়ে গেছেন—বাংলার মানুষ চিরদিন তা' বুক ভরে রেখে দেবে; তবু তাঁর অবাধ মুক্ত সৃষ্টি যেভাবে আকস্মিকরূপে ব্যাহত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের কাছে তা অপূরণীয় ক্ষতি। সেই জন্যেই তাঁর কথা স্মরণ করে গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে এক দুঃখের সুরও প্রাণে বেজে ওঠে:

'আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীতরূপে আপনারে ক'রে গেলে দান
দূর কালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তা'রা যা হারাল তা'র সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা?'

গরলামৃত

শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

আছে তো কলুষ-কল্মষজাল এই ধরণীরে নিয়ত ঘেরি,
আছে মিথ্যার মধুর ছলনা বাজে শাঠ্যের বিজয়-ভেরী।
　মহাদানবের প্রতারণা-জালে দুর্গত সীতা পায় না ত্রাণ—
　ছিন্নপক্ষ জটায়ু হতায়ুঃ ব্যর্থ কি তার আত্মদান?
　ভুলিনি তো আজো বারণাবতের কলঙ্কময় সে ইতিহাস,
　জতুগৃহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কুরুকুল-কালি হয়নি নাশ।

মন্ত্রণাদাতা শকুনিও ছিল—তারি পাশে ছিল বিদুর ধীর;
জীবন-মৃত্যু পাশাপাশি যেন—একই নদীর দুইটি তীর।
লভে ব্যর্থতা জটায়ু বিদুর—তবু ধর্মেরই হয়েছে জয়;
বল-দর্পীর প্রবল ঘাতেও ন্যায়ের শক্তি হয়নি ক্ষয়।
　সোনার লঙ্কা পুড়ে হ'ল ছাই—মহাভারতের শ্মশান-মাঝে
　　মহাজীবনের সন্ধান দিতে জীবনেশ্বর নীরবে রাজে।
　প্রলয়ের মাঝে তাই যেন বাজে উদার মধুর গভীর তান
　　শব-সাধনার মাঝে জাগে শিব, রুদ্র জাগায় নূতন প্রাণ

কোন্‌টি প্রশস্ত ?

স্বামী জীবানন্দ

মস্তিষ্ক না হৃদয় ?

মস্তিষ্কের মর্যাদা বেশি, না হৃদয়ের ? মানুষের মস্তিষ্ক এমন একটি জিনিস—যার সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে বড় বড় বৈজ্ঞানিকও কূলকিনারা পান না। একটি ছোট শিশু শশিকলার মতো বড় হতে থাকে ; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার আগ্রহও তার বাড়তে থাকে। দিনের পর দিন কত যে নতুন জিনিস সে শেখে তার ইয়ত্তা নেই। কিছু শুনলে বা দেখলে মনের মধ্যে একটি ছাপ পড়ে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে এক একটি রেখা অঙ্কিত হতে থাকে। সারা জীবনে অজস্র জিনিস দেখা শোনা ও শেখা হয় এবং তাদের প্রত্যেকটি মস্তিষ্কের মধ্যে নিজস্ব ছাপ রেখে যায় ; ভাল মন্দ সব কিছুরই রেখা মস্তিষ্কের মধ্যে স্থান পায়।

শৈশব থেকে শুরু করে একটি মানুষের জীবন শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, তার মস্তিষ্কের মধ্যে যে বিপুল পরিমাণ জিনিস স্থান পেয়েছে—সেই পরিমাণে কিন্তু মস্তিষ্কটির আকার বা আয়তন বৃদ্ধি পায়নি। কোন একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মস্তিষ্কের আয়তন বাড়ে, কিন্তু বহু বৎসর অবধি মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা অব্যাহতই থাকে। স্বদেশের বিদেশের বহু শিক্ষণীয় বিষয়—রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, ললিতকলা, সঙ্গীত, ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি আজীবন শিক্ষা চলতে পারে ; কারণ 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।'

শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা সকলেই সচেতন, তাই মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যের দিকে যেন আমাদের লক্ষ্য নেই ! শিক্ষার প্রচলিত মাপকাঠি ডিগ্রি বা বহু বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয় অথবা অভিজ্ঞতা অর্জন—সন্দেহ নেই, কিন্তু ইহাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। হৃদয়ের প্রসারতাই প্রকৃত শিক্ষার পরিমাপক হওয়া উচিত। যিনি যে পরিমাণে হৃদয়বান্‌ তিনি সেই পরিমাণেই শিক্ষিত বলা যেতে পারে। দেব-শিশুর মত সুন্দর যে ছোট্ট ছেলেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত—সদা সত্যকথন, মধুর ব্যবহার, সহানুভূতি, পরোপকার-স্পৃহা, দয়া প্রভৃতি মহৎ গুণে বিভূষিত ছিল—সেই-ই তো এখন ব্যারিষ্টার হয়েছে—হাঁ-কে না করছে, আইনের তর্কজালে সত্যকে মিথ্যা করতে পারদর্শী প্রসিদ্ধ আইনজীবী বলে পরিচিত, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তার ব্যক্তিত্ব সংকুচিত—এখন তার হৃদয়বত্তার কোন বালাই নেই, যত দিন যাচ্ছে ততই যেন সে হৃদয়হীন ও শুষ্ক যুক্তিপরায়ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে !

ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট মস্তিষ্কের অদ্ভুত ধারণ-ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময় হওয়া স্বাভাবিক, কারণ এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা সক্রিয়, কিন্তু হৃদয়েরও যে এইরূপ ধারণক্ষমতা রয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা ক'জন অবহিত ? হৃদয় যেন একটি শেওলা-ঢাকা বদ্ধ জলের ছোট ডোবায় পরিণত হয়েছে ! সংকীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধির আকর এই হৃদয়টি কেবল 'আমি, আমার' ভেবেই আকুল ! কোন সৎচিন্তার স্থান যেন এখানে নেই ! যে হৃদয়ের আজ এই অবস্থা তাকেই যদি উপযুক্ত সৎভাব ও পরের কল্যাণ-কামনায় পূর্ণ করতে চেষ্টা করা যায়—তা হলে সে-ই ক্রমে ক্রমে বিশাল হতে বিশালতর হবে। বদ্ধ জলের ক্ষুদ্র জলাশয়—স্বচ্ছ সরোবরে, সরোবর সাগরে, সাগর যেন মহাসাগরে রূপান্তরিত হতে থাকবে ; প্রশান্ত নির্মল অক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র !

আমিত্ব বুদ্ধির বহু উর্ধ্বে গিয়ে ক্ষুদ্র হৃদয়ই একদিন মহৎ হৃদয়ে পরিণত হবে—যখন সকলেই আপনার জন—'বসুধৈব কুটুম্বকম্', 'স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্'—এই অনুভূতিতে মন প্রাণ ভরপুর হয়ে উঠবে। তাই উপনিষদের ঋষি বললেন—'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। অনন্ত পথের যাত্রী আমরা, ঝড়ঝঞ্ঝায় দুর্গম দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে। পিছন ফিরে না তাকিয়ে 'স্বর্গাৎ স্বর্গম্', উন্নতি থেকে ক্রমোন্নতিতে আরূঢ় হব—এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

মস্তিষ্ক ও হৃদয়—উভয়েরই উৎকর্ষ প্রয়োজন মানবমনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য। একদিকে ক্ষুরধার মেধা ও অপরদিকে আকাশ-উদার হৃদয়, উভয়ের শুভ মিলনে যে অনুভূতি—তাই মর্ত্যবাসীকে অমরত্বের সন্ধান দেয়—তাকে স্মরণীয় বরণীয় করে।

উর্বর মস্তিষ্ক ও ক্ষুরধার বুদ্ধি—সকলের হয় না; বহু চেষ্টার দ্বারাও মস্তিষ্কের সেরূপ উন্নতি দেখা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের প্রসারতার জন্য কিছুই ব্যয় করতে হয় না। মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি, দুঃখে সমবেদনা, অন্তরে অপরের কল্যাণকামনা—সকলের পক্ষেই সম্ভব। তাই মানবজীবনে সর্বোপরি এবং সর্বাগ্রে হৃদয়বত্তাই কাম্য।

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এই রকম মানুষ যার থাকবে ক্ষুরধার মস্তিষ্ক, অনন্ত হৃদয়বত্তা এবং প্রচণ্ড কর্মশক্তি।

হাসি না অশ্রু?

হাসি ও অশ্রু, দুই-ই মানুষের সুখদুঃখের সাথী। সুখের সাধারণ সহচর হাসি, দুঃখের অশ্রু। আবার সুখের সময়ে—আনন্দের সময়েও অন্তরের অমিয়-ধারা অশ্রুরূপে নয়নকোণে প্রবাহিত হয়। আমরা হাসিরই মূল্য দিই বেশী, অশ্রুর তত দিই না। অশ্রুর মূল্য কিন্তু কম নয়। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা—মর্মভেদী শোক লাঘব হয় অশ্রুর বন্যায়। অনুতাপের অনলে যে হৃদয় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার প্রায়শ্চিত্তের পরিসমাপ্তি চোখের জলে! পাপে, অকৃতকার্যতায়, ব্যথা-বেদনায় যখন পদে পদে লাঞ্ছনা গঞ্জনা, তখন তো মুখে হাসি ফোটে না—দুনিয়ার সব বন্ধু পরিত্যাগ করে চলে যায়,—জগৎ শূন্য বলে মনে হয়, তখন রক্ষা করে কে? অশ্রু। অশ্রুই তখন সব কালিমা মুছিয়ে দিয়ে হৃদয় মন শুদ্ধ পবিত্র করে দেয়। যখন সংসারের সব কিছু অসার—মায়ামোহে আর মন বদ্ধ হতে চায় না—সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষালাভ করতে করতে এমন একটি জিনিসের জন্য ব্যাকুলতা আসে—যা না পেলে যেন আর কিছুতেই শান্তি নেই—তখন সেই ব্যাকুলতার বাহ্য প্রকাশ নয়নের অশ্রুধারা। যার জন্য এত ক্রন্দন তখন আর তা দূরে থাকে না, কাছে এসে ধরা দেয়—দীর্ঘ তিমির রাত্রির অবসানে উষার আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, অরুণোদয়ে পূর্বাকাশ রক্তরাগে রঞ্জিত হয়।

যার অধরে অবিরত মধুর হাসির রেখাটি লেগে আছে—সকলে যে তার সাহচর্য কামনা করে তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু যার ঐকান্তিকতা অশ্রুকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয় তার আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে—চিত্তকে অভিভূত করে, তার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা দুঃসাধ্য। ছেলের কান্না শুনে তাই মা ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নেন। সংসারের সুখৈশ্বর্যে পরম নিশ্চিন্ততায় যতদিন সন্তান হাসির আনন্দে ভুলে থাকে ততদিন যেন মাতৃকৃপা দুর্লভই থেকে যায়, কিন্তু যে মুহূর্তে নিশ্চিন্ততার মোহ কাটিয়ে জগন্মাতার জন্য ব্যাকুলতায় ক্রন্দনে বুক ভরে ওঠে তখন মা তাঁর অশেষ কল্যাণকর পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিয়ে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার চিরতরে অবসান করে দেন। অভাব বা দুঃখই অশ্রু আনে, আর অশ্রু

টেনে আনে মাকে। তাই হাসি অপেক্ষা ব্যাকুলতার অশ্রু, প্রেমের অশ্রুই কাম্য।

ভোগ না ত্যাগ?

ভোগ করতে গেলে ত্যাগ হয় না; আবার ত্যাগী হতে হলে ভোগ করাও যায় না। ভোগ আর ত্যাগ—দুটি বিভিন্নমুখী ভাব। একটিতে আছে সংসারের যা কিছু সুন্দর ও সুখময় তার দিকে দুর্বার আকর্ষণ—অপরটিতে সকল আকর্ষণীয় বস্তু হতে সম্পূর্ণ উপরতি। একটিকে বরণ করে সুখের হিল্লোলে গা ভাসিয়ে দেওয়া—অন্যটিকে আশ্রয় করে সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায় উদাসীন হওয়া ও স্রোতের গতিকে বিপরীত মুখে ধাবিত করবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। ত্যাগের প্রয়োজন কি? বেশ তো আছি—সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটছে। মন যা চায় তাই নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকি না কেন? কেন তাকে অনর্থক বিব্রত করা? সংসারের আরও দশ জন যা করছে—ধন জন মান নিয়ে সদা ব্যস্ততার মধ্যে দিন যাপন—সেই তো বেশ! কেন মিছামিছি বিপরীত পথে যাওয়া—যেখানে আছে নিরন্তর অন্তরে দ্বন্দ্ব আর বাহিরে ব্যর্থতা!

কিন্তু সহজ সরল ভোগের পথ মনের একান্ত কাম্য হলেও সেইটিকেই সব সময় মন মেনে নিতে চায় না—এমনি আশ্চর্য তার গঠন। যখন দেখা যায় ইন্ধন পেতে পেতে ভোগাগ্নির লেলিহান জিহ্বা অবাধগতিতে বেড়েই চলেছে—থামতেই চাইছে না—একশ হ'ল তো সহস্রের জন্য ভাবনা, সহস্র মিলল তো লক্ষের জন্য উন্মাদনা, আরো চাই আরও—তখন আর মন নিজেকে বাসনা-অনলে দগ্ধ হতে দিতে চায় না, বিদ্রোহ করে ওঠে,—পিছন ফিরে তাকিয়ে পর্যালোচনা করে—কতদূর এসেছি, কোথায় চলেছি, কেন? এই কী শান্তির পথ? তখনই ক্লান্ত মন যেন ঘরে ফিরতে চায়—বলে: না না অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, পথ ভুলে অনেক দূর তো এসেছি, আর না। দেখে শুনে ঠেকে অনেক শিক্ষা হয়েছে, এইবার প্রকৃত শান্তি চাই; সুখ চাই না, ভোগ চাই না।

ত্যাগের শক্তি অসীম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক কর্মের মধ্যেই তা উপলব্ধি করি। সংসারের কেউ কোন কিছুর অধিকার ত্যাগ করলে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ছোট ছোট শিশু বা বালকের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বা ব্যবহারের জিনিস যখন নিজেদের ভোগাংশ থেকে অপরের জন্য ছেড়ে দেয় তখনই তাদের একটি আত্মতৃপ্তির অনুভূতি হয়। উপযুক্ত পরিবেশে অনুকূল আবহাওয়ায় এই ত্যাগের ভাবটি সযত্নে লালিত হলে ভবিষ্যৎ জীবনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে—সমাজে বা রাষ্ট্রে নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ জীবন যাপন করা সম্ভব হতে পারে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনধারণ ও সামাজিকতা রক্ষার জন্য যতটুকু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন ততটুকুর জন্যই আমাদের ভোগ সীমাবদ্ধ থাকা কর্তব্য। কোন এক জায়গায় গণ্ডী না টানলে উপায় নেই, কোথায় নিয়ে গিয়ে যে ফেলবে কে জানে? এক ব্যক্তি শত জনকে বঞ্চিত করে প্রচুর ধন, প্রচুর খাদ্য, অপরিমিত বিলাস-সামগ্রী ভোগ করবে এ শুধু দৃষ্টিকটু নয়, অনুচিতও। প্রত্যেক মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ পেতে হলে বাল্যকাল থেকেই দেশের ভাবী নাগরিকদের মধ্যে যাতে স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মায় তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত কিনা—অবশ্যই চিন্তনীয়।

ঐহিক ভোগসুখের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝলে জীবনের কতটুকু ত্যাগ করব—যখন প্রশ্ন জাগে তখন সংসারের সীমার সংকীর্ণতা ত্যাগ করে একমাত্র অনন্ত বিস্তারের পথ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সাংসারিক পরিবেশে সব সময় পরিপূর্ণ ত্যাগের পথ বরণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য বৈরাগ্য যখন তীব্র হয় তখন কি অনুকূল কি প্রতিকূল যে কোন

অবস্থার সঙ্গেই অক্লেশে যুদ্ধ করে পথ সহজ করে নিতে পারা যায়। অন্তরে এবং বাহিরে পরিপূর্ণ-ভাবে যে ত্যাগ তা শ্রেষ্ঠ, তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে : 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।

ঠিক ঠিক ত্যাগ হচ্ছে মনে, অন্তরে অনাসক্তি। এই আন্তর বৈরাগ্য বহু তপস্যার ফলে হয়। বাহিরে অনন্ত ভোগসামগ্রীর মধ্যে থাকলেও অনাসক্ত পুরুষের অন্তরে পূর্ণ বৈরাগ্য সদা বর্তমান। কিন্তু তপস্যাবিহীন ব্যক্তির পক্ষে ভোগবিলাসের মধ্যে থেকে অনাসক্ত হওয়া অসম্ভব—বামনের চাঁদ ধরার ইচ্ছার মতো হাস্যকর। তপস্যা ব্যতীত অনাসক্তি-লাভ অসম্ভব।

প্রকৃত ত্যাগীই অনলস নিষ্কাম কর্মী; তিনিই প্রকৃত কর্মী। যিনি নিজে মনে প্রাণে ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করেছেন তিনিই দেশের দশের ও সকলের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেন। কারণ নিজের স্বার্থ বলতে যে তাঁর কিছুই নেই! ত্যাগ জীবনবিমুখতা নয়—জীবনকে পূর্ণ করবার উপায়।

একটি শরীর দিয়ে ও একটি মন দিয়ে মানুষ কতটুকুই বা ভোগ করতে পারে? বসুন্ধরার বিপুল সম্পদ—রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ—তিনিই বিচিত্র-ভাবে সকলের মধ্যে উপভোগ করতে পারেন যিনি প্রকৃত ত্যাগী—সব ছেড়ে যিনি সব পেয়েছেন। ভোগীর চিন্তাধারণার বাহিরে এ জিনিস! স্বামী বিবেকানন্দের কর্মবহুল জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় কথাটির তাৎপর্য কি তা বোঝা যায় :

আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে একবার বলেন,—'এই জগৎটা থেকে যতদূর লাভ করা যেতে পারে তার চেষ্টা সকলের করা উচিত—এই আমার বিশ্বাস। কমলা-লেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রস বের করে নিতে হবে—যেন এক ফোঁটা রসও বাদ না যায়—কারণ, আমরা এই জগৎ ছাড়া অপর কোন জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নই।' স্বামীজী তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন,—'আমি আপনার চেয়ে এই জগৎরূপ কমলা-লেবুটাকে নিংড়াবার উৎকৃষ্টতর প্রণালী জানি—আর আমি তাই এ থেকে বেশী রস পেয়ে থাকি। আমি জানি, আমার মৃত্যু নেই, সুতরাং আমার ঐ রস নিংড়ে নেবার তাড়া নেই। আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নেই—সুতরাং বেশ করে ধীরে ধীরে আনন্দ করে নেংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রী-পুত্রাদি ও বিষয়-সম্পত্তির কোন বন্ধনও নেই, আমি সকলকে সমভাবে ভালবাসতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে ভগবান বলে ভাল-বাসলে কি আনন্দ—একবার ভেবে দেখুন দেখি! কমলা-লেবুটাকে এইভাবে নেংড়ান দেখি—অন্যভাবে নিংড়ে যা রস পেতেন, তার চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশী রস পাবেন—এক ফোঁটাও বাদ যাবে না।'

এই হ'ল প্রকৃত ত্যাগী অনাসক্ত পুরুষের ভোগ!

ত্যাগের অসীম শক্তির কথা ভেবেই সত্যদ্রষ্টা ঋষি ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলেছেন :

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

'জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, সবই আত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন কর, অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য, জগৎ তাতে কল্পিত—মিথ্যা, এই জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করবে। (তাতেই তোমার হৃদয়ে আসক্তি-ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস আসবে) সেই ত্যাগ বা সন্ন্যাস দ্বারা অদ্বৈত নির্বিকার ভাব রক্ষা কর; কারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করো না।'

অভিজ্ঞতা-দ্বারা মানুষ শেষে বোঝে, আপাত-সুখকর ভোগের পথ পথ নয়—ত্যাগের পথই পথ, অনন্ত বিস্তারের পথ, অনন্ত শান্তির পথ। তাই ত্যাগই কাম্য—ত্যাগই বরণীয়। সংসারের সর্ব বিষয়ে সকল অবস্থায় যতটুকু ত্যাগ করিতে পারা যায় ততটুকুই কল্যাণজনক।

যাত্রীর চিঠি

[ব্যাঙ্ককের কথা]

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

গত রবিবার (৭ই এপ্রিল) স্যানফ্রান্সিস্কো পৌঁছেছি; দেখতে দেখতে সাত দিন কেটে গেল। ভারতবর্ষ ছাড়বার পর আঠারোটি দিন অতীতের গর্ভে মিলিয়ে গেছে। এখানকার বেদান্ত-সমিতির পরিচালক শ্রদ্ধাস্পদ অশোকানন্দজী মহারাজ মাঝে মাঝে হেসে জিজ্ঞাসা করছেন, দেশের জন্যে মন হু হু করছে কি না। জবাব দেওয়া মুস্কিল। তবে এটা তো সত্যিকথা, মানুষের ব্যক্তিগত উল্লাস-বেদনা বেগবান কালের অব্যর্থ অগ্রগতির কাছে একান্তই অকিঞ্চিৎকর। কালপ্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে যদি কিছু বলতে বা করতে পারা যায় উত্তম, নতুবা নিজেকে প্রকাশ করতে যাওয়া মূঢ়তা।

আমেরিকার মাটি ধরবার আগে পথের কয়েক-দিনের অভিজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাতাশে মার্চ রাত সাড়ে দশটার কিছুক্ষণ আগে দমদম বিমানঘাঁটিতে সকলের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ে বি. ও. এ. সি-র প্রশান্ত-মহাসাগরগামী বিমানটির সিঁড়ি বেয়ে যখন ভিতরে ঢুকলাম সেই যাত্রা-শুরুর মুহূর্তটি এক নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মনে হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির সাধারণ ধর্ম—যাত্রা। চলো চলো চলো। পিছনে তাকিয়ো না, সামনের অনিশ্চয়তায় মুষড়ে প'ড়ো না। সমস্ত মানুষ চলছে। সমস্ত মানুষের সাধারণ ধর্মের অতিরিক্ত অভিনব কিছু এই মুহূর্তে তোমার পক্ষে ঘটছে—এমন মিথ্যা ভাবনা রেখো না। মনে হয়েছিল এই বৃহৎ পৃথিবীতে সংযোগ-বিয়োগ একটা গণ্ডীবদ্ধ সত্য মাত্র। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ দেশ ও কালের দ্বারা সীমায়িত হতে পারে না। সমগ্র মানবজাতির কথা ভাবলে মানুষ কখনো মানুষ থেকে আলাদা হয় না, দূরে যায় না। অতএব মানুষ কখনই একা নয়। সকল কালের সকল মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে—অতীত মানুষ, বর্তমান মানুষ, আবার অনাগত মানুষ। মানুষের শক্তি ব্যষ্টিতে নয়, সমষ্টিতে।

মহাশূন্যে উড়ে চলবার আবেশের মধ্যে কখন যে চোখ বুজে গিয়েছিল খেয়াল নেই, নিশ্চয়ই রাত্রে কিছুটা ঘুমিয়েছিলাম, কেননা হঠাৎ জেগে উঠে ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় দু'টো। দুই কানে সূচ বেঁধার মতো প্রখর যন্ত্রণায় জেগে উঠেছিলাম। আঙুল দিয়ে কান চেপে ধরলাম, তুলো গুঁজে দিলাম কিন্তু যন্ত্রণার উপশম নেই। তখন স্টুয়ার্ডকে বলতে তিনি বললেন, 'Blow your nose' (নাক থেকে হাওয়া বের করে দিন)। ঐরূপ কিছুক্ষণ করায় উপকার পাওয়া গেল। ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন আমরা ব্যাঙ্ককে নামছি।

টাইম টেবলে ছিল ভোর ৪টায় ব্যাঙ্কক, তবে যে এত আগে? ক্যাপ্টেন বললেন, 'ব্যাঙ্কক টাইম'। বুঝলাম, পূবে চলেছি, সময়ও এগিয়ে গেছে। কলকাতার ঘড়ির রাত দুটো মানে ব্যাঙ্ককে রাত সাড়ে তিনটা। দেড় ঘণ্টার তফাৎ। তবুও প্লেন বেশ কিছুক্ষণ আগেই ব্যাঙ্কক পৌঁছে গেছে। কাস্টমস্-এর পরীক্ষাদির পর মালপত্র নিয়ে বি. ও. এ. সি-র বাসে উঠে ১৮ মাইল দূরে শহরে যখন পৌঁছুলাম তখনও বেশ রাত রয়েছে। থাই-ভারত লজে আমার থাকবার ব্যবস্থা আগে হতে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, কথা ছিল ওঁদের কেউ বি. ও. এ. সি-র শহরের অফিস থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন। অতএব বি. ও. এ. সি-র অফিসেই নামা গেল। বেশ লম্বা চওড়া গোলগাল এক ব্যক্তি আমাকে সন্ন্যাসী দেখে করজোড়ে নমস্কার করে হিন্দীতে

বলে উঠল, আইয়ে মহারাজ। ইনি বি. ও. এ. সি. অফিসের দারোয়ান। (পরে জেনেছিলাম ব্যাঙ্ককে যত অফিসে বা বড় বড় বাড়ীতেও দারোয়ানের কাজ এবং শহরে দুধের ব্যবসা—গোরখপুরের এই হিন্দুস্থানী লোকদেরই প্রায় একচেটিয়া। এদের স্থানীয় নাম 'ভাইয়া'। এরা দেশের মতই কাপড় পরে—তবে শ্যামদেশের ভাষা শিখে নিতে হয়েছে)।

দারোয়ানজী আমার জিনিসপত্র বাস্ থেকে নামিয়ে ঘরের এক পাশে রাখলো এবং আমাকে 'পঙ্খাকে নীচে' বসতে বললো, কেননা সেই শেষ রাত্রেও দস্তুরমতো গরম বোধ হচ্ছিল। ইতিমধ্যে অফিসের একটি কর্মচারী—আমি থাই-ভারত লজে যাব শুনে—বাসের ড্রাইভারকে ঐ স্থানের নির্দেশ দিয়ে আমাকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে বললেন। তখনও আমাকে নিতে থাই-ভারত লজ থেকে কেউ বি. ও. এ. সি-র অফিসে আসেন নি। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে এই অফিসে বসে না থেকে তাড়াতাড়ি ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়াই সমীচীন মনে হল। দারোয়ানজী আমার মালপত্র আবার বি. ও. এ. সি-র বাসে তুলে দিল।

ঘুমন্ত ব্যাঙ্কক শহরের সুদৃশ্য অট্টালিকাশোভিত অনেকগুলি বড় রাস্তার মোড় ঘুরে প্রায় ২০ মিনিট পরে বাস্ সিরিংফঙস্ রোডে প্রশস্ত ময়দানযুক্ত একটি বৃহৎ ব্যারাকের মতো দ্বিতল বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। বাড়ীর গায়ে লেখা দেখলাম—'থাই-ভারত কালচারাল লজ'। তখনও ভোর হয় নি। ড্রাইভার আমার জিনিসপত্র নিয়ে গেটের ভিতর ঢুকে ময়দানে দাঁড়ালো, পিছনে আমিও এলাম। কিন্তু কোন লোকজনের সাড়াশব্দ নেই—কেবল দূরে দোতলায় একটি ঘর থেকে অস্পষ্ট একটি বাজনার সুর ভেসে আসছিল। ড্রাইভারের কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর একতলার ঘর থেকে একজন 'ভাইয়া' বেরিয়ে এল—এখানকার দারোয়ান। করজোড়ে নমস্কার করে সে আমায় হিন্দীতে অভ্যর্থনা জানালো। বললো, আপনি আসবেন আমরা জানি, আপনার ঘরও ঠিক আছে, তবে চাবি পণ্ডিতজীর কাছে (পণ্ডিতজী অর্থাৎ লজের সেক্রেটারী), তিনি শীঘ্রই এসে পড়বেন। আপনি বরং ততক্ষণ উপরে চলুন শাস্ত্রীজীর কাছে।

দোতলার সিঁড়ি উঠে প্রশস্ত বারান্দা এবং অনেকগুলি ঘর পেরিয়ে একটি কক্ষে নীত হলাম। আলো জ্বলছিল, মেজেয় মাদুর পেতে একটি ভদ্রলোক হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন। আমায় দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং অতি অমায়িকভাবে হিন্দীতে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন। কাপড়-পরা, খালি গা, গলায় উপবীত, মুখে লম্বা গোঁফদাড়ি। বুঝে নিলাম ইনিই শাস্ত্রীজী। ঘরের দেওয়ালে অনেক দেবদেবীর ছবি। মেজেতে এক কোণে আসন পাতা রয়েছে, তার সামনে কোশাকুশি। বুঝলাম এই ঘর থেকেই বাজনার শব্দ নীচে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

শাস্ত্রীজীর সঙ্গে গল্প বেশ জমে উঠলো। ইনি ব্যাঙ্কক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক। থাই ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে ভদ্রলোক অনেক তথ্যপূর্ণ কথা বললেন।

সকাল হল। স্নান সেরে নিলাম। ইতিমধ্যে লজের সেক্রেটারী পণ্ডিত রঘুনাথ শর্মা এসে হাজির হয়েছেন; বললেন, আপনাকে আনতে বি. ও. এ. সি-র অফিসে একটি বাঙালী ভদ্রলোককে পাঠিয়েছি, প্লেন আগে এসে গেছে বলে তিনি আপনাকে ধরতে পারেন নি। ক্ষমা চাইলেন। বাঙালী ভদ্রলোকটিও কিছু পরে এসে উপস্থিত হলেন। ইনি বহু বৎসর ব্যাঙ্ককে রয়েছেন। স্ত্রী থাই মহিলা। ওঁদের একটি মাত্র মেয়ে—বাংলা নাম রেখেছেন 'অরুণা'। মেয়েটি বাংলা বলতে পারে না, কিন্তু বাংলা দেশের উপর তার একটা টান আছে, চেহারাও আধা ভারতীয় আধা থাই।

লজের সেক্রেটারী পণ্ডিতজী এবং ঐ বাঙালী ভদ্রলোক তিন দিন আমার ব্যাঙ্কক এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনেক জায়গা দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। থেল-ল্যাণ্ড বা শ্যামদেশ প্রধানতঃ বৌদ্ধদেশ। ব্যাঙ্ককের শত শত মন্দিরের মধ্যে প্রধান কয়েকটি দেখলাম। মন্দিরগুলির একটি স্বকীয় স্থাপত্য আছে। কাঠের তৈরী সৌধ যেমন বিরাট, তেমনি উঁচু। সমগ্র মন্দির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এবং বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেকগুলি স্তর পার হলে তবে প্রধান মন্দিরে পৌছানো যায়। দক্ষিণদেশের মন্দিরের কথা মনে পড়ে। তিনটি বুদ্ধ-মূর্তি এখানে বিখ্যাত—দণ্ডায়মান বুদ্ধ, শয়ান বুদ্ধ এবং পান্নার তৈরী বুদ্ধ-মূর্তি (Emerald Buddha)। ভগবান বুদ্ধের দাঁড়ানো এবং শায়িত—ছুটি মূর্তিই অতি প্রকাণ্ড, মুখের ভাবও খুব প্রশান্ত। শেষোক্ত পান্নার বুদ্ধ-মূর্তিটি রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন একটি মন্দিরে রক্ষিত। মূর্তিটি খুব বড় নয়, কিন্তু দেখতে ভারী সুন্দর। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন মন্দিরে পাঠ হচ্ছিল; শত শত নরনারী সশ্রদ্ধভাবে বসে শুনছিলেন। ঠিক আমাদের দেশের মন্দিরের পরিবেশ। এই মন্দিরের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বস্থ দালানে রামায়ণের চিত্রাবলী আঁকা রয়েছে। রামায়ণের অনেক নাম থাই ভাষায় কিছু কিছু রূপান্তরিত হয়েছে, ঘটনাবলীও কিছু কিছু বিকৃত হয়েছে, তবে মোট কাঠামোটি ঠিক আছে।

দু তিনটি বৌদ্ধ মঠেও গিয়েছিলাম। নানা বয়সের শত শত ভিক্ষুক দেখলাম। শ্যামদেশে গৃহস্থকেও জীবনের কোন একটা সময়ে কিছুকালের জন্য ভিক্ষু হতে হয়। বৌদ্ধ মঠে অনেক বিদ্যার্থী এবং ব্রহ্মচারীও নজরে পড়ল। এদেরও ভিক্ষুদের মতো বেশ, তবে সাদা কাপড়। বৌদ্ধধর্ম শ্যামদেশে বেশ জাগ্রতই রয়েছে।

ব্যাঙ্কক শহরটি দ্রুত পাশ্চাত্য শহরে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তায় রাস্তাঘাটের বহু উন্নতি ঘটেছে শহরের পরিচ্ছন্নতা এবং যানবাহন ও যাত্রীদের নিয়মশৃঙ্খলা দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে পড়লো আমাদের রাজধানী কলকাতার কথা। শ্যামদেশ-বাসী তাদের রাজধানীকে কি করে এত পরিষ্কার রেখেছে, আমরা পারি না কেন? বার বার এই প্রশ্নটি মনে তোলপাড় করতে লাগলো।

ব্যাঙ্ককে বহু চীনা অধিবাসী আছে! চীনা এবং থাইরা পাশাপাশি বেশ প্রীতির সঙ্গে বাস করছে—স্বার্থের সংঘর্ষ বাধছে না; তবে চীনারা থাইদের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রমী, দোকানপসার চীনাদেরই হাতে। চীনা এবং থাইন বৈবাহিক আদানপ্রদানও কিছু কিছু চলে। শহরের উপান্তে একটি থাই পল্লীও একদিন দেখতে গিয়েছিলাম।

শ্যামদেশে অন্নকষ্ট নেই। ভাত এবং মাছ প্রধান খাবার। থাইবাসীদের মধ্যে জাতিভেদ নেই। এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম—জাতীয় সংহতির দিক দিয়ে এ একটা মস্ত বড় কথা। পুরুষরা বাইরে কাজকর্ম করে। গৃহস্থালী, বাজার হাট সব মেয়েরাই করে। থাই মহিলারা সাজপোষাকে দ্রুত পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণ করে চলছেন। ব্যাঙ্কক বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখে আনন্দ হল। একদিন ব্যাঙ্কক থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলেও বেড়াতে গিয়েছিলাম। ধানক্ষেত এবং নানা গাছপালার মাঝে ছোট ছোট বাড়ীগুলি দেখে বাংলা দেশের গ্রামের কথা মনে পড়ে। ব্যাঙ্ককের নদী, নদীর বুকে শ্যামদেশীয় নৌকার আনাগোনা এবং নদীর তীরে বৃহৎ বৌদ্ধমন্দির ওয়াট-অরুণ (অরুণ বা সূর্যোদয় চিহ্নিত মঠ) দেখে ভারী আনন্দ লাভ করলাম।

শ্যাম এবং ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাকৃতিক, ভাষাগত এবং ধর্মীয় সাদৃশ্য উপেক্ষার বস্তু নয়। থাই-ভারত কালচারাল লজ এই সাদৃশ্যকে পুরো-ভাগে রেখে উভয় জাতির মধ্যে প্রীতি ও সাংস্কৃতিক

সংযোগ দৃঢ় করবার চেষ্টা করছেন। এঁদের কাজ যে খুব ব্যাপক প্রসারলাভ করেছে তা বলা চলে না, তবে এঁদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। জনৈক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। দীর্ঘকাল ব্যাঙ্ককে থেকে তিনি থাই ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন এবং থাই সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থও লিখেছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু ব্যাঙ্ককের অভিজাত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁর নাম এখনও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। লজের লাইব্রেরীতে ভারতীয় ও থাই সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক বই রয়েছে দেখলাম। লজ একটি বিদ্যালয়ও পরিচালনা করেন।

ব্যাঙ্ককে ভারতীয়ের সংখ্যা কয়েক হাজার। এঁদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী (শিখ ও হিন্দু উভয়ই)। এঁরা বেশীর ভাগ কাপড়ের ব্যবসা করেন। উত্তর প্রদেশের 'ভাইয়া'দের কথা আগেই বলেছি। একদিন পূর্বোক্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের গৃহে তাঁর নির্বাচিত ভারতীয় বন্ধুদের একটি সম্মেলনে উপস্থিত হতে হয়েছিল। বহুদিন ভারতবর্ষ ছাড়া হলেও এঁদের মনে ভারতের প্রতি টান এবং ভারতের সুখদুঃখের সহিত তাদাত্ম্যবোধ কথাবার্তায় ফুটে উঠছিল; দেখে বড় আনন্দলাভ করলাম। এঁদের কেউ কেউ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছিলেন। নেতাজীর ব্যাঙ্ককে থাকার সময়ের কথা এঁদের কাছে কিছু শোনা গেল।

ব্যাঙ্ককের তিনটি দিন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিবেশ বহুলভাবে অনুভব করেছিলাম। শ্যামের নরনারীর সমাজ এবং জীবনরীতি ভারতীয়দের থেকে অবশ্য অনেক আলাদা। কিন্তু জগৎ ও জীবনের প্রতি এশিয়ার যে একটি স্বকীয় উদার অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আছে—তার ছাপ থাইদের ভিতর আবিষ্কার করতে দেরি হয় না। আমেরিকার ক্রমপ্রসারণশীল সংযোগ থাই-জীবনকে দ্রুত আচ্ছন্ন করতে থাকলেও সেই ছাপ মুছে যেতে বোধ করি এখনও বহু বিলম্ব আছে।

শ্রীশ্রীমায়ের অদোষ-'দর্শন'

শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ

'শ্রীশ্রীঠাকুরের এক একটি কথা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখা যায়'—পূজ্যপাদ স্বামীজী এক সময় তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন। বন্ধুটি আশ্চর্য হয়ে কিছু বুঝিয়ে বলতে বলায় শ্রীরামকৃষ্ণের 'হাতি-নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ' গল্পটির অন্তর্নিহিত ভাব স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়েছিলেন তিন দিন ধরে।

শাস্ত্রসমূহের সত্যতা যেন প্রমাণ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় প্রায় নিরক্ষর হয়ে এসে নিজ জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন—সকল মত এবং সকল শাস্ত্রবাক্য সত্য—স্থানকাল পাত্রভেদে।

বড় বড় পণ্ডিত তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করে শান্তিলাভে ধন্য হয়েছিলেন। এসব তবু বুঝতে পারা যায়, কিন্তু শ্রীশ্রীমার এক একটি ছোট্ট কথায় কত তত্ত্ব আছে আমরা কি তার কিছু বুঝতে পারি?

মা জনৈকা শিষ্যাকে বললেন, "মা দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করো"; আরও বললেন, "মানুষের নিজের মনটি আগে দোষ করে, তবে সে পরের দোষ দেখে। পরের দোষ দেখলে অপরের কি ক্ষতি হয়? নিজেরই ক্ষতি, আমারও আগে লোকের দোষ চোখে ঠেক্‌তো, তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে 'ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারি না' বলে কত প্রার্থনা করে, তবে দোষ দেখাটা গেছে। দোষ তো মানুষ করবেই, ও দেখতে নেই, ওতে

নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষকালে দোষই দেখে।"

যোগেন-মাকে মা বল্লেন, 'যোগেন, দোষ কারুর দেখ না, শেষে দূষিত চোখ হয়ে যাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর ত্যাগের পর মা বৃন্দাবনে রাধারমণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও, আমি যেন কারুর দোষ না দেখি।'

নহবতে বাসকালে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে চাঁদের দিকে চেয়ে মা বললেন, 'তোমার জ্যোৎস্নার মত আমার অন্তরটি নির্মল হোক্।'

কিন্তু আমরা সাধারণতঃ কি করে থাকি? কারুর দোষ যদি চোখে পড়ল, আবার সে যদি নিজ-জন বা সন্তানাদি হয় তবে তো বেশ করে শাসন করে ছাড়ি, আর যদি তত নিকট সম্বন্ধ না হয়, তবে তার দোষের নিন্দা করি, সমালোচনা করি। তারপর দৈবাৎ যদি সে দোষটা নিজের না থাকে তবে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ বা একটু গর্বও অনুভব করে ফেলি। আর মায়ের কথা মনে করে হয়ত বা বলি—যাঁরা সাধুসন্ত, লোকসঙ্গবর্জিত, অরণ্য-পর্বত গুহাবাসী তাঁদের দোষদৃষ্টি না থাকার সুযোগ থাকতে পারে ; কিন্তু আমরা সংসারী মানুষ, নিয়ত ছেলেপুলে লোকজন নিয়ে চলতে হয়, আমরা কি করব? যেন দোষদৃষ্টি থাকাটা খুবই সঙ্গত।

মাকে আমরা কিভাবে দেখেছি? আমাদের বলবার কোনও উপায় নেই যে, মা আমাদের মতো সংসারের জ্বালা ভোগ করেন নি। মা আমাদের মতই হয়ে রাধু-নলিনী-মাকু-ভূদেব প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেন কতই জড়িয়ে রয়েছেন, তাদের জন্ম কত ভাবনা, কত চিন্তা। নিজে মহামায়া হয়েও আমাদের দেখিয়ে গেলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে তাদের জন্ম কত ভাবনা চিন্তায় মায়ায় জড়িয়ে থাকা। মা মহামায়া, মায়াতীতা ; গুণময়ী হয়েও গুণাতীতা ; নির্লিপ্তা, বায়ুর মতই নির্বিকার; সুজন দুর্জন সকল সন্তানকেই সমভাবে কোলে ঠাঁই দিয়েছেন। আমাদের চোখের সামনেই সংসার চিত্র ধরে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, অরণ্য-পর্বতবাসী না হয়েও দোষদৃষ্টি ত্যাগ করা যায় এবং কেমন করে করা যায়—আমাদের তাই শেখাতেই মায়ের শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কেঁদে বলা 'ঠাকুর দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও।' আমরা যদি মনে বুঝি দোষদৃষ্টি দোষীর চেয়ে আমার নিজেরই বেশী ক্ষতি করে এবং সেটি ছাড়তে ঠাকুরের কাছে কেঁদে প্রার্থনা করি—তবে তা যাবেই যাবে। আমাদের প্রতি মায়ের এই শিক্ষা এবং আদেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছিলেন, 'ওরে আমি ষোল টাং করে গেলুম তোরা এক টাংও তো কৃরবি।' ঠাকুরের কাছে মা আমাদের সহজসাধ্য প্রার্থনাটুকু করেই নির্মল হবার ছাঁচ তৈরী করে গেছেন, যাতে আমরা তাতে ঢেলে সহজে নিজেকে গড়তে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সব ভাবসমাধি ভক্তজনের নিত্য প্রত্যক্ষ ছিল, মার আমাদের সবই গোপন। পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী বলেছিলেন, 'মাকে কে বুঝবে? রাজরাণী হয়ে ঘর নিকুচ্ছেন, আমরা যা হজম করতে পারি না, সব মার কাছে চালান করি, মা সব বুকে তুলে নিচ্ছেন।'

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের রূপ পাঠ করি, 'বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্' ; মা আমাদের বিশ্বাত্মিকা হয়েই বললেন, 'মা, জগৎ তোমার'।

মায়ের কাছে সদসৎ সবাই সমান। চিরদিনই মা সেবাবুদ্ধিতে আমাদের বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করতে—সবার সেবা নিজে হাতে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, এবং ছোট্ট একটি কথা বললেন, 'তুমি জগতের'।

বিশাল মহীরুহ যেমন ছোট্ট একটি বটবীজের মধ্যে লুকানো থাকে, মায়ের এই ছোট্ট ছোট্ট কথাগুলির উপরও ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখা যায়।

সমালোচনা

Kumbha (কুম্ভ)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত, প্রকাশক—ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাই। পৃষ্ঠা—২৯৪+২৮ ; মূল্য—১৸০ আনা।

১৯৫০ খৃঃ প্রয়াগে অনুষ্ঠিত সর্বভারতের জাতীয় ধর্মমহামেলা সম্পর্কে লেখা ইংরেজী বই। কে. এম্. মুন্সী-লিখিত মুখবন্ধে যথার্থই উক্ত হইয়াছে, কুম্ভে সমাগত প্রকৃত সাধুসন্ন্যাসীর সহিত বহু প্রতারকও মানুষের মনে দাগ রাখিয়া যায়; লেখকদ্বয়ের দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় নাই। এগারটি অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে তাঁহারা কুম্ভের পৌরাণিক ইতিহাস, সাধুদর্শনে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা নিপুণভাবে শিল্পীর তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কয়েকটি চিত্র পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কুম্ভ সময়ের কথা ছাড়াও অন্য সময়ের অনেক সাধুসন্তের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ঈশ্বরদর্শন—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত ও ফাঁশীতলা, নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৪২ ; মূল্য দশ আনা।

ঈশ্বরদর্শন অতি দুর্লভ এবং অপ্রকাশ্য। তাহা হইলেও ঈশ্বরদর্শন সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে আছে। লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার যৌবনে বিপ্লবপথে ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে কিরূপে তিনি সাধনপথে অগ্রসর হন, তাহা এই বইটিতে প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মযোগে ঈশ্বরদর্শন, তথা প্রণাম ও গায়ত্রীমন্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। নাম ও ভাবের মহিমা বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন; এমন অনেক কথা পরিবেশন করিয়াছেন যাহা লিপিবদ্ধ না করাই সমীচীন—ব্যক্তিগত সাধনপ্রণালী প্রকাশ করা অনাবশ্যক। পুস্তিকাটিতে অনেকগুলি ত্রুটি পাঠকবর্গের চোখে পড়িবে; গীতা হইতে শ্লোকাংশের উদ্ধৃতি এবং গায়ত্রী মন্ত্রটিও নির্ভুল নয়।

—জীবানন্দ

ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—১০০ ; মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রবীণ চিন্তাশীল লেখক। সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আলোচ্যমান গ্রন্থখানির সঙ্গে তাঁহার সে পরিচয়ের সম্বন্ধ নাই।

এই গ্রন্থে তিনি ভারতের শাসনপদ্ধতির একটা ঐতিহাসিক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভারতের দশাবিপর্যয়ের পর প্রবর্তিত নব শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামত ইহাতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই আলোচনায় কোন উষ্মা নাই—শান্তসংযতভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা অনন্যসাধারণ। সবচেয়ে লক্ষ্যের বস্তু—স্বদেশের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহার আন্তরিক ও অকপট উদ্বেগ। গ্রন্থখানি ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারে ইহার স্থান হওয়া উচিত মনে করি।

—শ্রীকালিদাস রায়

আরাবল্লীর আড়ালে—শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রণীত, প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা—১১৪, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি রাজস্থানের অন্তঃপুরের কাহিনী সম্বলিত ছয়টি গল্পের সমষ্টি। পাত্রপাত্রী কাল্পনিক হইলেও কাহিনীগুলিতে ঘটনার ছায়া বিদ্যমান। প্রহরী-বেষ্টিত রাজস্থানের অন্তঃপুরে বাল্যকালে লেখিকার আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণে যাতায়াত ছিল। সেই সময়ের স্মৃতি পুস্তকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্তঃপুরের বিলাস বৈভব ও ঐশ্বর্যের পথে তিনি সেখানকার নারীদের যে করুণ কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে পাঠকের হৃদয় সমবেদনায় দ্রবীভূত হয়।

শ্রীদেবেশ দাশের 'রাজোয়াড়া'য় পড়িয়াছিলাম রাজস্থানের বহির্বাটীর কথা ও রাজনীতি, আর এই পুস্তকে পাওয়া যায়—সেখানকার অন্তঃপুর ও রাজ-পরিবারের কথা, তাহাদের আচার-ব্যবহার ও জীবন-মরণের চিত্র।

—বিদেহানন্দ

আশ্রম—(একাদশ বর্ষ, ১৩৬৩)—সম্পাদক—শ্রীশিশিরকান্তি ভট্ট, প্রকাশক—স্বামী পুণ্যানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা—৮৪।

বালকাশ্রমের সুমুদ্রিত এই বার্ষিক পত্রিকাখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ ও কবিতায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটিতে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে লিখিত রচনাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আশ্রম-সংবাদ এবং আলোক-চিত্রগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী উন্নতি ঘোষণা করিতেছে।

বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন্ পত্রিকা (স্বামী শিবানন্দ স্মরণে)—ত্রিংশ সংখ্যা, ১৩৬৩। ছাত্র-সম্পাদক—শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী ও শ্রীজগন্নাথ আঢ্য; ১০৭ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া—হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৬৪।

২৯টি প্রবন্ধ ও কবিতার সমাবেশে মাঝে মাঝে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর কথা সন্নিবেশিত করিয়া এই পত্রিকাটি তাঁহার স্মৃতি-অর্ঘ্য রূপে রচিত হইয়াছে। আচার্য নন্দলাল বসুর লেখা-চিত্র অবলম্বনে একটি ছাত্রের অঙ্কিত ভাবে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানি উল্লেখযোগ্য। অনেকগুলি আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মধারার পরিচয় দিতেছে।

অণুব্রত—(২য় বর্ষ, ৪র্থ অঙ্ক, ১৯৫৬)—সম্পাদক—দেবেন্দ্রকুমার সত্যনারায়ণ মিশ্র, ৩নং পর্তুগীজ চার্চ, শ্রীপ্রতাপসিং বৈদ দ্বারা প্রকাশিত।

অখিল ভারত অণুব্রত সমিতির এই হিন্দী মুখ-পত্রে সন্তবাণী, নৈতিক পথ, বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিক সমস্যা-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ অহিংস জৈনধর্মের দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত হইয়াছে।

কল্যাণ—(তীর্থাঙ্ক, ৩১তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) গোরখপুর গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৭০৪, সূচী ৩২; মূল্য ৭॥০ টাকা।

ভারতের চতুর্দিকে বিরাজিত আঠারো শতের উপর তীর্থের সচিত্র বিবরণ পাঠকের মনকে অজ্ঞাত-সারেই তীর্থযাত্রীতে পরিণত করে। ২১টি প্রধান গণপতি-ক্ষেত্র, ১০৮টি দিব্যশিব-ক্ষেত্র, ২৭৪টি পবিত্র শৈবস্থল, ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গ; ১০৮টি দিব্য বিষ্ণুস্থান, ১০৮টি বৈষ্ণবস্থল; ১০৮ দিব্য শক্তিতীর্থ, ৫১টি শক্তিপীঠ এবং ১২টি প্রধান দেবী-বিগ্রহের বর্ণনা গ্রন্থটিকে অসাম্প্রদায়িকতার মহান্ ভাবে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বহু রঙীন ও একবর্ণের চিত্র, মানচিত্র, স্তব ও স্তোত্র, এমনকি তীর্থ-বিশেষের পূজাপদ্ধতি পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। হিন্দীভাষায় অভিজ্ঞ তীর্থযাত্রীদিগের পক্ষে ইহা একখানি অমূল্য অপরিহার্য গ্রন্থ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব

আসানসোল ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার পুণ্য-প্রাতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি হস্তিপৃষ্ঠে সুসজ্জিত সিংহাসনে এবং দেবী সারদামণি ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিদ্বয় সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। শোভাযাত্রায় আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ব্যতীত স্থানীয় আরও চারিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ যোগদান করিয়া ইহার সৌষ্ঠব বর্ধন করে। শোভাযাত্রা আশ্রমে আসিয়া সমাপ্ত হইবার পর মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ভোগারতি ও হোম সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও অমৃতময়ী বাণীর আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এস্. শার্ঙ্গপাণি। সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও হিন্দী বক্তা শ্রী এস্. তারাল বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শ্রীভগবানের জীবনবেদ পর্যালোচনা করেন।

২০শে এপ্রিল বিশ্বজননী দেবী সারদামণির স্মরণবাসরে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর রমা চৌধুরী, অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। এই দিনের সভার বিশেষ আকর্ষণ ছিল সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীগৌরী-কেদার ভট্টাচার্যের মাতৃসঙ্গীত।

২১শে এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ-মহোৎসবে প্রভাত হইতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ভাগবত-পাঠ, স্থানীয় শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম-প্রচার-সমিতির পালা-কীর্তন উৎসবে সমবেত অগণিত ভক্ত নর-নারীর প্রাণে বিমল আনন্দ দান করে। এই দিবস বেলা ১১টা হইতে ৩টা পর্যন্ত প্রায় তিন সহস্রাধিক নর-নারায়ণকে বসাইয়া যত্ন সহকারে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় স্বামী রঙ্গনাথানন্দের ইংরাজী বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে এবং স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ স্বামীজীর বাণী বিশ্লেষণ করিয়া বর্তমান ভারতের নবরূপায়ণে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান এবং যুবকবৃন্দের প্রতি তাঁহার উদাত্ত আহ্বান সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে ২২শে এপ্রিল পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

কাঁথি ঃ গত ৬ই, ৭ই ও ৮ই বৈশাখ কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১২২তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিবস পূর্বাহ্নে পূজা চণ্ডীপাঠ ও সন্ধ্যায় স্বামী সুশান্তানন্দ কর্তৃক ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা এবং স্থানীয় শিল্পিগণ কর্তৃক ভজন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হয়। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্নে লোকসভার সদস্য শ্রীপ্রমথ-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভায় অধ্যাপক শ্রীভুবনমোহন মজুমদার এবং উদ্বোধনের সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ 'ধর্ম কি, ও কেন প্রয়োজন ?' বুঝাইয়া বলেন। তৃতীয় দিবস প্রাতে ভজন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠের পর মধ্যাহ্ন হইতে বৈকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীহরিনাম সংকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ হয়। সংকীর্তনে বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলের অন্যূন দশটি কীর্তন দল অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সম্মিলিত মৃদঙ্গবাদন, নৃত্য ও মধুর কীর্তনে আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। কয়েকটি বালকের মৃদঙ্গবাদন এবং দুইটি বালকের মধুর কীর্তন সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। সন্ধ্যায় অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীযশোদাকান্ত রায়ের সভাপতিত্বে একটি সভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ। বক্তৃতান্তে সভাপতি রচনা-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন।

মনসাদ্বীপ (২৪ পরগনা) ঃ গত ৫ই এপ্রিল রবিবার, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে পূজাপাঠের পর মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের এক শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। বৈকালে কথামৃত পাঠের পর স্বামী নিরাময়ানন্দজীর সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভায় আশ্রম-সম্পাদক স্বামী রঘুবীরানন্দ, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধীরকুমার মাইতি প্রভৃতি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও বাণী আমাদের জাতীয় জীবন গঠনে অপরিহার্য। বেতার-কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বক্তৃতা ও কথকতার মাধ্যমে সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য আবির্ভাব কাহিনী বিবৃত করিয়া পল্লীবাসীদের মুগ্ধ করেন।

সভাপতি বলেন, কর্মী বা কর্মের প্রতি নয়—রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের আদর্শের প্রতি অনুরাগ জন্মিলেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ধরিতে পারিব। উৎসব-কমিটির সম্পাদক শ্রীজগন্নাথ মাইতি কার্যবিবরণীতে ব্যক্ত করেন—গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কি-ভাবে এই দ্বীপে শিক্ষা বিস্তারের কার্য চালাইতেছেন, এই আনন্দ-উৎসব তাহারই একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

প্রায় দুই সহস্র পল্লীবাসী পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ ধারণ করিয়া রাত্রে প্রাক্তন ছাত্রগণ-কর্তৃক অভিনীত 'শিবাজী' যাত্রাভিনয় দর্শন করে।

রাঁচি : রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ই ও ১১ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে স্থানীয় বাংলা স্কুলে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা এবং স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে দুর্গাবাটীতে একটি সভায় শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্তগুপ্ত সুললিত কণ্ঠে একটি গান গাহিবার পর অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নারায়ণ ওঝা হিন্দীতে ও স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী বাংলায় ওজস্বিনী ভাষায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বৈশিষ্ট্য ও সমাজে উহার সার্থক রূপায়ণ সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। জন্মতিথি-দিবসে আশ্রমে পূজাপাঠ ও হোমের পর ২২০০ ভক্ত আদিবাসী প্রসাদ পান।

ময়মনসিংহ (পূর্ব পাকিস্তান) **:** গত ২৫শে মার্চ সোমবার হইতে ৩১শে মার্চ রবিবার (বাংলা ১১ই হইতে ১৭ই চৈত্র, ১৩৬৩ সন) সপ্তদিবসব্যাপী ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম সেবাকেন্দ্রে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ-জন্মোৎসব মহানন্দে উদ্‌যাপিত হইল।

২৫শে হইতে দিবসত্রয় প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সঙ্গীতাদি অনুষ্ঠিত হয়, সান্ধ্য আরাত্রিকের পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী—স্বামী প্রণবাত্মানন্দ কর্তৃক আলোচিত হয়। ২৮শে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় এক মহতী জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও তাহার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়।

২৯শে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ভজন, মধ্যাহ্নে ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূজার্চনা ও ভোগরাগ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ন ২ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্যন্ত জাতিধর্মনির্বিশেষে চারি সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৩০শে ও ৩১শে ছায়াচিত্রযোগে 'শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র' ও 'আর্যসভ্যতা' সম্বন্ধে বিপুল জনসমাবেশের সম্মুখে মনোজ্ঞ বিবৃতির পর এই আনন্দোৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

বাগের হাট (পূর্ব পাকিস্তান) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব গত ২২শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৬৩ (৫.৪.৫৭ ইং) মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভোর ৪॥টা হইতে ১২টা পর্যন্ত মঙ্গলারতি, ভজনসঙ্গীত, বিশেষ পূজা, হোম গীতা ও চণ্ডী পাঠ এবং ১॥টা হইতে প্রসাদ বিতরণ হয়। তিন সহস্রাধিক ভক্ত নর-

নারী জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বৈকাল ৫টায় সাধারণ সভায় সভাপতি হন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ। সভার প্রারম্ভে আশ্রমের বাৎসরিক কার্য-বিবরণী পাঠ করা হয়। পরে বক্তৃতা করেন—স্বামী শর্মানন্দ, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস (উকিল), শ্রীভূপেশচন্দ্র আইচ (উকিল), মৌ কে. নওয়াজ (প্রফেসর, বাগেরহাট কলেজ), শ্রীশিবনারায়ণ রায় (ঢাকা)। সন্ধ্যা ৭॥টায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ-বর্ধন করেন। রাত্রি ৯টায় রামায়ণ গান হয়।

পরদিন ২৩শে চৈত্র শনিবার বৈকাল ৫টায় গীতাপাঠ করেন পণ্ডিত হৃষীকেশ বিদ্যারত্ন। সন্ধ্যা ৭॥টায় স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে আর্য সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে ফল মিষ্টি প্রসাদ বিতরণান্তে উৎসবের কার্য সমাপ্ত হয়।

স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতি-পূজা—সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত (৯.৪.৫৭) ২৫শে চৈত্র ১৩৬৩—শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজাদিবসে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতিপূজা-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ৺চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদি-মাধ্যমে সারাদিন আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে স্বামী অন্নদানন্দজী স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের জীবন ও সেবাব্রত বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে একটি জনসভায় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজী, স্বামী অন্নদানন্দ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পুণ্য জীবনী অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। প্রায় ৬০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শাখাকেন্দ্রের কার্যবিবরণী

লক্ষ্ণৌ ঃ লক্ষ্ণৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫১-৫৫ সালের কার্যবিবরণীতে পাঁচ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মব্যাপৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

চিকিৎসা ঃ এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় বিভাগে এই পাঁচ বছরে যথাক্রমে ১,৪১০০৮ : ২,০২,৫৭৮ ; ১,৬৪,৭৫৭ ; ১,১২,০১১ ; এবং ১০৯,৭৪২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যে অস্ত্র-চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৫ খৃঃ গুঁড়া দুধ এবং মাখন শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিতরিত হয়।

শিক্ষা ঃ এই বিভাগে একটি লাইব্রেরি ও একটি অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারে ৬২১০ খানি বই আছে, পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ২৯টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা ২১২ ; পাঠাগারের দৈনিক উপস্থিতি ২৪। নিয়মিত ধর্মসভার অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন।

পাটনা ঃ পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৬ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি।

আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৯,৬৬৭ (নূতন ৭,৭৫২) এবং ৪০,৬৬৩।

প্রধানতঃ অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য স্থাপিত 'অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে' ছাত্র ছিল ১৬০ জন। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ২৪২৬, পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্যা ২৩২৭। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক এবং ২২টি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত আসিয়াছে। ২৫০টি ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থাগারের একতলার নির্মাণ-কার্য আলোচ্য বর্ষে শেষ হয় এবং ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ মার্চ মাসে তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। দ্বিতল নির্মাণ করিয়া গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৬০,০০০ টাকা দিয়াছেন, নির্মাণকার্য চলিতেছে।

মায়লাপুর, মাদ্রাজ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী আমরা

পাইয়াছি। এই বৎসরের শেষের দিকে দাতব্য চিকিৎসালয় বিভাগের 'শ্রীশ্রীমা-শতবার্ষিকী স্মারক ভবন' শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত হয়। এখানে বিশেষভাবে চোখ, কান-নাক-গলা [E-N-T] এবং অস্ত্রোপচার-শাখাগুলি বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই বিভাগ এতদঞ্চলের বহুদিনের অভাব দূর করিয়াছে।

এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয়ভাবে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা গত বৎসর অপেক্ষা দশ হাজার বাড়িয়া একলক্ষ একুশ হাজারের উপর উঠিয়াছে। রোগী ব্যতীত অপুষ্ট শিশু ও নারীদিকে নিয়মিতভাবে দুধ দেওয়া হয়।

গৃহাদি নির্মাণ ব্যাপারে সরকারের যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেলেও দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহের জন্য জনসাধারণের দানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। দরিদ্র রোগীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে আয় সেরূপ না বাড়ায় প্রায় ২,০০০ টাকা ঘাটতি হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা ঃ বিবেকানন্দ সোসাইটি

২১শে এপ্রিল, রবিবার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে স্বামী বিবেকানন্দের ৯৫তম জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে তাঁহার আদর্শ অনুসরণের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান।

সভাপতির ভাষণে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বলেন, যিনি এই নবভারতের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার কাজ যাহাতে পূর্ণতা পায় সেই জন্যই আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি কি করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে তাহার সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই যে, স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সর্বত্র। তিনি আসিয়াছিলেন বৈদান্তিক পথে ভারতকে আগাইয়া লইতে। ভারতের মুক্তির পথ তিনি উপনিষদের মন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখাইয়াছিলেন, আধ্যাত্মিকতার উপর তিনি স্বদেশপ্রেমকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা আজ আবার প্রয়োজন। কারণ, তিনি যে দুর্দিনে আসিয়াছিলেন আজ ভারতের তদপেক্ষাও দুর্দিন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন যে, একদিন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ। এই কথার ভিতর দিয়াই তাঁহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ভারতের চিন্তার সহিত জগৎকে তিনি পরিচিত করিয়াছিলেন। মায়ের পূজার জন্য তিনি ছিলেন সকলের পূজারী। ধর্মের সঙ্গে তিনি মানব-সেবার সংযোগ সাধন করিয়াছেন।

শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসের এক নূতন ধারা প্রবর্তন করেন। দুঃস্থ দরিদ্রকে নারায়ণ মনে করিয়া সেবার আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

নানাস্থানে রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

ঢাকুরিয়া ঃ (কলিকাতা-৩১)—গত ৭ই এপ্রিল ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ প্রাতঃকালে নগরকীর্তন বাহির হয় ও ঢাকুরিয়া পল্লীর বিভিন্ন অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে। বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ নিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় তিন হাজার ভক্ত পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও সাধনা সম্বন্ধে

আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় হাওড়া কাসুন্দিয়া মায়ের মন্দিরের সভ্যগণ 'ভগবান যুগে যুগে' গীতি-আলেখ্য পরিবেশনের দ্বারা সমবেত ভক্তবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করেন।

সিঁথি ঃ (কলিকাতা-২) — রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৪ঠা বৈশাখ হইতে ৮ই বৈশাখ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। একটি বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি নানাবিধ পুষ্প ও উপাচারে সুশোভিত করিয়া রাখা হয়। প্রতিদিনই পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন ও ধর্ম-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই কয়দিনে স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী বীত-শোকানন্দ, স্বামী দেবানন্দ, স্বামী শান্তিনাথানন্দ, স্বামী জীবানন্দ এবং ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশৈল কুমার মুখার্জি, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় সেন, শ্রীতামসরঞ্জন রায়, ডঃ রমা চৌধুরী ও ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী—শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক সুললিত ভাষায় বর্ণনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দাশ্রমের বালিকাগণ, চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও করুণাময়ী আশ্রমের ভক্তবৃন্দ ভজন ও কীর্তন করেন। বিখ্যাত রামায়ণ গায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী রামায়ণ গান করেন এবং শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন কথকতা ও গান সহ ব্যক্ত করেন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রবন্ধ, আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছিল। উৎসবের শেষ দিন একটি বিরাট শোভাযাত্রা সিঁথি পরিক্রমা করে। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৩০০০ হাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকভাব সঙ্গীতসহ বর্ণনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পদরেণুপূত সিঁথি এই কয় দিবস এক স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে।

রাণাঘাট—রামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে গত ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় রাণাঘাট পিপল্‌স্ ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্ম-সভায় স্বামী জীবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ২০শে প্রাতে স্বামী প্রেমরূপানন্দ পূজাহোম সম্পন্ন করেন এবং সান্ধ্য সভায় স্বামী ওঁকারানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বহুসমস্যা-কণ্টকিত বর্তমান কালের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও সাধনার আলোকসম্পাত করেন।

কাটোয়া (বর্ধমান)—গত ৮ই বৈশাখ কাটোয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্যাবির্ভাব উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শোভাযাত্রা, পূজাপাঠ, হোম ও প্রসাদ বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বেলুড় মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দের পৌরোহিত্যে একটি জনসভার অধিবেশন হয়।

আমতলা (২৪ পরগণা)—গত ১৪ ও ১৫ই বৈশাখ আমতলা রামকৃষ্ণ সেবক-সংঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন পূজা, চণ্ডীপাঠ, কীর্তন ও ভাগবতপাঠ হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত একটি ধর্মমহাসভায় বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা হয়; স্বামী জীবানন্দ সভাপতিত্ব করেন। রেভাঃ সুধীরকুমার চট্টো-পাধ্যায় খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে বলেন। বৌদ্ধধর্ম ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধেও বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুধর্মের বিষয়ে বলেন ডক্টর রামচন্দ্র পাল ও অধ্যাপক পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়। সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সর্বধর্ম সমন্বয় ও 'যত মত তত পথ' এই যুগবাণীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

বলরামপুর (মেদিনীপুর)—গত ৬ই বৈশাখ বলরামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা সম্পন্ন হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি

সহ সংকীর্তন করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে অপরাহ্ণে একটি সভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বক্তৃতা করেন।

কৃষ্ণনগর (নদীয়া): গত ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল (১৯৫৭) কৃষ্ণনগরের নবনির্মিত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন সন্ধ্যায় আশ্রমপ্রাঙ্গণে বৃহৎ জনসভায় শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (প্রথম মুন্‌সেফ) মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বেলুড় মঠের স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

পরদিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, গীতা পাঠ, হোম ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। আশ্রমের বৃহৎ প্রার্থনা-মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বৃহৎ প্রতিকৃতি পুষ্প ও মাল্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় ও তথায় সারাদিনব্যাপী ভজনকীর্তন গানে আশ্রম মুখরিত হইয়া উঠে। দ্বিপ্রহর বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৭॥টা পর্যন্ত প্রায় ২৫৯০ শত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান।

গোরক্ষপুর: স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর উদ্যোগে বিগত ২৩শে মার্চ শনিবার হইতে ২ দিন ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বারাণসী কেন্দ্র হইতে আগত স্বামী অপূর্বানন্দ প্রমুখ সাতজন সন্ন্যাসী যোগদান করিয়া এখানকার এই প্রথম উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। প্রথম দিন বৈকাল ধর্ম-সম্মিলনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা করার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কানপুর শাখার স্বামী চিদাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে হিন্দীতে মনোরম ভাষণ দেন। ২৪শে মার্চ বিশেষ পূজা ও হোমাদির পর সন্ন্যাসিবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ নামকীর্তন ও ভজন করেন। দ্বিপ্রহরের পরে প্রায় ১২০০ নরনারীকে ভোজন করান হয়। সন্ধ্যাকালে এক সভায় বাংলায় স্বামী অপূর্বানন্দ এবং হিন্দীতে অধ্যাপক কমলা-প্রসাদ সিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

খামারিয়া (জব্বলপুর)—শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ দ্বারা গত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল, বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। উভয় দিবসই বৈকালে সভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ, বিচারপতি মাননীয় শ্রীচতুর্বেদী, অধ্যক্ষ ডঃ নেরুলা প্রভৃতি ভাষণ দেন।

রেডিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র

নক্ষত্রমণ্ডলকে জানতে মানুষ এতদিন নির্ভর করে এসেছে আলোক-রশ্মি ও বৃহদাকার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ওপর। আলোক যে জ্ঞান বহন করে এনেছে কোটী মাইল দূর থেকে—তাকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানী এতদিন ব্রহ্মাণ্ডের রূপ কল্পনা করার চেষ্টা করেছেন।

সম্প্রতি কেম্ব্রিজ-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আর এক রকম যন্ত্র তৈরী করেছেন, তার নাম রেডিও দূরবীক্ষণ (radio telescope); এর সাহায্যে নভোমণ্ডলের বিভিন্নস্থান থেকে ক্ষীণ রেডিও রশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে radio star বা রেডিও নক্ষত্র। আজ পর্যন্ত অন্ততঃ ২০০০ রেডিও নক্ষত্রের অস্তিত্ব জানা গেছে।

যে রশ্মির সাহায্যে বেতার বার্তা প্রেরণ করা হয় তাকেই রেডিও রশ্মি বলে—এই রেডিও-রশ্মি ও আলোক-রশ্মির মধ্যে প্রকারগত ভেদ নেই, পার্থক্য শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে; সেজন্য সাধারণ নক্ষত্র ও রেডিও নক্ষত্রকে এক জাতীয় নক্ষত্রেরই বিভিন্ন অবস্থা বলে মনে করা হয়।

এই নবনির্মিত যন্ত্রের আবিষ্কার যেমন আমাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু নূতন জ্ঞান দেবে, তেমনই আভাস দেবে আমাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে আরও বহু নক্ষত্রের—যাদের জানবার মত যন্ত্র আমরা এখনও তৈরী করতে পারি নি। সৃষ্টিকে জেনে বিজ্ঞানী যে কোনদিন ইয়ত্তা করতে পারবে বলে মনে হয় না—তবে একদিন না একদিন তার মন সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার দিকে ফিরে তাকাবে।

—(Science and Culture)

ভ্রম সংশোধন:

গত বৈশাখ সংখ্যা পৃঃ ১৭৫; স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ-সংবাদে: ১৯২৪ খৃঃ তিনি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন।

উদ্বোধন

শ্রীগুরুর দক্ষিণামূর্তি

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমান-নগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষীকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে॥

* * *

নিদ্রাকালে স্বপ্নের প্রভাবে গৃহপরিজন শত্রুমিত্র অশ্বগবাদি যানবাহন বৃক্ষলতা দেশবিদেশ সম্ভব অসম্ভব নানা ভাব অনুভূত হয়—নানা পদার্থ যেন দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহারা তো বাহিরে নাই—তাহারা মন হইতে উদ্ভূত, মনেই অবস্থিত; অবশেষে মনেই লয় পায়।

সেইরূপ অজ্ঞানকালে অনির্বচনীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে যে বিচিত্র বিশ্বজগৎ বহির্ভাগে বিস্তৃত বিরচিত বলিয়া বোধ হয়—তাহার উৎপত্তিও অন্তরের অন্তরে। দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর ন্যায় এই বিশ্বজগৎ চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত।

নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রতীতি-প্রবাহ—অপরিবর্তিত সাক্ষীর মত দর্শন করিয়া জ্ঞানী অনুভব করেন, একই আত্মা নানারূপে প্রতীয়মান। পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি নিজের এই শাশ্বত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' স্বরূপ উপলব্ধি করেন—সেই শ্রীগুরুর রূপধারী পরম করুণাময় জ্ঞান ও প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে প্রণাম করি। তিনিই করুণাপরবশ হইয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া আমাদিগের অজ্ঞান-দুঃখ দূর করিতে পারেন।

কথাপ্রসঙ্গে

আণবিক যুগ ও বিশ্ব-শান্তি

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সিংহল সফরের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রথমে কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে, পরে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ কেন্দ্রে ও সিংহলের বৌদ্ধ ছাত্র-সংসদে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার যে চিন্তা ব্যক্ত করিয়াছেন—তাহাতে ভারতের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে; এই কথাই ভারত চিরদিন নানা ভাবে নানা ভাষায় বলিয়া আসিতেছে।

তিনি গভীর উদ্বেগের সহিত বলিয়াছেন, 'আজ আমরা লক্ষ্য করিতেছি, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ। আমার কর্মপরিধি আমার দেশের মধ্যেই নিবদ্ধ, কিন্তু আমরা বাধ্য হইয়াই আন্তর্জাতিক সমস্যাতেও আগ্রহান্বিত, কারণ ভারত বিশ্বব্যাপার হইতে বিচ্ছিন্ন নয়; আজ যখন সমগ্র মানবজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা তখন আমাদের নিজের যতই বিশেষ সমস্যা থাক—আমরা সাধারণ সমস্যায় উদাসীন থাকিতে পারি না।'

সেবার ভাব লইয়া দুঃখ দুর্দশা বিপদের সময় বন্ধুর মত সাহায্য করিতে আগাইয়া আসার ভাবটি বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন, এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানে এইরূপ করা হয়, সেখানেই মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধকে দৃঢ় করিয়া একদল মানুষ যথার্থ বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করিতেছেন।

এই ভাব লইয়াই দুই বৎসর পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বৌদ্ধ জীবননীতির রাজনৈতিক সংস্করণ পঞ্চশীলের প্রস্তাব করা হয়। অনেকেই এ বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই নীতি অনুযায়ী কাজ কতটুকু হইয়াছে? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তির জন্য আজ শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতাই একান্ত প্রয়োজনীয়,—এ কথা স্বীকার করিলেও, শতবার মুখে বলিলেও কেন এই পথে কাজ করা সম্ভব হইতেছে না, ইহাই আজ প্রধান বিচার্য।

সিংহলে ছাত্রদের সভায় শ্রীনেহেরু যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,—কারণ আণবিক যুগের সমস্যার সমাধান করিতে গেলে পূর্বে সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন :

'এই সমস্যাগুলি যে শুধু কঠিন তাহা নয়, গুণগতভাবে বর্তমান সমস্যাগুলি—পৃথিবীর পূর্ব সমস্যাগুলি হইতে পৃথক, মনে হয় বিভিন্ন স্তরে ইহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

'আমরা আণবিক শক্তি, আণবিক বোমা প্রভৃতির কথা বলি। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহারা সম্পূর্ণ নূতন, মানব সমাজে এগুলি মহা কল্যাণও বহন করিয়া আনিতে পারে।'

সর্ব সমস্যার সমাধানের জন্য পরিশেষে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে—মানুষেরই মনুষ্যত্বের কাছে। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন :

'মনে হয় বর্তমানে আমরা যে প্রধান সমস্যাগুলির সম্মুখীন—নিছক অর্থনীতি বা রাজনীতির উপায়ে সেগুলির সমাধান হইবে না। পরিচিত রাজনৈতিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্র হইতে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে নৈতিক-মানসিক জগতে।'

বর্তমান বিশ্বসমস্যা-সমাধানে ইহাই ভারতীয় সমাধান, এবং মনে হয় একমাত্র সমাধান। তত্ত্বের দিক দিয়া সমাধানে উপনীত হইলেও—সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহাকে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির উপরই আজ তাহার শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।

পৃথিবী আজ মহামৃত্যুর ছায়ায় প্রহর গণিতেছে।

বিজ্ঞানসহায়ে সুনিয়ন্ত্রিত আণবিক অস্ত্রযোগে আগামী কোনও যুদ্ধের পরে যে সামগ্রিক ধ্বংস পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিবে তাহাতে এক পক্ষ হয়তো একেবারে ধ্বংস হইবে, অপর পক্ষও বিধ্বস্ত হইবে।

মনুষ্যকুল একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে কি না কে জানে? তবু, মনুষ্য-সমাজ ও সভ্যতা বিনষ্ট হইতে পারে ভাবিয়াই মানুষ আজ আতঙ্কগ্রস্ত; তাই আজ শান্তির জন্য সকলের এত আগ্রহ।

যে প্রধান 'শক্তি'গুলি পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া সমরায়োজন বাড়াইতেছে—তাহাদেরও মূল লক্ষ্য হইল যুদ্ধকে এড়ানো। তাহাদের মত, যদি উভয় পক্ষ সম-সমান যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিত হয়, তবে আণবিক যুদ্ধ কখনই হইবে না। তাই তাহাদের মতে বিপক্ষ শক্তিকে আণবিক অস্ত্র ব্যবহারে নিরুৎসাহ করার জন্যই এই আণবিক অস্ত্র-নির্মাণ, এবং উহার ক্রমোন্নতির জন্যই এই বিনাশধর্মী পরীক্ষা-পরম্পরা; বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে ইহা একান্ত প্রয়োজন। শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীর পক্ষে এ যুক্তি বোঝা কঠিন। কিন্তু ইহাই আজ বিশ্ব-পরিস্থিতি, এবং ইহারই জন্য আজ ঘন ঘন পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ, যাহা প্রতিবারে পৃথিবীর নানাস্থানে ৫০,০০০ ব্যক্তির জীবনে ধীরে নীরবে অলক্ষিতে মৃত্যুর বীজ বহন করিয়া আনিতেছে।

একটি মুমূর্ষু মানবকে কয়েক দিনের জন্য, কয়েক ঘণ্টার জন্য বাঁচাইতে চিকিৎসাবিজ্ঞান কত গবেষণা করিয়াছে! মানুষের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিকগণ কত না চেষ্টা করিতেছেন! ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়—সেই জ্ঞান ও কল্যাণের সাধক-পুরোহিতগণের সমগোত্রীয় একদল বৈজ্ঞানিকই আজ সমষ্টি-মৃত্যুযজ্ঞের হোতা হইয়াছেন!

আশার সংবাদ—প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে। আমেরিকার দুই হাজার বিবেক-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের স্বাক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে, আরও হইতেছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আণবিক বোমার পরীক্ষা বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিকগণ যেন শান্তি ও কল্যাণের জন্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তি লইয়া পরীক্ষা না করেন।' ভারতের বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি ডক্টর রামন্‌ও বলিয়াছেন, জীবিকার জন্য আণবিক মারণাস্ত্র লইয়া পরীক্ষা করা অপেক্ষা বৈজ্ঞানিকগণের অনাহারে প্রাণত্যাগও শ্রেয়।

পাশ্চাত্ত্য মন পরীক্ষায় বিশ্বাসী, অভিজ্ঞতায় নয়। 'শান্তির জন্য যুদ্ধ', 'যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য যুদ্ধ'—এ ত বহু পুরাতন ও ব্যর্থ নীতি। ইওরোপীয় রণাঙ্গনেই, আমাদের চক্ষের সমক্ষেই দুইবার ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। আবারও কি ঐ ভ্রান্ত নীতির পরীক্ষার জন্য কোটি কোটি অনিচ্ছুক নিরপরাধ যুবকের জীবন বিসর্জন দিতে হইবে? তদপেক্ষা ইহাই কি যুক্তিযুক্ত নয়, অন্য কোন নীতি পরীক্ষা করা হউক? সে নীতিও নূতন নয়, বহু পুরাতন পরীক্ষিত নীতি—মানুষকে মানুষ ভাবিয়া লইয়া পারস্পরিক বোঝাপড়ার নীতি,—ধর্মের নীতি, বুদ্ধের নীতি, খৃষ্টের নীতি! প্রেম ও প্রীতির নীতি, ত্যাগ ও সেবার নীতি!—প্রাচ্য-দেশের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জীবন-নীতি। যখনই মানুষ ইহার অনুশীলন করিয়াছে তখনই দেখা গিয়াছে মনুষ্য-সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এ কথা কি ঐতিহাসিক সত্য নয় যে বুদ্ধের পরই আসমুদ্র হিমাচল ভারতের জনসাধারণ ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে?—ভারত জগতের তীর্থে পরিণত হইয়াছে? এ কথাও কি সত্য নয় যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পরই বর্বর জাতিগুলি ধীরে ধীরে সভ্যতার স্তরে উঠিতে শুরু করিয়াছে? বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া ভারতে এবং বৃহত্তর ভারতে শিল্পকলা সাহিত্য ও স্থাপত্যের উন্নতি জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে। খৃষ্ট-ধর্মকে ঘিরিয়া ইওরোপেও কি অনুরূপ উন্নতি হয় নাই?

ধর্মনীতির সূক্ষ্ম শক্তি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বচন:

'আলেকজাণ্ডার সীজার ও নেপোলিয়নের রাজ্য তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে—আর সূত্রধর পুত্রের (খৃষ্টের) রাজ্যসীমা দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে !'—ধর্মপ্রাণ অশোকের রাজ্য যতই বিস্তৃত হউক তাহাও সংকুচিত হইয়া ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ; কিন্তু আজও বিরাজমান তাঁহার কীর্ত্তি—প্রেম ও প্রীতির মাধ্যমে পূর্বে ও পশ্চিমে প্রচারিত প্রসারিত তাঁহার 'সদ্ ধর্ম'। বৌদ্ধধর্মের প্রতীকস্বরূপ অশোকস্তম্ভ অন্ধকার পৃথিবীতে আজও সমুন্নতশীর্ষে আলোক-স্তম্ভের কাজ করিতেছে।

গত তিনশত বৎসরের বিজ্ঞানের সাধনা নানাবিধ উন্নতির মধ্য দিয়া চরম সাফল্যের শেষ মুহূর্তে যেন আজ মানুষকে চরম অকল্যাণের মাঝে—অবধারিত মহামৃত্যুর সম্মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে ; এ যেন পর্বতারোহণের শেষ ধাপে উর্ধ্বমুখী ঢালু পথের বাঁকের সীমায় আসিয়া বিকট খাদের মুখে যন্ত্রযান চালকের আয়ত্তের বাহিরে গিয়া যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করিয়াছে! এই চরম মৃত্যু-ভয়-জনিত অশান্তির মধ্যে মানুষ আজ নূতন করিয়া চিনিতেছে জীবনকে, নূতন করিয়া চাহিতেছে শান্তি।

কিন্তু অমৃতময় জীবনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার শক্তি কি বিজ্ঞানের আছে? কিংবা সামাজিক, পারিবারিক, শারীরিক, মানসিক কোনও প্রকার শান্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতা কি বর্তমান রাজনীতির বা রাষ্ট্রনেতাদের আছে ?

তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন সত্য—কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়—এ চেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক হইলেও সমষ্টিগতভাবে আন্তরিক নয়; কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন আণবিক বোমা-বিস্ফোরণই গত যুদ্ধের যবনিকাপাত করিয়াছে। তাঁহারা ইহার ভয়াবহ মহাশক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত! তাঁহারা মুখে শান্তির কথা বলিলেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আপোষ-মীমাংসার বৈঠকের প্রথম উদ্দেশ্য কালক্ষেপ ও শক্তিবৃদ্ধি করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বিপক্ষকে দোষী প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের ন্যায়ের পক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা।

আণবিক অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে করিতে উহা আজ এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, যখন উভয় পক্ষ দ্বারা প্রচণ্ড আক্রমণই সম্ভব, আত্মরক্ষার উপায় এখনও অনাবিষ্কৃত। উভয় পক্ষই ধ্বংস-বিশারদ, তাহারা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতেই জানে, সংবরণ করিতে জানে না; অতএব প্রলয় আসন্ন। আজ এই বিশ্বব্যাপী বিভীষিকার জন্যই বিশ্বশান্তি-প্রচেষ্টা।

কিন্তু বিজ্ঞানের বলে এক পক্ষ আত্মরক্ষামূলক আবিষ্কার একটা করিতে পারিলেই আবার আসিবে ভয়প্রদর্শনের পালা। তাই মনে হয়, এ শান্তি-প্রচেষ্টা আন্তরিক নয়, নিতান্ত সাময়িক। আবার একথাও ঠিক—বর্তমানে যখন ভয়ার্ত সাধারণ মানব শান্তির প্রয়াসী, এই পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বব্যাপী স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচনা করিতে না পারিলে হয়তো পরে আর ইহা সম্ভব হইবে না। হয় এখন, নহিলে কখনও নয়।

আমাদের বিশ্বাস—মানুষের, তথা মানুষের প্রিয় কৃষ্টি সমাজ ও সভ্যতার উদ্বর্তনের জন্য আজ একান্ত এবং একমাত্র প্রয়োজন মানুষের মনের উন্নয়ন, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ; ব্যক্তিগত জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলের সচেতনতা! জড়বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি মানুষকে অত্যধিক যন্ত্রনির্ভর করিয়া, তাহাকে যন্ত্রাংশে পরিণত করিয়া—'মন' সম্বন্ধে তাহার চেতনা নষ্ট করিয়াছে। শারীরিক ভোগের বাহুল্য ও বৈচিত্র্যই জড়বাদী জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য! যন্ত্র ও বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষকে যন্ত্রাংশবৎ ব্যবহার করিয়া, কোথাও তাহাকে অবমানিত করিয়া, কোথাও তাহাকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া প্রভূত ভোগ্য-পণ্য উৎপন্ন হইল—কিন্তু ভোক্তা কই? সে ঐ

যন্ত্রেরই পার্শ্বে জড়পদার্থের মত নিঝুম হইয়া, যন্ত্রেরই মত প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া আছে, বুঝি বা বিশ্রাম লইতেছে ; তাহার ভোগ করিবার অবসর নাই, শক্তি নাই—কোথাও বা উপায় নাই। বর্তমান বিশ্ববিপদের মূল কারণ এই বিপথে পরিচালিত অপরিমিত যন্ত্রায়ণ, যে কারণে সাধারণ মানুষ অবমানিত, অবহেলিত !

তাই আজ শান্তির জন্য বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর নেতাদের বৈঠক বা বিবৃতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে চলিবে না, তাহা হইলে কল্পিত সমষ্টি-কল্যাণের নামে পুনশ্চ ব্যষ্টির স্বার্থ, ব্যক্তির জীবন বলি দেওয়া হইবে। ব্যষ্টি বিনষ্ট হইলে সমষ্টি থাকে কোথায় ? ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিলুপ্তির ভয়ই আজ মানুষকে শান্তির জন্য ব্যগ্র করিয়াছে—আজ মানুষ সমষ্টি-মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া সমষ্টি-শান্তি প্রার্থনা করিতেছে। বিশ্বধ্বংসী যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে তাহারই শেষ চেষ্টা করিতেছে।

এই চেষ্টা সফল করিতে গেলে বর্তমান বিজ্ঞান-পুষ্ট সভ্যতার মূলে যাইতে হইবে ; যে সভ্যতা এই মহামৃত্যুর বিভীষিকার কারণ, তাহা এক প্রকার রোগ-বিশেষ। এ রোগের বীজাণু সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়াছে শিল্প-বিপ্লবের সময় হইতেই। তাহার পর হইতে ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রকার তন্ত্র-চিকিৎসার পর মানুষ আজ এই দুরবস্থার সম্মুখীন—যখন দুই শক্তিগোষ্ঠী পৃথিবীকে তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে গিয়া মনুষ্যজীবনকে লইয়াই ছিনিমিনি খেলিতেছে। শত প্রতিবাদসত্ত্বেও খ্রীষ্টম্যাস দ্বীপে নির্বিঘ্নে এবং সবিক্রমে বোমার পর বোমা বিস্ফোরিত হইল। আবার ফ্লোরিডা হইতে অত্যদ্ভুত রেডিও-চালিত ঘণ্টায় ২২০০ মাইলগামী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া জগৎকে চমকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পিত শত্রুকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল।

আণবিক বোমা একদিনেই আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহার পরই উদজান বোমা—তাহার পর এই রেডিও-চালিত ক্ষেপণাস্ত্র ! সাধারণের অজ্ঞাত আরও কত গোপনাস্ত্র প্রতিদিন আবিষ্কৃত হইতেছে, যাহা জনসাধারণের জানিবার উপায়ও নাই ; যুদ্ধকালে তাহাই নিরপরাধ জনসাধারণেরই জীবন-হানির কারণ হইবে—যেমন হইয়াছে নাগাসাকি ও হিরোশিমায়। সেই মহাদুর্দিনের পুনরাবৃত্তি ব্যাহত করিবার অধিকার মানুষমাত্রেরই আছে। কিন্তু কি উপায়ে ?

এই যে সব আণবিক আবিষ্কার কেন হইতেছে—কাহারা করিতেছে—জানিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। গবেষণা করিয়া আবিষ্কার করিতেছেন অবশ্যই বৈজ্ঞানিকেরা, তাঁহাদের উৎসাহদাতা অন্নদাতা মন্ত্রণাদাতা রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন-মতবাদী বিরুদ্ধমতবাদী রাষ্ট্রনেতাগণ প্রতিযোগিতার আবর্তে পড়িয়া একই প্রকার কার্য করিতে বাধ্য হইতেছেন, একই পথে চলিতেছেন—ইহাই আশ্চর্য, ধ্বংস-কার্যে তাঁহাদের মতবিরোধ নাই ! ভয় ও বিদ্বেষজনিত এই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাবই বর্তমান বিজ্ঞানপুষ্ট আর্থনীতিক সভ্যতার অভিশাপ ! বলিতে গেলে ইহাই বর্তমান সমাজশরীরে রোগবীজাণু—যাহা মহামারী-রূপে পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া মানুষের স্বাভাবিক শান্তি ও আনন্দ নষ্ট করিয়াছে, রাজনীতি সমাজনীতি সব কিছু আচ্ছন্ন করিয়া মনুষ্য-জীবনকেই বিপন্ন করিয়াছে, অহরহ তাহাকে মৃত্যুভয়ে কণ্টকিত করিতেছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনে যে এষণা কাজ করিতেছে—তা শক্তি ও সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতা। বিংশ শতাব্দীর শিল্প-সভ্যতার জীবন এই প্রতিযোগিতায়, মরণও এই প্রতিযোগিতায়।

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির নামে মানব নির্বিচারে, স্বতঃসিদ্ধের মতো মানিয়া লইয়াছে—জীবনে

যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন, অতএব প্রতিযোগিতায় 'যোগ্যতম' হওয়ার জন্য যে কোনও প্রকার নীচতা নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে তাহার বিবেক কুণ্ঠিত হয় না, যথা ব্যক্তিগতভাবে—তথা জাতিগতভাবে।

ইহার দৃষ্টান্ত সমসাময়িক ইতিহাসে এত রহিয়াছে যে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রতিযোগিতার চরমাবস্থায় এক মল্লকে নিহত করিয়া অপর মল্ল নিজে আহত হইয়াছে—এ তো সে-দিনের সচিত্র সংবাদ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ হিংসার পথ, প্রতিযোগিতার পথ, যুদ্ধের পথ, মৃত্যুর পথ; সহযোগিতার পথ প্রীতির পথ, জীবনের পথ, শান্তির পথ।

মানুষ বুদ্ধিবলে এবং সহযোগিতার বলেই বন্যজন্তুর আক্রমণ হইতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, নিছক শারীরিক শক্তিতে নয়। একথা অবশ্য সত্য—মানুষে মানুষে যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ মানবজাতির মতই পুরাতন। একদিন পেশীর বলই ছিল শৌর্যের পরিচায়ক, বীর্যের মাপকাঠি; কিন্তু আজ মানুষ এমন এক অবস্থায় উপনীত—যখন আর জাতি-উপজাতির প্রশ্নে নয়, দেশ-বিদেশের প্রশ্নেও নয়, মতবাদের ভিত্তিতে মানব বিভক্ত! তাই যদি হয়, তবে মতবাদের লড়াই মানসিক স্তরেই হউক; তাহার জন্য ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র লইয়া খেলা এবং তজ্জনিত সামগ্রিক ধ্বংস বা সভ্যতার বিলোপ নিশ্চয়ই কোন মতবাদীর অভিপ্রেত নয়। পরিশেষে বক্তব্য—যে মত-প্রভুত্ব ও ভোগের প্রতিযোগিতার ভাব হইতে এ যুগের রোগ সংক্রামিত হইয়া প্রসারিত হইয়াছে, প্রতিষেধক দিয়া সেই মহামারী প্রতিরোধ করিবার সময় এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। প্রথম ও প্রধান প্রতিষেধক চিন্তা এই যে—মানুষের উন্নতির জন্যই মতবাদের প্রয়োজন, মতবাদের বিস্তারের জন্য মানুষ নয়।

জড়বিজ্ঞান মানুষকে সুখ দিয়াছে, সম্পদ দিয়াছে, মৃত্যুর বিভীষিকা দিয়াছে, শান্তি দিতে পারে নাই। তাহার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দূর করিয়া সহযোগিতামূলক জীবনাদর্শ রচনা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে হয়তো এক-জনের ভাগে ভোগের কিছুটা কম পড়িবে,—'ত্যাগের ভিতর দিয়া ভোগ করা'র নীতি গ্রহণ করিতে হইবে; তবেই আজ মানুষের মহতী বিনষ্টি ব্যাহত হইতে পারে। প্রকৃতি ভোগমুখী, স্বার্থমুখী; সংস্কৃতি ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, বহুজনহিতায়।

যে মানুষ একদিন একা এক প্রস্তর খণ্ড সহায়ে বন্যপশুর আক্রমণ ব্যাহত করিয়াছে—পরদিন যে তীরধনুর সহায়ে দূর হইতে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তার পরদিন সেই আবার দলগঠন করিয়া অন্য এক দলকে প্রতিরোধ করিয়াছে, এক সবল জাতি দুর্বল উপজাতিকে জয় করিয়াছে, তারপর ক্রমশঃ-উৎকর্ষশীল অস্ত্রসহায়ে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যও সে স্থাপন করিয়াছে। সে কি আজ মূর্খের মত এই প্রচণ্ড আণবিক অস্ত্রের দ্বিমুখী ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া শত্রুকে ধ্বংস করার নামে নিজেকেও ধ্বংস করিবে? অথবা—বুদ্ধিবলে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া কল্পিত শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করিয়া, সমগ্র মানবজাতিকে এক মহাজাতিতে ঐক্যবদ্ধ করিয়া, বিশ্ব-শাসন-তন্ত্র প্রবর্তিত করিয়া নূতন যুগের সূচনা করিবে? যেখানে দেশ-জাতি-ধর্ম-ভাষার বিভেদে বিভ্রান্ত না হইয়া সর্বপ্রকার শান্তি ও স্বাধীনতার অধিকার লইয়া মানুষ আগাইয়া চলিবে উত্তরোত্তর কল্যাণের পথে;—যেখানে সমবেতভাবে গবেষণা করিয়া আণবিক শক্তিকে মানুষ কাজে লাগাইবে কৃষিকার্যে ও খাদ্য-উৎপাদনে, রোগ নির্ণয়ে নিবারণে ও নিরাময়ে; পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন প্রান্ত নিকটতর করিয়া দেশবিদেশের সীমা দূর করিবে; সহজ বিদ্যুৎ-শক্তির সরবরাহ দ্বারা মানুষের কায়িক শ্রম লাঘব করিয়া তাহাকে সুখ, শান্তির ও উচ্চতর জীবন-বিকাশের অবসর দিবে;—

যেখানে পারস্পরিক ভয় ও কলহের পরিবর্তে বিরাজ করিবে শান্তি ও মৈত্রী !

অভাব ও ভয়কে অতিক্রম করিতে না পারিলে মুক্তি কোথায় ? শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্থাপিত না হইলে শান্তির মূল্য কি ? প্রীতি-বিবর্জিত কল্যাণ কি সম্ভব ? মানুষ পেশীর সমষ্টি নয়, মানুষ বোমা বারুদের ভোজ্য পদার্থ নয়, মানুষ কলকব্জার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নয়; মানুষ মননশীল প্রাণী—ক্রমোন্নতিশীল জীব ! তাহার শ্রেষ্ঠ ধন ঐশ্বর্য অস্ত্র যন্ত্র তাহার মন,—তাহারই শক্তিতে সে এতদিন চলিয়াছে, চিরদিন চলিবে—উন্নতি হইতে উন্নতির পথে। আণবিক যুগের অভ্যুদয়ে, মনে হয় তথাকথিত শিল্পযুগের প্রতিযোগিতামূলক দেশজাতি-পরিচ্ছিন্ন স্বার্থকেন্দ্রিক সভ্যতা হইতে নূতনতর উন্নততর সহযোগিতামূলক শান্তিপ্রীতিপূর্ণ উদার এক বিশ্বকৃষ্টির ভিত্তিস্থাপনার মাহেন্দ্রক্ষণ সমুপস্থিত !

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

ফাল্গুনের শুক্লাদ্বিতীয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি হইতে শুরু হইয়া তাঁহার দিব্য জন্ম ও জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে উৎসবের ধারা উৎসারিত হয়—ফাল্গুন চৈত্রকে প্লাবিত করিয়া বৈশাখের পরেও তাহা নিঃশেষিত হইতে চায় না।

কলিকাতায় ও শহরতলীর প্রায় প্রতি মহল্লায়, জেলা ও মহকুমা শহরে, তারপর পল্লীর প্রান্তরে—যেখানেই পাঁচজন মিলিত হইয়াছে, অথবা একজন মাত্র অনুরাগী ভক্তের শুভ বাসনা হইয়াছে সেখানেই বিচিত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন; সেখানেই পূজা পাঠ ভজন কীর্তন, ভক্ত জনগণের সম্মিলিত প্রসাদধারণ, সভায় প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর আলোচনা, পরিশেষে কোথাও ছায়া চিত্র, কোথাও কথকতা বা যাত্রাগানের পর উৎবের পরিসমাপ্তি।

এ বৎসর ১৯৫৭, ৩রা মার্চ—বাংলা ১৩৬৩, ১৯শে ফাল্গুন হইতে কয়েক মাস ধরিয়া সর্বত্রই উৎসবের সরল সতেজ অথচ অনাড়ম্বর ভাব ও অনুরাগ আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে। এমন সময় ১৩৬৩ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারী) সংখ্যার 'প্রবর্তকে'র সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার আলোচনা চোখে পড়িল : "বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হইল, কিন্তু তাহাতে বড় ভাবের অভাব, আন্তরিকতার অভাব।"

ভারতের নানা স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও সারা বৎসর ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব স্বতই অনুষ্ঠিত হয়—জনসাধারণ তাহা বিশেষভাবে অবগত।

'যুগের ভাব বিগ্রহে'র জীবন ও বাণী বুঝিবার এবং জীবনে তাহা পরিণত করিবার আকুল আগ্রহ সর্বত্র দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাময়িক উৎসব ব্যতীত মাসিক ও সাপ্তাহিক আলোচনা বা পাঠচক্রের মাধ্যমে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা নিত্যই পাইতেছি। তবে 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—অতএব সহসা চমকপ্রদ কিছু আশা না করিয়া শ্রদ্ধানত চিত্তে 'মহাজনগত পন্থা'র অনুসরণ করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই যথার্থ সাধনা।

মানব-জাতির ভাগ্যরচনায় যে সকল শক্তি কাজ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে—তাহাদের মধ্যে কোনটিরই প্রভাব সেই শক্তি অপেক্ষা নিশ্চয় অধিক নয়—যাহার বাহ্য প্রকাশকে আমরা 'ধর্ম' বলি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী রাঘবানন্দজীর দেহত্যাগ

স্বামী রাঘবানন্দ কলিকাতার উপকণ্ঠে বড়িশার সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৮৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (তাঁহার পূর্বনাম) প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ঐ কলেজ হইতে 'ঈশান স্কলারশিপ' পাইয়া তিনি বি. এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' প্রণেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার জীবনের গতিধারা আধ্যাত্মিক পথে চালিত হইলে তিনি বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসহচরগণের পদপ্রান্তে উপনীত হন ও সংসার ত্যাগের বাসনা ব্যক্ত করেন।

যথাসময়ে কৃতিত্বের সহিত এম. এ. ও বি. এল. পরীক্ষা পাস করিয়া ১৯১৩ খৃঃ ২৫ বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে গিয়া যোগদান করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯১৮ খৃঃ তাঁহারই নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে ১৯১৩ খৃঃ শেষভাগে তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেরিত হন—'প্রবুদ্ধ ভারতে'র তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানন্দজীর সহায়ক রূপে। পরে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গলাভ করিবার জন্য তিনি আলমোড়ায় কিছুকাল অবস্থান করেন এবং শ্যামলাতালেও স্বামী বিরজানন্দজীকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-রচনায় কিছুকাল সাহায্য করেন। ১৯১৮ খৃঃ স্বামী প্রজ্ঞানন্দজীর দেহত্যাগের পর তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। হিমালয়ে অবস্থানকালে তিনি কৈলাস ও মানস-সরোবর এবং কেদার-বদরী প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া তপস্যা ও বৈরাগ্যের ভাবটি জীবনে দৃঢ় করিয়া লন।

১৯২৩ খৃঃ স্বামী রাঘবানন্দ ইওরোপ হইয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। নিউইয়র্ক বেদান্ত কেন্দ্রের স্বামী বোধানন্দজীর সহায়করূপে যোগদান করিয়া সেখানে এবং ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি স্থানে বেদান্ত প্রচার করেন। প্রায় চার বৎসর আমেরিকায় কাটাইয়া ১৯২৭ খৃঃ তপোভূমি ভারতে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল থাকার পর হিমালয়ে ও দক্ষিণেশ্বরে তপস্যায় জীবন কাটাইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ প্রবল হয়। সংঘের নির্দেশে মাঝে মাঝে এবং পর পর তিনি পুরী, এলাহাবাদ ও গদাধর আশ্রমের কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। শেষদিকে আবার হিমালয়ে চলিয়া যান। গড়োয়াল জেলায় তপস্যাকালেই তাঁহার শরীর অপটু হইয়া পড়িলে তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

১৯৫৪ খৃঃ রক্তচাপ-জনিত ব্যাধির প্রথম আক্রমণে তাঁহার অঙ্গের একদিক অবশ হইয়া যায়, গত অক্টোবরে দ্বিতীয় আক্রমণে বাক্‌শক্তি ব্যাহত হয়। ১৭.৪.৫৭ তারিখে তৃতীয় আক্রমণের পর তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করেন। এই সুদীর্ঘ রোগভোগকালেও তাঁহার সহিষ্ণুতা ও বৈরাগ্য ভাব, তৎসহ বালকসুলভ সরলতা, আনন্দময় ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার সকলকে—বিশেষত সেবকগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিত। গত ১০ই জুন সন্ধ্যার পরই সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস-রোগ দ্বারা শেষবার আক্রান্ত হইয়া ৮-৩৩ মিঃ সময় গুরু ও ইষ্টনাম শ্রবণ করিতে করিতে এই তপঃপরায়ণ প্রবীণ সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করিয়াছেন। বেলুড় মঠে পুণ্য গঙ্গাতীরে ঐ রাত্রেই তাঁহার দেহের সৎকার করা হয়।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

মনুষ্যত্ব-বিকাশে বেদান্ত*

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে আমাদের জানতে হবে বেদান্ত কি ? বেদের অন্ত—বেদান্ত। আবার প্রশ্ন আসে বেদ কি ? 'বিদ্' ধাতু থেকে বেদ ; 'বেদ' অর্থে জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানের শেষ কথা বেদান্ত। বেদের শেষ ভাগ উপনিষদ্‌কেই বেদান্ত বলা হয়। যে জ্ঞান লাভ হলে মানুষের আর কিছু লভ্য থাকে না—সেই যে জ্ঞান—তাকেই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়। ব্রহ্ম কি ? বৃহত্তম বিশ্বব্যাপী বস্তু—যার থেকে আর কিছু বড় হতে পারে না,—তাই ব্রহ্ম, তাঁকেই পৃথিবীর ২৮০ কোটি মানব নানাভাবে সম্বোধন করে থাকে। যেমন—হিন্দুরা ঈশ্বর বা ভগবান, মুসলমানেরা খোদা বা আল্লাহ, আবার খৃষ্টানেরা বলে গড্। কিন্তু বস্তু সেই একই ব্রহ্ম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে—জল ; কেউ তাকে 'ওয়াটার' বলে, কেউ বলে পানি, কেউ বা অব্ বলে থাকে। কিন্তু যে যাই বলুক না কেন—পান করলে সকলেরই পিপাসা সমভাবেই নিবারিত হয়।

বেদান্ত-সূত্রের প্রথম সূত্রই হলো—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যার জানবার ইচ্ছা হয়েছে সেই তাঁকে জানতে পারবে। তাঁকে জানলে সকলেরই জ্ঞানের পিপাসা মিটে যায় ; আর এই জ্ঞানলাভই—মনুষ্যত্ব-বিকাশই—মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ব্রহ্ম যে এক, সে সম্বন্ধে বেদান্ত বলেছেন :

(১) 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি—বস্তু একই, পণ্ডিতগণ তাকে নানাভাবে ব্যক্ত করছেন।

(২) 'একং জ্যোতির্বহুধা বিভাতি'—জ্যোতি একই, নানারূপে ফুটে উঠছে।

(৩) 'একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি'—সত্য একই, বহুরূপে কল্পিত হচ্ছে।

সকল বেদ তাঁকে 'এক' বলেছেন। সৃষ্টি-স্থিতিলয়ের সেই বৃহত্তম শক্তি—তাকে আমরা ঈশ্বর বলি, কেউ আল্লাহ, কেউ জিহোবা বলে থাকে। তা যে এক—সে সম্বন্ধে আরও একটি উপমা দেওয়া যেতে পারে। যেমন—পিতা একটি বড় পরিবারের কর্তা—গৃহস্বামী ; তাঁর ছেলের পক্ষে তিনি পিতা—তাঁর মা বাবার পক্ষে তিনি পুত্র, তাঁর স্ত্রীর পক্ষে তিনি স্বামী, আবার তাঁর বন্ধুর পক্ষে তিনি বন্ধু। যদি এই একটি মাত্র পরিবারের একটি মাত্র লোক বিভিন্ন লোকের পক্ষে বিভিন্ন নামে অভিহিত হতে পারেন—তবে বিরাট পৃথিবীর ২৮০ কোটি মানুষ বৃহত্তম পরিবারের গৃহস্বামীকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করবে তাতে আর বিচিত্র কি ?

এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে পর পর চার প্রকার সাধন-প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। সেই সাধন-চতুষ্টয় সম্বন্ধে বেদান্ত বলছেন :—

(১) প্রথম 'বিবেক' বা নিত্যানিত্য-বস্তু-বিচার চাই। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমতঃ নিত্য বস্তু এবং অনিত্য বস্তু বিচার করতে হবে। যা চিরদিন আছে ও থাকবে যার ক্ষয় নেই, লয় নেই,—তাকেই নিত্য বস্তু বলে ; এবং যা আজ আছে, কাল নেই ; অথবা যা কাল হবে, পূর্বে ছিল না এবং দুদিন পরেও থাকবে না—তাকে অনিত্য বস্তু বলে। যা নিত্যবস্তু তাই গ্রহণ করতে হবে। অনিত্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "সদসদ্‌বিচার" চাই ; যা সৎ, নিত্য বা চিরস্থায়ী তাই গ্রহণ এবং যা অসৎ বা অনিত্য তা পরিহার বা পরিত্যাগ করতে হবে।

* ২৮.৫.৫৬ তারিখে চট্টগ্রামে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ

(২) দ্বিতীয় 'বৈরাগ্য': "ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগঃ।" কর্মফলভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। কোন কাজ করেই তার ফল কামনা করতে পারবে না। ইহলোকের সুখ, কি পরলোকে প্রাপ্য স্বর্গাদি সুখ উভয়েতেই বীতরাগ হতে হবে।

(৩) তৃতীয় সাধন: "শমদমাদি ষট্‌-সম্পত্তি"—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ছয় প্রকার সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে। আমরা সাধারণ সংসারী মানব যারা—তারা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়ি—গোলাম হয়ে পড়ি। আমাদের মোটেই ধৈর্য থাকে না। ইন্দ্রিয় আমাদের যে দিকে চালায় আমরা সে দিকেই ছুটি। চোখের ইচ্ছা হল—চল আজ কি 'ছবি' হচ্ছে দেখব—অমনিই ছুটে যাই। কানের ইচ্ছা হচ্ছে সঙ্গীত শুনব—অমনিই শুনতে যাই। জিহ্বার ইচ্ছা হচ্ছে—অমনি মিষ্টি খাই। এভাবে ইন্দ্রিয় আমাদের যে দিকে চালায় আমরা অন্ধের মত সেই দিকে পরিচালিত হই। আমরা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় ও মনের দাস হয়ে আছি। কিন্তু মহাপুরুষেরা ইন্দ্রিয়ের বা মনের দাস হন না।

বিচার করে দেখা যাক্—'আমরা মনের? না, মন আমাদের?' আমরা যদি মনের হই, তবে 'আমার মন, আমার মন' বলি কেন? শাস্ত্র বলেছেন 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ'। মহাজনেরা যে ভাবে চলেছেন সেটাই পথ। তাঁরা তো ইন্দ্রিয়ের দাস হন না। তাঁরা ইন্দ্রিয়কে দাস করে রাখেন। বহিরন্তরিন্দ্রিয় সংযমই দম ও শম, তার পর দুঃখ সহ্য করার নাম তিতিক্ষা, ভোগে অনিচ্ছা উপরতি, গুরু-বাক্যে বিশ্বাস শ্রদ্ধা, তারপর সমাধান—ইষ্টে চিত্তস্থাপন।

এই ষট্‌সম্পত্তি লাভ হলে শেষ বা চতুর্থ সাধন হচ্ছে 'মুমুক্ষুতা'। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কি চায়? শুধু মানুষ কেন—সমস্ত জীবজগৎ—সেই একটি—শুধু মাত্র একটী জিনিস চাচ্ছে—সেটি হ'ল মুক্তি বা শান্তি। কোথায় সেই শান্তি পাওয়া যাবে? সেই শান্তিময় যিনি—তাঁর থেকেই শান্তি আনন্দ নিতে হবে। পিপীলিকা এককণা চিনি পেল—তা পেয়ে মনে করল তার শান্তি হয়ে গেছে। কিন্তু সেটি ভোগ করা শেষ হতে না হতে আবার এককণা পাবার জন্য সে অশান্ত হয়ে ছুটাছুটি করে। আমরা শান্তির জন্য, আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করছি, বহির্জগতের নানা স্থানে নাচে, গানে, সিনেমায়, থিয়েটারে যাই শান্তি পাবার আশায়, মনে হ'ল শান্তি পেয়ে গেছি। কিন্তু ক্ষণেক পরেই আবার অশান্ত হয়ে পড়ি। এ ভাবে আমরা কোথাও চিরশান্তি খুঁজে পাই না। কিন্তু যখন আমরা কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য জানতে পারব, তখন আমরা আর অসত্য বস্তুর জন্য ছুটাছুটি করব না। সত্য বস্তু লাভ করবার জন্য ছুটে যাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ—সংসার-সম্বন্ধের অনিত্যতা বুঝে দস্যু রত্নাকর যখন সত্যের সন্ধান পেলেন তখন তিনি ঋষি বাল্মীকি হয়ে রামায়ণের মহাকবিতে পরিণত হলেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, "The very condition of life is death, and the very condition of death is birth. Death is inevitable." মৃত্যু অনিবার্য, জন্ম হলে মৃত্যু অবধারিত। কাজেই যে সত্য বস্তু লাভ হলে আমরা মৃত্যুর পারে যেতে পারি—যে বস্তু লাভ হলে আর কিছু লভ্য থাকে না, তা লাভ করাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। নইলে মানবজীবনের কোন মূল্য নেই, উদ্দেশ্য নেই। সকল ধর্মই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একই প্রকার বলে থাকেন। কোরান বলেন, "মিস্ত্রি যেমন একটি ঘর তৈরী করে তাতে অদৃশ্যভাবে এক কোণে তার নিজের নাম রেখে দেয়, সেরূপ আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে প্রতিটি মানুষের হাতে 'আল্লাহ' এই নাম রেখে দেন," কাজেই আমাদের প্রতিটি কাজের সময় চিন্তা করতে হবে—যাতে এই হাতে—যে হাতে আল্লাহর নাম লেখা

আছে তা দিয়ে যেন কোন প্রকার অন্যায় কার্য না করা হয়, অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ আমাদের ভালোর দিকে নিয়ে যায় আমরা যেন সে সমস্ত কাজই করি।

সকল প্রকার দানের মধ্যে জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান। অন্নবস্ত্র দানের দ্বারা মানুষের সাময়িক অভাব দূর হয়, স্থায়ী উপকার হয় না—আবার অভাব দেখা দেয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হলে পর মানবের আর কোন অভাব থাকে না—সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং সেই আত্মজ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মানবের পক্ষেই সম্ভব। কারণ প্রত্যেকের মধ্যে সেই ব্রহ্ম সমভাবে বিরাজমান—সকলেই পূর্ণ। কেউ বড় বা কেউ ছোট নয়। কিন্তু মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আমরা তা দেখতে পাই না। যাঁদের মায়া কেটে গেছে তাঁরাই দেখতে পান, 'আমিই সেই পূর্ণ।' আত্মজ্ঞান লাভে বিঘ্ন বা বাধা অজ্ঞান।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বললে ব্যাপারটা সহজে বুঝা যাবে। একজন ধনী লোক চট্টগ্রাম থেকে দিল্লী যাবেন স্থির করেছেন। তাঁর সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা—এক হাজার টাকার ৫০ খানা নোট। স্থানীয় এক বাটপার সে খবর জানতে পারে। ঐ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করবার মানসে সেও একখানা টিকিট করে ধনী লোকের গাড়ীতে চলতে থাকে। চট্টগ্রাম থেকে দিল্লী যেতে মোটামুটি তিন রাত্রি লাগে, প্রথম রাত্রিতে ধনী লোকের নিদ্রা যাবার পূর্বে টাকা বের করে গুনে তাঁর বাক্সের মধ্যে রেখে শুয়ে পড়লেন। তিনি নিদ্রাভিভূত হলে তখন ঐ তস্কর উঠে তাঁর বাক্স খুলে দেখে সেখানে টাকা নেই। সে প্রথমবারে বিফলমনোরথ হয়ে দ্বিতীয় সুযোগ সন্ধানের অপেক্ষা করতে লাগল। ধনী ব্যক্তি অনুরূপভাবে তার সামনেই সকালবেলা এবং রাত্রিতে আবার টাকা বের করে গুনে বাক্সের মধ্যে রেখে দিলেন। কিন্তু তস্কর সেবারও ধনী ব্যক্তি নিদ্রাভিভূত হলে বাক্সটি খুলে টাকা খুঁজতে লাগল কিন্তু টাকার সন্ধান না পেয়ে চিন্তিত হল, এভাবে তাদের গন্তব্য স্থান সন্নিকট হওয়ায় ভ্রমণ অবসান হতে চলল। তখন তস্কর মহাজনকে বলল, "দেখুন আমি একজন তস্কর—আপনার টাকা আত্মসাৎ করার মানসে আপনার অনুসরণ করছি। আপনি প্রতিদিন সকাল ও রাত্রে আমার সম্মুখে টাকা বাক্সে রাখেন, অথচ আমি আপনার নিদ্রিত অবস্থায় বাক্স খুলে টাকার কোনরূপ সন্ধান পাই না? আচ্ছা, আপনি কি কোন যাদু জানেন?" তখন ব্যবসায়ী বললেন, "দেখ, আমি কোনরূপ যাদু জানি না। প্রতি রাত্রেই আমি টাকা গুনে তোমার সম্মুখেই বাক্সর মধ্যে রেখেছি সত্য, কিন্তু আমি শোবার পূর্বে যখন তুমি স্নানঘরে ঢুকে পড় তখন আমি তাড়াতাড়ি টাকাগুলো তোমার শয্যার নীচে রেখে দিই। আবার সকালে যখন তুমি স্নানঘরে যাও তখন আমি টাকাগুলো এনে বাক্সে রেখে দিই। তুমি টাকা যথাস্থানে খোঁজনি, কাজেই কি করে পাবে?"

আমরাও শান্তির জন্য অন্ধের মত বহির্জগতে খুব ছুটাছুটি করি। কিন্তু বহির্জগতে প্রকৃত শান্তি নেই। বহির্জগতে বৈষয়িক আনন্দের চেয়ে অন্তর্জগতে আত্মানন্দের শান্তি কোটি গুণ বেশী। উহা প্রত্যেকের অন্তরে আছে, অন্তর্জগতে খুঁজতে হবে—বহির্জগতে তা কি করে পাবে?

বর্তমান ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্য কতই না উন্মুখ হয়ে পড়েছে। কয়েক শত বৎসর পূর্বে গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশ, প্রতিপত্তি দ্বারা সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল, কিন্তু আজ সেই সব দেশের স্থান কোথায়? আজ তারা ধ্বস্ত বিধ্বস্ত।

এ জগতে ধন, দৌলত, ঐশ্বর্য, বিত্ত, সম্পত্তি, মান, যশ বা শক্তি যে যারই অধিকারী হউন না না কেন আজ প্রত্যেকটি বস্তুর ঠিক ঠিক মর্যাদা

দেওয়া না হয় তবে কোনটিই থাকে না। নিজে বড় হবার জন্ত যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, ঝগড়া, বিবাদ এমন কি লড়াই বা তুমুল যুদ্ধ করুক না কেন, যদি শক্তির উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা না করে তবে সে কখনও কৃতকার্য হইতে পারে না; উহা জলের বুদ্‌বুদের স্থায় লয় প্রাপ্ত হয়। ইহা কি ব্যষ্টি, কি সমষ্টি সকলের পক্ষেই সত্য। জগতের ইতিহাসে বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে এই পৃথিবীতে যার যেটি প্রাপ্য তাকে সেটি দিলে যেমন সত্যের সেবা বা মর্যাদা রক্ষা হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। এই পৃথিবীতে গুরুজনকে সম্মান না করে কেউ বড় হতে পারে না। পিতামাতার মর্যাদা রক্ষা না করে ছেলে বড় হতে পারে না, শিক্ষক বা আচার্যকে সম্মান না করে শিষ্যের শক্তি বিকশিত হতে পারে না।

এই জগতে প্রত্যেক বস্তুরই মর্যাদা আছে। যাঁরা সেই মর্যাদা রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকেন তাঁদের আশ্রয়েই সেই সকল বস্তু চিরকাল থেকে যায়। মর্যাদার হানি হলেই মা লক্ষ্মী ঘর থেকে চলে যান। ভারতে বেদ-বেদান্তের মর্যাদা যতদিন অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন ভারতবর্ষ সমগ্র জগৎ-সমক্ষে ধ্যান-জ্ঞানের দেশ বলে সুপরিচিত ছিল। অবশ্য যুগ যুগান্তরে মহাপুরুষ ও অবতার-পুরুষদের আবির্ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় বটে, কিন্তু আবার যখনই মর্যাদার হানি হয়েছে তখনই জনের (জন সাধারণের) বেদান্ত বনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রধান শিষ্য বিশ্ববিশ্রুত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে সেই বনের বেদান্ত ঘরে ফিরেছে।

মানুষ নিজেকে চেনে না বলেই এত গোলমাল। নিজের আত্মা সম্বন্ধে কিছুই জানে না বলেই বাহিরে শান্তির জন্ত ছুটাছুটি করে। বেদান্তের আত্মতত্ত্ব বুঝাবার একটি সুন্দর গল্প: "দশমস্ত্বমসি"। দশজন লোক মিলে একসাথে বেড়াতে যাচ্ছিল এক জায়গায়। পথে এসে তারা এক বিরাট নদী পেলে। তাই সাঁতার কেটে তারা নদী পার হ'ল, এক এক বারে ২।৩ জন করে করে। সকলে পার হবার পর একজন বললে, গুনে দেখি আমরা দশজন ঠিক আছি কিনা; গোনার সময় সে বরাবর নিজেকে বাদ দেয়; কাজেই একজন কম পড়ে যায়। তখন প্রত্যেকেই একবার করে গুনতে আরম্ভ করলে, এবং প্রত্যেকেই একই প্রকার ভুল করতে লাগল, বার বার নিজেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। শেষে তারা ভাবলে, আমাদের কেউ হয়তো জলে ডুবে গেছে, নয়তো কুমীরে টেনে নিয়ে গেছে। বাড়ীতে আমরা সব আত্মীয় স্বজনদের কি জবাব দেব?—এই ভেবে তারা কাঁদতে লাগল। ক্রন্দনের এক মহা রোল পড়ে গেল। এই সময় সেখান দিয়ে একজন বুদ্ধিমান পথিক যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের কান্না শুনে ও ব্যাপার বুঝে সকলের হয়ে নিজে গুনে দেখালেন—তারা দশজন ঠিকই আছে, তখন তাদের একজনকে দিয়ে আবার গোনালেন, সে 'নয়' গোনার পর তিনি বললেন, 'দশমস্ত্বমসি'। এইভাবে তাদের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে আত্মজ্ঞান দিলেন; কাজেই তিনি তাদের গুরু হলেন। সংসারেও আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে গুরুর প্রয়োজন। সদ্‌গুরুই বলে দেন, ধর্ম বাহিরে নয়—শান্তি বাহিরে নয়, জ্ঞান বাহিরে নয়;—একেবারে ভিতরে, অন্তরের মধ্যেই। Each soul is potentially divine, প্রত্যেক আত্মাই স্বভাবতঃ সত্য পূর্ণ ও পবিত্র, Divinity is its birth-right. শুধুমাত্র মালা জপলেই ধর্ম হয় না, শুধু নামাজ পড়লেই ধর্ম হয় না এবং গীর্জায় গেলেই ধর্ম হয় না। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন, তা হলেই আত্মোন্নতি হয়, তার পরিণামেই Self-fulfilment সিদ্ধি বা পরিপূর্ণতা লাভ হয়।

যত্র নরঃ তত্র নারায়ণঃ; যেখানে নর সেখানেই

নারায়ণ, যত্র নারী তত্র গৌরী : যেখানে নারী সেখানেই গৌরী।

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বিস্তার করে বলেছেন—'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'। যেখানে জীব সেখানেই শিব অর্থাৎ ভগবানকে দেখতে হবে। শুধু মানুষে নয়, সকল প্রাণীতেই সমদৃষ্টি করতে হবে—আত্মদৃষ্টি করতে হবে। বেদান্তের শেষ সিদ্ধান্ত—কিছুতেই ভেদজ্ঞান রাখতে পারবে না, সব কিছুতেই সেই বিরাট আত্মা রয়েছেন, কাজেই ভেদবিভেদ থাকতে পারে না ; থাকে শুধু প্রেম, যার উদয় হলে মানুষে মানুষে, Caste and Creed বা জাতি-ধর্মের প্রশ্ন থাকে না, মতবাদের প্রশ্ন থাকে না, পরিবর্তে এক মহান্ ঐক্য দেখা দেয়। আজ মানুষ শান্তি স্থাপনের জন্ম ছুটাছুটি করছে ; একমাত্র বেদান্তের এই মহান শিক্ষা গ্রহণ করলেই পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে বলেছিলেন তা আমরা আজ বুঝতে পারছি, "India is still alive to contribute her quota to the perfect civilization of the whole world." দেশে দেশে এই বেদান্তের আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে জগতের সভ্যতাকে পূর্ণ করবার জন্যই ভারত আজও বেঁচে আছে। বেদ বলেছেন 'মাতৃদেবো ভব', 'পিতৃদেবো ভব', 'আচার্য-দেবো ভব'। পিতামাতাকে দেবদেবীবৎ পূজা করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সেটাকে আরও বাড়িয়ে বলেছেন, "দরিদ্রদেবো ভব মূর্খদেবো ভব।" এই শত শত দরিদ্র না খেয়ে মারা যাচ্ছে তাদের সেবা করতে হবে। তারা যেন দেবতার মান পায়। এই যে কোটি কোটি মূর্খ যারা অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে আছে তাদের সেবা কর দেবতাবোধে।

পল ডয়সন, ম্যাক্স মুলর প্রভৃতি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও মনীষীরা বেদান্ত সম্বন্ধে সর্বোচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন। বেদান্ত-দর্শনের চাইতে আর যে বড় দর্শন নেই—তাঁরা তা স্বীকার করেছেন।

বেদান্তের শিক্ষায় মনুষ্যত্বের চরম বিকাশে মানুষ ভাই ভাই হয়ে যায় ; কোনরূপ ভেদভাব বিবাদ বিসংবাদ যুদ্ধ বিগ্রহ থাকে না—পৃথিবীতে এক মহান ঐক্যের, মহান ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়—পৃথিবী চির শান্তির পথ খুঁজে পায় ; তা হ'লেই মানুষ একটা ভয়শূন্য আনন্দ অনুভব করতে পারে ; সমস্ত মানব গোষ্ঠী সব রকমের ভেদ ভুলে গিয়ে পৃথিবীতেই সর্বদা স্বর্গীয় আনন্দ উপলব্ধি করতে পারে। সমগ্র মানবজাতি যা চায় তা শান্তি। বেদান্ত দ্বারা মানুষের এই শ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ সম্ভব। বেদান্ত মানবকে অতিমানবত্বলাভে সাহায্য করে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির সর্বতোমুখী উন্নতি এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধন করে বেদান্তভাব মানবসভ্যতাকে কতখানি আগিয়ে দিয়েছে, ও আরো কত আগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আজ তা বুঝবার সময় এসেছে।

বেদান্তের আলোক প্রত্যেক গৃহে লইয়া যাও, প্রত্যেক গৃহে বেদান্তের আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠিত হউক, প্রত্যেকের ভিতরে দিব্যভাব সুপ্ত রহিয়াছে—তাহাকে জাগ্রত কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রভাতী সমুদ্রতটে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সুদূরের নীলাকাশ জলধির কোন্ সে বিন্দুতে
অগণন মুহূর্তের ফাঁকে ফাঁকে আলিঙ্গন করে !
মৃত্যুতরঙ্গিনী-স্রোত মিশেছে কি অমৃত-সিন্ধুতে
নব সৃজনের তরে ?
হৃদয়-অম্বর যেন দুলিতেছে চিত্ত-পারাবারে,
উদয়-অস্তের রাগে—
এমনি প্রত্যহ। অন্তরের সিন্ধু যেন কারে ডাকে
নিখিল প্রান্তর হোতে আলো অন্ধকারে
দুঃখে সুখে বৈরাগ্য-নিঃশ্বাসে—
চির যাযাবর প্রাণে—খেলা কেন সিন্ধুতে আকাশে ?

ভয়ার্ত শিশুর মতো ক্রন্দন বিলাপ
শুনি কার বালুবেলা তটে ! ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ দরিয়ায়
নিল যেথা শত শত শতাব্দীর সভ্যতা বিদায় !
পূষণের আবির্ভাব
উষার তোরণ-দ্বারে। ভাষা-হারা সতত বিদ্রোহ
তরঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে তবু আনে জীবনের মোহ।

অন্তহীন বারিধিরে আলিঙ্গন দিতে
অনন্ত আকাশ ব্যগ্র পৃথিবীর সান্ত সীমানাতে।
তরঙ্গ-ইঙ্গিতে আর আনন্দ-সঙ্গীতে
পরম আগ্রহ লয়ে মায়াজাল রচিতেছে প্রাতে
ঊর্মিদল। বায়ুস্রোতে বলাকারা চঞ্চল উদ্দাম।
একটি দৃষ্টির মতো ফেলে রেখে আপন হৃদয়
দূরের দুষ্প্রাপ্য তরে কি রহস্য করেছে সঞ্চয়
দুরন্ত জলধি ? —এই প্রশ্ন চিত্তে মোর জাগে অবিরাম।

কথামৃতের আলোয় অবতার-পুরুষ

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত

উপনিষদে অবতার পুরুষের কোনো উল্লেখ নাই। ঋষিরা ছিলেন তত্ত্বান্বেষী—জ্ঞানপথের পথিক। আর্যরা বীর ও শক্তিমান, প্রধানতঃ স্বীয় সাধনার শক্তিতেই তারা চেয়েছিলেন সত্যকে লাভ করতে। মৃত্যুর তোরণদ্বারে নচিকেতার বিজয়-অভিযান এই নির্ভীকতারই চরম পরিচয়। মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি গান করছেন—

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"

প্রণব ধনু, জীবাত্মাই বাণ; আর ব্রহ্ম সেই বাণের লক্ষ্য। লক্ষ্য ভেদ করতে হবে—প্রমাদ-হীন হয়ে। বাণের মত তন্ময়, অর্থাৎ লক্ষ্যের সাথে অভিন্ন হতে হবে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের ভগবান রসময়', মানুষের এই রসস্পৃহা চিরন্তন। সত্যকে ঋষিরা 'রসো বৈ সঃ' রূপেও উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু সেই আনন্দময়-তত্ত্বের মধ্যে মানুষ-ভগবানের কোনো স্থান ছিল না। প্রেমধর্মের বীজ উপনিষদে আছে, কিন্তু সে বীজ ভক্তিবাদে অবতারবাদে অঙ্কুরিত পল্লবিত হয়ে ওঠে নি।

অবতারবাদ—প্রাণধর্মের প্রকাশ। প্রাণের খেলার কোনো নিয়ম কিংবা কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নাই। ভক্ত কেন অবতারকে পূজা করেন, তা যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না। ভালবাসা বিচারের অপেক্ষা করে না—তার একটা নিজস্ব সত্তা আছে। সে স্ব-সম্পূর্ণ। ফরাসী দার্শনিক প্যাস্কালের মতে 'The heart has its own reasons of which reason does not know'—হৃদয়ের নিজেরই যুক্তি আছে, যা যুক্তি নিজেই জানে না।

কিন্তু প্রেমকে সত্য বলে গ্রহণ করলেই প্রাণের দেবতার অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয় না। ন্যায়বাদীদের মতে অনন্তের সান্ত হওয়া সম্ভব নয়। অন্তপক্ষে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রমাণও যুক্তির মধ্যে নেই, আছে তার অস্তিত্বের অনুভূতির মধ্যে। প্রমাণ বলতেই ন্যায়ের বিচার বোঝায় না। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি—আছে বলেই সত্য, কার্যকারণ আছে বলে নয়। ক্রমবিবর্তনবাদীদের মতে (Emergent Evolution) অপ্রাণ থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে পশুর প্রবৃত্তিজাত বুদ্ধি, এবং প্রবৃত্তিজাত বুদ্ধি থেকে মানুষের বিচারশক্তি (conceptual reason) জন্মায়। এই কম থেকে বেশী হওয়ার মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এ অযৌক্তিক, তবু এ সত্য। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার একটু রসিকতা করে বলেছেন—"Explanation is the interpretation of the more developed by the less developed"—অর্থাৎ 'ব্যাখ্যা করা', মানে একটা অল্পপরিণত ভাব দিয়ে একটা অধিক পরিণত ভাব বোঝানো।

ভগবানের আবির্ভাবের সব চেয়ে বড় প্রমাণ—এই অস্তিত্বের উপলব্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"দেখেছি বিচার করে একরকম জানা যায়, আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন, এর নাম অবতার—তিনি যদি তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন, তা হলে আর বিচার করতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। কি রকম জান? যেমন অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘসতে ঘসতে দপ্ করে আলো হয়। সেই রকম দপ্ করে যদি তিনি আলো জ্বেলে দেন, তাহলে সব সন্দেহ মিটে যায়। এরূপ বিচার করে কি তাঁকে জানা যায়?" আবার বলছেন, "তিনি অবতার

হয়ে আসেন—এটি উপমা দিয়ে বোঝানো যায় না। অনুভব হওয়া চাই—প্রত্যক্ষ হওয়া চাই"। যুক্তি দিয়ে প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করা চলে না।

অবতার প্রমাণসিদ্ধ,—যুক্তিসিদ্ধ নন কিংবা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধও নন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে বুদ্ধি দ্বারা তাঁর একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। তাঁরই শ্রীমুখের কথা—"তাঁর অবতারকে দেখা হলে তাঁকে দেখা হলো। যদি কেউ গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, সে বলে গঙ্গা দর্শন-স্পর্শন করে এলুম। সব গঙ্গাটা—হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না"। পূর্ণ থেকে অংশকে পৃথক করা যায় না। অসীম অনন্ত ভাগবত-চেতনার সাথে একীভূত অবতারকে অসীম থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। এ যেন—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"।

এই সুখে-দুঃখে-ভরা মাটির বুকে ভগবানের আবির্ভাব এক বিস্ময়ের বস্তু। এ যেন নিরাকারের সাথে সাকারের প্রণয় মিলন, রূপের সাথে অরূপের রাখীবন্ধন। ভগবান বারংবার নামরূপের বন্ধনে ধরা দিলেও তিনি নামরূপহীন। একদিন কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথি বন্ধু অর্জুনকে বলেছিলেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

—আমার জন্ম নাই, আমার জ্ঞান কখনও লুপ্ত হয় নাই। বিশ্বজগতের আমিই ঈশ্বর। সেই আমি নিজেরই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকে আশ্রয় করে মায়ায় যেন দেহ ধারণ করি।

সে মায়ার রূপ এবার ভগবান ফুটিয়েছেন কথামৃতে। "অবতারাদির 'আমি' পাতলা আমি। এ 'আমির' ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সব সময় দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে—পাঁচিলের দুইদিকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়।" সেই ফোকরটিই অবতার; সীমার মাঝে অসীম। ফাঁকটি সীমার গায়ে দেখা গেলেও এবং তার একটা আকার ফুটে উঠলেও সে নিজে শূন্য এবং অনন্তের মাঝে একাকার। কথামৃতের অবতারপুরুষ পরস্পর বিরোধী ভাবের এক অপূর্ব সমন্বয়। দার্শনিক হেগেলের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে, "Contradictions nestle in the very bosom of Eternity"—অনন্তের বুকে পরস্পর বিরোধী ভাব শান্ত সুখে জড়িয়ে রয়েছে।

"শক্তির লীলাতেই অবতার।" যে পরম শক্তির প্রকাশে এই বিশ্বসৃষ্টি—তারই ঘনীভূত রূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ; অলৌকিক তপস্যাবলে বলীয়ান্ ও বিচিত্র অনুভূতির রঙে রঙীন এই ভাগবত বিগ্রহ। সেই বিগ্রহের ভিতরেরই "সচ্চিদানন্দ বাইরে এল, এসে বললে আমি যুগে যুগে অবতার····· তারপর চুপ করে থেকে দেখি তখনও আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।" প্রশ্নোপনিষদে আছে—"প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত।" সেই পরমপুরুষের তপস্যায় সৃষ্টির বীণায় প্রথম রাগিণী বেজে উঠল, শ্রীমদ্ভাগবতেও পিতামহ ব্রহ্মা এই বিশ্ব-উন্মেষের প্রথম প্রভাতে নিজেরই অন্তরে শুনতে পেয়েছিলেন সেই শাশ্বত বাণী—"তপ, তপ, তপ"। সাধনার অর্থ প্রচ্ছন্ন আত্মশক্তির বিকাশ, প্রয়োগ কিংবা অভিব্যক্তি। ভগবানের সেই অভিব্যক্তিই এই জগৎ, এবং তাঁরই পূর্ণ বিকাশ অবতার পুরুষ। আবার ভগবানের সাধনার রূপ শক্তি-প্রকাশের বিগ্রহ। আদি পুরুষের প্রথম তপোমূর্তি আমরা দেখি নাই। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য পঞ্চবটীমূলে সত্য, শিব ও সুন্দরের যে আরাধনার রূপ এবার ফুটে উঠেছে তাকে অস্বীকার করব কোন প্রাণে? সে রূপ নিজেরই সম্বন্ধে ইঙ্গিতে বলছেন—"এক রকম তুবড়ি আছে যার ফুলকাটা আর ফুরায় না!"

বেদান্তের মতে ঈশ্বর সত্ত্বগুণপ্রধান। "ইয়ং

সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা"। সত্ত্বগুণ আলোর মত প্রকাশশীল; তম'র কাজ অন্ধকারে ঢেকে রাখা, আর রজ'র কাজ বিক্ষেপ কিংবা আলোড়নের সৃষ্টি করা। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥"

—শুকনো কাঠ তম'র প্রতীক, কারণ তার ভিতরের আগুন সে রেখেছে চেপে। তারপর দেখা গেল ধোঁয়া, সে আলোড়ন রজোগুণের। শেষে জ্বলে উঠল আগুন--কাঠ পর্যন্ত হয়ে উঠল আলো। এই আলো সত্ত্বের, যা থেকে হয় ব্রহ্মদর্শন। জীব কাঠের মত তামসিক, তার কর্মচঞ্চলতা রাজসিক ধোঁয়া। অন্তরের ভাগবত সত্তাকে ফোটাতে পারে সত্ত্বের আলো, এই সত্ত্বগুণেরই পূর্ণ প্রকাশে অবতারলীলা। তাই কথামৃতের ভগবান নিজের ভিতরে দেখলেন "পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য"। যে ত্যাগ, পবিত্রতা, ভক্তি, জ্ঞান, বিবেক ও বৈরাগ্য দিব্যচেতনার শ্রেষ্ঠ উপাদান তারই মূর্তবিগ্রহ অবতার-পুরুষ।

এ জ্ঞান, এ ভক্তি সাধনলভ্য নয়; ভগবানের নিজস্ব সত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তিনি "জ্ঞান ও ভক্তির জমাটবাঁধা মূর্তি.........সাধ্য-সাধনা করে নয়, এমনিই হয়েছে"। অবতারপুরুষ "বসানো শিব নয়, পাতালফোঁড়া শিব—স্বয়ম্ভুলিঙ্গ।" মানুষ সত্ত্বগুণের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে—'বসানো শিব' হতে পারে—কিন্তু অবতারত্ব অর্জন করতে পারে না। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা—

"শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু হে মোর প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।"

সে পরশ দক্ষিণেশ্বরের তাপস এবার রেখে গিয়েছেন প্রাণে প্রাণে। দার্শনিক ডীন্ ইঞ্জের মতে—ধর্মকে প্রচার করে শিক্ষা দেওয়া যায় না, তার ছোঁয়া লাগে প্রাণে। মানুষ-ভগবান ধর্মের সেই পরশমণি—যোগমায়ার প্রকাশ। এই মায়া অবতার-পুরুষের সহজাত শক্তি এবং এই শক্তির সাহায্যেই তিনি করেন লীলা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "যোগমায়ার এমনি মহিমা, তিনি ভেলকি লাগিয়ে দিতে পারেন। বৃন্দাবন-লীলায় তিনি ভেলকি লাগিয়েছিলেন। যোগমায়া যিনি আদ্যা-শক্তি, তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। আমি ঐ শক্তি আরোপ করেছিলাম"। নীল যমুনার কূলে একদিন এই যোগমায়াই বাঁশীর সুর হয়ে ফুটে উঠেছিল। সে সুরে উতলা হয়েছিল গোপী, ছুটে চলেছিল শ্রীদাম, সুদাম। এই যোগমায়াকে আশ্রয় করেই—"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"—ভগবানের রাসলীলা। সেই মায়াতেই আজ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ছে কথামৃতের সুর।

যোগমায়ার সাহায্যে অবতারলীলা হলেও, লীলা একটা রামধনুর রঙের অলীক খেলা নয়। ঠাকুর বলছেন, "লীলাও সত্য"। অবতারের বিগ্রহ অনিত্য নয়। সিনেমায় যেমন করে মানুষের অভিনয় বাঁধা পড়ে, প্রকৃতি তার নিজের ক্যামেরায় তেমনি করে চিরকাল ধরে রাখে ভগবানের খেলার রূপ। চৈতন্যভাগবতে আছে—

"অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে
যার ভাগ্যে থাকহে সে দেখয়ে নিরন্তরে।"

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী—

"সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস।
সত্য মোর লীলাকর্ম, সত্য মোর স্থান।

* * *

যে না জানে মোর সঙ্গ সেই যায় নাশ।"

মানুষ-ভগবানের লীলা তত্ত্বজিজ্ঞাসা নয়; তার একটা বাস্তব প্রয়োজনের রূপ আছে। কথামৃতের ভগবান প্রয়োজনবাদী। তিনি বলেছেন, "গরুর শিংটা যদি ছোঁয় গরুকেই ছোঁওয়া হলো...... কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। বাঁট দিয়ে সেই দুধ আসে। ঈশ্বর অনন্ত হউন আর যত বড় হউন, তাঁর ভিতরের সার বস্তু

মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে” অবতার যেন গরুর বাঁট, যা দিয়ে গরুর দুধ পাওয়া যায়। ভগবৎপ্রেমের পিপাসা তৃপ্ত করাই যদি ধর্মের উদ্দেশ্য হয় তবে মানুষ-ভগবানই—সেই রস ও রসপাত্র।

* * *

এ কথা বোঝা কিছু কঠিন নয় যে এই মাটির বুকে দিব্য আবির্ভাবের কারণ আছে। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। কিন্তু সেই হেতু নির্দেশ করার কোনো শক্তি কিংবা অধিকার মানুষের নেই। আমরা প্রত্যেকটি কর্মের পিছনে একটি অভিসন্ধি দেখতে চাই। ভগবানের লীলা অভিসন্ধিমূলক নয়। আমাদের চিন্তাপ্রণালীর সাথে ভগবানের ভাবধারার সামঞ্জস্য করা যায় না। তাঁর লীলা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক —অবতারের জীবন ভাগবতভাবের স্বতঃপ্রকাশ। তাঁর কার্যের কারণ একমাত্র তিনিই জানেন এবং যুগে যুগে তিনিই বলেন।

কুরুক্ষেত্রে গীতামুখে ভগবান তাঁর দিব্য আবির্ভাবের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন সে আজ সর্বজনবিদিত। তিনি এসেছিলেন অধর্মের বিনাশ করতে, ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে ও সাধুদের পরিত্রাণ করতে। এই তিনটি কারণ ছাড়াও হয়তো তাঁর লীলার আরও অর্থ ছিল, কিন্তু তার সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ গীতায় নেই। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে এবার তিনি নিজেকে একটু বেশী প্রকাশ করেছেন আমাদেরই প্রতি অহেতুকী করুণায়। সেই করুণার আলোতেই মানুষ আজ তাঁকে চিনতে পেরেছে তার প্রাণের ঠাকুর বলে।

সেই প্রেমের ঠাকুর বলছেন, “ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পুরে না। প্রয়োজন মিটে না”। মানুষের প্রেম চায় প্রেমাস্পদের একটি বাস্তব রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, “ভক্তেরা অবতারকে চান—ভক্তি আস্বাদন করার জন্য”। প্রিয়তমের রূপ ও গুণ বাদ দিয়ে ভালবাসার রস অনুভব করা যায় না। আধারকে ছেড়ে আধেয়কে কল্পনা করা একপ্রকার অসম্ভব। সগুণ নিরাকারবাদীদের মতে নিছক ভাবময় ভগবানকে ভালবাসলেও অন্তরের রসপিপাসার শান্তি হতে পারে; এখানেও একটা আধার কল্পনা করতে হয়। কিন্তু প্রেম তত্ত্বানুরাগ নয়, বিরাটের জয়গানও নয়, হিতোপদেশও নয়। সমধর্মেই প্রেম সম্ভব। ভালবাসা হয় সমানে সমানে। প্রাণের আকুতিকে দার্শনিক বিচার করে অস্বীকার করা চলে না। তাইতো ভগবান কথামৃতে বলছেন, “তাঁকে হাতে ক’রে খাওয়াতে পারলে তবে তো মানুষ তাঁকে ভালবাসতে পারবে”। শ্রীশ্রীমা বলছেন, “হাওয়াকে কে কবে ভালবাসতে পেরেছে বাবা?”

মানুষের অন্তরে থাকে প্রেমের ক্ষুধা, আর তার কালো চোখে থাকে দেখবার পিপাসা। সেই স্থূল পিপাসা মেটাবার জন্য ভগবানের স্থূল রূপ। “যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য। সে সূর্যকে দেখতে পারা যায়—চক্ষু ঝলসে যায় না—বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে আসে। তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ ক’রে তার কাছে আসেন।” ভালবাসা ঐশ্বর্য-প্রীতি নয়। কুরুক্ষেত্রে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন শুধু আনন্দ পান নি, ভয়ও পেয়েছিলেন।

“ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে
তদেব মে দর্শয় দেব রূপম্…”

“আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। ওগো তুমি আমাকে তোমার পূর্বরূপ দেখাও।” কোনো ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট রূপ দেখতে চাইলে তিনিও বলেছিলেন, “ওগো, ও রূপ দেখতে চাওয়া ভাল নয়, ওতে ভালবাসার ভাগ কম পড়ে যায়, ভয় হয়”।

কথামৃতের ভগবান আবার বলছেন—“মনুষ্য-লীলা কেন জান?……এর ভিতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়?” ‘শ্রীম’ কোন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর মত উদ্ধৃত করলেন, “ঈশ্বরের বাণী মানুষের

ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ তা বুঝতে পারে না"। শ্রীরামকৃষ্ণ এ কথার পূর্ণ সমর্থন করেন—"বাঃ এ ত বেশ কথা!" যুগে যুগে ভগবান আসেন আচার্য হয়ে, আর নিজেরই অন্তরের বাণী শোনান মানুষকে তাঁর নিজের ভাষায়। সে ভাষা দর্শনের ভাষা নয়। সে কথা ভাগবত সত্যের সহজ সরল সরাসরি প্রকাশ এবং বিচার-বিতর্কের বহু উর্ধ্বে।

অবতার-পুরুষ শুধু সাধনার মূর্ত বিগ্রহ নন, তিনি সাধনার ধন। চীনদেশের মহাপুরুষ লাউৎসের মতে সত্যের সাথে সত্যলাভের পথের বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। শ্রীভগবান্ একই সাথে সত্যপথ এবং পথের শেষ। তিনিই সাধনা, তিনিই সাধ্য। তিনিই উপাসনা, তিনিই উপাস্য। তিনিই উপায়, তিনিই উদ্দেশ্য। ঠাকুর বলছেন, 'তিনি যখন মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে আসেন তখন ধ্যানের খুব সুবিধা হয়। এ যেন কাঁচের লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে।' সেই ভাগবত চেতনার আলো লাভ করাই তপস্যার শেষ, আবার তাকেই উপায়রূপে গ্রহণ করা সাধনার আরম্ভ।

সে উপায় মানুষ শিখেছে তাঁরই আবির্ভাব ও সাধনার ফলে। মানুষ ভালবাসার জন্য অবতার-পুরুষকে চায় সত্য, কিন্তু তাঁকে ভালবাসার সম্পূর্ণ যোগ্যতা তার থাকে না। এ মাটির যে প্রেমের সাথে সে পরিচিত তার রূপ ভগবদ্ভক্তির সাথে মিলে না। তাই "প্রেম ভক্তি শেখাবার জন্য অবতার"। এই শিক্ষা দেবার পদ্ধতি কিন্তু একটু স্বতন্ত্র। যে বিরহ, ব্যাকুলতা, উন্মাদনা, দিব্যরসপ্রিয়তা, ভাব, মহাভাব ও প্রেম এবার দক্ষিণেশ্বরের তাপসের মধ্যে ফুটে উঠেছে—তারই আলোতে মানুষ চিনেছে তার সত্যকারের চলার পথ। তবু কিন্তু এ হোমানল জ্বালার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। এ বৈদিক সকাম যজ্ঞ নয়। প্রেম দেখাবার কিংবা শেখাবার জন্য প্রেমের অবতারণা হাস্যকর। এ দিব্যানুরাগ অবতার-পুরুষের ভাগবতভাবের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, এবং তার ফল তাঁরই প্রকৃতির সাথে জড়িত। এ প্রেমরূপ তাঁর নিজস্ব সত্তা, এবং তার প্রভাবও তাঁর থেকে অবিচ্ছেদ্য। সূর্যের নিজস্ব প্রকৃতিই আলো দেওয়া; এ দানের মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য নেই। আলো দেওয়ার অভিসন্ধি নিয়ে সূর্য জ্বলে না, কিন্তু তবু সে অন্ধকার দূর করে।

প্রশ্নটি অন্যদিক থেকেও আলোচনা করা চলে। অবতার-পুরুষের ভালবাসা জীব ও ভগবানের প্রতি সমভাবে পড়ে, কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোনো ভেদবুদ্ধি নাই। জীবও ভগবানেরই রূপ। প্রেম আবার পাত্রাপাত্র বিচার করে না, তাই সে শক্তিমান্। মায়ের স্নেহ কুসন্তানকেও মাতৃভক্ত করে। অবতার-পুরুষের মানবপ্রেমও অভক্ত অবিশ্বাসী মানুষকেও ভগবৎপ্রেমিক করে। তিনি মানুষকে ভালবেসে তাকে ভালবাসতে শেখান। কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যেও কোনো উদ্দেশ্য নাই। এ প্রেম সম্পূর্ণ অহেতুকী—এ তাঁর নিজস্ব ধর্ম। মাতৃত্বের উপাদানই বাৎসল্যের রস, অপত্যস্নেহ। সে স্নেহকে বাদ দিয়ে মাকে কল্পনা করা যায় না, আর সন্তানের প্রতি তার প্রভাবও অস্বীকার করা চলে না। দরদী শ্রীরামকৃষ্ণের মরমের টানে আজ মানুষ তাঁকে চিনেছে নিজেরই প্রাণের ঠাকুর বলে; বুঝেছে—পূজার আলোর সাথে জড়িয়ে রয়েছে চরম প্রেম। দার্শনিক বিচারে ভগবানের প্রেমরূপ ও জ্ঞানরূপের যে সমন্বয় করা যায় নি, সেই সমন্বয়ই এবার রূপ ধরে ফুটে উঠেছে এই অপরূপ অবতার-পুরুষে।

এ কথা সত্য যে, তাঁর প্রেম মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর ভাগবত জীবনের দৃষ্টান্ত তাকে প্রেরণা দেয়। সেই ভালবাসার, সেই তপস্যার মধ্যেই সে সন্ধান পায় পরিপূর্ণ দিব্যজীবনের। অবতার-পুরুষের আবির্ভাব আধ্যাত্মিক সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ঠাকুর বলছেন,

'মহাভাব ঈশ্বরের ভাব···এতদূর তোমাদের দরকার নাই···আমার ভাব নজিরের জন্য'। উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত অনেক বেশী কার্যকরী।

সে প্রেম জীবের পরম কল্যাণের নিদান, তার মুক্তির সোপান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'তিনি যখন মানুষ হয়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে; তখন—সমাধির পর ফেরেন—লোকের মঙ্গলের জন্য।' 'অবতার, যিনি তারণ করেন'। তাঁকে দর্শন করা, তাঁকে স্পর্শ করা, তাঁকে প্রণাম করা মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বুকে হাত দিয়ে বলছেন, 'এর ভিতর যদি কিছু থাকে, তবে তার সেবা করলে অজ্ঞান অবিদ্যা একেবারে চলে যায়'। 'চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিলেন কেন? লোকে প্রণাম করবে বলে। এখানে যে একবার প্রণাম করবে সে উদ্ধার হয়ে যাবে।' অবতারপুরুষকে তিনি 'বাহাদুরী কাঠ' বা 'স্টীম বোটের' সাথে তুলনা করেছেন—'যে নিজেও পারে যায়, অপরকেও পারে নিয়ে যায়'।

তাঁর সাধনা ব্যক্তিগত নির্বাণলাভের জন্য নয়, সমষ্টিগত মুক্তির জন্য। তিনি চিরমুক্ত। অবতার-পুরুষের তপস্যা অন্যের মনে শুধু প্রেরণার সঞ্চার করে না, তাকে শক্তিও দান করে। সে হোমানলের আলো বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে আর মানুষের চলার পথের অন্ধকার দূর করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'একজন আগুন করলে দশজন পোয়ায়'।

অবতার-পুরুষের সাধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী মানুষ, আর মানুষের সঞ্চিত কর্মের ফলভোগী লীলাময় ভগবান। বাইবেলের মতে যীশুখ্রীষ্ট এসেছিলেন জীবের পাপ গ্রহণ করে তাকে মুক্তি দিতে—Vicarious atonement. মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি দিলেন তাঁর বুকের রক্ত, হলেন ক্রুশবিদ্ধ। এবার দক্ষিণেশ্বরের ভগবানও এসেছেন মানুষের পাপের বেদনা নিজে সহ্য ক'রে তাকে পাপমুক্ত করতে, তাকে চৈতন্য দিতে। 'চৈতন্য হউক', একথা সকলকে বললে—'কলিতে পাপ বেশী, সেই সব পাপ এসে পড়ে'। তবু তো মহামায়া তাঁর গলার ক্ষত দেখিয়ে বলে উঠলেন যে, এ বেদনা অন্যের অপরাধ গ্রহণ করে তাকে মুক্তি দেবার প্রত্যক্ষ ফল! চীনের মহাপুরুষ লাউৎসের কথা মনে পড়ে—'যিনি পৃথিবীর পাপ বহন করেন, তিনিই পৃথিবীর রাজা'।

এই বেদনাও তাঁর লীলাবিলাসের অঙ্গ। 'দেখলাম, যে কামার সেই বলি—সেই হাড়িকাঠ হয়েছে'। অবশ্য সে সম্ভোগের মধ্যে শুধু দুঃখের রসই যে আছে তা নয়। তাঁর আবির্ভাবের মধ্যে প্রেমের আনন্দই প্রধান। তাঁরই শ্রীমুখের কথা —'লীলা বিলাসের জন্য—মনুষ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন······সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করতে শ্রীরাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই আধার, আর নিজেই শ্রীমতীরূপে আধেয়—নিজের রস আস্বাদন করতে—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দকে ভাল-বেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে'। অবতার পুরুষ ভক্ত হয়ে আসেন—নিজেরই অন্তরে ভগবানকে ভালবেসে আনন্দ করতে। লীলা শেষ করবার আগে ঠাকুর নিজের সম্বন্ধে বলছেন—'এর মধ্যে দুটি আছে। একটি তিনি, আর একটি ভক্ত হয়ে আছে···দেখলাম তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন এক ব্যক্তি। তবে একটি রেখা মাত্র আছে—ভক্তের আমি আছে—সম্ভোগের জন্য।' রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর কাছে কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করেছিলেন—

"আপন মাধুর্য হরে আপনার মন,
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন!"

এই সম্ভোগের দুটি দিক আছে। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, 'একবার ভগবান হন ফুল, ভক্ত হন ভ্রমর; আবার কখনও ভগবানই হন

অলি, আর ভক্ত হয় ফুল।' শুধু ভগবানের ভিতরেই যে রস আছে তা নয়, ভক্তভাবেরও মাধুর্য আছে। মা যেমন বাৎসল্য রস উপভোগ করেন, সন্তানও তেমনি মাতৃস্নেহ আস্বাদন করে। তাই অবতার-পুরুষ একবার ভক্তরূপে নিজেরই ভাগবত রস সম্ভোগ করেন, আবার ভগবানরূপে ভক্তের হৃদয়-মধু পান করেন।

এ খেলা শুধু তাঁর নিজেকে নিয়ে নয়, তাঁর জগৎরূপের সাথেও চলেছে তাঁর একই অভিনয়। এই সৃষ্টির মধ্যে যে বিচিত্ররূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন তারও সাথে ফুটে উঠেছে এই রসের আদান-প্রদান। ভগবানের এই জগৎলীলা সম্ভোগের রূপই অবতার-পুরুষ। প্রকৃতির থালায় সহস্রোপচারে সাজানো নৈবেদ্য গ্রহণ করতে তিনি যুগে যুগে আসেন এই মাটির কোলে। প্রকৃতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই তাঁর হয় আবির্ভাব।

'নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ীর ডালভাত ভাল লাগে না।' কিন্তু এ নিমন্ত্রণ শুধু বাইরের প্রকৃতির নয়, সমস্ত প্রকৃতির মানব-শিশুর। সে আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছেন সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে। মানুষের তপস্যা, তার সাধনা, তার চোখের জল যে 'পাষাণ'-দেবতার পূজা নয়, তার প্রতীক্ষা নিরর্থক নয়,—এরই প্রমাণ অবতার-পুরুষের আবির্ভাব।

ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করতে আসেন, আর রেখে যান তারই জন্য একটি পূজার বিগ্রহ। সে মূর্তির প্রতিষ্ঠা এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন নিজের হাতে। নিজের অবতার-রূপের গলায় তিনি নিজে পরিয়েছেন মালা, তাঁর পায়ে নিবেদন করেছেন ফুল, ছবিকে করেছেন পূজা, এবং বলেছেন—

'এর পর ঘর ঘর এর পূজা হবে।'

অন্তর্যামী

শ্রীমতী বিভা সরকার

ওগো অন্তর্যামী মোর,
হে বৈরাগী নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী,
ঘরভোলা বাঁশরীর সুরে—
করিছ উতলা শুধু
আড়ালে আড়াল রচি
রহি মোর দূর অন্তঃপুরে!
নিভৃত এ নিকেতনে'
নিত্যদিন একান্তে নিরালা
কিসের চয়নে আনমনা?
খুলি মন-বাতায়ন
ভৈরবীর শেষ গানে
কার লাগি করিছ বন্দনা?

রহিব কি রবাহূত সেথা?
ডাক মোরে স্থান দাও
তোমার মন্দিরে!
মানস-দেউল হতে
আমি শুধু বার বার
যাব ফিরে ফিরে?
আপনারে নাহি চিনি
দুঃসহ এ জ্বালা
বেপথু ব্যথার ভরে
আমার নিরালা!
বন্ধ ভোল হে নিষ্ঠুর
খোল তব স্তব্ধ যবনিকা
অমৃত-আলোয় জ্বালো
স্বপ্নময় দূর নীহারিকা!

প্রাচীন ভারতের শ্রমিক

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

[অবসর-প্রাপ্ত লেবার অফিসার, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স]

প্রাচীন ভারতে শ্রমিকরাই সমাজের মেরুদণ্ড ছিল। ধর্ম ও অর্থশাস্ত্র প্রণেতা শ্রীমৎ শুক্রাচার্য, নারদ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিরা শ্রমিকদের সম্পর্কে অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠে সহজেই অনুমিত হয় যে, সেকালের শ্রমিকদের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক ছিল। প্রাচীন ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা অর্থাৎ পারিশ্রমিক, অবসর প্রভৃতি সম্বন্ধে দু-চারটি আবশ্যকীয় বিষয় আলোচনা করিব।

(১) পারিশ্রমিক

সেকালে রাজা তাঁহার নিজের ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য শ্রমিকদের সদা সন্তুষ্ট রাখিতেন—ইহাই আদর্শ ছিল। শুক্রাচার্য লিখিয়া গিয়াছেন যে, রাজা স্বয়ং শ্রমিকদের কার্যদক্ষতা বিবেচনা করিয়া তাহাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিয়া দিবেন, এবং তাহা প্রদান করা কখনও বন্ধ থাকিবে না। নারদ বলিয়াছেন, কার্যের পূর্বে যে পারিশ্রমিক স্থির হইয়াছে—কার্যের পূর্বে, মধ্যে বা কার্য সমাপ্ত হইলে ভৃত্যকে তাহা দিতে হইবে, এবং যে নিয়োগকর্তা কার্যের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া বন্ধ করিবে, তাহাকে পারিশ্রমিকের পাঁচগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। বৃহস্পতি বলিয়াছেন কার্য-সমাপ্তিতে, নির্ধারিত পারিশ্রমিক না দিলে, পারিশ্রমিক ও অর্থদণ্ড দুই দিতে হইবে। নিয়োগকারী ও শ্রমিকের পারিশ্রমিক লইয়া মত-দ্বৈধ হইলে রাজা স্বয়ং সাক্ষী লইয়া ও আবশ্যক হইলে নিয়োগকারীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া পারিশ্রমিক স্থির করিয়া দিবেন।

প্রাচীন ভারতে পারিশ্রমিকের হার বেশ উচ্চ ছিল। শ্রমিকরা সাধারণ ভাবে জীবনযাপনের ব্যয়নির্বাহের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইত। শুক্রাচার্য বলিয়াছেন, শুধু যে পারিশ্রমিক অর্থ হইতে দৈনন্দিন আবশ্যকীয় জিনিষ কিনিবার মূল্য হইবে তাহা নহে, শ্রমিকরা ও তাহাদের পরিবারবর্গ যাহাতে বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করিতে পারে এরূপ পারিশ্রমিক দিতে হইবে। সমাজের পক্ষে অল্প পারিশ্রমিক বিপজ্জনক, কারণ শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট থাকিলে সমাজের বন্ধু হওয়া দূরের কথা, ক্রমশঃ শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। শুক্রাচার্য পারিশ্রমিকের অর্থ তিন ভাবে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন :

(ক) সাধারণ পারিশ্রমিক অর্থে বুঝা যাইবে যে অপরিহার্য অন্নবস্ত্রের সচ্ছলতা উপভোগ করিবার উপযোগী অর্থ।

(খ) উত্তম পারিশ্রমিক অর্থে—প্রচুর খাদ্য ও বস্ত্র পাওয়ার জন্য ব্যয় সঙ্কুলানের উপযোগী অর্থ।

(গ) অল্প পারিশ্রমিক অর্থে একটি লোকের জীবন-ধারণের উপযোগী অর্থ।

পারিশ্রমিক কখনও সময়, কখনও কার্যবিশেষ বিবেচনা করিয়া নির্ধারিত হইত। শুক্রাচার্যের উক্তি ছাড়াও আমরা 'জাতকে' দেখিতে পাই যে পারিশ্রমিকের হার বেশ উচ্চ ছিল।

গৃহস্থের ভৃত্যরাও সে সময়ে ভিক্ষা দান করিত (Jataka III, Pages 445—446). ইহা হইতে বেশ অনুমান করা যায় যে তাহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল, নতুবা ভিক্ষা দান কখনও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

(২) শ্রমিকদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা

সে সময়ে শ্রমিকদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধার বিষয় উল্লিখিত দেখা যায়। চল্লিশ বৎসর রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে পারিশ্রমিক পাইবে—শ্রমিক কাজ না করিয়া পরে তাহার অর্ধেক পাইবে

এবং শ্রমিক জীবিত না থাকিলে তাহার বিধবা স্ত্রী বা পুত্র বা কন্যা তাহা পাইবে। সন্তোষজনক কাজ করিলে নিয়োগকর্তা প্রত্যেক বৎসর মাহিনার এক অষ্টমাংশ পুরস্কার দিবেন।

অসুস্থ হইলে শ্রমিককে অসুস্থতার অজুহাতে বিতাড়িত করা চলিত না। শয্যাশায়ী থাকিলে সে পুরা বেতনে অবসর পাইত। পনেরো দিনের অধিক অসুস্থ হইলে যতদিন না সে আরোগ্য লাভ করে—ততদিন পারিশ্রমিকের চারি ভাগের তিন ভাগ সে পাইত। সপ্তাহকাল অসুস্থ থাকিলে পারিশ্রমিকের কোন অংশ কর্তিত হইত না। যদি শ্রমিক অসুস্থতানিবন্ধন স্থায়িভাবে অকর্মণ্য হইয়া পড়িত তাহা হইলে, যে শ্রমিক পাঁচ বৎসর কাজ করিয়াছে, তাহাকে তিন মাসের পারিশ্রমিক ও যে ততোধিক কাজ করিয়াছে তাহাকে ছয় মাসের পারিশ্রমিক দিবার নির্দেশ ছিল।

(৩) অবসর

প্রত্যেক শ্রমিককে তাহার নিজের গৃহকার্য পরিদর্শন করিবার জন্য অবসর দিবার রীতি ছিল। স্থায়ী ভৃত্যকে দিনের বেলা এক যাম সময় ও রাত্রে তিন যাম সময় বিশ্রামের জন্য দিতে হইত—অস্থায়ী (অর্থাৎ এক দিবসের জন্য নিযুক্ত) শ্রমিককে আধ যাম সময় বিশ্রামের জন্য দেওয়া নির্দেশ ছিল।

(৪) পরিবার-সংক্রান্ত আয়-ব্যয়

কৌটিল্য লিখিয়া গিয়াছেন, যেখানে অধিক শ্রমিক বা কারিগর নিযুক্ত থাকিত, সে সকল স্থানে শ্রমিকদের জন্য একজন গোপ নিযুক্ত থাকিবে। একজন গোপ দশ কুড়ি বা চল্লিশ পরিবারের খবরাখবর করিত। তাহাদের জাতি, নাম, পেশা ও আয়ব্যয় নির্ধারণ করিত।

(৫) সংরক্ষণ-তহবিল (Provident Fund)

শ্রমিকদের সংরক্ষণ-তহবিল থাকিত। শুক্রাচার্য নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যে নিয়োগকর্তা কর্মকাল শেষ হইলে ভৃত্যদের সম্পূর্ণ টাকা দিয়া দিবেন, বা বৎসরে এক চতুর্থাংশ বা এক ষষ্ঠাংশ বা অর্ধেক বা দুই তিন বৎসরে সংরক্ষণ-তহবিলে সঞ্চিত সম্পূর্ণ টাকা দিবেন। শুক্রাচার্য বলিয়াছেন যে, নিয়োগকর্তা নিজের নিকট ভৃত্যের বেতনের এক চতুর্থাংশ বা এক ষষ্ঠাংশ জমা রাখিয়া দিবেন এবং তাহা উপর্যুক্তভাবে প্রদান করিবেন।

এক কালে সংরক্ষণ-তহবিলের সব টাকা দিবার কোন উল্লেখ বেশী পাওয়া যায় না। বোধ হয় এককালে শ্রমিক সমস্ত টাকা পাইলে কোনরূপ বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া অসুবিধায় পড়িবে বলিয়াই ক্রমে ক্রমে টাকা দিবার প্রথাই কৌটিল্য সমর্থন করিয়াছেন।

সকল সময়ে যে নগদ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হইত এমত নহে। 'জাতকে' অনেক ভাবে পারিশ্রমিক দিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি লাল পোষাকের জন্য কোন বালিকাকে কোন পরিবারে তিন বৎসর কাজ করিতে হইত এবং এক পত্নীলাভ করিবার জন্য কোন যুবককে কোন পরিবারে সাত বৎসর কাজ করিতে হইত।

অশোকের শিলা-লিপি (Rock Inscription No. XIII) হইতে শ্রমিকদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার আভাস পাওয়া যায়। শ্রমিকদের সঙ্গে সহাস্যে সুমিষ্ট কথা কহিবার এবং কাপড় ভোজ্য পানীয় ও অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট রাখিবার আদেশ দেওয়া আছে।

'শ্রমিক' শব্দের ব্যাপক অর্থে সে সময় গৃহভৃত্যকেও বুঝাইত। হিউয়েন সাঙ লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সময়ে ভারতবর্ষ পর্যটন করেন সে সময়ে শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক নিযুক্তি (forced labour) দেখেন নাই তবে সাধারণের মঙ্গলের জন্য কোন কার্য হইলে শ্রমিকরা নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইত এবং তাহাদের কাজের অনুপাতে তাহাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হইত।

ধর্ম ও অর্থ শাস্ত্র হইতে বেশ প্রতীত হয় যে প্রাচীন ভারতের শ্রমিকরা আধুনিক শ্রমিকদের অপেক্ষা অনেক সুখ সুবিধা উপভোগ করিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে।

অন্নে অধিকার

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

"মাহং রাজন্ অন্যকৃতেন ভোজম্—"
— গৃৎসমদ শৌনক।

ভিক্ষার মত নাই কোন মহাপাপ,
ভিক্ষাই অভিশাপ।
শিশু অক্ষম পঙ্গু যদি না হও,
ব্যাধিতে আধিতে শায়িত যদি না রও,
মূল্য না দিয়া আপন পরিশ্রমে
কাহারো অন্নে অধিকার তব হয় নাক' কোনক্রমে।
শ্রমজলপাত না করিয়া যাহা লবে,
ভিক্ষা কিংবা হরণ বলিয়া তাহাই গণ্য হবে,
ঋণভার হয়ে রবে।

পিতার অন্ন, পতিরও অন্ন শ্রমজলপাত বিনা,
যে করে গ্রহণ তারে দেবগণ করেন সতত ঘৃণা।
বিনা শ্রমে যদি কর পরান্ন ভক্ষণ কোন দিন,
জানিও তাহারে ঋণ।
আছে দাসদাসী, ধন রাশি রাশি, শ্রমে নেই প্রয়োজন
পেয়েছ পিতার সঞ্চিত বহু ধন,
তবু কর খাটি মাটির অন্নে অধিকার অর্জন।
পতির সোহাগে অলস বিলাসে জীবন যাপো যে সতী,
সোহাগ তা নয়, মহাপাপে তোমা মগ্ন করিছে পতি।

হে বরুণদেব তোমার চরণে আমার আকিঞ্চন—
ভুঞ্জিতে যেন না হয় পরের অর্জিত কোন ধন,
হইতে না হয় পরের গলগ্রহ,—
এই প্রার্থনা করি আমি অহরহঃ।

যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ ও ধর্মবিশ্বাস

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী

প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. বি. এস্. হ্যালডেনের একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে পড়েছিলাম যে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষের পক্ষে কোন লোকোত্তর পরমপুরুষে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ জড়বিজ্ঞানের দাপটে ঈশ্বরের অস্তিত্বও যেন বিপন্ন হয়ে উঠছে। তাই আজ মানুষের ধর্ম—ঈশ্বরকে ছেড়ে অন্যত্র সন্ধান করতে ইংলণ্ডের মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল পরামর্শ দিয়েছেন। কুসংস্কারমুক্ত মানবমনের ধর্ম—মানুষের সেবা।

যদিও একদল দার্শনিক সর্বদাই বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাবার চেষ্টা করেছেন, তবুও ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ ক্রমশঃ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। অত্যাধুনিক আণবিক মারণাস্ত্রের যুগে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্তির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। এখনও অধিকাংশ অশিক্ষিত নরনারী ধর্মপ্রাণ হলেও, তথাকথিত সংস্কারমুক্ত বিদগ্ধ মানুষের দরবারে ভগবানের আলোচনাও অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে।

বিজ্ঞানের পদ্ধতি: পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ। মোহমুক্ত মন নিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক বিষয় ও ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করে জড়-প্রাণ- ও মনোজগতের প্রমাণসিদ্ধ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান-লাভই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। অবশ্য ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থের বিশ্লেষণ অপ্রত্যক্ষ অণুপরমাণুর খবর দিতে পারে; কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভুললে চলবে না। পরমাণু, জীবকোষ ইত্যাদির প্রকল্প ইন্দ্রিয়গম্য জগতেরই ব্যাখ্যার তাগিদে রচিত হয়। ঐন্দ্রিয়িক অভিজ্ঞতা ও তদনুযায়ী অনুমান নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় বলা হয়েছে। এরূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অস্বীকার করার উপায় নেই; কারণ বৈজ্ঞানিক যথার্থ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ মানবজাতির মঙ্গল বা অমঙ্গলের নির্ধারক।

যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষবাদী প্রায়োগিক (empirical) বিজ্ঞানের বিরোধী—তিনিও বিজ্ঞানের সুবিধাটুকু গ্রহণ করতে নারাজ নন। রোগে সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে, দূরভাষণের সাহায্যে নিজের জরুরী কাজ সমাধা করে, দ্রুতগামী ব্যোমযান, জলযান ব্যবহার করে, এক কথায় বিজ্ঞানের হাজার রকম সুবিধা ভোগ করে, ঘরে বসে বিজ্ঞানের নিন্দা করা অপরাধ। নিদ্রায় জাগরণে, আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে, স্থিতিতে ভ্রমণে, জীবনে মরণে বিজ্ঞানের সাহায্য না নিলে আধুনিক জীবন একেবারেই অচল। অবশ্য বিজ্ঞানের অভিশাপও দিকে দিকে প্রকট হয়ে উঠছে। আণবিক বজ্রের প্রচণ্ডতম বিদারণে নাগাসাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—প্রশান্তমহাসাগরে উদজান মারণাস্ত্রের পরীক্ষা এশিয়াবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলছে। কিন্তু এই ভীতি ও সন্ত্রাস বিজ্ঞানের অপব্যবহারজনিত। এর জন্য বিজ্ঞানকে দোষারোপ করা চলে না। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ বা পরমাণু-বিদারণ মানবের কল্যাণে নিয়োজিত না হয়ে তার ধ্বংস সাধন যদি করেই, তবে তার দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকের নয় — রাজনীতিকদের। তাই বিজ্ঞানের অপব্যবহারে বিজ্ঞানবিমুখ হওয়া মূর্খতার নামান্তর।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই যে অপব্যবহার, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণের এই যে পরস্পর ভীতি-প্রদর্শন ও অবিশ্বাস তা কী মানবের কল্যাণবুদ্ধির অবনতি প্রদর্শন করে না? ধীরভাবে বিচার করে দেখতে হবে—জড়বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে

তাল রেখে মানুষের শুভবুদ্ধিও অগ্রসর হতে পারছে কি না। বিগত মহাযুদ্ধে, নানা সম্ভব ও অসম্ভব পরিবেশে, মানুষের সহজাত কল্যাণকামনা প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে—পরাধীন দেশের অসহায় মানুষ শক্তিমানের স্বার্থযূপে বলি প্রদত্ত হয়ে পাশবিকতার নিম্নতম স্তরে নেমে এসেছে; আর অশক্তকে কলুষিত করে শক্তিমদমত্ত জাতিগুলিও কলুষ-কালিমায় বিকট হয়ে উঠল। দেবতার লীলাভূমিতে দানবের তাণ্ডব সন্ত্রাসের বীজ বপন করে গেল, পরস্পর অবিশ্বাস আর সন্দেহ মানুষের শান্তিকে করল বিঘ্নিত। তাই আজ দিকে দিকে আণবিক অসুরের আস্ফালন। মানুষের মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন না হলে বৈজ্ঞানিক শক্তির অপব্যবহার হবেই। তাই কিছুদিনের জন্ত বিজ্ঞানসাধনা থেকে অবসর নিয়ে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আজ তার প্রয়োজনীয়তা যতখানি ততখানি এর আগে ছিল কি না সন্দেহ।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানের সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. জে. এয়ার ও আমেরিকা-প্রবাসী অধ্যাপক কারনাপ্ যৌক্তিক দৃষ্টিবাদের (logical empiricism) ঋত্বিক্। এঁদের বিশ্লেষণমুখী দর্শন ক্যাম্‌ব্রিজের অধ্যাপক জর্জ এডওয়ার্ড মুর ও লুড্‌উইগ্ উইট্‌গেনষ্টাইনের ভাষা-বিশ্লেষণ-পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত। বিজ্ঞান করে পদার্থ বিশ্লেষণ, আর দার্শনিকের কাজ হচ্ছে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে ভাষায় ব্যক্ত হয় তার ব্যবচ্ছেদ। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের মতে, দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয় ভাষার অপব্যবহারে; দর্শন একপ্রকার মানসিক বিকার মাত্র। ভাষার বিশ্লেষণ করে তার যোগ্য ব্যবহার নির্দেশ করাই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা। দর্শনের ইতিহাস প্রমাণ করে যে দর্শন চিরকালই প্রধানতঃ অতীন্দ্রিয় মনের জগতে বিচরণ করেছে; ইন্দ্রিয়গম্য বহির্জগতের তথ্য বিশ্লেষণে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেনি। সেই জগতের জ্ঞান দিয়েছে 'শ্রমিক' বিজ্ঞানী। সে বহু যত্নে বহু বিপদের মুখে পড়ে জগৎসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে প্রামাণিক সত্যে উপনীত হতে চেয়েছে। কিন্তু দার্শনিকের ছিল অভিজাত 'নীলরক্ত'—তিনি বিচরণ করেছেন ভাবের জগতে, ঈশ্বর ও আত্মার সমভিব্যাহারে। কিন্তু এসব অতীন্দ্রিয় বস্তুসম্বন্ধে প্রামাণিক জ্ঞান লাভ করা মানুষের অসাধ্য—যতই উচ্চবর্গের 'পদার্থ' এরা হোক না কেন। প্রাকৃতিক জগৎসম্বন্ধেই মানুষের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গম্য জ্ঞান হতে পারে। এরূপ জ্ঞানেরই সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব। সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এইরূপ প্রাকৃতিক জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির লৌকিক জ্ঞান সুসংবদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। ভাব-জগৎ সম্বন্ধে কোন বাক্য বা বিচার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পদ্ধতির দ্বারা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না। তাই যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের মতে ঐ সম্বন্ধীয় বাক্য অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টিমাত্র। যে বাক্যের ইন্দ্রিয়গম্য প্রমাণ নেই বা থাকতে পারে না, তা শুধু অর্থহীন প্রলাপ।

ঈশ্বর দ্বিচক্ষু না সহস্রাক্ষ—এ সমস্যার মীমাংসা করা আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতার পক্ষে সম্ভব নয় বলে—এ সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। অধ্যাপক এয়ার তাই শুদ্ধমাত্র সাধারণ লৌকিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই অর্থবান্ বলে মনে করেন। ঈশ্বর আছেন, কী নেই—তার প্রমাণ বা অপ্রমাণ অন্ততঃ লৌকিকভাবে কিছু নেই। "ঈশ্বর" শব্দটি একটি বিশেষ্য পদ। ঘট, পট ইত্যাদি অন্যান্য বিশেষ্য পদের অনুরূপ বস্তু প্রাকৃত জগতে ইন্দ্রিয়-সংবেদনে পাই বলে আমরা মনে করি যে "ঈশ্বর" নামধারী কোন পরমপুরুষ কোথাও বর্তমান। কিন্তু আমাদের ব্যবহৃত ভাষার সব বিশেষ্যপদই যে বস্তু-জগতে দ্রব্যাদি নির্দেশ করে এমন কোন কথা নেই। উইটগেনষ্টাইন এই "নাম—বস্তু"-রূপ ভাষার

আলেখ্যকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। সর্বত্র এই আলেখ্য ঠিক নয়। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা দৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে তাকে 'বস্তু' বললেও অতীন্দ্রিয় বস্তুকে 'অবস্তু' বলে থাকেন।

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দুর্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত বিজ্ঞানের প্রকাণ্ড সৌধের স্তাবক উল্লিখিত দার্শনিকগণ ভুলে যান যে ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতাই একমাত্র অভিজ্ঞতা নয়। শিল্পীর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে, মানুষের বাঙ্ময় নীতিবোধে, প্রেমিকের মরমী অন্তর্লোকে যে দিব্যানুভূতি স্পন্দিত হয় তার খবর দেহসর্বস্ব ঐন্দ্রিয়িক অভিজ্ঞতাবাদী রাখেন না। সৌন্দর্যতত্ত্বের মাপকাঠিতে কাব্যরসামৃত আস্বাদন ঈশ্বরাস্বাদের পর্যায়ে। অপরূপ সৌন্দর্যের ধ্যানে নিমগ্ন হলে এক অখণ্ড, অদ্বয়, চিদ্ঘন, অব্যক্ত আনন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হয়—অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও "ইহা আমার, উহা তোমার" এইরূপ ভেদধর্মী চৈতন্যের বিলোপ হয়। এরূপ অনুভূতি যখন আমারও নয়, তোমারও নয়, তখন এ অনুভূতি এক অনন্ত সত্তার। এ রসানুভূতি একটি জাগতিক ঘটনা, একে অস্বীকার করি কী প্রকারে? ইন্দ্রিয়গম্য, ব্যবচ্ছিন্ন অনুভূতি নয় বলেই কী একে ত্যাগ করতে হবে? ভারতীয় দার্শনিকগণ লৌকিক জ্ঞান ছাড়া আরও এক রকম প্রাতিভ জ্ঞান স্বীকার করেছেন। অবশ্য জড়বিজ্ঞানের বন্ধু যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা ঐরূপ দিব্যানুভূতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। শুধু তাঁরা বলতে চান যে ঐ সব অনুভূতির আলোকে যে অতীন্দ্রিয় পদার্থের নির্দেশ হয় তার বাস্তবতা স্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। ঐ সব পদার্থ গগনকুসুমবৎ অলীক। একমাত্র বাহ্যপ্রত্যক্ষ ও আন্তরপ্রত্যক্ষের মাধ্যমে অনুভূত পদার্থই বাস্তব; আর তার প্রমাণ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। তাই যদি কোন বাক্যে অতীন্দ্রিয় বিষয় উল্লিখিত হয় তবে, হয় সেই বাক্যের কোন কোন পদ সম্পূর্ণ অর্থহীন চিহ্নমাত্র, অথবা বিশ্লেষণের দ্বারা ঐ বাক্যকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে যে তার থেকে অতীন্দ্রিয় পদার্থবাচক পদগুলি লুপ্ত হয়ে বাক্যটিকে অর্থবান করে তুলবে। যথা—আমি যদি বলি যে, "অমুক অধ্যাপক সরস্বতীর বরমাল্য লাভ করেছেন", তা হলে আমার উক্তিকে অর্থবান্ করতে হলে এর রূপান্তর করতে হবে এই ভাবে: "অমুক অধ্যাপক প্রভূত বিদ্যার অধিকারী হয়েছেন"। এই উক্তি প্রমাণসিদ্ধ, ইন্দ্রিয়গম্য ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। কিন্তু যদি উল্লিখিত বাক্য কোন লোকোত্তর দেবীর ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে তবে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। অধ্যাপক এয়ার এরূপ বাক্যবিশ্লেষণের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন লোকোত্তর, চিন্ময়, অখণ্ড পরব্রহ্মের অস্তিত্ববাচক বাক্যগুলি সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়—অর্থহীন প্রলাপমাত্র; কারণ লোকোত্তর বিষয়ে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণও নেই, অপ্রমাণও নেই।

যদি বল যে ইন্দ্রিয়গম্য প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা থেকেই তো জগৎকারণ ঈশ্বরের অনুমান হয়, তবে "ঈশ্বর আছেন"-বাক্য আর "প্রকৃতির একরূপতা আছে"-বাক্য সমতুল হবে; কিন্তু কোন ভক্তই এরূপ সমতুলতা স্বীকার করবেন কী? অর্থে যদি বাক্য দুটি সমতুল হয় তবে অধ্যাপক এয়ার "ঈশ্বর আছেন" বাক্যটি অর্থবান্ মনে করতে পারেন। তাছাড়া ধর্মান্ধ ব্যক্তিও বলেন "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর"। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রমাণ অপ্রমাণের বিষয় নন—বিশ্বাসের বিষয়। তা হলে পরীক্ষিত সত্যের মতো ঈশ্বরের অস্তিত্ববাচক বাক্য বৈজ্ঞানিক বাক্য হতে পারে না। অধ্যাপক এয়ার বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ স্বীকার করেন না; কারণ অর্থহীন বাক্যের সঙ্গে অর্থবান্ প্রমাণিত সত্যের কোন বিরোধ সম্ভব নয়। "ঈশ্বর চিররহস্যাবৃত"—এই যদি বিশ্বাসীর মত হয় তবে তো ঈশ্বরের সার্থক বর্ণনাই অসম্ভব। তা হলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও ঈশ্বরের অস্তিত্ববাচক বাক্যকে অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টিমাত্র মনে করতে বাধ্য।

কিন্তু যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দর্শনের অভিলষিত ভাষার এই ব্যবচ্ছেদ স্বীকার করা যায় কী? যখন বলি যে ঈশ্বর বিশ্বাসের বিষয়—তখন নিশ্চয়ই একথা বলি না যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বাক্যগুলি তাৎপর্যহীন। শুধু একথাই বলা হয় যে তিনি কোন লৌকিক প্রমাণগম্য নন। অধ্যাপক এয়ার ভক্তের উক্তিগুলির অর্থ করেছেন নিজের সুবিধামতো। তাছাড়া ঈশ্বরের অপার "রহস্য" তাঁর ষড়ৈশ্বর্য ও অপার মাধুর্যের প্রকাশক। তাঁর রহস্যাবৃত হবার অর্থ এই নয় যে তাঁর কোন আভাস, ইঙ্গিতও আমরা পাই না। শুধু এটুকুই বলা হয় যে তাঁর ঐশ্বর্যের ও মাধুর্যের কণিকামাত্রই মানববুদ্ধির গোচর হয়—অধিকাংশই আবরিত থাকে। এ কথা না হয় মেনে নিলাম যে, কোন অনুভূতি অতীন্দ্রিয় বস্তুকে অবলম্বন করলে তার যৌক্তিকতা মানা কঠিন। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, ইন্দ্রিয়গম্য অনুভূতিই কী তৎ-নির্দিষ্ট পদার্থের বাস্তবতা প্রমাণ করেছে? অদ্বৈত বেদান্তবাদী দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অলীকতা প্রমাণে যুক্তি দেন "জগন্মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ—ঘটবৎ"। অর্থাৎ দৃশ্যত্ব ও মিথ্যাত্বের মধ্যে অনিবার্য ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ বর্তমান, যা কিছু দৃশ্য—ইন্দ্রিয়াভূতির বিষয়—তাই অনিত্য বা মিথ্যা।

যদিও সাধারণ জীবনে যা দেখি, শুনি বা স্পর্শ করি তার বাস্তবতা অস্বীকার করা খুবই কঠিন, তবু ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষের বিষয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ নিশ্চয়ই বাস্তব নয়। এই ভ্রমপ্রত্যক্ষের যুক্তি আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগতের বাস্তবতায় সন্দিহান করে তুলতে পারে। শঙ্কর ও তাঁর পরবর্তী আচার্যগণ প্রাকৃত জগতের অলীকতা স্থাপনে বহু যুক্তিপ্রদর্শন করেছেন—তাদের বিশদ আলোচনা এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়।

বর্ণ-বোধরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি যে বর্ণকে নির্দেশ করে তার বাস্তবতার যুক্তি কী? যদি দিব্যানুভূতি নির্দিষ্ট অতীন্দ্রিয় পদার্থ খ-পুষ্পের মতোই অলীক, তবে রূপরসগন্ধের বাস্তবতাই বা বাদ যায় কেন? বর্ণ-বোধ বা শব্দ-বোধ একপ্রকার চেতনা—সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব, ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঐ বোধের কারণরূপে বহির্বস্তু স্বীকারে কোন যুক্তি নেই; বহুকারণবাদ অনুসারে আমিই তো আমার শব্দস্পর্শ-বোধের কারণ হতে পারি। শুধুমাত্র মানসিক, একান্ত নিজস্ব, ইন্দ্রিয়ানুভূতিটুকু স্বীকার করলে যোগাচারী বিজ্ঞানবাদে পর্যবসান অবশ্যম্ভাবী। তা হলে প্রাকৃত বিজ্ঞানের বিজয়-কেতন ধূলিলুণ্ঠিত হবে। বিজ্ঞান কী বাস্তব জগতের সর্ববাদিসম্মত জ্ঞান দেয়? তা হলে বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী যুগে যুগে পরিবর্তিত হয় কেন? কোন এক বিশেষ দৃষ্টি-কোণ থেকে সত্যদর্শন করলে আমাদের জ্ঞান খণ্ডিত হতে বাধ্য; আর বিজ্ঞান এই খণ্ডিত জ্ঞানেরই সম্ভার।

প্রাকৃত জগতের অলীকত্ব প্রতিপাদনে শঙ্কর-মতাবলম্বিগণ যে শক্তিশালী যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন তা অবহেলা করা অযৌক্তিক। বিজ্ঞানের জ্ঞানই একমাত্র চরমজ্ঞান—একথার প্রমাণ অবশ্যই প্রয়োজন। বিজ্ঞানই সার্থক, আর মুষ্টিমেয় দিব্যানুভূতিসম্পন্ন মানুষের জ্ঞান নিরর্থক—এ কথার প্রমাণস্বরূপ যৌক্তিক দৃষ্টিবাদিগণ বলেন যে, সর্ব-সাধারণে বিজ্ঞানকেই অর্থবান্ মনে করে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কী ধর্মবোধ বা নীতিবোধকে অর্থহীন প্রলাপ মনে করে? তাদের কাছে এরা অর্থহীন তো নয়ই, বরং বহুক্ষেত্রেই সত্য বলে প্রতিভাত। আর যদি কতিপয় বিদগ্ধ মানুষের কথা ভাবি, তা হলেও দেখা যায় যে প্লেতো, আরিস্ততল্, হেগেল, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সাধকও পণ্ডিতমণ্ডলী অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সত্যজ্ঞান দেবার ক্ষমতা স্বীকার করে গেছেন। এঁদের অবশ্য দৃষ্টিবাদীরা অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে সাহসী হবেন না!

ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃত

বিজ্ঞানের এমন বহু সত্য আছে যার প্রামাণ্য সাধারণ ইন্দ্রিয়শক্তিতে স্থাপন করা যায় না। এক-বিন্দু অপরিষ্কার জলে যে লক্ষ লক্ষ বীজাণু বর্তমান, তা তো চর্মচক্ষে দেখি না। বিজ্ঞানী বলবেন যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাপকতর করলেই তাঁর কথা প্রমাণিত হবে। সেইরূপ দিব্যানুভূতির প্রামাণ্য স্থাপন কী একান্তই অসম্ভব? ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে কী আমরা কোন অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অনুরূপ কিছুর কথা ভাবতে পারি না? দিব্যানুভূতি প্রাকৃত অনুভূতির মতো অনায়াস-লভ্য না হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণ বলেন যে মোক্ষশাস্ত্র-প্রদর্শিত সুকঠিন সাধনমার্গে অগ্রসর হলে শুদ্ধমনে যে কোন মানুষেরই দিব্যদর্শন হতে পারে। আমরা যদি সেই নিষ্ঠা, যত্ন ও শ্রম করতে পরাঙ্মুখ হই তবে তা মুষ্টিমেয় মহামানবের মধ্যেই সীমায়িত থাকবে। কিন্তু ধর্মজীবনের সেই স্বর্ণমণ্ডিত অন্তর্বীক্ষণ যন্ত্র তো পড়েই আছে; তুলে নিয়ে ব্যবহার করলেই মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়—অখণ্ড, চিন্ময়, দিব্যানুভূতিতে মানবের হৃদয় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সদ্গুরুর প্রদর্শিত পথে অচল নিষ্ঠায় থাকতে পারলে অতীন্দ্রিয় জগতে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন নয়—আর তাতে 'অমৃতের পুত্র' সকল মানবেরই অধিকার। এমন সদ্গুরুও আছেন যিনি মানুষকে দিব্যদৃষ্টি দান করে তার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে সমর্থ।

"আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?"—উৎসুক অথচ অবিশ্বাসী নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। "দেখেছি কী রে, তাঁর সঙ্গে থাকি, ঘর করি" —এলো অভ্রান্ত অবিশ্বাস্য উত্তর। "আমাকে দেখাতে পারেন?" "নিশ্চয়ই, দেখবি?" ঠাকুর নরেন্দ্রের সন্দেহ দূর করলেন—চিন্ময় মহাসমুদ্রের উতরোল কল্লোল তাঁকে শ্রবণ করালেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সদ্গুরুর দর্শনলাভ দুর্লভ। তাহলেও মানুষের দিব্যানুভূতিলব্ধ পদার্থের প্রামাণ্য যাচাই করবার উপায় আছে। আর যদি জ্যোতির্ময় দিব্যানুভূতিকে বলি কুসংস্কার—তবে ইন্দ্রিয়গম্য অনুভূতিকেই বা কুসংস্কার বলতে আপত্তি কী? শাস্ত্র বা সদ্গুরু-প্রদর্শিত পথে সাধন না করেই যদি বলি যে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের কোন প্রমাণ নেই, তাহলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার না করেই 'জলবিন্দুতে বীজাণু নেই' বলার মতো অযৌক্তিক কথা হবে না কী? ভক্তের কোন প্রশ্ন নেই—যার সমাধান করতে হবে। সে চায় প্রাণের অনুভূতি। ধর্ম মানব জীবনেরই একটি অবস্থা।

তাই মনে হয় যৌক্তিক দৃষ্টিবাদ অযৌক্তিক। দর্শনের কাজ শুধু প্রাকৃত বিজ্ঞানের দাস হয়ে থাকা নয়। পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয় বলেই কী ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা? মহাপুরুষগণ তো সর্বদাই সর্বত্র ঈশ্বরের স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তাঁরা কী প্রত্যেকেই ভণ্ড বা প্রতারক? নব্য দৃষ্টিবাদী দার্শনিকগণ বুদ্ধিচালনা করেছেন অনেক, ভাষা ও বাক্যের ব্যবচ্ছেদ করে তার কঙ্কাল বের করেছেন; কিন্তু দর্শনের প্রধান কাজ সৎ-বস্তুর সন্ধান থেকে বিরত থেকেছেন। ভাষাকেই সৎ বা সত্য বস্তু ধরে তার বিশ্লেষণ মূর্খতার নামান্তর মাত্র।

সম্প্রতি এই দার্শনিক মতবাদ ইউরোপে খণ্ডিত ও অনাদৃত হতে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু জড় বিজ্ঞানের এই অন্ধ-স্তুতিবাদী দর্শনের মধ্যে মানবের মূল্যবোধের প্রতি যে প্রচণ্ড উদাসীনতা বর্তমান তা মানুষকে ভুলপথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে, এখনও। মানুষের কল্যাণবোধ ও শুভবুদ্ধি অস্বীকৃত বলেই আজ পৃথিবীর এত সন্তাপ।

এই যন্ত্রদানবের যুগে মানুষের আত্মিক শক্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আত্মিক শক্তির প্রেরণা কী একান্তই অর্থহীন? জড়বিজ্ঞানই কী একমাত্র প্রামাণ্য?

যুগে যুগে মানুষ দেখেছে দানবের পরাজয়—

আর অসহায় মানবের কল্যাণকামনায় ভগবানের নররূপধারণ। যখন অধর্মের অভ্যুত্থান তখনই পড়ে মহামানবের পদধূলি—কখনও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধরথে, কখনও বোধিদ্রুমতলে, কখনও ক্রুশে বলিপ্রদত্ত হয়ে, শত অবহেলা ও লাঞ্ছনা সহ্য করে তাঁরা তমসাচ্ছন্ন মানবের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করে যান। আজ পরস্পর হিংসা ও অবিশ্বাসের ঘোর অন্ধকারে সেই রুদ্রের "অযুত আলোকে ঝলসিত" মূর্তির অপেক্ষায় রয়েছে সাধারণ মানুষ। যখনই মানুষের বিপদ গাঢ়তম হয়েছে তখনই ইতিহাস সবিস্ময়ে দেখেছে নরের মধ্যে নারায়ণের লীলা।

আজ দেখি শান্তিপ্রিয় সন্তানবৎসল ষ্টীল্ দম্পতি চলেছেন উদজান বোমার পরীক্ষা বন্ধ করতে; মনুষ্যত্বের জন্য, কল্যাণের জন্য এই আত্মত্যাগের ভাব যে কতো মহান্ ও আত্মিক শক্তিতে সমুদ্ভাসিত তা কী যুক্তি দিয়ে বলে বোঝাবার? নররূপী নারায়ণের অপার লীলা দেখা আমাদের অনেক বাকী আছে। তাই আজ জড়ের শক্তিতে শক্তিমান্ জাতিদের সতর্ক হতে হবে। মানবের কল্যাণবোধ ও আত্মশক্তি তুচ্ছ করার মতো নয়। জড়বিজ্ঞানের জয়গাথাই মানুষের ইতিহাসের শেষ কথা নয়।

পরিচয়

শ্রীশান্তশীল দাশ

রেখে যাব এইটুকু মোর পরিচয়:
সুন্দরের দানে আমি করিনি সংশয়।

সে-দান এসেছে কভু অন্ধকার রাতে,
জ্বালাময় বেদনার বহ্নিকণা সাথে;
কখন এসেছে স্নিগ্ধ প্রভাতবেলায়,
সাজায়েছে এ ধরণী আলোর মালায়।

কখন উঠেছে ঝড়, বিক্ষুব্ধ চঞ্চল
করেছে হৃদয় মোর; নয়নের জল
ঝরেছে; কখন পথ বাধাবন্ধহীন
চলেছি নিশ্চিন্তচিত্তে। হয়নিকো ক্ষীণ
আমার অন্তর মাঝে সে প্রদীপ জ্বলে,
সে-দীপ ধরেছি নিত্য ও চরণতলে।

যা পেয়েছি সবই আমি করেছি গ্রহণ,
সংশয়ের কালো মেঘে ঢাকিনি ভুবন।

তুমি সাথী

—মোহম্মদ দাউদ

যত কিছু আশা ও আকাঙ্ক্ষা মোর
সকলই তোমারে ঘিরি।
ব্যথাতুর মন ল'য়ে বসে আছি
যুগ যুগ ধরে করি তব আরাধনা।
আমি জানি তুমি আছ, আছে তব সৃজিত ধরণী—
রবি-শশী, ফুল-ফল, লতা-পাতা মাটি
তাই আছে আজো। দিন যায় রাত আসে, বায়ু বয়
ভুলিয়াও কেহ কভু স্তব্ধ নাহি রয়।
ঋতু যায়, ঋতু আসে বর্ষ বর্ষ ধরে,
নদী নাহি ভোলে কভু পড়িতে সাগরে
অবহেলি আদেশ তোমার।
মানবের সুখ দুঃখ
ঘুরে ফিরে আসে চলে যায়। তোমারি বিভূতি
নীরন্ধ্র আঁধারে জ্বলে, ঝলে তব দ্যুতি।
লক্ষ্য স্থির রাখি এক—চলি ঠিক পথে,
থাকিবে না দুঃখ ভয় যদি থাক' সাথে
দেখাইতে পথ। পূরিবে আকাঙ্ক্ষা আশা
মিটে যাবে চিরতরে অতৃপ্ত পিপাসা।

সাধু শ্রীজ্ঞান-সম্বন্ধর্

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দক্ষিণ ভারতে বহু মহাপুরুষ, সাধু ও ভক্ত জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁদের পবিত্র জীবন ও দিব্য বাণী আজও হাজার হাজার আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পিপাসুর জীবনপথে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। বহু লোক প্রত্যহ শ্রদ্ধাসহকারে এঁদের পবিত্র নাম স্মরণ করে, মন্দিরে মন্দিরে এঁদের অনেকের আবির্ভাব-উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় এবং এঁদের অলৌকিক জীবনকাহিনী বিভিন্ন ভাষায় সর্বত্র গীত হয়। সত্যই এদেশবাসীর মনের ওপর এঁদের প্রভাব অতুলনীয়।

এইসব সাধু ও ভক্তদের মধ্যে সাধারণতঃ দুইটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী বিষ্ণুর ভক্ত—এঁদের বলা হয় 'আলোয়ার'; সংখ্যা বারো। অপর শ্রেণী শিবভক্ত—এঁদের বলা হয় নয়নার; সংখ্যা তেষট্টি। তামিল ভাষায় এঁরা 'আরুবত্তমুন-ওয়ার' নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত প্রধান বিষ্ণু-মন্দিরে দ্বাদশ জন আলোয়ারের মূল ও উৎসব-বিগ্রহ এবং সমস্ত প্রধান শিবমন্দিরে তেষট্টি জন নয়নারের মূল ও উৎসব-বিগ্রহ দৃষ্ট হয়। এমনকি কর্ণাটক প্রদেশের নঞ্জনগড় প্রভৃতি স্থানেও শিব-মন্দিরে এঁদের বিগ্রহ আছে। পেরিয়া পুরাণে এই সব মহাপুরুষদের জীবনী বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। তামিল ভাষায় 'পেরিয়া পুরাণ' একখানি সর্বজনসমাদৃত মহাকাব্য। এছাড়া শিব-ভক্তবিলাস, অগস্ত্য-ভক্তবিলাস প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য ভাষায়ও এঁদের জীবনী ও বাণীর বিবরণ পাওয়া যায়।

এই তেষট্টি জন নয়নারের সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কেহই কল্পিত নহেন। এঁদের মধ্যে চারজন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন; 'সময় আচার্য' নামে এঁরা অভিহিত। এঁদের নাম আপ্পার্, সুন্দরর্, জ্ঞানসম্বন্ধর্ ও মাণিকভাসগর্। তামিলে সম্মানিত ব্যক্তির শেষে সাধারণতঃ 'র্' যোগ করা হয়। এই চারজন মহান্ আচার্য শৈব-ধর্মের চারটি পন্থা, যথা—কার্য, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞানের এক একটির প্রতিনিধিত্ব করেন। এই চারটি পন্থা আবার দাসমার্গ, সৎপুত্রমার্গ, সহমার্গ ও সন্মার্গ নামে পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞান-সম্বন্ধর্ ক্রিয়া বা সৎপুত্র-মার্গের আচার্য বলে পরিচিত। আপ্পার্ কার্য বা দাসমার্গের, সুন্দরর্ যোগ বা সহমার্গের এবং মাণিকভাসগর্ জ্ঞান বা সন্মার্গের আচার্য। ইতিহাস অনুযায়ী প্রথমে আপ্পার্ এবং তৎপরে জ্ঞানসম্বন্ধর্, সুন্দরর্ ও মাণিকভাসগর্ জন্মগ্রহণ করেন এবং সব শিব-মন্দিরেই ঐ ক্রমে ওঁদের মূর্তি স্থাপিত আছে। কেহ কেহ অবশ্য বলেন মাণিকভাসগরই সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন।

ঈশ্বরোদ্দেশ্যে এঁরা তামিল ভাষায় যে সব স্তবস্তুতি রচনা করেন—ভাবের গাম্ভীর্যে, ভাষার মাধুর্যে, ছন্দের সৌকর্যে সেগুলি অতুলনীয়। এঁদের রচনাবলী তামিল ভাষাকে অতীব সমৃদ্ধ করেছে। শিবের প্রতি তাঁদের ঐকান্তিকী ভক্তি, অপার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালবাসার কাহিনী ঐ সব রচনার মাধ্যমে সুপরিস্ফুট। প্রথম তিন জনের রচনাবলী 'তেবারম্' নামে এবং মাণিকভাসগরের রচনাবলী 'তিরুবাচগম্' নামে খ্যাত। অতীব শ্রদ্ধা সহকারে এখনও প্রত্যহ দাক্ষিণাত্যের বহু শিবমন্দিরে 'তেবারম্' গীত হয়ে থাকে। ৺রামেশ্বরের মন্দিরে ভোরে ভগবানকে জাগাবার সময় এবং রাত্রে শয়ন দেবার সময় প্রত্যহ 'তেবারমের' অংশবিশেষ গীত হ'তে শুনেছি।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আচার্যশ্রেষ্ঠ শ্রীজ্ঞান-সম্বন্ধরের পূতজীবনকাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা

করব। এঁর পুরা নাম "তিরুজ্ঞান সম্বন্ধমূর্তি স্বামী"। দাক্ষিণাত্যে সব ব্রাহ্মণদেরই এবং মহাপুরুষদেরও 'স্বামী' বলা হয়। 'তিরু' অর্থে 'শ্রী', অথবা 'দৈব' বা 'পবিত্র'। শিশুকালেই ইনি দৈবজ্ঞান লাভ করেন বা দৈবজ্ঞানের সংস্পর্শে আসেন সেজন্য এঁকে 'তিরুজ্ঞানসম্বন্ধর্' বলা হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁর বিখ্যাত রচনা 'সৌন্দর্যলহরী'র ৭৬তম শ্লোকে জগজ্জননী পার্বতীদেবীর স্তনপানে দ্রাবিড় শিশুর জ্ঞানলাভের কথা উল্লেখ করে জ্ঞানসম্বন্ধর্‌কেই স্মরণ করেছিলেন। শ্রীশঙ্কর তাঁর অমর লেখনীতে লিখেছেন :

তব স্তন্যং মন্যে ধরণিধরকন্যে হৃদয়তঃ,
পয়ঃপারাবারঃ পরিবহতি সারস্বত ইব।
দয়াবত্যা দত্তং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য তব যৎ
কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়ঃ কবয়িতা ॥

'হে গিরিসুতে! তোমার বক্ষ হইতে সারস্বত পয়ঃপ্রবাহের ন্যায় অর্থাৎ কৈলাসশিখরস্থিত সারস্বত নামক অগাধ অমৃতসিন্ধুর ন্যায় স্তন্য প্রবাহিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। কারণ দ্রাবিড়দেশীয় শিশুকে কৃপা করিয়া তুমি স্তন্য পান করাইয়াছিলে, সেই স্তন্যপান-প্রভাবেই বালক তৎক্ষণাৎ প্রৌঢ় কবিদিগের মধ্যে উত্তম কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিল।'

মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর (Tanjore) জিলায় শিয়ালি নামে এক ছোট পুরাতন সহর আছে। মাদ্রাজ হইতে উহার দূরত্ব প্রায় ১৬২ মাইল এবং উহা বিখ্যাত রেলওয়ে জংশন মায়াভরমের সন্নিকটে অবস্থিত। আমাদের পুরাণে কথিত আছে প্রত্যেক প্রলয়ের শেষে ধরাধাম জলে পরিপূর্ণ হয়। এমনই এক প্রলয়ের পর যখন সর্বত্র জল, তখন একমাত্র এই শিয়ালি শহরস্থিত শিব-মন্দিরটি তিন মাস্তলযুক্ত ছোট জাহাজের (Barque) ন্যায় ভাসতে থাকে। সেজন্য এই সহর 'বার্ক টাউন' নামেও খ্যাত। এই সহরে শিবপাদহৃদয়ার্ নামে এক অতি ধার্মিক শিবভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। চার বেদে তাঁর ছিল অসাধারণ জ্ঞান। মন্দিরে শিবের আরাধনা ও সেবাপূজাতেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত। যৌবনে তিনি ভগবতী নাম্নী এক ভক্তিমতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। সে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কথা। তখনকার দিনে তামিলনাদে জৈন ও বৌদ্ধদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। চোলা এবং পাণ্ড্য রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন। মন্ত্র ও যাদুবিদ্যার প্রভাবে জৈন এবং বৌদ্ধরা বিশেষ করে জৈনরা—হাজার হাজার হিন্দুকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করে। অসংখ্য জৈনমন্দির নির্মিত হয় এবং হিন্দুরা ক্রমশঃ তাদের সনাতন দেবদেবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'তে থাকে। বলা বাহুল্য হিন্দুধর্মের অঙ্গ শৈবরাও শিব-আরাধনা পরিত্যাগ ক'রে জৈন তীর্থঙ্করের পূজা শুরু করেন। ভক্তপ্রবীর শিবপাদহৃদয়ার্ এতে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি চাইতেন তাঁর প্রাণের আরাধ্য দেবতা প্রিয়তম দেবাদিদেব মহাদেবকেই সকলে ভজনা করুক। নিরুপায় হয়ে তিনি শুরু করেন কঠোর সাধনা এবং প্রার্থনা করেন, 'হে ভগবান, তোমার কৃপায় আমার এমন একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করুক—যে এই সব জৈন ও বৌদ্ধদের তাড়িয়ে দিয়ে তোমার অমৃতময় উপদেশ জনসমাজে প্রচার করতে পারবে। ভক্তের ভক্তির আতিশয্যে দেবতার আসন টলে ওঠে এবং দর্শনদানে ভক্তকে কৃতার্থ ক'রে শিব বলেন, 'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে'। যথাসময়ে ভগবতী দেবী সর্বসুলক্ষণযুক্ত এক সুকুমার পুত্র প্রসব করেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে জ্ঞানসম্বন্ধর্ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষীরা নবজাতকের জন্মনক্ষত্রাদি পরীক্ষান্তে বলেন যে জাতকের আয়ু মাত্র আট বছর, তবে যদি সে ধর্মপ্রচার করে তবে আরও আট বছর আয়ু পাবে। সুতরাং মাত্র ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবিত কাল। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই দাক্ষিণাত্যের

তথা ভারতের শৈবজগতে যে আলোড়ন তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অতুলনীয়। এই দেবশিশু দু-বছর বয়স হতেই পরিষ্কার কথা বলতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি অতি সুন্দর ও ভক্তিভাবাত্মক কবিতা রচনা করেন এবং উহাই প্রথম 'তেবারম্'। উহাকেই তামিল ভাষায় শৈবশাস্ত্রের প্রারম্ভ বলা হয়ে থাকে। এক আশ্চর্য পরিস্থিতির মধ্যে তিনি শ্লোকটি রচনা করেন।

একদিন শিবপাদহৃদয়ার্ যখন শিয়ালির শিব-মন্দিরচত্বরের অভ্যন্তরস্থ পুকুরে স্নান করতে যাবেন, শিশু জ্ঞানসম্বন্দর্ ধরে বসলেন তিনিও পিতার সঙ্গে যেতে চান। তাকে নিবৃত্ত করার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে সঙ্গে নিতে হ'ল। পুকুরের ঘাটে পুত্রকে বসিয়ে পিতা জলে নামলেন। পিতা জলে ডুব দিলে বালক ভীত হয়ে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ মন্দিরের চূড়ায় বালকের দৃষ্টি পড়ায় তার মনে কি ভাব এল এবং 'ও মা, ও বাবা' বলে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে শিশু আরও কাঁদতে আরম্ভ করল। পিতা স্নানে এবং সন্ধ্যা-আহ্নিকে ব্যস্ত। বালকের ক্রন্দনে শিব ও পার্বতী কৃপাবিষ্ট হয়ে ষাঁড়ে চড়ে বালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র বালকের হৃদয় আনন্দে ভরে গেল এবং তার দু-চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়তে লাগল। বালককে ক্ষুধার্ত মনে ক'রে পার্বতীকে শিব বললেন, 'আহা, ছেলেটি বোধ হয় খিদেয় কাঁদছে, ওকে দুধ খাওয়াও।' পার্বতী এক সোনার বাটিতে নিজের বক্ষ থেকে দুধ বার ক'রে শিশুকে পান করানো মাত্র শিশুর হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল এক দিব্যভাবে—তার জ্ঞানের কপাট যেন খুলে গেল। স্নানান্তে পিতা এসে বালকের ঠোঁটে দুধের চিহ্ন দেখে রুষ্ট হ'য়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তোকে দুধ খাইয়েছে বল্ ? বালক তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিখ্যাত ছন্দে বলে উঠল, 'ঐ দেউলের দেবতা—যিনি চোরের মত এসে আমার সমস্ত হৃদয় চুরি করে নিয়ে গেলেন, বিষধর সর্প যাঁর কর্ণের ভূষণ, বৃষ যাঁর বাহন, মস্তকে যাঁর শোভা পাচ্ছে স্নিগ্ধ শশাঙ্ক, শ্মশানের ভস্মে যাঁর সর্ব শরীর লিপ্ত সেই ভগবানের আদেশে স্বয়ং ভগবতী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন।' মুগ্ধ বিস্ময়ে পিতা ভাবতে লাগলেন, 'এই ক্ষুদ্র শিশু কিরূপে এই সুন্দর ছন্দোবদ্ধ দেবতার মাহাত্ম্যবিষয়ক শ্লোক রচনা করল!' ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে আনন্দে তিনি এই বলে নৃত্য করতে লাগলেন, 'যাক ভগবান আমার কাতর প্রার্থনা শুনেছেন। আজ থেকে আমাদের ধর্ম নিরাপদ। জৈন ও বৌদ্ধরা আর আমাদের ধর্মের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।' বালক বয়সেই পুত্র দৈবজ্ঞানের সম্পর্কে এলেন বলে পিতা তার নাম রাখলেন, 'তিরুজ্ঞান-সম্বন্দর্'। কিছুকাল পরে তিরুভলেকের মন্দিরে জ্ঞানসম্বন্দর্ যখন হাতে তাল দিতে দিতে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করছিলেন, হঠাৎ ওপর থেকে এক জোড়া সোনার করতাল তাঁর সামনে পড়ল এবং তদবধি তিনি সেই করতাল-বাদ্যসহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে তীর্থ হ'তে তীর্থান্তরে গমন করেন। বিখ্যাত ভক্ত ও অসাধারণ পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি অচিরেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক ভক্ত জ্ঞান-সম্বন্ধের ভক্তি ও রচনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে সমবেত হলেন। কথিত আছে জ্ঞানসম্বন্ধ চারবার তীর্থভ্রমণ করেন এবং মোট ২৭৫টি বিখ্যাত শিব-মন্দির দর্শন করেন। যখনই তিনি কোনও মন্দিরে গেছেন, তখনই সেই মন্দিরস্থ দেবতার উদ্দেশে সুন্দর স্তব রচনা করে তাঁর মহিমা কীর্তন করেছেন। ঐ স্তবগুলিই 'তেবারম্' নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং তামিল ভাষায় উহা এক অমূল্য সম্পদ।

জ্ঞানসম্বন্ধের চরিত্রের এক প্রধান গুণ যে তিনি সঙ্গীদের খুব ভাল বাসতেন। তখনকার দিনের

অনেক বিশিষ্ট ভক্ত ও সাধক তাঁর অনুগামী হন। তন্মধ্যে 'তিরুনীলকান্ত পেরমপানার' অন্যতম। তিনি একজন অতি সুপ্রসিদ্ধ বীণাবাদক ছিলেন। জ্ঞানসম্বন্ধের সম্মতিক্রমে তিনি তীর্থপর্যটনকালে তাঁর অনুগমন করেন এবং যখনই জ্ঞানসম্বন্ধ কোনও তেবারম্ রচনা করতেন, পানার তখনই তাঁর বিখ্যাত বীণা বাজিয়ে উহা গাইতেন। জ্ঞানসম্বন্ধের ভক্তিরসাত্মক ও গভীর ভাবোদ্দীপক অপূর্ব গীতিকাব্য রচনার কৌশল দেখে পানারের হৃদয় তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। পানারের আত্মীয় স্বজন কিন্তু বলতে লাগলেন যে বীণাসহযোগে পানার এত সুন্দরভাবে জ্ঞানসম্বন্ধের রচনা গেয়েছেন বলেই সেগুলির এত সমাদর। আত্মীয়স্বজনের নীচতা দেখে পানারের হৃদয় দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং জ্ঞানসম্বন্ধের নিকট তিনি প্রার্থনা করেন, তিনি এমন একটি শ্লোক রচনা করুন যা বীণা সহযোগে গাওয়া যায় না। ভক্তের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য জ্ঞানসম্বন্ধ তাই করলে পর পানার একটু শান্ত হন। কিন্তু যে বীণা তাঁর ঐরূপ মনঃকষ্টের কারণ তা তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হলেন। জ্ঞানসম্বন্ধ বীণাটি নিয়ে উহার সাহায্যে এমন একটি কঠিন স্তব গান করেন যা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। পরে আশীর্বাদান্তে তিনি বীণাটি পানারকে প্রত্যর্পণ করেন। কথিত আছে, ভক্তের ভক্তির আতিশয্যে দেবতা জাগ্রত হন। জ্ঞানসম্বন্ধের জীবনী আলোচনা করলেও দেখা যায় যে প্রত্যেকটি মন্দিরে তিনি হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি নিংড়ে যেন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করছেন এবং তাঁর বাঙ্ময়ী পূজাতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান যেন সেখানে জাগ্রত হয়ে উঠছেন। উপস্থিত অসংখ্য ভক্ত নরনারী সে সব মন্দিরে ভগবানের আবির্ভাব সাক্ষাৎ অনুভব করতেন।

পূর্বেই বলেছি জ্ঞানসম্বন্ধ চারবার তীর্থ পর্যটনে গিয়েছিলেন। প্রথমবার তাঁর পিতা কাঁধে করে শিয়ালির আশেপাশের মন্দিরে তাঁকে নিয়ে যান; দ্বিতীয়বার পবিত্র কাবেরী নদীর উত্তর তীরের মন্দিরসমূহ দর্শন করেন; তৃতীয়বার পাণ্ড্য রাজাদের এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরসমূহ দর্শন, চতুর্থবার তোণ্ডায় নাড়ুতে (নাড়ু অর্থে এলাকা) অর্থাৎ কাঞ্চীপুরম্ ও তৎসন্নিকটবর্তী তীর্থস্থানগুলি দর্শন করেন। শেষের তীর্থযাত্রা দুটি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

প্রথম যাত্রার শেষভাগে পিতার কাঁধে চড়ে যখন তিনি যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর মনে হল, যে পিতাকে কষ্ট দিয়ে এরূপভাবে যাওয়া উচিত নয়। যে চিন্তা সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন পিতার কাঁধ থেকে। কিন্তু বালকের অনভ্যস্ত কোমল পদদ্বয় শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন তিনি তিরুমারাণপাড়ির বিখ্যাত শিবমন্দিরের কাছাকাছি এসেছেন। ভক্তের কষ্ট ভগবানের হৃদয়কে আঘাত করল। সেই রাতেই গ্রামবাসী ও পুরোহিতদের ওপর আদেশ হ'ল, "মন্দিরে আমার যে মুক্তার পালকি ও ছাতি আছে উহা সত্বর জ্ঞানসম্বন্ধরকে দাও।" আদেশ পাওয়া মাত্র সকলে পালকি ও ছাতি অশেষ শ্রদ্ধাসহকারে জ্ঞানসম্বন্ধের সম্মুখে রেখে ভগবানের আদেশ তাঁকে নিবেদন করল। তদবধি সেই পালকিতে চড়েই জ্ঞানসম্বন্ধ তীর্থপর্যটনে বেরুতেন।

জ্ঞানসম্বন্ধের জীবন অসংখ্য অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সে সব ঘটনার বর্ণনা করা ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তবুও কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ না করলে তাঁর জীবনী যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যখনই তিনি কোনও বিপদ, পরীক্ষা বা সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখনই তাঁর প্রিয়তম ইষ্টদেব শিবের মহিমা-বিষয়ক অপূর্ব ভক্তিরসাত্মক স্তুতি স্বতই তাঁর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হ'ত এবং অলৌকিক ঘটনা ঘটত।

তাঁর ভ্রমণকালে মলোনাদ গ্রামের শিবমন্দিরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কোল্লিমালভন নামে—সেই গ্রামের এক ভক্তের একমাত্র কুমারী কন্যা দুরারোগ্য জঘন্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যখন অন্তিম কালে উপস্থিত তখন অনন্যোপায় পিতা প্রিয় কন্যাকে মলোনাদের মন্দিরে এনে ভগবানের সম্মুখে শায়িত করে তার কৃপার জন্য প্রার্থনায় রত হন। এমন সময় খবর আসে যে ভক্তপরিবৃত হয়ে জ্ঞান সম্বন্ধর্ সেই দিকে আসছেন। কোল্লিমালভন কন্যার অবস্থা ভুলে গিয়ে জ্ঞানসম্বন্ধের সাদর অভ্যর্থনার জন্য তৎক্ষণাৎ গমন করেন এবং ফলে-ফুলে গ্রামটি সুশোভিত করেন, মঙ্গলঘট স্থাপনপূর্বক বাদ্যধ্বনি সহকারে বালক-সাধুকে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে তাঁকে মন্দিরে নিয়ে যান। মুমূর্ষু কন্যাটিকে দেখে জ্ঞানসম্বন্ধের দয়া হ'ল। জিজ্ঞাসিত হয়ে কোল্লিমালভন বললেন, 'জাগতিক চিকিৎসক অক্ষমতা প্রকাশ করায় ত্রিলোকের চিকিৎসক ভগবানের দ্বারে মেয়েটিকে এনেছি।' জ্ঞানসম্বন্ধ তখনই এক স্তব রচনা করেন এবং কন্যাটির আরোগ্য লাভের জন্য ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান। আশ্চর্যের বিষয় মুহূর্তের মধ্যে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পিতার পাশে উঠে দাঁড়ায় এবং পিতাপুত্রী উভয়ে ভক্তিভরে জ্ঞানসম্বন্ধের পাদ-বন্দনা করেন।

মলোনাদ থেকে জ্ঞানসম্বন্ধ কাবেরী নদীর দক্ষিণ-তীরস্থ কোঙ্গু অঞ্চলে চেনকুনরুর, চোলা-মাণ্ডালা, তিরুভাডাতুরাই প্রভৃতি বিখ্যাত শৈব-তীর্থসমূহ দর্শন করেন। শেষোক্ত স্থান থেকে পূর্বপ্রতিশ্রুত যজ্ঞ সম্পাদন-মানসে জ্ঞানসম্বন্ধের পিতা পুত্রের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে শিয়ালি প্রত্যাগমন করেন। এ সব স্থানেও জ্ঞানসম্বন্ধ অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করেন। অতঃপর সিরুতোণ্ডার নামক বিখ্যাত শিবভক্ত সেদিকে আসছেন শুনে তিনি ছুটে যান তাঁকে দর্শন করতে। দুই ভক্তের সে মিলন এক অপূর্ব দৃশ্য! অশেষ প্রেমভরে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন এবং সিরুতোণ্ডারের মহিমা বর্ণনা ক'রে জ্ঞানসম্বন্ধ স্তব রচনা করেন; তাঁর কণ্ঠে সর্বক্ষণই দেবী সরস্বতী যেন বিরাজ করতেন।

সিরুতোণ্ডারের ভক্তির অবধি ছিল না। তিনি ও তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রী প্রত্যহ বহু শিবভক্তকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়ে তবে নিজেরা আহার্য গ্রহণ করতেন। একদিন কোনও শিব-ভক্তকে না পাওয়াতে ভক্তদম্পতি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, ভক্ত-সন্ধান-মানসে সিরুতোণ্ডার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে এক শিবভক্ত এসে দরজায় করাঘাত করেন। সিরুতোণ্ডারের স্ত্রী দরজা খুলে তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলেন, "পূজনীয় মহাশয়, ভেতরে আসুন। আমার স্বামী একটু বাইরে গেছেন। তিনি এসে আপনাকে দর্শন করে খুবই আনন্দিত হবেন।" ভক্তটি বলিলেন, "না মা, যে বাড়ীতে কোনও পুরুষলোক নেই আমি সে বাড়ীতে প্রবেশ করি না। ইহা করা উচিতও নয়। আমি উত্তরদেশবাসী। তোমার স্বামী না আসা পর্যন্ত আমি বাইরেই অপেক্ষা করব, বরং ইতিমধ্যে আমি পুকুরে স্নান করে আসি।"

কাউকে না পেয়ে হতাশহৃদয়ে সিরুতোণ্ডার ফিরে এসে যখন শুনলেন যে এক শিবভক্ত অযাচিত-ভাবে তাঁর বাড়ীতে এসেছেন তখন তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। স্নানান্তে ভক্ত ফিরে এলে সিরুতোণ্ডার জোড়হাতে বল্লেন, "প্রভু, আমার গৃহ পবিত্র করুন এবং এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন।" উত্তরে ভক্ত বললেন, "ভাই, তোমার ঘরে খেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি বোধ হয় আমাকে খাওয়াতে পারবে না। প্রতি ছয়মাস অন্তর আমাকে একবার মাংস খেতে হয়। কিন্তু তুমি কি ক'রে আমাকে মাংস খাওয়াবে?" "আপনি কিরূপ মাংস খান?"

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন সিরুতোণ্ডার। উত্তরে অতিথি বল্লেন, "আহা! সে মাংস তুমি আমায় দিতে পারবে না ভাই। নধর সুন্দরকান্তি সপ্তম-বর্ষীয় কোনও বালকের মাংস তোমরা উভয়ে রেঁধে দিলে তবেই আমি খেতে পারি।"

অতিথি অভুক্ত থাকবেন, একথা তখনকার দিনে সাধারণ গৃহস্থও ভাবতে পারতেন না; সিরু-তোণ্ডারের ত কথাই নেই। পতিব্রতা সহধর্মিণীর সহিত পরামর্শ ক'রে তাঁরা নিজেদের একমাত্র সপ্তমবর্ষীয় প্রিয়দর্শন পুত্রকে কেটে তার মাংস রন্ধন ক'রে খাওয়ার জন্য অতিথিকে সাদর আহ্বান জানালেন। অতিথি আসনে বসে বললেন, "আমি ত একা খাই না, আর আমার খাওয়া না হ'লে তোমরাও ত খাবে না, কাজেই তোমাদের ছেলেকে ডাক, সে আমার সঙ্গে বসুক।" কি করবেন ভেবে সিরুতোণ্ডার হতবাক হয়ে রইলেন। ভক্ত কর্তৃক পুনরায় জিজ্ঞাসিত হয়ে কম্পিতকণ্ঠে সিরুতোণ্ডার বললেন, "প্রভু, আমার ত পুত্র আর নেই।" অতিথি বললেন, "সেজন্য কিছু ভেব না। তোমার যে পুত্র ছিল—তার নাম ধরেই ডাক।" অতিথিপরায়ণ ভক্তদম্পতি হত পুত্রের নাম ধরে ডাকামাত্র সে হাসতে হাসতে দৌড়ে তাঁদের কাছে এল। মাতাপিতা আনন্দাতিশয্যে হারানিধি পুত্রকে পেয়ে তাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন ক'রে অতিথির দিকে ফিরে দেখেন যে অতিথি অদৃশ্য। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে স্বয়ং শিবই তাঁদের ভক্তি পরীক্ষার জন্য অতিথিরূপে তাঁদের সম্মুখে এসেছিলেন।

এ হেন ভক্তের দর্শনে স্বতই জ্ঞানসম্বন্ধ অত্যন্ত পুলকিত হন এবং তাঁর সাথে কয়দিন মহানন্দে যাপন করেন। অতঃপর তিনি তিরুমারুকল, তিরুভানাই প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন করেন। সিরুতোণ্ডার তাঁর অনুগামী হন এবং পথে পূর্বোল্লিখিত সাধু আপ্পার্ তাঁর সাথে যোগ দেন। ত্রিবেণী-সঙ্গমের ন্যায় এই অপূর্ব তিন ভক্তের দৈব মিলন দেখতে সহস্র সহস্র নরনারী মিলিত হন এবং সকলে সমবেতকণ্ঠে 'হর হর' ধ্বনি করতে থাকেন। সেই ধ্বনি শুনে সকলেই মনে করলেন যে জৈন ও বৌদ্ধদের অন্তিমকাল উপস্থিত। সত্যই হয়েছিলও তাই। (ক্রমশঃ)

স্বপ্ন ও জাগরণ*

শ্রীশিবদাস সুর

গ্রামবাসী চাষী এক, অনুভব-জ্ঞানী,
সকল বিষয়ে শান্ত, নহে অভিমানী;
ধার্মিক বলিয়া তারে সবে ভালবাসে,
নিরাপদে কাটে কাল সুখে চাষ-বাসে;
গৃহেতে গৃহিণী ছিল, পুত্র হারাধন,
পিতামাতা উভয়ের স্নেহের ভাজন।
দূর মাঠে একদিন চাষী চাষ করে,
হেনকালে হারাধনে বিসূচিকা ধরে;
বিপরীত খাতে বহে জীবনের ধারা,
ঘরে ফিরে দেখে বাপ, ছেলে গেছে মারা।
জীবনের বিয়োগান্ত নাট্য-অভিনয়,
দেখে শুনে মিথ্যা জেনে নির্বিকার রয়।

পতিরে কহিল পত্নী, পুত্র শোকাতুর,
'একবার কাঁদিলে না? নিদয় নিঠুর;
পাষাণে গঠিত হিয়া, নাহি মায়া লেশ,
উদাসীন আচরণে বাড়ে মোর ক্লেশ।'
'কাঁদি না যে' কহে চাষী, 'শোন কি কারণ:
কাল রাতে দেখেছিনু মজার স্বপন;
সাত রাজপুত্র সহ হইয়াছি রাজা
রাত্রি শেষে কিছু নাই অভিনয়ে সাজা;
ভাবিয়া না পাই তাই স্বপ্ন হতে জাগি
একপুত্র তরে কাঁদি, কিম্বা সাত লাগি?'

* * *

বেদান্ত-বিচারে হয় তত্ত্ব-নিরূপণ
স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সম—মিথ্যা জাগরণ।

* শ্রীরামকৃষ্ণকথা-অবলম্বনে।

শ্রীম-স্মৃতি

শ্রীমহেন্দ্রকুমার চৌধুরী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গলাভ করিয়া যৎসামান্য কিছুকাল সেই সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছিলাম; তাই তাঁহার চুম্বক স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষ এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সরকারি কার্যোপলক্ষ্যে কিছুকাল ৪৭নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে একটি মেসে বাস করি। চিরকালই সাধুসঙ্গ ভালবাসি। লোকমুখে জানিতে পারিলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মহাশয় (পরমভাগবত শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সন্নিকটবর্তী ৫০নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে (Morton Institutionএ) বাস করেন। তথায় সন্ধ্যাকালে বহু ভক্তের সমাগম হয় ও নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও কীর্তনাদি হয়। ইহা শুনিয়াই তাঁহার দর্শনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং কর্মস্থল হইতে আসিয়া কিছুকাল বিশ্রামের পর সন্ধ্যার অপেক্ষায় বাকি সময়টুকু উদ্বেগের সহিত কাটাইতাম।

প্রথম দিন গোধূলির সময় তাঁহার খোঁজ লইয়া নির্দিষ্ট ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতেছি; হঠাৎ তিনি আসিয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং আমায় সেই ঘরেই বসিয়া ধ্যান করিতে বলিয়া কিছু সময়ের জন্য উপরে ত্রিতলের ঘরে চলিয়া গেলেন। আমি অবাক হইয়া ভাবিতেছি, কি করিয়া তিনি আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন? কারণ তৎপূর্বক্ষণে ঐ স্থানে বসিয়া আমার ধ্যান করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।

যাহা হউক, তাঁহার সুদীর্ঘ বাহুযুগল এবং সুপক্ক এবং আবক্ষলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুরাজি ও নয়নাভিরাম মূর্তি দর্শন করিয়াই প্রাণে অপার আনন্দের ঢেউ খেলিতে লাগিল। তাঁহার কথামতো কিছুক্ষণ ধ্যানের চেষ্টা করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ঐ স্কুল ঘরটির সু-উচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকে ধ্যানের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মোটামুটি কয়েকটি বিষয় বলিয়া দিলেন। তখনও আর কোনও ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

ক্রমে ক্রমে যেমন রাত্রি বাড়িতে লাগিল ভক্তগণের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বাড়িতে আরম্ভ করিল। তখন সেই পূর্বোক্ত দ্বিতলের সামনের ঘর হইতে পূর্ব পার্শ্বের অন্য ঘরে সমাগত ভক্তগণের সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়া মাষ্টার মহাশয় নিজ আসনে উপবেশন করিলেন এবং যথারীতি 'পঞ্চবিংশতি গীতা' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করিয়া আমাদিগকে শুনাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'কথামৃত' হইতে সেই পূর্বকালের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন।

এইভাবে কিছুকাল চলিল। প্রতিদিনই তাঁহার নিকট হইতে নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতাম। তাঁহার সুদীর্ঘ ও শুভ্র শ্মশ্রুরাজি ইতস্ততঃ দোলাইয়া গানের তালে তালে যে ভাবে মন প্রাণ মজাইয়া ভক্তহৃদয়ে সুধাবর্ষণ করিতেন তাহা যেন হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

দিন যায়, কথা থাকে। একদিন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মূল উৎস কোথায় জানিতে পারি; সেই সঙ্গে তাঁহার কথিত অন্যান্য কথাও যতটুকু মনে ছিল বাসায় ফিরিয়া সেই রাত্রেই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

সেকালের সঙ্গিগণের সঙ্গে পরবর্তীকালে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। নানাজন নানাদিকে উন্নতি করিয়াছেন। কেহ সংসারী, কেহ বিরাগী হইয়াছেন ; কেহ বা সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আবার কেহ কেহ ধরাধাম হইতে বিদায় লইয়াছেন।

'কথামৃত' রচনার মূল সম্বন্ধে সেদিন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলাম। পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, 'ছোটকালে যখন Class V কি Class VI এ পড়িতাম তখন হইতেই দৈনন্দিন কাজকর্মের দিনলিপি (Diary) লিখিতে আরম্ভ করি। পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনের পূর্ব পর্যন্ত যথানিয়মে উহা লিখিতেছিলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দর্শনের পর হইতে ডায়েরিতে তাঁহার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) বাণীই প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং পূর্বেকার ডায়েরি নিজরূপ বদলাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে রূপান্তরিত হইল।'

এইজন্য মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রকাশিত হইবে বলিয়াই যেন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে পূর্ব হইতেই নিজ ডায়েরি লিখিবার অভ্যাস করাইতেছিলেন।

এই ভাবেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রকাশিত হইয়া অগণিত দীনদুঃখী, পাপীতাপী, সাধুসজ্জনের প্রাণ জুড়াইবার ও মোক্ষপথের সোপান সৃষ্টি করিল।

তাঁহার শ্রীমুখ হইতে 'কথামৃতে'র ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার একদিনকার কথামৃত যতটুকু স্মৃতি-পথে ছিল নিম্নে তাহাও লিপিবদ্ধ করিলাম :

হয় সাধুসঙ্গে বাস করবে, নচেৎ সিংহের ন্যায় একা বাস করবে। নির্জনে ও গোপনে ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে।

অজ্ঞের সঙ্গে দু'একটি মিষ্টি কথা বলে কি হবে ? সে সময়টি সাধন-ভজন ধ্যান-ধারণায় নিয়োগ করা উচিত।

শরীর তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ ; —Body, Mind and Spirit. কারণ-শরীর সংসারের কোন ভোগ নেয় না, কেবল ঈশ্বরীয় ভাব আস্বাদন করে থাকে। ঈশ্বরীয় কথায়—অঙ্গে পুলক হয় এবং নেত্রে ধারা বয়। কারণ-শরীর ধ্যানসমাধিতে মহাকারণে লয় হয়।

চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, শিবলোক ইত্যাদি আছে বলে জানা যায় এবং তা আমরা মহর্লোক হতে জানতে পারি। মানুষের বুদ্ধি সামান্য, এইজন্য নিজের ধারণা হয় না বলে অস্বীকার করা উচিত নয়। তবে বলা উচিত—আছে বলে শুনা যায়, আমি অবিশ্বাস করি না।

ঠাকুরকে কেহ জন্মান্তর আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতেন—আছে বলে জানা যায়, অবিশ্বাস করা উচিত নয়।

মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—ঈশ্বর লাভ করা। যে প্রকারে তাঁকে লাভ করা যায় তা করা উচিত। অত বাজে বিষয়ের হিসাব নিকাশ করে কি হবে ? আম খাও পেট ভরবে, পাতা লতা গুণে ফল কি ?

তাঁকে জানলেই তিনি সব জানিয়ে দিবেন। যদু মল্লিকের সহিত আলাপ করলে তিনিই জানিয়ে দিবেন তাঁর কত কোম্পানী কাগজ ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন, প্রথম পুস্তকাদি থেকে জ্ঞান লাভ করা, পরে তাঁকে জানা কিন্তু তাহা না করে প্রথমে তাঁকে জানা দরকার। প্রয়োজন হ'লে তিনিই সব জানিয়ে দেবেন।

সাধুসঙ্গ ঈশ্বর লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

এখন (ঠাকুরের সময় হইতে বর্তমান পর্যন্ত) যাঁরা জন্মগ্রহণ করছেন তাঁরা অনেক ভাগ্যবান্, কারণ তাঁরা একটা নির্দেশিত পথে চলতে পারবেন।

তিনি যুগে যুগে গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে এসে দুর্গম ও দুর্বোধ্য পথ সরল ও সহজ করে লোকের ঈশ্বর লাভের পথ সুগম করে দিয়ে যান।

যাঁদের এ জীবনে সুযোগ ঘটেনি তাঁদের আগামী জন্মে ঘটবে।

ঠাকুর বলে গিয়েছেন, তাঁর ধ্যান করলেই তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যাবে।

তাঁকে ডাকার চেয়ে তাঁর নির্দেশিত কাজ করা ভাল।—"Thou sayest O God, God, God, but why thou doest not do what I say unto you"—Bible.

গুরুর কৃপা হ'লে শিষ্য যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন ভাববার কোন প্রয়োজন নাই। এক বাজিওয়ালা দুই সহস্র দর্শককে সহস্র গ্রন্থি-বিশিষ্ট একখানা রজ্জু থেকে তার একটি গ্রন্থি খুলতে বলেছিলেন। কেহই তা পারল না। অবশেষে সে রজ্জুর এক প্রান্ত একটি লোককে ধরতে বলল এবং অপর প্রান্ত নিজে ধরে যখন ঘুরাল তখন সমস্ত গ্রন্থি খুলে গেল। গুরুর কৃপা হলেই শিষ্যের সর্ব প্রকারের বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়।

নির্জনে ধ্যান ধারণা করবে এবং কোন সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করবে। পড়ার চেয়ে শোনা ভাল।

কাহারও ভাব নষ্ট করা উচিত নয়, বরং তার সেই ভাবে সাহায্য করা উচিত। কারণ সব পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

সব পথে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় বলে একাধিক পথে চলা যায় না। ভক্তি বিশ্বাসের সহিত একপথে চলা উচিত। যেমন ছাদে উঠতে হ'লে দালানের সিঁড়ি, মই, বাঁশ ও দড়ি ইত্যাদির যে কোন একটি দ্বারা উঠা যায় এবং নামবার সময়ও যে কোন একটি উপায়ে অবলম্বন করে নামা যায়। সেই প্রকার একটি পথ অবলম্বন করে ঈশ্বর লাভ করবে।

দরিদ্র অবস্থায় যে সব সঙ্গী তারাই প্রকৃত সঙ্গী। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, এখন আমি মথুরায় রাজা ; এখনকার সঙ্গী অপেক্ষা যখন আমি বৃন্দাবনে দরিদ্র অবস্থায় ছিলাম—তখনকার সঙ্গীরাই আমার প্রকৃত সঙ্গী, আপন জন।

কৃষ্ণের নিকট যাবার জন্য চেষ্টা করে যে সকল গোপিকা স্বামী প্রভৃতির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে যেতে পারে নি—তারা গৃহের দ্বার বন্ধ করে সমাধি দ্বারা প্রাণ বিসর্জ্জন করে কৃষ্ণকে পেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের এতই ভালবাসা।

এই সঙ্গে তখন মাষ্টার মহাশয়ের নিকট তাঁহার প্রিয় যে কয়েকটি সংগীত প্রায়ই গীত হইত তাহা উল্লেখ করি। 'কে আসিলে হে মন্দিরে মম,' 'রঘুকুলরাজা রামচন্দ্র', 'এ হাটে বিকোয় না সুতো' 'আমার কি ফলের অভাব' প্রভৃতি সংগীতগুলি প্রসিদ্ধ। একটি গান সম্পূর্ণ লিখিয়া এই স্মৃতিকথা সমাপন করিলাম :

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে
চন্দ্রমা তপন তারা তাঁহারি আলোকে ভায়
এ বিপুল সংসার, সুখে দুঃখে আঁধার
কেমনে রাখিবি ঢাকি তাঁহারে কুহেলিকায় ?

চেনা ও অচেনা

শ্রীপুলকেন্দু সিংহ

জগতের যাহা কিছু পরম বিস্ময়,
তাহাদের সাথে মোর আছে পরিচয়।
চিনিনাক' আমি শুধু, জানিনাক' তারে,—
বিরাট পরিধিব্যাপী আপন আত্মারে।

'আমারে' চেনাতে শুধু করেছি সাধনা,
"আমি কে ?" জানিতে আজো জাগেনি বাসনা
ব্যর্থ হল অচেনারে চিনিবার ধ্যান ;
অচেনার কাছে চেনা—চিরদিন ম্লান।

স্বামীজীর 'পত্রাবলী'

অধ্যাপক শ্রীপ্রণব ঘোষ

মানব-মনের দু'টি আয়না—চোখ আর চিঠি। আমাদের অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেমন সবচেয়ে বেশী ধরা দেয় চোখে, অন্তরের কথা তেমনি বেশী ধরা পড়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে, অবশ্য সব লেখকের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য নয়। কোন কোন লেখকের চিঠিতে আর প্রবন্ধে বেশী ভেদ থাকে না—কারণ তাঁরা এ বিষয়ে বেশ সচেতন যে, এ চিঠি একদিন ছাপা হবে। আবার কোন কোন লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে যতই কল্পনাচারী হোন না কেন, চিঠির ক্ষেত্রে তাঁরা একান্ত প্রয়োজনবাদী, এই দুই ধরণের লেখককে বাদ দিয়ে সেই সব লেখকদের স্মরণ করি, যাঁরা আপন মনের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন চিঠিপত্রে অথচ লেখনীর গুণে সে সব চিঠি আপনিই সাহিত্য হয়ে উঠেছে, স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে এই দুর্লভ গুণের সমাবেশ দেখি, তাই বাংলা পত্র-সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর 'পত্রাবলী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যশৈলী ওজোগুণসম্পন্ন এবং একেবারে মুখের ভাষার মতই স্বচ্ছন্দ চলনে তার কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত গতিশীলতাই তাঁর গদ্যেও গতিবেগ সঞ্চার করেছে, চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে এই গতিসম্পন্ন ভাষা ইস্পাতের শাণিত উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে, চিন্তার দিক থেকে বেদান্তের মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি, এবং জীবনের দিক থেকে কলকাতার কথ্য-ভাষার সঙ্গ—এ দুয়ে মিলে তাঁর চিঠিপত্রের ভাষাকে গড়ে তুলেছে, জগৎ ও জীবনের নানাদিকে তাঁর দৃষ্টি, তবু মূলতঃ তিনি সন্ন্যাসী—এ কথাটি তাঁর চিঠিতেও পরিস্ফুট, অথচ এ সন্ন্যাসের একটি মূল আদর্শ—'জগদ্ধিতায়'—আধুনিক কালে যার নাম বিশ্বপ্রেম, স্বদেশ, স্বজাতি—সেই সঙ্গে সর্ব মানবের প্রতি অপরিমেয় প্রেমের গভীর মন্ত্রধ্বনি তাঁর চিঠিপত্রে অনাহত সুরে বেজে চলেছে,—একটু কান পাতলেই শোনা যায়।

'উদ্বোধন'-প্রকাশিত স্বামীজীর পত্রাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড) পাঠকালে এই সব কথাই মনে জাগছিল। এ প্রবন্ধে অবশ্য কেবল বাংলায় লেখা চিঠিগুলির আলোচনা করব—বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ওদেরই, ইংরেজী থেকে অনুবাদ-করা চিঠিগুলির সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের পরোক্ষ যোগ: যদিও এই চিঠিগুলির অনুবাদে স্বামীজীর রচনাভঙ্গী যে ভাবে অনুসৃত ও অনুকৃত হয়েছে তা' বিস্ময়কর।

পৃথিবীর অনেক মহামানবের মতোই স্বামীজীর পত্রাবলী তাঁর জীবনের ও অনুভূতিলোকের অনেক গূঢ় সংবাদ বহন করে এনেছে, এই পত্রাবলী তাঁর জীবনী-রচনার অপরিহার্য্য উপাদান।

একদিকে অগাধ আত্মবিশ্বাস, আর একদিকে সুগভীর মানবপ্রীতি—এই দুই সম্পদে তাঁর চিঠি-পত্রের ভাষা সমুজ্জ্বল, চলতি ভাষায় সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে "পরিব্রাজক" এবং "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য"—বই দুটিতে স্বামীজী যে অনায়াসকৃতিত্ব লাভ করেছেন, পত্রাবলীতে সেই কৃতিত্ব আরও বেশী, তাঁর ব্যক্তি-জীবনের নানা মুহূর্তের রঙে রঙানো এই চিঠিগুলি আমাদের সুখদুঃখময় আন্তর-চেতনার সঙ্গে অনায়াসে যোগস্থাপন করে। যাঁদের উদ্দেশ্য করে এসব চিঠি তিনি লিখেছিলেন, আজ তাঁদের অপরিসীম সৌভাগ্যের কথা মনে হলে বিস্ময় জাগে, তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও আলাপের চেয়ে এই পত্রালাপগুলির মূল্যও যে কিছুমাত্র কম ছিল না—একথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর বৈদ্যুতী-ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাই। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ

বিবেকানন্দকে পাওয়া যায়—তাঁর পত্রাবলীর পৃষ্ঠাতেই।

"তুমি আসিতে পারিবে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল; তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা করিব।"[১]

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা এই পত্রাংশটুকু গুরুভ্রাতার প্রতি সন্ন্যাসীর কী অমেয় ভালবাসার বাণী বহন করে এনেছে, অথচ এ বন্ধনও সন্ন্যাসীকে কাটাতে হবে! ভগবান বুদ্ধের জীবনেও দেখি—ত্যাগ তো প্রেমেরই নামান্তর। ঐ চিঠিরই আর এক অংশে বুদ্ধপ্রসঙ্গে আছে—"যে ধর্ম উপনিষদে জাতি-বিশেষে নিবদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্মের যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect এবং heart, যাহা জগতে আর হইল না।.........বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর,—আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু ইতি করিবার শক্তি কাহারো নাই।"[২]

ঠিক তেমনি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তাঁহার অনুভূতি: "......রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহৈতুকী দয়া, সে Intense sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধ জীবের জন্য—এ জগতে আর নাই।......তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনো আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনো বাসে নাই।"[৩] ব্যক্তিগত অনুভূতির মানদণ্ডে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে—"Love is the gate to all the secrets of the universe" (প্রেমই বিশ্বরহস্যের প্রবেশদ্বার)।

নারদভক্তিসূত্রে আছে—"স ঈশ অনির্বচনীয়ঃ প্রেমস্বরূপঃ"। মহাকবি দান্তে অনুভব করেছিলেন—'Love that moves suns and stars' (যে মহা আকর্ষণ সূর্যনক্ষত্রকে চালাচ্ছে)। জীবন শতদলের মধুস্থলী এই অনির্বচনীয় প্রেমসত্তারই শুভ্র ও সুন্দরতম বিকাশ বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণের মতো মহামানবদের জীবনে। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তাই এঁরাই মানবজাতির আদর্শ,—তাঁর মানস-আকাশের ধ্রুবজ্যোতি।

মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের মানদণ্ড হিসাবে তিনি ঐ অতুলনীয় সহানুভূতিকে বুঝতেন বলে 'জীবে দয়া'র জায়গায় 'জীবে প্রেম' তাঁর জীবনে নূতন পন্থা নির্দেশ করেছিল। আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তিনি লিখছেন—......"এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলোর পশুর মত জীবন যাপন করছে—তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু-পা দিয়ে দলেছে।

মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন্ কাম করে? তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ের নানা কথা, map camera, globe (ম্যাপ, ক্যামেরা, গ্লোব) সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা?"[৪]

১। পত্রাবলী (১ম খণ্ড) পৃষ্ঠা ৪২।
২। ঐ—পৃঃ ৪৩-৪৪
৩। ঐ—পৃঃ ৫১
৪। ঐ—পৃঃ ১৫৬

কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি এই সহানুভূতি কেবল চিন্তনীয় তত্ত্ব নয়। বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের জীবনে আমরা অনুভূতিকে কর্মে রূপান্তরিত করবার যে প্রবল প্রাণশক্তি দেখি তা উনিশ ও বিশ উভয় শতকের বাঙ্গালীর পক্ষে জাতীয় আদর্শ। সেই প্রবল কর্মশক্তির উদ্দীপনা তাঁর পত্রাবলীতে বারংবার প্রকাশিত—"Life is ever expanding, contraction is death. (জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ, আর সঙ্কোচনই মৃত্যু)। যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নেই; যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে হীনবুদ্ধি)।" [৫]

কাজ করতে গেলেই বাধা আসে। বিশেষ করে বাঙ্গালী শিক্ষিতমহলের কাছে অন্যের নেতৃত্ব অসহনীয়। [৬] "ঐ jealousy (ঈর্ষা), ঐ absense of conjoined action (সম্মিলিত ভাবে কাজ করার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের nature (স্বভাব); কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করা উচিত।" এই ঈর্ষার অনল রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সবাইকে দগ্ধ করেছে। আজ অবধি এই স্বভাবটি ছাড়তে না পেরেই আমরা নেতৃহীন হয়ে আছি।

কিন্তু বিবেকানন্দের সমালোচনা তো ভাঙ্গনমুখী নয়, গড়নমুখী। তাই নবযুগের কর্মপন্থা নির্দেশ করে তিনি লিখেছেন— [৭] "পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব,' আমি বলি 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।"

৬। ঐ—পৃঃ ৩০৭-৮

৭। ঐ—পৃঃ ৩১১

সত্যিকার অধ্যাত্ম ধর্মচেতনা ভারতবর্ষের কয়জনের আছে তা সন্দেহের বিষয়—কিন্তু ধর্মের নাম করে সামাজিক নিপীড়নের বেলায় আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেওয়াটা এদেশের রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। দেখে শুনে স্বামীজীর মন্তব্য— [৮] "ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ যোগমার্গ—সব পলায়ন। এখন কেবল আছেন ছুঁৎমার্গ। আমায় ছুঁয়োনা; আমায় ছুঁয়োনা। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ্! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়-কন্দরেও নাই, গোলকেও নাই, সর্বভূতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে।" ব্যঙ্গরসের সঙ্গে বেদনার মিশ্রণে এখানে উচ্চাঙ্গের হিউমার সৃষ্ট হয়েছে।

এই ছুঁৎমার্গী সামাজিক আচার যে ধর্ম নয়, উপনিষদ্-প্রতিপাদিত সত্যই যে হিন্দুধর্মের আসল রূপ, একথাটি রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত বহু বেদান্ত-চর্চার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ বারবার শুনেছিল। ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে এই উপলব্ধি হিন্দুধর্মের ভিতরের কলহ এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পন্থাগত পার্থক্য দূর করে সবার অলক্ষ্যে এক মহান্ চিন্তাসূত্রের ঐক্যে ভারতীয় জাতি গঠনের কাজ করে চলেছিল। অথচ এ সত্যোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবপ্রীতির গভীর যোগাযোগ ছিল। তাই আধ্যাত্মিকতা উনিশ শতকের সেবামূলক কর্মশক্তিকে অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করেছে। এই পটভূমিতে বিবেকানন্দের আর একটি পত্রাংশ স্মরণীয়— [৯] "আমি একমাত্র কর্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই।.........ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্যন্ত সমস্ত প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম, বাকি অধর্ম।"

৮। ঐ—পৃঃ ৩৪০

৯। ঐ—পৃঃ ৪৪৪

আর এই পরোপকারের জন্য যে বিপুল প্রাণশক্তি চাই, তার জন্যে প্রয়োজন অনন্ত আত্মবিশ্বাস। বিবেকানন্দ তো সেই আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধারই জলন্ত বিগ্রহ। [১০] "যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীনহীন ভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা।.........যে সদা আপনাকে দুর্বল ভাবে সে কোনকালেও বলবান হবে না; যে আপনাকে সিংহ জানে সে 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'।" এই পাশমুক্ত কেশরীর নির্ভয় বিচরণের মহিমা বিবেকানন্দের ব্যক্তিসত্তার প্রতীক। আমাদের জাতীয় চরিত্রের নিবীর্যতাকে তিনি এই অভয়মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন—তার ইংরেজী ও বাংলায় সর্বজাতীয় রচনার মধ্যেই বারংবার এই নির্ভীকতার উপর জোর দেওয়ার ভাব দেখ্‌তে পাই। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন: [১১] "......আসল কথা ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না তার সঙ্গে আর আমার সম্পর্ক চলে কি?......এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মার্‌তে হবে··· তবে মানুষ।...... কাপুরুষ—দয়ার আধার !!"

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-পরিমণ্ডলে দু'টি দেবতা—বস্তুতঃ একই দেবতার দুটি রূপ—আমরা দেখতে পাই। একজন 'উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর,' আর একজন 'মাতৃরূপা কালী'। শ্মশানচারী এই দুটি দেবতার মধ্যে তাঁর বৈরাগ্যপূত শাক্তচেতনার ঘনীভূত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় আমরা ত্যাগ ও ভোগের, সৃষ্টি ও প্রলয়ের সম্মিলিত প্রকাশ দেখি 'নটরাজ'-প্রতীকের মাধ্যমে। তাঁর 'নৃত্যের তালে তালে,' 'তপোভঙ্গ' প্রভৃতি গান ও কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'—'Kali the mother' প্রভৃতি কবিতায় আমরা শক্তিরূপিণী জগন্মাতার প্রকাশ দেখি। পত্রাবলীতে নানা জায়গায় জগন্মাতার নামোচ্চারণ করে আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করার প্রয়াস দেখি—[১২] "আমি মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস—আমাদের কি নাশ আছে, ভয় আছে? অহংকার যেন মনে না আসে, ভালবাসা যেন না যায় মন থেকে। তোমাদের কি নাশ আছে!—মাভৈঃ! জয় কালী! জয় কালী!"

এই সঙ্গে স্বামীজীর 'Kali the mother' কবিতাটির (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের) অনুবাদ স্মরণীয়—

> সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,
> মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে—
> কালনৃত্য করে উপভোগ,
> মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

মহাশক্তির উপাসক বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, জাতির মনে আবার শক্তি সঞ্চার করবার জন্যে প্রয়োজন নূতন ধরনের শিক্ষাপ্রণালী। [১৩] 'কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা, জবাব পাইলাম। শিক্ষা-বলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়-বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists (আইরিশ উপনিবেশবাসী) আসিতেছে—ইংরেজ পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ; সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক

১০। ঐ—পৃঃ ৪৪৫
১১। পত্রাবলী (২য়)—পৃঃ ৩৬১
১২। ঐ—পৃঃ ৩৬১
১৩। ঐ—পৃঃ ১২৪

দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে। তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে—ঐ Irish man (আইরিশ)-কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল "প্যাট্ তোর আর আশা নাই; তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম" আজন্ম শুনিতে শুনিতে Pat (প্যাট)এর তাই বিশ্বাস হল। নিজেকে Pat (প্যাট) হিপ্‌নটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ; তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—'প্যাট, তুইও মানুষ আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ!' Pat (প্যাট) ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই ত; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি।"

আইরিশ লোকটির এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে বেদান্তের শিক্ষাকে বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করবার কি আশ্চর্য উদাহরণ তিনি জীবন্ত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন, পাশ্চাত্ত্যের এই রজোগুণাত্মক শক্তিকেই তিনি নিদ্রিত ভারতবাসীর সুপ্ত চেতনায় সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছে রজোগুণের অর্থ—তৃপ্তিহীন সম্ভোগ নয়, 'পরহিতায়' সর্বস্ব সমর্পণের আনন্দ। সমগ্র স্বদেশী-যুগ জুড়ে বাঙালী যুবকদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে এই রজোগুণের আহ্বানকেই আমরা সফল হতে দেখেছি।

তাঁর বহুবিস্তৃত জীবনানুভূতি এমনি করে প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। প্রথমেই কেউ সর্বস্ব ত্যাগ করে নিষ্কাম সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রথমে ব্যক্তিগত ভালবাসা, তারপরে দেশগত প্রেম; বিশ্বানুভূতি তারও পরের কথা।

[১৪] "একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতা-বিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট্ ব্রহ্মে প্রীতি হইতে পারে।

অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা আগে না থাকলে কি কাহারও ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাকলে কি কখনও আলোকের মানে হয়?

সকাম, সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম। তারপর আপনা আপনি বড় আসবে।"

ব্যক্তিপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমের এই প্রতিটি ধাপ উত্তীর্ণ হবার মূল্য মানুষকে দিতে হয়—কঠোর বেদনা, কঠিনতর সাধনার মধ্য দিয়ে। দুঃখের ভয়ে যে পিছিয়ে আসে তার "অমৃতত্ব—বৃথা আকিঞ্চন।" [১৫] "ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে একফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে—কে কবে বড় হয়েছে?—কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও, কেন? কাঁদ। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ্ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ, জন্তু, গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।" [১৬]

"বাঙ্গালাভাষা" প্রবন্ধটিতে স্বামীজী লিখেছিলেন—"স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর,

১৪। ঐ—পৃঃ ৪৪২

১৫। ঐ—পৃঃ ৪৪০

১৬। আসলে এ প্রবন্ধটিও স্বামীজীর লেখা চিঠির অংশ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী 'উদ্বোধন' পত্রের সম্পাদককে স্বামীজী যে চিঠি লেখেন এটি তারই মধ্যে আছে।

যেমন অন্নের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, যেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না।" ভাষার এ আদর্শ সবচেয়ে বেশি প্রমাণিত হয়েছে তাঁর পত্রাবলীতে। পত্রাবলীর রচনাভঙ্গীই স্বামীজীর মানসভঙ্গীর পরিচায়ক; সে মানস—ত্যাগে প্রেমে, বীর্যে, ব্রহ্মদৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল, মানবাত্মার অনন্ত যাত্রাপথে শাশ্বত সত্যের চিরন্তন দিশারী।

যাত্রীর চিঠি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ক্রুঙ্‌থেপ (ব্যাঙ্কক) শহরের সুরিওয়ঙ্গ্‌স্ রোডে প্যান্-আমেরিকান এয়ার-ওয়েজের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। রাত প্রায় বারোটা। ৩০শে মার্চ, ১৯৫৭—শ্যামদেশে আমার চতুর্থ রাত্রি —বিদায় রাত্রি। শহর থেকে আঠারো মাইল দূরবর্তী এয়ার-পোর্টে নিয়ে যাবার জন্য প্যান-আমেরিকানের বাসের এখনও দেখা নেই, অথচ সওয়া এগারোটায় বাসটির ছাড়বার কথা! আধ ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই কিঞ্চিন্ন্যূন দুই লক্ষ বর্গ-মাইলের দেশটির সঙ্গে প্রায় দশগুণ বড় ভারতের যুগ-যুগ-বাহী অতীত সংযোগ এবং জাতিগত সালক্ষণ্য-বৈলক্ষণ্যের কথা। ভারতবাসীর মতো থাই জাতিও ধর্মপ্রাণ, ধর্ম সম্বন্ধে তাদের উদারতাও লক্ষণীয়।[1] ধর্মে ত্যাগের আদর্শ সম্মানিত।[2] থাইরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী, ভারতবাসীর মতো। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং খাদ্যের দিক দিয়ে ভারতের সঙ্গে অনেক মিল আছে। থাই ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ এবং প্রচলিত কথা-কাহিনীর মধ্যে ভারতীয় পুরাণ ও কিংবদন্তীর প্রভাব আগেই উল্লেখ করেছি। ভারত থেকে বৈলক্ষণ্য—এদের জাতি-প্রথারাহিত্য এবং সামাজিক স্বাধীনতা। শ্যামদেশ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে এই দেশ এবং দেশবাসীর প্রতি একটি অস্পষ্ট মমতা যে বোধ করছিলাম সেটা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ছিল না। তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল এদের ক্রমবর্ধমান পাশ্চাত্ত্য-সংযোগের কথা। বেশভূষা এবং চালচলনে পাশ্চাত্ত্যপ্রভাব বেশ শিকড় গেড়েই বসেছে, তবে জাতির নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ অদূর বা দূর ভবিষ্যতে ঐ প্রভাব থেকে কতটা আত্মরক্ষা করতে পারবে সেইটাই প্রশ্ন। ইংলণ্ড, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ এবং আমেরিকায় দলে দলে থাই ছাত্র নানা

১। থাইদেশে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ও মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠগণ নির্বিবাদে বাস করছে। কয়েকমাস আগে শ্যামদেশের বর্তমান রাজার সহোদর প্রিন্স্ চুলা (H. R. H. Prince Chula) লণ্ডনে একটি বেতারভাষণে বলেছিলেন,—"আমরা বৌদ্ধেরা খ্রীষ্টধর্মের 'মৌলিক পাপ' (Original Sin) এবং 'পরিত্রাতা-বাদে' বিশ্বাস করি না। আমরা ইহকাল বা পরকালে আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে আস্থা স্থাপন করি শুধু নিজেদের ভাল-মন্দ কাজের উপর। ব্যক্তিগত সৎ-ভাবের অতিরিক্ত—পর-জীবনের জন্যে খ্রীষ্টধর্মের 'পাপ-ক্ষমা' (Redemption) জাতীয় অপর কিছুর প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তথাপি আমাদের বিশ্বাস যে, ধর্মের চরম উদ্দেশ্য যখন মানবাত্মার মঙ্গল, তখন সব ধর্মই মানুষকে ঐ একই লক্ষ্যে নিয়ে যায় এবং সব ধর্মকেই সম্মান করা উচিত। আমরা থাইদেশ-বাসীরা এই জন্যে অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতাসম্পন্ন।"

২। শ্যামদেশে স্থায়ী বৌদ্ধভিক্ষুর সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। এতদ্ব্যতীত এই দেশের রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক গৃহস্থকে কিছু-কালের জন্য ভিক্ষুর জীবন যাপন করতে হয়—ঐ সব 'অস্থায়ী' ভিক্ষুর সংখ্যাও কম নয়।

বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্তে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে বর্তমানে প্রায় এক হাজার ছাত্র রয়েছে।

প্যান্-আমেরিকানের মোটর বাস যখন এল তখন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে ৩১শে মার্চ পড়ে গেছে। শহরের কয়েকটি হোটেল থেকে কয়েকজন যাত্রী তুলে গাড়ীটি এরোড্রোমে হাজির হ'ল প্লেন ছাড়বার মাত্র আধঘণ্টা আগে। অতএব কাষ্টম্স্ এবং অন্তান্ত আনুষঙ্গিক রীতিগুলো উধ্বর্শ্বাসে শেষ করতে বেশ হাঁপ ধরে গিয়েছিল। কলকাতার একটি বিশিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে ব্যাঙ্কক এরোড্রোমে দেখা; সস্ত্রীক টোকিও চলেছেন। বাঙ্গালী বিদেশে বাঙ্গলা কথা বলবার লোক পেলে আনন্দিত হয়, অতএব তাঁদের সঙ্গে গল্প জমে উঠেছিল।

টোকিওর আগে হংকং-এ প্লেন তিন ঘণ্টার জন্ত থামবে সকাল সাতটায় (কলকাতার ভোর সাড়ে চারটা)। রাত্রে ঘুম মন্দ হয় নি। ভোরে চোখ মেলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ফরসা হয়েছে, উপরে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু নীচে ঘন মেঘের আস্তরণ। বহু হাজার ফুট নীচে সমুদ্র সেই মেঘের আবরণে ঢাকা।

সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো, নয়টাও বাজে বাজে, কোথায় হংকং? অনন্ত মেঘের রাজ্যে প্লেন গোঁ গোঁ করে উড়েই চলেছে। হঠাৎ ক্যাপ্টেনের ঘোষণা:

"দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্তে হংকং-এ নামা সম্ভবপর হচ্ছে না, যাক্ আর একবার চেষ্টা করে দেখছি—যদি একান্তই না পারা যায় তাহলে ম্যানিলায় চলে যেতে হবে।"

দুই ঘণ্টা ধরে অতঃপর মেঘের সঙ্গে যুদ্ধ চললো। অবশেষে মনে হতে লাগলো মেঘ যেন হাল্কা হয়ে আসছে এবং আমাদের প্লেনটিও যেন বেগের সঙ্গে সোজা নীচে নামছে। অকস্মাৎ চোখে পড়লো দিগন্তপ্রসারিত সীমাহীন জল—দক্ষিণ চীন সাগর। এরই বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি—বেশ কাছেই জলের ঢেউও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দু'একটি পাহাড়ী দ্বীপ নজরে পড়লো। একটি দ্বীপে মানুষের বসতি রয়েছে। ঘরবাড়ী এবং অদূরে সাগরজলে জেলেদের অনেক নৌকাও দেখা গেল।

প্লেন হংকংএ নামলো বেলা ১১টায়,—৪ ঘণ্টা দেরীতে। শহর ঘুরে দেখার আর সময় ছিল না। এয়ার-পোর্টটি বেশ বড়। বহুলোকের আনাগোনা। এদের পোষাক এবং চেহারাতে বোঝা গেল চীনদেশে এসেছি। আমার গৈরিক কাপড়ের পরিচ্ছদ সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করছিল। এরোড্রোমের ভোজনালয়ে তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন আহার সেরে নিয়ে আবার বিমানপোতে নিজের সিটে এসে বসলাম। পোত উড়লো টোকিও অভিমুখে। পরিষ্কার আকাশ। বিকাল নাগাদ ক্যাপ্টেনের গলা মাইক্রোফোনে শোনা গেল—"আমরা টাইওয়ান দ্বীপকে (ফরমোসা) ডান দিকে রেখে চলছি।" সাম্প্রতিক ইতিহাসের বহু-বিসংবাদিত এই ভূখণ্ডের পাহাড় এবং অরণ্যানীকে আকাশ থেকে একবার দেখে নেওয়া গেল। এইবার বিমানপোত পূর্ব-চীন-সাগরের উপর দিয়ে উড়ছে। দ্বীপ-চতুষ্টয়গঠিত[৩] জাপানের দক্ষিণতম দ্বীপ কিয়ুশু (Kyushu)কে যখন অতিক্রম করলাম তখনও দিনের আলো রয়েছে। ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হল "কিয়ুশু।" কিয়ুশু দেখবার জন্তে প্লেনের প্রায় বিশ পঁচিশ জন যাত্রী নরনারী জানালার কাঁচ দিয়ে নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। জাপানের দ্বিতীয় দ্বীপ শিকোকু (Shikoku) অপর তিনটির তুলনায় ছোট। তৃতীয়

৩ চারটি প্রধান দ্বীপ ছাড়া ঐ গুলির কাছাকাছি আরও অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপও জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, যথা,—সাসেবো (আণবিক বোমা-বিধ্বস্ত প্রসিদ্ধ নাগাসাকি শহর এই দ্বীপেই), শিমো, যাকু, টানেগা, ইত্যাদি। বড় দ্বীপগুলির আয়তন (বর্গমাইলে):

হোনশু—৮৭৫০০, কিয়ুশু—১৬২১৫,
হোকাইডো—২৯৯৫০, শিকোকু ৭২৪৫।

দ্বীপ হোনশু (Honshu) সব চেয়ে বড়। রাজধানী টোকিও এই দ্বীপেই। চতুর্থ দ্বীপ হোক্কাইডো (Hokkaido) হোনশুর উত্তরে।

টোকিও ইন্‌টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে প্লেন নামলো পাঁচটার জায়গায় সাড়ে সাতটায়। জাপানীদের সৌন্দর্যানুরাগের প্রথম পরিচয় এয়ার-পোর্টেই পাওয়া গেল। কী পরিচ্ছন্ন পরিবেশ! দেওয়ালে, কার্নিশে কৃত্রিম চেরীফুলের বড় বড় স্তবক সাজানো। চেরীর মরশুম সামনে—তারই স্মারক হিসাবে এই ব্যবস্থা। চেরীফুল জাপানের গৃহ, উদ্যান, রাজপথের অন্যতম শোভাবিধায়ক। জাপানের সাহিত্য, সঙ্গীত, সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব, চিত্রকলা, অভিনয়—সর্বক্ষেত্রেই শত শত বৎসর ধরে চেরী তার প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। আশ্চর্য সুন্দর এই ফুল এবং সমস্ত গাছ-জোড়া তার অফুরন্ত প্রাণ-সমারোহ!

ইমিগ্রেশন, কারেন্সি কনট্রোল এবং কাস্টম্‌স্ এর লেন দেন পর পর মিটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে প্যাসেঞ্জার লৌঞ্জ্‌এ এলাম। এখানে যাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্যে বন্ধুবান্ধবরা অপেক্ষা করেন। বিরাট হল ঘর—অতি পরিপাটীভাবে সাজানো। একটি বাঙ্গালী বন্ধু তাঁর পরিচিত আরও দু'জন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে একটি ট্যাক্সিতে এয়ার-পোর্ট থেকে ১১ মাইল দূরবর্তী শহরে রওনা হলাম। দেখলাম এই এগারো মাইলও শহর-ছাড়া অন্য কিছু নয়।[৪] শিবাপার্ক হোটেলে আমার থাকবার ব্যবস্থা আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানী আগে থেকেই করে রেখেছিলেন।

পরদিন সকালে বাঙ্গালী বন্ধুটির সঙ্গে ট্রেনে কিয়োটো যাবার উদ্দেশ্যে টোকিও স্টেশনে উপস্থিত হলাম। টোকিও স্টেশন দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। শত শত যাত্রী আসছে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে, নীচে নামছে ক্ষিপ্র তাদের গতি, ব্যস্ত তাদের দৃষ্টি, কিন্তু প্রত্যেকেই আশ্চর্য শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলছে। যেন একটি সামরিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি! জাপানী পুরুষ মেয়ে—উভয়েরই রঙ খুব ফর্সা, দেহ বলিষ্ঠ, চালচলনে উদ্যম যেন উপচে পড়ছে, কিন্তু কথাবার্তায় (বিশেষতঃ বিদেশীদের সঙ্গে) আশ্চর্য মৃদুতা ও বিনয় পরিলক্ষিত। টোকিও স্টেশন হাওড়া স্টেশন থেকে যে অনেক বড়—এইটাই বিস্ময়ের কারণ নয়, বিস্ময়ের কারণ এই বিরাট স্টেশনের কর্ম-ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা এবং স্টেশনের প্রত্যেকটি কর্মীর নিরলস কর্মনিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ। কলকাতার শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনের কথা মনে হয়ে অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আমাদের কিয়োটোগামী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাড়লো। বন্ধু বললেন, এখানে ট্রেন ছাড়তে বা পৌঁছুতে এক মিনিট দেরী হলে তুমুল বিক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং কর্তৃপক্ষকে জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর কামরার পরিচ্ছন্নতা, বসবার আরাম এবং গঠন-সৌষ্ঠব দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। যাত্রীর ভিড় আছে, কিন্তু সেই ভিড় যাত্রাকে দুর্বিষহ করছে না, কামরাটিকে নোংরা করছে না। প্রত্যেকে জানে, এই গাড়ী আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, একে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। প্রত্যেকে জানে আমাদের সকলকেই চলতে হবে; কাজেই এমন কিছু আচরণ ক'রব না যাতে অপরের অসুবিধা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কামরার শৌচাগারের পরিচ্ছন্নতা দেখেও মুগ্ধ হলাম। ওখানেও একটি তাকের উপর একটি ভাসে ফুল সাজানো রয়েছে, চোখে পড়লো।

৪ বৃহত্তর টোকিওর পরিসর ৭৫০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৮৪ লক্ষ। আশপাশের অংশ বাদ দিলে শুধু টোকিও শহরের আয়তন ২২১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫৪ লক্ষ। শুধু শহর হিসাব ধরলে টোকিও পৃথিবীর দ্বিতীয় বড় শহর।

জাপানের শহর ও গ্রাম দেখতে দেখতে চলেছি। গ্রামগুলি ছবির মতো। প্রত্যেকটি বাড়ী সুন্দর বাগান-ঘেরা। কোথাও একটু জমি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে বলে মনে হল না। শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাপানী হরফে লেখা সুচিত্রিত সাইনবোর্ড নজরে পড়লো। বন্ধু বললেন, রাজধানীর শিল্পবাণিজ্য-বিষয়ক পরিচিতি ওতে লেখা রয়েছে। মাঝে মাঝে কিছুদূরে বাম ধারে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, ডান ধারে পাহাড়। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। এখনও শীত চলেছে। জাপানী কৃষক—পুরুষ ও মেয়েরা গরম কাপড় পরে ক্ষেতে কাজ করছে। চেহারায় বেশভূষায় কারুরই দৈন্য নেই। গ্রামের রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেল চলছে। স্টেশনে স্টেশনে পরিষ্কার পোষাক-পরা ফিরিওয়ালা আসছে নানারকম ফল, খাবার ও পানীয় নিয়ে। খাবার জিনিস সুন্দর প্যাকেটে মোড়া। স্টেশনে আসবার আগে গার্ডের কামরা থেকে জাপানী ভাষায় মাইক্রোফোনে ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে—এবার অমুক স্টেশন আসছে, যাঁদের নামতে হবে—তাঁরা দয়া করে প্রস্তুত হোন্। সমস্ত কামরার ভিতরে দুই সারি বেঞ্চির মাঝখান দিয়ে একটি সোজা পথ গাড়ীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। যে কোন কামরা থেকে অন্য সব কামরায় যাওয়া যায়। এই পথ দিয়ে রেলওয়ে ভেণ্ডররা ফলের রস, সোডা লেমনেড, কফি প্রভৃতি বিক্রী করতে আসছে। অতি অমায়িক তাদের ব্যবহার, ভারি ভদ্র ও মিষ্টি তাদের কথা। এক ঘণ্টা পর পর একটি লোক এসে বুরুশ দিয়ে কামরাগুলির মেজে পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছে। কিয়োটোর পথে অনেকগুলি শিল্পকেন্দ্র চোখে পড়লো। বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত যন্ত্রে ছোট ছোট বহুবিধ শিল্পের প্রচলন জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিয়োটোয় যখন পৌঁছুলাম তখন সন্ধ্যা হতে বেশ দেরী আছে। স্টেশনের কাছে একটি হোটেলে আমাদের স্থান পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট ছিল। মুগ্ধ হলাম হোটেলের কর্মচারিবর্গ এবং চাকরদের প্রত্যেকের সৌজন্যে এবং আতিথেয়তায় এবং বলা বাহুল্য হোটেলের পরিচ্ছন্নতায়। সৌন্দর্যানুরাগ, পরিচ্ছন্নতা, পরিশ্রম, সৌজন্য এবং আতিথেয়তা—জাপানী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি জাপানে নামবার পর হতে জাপান ছাড়বার পূর্ব পর্যন্ত সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি।

হোটেলে একটু বিশ্রাম করে আমরা একটি ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিয়োটোর দ্রষ্টব্য-স্থানগুলির কতক কতক আজই দেখে নিতে। কিয়োটো দশ শতাব্দী ধরে জাপানের রাজধানী ছিল (খ্রীঃ ৭৯৪ থেকে খ্রীঃ ১৮৬৮ পর্যন্ত)। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জাপানের সাংস্কৃতিক গৌরবের অন্যতম ধারকরূপে এই সহর দেশবিদেশের যাত্রী আকর্ষণ করে। হিগাশি হোঙ্গানজি মন্দির এখানকার বৃহত্তম বৌদ্ধমন্দির। আগাগোড়া কাঠের তৈরী বিরাট মন্দিরটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ কাষ্ঠসৌধ। বেদীর কারুকার্য এবং সজ্জাসৌষ্ঠব মনোমুগ্ধকর। বুদ্ধের মূর্তি কিন্তু মন্দিরের তুলনায় খুবই ছোট। প্রধান বেদীর দু-পাশে অপর দুটি বেদীতে প্রাচীন বৌদ্ধাচার্যদের মূর্তি। আরও কয়েকটি বৌদ্ধমন্দির কিয়োটোতে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল—কিয়োমিজুজি, কিঙ্কাকুজি, গিঙ্কাকুজি। এই মন্দিরত্রয় অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা নির্জন পরিবেশের মধ্যে নির্মিত। কিয়োটোর বৌদ্ধমন্দিরগুলির ভিতরকার গম্ভীর পবিত্র আব-হাওয়া অন্তরকে স্পর্শ করে। কয়েক জন ভক্তি-বিনম্র জাপানী নরনারীকে তথাগতের বেদীর সামনে চোখ বুজে বসে ধ্যান করতে দেখলাম। ভাল লাগলো। মনে হল ভারতবর্ষের কোন মন্দিরেই দেবদর্শন করতে এসেছি। কিয়োটোর দুটি প্রাচীন বৌদ্ধমঠও দেখলাম। শুনলাম ছোট ছোট মন্দির

ও মঠ কিয়োটোতে আরও অনেক আছে। সন্ধ্যার আলোকমালায় উজ্জ্বল কিয়োটোর প্রশস্ত সুন্দর রাজপথে দোকানের পর দোকান জাপানী শিল্পজাত বিচিত্র নানা দ্রব্যসম্ভারে ঝলমল করছিল।

পরের দিন সকালে জাপানের অন্যতম ধর্ম 'শিণ্টো'-মতের কয়েকটি মন্দির দেখলাম। সব চেয়ে বড় মন্দিরটির নাম হিআন জিঙ্গু। মন্দির, উৎসবপ্রাঙ্গণ, হ্রদ, বাগান প্রভৃতি নিয়ে একটি প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদ বিশেষ। এই তিনটি মন্দিরও খুব সুন্দর—য়াসাকা (বা গিওন) মন্দির, কিটানো মন্দির এবং ইনারি মন্দির। মন্দিরে কোন মূর্তি নজরে পড়লো না। শিণ্টোধর্ম প্রধানতঃ প্রাকৃতিক শক্তি, পূর্বপুরুষ এবং পরলোকগত সম্রাটদের আত্মার উপাসনা। এঁদের স্মারকরূপে প্রস্তর-জাতীয় কিছু প্রতীক বেদীর উপর দেখলাম। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি সংরক্ষণই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। জাতীয় ঐক্যবোধের পরিপুষ্টির জন্যে মন্দিরগুলিতে নানা উৎসবাদির ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে করা হয়। শিণ্টো মন্দির-গুলির থাম এবং কড়ি বরগা ঘোর লাল রঙের। প্রত্যেকটি মন্দিরে প্রশস্ত চত্বর এবং বহু রকমের ফুল এবং লতাপাতাযুক্ত সুন্দর বাগান রয়েছে। চেরীর সময়ে এই বাগানগুলি অপূর্ব শোভা ধারণ করে। শিণ্টোমন্দিরে বৌদ্ধমন্দিরের আধ্যাত্মিক আব-হাওয়া অনুভব করলাম না।[৫] কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ, কারুকলা এবং অতি যত্নে রক্ষিত পুষ্পো-দ্যানের জন্যে মন্দিরগুলি চিত্তবিনোদন ও সামাজিক সম্মেলনের উপযুক্ত স্থান বটে।

এর পরে আমরা কিয়োটোর অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে রাজপ্রাসাদ, নিজো দুর্গ (Nijo Castle) এবং ক্যান্নন রেইজান (Kannon Reizan) বা একটি পাহাড়ের চূড়ায় নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বুদ্ধের প্রস্তর মূর্তি দেখে নিলাম। নিজো দুর্গটি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে নির্মিত। মোমোয়ামা যুগের স্থাপত্যের একটি চমৎকার নিদর্শন। দুর্গের মধ্যে নিনোমারু প্রাসাদ। এখানে অনেক প্রাচীন চিত্র দেখলাম। কিয়োটোর মারুয়ামা পার্কটি একটি চমৎকার বেড়াবার জায়গা। জাপানের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে জাপানী শিল্পপ্রতিভা সংযুক্ত হয়ে এই প্রমোদো-দ্যানটিকে অতুলনীয় আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর এই পার্কটি দেখে যায়। কিয়োটোর সব চেয়ে বড় আকর্ষণ এখানকার সাময়িক উৎসবগুলি। ১৫ই মে বসন্ত কালের উৎসব—আওই মাৎসুরি, ১৭ই জুলাই বর্ষার উৎসব—গিওন উৎসব, ২২শে অক্টোবর শরৎকালীন উৎসব—গিদাই মাৎসুরি। 'মিইআকো ওদোরি' হল চেরী নৃত্য। এই উৎসবগুলিতে পুষ্প-সজ্জা এবং জাপানী নরনারীর বর্ণাঢ্য পোষাক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

কিয়োটোয় জাপানের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি রক্ষণশীলতা এখনও সুস্পষ্ট। বর্তমান রাজধানী টোকিও-সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। টোকিওর রাজপথে প্রাচীন জাপানী পরিচ্ছদ-পরিহিত নরনারী খুব কম দেখতে পাওয়া যায়—কিয়োটোয় কিন্তু অনেক চোখে পড়ে। মেয়েদের প্রাচীন জাপানী পোষাকের একটি স্বকীয় চমৎ-কারিতা রয়েছে। টোকিওর আবহাওয়া প্রায় ষোল আনাই পাশ্চাত্ত্যগন্ধী।

কিয়োটো থেকে ট্রেনে আমরা নারায় এলাম। নারা সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে জাপানের রাজধানী[৬] ছিল। ভাস্কর্য, সাহিত্য এবং শিল্পকলায় নারা

৫। সাম্প্রতিক কালে শিণ্টোধর্মে সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে অনুস্যূত একটি সর্বব্যাপী শক্তির ধারণা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে। জীব ও জগতের নিয়ন্তা এক পরমেশ্বরের ধারণাও কিছু কিছু সমাদৃত হচ্ছে।

৬। ৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ কাম্মু নারা থেকে রাজধানী কিয়োটোয় নিয়ে যান।

তখন তার গৌরবের শীর্ষদেশে উঠেছিল। এখনও বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে তোদাইজি মন্দিরে দাইবুৎসুর (বুদ্ধদেব) উপবিষ্ট ব্রোঞ্জের বৃহৎ মূর্তিটি সত্যই বিস্ময়কর। জাপানে এইটিই সবচেয়ে বড় বুদ্ধ মূর্তি। উচ্চতা—৫৩½ ফুট, মুখের মাপ ১৬ ফুট × ৯½ ফুট। এত বড় মূর্তি যে কাঠের মন্দিরে সমাসীন, তার বিশালতা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীতে এই মন্দিরটিই বৃহত্তম কাঠের বাড়ী। দাইবুৎসু হলেন বিরোচন বুদ্ধ। নারার একটি পাঁচতলা কাঠের প্যাগোডা এখানকার অন্যতম প্রাচীন কীর্তি। ৭১০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত প্যাগোডাটির নাম কোফুকুজি, উচ্চতা—১৬৫ ফুট। নারার শিন্টো মন্দিরের মধ্যে কাসুগা মন্দির ভাস্কর্য, নির্মাণ-কৌশল এবং জাঁকজমকে অতুলনীয়। একটি গোটা পাহাড় জুড়ে এই মন্দির—প্রবেশ পথই প্রায় ½ মাইল। সারা পথের দুধারে হাজার হাজার পাথরের দীপ রয়েছে; বিশেষ বিশেষ পর্বে জ্বালা হয়। নারা পার্ক এবং মিউজিয়ম দেখেও খুব আনন্দ হল। নারার বাজারে এখানকার গৃহশিল্পজাত নানা রকমের জাপানী পাখা এবং পুতুল দেখে চোখ ঝলসে গেল। নারায় আমরা আরও অনেকগুলি ছোট বড় মন্দির দেখেছিলাম। সন্ধ্যার পর প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ও পরবর্তী রাজনৈতিক জাগরণের সন্ধিক্ষণে জাপানের সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচয়-সূচক একটা চলচ্চিত্রও দেখবার সুযোগ হয়েছিল।

* * *

কামাকুরার ট্রেনের জন্যে নারা স্টেশনে রাত্রে বসে আছি। মে মাসেও প্রচণ্ড শীত। তৃতীয় শ্রেণীর ঘুমাবার বেঞ্চি (Sleeping accommodation) রিজার্ভ করা ছিল। গাড়ী এল। একটি রেলওয়ে কর্মচারী সযত্নে ঐ কামরায় নিয়ে গিয়ে আমাদের দুজনের বেঞ্চি দুটি দেখিয়ে দিলেন; এত সৌজন্য, যেন তাঁর নিজের বাড়ীতে বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত অতিথিকে সমাদর করে নিয়ে যাচ্ছেন! বেঞ্চিতে সুন্দর পরিষ্কার বিছানা পাতা রয়েছে, গায়ে দেবার কম্বলও। সমস্ত গাড়ীটিতে একশ'রও বেশী এইরূপ শয্যা। কয়েক জন রেলওয়ে কর্মচারী সারা রাত জেগে যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখছেন। সকালে তাঁরা বিছানাগুলি তুলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো করতে লাগলেন দেখলাম। বন্ধু বললেন, দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবার আগে সব কাচা হবে।

কামাকুরা জাপানের অতি প্রাচীন শহর। কেঞ্চোজি এবং এঙ্গাকুজি—পুরাতন বৌদ্ধ মন্দির দুটি দেখে এখানকার 'দাইবুৎসু' (বৃহৎবুদ্ধ) দর্শন করতে গেলাম। একটি টিলার উপর ব্রোঞ্জে নির্মিত ভগবান বুদ্ধের বিরাট ধ্যানমূর্তি। কোন মন্দির নেই। সাত শত বৎসর ধরে রৌদ্র, বরফ ও ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে নিশ্চল ধ্যান-মূর্তিটি একই অবস্থায় বসে। জায়গাটির পরিবেশ খুব গম্ভীর; মূর্তির মুখের ভাবও অতি প্রশান্ত। কামাকুরার শিন্টো মন্দিরও বিখ্যাত; নাম—হাচিমান গু। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত। সংলগ্ন উদ্যানও দেখবার মতো।

কামাকুরা দেখে আমরা মোটরে এনোশিমায় এলাম। সমুদ্রের কূলে একটি মনোরম দ্বীপ। দৃশ্য অতি সুন্দর। এখান থেকে জাপানের প্রসিদ্ধ তুষারাবৃত ফুজি পর্বত চমৎকার দেখা যায়। নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি—উচ্চতা ১২,৩৯৪ ফুট।

রাজধানী টোকিও ঘুরে দেখবার সময় পেয়েছিলাম প্রায় দুই দিন। রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে শহর ছড়িয়ে পড়েছে—পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ শহর। এখানকার অতি আধুনিক বিরাট অট্টালিকা-সারি, প্রশস্ত রাজপথ, বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স, বিশ্ববিদ্যালয়, আর্ট গ্যালারি, বড় বাজার—'গিঞ্জা', লোকনৃত্য 'কাবুকী'র প্রেক্ষাগৃহ—

'কাবুকিজা'—প্রত্যেকটিই নিজস্ব গৌরব ও মাদকতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে নির্মিত বৌদ্ধমন্দির হোঙ্গানজি টেম্পলও দেখলাম। টোকিও আধুনিক জাপানের কর্মোত্তম, স্থাপত্য, যান্ত্রিক কৌশল এবং শিল্প ও বাণিজ্য-সমৃদ্ধির নিদর্শন। বড় বড় বইএর দোকানও দেখলাম। জাপানীরা খুব পড়ে। বিদেশের যাবতীয় সেরা বই জাপানী ভাষায় অনূদিত হতে বেশী সময় লাগে না। মাতৃভাষার উপর জাপানীদের অত্যন্ত অনুরাগ। সহজে এরা জাপানী ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে চায় না।

জাপান থেকে বিদায় নেবার আগে এই ধারণাই মনে বসে গিয়েছিল যে পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা অবাধে গ্রহণ করলেও জাপানের প্রাণ পাশ্চাত্যমুখী নয়। এশিয়ার ছাপ তার সহজে যাবার নয়, মুছে ফেলার পক্ষপাতীও সে নয়। তার ধর্ম, সমাজ এবং ভাষার ভারসাম্য এখনও নড়ে নি।

* * *

টোকিও থেকে বিমান-যাত্রা বরাবর প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে। এক রাত প্লেনে কাটিয়ে সকালে 'ওয়েক আইল্যাণ্ড' নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে দেড় ঘণ্টার জন্য নামা হয়েছিল। রাত্রে হনলুলু পৌঁছুলাম। এটি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা। ওয়েক এবং হনলুলুর মাঝামাঝি 'ইন্টার-ন্যাশনাল ডেটলাইন' অতিক্রম করে এসেছি। একটা দিন সময়ের তহবিলে বেঁচেছে। ৪ঠা এপ্রিল রাত ৯টায় টোকিও থেকে যাত্রা করে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আকাশে উড়েও হনলুলুতে পৌঁছেছি ৪ঠা এপ্রিলেই রাত ৯টায়।

আমেরিকার পরিচয় হনলুলুতেই পাওয়া যায়, যদিও পুরোপুরি নয়। প্রাচ্যের বাতাস এখানেও অনেকটা বয়। ফিলিপাইন, জাপান, চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের নরনারীর বেশ আনাগোনা রয়েছে। স্বাস্থ্যকর বেড়াবার জায়গা—এখানকার সমুদ্র-স্নান মুসাফিরদের অন্যতম আকর্ষণ। হনলুলুর রাস্তায় নানা ধরণের পোষাক-পরা লোক দেখে বেশ মজা লাগছিল। এখানে পোষাকের কোন সামাজিক ছকবাঁধা নিয়ম নেই। এখানে কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির দেখলাম—খ্রীষ্টীয় গির্জার অনুকরণ পুরোপুরি। প্রাচ্যের ধর্ম-পরিবেশ জাপানেই ছেড়ে এসেছি! মিউজিয়ম এবং আর্ট গ্যালারিও দেখা হল। হনলুলুতে বেদান্তানুরাগী একটি গোষ্ঠী আছে। এঁদের কাছে একদিন সন্ধ্যায় কিছু বলতে হল। টোকিও থেকে পাশ্চাত্য পোষাক পরে এসেছিলাম। স্থানীয় ভক্ত বন্ধু মিঃ ম্যারোজি বললেন, আপনি গেরুয়া কাপড় পরেই বলবেন। কেউ কিছু মনে করবে না, পছন্দ করবে। তাই করেছিলাম।

৬ই এপ্রিল রাত ১০টায় হনলুলু থেকে প্যান-আমেরিকানের স্যানফ্রান্সিস্কো-গামী প্লেন ছাড়লো। আশা-প্রতীক্ষার স্পন্দন বুকে টের পেলাম—এবার তবে যাত্রা শেষ হতে চলেছে! অথবা যাত্রার আরম্ভ? আগের তিন রাত্রের চেয়ে আজ রাতে চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে অনেক বেশী স্বস্তি ও নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম। বেশ সকালেই ঘুম ভাঙ্গলো। উপরে স্বচ্ছ অনন্ত আকাশ, নীচে স্বচ্ছ পারাবারহীন মহাসমুদ্র। ঘণ্টা দেড়েক পরে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর মাইকে শোনা গেল: আমরা সানফ্রান্সিস্কোতে নামছি।

প্লেন নামলো। সিঁড়ি বেয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা দিলাম। প্রতীক্ষমাণ প্রিয় জনদের সাদর অভ্যর্থনায় অন্তত: তখনকার মতো ভুলে গেলাম ভারতবর্ষ থেকে সাড়ে দশ হাজার মাইল দূরে এসে পড়েছি!

(সমাপ্ত)

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ

[ফ্রান্সে বেদান্ত-প্রচারক]

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পূর্বতন কোচিন রাজ্যের অন্তর্গত ত্রিচুড়ের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে—স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যখন ভারতের আকাশ বাতাস বেদান্ত-নির্ঘোষে মুখরিত তখন—যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল পরবর্তীকালে বর্তমান যুগ-প্রয়োজনে সে যে বেদান্ত-প্রচার কার্যেই জীবন উৎসর্গ করিবে—ইহাই যেন বিধাতার অভীপ্সিত ছিল।

যথাসময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া গোপাল (স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম) ১৯২০ খৃঃ বাইশ বৎসর বয়সে মায়লাপুরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করিয়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষালাভ করেন। ১৯২৪ খৃঃ দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করিয়া নব যুগের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ী সাধনায় মগ্ন হন।

মাদ্রাজে থাকাকালে তিনি 'বেদান্ত-কেশরী' ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদন-কার্যে সহায়তা করিতেন, এবং কিছুকাল স্থানীয় কেন্দ্রের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ছিলেন।

অতঃপর মহীশূরে রামকৃষ্ণ-কেন্দ্র স্থাপনার কার্যে প্রেরিত হইয়া প্রাথমিক সংগঠন তাঁহাকেই করিতে হইয়াছে। ঐ আশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর কিছু দিনের জন্য তিনি বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ হন। এখান হইতেই ১৯৩৭ খৃঃ বেদান্ত-প্রচার কার্যের জন্য বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ফ্রান্সে প্রেরণ করেন।

ইহার পূর্বে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দেই জার্মানিতে বেদান্ত-প্রচারে নিযুক্ত স্বামী যতীশ্বরানন্দজী—ভারতকৃষ্টির অনুরাগী কয়েকজন ফরাসী মনীষী-কর্তৃক আহূত হইয়া প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় সরবোঁতে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সভার পরিচালনা করিতে ফ্রান্সে আসেন। পরে রামকৃষ্ণ-সংঘে সুপরিচিতা মিস ম্যাকলাউড ও কয়েকজন ফরাসী ভারতহিতৈষী বন্ধু বেলুড় মঠকে অনুরোধ করেন, তাঁহারা যেন ফ্রান্সে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একজন সন্ন্যাসী পাঠান।

এই সহৃদয় আহ্বানের উত্তরেই ১৯৩৭ খৃঃ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ তথায় প্রেরিত হন। ১লা আগষ্ট তিনি ফ্রান্সে পদার্পণ করিলে সতোঁ (Sauton) দম্পতি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদের জীবনও মিশনের কার্যে পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত হয়।

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ভার্সাই-য়ে গীতা-সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়া তাঁহার কাজ আরম্ভ করেন; তিনি ইংরেজিতে বলিতেন, এবং উহা সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীতে অনূদিত হইত।

তারপর আসিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বাধ্য হইয়া স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে ফ্রান্সের দক্ষিণে পল্লী অঞ্চলে সরিয়া আসিতে হইল। তখন তাঁহাকে খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাইতে হয়। তাঁহাকে বন্দী-শিবিরে প্রেরণের ভয়ও দেখান হইয়াছিল। এত দুঃখ বিপদের মধ্যেও এই সময়টি ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠিতেছিল। কারণ এই সময়েই স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ ফ্রান্সের ভাষা বেশ আয়ত্ত করিবার সুযোগ পান, এবং তুলোঁ (Toulouse) ও মঁ-পেলি (Mont pellier) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে আসেন ও সেখানে বেদান্ত সম্বন্ধে যে বক্তৃতাবলী দেন, পরে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

যুদ্ধের শেষে প্যারিসে ফিরিয়া সরবোঁ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিতে থাকেন,

তন্মধ্যে বেদান্ত, বুদ্ধ, সেণ্ট জন, মেষ্টার এক্‌হার্ট সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি জনচিত্তে গভীর রেখাপাত করে। সরবোঁতে ভারতীয় কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তিনি দুই বৎসর ধরিয়া 'তৈত্তিরীয়' এবং দুই বৎসর 'মাণ্ডূক্য' উপনিষদ্‌-বিষয়ে নিয়মিত অধ্যাপনা করেন।

ইতোমধ্যে বেদান্ত-চিন্তা-বিষয়ক তাঁহার প্রবন্ধ ও পুস্তক ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ 'ধ্যান ও যোগবেদান্ত' 'বেদান্ত-দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্ম-সমন্বয়'।

১৯৪৬ খৃঃ অক্টোবরে তিনি কয়েক মাসের জন্য একবার ভারতে আসেন; উত্তর ও দক্ষিণভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং বেলুড়মঠে কিছুদিন কাটাইয়া ১৯৪৭ খৃঃ প্রথমেই ফ্রান্সে ফিরিয়া যান।

১৯৪৮ খৃঃ মার্চ মাসে প্যারিস হইতে ২২ মাইল দূরে সীন-নদী-তীরে গ্রেজ-নামক স্থানে (Gretz, Seine-et-Marne) একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কিছু জমি ও তন্মধ্যস্থ গৃহ তাঁহাকে প্রদত্ত হয়; সেখানে বারো জন অনুরাগী ছাত্র ও শিষ্য তাঁহার তত্ত্বাবধানে ত্যাগের ও সাধনার জীবন যাপনের ব্রত গ্রহণ করে, এতদ্‌ব্যতীত বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ লইতে আসিত, কেহ বা আসিত আশ্রমের শান্ত সংযত পরিবেশে নিজ নিজ জীবনের শান্তির সন্ধানে।

আশ্রমের এই সকল নিত্য নিয়মিত কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃতিমূলক কাজেরও গোড়া-পত্তন করিয়া গিয়াছেন—যেখানে স্বামী বিবেকা-নন্দের পরিকল্পনা—মানুষ-গড়ার ধর্ম—রূপায়িত হইবে, যেখানে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নিজেদের এক পরিবারভুক্ত ভাবিয়া পরস্পরকে ভাই বলিয়া দেখিতে শিখিবে।

প্রবন্ধ, বক্তৃতা, ব্যক্তিগত উপদেশ প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি সর্বত্র সকলের খুব প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার সরল অমায়িক সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার, গভীর ধর্মপরায়ণ স্বভাব, জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ে সুগঠিত চরিত্র তাঁহাকে যেন বিশেষভাবে তাঁহার জীবনব্রতের উপযুক্ত করিয়াছিল। দুর্বল শরীর ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া সারা জীবন তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন।

১৯৫৩ খৃঃ গ্রেজের আশ্রম কেন্দ্রটি 'সেণ্টার বেদান্তিক রামকৃষ্ণ, প্যারিস' (Center Vedantique, Ramakrichna, Paris) নামে রেজেষ্ট্রি করার পর ফ্রান্সে বেদান্তকেন্দ্র একটি স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করিলে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের জীবনব্রত যেন সমাপ্ত হইল।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি কঠিন কর্মের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িলে বিশ্রাম লইতে বাধ্য হন, তখন তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য বেলুড় মঠ হইতে একজন সন্ন্যাসী প্রেরিত হন।

১৯৫৬ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারি শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ যে ভাষণ দেন তাহাই যেন তাঁহার জীবনের শেষ সঙ্গীত। তিনি বলেন: শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে 'শাশ্বত-নারী-প্রকৃতি'র স্বরূপটি হইল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ।

১৯৫৭ খৃঃ ২রা এপ্রিল রাত্রি ২টার পর বমির ভাব দেখা দেয় এবং সকাল হইতে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ক্ষীণ হইতে থাকে, বেলা ১-১৫ মিঃ সময় সজ্ঞানে গঙ্গাজল পান করিয়া শ্রীগুরু মহারাজের নাম শ্রবণ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। লণ্ডনের বেদান্ত-কেন্দ্র হইতে স্বামী ঘনানন্দজী আসিলে চার দিন পরে প্যারিসে তাঁহার দেহ সৎকার করা হয়। কিছুদিন পূর্বে তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহের ভস্মাবশেষ যেন গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়।

সমালোচনা

Education and Reconstruction—লেখক ও প্রকাশক—লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, বিনয়পল্লী, পোঃ—শান্তি নিকেতন, বীরভূম। মূল্য—৮০, পৃঃ সংখ্যা—৫৯

সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই শিক্ষাকে জীবন-কেন্দ্রিক করার চেষ্টা চলছে। ফলে শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণীর মান অনুসারে শিক্ষার বিষয়সমূহ ও কার্যসূচীতে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দেখা দিয়েছে। শিক্ষাদানের প্রণালী বা পদ্ধতিও এই নূতন চিন্তাধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শিশু-শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করতে গিয়ে হাতের কাজকে ধরা হয়েছে শিক্ষার মাধ্যম।

শিক্ষাধারায় পরিবর্তনের ঢেউ ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতিতেও আঘাত দিয়েছে। এখানকার শিশুশিক্ষা আজ শিল্প-মাধ্যম। শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহাশয় সারা-জীবনই শিক্ষার কাজ নিয়ে কাটিয়েছেন। তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দেশ-বিদেশের শিক্ষাধারাকে নিয়ে। তাঁর কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধকে নিয়ে "Education and Reconstruction" পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে।

এতদিন যে পদ্ধতিতে শিক্ষা চলে এসেছে তা দেশে একটা সংস্কারের মত চেপে আছে। নূতন কিছু করতে গেলে সহজে কেউ গ্রহণ করতে চায় না। শিল্প-মাধ্যম শিক্ষা চালু করার জন্য—সরকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দেশের লোক যে সহজে এটা চায় না—তা যাঁরা এই কাজ করছেন তাঁরা বুঝতে পারেন। এ জন্য দরকার সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা। শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহাশয়ের পুস্তিকাটি প্রচার কার্যে সাহায্য করবে। নইতালিমের যে সব বাংলা পুস্তক আছে সেগুলি থেকে এর চিন্তা-প্রণালী একটু পৃথক।

লেখক দেখিয়েছেন—যন্ত্রের আবিষ্কার ও সভ্যতার ক্রমোন্নতি। মানুষ বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য করেছে চিন্তা। সেই চিন্তাকে নিত্য নৈমিত্তিক কাজে ব্যবহারের জন্য মানুষ তৈরী করেছে যন্ত্র। হাত, পা, কান, চোখ সবই যন্ত্রের ব্যবহারে নিয়োজিত। শিক্ষা যদি সভ্যতার বাহন হয় তবে শিক্ষায়ও আজ যন্ত্রের প্রয়োজন, তাই শিক্ষা আজ কর্ম-মাধ্যম।

এইভাবে লেখক তাঁর চিন্তাকে মোট ছয়টি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করছেন। আশা করি পুস্তিকাটি সাধারণ পাঠ্য হিসাবেও সকলের আদর লাভ করবে।

—শ্রীপরমেশ্বর জানা

ভক্তের ভগবান্—শ্রীকালী মোহন শর্মা অধিকারী প্রণীত, প্রকাশক শ্রীঅসিত রঞ্জন শর্মা, ১, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬। পৃষ্ঠা—৩১৫ ; মূল্য—৪৲ টাকা।

ভক্তির সাধনা ঠিক ঠিক হইলেই 'ভক্তের ভগবান্' কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। গ্রন্থকার ভাবুক ও ভক্তিপথের সাধক। এই গ্রন্থে তিনি সরল ভাষায় শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা ভক্তি-তত্ত্বটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সাকার নিরাকার তত্ত্ব লইয়া গ্রন্থের আরম্ভ এবং নাম-মাহাত্ম্যে ইহার পরিসমাপ্তি। 'সৃষ্টিতত্ত্ব,' 'জন্ম-মৃত্যু-তত্ত্ব,' 'ভক্তি ও ভক্ত,' 'শ্রীশ্রীগুরু-তত্ত্ব' প্রভৃতি অধ্যায়ে ব্যাখ্যাপটুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্তি-সাধকগণের নিকট পুস্তকটি আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বরাহনগর : বার্ষিক উৎসব

গত ২৭শে এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্যন্ত ৫ দিন ধরিয়া বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামীজীর জন্মোৎসব ও আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল ৭ ঘটিকায় স্বামীজীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচিত হইলে উপনিষদের মন্ত্র বৈদিক শান্তিপাঠ, ও ভজন সংগীতে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বৈকালে শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তীর একটি ধ্রুপদ গানের পর স্বামী ওঁকারানন্দজী বলেন : আমরা অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছি, তাহাদের আমরা অনুকরণ করি, কিন্তু ভারতের সংস্কৃতি বাদ দিয়া আমাদের কল্যাণ হইতে পারে না। আমাদের জাতীয় জীবন বাঁচাইতে হইলে গ্রহণ করিতে হইবে—স্বামীজীর ভাবানুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ। অতঃপর ধ্রুপদ গান ও খেয়াল গানের আসরে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশেষ গায়কগণ অংশ গ্রহণ করেন।

পরদিন ২৮শে এপ্রিল বৈকালে কালীকীর্তনের পর বক্তৃতা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, শ্রীজনাদন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরথীন রায়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-কীর্তন সকলকে আনন্দ দান করে। ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন প্রাক্তন স্পীকার শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায়।

৩০শে এপ্রিল ছাত্রগণ "আত্মহত্যা" ও "নদের পাগল" নাটক অভিনয় করে। ১লা মে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ভজন সংগীত ও সাধুসেবা হয়। সন্ধ্যায় ইলেকট্রিক গীটার বাদনের পর রাত্রে প্রায় ৩৫০০ দর্শক 'রামপ্রসাদ' নাটক অভিনয় দর্শন করেন।

জয়রামবাটী : শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির

গত ২রা মে, ১৯শে বৈশাখ শুভ অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার পঞ্চত্রিংশ বাৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গল আরতি, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শ-উপচারে পূজা ও হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভজন উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রাতে ৮॥ ঘটিকায় পত্র পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত শ্রীশ্রীমায়ের একটি বৃহৎ প্রতিকৃতি লইয়া ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল ও কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যসহ একটি শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি সভায় স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, স্বামী আদিনাথানন্দ এবং শ্রীযুক্তা সত্যবতী রায়চৌধুরী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। এই উৎসবে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পুরুষ ও মহিলা ভক্ত যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন।

বহরমপুর : শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-মহোৎসব

৬ই বৈশাখ শুক্রবার—জেলা শাসক মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয় "শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও শিক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন শ্রীচারু চন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ), স্বামী অন্নদানন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ এবং স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী। প্রায় ২০০০ শ্রোতা মুগ্ধ চিত্তে জীবনালোচনা শ্রবণ করেন। ৭ই বৈশাখ শনিবার শ্রীনগেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য এম-এল সি-মহাশয়ের সভাপতিত্বে জনসভা হয় (শ্রোতৃ-সংখ্যা ৫০০০)। ৮ই রবিবার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভজন সঙ্গীতে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। সন্ধ্যায় কীর্তন-কলানিধি শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের কীর্তন—রাত্রি ১২॥০টা অবধি চলিয়াছিল। প্রায় ৮০০০ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় : বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের উদ্যোগে 'সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়'

প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হইয়াছে। সংস্কৃত-ভাষা ভারতের জাতীয় আদর্শের বাহন, ইহার অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল বেলুড়ে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর 'সংস্কৃত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ তাহা রূপায়িত হইতে চলিয়াছে। পরিকল্পনাটিকে আকাঙ্ক্ষিত রূপ দিবার জন্য আনুমানিক ৫৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসীর বদান্যতায় ও সরকারী সংযোগিতায় ইহা সার্থক পরিণতি লাভ করিবে। প্রাচীন নালন্দা, তক্ষশীলা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাবিহারের ছাঁচে এই বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হইবে বেলুড় মঠের সন্নিকটে। শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের পুণ্য-স্মৃতি বিজড়িত গঙ্গাতীরবর্তী বাগানটি এই উদ্দেশে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। পরিকল্পিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি সন্নিবেশিত থাকিবে: (১) স্নাতকোত্তর বিদ্যার্থিবৃন্দের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় উচ্চতম (এম্-এ) উপাধি প্রাপ্তির উপযুক্ত পরিষৎ। (২) ভারতে ও ভারতের বাহিরের দেশ সমূহে সংস্কৃতের গবেষণাকেন্দ্র। (৩) প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও সংস্কৃত গ্রন্থাগার। (৪) ভারতীয় ও ইংরেজী ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ, গ্রন্থ প্রকাশন এবং প্রকাশিত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ। (৫) সংস্কৃত-ঐতিহ্যমূলক সংগ্রহশালা ও শিল্প প্রদর্শনাগার। (৬) "বৃহত্তর ভারত-ভবন"—যেখানে থাকিবে ভারত এবং সিংহল, তিব্বত, মধ্যএশিয়া, ব্রহ্ম, মালয়, সুমাত্রা, যাভা, বলি, কম্বোডিয়া, শ্যাম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা।

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডনে ভারতীয় সঙ্গীতের সমাদর—এশীয় সঙ্গীত-চক্রের সভাপতি বিশ্ববিখ্যাত বেহালা বাদক য়েহুদী মেনুহিন লণ্ডনে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে ভারতীয় সেতারী রবিশঙ্করকে পরিচিত করাইতে গিয়া বলেন: 'ভারতীয় সঙ্গীত নিম্নতর ভাবাবেগ হইতে উচ্চতর ধ্যানের স্তরে মানুষের মনকে মুক্তি দিতে চায়। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত হইতে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতীয় সঙ্গীত সৃষ্টি করে শ্রোতা ও শিল্পীর প্রাণে আত্মসমর্পণের পরিবেশ।'

চার বৎসর পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে উহা তাঁহার জীবনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন: 'ভারতীয় সঙ্গীত চায় ব্যক্তি-সাধনার ভিতর দিয়া ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে; আর পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত চায় বহুবিধ যন্ত্রের বিচিত্র সমাবেশ। ভারতীয় সঙ্গীত-সাধনা একটি সুরের এবং একটি শিল্পীর পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সমবেত ঐকতানে বহুকে মিলাইবার প্রচেষ্টা। ভারতীয় সঙ্গীত এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। তাহার কোন ছাপানো স্বরলিপি নাই। শিল্পী অবিরত তাহার সুর সৃষ্টি করিতেছে; সূক্ষ্ম সুর ও তাল সম্বন্ধে তাহার চিত্ত সর্বদা সচেতন।' (P. T. I.)

অদ্বৈতানন্দ-মহারাজের জন্মোৎসব—গত ২২শে বৈশাখ ১৩৭৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ অদ্বৈতানন্দজীর জন্মস্থান দক্ষিণ জগদ্দল গ্রামে রামকৃষ্ণ অদ্বৈতানন্দ সংঘের পরিচালনায় তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্মানুষ্ঠানে রাজপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। সন্ধ্যায় কালীকীর্তনের পর ছায়াচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। প্রাতে নগর-সংকীর্তন ও ভজনের পর মধ্যাহ্নে প্রায় তিনশতাধিক গ্রামবাসী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব:—হেড়্যা, মেদিনীপুর। গত ২৭-২৮শে এপ্রিল, কল্যাচক বিবেকানন্দ মিলন-সংঘের উদ্যোগে—শোভাযাত্রা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা ও কথকতার মাধ্যমে বার্ষিক-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ভ্রমসংশোধন:

গত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা পৃঃ ২৩৭: 'প্রশস্তি' কবিতার পঞ্চম পঙ্‌ক্তি পড়িবেন, 'মূর্ছিত সংগীত যেথা সুরহারা মূক নিঃস্বতায়'।

উদ্বোধন

অনাহত আহ্বান

লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্।
গোপান্ সম্ভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্
ওঙ্কারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রম্)

দ্যুলোক ভূলোক অন্তরীক্ষলোকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া, ত্রিভুবনকে উন্মত্ত করিয়া ঋক্ সাম যজুঃ বেদত্রয়কে প্রকাশিত করিয়া—মৌন শ্রুতিকে মুখরিত করিয়া, তরুরাজিকে পুলকিত পল্লবিত করিয়া, কঠিন শিলাময় পর্বতকে বিগলিত করিয়া—নির্ঝর-ধারায় প্রবাহিত করিয়া, জীবজন্তুকে মুগ্ধ বিবশ করিয়া, ধেনু-বৎস-বৃষকুলকে আনন্দিত করিয়া, গোপ-গোপী-গণকে মিলনের পথে ত্বরান্বিত করিয়া, ধ্যানমগ্ন যোগী মুনিদিগের চিত্তকমল প্রস্ফুটিত করিয়া, সঙ্গীতের সপ্তসুরকে মূর্ছিত করিয়া, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্মক প্রণবের অর্থ প্রকটিত করিয়া চিরশিশু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি—শ্রীভগবানের মোহন শব্দশক্তি চিরদিন সকলের হৃদয় মন জয় করিয়া স্বমহিমায় বিরাজমান।

এই অনাহত আহ্বান-ধ্বনি অপ্রতিহতভাবে বাজিয়া চলিয়াছে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া দেশকালকে অতিক্রম করিয়া। এ অরোধ্য আহ্বান-ধ্বনি স্থাবর-জঙ্গমকে ডাকিতেছে—গাছপালা পশুপাখী দেবতা মানব সকলকে ডাকিতেছে—জড়ীভূত মোহনিদ্রা সুখতন্দ্রা ভাঙিবার জন্য ডাকিতেছে—জ্ঞানময় প্রেমময় জাগ্রত জীবনের দিকে ডাকিতেছে। অজ্ঞাতসারে এই আহ্বানে সাড়া দিয়া সীমার সংকীর্ণতা হইতে মুক্তির আনন্দময় সঙ্গীতের স্রোতে জগৎসংসার স্বভাবতই ভাসিয়া চলিয়াছে।

কথাপ্রসঙ্গে

জীবন ও দর্শন

জীবনের জন্যই দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম—সব কিছু। জীবনকে বাদ দিয়া কোনটিরই কোন মূল্য নাই। জীবনের প্রয়োজনেই মানুষের সকল চেষ্টা, জীবনের প্রয়োজনেই বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে মানুষের মনেই জাগিয়াছে বিভিন্ন চিন্তা। যে সূক্ষ্ম যুক্তি-পরম্পরা শান্ত মনের গভীরতা হইতে উঠিয়া অনুভূত জগৎ ও জীবনের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছে—যাহার ফলে মানুষ 'মনুষ্য'-পদবাচ্য হইয়াছে—তাহাকেই আমরা বলিয়াছি 'দর্শন'; যে চিন্তাগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-জনিত—এবং বহিঃপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধানী—তাহাকে আমরা বলিয়াছি 'বিজ্ঞান'; আর যে অনুভূতি মানুষের মনের গোপন দুয়ার খুলিয়া দিয়া তাহার কাছে অতীন্দ্রিয় সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে তাহাকেই আমরা বলিয়া থাকি 'ধর্ম'। মনুষ্য-জীবনে ইহার কোনটিকেই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, ইহার যে কোন একটিকে বাদ দিলেই মনুষ্যজীবন হইবে অসম্পূর্ণ।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় একটি কথা—'বাস্তবতা'; সব কিছুকে 'বাস্তব' দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে হইবে, সকলকে 'বাস্তববাদী' হইতে হইবে! বিজ্ঞান বাস্তববাদী তাই ভাল; ধর্ম বাস্তববাদী নয়—অতএব মন্দ এবং পরিত্যাজ্য; দর্শনকে যদি টিকিয়া থাকিতে হয়—তবে তাহাকেও বাস্তববাদী হইতে হইবে। আধুনিকদের মতে—আদর্শবাদ, ভাববাদ প্রভৃতি অর্থহীন, মূল্যহীন।

যাঁহারা এই সব কথা বলেন—তাঁহারা অবশ্য আলোচনা করিবার জন্য বলেন না—কারণ আলোচনা করিতে গেলেই 'বাস্তববাদ' সম্বন্ধে তাঁহাদের যে একটি মনঃকল্পিত রূপ আছে তাহা বিশ্লেষণ করিতে হয়; তাহাতে তাঁহারা নারাজ,—কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলেই 'বাস্তববাদ' 'অবাস্তব' ভাববাদ বা মনন-মাত্রে পর্যবসিত হইয়া যায়। অতএব তাঁহারা তাঁহাদের সযত্ন-লালিত ভাবটি লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে চান। প্রকৃতপক্ষে 'বস্তু' কি, 'বাস্তব' কাহাকে বলে, 'বাস্তববাদ' বলিতে কি বুঝায়—ইহাদের বিপরীতই বা কি?—এ সব কিছুর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না করিয়াই তাঁহারা স্বকপোলকল্পিত একটি ভাবকেই পূজা করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।

জ্ঞানের সাধনায় যেখানে কষ্ট আছে, পরিশ্রম আছে, সেখানে এই অজ্ঞান-ভাব—অন্ধকারে ভ্রমে আলস্যে নিশ্চিন্ত-ভাব নিশ্চয় সুখকর এবং অনেকেরই কাম্য! অজ্ঞতাই যেখানে সুখ-শান্তিদায়ক সেখানে জ্ঞানী হওয়া চেষ্টা মূর্খতা। তবে মানুষ চিরদিন এইভাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; তাহার অন্তরে জাগে অসন্তোষ; অজানাকে জানিবার, না-বোঝাকে বুঝিবার, নূতনকে ধরিবার আগ্রহে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে; হউক না তাহা যত অবাস্তব! আজিকার অবাস্তব আদর্শবাদী আগামীকাল বাস্তববাদিগণ-কর্তৃক অভিনন্দিত হইবে! বাস্তবতার দিগ্‌বলয় ক্রমবর্ধমান!

আজ যাহারা বিজ্ঞানকে বাস্তববাদী বলিয়া সমর্থন জানাইতেছে, গতকাল তাহারাই বৈজ্ঞানিককে স্বপ্নবিলাসী বলিয়াছে; এবং আজও এমন বৈজ্ঞানিক আছেন—যাঁহারা ঐ বাস্তববাদীদের ধারও ধারেন না, তাঁহাদের কারবার ভাব-জগতে; বিশ্বজগৎ তাঁহাদের চক্ষে পাটীগণিতের পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স নয়, বীজগণিতের সমীকরণ মাত্র (equation).

অতএব দর্শনকে বাস্তববাদী হইতেই হইবে—নতুবা দর্শনের কোন মূল্য থাকে না—এ কথা আর যাহাই হউক দার্শনিক নয়; বৈজ্ঞানিককে অবৈজ্ঞানিক হইতে বলিয়া, ধার্মিককে অধার্মিকে

পরিণত করিয়া বাস্তববাদী হইতে বলা নিতান্তই অবাস্তব প্রস্তাব!

জীবন একটি অনস্বীকার্য অখণ্ড সত্য, অতএব জীবনকে অস্বীকার করিয়া দর্শন, ধর্ম কেন,—কোনও 'বাদ'ই দাঁড়াইতে পারে না, যাঁহারা বলেন, পারে,—সবিনয়ে তাঁহাদের বলিতে হয় তাঁহারা যে বিষয়ে কথা বলিতেছেন—তাহার অর্থ তাঁহারা জানেন না। অখণ্ড জীবনকে তাঁহারা দেখেন খণ্ডদৃষ্টিতে। সূর্যের আলোক ত্রিকোণ-কাঁচ-সহায়ে বিচ্ছুরিত হইলে সাতটি রঙ অবশ্যই চোখকে আকৃষ্ট করে, বাস্তববাদী বলিবেন, চক্ষুর দৃষ্টিসীমার মধ্যেই আলোকতরঙ্গ শেষ, ঐটুকুই আলো। কিন্তু সূক্ষ্ম বিজ্ঞানে ধরা পড়ে অবলোহিত তরঙ্গ (infra-red rays) এবং অতি-বেগনী রশ্মি (ultra-violet rays)—দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় তরঙ্গ লইয়াই সূর্যালোকের সমগ্র বর্ণালী (spectrum); জীবন সম্বন্ধেও এইরূপ।

কতটুকু আর জন্মমৃত্যুর সীমার মধ্যে, জাগ্রৎ-কালের পঞ্চেন্দ্রিয়ের জালে ধরা পড়ে? বিরাট স্বপ্নজগৎ—প্রতিদিনের সূক্ষ্ম অনুভূতি বহিরিন্দ্রিয়ের বাহিরে বলিয়াই কি অবাস্তব? জাগ্রৎ-স্বপ্নের অতীত আর একটি সত্তা—যেখানে সব কিছু শান্ত উপরত, যেখানে অজ্ঞানের মাঝেই আনন্দ-তত্ত্ব .আভাসে সাক্ষি-স্বরূপে অনুভূত, তাহাও কি জীবনের বহির্ভূত? 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কোন জ্ঞান ছিল না, কিন্তু খুব আনন্দবোধ ছিল'—ইহা কি জীবনেরই অনুভূতি নয়?

দর্শনকে জীবনধর্মী হইতে বলিয়া যাহারা শুধু মাত্র ইন্দ্রিয়নির্ভর বাস্তববাদী হইতে বলে তাহারা 'দর্শন' বা 'জীবন' দুটি কথার একটিরও অর্থ সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত নয়! সত্য কথা বলিতে কি, কোন কিছু বুঝিতে গেলে শব্দের অর্থজ্ঞানই প্রথম প্রয়োজন! কিন্তু আধুনিক বাস্তববাদীদের এত পরিশ্রম করিবার শক্তির অভাব, সময়েরও অভাব! তাহারা চায় একটি সহজ সুলভ দার্শনিক মতবাদ—যাহা তাহাদের ভাল লাগিবে, যাহা তাহাদের সুখ-সম্ভোগের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করিবে না! এইরূপ দর্শন বা ধর্মই তাহাদের নিকট বাস্তববাদী, জীবনধর্মী! ধর্ম বা দর্শন জীবনধর্মী বটে, এক হিসাবে নিশ্চয় বাস্তববাদী, যথার্থই বাস্তববাদী; তবে এত সুলভভাবে নয়।

ত্যাগ, তপস্যা, তিতিক্ষা?—এগুলি আত্ম-প্রবঞ্চনা, জীবনধর্মী নয়! শঙ্করের মায়াবাদ যথার্থ সত্য নির্ণয়ে আলোকপাত করে কি না, ইহা দেখিবার ধৈর্য তাঁহাদের নাই।—'মায়াবাদ? জগৎকে মিথ্যা বলে? ভোগ করিতে মানা করে? অতএব ঐ বাদ মিথ্যাবাদ!' একটু দেখিবার অবসর হইল না, বুঝিবার ইচ্ছা হইল না—বেদান্ত-দর্শনে কাহাকে 'মায়া' বলা হইয়াছে, 'জগৎ মিথ্যা' বাক্যটির অর্থ কি? কেন, কিভাবে মানব মনে এই চিন্তার ধারা উঠিল! আধুনিক মানুষের ভোগচঞ্চল কর্মব্যস্ততা তাহাকে সত্যানুভূতি হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, তাহার স্বরূপগত অধিকার শান্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতেছে। সুখ মনে করিয়া মানুষ দুঃখকে জড়াইয়া ধরিতেছে। যে জিনিস যাহা নয় তাহাকে তাই মনে করাই মায়া; 'অ-তস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ'—আচার্য শংকরের মতে ইহাই মায়ার সংজ্ঞা! বর্তমানকালে স্বামী বিবেকানন্দ মায়ার আর একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন: 'Maya is a statement of fact.'—মায়া ঘটনাবলীর বিবরণ মাত্র। জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান, কিন্তু যথার্থ সত্য নয়। সত্যেরও দার্শনিক সংজ্ঞা: 'ত্রিকালাবাধিতত্বং সত্যম্'; অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে যাহা ছিল, আছে এবং থাকিবে, কখনও কোন কালেও যাহা বাধিত হয় না, যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব নাকচ হয় না—তাহাই সত্য! এবং যাহা কিছু পূর্বে ছিল না, এখন আছে বলিয়া মনে হয়, পরে থাকিবে না—তাহা অবশ্যই

ঘটনা (phenomenon, fact), কিন্তু সত্য (Truth) নয়। সমুদ্র ছিল, আছে ও থাকিবে; কিন্তু তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে, ভাসিতেছে, লয় পাইতেছে। তরঙ্গ দৃশ্য, ঘটনা; কিন্তু সত্য নয়; তরঙ্গ মায়া, মিথ্যা; সমুদ্রই সত্য! 'সূর্য পূর্বদিকে উঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়'—ইহা দৃশ্য, ঘটনা; কিন্তু সত্য নয়; কারণ সূর্য উঠেও না, ডুবেও না; তাহার উদয়াস্ত প্রতীয়মান, মায়া, মিথ্যা! মানবের মন জগৎকে একরূপে বুঝে এবং অপরের সহিত ব্যবহারে তাহাকে সেইরূপ বুঝায়,—ইহাই ব্যবহারিক সত্য, যথার্থ সত্য নাও হইতে পারে। রজ্জু-সর্প, মরু-মরীচিকা, আকাশের তল-নীলিমা প্রভৃতি কত দৃষ্টান্ত দ্বারা অদ্বৈত-বেদান্তের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ 'প্রতীতি মিথ্যা, এবং অধিষ্ঠানই সত্য' এই কথা মানুষের বুদ্ধিতে আরূঢ় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যথেষ্টই জানিতেন বিষয়টি অতি কঠিন, গূঢ় এবং গম্ভীর। পরিশেষে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আত্মা জন্মায় না, মরেও না; জন্ম মৃত্যু ঘটনা; কিন্তু মায়া বা মিথ্যা! আত্মা অমৃত জীবনস্বরূপ, এক অখণ্ড সত্তা, অবাধিত অস্তিত্ব যাহার অপর নাম 'সৎ-স্বরূপ' (Universal Eternal Existence Absolute).—যাহার অনুভূতি হইলে হৃদয়ের সকল গ্রন্থি খুলিয়া যায়, সকল ভ্রম-সন্দেহ চিরতরে দূর হইয়া যায়—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'। সৎ বা সত্যকে জানাই জ্ঞানস্বরূপত্ব লাভ, এবং জ্ঞানলাভ হইলেই অজ্ঞান-অন্ধকারজনিত ভয়-দুঃখ বিদূরিত হইয়া অভয় আনন্দ বা শান্তিলাভ হয়, ইহাই মানব-জীবনের শেষ ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য!

এই চরম অনুভূতির কথা বেদান্ত-দর্শনের গ্রন্থে গ্রন্থে আচার্যদের কণ্ঠে কণ্ঠে যুগ যুগ ধরিয়া ধ্বনিত হইয়াছে, এবং হইতে থাকিবে। কিভাবে জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা অজ্ঞানে আবৃত হন—কিভাবে আত্মায় জন্ম-মরণাদি কল্পনা অনুভূত হয়, কিভাবে অখণ্ড-সত্তা ব্রহ্মে খণ্ড বিখণ্ড জগদ্বৈচিত্র্য প্রতীয়মান হয়, তাহা বুঝাইবার জন্যই মায়াবাদ উপস্থাপিত। মায়া বেদান্ত-দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়; মায়াবাদ ব্যাখ্যা মাত্র; প্রতিপাদ্য বিষয় আত্মতত্ত্ব! 'এক কি করিয়া বহু হইল'—ইহারই ব্যাখ্যায় বেদান্ত-দর্শন বলিয়াছে: এক একই আছে বহু হয় নাই, মায়ায় বহু প্রতীয়মান! ইহাই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার অনির্বচনীয় শক্তি! তোমার মনের শক্তি থাকে, তুমি বহুর অন্তরালে এককে অনুভব কর, তরঙ্গ না দেখিয়া সমুদ্র দেখ, জীব জগৎ না দেখিয়া ব্রহ্ম অনুভব কর! সূর্যের উদয়াস্ত অস্বীকার করিতে না পারিলেও অনুভব কর—সূর্য 'নোদেতি নাস্তমেতি'। জীবের জন্ম মরণ ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াও অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিদ্বারা অনুভব কর—আত্মা 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ' —তবেই তুমি শোক দুঃখ অতিক্রম করিয়া মৃত্যুময় সংসারেই অমৃত জীবনের আস্বাদ পাইবে!

প্রতীয়মানের অন্তরালে যথার্থ সত্যকে ধরিবার চেষ্টা, ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা মানুষের সর্ব দেশে সর্ব কালেই আছে, তবে ইহা অতি অল্প সংখ্যক উন্নত মনের পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব। সংখ্যাধিক্য দ্বারা সত্য নির্ণীত হয় না। বিভিন্ন দেশে কালে মানুষ অনুভব করিয়াছে—এই জগতে একটা আলোছায়ার খেলা এবং মায়ার লীলা চলিয়াছে। কখনও কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে 'Things are not what they seem' (যাহা প্রতিভাত হয় তাহাই সত্য নয়); কখন দার্শনিক দৃষ্টিতে সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে—'Reality behind appearance'—পরিবর্তনশীল নানা বর্ণময় চলচ্চিত্র-প্রবাহের পিছনে স্থির শুভ্র পটভূমিকার মতো। বর্তমানে বিজ্ঞানও জগৎ-রহস্যের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইয়া যেখানে আসিয়া উপস্থিত তাহা কি দর্শনের এই দৃষ্টি হইতে খুব বেশী দূরে? ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কথা বলিতেছি না, তাত্ত্বিক বিজ্ঞান আজ দর্শনের পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে; ডালটনের

অবিভাজ্য দুর্ভেদ্য অ্যাটমের আজ কি স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত—তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় 'things are not what they seem'—দেখিয়া যাহা মনে হইতেছে তাহাই পদার্থের স্বরূপ নয়।

কঠিন তরল গ্যাসীয় পদার্থের অণু—সব আজ মহাশূন্যে ঘূর্ণমান অনির্দেশ্য তড়িৎ-কণা, যাহা সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে! ফলমাত্র অনুভূত, 'সংঘাত'ই প্রত্যক্ষ! কেন কিভাবে?—জানিনা, বুঝিনা, কিন্তু ইহাই ঘটনা! বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে অনিশ্চয়তাবাদ এক নূতন ভাব; বুঝা যায় Appearance and Realityর ভাবধারা বা মায়াবাদের অনুরূপ ব্যাখ্যাশৈলীর প্রয়োজনীয়তা আজ বৈজ্ঞানিকের মনেও অনুভূত হইতেছে।

সত্যকে জানিবার জন্য যদি এই পরিচিত জগৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়জ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হয়, জ্ঞানের সাধনায় বৈচিত্র্যের পিছনে ঐক্যকে ধরিবার জন্য পূর্বের যত কিছু প্রিয় মতবাদ যদি বিসর্জন দিতে হয়, সত্যানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের যুক্তিপরায়ণ মন—তাহাতে পিছপাও নয়। জীবনকে বুঝিবার জন্য দার্শনিক জীবন দিতে প্রস্তুত। বাস্তববাদীর চীৎকার বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে পৌঁছায় না; তথাকথিত জীবনবাদীর সমালোচনায় দার্শনিক চিরবধির!

এক দিকে সাধারণ মানুষ আজ স্থূল বাস্তববাদী, আবার আর একদিকে মানব-মনীষা সূক্ষ্মতম চিন্তার ও যুক্তির পথে অগ্রসর! প্রত্যেকটি ধর্ম ও দর্শন কেন উদ্ভূত হইয়াছিল, কি তাহারা বলিতে চায়, নিরপেক্ষ মন লইয়া তুলনামূলক বিচার করিলে তবেই আমরা মানবের চিন্তাধারার একটি সমগ্র রূপ ধরিতে পারিব; বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মানুষকে আত্মীয় বলিয়া অনুভব করিতে পারিব।

* * *

শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত দার্শনিক কংগ্রেসে বিশ্ববৌদ্ধ সংঘের সভাপতি ডক্টর মালালসেকেরার সভাপতির অভিভাষণের আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড লিখিয়াছেন: 'Earthly existence is no longer believed to be an illusion, mere 'maya', but the medium through which the divine reality becomes realisable by the finite human beings. Vedanta has been turned upside down in the modern age. (Hindusthan Standard 19th June 1957, Editorial).

"পার্থিব অস্তিত্বকে এখন আর কেহ 'মায়া' বলিয়া বিশ্বাস করে না……খুশিমত বর্তমানকালে বেদান্তকে উল্টাইয়া ফেলা হইয়াছে!" প্রশ্ন ওঠে ইহা কি সত্যানুসন্ধিৎসুর শান্ত দৃষ্টি? না কর্মচঞ্চল বাস্তববাদীর সিদ্ধান্ত? এই প্রসঙ্গে ঐ পত্রিকাতেই শ্রীবালগোবিন্দ পরমপন্থী কর্তৃক উদ্ধৃত সমারসেট ম'মের 'মায়া' সম্বন্ধে অপূর্ব ব্যঞ্জনা দূরাগত প্রত্যুত্তরের মতোই ভাসিয়া আসে: 'It is a mistake to think that Indians look upon the world as an illusion, they don't, all they claim is that it is not real in the sense as the 'Absolute'. Maya is only a speculation devised by ardent thinkers to explain how the infinite could produce the finite! (Razor's Edge—Somerset Maughm)—ভারতবাসীরা জগৎকে ভ্রান্তি-ছায়া বলিয়া মনে করে, ইহা বলা ভুল; তাহারা তা করে না, তাহারা এইটুকু দাবি করে—নিরপেক্ষ ব্রহ্ম যে অর্থে সত্য, জগৎ সে অর্থে সত্য নয়। অসীম কি করিয়া সীমা সৃষ্টি করিল তাহা বুঝাইবার জন্যই মায়া গভীর চিন্তাপ্রসূত ব্যাখ্যা।

* * *

জীবন ও জগৎকে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্যই দর্শন; প্রকৃত সত্য বস্তুর সন্ধানই জ্ঞানের সাধনা—দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম সকলই তাহার অন্তর্গত! এই সন্ধানের সাধনায় মিলিয়াছে এক অখণ্ড অবাধিত অনন্ত সত্তা—যাহা সকল খণ্ড খণ্ড পরিবর্তনের এক অপরিবর্তনীয় অধিষ্ঠানরূপে চিরবিরাজমান। তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম; তাহাই বস্তু—আর সব প্রতীতিমাত্র, অতএব অবস্তু।

আবাসিক বিদ্যায়তন

এ বৎসর বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের পরীক্ষার ফল জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতরভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রশংসামূলক সমালোচনার পর বিধান সভাতেও বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল—বহু ছাত্রের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার কারণ।

সাধারণ গতানুগতিক শিক্ষা দ্বারা জীবন ও চরিত্র গঠিত হয় না, তাহা আজ সকলেই বুঝিতেছেন। ধর্মভিত্তিক শান্ত-পরিবেশে আদর্শ-নিষ্ঠ শিক্ষকের সান্নিধ্যে ছাত্রদের মনে যে একাগ্রতা জন্মে ও প্রেরণা জাগে তাহাতেই তাহাদের জীবন ও চরিত্র গড়িয়া উঠে। ছাত্রদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগাইতে ত্যাগী ও সেবা-ভাবাপন্ন শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন। জাগ্রত মন অভিরুচি অনুযায়ী জীবনের পথ বাছিয়া লইয়া অগ্রসর হইবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আবাসিক বিদ্যায়তনের আশ্রমিক পরিবেশের মধ্যে দিনের পর দিন নিয়মিত কর্মসূচীর মাধ্যমে বালকদের মনে একটি উন্নততর জীবনের ছবি অঙ্কিত হইয়া যায়, এবং তাহাদের সকল কর্মে একটি শান্ত ছন্দ সঞ্চারিত হয়। ত্যাগ ও সেবাপরায়ণ আশ্রমিকদের বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গী (elderly companions) মনে করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে তাঁহাদের সহিত মেলামেশা করিলে ছাত্রেরা অবশ্যই লাভবান্ হইয়া থাকে—তাঁহাদের সাধারণ সহায়তায়, এবং ব্যক্তিগত সাহচর্যে ও অভিজ্ঞতায়।

যাহাদের মনের গঠন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এরূপ পরিবেশ বিশেষ উপকারে আসে না; এখানে তাহারা নিজেদের 'বন্দী' বলিয়া অনুভব করে। এরূপ প্রতিষ্ঠানে জীবনযাপনের জন্য শ্রদ্ধার ভাব একান্ত প্রয়োজন; কোন শ্রদ্ধাহীন ছাত্রের উপস্থিতি তাহার নিজের, অন্যান্য ছাত্রের ও প্রতিষ্ঠানের—সকলেরই ক্ষতি করে। অভিভাবকদের অনেকে মনে করেন আবাসিক বিদ্যায়তন সংশোধনী শিক্ষালয়; কিন্তু তা নয়। সেখানকার কর্মপদ্ধতি পৃথক। আবাসিক বিদ্যালয়ে যে কোন ছাত্রকে ভরতি করা চলে না। ছাত্রের পূর্ব পরীক্ষার ফলই একমাত্র বা প্রধান বিচার্য নয়, তাহার রুচি মনোভাব স্বাস্থ্য এবং সাংসারিক পরিবেশও বিবেচ্য।

আবাসিক বিদ্যায়তনের সহিত তুলনীয় সযত্ন-বর্ধিত উদ্যান। যদি ভাল ফুল ফুটাইতে হয় তবে নির্বাচিত চারা রোপণ করিতে হইবে, বাহিরের অত্যাচার হইতে গাছগুলিতে বাঁচাইবার জন্য বেড়া দিতে হইবে, সর্বোপরি প্রয়োজন উদ্যানের তত্ত্বাবধায়কের সযত্ন ও সদা-সতর্ক দৃষ্টি।

কাহারও কাহারও মতে আবাসিক বিদ্যায়তনের ছাত্রদের প্রকৃতিগত একটি অভাব আছে, এ সম্বন্ধে অভিভাবক এবং পরিচালকগণ সম্যক্ অবহিত হইলে তাঁহারা অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার দরুন সাধারণ ছাত্রদের যে পরিমাণ মানসিক প্রতিষেধ-শক্তি (mental immunity) এবং অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিবার বুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকে—রুদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে আবাসিক ছাত্রদের ভিতর ঐ সকল গুণ সেই পরিমাণে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় না। ইহা আংশিক সত্যমাত্র, উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে আবাসিক ছাত্রদের বিপথগামী অথবা জীবনে অসহায় অবস্থায় বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা বেশী হইলেও—একথা অবশ্য স্বীকার্য, প্রথমাবস্থায় চারা গাছ যদি বেড়া দেওয়া থাকে—পরে কাণ্ড শক্ত হইয়া গেলে তাহাতে হাতীও বাঁধা চলে, কালবৈশাখীর ঝড় ঝাপটাও সেই গাছ মাথা পাতিয়া সহ্য করে।

আবাসিক বিদ্যায়তনের শিক্ষকদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—ছাত্রেরা যেন জীবন-সংগ্রামের উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠে। ছাত্র ও শিক্ষক—উভয়কেই সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—আজ যাহারা ছাত্র—কাল তাহারা ঘাতপ্রতিঘাতময় রাষ্ট্রের নাগরিক—সুখদুঃখময় সমাজের কর্মী।

বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম ?

স্বামী বিবেকানন্দ

বেদান্তই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম ; তবে ইহা কখনও লোকপ্রিয় হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। অতএব 'বেদান্ত কি ভবিষ্যতের ধর্ম হইতে চলিয়াছে ?'—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

প্রথমেই বলি বেদান্ত কি নয় ; পরে বলিব, বেদান্ত কি। নৈর্ব্যক্তিক ভাবের উপর জোর দিলেও বেদান্ত কোন কিছুর বিরোধী নয়—যদিও বেদান্ত কাহারও সহিত কোনও আপোষ করে না, বা নিজস্ব মৌলিক সত্য ত্যাগ করে না।

প্রত্যেক ধর্মেই কতকগুলি জিনিস একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম একখানি গ্রন্থ। অদ্ভুত তাহার শক্তি! গ্রন্থখানি যাহাই হউক না কেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের সংহতি। গ্রন্থ নাই—এমন কোন ধর্ম আজ বাঁচিয়া নাই। যুক্তিবাদের বড় বড় কথা সত্ত্বেও মানুষ গ্রন্থ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

ধর্মের দ্বিতীয় প্রয়োজন একটি ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। সেই ব্যক্তি হয় জগতের ঈশ্বররূপে বা মহান্ আচার্যরূপে উপাসিত হইয়া থাকেন। মানুষ একজন মানুষকে পূজা করিবেই। তাহার চাই—একজন অবতার, প্রেরিত পুরুষ বা মহান্ নেতা। সকল ধর্মেই ইহা লক্ষণীয়।

ধর্মের তৃতীয় প্রয়োজন--নিজেকে শক্ত ও নিরাপদ করিবার জন্য এমন এক বিশ্বাস যে সেই ধর্মই একমাত্র সত্য, নতুবা ইহা জনসমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

উদারতা শুষ্ক বলিয়া মরিয়া যায় ; ইহা মানুষের মনে ধর্মোন্মত্ততা জাগাইতে পারে না ; সকলের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াইতে পারে না। তাই উদার ধর্মের বারংবার পতন ঘটিয়াছে ; মাত্র কয়েক জনের উপরই ইহার প্রভাব। কারণ নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। উদারতা আমাদের নিঃস্বার্থ হইতে বলে, আমরা তাহা চাই না—কারণ তাহাতে সাক্ষাৎভাবে কোন লাভ নাই ; স্বার্থদ্বারাই আমাদের বেশী লাভ। যতক্ষণ আমাদের কিছু নাই, ততক্ষণই আমরা উদার। অর্থ ও শক্তি সঞ্চিত হইলেই আমরা রক্ষণশীল। দরিদ্রই গণতান্ত্রিক, সেই আবার ধনী হইলে অভিজাত হয়। ধর্ম-জগতেও মনুষ্য-স্বভাব একই ভাবে কাজ করে।

প্রচলিত প্রসারশীল সকল ধর্মই দারুণভাবে অন্ধমতবাদে উন্মত্ত। যে সম্প্রদায় অপর সকল সম্প্রদায়কে যত ঘৃণা করিতে পারিবে তাহার সাফল্য তত বেশী, ততই অধিকতর লোক তাহার কুক্ষিগত হইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ভ্রমণ করিয়া, বহুজাতির মানুষের সঙ্গে বাস করিয়া, প্রচলিত অবস্থা দেখিয়া আমার সিদ্ধান্ত—বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অনেক কথা সত্ত্বেও বর্তমান অবস্থাই চলিতে থাকিবে।

বেদান্ত এই সকল শিক্ষার একটিতেও বিশ্বাস করে না। প্রথমতঃ ইহা কোনও পুস্তকে বিশ্বাস করে না। প্রবর্তকের পক্ষে ইহা খুবই কঠিন। অন্যান্য পুস্তকের উপর একখানি পুস্তকের প্রামাণ্য বা কর্তৃত্ব বেদান্ত মানে না। বেদান্ত জোরের সহিত অস্বীকার করে যে একখানি পুস্তকেই ঈশ্বর, আত্মা ও পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল সত্য আবদ্ধ থাকিবে। উপনিষদ্‌ই বারংবার বলিতেছে, শুধু

পড়িয়া শুনিয়া কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ একজন বিশেষ ব্যক্তিকে (শ্রেষ্ঠ) ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করা—বেদান্ত-মতে আরও কঠিন। বেদান্ত বলিতে উপনিষদ্‌ই বুঝায়; একমাত্র উপনিষদ্‌ই কোন ব্যক্তি বিশেষে আসক্ত নয়।

আরও কঠিন ব্যাপার ঈশ্বরকে লইয়া। বেদান্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ এক জগতে সিংহাসনে সমাসীন সম্রাট্ নয়! অনেকে আছে, তাহাদের ঐরূপ একজন ঈশ্বর চাই, যাহাকে তাহারা ভয় করিবে, যাহাকে তাহারা সন্তুষ্ট করিবে। তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য তাহাদের একজন রাজা চাই, স্বর্গেও তাহাদের সকলের উপর শাসন করিবার জন্য রাজা চাই। গণতান্ত্রিক দেশে রাজা প্রত্যেক প্রজার অন্তরে।······বেদান্ত-ধর্মেও তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে। বেদান্ত বলে জীব ব্রহ্মই। এই জন্য বেদান্ত খুব কঠিন। বেদান্ত ঈশ্বর-সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আদৌ শিক্ষা দেয় না। মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী, শূন্য হইতে খুশিমত সৃষ্টি-কারী, মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শিক্ষা দেয়—ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামী, ঈশ্বর সর্বরূপে—সর্বভূতে।

স্বর্গস্থ ঈশ্বরের ধারণা কি রকম? নিছক জড়বাদ! বেদান্তের ধারণা—ঈশ্বরের অনন্ত ভাব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রূপায়িত।······মেঘের উপরে ঈশ্বর বসিয়া আছেন! কি অধর্মের কথা! ইহাই জড়বাদ, জঘন্য জড়বাদ! শিশুরা যখন এই প্রকার ভাবে, তখন ইহা ঠিক হইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা যখন এই প্রকার শিক্ষা দেয়, তখন ইহা দারুণ বিরক্তিকর। এই ধারণা জড় হইতে, দেহভাব হইতে, ইন্দ্রিয়ভাব হইতে উদ্ভূত। ইহা কি ধর্ম? ইহা আফ্রিকার 'মাম্বো ফাম্বো' ধর্ম হইতে উন্নত নয়! ঈশ্বর আত্মা; তিনি সত্যস্বরূপে উপাস্য। আত্মা কি শুধু স্বর্গেই থাকে? আত্মা কি? আমরাই আত্মা, আমরা ইহা অনুভব করি না কেন? দেহবোধ হইতেই বিভেদ-ভাব; দেহভাব ভুলিলেই সর্বত্র আত্মভাব অনুভূত হয়।

* * * * *

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শেখানো হইয়াছে জগৎপ্রভু, অবতার, পরিত্রাতা ও প্রেরিত পুরুষগণকে পূজা করিতে হইবে; শেখানো হইয়াছে তাহারা নিজেরা অসহায় হতভাগ্য জীব, মুক্তির জন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে। এইরূপ বিশ্বাসে নিশ্চয় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পারে। তথাপি সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় এই প্রকার বিশ্বাস ধর্মের শিশুশিক্ষামাত্র (Kindergarten of religion), এইগুলি মানুষকে অতি অল্পই সাহায্য করিয়াছে বা কিছুই করে নাই। মানুষ এখনও অধঃপাতের গহ্বরে মোহাবিষ্ট হইয়াই পড়িয়া রহিয়াছে। অবশ্য কয়েকজন শক্তিশালী মানুষ এই মায়ার ভ্রম অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন!

সময় আসিতেছে—যখন মহান্ মানবগণ জাগিয়া উঠিবেন; এবং ধর্মের এই শিশুশিক্ষার পদ্ধতি ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা আত্মা দ্বারা আত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্মকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন।

'আনন্দ-ধাম'*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

ভক্ত সাধকের গানে আছে—

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ময়।
শোকতাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন ;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।

সংসারে জর্জরিত শোক-তাপিত মানুষের জন্যে এই আহ্বান,—ওরে শোকক্লিষ্ট জীব, সংসারের মিথ্যা আসক্তির বন্ধন এড়িয়ে ছুটে আয়,—সংসারে সে আনন্দ নেই ; সংসারের ওপারে আছে আনন্দ-ধাম, সেখানে আছে অনাবিল আনন্দ, শাশ্বত শান্তি। সংসারী জীব জড়িয়ে আছে নানা দুঃখ ও আসক্তির বন্ধনে, আসল আনন্দের এতটুকু ছিটে-ফোঁটা পেয়েই জীব ভুলে আছে, ভুলে গেছে আত্মস্বরূপ। যার সংসারের বাঁধন যত ছিঁড়েছে, সেই তত এগিয়ে যাচ্ছে আনন্দের দিকে।

এই আনন্দ লাভ হয় কিসে ? কেমন ক'রে ? সাধনা করতে হবে—ধর্মকে করতে হবে আস্বাদন। শাস্ত্রপাঠ, বেদপাঠ, পাণ্ডিত্য—অনুভূতি বিনা সবই বৃথা ; অনুভূতি চাই, নইলে কিছুই হবে না।

'অনুভূতিং বিনা মূঢ়া যথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিত-শাখাগ্র-ফলাস্বাদন-মোদবৎ ॥'

—মূঢ় লোকেরা ধর্মকে কি ভাবে আস্বাদন করে ? বৃক্ষে ধরে আছে ফল, তার ছায়া জলে পড়ে, তীর থেকে তাই দেখে যেমন ফলকে অনুভব করা, আস্বাদন করা ;—মূঢ় লোকেরাও তেমনি তীরেই বসে আছে, জলে ছায়া দেখেই যেন ধর্মকে অনুভব করছে, অন্তরে সত্যের প্রকাশ হয় নি, অনুভূতি হয় নি। শাস্ত্রেও বলেছে—বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায় না, অনুভূতি করতে হয়। তার জন্যে প্রয়োজন ভেতরে প্রবেশ ; ঠাকুর তাই বলেছেন 'ডুব দাও', আর বলতেন, 'এগিয়ে পড়'। ডুব কোথায় দিতে হবে ? ভেতরে। এগিয়ে কোথায় যেতে হবে ? ভেতরে। শুধু বেদপাঠ আর পাণ্ডিত্য যেন রস-জাল-দেওয়া কাঠের হাতার মতো—রসে ডুবে আছে কিন্তু নিজে নিজে কিছু আস্বাদন করতে পারছে না।

'অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রাণ্যশেষতঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বী পাকরসং যথা ॥'

ঠাকুরের জীবনের দিকে দেখতে হয়। লেখাপড়া তো বিশেষ কিছুই জানতেন না, চালকলা-বাঁধা বিদ্যে শিখলেন না, সকলে ব'লত পাগল বামুন। কিন্তু তাঁর কাছে কারা আসতেন ? কত বৈজ্ঞানিক, কত বড় পণ্ডিত, কত আচার্য এসে তাঁর কাছে বসে থাকতেন। কিসের জন্যে ? শাস্ত্রে যা পড়েছেন, যা এতদিন শুনেছেন তা প্রত্যক্ষ করবার জন্যে। ঠাকুরের অনুভূতির ফল শোনবার জন্যে। ঠাকুর সেই আনন্দধামে পৌঁছেছিলেন, তাই সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন যে আনন্দ ও শান্তি—তাই দু'হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন সকলকে।

ঠাকুর সাধনার সব স্তর অতিক্রম করে-ছিলেন—ভাবসমাধি, নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত ; তাঁর সেই সব অনুভূতির জ্ঞান দিয়ে গেলেন স্বামীজীকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এসে আমাদের ধর্মের মূলে যে কঠোর আঘাত দিয়েছিল, তাতে সমস্ত দেশে ও সমাজে এনেছিল অবিশ্বাস ও

* করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে—১৯.৪.৫৭ তারিখে পূজ্যপাদ মহারাজ-প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীমতী সুধা সেন-কর্তৃক সংকলিত।

সংশয়—ধর্মের প্রতি। নরেন্দ্র কত সাধক, কত আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে বলতে পারলেন না যে তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন।

কিন্তু ঠাকুর তাঁকে কি বললেন? 'তোকে যেমন দেখছি, তোর সঙ্গে যেমন কথা বলছি, তেমনি ক'রেই তো তাঁকে পেয়েছি আমি। তোকেও দেখাতে পারি, তুই যদি দেখতে চাস।'

ঠাকুর স্পর্শ ক'রে নরেন্দ্রকে নিয়ে গেলেন সংসারের বাইরে, মন ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে উঠতে লাগল, উচ্চতম ভূমিতে গিয়ে লীন হবার উপক্রম! নরেন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না, চীৎকার ক'রে উঠলেন—ওগো, এ তুমি আমার কি করলে? আমার যে মা বাবা আছেন। আবার স্পর্শ করেই ঠাকুর তাঁর মন নীচে নামিয়ে আনলেন। অবতার-পুরুষেরা স্পর্শমাত্রেই ঈশ্বরানুভূতি করিয়ে দিতে পারেন; কিন্তু প্রস্তুত হ'তে হবে সাধককে, নিজে অনুভূতি লাভ করতে হবে। স্বামীজীকেও তাই প্রতীক্ষা করতে হ'ল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের নীতি-অনুযায়ী ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী; কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠাকুর মূর্তিপূজাতে তাঁর বিশ্বাস এনে দিলেন।

জীবনে শুভ মুহূর্তের উদয় হ'ল, সহায় হ'ল দৈব ও পুরুষকার। পিতার মৃত্যুর পরে সংসারের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন ভবতারিণীর মন্দিরে—'যা চাইবি তাই পাবি মায়ের কাছে, যা, তুই নিজে চেয়ে নিয়ে আয়।' নরেন্দ্র মায়ের কাছে গেলেন। কী দেখলেন? ভবতারিণীর পাথরের মূর্তি নয়, স্বয়ং মা প্রত্যক্ষ হলেন মূর্তির মধ্যে। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য তুচ্ছ হয়ে গেল, নরেন্দ্রনাথ মায়ের কাছে চাইলেন—বিবেক বৈরাগ্য। বার বার তিনবার—সংসার-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনায় ব্যর্থ হলেন নরেন্দ্রনাথ, ফিরে এলেন বৈরাগ্য-বিবেকবান্ বিবেকানন্দ। প্রসন্নহাস্যে ঠাকুরের মুখ মধুর হ'য়ে উঠল। আপনার উপার্জিত সাধনার ধনসম্পদ্ সমর্পণ করলেন শিষ্যকে। গুরু তো প্রত্যক্ষ ভগবান। শিষ্য যখন শরণাগত হয় তখন গুরু সব দিয়ে দেন শিষ্যকে। অর্জুন এত বড় বীর, কত তাঁর অহঙ্কার—স্বয়ং ভগবান তাঁর সারথি। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে কোথায় গেল সে অহঙ্কার! যখন শিষ্য হয়ে গুরু ব'লে কৃষ্ণের শরণ নিলেন তখনই অর্জুনকে আশ্রয় দিলেন ভগবান, জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন, দেখালেন বিশ্বরূপ।

স্বামীজীও মানতেন না গুরুবাদ, মানতেন না অবতারবাদ। ছয় বৎসর ঠাকুরের কাছে কাছে রইলেন, কত কিছু প্রত্যক্ষ করলেন, তবুও মনে সংশয়। কে ইনি? মহাপুরুষ, সিদ্ধ পুরুষ, না অবতার? এ বিষয়ে কোথায় তাঁর নিজস্ব উক্তি? ঠাকুরের মহাসমাধি লাভের আর মোটে তিন চার দিন বাকী, ঠাকুর ডাকলেন নরেন্দ্রকে—"এত দেখলি তবু অবিশ্বাস? যেই রাম, যেই কৃষ্ণ—সেই এবার রামকৃষ্ণ। কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" 'ছদ্মবেশে এসেছেন রাজা, জানাজানি হলেই চলে যাবেন'—এ কথাও বলেছিলেন আর একদিন ঠাকুর।

সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে ঠাকুর বলেছিলেন তাঁর কাঞ্চন-ত্যাগের সাধনার কথা: 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—যখন অনুভূত হ'ল তখন টাকা জলে ফেলে দিলুম। বঙ্কিম বলে উঠলেন—সে কি মশায়, টাকা ফেলে দিলেন? চারটে পয়সা থাকলে যে গরীবের উপকার হয়।

ঠাকুর চুপ ক'রে রইলেন একটু; পরে বললেন—"পরোপকার, পরোপকার? কে কার উপকার করে? হরিময় এ সংসার, হরির উপকার? ছি, ছি, উপকার নয় সেবা, জীবের সেবা শিবজ্ঞানে।"

গীতায় বলেছেন ভগবান—সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে আছি আমি, একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমাকে লাভ করা যায়। চৈতন্য-চরিতামৃতেও আছে—

'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবন'। জীবে দয়া মানে সেবা, উপকার নয়। আর বৈষ্ণবের সেবা অর্থ কি? বিষ্ণুরই সেবা। যিনি সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনিই তো বিষ্ণু। তাই মহাপ্রভুও ব'লে গেছেন, জীব-মাত্রেরই বিষ্ণু-বোধে সেবা করবে, তাই হবে 'বৈষ্ণব-সেবন'।

স্বামীজীকে এই সেবার ব্রতে উদ্বুদ্ধ ক'রে ছিলেন ঠাকুর। তাই তো স্বামীজী বললেন:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামীজী মুখেই শুধু এ কথা বলে যান নি, তিনি জগৎময় ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর সেই উপলব্ধির অভিজ্ঞতা যখন পাশ্চাত্যের শিক্ষিত সভ্য জগতে পরিবেশন করলেন তখন জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। ঠাকুরের সমন্বয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল স্বামীজীর মাধ্যমে। ঠাকুর সর্ব-ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; তাঁর ব্রহ্মদর্শন হয়েছিল সর্বভূতে—'যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে'। স্বামীজীও গুরুর কৃপায় সেই সত্য, সেই অনুভূতি লাভ করলেন; তাই তাঁর বাণীর এত শক্তি। যুগে যুগে জগতে অবতার-পুরুষেরা আসেন, শক্তি সঞ্চার ক'রে যান শিষ্যের মধ্যে, ভক্তের মধ্যে—আর সেই শক্তি কাজ ক'রে যায় দীর্ঘকাল।

চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় দাঁড়িয়ে অপরিচিত সন্ন্যাসী উদাত্তকণ্ঠে যখন ঘোষণা করলেন—Man does not travel from error to truth, but from truth to truth, from lower to higher truth,—বললেন, 'মূর্তিপূজা মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় প্রতীকোপাসনা—এ শুধু নিম্ন সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে যাওয়ার সোপান'—তখন সেখানকার শিক্ষিত সভ্য সমাজে দেখা দিল বিস্ময়, স্তব্ধ মুগ্ধ হয়ে রইল জনতা, সত্যের উজ্জ্বল আলোকে মিথ্যা দম্ভ ও পাণ্ডিত্যের অভিমান ভেঙে গেল।

সর্ব ধর্মেই সত্য আছে, সর্ব ভূতে ব্রহ্ম আছেন। বিশ্বাস কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর, জীবনে আচরণ কর ধর্মকে, তবেই সত্যকে জানবে, অনুভূতি লাভ হবে। ডুব দাও, এগিয়ে চলো। সংসারে বাস কর পাঁকাল মাছের মতো, দাসীর মতো। ঠাকুর আছেন, ভয় কি? তিনিই তো রয়েছেন জগতে ব্যাপ্ত হয়ে, 'সূত্রে মণিগণা ইব', সূত্রের মতো সকলকে ধ'রে রয়েছেন তিনিই তো। তাঁর থেকেই জগৎ এসেছে, তাঁতেই রয়েছে, আবার তাঁতেই ফিরে যাবে।

স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে, ফিরে পেতে হবে শাশ্বত আনন্দকে—এ আনন্দ তো সংসারে নেই, বাইরে নেই; আছে অন্তরে, ভেতরে। সেই আনন্দের কণামাত্র লাভ হ'লে জগৎ ভুল হ'য়ে যাবে, অন্তর ভরে উঠবে। এই আনন্দ লাভ করেছিলেন ব'লেই তুলসীদাস বলেছেন: আমি এই জগতে এসেছিলাম কাঁদতে কাঁদতে, কিন্তু লোকে হেসেছিল;—আর আমি যখন চলে যাব তখন জগৎ কাঁদবে, আর আমি হাসতে হাসতে চলে যাব। ভক্তেরা হাসতে হাসতেই যান, তাঁরা যে আনন্দধামের সন্ধান পেয়েছেন।

'ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম'—সংসারক্লিষ্ট শোক-তাপিত জীব, চলো চলো। দুঃখ শোক দূর হয়ে যাবে, লাভ হবে আনন্দ ও প্রেম।

যে ওলা-মিছরির স্বাদ পায়, সে কি আর চিটে গুড় খেতে চায়?......
ব্রহ্মানন্দ যে পায়, সে কি আর বিষয়ানন্দে মাতে?

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শঙ্কর-মতে জগতের মিথ্যাত্ব

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

প্রখ্যাত অদ্বৈতবেদান্তবাদী শঙ্করাচার্যের অতুলনীয় দার্শনিক মতবাদের মূল কথা হ'ল এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিথ্যা—মায়ামাত্র। কিন্তু এস্থলে 'মিথ্যা' এই শব্দটি এক বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, সাধারণ অর্থে নয়। সেজন্য, 'মিথ্যা' শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে না পারলে শঙ্করের মায়াবাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হ'তে পারে।

প্রথমতঃ, 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ 'অলীক' বা 'অসৎ' নয়। যে বস্তু কেহ কোন দিন মুহূর্তমাত্রও সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করেনি, তা' হ'ল সম্পূর্ণরূপেই অলীক, অসৎ বা তুচ্ছ; যেহেতু তার বাহ্য, আন্তরিক, জাগতিক, মানসিক, বস্তুগত্যা, প্রত্যক্ষগত্যা—কোনরূপ অস্তিত্বই নেই। যেমন: আকাশকুসুম বা শশ-বিষাণ। কেহ কোন কালে মুহূর্তের জন্যও আকাশস্থ কুসুম বা শশশিরস্থ শৃঙ্গ প্রত্যক্ষমাত্র করেনি। সেজন্য, এরূপ কুসুম বা শৃঙ্গ আদ্যোপান্ত, ওতপ্রোতভাবে, শাশ্বতকাল, সম্পূর্ণরূপে অলীক, অসৎ বা তুচ্ছ—সর্বলোকের নিকট, সর্বপ্রকারে, সর্বদিক থেকে, সর্বকালে অস্তিত্ববিহীন।

কিন্তু 'মিথ্যা' বস্তু তা নয়; কারণ, সেই বস্তুই 'মিথ্যা' যা প্রথমে কিয়ৎকাল সত্যরূপে প্রতিভাত, প্রত্যক্ষীভূত বা দৃষ্ট হয়। যেমন, রজ্জু-সর্প—ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প—মিথ্যা; যেহেতু, প্রথমে ভ্রমকারী সর্পকে কিছুক্ষণ সত্যবস্তুরূপেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেন, অর্থাৎ, যতক্ষণ তিনি ভ্রমে পতিত হয়ে থাকেন, ততক্ষণই সর্প তাঁর নিকট সত্যরূপেই প্রতীয়মান হয়। পরে অবশ্য সত্যজ্ঞানোদয়ে, তাঁর সেই ভ্রম দূর হ'লে তিনি আর সর্প প্রত্যক্ষ করেন না, এবং সঙ্গে সঙ্গে—অর্থাৎ ভ্রান্ত-সর্প-প্রত্যক্ষের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই—দৃষ্ট সর্পটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও ভ্রমকারীর নিকট, তাঁর অন্তরে, প্রত্যক্ষে, চিন্তা ও কল্পনায় সর্পটির অস্তিত্ব ছিল সত্যবস্তুরূপেই। সেই দিক্ থেকে আকাশ-কুসুম বা শশ-বিষাণের ন্যায় এই সর্প সম্পূর্ণ অস্তিত্ব-বিহীন নয়। বাহ্য বাস্তব জগতে তার শাশ্বত বা দীর্ঘকালস্থায়ী অস্তিত্ব না থাকলেও মানসিক বা কাল্পনিক জগতে তার অল্পক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। এরূপে 'মিথ্যা' বস্তু 'অসৎ' বস্তুর ন্যায় সর্বলোকের নিকট, সর্বপ্রকারে সর্বদিক্ থেকে, সর্বকালে অস্তিত্ববিহীন নয়—কিন্তু এক বা ততোধিক ব্যক্তির নিকট, প্রত্যক্ষ প্রকারে, মানসিক দিক্ থেকে—ভ্রমকালে অস্তিত্ববিশিষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ, 'মিথ্যা' বস্তুও দু' প্রকারের: রজ্জু-সর্প—ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প—পূর্বোক্ত প্রকারে মিথ্যা; পুনরায়, ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমকালে দৃষ্ট জগৎও মিথ্যা। কিন্তু, তা সত্ত্বেও সর্প ও জগৎ একই স্তরগত নয়; জগৎ উচ্চস্তরীয়।

সেজন্য—অদ্বৈতবাদিগণ ত্রিবিধ সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন: পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। এই মতবাদের নাম "সত্তা-ত্রৈবিধ্যবাদ।" মাধবাচার্য তাঁর "সর্বদর্শন-সংগ্রহে" এই মতবাদের সারার্থ সংগ্রহ ক'রে বলছেন :—

"তদুক্তং পঞ্চপাদিকা-বিবরণে: ত্রিবিধং সত্ত্বম্। পরমার্থসত্ত্বং ব্রহ্মণঃ। অর্থক্রিয়াসামর্থ্যং সত্ত্বং মায়োপাধিকমাকাশাদেঃ। অবিদ্যোপাধিকং সত্ত্বং রজতাদেরিতি। অন্যত্রাপ্যুক্তম্—

কালত্রয়ে জ্ঞাতৃকালে প্রতীতিসময়ে তথা।
বাধাভাবাৎ পদার্থানাং সত্ত্বত্রৈবিধ্যমিষ্যতে॥

তাত্ত্বিকং ব্রহ্মণঃ সত্ত্বং ব্যোমাদের্ব্যবহারিকম্।
রূপ্যাদেরর্থজাতস্য প্রাতিভাসিকমিষ্যতে॥
লৌকিকেন প্রমাণেন যদ্ বাধ্যং লৌকিকেঽবধৌ।
তৎ প্রতিভাসিকং সত্ত্বং বাধ্যং সত্যেব মাতরি॥
বৈদিকেন প্রমাণেন যদ্ বাধ্যং বৈদিকেঽবধৌ।
তদ্ ব্যবহারিকং সত্ত্বং বাধ্যং মাত্রা সহৈব তৎ॥"

(পৃঃ ৪৪৬, ভাণ্ডারকার সং)

অর্থাৎ, ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের টীকাকার পদ্মপাদাচার্য তাঁর টীকা "পঞ্চপাদিকা-বিবরণে" বলেছেন যে, সত্তা ত্রিবিধ :—পারমাথিক, যথা—ব্রহ্ম ; ব্যবহারিক, যথা—জগৎ ; প্রাতিভাসিক, যথা—রজ্জু-সর্প—ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প প্রভৃতি।

প্রথমতঃ, পারমাথিক সত্তা হ'ল সেই বস্তু যা কালত্রয়েও—কস্মিন্ কালেও—বাধিত হয় না, বা অসৎরূপে প্রমাণিত হয় না। সেজন্য পারমার্থিক সত্তা শাশ্বতকাল সত্য। বলাই বাহুল্য যে—চিরসত্য চিরপূর্ণ ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্তা।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহারিক সত্তা হ'ল সেই বস্তু—যা পূর্বে সত্যরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে যায় ; যথা, জগৎ।

তৃতীয়তঃ, প্রাতিভাসিক সত্তাও হ'ল সেই বস্তু—যা পূর্বে সত্যরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে যায় ; যথা, রজ্জু-সর্প—ভ্রমকালে দৃষ্ট সর্প, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু।

এরূপে—ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার সাধারণ লক্ষণ একই। কিন্তু, তা সত্ত্বেও উভয়ে সম্পূর্ণ এক নয়।

প্রথমতঃ ব্যবহারিক সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তার ন্যায় বাধিত হয়ে গেলেও তদপেক্ষা বহু দীর্ঘকাল-স্থায়ী। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম অল্প সময়ের মধ্যে রজ্জু-জ্ঞানোদয়ের দ্বারা বাধিত হয়ে অপসারিত হ'য়ে যায় ; যেহেতু, যে যে কারণ বা দোষের জন্য সেই ভ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয় ; যেমন : চক্ষুর দোষ, দূরবর্তিত্ব, উপযুক্ত আলোকের অভাব-প্রমুখ বাহ্য কারণ ; উপযুক্ত মনোযোগ বা অবধারণের অভাব, সাদৃশ্য জ্ঞান, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা-প্রমুখ মানসিক ধারণা বা কারণ। যথা, কোনো বিষয়ে গভীর আকাঙ্ক্ষা বা আশঙ্কার বশবর্তী হ'য়ে, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সেই সেই বস্তু অবিদ্যমানেও যেন তাদের প্রত্যক্ষ করি। অন্ধকার রাত্রিতে আমরা শ্মশানে অপ-দেবতার আশঙ্কা করি ব'লেই সেই স্থানের বৃক্ষাদিকেও অপদেবতারূপে দর্শন করি, যা আমরা অন্য স্থানে করি না। সেজন্য, যদি ভ্রমকারী নিকটে এসে, আলোকের সাহায্যে, মনোযোগ সহকারে সেই বৃহৎ শীর্ণ বস্তুটাকে পরীক্ষা করেন তা হ'লে তিনি তৎক্ষণাৎ বা অচিরেই তাকে রজ্জুরূপেই প্রত্যক্ষ ক'রে সর্পভ্রমমুক্ত হন। একই ভাবে—প্রতিদিন প্রভাতে স্বপ্নভ্রমেরও স্বতই নিরাস হয়, অনায়াসে। কিন্তু ব্রহ্মকে জগৎ-রূপে ভ্রম করলে যে জগৎ-প্রত্যক্ষের উদ্ভব হয়, তা এরূপ অল্পকাল-স্থায়ী নয়, অতি দীর্ঘকালস্থায়ী, জন্মজন্মান্তরব্যাপী —ব্রহ্মজ্ঞানোদয় ও মুক্তির পূর্বে আর তার বিলয় বা অবসান নেই। বহু বদ্ধজীব অসংখ্য জন্ম-জন্মান্তরেও এই জগদ্ভ্রমের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না, জগৎকেই পারমার্থিক সত্যরূপে গ্রহণ করে, বারংবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করে ও অশেষ দুঃখভাগী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যা উপরে বলা হয়েছে, স্বপ্ন-ভ্রম ও সর্প-ভ্রম প্রভৃতির নিরসন সহজসাধ্য। প্রতিদিন স্বপ্নকালে নানাবিধ বস্তু, ঘটনা প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হ'লেও প্রত্যূষে জাগ্রৎ প্রত্যক্ষের দ্বারাই সে সকল স্বতই বাধিত হয়ে যায় প্রত্যহ। একই-ভাবে, সর্প-ভ্রমাদির নিরাকরণও কঠিন নয়। কিন্তু জগদ্ভ্রমের বিনাশ অতি কঠিন ব্যাপার। বহু প্রচেষ্টা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি বহু কঠোর সাধনাভ্যাস প্রয়োজন হয় সেজন্য। এই কারণে, উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হয়েছে যে, প্রাতিভাসিক

সত্তা লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই বাধিত হয়ে যায় ; কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা বাধিত হয় কেবলমাত্র বৈদিক প্রমাণের দ্বারাই।

তৃতীয়তঃ, উপরের শ্লোকে পুনরায় বলা হয়েছে যে—প্রাতিভাসিক সত্তা যখন বাধিত হয় তখন প্রমাতা বা ভ্রমকারীও সেই সঙ্গে বাধিত হন না—রজ্জু-সর্প ভ্রমের নিরসন হ'লে কেবল সর্পটিই বাধিত বা অসৎরূপে প্রমাণিত হয়, ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বয়ং নয়। কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা যখন বাধিত হয়, তখন প্রমাতা বা ভ্রমকারীও সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হয়ে যান। জগৎ যখন ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে বাধিত হয়ে অসৎ প্রতিপন্ন হয়, তখন ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাই হ'য়ে যান, তখন একমাত্র ব্রহ্মই সত্যরূপে প্রকাশিত হন।

চতুর্থতঃ, প্রাতিভাসিক হ'ল ব্যবহারিকের মধ্যে, বা ভ্রমের মধ্যে ভ্রম। অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তা সমগ্র সংসারই ত প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট্ বিশ্বজনীন ভ্রম। কিন্তু তার মধ্যেও, সাধারণ দিক্ থেকে, লোক-ব্যবহার নির্বাহের জন্য প্রমা ও অপ্রমা, সৎ ও অসতের, নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতির মধ্যে ভেদ-স্বীকার করা হয়। যেমন, রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান ; রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান ; রজ্জু সৎ বস্তু, সর্প অসৎ বস্তু ; রজ্জু নিত্য, সর্প অনিত্য ইত্যাদি। এরূপে—প্রাতি-ভাসিকের তুলনায় ব্যবহারিক সৎ ও শাশ্বত।

পঞ্চমতঃ, প্রাতিভাসিক সত্তা সাধারণতঃ ব্যক্তি-গত ; অর্থাৎ, এরূপ ভ্রম সাধারণতঃ সকলেরই সমকালে, সমভাবে, যুগপৎ হয় না ; বিভিন্ন ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, বিভিন্ন সময়ে হয়। যেমন, স্বপ্নদ্রষ্টা একাকীই সেই সকল স্বাপ্ন পদার্থকে প্রত্যক্ষ ক'রে ভ্রমগ্রস্ত হন, অন্যেরা নয় ; রজ্জুকে সর্প ব'লেও ভ্রম করেন একজন, বা দু'তিন জনই মাত্র এক কালে ও একসঙ্গে। অবশ্য, সার্বজনীন প্রাতিভাসিক সত্তা বা ভ্রম যে নেই তা নয় ; যেমন সূর্যের উদয়াস্ত এবং গতি প্রত্যক্ষ, কিন্তু সার্বজনীন ভ্রম। তা সত্ত্বেও বলা চলে যে, প্রাতিভাসিক সত্তা বা ভ্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ; দু'একটি ক্ষেত্রে সার্বজনীন। অপর পক্ষে, ব্যবহারিক সত্তা বা ভ্রম সাধারণতঃ সার্বজনীন, অর্থাৎ জীবন্মুক্তদের বাদ দিয়ে অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রেই সমকালে, সমভাবে, যুগপৎ হয়।

উপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তা সাধারণ লক্ষণানুসারে সমধর্মীয় হ'লেও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল-স্থায়ী, দুরপনেয় ও সার্বজনীন ব'লে ব্যবহারিক সত্তা উচ্চতর সত্তা।

এরূপে, চারটি পক্ষ সম্ভবপর : পারমার্থিক সত্তা (ব্রহ্ম), ব্যবহারিক সত্তা (জগৎ), প্রাতিভাসিক সত্তা (স্বপ্ন, রজ্জু-সর্পাদি সাধারণ ভ্রম), অসৎ (আকাশকুসুম)।

এদের মধ্যে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তা 'মিথ্যা'। 'মিথ্যার' সংজ্ঞা ও লক্ষণ সম্বন্ধে বিশদ-তরভাবে আলোচনা পরে করা হবে।

অদ্বৈত বেদান্ত-দর্শনের মতে—এই জড়, এই জগৎ কিছুকালের জন্য যেন মানুষের স্বরূপ ঢেকে রেখেছে, প্রকৃতপক্ষে তার স্বরূপের কোনই পরিবর্তন হয় নি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ষড়্‌গোস্বামীর কথা*

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বাংলার আধ্যাত্মিক দুর্গতি তখন চরমে। নর-নারী ভোগের পঙ্ককুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ভগবানের দিকে কারও মন নেই। ভক্তির ধারা শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সাহারায় নিশ্চিহ্ন।

'নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ।
নিত্য সংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুখ॥'

লোকের মতিগতি দেখে করুণ-হৃদয় শ্রীঅদ্বৈতের মনে পর্বতপ্রমাণ দুঃখ; ভাবেন, শয়নে স্বপনে কেবলই ভাবেন, লোকের কল্যাণ হবে কিসে। ভাবতে ভাবতে দিগন্তে আলোর নিশানা পেয়ে গেলেন।

'আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥'

তবেই জীবের পক্ষে সম্ভব কৃষ্ণোন্মুখ হওয়া। অদ্বৈতাচার্য একমনে তাই কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। সেই ডাকে দয়াল ভগবান নেমে এলেন ধূলির ধরণীতে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন: 'প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার'। চৈতন্য-অবতারে জীবের সংসারাসক্ত চিত্তকে কৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ করবার জন্যে। মহাপ্রভুর এই লীলায় যাঁরা ছিলেন তাঁর প্রধান সহায় তাঁরাই হ'লেন ছয় গোস্বামী। এই ছয় গোস্বামীকে প্রণতি জানিয়ে ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখেছেন:

শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
ইঁহা সবার পাদ-পদ্মে কোটী নমস্কার॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো এত বড়ো একজন সাধক এবং কবি নিজের শিক্ষাগুরু ব'লে যাঁদের পাদপদ্মে প্রণতি রেখেছেন তাঁরা যে স্মরণীয় এবং বরণীয়—এতে কোনই সংশয় নেই। এঁদের বৈরাগ্যপূত জীবনের সাধনাকে সহায় ক'রে মহাপ্রভুর ধর্ম দিকে দিকে এমন বিস্তার লাভ করেছে।

ছয় গোস্বামীর জীবন আলোচনা করলে দেখা যাবে—ভক্তি-অধিকারীদের মধ্যে যাঁদের বলা হয়েছে উত্তম অধিকারী এঁরা সেই ভাগ্যবানদের স্তরে। এঁরা সকলেই শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যুক্তিতে সুনিপুণ। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হ'লে, বুদ্ধির মধ্যে সত্যের উজ্জ্বল দীপ্তি না থাকলে—যাকে তাকে দিয়ে তো নবধর্মকে জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়! তাই দেখতে পাই—মহাপ্রভু স্বয়ং কাশীধামে সনাতনকে দুই মাস ধ'রে ভাগবতাদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম শেখাচ্ছেন। সনাতনের অনুজ শ্রীরূপকেও সর্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করলেন মহাপ্রভু।

শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করিলা॥
শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল।
প্রভু-আজ্ঞা অনুসারে সব আচরিল॥
(চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা)

কিন্তু কেবল পাণ্ডিত্য দিয়ে অন্যের জীবনে রূপান্তর ঘটানো সম্ভব নয়। তাই তো মহাপ্রভুর জীবনের একটি মূল কথা হ'ল: 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও।' ষড়্‌গোস্বামীর জীবনে এই সত্যেরই দিব্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তি। শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব-লক্ষণগুলির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ছয় গোস্বামীর প্রত্যেকেরই অপূর্ব জীবন। এই সব লক্ষণ হ'ল:

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক-শরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

(চৈতন্য-চরিতামৃত—মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ-২২)

গৌড়েশ্বর হুসেনশাহের মুখ্যমন্ত্রী এবং অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি সনাতন। মহাপ্রভুর বৈরাগ্যোজ্জ্বল প্রেমধর্মের বন্যায় তখন 'শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়।' সনাতনের মনের মধ্যে কখন দিগন্তের ডাক এসে পৌঁছেছে। মুক্তির জন্যে প্রাণের মধ্যে কী ব্যাকুলতা! এমন সময় মহাপ্রভু এসে রূপ-সনাতনের বাসভূমি রামকেলী গ্রামে উপস্থিত। নবধর্মের জয়ধ্বজাকে দিগ্‌দিগন্তে বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে রূপ-সনাতনের মতো উত্তম অধিকারীকে তাঁর প্রয়োজন ছিল। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে দুই ভাই লাভ করলেন নূতন জীবন। যাঁরা ছিলেন ঘরের মানুষ তাঁরা বৈরাগীর দীন-হীন বেশে পথে এসে দাঁড়ালেন। ঠিকই বলেছেন শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার:

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লব-মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

(মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ-২২)

রূপ গৌড়াধিপ হুসেনশাহের রাজস্ববিভাগে সর্ব শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুই ভায়ের মধ্যে অনুজ রূপই প্রথমে গৃহত্যাগ করেন। অগ্রজ সনাতনের গৃহত্যাগের পথে বহু অন্তরায় দেখা দিল। সনাতন রাজকার্য করতে একান্ত নারাজ, হুসেন-শাহও এমন একজন দক্ষ রাজপুরুষকে ছেড়ে দিতে একান্ত অনিচ্ছুক। টানাটানির মধ্যে প'ড়ে সনাতন কারারুদ্ধ হ'লেন। কিন্তু বৈরাগ্যের বাঁশি যাঁর প্রাণের মধ্যে বেজে উঠেছে তাঁকে কারাগারের বন্ধন কতক্ষণ বেঁধে রাখবে? অদ্ভুত উপায়ে কারার দুয়ার খুলে গেল। সনাতন মুক্তি পেয়ে সোজা এসে কাশীধামে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। অঙ্গে ভগ্নীপতির দেওয়া মূল্যবান একখানি ভোটকম্বল, আর পরিধানে একখানি মলিন বসন। বৈরাগীর ঐশ্বর্যের শেষ চিহ্ন দেখে 'ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বার বার।' সনাতন বুঝতে পারলেন, প্রভুর অনুগামী হ'তে গেলে যাকে বলে 'অকিঞ্চন'—তাই হ'তে হবে। যেমন সংকল্প তেমনি কাজ। গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে সনাতন কম্বলের বিনিময়ে একজনের কাঁথা নিয়ে চন্দ্রশেখরের বাসায় ফিরে এলেন। সনাতনের অঙ্গে কাঁথা দেখে প্রভুর কী আনন্দ!

'প্রভু কহে—উহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল যে কৃষ্ণ তোমার॥'

মহাপ্রভু তাঁর পার্শ্বচরগণকে একদিকে যেমন সযত্নে ভাগবত-আদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম শিখিয়েছেন অন্য দিকে তেমনি ত্যাগের জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে তাঁদের জীবনকে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের মতো নির্মল ক'রে তুলেছেন। শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে তো মানুষের বুদ্ধিকে স্পর্শ করা যায়; তার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য দরকার সাধুর পবিত্র জীবনের স্পর্শের যাদু। তাই সংযমের উপরে, ত্যাগের উপরে মহাপ্রভুর এত জোর। সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামী সংসারত্যাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। জ্যেষ্ঠতাতদের মতো জীবও পরম পণ্ডিত ছিলেন। পিতা অনুপমের মৃত্যুর পর জীব গোস্বামী কাশীতে বেদান্তাদি শাস্ত্র শিক্ষার পর বৃন্দাবনে যান। শ্রীজীব ছিলেন বৃন্দাবনের প্রাণ। বৃন্দাবন তখন ছিল বৈষ্ণব সমাজের বিশ্ব-বিদ্যালয়, আর সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীজীবের অধ্যাপনায় বিদ্যার্থীদের জ্ঞানের পিপাসা হ'ত পরিতৃপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ঋষিদের লক্ষ্য ক'রে লিখেছেন। 'নীরব বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল।' ছয় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাসের জীবনও বৈরাগ্যের কী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! ছয় গোস্বামীর অন্যদের মতো রঘুনাথের দৈন্যও নীরব বৈরাগ্যে

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের এই ধনী কায়স্থ-সন্তান ছিলেন লক্ষপতি গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র। কিন্তু অনন্ত যাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে দিগন্তের পানে, গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-সম্পদের নীড়ের মধ্যে তাঁর জীবন কেমন ক'রে অবগুণ্ঠিত হ'য়ে থাকবে? পুত্রের বৈরাগ্য দেখে পিতা রঘুনাথের বিবাহ দিলেন সুন্দরী কন্যা দেখে। পাখী কিন্তু শিকল কেটে একদিন মহাকাশে ডানা মেললো। মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে ফিরে এলেন। রঘুনাথ অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে চৈতন্যের চরণপ্রান্তে নিপতিত হ'লেন। মহাপ্রভুর পার্শ্বচরের মধ্যে আরও দুই রঘুনাথ ছিলেন। দয়াল ঠাকুর গৌরাঙ্গদেব রঘুনাথ দাসকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সঁপে দিলেন এবং তাঁর নূতন নামকরণ করলেন, 'স্বরূপের রঘু।' ষোল বৎসর কাল রঘুনাথ মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে বাস করেন। তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয় বৃন্দাবনে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন দাস রঘুনাথের অন্তরঙ্গ সেবক।

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে অতিথি ছিলেন। বেঙ্কট-পুত্র বালক গোপাল মহান্ অতিথির সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। গোপালের ইচ্ছা সংসার ত্যাগ ক'রে অতিথির সঙ্গে তখনই বেরিয়ে পড়েন। সাধু-সঙ্গের গুণে বালকের প্রাণে জেগেছে মুক্তির ক্রন্দন। কিন্তু মহাপ্রভু মাতা-পিতার জীবদ্দশায় কোন গৃহস্থ ভক্তকে সংসার ত্যাগের উপদেশ দেন নি। যাবার সময় পিতাকে ব'লে গেলেন—গোপালকে যেন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা না হয় এবং তাকে যেন পড়িয়ে শুনিয়ে সুপণ্ডিত করা হয়। গোপাল ভট্ট শেষে সংসারত্যাগী হন এবং বৃন্দাবনে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

সর্বশেষে গোস্বামী রঘুনাথ ভট্টের কথা। কাশীধামে অবস্থানকালে মহাপ্রভু তপন মিশ্রের গৃহে আহার করতেন, থাকতেন চন্দ্রশেখরের বাটীতে। তপন মিশ্রের বালকপুত্র রঘুনাথ প্রভুর প্রেমে আত্মহারা। দাক্ষিণাত্যের বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপালের মতো এই বালককেও মহাপ্রভু এমন টানে টানলেন যে সেই টানে রঘুনাথও শেষ পর্যন্ত বিবাগী হ'য়ে গেলেন। রঘুনাথ কিছুকাল পরে পুরীতে মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় নেন। কিন্তু তাঁর বাপ-মা তখনও জীবিত। তাই প্রভু তাঁকে মাত্র আটমাস কাছে রেখে কাশী পাঠিয়ে দিলেন। শুধু ব'লে দিলেন বিবাহ না ক'রতে এবং কোন বৈষ্ণব পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়তে। রঘুনাথ ভট্টও গোপাল ভট্টের মতোই বৃন্দাবনে শেষজীবন যাপন করেন।

উত্তরকালে যাঁরা বৃন্দাবনকে বৈষ্ণব সাধনার মহাতীর্থে পরিণত করেন এবং মহাপ্রভুর সাধনার ধারক ও বাহক হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে রূপান্তর আনেন সেই ষড়্‌গোস্বামীর প্রত্যেকেরই জীবন জ্ঞানে এবং প্রেমে জ্যোতির্ময়। এঁরা প্রত্যেকেই নমস্য। এঁদের চরণপদ্মে কোটী কোটী প্রণতি।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব ভারতের সর্বত্র। যেখানেই ভক্তিমার্গ প্রচলিত সেখানেই তিনি আদৃত, উপাসিত; সেখানেই তাঁহার সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী সযত্নে পঠিত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রার্থনা—কেন ও কত প্রকার?

স্বামী জীবানন্দ

অন্তরের অন্তস্তলে যে ইচ্ছা নিগূঢ়ভাবে নিহিত, তাকে জাগরিত করবার জন্য প্রাণের যে আবেদন তাই তো প্রার্থনা—বাসনা-পূরণের আকূতি।

যা আমার নেই তার অভাব সর্বদা আমাকে পীড়া দেয়, আবার যা আছে তা রক্ষার জন্য ব্যাকুল হই। না পাওয়া জিনিসটি পাবার জন্য, আর পাওয়া জিনিসটিকে রক্ষার জন্যই সাধারণতঃ আমাদের যত কিছু প্রার্থনা।

নির্ধনের প্রার্থনা—অর্থকষ্ট দূর করবার জন্য, বিদ্যাহীনের বিদ্যার জন্য; স্বাস্থ্যহীনের কামনা স্বাস্থ্য, রোগীর রোগমুক্তির আবেদন, অপুত্রকের পুত্রকামনা, যশঃপ্রার্থীর যশের আকাঙ্ক্ষা—যার যেটি নেই সেটি পাবার জন্য তার অন্তরের গভীর প্রার্থনা।

যে শরীরটি পেয়েছি সেটি যাতে নীরোগ থাকে, যে বিষয়সম্পত্তি আমার রয়েছে তা যাতে নষ্ট না হয়, যে বিদ্যা ও সদ্‌গুণ লাভ করেছি—তাও যাতে ঠিক থাকে—তার জন্য প্রার্থনা!

আবার এই সব সম্পদ্ আরও পাবার জন্য প্রার্থনা! অপরের অনেক সম্পত্তি ও সম্মান দেখে, প্রতিবেশীর সচ্চরিত্র বিদ্বান্ ছেলেটির সঙ্গে নিজের মূর্খ অপোগণ্ড সন্তানটির পার্থক্য ভেবে প্রাণ হিংসায় জ্বলে উঠলে মনের গোপন কোণে অন্যের অকল্যাণ কামনাও হয় না কি?

প্রার্থনা নানা ভাবে আসে। যখন নদীবক্ষে তরীখানি ডুবুডুবু হয়—তখন বুক দুরুদুরু করে ওঠে—ভয়ে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' ব'লে প্রার্থনা! যখন করাল মৃত্যু গ্রাস করতে ছুটে আসে—তখন বাঁচবার জন্য চোখের জলে বুক ভেসে যায়—প্রার্থনা হয় 'রক্ষা কর'। যখন সমস্ত সম্পত্তি শত্রুর কবলিত হচ্ছে, নিঃস্ব হয়ে বাঁচব কেমন ক'রে—এই চিন্তায় পাগলের মতো ছুটে বেড়াই, তখনও প্রার্থনা করি 'রক্ষা কর' ব'লে। ভয় ও ভাবনাকে অবলম্বন ক'রেই এই সব প্রার্থনা।

শিশুর প্রার্থনা তার খেলার জগৎকে অবলম্বন ক'রে—যা সে দেখে, যেটি তার ভাল লাগে সেটি সে চায়। কিশোর যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেরই প্রার্থনা নিজ নিজ চিন্তা চাহিদা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে। যে বালক খেলার জিনিস পাবার জন্য কত ইচ্ছা করেছিল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জিনিসগুলির প্রতি টান মন থেকে চলে যায়—সেগুলি আর তাকে ভোলাতে পারে না। বয়স যত বাড়ে, নতুন নতুন জিনিসের প্রতি অনুরাগ ও আসক্তি তত বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধাবস্থায় যখন লোকে আত্মবিশ্লেষণ করে—তখন না ভেবে পারে না যে, ছোটবেলা থেকে কত অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে মনকে লিপ্ত ক'রে শুধু নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়েছে—বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রার্থনা চিত্তকে কেবল ভারাক্রান্ত ক'রেই তুলেছে।

ভিখারী ধনীর দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে কখনো পায়, কখনো বা বিফল হয়। মানুষের কাছে প্রার্থনা অনেক সময়েই বৃথা যায়, কারণ দেওয়া না দেওয়া দাতার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। না-পাওয়া তবু তো ভাল, কিন্তু অনাদর বা লাঞ্ছনা বড়ই পীড়াদায়ক। সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষই ভিক্ষুক; তার কামনা-বাসনার শেষ নেই, তাই মানুষের কাছে প্রার্থনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হয় এবং পরিবর্তে আসে হতাশা, দুঃখ ও মানসিক অশান্তি। কিন্তু ভগবান যিনি এই দুনিয়ার মালিক ও সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী, যিনি যন্ত্রী-রূপে সকলকে যন্ত্রের মত চালাচ্ছেন তাঁর কাছে ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করলে তিনি মনস্কামনা পূর্ণ ক'রে দেন।

ঈশ্বর কল্পতরু! কল্পবৃক্ষের নিকট যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়—কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকে না। কিন্তু সাবধানে প্রার্থনা না করলে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিকার সেই তরুতলে বিশ্রামরত পথিকের মতই ব্যাঘ্রের কবলিত হ'তে হয়। পথিক বেশ তো ভাল ভাল জিনিস (?) চেয়েছিল,—পেয়েছিলও, কিন্তু কী কুক্ষণে তার মনে বাঘের কথা এল—আর যায় কোথা! ব্যাঘ্রের আবির্ভাবে সব শেষ! .

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কল্পতরু হয়েছিলেন—সব কিছু দেবার জন্য মুক্তহস্ত, যে যা চায় তাকে তাই দেবেন। সংসারের শোকে দুঃখে জ্বালাযন্ত্রণায় পীড়িত—মায়া-মোহে আচ্ছন্ন অচৈতন্য মানুষ তাঁর চারদিকে ভিড় জমিয়েছে—কি চাইতে কি চেয়ে ফেলবে তার তো ঠিক নেই—হয়তো লাউ কুমড়ো আলু পটল চেয়ে বসবে। তাই কি করুণাবতার রামকৃষ্ণ সকলের প্রার্থনার আগেই 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলে আশীর্বাদ করলেন? ভাবটি এই—যে যা প্রার্থনা করে করুক, কিন্তু সে যেন তার মানবজীবনের উদ্দেশ্যটি ভুলে না যায়।

যত দিন ভোগবাসনা ষোল আনা মনকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে তত দিন 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি' প্রার্থনা ছাড়া অন্য প্রার্থনা হয় কি? অবশ্য অনেক সাধক 'রূপ' অর্থে পরমার্থ রূপ, 'জয়' অর্থে আধ্যাত্মিক উন্নতি, 'যশ' অর্থে তত্ত্বজ্ঞানলাভের যশ এবং 'শত্রু'নাশ অর্থে কাম-ক্রোধাদি রিপু দমন প্রার্থনা করেন। এরূপ অর্থ অতি উত্তম—যাঁরা এইরূপ প্রার্থনা করেন তাঁরা ধন্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন যে স্তরে থাকে ও যে পরিবেশের মধ্যে তারা জীবন যাপন করে—তাতে প্রার্থনার সময় পার্থিব ভোগ-সুখ ও বিলাস-বৈভবের কথাই মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। দেবতার উদ্দেশ্যে একটি প্রণামের বিনিময়ে কত কী প্রার্থনা! —ভাল শরীর, সাংসারিক উন্নতি, বিদ্যা মান যশ, শত্রুনাশ ইত্যাদি—হয়তো আর একটি প্রণামের বিনিময়ে 'সোনার থালে নাতির সঙ্গে খাওয়া'র প্রার্থনা হ'ল। একটির বিনিময়ে দশটি পাবার ইচ্ছা—এ তো নিছক ব্যবসাদারি!

ভোগের বাসনা মন থেকে যত দূর হ'তে থাকে উচ্চতর জিনিসের আকাঙ্ক্ষা ততই মনকে অধিকার করে। ভোগ্যবস্তুগুলি কত ক্ষণস্থায়ী—ঠিক ঠিক ধারণা হ'লে মন শাশ্বত বস্তুর দিকে ধাবমান হয়; 'চিটে গুড়' আর ভাল লাগে না, 'মিছরির পানা'র জন্য মন ছটফট করে। তখন অনন্ত ভোগের সামগ্রী কেউ যদি সামনে রেখে যত ইচ্ছা ভোগ করতে অনুমতি দেয়, তার কণামাত্রও ভোগ করতে ইচ্ছা হয় না—তখনই কণ্ঠে নচিকেতার মতো তীব্র বৈরাগ্যের সুর ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে :

'অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।'—সকল জীবনই ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণিক জীবনে ভোগের সময় কই? তোমার রথ নৃত্যগীত তোমারই থাকুক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রার্থনা—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
> 　　কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
> 　　ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
> —ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতাসুন্দরী।
> শুদ্ধা ভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি॥

এ যে উচ্চস্তরের প্রার্থনা—সে স্তরে না উঠলে মন তা ধারণা করতে পারে না। এখানেও চরম বৈরাগ্যের সুর অনুরণিত, তার সঙ্গে এসে মিশেছে—অহৈতুকী ভক্তি। প্রকৃত ভক্ত শুদ্ধা ভক্তিই প্রার্থনা করেন—কোন কিছুর বিনিময়ে নয়। ইহ ও পরলোকের সব কিছুই তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর।

ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের কণ্ঠেও প্রার্থনার এই একই সুর :

> যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
> ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

'মোহাচ্ছন্ন যারা তাদের বিষয়ের উপর যে প্রীতি রয়েছে, অনুক্ষণ তোমার স্মরণে রত আমার হৃদয় থেকে সেই রকম প্রীতি বা অনুরাগ কখনও যেন অন্তর্হিত না হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বুঝি বলেছেন বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টানটুকু ভগবানকে দিতে!

রামনাম-সঙ্কীর্তনের সময় যে প্রার্থনাটি করা হয় সেটিও ভাবে পরিপূর্ণ,—অন্তর্যামী ভগবান, আমার চিত্ত কামাদিশূন্য কর:

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ॥

'হে রঘুনাথ! আমি সত্য বলছি—আর আপনিও সকলের অন্তরাত্মারূপে জানেন যে, আমার হৃদয়ে অন্য কোন বাসনা নাই। হে রঘুশ্রেষ্ঠ, আমাকে একান্ত নির্ভরশীল ভক্তি প্রদান করুন—আমার মনকে কামাদি-দোষশূন্য করুন।'

প্রার্থনার উদ্দেশ্য চিত্তকে নির্মল ও মনকে বাসনামুক্ত করা। নির্মল দর্পণে বা পরিষ্কার জলে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়—সেইরূপ শুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের রূপ প্রতিবিম্বিত হয়।

কি ভাবে প্রার্থনা করতে হয়—ছেলেদের শেখাবার জন্যই যেন শ্রীশ্রীমা নিজের জীবনে মাত্র দুটি জিনিস প্রার্থনা করলেন, (১) জ্যোৎস্নার মত নির্মল চিত্ত, (২) নির্বাসনা। 'নির্বাসনা' চাওয়ার মধ্যে প্রার্থনার সব কিছুই নিহিত রয়েছে—এ যেন একেবারে মূল ধ'রে আকর্ষণ! এরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা আর নেই! মনকে বাসনামুক্ত না করতে পারলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ সুদূর-পরাহত থেকে যায়; তাই মা 'নির্বাসনা' ছাড়া আর কিছু চাইলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে প্রার্থনার যে বাণী নির্গত হয়েছে তা ভক্তিসাধনার মহামন্ত্র। জগন্মাতার কাছে তিনি চেয়েছেন 'শুদ্ধা ভক্তি'! প্রার্থনা তাঁর নিষ্কাম:

'মা, আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত! দেহসুখ চাই না মা! লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই; তোমার মায়ার সংসারের, কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখনও না হয়। মা! তোমা বই আমার আর কেউ নেই, আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—কৃপা ক'রে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

বুদ্ধের যে মৈত্রীভাবনা সে তো সর্বভূতের জন্য কল্যাণ-প্রার্থনা। যে কল্যাণচিন্তা ২৫০০ বছর আগে নিভৃতে ব'সে আকাশে বাতাসে দিগ্‌দিগন্তে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আজও তা মানুষের অন্তর স্পর্শ না ক'রে পারে না!

স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন প্রার্থনা করলেন নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে যাবার জন্য—সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে যে ভাব ঢুকিয়ে দিলেন তা প্রকাশ পেল নরনারায়ণ-সেবার মাধ্যমে। শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কেন, সামান্য একটি কুকুরকে অভুক্ত দেখলেও বেদনায় স্বামীজীর চিত্ত ভরে উঠত।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

এই প্রার্থনা যেন তাঁর অন্য সব প্রার্থনাকে ব্যাপ্ত ক'রে ছিল।

কো নু স স্যাদুপায়োঽত্র যেনাহং সর্বদেহিনাম্।
অন্তঃপ্রবিশ্য ভূতানাং ভবেয়ং দুঃখভারভাক্॥
ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

'এমন কি উপায় আছে যাতে আমি সকল প্রাণীর

অন্তরে প্রবেশ ক'রে সদা তাদের দুঃখভারের ভাগী হতে পারি ? আমি রাজ্য স্বর্গ বা মুক্তি চাই না, শুধু দুঃখতপ্ত প্রাণিগণের আর্তিনাশ প্রার্থনা করি।' —এ-ও স্বামীজীর ভাবের প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন মুখ এক ক'রে প্রার্থনা করতে বলেছেন, তা নইলে ভাবের ঘরে চুরি হবে। মুখে উচ্চারিত হচ্ছে জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তির প্রার্থনা—ভিতরে কিন্তু কামনা বাসনা গজগজ করছে। ভাবের ঘরে চুরি: সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে যে প্রার্থনা 'আর পারি না, মরণ দাও ভগবান' তার উত্তরে সত্যই যদি মরণ আসে তবে সেই মৃত্যুপ্রার্থিনী কাঠকুড়নী বুড়ীর মতো তাকে এই ধরনের কথাই না ব'লে থাকা যায় না 'আমার মাথায় কাঠের বোঝাটা একটু তুলে দাও না, বাবা!'

নির্জনে কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করতে বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কান্নার স্বর যেন অন্যের কানে না পৌঁছায়, কেবল যাঁর জন্য ক্রন্দন তিনিই যেন শুনতে পান! যত গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে—প্রার্থনার শক্তি তত বেশী। ঐকান্তিক প্রার্থনার অমোঘ শক্তি। প্রার্থনার দ্বারা অন্তর্নিহিত শক্তি জাগরিত হয়। এই সৃষ্টিরহস্য ও বিশ্ব-প্রপঞ্চের মূলেও প্রার্থনা। ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন 'আমি এক, বহু হব—একোঽহং বহু স্যাম্'। প্রার্থনা ও তপস্যার দ্বারা স্রষ্টা সৃজন-ক্ষমতা লাভ করলেন। আমরাও নিজেদের ইচ্ছাশক্তিকে যে ভাবে চালিয়েছি ও যে ভাবে প্রার্থনা করেছি তদনুযায়ী শরীর মন লাভ করেছি। প্রার্থনা ইচ্ছা-শক্তিরই বাঙ্ময় রূপ। স্বামীজী বলেছেন: 'নিজের ইচ্ছাশক্তিই প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকে—তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণা অনুসারে সেটা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। আমরা তাকে বুদ্ধ, যীশু, জিহোবা, আল্লা বা অগ্নি, যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে আমাদের আত্মা। খৃষ্ট, বুদ্ধ এঁরা বাহিরের অবলম্বন, বাস্তবিক আমরাই আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিই।' উপনিষদে আছে যে সাধক একান্ত-ভাবে স্বরূপ-উপলব্ধির জন্য প্রার্থনা করেন, তাঁর নিকটেই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা উদ্ঘাটিত হন:

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।

অনন্ত কাল ধরে আমরা যার অনুসন্ধানে রত, —সেই পরম সত্যকে বরণ করার জন্য জ্ঞান-সাধক প্রার্থনাটি যেন আমাদের অন্তরে সদা জাগরূক থাকে:

অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

'অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার হ'তে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে চল। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে সদাই রক্ষা করো।'

দেশের যুবকদের এমন প্রার্থনা হওয়া উচিত যাতে তারা তেজ বীর্য ও শক্তির অধিকারী হ'তে পারে, দরকার হ'লে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে দাঁড়াতে পারে। বীরের জন্য বৈদিক প্রার্থনা:

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং মহি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।

'তুমি তেজ, আমায় তেজস্বী কর; তুমি বীর্য, আমায় বীর্যশালী কর; তুমি বল, আমায় বলবান্ কর; তুমি ওজঃ, আমাকে ওজস্বী কর; তুমি অন্যায়-দ্রোহী, আমাকে অন্যায়দ্রোহী কর; তুমি সহনশক্তি, আমাকে সহিষ্ণু কর।'

ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন কুসুমকোমলভাব ও কেবল নৃত্যগীতের সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হ'য়ে যুবকদের

আজ নামতে হবে কর্মক্ষেত্রে—যেখানে আলস্যের স্থান নেই—অনাচারের প্রশ্রয় নেই। নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ ক'রে সকলের মঙ্গলের জন্য সমবেত প্রচেষ্টার আজ একান্ত প্রয়োজন।

একা চললে হবে না—স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ ক'রে এক মন এক প্রাণ হ'য়ে চলার পথে অগ্রসর হ'লে অসীম শক্তি স্ফুরিত হবে; এ যুগে সমষ্টির শক্তিই শক্তি—'সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে'। এইজন্য সমবেত প্রার্থনাও আবশ্যক।

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

ঋষির আশীর্বাণী: 'তোমাদের সকলের সঙ্কল্প, হৃদয়, অন্তঃকরণ সব এক সুরে বাঁধা হোক—যাতে তোমাদের পরম ঐক্য লাভ হয়, তাই হোক।'

তিমিরাভিসার

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

বাঁশী বাজে 'রাধা' 'রাধা'!
অই নাম ছাড়া বাজিতে জানে না,
অই নামে সুর সাধা!
শুনি সেই ধ্বনি রাধা নহে থির,
বুকে জাগে তার বেদনা-গভীর,
প্রাণের আবেগ উথলিয়া উঠে,
নাহি মানে কোন বাধা!
বাঁশী বাজে—'রাধা' 'রাধা'!

বরিষার মেঘ-দামে,
দিগদিগন্ত ভরেছে তখন,
যামিনী মধ্য-যামে!
গগনে উঠিছে অশনির ধ্বনি,
দামিনী চমকে, চমকে ধরণী,
উর্ধ্ব হইতে ঝর-ঝর-স্বনে
জলধর-ধারা—নামে!
বাঁশী বাজে—'রাধা' নামে!

কেমনে রহে সে ঘরে!
কানু-অনুরাগে জর-জর হিয়া,
দু'আঁখিতে বারি ঝরে!
একে ঘোরা রাতি ভরা আঁধিয়ার,
দুর্যোগময় বন-কান্তার,
তবু অভিসারে চলে বিরহিনী
চলে বঁধুয়ার তরে!
বাঁশী বাজে প্রেম-ভরে!

বাঁশী বাজে, বাঁশী বাজে!
চমকিত হ'য়ে শুনিছে শ্রীমতী
আপন মনের মাঝে!
মন্থর-পদে যত আগুসারে,
সাথে সাথে যেন হেরে বঁধুয়ারে,
মনে হয় যেন সেই মনোচোরা,
তাহারি হিয়ায় রাজে!
'রাধা' নামে বাঁশী বাজে!

রাধা চলে—রাধা চলে!
প্রাণের দয়িত আর কত দূরে—
কোন্ কুঞ্জের তলে?
কেঁদে উঠে প্রাণ ব্যাকুল বিরহে,
বেদনার দাহে সারা তনু দহে,
অবলা নারীর আর কত সহে,
চরণ কেবলি টলে!
বাঁশী বাজে পলে পলে!

এই ত' সে চিত-চোর!
'রাধা' 'রাধা' নামে বাজায় বাঁশরী
আপনার ভাবে ভোর!
গিরিধারী পাশে মিলিল শ্রীরাধা,
ঘন বরিষার আর নাহি বাধা,
দুঁহু হিয়া আজ দুঁহু প্রেমে বাঁধা,
প'রে মিলনের ডোর!
বাঁশী আজ ভাবে ভোর!

সাধু শ্রীজ্ঞান-সমন্ধর্

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

বেদারণ্যমে বসে এই প্রবন্ধ লিখছি, কাজেই এখানে জ্ঞান-সম্বন্ধর্ যে অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন করেছিলেন তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বেদারণ্যম্ তাঞ্জোর জেলায় সমুদ্রের ধারে অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। মাদ্রাজ থেকে এর দূরত্ব ২২০ মাইল। ঘূর্ণিবাত্যায় সেবা করার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে এখানে এসেছি। বেদারণ্যম্ অতি প্রাচীন স্থান। এখানে শিবের বিখ্যাত মন্দির আছে; শিবের নাম শ্রীবেদারণ্যেশ্বর। কথিত আছে, পুরাকালে চার বেদ স্বয়ং আবির্ভূত হ'য়ে বেদারণ্যেশ্বরের পূজা করেছিলেন। তারপর থেকে মন্দিরের সুবৃহৎ প্রধান প্রবেশদ্বার আপনা-আপনি বন্ধ হ'য়ে যায়, কারণ সে দরজা দিয়ে আর কেহ মন্দিরে প্রবেশ করতে সাহস করে নি। পূজার জন্য পুরোহিতরা দরজাতে ছোট একটি ছিদ্র ক'রে তাই দিয়ে যাতায়াত করতেন।

জ্ঞানসম্বন্ধর্ ও আপ্পার্ যখন এই মন্দিরে আসেন তাঁরা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে প্রধান দরজা দিয়েই প্রবেশ ক'রে ভগবানের দর্শন করবেন। দরজা খোলার জন্য প্রথমে আপ্পার্ দেবতায় স্তুতিগান করেন, কিন্তু তাতেও দরজা খোলে না! অতঃপর আপ্পার্ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে জ্ঞানসম্বন্ধর্ দেবতার উদ্দেশ্যে এক অপূর্ব ভক্তিরসাত্মক স্তব রচনা ক'রে গান করেন। দেবতার হৃদয় দ্রবীভূত হ'ল এবং সমবেত অসংখ্য ভক্ত নরনারী অবাক্ বিস্ময়ে দেখল যে বহুকালের বন্ধ দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। আনন্দে মগ্ন হয়ে সাধুদ্বয় মন্দিরে প্রবেশপূর্বক ভগবানের পূজা করলেন। পূজান্তে বাইরে এসে জ্ঞানসম্বন্ধর্ আর একটি স্তব গান করাতে দরজা আবার বন্ধ হ'য়ে গেল। উপস্থিত পূজারীবৃন্দ জ্ঞানসম্বন্ধের পদতলে পতিত হয়ে আবেদন জানাল, যে প্রয়োজন-মত তারাও যেন প্রার্থনা জানালে দরজা খুলে যায় ও বন্ধ হ'য়ে যায়। সাধুরা বললেন, 'আমরা যে যে স্তব গান করলাম তোমরাও ভক্তিভরে ঐগুলি গান করলে দরজা খুলবে ও বন্ধ হবে।' তদবধি আজ পর্যন্ত মন্দিরে ব্রহ্মোৎসবের সময় অসংখ্য ভক্ত নরনারী-পরিবৃত হ'য়ে পূজারীরা সেই স্তব গান ক'রে বছরে একবার সেই দরজা খোলেন এবং উৎসবান্তে আবার স্তব গান ক'রে দরজা বন্ধ করেন। অবশ্য, এখন আর দরজা আপনা-আপনি খোলে না বা বন্ধ হয় না; কারণ সে জ্ঞান-সম্বন্ধই বা কোথায়, আর সে ভক্তিই বা কোথায়?

বেদারণ্যমে কয়দিন মহানন্দে কাটিয়ে সব দল-বল নিয়ে জ্ঞানসম্বন্ধর্ মাদুরাভিমুখে যাত্রা করলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্রাচীনতম শহর। মীনাক্ষী এই শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মীনাক্ষীদেবীর মন্দির দাক্ষিণাত্যের মন্দির-গুলির মধ্যে বৃহত্তম বললেও অত্যুক্তি হবে না। জ্ঞানসম্বন্ধের সময়ে কূন পাণ্ড্য নামে পাণ্ড্যবংশীয় এক রাজা মাদুরায় রাজত্ব করতেন। 'কূন' অর্থে কুব্জ বা বিকৃতদেহ। বুদ্ধির বিকৃতিবশতঃ তিনি জৈনধর্ম অবলম্বন করেন ব'লেও কেহ কেহ তাঁকে 'কূন পাণ্ড্য' বলতেন। পরে তিনি 'সুন্দর পাণ্ড্য' নামেও খ্যাতিলাভ করেন। তখন মাদুরা শহর ও আশেপাশের গ্রামগুলিতে জৈনদের বিশেষ আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল। রাজার সমর্থন পেয়ে জৈনরা নানাপ্রকার অত্যাচার করতেন এবং বলপ্রয়োগে বহুলোককে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। জৈনদের মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্রাদি জানতেন এবং ময়ূরের পাখা দিয়ে নানারূপ তুকতাক করতেন।

সাধারণ লোক এতে ভয় পেয়ে সহজেই তাদের ধর্মে দীক্ষিত হ'ত। শৈবদের, তথা ঐ রাজ্যের হিন্দুদের সে এক মহা দুর্দিন।

রাজা এবং বহু প্রজা জৈনধর্মাবলম্বী হ'লেও রাণী মাঙ্গারকারসি ও প্রধান মন্ত্রী কুলশেখর কিন্তু শৈব ছিলেন। জ্ঞানসম্বন্ধের খ্যাতির কথা তাঁদের কানে এল এবং ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁরা জ্ঞানসম্বন্ধরকে মাদুরায় আসবার জন্য সকাতর অনুরোধ জানিয়ে গোপনে দূত প্রেরণ করেন। তিনি রাজী হলেন এবং পথে অন্যান্য মন্দিরাদি দর্শনান্তে মাদুরায় এসে মঠে আশ্রয় নিলেন। জৈনরা এ খবর শুনে অত্যন্ত আশঙ্কান্বিত হলেন। বুদ্ধির বিভ্রমবশতঃ জ্ঞানসম্বন্ধরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা অবলম্বন করলেন এক অতি হীন ও জঘন্য পন্থা। গভীর রাতে যখন সকলে নিদ্রাগত, তখন জৈনরা জ্ঞানসম্বন্ধের কুটিরে দিলেন আগুন লাগিয়ে। কিন্তু ভগবান ত নিজেই গীতায় বলেছেন, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' অপরের চীৎকারে জ্ঞানসম্বন্ধর্ বেরিয়ে এসে মাদুরার বিখ্যাত শিব চোকনাথের উদ্দেশে এক স্তব রচনা করেন। আগুন নিবে গেল। রাজার সম্মতিক্রমে জৈনরা তাঁর কুটিরে আগুন দিয়েছে শুনে তাঁর অত্যন্ত রাগ হ'ল এবং তিনি প্রার্থনা করলেন, যাতে ঐ আগুন ব্যাধিরূপে রাজার শরীর আক্রমণ করে। তাই হ'ল। তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হ'য়ে রাজা ছটফট করতে লাগলেন এবং রোগমুক্তির জন্য জৈন পুরোহিতদের ডেকে পাঠালেন। তারা এসে ময়ূরের পাখা বুলিয়ে অনেক ঝাড় ফুঁক ক'রল কিন্তু ব্যাধির কোনও উপশম হ'ল না। অবশেষে রাণীর অনুরোধে কুন পাণ্ড্য জ্ঞানসম্বন্ধরকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি এসে শিবের উদ্দেশ্যে এক স্তব গান করলেন এবং প্রসাদী ভস্ম রাজার অঙ্গে লেপন ক'রে দিতেই রাজা সুস্থ হ'য়ে উঠলেন। জৈনরা লজ্জা পেয়েও দমিত হ'ল না। তাদের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞানসম্বন্ধের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করার জন্য তারা কোনও রকমে আরও দুটি পরীক্ষার জন্য রাজাকে রাজী করা'ল। পরীক্ষা এইভাবে হ'ল: জৈনরা জ্ঞানসম্বন্ধরকে ব'লল, 'আমরা আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি স্তব লিখব। তুমিও তোমার ভগবান সম্বন্ধে পত্রে একটি স্তব লেখ। আমরা উভয়ে সেই পত্র প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ ক'রব। যাদের ঈশ্বর সত্য ও মহত্তর তাদের পত্র আগুনে দিলেও পুড়বে না। যাদের ঈশ্বর নিকৃষ্ট ও মিথ্যা তাদেরটি পুড়ে যাবে। জ্ঞানসম্বন্ধর রাজী হলেন। এই পরীক্ষা দেখবার জন্য হাজার হাজার লোক সমবেত হ'ল। সপার্ষদ রাজাও উপস্থিত হলেন। উভয় দলই স্তব-লেখা পত্র দুটি জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ ক'রল। নিমেষে জৈনদের পত্রটি ভস্মসাৎ হ'ল, কিন্তু জ্ঞানসম্বন্ধের পত্রটি যথাপূর্ব রয়ে গেল। শিয়ালির সাধুকে সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। পরাজয় স্বীকার করার জন্য বলা সত্ত্বেও জৈনরা রাজী হ'ল না। রাজা তাঁর অসুখের ব্যাপারে জৈনদের প্রতি কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতায় ও সাধুত্বে তাঁর সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'ল। তিনি শৈবধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হবার জন্য জ্ঞানসম্বন্ধরকে অনুরোধ জানালেন; কিন্তু জৈনরা রাজার পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চেয়ে কোনও রকমে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করে; এবং নিম্নলিখিত শেষ পরীক্ষাটি গ্রহণের জন্য রাজাকে রাজী করায়।

বৈগাই নদীর তীরে মাদুরা শহর অবস্থিত। এর স্রোতের খুব জোর ব'লে একে বেগবতীও বলা হয়। তখন বর্ষাকাল। নদীর কানায় কানায় জল এবং প্রচণ্ড স্রোত, যেন হাতীকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জৈনরা বলল, 'আমরা আমাদের প্রভু অর্হতের সম্বন্ধে পত্রের ওপর একটি স্তব লিখব এবং জ্ঞানসম্বন্ধও তার ভগবান সম্বন্ধে আর একটি পত্রে স্তব লিখবে। উভয় পত্রই স্রোতের মাঝ-

খানে স্থাপন করা হবে এবং যার ভগবান সত্য ও মহৎ তার পত্র স্রোতের বিপরীত দিকে যাবে। পরীক্ষা দেখবার জন্য বেগবতীর তীরে সমস্ত শহর ভেঙে পড়ল। রাজাও সদলবলে উপস্থিত। জৈনরা তাদের পত্র স্রোতে নিক্ষেপ করা মাত্র উহা মুহূর্তে স্রোতের অনুকূলে অর্থাৎ নীচের দিকে ভেসে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের ও বিস্ময়ের বিষয় যে শিব স্মরণ ক'রে জ্ঞানসম্বন্ধর্ তাঁর পত্র স্রোতের মধ্যস্থলে স্থাপন করলে সেটি ধীরে ধীরে স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে লাগল। জ্ঞানসম্বন্ধের জয় দিতে দিতে সকলে তাঁর পদতলে পতিত হ'ল। রাজাও তাঁর পায়ে প'ড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন এবং তাঁর সকাতর প্রার্থনায় জ্ঞানসম্বন্ধর্ রাজাকে পুনরায় শৈবধর্মে দীক্ষিত করলেন।

জৈনদের শঠতা ও জ্ঞানসম্বন্ধের প্রতি তাদের অত্যাচারের জন্য রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, 'এই সব ধূর্তদের যথোপযুক্ত শাস্তি দাও'। ভয়ে বহু জৈন দেশত্যাগী হ'ল। ঘরে আগুন দেওয়ার অপরাধে এবং জোর ক'রে হাজার হাজার লোককে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য শাস্ত্র ও পণ্ডিতদের বিধান অনুযায়ী বহু জৈনকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

মাদুরা থেকে বিদায় নিয়ে জ্ঞানসম্বন্ধর্ বিখ্যাত রামেশ্বর মন্দির দর্শন ক'রে পথিমঙ্গাই নামক এক শহরে এলেন। বৌদ্ধদের এটি একটি প্রধান ঘাঁটি। এরা শৈবদের অত্যন্ত ঘৃণা ক'রত। এখানেও এক সভায় বৌদ্ধদের সাথে জ্ঞানসম্বন্ধের এক শিষ্যের তর্ক হ'ল। বৌদ্ধরা ক্রমান্বয়ে পরাজিত হওয়ায় অবশেষে প্রায় সকলেই শৈবধর্ম গ্রহণ ক'রল। এইভাবে জ্ঞানসম্বন্ধের চেষ্টায় শৈবধর্ম, তথা হিন্দুধর্ম স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অতঃপর জ্ঞানসম্বন্ধর্ ত্রিবাঙ্কুর শিবমন্দির দর্শনান্তে শ্রীকালহস্তীশ্বর-মন্দিরে গমন করেন। এখানকার প্রধান ভক্ত ব্যাধ কানাপ্পার ভক্তির কথা স্মরণ ক'রে তাঁর চোখে জল এল। কানাপ্পা সম্বন্ধে তিনি সুন্দর স্তব রচনা করলেন। এখানে কয়দিন মহানন্দে কাটিয়ে জ্ঞানসম্বন্ধর্ মাদ্রাজ শহরের দিকে রওনা হলেন। মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণাংশ ময়লাপুর নামে খ্যাত। তামিল ভাষায় 'ময়লাই' অর্থ ময়ূর। কথিত আছে এখানে দেবী পার্বতী ময়ূরের রূপ ধ'রে মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন। তদবধি এই অঞ্চল ময়লাপুর নামে প্রসিদ্ধ। এখনও ময়লাপুরস্থিত কপালীশ্বর নামক বিখ্যাত শিবমন্দিরের পাশেই মন্দিরের 'স্থলবৃক্ষ'-সংলগ্ন একটি ছোট মন্দিরে পাথরের একটি ছোট শিবলিঙ্গ এবং তার পাশেই শ্রীভগবতীর ময়ূর-মূর্তি রয়েছে, যেন তিনি শিবকে পূজা করছেন।

মাদ্রাজ শহরে এটিই সব চেয়ে বড় মন্দির। এই ময়লাপুরে শিবনেশন চেট্টি নামে এক ধনী শিবভক্ত বাস করতেন। পুম্পাবাঈ নামে তাঁর একটি সর্বগুণসম্পন্না ভক্তিমতী সুন্দরী কন্যা ছিল। 'পুম্পাবাঈ' অর্থ কেউ কেউ বলেন পুষ্পকন্যা। বলাবাহুল্য শিবনেশন কন্যা-গতপ্রাণ ছিলেন। পুম্পাবাঈ রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে আসত এবং পিতাপুত্রীতে মালা গেঁথে রোজ ভগবান কপালীশ্বরের পূজা করতেন। একদিন ভোরে পুম্পাবাই বাগানে ফুল তুলছে, এমন সময় এক বিষধর সর্প তেড়ে এসে তাঁকে দংশন ক'রল। সঙ্গে সঙ্গে বিষের তীব্র জ্বালায় পুম্পাবাঈ মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে যায়। কন্যাকে বাঁচাবার জন্য পিতা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। স্নেহময় পিতা হাহাকার ক'রে উঠলেন। তাঁর দুঃখ দেখে উপস্থিত সকলের হৃদয় বিগলিত হ'ল; অনেকেই অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

মন্দিরের অদূরেই পুম্পাবাঈ-এর প্রাণহীন দেহের সৎকার করা হ'ল। চিতা নির্বাপিত হ'লে পিতা অস্থিগুলি সংগ্রহ ক'রে একটি স্বর্ণপাত্রে সযত্নে রক্ষা করলেন। দুইজন পরিচারিকা উহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হ'ল এবং শিবনেশন রোজ কন্যার

উদ্দেশ্যে অস্থিপাত্রের সামনে খাদ্য ও পানীয় উৎসর্গ করতেন। অনেকে মনে ক'রল কন্যার শোকে পিতা বোধহয় পাগল হ'য়ে যাচ্ছেন।

জ্ঞানসম্বন্ধের মাহাত্ম্যের কথা শিবনেশন পূর্বেই শুনেছিলেন এবং তাঁর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়েছিলেন। শ্রীকালহস্তীশ্বর থেকে জ্ঞানসম্বন্ধর্ যখন ময়লাপুরে পৌঁছলেন বহু লোক তাঁর দর্শন লাভ করে ধন্য হ'ল। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে শিবনেশন তাঁর দর্শনে ছুটলেন, কিন্তু কন্যার কথা তাঁকে কিছুই বললেন না। অপরের মুখে জ্ঞানসম্বন্ধর্ পুষ্পাবাঈ-এর কথা শুনলেন। শিবনেশনের দুঃখের কথা স্মরণ ক'রে এবং তার অবস্থা দেখে সাধুর হৃদয় বিগলিত হ'ল।

অতঃপর হাজার হাজার ভক্ত-সমাবৃত হ'য়ে তিনি কপালীশ্বর মন্দিরে শিবকে দর্শন ও পূজা ক'রে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের পশ্চিমদিকে উপবেশনপূর্বক শিবনেশনকে বললেন, 'কই তোমার কন্যার অস্থি-পূর্ণ পাত্রটি এখানে নিয়ে এস তো।' সকলেই মনে ক'রল জ্ঞানসম্বন্ধর্ অলৌকিক কিছু করবেন। সুপ্রশস্ত মন্দিরপ্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেল। পাত্রটি সম্মুখে স্থাপিত হ'লে কিছুক্ষণ মুদ্রিত নয়নে থেকে তিনি কপালীশ্বর শিবের এক স্তব রচনা ক'রে ভক্তিগদগদকণ্ঠে তা গান করতে শুরু করলেন। সেই স্তবে তিনি শিবের কাছে করুণকণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন—পুষ্পাবাঈ যেন তাঁর কৃপায় পুনর্জীবিতা হয়। ভক্তের আকুল প্রার্থনা ও আবদার ভগবানের হৃদয় স্পর্শ ক'রল। সমবেত সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলেন যে অস্থিপূর্ণ পাত্রটি ধীরে ধীরে নড়তে আরম্ভ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় স্তব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটি ভেঙে গেল এবং তা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল একটি অতি কমনীয়া বালিকা—ইনি আর কেহই নহেন, ইনিই পুষ্পাবাঈ। পিতাপুত্রী সাধুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন। সমবেত সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল এবং দেবতারা জ্ঞানসম্বন্ধের উপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন। বহু জৈন এবং বৌদ্ধও এই ঘটনা দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা জ্ঞানসম্বন্ধের অলৌকিক কাণ্ড দেখে সকলেই শৈবধর্ম গ্রহণ করলেন। পুনরায় সাধুর চরণে প্রণত হ'য়ে বললেন শিবনেশন, 'স্বামিন্, এই কন্যাকে বহু পূর্বেই আপনার নামে উৎসর্গ করেছিলাম—আপনি কৃপা ক'রে একে গ্রহণ করুন।' জ্ঞানসম্বন্ধর্ তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন, 'এ আমার কন্যাস্বরূপা। কপালীশ্বর মহাদেবের অসীম কৃপা প্রদর্শনের জন্যই এই কন্যার জীবন দান করলাম।'

এর পর জ্ঞানসম্বন্ধর্ বিশ্রামলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর জন্মস্থান শিয়ালি এলে গ্রামের ব্রাহ্মণরা জ্ঞানসম্বন্ধর্‌কে ধরে বসলেন যে তাঁকে বিবাহ করতে হবে। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি সে দায়িত্ব বহনে অক্ষম।' ব্রাহ্মণরা নানাভাবে যুক্তিতর্কের অবতারণা ক'রে বললেন, 'আপনি বৈদিকধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। বৈদিক নিয়ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণের বিবাহ করা উচিত।' সকলের অনুরোধ ও আকূতি জ্ঞানসম্বন্ধর্ এড়াতে পারলেন না। বিখ্যাত শিবভক্ত নাম্বি অন্দরনাম্বির সুলক্ষণা কন্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হ'ল। বহু ব্রাহ্মণ ও শিবভক্ত সমবেত হ'লেন। জ্ঞানসম্বন্ধর্ তিরুমানম্ মন্দিরে গিয়ে শিবকে পূজা ক'রে এসে কন্যার গলায় পরিণয়তালি পরিয়ে দিলেন। দাক্ষিণাত্যে বিবাহের সময় স্বামী কন্যার গলায় একটি সুবর্ণ 'তালি' (মাদুলির ন্যায়) পরিয়ে দেন উহাকে 'সুমঙ্গলী'ও বলা হয়। স্বামী যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন ঐ তালি প্রত্যেক স্ত্রী সব সময় ধারণ ক'রে থাকেন। উহাই সধবার চিহ্ন।

বিবাহান্তে জ্ঞানসম্বন্ধর্. ভাবলেন, 'প্রকৃত সুখ ও শান্তি বিবাহ দ্বারা পাওয়া অসম্ভব। একমাত্র শিবসাযুজ্যেই উহা সম্ভব। এই ভেবে তিনি প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। কথিত আছে, ভক্তের প্রার্থনায়

শিব এক বিরাট অগ্নিমূর্তি ধারণ ক'রে জ্ঞানসম্বন্ধের সামনে এলেন। সকলে আশ্চর্য হ'য়ে দেখল যে দাউ দাউ ক'রে অগ্নি জ্বলছে, কিন্তু তার মধ্যে একটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। জ্ঞানসম্বন্ধর্ সকলকে বললেন, 'মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, শীঘ্র সকলে এস',—এই ব'লে তিনি সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রী ও সমবেত ভক্তগণসহ সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ ক'রে চিরতরে শিবসাযুজ্য লাভ করলেন। কর্তব্য সমাপনান্তে এইভাবে এক মহান্ আচার্যের জীবনের অবসান হ'ল।

*　　*　　*

স্তব রচনা করার এক অদ্ভুত শক্তি দিয়েছিলেন ভগবান জ্ঞানসম্বন্ধর্‌কে। তামিল ভাষায় তিনি প্রায় ৩৮৪০টি শ্লোক একশত প্রকার বিভিন্ন ছন্দে রচনা করেন। শৈবধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অভিমত পরিষ্কাররূপে তাঁর রচনার মাধ্যমে আমরা পাই। শিবের সাকার ও নিরাকার দুটি রূপের কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে ঈশ্বর এক এবং অনন্ত; যিনি জ্যোতিরও জ্যোতি, তিনিই আবার বিভিন্নরূপে স্থান কাল ও পাত্রভেদে অবতীর্ণ হন। তিনি কেবল মঙ্গলই করেন। অন্যায় বা মন্দের ছায়া পর্যন্ত তাঁতে নাই। তিনি জীবনের জীবন এবং ভক্তের হৃদয়কে তিনি সাময়িক সুখদুঃখের পারে নিয়ে গিয়ে অনন্ত শান্তিতে পূর্ণ করেন ও মধুময় করেন। জ্ঞানসম্বন্ধের মতে—তপস্বী অপেক্ষা ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তিনি ভক্তিকেই মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলেছেন। তিনি বলতেন, ভক্তিপুষ্প প্রস্ফুটিত হ'লে মুক্তি লাভ হয়। ভগবান ভক্তের সঙ্গ চান—তিনি ভক্তাধীন, একথা তিনি একাধিক বার বলেছেন।

ষোল বছর তিনি স্থূল শরীরে ছিলেন; তাঁর হৃদয় ছিল ভক্তিতে পরিপূর্ণ, অন্তর ছিল জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, জীবন ছিল আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ এবং কর্ম ছিল সর্বদা অপরের সেবা। জগতের সর্বজীবের কল্যাণের জন্য তিনি বার বার সকরুণ প্রার্থনা জানিয়েছেন তাঁর ইষ্টদেবকে। তাঁর প্রার্থনার মন্ত্র ছিল, 'জগৎ থেকে পাপ তাপ চলে যাক, সকলে শান্তিতে থাকুক এবং সকলে ভগবানের সান্নিধ্যলাভ ক'রে চিরশান্তির অধিকারী হোক!' এই সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত তামিল স্তবক-টির অনুবাদ দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি:

গো-ব্রাহ্মণ দেবতা সকল হউক শান্তিময়,
শীতল বৃষ্টি ধরায় ঝরুক—রাজার হউক জয়!
সকল অশুভ ধ্বংস হউক—শিব-নাম-মহিমায়,
দুঃখ ও শোক নিঃশেষ হোক পৃথিবীর সীমানায়।

ভ্রান্তি

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর

আপনি হ'য়ে রূপের রাজা বৃথাই মনের ভ্রান্তিতে,
রূপ-পিয়াসী রূপের নেশায় চল্‌লি কোথায় প্রাণ দিতে?
ভোগবিলাসী, ভোগ না ক'রে আপন বিরাট সত্তারে,
কার কাছে কি ভিক্ষা মেগে হাত বাড়ালি পথ-ধারে?

নাভির মূলে বন্ধ রেখে গন্ধে ভরা কস্তুরি—
মৃগের যেমন গন্ধ খুঁজে কানন-ভ্রমণ দস্তুর-ই,
নিজকে নিজে যে না জানে—পশুর মত মূর্খতায়,
পাওয়া ধনে হারায়ে সে তেমনি কেবল দুঃখ পায়।

প্রাচীন ভারতে দুর্ভিক্ষের প্রতীকার-ব্যবস্থা

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতবর্ষ ধনধান্যপূর্ণ সম্পৎশালী দেশ বলিয়া পরিগণিত। প্রাচীন ভারতে খাদ্যাভাব ছিল না, দুর্ভিক্ষের ধ্বংসকর করাল মূর্তি জনগণ দেখিতে পাইত না—এরূপ প্রাচুর্য ও সম্পদের বর্ণনাই আমরা সাধারণতঃ পাইয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন পুস্তকাদিতে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের স্থানে স্থানে দারুণ খাদ্যাভাব ও হৃদয়বিদারক দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জাতক ও অবদান-গ্রন্থাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। উত্তম শস্যোৎপাদনের জন্য ইহাকে প্রধানতঃ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থাকিতে হয়। প্রাচীন ভারতেও অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টির জন্য শস্যোৎপাদনের বিঘ্ন উপস্থিত হইত—ফলে সময়ে সময়ে খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। এমন কি যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে শস্যহানি হইত এবং খাদ্যাভাবে জনগণ দুঃখ পাইত। ভারতবর্ষের মতো কৃষিপ্রধান দেশে দুর্ভিক্ষ হইত না বা হইবে না—এরূপ কল্পনা করা নিরর্থক।

বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রাচীন ভারতে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব-প্রতীকারের জন্য রাষ্ট্র সর্বদাই সজাগ ও সক্রিয় ছিল, কর্তব্যপালন ও দায়িত্ব-স্বীকারে পশ্চাৎপদ ছিল না। কৌটিল্য তাঁহার রাষ্ট্রনীতি-সম্বন্ধীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্রে' দুর্ভিক্ষ-প্রতীকারের জন্য রাষ্ট্রের নীতি হিসাবে কতিপয় উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। সর্বসাধারণের মধ্যে সমভাবে বিতরণের (ভক্ত-সংবিভাগ) জন্য খাদ্যশস্য-সংগ্রহ (ভক্তোপগ্রহ), খাদ্যের বিনিময়ে বা মূল্যবাবদ রাস্তা-ঘাট-সেতু-বাঁধ-দুর্গাদি নির্মাণরূপ লোককল্যাণকর কার্যের প্রবর্তন, ঘাটতি-অঞ্চলগুলি হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল অঞ্চলসমূহে সুশৃঙ্খল লোকবিনিময়, জলসেচ, খাল-খননাদি, লৌকিক উপায়ে পতিত জমির সংস্কারসাধন ও উহাতে শস্যোৎপাদনের চেষ্টা এবং অন্যান্য উর্বর ভূমিতে ব্যাপকভাবে 'অধিক-ফসল-ফলাও' অভিযানের প্রচলন প্রভৃতি কার্যকর উপায় দ্বারা কৌটিল্য শাসকগণকে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ ও প্রতীকার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র-৩য় অঃ, ৭৮তম প্রকরণ)

দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য কৌটিল্য যে-সকল উপায় নির্দেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। দুর্ভিক্ষের সময় ধনিগণের উপর অত্যধিক কর ধার্য করিয়া তাহাদিগকে অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করার নীতি অবলম্বন করিবার জন্য কৌটিল্য শাসকগণকে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই একটি অত্যাবশ্যক উপায়, কারণ দারুণ অন্নাভাবের দিনে জাতীয় অর্থসঙ্কট চরম অবস্থায় উপনীত হইলে, রাষ্ট্র এরূপ একটি কার্যকর উপায় অবলম্বন করিয়া দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইতে পারে।

'রেশনিং' বা মাথাপিছু খাদ্যবরাদ্দের প্রথা (ভক্ত-সংবিভাগ) দ্বারা প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র কিরূপে দুর্ভিক্ষ-প্রতীকারের চেষ্টা করিত উহার বিশদ বর্ণনা বৌদ্ধ অবদানগুলিতে পাওয়া যায়। 'দিব্যাবদানে' বর্ণিত আছে—দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী হইলে প্রজাহিতৈষী রাজা কনকবর্ণ দুর্ভিক্ষের কবল হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য রাজ্যের লোকগণনা এবং খাদ্যসম্পদের মোট হিসাব করাইলেন। রাজা সমস্ত খাদ্যশস্য ক্রয় করিলেন এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলি হইতে আরও শস্য আমদানি করিয়া সঞ্চয়ের শস্যভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিলেন। এরূপে ব্যাপক শস্যসংগ্রহ-নীতি অবলম্বন করিবার

সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রত্যেক প্রজার মধ্যে সমভাবে নির্দিষ্ট খাদ্য-বরাদ্দের ভিত্তিতে খাদ্য-বিতরণের নিমিত্ত প্রতিগ্রামে, পল্লীতে, শহরে, নগরে সরকারী শস্য-ভাণ্ডার (কোষ্ঠাগার) স্থাপন করেন। রাজ্যের সমগ্র শাসনযন্ত্র এরূপ সততা ও আন্তরিকতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল যে প্রজাগণ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকালের সঞ্চিত খাদ্যশস্য নিঃশেষিত হওয়ায় রাষ্ট্রপরিচালিত নীতি ভাঙিয়া পড়ে। তখন রাজার দয়াদাক্ষিণ্য-বশতঃ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন হয়। রাজা নিজের সমগ্র খাদ্যশস্যভাগ বোধিসত্ত্বকে অর্পণ করিয়া সেইবার প্রজাদের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। কনকবর্ণের এই উপাখ্যানে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য ভারতের একজন শাসকের আন্তরিক অনুরাগ ও সহানুভূতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

'অবদানশতকে' আমরা বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টার উল্লেখ দেখিতে পাই। দুর্ভিক্ষের বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত নিজের ব্যবহারের জন্যে রাজকীয় ভাণ্ডারে রক্ষিত সমস্ত আহার্য ও পানীয় দ্রব্য দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাগণের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করিতে আদেশ দিলেন। রাজা ঘোষণা করিলেন যে তিনি প্রজাগণের সমপর্যায়ভুক্ত—প্রজাদের দুঃখ তাঁহার নিজের দুঃখ, তাঁহার নিজের আহার্যভাগ ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ প্রজাবর্গের প্রাপ্য। রাজ্যের লোকসংখ্যাগণনা এবং সঞ্চিত-শস্যভাণ্ডারের পরিমাণ-নির্ধারণের পর নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, প্রত্যেক প্রজার জন্য এক বরাদ্দ (ভাগ) এবং রাজার জন্য দুই বরাদ্দের ব্যবস্থা হইলে উপস্থিত অন্নকষ্টের হাত হইতে দেশবাসিগণ রক্ষা পাইতে পারে। লোকগণনার সময় ভুলক্রমে এক ব্যক্তি বাদ পড়িয়াছিল এবং সে যখন তাহার দাবি উপস্থিত করিল, তখন রাজা তাঁহার নিজস্ব অতিরিক্ত বরাদ্দ ছাড়িয়া দিয়া প্রজার সমপর্যায়ভুক্ত হইলেন।

উপরি-উক্ত দুইটি উপাখ্যানেই দুর্ভিক্ষপীড়িত ও ভীতিবিহ্বল প্রজাদের দুঃখ-অপনোদনের জন্য রাজ্যশাসকগণের আন্তরিক সহানুভূতি, অনুপম সহৃদয়তা ও দৃষ্টান্তস্থানীয় স্বার্থত্যাগের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শাসকবর্গের প্রত্যেকেই সততা, একনিষ্ঠা, প্রেম ও উদ্যমের সহিত দুর্ভিক্ষ-নিবারণের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের দুঃখনিবারণ রাজ্যসরকারের সর্বাগ্র দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য অবলম্বিত রাষ্ট্রনীতিকে সর্বাংশে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিয়াছিল।

গ্রন্থাদিতে বর্ণিত উপাখ্যান ছাড়াও আমরা দুই হাজার বৎসরের অধিক কাল পূর্বের ভারতে দুর্ভিক্ষ-প্রতীকার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে দুইটি শিলালেখের উল্লেখ করিতেছি—একটি তাম্র ও অপরটি প্রস্তর-ফলকের উপর খোদিত। আশ্চর্যের বিষয়, কৌটিল্যের দুর্ভিক্ষনীতি এবং বৌদ্ধ অবদান-সমূহে বর্ণিত শাসকগণের দুর্ভিক্ষনীতির সহিত এই দুইটি শিলালিপিতে উক্ত দুর্ভিক্ষ-নিবারণের উপায়-গুলির স্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাম্র-ফলকটি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার সোগৌরা নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফলকটির পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে খাদ্যাভাবের সময়ে ও আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় দুর্ভিক্ষ প্রতীকারের জন্য রাজ্যের শাসক নির্দেশ জারি করিয়াছেন। ফলকটি রাজ্যের প্রকাশ্যস্থানে শস্যভাণ্ডারের প্রাচীরগাত্রে প্রোথিত করা হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মী হরফে অনুশাসনলিপিটি লিখিত। শ্রাবস্তীর মন্ত্রি-পরিষদ্ কর্তৃক আদেশটি ঘোষিত হইয়াছিল এবং ইহাতে উষাগ্রাম বা বাস-গ্রামের শস্যভাণ্ডারগুলির উল্লেখ আছে। রাজার

আদেশের মর্মার্থ এই—শস্যভাণ্ডারগুলিতে সঞ্চিত খাদ্যশস্য কেবল অনাবৃষ্টির সময়ে খরচ করিতে হইবে, প্রাচুর্যের সময়ে খরচ করিতে পারিবে না। স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতে দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য রাজ্যসরকারগুলি যথাসময়ে খাদ্যশস্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিয়া সমভাবে সকলের মধ্যে বিতরণের দায়িত্বপালনে তৎপর ছিল।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর আর একটি প্রস্তরফলক উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার মহাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকার ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—ইহা স্পষ্ট-রূপে প্রতীত হয়, পুণ্ড্রনগর ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চল-গুলির অধিবাসিগণের দুর্ভিক্ষক্লেশ দূর করিবার জন্য তত্রত্য 'মহামাত্র'-শ্রেণীর কর্মচারিগণের উপর মৌর্যযুগের কোনও শাসক এক আদেশ জারি করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ প্রতীকারের জন্য দুইটি উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল (১) প্রথম উপায়—গ্রামনী বা গ্রামের নেতাকে সরকার হইতে বিনাসুদে ঋণ-দান। পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রকে এই আদেশ পালন করিতে বলা হইয়াছে। (২) দ্বিতীয় উপায়—সরকারী শস্যভাণ্ডার হইতে ধান্য-বিতরণ। সরকার ইচ্ছা করেন, এই দুইটি উপায় অবলম্বন করিলে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের ক্লেশ অপনোদিত হইবে। সরকারী আদেশে ইহাও বলা হইয়াছিল—সম্পদ্ ও প্রাচুর্যের দিন ফিরিয়া আসিলে অধিবাসিগণকে সরকারী ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং খাদ্যশস্য সরকারী শস্যভাণ্ডারে ফেরত দিতে হইবে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকারের মতে নদীতীরবর্তী পুণ্ড্রনগর বন্যার জলে ভাসিয়া যাওয়ায় নগরবাসিগণের গৃহগুলি বিনষ্ট হয় এবং দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এই হেতু জনগণের পুনর্বাসনের জন্য সরকারী ঋণদান ও খাদ্যবিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন ভারতের সরকারী দুর্ভিক্ষ-প্রতীকার-নীতি সুপরিকল্পিত ছিল এবং নিপুণতার সহিত পরিচালিত হইত। দুর্ভিক্ষ-নীতি-পরিচালনে শাসকবর্গ ও সর্বশ্রেণীর কর্মচারি-গণের সহৃদয়তা, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা ও কর্মকুশলতা যথার্থই প্রশংসনীয় ছিল। দুই হাজার বৎসরের অধিককাল পূর্বে ভারতে রাজ্যের বিভিন্ন-স্তরের কর্মচারিগণের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজা-নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ ও সহযোগিতা এবং শাসক-প্রধানদের পুরোবর্তী হইয়া প্রজাদের ক্লেশনিবারণের জন্য নিরলস চেষ্টা ও উদ্যম বর্তমান ভারতের কর্মী ও কর্মচারিগণকে দেশের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের অভাব ও তজ্জনিত দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে উদ্বুদ্ধ করুক।

জ্যোতির জোয়ার

শ্রীসুধীর গুপ্ত

জ্যোতির সমুদ্র হ'তে এসেছে জোয়ার,
উথলিয়া—উচ্ছলিয়া—উল্লসিয়া যায়;
তরঙ্গ ঢলিয়া পড়ে তরঙ্গের গায়,
সঙ্গীত-মুখর হ'ল মোর চারিধার।
নামিল আলোর ঢল্ রুক্ষ মৃত্তিকার
জীর্ণ-দীর্ণ সৈকতের সূক্ষ্ম বালুকায়;
পিপাসা পূরিয়া গেল এক লহমায়;
জ্যোতিতে ভরিয়া গেল পারাবার-পার।

পরিচিত পরিবেশ নিরানন্দকর
আনন্দ-সুন্দর হ'ল রহস্য-নিবিড়;
খেলিছে—দুলিছে ওই জ্যোতির সাগর—
হিল্লোলে হারায় সত্তা মৃত্তিকার তীর,
ডুবে যায়—গ'লে যায়। সীমার ভিতর
এ কোন্ অচিন্ত্য লীলা চলিছে জ্যোতির!

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কথা

শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ যে ক'টি সন্তানের হাত ধ'রে বাংলার অঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিল সেদিন কে জানত যে তারা শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার ইতিহাসে চিহ্নিত প্রাণ। শুধুই কি শ্রীরামকৃষ্ণেরই অন্তরঙ্গ তাঁরা? সমগ্র বিশ্বের ব্যথাতুর মানবতা, যথার্থ উন্নতিকামী হৃদয়, আজও কি তাদের ভাবময় জীবনের অভাব বোধ করে না?

অন্তরের প্রেরণাই তত্ত্বজিজ্ঞাসু নরেন্দ্রকে এনেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে। নবীন সেদিন যেন মাথা নত করেছিল প্রাচীনের কাছে। তৎকালীন নবীনদের প্রতিনিধি নাস্তিক্যবাদের তরঙ্গ-দোলায় দোলায়িত হ'য়ে, মানুষ যে সত্যে চির প্রতিষ্ঠিত সেই সত্যকে পুরোপুরি না পেয়ে, উদ্বেলিত হ'য়ে ছুটে এসেছিল প্রাচীনের প্রশান্ত আশ্রয়ে, সন্দেহ-আকুলিত বিশ্বে নিজের স্বরূপ জেনে নিতে। দক্ষিণেশ্বরের গবেষণাগারে এমনি ক'রে শুধু নরেন্দ্রই আসেননি এসেছিলেন শরৎ শশী এবং আরও অনেকে।

কুড়ি বছরের যুবক শশীও অধ্যাত্মতৃষ্ণা নিবৃত্তির আশা নিয়ে আসেন। গুরু সেটি বুঝেছিলেন, তাই তার পিপাসা মিটিয়েছিলেন—তার প্রাণঢালা সেবা গ্রহণ ক'রে।

শশী প্রায় তিন বছর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা ও সঙ্গ করার সুযোগ পান। এই স্বল্পকালের মধুর স্মৃতি, শিক্ষা ও দীক্ষা তাঁকে সারাটি জীবন শ্রীরামকৃষ্ণময় ক'রে তুলেছিল। কায়, মন ও বাক্যের ত্রি-সাধনায় তিনি জানতেন—দেহ দিয়ে তাঁর সেবা করবো, মন দিয়ে তাঁকে মনন করবো, বাক্য দিয়ে কেবল তাঁর কথাই কইব, তাঁর প্রসঙ্গ করবো। 'তুমি গুরু তুমিই আমার সর্বস্ব, তোমার সুখে আমার সুখ, তোমার প্রদর্শিত পথই আমার পথ, আমার নিজের বলতে যদি কিছু থাকে সে কেবল তুমিই আছ'—এই ছিল তাঁর ভাব। এ ভাবের সাথী ছিল নিষ্ঠা; আর তা যেন মূর্তি ধরেছিল রামকৃষ্ণানন্দ-রূপে। জীবনে কোন বাধাই তাঁকে টলাতে পারে নি, কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে টানতে পারে নি। মঠজীবনের গুরুভাইরা চললেন সবাই তীর্থপর্যটনে, তিনি রইলেন মঠে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের পাশে।

এই নিষ্ঠার আর একটি দিক আছে। গুরুকে ভালবাসি; তাই গুরুর প্রিয় যারা তাদেরও ভালবাসি, মানি ঠিক গুরুর মতই, তখন নিজেকে বড় করি না। গুরুভায়ের আদেশ পালন করি, হ'লেই বা সে গুরুভাই সমবয়সী। গুরুর সঙ্গে যুক্ত যা, তাকে ভালবাসা মানে তো গুরুকেই ভালবাসা, আদর্শকে ভালবাসা। তাই স্বামীজী যখন তাঁকে মাদ্রাজে যেতে বললেন, অমনি অত সাধের, অত প্রিয় ঠাকুর সেবা ছেড়ে চলে গেলেন দাক্ষিণাত্যে। এ যে গুরুরই অদেশ!

তখনকার মাদ্রাজ এখনকার মত ছিল না। তাঁকে পরিবেশ তৈরী ক'রে নিতে হ'ল। সে দেশের ভাষা জানা নেই, বেশী কেউ চেনা নেই, কাজ করার উপযোগী সুযোগ সুবিধা নেই, অভাবের অভাব নেই। যা হ'লে বেশ মনের মত হয়, তার কিছুই নেই; আছে নিষ্ঠা, আছে বিশ্বাস; আছে ধর্মব্যাখ্যার, বই লেখার ও বক্তৃতা করার ক্ষমতা; আছে ব্রত উদযাপন করার মনোবল, আছে সকলের জন্য কল্যাণ-চিন্তা। তাই কারুর কাছে মুখ ফুটে কোন দিন কিছুই চান নি; শুধু নির্ভর করেছিলেন ঠাকুরের ওপর। গুরু-ভক্তিই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল। ভাবতেন ঠাকুর ঘরে রয়েছেন শ্রীপ্রভু, তিনিই কর্তা, আমি কিছু নই; চালক তিনি।

তিনিই আমার জাগ্রত জীবন্ত দেবতা; জল পড়লে তাই ঠাকুরের মাথায় ছাতা ধরছেন, গরম হ'লে হাওয়া করছেন "প্রাণনাথ, জীবনবল্লভ" বলে আকুল আকৃতি জানাচ্ছেন; ঠাকুরকে নিবেদন না ক'রে কোন কিছুই গ্রহণ করছেন না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মাদ্রাজে এলেন,—রামকৃষ্ণ-সংঘে তিনি "রাজা মহারাজ"। তাই তাঁর সঙ্গে রাজার মত ব্যবহার। সর্বদা তাঁর তুষ্টি-সাধন প্রচেষ্টা নিজেকে তাঁরই অধীন ভেবে।

শ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণ ভারতের তীর্থপর্যটনে গেলে তাঁর যাবতীয় বন্দোবস্ত শশী মহারাজ নিজেই করলেন—তাঁকে সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানে পূজা ও স্তবস্তুতি ক'রে আশীর্বাদলাভ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্তানদের প্রত্যেকের এক এক দিকে বিশেষত্ব। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মধ্যে বিশেষত্ব কি—যা আমরা নিতে পারি? ঠাকুর যেন তাঁকে সাধক জীবনের প্রথম-অবস্থার আদর্শরূপে গঠন ক'রে গেছেন। সাধনার আরম্ভকালে সাধকের কেমন ক'রে চলতে হয়, তার প্রতিটি খুঁটিনাটি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনে পরিস্ফুট, যা আমাদের অনুকরণীয়, অনুসরণীয়।

সাধক জীবনের প্রথমেই চাই গুরু-সেবা, গুরু-ভক্তি, নিষ্ঠা, ধ্যান-ধারণা; প্রথম প্রেরণাকে পাকা করার জন্যেই কর্মের যোগ। আমাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জন ছাড়া সকলেরই প্রথম প্রয়োজন হয় অনুষ্ঠানমূলক সাধনার। ভাব প্রভৃতি ত পরের কথা, মুষ্টিমেয় কয়েক জনেরই জন্য।

শশী মহারাজের জীবনে দেখতে পাই ভাবময় হ'য়ে পূজা আরাত্রিক করা; শুধু আরাত্রিকাদি কেন—সব কাজই ভাবে তন্ময় হ'য়ে করছেন। ভাব ও অনুষ্ঠানের দ্বি-ধারা তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছিল।

সচরাচর তিন শ্রেণীর সেবক দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর যারা—তারা সেব্যের মন বুঝেই সেবা করে, তাদের কিছু বলতে হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর যারা—তাদের একবার ব'লে দিতে হয় আর কখনও ভুল হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর যারা তাদের বার বার বলতে হয়, আর তারা বার বার ভুলে যায়। শশী মহারাজ নিশ্চয়ই প্রথম স্তরের সেবক ছিলেন, কেননা তিনি সেবা করতেন মনের ভাব বুঝে।

কাশীপুরে সবাই সাধন ভজনে মগ্ন, শশী মহারাজ, কেবল সেবা ক'রে চলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের। তিনি কিছু চান না। দাস্যভাবের প্রতিমূর্তি শ্রীহনুমানের মতো ইষ্ট-সেবার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত।

'মন্নাথ যে জগন্নাথ,' 'মদ্‌গুরু যে জগদ্‌গুরু'—সেইটি তিনি তাঁর 'গুরু ও ঈশ্বর' শীর্ষক যুক্তিপূর্ণ একটি প্রবন্ধে দেখিয়ে গেছেন। সে লেখার মর্মকথা হ'ল :—

ঈশ্বর অসীম। অসীমতা সম্পূর্ণরূপে একক। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—একজন ব্যতীত দু'জন ঈশ্বর হ'তে পারেন না, কারণ দুই 'অসীম' স্ববিরোধী। জীবাত্মা সসীম; তাই ঈশ্বরকে জানা ও তিনি কেমন মুখে বলা—তার পক্ষে অসম্ভব, কারণ সসীম কখনও অসীমকে জানতে পারে না। সসীম মন অসীম মনের গভীরতা কত—জানেনা বলেই সৃষ্ট জীবের পক্ষে অসীমের ক্রিয়াকলাপ জানা অসম্ভব।

সসীম, পরিমাণে যত বড়ই হোক না কেন অসীমের তুলনায় তা অনন্তগুণে ক্ষুদ্র বা শূন্যবৎ, কেননা অসীম সসীমের চেয়ে অনন্তগুণে বড়। তাই সৃষ্ট পদার্থ ঈশ্বরের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে নগণ্য, আর তাই তারা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সৃষ্টি স্বাধীন নয় ব'লে, মন সীমাবদ্ধ; তাই কেমন ক'রে নিজেদের চালাতে হয় তা জানে না ব'লে তাদের ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হওয়া উচিত; ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ প্রভু; জীব যদি মৃত্যুর হাত থেকে, অগণন দুঃখের হাত থেকে বাঁচতে চায় তাহ'লে তাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হ'তে হয়; যখন তারা ঈশ্বরকে হাত ধ'রে নিয়ে যেতে দেয়, যখন নিজের বুদ্ধিতে

চলে না তখনই তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্ঞানের বিকাশ হয়।

কিন্তু প্রভুর মনকে কেমন ক'রে জানা যাবে? সৃষ্ট জীবের তো তা জানার ক্ষমতা নেই। অনন্ত প্রেমময় ভগবান তাই অংশতঃ নিজেকে প্রকাশ করেছেন বেদের মধ্যে, জগতের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে—বাইবেল, কোরান, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতির মধ্যে। বেদ প্রভৃতিকে মানাই ধর্মকে মানা। ঈশ্বরের অনুগত যে, তাকে তাই ধার্মিক বলে।

মানুষ যখন শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে, অসৎ ব্যবহার করে তখন ঈশ্বরকে—নিজেকেই নিজের ব্যাখ্যাতা হ'তে হয়, তখন ধর্মস্থাপনের জন্যে তাঁকে অবতীর্ণ হ'তে হয়।

এই অবতারেরাই গুরু বা জগতের প্রকৃত শিক্ষক; এই সব দেহধারী ঈশ্বরকে মেনে বা পূজো ক'রে আমরা ঈশ্বরেরই আজ্ঞা পালন ও পূজো ক'রে থাকি। এই সব গুরুই শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন। তাই একমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, আর কেউ নয়। ভগবান অবতীর্ণ হ'লে মানুষের মতই আচার ব্যবহার করেন এবং তাঁর আগমনে অধর্মের নাশ ও ধর্মের রক্ষণ হয়। তিনি আবার যখন স্বধামে গমন করেন তখন তাঁর শক্তি শিষ্যদের দিয়ে যান। তাঁর প্রদত্ত শক্তির বলে এঁরাও মানবকুলের গুরু হন। এই গুরুশক্তি আবার শিষ্য থেকে প্রশিষ্যে গমন ক'রে লোককল্যাণ করতে থাকে; কিন্তু কালক্রমে এই শক্তি যখন খুব হীনবল হ'য়ে যায় এবং তৎকালীন ক্রমবর্ধমান অধর্মশক্তির ওপর প্রভুত্ব করতে পারে না, তখনই আবার ঈশ্বর নেমে আসেন তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে তাঁর মহিমা প্রতিষ্ঠাকল্পে।

হিন্দুরা গুরুবাদ মানে। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের একজন গুরু থাকেন। যখন বিভিন্ন বংশের কুল-গুরুগণ স্বধর্ম-ভ্রষ্ট হয়ে শিষ্যদের বিশ্বাস হারায় তখন জগতে আবার অবতারের আসার প্রয়োজন হয়। আজ এই যুক্তিবাদের যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতে চান না এই তত্ত্ব। অবনত অবস্থার তথাকথিত গুরুদের যখন তাঁরা ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখেন—তখন ধর্মের ওপর তাঁদের আর বিশ্বাস থাকে না। সেই জন্যেই দেখি শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে ধর্মের প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা, শেষ পর্যন্ত নাস্তিকতা। এরা জগৎ থেকে ধর্মকে মুছে ফেলতে চায়। বলে, ধর্ম কতকগুলো কুসংস্কারের সমষ্টিমাত্র, যত শীঘ্র ধর্ম নষ্ট হ'য়ে যায়—ততই মানব সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

ভারতে যে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা দেখা যায়—এর মূলে রয়েছে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে মানুষের মনে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠানাদিকে কুসংস্কার ব'লে ভাবা এবং এই সব সংস্কারমুক্ত একটি ধর্মের চাহিদা। কুলগুরুরা শিক্ষিতদের আস্থা হারিয়েছিলেন, কেবল কয়েকজন শিক্ষিত, এবং অধিকাংশ অশিক্ষিত ব্যক্তি এই প্রকার গুরুর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। এদের ধারণা—'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়'। গুরু কি করেন তা আমরা দেখব না, তাঁর মন্ত্রকে আমরা চাই—এই মন্ত্র স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে ব'লে তার শক্তি অসীম। এই রকম লোকের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণতঃ কিন্তু সকলে চায় গুরুর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব—যার ছায়াতলে তারা আশ্রয় নেবে। সে রকম গুরুর অভাব আছে ব'লেই তারা ধর্মবিহীন জীবন যাপন করে এবং ঈশ্বরের পূজার পরিবর্তে নিজেদেরই পূজো ক'রে থাকে।

যখন এই ভাব প্রবল হ'ল—"এই জীবনই সব। পরকাল ব'লে কিছু নেই, এমন ঈশ্বর কেউ নেই যার কাছে আমাদের নিজেদের কর্মের জন্যে দায়ী হ'তে হবে। যত পার খাও—দাও, আনন্দ কর। অপরের কাছ থেকে ভালবাসা পেতে হ'লে তার সঙ্গেও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। সমাজই আমাদের

ভগবান, কেননা সমাজ থেকেই আমরা সাহায্য পাই, কোন অদৃশ্য ঈশ্বর আমদের সাহায্য করেন না। অদৃশ্য সত্তাকে বিশ্বাস করা নিছক বোকামি, এবং কুসংস্কার। ও সব আমরা চাই না।" তখন নিজেরই প্রতিজ্ঞা-অনুযায়ী তাঁকে আসতে হ'ল; এবং এইবার তিনি এলেন সব জাতি ও সব ধর্মের হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। কাল তাঁকে চেয়েছিল এবং সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন্‌টা গ্রাহ্য, কোন্‌টা ত্যাজ্য—না জেনে তাঁরই বহু সন্তান যখন তাঁকে আকুল আকৃতি জানিয়েছিল এই ধূলির ধরণীতে পদার্পণের জন্যে, তখন তিনি সে ডাক অবহেলা করতে পারেন নি।

[৯ই শ্রাবণ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জন্মতিথি]

স্বর্গাশ্রমে—সন্তবাণী

'আনন্দ'

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা—হৃষীকেশের ওপারে স্বর্গাশ্রমে গঙ্গাতীরে সাধুদের কুটিয়া দেখিব; দেখিব সংসারের কোলাহল হইতে দূরে—সমাজ ও সভ্যতাকে পিছনে ফেলিয়া, হিমালয়ের পাদদেশে খরস্রোতা শান্তি-শীতলা ভাগীরথীতীরে বিরক্ত-মহাত্মাগণ কিভাবে জীবন কাটান,—কিভাবে বিবেকবৈরাগ্য অবলম্বনে শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি অর্জন করিয়া মুমুক্ষুতা সহায়ে তাঁহারা জ্ঞানের পথে জীবন্মুক্তির প্রতি অগ্রসর হন।

একদিন ইচ্ছা করিয়াই একলা স্বর্গাশ্রমের পরিত্যক্ত কুটিয়াগুলি দেখিয়া আসিলাম। গঙ্গার তীরে কুটিয়ার সারি।

একটি একটি করিয়া কত কুটিয়ায় গেলাম, ভাবিতে লাগিলাম—কত বৈরাগ্য, কত অনুরাগ লইয়া সাধক এখানে আসিয়াছিলেন; নিত্যগঙ্গাস্নান, ছত্রে ভিক্ষান্ন-গ্রহণ, সাধ্যমত সাধনভজন, কতদিন করিয়াছিলেন বা করিতে পারিয়াছিলেন—কে তাহা জানে? হয়তো ব্যাধি আসিয়া কাহারও দেহকে আক্রমণ করিয়াছিল, বাসনা আসিয়া কাহারও বা মনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। কেহ বা ফিরিয়া গিয়াছে। কেহ বা জীবনপণ করিয়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাধনপথে অচল অটল থাকিয়া এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন! বন্ধু-বিহীন স্থানে সাধক নিজেকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য দেওয়ালে গেরি মাটির টুকরা দিয়া লিখিয়াছিলেন:

শ্বাসে শ্বাসে নাম রটো, বৃথা শ্বাস মত খউ।
কো জানে কৌন শ্বাস, আয়ন্ হো কি নেহি আউ॥

কোন সাধক হয়ত সারাজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন শ্রীতুলসীদাসের একটিমাত্র দোঁহা। তাহাতেই তাঁহার অন্তর বাহির আলোয় আলোময় হইয়া গিয়াছে। প্রাচীরগাত্র হইতে সেই অপরূপ দোঁহাটি আমার হৃদয়ে উৎকীর্ণ করিয়া আনিলাম—

রামনাম মণি দীপ ধরু, জীহ দেহলী দ্বার।
তুলসী জো চাহসি, ভীতর বাহির উজিয়ার॥

হে তুলসী—যদি তোমার ভিতর বাহির দুই-ই এক-সঙ্গে উজ্জ্বল করিতে চাও, তবে দেহরূপ ঘরের দ্বারদেশে চৌকাঠে—জিহ্বায়—'রামনাম' রূপ মণি দীপ ধারণ কর।

আর একটি কুটিয়ায় দেখিলাম—একটি বাঙালী সাধক তাহার জীবনের শেষ অনুভূতি-বাণী জগৎকে দিয়া জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছে। সেই বাণী আজও জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে ও বলিতেছে:

দেহদৃষ্টি যত হয়, ততই মরণ ভয়।
আত্মদৃষ্টি যত হয়, ততই অমৃতময়॥

রাত্রির ঘন অন্ধকারে কুটিয়ায় বসিয়া এই সকল অজ্ঞাত সাধকদের জীবন ও সাধনা অনুধ্যান করিতে লাগিলাম।

কুটির-শিল্পে সাবান

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

ব্যাপক অর্থে "সাবান"

'সাবান' সম্বন্ধে অনেকেরই অস্ফুট ধারণা আছে, সঠিক ধারণা নাই। কোন কোন মহলে আবার ইহা অশুচি পর্যায়ভুক্ত! ভ্রান্তি-নিরসন-কল্পে প্রথমেই সাবানের সংজ্ঞা-প্রকরণ আবশ্যক।

উদ্ভিজ্জ ও জান্তব তৈল ও চর্বির সহিত ক্ষার মিশ্রিত করিলে 'সাবান' উৎপন্ন হয়। নারিকেল, বাদাম, তিল, তিসি, মহুয়া, রেড়ি, তুলাবীজ, সরিষা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তৈল এবং তিমি প্রভৃতি যাবতীয় মৎস্যের তৈল—সংক্ষেপে আমরা যে সকল তৈল বা চর্বির সহিত সচরাচর পরিচিত—প্রত্যেকে বিশেষ অবস্থা-নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট মাত্রায় ক্ষার-সংযোগে 'সাবান' উৎপন্ন করে। তবে কোন তৈল হইতে উৎপন্ন সাবান 'নরম', পক্ষান্তরে অপরাপর চর্বিজাত সাবান 'শক্ত'—ইহাই পার্থক্য। বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য সরিষার তৈল হইতেও সুচারুরূপে সাবান তৈয়ারি করা যায়; তবে ইহার মূল্য অধিক হওয়ায় ইহা হইতে সাবান প্রস্তুত হয় না। উপর্যুক্ত তৈল বা চর্বিসমূহ আর কিছুই নহে—কতকগুলি অম্ল (এইগুলিকে মেদাম্ল বা Fatty Acids বলা হয়) ও গ্লিসারিণের সমাহার। ঐ সকল মেদাম্ল সোডিয়ম বা পটাসিয়ম নামক মৌলিক পদার্থের ক্ষার সংমিশ্রণের ফলে বিভিন্ন মেদাম্লের লবণ প্রস্তুত করে। বিজ্ঞানে এই লবণগুলির ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত নাম—'সাবান'! প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, খনিজ তৈল—পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি হইতে সাবান প্রস্তুত করা যায় না। খনিজ তৈল সমূহের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

ব্যাপারটি একটু প্রাঞ্জল হওয়া প্রয়োজন। এক্ষণে লবণগুলি কি? লবণ বলিতে আমরা নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যটিকেই বুঝি—কিন্তু রসায়নে 'লবণ' বলিতে শুধু ইহাকেই বুঝায় না। বহুসংখ্যক যৌগিক পদার্থকে 'লবণ'রূপে গণ্য করা হয়; তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত 'নুন'! ইহা নির্দিষ্ট মাত্রায় সোডিয়ম (ক্ষার-জনক) ও ক্লোরিন (অম্ল-জনক) মৌলিক পদার্থদ্বয়ের রাসায়নিক মিলনের ফল; তুল্যভাবে সাবানও সোডিয়ম বা পটাসিয়ম ক্ষার এবং মেদাম্লের সংযোগ-জাত। ক্ষার ও অম্লের সংযোগে গঠিত—লবণের সহিত সাবানের ইহাই সাদৃশ্য।

দুইটি সাধারণ ক্ষার—কষ্টিক সোডা ও কষ্টিক পটাস্; ইহারাই যথাক্রমে সোডিয়ম ও পটাসিয়ম সরবরাহ করে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ক্ষারাত্মক পদার্থও রহিয়াছে, সেগুলি হইতেও সাবান তৈয়ারী হয়—তবে সাধারণ নহে, বিশেষ পর্যায়ের সাবান। কষ্টিক সোডা বা পটাস্-জাত সাবানকে যেমন সোডিয়ম বা পটাসিয়ম-সাবান বলা হয়, তদ্রূপ ক্যালসিয়ম সাবান (জল নিরোধক প্রলেপ-রূপে ব্যবহৃত), বেরিয়ম সাবান, এলুমিনিয়ম সাবান (মুদ্রণের কালিতে ও জল-দুর্ভেদ্য আস্তরণ হিসাবে ব্যবহৃত), ম্যাগনেসিয়ম সাবান, দস্তা সাবান (মলম তৈয়ারিতে লাগে), তাম্র সাবান (পাটসংরক্ষণে ও কীটঘ্নরূপে মূল্যবান্) ও অন্যান্য বহু সাবানের প্রচলন হইয়াছে। তবে সচরাচর সাবানের সহিত ইহাদের এক প্রধান প্রভেদ আছে। সাধারণ সাবানের ন্যায় ইহারা জলে দ্রব হয় না। এই সব সাবানের প্রচলিত নাম 'শিল্প সাবান'। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্তমানে 'সাবান' শব্দের অর্থ ব্যাপক, মাত্র গাত্র বা বস্ত্র-পরিষ্কারক পদার্থ হিসাবেই তাহা সীমাবদ্ধ নহে;

যদিও সাধারণতঃ সাবান অর্থে তাহাই বুঝায়, এবং আমাদের আলোচনা এই প্রচলিত অর্থে আমরা নিবদ্ধ রাখিব।

যে-সকল সাবানের সচরাচর সম্মুখীন হওয়া যায়, তাহারা নিম্নোক্ত যে-কোন পর্যায়ভুক্ত হইবে—(১) বস্ত্রাদি পরিষ্কারক বা কাপড়-কাচা, (২) প্রসাধনী বা গায়ে মাখা তৎসহ ক্ষৌরকর্মে ব্যবহৃত, (৩) সমুদ্র-জলে ব্যবহারোপযোগী, (৪) বয়নশিল্পে প্রযুক্ত এবং (৫) ঔষধার্থে ব্যবহৃত। এইগুলি আবার কঠিন, তরল বা নরম অবস্থায় প্রাপ্য।

ভারতে সাবান-শিল্পের সূচনা

অতঃপর বহুভাবে শাখায়িত সাবান-শিল্পের অভ্যুত্থান এ দেশে কিরূপে ও কখন হইল—এই কৌতূহল নিবৃত্ত হওয়া দরকার। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশব্যাপী স্বদেশী-আন্দোলনের যে বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, যখন "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় করে নে রে ভাই" এইরূপ নির্দেশ আসিল, সে দিনের সেই দেশমাতৃকার উদ্দেশে নেতৃবৃন্দের উদার আহ্বানে স্বদেশ-হিতৈষণার যে অমোঘ বাণী শোনা গিয়াছিল—তাহারই প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব শুধু স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের উপরেই পড়ে নাই; উপরন্তু বঙ্গের সেই বিদেশী পণ্য-বর্জন আন্দোলনে যে কয়েকটি শিল্পের বীজ উপ্ত হয়, ভাবীকালে তাহা হইতেই বিরাট মহীরুহের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাই বঙ্গদেশে স্বদেশী বস্ত্র, স্বদেশী সাবান ও স্বদেশী দিয়াশলাই শিল্পের আদি কথা। তখন ইহা কুটিরশিল্প; ভারী ভারী যন্ত্র সহযোগে বিজ্ঞানসম্মতরূপে এ দেশে সাবান তৈয়ারির প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। উক্তোক্তরূপে কলিকাতার নিকটবর্তী বাগমারী অঞ্চলেই সেই সময় ছোট ছোট কারখানা স্থাপিত হয় এবং কাপড়-কাচা সাবান তৈয়ারিতে এই অঞ্চল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এখনও এই স্থানে বহু কারখানা কুটিরশিল্পরূপে বিদ্যমান। ক্রমে এই কুটিরশিল্প একদিকে যেমন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি সুদূর লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রসারলাভ করে।

এ দেশে সাবান উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ

সাবান প্রস্তুতের দুইটি প্রধান প্রণালী—(১) বাষ্প-সংযোগে এবং (২) অগ্নিসহযোগে। এই সব ক্ষুদ্রাকার কারখানায় কড়াই-এর তলদেশে অগ্নি-সংযোগ করিয়া সাবান প্রস্তুত হয় বলিয়া এই পদ্ধতি "কড়াই"-পদ্ধতি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। উপযুক্ত ক্ষারের অভাবে এই সব কারখানায় প্রায়শঃ স্বভাবজাত সাজিমাটি ও চুন ব্যবহৃত হয়। কড়াই-পদ্ধতিতে লিপ্ত অসংগঠিত কুটিরশিল্পের আকারে কারখানার সংখ্যা এবং তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। এতদতিরিক্ত সুসংগঠিত পন্থায় প্রথমোক্ত প্রণালীর কয়েকটি কারখানাও বঙ্গে আছে। ভারতের মোট সাবান উৎপাদনের এক বিরাট অংশ বঙ্গেরই অবদান। উদাহরণস্বরূপ ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে ১,৩০,০০০ টন সাবান প্রস্তুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের ও বঙ্গের উৎপাদন পরিমাণ যথাক্রমে ৫৫,০০০ ও ৪১,০০০ টন। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ফলেও বঙ্গ তথা ভারতের সাবান শিল্প সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইওরোপের সর্বত্রই খাদ্যের ন্যায় সাবানও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ভারতে এই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা প্রয়োজন হয় নাই।

দেশে সাবান উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিদেশ হইতে আমদানি ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। সে বেশী দিন পূর্বের কথা নহে—যখন দেশকে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী আমদানির উপর নির্ভর করিতে হইত। ১৯৪৯ খৃঃ প্রথম সাতমাসে মোট ১,০৫৭ এবং ১৯৪৮ খৃঃ মোট ১৮,৩০৫ টন সাবান

আমদানি হয়; ঐ বৎসর প্রথম নয় মাসে ভারতের সাবান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯০,২৩৬ টন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের কথা উল্লেখ করা যায়—তখন ১৬,৩০০ টনে দাঁড়ায়। আর ১৯৩৯-৪০খৃঃ আমদানি আরও অধোগতি প্রাপ্ত হয়—মাত্র ১,৬৬০ টন। পরে অবশ্য কাঁচামালের অবস্থার অবনতি হওয়ায় আমদানি কিছু বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে মোট সাবান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮০,০০০ ও কিঞ্চিন্ন্যূন ১,০০,০০০ টন।

দেশে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, তেমনি ভারত মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে সাবান রপ্তানি আরম্ভের সুযোগ পাইল।

সাবানের কাঁচামাল

উদ্ভিজ্জ তৈল উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান সর্বাগ্রে। কিন্তু প্রাণিজাত চর্বির (যেমন ভেড়া, শূকর, প্রভৃতি) এদেশে নিতান্তই অভাব—সেজন্য মুখ্যতঃ অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়। সাবান তৈয়ারি কেবল মাত্র একটি তেল বা চর্বির দ্বারা করা হয় না—কয়েকটি চর্বির সংমিশ্রণে সাবান প্রস্তুত করা হয়। সেই হিসাবে উত্তম সাবান প্রস্তুতের জন্য প্রাণিজাত চর্বি অপরিহার্য। অবশ্য বাংলাদেশেই প্রাণিজাত চর্বি সাবান-প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়; ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এই শ্রেণীর চর্বি অশুচি ও অস্পৃশ্য গণ্য হওয়ায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না।

জান্তব চর্বি ব্যবহৃত না হইলে, তাহার পরিবর্তে বনস্পতি (বা Hydrogenated oil) এবং মহুয়া তৈল দ্বারা সাবান প্রস্তুত এদেশে প্রচলিত আছে; পরিতাপের বিষয়, তাহাতে প্রাণিজাত চর্বির মতো সুফল লাভ হয় না।

ভারতীয় বনস্পতি-শিল্পের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নহে—মাত্র ত্রিশ বৎসরের পূর্বেও ইহা প্রয়োজনীয় শিল্প হিসাবে নগণ্য ছিল, বর্তমানে ইহা ভারতের একটি প্রধান শিল্প এবং প্রায় অর্ধশত কারখানা সম্মিলিতভাবে উৎপাদন-রত। মূল্য লাভজনক, বিভিন্ন পর্যায়ের গলন-বিন্দু সমন্বিত, গন্ধহীন ও সাদা এই জিনিসটি অবশ্য উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজাত তৈল বা চর্বি অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী ও পচন-নিরোধক।

সাবানের অপর প্রয়োজনীয় উপাদান নারিকেল-তৈল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে—যেমন সুন্দরবনে, প্রচুর নারিকেল জন্মিলেও আহার্যরূপে ব্যবহারের ফলে তৈল-নিষ্কাশনের জন্য অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়। কেরালায় ও ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই নারিকেল হইতে অধিক পরিমাণ তৈল নিষ্কাশিত হয়।

সাবান প্রস্তুতকালে তৈল বা চর্বির পরেই প্রয়োজন ক্ষারের, বিশেষতঃ কষ্টিক সোডার। ভারতে বর্তমানে প্রায় ৭২,০০০ টন পরিমাণ ইহার চাহিদা। বঙ্গে রিষড়া অঞ্চলে কষ্টিক সোডা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত হয়; তবে কয়েকটি সুবৃহৎ কাগজের কলেও আত্ম-স্বচ্ছলতার জন্য কষ্টিক সোডা উৎপাদন করা হয়। ভারতীয় উৎপাদনের পরিমাণ—উপর্যুক্ত চাহিদার অর্ধেক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম। সুতরাং চাহিদার অবশিষ্টাংশ বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। এতদতিরিক্ত গুঁড়া সোডারও (বা Soda Ash) প্রয়োজন হয়।

প্রসাধনী সাবানের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য গন্ধবহ তৈল (বা Essential oils). বর্তমানে ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্যের অধিকাংশই কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্য। তথাপি গোলাপ নির্যাস, খস্, চম্পক, গন্ধরাজ শ্রেণীর গন্ধ ও বঙ্গের কেওড়া চিরকাল সকলের আদরণীয় হইয়া থাকিবে। দক্ষিণ ভারতে চন্দনাদি গন্ধবহ তৈলবৃক্ষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী।

সাবানের জন্য আরও অনেক শ্রেণীর জিনিসের প্রয়োজন হয়—তবে বিশেষ বিশেষ প্রকারের সাবানের নিমিত্ত। সাবানের সহিত প্রয়োজন-মত

সোডিয়ম-সিলিকেট, সোপ-ষ্টোন, লবণ, গন্ধক, কার্বলিক এসিড প্রভৃতি সংযুক্ত করা সময় সময় প্রয়োজন হইয়া পড়ে। স্বচ্ছ সাবানের জন্য সুরাসার (বা Alcohol) অতি প্রয়োজনীয়।

সাবান-কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত স্থান

সাবানের মুখ্য কাঁচামাল—তৈল, চর্বি ও ক্ষার, সেজন্য সাবান-কারখানা স্থাপন করিতে হইলে এই সকল কাঁচামালের সান্নিধ্য প্রয়োজন; নচেৎ পরিবহন সম্পর্কিত প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। জলপথ বা রেলপথের নিকটে স্থান নির্বাচিত হইলে কাঁচামাল আনয়নের একদিকে যেমন কোন চিন্তা থাকে না, অন্যদিকে পণ্যদ্রব্য বাজারে পাঠাইবারও কোন অসুবিধা হয় না। তবে স্থানীয় বাজারের জন্য উৎপন্ন সাবান মোটর লরী বা ঐরূপ যানেই প্রেরিত হইতে পারে।

সাবান-শিল্পের উন্নতিবিধানার্থে কয়েকটি কথা

সাবান-উৎপাদনের পরিমাণ, অল্প বা বেশি, যাহাই হউক না কেন, সাবান-প্রস্তুত-প্রণালী বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হওয়া উচিত। অযৌক্তিক ও নিরর্থকভাবে অনভিজ্ঞ কারিগরদের দ্বারা প্রস্তুত সাবান অধিকাংশ সময়েই যে শুধু নিকৃষ্ট শ্রেণীরই হয়—তাহা নহে, পরন্তু এরূপভাবে প্রস্তুত সাবানের মানেরও (Standard) কোন স্থিরতা থাকে না।

দেশের খাদ্য-সংরক্ষণের সহিত সামঞ্জস্য বিধানার্থে এবং মূল্যের প্রতিযোগিতায় বাঁচিতে হইলে অখাদ্য তৈল ও চর্বির দ্বারা সাবান তৈয়ারি করিতে হইবে। বাদাম, নারিকেল, তিল প্রভৃতি যে সকল তৈল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, সেগুলি সাবানে ব্যবহার না করা ভাল; একান্তই যদি করা হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব স্বল্প মাত্রায় করাই যুক্তিযুক্ত। দরিদ্র দেশে খাদ্যবস্তুর অপচয় করা ঠিক নয়।

অভক্ষ্য তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত হইলে উৎপাদন মূল্যও কম হয়। নিম, মহুয়া, তিসি, তুলাবীজ, বনস্পতি, মোম প্রভৃতি যত অধিক পরিমাণে সাবান-প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইবে ততই আহারোপযোগী তৈল উদ্বৃত্ত থাকিবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে তৈল বা চর্বির পরিবর্তে বহু সময় মেদাম্লসমূহ সাবান প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়। তৈল ও চর্বি হইতে গ্লিসারিণ বাহির করিয়া লইলেই মেদাম্লসমূহ অবশিষ্ট থাকে; সুতরাং স্বভাবতই মেদাম্লসমূহের মূল্য তৈল বা চর্বি অপেক্ষা কম হইবে। আর এই মেদাম্ল সাবান প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইলে সুবিধার মাত্রা দ্বিগুণিত হয়—কারণ মেদাম্লসমূহ অনায়াসে অপেক্ষাকৃত স্বল্প-মূল্যের ক্ষার, গুঁড়া সোডা (বা Soda Ash) সাহায্যে সাবানে পরিণত হয়। এদেশে অবশ্য মেদাম্ল-প্রস্তুতকারী কোন প্রতিষ্ঠানের কথা জানা নাই, অতএব উহা আমদানি করিয়া যখন এবং যেখানেই সম্ভব, বিশেষতঃ কুটিরশিল্পে, মেদাম্ল ব্যবহার করিলে ঐ সাবান অনায়াসেই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে।

নারিকেল-তৈল সাবান-প্রস্তুতের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার মূল্য অধিক এবং ইহা মনুষ্য-ভক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত। নারিকেল-তৈলের তুল্য তৈলের সন্ধান বিজ্ঞানীরা বহুদিন যাবৎ করিতেছেন যাহাতে—নারিকেল-তৈলের ব্যবহার কমানো যায়, সেই আশায়। তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে সফলও হইয়াছেন। নহুর-বীজ-তৈল (দার্জিলিং, কারশিয়ং, জলপাইগুড়ি এবং চট্টগ্রামে জাত), রয়না (পূর্ববঙ্গের জাত) পুণাল বা পোলাং তৈল—ইহারা নারিকেল তৈলের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে বর্তমান জ্ঞান অধিক নহে এবং উৎপাদন পরিমাণও কম। গবেষণার ফলে ইহাদের সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবার রহিয়াছে। তবে যতই নারিকেল-তৈলের তুল্য তৈল আবিষ্কৃত হউক

না কেন, ইহার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য চিরকাল থাকিবে মনে হয়, তাহার কারণ ইহার রসায়নগত ধর্মসমূহ ও গুণাবলী। একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া গেল: সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অন্য কোন সাবান অনুপযোগী; একমাত্র নারিকেল তৈলোদ্ভূত সাবানই সমুদ্রজলে ব্যবহারোপযোগী ও দ্রব হয়। প্রচুর ফেনা উৎপাদনে নারিকেল-তৈলের সমকক্ষ অন্য কোন তৈলের কথা এদেশে বর্তমানে জানা নাই।

ক্ষার হিসাবে সচরাচর কষ্টিক সোডার পিণ্ড বা খণ্ড ব্যবহার করা হয়। যদি তৎপরিবর্তে কষ্টিক সোডার দ্রবণ (যাহা Caustic Soda Lye নামে বিক্রয় হয়) ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদন খরচ যথাসম্ভব কম হইবে। অবশ্য জিনিসটি সর্বত্র পাওয়া সম্ভব নয়, ইহাও উল্লেখযোগ্য।

সাবানে ভেজাল বর্জনীয়। তথাকথিত সাবানের বহু নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে প্রকৃত সাবান অপেক্ষা ভেজালের মাত্রা অনেক বেশী। 'সোনার পাথরবাটি'র ন্যায়ই এইগুলি হাস্যোদ্দীপক ও অলীক ; কারণ সাবানের নামে ও ছদ্মবেশে এইগুলি সাবান ব্যতীত যাবতীয় অন্য কিছু।

সাবানের সহিত সিলিকেট মিশ্রিত করিবার রীতি আছে। শতকরা ৫ ভাগের বেশী ইহা সাবানে ব্যবহৃত হওয়া অভীপ্সিত নহে—এই মাত্রায় ইহা সাবানের মালিন্যমোচক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ইহার ঊর্ধ্ব মাত্রায় ইহাকে সাবানের ভেজাল-রূপে গণ্য করা হয়। আর বাজারে এমন সাবানের সংখ্যা বিরল নহে, যাহার ভিতর অত্যধিক মাত্রায় সিলিকেট, লবণ, চুণ, সাজিমাটি প্রভৃতি ভেজাল দিয়া সাবানের আকার বৃদ্ধি ও তাহার তুলনায় মূল্য আশাতীতরূপে কম করিবার প্রয়াস দেখা যায়। অবশ্য কারখানার শ্রমিকদের জন্য হাতের ঝুলকালি তুলিতে যে সব সাবান প্রস্তুত করা হয়, প্রয়োজনবোধেই সেগুলির ভিতর প্রচুর পরিমাণে বালি বা ঐ শ্রেণীর জিনিস মিশ্রিত করিতে হয়।

কুটির-শিল্পে প্রস্তুত সাবানের মানের (standard) নির্দিষ্ট সীমারেখা, স্থিরতা ও সামঞ্জস্য রাখিলে ক্রেতার বিশ্বাস ও পৃষ্ঠপোষকতা অটল থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সময় পৃথক পৃথক প্রকারের সাবান বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিলে ক্রেতাদের সেই প্রকারের সাবানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে। সাবানের মানের স্থিরতা রাখিবার জন্য প্রস্তুতকারকের কোনরূপ শৈথিল্য থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। এইজন্য সামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কাপড়-কাচা অপেক্ষা গায়ে-মাখা সাবানের মানের স্থিরতা রক্ষা কত বেশী প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। কোমল ত্বকের উপর কোনরূপ অপক্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রসাধনী সাবানের সর্বাগ্রে সুনির্দিষ্ট মান থাকা প্রয়োজন। অঙ্গরাগের সাবানে সামান্য মাত্রায় ও রাসায়নিকভাবে অসংযুক্ত, অনাবদ্ধ ও শিথিল ক্ষার (Free alkali) ত্বকের যথেষ্ট ক্ষতি করে। সেইজন্য কড়াই-পদ্ধতির দ্বারা উত্তম প্রসাধনী সাবান তৈয়ারি অসম্ভব। তজ্জন্য বিস্তৃততর ব্যবস্থাদি ও যন্ত্রপাতি-সম্বলিত বাষ্পীয় প্রণালীই শ্রেয়ঃ।

তবে কার্বলিক, গন্ধক ও চালমুগরা শ্রেণীর সাবান প্রধানতঃ কুটির-শিল্পরূপেই বাংলাদেশে প্রস্তুত হয়। ইহাদের চাহিদাও যথেষ্ট। বাংলাদেশে কুটির-শিল্প-জাত কাপড়-কাচা সাবানের চাহিদা পর্যাপ্ত। ভাল কাঁচা মাল ব্যবহার করিয়া, সাবান প্রস্তুতকালে কোন কিছুর অপচয় নিবারণ দ্বারা, বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্দিষ্ট মানের সাবান উচিত মূল্যে বাজারে বাহির করিলে কুটিরশিল্প-জাত সাবান জন-মন অধিকার করিবে নিঃসন্দেহে। যোগ্যস্থলে ক্রেতৃগণ কুটির-শিল্পোৎপন্ন সাবানের প্রতি আস্থা রাখিলে ও সহযোগিতা করিলে, বঙ্গের এই কুটিরশিল্প কোনদিন লোপ পাইবে না। বলা বাহুল্য সুবৃহৎ সুসংগঠিত কারখানাগুলির সহিত প্রতিযোগিতার

ফলে কুটিরশিল্পসমূহকে সর্বদাই শঙ্কাগ্রস্ত থাকিতে হয়।

বিজ্ঞানে উন্নত দেশসমূহের তুলনায় আমাদের ভারতবর্ষে মাথাপিছু সাবানের ব্যবহার নিতান্তই অল্প। নূতন নূতন ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত সাবান ঐ সব দেশে যে পরিমাণে জনসাধারণ ব্যবহার করে, তাহা আমাদের কল্পনাতীত। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জন-প্রতি সাবান ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২৩.৪ পাউণ্ড। তা ছাড়া সেখানে সাবানের অনুকল্পসমূহ* (Soap substitute অথবা Soapless Soap) যথেষ্ট মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডে এক সময় জন-প্রতি সাবান ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২২ পাউণ্ড, ভারতে ঐ পরিমাণ এক পাউণ্ডেরও কম বা তাহার কাছাকাছি! বিষয়টির গুরুত্ব ইহা হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে। উপরন্তু এতদ্দেশে সাবানের অনুকল্প কচিৎ ব্যবহৃত হয়।

দেশমাতৃকার প্রতি মমত্ববোধে একদা যে শিল্পের আরম্ভ হইয়াছিল, আজও তাহা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইলে দেশের ও দশের—উভয়েরই মঙ্গল। সাবানের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবার অর্থ—জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতনতা। আর "পরিচ্ছন্নতা দেবতার সমীপবর্তী"—এ প্রবাদ যদি সত্য হয়, তবে পরিচ্ছন্নতা-রক্ষাকল্পে সাবানের প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে।

* লেখকের প্রবন্ধ—উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৫৬ দ্রষ্টব্য।

তপোবনে

শ্রীমতী শুক্লা মজুমদার

ওই দূর বনানীর শ্যাম বনচ্ছায়
স্বচ্ছতোয়া তটিনীর তটে নিরালায়—
অনন্ত ওঙ্কারধ্বনি আনন্দগম্ভীর,
সীমার বাঁধনে বাজে অসীমের বেদনা গভীর।
পরম আনন্দবার্তা এ মর্ত্য ভুবনে,
অন্তহীন সুধা ঢালে আতপ্ত এ তৃষিতের প্রাণে।
ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল ওইখানে একদিন নারীর জিজ্ঞাসা,
অমৃতের লাগি তার জেগেছিল শাশ্বতী পিপাসা।
কেটে গেছে ভারতের সে মধুর আলোক-লগন,
শ্রুতির সাগর-মাঝে অনন্তের অমৃত-মন্থন।
ভারতের তপোবনে সৃষ্টির সে ঊষার উদয়!
চিরন্তন আত্মা সেথা লভিয়াছে আসন অক্ষয়।

শ্রীরামকৃষ্ণে মহাপ্রভুর ভাব*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ফাল্গুনী পূর্ণিমা আমাদের কাছে দ্বিধা পবিত্র, দ্বিবিধরূপে ধন্য। প্রথমতঃ পরমপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র দোললীলা-তিথিরূপে; দ্বিতীয়তঃ কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথিরূপে। এ-ছাড়া উত্তর ভারতের ফাগুয়া বা হোলির এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত বসন্তোৎসবের আবির-কুঙ্কুমের রঙ মিশে এই দিনটিকে অতি বিচিত্র ও অভিনব রূপ দান করেছে। অধিকন্তু ঋতুশ্রেষ্ঠ মধুবসন্তের পূর্ণিমায় পূর্ণ শশীর শুচিস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারার অমল ধবল শুভ্রতার আবেদনও আমাদের হৃদয়পুরে প্রচুর আনন্দের দোলা সৃষ্টি করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে শুধু 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' নন, তাঁর মহাজীবনে তথাগত বুদ্ধের অফুরন্ত ত্যাগ, আচার্য শঙ্করের অপরিসীম জ্ঞান এবং মহাপ্রভু চৈতন্যের অপরিমেয় প্রেমভাবের অভিনব সমাবেশ লক্ষিত হয়। অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ—কেহ কেহ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সকল দেবদেবীকে বিলীন হ'তে দেখেছিলেন। সাধনকালের ইতিহাসে পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম ও সকল মতের দুশ্চর সাধনায় যখন যে দেবদেবীর দর্শন লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই তাঁর শ্রীঅঙ্গে লীন হ'য়ে গেছেন। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-পুঁথিকার পরম ভক্তিভরে গেয়েছেন:

বিরাট আলয় যেন ঠাকুরের দেহ।
নাম রূপ জগতের সম্মিলনা গৃহ॥
যাবতীয় দৃষ্টরূপ দেহে লীন পায়।
বিরাট বিগ্রহ তনু রামকৃষ্ণ রায়॥

বস্তুতঃ ধর্মসংস্থাপন যুগাবতারের পরম লীলা। গভীর শ্রদ্ধাভরে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবন অনুধ্যান করলে দেখা যায়—তিনি যে কেবল সকল ধর্ম-মতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সকল ধর্মের সংস্থাপক এবং সর্বধর্মস্বরূপ। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণতি জানিয়েছেন:

ওঁ সর্বধর্মস্থাপকস্ত্বং সর্বধর্মস্বরূপকঃ।
আচার্যাণাং মহাচার্যো রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

এত কথা ব'লে দীর্ঘ ভূমিকা করার উদ্দেশ্য এই যে পরমপুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবন-রত্নাকরে 'দম-সামর্থ্যে ডুব দিলে' ভাগ্যবান ভক্তগণ তাঁতে শ্রীগৌরাঙ্গ-রত্নেরও সন্ধান অবশ্য পাবেন।

আজকের গৌর-পূর্ণিমায় পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এবং তাঁদের অগণন সাঙ্গোপাঙ্গের পদরেণুপূত এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর মহাভাব তথা শ্রীগৌরলীলা অনুধ্যানের পরম সার্থকতা রয়েছে। এই বলরাম-মন্দিরের মহিমা-কীর্তন-প্রসঙ্গে মনে হয়:

ধন্য ভক্ত বলরামবসুর ভবন।
প্রভুর লীলায় যেন শ্রীবাস-অঙ্গন॥

শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনার গুরু সর্বতন্ত্রসিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনমাত্রই বুঝেছিলেন—'এবার নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব',—অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একাধারে শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে একসঙ্গে লীলা করছেন। ভৈরবীর আগমনের কিছুকাল পূর্ব হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুর অসহ্য গাত্রদাহে বিষম কষ্ট ভোগ-করছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রমুখ সেকালের বিখ্যাত কবিরাজগণের দ্বারা বহু চিকিৎসা করিয়েও কোনো ফল হয়নি। ব্রাহ্মণী কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের গাত্রজ্বালার কথা শোনামাত্রই বুঝতে পেরেছিলেন

* গত দোল-পূর্ণিমায় বলরাম-মন্দিরে আলোচনা-অবলম্বনে

যে, এ শারীরিক ব্যাধি নয়—'যোগজ বিকার'। ব্রাহ্মণী শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র থেকে নানা বচন উদ্ধার ক'রে বলেন যে, সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতির জীবনে হুবহু এই সকল লক্ষণ প্রকটিত দেখা যায়।

ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ গাত্রদাহ উপশমের ভক্তিশাস্ত্র-নির্দিষ্ট উপায়ও বলেন যে, কয়েকদিন সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য ধারণ ও সর্বাঙ্গে সুবাসিত শ্বেত-চন্দন অনুলেপন করলেই ঐ দাহ প্রশমিত হবে। ব্রাহ্মণীর কথামত মাত্র তিনদিন ওরূপ করা হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসহ্য গাত্রদাহ একেবারে প্রশমিত হ'য়ে গেল। ব্রাহ্মণীর এই সহজ ব্যবস্থায় তাঁর গাত্রদাহ নিবারণ হ'তে দেখে মথুরবাবু প্রভৃতি এমনকি স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরও চমৎকৃত ও বিমুগ্ধ হ'লেন।

ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে কামারপুকুর হ'তে পালকি চড়ে শিহড় গ্রামে—ভাগনে হৃদয়রামের বাড়ি যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ হ'তে দুটি অতি সুদর্শন কিশোর-বয়স্ক বালক বহির্গত হ'য়ে আনন্দে আহ্লাদে পথে ও মাঠে খেলতে খেলতে পালকির সঙ্গে সঙ্গে শিহড়ের দিকে যেতে থাকেন। অবশেষে তাঁরা আবার ঠাকুরের দেহের মধ্যে প্রবেশ করেন। ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে প্রসঙ্গক্রমে একদিন তাঁর এই অদ্ভুত দর্শনের কাহিনী শুনে বললেন—'বাবা, তুমি ঠিক দেখেছ; এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে এসে তোমার ভিতরে রয়েছেন। সেইজন্যই তোমার ওরূপ দর্শন হয়েছিল।'

বিদুষী ভৈরবী শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-দেবের ভাব এমনি জীবন্তরূপে প্রকাশিত দেখে-ছিলেন যে, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেব জ্ঞান করতেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত তা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে মথুরবাবুকে দিয়ে তিনি পণ্ডিতগণের সভা আহ্বান করান। ভৈরবী সেকালের প্রথিতযশা পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ প্রভৃতিকে শাস্ত্রীয় বিচার ও তর্কযুক্তির দ্বারা শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে দেন যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই এবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। পণ্ডিতপ্রবর বৈষ্ণবচরণ যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর সকল যুক্তি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন ক'রে মথুরবাবু প্রভৃতির সমক্ষে ঐ পণ্ডিত সভায় সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে মহামহান্ত পুরুষ বলে স্বীকার করেন।

বৈষ্ণবচরণ প্রসঙ্গতঃ বলেন—"যে প্রধান উনিশ প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ত্র 'মহাভাব' বলে নির্দেশ করেছেন এবং যা কেবল একমাত্র ভাবময়ী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা ও প্রেমাবতার ভগবান শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই এ পর্যন্ত লক্ষিত হয়েছে, কী আশ্চর্য ঐ মহাভাবের সকল লক্ষণই এঁর মধ্যে প্রকটিত। জীবের বহু সৌভাগ্যক্রমে যদি কখনও জীবনে মহাভাবের আভাস উপস্থিত হয়, তবে ঐ উনিশ প্রকারের অবস্থার ভেতর দুই পাঁচটা অবস্থাই প্রকাশ পায়। জীবের শরীর ঐ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ ধারণ করতে কখনও সক্ষম হয় না।" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণের এই মন্তব্য শুনে মথুরবাবু প্রমুখ উপস্থিত সকলেই একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে বিস্ময়ে মথুরবাবুকে বললেন—'ওগো বলে কি? মহাভাব। যা হোক বাপু, রোগ নয় শুনে মনটায় আনন্দ হচ্ছে।'

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সাধ হ'ল শ্রীচৈতন্যদেবের নগরসঙ্কীর্তন দর্শন করার। তিনি ভাবনেত্রে তখনই ঐ দিব্য দৃশ্য দর্শন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই দর্শনের কথা লীলাপ্রসঙ্গে সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে—'সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—অসীম জনতা, হরিনামে উদ্দাম উন্মত্ততা। আর সেই উন্মাদ

তরঙ্গের ভিতর শ্রীগৌরাঙ্গের উন্মাদন আকর্ষণ!' 'নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুকে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া ঐ জন-তরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন।' 'সেই অপার জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানের পঞ্চবটীর দিক্ হ'তে ঠাকুরের ঘরের সম্মুখ দিয়া অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন, উহারই ভিতর যে কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিতে চির অঙ্কিত ছিল, বলরামবাবুর ভক্তিজ্যোতিঃপূর্ণ মুখখানি তাহাদের অন্যতম।' অন্যত্র উল্লিখিত রয়েছে কথামৃত-কার ভক্তিভাজন মাষ্টার মহাশয়কেও শ্রীশ্রীঠাকুর চৈতন্যদেবের ঐ দলে দর্শন করেছিলেন ভক্তপ্রবর বলরাম, পরমভক্ত 'শ্রীম'—এঁরা শ্রীচৈতন্যলীলায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পার্ষদ ছিলেন,—শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি হ'তে আমরা একথা বিশ্বাস ক'রে থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে পূজ্যপাদ মাষ্টার মহাশয়ের আবাল্য ঐকান্তিক অনুরাগ দেখা যায়। দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণসহ ভগবৎপ্রসঙ্গে রত শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রথম দিনেই দর্শন করামাত্র মাষ্টার মহাশয়ের ভক্তিস্নাত শুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কথা উদিত হয়: 'যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ-স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ-কীর্তন করিতেছেন।' মাষ্টার মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে গৌরাঙ্গদেবের লক্ষণগুলি ও মহাভাবের প্রকাশ দর্শন ক'রে এমনি বিমুগ্ধ হন যে, একদিন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন— 'দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন। অদ্ভুত মহা-পুরুষ! ঠিক চৈনন্যদেবের মতই তাঁর মুহুর্মুহুঃ ভাব ও সমাধি হয়। অদ্ভুত ঈশ্বরপ্রেমিক, ঈশ্বর ছাড়া কিছুই জানেন না। ভগবানের নামে সর্বদাই মাতোয়ারা। যেন সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গদেব।' মাষ্টার মহাশয় মহাভাগ্যবান্, সন্দেহ নেই। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাজীবনে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মহাভাব জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় গৌরলীলা দর্শন করেছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে:

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নীলাচল বা ৺পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহে লীন হ'য়ে নিত্য লীলা প্রাপ্ত হন। শ্রীশ্রীঠাকুর ৺গয়াধাম ও পুরীক্ষেত্রে গমন করেন নি। গয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎপত্তিস্থল এবং পুরী শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মানবলীলা-সম্বরণ-স্থল। গয়া ও পুরী-দর্শনে যাবার কথায় ঠাকুরের মনে একটা অব্যক্ত ভাবের সঞ্চার হ'ত। ও-সব স্থানে গেলে হয় তো তিনিও মহাপ্রভুর মতই লীন হ'য়ে যেতেন। তিনি বলতেন, গয়া ও পুরীতে গেলে তাঁর শরীর থাকবে না। এমনি গভীর সমাধিস্থ হবেন যে, তা থেকে তাঁর মন আর নিম্নে মনুষ্যলোকে ফিরে আসবে না।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ কলুটোলার হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর কথকতা শুনতে শুনতে এমনি ভাবাবিষ্ট ও আত্মহারা হ'য়ে পড়েন যে, দ্রুত ছুটে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আসনের ওপর দণ্ডায়মান হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হস্ত উত্তোলন ক'রে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হ'লেন। তাঁর প্রেমানুরঞ্জিত প্রিয়দর্শন জ্যোতির্ময় শ্রীমুখ-কমলের অদৃষ্টপূর্ব দিব্য হাসি দর্শন ক'রে সকলের মনে হ'ল যেন তিনি ভাবমুখে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সঙ্গে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছেন। তাঁর কর্ণমূলে বহুক্ষণ ধরে শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করলে তাঁর ভাব উপশম হ'ল। কালনার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ ভগবানদাস বাবাজী মহারাজ কলুটোলার হরিসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের 'চৈতন্য-আসন'-গ্রহণের কথা শুনে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে মথুর বাবুর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে গমন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব সম্বন্ধে তিনি প্রথমে

সন্দিহান ছিলেন। তাঁর শ্রীমুখের কথা—"ভাবতুম পুরাণ ভাগবত কোথাও কোন নামগন্ধ নেই—চৈতন্য আবার অবতার! ন্যাড়া নেড়ীরা টেনেটুনে বানিয়েচে আর কি।—কিছুতেই ও কথা বিশ্বাস হ'ত না।" পুঁথিতেও আছে :

শ্রীপ্রভুর পূর্বেকার আদিম ধারণা।
সন্দেহ গৌরাঙ্গদেব অবতার কি না॥
পুরাণ কি ভাগবতে নাই কোন তত্ত্ব।
সন্দেহে দোলায়মান মিথ্যা কি এ সত্য॥
নবদ্বীপ আগমনে মিলিবে নিশ্চয়।
দরশন গৌরাঙ্গদেব যদি সত্য হয়॥
সেই হেতু বর্তমানে হেথা আগমন।
এখানে সেখানে ধামে তত্ত্ব অন্বেষণ॥

যা হোক, শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের অদ্ভুত অনুভূতির কথা শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গ থেকে উদ্ধার করছি :

"মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম যদি (চৈতন্যদেব) অবতারই হন ত সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ দেখবার জন্য এখানে ওখানে, বড় গোঁসাইয়ের বাড়ী, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়াতে লাগলুম। কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না!—সব জায়গাতেই এক একটি কাঠের মুরত হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলুম! দেখে প্রাণটা খারাপ হ'য়ে গেল। ভাবলুম কেনই বা এখানে এলুম! তারপর ফিরে আসব ব'লে নৌকায় উঠচি এমন সময়ে দেখতে পেলুম—অদ্ভুত প্রিয়দর্শন দুটি সুন্দর ছেলে!—এমন রূপ আর কখন দেখিনি! তপ্ত-কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা ক'রে জ্যোতির মণ্ডল। হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ পথ দিয়ে ছুটে আসছে। অমনি 'ঐ এলোরে, ঐ এলোরে' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথা ব'লতে না ব'লতে তারা নিকটে এসে এই শরীরের ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান-হারা হ'য়ে পড়ে গেলুম। জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল বলে ধরে ফেলল। এই রকম ঢের দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে বাস্তবিক অবতার—ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাজীবনের এই ঘটনাটিও—"এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব" ভৈরবী ব্রাহ্মণীর এই উক্তির মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নবদ্বীপ থেকে ফেরার পথে কালনায় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ভগবানদাস বাবাজীকে দেখতে যান। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধি, ঈশ্বরানুরাগ, শুদ্ধভক্তি এবং সুতীব্র ব্যাকুলতা দর্শন ক'রে বাবাজী অতিশয় মুগ্ধ হ'লেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে অতিশয় উন্নত স্তরের মহাপুরুষ ব'লে সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেন। বাবাজী যখন জানলেন ইনিই কলুটোলার হরিসভায় 'শ্রীচৈতন্যের আসন' গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর সমস্ত ক্ষোভ বিদূরিত হ'ল। তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্তব্য করেন—'ঠিকই হয়েছে। ইনি শ্রীচৈতন্যের আসনে বসার যথার্থই যোগ্য। এঁতে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত দেখছি তা সমস্তই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।'

শ্রীক্ষেত্র পুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সার্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্যকে ষড়্ভুজ হ'য়ে দর্শন দিয়েছিলেন।

"দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ-রূপ।
পাছে শ্যাম বংশী-মুখ স্বকীয় স্বরূপ॥"

ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ-মূর্তির প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। দক্ষিণেশ্বরে তিনি নিজ ঘরের দেয়ালে ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গের পট রেখেছিলেন। তিনি একবার বরানহাটায় শ্রীষড়্ভুজ-গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ দর্শনে গিয়েছিলেন। শোনা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীলাটু মহারাজকে ষড়্ভুজ-রূপে দর্শন দান করেন—ওপরের হস্তদ্বয়ে শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্বাণ, মধ্যের হস্তদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের মোহন-বংশী এবং নিম্নের হস্তদ্বয়ে স্বকীয় বরাভয়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরেরও শ্রীহরিনামে এবং সঙ্কীর্তনে ঐকান্তিক অনুরাগ দেখা যায়। পানিহাটীর প্রসিদ্ধ চিঁড়ার মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকবারই যোগদান করেছিলেন এবং প্রত্যেক বারেই সঙ্কীর্তনানন্দে ভক্তমণ্ডলীকে উন্মত্ত ক'রে তোলেন এবং নিজেও মুহুর্মুহুঃ ভাবস্থ ও সমাধিস্থ হন। শিহড়ের সন্নিকটে ফুলুই-শ্যামবাজার নামক গ্রামে সঙ্কীর্তন শুনতে গিয়ে হরিপ্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে

আহারনিদ্রা ভুলে তিনি তিন দিন কেবল শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন করেন এবং প্রেমের আবেশে উদ্দাম নৃত্য করেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জীবনেও দেখা যায় সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে তিনি রাঢ়দেশে আহার-নিদ্রা ভুলে তিন দিন অবিরাম সঙ্কীর্তন ক'রে ঈশ্বরপ্রেমে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন।

চৈতন্যদেবের মত ঠাকুরেরও শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ দেখা যায়। ভক্তগণের সঙ্গে তিনি মাহেশের রথ দেখতে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভু পুরীধামে রথের সম্মুখে বিরাট জনতার মধ্যে যেমন প্রেমাবেশে উদ্দাম নৃত্য ও শ্রীহরি-সঙ্কীর্তন করেছিলেন, ভক্তগণ-সঙ্গে মাহেশের রথ দেখতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণও রথের সম্মুখে বিশাল জনমণ্ডলীর মধ্যে ভাবোন্মত্ত হ'য়ে উদ্দাম নৃত্য ও সঙ্কীর্তন করেছিলেন এবং নিজহস্তে রথের রজ্জু আকর্ষণ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব দারুব্রহ্ম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে মধুরভাবে আলিঙ্গন করার জন্য অস্থির হ'য়ে ছুটে যেতেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে :

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইয়া অস্থিরে॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িল প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন মাহেশে গিয়েছিলেন সেই সময়ে তাঁর দুরারোগ্য গলরোগের সূচনা হয়েছে এবং তিনি তাতে কষ্টও পাচ্ছেন। কিন্তু তিনি সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য ক'রে ভক্তগণ-সঙ্গে নৌকাযোগে মাহেশ গেলেন জগন্নাথ-দর্শনে। মন্দিরের সন্নিকটে একটি বাটীর ত্রিতলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। সেদিন গলার যন্ত্রণা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তাঁর আহারের খুবই কষ্ট হ'ল।

যথাসময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ পুষ্পমাল্য-বস্ত্র চন্দনাদির দ্বারা সুসজ্জিত ক'রে রথে তোলা হ'ল। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর মৃদঙ্গ প্রভৃতি উচ্চরোলে ধ্বনিত হ'ল। মহা কোলাহল। লোকে লোকারণ্য। জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখর। শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে তিনি দ্বিতলে নেমে এলেন। ভাবের ঘোরে তাঁর শ্রীঅঙ্গ টলমল করছে এবং ক্রমশঃ আবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি আর ওপরে থাকতে পারলেন না। আবেগভরে নীচে নেমে এলেন এবং ছুটে চললেন মহাভাবে টলতে টলতে রথের অভিমুখে। এমন সময় রথের রজ্জু ধ'রে যাত্রিগণ টান দিয়েছে, ঘর্ ঘর্ শব্দ ক'রে সুবৃহৎ রথ চলতে লাগল।

"প্রভুরও হইল মন রথ টানিবারে।
দ্রুতপদে প্রবেশিলা জনতা ভিতরে॥
উপনীত একেবারে বিষম সঙ্কট।
রথের ঘূর্ণায়মান চক্রের নিকট॥
মহাভাবগ্রস্ত এবে বাহ্য মোটে নাই।
আপনে আপন হারা জগৎ গোঁসাই॥"—পুঁথি

রথযাত্রা-উৎসবে বলরাম-মন্দিরেও শ্রীশ্রীঠাকুরের অতি অপরূপ মোহন-লীলার বর্ণনা পুঁথিতে রয়েছে :

"আষাঢ়ে রথের দিনে শহরে গমন।
ভক্ত বসু বলরাম তাঁহার ভবন॥
তাঁহার মন্দিরে জগন্নাথের মূরতি।
অন্নভোগরাগ সহ সেবা নিতি নিতি॥
শ্রীকরে রথের রজ্জু করি আকর্ষণ।
মহাভাবে ধরিলেন মধুর কীর্তন॥
কভু রজ্জু পরিহরি প্রমত্ত কীর্তনে।
অপূর্ব প্রভুর লীলা ভক্তগণ সনে॥
তালে তালে বাহুরোল উঠে অনিবার।
প্রভুর নৃত্যান তাহে করিয়া হুঙ্কার॥"

এই বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে মধুরভাবে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহকে ছুটে আলিঙ্গন করতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েন এবং হাতে দারুণ আঘাত পান। শ্রীবৃন্দাবনেও তিনি অনুরূপ ভাবাবেশেই ব্রজেশ্বর বাঁকাবিহারীকে আলিঙ্গন করার জন্য অস্থির হ'য়ে ধেয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরলীলায় ভক্তপার্ষদগণসহ অত সঙ্কীর্তন ও নৃত্য ক'রেও মহাপ্রভুর সাধ মেটেনি; তাই পুনরায় তিনি দেহ ধারণ ক'রে লীলা করবেন,

সঙ্কীর্তনানন্দ সম্ভোগ করবেন—তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁর শ্রীমুখেই পাওয়া যায় :

পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরের মধুর-লীলাস্মৃতি-বিজড়িত শ্রীধাম বৃন্দাবন আবিষ্কার করেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগ ও তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়। যখন মথুরবাবুসহ তিনি বৃন্দাবনধামে যান তখন তাঁর নিত্যই কত ভাবোদয় হ'ত। সেখানে সুপ্রসিদ্ধা বৈষ্ণব-সাধিকা শ্রীমতী গঙ্গামায়ীর কুঞ্জ-দর্শনে শ্রীশ্রীঠাকুর গমন করলে গঙ্গামায়ী ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা-রূপে দর্শন ক'রে আত্মহারা হন। তিনি এইজন্য তাঁকে 'দুলালী' ব'লে সম্বোধন করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের পবিত্র রজঃ এনে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং ধ্যান করার জন্য নিজ হস্তে সেখানে তুলসী-কানন রচনা করেছিলেন। সেই থেকে তিনি দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীকে শ্রীধাম বৃন্দাবন জ্ঞান করতেন।

ভক্তিশাস্ত্রমতে সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রেমে চির আবদ্ধ থেকে তাঁরই ইঙ্গিতে ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ করেন। সুতরাং শ্রীমতীর কৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের করুণা-লাভ অসম্ভব। তিনি শ্রীগোবিন্দের মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত না করলে তাঁর দর্শন হয় না। তাই মধুরভাবের সাধন-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ রাধারাণীর কৃপা লাভের জন্য তাঁর চরণকমলে দিবারাত্র ব্যাকুল বিনতি ও আকুল প্রার্থনা নিবেদন করতে থাকেন। হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতায় অচিরেই তিনি শ্রীমতীর দর্শনলাভে ধন্য হন। ঐ দিব্যদর্শন সম্বন্ধে তিনি বলতেন— "শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে সর্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্তির মহিমা ও মাধুর্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশর পুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণ দেখেছিলাম।" যা হোক, শ্রীমতী রাধিকা ঐ-ভাবে ঠাকুরকে দর্শন-দানে কৃতার্থ ক'রে তাঁর শ্রীঅঙ্গে বিলীন হ'য়ে যান। সেই হ'তে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুকাল নিজেকে সাক্ষাৎ ব্রজরাণী জ্ঞান করতেন। ফলে ঐ কালে তিনি আপনার পৃথক অস্তিত্ববোধ একেবারেই হারিয়ে ফেলে শ্রীমতীর সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে তাদাত্ম্য অনুভব করতেন। বস্তুতঃ ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রাবল্যে তাঁর মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় মধুরভাবের পরাকাষ্ঠা প্রসূত মহাভাবের সকল প্রকার লক্ষণই প্রকটিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর ভাব সাধনকালের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের প্রাবল্যে হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণায় সময় তাঁর দেহের রোমকূপ-সমূহ থেকে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হ'ত। তার ফলে তাঁর দেহের গ্রন্থিসকল শিথিল হ'য়ে প'ড়ত এবং তাঁর দেহ নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে মৃতের মত প'ড়ে থাকত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং শ্রীমতী রাধারাণীর জীবনে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে হুবহু এই সকল লক্ষণ প্রকটিত দেখা যায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে একাধারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকা—এই যুগলমূর্তির একত্র প্রকাশ জ্ঞান করা হয়ে থাকে। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেম ও ভাবময়ী শ্রীরাধিকার অতুল ভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেব। যা হোক, ভক্তভৈরব শ্রীগিরিশচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীঅতুলচন্দ্র কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে একদিন একান্ত অভাবনীয় উপায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে একাধারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজরাণী শ্রীরাধার যুগল রূপের প্রকাশ দর্শন ক'রে বিমুগ্ধ ও কৃতার্থ হয়েছিলেন। অতুলচন্দ্র দেখেন—

"শ্রীপ্রভুর এক অঙ্গ ভাগে আধা আধা।
দক্ষিণাঙ্গ কৃষ্ণ রূপ বাম অঙ্গ রাধা॥
কৃষ্ণাঙ্গে নীলিমাকান্ত নয়নরঞ্জন।
রাধা অঙ্গ ঢল ঢল সোনার বরণ।"

* * *

অন্তরঙ্গ-জীবনে মহাভাবের লীলা-আস্বাদন এবং সাধারণভাবে ভক্তিযোগের প্রবর্তন—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেই প্রকাশিত দেখা যায়।

সুললিত ছন্দে স্বামী অভেদানন্দ-রচিত উভয়ের একাত্ম-সূচক স্তব দ্বারাই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি :

কলিমল-হর-নাম-কীর্তনং ঘোষয়ন্তং
করধৃতজলপাত্রং দণ্ডিনং হেমবর্ণম্।
ভবজলনিধিপোতং কৃষ্ণচৈতন্য-রূপং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অজ্ঞের বিজ্ঞতা

ঘোষে আচার্য : ব্রহ্ম শুষ্ক, রসের খবর রাখে না তো সে।
আমাদেরি হবে করতে সরস অগুণ ব্রহ্মে প্রেমের রসে।
ভক্ত হাসে : কী বলছ ঠাকুর—ছবি আঁকো তাঁর, তাঁরে না চিনি' ?
ব্রহ্ম নীরস ! হায় রে বিশ্বে নিখিল রসের উৎস যিনি ?
সেদিন একটি শিশু বলছিল আর এক শিশুকে—হায় কপাল !
"জানিস ! আমার মামার গোয়ালে করে গুঁতোগুঁতি ঘোড়ার পাল !"

ক্ষুদ্রের দর্প

শশী কয় : "সাগরে আমিই তো মাপিব,
ছিলাম সে জঠরে, মথি' ফের জানিব।"
রবি কয় : "দূর দূর ! আমারি তো তাপে জল
মেঘ হয় রোজ—তাই আমি পাব তার তল।"
লবণের পুতুল সে হেসে বলে : "কী জ্বালা ;
আমি প্রতি বিন্দুতে রই তার—যা পালা—
দেখ্ : আমি এক্ষনি মেপে দেব ব'লে—আয় !"
দেয় ডুব যেমনি সে যায়—টুপ্—গ'লে হায় !

শতাব্দ-সাধনা

যে যেথা ছিল লুটে সাধুর পায়, বহি' অর্ঘসম্ভার, রত্নমণি :
না জানি সন্ন্যাসী দেখাতে এল কোন্ সিদ্ধি অদ্ভুত—রোমাঞ্চনী !
ভক্ত ভেটি' কহে কৃতাঞ্জলি : "মুনি, বর্ষ শত ঘোর তপের ফলে
কী দেববাঞ্ছিত পেলে প্রেমের ধন, বিলাতে এলে যারে ?" তাপস বলে :
"প্রেম কি ? দেখ্ মূঢ় বিভূতি-বিস্ময় !" লক্ষ পুরবাসী আত্মহারা :
পদব্রজে মুনি গঙ্গা হয় পার !! জয়ধ্বনি করে সবাই তারা !
ভক্ত এক কড়ি মূল্যে খেয়া করি' গঙ্গা তরি' বলে : "প্রভু, প্রণাম !
ধন্য তুমি হে, শতাব্দ-সাধনায় লভিলে—এক কড়ি যাহার দাম।"

সমালোচনা

Significance and Importance of Jatakas—By Gokuldas De, M. A. (Gold Medalist). Published by Calcutta University, 1951. Pages 184+13; Price Rs. 7/-.

ভারতীয় সাহিত্যে বৌদ্ধ জাতকনিচয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে জাতকনিচয়ের ক্ষেত্রও তেমনি। অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে মহাশয় বিগত ৩৮ বৎসর পালি সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া এই পুস্তকখানিতে তাঁহার গবেষণামূলক তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সেগুলি প্রণিধানযোগ্য। এই পুস্তকে তিনি বৌদ্ধধর্মের আদি ইতিহাসের উপর অনেক আলোক সম্পাত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জাতকনিচয় অনেকাংশে লোকসাহিত্য, যাহাতে নীতি ও ধর্মের উপদেশগুলি গল্পাকারে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই গল্পগুলিতে প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারা ও মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের আদি ভিত্তি দেখানো হইয়াছে। পুস্তকখানি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া রচিত হইয়াছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়াছেন। যাঁহারা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসু, তাঁহারা এই পুস্তকের দ্বারা প্রভূত উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

Democracy in Early Buddhist Sangha—By Gokuldas De, M. A. (Gold Medalist). Published by Calcutta University, 1953. Pages 120+12; Price : Paper cover Rs 5/-, Cloth-bound Rs. 9/-.

এই পুস্তক বৌদ্ধ সঙ্ঘের গণতন্ত্রবাদ বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার পালি বিনয়-পিটকের মহাভাগস্থ প্রথম চারি অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে অনুভূত হয় যে বিরাট বৌদ্ধসঙ্ঘের পবিত্রতা, স্থায়িত্ব, ও লোককল্যাণকারিত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীন বৌদ্ধগণ কত প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সব ব্যবস্থার মূলে গণতন্ত্রবাদ পরিস্ফুট। গ্রন্থকার অতি নৈপুণ্য ও কৃতকার্যতার সহিত প্রাচীন পালিগ্রন্থ হইতে বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে ধরিয়াছেন। বর্তমান যুগে যে কোন ধর্মসঙ্ঘের পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ।

—মৈথিল্যানন্দ

মাঘোৎসবের উপদেশ—শিবনাথ শাস্ত্রী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; ২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৩১৯; মূল্য—আড়াই টাকা।

ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাস উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণে বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—মোটামুটিভাবে এই কয়জনের নাম, ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের ইতিহাসে সর্বাধিক স্মরণীয়। খ্রীষ্টধর্মের আদর্শের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত এই নব-বৈদান্তিকদের মধ্যে এক রামমোহন ছাড়া আর সকলেরই উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম। খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের রীতি-অনুসারে প্রার্থনা-সভায় ভাষণ-দানের মধ্য দিয়ে এই সগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে ভক্তহৃদয়ের গভীর সম্বন্ধের পরিচয় ফুটে উঠতো দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথশাস্ত্রী প্রমুখ আচার্যদের প্রার্থনায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মব্যাখ্যাগুলি একাধারে জ্ঞান, ভক্তি ও ভাষাশিল্পের সার্থক সংমিশ্রণ। শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্মব্যাখ্যান অনেকটা তত্ত্ব ও যুক্তিকেন্দ্রিক, সেইসঙ্গে সরল বিশ্বাস ও আন্তরিক ভক্তির সুরে মহিমান্বিত। বিভিন্ন ধর্ম-

মতের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার ফলে শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষণমালায় একটি উদার মননভূমির পরিচয় মেলে। "মাঘোৎসবের উপদেশ"—এমনি একটি ভাষণ-সংগ্রহ। এই সংগ্রহটিতে—ঈশ্বরের মনোনীত কে? ধর্মলাভের অধিকারী কে? ধর্মের সম্ভাবনীয়তা, পরিত্রাতা ঈশ্বর, জাতীয় সাধনা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধর্ম, ধর্ম : প্রাণে পাওয়া—প্রভৃতি নিবন্ধে লেখকের সার্থক প্রকাশভঙ্গী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সঙ্গে তদ্গতপ্রাণ সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধনপন্থার পৃথক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও মৌলিক সত্যের ক্ষেত্রে সকল দেশের সকল যুগের সাধকদের কণ্ঠ এক। "ধর্ম : প্রাণে পাওয়া" নিবন্ধটির বক্তব্য কেবল ব্রাহ্মদের জন্য নয়, সব সত্যান্বেষীর পক্ষেই স্মরণীয়—"এক সচ্চিদানন্দ, চিন্ময়, নিরাকার নির্বিকার পরমাত্মা, যাঁর তত্ত্ব সাধুর উক্তিতে ও জীবনে প্রকাশিত, তাহা মানবাত্মাতে শক্তিরূপে স্থাপন ও জীবন গঠন করবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ। উপনিষৎ, বাইবেল, কোরান থেকে যদি পাঁচটা বচন তুলে দি, তা হ'লে কি ব্রাহ্মধর্ম পেয়েছি? তা নয়। প্রাণে কি পেয়েছি? তুমি কি সচ্চিদানন্দ অনাদি ঈশ্বরকে প্রাণের কাছে পেয়েছ? যদি বলা যায় 'পেয়েছি', তা হ'লে ঠিক জানা হয়েছে।"

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

মন্দিরের চাবি—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত। দি বুক কোম্পানি লিমিটেড, ৪।৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—১৮৫; মূল্য—২৲ টাকা।

আজও সমাজের এক অংশ দেবতার মন্দিরে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত—এই চিন্তাই সংবেদনশীল কবির চিত্তকে ব্যথিত করিয়াছে; তাই তিনি এই অন্যায়ের অবসান চান—সর্বস্তরের মানবের পুণ্যমিলনে সুস্থ সবল সুন্দর সমাজ দেখিতে চান। কবি মুক্তির ও মিলনের পূজারী—রাষ্ট্রীয় কি সামাজিক—সকল ক্ষেত্রেই; বিশেষতঃ অস্পৃশ্যতা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য তাঁহাকে ব্যথিত করে; তাই ঐ সকল বিষয়-বস্তু লইয়া অনেকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছে। 'মন্দিরের চাবি,' 'দীনেশ গুপ্তের শেষ পত্র,' 'বিদ্রোহী', 'হরি-মন্দির,' ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কবির ভাষা ভাব ও ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ১৯৩১ খৃঃ পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, ২৪ বৎসর পরে সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া দেওয়ায় ইহা নব সজ্জায় পুনরায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

সংকলিতা—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রকাশক—সুনীল দাস, ২৬বি ক্রিস্‌টোফার রোড; কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা—১৭২; মূল্য—চার টাকা।

বহু দিন ধ'রে বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরচিত কবিতাগুলিকে লেখক সন্নিবদ্ধ করেছেন 'সংকলিতা'য়; উদ্দেশ্য—বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে নিজের স্থানটুকু ক'রে নেওয়া।

কবিতাগুলি পূজা, প্রকৃতি, পরিস্থিতি, অতি আধুনিক, প্রেম, শিশুকবিতা, ব্যঙ্গকবিতা প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত; সনেট্, গান, কণিকা, চৌপদী, অনুবাদ—কাব্যের সকল ক্ষেত্রেই লেখক নিজের প্রতিভার পরীক্ষা করেছেন। মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

নিঃসংশয়ে এটুকু ব'লব—প্রায় শতাধিক কবিতায় লেখকের কবিপ্রাণ নানাভাবে নানা ভাষায় স্পন্দিত, যা অপরের প্রাণেও স্পন্দন জাগায়; এইতো কবির সব চেয়ে বড় সার্থকতা!

মীমাংসাপ্রকাশঃ—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, কাব্যবেদপুরাণস্মৃতিতীর্থ প্রণীত; প্রকাশক—সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ, হাওড়া; পৃষ্ঠা—৬৬; মূল্য—২৲।

জৈমিনির পূর্বমীমাংসা ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের অন্যতম; ইহা ভারতের অমূল্য সম্পদ। উত্তর

মীমাংসা অর্থাৎ বেদান্তের অনুশীলনে পূর্বমীমাংসার জ্ঞান অপরিহার্য। পূর্বমীমাংসা বিপুলায়তন এবং ইহার অধ্যয়নে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। গ্রন্থকার মূল মীমাংসা শাস্ত্র হইতে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সরল সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকটির 'মীমাংসা-প্রকাশঃ' নামকরণ করিয়াছেন। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও প্রয়োজনের দিক হইতে পুস্তকটি ক্ষুদ্র নহে। বিশেষ করিয়া পরীক্ষার্থী ছাত্রসমাজে ইহার সমাদর হইবে।

বিদ্যামন্দির পত্রিকা—সপ্তম বার্ষিক সংখ্যা—১৯৫৭। সম্পাদনায় ব্রহ্মচারী শ্যামাচৈতন্য, অধ্যাপক শ্রীসুপ্রিয়কুমার কর এবং ছাত্রপক্ষে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা প্রভৃতি চারজন।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (আবাসিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ) বার্ষিক পত্রিকাটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। কি প্রবন্ধ নির্বাচনে, কি মুদ্রণ-পারিপাট্যে সুরুচির পরিচয় সর্বত্র। 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে' সঞ্চয়নটি দিগ্‌দর্শনে সহায়তা করে। সচিত্র প্রবন্ধ 'ভারততীর্থ'—শিক্ষক-সাহচর্যে ছাত্রদের উত্তর ভারত ভ্রমণের শুধু কাহিনী নয়—শিক্ষার পরিপূরক বলিয়াও মনে হয়। সম্পাদকীয় ও বিভিন্ন বিবরণীসহ মোট পঁয়ত্রিশটি প্রবন্ধ, তাহার মধ্যেই তিনটি গল্প এবং সাতটি কবিতা রহিয়াছে। ছয়টি ইংরেজী প্রবন্ধের প্রথমটি স্বামী অতুলানন্দজীর স্মৃতিকথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাব্দী-বৎসরে এই সংখ্যাটি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

ত্রয়ী (বার্ষিক পত্রিকা)—প্রথম সংখ্যা ১৯৫৭। সম্পাদক—শ্রীতারাপদ ঘোষ।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির—লাইসেনসিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগের ছাত্রসংসদ্-প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকাটি পরিকল্পনায় এবং বিষয়বিন্যাসে সত্যই অভিনব। কারিগরের কালি-ঝুলি-মাখা হাতে কবি ও লেখকের কালিকলম যে নতুন গতি-ভঙ্গি নিয়ে নতুন সৃষ্টি করতে সক্ষম—তার প্রমাণ এই 'ত্রয়ী'। চব্বিশটি বাঙলা রচনার মধ্যে অনেকগুলি কবিতা ও একটি নাটিকা, তার পাশে 'অটোমেটিক নেম-প্লেটে' সিরিজ প্যারালেলের বৈদ্যুতিক সংযোগ—এক অপূর্ব সৃষ্টি। ষোলটি ইংরেজী প্রবন্ধের অধিকাংশই প্রায়োগিক বিজ্ঞান-বিষয়ক। Reality in Imagination—কবিতাটি মৌলিক, ও আনন্দপ্রদ। সম্পাদনা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ।

মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকা

Upanishadic Stories and Significance—by Swami Tattwananda, published by Sri Ramakrishna Advaita Asrama, Kalady. pp 164—price Rs 2.

স্বামী তত্ত্বানন্দ-লিখিত 'উপনিষদের গল্প ও তাহার তাৎপর্য'—সাত পৃষ্ঠা তত্ত্বপূর্ণ ভূমিকার পর ১৯টি গল্পে—উপনিষদের গভীর আত্মজ্ঞানের কথা উপনিষদেরই গল্পাশ্রয়ে সরলভাবে বলা হইয়াছে। নচিকেতা, ভৃগু, সত্যকাম, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী, নারদ-সনৎকুমার প্রভৃতি গল্পগুলি নূতনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

Anirvan—(Students' Volume) No 3. May 1957. published by Ramakrishna Mission, Social Education Organisers' Training Centre, Belur Math, Howrah pp 20.

ভারতের অবনতির প্রধান কারণ—শিক্ষা-দীক্ষা অতি অল্প সংখ্যক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ, অতএব উন্নতির জন্য প্রথম ও প্রধান কর্তব্য জনসাধারণে শিক্ষাবিস্তার। এতদুদ্দেশ্যে সরকারী পরিকল্পনায় মিশনের তত্ত্বাবধানে বেলুড়ে জনশিক্ষা-মন্দিরে যে সংগঠক-শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষক ও কর্মী সেখানে ট্রেনিং পাইতেছেন। 'অনির্বাণ' তাঁহাদেরই মুখপত্র। শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন-বিষয়ক বারো তেরোটি সুচিন্তিত এবং অভিজ্ঞতা-প্রসূত প্রবন্ধ ঐ সকল বিষয়ে আগ্রহান্বিত বা ঐ সকল ক্ষেত্রে সেবানিরত ব্যক্তিদের যথেষ্ট উদ্দীপনা দিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্য-বিবরণী

কলিকাতা: ইন্‌ষ্টিট্যুট অব্ কালচার

১৯৫৩-৫৫ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণীতে এই কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানটির অভাবনীয় বিস্তৃতি ও উন্নতি পরিস্ফুট। নিয়মিত কার্যের মধ্যে—গীতা, উপনিষদ্, ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাখ্যামূলক পাঠ; সাপ্তাহিক বক্তৃতায় দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের সমাজ ও কৃষ্টিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাববিনিময়ের জন্য আন্তর্জাতিক আলোচনা-পরিষদ্; গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও গবেষণাগার, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, ভারতীয় ভাষায় ক্লাস; শিল্প-প্রদর্শনী, গ্রন্থপ্রকাশন, সংবাদপত্রিকা; অতিথি-ভবন ও ছাত্রাবাস।

আলোচ্য বর্ষে দেশবিদেশের মনীষি-প্রদত্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৬০০ শত বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গকে নানাবিষয়ে অবহিত করিয়াছে। প্রকাশন-বিভাগে এই কালে—Cultural Heritage of India (ভারত-কৃষ্টির উত্তরাধিকার) গ্রন্থাবলী, ৩য় (দর্শন) ও ৪র্থ (ধর্ম) খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

বিরাট পরিকল্পনা লইয়া প্রতিষ্ঠানটি নিকটেই প্রশস্ত পরিবেশে সরিয়া যাইতেছে, দক্ষিণ কলিকাতায় লেকের নিকট ২'৩৩ একর জমি ক্রয় করা হইয়াছে—কার্য-বিবরণীতে নির্মীয়মাণ হর্ম্যের প্ল্যান ও প্রতীক চিত্র—যেমনই বিস্ময়কর তেমনই আশাসঞ্চারী! শীঘ্রই ইহার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হউক এবং পূর্ণ-পরিণত প্রতিষ্ঠানটি সমাজের নূতন কৃষ্টিচেতনা জাগরিত করুক।

রহড়া (২৪ পরগণা): রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম ৩৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত বহু বিভাগ-সমন্বিত বৃহৎ অবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে প্রধানতঃ দরিদ্র মেধাবী মাতাপিতৃহীন অনাথ বালকেরাই প্রবেশের সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে; বহুমুখী বিদ্যালয় (Muti-purpose School), জেলা গ্রন্থাগার, ডাকঘর, কর্মি-ভবন, একটি প্রশস্ত ছাত্রাবাস এবং বয়নশিল্পগৃহ। এই নির্মাণকার্যের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৮৯,৪১৬৲ টাকা। আশ্রমসংলগ্ন দুইখণ্ড জমিও আলোচ্য বর্ষে কেনা হইয়াছে। গত ২৪শে জুন, ১৯৫৬ পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বহুমুখী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক, শিল্প প্রভৃতি সকল বিভাগেরই ক্রম-বর্ধমান প্রসার ও উন্নতি লক্ষণীয়। আলোচ্য বর্ষে মোট ৩৪৬টি বিদ্যার্থী এই আশ্রমে শিক্ষালাভ করিয়াছে। প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল শতকরা শত; ১৯৫৬ খৃঃ ১৯ জন পরীক্ষা দেয়, সকলেই পাস করে; একটি বালক বৃত্তি পায়।

রঁাচি: টি. বি. স্যানাটোরিয়াম—এই প্রতিষ্ঠানে ১৯৫৬ খৃঃ কার্য-বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত গতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে—তাহার পরিচয় এই বিবরণীতে পাওয়া যায়। বর্তমানে এখানে ৫০টি ব্লক আছে; অস্থায়ী রোগী-ভবন, রন্ধনাগার ও ভোজনালয়, কর্মিভবন, ঝাড়ুদার-পল্লী, ধোপাঘাট, ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস, ক্ষুদ্র অতিথিভবন প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত; এতদ্ব্যতীত সবজিবাগান ও সুদৃশ্য পুষ্পোদ্যান এবং জল-সংরক্ষণ ব্যবস্থা এখানে দর্শক-বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে মোট ১৬২টি শয্যা (Bed) আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যক্ষ্মা-সেবা অতি প্রয়োজনীয় এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ। যক্ষ্মা-প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ ইহার সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিন্তা করিতেছেন:—প্যাথলজি গৃহ, চিকিৎসক ও কর্মিগণের জন্য উপযুক্ত ভবন, আধুনিকতম রন্ধনশালা, স্যানাটোরিয়ামে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন, প্রাক্তন রোগীদিগের জন্য বাসস্থান, বহির্বিভাগ-সমন্বিত সাধারণ চিকিৎসালয় (যেহেতু ৯ মাইলের মধ্যে কোন চিকিৎসালয় নাই), বৈজ্ঞানিক ধোলাইখানা।

জন্মোৎসব

সোনার গাঁ (ঢাকা)—গত ১০ই হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ—সোনার গাঁ রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন উষাকীর্তনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া পল্লী-পরিক্রমা হয়। অপরাহ্ণে বিরাট জনসভায় পূর্বপাকিস্তানের স্বাস্থ্য-সচিব শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সত্যকামানন্দ সুললিত ভাষায় স্বামীজীর জীবন-আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন—স্বামীজী কোন ধর্ম-বিশেষের জন্য নয়, তিনি মানুষের কল্যাণ-কামনায় জীবনপাত করেন। দ্বিতীয় দিবসে নারায়ণগঞ্জ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিঃশঙ্কানন্দজীর সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়।

শেষ দিন উৎসব মহোৎসবের আকার ধারণ করে। মধ্যাহ্নে ৪০০০ নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্ণে এক বিরাট জনসভায় বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী সভাপতিরূপে মধুর ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেন, নিস্তব্ধ জনতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শুনিয়াছিল। সন্ধ্যারতির পর 'নচিকেতা' নাটক অভিনীত হয়।

বালিয়াটি (ঢাকা): বার্ষিক উৎসব—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১০ই হইতে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত মহা আনন্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১২ই মধ্যাহ্নে প্রায় ২০০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হয়। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ দুই দিন সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

ছায়াচিত্রযোগে প্রচারকার্য

গত মার্চ হইতে ১৬ই জুন পর্যন্ত—'বিশ্ব-সভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবদান' 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ,' 'মাতা সারদা দেবী,' 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও আর্যসভ্যতা' সম্বন্ধে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, খুলনা, যশোহর, নড়াইল, বরিশাল, চাঁদপুর, ফরিদপুর, বালিয়াটী, মির্জাপুর, হবিগঞ্জ, নরসিংদী, শ্রীহট্ট ইত্যাদি অঞ্চলে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী মোট ৬৫টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫০টি ছায়াচিত্রসহ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সহস্র সহস্র নরনারী উক্ত সভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্তাহিক ধর্মসভা

বলরাম-মন্দির (কলিকাতা): আলোচিত বিষয়

এপ্রিল: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা, আচার্য বিবেকানন্দ, ভাগবত ও প্রেমধর্ম, গীতার বাণী।

মে: বাল্মীকি-রামায়ণ, সনাতনধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান, বুদ্ধের জীবনী ও বাণী, ধর্ম ও বিজ্ঞান।

জুন: প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের প্রয়োগ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, যুগমানব বিবেকানন্দ, ভাগবত ও প্রেমধর্ম, রথোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ।

স্বামী যুক্তানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ, পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী, স্বামী দেবানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং বেতার-কথক সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিভিন্ন দিনে বলেন।

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার

সানফ্রান্সিস্কোঃ উত্তর কালিফর্নিয়া বেদান্ত-সমিতি
[২৯৬৩ ওয়েব্‌ষ্টার ষ্ট্রীট, সানফ্রান্সিস্কো-২৩]

প্রতি রবিবার বেলা ১১ টায় ও প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় সোসাইটির নিজস্ব অডিটোরিয়মে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ বা সহায়ক স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ বেদান্ত-বিষয়ক বক্তৃতা দেন।

ফেব্রুআরি : সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন, ধর্মজীবনে ক্রিয়া-কাণ্ডের স্থান, বিশ্ব-ঐক্যের আধ্যাত্মিক ভিত্তি, ঈশ্বর কিভাবে মানুষের সঙ্গে মেশেন? দৃষ্টি যদি একাগ্র হইত, ধ্যান অভ্যাস করিব কেন? ধর্মজীবনের ছয়টি সহায়, ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ—যাঁহাকে দেখিয়াছি।

মার্চ : ঈশ্বর, দেব-মানব ও অবতারের পার্ষদভক্ত; শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানবের উত্তরাধিকার; শান্তি নয়—তরবারি, প্রতিটি মানুষ—একটি রহস্য, শ্রীরামকৃষ্ণের নারীভক্তবৃন্দ, সুপ্তির আধ্যাত্মিক অর্থ, আত্মা—এক না বহু? যুগে যুগে ভারতীয় মহাপুরুষগণ।

এপ্রিল : আমাদের দুঃখের কারণ, প্রবর্তকের সাধনা, বেদান্তের বৈশিষ্ট্য কি? উন্নত সাধকের সাধনা, বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর ও মানব সম্বন্ধে ধারণা, পুনরুত্থান সম্বন্ধে—খৃষ্টান ও হিন্দু দৃষ্টি-ভঙ্গি, চাই অনুভূতির ধর্ম—শুধু বিশ্বাসের নয়; আমরা যা হয়েছি, তা কেন হয়েছি?

মে : আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ, স্বাভাবিক মানবের আধ্যাত্মিক মানবে রূপান্তর (নবাগত স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রথম ভাষণ, ৫ই), দৃশ্য ও অদৃশ্য ঈশ্বর, ভাবাবেগকে কিরূপে ধর্মভাবে পরিণত করা যায়? শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তগণ; চাও, খোঁজ এবং দরজায় ধাক্কা দাও; শক্তির উৎস, মৃত্যুকে জয় করা যায়, বেদান্তের নীতি ও আচার্যগণ।

এতদ্‌ব্যতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টায় স্বামী অশোকানন্দ বেদান্তদর্শনের তত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে সবিস্তারে অধ্যাপনা করেন, বর্তমানে মুণ্ডক-উপনিষদ্‌ আলোচিত হইতেছে। রবিবার সকালে সমবেত শিশুদিগকে বিভিন্ন ধর্মগুরুর কথা বলিয়া উদারধর্মভাবের শিক্ষা দেওয়া হয়।

নিউইয়র্ক : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ২৭শে জানুআরি রবিবার স্বামী নিখিলানন্দের বক্তৃতা—'বিবেকানন্দের বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বিষয়ক ভবিষ্যদ্‌-দৃষ্টি'। তৎসহ ছিল ভারতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান।

ফেব্রুআরি : পাপ ও উদ্ধার বিষয়ে হিন্দুমত, অন্তরাত্মার দীপ্তি, মানব-জীবনের অর্থ, ধর্মের মৌলিক আদর্শ।

মার্চ : প্রার্থনা ও পরিপূরণ, ঈশ্বরানুভূতির চারিটি সোপান, ঈশ্বর কৃপার অর্থ, ভালবাসার কৌশল।

এপ্রিল : বেদান্তের দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব, আত্মসংযমের ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান, সাহস ও ও আনন্দের সহিত মৃত্যুবরণ (গুডফ্রাইডে), অমৃতত্বের সন্ধানে মানুষ (ইষ্টার), কর্তব্য ও মুক্তি।

মে : জীবনের লক্ষ্যচতুষ্টয়, সিদ্ধিলাভের উপায়, বুদ্ধবাণী—শান্তি ও জ্ঞান (তৎসহ ভারতীয় সঙ্গীত), মায়া বা সমষ্টি-অজ্ঞান।

এই বক্তৃতা-সূচী ব্যতীত নিয়মিতভাবে প্রতি মঙ্গলবার স্বামী ঋতজানন্দ গীতা ও প্রতি শুক্রবার স্বামী নিখিলানন্দ উপনিষদ্‌ ব্যাখ্যা করেন।

বিবিধ সংবাদ

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পূজা পাঠ ভজন প্রসাদ-বিতরণ ও আলোচনাসভা প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সংক্ষিপ্ত উৎসব-সংবাদ পরিবেশিত হইল :

কলাইঘাট (রাণাঘাট, নদীয়া) : বক্তা—স্বামী পুণ্যানন্দ ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। কলাইঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুর সহিত আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া স্থানীয় ভক্তবৃন্দ উৎসবের আয়োজন করেন।

নাটশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (মেদিনীপুর) : বক্তা—স্বামী সুশান্তানন্দ (সভাপতি), শ্রীসূর্যকুমার চক্রবর্তী, শ্রীসুধীরকুমার পাল প্রভৃতি। সভান্তে 'শ্রীরামকৃষ্ণ'-সম্বন্ধে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। ১০ হাজার নরনারী উৎসবে যোগদান করেন।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (পূর্ণিয়া) : বক্তা—স্বামী পরশিবানন্দ (সভাপতি), স্বামী অনুপমানন্দ। আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্বামী পরশিবানন্দ মহারাজ।

আরিট (খেপুত, মেদিনীপুর) : বক্তা—স্বামী বিশ্বদেবানন্দ (সভাপতি), স্বামী সুশান্তানন্দ প্রভৃতি। ছায়াচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা ও কালীকীর্তন উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

টাংলা (আসাম) : বক্তা—স্বামী সৌম্যানন্দ মহারাজ (সভাপতি) ও স্বামী চণ্ডিকানন্দ। স্বামী গহনানন্দ ছায়াচিত্র-সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীর বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। স্থানীয় উদ্বাস্তুগণ কর্তৃক 'নিমাই-সন্ন্যাস' লীলাযাত্রা অভিনীত হয়। তিনদিন ধরিয়া উৎসব চলে।

বেলগাছিয়া (অনাথদেব লেন, কলিকাতা) : অনুন্নত শ্রেণী-দ্বারা পরিচালিত 'রামকৃষ্ণ-যুবকসঙ্ঘ' কর্তৃক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা—স্বামী জীবানন্দ, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, ডাঃ তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত।

ইম্ফল (মণিপুর) : বক্তা— স্বামী পুরুষাত্মানন্দ, স্বামী শিবরামানন্দ, শ্রীসুকুমার পাগাড়ে (সভাপতি), অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীযোগেন্দ্র সিংহ (মণিপুরী ভাষায়), অধ্যাপক শ্রীনীলকান্ত সিংহ (ইংরেজীতে)।

বিজ্ঞান-সংবাদ

আণবিকঃ গত ২৫শে জুন—অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র উদ্যোগে ভারতের চার জন বৈজ্ঞানিক আণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন তাহা নিউ দিল্লী হইতে বেতারযোগে প্রচারিত হয়।

ডক্টর কৃষ্ণান্, ডক্টর কোটারি, ডক্টর মাহেশ্বরী এবং ডক্টর খানেলকার বিভিন্ন দিক হইতে সমস্যাটির আলোচনা করেন।

[প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর] গত ১২ বৎসরে বাতাসে তেজস্ক্রিয়তা বাড়িয়াছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ডঃ কৃষ্ণান্ বলেন : অপরিহার্য কারণে স্বাভাবিকভাবেই আমরা খানিকটা তেজস্ক্রিয় হইয়া উঠিয়াছি। মহা-জাগতিক রশ্মি বিকীরণের ফলেও বাতাসের নাইট্রোজেন হইতে অবিরত তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ উৎপন্ন হইতেছে এবং মানুষের শরীরের উপাদানেও উহা নিহিত রহিয়াছে। উদ্ভিদ্ হইতে আমরা যে কার্বন সংগ্রহ করি তাহা যদিও তেজস্ক্রিয় নয়—তথাপি তাহাতে অল্পপরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা লক্ষিত হয়।

এই তেজস্ক্রিয়তা ক্ষতিকারক কিনা জিজ্ঞাসিত

হইয়া তিনি বলেন : ব্যক্তিবিশেষ সম্ভবতঃ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াও এই বিকীরণ সহ্য করিতে পারে ; অবশ্য ইহার একটা সীমা আছে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানুষ তো রঞ্জন-রশ্মির (এক্স-রে) সম্মুখীন হইতেছে।

আণবিক বিস্ফোরণজাত পদার্থনিচয়ের বিপদ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া প্রতিরক্ষা বিভাগের মন্ত্রণাদাতা ডঃ কোঠারি বলেন : আমরা যখন এই জাতীয় বিপদের কথা বলি তখন অবশ্যই বড় বড় বিস্ফোরণের ব্যাপারই চিন্তা করি ; এই সময়ে উদ্ভূত নানা তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু ক্যালসিয়মের সমগোত্রীয় ষ্ট্রন্সিয়ম-৯০, মাটিতে পড়িয়া খাদ্যের মাধ্যমে ইহা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, এবং অস্থিতে সঞ্চিত হইয়া উহা ক্রমশঃ ক্ষতিসাধন করে। বেশির ভাগ মানুষ উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতেই ক্যালসিয়ম সংগ্রহ করে, ইহার অপর উৎস দুগ্ধ আমাদের দেশে দুর্লভ। ইওরোপ এবং আমেরিকার অধিবাসিগণের শতকরা ৮০ জন দুগ্ধ হইতেই অস্থির জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ম সংগ্রহ করে। উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে ক্যালসিয়ম সংগ্রহকারী আমাদিগের ষ্ট্রন্সিয়ম-বিপদ দুগ্ধ হইতে ক্যালসিয়ম সংগ্রহকারীদের অপেক্ষা দশগুণ বেশি।

* * *

আমেরিকার নোবেল লরিয়েট বৈজ্ঞানিক ডক্টর নিলাস পলিং একটি টেলিভিসন আলোচনায় বলিয়াছেন, অনুষ্ঠিত আণবিক পরীক্ষাগুলির ফলে দশলক্ষ মানুষের জীবন ৫।১০ বৎসর করিয়া কমিয়া যাইবে ; দুইলক্ষ শিশু শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে। অল্প তেজস্ক্রিয় বিকীরণও ক্যান্সার এবং রক্তদুষ্টি উৎপন্ন করে।

(সংক্ষিপ্ত সংবাদ : লস এঞ্জেলিস—জুন ৩, রয়টার)

মেরুর জ্যোতি—মেরু প্রদেশে অন্ধকার রাত্রে আকাশে এক রকম জ্যোতি দেখা যায়, তাকেই মেরুর জ্যোতি বলে। যে সময়ে সূর্যে কলঙ্ক দেখা যায় তখন মেরু অঞ্চলের অনেক দূরেও, যেমন ফ্রান্স বা জার্মানিতে, এই জ্যোতি কখনও কখনও দেখা যায় ; একবার সিঙ্গাপুরেও নাকি দেখা গিয়াছিল। এর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে এই আলোর খেলা আনন্দের থেকে ভয়েরই সঞ্চার করে।

উত্তর গোলার্ধে এই জ্যোতি উত্তর দিকে ভোরের আলোর মত দেখায় তাই এর নাম অরোরা বোরিয়ালিস্, দক্ষিণে এর নাম অরোরা অষ্ট্রেলিস্।

সম্প্রতি এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানী গবেষণা চলেছে। জানা গেছে এগুলির ঘটনাস্থল সাধারণতঃ ৫০।৬০ মাইলেরও উর্ধ্বে। সূর্য থেকে আলোক-রশ্মি ছাড়াও কতকগুলি বৈদ্যুতিক বস্তুকণা (+ ও −) বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির আকর্ষণে মেরু অঞ্চলের দিকে ছুটে। গতিপথে ইহারা আকাশের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস-কণার সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে এই কিরণের সৃষ্টি হয়। আগামী আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণায় এ সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানা যাবে।

(Endeavour—Jan.' 57)

বিশ্বব্যাপী ভূতাত্ত্বিক গবেষণা

১লা জুলাই, ১৯৫৭ হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ ১৮ মাস ধরিয়া ৭০টি দেশের প্রায় ১০,০০০ বৈজ্ঞানিক সংঘবদ্ধভাবে বিশ্বব্যাপী এক নূতন ধরণের গবেষণার অভিযান চালাইবেন ; এই জন্য এই বৎসরটিকে বলা হইবে আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্ত্বিক বৎসর (International Geophysical Year —সংক্ষেপে I. G. Y.).

মেরু অঞ্চল পর্যবেক্ষণের জন্য এই প্রকার আন্তর্জাতিক গবেষণা দুইবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে ; প্রথম ১৮৮২-৮৩ খৃঃ, দ্বিতীয় ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে। এইগুলিকে বলা হয় প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মেরু বৎসর। বিশেষ ভাবে মেরু অঞ্চলের তথ্য-সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে অস্থায়ী পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ঐ সময় বহু তথ্য সংগৃহীত হয়।

বর্তমান গবেষণার বিষয় পৃথিবী ও তৎসংশ্লিষ্ট

যাবতীয় কিছু ; জল, স্থল, বায়ুমণ্ডলে তন্ন তন্ন করিয়া প্রায় বারোটি বিভিন্ন বিজ্ঞানের নূতন তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।

আবহ-বিজ্ঞান (Meteorology) এই গবেষণার একটি প্রধান এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। শুধু আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়াই বড় কথা নয়, নিরাপদ ও দ্রুত বিমান-চালনার জন্ম বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের (বিশেষত ২০,০০০ হইতে ৪০,০০০ ফুট উর্ধ্বে) বায়ু চলাচলের তথ্য একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

অতঃপর পৃথিবীর চৌম্বকশক্তি সম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজন, কারণ কম্পাসের কাঁটা ঠিক উত্তর দিক দেখায় না এবং নানা কারণে স্থান-কালভেদে উহা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। সৌরকলঙ্ক-বৃদ্ধিকালে, বিশেষত মেরু অঞ্চলে চৌম্বক ঝড় (বা Magnetic Storm) দেখা যায়, তখন কম্পাস মোটেই নির্ভর-যোগ্য থাকে না। জল পথে ইহা খুবই বিপজ্জনক। এ বিষয়েও পৃথিবীব্যাপী তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। এই সঙ্গে সম্পর্কিত মেরুজ্যোতির কারণও আশা করা যায় আবিষ্কৃত হইবে।

মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic ray) অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিতেছে এবং অলক্ষ্যে বিশেষতঃ বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে নানা পরিবর্তন ঘটাইতেছে তাহা এখনও মানুষের অজ্ঞাত। এ জন্ম রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতির সাহায্যে এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা হইবে।

আয়ন মণ্ডল (Ionosphere) পৃথিবীর উর্ধ্বে ৬০ হইতে ২৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, ইহাকে বিদ্যুৎ-মণ্ডলও বলা যাইতে পারে; বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনে ইহার গুরুত্ব অনুভূত হইয়াছে, বজ্রবিদ্যুৎও এই মণ্ডলের ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। বেতারের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্ম এই মণ্ডলের আরও জ্ঞান আবশ্যক।

বায়ুমণ্ডলের পর জলমণ্ডল—ভূতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়। সমুদ্রস্রোত, বাণিজ্যবায়ু ও মৌসুমীবায়ুর সম্যক জ্ঞান সংগৃহীত হইলে জানা যাইবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার কোন স্থায়ী পরিবর্তন কিভাবে কতদিনে হইবে—বা হইতেছে কি না।

সর্বশেষে গবেষণার বিষয় ভূবিজ্ঞান; সাধারণ মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা নিকটতম ভূত্বক্—ভূকম্পন কেন হয় ইহার পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব কি না, পৃথিবীর অভ্যন্তরের তরল মণ্ডল (৪০০০ মাইল ব্যাসব্যাপী), আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা তথ্য সংগৃহীত হইবে।

এতদিন পদার্থবিদ্ ও রাসায়নবিদ্‌রা পরীক্ষা-গারে বসিয়া একা একা গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু আজ বিরাট প্রয়োজনে এই বিরাট আয়োজন।

ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি প্রত্যেক দেশই এই বিরাট জ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

উদ্বোধনের গ্রাহক-সংখ্যা পরিবর্তন

উদ্বোধন-পত্রিকার বর্তমান গ্রাহকবর্গকে জানান যাইতেছে যে এই মাস - শ্রাবণ ১৩৬৪, হইতে তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যা (Subscribers' Number) পরিবর্তন করা হইল। পত্রিকার উপরে যে ঠিকানা থাকে তাহার পূর্বভাগেই এই গ্রাহকসংখ্যা থাকিবে। যদি কেহ ঠিকানা পরিবর্তন, বা পত্রিকা অপ্রাপ্তি প্রভৃতির জন্ম পত্র দেন, তাহা হইলে এই গ্রাহকসংখ্যাসহ নিজ নাম ঠিকানার উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না। ইতি—

—কার্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তুতিঃ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমলচতুর্ধুরীণ-বিরচিতা

ত্রেতায়াং রামভদ্রায় জগদ্রমণকারিণে।
দ্বাপরে কৃষ্ণরূপায় পাপতাপাদিকর্ষিণে ॥১
কলৌ শ্রীরামকৃষ্ণায় যুগ্মরূপপ্রধারিণে।
নমঃ কোটীযুগব্যাপি-তপঃফলস্বরূপিণে ॥২

অবতীর্ণপরেশায় যতীন্দ্রস্য নমোঽস্তু তে।
যুগযুগাবতারাণাং সমষ্টয়ে নমোঽস্তু তে ॥৩
রামো দূর্বাদলশ্যামঃ কৃষ্ণোঽপি কৃষ্ণবর্ণকঃ।
মাতা তে কালিকা ঘোরা গৌরস্ত্বং শিবরূপকঃ ॥৪
নিষ্কলুষং জগৎ সর্বং নিষ্পাপং চিরশুভ্রকম্।
কৃতং ত্বয়া স্থিরজ্যোতিঃ প্রমূর্তব্রহ্মবর্চসম্ ॥৫
বিশ্বদীপস্বরূপায় ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় নরেন্দ্রধ্যানরূপিণে ॥৬

বামনস্য স্থিরা প্রজ্ঞা রামস্য সত্যনিষ্ঠতা।
বীর্যং নীতিশ্চ কৃষ্ণস্য ত্বয্যেব পূর্ণতাং গতা ॥৭
গৌরস্য প্রীতিভক্তী চ জ্ঞানকর্মসমন্বিতে।
ত্বয়ি রূপং পরং প্রাপ্তে রামকৃষ্ণ নমোঽস্তু তে ॥৮
সর্বধর্মপ্রপালিনে তৎসমন্বয়-কারিণে।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় সচ্চিদানন্দরূপিণে ॥৯

'তাবান্ পন্থা মতং যাবন্'—মহাবাণী-প্রচারিণে।
পরশিবস্বরূপায় 'জীবশিব'-বিঘোষিণে ॥১০
মাধ্যমেন মহাদেব্যা জননীসারদামণেঃ।
নারীশক্তেঃ প্রবোধায় সংসারারণ্যবাসিনে ॥১১

ঈশপ্রত্যক্ষতায়াশ্চ সাক্ষাৎপ্রমাণকারিণে।
নমো ভগবতে তুভ্যং ষড়ৈশ্বর্যপ্রকাশিনে ॥১২
পুত্রাধমযতীন্দ্রায় পাদরেণুপ্রদায়িনে।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় সারদাসাররূপিণে ॥১৩

অনুবাদঃ ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী

যিনি ত্রেতাযুগে শ্রীরামরূপে জগৎকে আনন্দ দান করেছিলেন, যিনি দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতের পাপ, তাপ প্রভৃতি হরণ করেছিলেন, যিনি কলিযুগে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মেলিত পূর্ণ রূপ ধারণ করেছিলেন, বিশ্বের কোটি কোটি যুগের তপস্যার ফলস্বরূপ সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম ॥ ১-২

তুমিই স্বয়ং অবতীর্ণ পরমেশ্বর; তোমাকেই যতীন্দ্রের প্রণাম। যুগে যুগে সকল অবতারের সমষ্টিস্বরূপ তোমাকেই প্রণাম॥ শ্রীরাম দূর্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ; শ্রীকৃষ্ণও কৃষ্ণবর্ণ। তোমার মাতা শ্রীকালিকাও ঘোরকৃষ্ণবর্ণা; কিন্তু শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যুগ্মরূপ এবং শ্রীকালিকার পুত্র হয়েও, তুমি পিতা শিবেরই ন্যায় গৌরবর্ণ॥ সমগ্র জগৎকে কলঙ্কহীন, পাপহীন, চিরশুভ্র, চিরজ্যোতির্ময় এবং ব্রহ্মলোকের মূর্ত প্রতিচ্ছবি করেছিলে তুমিই, এই উজ্জ্বলগৌররূপ ধারণ ক'রে॥ যিনি বিশ্বের দীপ-স্বরূপ, যিনি ভক্তি ও মুক্তির প্রদাতা, যিনি শ্রীবিবেকানন্দের ধ্যানমূর্তি, সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম॥ ৩-৬

সত্যযুগের অবতার শ্রীবামনের শাশ্বত জ্ঞান, ত্রেতাযুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, দ্বাপরযুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য-বীর্য এবং ধর্মনীতি—একমাত্র তোমাতেই পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে॥ একই সঙ্গে, কলিযুগের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রীতি ও ভক্তি—জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে সমন্বিত হ'য়ে, তোমাতেই শ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ! তোমাকেই প্রণাম॥ যিনি সর্ব ধর্ম স্বয়ং পালন করেছিলেন, যিনি এইভাবে সর্ব ধর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন, যিনি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মরূপী, সেই শ্রীরামকৃষ্ণকেই প্রণাম॥ ৭-৯

"যত মত, তত পথ" এই মহামতবাদ যিনি প্রচার করেছিলেন, স্বয়ং পরম শিব-স্বরূপ হয়েও "জীবই শিব" এই মহাবাণী যিনি ঘোষণা করেছিলেন, মহাদেবী জননী সারদামণির মাধ্যমে, নারীশক্তির পূর্ণ জাগরণের নিমিত্ত যিনি সংসার-অরণ্যেই বাস করেছিলেন, "ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়"—এই মহাসত্য যিনি নিঃসংশয়ে প্রকাশ করেছিলেন,* এবং যাঁকে প্রত্যক্ষ ক'রেই আমরা তাঁর সাক্ষাৎ প্রমাণ পাই; ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ এই ষড়ৈশ্বর্য যিনি পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন, সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকেই প্রণাম॥ ১০-১২

যিনি অধম পুত্র যতীন্দ্রকে পাদরজঃ প্রদান করেছেন, যিনি জননী সারদামণির সাররূপ, সেই শ্রীরামকৃষ্ণকেই প্রণাম॥

* শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে এই কথা বলেছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে

অবতার-উপাসনা

পশু বা পশুপ্রকৃতি মানব উপাসনা করে না, কারণ উপাসনা করিবার মতো মন বা বুদ্ধি তাহার এখনও বিকশিত হয় নাই; আর পরমহংসেরা উপাসনা করেন না—কারণ তাঁহাদের মনে উপাস্য-উপাসকের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে। এই দুই মেরুপ্রান্তের মধ্যবর্তী নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলেই সাধারণ মানুষের বসবাস। তাহাদের মন বুঝিয়াছে এই জগদ্‌ব্যাপারের পিছনে এক মহাশক্তি আছেন—যিনি এই জীব জগৎ চালাইতেছেন। সূর্য চন্দ্র নিয়মিত উঠিতেছে—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নিয়মিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে—যথাসময়ে ফুল ফুটিতেছে, ফল ফলিতেছে, শস্য পাকিতেছে! তারপর জন্ম জীবন ও মৃত্যুর রহস্য বিরাট প্রশ্নের মতো তাহাদের সম্মুখে প্রতিদিন বিস্ময়ের সঞ্চার করিতেছে! মানুষ কোথা হইতে জন্মায়—মরিয়া কোথায় যায়? এ প্রশ্নও চিরন্তন। উন্নত মানব-মনের প্রশ্ন—মানুষ কেন জন্মায়!

শেষ প্রশ্নটি বাদ দিলে—অন্যগুলির সমাধানের জন্য আদিম মানুষই ভয়ে বিস্ময়ে প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে দেবতার কল্পনা করিয়াছিল—পরিশেষে 'এক সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর' তাহার প্রায় সকল প্রশ্নেরই সমাধান করিয়াছিলেন! একজন সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আছেন—তিনি সব করিতে পারেন এবং করিতেছেন—এই ভাবনায় আসিয়া মানব-মন একটা স্থিতিলাভ করে। স্বর্গে বা আকাশে অদৃশ্য ঈশ্বর আছেন—তাঁহার হাতে বজ্র, চক্ষে ভ্রূকুটি; তিনি রুষ্ট হইলে ঝড় বন্যা অগ্নি ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বারা মানুষকে ধ্বংস করেন, তিনি তুষ্ট হইলে সুবৃষ্টি দিয়া, শস্য ও গোধন বর্ধিত করিয়া, ফুলে ফলে বৃক্ষলতা সুসজ্জিত করিয়া মানুষকে পালন করেন। অতএব মানুষের কর্তব্য—তাঁহাকে সর্বদা তুষ্ট রাখা, তাই উপাসনা; তিনি রুষ্ট হন—এমন কাজ না করা, এবং তিনি সর্বদা তুষ্ট থাকেন—সকলে মিলিয়া এমন কাজ করা, এই ভাব হইতেই বিধি-নিষেধের ধর্মের উদ্ভব। তাহার মর্মকথা—'এইরূপ কর, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, তুমি ইহপরলোকে সুখী হইবে; এইরূপ করিও না, ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হইবেন, তুমি ইহপরলোকে দুঃখ পাইবে। এই ঈশ্বরের আমরা দেখা পাই—বৈদিক ইন্দ্রে, গ্রীক জুপিটারে, ইহুদীর জিহোবায়।

ধীরে ধীরে যখন পিতার তত্ত্বাবধানে মানবগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল—তখন স্বভাবতই প্রত্যক্ষ পিতার পালনশক্তি অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া 'ঈশ্বর আমাদের পিতা' এই ভাবসম্বন্ধ স্থাপিত হইল, এবং মানব-মনের স্বভাবজ পিতৃভক্তির—বিশেষতঃ অদৃশ্য মৃত পিতার প্রতি পুত্রের ভক্তির অনেকখানি অদৃশ্য পিতা ঈশ্বরও অধিকার করিতে লাগিলেন! পরলোক পিতৃলোক স্বর্গলোক দেবলোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইল—কারণ অনবরত যে মানুষ মরিতেছে তাহারা কোথায় যায়? সেখানে কি খায়? এ প্রশ্ন তো স্বাভাবিক। তাই পিতৃপুরুষের উপাসনা পিণ্ডাদি-দান আস্তিক্যবুদ্ধির তথা গোষ্ঠী-স্থাপনের এবং সমাজসংগঠনের একান্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানরূপে স্বীকৃত হইল।

মানুষের মন কিন্তু থামিয়া নাই, সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া চলিয়াছে। পিতৃ-উৎসর্গীকৃত, সত্যের জন্য সর্বত্যাগী, অতীব সাহসী নচিকেতা প্রশ্ন করিয়াছে—'বল যম, মৃত্যুর পরে কি?' শ্বেতকেতু ঋষি পিতাকে বলিতেছে—'বলুন পিতা, বলুন আমাকে—কি এমন জিনিস আছে, যাহা জানিলে সব জানা যায়?' মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করিতেছেন প্রব্রজ্যাগ্রহণেচ্ছু জ্ঞানী স্বামীকে—'যাহা দ্বারা আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে না—সেই সংসার লইয়া আমি

কি করিব ?' সব শেষে আসিল প্রশ্নোপনিষদের ঋষির প্রশ্ন—'ক্বাহসৌ পুরুষঃ ?'

এক মন হইতে অন্য মনে প্রশ্ন সঞ্চারিত হইয়া চলিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হইয়াছে এক দিব্য অভাববোধ! কে সেই পুরুষ? কোথায় সে?—যে সকলের অন্তরালে থাকিয়া সকলের অন্তর্যামী-রূপে এই জীবনের খেলা খেলিতেছে? উদ্যতবজ্র ঈশ্বরের প্রতি ভয় চলিয়া গিয়াছে, ভালবাসা আসিয়াছে, ধ্বনিত হইতেছে—'আত্মা প্রিয় ইত্যেব উপাসীত!' আত্মাকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা কর।

পরমতত্ত্ব প্রথমে এক অখণ্ড সত্তারূপে ধ্যানমগ্ন মনের গোচর হইল; গভীরতর সাধনায় তিনি অন্তর্যামী চেতনারূপে অনুভূত হইলেন; সৎ-চিৎ-এর সাধনায় যেন কিসের অভাব ছিল। আবার সন্ধান চলিল, কি সেই বস্তু—যাহা হইতে সব কিছুর জন্ম—যাহাতে সব কিছু বিলীন হইতেছে? গভীরতম সাধনায় শেষের সন্ধান মিলিল—'আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।'—আনন্দ হইতেই সকলের জন্ম, আনন্দেই সকলে জীবিত, আনন্দেই সকলে বিলীন হয়। এই আনন্দতত্ত্বই মানব-মনকে প্রিয় হইতে প্রিয়তরের, প্রিয়তর হইতে প্রিয়তমের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে। কোথায় সেই প্রিয়—সেই প্রিয়তর, প্রিয়তম আত্মা? দেহ মনের জালে জঞ্জালে কোথায় সে হারাইয়া গিয়াছে? সে আছে অতি কাছে, তবু অতিদূরে—'তদ্ দূরে তদ্ব অন্তিকে'! কখন পিতারূপে, কখন পতিরূপে কখন গুরু বা আচার্যরূপে যিনি মানুষকে পালন করিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন—তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, তাহার ভক্তি ভালবাসা শ্রদ্ধা আস্বাদন করিয়াছেন; তিনিও মানুষের মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজ মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া যেন ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে মানুষ হইয়া ধরা দিতে চাহিতেছেন। ঈশ্বর যেন ক্রমশঃ নিজেকে মানবীয় ভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন! আশ্চর্য—ঈশ্বরের এই মানুষী লীলা!

জ্ঞানী সাধকগণ বলিয়াছেন, বেদান্তের আত্মতত্ত্ব—ব্রহ্মতত্ত্ব যদি বা বিচার-বুদ্ধি-সহায়ে কথঞ্চিৎ ধারণা হয়, অবতারতত্ত্ব বুদ্ধির অগম্য। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর কি করিয়া সসীম সার্ধত্রিহস্ত-পরিমিত শরীরে অবস্থান করেন? ইহা অসম্ভব, ইহা অবিশ্বাস্য! কিন্তু,—একটি 'কিন্তু'ই মনে হয় যেন সকল প্রশ্নের সমাধান, 'কিন্তু ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান্, তিনি যদি সব পারেন—পারেন না কি তিনি তাঁর সারটুকু লইয়া মানুষরূপে অবতীর্ণ হইতে?' জ্ঞানী যাহাই বিচার করুক, ভক্ত বিশ্বাস করে—তিনি শুধু যে পারেন তা নয়, সত্যই তিনি অবতীর্ণ হন! তাই তো দেখা যায়—বেদ-বিভাজক, বেদান্ত সূত্রগ্রথয়িতা, মহাভারতের লেখক দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের শেষ ও শ্রেষ্ঠ রচনা শ্রীভগবানের অবতার-লীলাবলী! শ্রীমদ্ভাগবতের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তিনি দেখিলেন—'বেদান্ত-সিদ্ধান্তো নৃত্যতি'।

ভারতের ইতিহাসে অবতারের পর অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতের বাহিরেও ঈশদূত, ঈশ্বরপুত্র বা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের আগমন লক্ষ্য করিয়া স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে অবতার-উপাসনাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম কিনা? বিচারপ্রবণ মনে অবশ্যই সন্দেহ উত্থিত হয়: মানুষমূর্তিতে ঈশ্বর-ভাবনা উচিত না অনুচিত? ঊনবিংশ শতাব্দীর মানব-মনের এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করিয়া ঈশদূত যীশু খৃষ্টের জীবন ও বাণী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কী অপূর্ব ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্ত করিয়াছেন অবতার-উপাসনার নিগূঢ় রহস্য:

"আমরা সকলেই জানি ঈশ্বর আছেন, অথচ কেহই তাঁহাকে দেখি নাই; কেহই তাঁহাকে বুঝি না। এই সব আলোকের দূতগণের একটিকে গ্রহণ কর। ঈশ্বর-সম্বন্ধে তোমার কল্পিত শ্রেষ্ঠ

ভাবাদর্শের সহিত তাঁহার তুলনা কর, দেখিবে তোমার 'ঈশ্বর' কত ছোট; এবং এই অবতার পুরুষের চরিত্র তোমার ধারণাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই শরীরধারী ঈশ্বর—যে ভাব স্বীয় জীবনে অনুভব করিয়া যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, তুমি তাহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ চিন্তাই করিতে পার না। তবে এই সকল দেবমানবের পদতলে পতিত হওয়া, ধরাতলবাসী দেবতাজ্ঞানে তাঁহাদের উপাসনা করা কি পাপ? যদি সত্যই তাঁহারা আমাদের ঈশ্বর-ধারণা হইতে অনেক বড় হন—তবে তাঁহাদের পূজা করায় ক্ষতি কি? ক্ষতি তো নাই-ই, বরং ইহাই একমাত্র সম্ভব ও সার্থক পূজার পদ্ধতি।

"সাধনা দ্বারা, ভাবমাত্র আশ্রয়ে অথবা তোমার খুশিমত যে কোন উপায়ে, যতই চেষ্টা কর না কেন—যতক্ষণ তুমি মানুষের পৃথিবীতে মানুষ, তোমার এই পৃথিবী মানবভাবে পূর্ণ, তোমার ধর্ম মানবধর্ম, তোমার ঈশ্বরও মানবরূপী! এবং তাহা হইতেই হইবে! তাই সকল ঈশ্বরাবতারই সকল যুগে সকল দেশে পূজিত হইয়াছেন।"

ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ

উপনিষদের আত্মতত্ত্বই যেন সচ্চিদানন্দঘন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সন্দিগ্ধ মানবকে শুনাইয়া ঘোষণা করিল:

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

আমি জন্মহীন অব্যয় আত্মা, তবু আমি জন্মগ্রহণ করি—আত্মমায়ায়; আমি নিখিল ভুবনের নিয়ন্তা ঈশ্বর—তবু আমি জীবদেহ স্বীকার করি নিজেরই মায়ায়—স্বীয় প্রকৃতিকে সহায় করিয়া!

তিনি জানেন—মানুষ তাঁহাকে বুঝে না, চিনিতে পারে না; কখনও বা অবজ্ঞা করিয়া অবহেলা করে, তাই করুণাঘন গুরুমূর্তি শ্রীভগবান্ বলিতেছেন:

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

তাঁহার অতুলনীয় মায়াতীত অব্যয় ভাব না জানিয়া, বুঝিতে না পারিয়া মানুষ তাঁহাকে মায়াধীন মানুষই মনে করে! কিন্তু শ্রীভগবানের প্রতিশ্রুতি:

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

বারংবার জন্মমৃত্যুর পুনরাবর্তনে ক্লান্ত মানবের মুক্তিপথ নির্দেশ করিয়া নররূপী নারায়ণ বলিতেছেন হে অর্জুন, আমি নরলীলা করি, আমার সেই দিব্য জন্ম ও কর্ম যাহারা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে—তাহারাই জন্মমৃত্যুর বেদনাময় বন্ধন অতিক্রম করে, তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কি উপায়ে?

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

জন্মমৃত্যুময় সংসারে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণস্বরূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়া আমার দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া; দুস্তর এ পারাবার পার হইবার একটি উপায় আছে: যাহারা আমার প্রপন্ন হয় তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে!

নিরাশার অন্ধকারে শ্রীভগবানের বাণীই আশার আলো!—পথের সন্ধান দেয়—পথ চলিবার শক্তি দেয়! ভগবদ্বাক্যই ভগবৎ-কথা আলোচনার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। গঙ্গাজলই যেমন গঙ্গাপূজার শ্রেষ্ঠ উপচার।

উপনিষদ্রূপ গাভীকে 'গোপালনন্দন' শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দোহন করিয়া যে উপাদেয় অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন—মানুষ যুগযুগান্ত তাহা পান করিয়া জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার—অমৃতত্ব লাভ করিবার শক্তি পাইতেছে।

গীতা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়—আবার শ্রীকৃষ্ণ গীতার প্রতিমূর্তি, গীতায় যে শিক্ষা তিনি দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তাহা বুঝিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য

জন্ম কর্ম বুঝিতে হইবে, কারণ গীতা শ্রীকৃষ্ণেরই জীবনদর্শন !

যজ্ঞ, উপাসনা, সাংখ্য ও যোগ প্রভৃতি প্রচলিত আপাত-বিরুদ্ধ ভাবসমূহের সমন্বয়ের প্রথম আচার্য শ্রীকৃষ্ণই বেদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। জ্ঞান, ভক্তি কর্ম ও যোগের কোনটিকেই তিনি ছোট বলেন নাই ! পরিধিতে ভ্রাম্যমাণ বিন্দু ক্লান্ত হইয়া যদি স্থির কেন্দ্রে যাইতে চায় তবে তাহার অবলম্বনীয় যে কোন একটি ব্যাসার্ধ! ইহাই যোগরহস্য! ইহাই কর্মের কৌশল! যদি শান্তি চাও, শেষ চাও, তবে আর ঘুরিওনা—কেন্দ্রে চলো, যেখানে সকল কিছুর উৎস—সেইখানেই সব কিছুর শেষ !

শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের শ্রেষ্ঠ প্রচারক,—তিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন আজন্ম তিনি তাহা আচরণ করিয়াছেন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া জীবনের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অবিরত কর্ম করিয়াছেন ! তাঁহার শিক্ষা : কর্মের জন্য কর্ম কর, অনাসক্তভাবে কর্ম কর, আমার খেলার সাথী হইয়া কাজ কর, তবেই কর্ম বন্ধনের বা দুঃখের কারণ না হইয়া হইবে মুক্তির কারণ—আনন্দের কারণ !

শুধু অনাসক্ত কর্মেরই নয়, অনাসক্ত ভালবাসারও আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ! ভালবাসার জন্যই ভালবাসো—কোন কিছুর আশায় নয়, প্রতিদানের জন্য নয়।

অনাসক্তিতে আশা নাই, তাই নিরাশা নাই। অনাসক্তিতে বন্ধন নাই, অতএব বন্ধন হইতে মুক্তির প্রসঙ্গও নাই। অনাসক্তিতেই জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটিত ! শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে এই বাণীই মূর্ত, মুখরিত !

বৃন্দাবনের লীলাবিতানে সে কি প্রেমের পরিবেশ! স্নেহপ্রেমপ্রীতিময় বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিতে পারে নাই! যখন মথুরা হইতে কর্তব্যের আহ্বান আসিল তখনই—মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তিনি চলিলেন অক্রূরের রথে, পিছনের দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইলেন না ; দেখিলেন না নন্দ-যশোদার দলিত মথিত হৃদয়, শুনিলেন না শ্রীদাম-সুদামের আকুল আহ্বান, দেখিয়াও দেখিলেন না রথচক্রে লগ্ন ব্রজগোপীগণের দেহলতা !

মথুরায় রাজা কংসকে নিধন করিয়া বীর বালক নিজে না বসিয়া সিংহাসনে বসাইলেন যথার্থ অধিকারীকে, শৃঙ্খলিত মাতাপিতাকে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের বঞ্চিত হৃদয় বাৎসল্যরসে সিক্ত করিলেন।

দ্বারকায় রুক্মিণী-সত্যভামা-সমলংকৃত শ্রীকৃষ্ণ নির্লিপ্ত কর্মযোগী গৃহস্থের আদর্শরূপে বিরাজমান! বিদ্যায় বুদ্ধিতে রূপে গুণে তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ কি নিরভিমান! সকলের আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত !

মহাভারতের ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কী ঐ মহিমময় রূপ! রথী মহারথী পরিচালিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যেখানে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য উন্মুখ—মরণের সেই মহোৎসবে উভয় সৈন্যের মধ্যভাগে অর্জুনের কপিধ্বজরথে শান্ত দৃষ্টিতে সাক্ষীর মত তিনি সব দেখিতেছেন—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ; বলিতেছেন ওঠ হে অর্জুন, ক্লৈব্য পরিহার কর—মরণের মহোৎসবে যোগ দাও, 'অবারিত স্বর্গদ্বার সম্মুখে তোমার! অন্যথায় অপযশে ভরিবে ভুবন।' কী পৌরুষব্যঞ্জক উদ্দীপনা !

রণক্ষেত্রের সেই অশান্ত পরিবেশে শান্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হইয়া অর্জুনকে দিলেন আত্মজ্ঞানের উপদেশ, অনাসক্ত কর্মের প্রেরণা, সর্বশেষে উদ্‌ঘাটিত করিলেন জীবনের পরম রহস্য—শরণাগতি, সখা সুহৃদ্ প্রিয়তম শিষ্য অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত গীতার মর্মবাণী :

'সকল প্রকার বিধিনিষেধের ধর্ম, কাম্য কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে রক্ষা করিব, শোক করিও না !' বিষাদগ্রস্ত অর্জুন উঠিলেন এবং নিমিত্তমাত্র হইয়া গুরুরূপী সখা ও সারথির নির্দেশে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলেন, যশস্বী হইলেন। শ্রীভগবানও

ধর্মস্থাপন-রূপ লীলা সমাপ্ত করিয়া স্বরূপে বিলীন হইলেন।

ইহাই সেই জন্মহীনের জীবনাদর্শ—যাহা ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রতিফলিত ; ইহাই সেই পুণ্যশ্লোকের জয়গাথা—যাহা ভারতের ঘরে ঘরে পথে প্রান্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। কবির কাব্য, শিল্পীর শিল্প, ভক্তের সাধনা—সবার কেন্দ্র 'কৃষ্ণ'! এই কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া জননী দেবকীর মতো ভারত-জননীও অনুভব করিয়াছেন সেই সুখ 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'। তাই তো ভারত অতি দুঃখের রাত্রিতেও বিচলিত না হইয়া কারাগারে শৃঙ্খলিতা দেবকীর মতোই মন প্রাণ দিয়া যুগে যুগে তাঁহার কোলে কৃষ্ণের আবির্ভাব কামনা করিয়াছেন, ভগবানও যুগে যুগে তাঁহার হৃদয় আলোকিত করিতে আসিয়াছেন!

আসন্ন জন্মাষ্টমীর শুভবাসরে আমরা স্মরণ করি—সেই ধর্মস্বরূপ ধর্মসম্ভব ধর্মস্থাপক শ্রীকৃষ্ণকে, প্রণাম করি 'মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসং।'

পঞ্চশীল

'পঞ্চশীল'র কথাটি শোনে নাই—এমন লোক আজকাল আর নাই বলিলেই হয়; সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা ও রেডিওর মাধ্যমে কথাটি ঘরে ঘরে পঁহুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণ ইহার যথার্থ ভাবসংগ্রহ করিতে পারিতেছে কিনা সন্দেহ, কারণ পঞ্চশীলের আধুনিক প্রচারকগণও ইহার সঠিক অর্থ সম্বন্ধে অবহিত বলিয়া মনে হয় না। নিত্যই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বক্তাদের উচ্চারণ-তারতম্যে এবং সংবাদপত্রে মুদ্রিত বানানের বৈচিত্র্যে। ইংরেজী পত্রিকার 'Pancha Sheela,' 'Pancha Sila' 'Punch Sil' বাঙলায় রূপান্তরিত হইয়া যখন 'পঞ্চশীলা', পঞ্চশিলা' বা পঞ্চশিল' আকারে দেখা দেয়—তখন সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে—বক্তা ও শ্রোতাদের, তথা লেখক ও পাঠকদের, কথাটির অর্থবোধ হইতেছে কিনা!

তা ছাড়া এই নাম-সাম্যের জন্য অনেকেরই ধারণা এই রাজনীতিক পঞ্চশীল বুঝিবা বৌদ্ধ ধর্মেরই পঞ্চশীল। দুইটির মধ্যে অবশ্য অহিংসার সূত্রে শান্তির একটি সাধারণ ভিত্তিস্থাপনের চেষ্টা রহিয়াছে, কিন্তু দুইটি 'পঞ্চশীল' সম্পূর্ণ পৃথক সুরের।

বুদ্ধ-প্রচারিত 'পঞ্চশীল' আধ্যাত্মিক জীবনের মূল নীতি; ইহা নূতন কিছু নয়। পুরাতন নিয়মের বাইবেলে মুশা-প্রবর্তিত আদেশ-দশক (Ten Commandments of the Old Testament)-এর ভাব ও ভাষা একই প্রকার। প্রাচীনকালে সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে সমাজকে সংগঠিত করিবার জন্য সর্বত্রই এই জাতীয় বিধি-নিষেধাত্মক নীতির প্রবর্তন দেখা যায়। এই সম্পর্কে মনু-নির্দিষ্ট ধর্মের দশ-লক্ষণও তুলনীয়:

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্মলক্ষণম্॥

ধৈর্য, ক্ষমা, বহিরিন্দ্রিয় দমন, অচৌর্য, পবিত্রতা, অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্রার্থ বুঝিবার সদ্‌বুদ্ধি, অধ্যাত্ম বিদ্যা, যথার্থ ভাষণ, অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ!

আর্যজাতি-নিষেবিত সদাচারগুলিই তথাগত বুদ্ধ আর্য-অনার্য-অধ্যুষিত ভারতভূমিতে ছড়াইয়া দেন। 'পঞ্চশীল' কথার অর্থও 'পাঁচটি সদাচার'—যেগুলি পালন করিলে কি ব্যষ্টি কি সমষ্টি—সকলেরই কল্যাণ হইবে।

বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ—এই ত্রিরত্নের শরণ বা ত্রিশরণ-মন্ত্র গ্রহণের পর শান্তিকামী মানব শীলপালন ও আদর্শ জীবন যাপনের প্রথম সোপান স্বরূপ পঞ্চশীল গ্রহণ করিবার সময় বলিত: (১) জীবহিংসা (২) চৌর্যবৃত্তি (৩) ব্যভিচার (৪) মিথ্যাভাষণ ও (৫) সুরাপান হইতে বিরত থাকিব। ব্যক্তিগত জীবনে এই নীতিগুলি আচরিত হইলে সমাজ-

জীবনেও যে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রেও একই ভাব: 'অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।' ২।৩০ চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনার প্রথম সোপান 'যম'—সেখানেও পঞ্চশীলেরই প্রয়োগ, শুধু পঞ্চম শীলটির পরিবর্তে 'অপরিগ্রহ' নীতি প্রযুক্ত।

সাধারণভাবে পঞ্চশীলের কথা বলিলেও শ্রীবুদ্ধ দশবিধ অশুভ পরিহারের উপদেশও দিয়াছেন। দেহের ত্রিবিধ অশুভ: হত্যা, চৌর্য, ব্যভিচার; জিহ্বার চতুর্বিধ অশুভ: মিথ্যাভাষণ, পরনিন্দা, শপথগ্রহণ, জল্পনা; মনের ত্রিবিধ অশুভ: লোভ, দ্বেষ ও ভ্রান্তি। এইগুলি পরিহার করিয়াই মানুষ পশুর স্তর হইতে মানুষের স্তরে উন্নীত হয়। সুস্থ ও নীরোগ জীবন ধারণের জন্য যেমন পরিষ্কার জল, বিশুদ্ধ বায়ু একান্ত প্রয়োজন; স্থায়ী সমাজ-গঠনের জন্য ঐ সুনীতিগুলিও একান্ত প্রয়োজন।

বুদ্ধের এবং তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন ধর্মের এই প্রকার বিধি-নিষেধের শিক্ষা ও উপদেশের বিষয় আলোচনা করিয়া, সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, মানুষ চিরদিন সর্বত্র ব্যক্তিগত জাতিগত সমাজগত জীবনে কতকগুলি মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে; সমাধানের চেষ্টাও সর্বত্র প্রায় একই ধারায় চলিয়াছে; কি মনুর শিক্ষা, কি মুশার আদেশ, কি বুদ্ধের উপদেশ—সবগুলির মধ্যে একটি সাধারণ নীতি রহিয়াছে, তাঁহারা সর্বত্র মানবকে উন্নত করিতে চাহিয়াছেন।

তথাপি লক্ষণীয়—ঐ শিক্ষা ও উপদেশগুলির মধ্যে নিষেধের উপর এত জোর যে মনে হয়—ঐ সকল বহুল-আচরিত অন্যায় কাজগুলি সংযত করিবার জন্যই যেন লোকগুরুগণ বারংবার বলিয়াছেন 'এরূপ করিও না, ওরূপ করিও না!' যদি বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তো নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে—এই সকল শিক্ষার অধিকাংশেরই প্রয়োজনীয়তা এখনও দূরীভূত হয় নাই; ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন অপেক্ষা ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসনের ক্ষমতা অধিক, ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য।

ব্যক্তিজীবন শান্ত সংযত হইলে সমাজ সুনিয়ন্ত্রিত হইবে, সমাজ সুষ্ঠু পথে চলিলে জাতীয় জীবনে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর দেখা দেয়—বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক সমস্যা। এখন আর কোন একটি জাতি ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক প্রাচীরের মধ্যে বাস করিতে পারে না; প্রাকৃতিক দিক দিয়া অবারিত সমুদ্রের পর অবাধ আকাশ দেশের সীমারেখা প্রায় বিলুপ্ত করিয়াছে, মানসিক দিক দিয়াও—উৎপন্নদ্রব্যের মতো ভাবরাশি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে।

চার বৎসর পূর্বে বাংডুং সম্মেলনে প্রধানতঃ ভারত ও চীনের উদ্যোগে বিশ্বশান্তির মহান উদ্দেশ্য লইয়া পঞ্চশীলের রাজনীতিক সংস্করণ প্রচারিত হয়; তাহার মর্মার্থ: (১) প্রত্যেকের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার, (২) অনাক্রমণ, (৩) একে অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সমানাধিকার ও পারস্পরিক সম্মান, (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। শান্তির এই প্রযত্ন খুবই মহৎ এবং সময়োপযোগী, এবং এই প্রস্তাবও সাহসিকতা ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক; কিন্তু স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে—কতদিনে ইহা বিশ্বসংস্থায় স্বীকৃতি লাভ করিয়া কার্যকরী হইবে? প্রতিবৎসর ইহার প্রভাবে শান্তির পরিধি বর্ধিত হউক, ইহা সকলেরই আকাঙ্ক্ষা!

পরিশেষে বক্তব্য—উপরি-উক্ত রাজনীতিক পঞ্চনীতি বুদ্ধের পঞ্চশীলের প্রত্যেকটি হইতে এত পৃথক যে উহাদের 'পঞ্চশীল' নাম সাধারণের নিকট বিভ্রান্তিজনক! উভয়ে সমস্তরের নয়, উভয়ের উদ্দেশ্যও এক নয়। সমাজে—ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ 'পঞ্চশীল' বা 'টেন কম্যাণ্ডমেণ্ট্‌স্' প্রভৃতি প্রাথমিক নীতি-ধর্ম আচরণ করিয়া ত্যাগ তপস্যা সহায়ে স্বার্থকেন্দ্রিক ভোগপরায়ণ পশুজীবন অতিক্রম করিয়া যথার্থ 'মানব-ধর্ম' পালন করুক; তবেই সম্ভব হইবে 'বিশ্বজনীন নৈতিক উজ্জীবন'—যাহার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইতে পারে 'আন্তর্জাতিক অহিংসা-নীতি'। সমষ্টিশান্তির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ব্যষ্টি মানুষের মানসিক উন্নয়ন!

জন্মাষ্টমী-রাতে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অতীত দিনের স্মৃতি-সুরভিত ভরা ভাদরের রাতে,
তব জনমের ইতিহাস মোরে করেছে নিদ্রাহারা।
কংসকারার কাহিনী-জড়িত বর্ষা-মুখর ধারা
আমার মনের বন্দীশালায় মিশেছে কি তব সাথে?
তোমারে ধেয়ানে ধরেছি দেবতা! দুঃসহ বেদনায়
যন্ত্রযুগের কংস-নিধনে মানুষ তোমারে চায়।

মেঘে মেঘে ছুটে চলেছে বিজলী আকাশেতে গরজন,
আশা-হত প্রাণে ক্রন্দনধ্বনি স্রোতে ও বাতাসে ভাসে—
সারা নিখিলের জনারণ্যেতে তরু কিশলয় ত্রাসে
অসহায় হ'য়ে ডাকিছে তোমারে: মন যে গো উন্মন!
কোন্ গোকুলের গোপ-গৃহমাঝে রহিবে গোপনে প্রভু,
হৃদি-যমুনায় ঊর্মি ভীষণ,—পার হ'তে হবে তবু!

ওই গগনের নীল বাতায়নে মায়া-গুণ্ঠন ল'য়ে,
কে যেন চকিতে দাঁড়ায়ে সহসা নভোরেণু মেখে মেখে,
পৃথিবীর পানে ক্ষণিকের তরে দৃষ্টি-পলক রেখে—
লুকালো নীরবে! অশ্রু তাহার সংসারে যায় ব'য়ে!
তুষারের বুকে অলকানন্দা নেমেছে কি অনুরাগে?
দৈব দ্যুতির পরশ পেয়ে কি জীবনের আলো জাগে?

ধ্যানের অতীত অরূপ আধার,—আধেয় বিরাট জানি,
তারি মাঝে তব সীমার মাঝারে নব নব লীলা চলে;
ভুলায়ে রেখেছ জীবেরে নিয়ত কত না খেলার ছলে,
প্রকৃতির সাথে প্রণয় তোমার রচিছে বিশ্ববাণী,
বেদের বার্তা শুনাতে আবার—এ কি রূপে দিলে দেখা!
তোমার লীলার ইতিহাস কেন গগনের গায়ে লেখা?

করে ধরি কবে চক্র আবার স্বরূপ দেখাবে নব,
দানব দলিতে পাঞ্চজন্য বাজাবে মাভৈঃ রবে!
অমৃতবার্তা শুনায়ে প্রেমের স্বর্গ রচিবে ভবে,
তুমি জেগে ওঠ,—প্রাণ-শিশু সাথে খেলা ছেড়ে দাও তব।
ধর্মবিহীন যুক্তিবাদের কণ্টক-পথ ধরি
কালের রাখাল দিন-ধেনু ল'য়ে চলে বেদনারে বরি।

কত পূতনার অত্যাচারেতে জর্জর হ'ল ধরা,
কত শিশুপাল বকাসুর সনে ধ্বংসে কংস নাচে।
নিখিল ভুবনে হিংসা-দিগ্ধ আণব অস্ত্র সাজে!
মনের বনেতে হে পরম শিশু! শোভে কিগো খেলা করা?
তোমার দিব্য শংখের রবে জাগাও জগত-জনে
জীবন-যুদ্ধে টেনে লও সবে—এ যুগের প্রয়োজনে।

অধিকারি-ভেদে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা

৺বিহারীলাল সরকার

[অপ্রকাশিত রচনা]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'গ্রন্থ নয় গ্রন্থি।' যাঁহারা গ্রন্থ হিসাবে শাস্ত্র পড়েন, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্র হয় 'গাঁট' বা বন্ধন। শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য কতকগুলি কথা শিক্ষা করা নহে। শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য—জ্ঞান ও ভক্তিলাভ। যাঁহারা জ্ঞান ও ভক্তির জন্য শাস্ত্রপাঠ করেন, তাঁহাদেরই শাস্ত্রপাঠ সার্থক হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—কেবল শব্দব্রহ্মে যিনি অভিজ্ঞ, যিনি কেবল পাণ্ডিত্য অর্জনই করেন, সাধন দ্বারা শাস্ত্রার্থনিষ্ঠ হন না—অধ্যয়নের পারে যাইয়া পরব্রহ্ম ধ্যানাদি করেন না, তাঁহার শাস্ত্রপাঠ বন্ধ্যা গাভীর রক্ষকের শ্রমের ন্যায় বৃথা শ্রম মাত্র।

শাস্ত্রপাঠ দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরোক্ষ জ্ঞান হয় মাত্র। তারপর সেই প্রতিপাদ্য বিষয়কে অনুভব করিতে পারিলেই, অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই শাস্ত্রপাঠের সফলতা হয়। শাস্ত্রপাঠের অন্তরায় কুতর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'আম খেয়ে যাও, গাছে কত ডাল, কত পালা, কত ফল আছে—গুনে কি হবে?' কিন্তু ইহাও স্বীকার্য, যুক্তির স্থান আছে—যুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। মহাভারতে আছে: আপ্তবাক্য, সদাচার এবং যুক্তির সহিত যাহার ঐক্য আছে, তাহাই ধর্ম। যুক্তি অর্থে কুতর্ক নহে—শাস্ত্রপাঠের প্রধান সহায় অনুকূল যুক্তি। আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন, বিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা না করিয়া, শ্রুতি-অনুকূল যুক্তির আশ্রয় লইয়া শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে। যুক্তি হইবে শ্রুতির সাহায্যকারী।

ভারতীয় আচার্যগণ শিষ্যের অধিকার বিবেচনা করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন শ্রীপার্থকে। 'নাত্যাসক্তা নাতিবিরক্তা' ব্রজগোপীদের ভক্তিশিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করেন। নির্বিণ্ণ উদ্ধবকে তিনি জ্ঞান-শিক্ষা দেন। শ্রীঅর্জুন বলিয়াছিলেন, 'ভৈক্ষ্য অবলম্বন করিব'; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তোমার কর্মে অধিকার—তুমি কর্ম কর'। আর মন্ত্রী উদ্ধবকে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, 'তুমি স্বজন-বন্ধুতে স্নেহ ত্যাগ করিয়া আমাতে সম্পূর্ণরূপে মন সমাধান করিয়া সমদ্রষ্টা হইয়া পৃথিবী পর্যটন কর।'

কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—নাম ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু শিক্ষা এক। শিক্ষার বিষয় সেই আত্মা। আত্মাকে উপলব্ধি করাই সকলের চরম উদ্দেশ্য। প্রেমের ভিতর দিয়া যাইলেও প্রাপ্য বস্তু সেই এক; আবার কর্মের মধ্য দিয়া যাইলেও, সেই একই লভ্য বস্তু আত্মা। হৃদয়ের ভালবাসা, মস্তিষ্কের বিচার-যুক্তি, কর্মপ্রচেষ্টা—তিনটি দ্বারাই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ভালবাসা প্রতিদান চাহে, কর্মী ফল চাহে, জ্ঞানের সাধক ব্রহ্মলোক বা মুক্তি চাহে। শ্রীভগবানের প্রতি প্রেম প্রতিদান চাহে না, নিষ্কাম কর্মী ফল চাহে না, জ্ঞানী কিছুরই অপেক্ষা করে না। ইহার কারণ এই যে, শ্রীভগবানের শিক্ষার মর্ম, 'সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—তিন গুণকেই অতিক্রম কর, গুণাতীত হও।' নির্গুণে প্রতিদান হয় না, নির্গুণে ফল অসম্ভব, নির্গুণে কেবল 'নিরপেক্ষ ভাব'। শ্রীকৃষ্ণের মতে মোক্ষের তিনটি উপায়—(১) ভক্তি (২) কর্ম (৩) জ্ঞান। বেদেও ব্রহ্ম, যজ্ঞ, এবং এই তিনটি 'যোগ' অর্থাৎ উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। এই তিনটি উপায় ভিন্ন মোক্ষের অন্য উপায় নাই।

উপায় তিনটি বটে, কিন্তু স্বেচ্ছামত অবলম্বনীয় নহে; অবস্থানুযায়ী অবলম্বনীয়। সকাম ব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগ। যিনি অত্যন্ত আসক্ত নহেন, অত্যন্ত বিরক্ত নহেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ। আর যিনি অত্যন্ত বিরক্ত, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানযোগ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন: যাহারা দুঃখবুদ্ধিতে কর্মফলে বিরক্ত, সেই সব কর্মত্যাগীর পক্ষে জ্ঞানযোগ; আর যাহারা দুঃখবুদ্ধি-শূন্য এবং ফললাভে অবিরক্ত, তাহাদের পক্ষে কর্মযোগ; আবার ভাগ্য-বশতঃ যাহারা ভগবৎকথায় জাতশ্রদ্ধ কিন্তু বিষয়ে বিরক্ত নহে, কিংবা অত্যন্ত আসক্তও নহে, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ।

শ্রীভগবান সকাম কর্মীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন; ততদিন কর্ম করিবে, যতদিন না নির্বেদ উপস্থিত হয়, যতদিন না মৎ-কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা জন্মায়। 'বিরক্ত'জনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যখন যোগী কর্মেতে নির্বিণ্ণ এবং তৎফলে বিরক্ত হয়, তখন সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ধ্যানের অভ্যাস দ্বারা আত্মার ধারণা করিবে। ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'যাহারা মৎ-কথায় জাত-শ্রদ্ধ, সর্বকর্মে নির্বিণ্ণ কিন্তু কাম দুঃখাত্মক জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে অশক্ত, তাহারা ভক্তি অবলম্বন করিবে।' কামনা দুঃখের আকর বুঝিয়াও যাহারা ছাড়িতে পারিতেছে না, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ। বাসনায় অবিরক্ত জনসাধারণের পক্ষে কর্মযোগই প্রশস্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনেক শিষ্যের মধ্যে ঐ তিনটি যোগশিক্ষার মুখপাত্র-স্বরূপ তিনজনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়—শ্রীঅর্জুন, শ্রীরাধা এবং শ্রীউদ্ধব। বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীঅর্জুনের শিক্ষার স্থল কুরুক্ষেত্র; গোপিকাগ্রণী শ্রীরাধার শিক্ষাস্থল বৃন্দাবন; নিত্য অনুব্রত পার্ষদ শ্রীউদ্ধবের শিক্ষার স্থল দ্বারাবতী। প্রিয় সখা শ্রীঅর্জুনকে কর্মশিক্ষাই ভগবদ্গীতার বিষয়; ব্রজগোপীকে প্রেমশিক্ষাই শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের বিষয়; শ্রীউদ্ধবকে জ্ঞানশিক্ষাই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বিষয়। কর্মী শ্রীঅর্জুনের নিকট তিনি ঐশ্বর্যময় ঈশ্বর; প্রেমপরায়ণা শ্রীরাধার চক্ষে

তিনি সৌন্দর্য-মাধুর্যময় ভগবান; জ্ঞানী শ্রীউদ্ধব বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিগুর্ণ পরমাত্মা।

ভগবান শ্রীবুদ্ধ, শ্রীযীশু, শ্রীশঙ্কর প্রমুখ পূজ্যপাদ ধর্মোপদেষ্টাগণের প্রকৃত মত হইতেছে, সন্ন্যাস ভিন্ন ঈশ্বরলাভের অন্য উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণই ভারতে একমাত্র ধর্মপ্রচারক, যিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে কর্মত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, ফলত্যাগ করিলেই হইল। কর্ম করিয়া ফল ত্যাগ করিতে পারিলে সংসারে থাকিয়াও উচ্চতম অবস্থা লাভ হইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রচার করিয়াছেন, মানুষ ঈশ্বর-অর্চনা হিসাবে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, রাজকার্য, বাণিজ্য এবং পরিচর্যাদি করিয়াও সিদ্ধি-লাভ করিতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে অধ্যাপক, রাজকর্মচারী, বণিক বা পরিচারক—কাহাকেও তাহার দৈনন্দিন কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে না; স্ব স্ব কর্ম করিয়াও তাহাদের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেও গৃহে থাকিয়া গৃহীর মত সব কার্য করিতেন, যাহাতে লোকে কর্মত্যাগ না করে। জনসাধারণের জন্য কর্মই ধর্ম—ইহা শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বর উপাসনা করিতে তিনি নিষেধ করেন নাই। গীতাতে আছে, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে আছেন, সেই অন্তর্যামীকে আশ্রয় কর—শান্তি পাইবে। আচার্য শ্রীরামানুজ বলিয়াছেন, অর্চা অর্থাৎ প্রসিদ্ধ মন্দিরে যে সব বিগ্রহ আছেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রথম করিতে হয়; তারপর বিভব অর্থাৎ রামাদি অবতারের উপাসনা; তাহাতে অধিকার হইলে সর্বশেষে অন্তর্যামীর উপাসনা। অতএব অন্তর্যামীর উপাসনা সকলের আয়ত্তাধীন নহে। নির্গুণ ব্রহ্ম-উপাসনা অতি কঠিন। ব্রহ্ম-উপাসনা দেহবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে দুষ্কর।

সাধনমার্গে দুইটি বস্তু অন্বেষণীয়, অবলম্বনীয়; এক 'আত্মা', অপরটি 'অবতার'। আত্মা বা অবতার মনঃকল্পিত নহে—অতি সত্যবস্তু। বিবেক বা বিচার দ্বারা আত্মার সন্ধান করিতে হয়, আর ভালবাসা দ্বারা অবতারের শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়। কর্ম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইলে বিচার বা ভালবাসা প্রকাশ পায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমাকে যাহারা আশ্রয় করে, আমি তাহাদের সংসার হইতে উদ্ধার করি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'বাঁদর-ছানা আর বিড়াল-ছানা। বাঁদর-ছানা মাকে ধ'রে থাকে। বিড়াল-ছানা কেবল মিউ মিউ করে—তার মা মুখে ক'রে নিয়ে যেখানে রাখে সে সেখানে থাকে।' একটি স্বাবলম্বন, আর একটি নির্ভরতা। ব্রহ্ম-উপাসক নিজের পুরুষকারে ব্রহ্মলাভ করেন, এবং ভগবদুপাসককে শ্রীভগবান উদ্ধার করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'আমার উপাসককে আমি উদ্ধার করি। অত্যন্ত দুরাচারও যদি আমার ভজনা করে, সেও সাধু হইয়া যায়। আমার ভক্তের নাশ নাই। আমাকে পূজা কর, আমাকে পাইবে। আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।'

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছিলেন, 'উর্ধ্বরেতা অমল সন্ন্যাসীরা সাধনপ্রভাবে ব্রহ্মধামে যান, কিন্তু ধর্মপথে ভ্রমণ করিয়া ও তোমার চরিত বর্ণন দ্বারা আমরা দুস্তর সংসার-তমঃ উত্তীর্ণ হইব।' সার কথা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা কর, তাঁহাকে ভজনা কর, তাঁহাকে যজন কর, তাঁহাকে নমস্কার কর—নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণকে পাইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ভরসা দিয়াছেন, 'সর্ববিধ বাহ্য ধর্ম-কর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব—কোন ভয় নাই।' শ্রীভগবানের এই অভয় বাণীর মূল্য স্বতন্ত্র!

শ্রীভগবানের চরিত-কথা ও তাঁহার বাণী—এই দুইটিই মহাতীর্থ। যে ইহাদের সেবা করিবে, সেই নিষ্পাপ হইবে—অমলাশয় হইবে—পবিত্র হইবে। পবিত্র হইলে আত্মতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশিত হয়—অমল চক্ষুতে যেমন সবিতা আপনি প্রকাশিত হন।

শ্রীভগবানের কর্ম অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'আমি মানুষী তনু আশ্রয় করিয়াছি, সেইজন্য মূঢ়রা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মানুষ ভাবে; তাহারা আমার ঈশ্বর-ভাব জানে না। অলৌকিক এবং পরের অনুগ্রহার্থ আমার জন্মকর্ম। ইহা যাহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের দেহাভিমান চলিয়া যায় এবং তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না।' শ্রীভগবানের বাণীর মহিমা অপার। তিনি ইহাও বলিয়াছেন: আমার বাণী যে 'জপ' রূপে পাঠ করে, সে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে প্রসন্ন করে। আমার উপদেশ যে শ্রবণ করে, তাহার আমাতে পরাভক্তি হয়, সে আর কর্মে বদ্ধ হয় না।

শ্রীভগবানের চরিত-কথা এবং তাঁহার বাণী বা উপদেশ ছাড়াও আর একটি বস্তু আছে—সেটি তাঁহার শ্রীমূর্তি। কুরুক্ষেত্রে নরলোক-বীরগণ সেই শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া পরকালে পরমগতি লাভ করিয়াছিল। বৃন্দাবনে সেই শ্রীমূর্তিতে ব্রজাঙ্গনাদের নয়ন-সংলগ্ন হইলে তাহাদের সমাধি হইত। সেই ভাবমূর্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, সর্বনেত্রের প্রিয় সেই তনু মঙ্গলময়,—উপাসনাকালে সেই শ্রীমূর্তির সাক্ষাৎকার হয়।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, আনুমানিক ১৫১৯ খৃষ্টপূর্ব বৎসরে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবুদ্ধের এক হাজার বৎসর পূর্বে এবং শ্রীযীশুর দেড় হাজার বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধরিতে হইবে। মহাপ্রয়াণের সময় তাঁহার বয়স ১২৫ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের ৩৬ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টপূর্ব বৎসরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। স্বতন্ত্র-তন্ত্রে আছে, 'ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্রে, বুধবারে, মধ্য-রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু—তিনি স্বয়ং ভগবান।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "জ্ঞান আর বিজ্ঞান। জ্ঞান মানে জানা—ঈশ্বরের বিষয় শোনা; জ্ঞানে ঈশ্বর আছেন, এই অস্তিমাত্র বোধ হয়। আর বিজ্ঞানে তাঁহার দর্শন হয়—তাঁহার সহিত আলাপ হয়। কাঠে অগ্নিতত্ত্ব আছে, ইহা শোনা এক, আর কাঠ জেলে ভাত রেঁধে খাওয়া আর এক ব্যাপার।" যদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ চিরকাল না থাকিত, তাহা হইলে বিজ্ঞান সম্ভব হইত না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ আছে, সেইজন্য বিজ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, 'আমি ব্রহ্মের প্রতিমা—আমি ব্রহ্ম-জ্যোতিঃঘন—ব্রহ্মণোঽহস্য প্রতিষ্ঠাহম্।'

শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরু। তাঁহাকে যে ভাবে ডাকা হয়, সেই ভাবে তিনি সাড়া দেন। তাঁহার আশ্রয়ে সাংসারিক দুঃখও নাশ হয়। শ্রীভগবান বলি-য়াছেন, 'আমার ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করি।' শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে সাহস বাড়ে। আর একটি মহাগুণ—তাঁহার আশ্রয় লইলে অধঃপতন হয় না—'ন ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ।' উপাসকের মনে বিশ্বাস থাকে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের পূজার জন্য কিছু সংগ্রহ করিতে হয় না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'সামান্য পত্র পুষ্প ফল তোয় ভক্তির সহিত অর্পিত হইলে আমি গ্রহণ করি। তাহাও যদি না সংগ্রহ হয়, তবে—যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু কর আমাকে অর্পণ কর, তাহা হইলেই আমার পূজা হইবে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞান শিক্ষা পাইয়া শ্রীউদ্ধব পরিশেষে বলিয়াছিলেন, 'হে অরবিন্দলোচন! যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা তোমার পদাম্বুজ আশ্রয় করিয়া থাকেন; কারণ ঐ পদাম্বুজ আনন্দপরিপূরক পরমানন্দ।' দেবতারাও বলিয়াছেন, 'তোমার পাদপদ্ম অশুভ বিষয়-বাসনার দাহক।' শ্রীকৃষ্ণের চরণ পবিত্র, বিশ্বব্যাপী—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অতিক্রম করিয়া বর্তমান; 'চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণম্'। শ্রীউদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'জ্ঞানের

ফল মোক্ষ, কৃষ্যাদির ফল অর্থ। যোগের ফল অণিমাদি সিদ্ধি, দণ্ডনীতির ফল ঐশ্বর্য, কর্মের ফল স্বর্গ, কিন্তু আমি তোমার চতুর্বর্গ-ফলদাতা।'

মহাজ্ঞানী শ্রীউদ্ধবের যেমন শ্রীকৃষ্ণে অধিকার, সমাজ চক্ষে হেয় কুব্জারও সেইরূপ তাঁহাতে অধিকার। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান—তিনি যে সকল প্রাণীর নিজ জন! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'কেউ কি বানের জলে ভেসে এসেছে? চাঁদামামা যে সকলের মামা।'

পরমভাগবত শ্রীভীষ্ম দেখিতেন—শ্রীকৃষ্ণ নিরুপাধি পরম ব্রহ্ম; আর সাধারণ নরনারী সাংসারিক সঙ্কটে তাঁহাকে মাত্র বিপৎতারণ মধুসূদন বলিয়া জানে। তাহাদেরও শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ অধিকার আছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে যেমন বুঝাইয়াছেন, সে সেইরূপ বুঝিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যার যা পেটে সয়—কেউ কালিয়া পোলাও হজম করতে পারে, কেউ বা মাছের ঝোল পারে।' শ্রীভগবান যে অকিঞ্চনের ধন—অনাথের নাথ—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়!

সংসারে দেখা যায়, নিজ পিতা বর্তমানে, পুত্র যেরূপ সনাথ ও নিশ্চিন্ত থাকে, পিতৃহীন বালক কি সেইরূপ নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতে পারে? শরীরী পিতার বাণী শোনা যায়—শরীরী পিতার দয়া বোধগম্য হয়; কিন্তু অশরীরী পিতার সহিত ঐরূপ ব্যবহার হয় না। ঈশ্বর অশরীরী পিতা, আর শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ অবতার শরীরী; পিতা চলিয়া যাইলেও তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি সন্তানের কত উপকারে আসে! নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অমূল্য অক্ষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও চরিত-কথা পঞ্চম বেদ মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণ হইতে আমরা অনায়াসে পাইতে পারি! আমরা সেই অমৃতের অধিকারী—কর্মদোষে বা বুদ্ধিভ্রংশ হেতু সেই পিতৃ-ত্যক্ত অমূল্য সম্পদ হইতে আমরা যেন বঞ্চিত না হই! ওঁ

বিভিন্ন যোগের অধিকারী নির্ণয়

(উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥

নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্নচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।৬,৭,৮)

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য—'

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যার আঁধার নামে জীবনের গোধূলি-আকাশে !
বৃথায় কাটানু কাল খেলা-ঘরে পুতুল-খেলায় !
কীর্তির ভেলায় চড়ি মৃত্যুরে লঙ্ঘিব—এই আশে
সযত্নে লিখিনু নাম বালুময় সাগর-বেলায় !

ধরণীর সব কিছু একদিন হ'য়ে যায় ধূলি !
হায় মূঢ় ! কীর্তি দিয়ে চেয়েছিলে ভরিবারে হিয়া !
জানিতে না, খ্যাতি—সে তো মূল্যহীন অচল আধুলি !
অন্তরে প্রচ্ছন্ন গ্লানি এতকাল বেড়ালে বহিয়া !

একদা এ ভারতের তপোবনে মেঘমন্দ্রস্বরে
ঋষিকণ্ঠ উচ্চারিল : আনন্দ—সে ভূমাতে কেবল !
অল্পে সুখ নাই। হায়, জানিলাম এতকাল পরে,
কামনার পরিণতি—দীর্ঘশ্বাস, তিক্ত অশ্রুজল !

আমার আনন্দ আছে, হে ঈশ্বর, কেবল তোমাতে !
চরণারবিন্দে তব শান্তি মোর অনির্বচনীয় !
তোমার বাহিরে আমি কাঁদি শুধু মৃত্যু-যাতনাতে !
তৃষিত আত্মার মম তুমি স্বচ্ছ সুস্নিগ্ধ পানীয় !

তোমার নামের যাদু ছিন্ন করি দিবে মায়া-ডোর !
মানুষ মনেতে বদ্ধ, মনে মুক্ত। বিশ্বাসেই ত্রাণ !
তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা মোর !
আমার ঐশ্বর্য তুমি ! তুমি বিদ্যা, তুমি মোর প্রাণ !

মৃত্যুর শৃঙ্খলে বদ্ধ ! অমৃত-সিন্ধুর তীরে নাও !
অন্ধকার হ'তে লও আলোকেতে, হে জ্যোতির জ্যোতিঃ !
আজ আমি নিরাশ্রয় ! হে ঈশ্বর, আমারে শোনাও,
'কল্যাণ যে করে বৎস, তার কভু হয় না দুর্গতি !'

শোনাও অভয়মন্ত্র, 'এসো সর্ব ধর্ম তেয়াগিয়া !
আমারে আশ্রয় করো ; সুনিশ্চিত করিব উদ্ধার
সর্বপাপ হ'তে। নিত্য জাগি আমি তোমারই লাগিয়া !
যে মোর শরণাগত—আমি বহি যোগক্ষেম তার !'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি

[অতীত ও বর্তমান]

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।"
(শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৩১।১)

'হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার জন্মবশতই ব্রজভূমির এই মহত্ত্ব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। আর সেই হেতু ইহা ইন্দিরার (লক্ষ্মীর) চিরন্তন নিবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে।'

সে আজ প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বের কথা। গিরি গোবর্ধন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুসলমান যুবক টঙ্গাচালক কণ্টকাকীর্ণ উচ্চভূমির উপর অবস্থিত একটি মসজিদের পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়া বলিল: বাবাজী যাইয়ে—ভগ্‌ওয়ান্‌কা জনম্‌ভূম্‌ দেখিয়ে—বাবাজী, ভগবানের জন্মভূমি দেখে এস। 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি' নামক একটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে, কিন্তু তাহার যে এই প্রকার অবস্থা, তাহা বাবাজীর জানা ছিল না। যাই হোক বাবাজী তো কোন প্রকারে কণ্টকগুল্মপ্রাচীর ভেদকরত মসজিদের পশ্চাদ্‌ভাগে উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া একটি ছোট্ট পথে মসজিদ-প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইল; আর তাহাই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি—ইহা শ্রবণ করিয়া ভারাক্রান্তচিত্তে সেই স্থানেই তাহার প্রণতি জানাইয়া প্রস্থান করিল।

সম্প্রতি ৺জন্মাষ্টমী তিথিতে পুনরায় উক্ত মহাতীর্থে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও পুস্তিকা* ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই উদ্বোধনের শ্রদ্ধেয় পাঠকপাঠিকার সম্মুখে অর্ঘ্যরূপে উপস্থাপিত করিতেছি।

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল ভারতের, তাহা নহে—তিনি সমগ্র বিশ্বের এক মহান্‌ জ্যোতিষ্ক। শ্রীবৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে, কুঞ্জে কুঞ্জে ও যমুনা-পুলিনে সেই বালগোপালের লীলামাধুর্য স্মরণ করত আজিও লক্ষ লক্ষ নরনারী পুলকিতচিত্তে প্রেমাশ্রু-বর্ষণ করিতেছে। কিন্তু সেই লোকোত্তর মহাপুরুষের জন্মভূমি হইবার সৌভাগ্য যে ভূখণ্ড অর্জন করিয়াছে, শূরসেন প্রদেশের প্রধান নগরী সেই মথুরাতে এবং যে-স্থানে নন্দগোপগৃহে তাঁহার বাল্যলীলাসকল প্রেমবিহ্বল গোপ-গোপীগণের চিত্ত হরণ করিত, মা যশোদা যে-স্থানে দুরন্ত গোপালের দুরন্তপনায় বিব্রত হইতেন, সেই গোকুলে [বর্তমান নাম—'পুরাণা গোকুল' বা মহাবন], তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন বর্তমানে বস্তুতঃ কিছুই নাই বলিলেই চলে। শেষোক্ত স্থলে কোন প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষের ন্যায় পরিদৃষ্ট একটি বহুবিস্তৃত উচ্চ ভূমির উপরিভাগে মাননীয় সরকার বাহাদুর কর্তৃক পুরাতত্ত্বসংরক্ষণ আইনানুসারে সংরক্ষিত, সুদৃশ্য কারুকার্যমণ্ডিত বহু স্তম্ভবিশিষ্ট একটি বিস্তৃত দালান [বর্তমানে ইহার নাম—চৌরঙ্গী খাম্বা] এবং তাহা হইতে কিয়দ্দূরে অন্য একটি উচ্চস্থানে মা যশোদার সূতিকাগার নামে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ক্ষুদ্র গৃহ ব্যতীত আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। এই দালান এবং ক্ষুদ্র গৃহ কয়টি কোন্‌ সময়ে কাহাদ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। প্রত্ন-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান হইলে কালে তাহা অবশ্যই জানা যাইবে। পাণ্ডাগণ উক্ত দালান ও ক্ষুদ্র গৃহগুলিকে যথাক্রমে নন্দরাজার বৈঠক ও মা যশোদার সূতিকা-গাররূপে পরিচয় প্রদান করে। শেষোক্ত স্থলে সন্তানক্রোড়ে বাসুকীছত্র বসুদেবের যমুনা-উত্তরণ, যশোদার সদ্যোজাতা কন্যার সহিত পুত্র-বিনিময়

* ব্রজ-সাহিত্য-মণ্ডল হইতে প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থানকা ইতিহাস" ও অন্যান্য পুস্তিকাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য।

ইত্যাদির সূচক দু-একটি চমৎকার দেওয়ালচিত্র ও বালকৃষ্ণের মূর্তি প্রভৃতি আছে।* "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"—জনশ্রুতি একেবারে মূল ঘটনা বিরহিত হয় না—পৌরাণিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত এই ঐতিহ্য-প্রমাণ অনুসারে ইহা স্বীকার করিলে অন্যায় হইবে না যে—সুদূর প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডই নন্দকিশোরের বাল্যলীলাভূমি হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল। অনতিদূরে যমলার্জুন ভঙ্গের স্থান, যে স্থলে উদূখলবদ্ধ বালগোপাল অর্জুনবৃক্ষদ্বয়কে ভগ্ন করিয়াছিলেন এবং প্রায় এক মাইল দূরে যমুনার উপর ব্রহ্মাণ্ডঘাট, যে স্থলে বালক কৃষ্ণ স্বীয় ক্ষুদ্র মুখগহ্বরে মাতাকে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা পরিদৃষ্ট হয়। এই স্থলদ্বয়ও প্রাচীন বলিয়াই প্রতিভাত হইল। এতদ্ব্যতীত একটি প্রাচীন মন্দিরে দ্বারকাধীশ ও মথুরাধীশ নামক দুইটি অতি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তিও পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কারাভাবে সকল মন্দিরই কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ। পরবর্তী কোন সময়ে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের কোন আচার্য কর্তৃক 'নয়া গোকুল' নামে একটি নাতিবৃহৎ শহর 'পুরাণা গোকুল' হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে যমুনাতীরে শ্রীশ্রীবালগোপালজীর মন্দিরসহ স্থাপিত হইয়াছে। পুরাণা গোকুল হইতে প্রায় এক মাইল দূরে "রমণরেতী" [ক্রীড়াক্ষেত্রভূত বালুকারাশি] নামক উদাসী সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক স্থাপিত অপর একটি লীলাস্থলও প্রদর্শিত হয়। "বেণুবাদনরত চঞ্চল শ্যাম" এই পুণ্যভূমির কোন্ স্থলে বিচরণ করিয়াছিলেন, আর কোন্ স্থলে করেন নাই, তাহা নিরূপণের কোন উপায় নাই। ব্রজভূমির সকল স্থানই তাঁহার চরণরেণুস্পর্শের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিলেও, যমুনার অনতিদূরে বালুকাপূর্ণ একটি ভূখণ্ড ব্যতিরেকে প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন আমরা এই শেষোক্ত স্থলে পাইলাম না।

নয়া গোকুলেও পুরাণা গোকুলের ন্যায় প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন নাই।

* * *

এক্ষণে আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'জন্মভূমি' বিষয়ে আলোচনা করিব। 'পশ্চিম রেলওয়ের' মথুরা জংশন ষ্টেশন হইতে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে যে ছোট রেলপথ ও সুবিস্তৃত রাজপথ গিয়াছে, জংশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে রেলপথ ও রাজপথের বামপার্শ্বে যে সুবিস্তৃত উচ্চ ভূমি পরিদৃষ্ট হয়, সেইস্থলেই উক্ত ভূখণ্ড অবস্থিত, যাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম চরণস্পর্শের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল। উহাই ছিল পুরাণবর্ণিত 'কংস-কারাগার', উক্ত স্থলেই "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" শ্রীভগবান দেবকীমাতার ক্রোড়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পুরাণকারগণ বলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র 'বজ্র' উক্ত স্থলেই সেই সুপ্রাচীনকালে কেশবদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। কালপ্রভাবে সেই মূর্তি ও সেই মন্দির কি প্রকারে বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়াছে, তাহা নিরূপণের কোন উপায় আজ আর নাই। বর্তমান সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ উক্ত স্থলে খনন-কার্যের দ্বারা যে সকল নিদর্শন পাইয়াছেন এবং বিদেশী ভ্রমণকারিগণ মথুরা ও তত্রস্থ শ্রীশ্রীকেশবদেব সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল আলোচনা করত পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—এই জন্মভূমির উপর বহুবার বহু বিশাল মন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং কালপ্রভাবেই হউক বা যবনাদির আক্রমণের ফলেই হউক, পুনঃ পুনঃ সেই সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছে।

* অত্রস্থ পূজারী ব্রাহ্মণ সখেদে বলিলেন, "নবাব বাদশাহগণ এই মন্দিরে সেবাপূজার জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার পাট্টা এখনও আমাদের নিকট আছে; কিন্তু কালপ্রবাহে উক্ত জমি আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। সেবাপূজার কোন ব্যবস্থাই এখানে নাই। উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীসম্পূর্ণানন্দ, মথুরা পুরাতত্ত্বসংরক্ষণাগারের অধ্যক্ষ মহোদয় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি-প্রদত্ত স্থানটির প্রাচীনত্বসূচক সহানুভূতিপূর্ণ সাক্ষ্যপত্র পূজারী আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

আর উক্ত স্থলে শুধু যে শ্রীশ্রীকেশবদেবের মন্দিরই ছিল—তাহা নহে, উহার চতুষ্পার্শ্বে বৌদ্ধ ও জৈনগণের অনেক স্তূপ ও মন্দির বর্তমান ছিল। এক্ষণে মথুরা প্রত্নতত্ত্বশালায় একটি চমৎকার বুদ্ধমূর্তি পরিদৃষ্ট হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মভূমির নিকট একটি কূপ খননকালে প্রায় অভগ্ন অবস্থাতেই তাহা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে, উহার পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালেখ হইতে অবগত হওয়া যায়—ভিক্ষুণী জয়ভট্টা কর্তৃক ২৩০ সম্বতে (৫৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে) উহা স্থাপিত হইয়াছিল—'যশা' নামক বিহারে। জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের এক মূর্তিও উহার নিকটবর্তী স্থলে পাওয়া গিয়াছে। 'এরিয়ান্' নামক ইউনানী লেখক স্বরচিত 'ইণ্ডিকা' নামক পুস্তকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমসাময়িক (খৃঃ পূঃ ৩২৫-২৯৮) মেগাস্থিনিস্ কর্তৃক লিখিত বিবরণের আলোচনা প্রসঙ্গে 'শূরসেন' নামক সমৃদ্ধ জনপদ মথুরা নগরী, কেশবপুরা (কট্রা কেশবদেব, বর্তমান জন্মভূমি) ও যমুনা নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বর্ণিত আছে, মথুরা প্রদেশের জনসমুদায় 'হিরাক্লিজকে' (শ্রীকৃষ্ণকে) সম্মানসহকারে পূজা করিয়া থাকে। টলেমী মথুরাকে 'দেবগণের নগর' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্লিনি নামক অন্য ইওরোপীয় পণ্ডিতও কেশবপুরা ও যমুনা নদীর বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিসের ভারতে আগমনের বহুপূর্বেই কেশবপুরাতে (বর্তমান জন্মভূমিতে) শ্রীশ্রীকেশবদেবের (শ্রীকৃষ্ণের) মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। তদ্বিষয়ক কোন স্পষ্ট প্রমাণ কিন্তু অদ্যাপি হস্তগত হয় নাই। উক্ত জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণবিষয়ক প্রথম শিলালেখ যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা মহাক্ষত্রপ শোভাসের সময়ের (খৃঃ পূঃ ৮০-৫৭)। ব্রাহ্মীলিপি ও সংস্কৃত ভাষায় তাহাতে এই প্রকার লিখিত আছে—"বসুনা ভগবতো বাসুদেবস্য মহাস্থানে চতুঃশালং তোরণং বেদিকা প্রতিষ্ঠাপিতা প্রীতো ভবতু বাসুদেবঃ স্বামিস্য * মহাক্ষত্রপস্য শোভাসস্য সংবর্ত্তেয়াতাম্"—ভগবান্ বাসুদেবের মহাস্থানে চতুর্দ্বারযুক্ত মন্দির, তোরণ ও বেদিকা মহাক্ষত্রপ শোভাসের রাজত্বকালে বসুকর্তৃক স্থাপিত হইল। এই শিলালেখটি মথুরার প্রত্নতত্ত্বশালায় রক্ষিত আছে। খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্বে যে রাজপুতানায় চিতোরগড়ের নিকটবর্তী ঘোসুণ্ডী নগরে এবং মধ্যপ্রদেশের বিদিশাতে (বর্তমান ভীলসার নিকটবর্তী বেসনগরে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি পূজিত হইত, এতদ্বিষয়ে কয়েকটি শিলালেখ সম্প্রতি জন্মভূমিতে খননকার্যের সময় পাওয়া গিয়াছে।

মহাক্ষত্রপ শোভাসের পরবর্তিকালীন যে দুইটি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একটি মহাভাগবত রাজাধিরাজ সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (চতুর্থ শতাব্দী); অপরটি তাঁহার পরবর্তী কোন গুপ্তবংশীয় সম্রাটের। উক্ত শিলালেখদ্বয়ের কিঞ্চিৎ অংশ খণ্ডিত হইলেও, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে গুপ্তসম্রাট্গণ কর্তৃক উক্ত স্থলে মন্দির নির্মাণ ও নানাপ্রকার সৎকার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করেন। তল্লিখিত বিবরণেও মথুরা নগরী, যমুনা নদী, তাহার উভয় পার্শ্বে বৌদ্ধসংঘারাম ও স্তূপের বর্ণনা আছে। কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষাংশে ও স্কন্দগুপ্তের শাসনকালে বর্বর হূনগণের আক্রমণে মথুরানগরী এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সংঘারামসমূহের মধ্যে কতকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ও কতকগুলি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। শ্রীশ্রীকেশবদেবের মন্দির এই সময়ে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ক কোন স্পষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

* এই প্রকার পাঠই সম্ভবতঃ শিলালিপিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ছাপানো পুস্তকেরও এই প্রকার পাঠ।

চৈনিক পরিব্রাজক 'হিউএন চাং' ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তল্লিখিত বিবরণে স্পষ্ট-ভাবে কেশবদেবের মন্দিরের উল্লেখ না থাকিলেও, তৎকালে মথুরাতে পাঁচটি বৃহৎ দেবমন্দির ও কুড়িটি সংঘারামের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত পাঁচটি দেবমন্দিরের মধ্যে একটি অবশ্যই শ্রীশ্রীকেশবদেবের হইবে, ইহা অনুমান করা চলিতে পারে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত স্থলে খননকার্যের সময় একটি খণ্ডিত শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায়—মহারাষ্ট্রাধিপতি রাষ্ট্রকূটবংশীয় কৃষ্ণরাজ, কর্ক এবং তৃতীয় গোবিন্দদেব কর্তৃক এই জন্মভূমিতে মহৎ কোন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ হূন আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত কেশবদেব-মন্দির উক্ত রাজবংশীয়গণ-কর্তৃক পুনঃ স্ব-মহিমাতে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।

অতঃপর আসিল মূর্তিভঙ্গকারী গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণ। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নবম ভারতাক্রমণকালে মথুরা নগরী বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। মামুদের মন্ত্রী 'অল্-উত্বী' তল্লিখিত 'তারিখে-যামিনী' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—'সুলতানের আজ্ঞায় এমন একটি সুন্দর সুবিস্তৃত বিশাল মন্দির ধ্বংস করা হইল, যাহাকে স্থানীয় লোক দেবগণ-কর্তৃক নির্মিত বলিয়া থাকে। স্বয়ং সুলতানই বলিয়াছেন—এই প্রকার একটি সুবিশাল ইমারত নির্মাণ করিতে কমপক্ষে ১০ কোটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) আবশ্যক এবং বহু সুদক্ষ কারিগর নিযুক্ত করিলেও দুইশত বৎসরের কম সময়ে এই প্রকার ইমারত নির্মিত হইতে পারে না। সুলতানের আজ্ঞায় উক্ত মন্দির বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হইল। ২০ দিন ব্যাপিয়া মথুরা শহরে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলিল। তাহার ফলে সুবর্ণনির্মিত পাঁচটি দেবমূর্তি—পাওয়া গেল, যাহার একটির ওজন ১৪ মণ। উহার মূল্য কমপক্ষে ১৪ হাজার দীনার। উক্ত পাঁচটি দেবমূর্তির চক্ষুই বহুমূল্য মণির দ্বারা নির্মিত ছিল। একশত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে এই সমস্ত মূর্তি ও অন্যান্য লুণ্ঠিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্য গজনীতে প্রেরিত হইল।"

১২০৭ সম্বতের (১১৫০ খৃঃ) একটি শিলালেখ এই জন্মভূমিতে পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে অবগত হওয়া যায়—রাজা বিজয়পালদেব কর্তৃক মামুদ-বিধ্বস্ত শ্রীশ্রীকেশবদেবের মন্দির পুনরায় নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য বহু ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল এবং 'জজ্জ' প্রমুখ ১৪ জন প্রধান নাগরিক এই মন্দিরের ব্যবস্থাপক-রূপে বিনিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে সম্ভবতঃ রাজা বিজয়পাল দেব কর্তৃক নির্মিত এই মন্দিরেই শ্রীশ্রীকেশবদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন তাহা রাজা বিজয়পাল-দেব কর্তৃক নির্মিত মন্দির নহে; কারণ তৎকালে দিল্লী আগ্রা ও মথুরা প্রদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং এই প্রকারও হইতে পারে যে—বিজয়পাল দেব কর্তৃক নির্মিত মন্দির মুসলমানগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং অন্য কোন ধর্মপ্রাণ রাজা কর্তৃক নির্মিত মন্দিরই তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ অদ্যাপি হস্তগত হয় নাই। ১২শ শতাব্দী হইতে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে সিকান্দার লোদীর রাজ্যারোহণ সময় পর্যন্ত জন্মস্থানের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা দুরূহ।

ফিরিস্তা নামক মুসলমান লেখকের বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কোন সময়ে সিকান্দার লোদী কর্তৃক কেশবদেবের মন্দির ও যমুনার ঘাটসমূহ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অতঃপর আসিল মোগলগণের রাজত্ব। মহানুভব সম্রাট্ আকবরের সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দির, গোবর্ধনে হরিদেবের মন্দির প্রভৃতি নির্মিত হইলেও মথুরাতে কেশবদেবের মন্দির নির্মিত হইতে

পারে নাই। তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ওড়চ্ছারাজ্যের বুন্দেলা-নরেশ বীরসিংহদেব কর্তৃক এই জন্মভূমিতে ২৫০ ফুট উচ্চ এক বিশাল মন্দির ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার কারুকার্য ও শিল্পকলা এতই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারতে এই প্রকার মন্দির ছিল না। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক ট্রাভার্ণিয়ার, ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক বার্ণিয়ার এবং তৎপরবর্তিকালে ইটালীদেশীয় পরিব্রাজক মনুচী ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহারা সকলেই বীরসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত এই মন্দিরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ট্রাভার্ণিয়ারের বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায়—কোন সময়ে যমুনা নদী কেশবদেবের মন্দিরের নিকটেই প্রবাহিত হইত। তৎকালে তাহা দূরে সরিয়া গিয়াছিল। [এখনও যমুনা জন্মভূমি হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত]। মন্দিরটি নিম্নভূমিতে অবস্থিত হইলেও ৫।৬ ক্রোশ দূর হইতে তাহা পরিদৃষ্ট হইত, এতই ছিল তাহার উচ্চতা। মনুচী লিখিয়াছেন: জন্মাষ্টমীর দিন মন্দিরে যে আলোকসজ্জা হইত, তাহা আগ্রা হইতে স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হইত এবং বাদশাহ তাহা দেখিতেন।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পৌত্র—সম্রাট্ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ১৬৫৪ সালে মথুরা প্রদেশ জায়গীররূপে প্রাপ্ত হন। বীরসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত মন্দিরে বহু ব্যয়ে তিনি একটি বৃহৎ বেদিকা নির্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থাবশতঃ ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভ্রাতা ঔরঙ্গজেব কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব দারাশিকো-কর্তৃক কেশবদেবের মন্দিরে বেদিকা নির্মাণের বিষয় জানিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তিনি উক্ত বেদিকা ধ্বংস করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন, তাঁহার মথুরাস্থিত ফৌজদার আবদুল কর্তৃক রাজাজ্ঞা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়। উক্ত সময়েই ধর্মান্ধ সম্রাট 'কাফের'গণের ৬বৃন্দাবনস্থ ও মথুরাস্থিত সমস্ত মন্দির, পাঠশালা প্রভৃতি ধ্বংস করিবার ও তাহাদের পূজা পাঠ ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু নানা কারণে সেই আদেশ তৎকালে পালিত হইতে পারে নাই। হিন্দুগণ উক্ত রাজাজ্ঞা শ্রবণ করত মন্দিরের মায়া ত্যাগ করিয়া দেবমূর্তিগুলিকে গোপনে স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। এই সময়েই বৃন্দাবনের গোবিন্দদেব, মদনমোহন ও গোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহগুলি রাজপুতানায় জয়পুর ও করৌলী প্রভৃতি স্থানে নীত হয়। কেশবদেবের বিগ্রহ যে কোথায় প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহা মথুরার দক্ষিণ-পূর্বকোণে কোনস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। অতঃপর কয়েক মাস পরে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব স্বয়ং মথুরাতে আগমন করিয়া মহাত্মা বীরসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত সেই বিশাল মন্দির ধ্বংস করেন। বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির প্রভৃতিও এই সময়ে উক্ত ধর্মান্ধ নরপতি কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। এই সময়ে যে সকল দেবমূর্তি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা রাজাজ্ঞায় আগ্রাতে প্রেরিত হয় এবং তত্রস্থ দেওয়ান-ই-খাসের নিকটবর্তী ছোট মসজিদের [যাহাতে সম্রাট শাহজাহান বন্দীদশায় আবদ্ধ ছিলেন] সিঁড়ির নিম্নদেশে প্রোথিত হয়, উদ্দেশ্য সকলের পদাঘাতে উক্ত দেবমূর্তিসকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। অতঃপর এই ধর্মান্ধ সম্রাট্ বীরসিংহদেব-নির্মিত সেই সুবিস্তৃত মন্দিরের ভিত্তির পূর্বভাগে মন্দিরে ব্যবহৃত প্রস্তরগুলির দ্বারাই একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যাহা অদ্যাপি উক্তস্থলে পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই সময়ে উক্ত মোগল সম্রাট্ নাম বদলাইয়া মথুরার 'ইস্‌লামাবাদ' এবং বৃন্দাবনের 'মোমিনাবাদ' নাম দেন। এই নামদ্বয় কিন্তু সরকারী কাগজ-পত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, জনগণ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই।

ঔরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে 'জন্মভূমি' উপেক্ষিত অবস্থাতেই বহুকাল পড়িয়া থাকে। অতঃপর মথুরা প্রদেশ জাঠগণের অধিকারে আসে! তাঁহারা মথুরার ধর্মীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করেন। মথুরার ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। অতঃপর জয়পুরের নৃপতিগণ মথুরাতে দপ্তরখানা দুর্গ ও সেনানিবাস ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এই সময় 'জন্মভূমি' কিছুকাল সরকারী দপ্তররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অতঃপর মথুরামণ্ডল মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারে আসে। এই সময় গোয়ালিয়ররাজ মহাদ্জী সিন্ধিয়া 'জন্মভূমি'র উপর একটি মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা করেন। কিন্তু বারাণসীর পণ্ডিতগণের প্রতিকূলতায় তাহা সম্ভব হয় নাই। তিনি 'জন্মভূমি'র সন্নিকটে একটি সরোবর খনন করেন, বর্তমানে উক্ত সরোবরের নাম 'পোতরা কুণ্ড'! অজ্ঞলোকে বলে —জননী দেবকী এই সরোবরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া স্নান করেন।' ইহাই হইল শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমির প্রাচীন ইতিহাস।

*　　*　　*

ইদানীন্তনকালের ইতিহাস এই—১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মারাঠাগণকে পরাজিত করিয়া ইংরাজগণ মথুরার আধিপত্য লাভ করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে বারাণসীরাজ পাটনীমল শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি ও তৎসংলগ্ন স্থান সকল নিলামে ক্রয় করেন। তিনি উক্তস্থলে মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পূর্ণ হয় নাই। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মহামনা মদনমোহন মালবীয়জী রাজা শ্রীযুগলকিশোর বিড়লার সহায়তায় বারাণসীরাজের উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে উক্ত ভূমি ক্রয় করেন। কিন্তু মন্দিরনির্মাণের ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পূজ্য মালবীয়জীর ইচ্ছানুসারে বিড়লাজী কর্তৃক ১৯৫১ সালে একটি 'জন্মভূমি ট্রাষ্ট' গঠিত হইয়াছে। যাহার মধ্যে শ্রীবিড়লা প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ধনকুবেরগণ আছেন। এই ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য 'জন্মভূমি'র উপর শ্রীশ্রীকেশবদেবের মন্দির পুনর্নির্মাণ এবং কটরা কেশবদেবের অর্থাৎ 'জন্মভূমি'র চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানের পুনরুদ্ধার। এই স্থলে এই প্রকার সংস্থা তাঁহারা সংগঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, যাহা হইবে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির একটি সুবিশাল কেন্দ্র। সম্প্রতি কয়েকবার শ্রমদানের ফলে স্থানটি পরিষ্কৃত হইয়াছে; ২৫ বৎসর পূর্বে যে কণ্টকগুল্মাকীর্ণ পতিতভূমি দেখিয়াছিলাম, তাহা আর নাই। জন্মভূমির পূর্বাংশে অবস্থিত মসজিদবাটীর পশ্চিমাংশ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং ওড়চ্ছারাজ বীরসিংহদেব কর্তৃক নির্মিত মন্দিরের সমগ্র ভিত্তিটি (কয়েকটি ভূনিম্নস্থ কক্ষসহ) খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। উক্ত ভিত্তির উপর মসজিদের ঠিক পশ্চাদ্‌ভাগে একটী চন্দ্রাতপের নিম্নদেশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি স্থাপন করত আজ জন্মাষ্টমীর দিন আনন্দোৎসব হইতেছে। বহু ভক্ত নরনারীর সমাবেশে স্থানটি আজ মুখরিত। শুনিলাম এই উৎসব মাসাধিককাল পর্যন্ত চলিবে। উত্তর প্রদেশ সরকার উক্ত স্থলে কৃষি ও স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। লোকনৃত্য রাসলীলা ও নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। অস্থায়ী দোকানপাটও কয়েকটি খুলিয়াছে। মন্দিরভিত্তির পুরোভাগে উত্তরপ্রদেশ সরকার কর্তৃক 'এনামেল ধাতুপাত্রে' অঙ্কিত দুইটি বিজ্ঞপ্তিপত্র ইংরেজী ও হিন্দীভাষায় প্রদর্শিত; যাহার বাংলা মর্মানুবাদ এই—

"কৃষ্ণচবুতারা নামে প্রসিদ্ধ এই স্থানটি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে মথুরার শাসক কংসের কারাগৃহে প্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই স্থানটিতেই। এইস্থলে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি শিলালেখ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রামাণ্য বলে ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে শকরাজ শোদাসের

রাজত্বকালে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সম্মানের জন্য এখানে একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। অতঃপর খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় শাসক চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এখানে একটি সুবৃহৎ সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্‌চাং এই মন্দিরটি দর্শন করেন। গজনীর সুলতান মামুদ ১০১৭ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি ধ্বংস করেন। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা বিজয়পালদেব কর্তৃক অন্য একটি মন্দির এই স্থলেই নির্মিত হয়। ইহাও খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে সিকান্দার লোদী কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শেষ স্মৃতিচিহ্ন এইস্থলেই ওড়চ্ছার রাজা বীরসিংহদেব কর্তৃক ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। বিদেশী পরিব্রাজক ট্রাভার্নিয়ার, বর্নিয়ার এবং মনুচী এই মন্দিরটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব এই মন্দিরটি ভূমিসাৎ করেন এবং সেই মন্দিরের বৃহৎ ভিত্তির পূর্বাংশে তাঁহার আজ্ঞায় একটি মসজিদ্ নির্মিত হয়। এই জন্মভূমির স্মৃতিরক্ষার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতায় এক্ষণে এখানে একটি উপযুক্ত স্মৃতিভবন নির্মিত হইবে।”

আমরা নিশ্চয়ই উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই শুভ দিনটির প্রতীক্ষা করিব।

এই পরিচয় তোমার সাথে?

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

তুমি, এমনি নিবিড়, এমনি গভীর!
লীলাচঞ্চল দেবতা মোর!
বরষার এই ঘন ঘটা-রূপে
নয়নে জীবনে ঘনালে ঘোর?

মেঘ-মেদুর হৃদয়-আকাশে
ক্ষণিক চকিত বিজলি চাওয়া,
বজ্রবেদন হানো ঘন ঘন—
এই কি তোমার পরশ পাওয়া?

দুঃখ-নিশার নিরাশার শ্বাসে
এমনি সজল বাতাসে ভরা,
করুণা-ধারায় আঁখির তারায়
এমনি অঝোর ঝরনে ঝরা!

দেয়া-গরজনে বাঁশরীর ধ্বনি
নিশীথ রাত্রে ঘুম ভাঙায়
মালতী-কুঞ্জে নীপের পুঞ্জে,
অবশ হিয়ায় দোল লাগায়!

মধুর মিলনে নিঠুর বিরহে
এমনি সরস শ্যামলিমায়,
অনুভবে মন ছায় অনুক্ষণ
ধরি ধরি করি, ধরা না যায়!

অধীর উতল স্রোত-ছল্‌ছল্
জীবন-নদীর পারাপারে,
স্তিমিত আলোকে পলকে পলকে
খেয়া-তরী পাওয়া বারে বারে-

কেয়া-কণ্টকে আঙুলিয়া রাখা
রক্ত ঝরানো বনের পথে,
আপনা-হারানো ভাবে বিস্ময়ে—
এই পরিচয় তোমার সাথে?

শ্রীকৃষ্ণের মহানুভবতা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

আজ প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তাঁহার মহিমোজ্জ্বল জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী অনুধ্যান করিলে তাঁহার অশেষ মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কংসবধ করিয়া স্বীয় মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া মস্তকের দ্বারা তাঁহাদের পাদস্পর্শ করিয়া বন্দনা করিলেন। দেবকী ও বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে জগতের ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং স্নেহ প্রদর্শন করিতে পারিলেন না, কেবল কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার নিকট গমন করিয়া বিনয়াবনত হইয়া 'হে মাতঃ! হে পিতঃ!' বলিয়া সাদরে ডাকিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের প্রীতি জন্মাইয়া বলিলেন, 'এতদিন কংসের ভয়ে আমাদের চিত্ত সর্বদা উদ্বিগ্ন ছিল, আমরা অসমর্থ ছিলাম, আপনাদের সেবা করিতে পারি নাই; অতএব এতদিন আমাদের নিরর্থক অতিবাহিত হইয়াছে। হে মাতঃ! হে পিতঃ! আমরা পরাধীন ছিলাম, দুরাত্মা কংস আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছে, আমরা আপনাদের সেবা করিতে পারি নাই; অতএব আপনারা আমাদিগকে ক্ষমা করুন।'

"তস্মাবকল্পয়োঃ কংসান্নিত্যমুদ্বিগ্নচেতসোঃ।
মোঘমেতে ব্যতিক্রান্তা দিবসা বামনর্চতোঃ॥
তৎক্ষন্তুমর্হথস্তাত! মাতর্নৌ পরতন্ত্রয়োঃ।
অকুর্বতোর্বাং শুশ্রূষাং ক্লিষ্টয়োর্দুর্হৃদা ভৃশম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৪৫

* * *

যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ ও কুকুর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ কংসের ভয়ে আকুল হইয়া নানাদিকে অবস্থান করিতেছিলেন এবং প্রবাস-ক্লেশে কাতর হইয়া পড়িতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই জ্ঞাতিদিগকে এবং বান্ধবগণকে নানা দিক হইতে আনাইলেন এবং আশ্বাস দিয়া ও অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে ধনসম্পত্তি দান করিয়া নিজ নিজ গৃহে বাস করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া তাঁহারা পরম আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

* * *

শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিয়া সুদামা নামক এক ভক্ত মালাকারের ভবনে বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইলেন। সে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হঠাৎ দর্শন করিয়া শির নত করিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং ভক্তিভরে তাঁহার অর্চনা করিয়া তাঁহাকে মাল্য প্রদান করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে প্রণত ও শরণাপন্ন দেখিয়া কৃপা করিলেন এবং তাহার প্রার্থিত—ভগবানে অচলা ভক্তি, ভক্তগণের প্রতি সৌহার্দ্য এবং সর্বভূতে দয়ারূপ বর প্রদান করিলেন। সে আর কিছু প্রার্থনা না করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পার্থিব বহু বর দিলেন!

* * *

পরম ভক্ত অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গৃহে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে ভগবদ্বোধে অভ্যর্থনা, অর্চনা, সেবা ও স্তুতিবাদ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে বলিলেন, 'হে তাত! আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য এবং শ্লাঘ্য বন্ধু, আমরা সর্বদা আপনাদের রক্ষা, পোষণ ও অনুকম্পার পাত্র; কারণ আমরা আপনাদের পুত্রতুল্য।'

"ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাঘ্যো বন্ধুশ্চ নিত্যদা।
বয়ন্তু রক্ষ্যাঃ পোষ্যাশ্চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৪৮

তিনি আরও বলিলেন, 'হে পিতৃব্য! আপনার মত মহাভাগ সাধুদের সর্বদা সেবা করা কর্তব্য। জলময় তীর্থসমূহ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন না, মৃত্তিকা ও শিলাময় তীর্থক্ষেত্রসমূহ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন না এবং দেবগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন না; তাঁহারা সকলে দীর্ঘকাল সেবিত হইয়াই পবিত্র করিয়া থাকেন। আপনার মত সাধুব্যক্তি কিন্তু দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন।'

"ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৪৮

* * *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মঙ্গল-কামনায় তাঁহাদের ভাল-মন্দ জানিবার জন্য অক্রূরকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাঠাইবার কালে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে বলিয়াছিলেন, 'আপনি হস্তিনাপুরে গমন করুন। ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবগণের প্রতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহার সম্প্রতি ভাল কি মন্দ তাহা জানিয়া আসুন। তাহা জানিলে আমরা আমাদের সুহৃদ্গণের মঙ্গল যেরূপে হইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিব।'

"গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধু বা।
বিজ্ঞায় তদ্বিধাস্যামো যথা শং সুহৃদাং ভবেৎ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৪৮

* * *

রুক্মিণীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া একদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, 'হে রাজপুত্রি! ঐশ্বর্যশালী রাজগণ তোমাকে লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। তোমার ভ্রাতা ও পিতা তোমাকে তাঁহাদিগের করে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ তোমাকে লাভ করিবার জন্য তোমার পিতৃভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তুমি সেই সকল প্রার্থিগণকে ত্যাগ করিয়া কেন আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে? আমি জরাসন্ধ প্রভৃতি বলবান্দের সহিত শত্রুতা করিয়াছি। তাহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্র মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি। আমি প্রায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছি। এরূপ অযোগ্য আমাকে তুমি কি কারণে পতিত্বে বরণ করিলে? হে সুন্দরি! যাহাদের পথ জানা যায় না এবং যাহারা লোকাতীত আচরণ করিয়া থাকে, তাদৃশ পুরুষগণের অনুবর্তন করিলে রমণীগণ প্রায়ই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। আমি এবং আমার অনুরক্ত জনগণ নিষ্কিঞ্চন। যাহাদের কিছুই নাই, তাহারাই আমাদের জন এবং আমরা তাহাদের নিত্য প্রিয়। অতএব আঢ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই আমাকে ভজনা করে না।'

"নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৬০

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন যে ভিক্ষুকগণই তাঁহার বৃথা প্রশংসা করিয়া থাকে—"ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা"। এই উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। যেহেতু নিষ্কিঞ্চন ও ভিক্ষুকদের প্রতি তাঁহার হৃদ্যতা অসাধারণ।

* * *

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে যাইবার পূর্বে জরাসন্ধকে বধ করা উচিত—এই কথা যাদবগণ পুনঃ পুনঃ জিদ্ করিয়া বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধব মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে উদ্ধব! তুমিই আমাদের বন্ধু, কর্তব্য এবং অকর্তব্য বিষয়ে তুমিই পরম দ্রষ্টা, মন্ত্রণাসাধ্য বিষয়সমূহে তুমি অভিজ্ঞ; অতএব উপস্থিত কি করা উচিত, তুমি বল; তুমি যাহা বলিবে, আমরা তাহাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ

করিব এবং তদনুসারে কার্য করিব।' জরাসন্ধকে প্রথমে জয় করা কর্তব্য—উদ্ধব মহাশয় এই সিদ্ধান্ত দিলে শ্রীকৃষ্ণ তদনুসারে কার্য করিলেন।

*   *   *

রাজসূয়-যজ্ঞে কোন্ ব্যক্তি অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য —এই বিষয় লইয়া সভামধ্যে সভ্যগণ আলোচনা করিতে লাগিলেন। বহু যোগ্য ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাই তাঁহারা অনেক আলোচনা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন মাদ্রীপুত্র সহদেব সভামধ্যে বলিতে লাগিলেন, 'যাদবগণের অধিপতি ভগবান্ কৃষ্ণই অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য। কারণ, বর্তমান সময়ে তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা মহত্তর কোন ব্যক্তি নাই।'

"তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণম্।"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৭৪

প্রধানগণ সভামধ্যে 'সাধু, সাধু' বলিয়া উঠিলেন এবং সহদেবের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠিরাদি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এমন সময় শিশুপাল স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া সভামধ্যে বাহু উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন, 'হে সভ্যগণ! বলবান্ কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, এই জনশ্রুতি সত্য। যেহেতু বালক সহদেবের কথায় প্রধানগণের বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিল। হে সভ্য-শ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সকলে পূজনীয় পাত্র নিরূপণে অভিজ্ঞ; সুতরাং কৃষ্ণ অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য—সহদেবের এই বালভাষিত আপনারা গ্রহণ করিবেন না।' তৎপরে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে কুলকলঙ্ক, কুলভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী গো-পালক বলিয়া সভামধ্যে তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সমবেত সাধু ব্যক্তিগণ সভাত্যাগ করিয়া গেলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সিংহ যেরূপ শৃগালের রবে নীরব থাকে, প্রথমে সেইরূপ নীরব রহিলেন, কিছুই বলিলেন না:

"নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্।"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৭৪

*   *   *

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতরা গোপীগণকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের মহানুভবতাবশতঃ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'হে প্রিয়তমাগণ! তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ এবং শুদ্ধভাবে আমার আশ্রয় লইয়াছ। আমি তোমাদের প্রত্যুপকার করিতে দেব-পরিমিত আয়ু দ্বারাও সক্ষম হইব না। তোমাদের সৎকার্যের দ্বারাই আমার ঋণ পরিশোধ হউক।'

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০.৩২

*   *   *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা শ্রীদাম অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। জিতেন্দ্রিয় ও নিঃস্পৃহ হইয়া যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা জীবনধারণ করত গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ছিলেন। অর্থাভাবে তিনি মলিন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া থাকিতেন। তাঁহার পত্নীও তাঁহার ন্যায় গুণযুক্তা ছিলেন এবং জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া থাকিতেন। তিনি পতির জন্য যদৃচ্ছালব্ধ আহার্য বস্তু রন্ধনাদি করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন। পতিব্রতা ব্রাহ্মণপত্নী একদিন চিন্তায় অবসন্না হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পতিকে বলিলেন, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার বাল্যসখা বলিয়া শুনিয়াছি। তিনি এখন দ্বারকার অধিপতি। আপনি দারিদ্র্যে কষ্ট পাইতেছেন জানিতে পারিলে তিনি আপনাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন।

আপনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, আপনি তাঁহার সমীপে গমন করুন।' ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী স্বজনগণের নিকট হইতে চারি মুষ্টি চিপিটক যাচ্ঞা করিয়া আনিলেন এবং উহা জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া সেই উপহার পতির হস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীদাম ইতস্ততঃ করিয়া দ্বারকার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং কোনক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন রুক্মিণীদেবীর পর্যঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দূর হইতে মলিন, দরিদ্র শ্রীদামকে দেখিতে পাইয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং নিকটে আগমন করিয়া আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বাল্যসখাকে শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্কে বসাইয়া পূজা করিলেন এবং তাঁহার চরণযুগল ধৌত করিয়া সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সোল্লাসে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের হস্তধারণ করিলেন এবং একত্রে গুরুগৃহে বাসের কথা ও বাল্য-কালের মনোহর কাহিনীসকল বলিতে লাগিলেন। শ্রীদাম চিপিটক উপহার আনিয়া লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারিতেছেন না—ইহা শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিয়া বলিলেন, 'হে সখে! তুমি তোমার গৃহ হইতে আমার জন্য কি উপহার আনয়ন করিয়াছ?' শ্রীদাম শ্রীপতিকে চিপিটক উপহার দিতে পারিলেন না, অপিচ লজ্জিত ও অধোমুখে হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ চিপিটকগুলি কাড়িয়া লইলেন এবং বলিলেন, 'হে সখে! তুমি ত আমার প্রীতিকর উপহার আনিয়াছ, এতক্ষণ কেন বল নাই?' এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক মুষ্টি চিপিটক পরম তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। দরিদ্র শ্রীদাম দ্বারকাপতির মহানুভবতা দেখিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

* * *

অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান আহত হইলে উত্তরাদেবী করুণ আর্তির সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্বীয় সন্তানের জীবন ভিক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার কাতরতায় কৃপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'আমি জীবনে কখনও পরিহাস করিয়াও মিথ্যা বলি নাই, আমি কখনও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করি নাই,—এই সকলের বলে উত্তরার সন্তান জীবন লাভ করুক'—এই কথা বলিবামাত্র অভিমন্যুর সন্তান কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

* * *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, 'আমি নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্বৈর, সমদর্শী মুনির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি, যেহেতু তাঁহার চরণরজঃ দ্বারা নিজেকে পবিত্র করিতে পারিব।'

"নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।১৪

এই প্রকারের ভক্তবৎসলতা ও ভক্তকে সম্মান-প্রদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয় না।

* * *

রুক্মিণী-প্রেরিত এক ব্রাহ্মণ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া স্বীয় আসন হইতে নামিলেন এবং তাঁহাকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন। দেবগণ শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ পূজা করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার স্বীয় হস্ত দ্বারা তাঁহার চরণদ্বয় সম্মর্দন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'যে সকল ব্রাহ্মণ স্বলাভ-সন্তুষ্ট, সাধু, সকল ভূতের সুহৃত্তম, নিরহঙ্কার, এবং শান্ত—তাঁহাদিগকে আমি মস্তক অবনত করিয়া বার বার নমস্কার করি।'

"বিপ্রান্ স্বলাভসন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহৃত্তমান্।
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ নমস্যে শিরসাঽসকৃৎ॥"
—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০।৫২

মৃগ মনে করিয়া জরা নামক ব্যাধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। ব্যাধ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে মস্তক রাখিয়া নিপতিত হইয়াছিল। সে তাহার কৃতকর্মের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাহাকে সংহার করা হউক, শ্রীকৃষ্ণ তাহার কোন অপরাধ দেখিলেন না, বরং বলিলেন, 'হে ব্যাধ! তুমি ভয় করিও না। গাত্রোত্থান কর। তোমার এ কার্য আমারই অভিলষিত। এক্ষণে তুমি আমার আজ্ঞায় সুকৃতি-গণের লভ্য স্বর্গলোকে গমন কর।'

"মাভৈর্জরে! ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে।
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্॥"

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।৩০

মহামানব শ্রীকৃষ্ণের মহানুভবতার অন্ত নাই। যতই তাঁহার বিষয়ে অনুধ্যান করা যায়, ততই তাঁহার মহৎ চরিত্রের পরিমাপ করিতে পারা যায় না।

একান্তিকা

[ইন্দিরা দেবীর হিন্দী ভজনের অনুবাদ]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ, গাহিব তব নাম
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম।

জগত হ'তে দূরে—সুদূরে—পুলিনে গঙ্গার
তারকা যেথা তুষার চুমে গহন-ঝঙ্কার,
একটি ছোট মন্দির হে বিরচি' নাথ তব
কলিতে ফুলে সাজায়ে বেদী সেথায় অভিনব
হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ গাহিব তব নাম
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম।

সে-নিরালায় রবে না কেহ আপন পর আর,
বৈরী নয়, বন্ধু নয়, কান্ত পরিবার,
মুখে কেবল তোমারি নাম রহিবে সাথী বঁধু,
তোমারি রবো সেবিকা রাঙি তোমারি রঙে শুধুঃ
হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ গাহিয়া তব নাম
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম।

শ্যামল শেজ বিছাব আমি সেথা শৈলাচলে,
বাতাস গাবে ঘুমপাড়ানি তারার আঁখিতলে,
ঘুমাব আমি করিয়া শুধু তোমারি নাম ধ্যান,
ভাঙিলে ঘুম প্রথম তব গাহিব নাম গানঃ
হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ নবঘনশ্যাম
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম।

এমনি প্রেমে ডাকিব—চেয়ে ও-রাঙা পায়ে ঠাঁই
তোমারে শুধু দেখিব—আঁখি রাখিব হে যেথাই।
প্রেম আমার তোমারে বঁধু আনিবে বেঁধে না কি?
মীরার হে গোপাল, দেখিব কেমনে দাও ফাঁকিঃ
ডাকার মতো ডাকিব যবে একবার ও-নাম
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম।

ভক্তি-পথ

স্বামী জীবানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসংখ্য উপদেশের মধ্যে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন ক'রে দেওয়ার বাণীই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাকে তিনি বার বার শুনিয়েছেন : মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ।

এখন প্রশ্ন আসে,—ভগবান লাভ ক'রে কি হবে? উত্তর : দুঃখের হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে—জীবন মধুময় হবে। গীতায় আছে :

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

আমরা যে আনন্দ থেকে এসেছি—সেই আনন্দ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। ঈশ্বরই সেই আনন্দস্বরূপ। তিনি রসস্বরূপ 'রসো বৈ সঃ'—পরম-প্রেমস্বরূপ।

প্রেমময় ঈশ্বরকে পাবার জন্য বহু সাধক ও বহু আচার্য নিজেদের উপলব্ধি থেকে লোককল্যাণার্থে বিভিন্ন মতের ও পথের নির্দেশ দিয়েছেন। যে-কোন একটি মত বা পথকে অবলম্বন ক'রে ঐকান্তিকী নিষ্ঠায় গুরুনির্দিষ্ট সাধন-পথে অগ্রসর হ'তে থাকলে সাধক যথাকালে সকলের একই গন্তব্যস্থল ঈশ্বরে পৌঁছুতে পারে। ভক্তিপথই সর্বসাধারণের উপযোগী এবং সর্বাপেক্ষা সহজ সরল ও প্রশস্ত পথ।

ভক্তি-পথ সহজ কেন? প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই আছে ভালবাসার অন্তঃসলিলা রস-নির্ঝরিণী। মানুষে আবার এই হৃদয়াবেগ অধিকতর। ভালবাসার তিনটি রূপ—শ্রদ্ধা, প্রীতি ও স্নেহ। গুরুজনদের উপর ভালবাসার যে প্রকাশ তাকে বলা হয় শ্রদ্ধা, সমবয়স্কদের প্রতি প্রকাশিত হ'লে প্রীতি বা সখ্য—আর কনিষ্ঠদের উপর ভালবাসার যে বাহ্য প্রকাশ তার নাম স্নেহ। শ্রদ্ধা প্রীতি ও স্নেহের বন্ধনে সকলেই বদ্ধ। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি—এই অনুরাগ যখন ঈশ্বরে নিবেদিত হয় তখন এর নাম হয় ভক্তি। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেছেন, ঈশ্বরে পরম অনুরক্তিই ভক্তি—'সা পরানুরক্তি-রীশ্বরে'। দেবর্ষি নারদের মতে ভক্তি হচ্ছে—ঈশ্বরের উপর পরম প্রেম—'সা তস্মিন্ পরম-প্রেমরূপা'। পরম অনুরাগ আর পরম প্রেম একই। পরিবর্তনশীল জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী—অতএব জাগতিক ভালবাসাও ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র প্রেমময় ঈশ্বর বা পরমাত্মাই নিত্য বা অবিনাশী; সেইজন্য ঈশ্বরের উপর প্রেমও নিত্য ও অবিনাশী। যে অনুরাগ আমাদের স্বাভাবিক, অন্য কোথাও থেকে আনতে হয় না—তা মানুষকে না দিয়ে ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে পারলেই হ'ল। ভক্তিপথে হৃদয়াবেগের শুধু 'মোড়' ফিরিয়ে দেওয়া—তাই এ পথ সহজ।

আবার মানুষের আছে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি স্বাভাবিক বৃত্তি। যদি কামনা করতেই হয় তবে ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা ঐশ্বর্য প্রার্থনা না ক'রে সকল সুখৈশ্বর্যের উৎসস্বরূপ ভগবানকেই চাই না কেন? যদি ক্রোধ না যায় তবে মানুষের উপর ক্রুদ্ধ না হ'য়ে ভগবৎকৃপা লাভ হ'ল না ব'লে তাঁরই উপর ক্রোধ করি না কেন? কাম ক্রোধ লোভ মান-অভিমান সবই তাঁকে কেন্দ্র ক'রে হোক। ভক্তি-পথে নিজস্ব বৃত্তিগুলিকে জোর ক'রে ছাড়তে হয় না—শুধু ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হয়, তাই এ পথ সহজ।

শরীর-মনকে কেন্দ্র ক'রে যতক্ষণ অহংকার অভিমান ততক্ষণ নিজেকে শরীর-মনের অতীত ব'লে চিন্তা করা কষ্টকর। আবার রাজযোগ দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাও সুকঠিন। তাই ভক্তিমার্গই প্রশস্ত।

বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলের পক্ষেই ভক্তি-পথ উপযোগী ও সহজ।

অদ্বৈতসিদ্ধিকার আচার্য মধুসূদন সরস্বতী ভক্তির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এই ভাবে: দ্রবীভাবপূর্বিকা মনসো ভগবদাকাররূপা সবিকল্পবৃত্তির্ভক্তিরিতি—অর্থাৎ ভগবৎপ্রেমে দ্রবীভূত হ'য়ে ভগবানের সঙ্গে চিত্তের যে তদাকার ভাব তা-ই ভক্তি।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীভগবান স্বয়ং ভক্তির লক্ষণ নিম্নোক্তরূপ বলেছেন:

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তম॥

শ্রীভগবানের গুণগান শ্রবণমাত্রই তাঁর প্রতি সমুদ্রগামিনী গঙ্গার স্রোতোধারার মত চিত্তের যে অহেতুক অবিচ্ছিন্ন গতি তা-ই ভক্তি।

ভক্তি দুই প্রকার: (১) গৌণী, (২) পরা। সাধনাবস্থার ভক্তির নাম গৌণী ভক্তি, আর সিদ্ধাবস্থার ভক্তির নাম পরাভক্তি। গৌণী ভক্তি আবার দুই প্রকার: (১) বৈধী, (২) রাগাত্মিকা। শ্রীগুরুর উপদেশানুসারে এবং শাস্ত্রের সহায়তায় শ্রীভগবানের উপর প্রীতি উৎপাদনের জন্য যে সাধন তাকে বলা হয় বৈধী ভক্তি। 'বিধিসাধ্যমানা বৈধী সোপানরূপা।' (দৈবীমীমাংসা-দর্শন)

সাধন-পথে অগ্রসর হওয়ার সোপান-স্বরূপ বৈধী ভক্তির নয়টি অঙ্গ যথাক্রমে:

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

হে ঈশ্বর! কর্ণকুহরে যেন অহর্নিশি তোমারই বাণী প্রবিষ্ট হয়, মুখে সর্বদা যেন তোমারই কথা উচ্চারণ ও তোমার নাম-গুণ গান করি, তোমার স্মরণ-মননে পূজা-বন্দনা-সেবায় যেন আমার কাল কাটে, সংসারে একমাত্র তুমিই আমার বন্ধু—একমাত্র প্রভু, আমি তোমার দাস, তোমার শরণাগত, তোমারই উপর আমার আত্মসমর্পণ—এই ভাবে বৈধী ভক্তির সমস্ত অঙ্গের সাধন দ্বারা চিত্ত নির্মল হ'লে সাধকের অন্তঃকরণ শ্রীভগবানের যথার্থ মন্দিরে পরিণত হয়, তখন তাঁর চিত্তে অবিরল প্রেমধারা প্রবাহিত হ'তে থাকে। ভগবৎপ্রেমের এই অবস্থার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণে মহর্ষি অঙ্গিরা বলেছেন: 'রসানুভাবিকানন্দশান্তিদা রাগাত্মিকা।' রাগাত্মিকা ভক্তির উদয়ে সেই রসস্বরূপ—আনন্দ-স্বরূপের অনুভব হয়, পার্থিব শোক-দুঃখ মান-অপমানের বহু ঊর্ধ্বে তখন মন অবস্থান করে এবং অপার শান্তি অনুভূত হয়।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রিয়তম ভগবান ব্যতীত আর কিছুই চান না। সাংসারিক সুখ, ভোগবিলাস তাঁর নিকট অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সমস্ত ভূমণ্ডলের আধিপত্য এবং অণিমাদি সিদ্ধিও তাঁর কাম্য নয়।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
　　ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
　　ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্‌বিনান্যৎ॥

ভাগবত, ১১।১৪।১৪

প্রকৃত ভক্তের অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। এইরূপ ভক্তের মধ্যে নানা অলৌকিকত্ব দেখা যায়; তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও আনন্দ প্রকাশ করেন, কখনও বা মৌনভাবে অবস্থান করেন।

ক্বচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
　　দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
　　ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥

ঐ: ১১।৩।৩২

পরাভক্তির অবস্থায় ভক্ত ভগবানের চিন্ময়রূপ দর্শন ক'রে কৃতকৃত্য হন। পরাভক্তি লাভ হ'লে

জ্ঞানের প্রকাশ হয়। বস্তুতঃ পরাভক্তি ও পর-জ্ঞান একই। গন্তব্য স্থলে পৌঁছে গেলে আর বিভিন্নতা থাকে না, বিভিন্নতা কেবল সাধন-মার্গে। জ্ঞানমার্গের সাধক 'আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই' এইরূপ 'নেতি নেতি' ক'রে বিচারের দ্বারা নিজেকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ আত্মা-রূপে—'শুদ্ধ অহং'-রূপে উপলব্ধি করেন, সর্বভূতও তাঁর কাছে 'আত্ম'-রূপে প্রতিভাত হয়। ভক্ত কিন্তু 'নাহং নাহং, তুঁহু, তুঁহু'—ভাবে বিভোর হ'য়ে সতত নিজেকে ভগবানের দাস বা সন্তান মনে ক'রে নিজের 'কাঁচা আমি'টাকে নাশ ক'রে দেন—তিনি সর্বত্র সকল প্রাণীর মধ্যে ভগবানকে দেখেন আর বলেন, 'হে ভগবান, একমাত্র তুমিই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিরাজমান; তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই, তোমাকে ছাড়া আর কিছুই দেখি না।' সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত এবং জ্ঞানী উভয়েই উচ্চতম স্তরে উঠে যান—যেখান থেকে দেখলে সব কিছু এক, সমান; তবে পার্থক্য শুধু ভাষার অর্থাৎ 'আমি' এবং 'তুমি'র—ভক্তের 'বিরাট তুমি' আর জ্ঞানীর 'বিরাট আমি'র লক্ষ্য বস্তু একই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়। সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই। স্বপ্নবৎ বলে না, তবে বলে তিনিই সব হয়েছেন, মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ। পাকা ভক্তিলাভ হ'লে এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে; তখন দেখে যে সবই হলদে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে, আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হ'ল। পারার হ্রদে সীসে অনেক দিন থাকলে পারা হ'য়ে যায়। কুমুরে পোকা ভেবে আরশুলা নিশ্চল হ'য়ে যায়; নড়ে না, শেষে কুমুরে পোকাই হ'য়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হ'য়ে যায়। আবার দেখে—'তিনি'ই আমি, আমিই 'তিনি'।"

সতত তদ্‌গতচিত্ত ভক্তকে ভগবান বুদ্ধিযোগ দেন, তাঁর হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ প্রজ্বলিত ক'রে সমস্ত অজ্ঞান দূর ক'রে দেন। বস্তুতঃ প্রকৃত ভক্ত ও প্রকৃত জ্ঞানী উভয়েই জাতিগত, সম্প্রদায়গত ভেদের বহু ঊর্ধ্বে; শুচি-অশুচির অতীত অবস্থায় তাঁদের স্থান। যেখানে তাঁরা বিচরণ করেন সে স্থান পবিত্র হয়, যাঁরা তাঁদের দর্শন লাভ করেন তাঁরাও পবিত্র হন।

ভক্তিপথে কৃতকৃত্য সাধকের—জ্ঞানীর মতোই মৃত্যুভয় নেই। মৃত্যু যদি আসে তবে ভক্তের মনে হয়—ভগবানের দূত এসেছে। ভগবানের মন্দির এই শরীর তিনিই দিয়েছেন, তিনিই যখন খুশি নিয়ে নিতে পারেন—তবে মৃত্যুভয়ে হৃদয় কম্পিত হবে কেন? সংসারে আত্মীয় পরিজনের বিয়োগেও ভক্ত শোকগ্রস্ত হন না। জ্ঞানীর তো কথাই নেই—জ্ঞানী নিজেকে পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি ক'রে ভূমানন্দে পূর্ণ হয়ে যান—আত্মারাম তিনি, তাঁর কাছে শোক-মোহের স্থান কোথায়?

ভক্ত ভগবানকে আস্বাদন করতে চান,—ভক্ত চিনি হ'তে চান না, চিনি খেতে ভাল বাসেন।

অনন্ত ভগবান ভক্তের ভক্তিহিমে জমে গিয়ে সান্তরূপে তাঁর কাছে ধরা দেন—এ যেমন অলৌকিক, তেমনি বিস্ময়কর! এতকাল যাঁর প্রতীক্ষারত ছিলেন তাঁকে কাছে পেয়ে ভক্ত প্রেমভক্তির আস্বাদন করতে থাকেন। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর—এই পঞ্চভাবের কোন একটি অবলম্বন ক'রে ভক্ত নরশরীরে অবতীর্ণ ভগবানকে আস্বাদন ক'রে ধন্য হন। শান্ত ভক্ত উচ্ছ্বাসহীন, শ্রদ্ধা-ভক্তির মাধ্যমে তিনি ভগবানের লীলারস উপভোগ করেন। দাস্য ভক্তির সেব্যসেবক ভাব—ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে সাধকের অপার আনন্দ, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। সখ্য ভাবের সাধক মনে করেন ভগবান তাঁর সখা, তাই বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে লৌকিক ব্যবহার তিনি সবই ভগবানের উপর

প্রদর্শন করেন। বাৎসল্য ভাবে ঈশ্বরকে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে বিযুক্ত ক'রে নিজের সন্তানরূপে ভাবনা করা হয়। সর্বশেষে মধুর ভাব; এতে শ্রীভগবানকে পতিভাবে ভাবনা কর্তব্য।

নররূপধারী ভগবানের চরিত্র এমনি বিপুল এবং বিরাট যে মানুষের পক্ষে তার পূর্ণ ধারণা ও অনুধ্যান সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণকে মা-যশোদা তাঁর স্নেহের দুলাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারেন নি, বাৎসল্য রসে তিনি ছিলেন সিক্ত—ওতপ্রোত। অর্জুনের কাছে কৃষ্ণ তাঁর সখা—সারথি। দেহভাব-বিবর্জিতা শ্রীরাধা ও গোপীরা জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতিভাবে চেয়েছিলেন।

আর একটি ভাব আছে যেটি অতি পবিত্র এবং সকলেরই অনুভবের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নেই।' ঈশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা ক'রে সাধক ভক্ত নিজের উপর পাঁচ বছরের অবোধ শিশুর ভাবটি আরোপ করেন—মার জন্য কাঁদেন, মার কাছে আবদার করেন। তাঁর রাগ অভিমান সবই শিশুর মতো।

অনন্ত ভগবানের অনন্ত নাম। তিনিই সৃষ্টি করেছেন নিজের বহু নাম এবং সেই সব নামে অপার শক্তি ঢেলে দিয়েছেন—এমন শক্তি যে নাম জপের ফলে জীবের মোহ বন্ধন কাটে—দেহমন শুদ্ধ হ'য়ে যায়। তাই বলা হয় 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'; 'নাম ও নামী এক'। নামের দ্বারাই নামীর দর্শন লাভ হয়। নাম-স্মরণের নিয়মিত কোন স্থান কাল নেই, যখন খুশি অনুরাগের সহিত নাম করতে পারলেই হ'ল। 'শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ অবিরাম' এই কথাটি যেন ভক্তের কণ্ঠহার। শ্রীশ্রীমা বলতেন, ঘড়ির কাঁটা যেমন টিক্ টিক্ করে, তেমনি নিরন্তর অন্তরে নাম জপ করতে হয়।

ভক্তিলাভের প্রধান উপায় ব্যাকুলতা—অন্তরে অভাববোধ এবং অভ্যাস—সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা। ভক্তিমার্গে শরণাগতির স্থান অতি উচ্চে—সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় নিজেকে ভগবানের ইচ্ছায় সমর্পণ করা। তিনি যখন যে ভাবে রাখেন সেই ভাল—সুখ দুঃখ সব তাঁরই দান—শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বিড়াল-ছানার মতো হওয়া—কখনও হেঁসেলে, কখনও বা পালঙ্কের উপর। মাতৃনির্ভর হ'তে পারলেই নির্ভয়ে থাকা যায়। 'উলটু জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।' জলের শরণাগত হ'য়ে মাছ অক্লেশে স্রোতের বিপরীত মুখে কেমন চলতে থাকে—শক্তিধর গজরাজ ভেসে যায়! 'জো যাকে শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ'; ভক্তি-পথের শেষ কথা—শরণাগতি। শরণাগতির জন্যই ভগবান ভক্তাধীন হ'য়ে পড়েন।

চির-আনন্দময়

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দে

এ মোর জীবন তোমারি সৃজন
এই জানি পরিচয়,
তোমারি মহিমা নিয়ত গাহিয়া
হয় যেন মোর লয়।

জাগাতে জীবন নিবারিতে ক্ষুধা
জননীর বুকে তুমি দাও সুধা
তোমারি ত মায়া, তুমিই মুক্তি
চির-আনন্দময়!

সুখে দুখে তুমি জীবনে মরণে
জাগ্রত বরাভয়।

কবি বিদ্যাপতি

শ্রীপ্রণব ঘোষ

দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনদেবের রাজসভার অন্যতম কবি জয়দেব রচনা করেন 'শ্রীগীতগোবিন্দ' তাহা একই সঙ্গে "মঙ্গলমুজ্জ্বলম্ গীতি" এবং "মধুর কোমলকান্ত" পদাবলী। কালিদাসের মেঘদূতের পর আর কোন কাব্য এমনভাবে ভারতভূমির সর্বত্র রসিকজনবন্দনীয় হয় নাই। দেখিতে দেখিতে ইহার প্রভাব অপরাপর সাহিত্যে দেখা দিল। বাংলার নিকটতম প্রতিবেশী মিথিলা। মৈথিলী সাহিত্যে এ প্রভাবের গীতিময় প্রকাশ দেখা দিল হরিসিংহদেবের সভাকবি উমাপতি উপাধ্যায়ের 'পারিজাতহরণ'—নাটকে। এই নাটকের মৈথিলী-ভাষায় লেখা একুশটি গানে জয়দেবের পদাবলীর পরবর্তী রূপ দেখিতে পাই। অনুমান করা চলে যে, মৈথিলী ভাষায় এ পদাবলীর ধারা ছিল জনপ্রিয় এবং প্রবহমান। তাই একশত বৎসর পরে পঞ্চদশ শতকে 'শ্রীবিদ্যাপতি ঠকুর' অবহট্‌ঠে কাহিনীমূলক কাব্যরচনা করিলেও পদাবলী রচনা করিলেন মৈথিলীভাষায়। ইঁহার পরবর্তী তিনজন ও পূর্ববর্তী একজন 'বিদ্যাপতি'র নাম পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, মধ্যযুগের কাব্যধারায় 'বিদ্যাপতি' নামটি ছিল উপাধি।

আমাদের আলোচ্য কবি "বিদ্যাপতি"—কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ প্রমুখ মিথিলাধিপতিগণের সভাকবি। ইঁহার চম্পুকাব্য "কীর্তিপতাকা" ও "কীর্তিলতা"; গল্পগ্রন্থ—"ভূ-পরিক্রমা", "পুরুষ-পরীক্ষা"; পূজাপদ্ধতিগ্রন্থ "গঙ্গাবাক্যাবলী" ও "শৈব-সর্বস্বসার"; সর্বশেষ তিনটি গ্রন্থ—"বিভাগসার", "দানবাক্যাবলী", ও "স্মৃতিনিবন্ধ"। কেহ কেহ অনুমান করেন—"মণিমঞ্জরী" এবং "গোরক্ষবিজয়"—এই দুইটি সংস্কৃত নাটক বিদ্যাপতিরই রচনা।

বিদ্যাপতির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার মৈথিল পদাবলীতে। দেবসিংহের পূর্ববর্তী কোন মৈথিল রাজার উল্লেখ তাঁহার পদাবলীতে নাই। এজন্য অনুমান করা চলে দেবসিংহের রাজত্বকাল হইতেই বিদ্যাপতির পদাবলী রচনা আরম্ভ।

বিদ্যাপতির প্রথম সৃষ্টি 'কীর্তিলতা।' ইহার ভাষা অবহট্‌ঠ বা প্রাচীন অপভ্রংশ। রচনারীতি, সংক্ষিপ্ত বাক্যের তীব্রতা উপমাসৌকর্য এবং ছন্দো-বৈচিত্র্যের দিক দিয়া 'কীর্তিলতা' বিদ্যাপতির নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিদ্যাপতির বাস্তবদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হিন্দুমুসলমানের সংঘাত ও সমন্বয়ে তরঙ্গিত মিথিলার সমাজ-জীবন। ঘটনা ও ভাবের স্পন্দন অনুসরণ করিয়া কবি এ কাব্যে যে ছন্দস্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহা অপূর্ব। আরও একটি দিকে 'কীর্তিলতা'র সার্থকতা আছে। বিদ্যাপতি ছিলেন সৌন্দর্যের চিরমুগ্ধ বাক্‌শিল্পী। সেই সৌন্দর্যবন্দনার প্রথম আভাসটি আছে 'কীর্তিলতা'র নারীসৌন্দর্য বর্ণনায়। পদাবলীতে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি এই সৌন্দর্যসন্ধানী দৃষ্টিরই তিল আহরণের অমৃতফল।

তবু 'কীর্তিলতা'য় কবি সিদ্ধ নহেন—প্রথম স্তরে উপনীত প্রবর্তক মাত্র। কীর্তিলতার ছন্দ অসম, ভাষায় আতিশয্য বারংবার দেখা দেয়, আর কলা-কৌশল—প্রথম সৃষ্টির শিথিলতাকে ঘনবন্ধনে বাঁধিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাপতির পদরচনার গাঢ়বদ্ধ রূপটি 'কীর্তিলতা'র নানা জায়গায় দেখিতে পাই। স্থানে স্থানে ইহার বাক্যবিন্যাস প্রবাদসুলভ সংহতি লাভ করিয়াছে—

মানবিহুনা ভোঅনা, সত্ত‌্ক দেলে রাজ।
শরণ পইঠ‌্ঠে জীঅনা তীনু কাঅর কাজ॥

মানবিহীন ভোজন, শক্রদত্ত রাজ্য, ও শরণাগত হইয়া জীবন রক্ষা—এই তিনটিই কাতরের কার্য।

'কীর্তিপতাকা'য় বিদ্যাপতি শিবসিংহের যশ গাহিয়াছেন। শিবসিংহের রাজত্বকালেই বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদ রচিত হয়। অবহট্‌ঠ হইতে ব্রজবুলিতে কাব্যরচনার প্রেরণা কিভাবে আসিল, তাহা বিস্ময়কর মনে হইলেও বিদ্যাপতির ভাষানির্বাচন-শক্তির প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই। মৈথিলী ও অবহট্‌ঠের মিশ্রণে রচিত এ ভাষাটির অপূর্ব নমনীয়তা ইহাকে পদসাহিত্যের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। 'ব্রজবুলি' নামটি অবশ্য একালের দেওয়া, প্রাচীন কবিদের কেহই 'ব্রজবুলি' কথাটি ব্যবহার করেন নাই। আধুনিক কালে ব্রজের ভাষা মনে করিয়া বাঙালীরা ইহাকে ভুল করিয়া 'ব্রজবুলি' নাম দিয়াছেন। ব্রজের ভাষা 'ব্রজভাখা' আধুনিক হিন্দীরই শাখা।

গীতগোবিন্দের পদাবলী সাজানো হইয়াছে—নাটযাত্রার অনুসরণে। ফলে ইহার মধ্য দিয়া বেশ একটি ঘটনাপরম্পরা ও নাটকোচিত উত্তরণের অনুভব মনে জাগে। মিলন, বিরহ ও ভাবসম্মেলনে এবং সখীদের দ্বারা লীলায়িত রাধাকৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় জয়দেব ছিলেন প্রথম পথিকৃৎ। জয়দেবের পদাবলীর উত্তরসূরী বিদ্যাপতি এই নাটকীয় ধারা তাঁহার পদাবলীর ধারার মধ্যেও অলক্ষ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন। সেই সঙ্গে সখীদের প্রাধান্য তাঁহার কাব্যে আরও স্পষ্ট। কিন্তু পূর্বরাগের পরিকল্পনায় বিদ্যাপতিই প্রথম পদরচনার কৃতিত্বের অধিকারী। পরবর্তী কবি 'বড়ু চণ্ডীদাসে'র "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে"ও আমরা পূর্বরাগের পদ পাই না। যদিও 'চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত পদাবলী-সাহিত্যে পূর্বরাগের অজস্র উদাহরণ মেলে। এ দুই কবি এককালের কি না, সে সম্বন্ধে আজও নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। কিন্তু বিদ্যাপতির ঐতিহাসিক পরিচিতি সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত; তাই, পূর্বরাগের প্রথম পদাবলী-রচয়িতার সম্মান তাঁহাকেই অর্পণ করিতে হয়।

পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরহ অবধি বিদ্যাপতি যে পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তরালে সংস্কৃত সাহিত্যের যুগসঞ্চিত প্রেমকাব্য সহায়তা করিয়াছে। নারীহৃদয়ের ক্রমবিবর্তনে প্রেমের বিকাশ প্রতিটি স্তরে সংস্কৃত কবিগণ অপূর্ব সার্থকতার সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ঐশ্বর্যভাণ্ডার হইতে তিল তিল গ্রহণ করিয়া যে তিলোত্তমাকে বিদ্যাপতি রূপ দিয়াছেন, সে লাবণ্যময়ীর পরিচয় কিন্তু কোন অনুকরণেই আবদ্ধ নহে। রূপদক্ষ কবি তাহার মধ্যে এমন একটি প্রাণময় গতি সঞ্চার করিয়াছেন, এমন একটি কল্পনার অলৌকিক অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছেন, যাহার ফলে পদাবলী-সাহিত্যের চিরপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে।

পূর্বরাগের মতো বয়ঃসন্ধির সুন্দর পদগুলিও বিদ্যাপতির নিজস্ব সংযোজন। দেহপরির্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের সূক্ষ্ম সুকুমার পরিবর্তনগুলি কবি নিপুণ তুলিকার দ্বারা রেখায় রেখায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অভিসার পদাবলীরও আদিতে আছেন বিদ্যাপতি। সংস্কৃত সাহিত্যে অভিসারের চিত্র আছে নায়িকার অসংবরণীয় হৃদয়াবেগের প্রতীকরূপে। কিন্তু বাধা বিঘ্ন সঙ্কটের মধ্য দিয়া শ্রীরাধার অভিসারকে বিদ্যাপতি যে গভীরতর স্পর্শ দিয়াছেন তাহার ব্যঞ্জনা অধ্যাত্মধর্মী। অভিসারের পরে আশানুরূপ সার্থকতা বিদ্যাপতির 'মিলন'-পদাবলীতে নাই। কিন্তু মাথুর-বিরহের বিদীর্ণ আকুলতা অলঙ্কারশাস্ত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অনন্তলোকে উত্তীর্ণ।

জয়দেবের কাব্যে ভাবমিলনের সামান্য স্পর্শ দেখি এই ছত্রটিতে—

"মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥"

কিন্তু বিদ্যাপতি বিরহের ব্যথাবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণটিতে ধ্যানতন্ময়া শ্রীরাধার মানসনেত্রে যে প্রিয়তমের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন, তাহাতে মানবহৃদয় প্রেমের শাশ্বত সত্যস্বরূপকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের বিরহই হয়তো ইহলোকের কাহিনীগত সত্য; কিন্তু বিদ্যাপতি ইহাকেই চরম বলিয়া ভাবেন নাই। রাধিকার তদ্গত হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের আবির্ভাব ঘটাইয়া শ্রেষ্ঠ কবিকল্পনার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীরাধার রূপবর্ণনায় বিদ্যাপতির উপমা:

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার॥

আর একটি স্থলে কবি বলিতেছেন—এ রূপ যেন:

কনকলতা অবলম্বন উয়ল
হরিণহীন হিমধামা॥

—নিষ্কলঙ্ক চাঁদ উঠিয়াছে কনকলতাকে অবলম্বন করিয়া। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের উপমায় সখী বলিতেছেন:

খোঁজল সকল মহীতল গেহ।
খীর নীর সম না হেরল নেহ॥

এমন অবিচ্ছেদ্য প্রেম একমাত্র রাধাকৃষ্ণের।

অভিসারিকা রাধা—

বরিস পয়োধর ধরণী বারি ভর
রয়নি মহাভয়ভীমা।
এইও চললি ধনি নিজ গুণ মনে গুণি
তসু সাহস নাহি সীমা॥
দেখি ভবনভিতি লিখন ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনি করে ঝপইত ফণিমণি
বিহুসি আইলি তুহুঁ পাসে॥

এমন দুর্যোগময়ী বর্ষার অন্ধকার রজনীতে, প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত সর্প দেখিয়া যাহার ভয় হয়, সে নির্ভয়ে সাপের মাথার মণি দুইহাতে আবৃত করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছে। এ প্রেমকে বাধা দিবে কে? কবি কল্পনার আতিশয্যবশতঃ সাপের মাথার মণি হইতে বিচ্ছুরিত আলোককেও কবি অভিসারের বিঘ্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু অভিসারের দুর্নিবার গতি-সংকেতটি এখানে চমৎকার ফুটিয়াছে। অভিসারের পর মিলন, কিন্তু সে তো জীবনের মতো কাব্যেও ক্ষণস্থায়ী। বিদ্যাপতির পদাবলীতে বিরহই রসোত্তীর্ণ।

বিরহিনীর চিরকালের বেদনায় রাধা বলিয়াছেন—

অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে।
ঈ নব যৌবন বিরহে গমাওব
কি করব সো পিয়া-নেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব-দুরাশা।
সিন্ধু নিকট যদি কণ্ঠ সুখাএব
কো দূর করব পিয়াসা॥

সূর্যতাপে অঙ্কুর যদি শুষ্ক হয়, তবে বারি-বর্ষণে কি ফল হইবে? বিরহদীর্ণ এ জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটি চলিয়া গেলে আর কি হৃদয় তেমন করিয়া প্রিয়-আহ্বানে সাড়া দিবে? হায় এ কি দুরাশা, সিন্ধুতীরে আসিয়া যদি কণ্ঠ শুকায় তবে কে সেই পিপাসা দূর করিবে? আর এ বেদনার কথা আমি কাহার কাছে বলিব—এ প্রেমের স্মৃতি যে অন্তরের অন্তঃস্থলে আমরণ আগুন হইয়া দগ্ধ করিতে থাকিবে, তবু সংসারের মানুষকে ডাকিয়া বলিবার উপায় নাই—

চোর-রমণি জনি মনে মনে রোতই
অম্বর বদন ছিপাই।
দীপক লোভ সলভ ধনি ধাএল
সে ফল ভুজইও চাই॥

চোরের রমণী যেমন অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া গোপনে কাঁদিতে বাধ্য হয়, তেমনি তো আমার ক্রন্দন। প্রদীপের শিখা দেখিয়া উন্মত্ত পতঙ্গ ধাবিত

হইয়াছিল; তাহার ফল তো ভোগ করিতেই হইবে। তারপর একদিন—

অনুখন মাধব মাধব সুমরইত
সুন্দরি ভেলি মধাই।
ও নিজ ভাব সুভাবহি বিসরল
অপনে গুণ লুবুধাই॥"

—প্রিয়তমকে ভাবিতে ভাবিতে রাধা সেই প্রিয়তমের স্বরূপেই রূপান্তরিতা হইলেন। এমনি অনুভবের মধ্য দিয়া একদিন শ্রীরাধা ভাবনেত্রে দর্শন করিলেন—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু,
পেখনু পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল কহি মাননু
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

যিনি বাহিরে ছিলেন বলিয়া অদর্শনের বেদনা, আজ অন্তরের মন্দিরে তিনি চিরদিনের জন্য আসিয়াছেন—আর তো দুঃখ নাই।

কি কহব রে সখি, আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

ভক্তকবির এমন অলোক কল্পনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া যখন শুনি তাঁহার অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

তখন গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্মিলিত সুরটি বৈষ্ণব কবিদের অন্তরের বাণী বহন করিয়া আনে।

সন্দেহ নাই, পদাবলীতেই বিদ্যাপতির প্রতিভার সানন্দ বিকাশ। তাঁহার অপরাপর রচনার মধ্যে এক 'কীর্তিলতা' ছাড়া আর কোথাও এই অমর প্রতিভার উপযুক্ত নিদর্শন মেলে না। সে সব রচনায় তিনি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, কিন্তু রসবিদগ্ধ মহাকবি নহেন। অবশ্য জয়দেবের মতোই বিদ্যাপতিও আক্ষরিক অর্থে বৈষ্ণব কবি নহেন। তাঁহার উপাস্য দেবতা বোধ করি একাধিক। পদরচনার ক্ষেত্রে তিনি হরগৌরীকেও অবলম্বন করিয়াছেন। দুরিতবারিণী দুর্গার স্তবের মধ্য দিয়া দেবীর রুদ্রাণী-রূপটি তিনি সুন্দর ফুটাইয়াছেন। দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতি তাঁহার অবিচলিত ভক্তি ছিল। রাজ্যচ্যুত দুই ভায়ের উপমায় তিনি তাঁহার চম্পূকাব্যে রামলক্ষ্মণের উপমা দিয়াছেন। ভক্তি-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁহার মানসিক ব্যাপ্তি ছিল। সেদিক দিয়া তিনি পদাবলী-সাহিত্যের প্রথম এবং প্রধান কৃতী হইলেও আক্ষরিক অর্থে "বৈষ্ণব" নহেন।

কিন্তু মিথিলা অপেক্ষা বাংলা দেশ বিদ্যাপতিকে আপন করিয়া লইয়াছে। তাঁহার মৈথিল পদাবলীর মধ্য দিয়া বৃন্দাবনলীলা আস্বাদ করিয়া বাঙালী ইহাকে ব্রজধামের ভাষা ভাবিয়াছে। যশোরাজখান হইতে 'ভানুসিংহ' অবধি সেই ব্রজবুলির অমৃতসিঞ্চনে বাঙালী ধন্য। মহাপ্রভুর আস্বাদনের মধ্য দিয়াই বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙালীহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আলোড়ন তুলিয়াছিল। নীলাচলে প্রত্যহ বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে চণ্ডীদাস ও রামানন্দ রায়ের গানও হইত। কিন্তু শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তনের উন্মাদনায় একদা 'কি কহব রে সখি' পদটি গাহিয়া মহাপ্রভু যেভাবে সারাটি রজনী বিভোর হইয়া-ছিলেন, আর কোন পদের সে সৌভাগ্য হয় নাই। এ পদটি বিদ্যাপতির রচনা। বিদ্যাপতির রসসাধনায় মহাপ্রভুর প্রাণের সম্মিলন বাংলা পদাবলীর সাহিত্যের সকল শ্রেষ্ঠ কৃতীকেই প্রভাবিত করিয়াছে। হোসেন শাহের কর্মচারী দৈবকীনন্দন সিংহ ব্রজবুলিপদ রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া 'বিদ্যাপতি' খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিলেই তাঁহার পদে বিদ্যাপতির বাগ্‌ভঙ্গির প্রভাব বুঝা যায়। বিদ্যাপতির সার্থকতম উত্তরাধিকারী গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাসে বিদ্যাপতির রস-মাধুর্য আরো ঘন গভীর ও চিত্ররূপময় হইয়া দেখা দিয়াছে। পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখর শিশেখরের

পদাবলী বিদ্যাপতির সুদূরপ্রসারী প্রভাবের নিদর্শন। সমগ্রভাবে মধ্যযুগের ব্রজবুলিতে পদরচয়িতাগণ সকলেই বিদ্যাপতির নির্দিষ্ট সরণিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বাংলার পদাবলী-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন ব্রজবুলি-সাহিত্য বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে যাত্রা শুরু করিয়াছে এবং মহাপ্রভুর জীবনস্পর্শে প্রাণায়িত হইয়া সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যধারাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে।

ত্রিযুগীনারায়ণ

স্বামী সুত্রানন্দ

ত্রিযুগীনারায়ণ পৌঁছে আমাদের সে কি আনন্দ! অতীব দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রে হরিহরের স্মৃতিবিজড়িত এই তীর্থস্থানে এসে আনন্দানুভব না করা স্থূল মনেরই পরিচয়। আমরা উচ্চ স্তরে উঠলেও সূক্ষ্ম স্তরে উঠে গেছি, তা নয়। সমাজ-বদ্ধ মানুষ, নির্জনবাস করেনি যারা—তারা বুঝতে পারে না নির্জনতা কি ভয়ানক অবস্থা। আবার মানুষ সাধারণতঃ চায় একটা কিছু ধ'রে রাখতে। যারা গতানুগতিক নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশাকে ধ'রে রেখে দুর্গম হিমালয়-তীর্থে যাত্রা করেন, তারাই নিরাশার বেদনা বোধ করেন। সে পথে প্রকৃতির সৌন্দর্য চোখে পড়লেও মন গম্ভীরভাব গ্রহণ করতে পারে না, হাঁপিয়ে উঠে। ভাবটা এরূপ—আসুন, আসুন! একটু কথা বলি; প্রাণ যে যায়! ত্রিযুগীনারায়ণে এসে আমাদের আনন্দ কতকটা এ ধরণেরই ছিল।

হরিদ্বার থেকে সাধারণ পথে অর্থাৎ দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, মৈখণ্ডা ও ফাটাচটি হ'য়ে আমরা ত্রিযুগীনারায়ণ যাইনি। সে তো মাত্র ৫।৬ দিনের ব্যাপার। তাছাড়া চড়াই উৎরাই কম। রাস্তা ঘাট, বাস ও চটি—সর্বত্রই যাত্রীর ভিড়। আমরা ২৫।৩০ দিন গৃহছাড়া; এ ক'দিনে হরিদ্বার থেকে টিহরী হ'য়ে যমুনোত্রী ও উত্তরকাশী হ'য়ে গঙ্গোত্রী দর্শন ক'রে এসেছি। মাত্র টিহরী ও উত্তর-কাশী ছাড়া আর কোথাও সমাজ কিংবা সভ্যতার ন্যূনতম কোন উপকরণই আমাদের নয়নগোচর হয়নি। পত্র নেই, পত্রিকা নেই, স্কুল, ডাকঘর, হাট বাজার দূরে থাকুক—একটা দোকানও নেই ভাল। এমনকি কথা বলবার জন্য একটি ভদ্র-লোকেরও (?) দেখা পাওয়া কঠিন। থাকবার মধ্যে আছে কচিৎ কোথাও সরল প্রকৃতির মানুষ—কুমায়ুনীর চায়ের দোকান। দোকানে বেশী মিলে তো চা, আলু ও আটা। কোথাও বা চাল, দুধ, ঘি। সংসার-বন্ধন বা মায়াজাল-মুক্ত এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ভগবানের উপর নির্ভরশীল অথবা প্রকৃতির রূপ-রস-সন্ধানী হ'য়ে এ ভীষণ নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ান, তারাই কেবলমাত্র সর্বাবস্থায় আনন্দ পাবার অধিকারী। তাঁদের পক্ষে সেখানে গ্রামের হিংসা, নিন্দা ও ঈর্ষার ভয় নেই—নেই অভাব অভিযোগের তাড়া। ধোঁয়া-ধুলো-আচ্ছন্ন সহরের হৈচৈ-সহ নেই যন্ত্রদানবের বিকট চিৎকার; আছে শুধু ছায়াশীতল অরণ্য, নির্মল বায়ু ও অফুরন্ত সৌন্দর্য—অব্যক্ত প্রশান্তি! পাহাড়ী লোকজন—সেও ঐ তরুলতারই মত নগ্ন সরল। সেখানে সমতলের সভ্যতা প্রবেশ করেনি—একে অপরকে সন্দেহ করতেও শেখেনি। নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রা। সেই সংস্কারমুক্ত পথিকগণ নিজেকে তাদেরই একজন মনে ক'রে, ঐ প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। সেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, বন্ধুবান্ধব, শত্রুমিত্রের কোন ভাবনা নেই—আছে সত্য, শিব ও সুন্দর।

বিগত ২৫।৩০ দিনের কথা তো গেল। এর

মধ্যে আবার শেষ তিন চারদিনের অবস্থা ভীতিপ্রদ। বস্তি বা লোকালয় একেবারেই নেই—কেবলমাত্র শ্বাপদসঙ্কুল ঘনবৃক্ষ-সন্নিবিষ্ট জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়। মধ্যে মধ্যে প্রবাহিতা মন্দগতি স্রোতস্বতী। আবার যেখানে জঙ্গল নেই, সেই উঁচু সানুদেশ কঠিন প্রস্তরবৎ মসৃণ হিমানীতে আবৃত। বহু বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ঐ বরফ ঢাকা পাহাড় পওয়ালীর তুঙ্গশীর্ষে উঠেছি। এখন অবতরণের পালা। ভোরবেলা পওয়ালীর সূর্যোদয় দর্শন করে আমরা মুগ্ধ। এর তুলনা মিলে না, এ এমনই সাধনায় ভাবাপ্লুত। মন আপনি সৃষ্টি-কর্তার চরণে লুটিয়ে পড়ে। এত উঁচুতে (১১০০০) নির্মল নীলাকাশের এককোণে মাধুর্যময় বালসূর্যের আবির্ভাব; দূরে অদূরে স্বচ্ছ তুষারকিরীট হিমাদ্রি-শিখর; বহুদূরে একখণ্ড হালকা মেঘ এখনও নিদ্রিত। পওয়ালীর উপর থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নে স্ফটিক শুভ্র পাহাড়ের আড়ালে সোনার থালার ন্যায় দিনের প্রথম আলো নিয়ে উদীয়মান ভানুদেব —কি অপূর্ব দৃশ্যপট! পাহাড়ে পাহাড়েই বা কি রূপ-সম্ভার ফুটে উঠেছে! পুরীর সূর্যোদয়, চট্টগ্রামের সূর্যাস্ত আর দার্জিলিংএর টাইগার হিল্? —হিমালয় ও তিব্বতের অনেক জায়গা ঘুরেছি—১৮৭০০০ ফুট উঁচু পাহাড় ডিঙ্গিয়েছি—এ হেন মনোহারী রূপ চোখে পড়েনি কোথাও!

পাহাড় চড়াই করা কঠিন সত্যি—বুক ধড় ফড় করে, শ্বাস কষ্ট হয়। কিন্তু উৎরাইও সহজ নয়—পা ভেঙ্গে পড়ে, বসে যেতে হয়। চড়াই থেকে উৎরাই অত্যধিক দুঃসহ, যদি সে ঢালু পথে থাকে পিচ্ছিল বরফ। আমাদের সামনে এখন পথ তার সেই ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করে এসে হাজির। অধিকন্তু পাহাড়টি ছিল আগাগোড়াই পাষাণময়। কখনও পথ এমন নিম্নাভিমুখী, মনে হয় যেন সিঁড়ি দিয়ে নামছি। আর চওড়া? এদিক ওদিক নড়লেই পাহাড় এসে গায়ে ঠেকে। আবার হয়তো কিছুটা সমান জায়গা আছে, কিন্তু বরফাবৃত বলে সে রাস্তা খুঁজে পাওয়া দায়। সামান্য পদস্খলন হ'লেই হল—কঠোর সমাজ-ব্যবস্থায় দণ্ডিতের ন্যায় শত শত ফুট নীচে নেবে যেতে হবে, আমৃত্যু একঘ'রে হ'য়ে থাকতে হবে। কেউ হাত ধ'রে একটু সাহায্য করতেও আসবে না। কে কাকে সাহায্য করবে? যে যার নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। লোকে বলে 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।' সত্যি তাই। এ দুর্গম পথের অর্ধেকটা আসতে না আসতেই আবার টিপ টিপ করে নেবে এলো বৃষ্টি। নামল তো সন্ধ্যা পর্যন্ত আর ছাড়বার নামটি নেই। এপথে যাত্রিগণ দলবদ্ধ হ'য়ে চলেন। সেদিন আমাদের দলে দু'তিন দিনের লোক মিলে প্রায় ৬০।৭০ জন ছিলেন। তার মধ্যে হয়তো ৫।৭ জন ছাড়া, বাকী সকলেই অল্পবিস্তর আহত হয়েছিলেন। তিন জনের অবস্থা হয়েছিল গুরুতর। অতি সন্তর্পণে অল্প নয় মাইল রাস্তা অতিক্রম করে মঙ্গু চটিতে উপস্থিত হ'য়েই দেখছি মৌন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এইটুকু আসতে সমস্ত দিনটা লেগে গেল। পৌঁছেই জনমানবহীন চটিতে শোরগোল আরম্ভ হ'য়ে গেল—কে এসেছে, কে আসেনি, কার জিনিসই বা কোথায়, কে কিরূপ আহত এবং কে-ই বা কোথায় রাত্রিবাসের জায়গা দখল করেছে ইত্যাদি। গোপালদা তার ছোটখাট চলন্ত ডিস্পেন্সারিটি খুলে বসলেন। ইতিমধ্যে খবর এলো—সবচেয়ে বড় শেঠজীর যে দলটি ছিল, তার একজন নিখোঁজ হয়েছে। টাকা পয়সা ও আলো দিয়ে নেপালী ও গাড়োয়ালী কুলীদের পাঠানো হ'ল—সবই বৃথা। আর অন্য চিন্তা করবার মত অতিরিক্ত ধৈর্য আমাদের ছিল না। রাত্রে আর উনুন ধরেনি। শুক্নো যা কিছু খাবার খেয়েই সকলে নিদ্রাদেবীর পদতলে মাথা নত করলেন।

সকালবেলা উঠে দেখছি চটিতে একজন

আমেরিকানও রয়েছেন - সঙ্গে দুটি কুলী। কোথা থেকে এলেন? গত দু'চারদিন তো তাঁর দেখা পাইনি? রতনবাবু এগিয়ে গেলেন; রোগ জিজ্ঞেস ক'রে গোপালদার নিকট থেকে দু'একটা কি ঔষধের পিলও তাকে দিয়ে আসলেন। তিনি এসেছেন এক্সপিডিশনে নয়—আমাদের সঙ্গেও নয়; এসেছেন তীর্থদর্শনেই, তবে আমাদের ঠিক উল্টো-দিক থেকে। বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ দর্শন ক'রে এসেছেন—যাবেন গঙ্গোত্রী, পরে যমুনোত্রী। এমন দুঃসাহস কেউ করে কিনা জানিনা। নব উৎসাহে, নূতন উদ্যমে, সুস্থ মনে ও সবল দেহে প্রথমে অপেক্ষাকৃত সুগম ও সহজ পথ অতিক্রম ক'রে, দীর্ঘদিন পরে ক্লান্ত শরীরে ও অশান্ত মনে দুর্গম ও চড়াই পথে আরোহণ নিশ্চয়ই সুবিধাজনক নয়! তবে আমেরিকানদের কথা আলাদা। তাঁদের মনোবল ও ধনবল আমাদের বাঙালী তথা ভারতবাসীদের মত নয়। ঐ যাত্রীটি দার্শনিক; হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফেরবার আগে হিমালয়ে এসেছেন হিন্দুতীর্থদর্শনে—বিশেষতঃ উত্তরকাশীর ধ্যানমগ্ন সাধু-সন্দর্শনে।

ভোর হ'তে না হ'তেই সকলে যে যার তল্পী-তল্পা গুটিয়ে প্রস্তুত; আমরাই কি বসে থাকতে পারি? পথিক আমরা—পথই আমাদের ঘর। এবার কিন্তু রাস্তা ভাল। বরফবিহীন অরণ্যে-ঢাকা পাহাড়ের ছায়াশীতল রাস্তা—ক্রমনিম্ন ঢালু হ'য়ে চলেছে। এপাশে ওপাশে লাল সাদা গোলাপের গন্ধে বন আমোদিত। কত কত অজানা গাছ—পাইন বা চীড়, শ্বেতবল্কলধারী ভূর্জ ও আখরোটের বনানী। বেশী নয়—মাত্র পাঁচ মাইল গিয়েই দেখতে পেলাম ত্রিযুগী-নারায়ণ। দেখেই বুঝতে পারলাম শান্ত সমাহিত হিমালয়ের নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মূর্তিমান্ ব্যাঘাতস্বরূপ এখানে গড়ে উঠেছে একটি ছোট্ট শহর। ডাকঘর, ডাকবাংলো, কেতাবখানা ও পুলিশ থেকে আরম্ভ করে, ঝাড়ুদার মেথর পর্যন্ত প্রত্যেকেরই কড়া শাসন এখানে বর্তমান। শিক্ষিত লোকের তো অভাব নেই-ই অর্থাৎ সমতলের লোক যা চায়, উপরের হিমালয়ে এখানেও তাই আছে। রায়না-গাঁ শহরটিকে চার-দিকে ঘিরে রেখেছে। গাঁয়ের আসে পাশে গম, ভুট্টা, আলু ও শাকসবজির প্রচুর চাষ। এখন বোঝা খুবই সহজ—ত্রিযুগী-নারায়ণ দেখে আমাদের মত সাধারণ মানুষের মন কেন এত আনন্দিত হয়েছিল। কতকাল নির্বাসনের পর যেন নিজের দেশ দেখতে পেলাম!

ত্রিযুগী-নারায়ণ হিমালয়ের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এ পাহাড়ের শীর্ষ ১১০০০ ফুট উঁচু। হরিদ্বার থেকে সোজা রুদ্রপ্রয়াগের পথ দিয়ে হিমালয়ের ১৪০ মাইল অভ্যন্তরে; তার মধ্যে ১০০ মাইল পর্যন্ত বাস সার্ভিস আছে। আবার হরিদ্বার থেকে যমুনোত্রী, উত্তরকাশী ও গঙ্গোত্রী হ'য়ে ৺কেদারনাথের পথে যাঁরা এখানে আসেন, তাঁদের পক্ষে দূরত্ব প্রায় তিনশ' সত্তর মাইল; এর মধ্যে বাস যাতায়াত করে মাত্র ৯০ মাইল।

নাটমন্দির ও চত্বর-সহ মন্দিরটি বেশ মনোরম। ক্ষীণ দীপালোকে দেখলাম অধিষ্ঠিত দেবতা চতুর্ভুজ নারায়ণ—দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সামনে অবস্থিত দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে দ্বারী জয় ও বিজয়। তা-ছাড়া কালভৈরব, কুবের প্রভৃতি দেবগণও ভেতরে রয়েছেন। মন্দিরে একটা ধ্যান-মগ্ন প্রশান্তির ভাব বিরাজিত। নাটমন্দিরে একটি বিরাট যজ্ঞকুণ্ড। সত্যযুগে হরগৌরীর বিবাহে প্রজ্বলিত এই হোম আজ পর্যন্ত অনির্বাণ আছে। বিবাহের সাক্ষী স্বয়ং নারায়ণ তিনযুগ ধরে এখানে বর্তমান। যজ্ঞকাষ্ঠ, যব, ঘৃত, তিল প্রভৃতি দিয়ে যাত্রিগণ কুণ্ডে আহুতি দেন। যখন যাত্রীদের যাতায়াত বন্ধ হ'য়ে যায়—শীতকালে বড় বড় গাছের গোড়া অগ্নি-সংলগ্ন ক'রে দেওয়া হয়। তাতে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। নাটমন্দিরের বাঁদিকে

পর পর চারটি কুণ্ড আছে। নাম যথাক্রমে—ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড ও সরস্বতীকুণ্ড। একটিতে স্নান, পাশেরটি স্পর্শ, পরেরটিতে আচমন ও শেষটিতে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করা হয়। ব্রহ্মকুণ্ডে ছোট ছোট সাপ আছে। উঠানের সামনের দিকে আরো একটি ছোট মন্দির আছে।

৺কেদারনাথ-মাহাত্ম্যে আছে: যজ্ঞ নামক পর্বতের উপর নারায়ণ-তীর্থ নামে ইহা প্রসিদ্ধ। এখানে লক্ষ্মীনারায়ণের দর্শন পাওয়া যায়। হর-পার্বতীর মনোহর বিবাহ-স্থলও ইহাই। একটি হবনকুণ্ড চিরকাল প্রজ্বলিত আছে। এই কুণ্ডে নারায়ণ-মন্ত্রে হোম করলে জন্মমৃত্যু রহিত হ'য়ে স্বর্গ-বাস হয়। এখানে এক ব্রহ্মকুণ্ড আছে। উহার জল হরিদ্রাবর্ণ। তাতে ছোট ছোট সাপ থাকে; দেখলে ভয় হয়, কিন্তু তারা কখনও দংশন করে না। ইহার দক্ষিণভাগে বিষ্ণুকুণ্ড। এই দুই কুণ্ডে স্নান ও পরিক্রমা করলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়।

বিকেলবেলা দেখছি আরো শতাধিক যাত্রী রুদ্রপ্রয়াগের পথে নীচে থেকে এসে হাজির—যাবে ৺কেদারনাথ। বাঙালী মারোয়াড়ী মিলে ২৮ জনের একটি দল এসেছে কলকাতা থেকে। পরদিন সকালে ৺কেদারনাথজীর উদ্দেশ্যে রওনা হবার পূর্বেই খবর পাওয়া গেল—দুদিন পূর্বে পণ্ডয়ালীর পথে নিখোঁজ লোকটিকে পাওয়া গিয়েছে। রাত্রের অন্ধকারে পথ হারা হ'য়ে সে অন্য পাহাড়ে চলে গিয়েছিল। যাক, চরম ভাগ্যবিপর্যয়েও প্রাণটা নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে।

আলোক-শরৎ

'শুভ গুপ্ত'

বিষণ্ণ বর্ষার শেষে ভাদ্র এলো নেমে,
মেঘে মেঘে বজ্র হেনে, বেদনার গানে,
অভিযান শেষ হলো। আলোকের প্রেমে
শষ্প-শীর্ষ সমুন্নত আকাশের পানে।

নীল শান্তি নেমে এলো সূর্য দিয়ে মাখা।
মাঠ থেকে মাঠ-ভরা থই থই জলে,
সৌরপ্রেম অগণিত হীরা হয়ে জ্বলে।
তবে আজ স্তব্ধ হোক্ সময়ের চাকা।

ময়ূরের কণ্ঠ হলো দিনের আকাশ,
রাত্রির তারায় তারি ছড়ানো কলাপ,
শুভ্র মেঘে নম্র কাশে শরৎ সহাস
দিনের সোনার তারে আলোর আলাপ।

তবু মেঘ, আশ্বিনের হে শুভ্র প্রকাশ,
তোমার চলার পথে উধাও হৃদয়;
চম্পা-নীল রৌদ্রে কাঁপে প্রাণের উল্লাস,
"তাহ'লে আবার যাত্রা,"—কানে কানে কয়

কেমন করিয়া ডাকিব ?

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

কেমন করিয়া ভগবানকে ডাকিতে হয়—তাহা মানুষ সভ্যতার জন্মের আগেই জানিয়াছিল। সে যখন লিখিতে পড়িতে শিখে নাই তখনও সে আকাশের দিকে চাহিয়া অদৃশ্য কোন শক্তির উদ্দেশ্যে নিজের বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। হয়তো সেই প্রার্থনা একান্তই ইহ-জগতের প্রার্থনা—হয়তো অন্ন-পানের প্রার্থনা, বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝা-বন্যার সঙ্কট হইতে উদ্ধারের প্রার্থনা, ব্যাধি-নিরাময়ের বা পুত্রলাভের অথবা সুবৃষ্টির জন্য মিনতি এবং হয়তো যে দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া সেই প্রার্থনা—সে পরবর্তীকালের 'সভ্য' মানুষের দৃষ্টিতে একান্তই কোন আদিম দেবতা,—তথাপি 'কেমন করিয়া ডাকিব?' প্রশ্নের মীমাংসা ঐ প্রার্থনার মধ্যেই যেন আমরা দেখিতে পাই। যদি প্রকৃত অভাব-বোধ থাকে এবং অভাব মিটাইতে পারেন এমন কোন অতি-লৌকিক ব্যক্তি-সত্তায় বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে নিজের প্রাণের ভাষায় ঐ অভাব তাঁহার নিকট জানানোর নামই তাঁহাকে ডাকা। ডাকা শিখিতে হয় না, কিন্তু ডাকার আগেকার ধাপ দুটি—অভাব বোধ করা বা ব্যাকুলতা এবং বিশ্বাস—ইহারা ঠিক আপনা হইতে আসে না, কিছু তালিম প্রয়োজন হয়।

প্রগতির পথ ধরিয়া সেই আদিম যুগ হইতে মানুষ আজ বহু দূর চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতি জৈবিক প্রবৃত্তির ন্যায় অদৃশ্য কোন শক্তিকে ডাকিবার প্রবৃত্তিটিও মানুষ ছাড়িতে পারে নাই। পারা কঠিন, কেননা বোধ করি উহা তাহার স্বভাবের সঙ্গে মিশাইয়া সৃষ্টিকর্তা তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। মানুষ জানা-অজানার এক বিচিত্র মিশ্রণ, দেখা-অদেখার টানা-পোড়েনের এক অত্যাশ্চর্য সংগ্রথন। অজানাকে বাদ দিবার তাহার উপায় নাই, অদেখাকে স্মরণ না করিয়া তাহার শান্তি নাই। 'প্রগতি' তাহার কতকগুলি অভাব দূর করিয়াছে সত্য, কিন্তু অভাবের কি শেষ আছে? বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে মানুষ আজ পদে পদে অসহায় নয়; আদিম কালে যে সকল বিপদে তাহাকে আকাশের দিকে তাকাইতে হইত, আজ মানুষ সেই সকল সঙ্কটত্রাণের উপায় নিজেই আবিষ্কার করিয়াছে, অলৌকিকের আহ্বান নিষ্প্রয়োজন। তথাপি এমন অনেক সঙ্কট আজিও তাহার নিকট উপস্থিত হয়, যাহাতে সে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে পুনরায় বিশ্বাসের দরজায় হাজির হইতে হয়। "যদি কেহ থাকো বাঁচাও"—এই আর্তি বুকের ভিতর হইতে আপনাআপনি গুমরাইয়া উঠে।

আদিমকালে অলৌকিক শক্তির নিকট মানুষের চাহিবার জিনিসের সংখ্যা ছিল কম, কারণ তাহার জীবনের পরিধি বেশী দূর বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু 'প্রগতি' মানুষের জীবনকে নানাদিকে প্রসারিত করিয়াছে। মানুষের সুখের ধারণা, নিরাপত্তার ধারণা, ক্ষমতার ধারণা বহুগুণে শাখা-প্রশাখান্বিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাবও বাড়িয়াছে। সব অভাবগুলি দৃশ্য উপায়ে মিটেনা, অতএব কতকগুলির জন্য নিজের পৌরুষের অহঙ্কারকে সাময়িকভাবে ধামাচাপা দিয়া অদৃশ্য শক্তির নিকট মাথা কুটিতে হয়। স্বয়ং জাঁহাপনা আকবর বাদশাহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, আমাকে আরও ধন দাও, দৌলত দাও। ফকীর সাহেব আসিয়া তাঁহার চোখ খুলিয়া দিলেন (—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত উপদেশমূলক গল্প)। আমাদের অনেকের মধ্যেই ভিখারী বাদশাহ বাস করিতেছেন। সভ্যতার জটিল জীবনধারা লাল নীল বেগুনী সবুজ নানা

রঙের হিমালয়প্রমাণ অভাব সৃষ্টি করিয়াছে এবং যেগুলি নিজের হাত পা ছুঁড়িয়া মিটাইতে পারিনা সেগুলির জন্য আমাদিগকে কালীঘাটে তারকেশ্বরে মদনমোহনতলায় ছুটিতে হয়। ভগবানকে না ডাকিয়া কি উপায় আছে ? আর সেই ডাকা কেহ আমাদিগকে শিখাইয়াও দেয় না—পাড়ার শিশু-বিদ্যাপীঠের শ্যামল-বাবুল-রুবী-দীপাদেরও নয়। তাহারাও পরীক্ষার দিনটিতে সকাল সকাল ভাত খাইয়া ঠাকুরবাড়ীতে হানা দেয়, দেবমন্দিরে ক্ষুদ্র মিনতি জানাইয়া যায়,—ঠাকুর, যেন পাস করি !

মানুষ 'প্রগতি' লাভ করিয়াও অলৌকিককে ডাকা যে ছাড়িতে পারে নাই—ইহাতে মানুষের লজ্জা পাইবার কিছু নাই। আর ঐ ডাকা তো নিস্ফলও নয়। অনেকের অনেক অসম্ভব প্রার্থনাও 'সিন্নি', 'হত্যা', 'বলি' বা 'পূজা'র জোরে পূরণ হইতে দেখা যায়। অলৌকিক যে মানুষের মাথার ভ্রম নয়—তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এই সকল ঘটনা হইতে মানুষ লিপিবদ্ধ করিতে পারে : সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ—জমিদার তারাপ্রসন্ন মজুমদার (মকদ্দমা-জয়), দুঃখিনী বিধবা গৌরের মা (গৌরের মরণাপন্ন ব্যাধি-আরোগ্য), বাবু সুমেরচাঁদ চনচনিয়া (ব্যবসায়ে মোটা কিস্তি লাভ), ছা-পোষা কেরানী ব্রজেন্দ্র মিত্র (কন্যার বিবাহ)। শুধু আমাদের দেশে বা হিন্দুধর্মে নয়, নানা দেশের নানা ধর্মাবলম্বী বহু মানুষকে এই ধরনের প্রার্থনার সফলতার সাক্ষ্য দিতে ডাকিতে পারা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে (৪র্থ অধ্যায়) এই প্রকার প্রার্থনাকে আর্তভক্তি বলিয়াছেন। ইহা মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্কাম ভালবাসা অবশ্যই সূচনা করেনা, কিন্তু তবুও ইহা ভালবাসা বা ভক্তি বলিয়া মর্যাদা পাইয়াছে। কিন্তু মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্নতির সহিত তাহার অলৌকিকের ধারণার এবং অলৌকিকের সহিত সংযোগের অর্থাৎ 'ডাকা'রও উন্নতি হইয়াছে। আর্তভক্তি বা বিপদে পড়িয়া ডাকা হইতে উন্নততর প্রার্থনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যে অলৌকিক শুধু ভূতপ্রেত, পূর্বপুরুষ বা নানা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ামক খণ্ড খণ্ড দেবতায় সীমাবদ্ধ ছিল তাহা ধাপে ধাপে উঠিয়া সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা, এক প্রেমময় পরমপিতা শ্রীভগবানে আসিয়া স্থিতিলাভ করিয়াছে। সুসভ্য মানুষের উপযুক্ত ভগবান ইনি, সন্দেহ নাই। ইঁহার গুণ, কার্য প্রভৃতি লইয়া কত দর্শন, কত তত্ত্ববিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভগবান থাকুন বা না থাকুন, মানুষ কিন্তু সভ্যতার ধাপে পৌঁছিয়াও ভগবানের জন্য কম সময় ও শক্তি ব্যয় করে নাই।

আর্তভক্তির অপেক্ষা শুদ্ধতর ভক্তি—গীতার ভাষায় 'অর্থার্থী' ভক্তি। ইহা 'অর্থ' বা ভোগ-সামগ্রীর জন্য প্রার্থনা। বিপদে পড়ি নাই কিন্তু সম্পদ্ চাই। ভগবান যদি আপনার জন, তবে তাঁহার নিকট ঐহিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য হাজির হইতে আপত্তি কি ? না,— আপত্তি নাই। ধর্মাচার্যগণ তাই আর্তভক্তির ন্যায় ইহাকেও মর্যাদা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে দ্বিতীয় স্তরের ভক্তি বলিয়াছেন। যীশুখ্রীষ্ট নিজে তাঁহার শিষ্যগণকে যে প্রার্থনা শিখাইয়াছিলেন তাহাতে 'অর্থার্থী' ভক্তি খানিকটা ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন,—"হে পরম পিতা, দৈনন্দিন রুটি যেন তোমার দয়ায় মিলে।"

ইহার পরবর্তী স্তরের ভক্ত গীতার সংজ্ঞায় 'জিজ্ঞাসু' ভক্ত। ইনি কোন বিপদে পড়িয়া বা সাংসারিক বিষয়ের কামনায় ভগবানকে ডাকিতেছেন না, ডাকিতেছেন জীবনের প্রকৃত রহস্য কি, লক্ষ্য কি, যথার্থ শান্তির উপায় কি, ভগবানের তত্ত্ব কি, মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি—এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য। ডাকিবার প্রেরণা অভাববোধ—এখানেও ঠিকই আছে, তবে কিছু রূপান্তরিত। এখানে ভক্ত সংসারের কোন অভাব বোধ করিতেছেন না। অভাব—প্রাণের একটা

অব্যক্ত শূন্যতা। ইহারই নাম আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা। ভগবান ব্যতীত এই অভাব অপর কিছুতেই মিটিবার নয়। তাই প্রার্থনা, "আবিরাবির্ম এধি"—হে জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি হৃদয় আলোকিত করিয়া আবির্ভূত হও।" "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥" (ঈশোপনিষৎ)—হে সর্বপোষক, জ্যোতির্ময় সত্যের দ্বার উন্মোচন কর, সত্যকে যে মিথ্যা চাকচিক্যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে তাহা অপসৃত হউক, সত্যের দর্শনকামী আমার বাসনা পূর্ণ কর।

ভগবানকে সাংসারিক প্রয়োজনে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া পরে আধ্যাত্মিক শান্তির জন্য ভগবদ্ভজনা অর্থাৎ 'আর্ত' বা 'অর্থার্থী' ভক্তের 'জিজ্ঞাসু' ভক্তে রূপান্তর ধর্মজগতে একটি চিত্ত-চমৎকারী ঘটনা। ধ্রুবের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমের অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিবার বাসনা তাঁহাকে শ্রীহরিকে ডাকিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। হরি দেখা দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি চাও? ধ্রুব কাঁদিয়া আকুল। কি আর চাহিব? চাহিয়াছিলাম তো কাচ, পাইয়া গেলাম হীরক। অনিত্য স্থান আকাঙ্ক্ষা করিয়া দর্শন মিলিল তোমার—অবিলুপ্ত-জ্যোতি সারাৎসার পরাৎপর পরমাত্মার। আর কিছু চাই না। এই চাই যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি।

এই যুগেও ভাবী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথের জীবনের একটি ঘটনা 'অর্থার্থী' ভক্তি এবং 'জিজ্ঞাসু' ভক্তিতে পার্থক্য কি—সেই বিষয়ে অতি সুন্দর আলোক সম্পাত করে।

সাংসারিক অভাব-অনটনে নরেন্দ্র দারুণ বিপর্যস্ত—বহু চেষ্টাতেও কিছু সুরাহা হইতেছে না। একদিন তিনি অগত্যা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—মা কালীকে বলিয়া অভাব অনটনের কোন প্রতিকার করিয়া দিতে পারেন কিনা। ঠাকুর বলেন, যা না, তুই-ই মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রার্থনা জানা। নরেন্দ্র তিন তিন বার ঐ প্রার্থনা জানাইবেন বলিয়া মন্দিরে গিয়া বসিলেন। তিনবারই ভিতর হইতে প্রার্থনা উঠিল,—মা, বিবেক বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান ভক্তি দাও। ঠাকুর শুনিয়া খুব আনন্দিত। নরেন্দ্রের ন্যায় অধিকারীর কি অর্থার্থী ভক্তি সাজে?

গীতার বিভাগে 'অর্থার্থী' ভক্তের পরে 'জ্ঞানী' ভক্ত। ইনি ভগবানকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'-জ্ঞান তাঁহার চিত্তকে এক অবিচলিত সমতা, শান্তি ও সামঞ্জস্যে সুস্থির রাখিয়াছে। চাহিবার আর কিছু নাই। ভগবদিচ্ছায় সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, গাছের পাতাটিও ঈশ্বরের ইঙ্গিত ছাড়া নড়ে না—এই অনুভূতি স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার 'বিপন্ন' বোধ নাই। অতএব আর্তভক্তির প্রশ্ন উঠে না। অর্থার্থী ভক্তিরও নয়, কেননা পরমসম্পদ্ ভগবানকে সর্বদা নিজের কাছে পাইতেছেন, পার্থিব বা পারলৌকিক অন্য কোন 'অর্থ' তাঁহার দৃষ্টিতে ফিকা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি এই চতুর্থ ধাপ বা শেষ ধাপের ভক্ত ভগবানকে অনবরত ডাকিয়া চলেন। তাঁহার ডাকের পিছনেও কি অভাববোধ আছে? হাঁ, আছে। ভগবানের অনন্ত প্রেমের সম্মুখে আসিয়া 'জ্ঞানী' ভক্ত দিশাহারা। ভগবানকে ভালবাসিয়া যেন ফুরাইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যদেব জীবনের শেষ পর্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া গেলেন। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি পরিপূর্ণ; কিন্তু সেই কৃষ্ণপ্রেমেরই তিনি শাশ্বত ভিখারী! অনন্ত ব্রহ্মসাগরের এক গণ্ডূষ জলপান করিয়া শিব চিরকালের জন্য আউল হইয়া বেড়াইতেছেন! ভগবানকে যিনি সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহার অপর সব তৃষ্ণা মিটিয়াছে, কিন্তু ডাকার তৃষ্ণা মিটে নাই; মিটিতেও পারে না। ভগবানকে ডাকিবার অন্তহীন তৃষ্ণার জন্যই যে ভগবানকে ডাকা।

ভগবানকে কেহ নানা বাক্যের মধ্য দিয়া ডাকেন, আবার কেহ বা সংক্ষিপ্ত দু' চারটি কথা বলিয়া কিংবা কখনও কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়াই ডাকেন—নীরব প্রার্থনা। ভাবটি এই,—ভগবান অন্তর্যামী, আমার মনের কি কথা, প্রাণের কি অভাব—তাহা তো তাঁহার অবিদিত নাই। আমি কেবল তাঁহার নিকট আসিব, তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিব। আমার বেদনা, আর্তি, শূন্যতা তিনি আপনা হইতেই দূর করিবেন। তাঁহার নিকট অধিক বাক্যপ্রয়োগ তো শোভা পায় না। নীরব প্রার্থনার ভাবটি সত্যই বড় সুন্দর! কোন কোন ভক্তের ডাকা শুধু ইষ্টের নাম জপ করা। নাম উচ্চারণের সহিত তাঁহার সমগ্র প্রাণের প্রার্থনা মিশিয়া থাকে। যখন বলি 'রাম' তখন তো শুধু এইটুকুই বলিনা, কথায় প্রকাশ না করিলেও প্রাণে প্রাণে বলি,—হে রাম, আমি তোমার শরণাগত; তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি ইহকাল, তুমি পরকাল, আমি সাধনহীন ভজনহীন জ্ঞান-হীন ভক্তিহীন। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। দর্শন দিয়া জীবন ধন্য কর।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানুষ কত ভাবেই না ভগবানকে ডাকিয়া আসিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সেই ডাকিবার ভাষা পরবর্তীকালের সাধক-সাধিকাদের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ভগবৎ-প্রেমিক ভক্তেরা যে কথা বলিয়া ভগবানকে ডাকেন, সেই কথাগুলির ভিতর কত শক্তি, কত প্রেরণা, কত মাধুর্য নিহিত। স্থূল মানুষ যখন স্থূল মানুষকে ভালবাসে তখন কয়টি কথা দিয়াই বা সে তাহার ভালবাসাকে প্রকাশ করিতে পারে? ভালবাসার বস্তু এখানে সীমাবদ্ধ, ভালবাসাও তাই সীমাবদ্ধ। তবুও সেই ভালবাসাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়া বহু কবিতা, বহু নাটক, বহু উপন্যাস রচিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। আর ভগবানের ভালবাসা? সেই অনন্ত মহাসাগরের উপলব্ধি এবং প্রকাশের কি শেষ আছে? তাই যুগে যুগে দেশে দেশে ভগবদ্ভক্তগণের প্রার্থনাগুলি চিরদিন নূতন সজীব, প্রাণপ্রদ। ঐগুলি হইতে আমরাও ভগবানকে কি করিয়া ডাকিতে হয় শিখি। তাঁদের কথা, তাঁদের ভাব নিজেদের উপর আরোপ করিয়া আমরা নিজেরা ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি। আলো হইতেই আলো জ্বলে। ভগবৎ-প্রেমিকের (সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ) সঙ্গ আমাদিগের হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেম উদ্বুদ্ধ করে।

গায়ত্রীমন্ত্রের সেই শাশ্বত প্রার্থনাটি! সর্ব-চরাচরের যিনি চৈতন্যালোক—তাঁহাকে হৃদয়ে আহ্বান! তিনি যদি বুদ্ধিকে প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি, সত্যকে বুকে রাখিয়া সংসার যাপন করিতে পারি—উপনিষদের 'অসতো মা সদ্গময়' প্রার্থনাটিতে যে ব্যাকুলতা, নির্ভরতা, সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সকল কালে সকল মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। "মিথ্যার কুহক ভাঙিয়া আমায় সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর, অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আমায় আত্মজ্ঞানের দীপ্তিতে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে আমায় অমরত্বে স্থাপন কর, আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও। তোমার করুণামাখা মুখের দৃষ্টিতে আমাকে পরিতৃপ্ত কর।"—এই প্রার্থনা কি এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়?

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি! হে জগদীশ্বর, ধন চাই না, লোকসঙ্গ চাই না, সুন্দরী বনিতার বা কাব্যচর্চার কামনাও আমার নাই। চাই জন্মে জন্মে তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি। সার্থক ভক্তি লাভ করিতে গেলে মনের ভাব কি হওয়া দরকার, এই কথাগুলি হইতে আমরা তাহা শিখিতে পারি। ভক্তদের চরিত্রা-লোচনা যেমন ভক্তির সহায়ক তেমনি তাঁহাদের ডাকিবার ভাষা আয়ত্ত করাও ভক্তির একটি অন্যতম সাধনা।

ভগবানকে ডাকিবার ইচ্ছা যত আন্তরিক হইবে তাঁহাকে ডাকাও তত ফলপ্রসূ হইবে। যাহার পিপাসা পাইয়াছে জল তাহারই নিকট সুস্বাদু এবং তৃপ্তিদায়ক বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণোদয়। বালক যখন সাথীদের বলে, 'ভগবানের দিব্য' তখন ভগবান শব্দটির তাৎপর্য আর কতটুকু? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, আমরা যখন ভগবানের নাম করি, ভগবানকে ডাকি, তখন ভগবান যেন শুধু ঐরূপ একটা কথার কথা, ক্রীড়াঙ্গনের শব্দমাত্রে পর্যবসিত না থাকেন। জীবন্ত বিশ্বাস আসিয়া যেন সেই শব্দকে প্রাণবান্ করে।

'কেমন করিয়া ডাকিব?'—ইহা বুদ্ধিবৃত্তির সাজানো কৌতূহল নয়, ইহার মীমাংসাও বুদ্ধিবৃত্তির শিখানো বুলির দ্বারা হইবার নয়। প্রশ্নটি মানুষের জীবন-মরণের সহিত সম্পৃক্ত একটি স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসা। ব্যাকুল-প্রাণের উদ্বেল অনুরাগ এবং অকম্পিত বিশ্বাস ইহার সমাধান আনিয়াছে অসংখ্য বিচিত্র ভগবন্মুখী আচরণ ও আবেগের মধ্য দিয়া। সেইগুলিই লক্ষ্য করিবার, অনুধ্যান করিবার, অনুভব করিবার। মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে পূর্ণতাকে অন্তরে ধারণ করিয়া। উহা যে ভিতরেই আছে তাহা তাহার মনে নাই। জন্মিয়াই তাই তাহার ক্রন্দন শুরু। কোথায় গেল? কোথায় গেল? বুকের ধনকে যতদিন না সে ফিরিয়া পাইতেছে ততদিন তো তাহার রোদন থামিবে না। নানা ভাবে তাহাকে চাহিয়া বেড়াইতে হইবে। ইহাই তাহার ডাকার ইতিহাস এবং উপন্যাস। ইহার কোন পরিচ্ছেদই ব্যর্থ নয়, তুচ্ছ নয়। ঠেকিয়া, শিখিয়া, পড়িয়া, উঠিয়া মানুষ ডাকিয়া চলে, ডাকিয়া ডাকার সার্থকতাকে লাভ করে। অবশেষে পূর্ণতাকে ফিরিয়া পায়। হাহাকার মিটে, কিন্তু ডাকা থামে না। সে ডাকা ক্রন্দন নয়, সঙ্গীত!

বেদান্ত কি?*

স্বামী অভেদানন্দ

'বেদান্ত' কথাটির অর্থ 'বেদের অন্ত বা জ্ঞানের শেষ'। এই পরিভাষা দ্বারা আমরা যেন এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত না হই যে জ্ঞানের কোন সীমা আছে বা শেষ আছে। 'জ্ঞানের শেষ' বলিতে বুঝায় জাগতিক ও ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির সীমা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যেখানে পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কখন পৌঁছিতে পারিবে না। কোথায় এই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা? ইহা কি জড় পদার্থের জ্ঞানে পর্যবসিত? না; জড়পদার্থ দৃশ্যমান জগৎ বলিয়া যাহা পরিচিত তাহারই জড় অণুর সংযোগমাত্র—ইহা বিশ্বজগতের মাত্র অর্ধেক। অন্য অর্ধেক জড় নয়—জড়ের অনুভবিতা—চেতন বোধশক্তি, যাহার সহায়ে আমরা বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইতেছি। যখন আমরা বাহিরের অনুভূত জ্ঞানের (knowledge of objective world) সহিত অনুভবিতার জ্ঞান (knowledge of subjective world) সম্মিলিত করি তখন এক মহত্তর জ্ঞানের সন্ধান আমরা পাই যাহা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ নয়, এই জ্ঞানকে দিব্যজ্ঞান বা অনন্ত জ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই জ্ঞানই সমগ্র বিশ্বের আদি ও অন্ত।

এই জ্ঞান কোথায়?—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে? আমাদের শরীরের (ভাণ্ডের) বাহিরে? না। ইহা সর্বত্র, বাহিরে এবং ভিতরেও। আমাদের আত্মায় জ্ঞানই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আত্মা এই প্রতীয়মান অস্তিত্ব-সমূহের লয়স্থান বা অধিষ্ঠানস্বরূপ অনন্তজ্ঞানেরই প্রকাশ-মাত্র। জ্ঞানের সমুদ্র একই, যদিও ইহা বিভিন্ন অবস্থায় অনুভূত, এবং বিভিন্ন নামে অভিহিত।

* সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সোসাইটির সৌজন্যে প্রাপ্ত। [ইংরেজী হইতে অনূদিত]

আমরা ইহার সমগ্র রূপটি দেখিতে বা বুঝিতে নাও পারি। কিন্তু জীবনের কোন কোন মুহূর্তে আমরা ইহার আংশিক রূপ ক্ষণিকের জন্য দেখিতে পাই। যদি জানিতে চাই—'কে আমি ? আমার স্বরূপ কি ?'—তবে বুঝিতে পারি অন্তরের মধ্যে একটি অগ্নিকণা জ্বলিতেছে—যাহাতে দিব্যভাব অন্তর্নিহিত—যাহা অনন্ত জ্ঞানের সূর্য হইতেই প্রসূত ও প্রসারিত।

বেদান্তের তিনটি প্রণালীবদ্ধ মতবাদ আছে—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত। যতদিন পর্যন্ত আমরা শরীরকেই মনে করি আমাদের স্বরূপ, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আমরা সচেতন, ততদিন বিশ্বের একজন স্রষ্টা ও শাসকের কথা—আমাদের মনে আসে। সে অবস্থায় আমরা চিন্তা করি, ঈশ্বর বিশ্বের বাহিরে (extra-cosmic) মেঘের ওপারে, স্বর্গে বসিয়া আছেন; তাঁহার কাছে আমরা পৌঁছিতে পারি না, এত দূরে যে আমাদের ধরাছোঁয়ার বা অনুভূতির বাহিরে, এত মহিমান্বিত যে আমরা তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। বিশ্বের অধিষ্ঠানস্বরূপ সেই অনন্ত জ্ঞান উপলব্ধি করিবার ইহা প্রথম সোপান মনে করা যাইতে পারে।

তারপর ক্রমশঃ যতই আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতি ও তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ বুঝিতে পারি, ততই আমরা অনুভব করি—তিনি আমাদের খুব দূরে নহেন; তিনি বিশ্বব্যাপী, তিনি আমাদের অন্তর্যামী। আত্মা যেমন শরীরের উপর প্রভুত্ব করে, তেমনই তিনিও দৃশ্যমান জগতের বাহির হইতে নয়—মধ্যে থাকিয়াই তাহার প্রতিটি পরমাণু নিয়মিত করেন। আমাদের আত্মাও সেই বিরাটের অংশ, কিন্তু পূর্ণের সমান কখনই নয়। আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ইহা দ্বিতীয় স্তর।

তারপর যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও চিন্তার পারে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহারই আত্মা পরমাত্মাকে নিকটতরভাবে উপলব্ধি করে। যখন আমরা আপেক্ষিক (দ্বৈত-দ্বন্দ্ব) ভাবের ঊর্ধ্বে উঠি তখন বুঝিতে পারি, একটি কিছু আছে—যাহা নানা নামে উপাসিত ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ভিত্তিস্বরূপ; তখনই আমরা নিরপেক্ষ সত্তার রাজ্যে প্রবেশ করি। তখন আর বাহিরের জ্ঞান থাকে না, অবর্ণনীয় সমাধির আনন্দ অনুভূত হয়; সর্বপ্রকার ভেদ-দর্শন তিরোহিত হয়।

বেদান্তের ধর্মই পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োগসিদ্ধ (practical). ইহা আমাদের শিখায় না যে কতকগুলি তত্ত্ব, যুক্তিহীন মতবাদ এবং উপদেশে বিশ্বাস করাই ধর্মের উদ্দেশ্য। পরন্তু ইহা শিখায়—ঈশ্বরীয় হওয়া, পরিপূর্ণতা লাভ করা, প্রতিদিনের কাজে কর্মে দিব্যভাব বিকশিত করাই যথার্থ ধর্ম!

বেদান্ত-ধর্মের মূল নীতি কি ?—আমরা অমর আত্মা-রূপেই জন্মিয়াছি, পাপের ফলে বা অন্যায় আচরণের জন্য নয়—অমৃত-আনন্দের সন্তান আমরা! সত্যই যদি তাই হয়—তবে আমরা কি তাহা অনুভব করি ? করি, বা নাই করি—তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ইহা আমাদের জন্মগত অধিকার, আজ না হয় কাল—আমরা নিশ্চয় ইহা অনুভব করিব, এ বিষয়ে সচেতন হইব। আমাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের মতো অনন্ত অমৃত এবং দিব্য,—পবিত্র। ব্যক্তিগত আত্মা (জীব) এবং বিশ্বগত পরমাত্মায় (ঈশ্বরে) [পরমার্থতঃ, স্বরূপতঃ] কোন ভেদ নাই।

আত্মা অনন্ত, জন্মহীন, মৃত্যুহীন—অপরিবর্তনীয়। শরীরের বিনাশে শরীরী আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা কখনও মরিতে পারে না; এই সত্যটুকু মনে রাখিতে পারিলে মৃত্যুকে আর কেন ভয় ? ভয়শূন্যতাই আমাদের আদর্শ; এবং ইহাই প্রত্যেকের আদর্শ হওয়া প্রয়োজন।

'মরম না জানে, ধরম বাখানে'

[সমালোচনা]

শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার, এম্-এ

'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকার ১৩৬৩ সালের শারদীয়া সংখ্যায় কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেব লিখিত 'রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। ইহা ওদুদ সাহেব কর্তৃক বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত বক্তৃতামালার অংশ। আলোচ্য প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ওদুদ সাহেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামীজীর প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের সাধনার মর্মকথা বুঝিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, প্রবন্ধটিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি কিন্তু লেখকের যথাযোগ্য শ্রদ্ধার অভাব সুপরিস্ফুট।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান সাধনায় যে কালজয়ী ও সীমাতিশায়ী পরিপূর্ণতা আছে—তাহা ওদুদ সাহেবের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। তিনি ভক্ত-হৃদয়রূপ অমৃতলোকের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণের পথে সেই অমৃতলোকে প্রবেশ করা যায় না। মরমী সাধক 'প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা কয়, ও প্রাণে-প্রাণে প্রেরণা জোগায়।' তাহার অন্তরে অন্তর মিশাইয়া যে তাহার প্রাণের পরিচয় নিতে পারে, আনন্দলোকে শুধু তাহারই নিমন্ত্রণ।

ওদুদ সাহেব 'মরমী সাধনার অবাঞ্ছিত পরিণতি,' 'প্রগল্‌ভ ভক্তির অবাঞ্ছিত পরিণাম,' 'ভগবৎ-চেতনা ও ভগবৎ-নির্ভরতার উৎকট স্বয়ংসম্পূর্তি,' প্রভৃতি অনেক কথা বলিয়াছেন। ভক্তিমার্গে সিদ্ধিলাভের অর্থ ই স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভগবৎ-চেতনা, আরাধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও একান্ত নির্ভরতা—'যদেব ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্যুপাসতে'। ভক্তের কাছে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। মহা ভাবলোকে ভক্ত ও আরাধ্য নিভৃতে বিরাজ করিয়া নিত্য নব সঙ্গ-সুখের আস্বাদন গ্রহণ করেন।

হিসাব পরিমাণ করিয়া বা 'ফরমুলা'-অনুসারে সাধনা করিয়া ঈশ্বর লাভ হয় না, ব্যাকুলতা হইলেই ঈশ্বরলাভ হয়। ব্যাকুল মনে পরিণামচিন্তা সম্ভব নয়। ভক্তিমার্গে সতর্কতাবিহীন ব্যাকুলতার জন্য 'অবাঞ্ছিত পরিণাম' কখনও ঘটে না। ভক্ত যাঁহার জন্য ব্যাকুল, সেই সর্বশক্তিময়ের অতন্দ্র দৃষ্টি তাহার উপর সদা নিবদ্ধ থাকিয়া তাহাকে কল্যাণের পথে চালিত করে। কেহ ইহা বিশ্বাস করুক, আর নাই করুক, ভক্তের তাহাতে কিছুই যায় আসে না। ভক্ত মহাভাবে বিভোর হইয়া থাকে। ভগবৎ-চেতনা তাহার মধ্যে 'উৎকট'-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া কেহ চীৎকার করিলেও তাহার কিছুই যায় আসে না।

ওদুদ সাহেবের মতে 'যে ভগবৎ-চেতনা বা নির্ভরতা অভ্রান্তভাবে লোকশ্রেয়ের প্রেরণা দেয় না, তাহা বন্ধ্যা'। যথার্থ ভগবৎ-চেতনা লোকশ্রেয়ের প্রেরণাদায়ক না হইয়াই পারে না। জীবপ্রেম ভগবৎপ্রেমেরই অপরিহার্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই ধরিয়াছেন, বৈষ্ণবের ভগবৎপ্রেম শুধু বৈকুণ্ঠের তরে নয়:

'প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি দিই তাই দেবতারে,
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই প্রিয়জনে,
আর পাব কোথা? দেবতারে প্রিয় করি,
প্রিয়েরে দেবতা।'

সেই প্রিয়তমের প্রতিরূপ হিসাবে বিশ্বের সকলেই ভক্তের প্রিয়জন। লোকশ্রেয়ের মাপ-কাঠিতে পরমহংসদেবের সাধনাকে অসার্থক প্রতিপন্ন

করার জন্য ওদুদ সাহেবের প্রয়াস টুপি দিয়া আকাশ ঢাকিবার চেষ্টার মতোই হাস্যকর। তাঁর এই প্রবন্ধেই তিনি পরমহংসদেবের বিখ্যাত বাণী 'যত্র জীব তত্র শিব' উল্লেখ করিয়াছেন। 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' করিবার যে উপদেশ পরমহংদেব দিয়াছেন ওদুদ সাহেব নিশ্চয়ই তাহা জানেন। তাঁর প্রবন্ধের আর এক জায়গায় তিনি তিনি লিখিয়াছেন, 'পরমহংসদেবের সাধনায় সেবার প্রেরণা অবশ্য ছিল, না থাকলে স্বামী বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগত মুক্তি উপেক্ষা ক'রে লোকহিত-সাধনায় তিনি উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন না।' তবে ওদুদ সাহেব বলেন, 'বিবেকানন্দের প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত না হ'লে তাঁর মানব-সেবার আকাঙ্ক্ষা সার্থক হ'তে পারত না, এই মনে হয়।' অতি সত্য কথা। কিন্তু এজন্য যে তিনি মনে করেন, পরমহংসদেবের ব্যক্তিগত ভগবৎ-চেতনায় লোকশ্রেয়ের ইচ্ছার অল্পতা ছিল—তবে বলিতে হয়, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যে একই সত্তার দ্বিবিধ প্রকাশ—ওদুদ সাহেব তাহা ধরিতে পারেন নাই। ভাবসমাহিত প্রশান্তবিগ্রহ রামকৃষ্ণ ও তেজোদীপ্ত অমিতবিক্রম বিবেকানন্দ—এই দুইয়ে মিলিয়া এক। শুধু তাই নয় অসংখ্য সন্ন্যাসী ও ভক্তদলের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। এই ভাবে রামকৃষ্ণ সকল জীবশ্রেয়ের মূলাধার, লোকশ্রেয় তো আরও সীমাবদ্ধ। ভারতের সর্বত্র এবং পৃথিবীর নানাস্থানে যাঁহার নামে আর্তত্রাণ, শিক্ষাদান এবং জনসেবার নানা কাজ চলিতেছে, সহস্রাধিক সন্ন্যাসী যাঁহার অনুগামী হইয়া সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার ভগবৎ-চেতনা 'বন্ধ্যা'! এইরূপ উক্তি ওদুদ সাহেবের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট আশা করা যাইত না।

ওদুদ সাহেব আবার সন্ন্যাসের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন! তাঁহার মতে, 'সন্ন্যাস ইত্যাদি জীবন-বিমুখ-প্রবণতা……।' ওদুদ সাহেব সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টির দাবি করেন, কিন্তু এখানে 'নিয়াতা ফিল ইস্‌লাম'—ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নাই—এই সংস্কারটি তাঁহার দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসী সংসার- বা জীবনবিমুখ নহেন, তাঁর সংসার বিরাট এবং সাধনা মহাজীবনের। কবির কথায়ঃ

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর?

দৃষ্টির স্বচ্ছতা থাকিলে তিনি এই ভাবেই সন্ন্যাসকে দেখিতেন। হিন্দু বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সন্ন্যাসি-সঙ্ঘগুলির অক্লান্ত সেবায় মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া আসিতেছে। যে কোন অপক্ষপাতী সমালোচকই এই কথা স্বীকার করিবেন Sleeping liviathan-রূপ ঘুমন্ত ভারতীয় জাতির চেতনা-সঞ্চারে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সন্তানবর্গের অবদান তুলনাহীন।

ওদুদ সাহেবের মতে, "পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ' চিন্তাধারার উপর অতীত প্রভুত্ব করছে, তাই ওটি তত্ত্বের ব্যাপার বেশী, সত্যের ব্যাপার কম।" ইহা ওদুদ সাহেবের অপূর্ব গবেষণা। 'যত মত তত পথ'—সর্বাশ্রয়ী সত্য। উপনিষদে আছে, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। ধর্মের ব্যাপারে ভারত কোনও মতকে কোনও দিন অস্বীকার করে নাই। কি করিয়া অস্বীকার করিবে? যিনি অবাঙ্মনসোগোচর, 'অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে আদিযুগ হইতে। সাকারের ধ্যানে, নিরাকারের ধ্যানে, গানে, নৃত্যে, আচারে, বিচারে, প্রেত-পূজায়, প্রতীক পূজায়, কত সাধক কত ভাবে তাঁহার পরশ আপন প্রাণের ভিতর পাইতে চাহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাহার সাধনপথ ঠিক, কাহার বা ভুল—তাহার বিচারের শক্তি ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্বল্পজীবী মানুষের নাই। নুনের পুতুল কি মহাসমুদ্রের

গভীরতার পরিমাপ করিতে পারে? রামকৃষ্ণ অসীম, কিন্তু তিনি যাহাদের শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ, সেই সাধারণ মানুষ সীমাবদ্ধ, তাই তিনি বলিয়াছেন যে ইহাদের কাহারও আন্তরিক সাধনা বিফল হইতে পারে না। সরল ব্যাকুল ভাবে সাধন করিলে সকল পথেই সকল মতেই অনন্ত ভাবস্বরূপ ঈশ্বর লাভ হয়। ইহাই "যত মত তত পথ"। ৺মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় তাঁর 'বাংলার নবযুগ' বইটিতে "সেমিটিক নেতিবাদের" কথা বলিয়াছেন। অধ্যাপক গোপাল হালদার তাঁহার "সংস্কৃতির রূপান্তর" বইটিতে "সেমিটিক নেতিবাদ"কে মানসিক ঔদ্ধত্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ওদুদ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধে 'এটা ভুল, ওটা ভুল' বলিয়া চলিয়াছেন—এই নেতিবাদের প্রভাবে।

স্বচ্ছ অন্তর-বিশিষ্ট মানুষ বুঝিতে পারে যে অসীম বিশ্বব্যাপারের প্রায় সবটুকু তার জ্ঞানের অগম্য। সুতরাং তার উপলব্ধির অতীত কোনও বিষয়কে সে ভুল বলিবার সাহস পায় না, এবং বলে না। কিন্তু নেতিবাদমূলক চিন্তারাজ্যে কতকগুলি মায়া-বিগ্রহ (বেকনের 'idol')-এর সৃষ্টি হয়। এই সব ভাবপুত্তলিকার দাস হইয়া নেতিবাদীরা সর্বাশ্রয়ী সনাতন সত্যকে হারাইয়া ফেলে। এই কারণেই ওদুদ সাহেব বলিয়াছেন, "সর্বধর্মই সত্য, এটি একটি শিথিল চিন্তা মাত্র। তার চাইতে সব ধর্মের ভিতরই যথেষ্ট মিথ্যা বা অসার্থক ভাবনা রয়েছে, মানুষকে সে সব কাটিয়ে উঠ্‌তে হবে, এই চিন্তার মর্যাদা বেশী।" একথা জানিয়া মিস্ মেয়ো ও বিভারলি নিকলসেরা উৎসাহিত হইবেন যে রুচিবান্ শিল্পীর চেয়ে নর্দমা-পরিদর্শকের মর্যাদা বেশী। নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় না।

অবতারবাদের বিরুদ্ধে ওদুদ সাহেবের আপত্তি। তাঁর মত "এ সম্পর্কে সব চাইতে শোচনীয় ব্যাপার হলো, স্বামী বিবেকানন্দ যে তাঁকে পূজা নিবেদন কর্‌লেন অবতারগরিষ্ঠ ব'লে।" বিবেকানন্দ অবতার-বরিষ্ঠকেই "অবতারবরিষ্ঠায়" বলিয়া পূজা করিয়াছেন। অতিমানবীয় মনীষাসম্পন্ন স্বামীজীর মনে সন্দেহের লেশমাত্র থাকিলেও তিনি তাহা করিতেন না। পরমহংসদেবের সহিত স্বামীজীর প্রথম পরিচয়ই তাহার প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষের মনের গঠন এইরূপ যে সে কোনও না কোনও ভাবে অবতারের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞানদাতা, পরিত্রাতা, বার্তাবহ অবতার কেবল হিন্দুরই অতি প্রিয় নয়; তথাগত বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, হজরত মহম্মদ প্রভৃতি ধর্মগুরুগণেরও কোটি কোটি উপাসক আছেন, ইহাতে দোষ দেখি না। নাস্তিকেরাও দেখিতেছি রাজনৈতিক নেতাকে অবতারের আসনে বসাইয়া উপাসনা করেন। কেহ কেহ চিত্রতারকা, খেলোয়াড় বা দৌড়ের ঘোড়ারও উপাসনা করেন। নেতিবাদী নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নিজেরই উপাসনা করেন। সুতরাং মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ অবতারের উপাসনাকে সেকেলে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া নিরর্থক। উপাসনা যখন করিতেই হইবে তখন শ্রেষ্ঠ অবতারের উপাসনা করাই শ্রেয়।

ওদুদ সাহেব বলেন, 'রামকৃষ্ণদেবের যে অলৌকিক দর্শন হলো, সেটি হয়ত মরমী সাধনার এক সাধারণ দুর্বলতা।' যিনি অলৌকিক দর্শন বিশ্বাস করেন না তাঁহার সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই। আমরা অলৌকিক দর্শনে বিশ্বাসী; হজরত মহম্মদের অহিলাভ ও 'সাব-ই-মিরাজ'এর রাত্রিতে সপ্তস্বর্গ ভ্রমণ সম্পর্কে ওদুদ সাহেবের সুস্পষ্ট মত জানিলে বাধিত হইব।

রোঁমা রোঁলা পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া মণিপূর্ণ খনি অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহার পরশ-পাথর মিলিয়াছে। ওদুদ সাহেবের পথে চলিলে তিনি এই পাওয়ার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতেন। ধর্মকে নিজ বুদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ করার পরিণাম বেদনাদায়ক।

সমালোচনা

দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা—শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্থাপত্য-বিশারদ-প্রণীত, প্রকাশক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা—২৩৮+২৵০ (ভূমিকা-সূচী প্রভৃতি); মূল্য ২০৲ টাকা।

স্থাপত্য-বিশারদ শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় নূতন করিয়া নিষ্প্রয়োজন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া ভারত-প্রতিভা কিভাবে স্বমহিমার বিকাশ-সাধন করিতে পারে বর্তমান গ্রন্থখানি তাহারই একটি স্থায়ী নিদর্শন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীচট্টোপাধ্যায় ১৯৫৪ খৃঃ ধারাবাহিক ভাবে যে বক্তৃতাবলী দেন—তাহারই সারাংশ অবলম্বনে ইহা সংকলিত, ইহার পিছনে রহিয়াছে লেখকের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা, বহু অধ্যয়ন, পর্যটন ও প্রাচীন পুঁথির গবেষণা; সর্বোপরি রহিয়াছে তাঁহার স্বকীয় প্রতিভাদীপ্ত চিন্তা!

প্রস্তাবনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত মহাশয় লিখিয়াছেন: 'দেবায়তনের ইতিহাসের যোগ একটি দেশের বা জাতির ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে নয়, ইহার যোগ সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে।' বহু পরিশ্রমে রচিত গ্রন্থখানিকে কেহ যেন মন্দির-নির্মাণের প্রণালী বা পদ্ধতি বলিয়া মনে না করেন। লেখক অনুভব করিয়াছেন: 'ভারতবর্ষের একটি সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ নির্ভুল নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রকাশের আশু প্রয়োজন।' ইতিহাস প্রায়ই অসত্য এবং অর্ধসত্য উপাদানের মিশ্রণে বিকৃত হয়। মহাকালের বিরাট বক্ষে মানব-মন তাহার যে স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে—লেখক তাহাই অধ্যয়ন করিয়াছেন—সযত্নে, নীরবে—একাকী।

জীবন-সায়াহ্নে স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দেশবাসীকে তথা বিশ্ববাসীকে তিনি উপহার দিয়াছেন। বাইশটি অধ্যায়ে সুলিখিত গ্রন্থে আদিপ্রস্তরযুগ হইতে শুরু করিয়া দ্রাবিড় ও আর্য, হিন্দু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত—প্রতিটি কৃষ্টির তরঙ্গ আলোচিত হইয়াছে; ভারতের বাহিরে ভারত-সংস্কৃতির প্রসার এবং বহিরাগত সংস্কৃতির সহিত ভারত-কৃষ্টির সংঘাত এবং সমন্বয়-প্রচেষ্টাও প্রদর্শিত হইয়াছে। 'বস্তু-তান্ত্রিকতার কবলে বর্তমান ভারত'ও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মূলগত ঐক্য লক্ষ্য করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করিয়া লেখক গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

পরিশেষে চিত্রবিরবণীতে প্রায় ১৭১টি চিত্রের অন্তর্নিহিত ভাব তিনি বিবৃত করিয়াছেন। চিত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশই মন্দির ও দেবতা বা তীর্থ সংক্রান্ত; কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি ও নক্সা পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অধুনা-নির্মিত নয়াদিল্লীর বিড়লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির রহিয়াছে, অথচ বেলুড়মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির না থাকার কারণ বোঝা গেল না। শ্রীরামকৃষ্ণের যে ছবিখানি আছে তাহা নিতান্তই কাল্পনিক। —নি.

নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—৮৭; মূল্য আড়াই টাকা।

'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'—সুমুদ্রিত পুস্তকখানিতে প্রখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর 'গুরু' 'ইষ্ট' ও 'সাধন' বিষয়ক সংস্কৃতে রচিত শ্লোকগুলি ও তাহাদের পদ্যানুবাদ অধ্যাত্ম পথের পথিকের নিকট অপূর্ব দিগ্‌দর্শন-রূপে গ্রহণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সাধনার মর্মকথা অনবদ্য ভাষায় মনোরম ছন্দে ও ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়া সাধক-কবি ৪৭টি কবিতা সাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। —জী.

স্মৃতিপূজা গ্রন্থমালা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—প্রণেতা শ্রীহরিদাস রামানন্দ। প্রকাশক শ্রীসূর্যমণি—ললিতা সাহিত্য ভবন। আশীষ কুটীর, শিলং। পৃঃ ১২৮+৯। মূল্য ৪৲ টাকা।

গ্রন্থকারের পূর্বনাম শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ভারতীয় শিক্ষা-সেবক, অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর। তাঁহার জীবনে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শ-লাভ এক পরম সৌভাগ্য, তাই গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, আধ্যাত্মিক দান প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে, দুইটি অধ্যায় লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতি-তর্পণ। দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা কিভাবে কয়েকজন সাধক ও মহাপুরুষের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তত্ত্বভূষণ সীতানাথ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির সহিত গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত স্মৃতি ও মতানুযায়ী অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। "রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় মহাবিশ্বজীবনের যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, পরমহংসদেবের সাধনায় তাহাই যেন মূর্তিমান্ হইয়াছে।"—দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লেখকের এই উক্তিতে ইতিহাসের পারম্পর্য অবহেলা করা হইয়াছে।

—মৈথিল্যানন্দ

Song Sublime or 'Geeta'—(In Rhyme) by Sri Profulla Kumar Lahiri, 57, Monohar Pukur Road, Calcutta-29 Pages 148. Price Rs. 1/-

সম্পূর্ণ গীতার আঠারোটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি শ্লোক পৃথক্ ভাবে ছন্দে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। Edwin Arnold এর 'Song Celestial' এবং স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিষ্টোফার ঈশারউডের 'Song of God'এর পর ইংরেজীতে গীতার কাব্যানুবাদে ভাষা ভঙ্গি ও ছন্দের নূতনত্ব আনা দুরূহ। লেখক সে দিক দিয়া না গিয়া মূলের নিকটতা রক্ষা করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, সেজন্য ভাষা ও ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; তবে ভাবের দিক দিয়া তাহা পূর্ণ হইয়াছে। বিদেশী পাঠকের নিকট ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাব পরিবেশনের প্রথম পুস্তকরূপে ইহা অনায়াসেই দেওয়া চলিবে। কাব্যের আবরণে দর্শনের তত্ত্ব ঢাকা পড়ে; আমাদের মনে হয় গীতার গদ্যানুবাদ বিষয়-প্রবেশে অধিকতর সহায়তা করিত।

মীরাবাঈ—শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য প্রণীত, প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স কলিকাতা-১২ পৃষ্ঠা ২৬২+(২২); মূল্য সাড়ে চারি টাকা।

নানা কারণে মীরাবাঈ-এর জীবনী লেখা সহজ নহে। প্রথমতঃ কোন সাধক বা সাধিকার জীবনী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয় না; দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী কালে ভাবের আতিশয্যে অনেকে বহু ঘটনা অতি-রঞ্জিত করিয়া এমনভাবে লোকের চোখে ধরিয়া দেন যে তাহা হইতে আসল জীবন খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

টড্ সাহেবের 'রাজস্থানে' আমরা মীরাবাঈ-এর জীবনীর ধারাবাহিক আলোচনা প্রথম দেখিতে পাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন—ঐ সকল লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীর অনেকাংশই সত্য নয়।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া মীরার জীবনের ঘটনাগুলির যথাযথ সত্যতা নির্ণয় করিয়াছেন, ইহা প্রশংসনীয়; তবে হয়তো এই কারণেই পুস্তকখানি সাহিত্যের দিক দিয়া শুষ্ক হইয়াছে। মীরা-ভজনাবলীর অনুবাদগুলিতে মূলের আবেদন ঝঙ্কৃত হয় নাই। সঙ্গীত-মুখরিত প্রেম-নির্ঝরিণী মীরার জীবনের ভাব-ব্যঞ্জনা ইহাতে ফুটে নাই।

রামকৃষ্ণ-জননী শ্রীশ্রীসারদামণি—অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রণীত, প্রকাশক শ্রীলালবিহারী পাল, ২৮ বি, এন. স্নাফ মিল ষ্ট্রীট, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪৮, মূল্য ১৲।

বইখানির ঐ প্রকার নামকরণের সার্থকতা লেখক ভূমিকায় যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না। সে যাহাই হউক শ্রীসারদাদেবীর ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনলীলা, বিশেষভাবে মাতৃভাবের দিকটি, কাব্যধর্মী গদ্যে লেখক ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। পুরাপুরি কাব্যাকারে লিখিলেই পুস্তকটির মর্যাদা বাড়িত। ঘটনা ও ভাষার ভুল অনেক স্থলে চোখে পড়িল। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি অবশ্য দূরীকরণীয়। ভাবের আতিশয্যে লেখক ঘটনার যাথার্থ্য বা পারম্পর্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন নাই—মনে হয়।

অঘটন আজো ঘটে—দিলীপকুমার রায়। পৃষ্ঠা ২৯৬+৯। মূল্য চার টাকা আট আনা। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ; ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাংলাদেশের এই শ্যামল মাটিতে রাধাকৃষ্ণের যুগল-উপাসনা বহুদিন সাধক-সাধিকাগণের হৃদয়ে শ্রীভগবানের মাধুর্যময় আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি সঞ্চারিত করিয়াছে। এই ভক্তিরসাশ্রিত গ্রন্থটির আদ্যন্ত সেই অনুভূতির কাব্যমণ্ডিত প্রকাশ। পর পর কয়েকটি কাহিনীর মধ্য দিয়া লেখক এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ভগবানের চিরন্তন লীলারস পরিবেশন করিয়াছেন। অলৌকিক কাহিনীর প্রতি বিজ্ঞ সমাজের একান্ত উপেক্ষা এবং অজ্ঞ সাধারণের অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণতা—এই দুইই অযৌক্তিক। আমাদের সীমাবদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধি বিরাট বিশ্বরহস্যের সমস্তখানিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, একথা অহঙ্কারের পরিচয় দেয় মাত্র। অপর পক্ষে এই অলৌকিকতার ছদ্মবেশে অনেক নকল অবতার দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে—দেখিয়া সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার কথা ভাবিয়া দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি একথা সত্য যে সাধারণ যুক্তি ও বুদ্ধির অগম্য অনেক ঘটনাই এ জগতে ঘটে। বৈজ্ঞানিক তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন এবং ভক্ত ঐ ঘটনার মধ্য দিয়া সর্বসাধারণের কারণস্বরূপ শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমার কথা স্মরণ করিয়া ধন্য হন।

'অঘটন আজো ঘটে' সেইরূপ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার সমষ্টি—যৌক্তিক যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা এই সব ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এ বইটির উদ্দিষ্ট পাঠক—"…যাঁরা সত্যকে খানিকটা কষতে পারেন, তাঁদের সহজবোধের—ইনটুইশনের নিকষে। …এ বইটি লেখা শুধু তাঁদের জন্যে যাঁরা জানতে চান ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় কি না, ভক্ত কাতর হয়ে ডাকলে তিনি রক্ষা করেন কি না—এক কথায়, ভাগবত করুণা ভাববিলাসী কল্পনামাত্র, না পরীক্ষাসহ, অনুভবগম্য সত্য।" ভক্ত ভাবুকেরা বইটিকে যোগ্য সমাদর জানাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ভগবৎ-নির্ভরতার ও ভক্তরক্ষায় সদাজাগ্রত শ্রীভগবানের মহিমা কয়েকটি কাহিনীর মধ্য দিয়া লেখক অমৃতময়ী ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন। নবযুগের "ভক্তমাল"-রূপে এই গ্রন্থটি অজস্র হৃদয়ে শান্তির অমৃত পরিবেশন করিবে—ইহাই আমাদের ধারণা।

বইটির ছাপা ও প্রচ্ছদপট উচ্চাঙ্গের। সে তুলনায় প্রকাশক যদি বাঁধাইয়ের দিকে আর একটু নজর দিতেন তাহা হইলে পাঠকেরা অধিকতর তৃপ্তি লাভ করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

দিল্লী : দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে ইহার ধর্ম-সংস্কৃতি-সেবামূলক কার্যাবলীর ব্যাপক চিত্র সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। রবিবারের গীতা ক্লাসে প্রায় সহস্র সুধী ও বিদ্যার্থীর সমাগম হয়। আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে অনুষ্ঠিত শাস্ত্রালোচনার সভাগুলি খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রপরিচালক স্বামী রঙ্গনাথানন্দ পাটনা, নাগপুর, লখ্‌নৌ, কানপুর, দেরাদুন, সাহারানপুর প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কর্তৃক গ্রন্থাগার ও সভাগৃহের উদ্বোধন এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, যক্ষ্মা-ক্লিনিক এবং 'সারদা-মহিলা-সমিতি'র কার্যও প্রশংসনীয়।

বেলঘরিয়া (২৪ পরগনা) **:** শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস্ হোমের ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে মনুষ্যত্ব-বিকাশের সর্ববিধ সুযোগ লাভ করিতে পারে তাহার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদিগের সমস্ত খরচ আশ্রম হইতেই দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট ৮২ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে ৪৭ জন 'ফ্রি' এবং ১৫ জন আংশিক 'ফ্রি' ছিল। ১৯৫৬ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষ-জনক: এম্-এস্.সি পরীক্ষায় ২টি ছাত্রের মধ্যে একটি ফার্স্ট ক্লাস ও একটি সেকেণ্ড ক্লাস পায়; বি-এ এবং বি-এস্.সিতে ৭টির মধ্যে ৬টি দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ করে; আই-এ ও আই-এস্.সিতে ২১ জনের সকলেই উত্তীর্ণ হয় (১৭টি প্রথম বিভাগে), ৪ জন সরকারী বৃত্তি লাভ করে।

এখানে উপাসনা-মন্দিরে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা, নিয়মিত ধর্ম ও সমাজনীতি বিষয়ক আলোচনা, সুপরিচালিত ব্যায়ামাগারে স্বাস্থ্যচর্চা, প্রশস্ত মাঠে খেলাধুলা, বৃহৎ ঝিলে সন্তরণ বিদ্যার্থিগণের নৈতিক মানসিক ও শারীরিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক।

বারাণসী : সেবাশ্রম (শ্রীরামকৃষ্ণ রোড, বারাণসী-১)—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই পুরাতন সেবা-প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ ৫৬ বৎসর ধরিয়া জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিবজ্ঞানে আর্তসেবা করিয়া আসিতেছে। ১৯৫৬ সালের সুমুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। এখানকার সুপরিচালিত বিভাগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী: অন্তর্বিভাগীয় সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসিত—২৯৯৬; বৃদ্ধ কর্মশক্তিহীন নরনারীর আশ্রয়াগারে ২৮ জন ছিলেন; বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে মোট চিকিৎসিত—৭৩,৩৭৫, অস্ত্রচিকিৎসা-প্রাপ্ত—৪৭,০৫৫। গড়ে দৈনিক রোগিসংখ্যা—৮৬০; প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে প্রায় ১০,০০০ নমুনা পরীক্ষিত হয়; এক্স-রে বিভাগে পরীক্ষিতের সংখ্যা প্রায় ১০০০। দরিদ্র, পঙ্গু ও স্কুলের ছাত্রদিগকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়, এবং সাময়িক রিলিফ কার্যের ভারও গ্রহণ করা হইয়াছিল।

উৎসব

জলপাইগুড়ি : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৩শে চৈত্র শনিবার, (৬ই এপ্রিল) সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে জনসভা হয়। সভায় আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বোধসানন্দ বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ করেন, স্বামী অচিন্ত্যানন্দের বক্তৃতার পর রাত্রে কীর্তন হয়। পরদিন সাধারণ উৎসবে সারাদিনে বহু ভক্ত নরনারী সমাগত হন ও ২০০০ জন বসিয়া প্রসাদ পান।

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার

সেণ্ট লুই ঃ বেদান্ত সোসাইটি, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী : কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারের ধর্মালোচনা : ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে সারা বৎসরে প্রায় ৪৭টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। নানা ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তুলনামূলক ধর্ম (Comparative Religion) অধ্যয়ন করিবার জন্য ছাত্রগণ আসিতেন।

(২) প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ধ্যানভ্যাস শিখাইতেন এবং 'কঠোপনিষদ্' ও 'নারদীয়ভক্তিসূত্রে'র অধ্যাপনা করিয়াছেন।

(৩) এই বৎসরের বিশেষ ঘটনা : ভারত হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী ও প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী নির্বাণানন্দজীর আমেরিকা আগমন। তাঁহারা ২২শে মার্চ সেণ্ট লুই আশ্রমে আসেন। সোসাইটিতে স্বামী মাধবানন্দজী সাধারণ সভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্বশান্তি' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন।

(৪) ২৩শে ফেব্রুআরি স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ কলম্বিয়া স্টিফেন কলেজের উদ্যোগে একটি টেলিভিশন আলোচনায় যোগ দেন। প্রায় নয় শত শ্রোতার সম্মুখে তিনি ভারতীয় দর্শনের দিক হইতে অধ্যাপক স্মিথের পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর দেন,—আমরা যে জগতে বাস করি তাহার স্বরূপ কি? মানুষ কি? মানুষের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য কি? কি করিয়া মানুষ সেই উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারে? সমাজ কিভাবে গঠিত হইবে?

(৫) সেণ্ট লুই-এর থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও খৃষ্টান ধর্মমন্দিরে আহূত হইয়া 'স্বামী' ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেন।

(৬) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে বিশেষ পূজা ভজন হয়। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকরাচার্যের জন্মদিনেও বিশেষ আলোচনা, এবং দুর্গোৎসব—গুড ফ্রাইডে ও খৃষ্টমাসের সময় আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(৭) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামীজী এই বৎসর ২৮ জনকে সাধনার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৮) সোসাইটির বন্ধু ও সদস্যেরা গ্রন্থাগারের পুস্তকের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

শিক্ষা-শিবির

বেলুড় ঃ জনশিক্ষা মন্দির : যুব-শিক্ষা শিবির

অন্যান্য বৎসরের মত এবারও গ্রীষ্মাবকাশকালে সারা জুন মাস ধরিয়া বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জন-শিক্ষামন্দিরের তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত কর্মী বা আদর্শ সমাজ-সেবক গঠনের উদ্দেশ্যে যুব-শিক্ষা-শিবির পরিচালিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগনা হইতে শিবিরে যোগদান করে। প্রায় সকলেই স্কুল বা কলেজের ছাত্র; এক জন শিক্ষক ছিলেন।

নিয়মিত কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ভোরে প্রার্থনা, সকালে কুচকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা-শিক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ-অভিযান ও খেলাধুলা। শিবিরে বাসকালে কাঠের খেলনা তৈয়ারি, বই বাঁধাই প্রভৃতি হাতের কাজ ও গ্রন্থাগার পরিচালনা শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল।

শিক্ষার্থীদের জন্য সকালে ও সন্ধ্যায় প্রায় প্রতিদিনই সমাজজীবন-গঠনের উপযোগী বিষয় আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। আলোচিত বিষয়-গুলির মধ্যে স্বপনবুড়োর 'শিশুসংগঠন,' মৌমাছির

'নেতৃত্ব', বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীসুবোধ মুখার্জির 'গ্রন্থাগার পরিচালনা', পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়ের 'শিবির-জীবনের উদ্দেশ্য', শ্রীদেবনাথ দাসের 'নেতাজী', শ্রীননী দত্তের 'বয়স্কশিক্ষা', রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা শিক্ষণকেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীঅধীর মুখার্জির 'চলচ্চিত্রের মর্যাদা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসিগণও বিভিন্ন দিন বেদ, গীতা, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, বিবেকানন্দ ও বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে বলেন।

সর্বসাধারণের জন্য: একদিন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীর কথকতা' হয়, কয়েক দিন চলচ্চিত্রে 'পথের পাঁচালী' প্রভৃতি দেখানো হয়; একদিন জনশিক্ষা-মন্দিরের যুবপ্রতিষ্ঠান 'মহেশ' নাটক অভিনয় করিয়া সকলকে আনন্দিত করে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে পুলিনবিহারী মিত্র

গত ১৮ই শ্রাবণ ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয় তাঁহার ঈশ্বর চক্রবর্তী লেনের বাসভবনে ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দকেও তিনি দর্শন করিয়াছিলেন, এবং বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পুলিনবাবু সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে তিনি প্রায়ই সঙ্গীত শুনাইতেন, মহারাজও তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ রচিত 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি'—বিখ্যাত সঙ্গীতটি রেকর্ডে গাহিয়া পুলিনবাবু যশস্বী হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-নায়ক পরলোকগত অঘোর চক্রবর্তীর নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পূর্বে প্রায় প্রতিবৎসর বেলুড়মঠে দুর্গাপূজার সময় তিনি আগমনী সঙ্গীত গাহিয়া ভক্তগণকে মুগ্ধ করিতেন। মঠে সাধুদের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন; তিনিও সকলকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা চির শান্তিলাভ করুক,—ইহাই প্রার্থনা।

নানাস্থানে উৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২২তম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে পূজা পাঠ কীর্তন ভজন প্রসাদ-বিতরণ আলোচনা-সভা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

চাকদহ (নদীয়া), চৌধুরীহাট (কুচবিহার), আদ্রা (পুরুলিয়া), কাটোয়া (বর্ধমান), ইছাপুর নবাবগঞ্জ (২৪ পরগনা), জনাই (হুগলী), তারাগুলিয়া (২৪ পরগনা)।

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ এই উৎসবগুলিতে যোগদান করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' আলোচনা করেন। চৌধুরীহাটে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন কুচবিহারের মহারাজ ভূপবাহাদুর; আদ্রায় অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং ইছাপুর নবাবগঞ্জে অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত অন্যতম বক্তা ছিলেন।

অণ্ডাল (বর্ধমান): চারদিনব্যাপী উৎসবে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ এবং স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন।

ডিগবয় (আসাম) : স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃক চারদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সৌম্যানন্দ মহারাজ বাংলায়, স্বামী প্রণবাত্মানন্দ হিন্দীতে এবং শ্রীমহাদেব শর্মা আসামীতে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন।

তেজপুর (আসাম) : গত ১৪ই ১৫ই ও ১৬ই জুন শিলং মিশন কেন্দ্রের স্বামী চণ্ডিকানন্দ ও স্বামী গহনানন্দের উপস্থিতিতে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিদিনই পূর্বাহ্ণে পূজা পাঠ ভজন সঙ্গীত, মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ ও সায়াহ্নে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অসমীয়া হাইস্কুলে (তেজপুর একাডেমী), বাঙালী বালকদের ও বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয়ে—তিন দিন তিন জায়গায় সভা হওয়াতে সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন।

সংস্কৃতি-সংবাদ

বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার : গত জুলাই মাসে সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে আহূত পণ্ডিত এবং সংস্কৃতানুরাগী সুধীবৃন্দের এক মহতী সভায় পরিষদধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন, গত কয়েক বৎসরে বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের অবিভক্ত বাংলার ২৫০টি চতুষ্পাঠীর স্থলে বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ১৪০০ চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে। পরিষদের অধীনে ৫৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ৩০টি কেন্দ্র বাংলার বাহিরে পরিচালিত হইতেছে। ছাত্রসংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়াছে। তিনি বলেন, বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মুসলমান ছাত্রগণ ক্রমশঃ সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগারে তিব্বতী পুঁথি : মাননীয় দলাই লামা সম্প্রতি কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে বুদ্ধ-মুখ-নিঃসৃত বাণী-সংকলন 'কাঞ্জোর' নামক একটি দুষ্প্রাপ্য তিব্বতীয় ধর্মগ্রন্থ উপহার পাঠাইয়াছেন। গত শীতকালে যখন তিনি গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন তখন গ্রন্থাগারিক মহাশয় তাঁহাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করায় তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, ঐ পুস্তকের একটি নকল পাঠাইয়া দিবেন। এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাওয়াতে গ্রন্থাগারের গৌরব বাড়িয়াছে। এতদ্দ্বারা তিব্বতের ধর্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইল।

বিশ্ব-দার্শনিক সম্মেলন : প্যারিসের আন্তর্জাতিক দার্শনিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পোলিশ আকাডেমির ভবনে ওয়ারস'তে কুড়িটি দেশের প্রায় পঞ্চাশ জন দার্শনিক সমবেত হন। ১৭ই জুলাই হইতে ২০শে জুলাই পর্যন্ত চারদিনে 'চিন্তা ও কর্মের পরস্পর সম্বন্ধ'—এই প্রধান বিষয় লইয়া নয়টি গবেষণা-পত্র পঠিত হয়, ঘরোয়াভাবেও আলোচনা হয়। এশিয়া হইতে ভারত, চীন ও জাপানের প্রতিনিধিগণ ইহাতে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। ১৮ই জুলাই ভারতকে একটি পুরা দিন প্রদত্ত হয়। মহীশূরের শ্রীনিকাম ও দিল্লীর শ্রীহুমায়ুন কবীর ভারতীয় ভাবধারা ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে বসিবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

বিশ্ব-ধর্ম-সভা : গত ২৩শে জুন, নিউ দিল্লী রাষ্ট্রপতি-ভবনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া স্থির করিয়াছেন—আগামী নভেম্বরে দিল্লীতে বিশ্বশান্তি ও মানুষের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মগুলির একটি সম্মেলন-সভা অনুষ্ঠিত হইবে। জৈন 'মুনি' সুশীল কুমারজীর দায়িত্বাধীনে সর্বভারতীয় ধর্ম-সম্মেলনের এক সভায় কাকা কালেলকারের সভাপতিত্বে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। রাজস্থানের (অর্থমন্ত্রী) শ্রীহরিবল্লভ উপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সংঘের অধ্যক্ষ।

বিজ্ঞান

সমুদ্র হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি: কিছুদিন যাবৎ বৈজ্ঞানিক-মহলে গবেষণা চলিতেছিল সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে যে তাপ-তারতম্য (Oceanic thermal gradients) রহিয়াছে, তাহাকে কাজে লাগাইয়া শিল্পের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা যায় কিনা। উপরিভাগে চঞ্চল উষ্ণস্রোত এবং তলদেশে শান্ত শীতল জলের স্তর, সমুদ্রের এই ধর্ম লইয়া ফ্রান্সে প্রাথমিক পরীক্ষার সাফল্যের পর আফ্রিকার আইভরি কোষ্টে—যেখানে এই তাপ-তারতম্য খুব বেশী সেখানে বিদ্যুৎ-শক্তির দুইটি উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ-শক্তির আরও একটি অফুরন্ত উৎস—নূতন আবিষ্কৃত না হইলেও—নূতনভাবে কাজে লাগানো হইল।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা

সম্মিলিত জাতিসংঘের পরিসংখ্যান মতে: পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ২৭০,০০,০০,০০০; এবং প্রতি ঘণ্টায় ৫০০০, প্রতিদিন ১২০,০০০ এবং প্রতিবৎসর ৪,৩৮,০০,০০০ করিয়া বাড়িতেছে! হাজার করা জন্মের হার ৩৪ এবং হাজার করা মৃত্যুর হার ১৮। ল্যাটিন আমেরিকার বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশী—প্রতিবৎসর শতকরা ২·৬। সর্বাপেক্ষা ঘনবসতির দেশ এশিয়া; পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী লোক এশিয়াবাসী! সকল দেশেই এমনকি অনুন্নত দেশগুলিতেও মৃত্যুর হার পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ স্বাস্থ্যনীতির মান উন্নয়ন। মৃত্যুর হার কমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—প্রত্যাশিত আয়ু বাড়িয়াছে। উত্তর আমেরিকা ও ইওরোপে—গড়ে আয়ু ৭১ বৎসর, ভারতে ৩৪ বৎসর।

বয়স অনুযায়ী সংখ্যাবিভাগ: ১৫ বৎসরের নীচে শতকরা ৩৪; ১৫ হইতে ৫৯ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা শতকরা ৫৮; ৬০ এর উপরে শতকরা ৮।

পণ্য-উৎপাদন কার্যে নারীর যোগদান: হাইতি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়ায় ৫৪%, ল্যাটিন আমেরিকায় ১০%, পাকিস্তান ৪%।

ধর্ম ও ভাষা অনুযায়ী বিভাগ: (১) ভারতে—হিন্দু ৮৫%, মুসলমান ১০%, বাকী ৫% শিখ খৃষ্টান জৈন প্রভৃতি।

(২) পাকিস্তানে—মুসলমান ৮৫%, হিন্দু ১৩%, অন্যান্য ২%।

(৩) সিংহলে—হিন্দু ২০% অন্যান্য ভারতীয় ধর্ম ১০%, সিংহল, ব্রহ্ম ও থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধ ধর্মই প্রবল। খৃষ্টান ধর্ম পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র—ছড়াইয়া আছে। ভারতে প্রায় ৮০০ প্রকার ভাষা কথিত হয়।

বহিরাগত জাতিদের সংখ্যানুপাত: ফিজিতে ভারতীয়দের সংখ্যা ফিজিয়ান অপেক্ষা অধিক। ট্রিনিদাদের ৩৫% এবং বৃটিশ গায়েনার ৪০% ভারতীয়। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের জন্মহার অপর অধিবাসী-অপেক্ষা বেশী, এবং ভারতীয়রাই সংখ্যাধিক।

দক্ষিণ আফ্রিকায় দেশীয় বা বান্টু জাতি ৬৭%, শ্বেতজাতি ২১%, মিশ্র ৯% এবং এশীয় (ভারতীয়) ৩%।

বহু দেশেই, সংখ্যা-গণনায় অনেক ভুল-ত্রুটি আছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সংখ্যাগণনা, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব নাই বলিলেই চলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যাগণনার ভুল মাত্র ১·৪%, তাহারও কারণ লোকেদের চলাফেরা ও স্থানপরিবর্তন।—United Nations' Demographic Year Book.

বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধনের গ্রাহক-সংখ্যা পরিবর্তন

উদ্বোধন-পত্রিকার বর্তমান গ্রাহকবর্গকে জানান যাইতেছে যে—শ্রাবণ ১৩৬৪, হইতে তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যা (Subscribers' Number) পরিবর্তন করা হইল। পত্রিকার উপরে যে ঠিকানা থাকে তাহার পূর্বভাগেই এই গ্রাহকসংখ্যা থাকিবে। যদি কেহ ঠিকানা-পরিবর্তন, বা পত্রিকা-অপ্রাপ্তি প্রভৃতির জন্য পত্র দেন, তাহা হইলে এই গ্রাহকসংখ্যাসহ নিজ নাম ঠিকানার উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না। ইতি—

—কার্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন

দেবীর আত্মপ্রকাশ

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি

যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্ ।

অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি

শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥

[ঋগ্বেদ : ১০।১০।১২৫।৪]

ভারতের তপোবনে মহর্ষি অম্ভৃণের দুহিতা বাক্ আত্মোপলব্ধির পরম মুহূর্তে পরিপূর্ণ হৃদয়ে যাহা বলিয়া উঠিয়াছিলেন—তাহাতে জগতের ও জীবনের মহারহস্য উদ্‌ঘাটিত। জগৎ-রঙ্গমঞ্চের পিছনে থাকিয়া যিনি এই বিশ্বনাট্য পরিচালনা করিতেছেন, সহসা যবনিকা উত্তোলন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া 'দেবীসূক্তে' সেই দেবীই যেন স্বয়ং বলিতেছেন :

আমারই শক্তিতে সকল প্রাণী অন্ন আহার করিয়া শরীর পোষণ করে, আমারই শক্তিতে সকলে শ্বাস-প্রশ্বাস নির্বাহ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, আমারই শক্তিতে চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় রূপরসাদি পঞ্চবিষয় ভোগ করে—চক্ষু দেখিতে পায়, কর্ণ কথিত বাক্য শ্রবণ করে।

যাহারা আমাকে এইরূপে অন্তর্যামিনীরূপে জানে না, তাহারা আত্মবিমুখ হইয়া জন্ম-মরণের পথে বারংবার দেহধারণ করিয়া দুঃখ পায়, ক্লেশ পায় ; আমাকে অবজ্ঞা করিয়া হীন হয়, ক্ষীণ হয়। হে শ্রুতি-স্মৃতিপরায়ণ বিশ্বাসী মানব! শ্রদ্ধালভ্য আত্মতত্ত্বের কথা তোমাকেই বলিতেছি—শ্রবণ কর, ধারণা কর!

আমি সকলের আদি মধ্য অন্ত জুড়িয়া—ভক্ষ্য-ভোগ্যরূপে বাহিরে, প্রাণ ও চৈতন্যরূপে ভিতরে ; আমাকে অস্বীকার করিও না, আমাকে আত্মা বলিয়া উপলব্ধি কর ; আমাকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আশ্রয় বলিয়া জানো। বিশ্বাস কর—মৃত্যুময় জীবনের পারে অমৃতত্বে তোমাদের চির অধিকার! তোমরা যে অমৃতের সন্তান, আমার সন্তান,—আমিই যে অমৃত-স্বরূপিণী।

কথাপ্রসঙ্গে

মাতৃ-উপাসনা

সৃষ্টির রহস্য মানুষ জানিতে না-ও পারে, আত্যন্তিক প্রলয়ও তাহার জ্ঞানের অগোচর; কিন্তু পালনী শক্তির মধুর স্পর্শ কি জীবনের প্রথম অনুভূতির সহিত তাহার সত্তার পরতে পরতে চেতনা সঞ্চারিত করে নাই? বহির্জগতের কঠিন মৃত্তিকাস্পর্শজনিত প্রথম ক্রন্দনকে হাসিতে রূপান্তরিত করিতেই কি সেই আনন্দশক্তির সকল চেষ্টা নিয়োজিত হয় নাই?

স্বীয় হৃদয়ের স্পন্দন দিয়া যিনি সন্তানহৃদয়ে স্পন্দন সূচনা করিয়াছেন, স্বীয় বক্ষের সুধা দিয়া যিনি সন্তানের ক্ষুধা মিটাইয়াছেন, স্বীয় চক্ষের স্নিগ্ধ দীপ্তি দিয়া যিনি সন্তানের চোখে দৃষ্টি করিয়াছেন, মহাশক্তির সেই পরম বিকাশ—সত্তা, চেতনা ও আনন্দের সেই মধুর প্রকাশ—মাতৃমূর্তিই সন্তানের অনুভূতিতে প্রথম প্রতিভাত; বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া শিশু দেখিয়াছে--তাহার নিকটতম, অন্তরতম এই মূর্তিটিকে! বুদ্ধি দিয়া বোঝে নাই, মন দিয়া ভাবে নাই; কিন্তু প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে—এই আমার প্রিয়—পরম কাম্য! তাহাকে দেখিলে সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে না দেখিলে সে কাঁদিয়াছে—অস্ফুট স্বরে ডাকিয়াছে—সে ডাকাতে প্রস্ফুটিত ভাষা নাই; কিন্তু সন্তান ও জননীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পক্ষে তাহাই কি যথেষ্ট হয় নাই?

তারপর যেদিন আধ-আধ স্বরে সন্তান-কণ্ঠে 'মা, মা' শব্দ দুটি ধ্বনিত হইল—সেদিন জননীর এতদিনের নীরব সাধনা সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল! জননীর সম্পূর্ণ রূপ, স্বরূপ—সন্তান কখনও জানিতে পারে না। মাতৃশক্তির পালনী মূর্তিই সন্তানের প্রয়োজন, এই মূর্তিই তাহার উপাস্য এবং মাতৃনাম-মহামন্ত্রেই তাহার জন্মগত অধিকার! এই শক্তির মধুর মহিমাই তাহার জীবন মরণ জুড়িয়া এক মহা-সঙ্গীতের মতো বাজিয়া চলিয়াছে!

অন্ধকারে ভয় পাইয়া শিশু সর্বাগ্রে মা-কেই মনে মনে ডাকিয়াছে, বিপদে সঙ্কটে মানুষ 'প্রাণ-পরিত্রাহি' ডাকিয়া ওঠে, 'মাগো, রক্ষা করো'; দূর দেশান্তরে রোগযন্ত্রণায় মাতৃস্পর্শ কামনা করিয়াই অচৈতন্য অবস্থায়ও সন্তান মাকেই খুঁজিয়া থাকে! মুমূর্ষু বৃদ্ধও অস্ফুট স্বরে বলে, 'মাগো! কোলে তুলে নাও।' কে এই জননী? যাহার জন্য সন্তান সর্বদা সর্বাবস্থায় স্বভাবতই ব্যাকুল—যাহার সহিত তাহার নিত্যসম্বন্ধ?—দেশ কালের ঊর্ধ্বে,—যুক্তি-তর্কের সীমার বাহিরে?

এই মাতৃতত্ত্ব বিশ্লেষণের বস্তু নয়, একান্তই অনুভূতির বিষয়, এবং মাতৃস্নেহ—মহামায়ারই অপার করুণায় প্রত্যেক প্রাণীর অনুভূতির মধ্যে; তিনিই যেন অনুভূতিরূপে সন্তানের হৃদয়ে, অন্তর্যামিনীরূপে সন্তানের অন্তরে!

* * *

সৃষ্টির সেই প্রথম ঊষায় যখন সৃষ্টিকর্তা সদ্য জাগিয়া উঠিয়া দেখেন মধু-কৈটভ-রূপ সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বাবর্তে মহান্ধকারে তিনি বিপন্ন, জগৎ-পাতা পুরুষোত্তমও নিদ্রাচ্ছন্ন,—তখনই তিনি নারায়ণেরও নিদ্রাকারিণী 'হরি-নেত্র-কৃতালয়া' সেই মহামায়ার বন্দনা শুরু করিলেন, 'মা, তুমি আর তমোময়ীরূপে

আমাদের অন্তর আচ্ছন্ন রাখিও না, বিষ্ণুকে উদ্বুদ্ধ কর জগৎপালনকার্যে।' ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্টা মহাকালী মহামায়া সরিয়া দাঁড়াইলে জাগরিত বিষ্ণু মধুকৈটভকে সংহার করিয়া সৃষ্টির পর পালনে তৎপর হইলেন।

আবার 'দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধম্ পূর্ণমব্দশতং পুরা'! শতায়ু মানবের সারাটি জীবনই তো দেবাসুরের যুদ্ধ, এবং সত্ত্বগুণাশ্রিত দৈবীসম্পদ জ্ঞানভক্তিকে বিদূরিত করিয়া রজস্তমোময় আসুরিক ভাব কামক্রোধই তো আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে; শান্তি ও আনন্দের স্বর্গরাজ্য হইতে দেবস্বভাব মানব নির্বাসিত।

কি উপায়ে আবার তাহা ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে?—এই চিন্তায় নিমগ্ন সাধক দেবতাগণ! তাঁহাদের ভিতর যে শক্তি বিভক্তভাবে ছিল—একাগ্রতায় তাহাই একীভূত, সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব নারী-মূর্তিরূপে আবির্ভূত হইল—পালনপরা বরাভয়করা মাতৃমূর্তি! কিন্তু পালনকার্যে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত দ্বৈত-দ্বন্দ্ব শুভাশুভের অশুভকে পরিহার করিতেই হইবে, অশুভ দুর্বৃত্তশক্তিকে দৈবী শুভশক্তি দ্বারা নিগৃহীত করিয়া মহালক্ষ্মী মহাদেবী সন্তানদের শুভ বাসনা পূর্ণ করিলেন, তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত বন্দনা শ্রবণান্তর স্বর্গীয় সহস্রোপচারের পূজা গ্রহণ করিয়া 'বিপৎকালে ডাকিলেই আসিব' সন্তানদিগকে এই মধুর আশ্বাস দিয়া জননী অন্তর্হিতা হইলেন!

আবার দম্ভ-দর্প-রূপী দুই মহাশত্রু শুম্ভ-নিশুম্ভের বিক্রমে স্বর্গশান্তিচ্যুত হইলে উপাসনা-পরায়ণ নির্যাতিত দেবগণ দেবীকে আহ্বান করিলেন, যে দেবী সকলের মধ্যে সর্বরূপে বিরাজমানা—বিপন্ন দেবতাগণ জননীর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণপণ ডাকিতে লাগিলেন! লীলাময়ী দেবী দেখা দিয়া, অনন্ত অপূর্ব চিত্তচমৎকারিণী মায়া বিস্তার করিয়া সন্তানদের সুখের বাধা দূর করিলেন। অসংখ্য অশুভ বাসনা ধ্বংস করিয়া মহাসরস্বতী অহঙ্কারের যুগ্মমূর্তি দম্ভ-দর্প-রূপী শেষ দুই মহা শত্রু বিনষ্ট করিয়া শান্তির স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক করেন! যাহা বাহিরে, তাহাই অন্তরে! যাহা অন্তরে, তাহাই বাহিরে!

* * *

শিশুর মতো সরল বিশ্বাসে ডাকিতে পারিলে মা না আসিয়া থাকিতে পারেন না, কারণ সন্তানের উপর জননীর নিজেরই যে এক স্বাভাবিক টান রহিয়াছে! তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ভাবের সাধনা করিয়া মাতৃভাবেই স্থিতি করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন: ঈশ্বরকে অনেকভাবে তো ডেকেছ, একবার 'মা' বলে ডেকে দেখ না! মা নাম বড় মধুর, মা বড় আপনার, জোর চলে।—মা জানেন সন্তানের ভাব ও অভাব। অভাব বুঝিয়া তিনি সুরথকে রাজ্য দেন, ভাব বুঝিয়া সমাধিবৈশ্যকে জ্ঞান দেন, আর মেধামুনিকে মাতৃমহিমা-কীর্তনে মুখর করেন!

মাতৃতত্ত্ব আত্মতত্ত্বেরই নামান্তর—অন্তর্নিহিত রূপ! মাতৃ-উপাসনাই আত্মানুসন্ধান: 'কোথা হইতে আমার উদয়, কোথায় স্থিতি, কোথায় বিলয়?' আত্মানুসন্ধান মানুষকে লইয়া যায় আত্মায়, ব্রহ্মে, সচ্চিদানন্দে। মাতৃ-উপাসনায় সাধক বোঝেন: মা-ই আমার আত্মা; শক্তি ব্রহ্ম অভেদ;—যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই সর্বভূতে সর্বব্যাপিনী সত্তা ও চেতনা,—তিনিই সুখে দুঃখে আনন্দদায়িনী, তিনিই আনন্দময়ী—আনন্দ-স্বরূপিণী।

মহালয়া-তত্ত্ব

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

'মহালয়া' কথাটীর প্রকৃত অর্থ কি, এ যেমন ভাবতে ইচ্ছা করে, তেমনি মহালয়ার সঙ্গে দুর্গা-পূজার সম্বন্ধ কি, সে রহস্যও উল্লেখ করতে স্বতই বাসনা জাগে। মহালয়া থেকেই আমাদের দেশে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি; কোনও কোনও অঞ্চলে মহা-লয়ার পূর্ববর্তী কৃষ্ণা নবমীতিথি থেকেই কল্পারম্ভ। তা হ'লে মহালয়া কি, অপর-পক্ষ বা পিতৃপক্ষের সঙ্গে দুর্গাপূজার পক্ষ বা দেবীপক্ষের সম্পর্ক কি—এই তত্ত্বের অনুধাবন করবার চেষ্টা করবো।

মহালয়া স্ত্রীলিঙ্গবোধক শব্দ—অমাবস্যা—শব্দের বিশেষণ। কিন্তু এই পিতৃপক্ষীয় অমাবস্যাটীই 'মহালয়া' কেন? বিগ্রহবাক্য করতে গেলে (১) "মহান্ লয়ো যত্র" অথবা (২) 'মহান্ আলয়ো নিবাসো যত্র যা বা সা মহালয়া'। তা হ'লে এ অমাবস্যাতে কার মহান্ লয়, অথবা কারই বা মহান্ নিবাস? উত্তর কি? পুনরায় যদি বলি—(৩) 'মহস্য উৎসবস্য আলয়ঃ' অর্থাৎ উৎসবের বসতিস্থল বা পরিপূর্ণ উৎসব-দিবস—তা হ'লেও কি অর্থ দাঁড়ায়? শাস্ত্র-প্রমাণ কি? মহালয় ও মহালয়া দুটি শব্দেরই প্রয়োগ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কাজেই এই শেষোক্ত বিগ্রহবাক্যও সম্ভবপর; অথবা যদি বলি 'মহাংশ্চাসৌ আলয়শ্চ ইতি'—পুংলিঙ্গান্ত মহালয়।

(১) মহান্ লয়ো যত্র

কস্য? চন্দ্রস্যেতি—চন্দ্রের মহান্ লয় হয় এই অমাবস্যায়—এই অর্থে 'মহালয়া' যোগরূঢ়-শব্দ, বলেছেন বঙ্গদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ স্মার্ত কালবিবেকের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। চন্দ্রের ক্ষয় তো প্রতি কৃষ্ণপক্ষেই হয়; তবে প্রোষ্ঠপদী বা ভাদ্রী পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যাটীতে চন্দ্রের আত্যন্তিক বা বিশেষ ক্ষয়ের প্রশ্ন কোথায়? তাই তর্কালঙ্কার এই শব্দকে "যোগরূঢ়" বলেছেন। যোগরূঢ় শব্দ ব্যুৎপত্তি-বিষয়ে আমাদের মৌন মূক করে দেয় ঠিকই, কৌতূহল চরিতার্থ করে না—চিত্তেও তেমন শান্তি প্রদান করে না।

কিন্তু আমরা যদি যে অমাবস্যায় সারা বৎসরের শ্রাদ্ধদানের সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ লয় ঘটে—সেই অর্থে ধরি, তা হ'লে তো "চন্দ্রের লয়" অর্থ আনতে হয় না, অথচ শাস্ত্রবাক্যও এই অর্থে সুসিদ্ধ হয়ে পড়ে।

(২) মহান্ আলয়ো যত্র

যজুঃশ্রুতি বলছেন—"দ্বে স্রুতী অশৃণবং দেবানামুত পিতৃণাম্।' একটী দক্ষিণায়ন, অন্যটী উত্তরায়ণ। অর্থাৎ দেবগণ ও পিতৃগণের অধিকার অনুসারে দুটি সরণি রয়েছে। একটী উত্তরায়ণ, অন্যটী দক্ষিণায়ন। মাঘাদি ষন্মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণাদি ষন্মাস দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়নই পিতৃগণের অধিকৃত কাল। দক্ষিণায়নের ছয় মাস সময়ের মধ্যে, পুনরায় কেশব যখন সুপ্ত থাকেন, সে সময়ই প্রশস্ত। তন্মধ্যে পুনরায় প্রোষ্ঠপদীর অর্থাৎ ভাদ্র পৌর্ণমাসীর পর-পক্ষ প্রশস্ত। আবার তার মধ্যে প্রতিপদ্ থেকে পঞ্চমী, ষষ্ঠী থেকে দশমী এবং একাদশী থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত অর্থাৎ মহালয়া পর্যন্ত উত্তরোত্তর প্রশস্ত, প্রশস্ততর ও প্রশস্ততম কাল। ত্রয়োদশী যদি মঘা-নক্ষত্রযুক্ত হয়, তা হলেই সব চেয়ে প্রশস্ত। যদি মধু এবং পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ প্রদান করা হয়, তা হ'লে সে শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। যে যেমন অবস্থাতেই থাকুক—এ সময়ে সকলের পক্ষে শ্রাদ্ধ একান্ত বিহিত।

উত্তরাদয়নাচ্ছ্রাদ্ধে শ্রেষ্ঠং স্যাদ্দক্ষিণায়নম্।
চাতুর্মাস্যঞ্চ তত্রাপি প্রসুপ্তে কেশবে হিতম্॥

প্রোষ্ঠপদ্যাঃ পরঃ পক্ষস্তত্রাপি চ বিশেষতঃ।
পক্ষমূর্ধ্বঞ্চ তত্রাপি দশমূর্ধ্বমতোঽপ্যতি॥
মঘাযুক্তা চ তত্রাপি শস্তা রাজংস্ত্রয়োদশী।
তত্রাক্ষয়ং ভবেচ্ছ্রাদ্ধং মধুনা পায়সেন চ॥
সর্বস্বেনাপি কর্তব্যং শ্রাদ্ধমত্র নরাধিপ।
পরান্নভোজী শ্বপচঃ শ্রাদ্ধমত্র তু কারয়েৎ॥

বৃহদ্রাজ-মার্তণ্ড-ধৃত 'মৎস্যপুরাণে'ও লিখিত আছে :

কন্যাং গতে সবিতরি দিনানি দশ পঞ্চ চ।
পার্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধং তত্র বিধীয়তে॥

অর্থাৎ সূর্য যখন কন্যারাশিতে উপস্থিত হন, তখন পার্বণ-বিধানে শ্রাদ্ধ বিহিত। কার্ষ্ণাজিনি ও ভবিষ্যোত্তরও বলছেন :

নভস্যস্যাপরে পক্ষে শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্ দিনে দিনে।
নৈব নন্দাদি বর্জ্যং স্যান্নৈব বর্জ্যা চতুর্দশী॥

অর্থাৎ গৌণ ভাদ্র মাসের অপর বা কৃষ্ণ পক্ষে প্রতিদিন শ্রাদ্ধ বিহিত ; তখন নন্দাও (প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী) বর্জনীয় নয়, চতুর্দশীও বর্জনীয় নয়। অতএব মহালয়া-সম্পর্কীয় এই পক্ষ অত্যন্ত প্রশস্ত বলে এই সময়ে বহুবিধ শ্রাদ্ধ বিহিত। এ সমস্ত নিত্য।

সমস্ত স্মৃতিকারই বলছেন—"আষাঢ্যা পঞ্চমে পক্ষে কন্যাসংস্থে দিবাকরে", দিবাকর কন্যাগত হলে অর্থাৎ আশ্বিনে—এটী আষাঢ় থেকে পঞ্চম পক্ষ—সেই শ্রেষ্ঠ পক্ষে, সমুদয় তিথির মধ্যে পুনরায় পিতৃকর্ম-শ্রাদ্ধাদিতে অমাবস্যাই প্রশস্ততম বলে অপরপক্ষের এই অমাবস্যাটীই সারা বৎসরের মধ্যে পিতৃশ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ দিন।

এই অপরপক্ষ বা পিতৃপক্ষে পিতৃগণ আপন পুরী থেকে মনুষ্যলোকে এসে পুত্র-পৌত্রাদি-প্রদত্ত ভোজ্যাদি গ্রহণের নিমিত্ত সমবেত হন। তাঁরা এই তিথিতেই প্রেতপুরী থেকে এসে সমবেত হন—আলীন হন বলে—এই তিথির নাম মহালয়।

(৩) মহস্য আলয়ঃ

মহ শব্দের অর্থ উৎসব। এই অপরপক্ষের অমাবস্যায় প্রেতপুরী খালি ক'রে সকলে এসে মর্ত্যভূমিতে সমবেত হন—যমরাজের অনুশাসনে—এবং তাঁরা বৃশ্চিকরাশিতে সূর্য উপনীত হওয়ার সময় পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। বৃশ্চিকে সূর্যদেবের উপস্থিতির সময়ের মধ্যে যদি পিতৃগণ শ্রাদ্ধ না পান, তা হ'লে তাঁরা নিদারুণ ক্ষোভে, অভিমানে, অনুতাপে দারুণ শাপ দেন বর্তমান বংশধরগণকে এবং পুনরায় প্রেতপুরীতে বিষম হতাশায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। অমাবস্যাতিথিই তাঁদের শ্রাদ্ধ গ্রহণের শ্রেষ্ঠ দিন—সেজন্য তাঁদের উৎসবের দিন বলে চিহ্নিত করার জন্যই এই তিথিটিকে "মহালয়া" নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণ এই প্রসঙ্গে বলেছেন :

যাবচ্চ কন্যাতুলয়োঃ ক্রমাদাস্তে দিবাকরঃ।
তাবচ্ছ্রাদ্ধস্য কালঃ স্যাৎ শূন্যং প্রেতপুরং তদা॥

যখন সূর্যদেব কন্যা ও তুলার সংক্রমণে ব্যাপৃত, তখন শ্রাদ্ধের কাল বিহিত, তখন প্রেতপুরী শূন্য থাকে।

ভবিষ্যপুরাণে এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন দৃষ্ট হয় :

কন্যাং গতে সবিতরি পিতৃরাজানুশাসনম্।
তাবৎ প্রেতপুরী শূন্যা যাবদ্বৃশ্চিকদর্শনম্॥
ততো বৃশ্চিকে আয়াতে নিরাশাঃ পিতরো নৃপ।
পুনঃ স্বভবনং যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্॥ * * *
সূর্যে কন্যাস্থিতে শ্রাদ্ধং যো ন দদ্যাদ্ গৃহাশ্রমী।
ধনং পুত্রাঃ কুতস্তস্য পিতৃনিঃশ্বাসপীড়নাৎ॥[১]

এই মহালয়ার দিনটীই পিতৃপুরুষের কেন শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন—এইটী প্রমাণ করতে গেলে শ্রাদ্ধ-দানের বিধিক্রমটী পর্যালোচনা করতে হয়। প্রথমতঃ মৃততিথিবিহিত সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পুত্রাদির অবশ্য কর্তব্য। তা ছাড়া প্রতিমাসে বিহিত কৃষ্ণপক্ষীয় পার্বণশ্রাদ্ধ ও নিত্য।[২] তন্মধ্যে পুনরায় অপরাহ্ণ শ্রেয়ান্—"মাসি মাসি অপরপক্ষস্য অপরাহ্ণঃ

১ শ্রাদ্ধ-বিবেক, ১১৪ পৃঃ।

২ পয়োমূলফলৈঃ শাকৈঃ কৃষ্ণপক্ষে চ সর্বদা। পরাধীনঃ প্রবাসী চ নির্ধনো বাঽপি মানবঃ॥ মনসা ভাবশুদ্ধেন শ্রাদ্ধে দদ্যাত্তিলোদকম্॥

শ্রেয়ান্"। নিগম বলছেন—"অপরপক্ষে যদহঃ সংপদ্যতে, অমাবস্যায়াস্তু বিশেষেণ"। সাগ্নিক যিনি, তিনি কেবল অমাবস্যাতেই শ্রাদ্ধ করবেন—"ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতাগ্নের্দ্বিজন্মনঃ"। কিন্তু কেউ যদি প্রতি মাসের কৃষ্ণপক্ষে পার্বণশ্রাদ্ধ করতে না পারেন, তা হ'লে—

"অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং ত্রিরব্দস্যেহ নির্বপেৎ।

কন্যাকুম্ভ বৃষস্থেহর্কে কৃষ্ণপক্ষে চ সর্বদা॥"

সারা বৎসরের মধ্যে তিন দিন শ্রাদ্ধ করলে সূর্য যখন কন্যারাশিতে অর্থাৎ সৌরাশ্বিন, সৌর-ফাল্গুন এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে, বিশেষতঃ অমাবস্যায়।

তাতেও যদি অসমর্থ হন, তাহলে "হংসে বর্ষাসু কন্যাস্থে শাকেনাপি গৃহে বসন্। পঞ্চম্যা উত্তরে দদ্যাদুভয়োর্বংশয়োর্ ণম্॥" এই উক্তি অনুসারে সূর্য কন্যারাশিতে উপগত হলে অমাবস্যায় শাক দিয়ে হলেও গৃহস্থ একবার অন্ততঃ শ্রাদ্ধ করবেন। এটাই তো 'মহালয়া' অমাবস্যা। এই অমাবস্যা মহালয়া—"মহস্য পিতৃণামুৎসবস্য আলয়ঃ নিকেতন-স্বরূপঃ দিবসোয়হমি" তি মহালয়ঃ, বা নিকেতনরূপা তিথিঃ মহালয়া॥

এখানে আর একটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই পিতৃগণের মহানন্দ দিবসে ষোড়শ-পিণ্ড-দান একান্ত কর্তব্য। "ষোড়শ" এখানে "পঞ্চাম্রবৎ" পারিভাষিক শব্দ—কারণ, ক্রিয়ার সময়ে উনিশটী পিণ্ডই দান করতে হয়। এই মন্ত্রগুলি এত উদাত্ত, এত সৌন্দর্য-মাধুর্য-বিমণ্ডিত, সর্বতোভাবে এত অপূর্ব যে সেগুলির বিশ্লেষণের জন্য স্বতন্ত্র স্থান প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু লিপিবদ্ধ করছি যে নীচ ও উচ্চ, পাপী ও নিষ্পাপ, বিভিন্ন যোনিজ—কারো জন্য শ্রাদ্ধ-দাতার আজকের এই মঙ্গলতম দিনে কোনও ভেদবুদ্ধি নেই—সকলকেই শ্রাদ্ধদাতা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছেন। আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্যন্ত দেবর্ষি-পিতৃ-মানব সকলের জন্যই আজ পিণ্ডদান :

'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।

তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥

অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥"

এখন প্রশ্ন এই—যদি কোনও কারণে মহালয়াতেও পিতৃশ্রাদ্ধ কেহ দুর্ভাগ্যবশতঃ করতে না পারেন, তা হ'লে পিতৃগণের তুষ্টিবিধানের কি কোনও উপায় নেই? নিবন্ধকারগণ এই বিষয়ে এই গৌণ কল্পের বিধান দিয়ে ভবিষ্যপুরাণ বলছেন :

"যেয়ং দীপান্বিতা রাজন্ খ্যাতা পঞ্চদশী ভুবি।

তস্যাং দদ্যান্ন চেদ্দত্তং পিতৃণাং বৈ মহালয়ে॥"

কিন্তু এই গৌণ কল্পে ষোড়শ-পিণ্ডদান হবে না।

১৩৬৪ সালের শারদীয় উৎসবের প্রাক্কালে জগজ্জননীকে কোটী কোটী প্রণতি নিবেদন করি। অপর বা পিতৃপক্ষ ও দেবীপক্ষ দুটী অঙ্গাঙ্গিভাবে সংবদ্ধ। অপরপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষের মহালয়া তিথি মহাজননীর আগমনের শঙ্খনিনাদ ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত করে। পিতৃগণের মহানন্দ ও জননীর আগমনের পদধ্বনি—উভয়ে মিলে মহালয়া জগজ্জনের এত আদরের ও আনন্দের দিন।

এই আনন্দের দিনে মহাপুণ্য দিবসে জগজ্জননীকে স্তুতি নিবেদন করি—

সর্বরূপস্বরূপা ত্বং সর্বরসস্বরূপিণী।

সর্ববর্ণসমাহার-সর্বলীলাবিধায়িনী॥

অমৃতমসি মাতস্ত্বং সর্বানন্দবিধায়িনী।

সর্বালোকবিধাত্রী চ সর্বশান্তিপ্রদায়িনী॥

ওঁ শান্তিঃ॥

শারদ বোধন

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বাদলের অভিসার সাঙ্গ করি স্বচ্ছ নীলাকাশ
এ সুন্দরী ধরণীর পানে চেয়ে পরম আগ্রহে,
শুনায় মহতী বার্তা জাগাইয়া আনন্দ উল্লাস
দিগ্‌বধূ-মনে, কেদার-বাহিনীধারা বুঝি বহে
আগমনী গীতি ল'য়ে মর্মে মর্মে। নব আলিম্পন
সুন্দরের দেখেছে কি অন্তরের নগ্ন শিশু মম ?
মাতৃ-মমতার সুধাঙ্করা শক্তি-পীঠে মগ্ন মন,
শীর্ষে শোভে অসংখ্য তারকাশ্রেণী রত্নদ্বীপ সম
আশ্বিন-উৎসব-রসে প্রকৃতির পাত্র পূর্ণ করিয়া আবার—
কে তুমি জাগাতে এলে ভূমার ব্যঞ্জনা ল'য়ে বিশ্বমূলাধার ?
চিরকামনার মায়ামৃগমদ-গন্ধের পরশে
জীবন-আশ্রমে মোর চিত্তশিখা উঠেছে উজ্জ্বলি'।
মানস-যাত্রীর দল লোকে লোকে চলেছে হরষে
কোন্ তীর্থ-পথে যাবে সঙ্গে দিতে প্রাণের অঞ্জলি ?
প্রশান্তির আবেষ্টনে নিঃসঙ্গতা চায় দিতে এনে
অমৃতের পারাবারে অন্তহীন রহস্যের তরী।
আজিকার ভূ-বলয় মোর চোখে রূপ-রেখা টেনে
অরূপের গাহে গান ধ্যানে পরা-প্রকৃতিরে স্মরি।
প্রেমার পরশ দিতে মায়াচ্ছন্ন সংসারের আলোছায়া হ'তে,
কে তুমি বোধন-শঙ্খ বাজায়ে এসেছ মোর সাধনার স্রোতে ?
স্বপ্নে কত অভ্রপুষ্প ফুটেছিল, ঝরে গেছে তারা,
বর্ষা-রাতে সপ্তস্বরা সঙ্গীতের সুরে সুরে শত,
বিরহবিচ্ছেদবাণী শুনেছিনু, মৌন অশ্রুধারা
বয়ে গেছে আঁখি হ'তে, দিন গেছে নিমেষ-নিহত।
দুঃখতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণসিন্ধু মাঝে
বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত—যে জীবন অরণ্য-শোভায়
যাপিতেছি আমি, সেথা মোর মাতৃবন্দনার বাজে
শঙ্খ আজি, ব্যথা-বেদনার কথা শোনাবো তোমায়।
সংসারের সান্ত স্তরে কতবার এলো মোর অনন্তের ডাক ?
কি বার্তা এনেছ দূত! কহ মোরে, ওই সব কথা আজ থাক্!

দ্বিভুজার রূপ ধরি মহাসাধকের লীলাময়ী
যে জননী এসেছেন আদ্যাশক্তি কৈবল্যদায়িনী ;
ভবতারিণীর দেহে, করুণায় যার মৃত্যুঞ্জয়ী
হ'ল নর, সুরধুনী কহে যার কথা ও কাহিনী
সেই মোর দশভুজা, অন্তরের নগ্ন শিশু ডাকে
তারে সদা, বুঝি তার সীমাহীন মহাসিন্ধু বুকে
অন্তহীন বিন্দু মিশে যায়, আমি ডাকি সেই মাকে
নিখিলের সব ধারা তারি মাঝে মিশে আছে সুখে।
সারদা-প্রতিমা গড়ি শারদ উৎসবে মোরা জাগাবো বোধন,
কে তুমি এসেছ হেথা, মাতৃশক্তি-বন্দনার করো আয়োজন।

কে বড় ?

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গণেশ-সাথে কার্তিকের বাধে
কলহ কত—প্রতিযোগিতা নানা !
রূপ জিতিলে গুণ বিষাদে কাঁদে,
গুণ জিতিলে রূপ শোনে না মানা।
তর্ক বাড়ে, ভবানী কহে তবে :
"ভুবন আগে আসিবে ঘুরি' যেই
গলার মালা আমার তারি হবে,
রটিবে ভবে জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে সে-ই।"
কার্তিক তো হেসেই কুটি কুটি :
"মূষিকে চ'ড়ে ভায়া জিতিতে পারে ?"
ময়ূরে উড়ে চলে সে নভে ছুটি'।
গণেশ শুধু উমার চারিধারে
পরিক্রমি' ডাকে : "ভুবন-মাতা !"
শক্তিধর ক্লান্ত ফিরে সাঁঝে।
পরিয়া মালা গণেশ হাসে, "দাদা !
মায়েরি মাঝে কোটি ভুবন রাজে !"

মন ও জীবন

শ্রীপ্রণব ঘোষ

আশ্চর্য এ মন,
পৃথিবী হাতের মুঠোয় পেয়েছে যখন,
অনায়াসে চায় সে আকাশ।
আবার সে—স্বর্গ থেকে হারায় আশ্বাস,
ধরাতল ফিরে পেতে চায়।
এই চায় ইন্দ্রধনু, এই প্রজাপতি,
সহজের পন্থা ছেড়ে বিসর্পিল গতি
সেই তার প্রাণের উল্লাস।

তবুও আকাশ থেকে রৌদ্র ঝরে পৃথিবীর বুকে,
এ প্রশান্ত শরতের সুনির্মল সুখে,
শুভ্র আলো হ'য়ে ওঠে সকল মনন।
তখনই নিশ্চিত মানি : প্রেমই জীবন।

'ডুব দে রে মন—'*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

অশ্বিনী দত্ত একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর তাঁকে 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন' গানটি গেয়ে শোনাচ্ছেন। অশ্বিনীবাবু দেখলেন, ঠাকুর গাইতে গাইতে কোথায় ডুবে গেলেন,—একেবারে সমাধিস্থ। এই ডোবাটাই আসল জিনিস। ডুবতে হয় কোথায়? ভিতরে। উপর উপর ভাসলে কিছুই হয় না। ধর্মলাভ করতে হ'লে ডুব দিতে হবে,—ঠাকুরের এটি একটি বিশেষ শিক্ষা।

ডুব দে রে মন কালী ব'লে

হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥ (রামপ্রসাদ)

এই ডুব দেওয়াই জীবনের লক্ষ্য। ঠাকুরের জীবনে এটি আমরা বিশেষ ক'রে দেখতে পাই। 'এগিয়ে পড়, ঝাঁপ দাও, ডুব দাও'—এইগুলিই পাঁচ খণ্ড কথামৃতের সার কথা। ঠাকুর এই ক'টি কথা প্রায়ই ব্যবহার করতেন।

ডুব দিলে কি পাওয়া যায়? "রত্নাকর নয় শূন্য কখন দু' চার ডুবে ধন না পেলে।" ডুব দিলে কত মণি পাওয়া যায়। ঠাকুর ডুব দিয়ে অমূল্য রত্নরাশি তুলে এনে ছড়িয়ে দিতেন, লোকে আনন্দে প্রাণভরে কুড়িয়ে নিত।

সবাই টাকা আর নাম-যশের পিছনে ছুটছে; কিন্তু আনন্দ পাচ্ছে কি? মোটেই নয়। ধর্ম হবে কখন? যখন আমরা বিষয় থেকে পিছিয়ে এসে আবার ভিতরে ডুবতে আরম্ভ ক'রব।

বঙ্কিমবাবুকে ঠাকুর বললেন, "উপরে ভাসলে হবে না।" উত্তরে তিনি বলেন, "ডুবি কি ক'রে, পিছনে শোলা বাঁধা রয়েছে যে!"

ঠাকুর কেশব সেনকে পোষা বেজির উপমা দিয়েছিলেন। পোষা বেজির লেজে দড়ি দিয়ে বাঁধা ইঁট। এক এক বার সে দেওয়াল বেয়ে কলুঙ্গায় উঠে বসে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, ইঁটের টানে ধুপ্ ক'রে নেমে পড়ে। কেশবাদি ভক্তকে ঠাকুর বললেন,—"তোমরাও একটু ধ্যান ট্যান করতে পার, কিন্তু দারাসুত-ইঁট টেনে নাবিয়ে ফেলে।"

সাধুসঙ্গ করলে বিবেকের উদয় হয়। বিবেকের সঙ্গে সঙ্গে আসে বৈরাগ্য। বিবেক আমাদের হাত ধ'রে নিয়ে চলে। সাধুসঙ্গে মন-ঘড়ি মেলানো যায়। ঠাকুরের সান্নিধ্যে যাঁরা আসতেন তাঁদের বিবেক জাগত, তাঁর কাছে 'ঘড়ি মিলিয়ে' নিতেন তাঁরা। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত শুনে তাঁদের হুঁশ হ'ত, চৈতন্য জাগত। তাঁরা দেখতে পেতেন, মন বিষয়ের দিকে কতটা ছুটেছে, ঈশ্বর থেকে কতটা পিছিয়ে পড়েছে।

সংসারে দুটি জিনিস আমরা সর্বদা খুঁজছি: আনন্দ ও শান্তি। কিন্তু বিষয়ের আনন্দ ও নিরানন্দ সংযোগ-বিয়োগের ব্যাপার। ছেলে ছিল না, তখন নিরানন্দ; ছেলে হ'ল, তাতে আনন্দ; আবার সেই ছেলে চলে গেল, তখন দুঃখ অশান্তি নিরানন্দ। এরই ভিতর দিয়ে কত জন্ম চলে যায় মানুষের। তবু চৈতন্য আসে না, হুঁশ হয় না। সাধুসঙ্গ এই হুঁশ এনে দেয়। ঠাকুর গাইতেন:

আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে॥

* মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৩০-৫-৫৭ তারিখে প্রদত্ত পূজ্যপাদ মহারাজের বক্তৃতা। শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য সংকলিত। 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে' গানটির পর ধর্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়।

পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥

ধর্ম জিনিসটা ভিতরের, বাইরের নয়। অনাবিল আনন্দ ও শান্তি লাভ করতে হ'লে ভিতরে যেতেই হবে, আপনাতে আপনি থাকতে হবে। ভিতরে তো বটেই। যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন: The kingdom of heaven is within.—স্বর্গরাজ্য অন্তরে। এই জিনিসটি 'পাখীর মাস্তল আশ্রয় করা'-র ছোট্ট গল্পের মধ্য দিয়ে ঠাকুর কেমন সুন্দর বুঝিয়েছেন। 'মাস্তল আশ্রয় করা' অর্থাৎ চারদিক ঘুরে এসে ভিতরে গিয়ে ভগবানকে আশ্রয় ক'রে পড়ে থাকা, এইটিই ধর্মের শেষ কথা। যতক্ষণ না ডানা ব্যথা করে—ততক্ষণ মন-পাখী বসতে চায় না। ডানা-ব্যথার পর একটা অবস্থা, তখন শরণাগতি। ভিতরে সন্ধান ক'রে ভগবানকে পেলে তাঁকে সর্বভূতে দেখা যায়। তখন তাঁর সত্তা সকল বস্তুতে অনুভূত হয়। ভিতরে আসতে হ'লে ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী করতে হয়। সংসারের দীর্ঘ পথের শেষ নেই।

আর পারি না, এটি যখন ঠিক ঠিক বোধ হয় তখনই বিবেক আসে, হুঁশ হয়। তখন থেকেই ভিতরের দিকে আসা। দুটি পথ—প্রেয় ও শ্রেয়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। এসব অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে আসে। ঠাকুর বলতেন,—"শুনে শেখা, দেখে শেখা, ঠেকে শেখা।"

রামপ্রসাদ গৃহী ছিলেন। কিন্তু বিষয়ের মধ্যে থেকেও তিনি এত বড় ভক্ত ছিলেন যে, জগদম্বা নিজে কন্যারূপে এসে তাঁর বেড়া বেঁধেছিলেন। রামপ্রসাদের গানে আছে,—

আয় মন বেড়াতে যাবি!
কালী-কল্পতরুমূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটারে, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥

দুটি পথ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিকে ছেড়ে নিবৃত্তির সঙ্গে ঘর করতে হবে। কামনা-বাসনা সঙ্গে নিয়ে কালী-কল্পতরুমূলে যাওয়া যায় না, সে যে ত্যাগের পথ। রামপ্রসাদ সংসারের মধ্যে থেকেও ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি নিবৃত্তিকে সঙ্গে নিলেন কেন? ভগবানের দর্শন লাভ করতে হ'লে ভিতরে যেতে হবে। মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পথই পথ।

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার-লোভে সদাই ফেরে।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে লও
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥

এখানেও রামপ্রসাদ পুনরায় বলছেন, বিবেকের আশ্রয় নিতে। মহাপুরুষেরা তো সবই ব'লে দিয়েছেন। শোনে কে? ঠাকুর পানাপুকুরের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। হাতে ক'রে পানা সরালে দেখা যায়, পানাপুকুরের ভিতরে জল চিক্ চিক্ করছে। একটু পরেই আবার পানা নাচতে নাচতে এসে জল ঢেকে ফেলে। রামপ্রসাদ তাই ব্যাকুল হ'য়ে বলছেন,—"মাগো! চোখের ঠুলি খুলে দাও।"

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
খুলে দে মা চোখের ঠুলি হেরি গো তোর অভয়পদ॥

* * *

বৈরাগ্য মানে—মনে অনাসক্তির ভাব আনা, ভোগে বিতৃষ্ণ হওয়া। ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হ'লে আসক্তি থেকে নিস্তার হ'তে পারে। বৈরাগ্য কি থেকে আসে? বিষাদ থেকে। বিষাদ কেন? শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মতি হ'ল না ব'লে। বিবেক ও বৈরাগ্য নিয়ে আমাদের সাধনের পথে এগিয়ে পড়তে হবে, ভিতরে আসতে হবে।

লালাবাবুর জমিদারীর বার্ষিক আয় সাত লক্ষ টাকা ছিল শুনেছি। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে 'বেলা যায়' এই কথাটি কানে যেতেই লালাবাবুর মনে প'ড়ল,—"আমার জীবনসূর্যও তো অস্তগামী। আমাকেও তো এবার যেতে হবে।" এই সামান্য

ব্যাপারেই তাঁর বিবেক জাগল, বৈরাগ্য এল। নিজের বিষয়সম্পত্তিদ্বারা ভগবানের সেবার ব্যবস্থা ক'রে তিনি বৃন্দাবনে চলে গেলেন এবং ভগবৎ-আরাধনায় মগ্ন হলেন।

স্ত্রী পুত্র সংসার, এই নিয়েই লোকে মত্ত। ভগবানকে বাদ দিয়ে এই সমস্ত নিয়ে তারা ভুলে রয়েছে; এককে বাদ দিয়ে শূন্যের পর শূন্য বসিয়ে চলেছে। উপনিষদে আছে, ইন্দ্রিয়গুলিকে বিধাতা এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে তারা ক্রমাগত বাইরের দিকেই ছুটছে—'কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্'। অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছা—কিনা ভগবান লাভের, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অভিলাষ। ভগবানকে চাই, এই অভিলাষ থাকা চাই। আর কি চাই? বিবেকের আশ্রয় নিয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করা। ইন্দ্রিয়সংযম আসল কথা,—মনের মোড় ফেরানো; আসক্তি অনুরাগ ভিতরে দেওয়া। বিষয়-বাসনা মনটাকে চারদিকে টেনে রেখেছে। সাধন চাই। 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'। শুধু সাধনেও হয় না; তার সঙ্গে চাই কৃপা। মীরা বলেছেন,—"সাধন কর না চাহিয়ে মনুয়া, (মনুয়া=মন) প্রেম লগানা চাহি।" সাধন আবার শুকনো হ'লে হবে না, তার সঙ্গে ভালবাসা মাখিয়ে দিতে হবে, প্রেম লাগাতে হবে। প্রেম ভালবাসা—স্ত্রীপুত্রাদিতে বিষয়ে দিয়ে তো মানুষ দেউলে হ'য়ে বসে আছে। ঠাকুর হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে বলেছেন। তেল কিনা ভক্তি। 'কাঁঠাল ভাঙা' মানে সংসার করা। বুদ্ধিমান্ যারা তারা মনে 'ভক্তিতেল' মেখে নিয়ে সংসার করে। তা হ'লে আর সংসারে আসক্ত হ'য়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে না।

ঠাকুর বলতেন,—"মান-হুঁশ।" যার চৈতন্য জেগেছে, হুঁশ হয়েছে, সেই মানুষ। ঠাকুর বলতেন, খোঁটা ধরতে। খোঁটা কিনা ভগবান। মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ভগবান যেন দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন! রাজসিক বুদ্ধি আমাদের বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কোথায়? জগতের সমস্ত টাকাকড়ি পেলে আরও পেতে ইচ্ছে হবে। এই জিনিসটি বুঝলে তখন মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়াতে হবে আবার; বলতে হবে,—"দরজা খুলে দাও।" গীতায় শ্রীভগবান বলছেন,—"কাম-ক্রোধগুলো সংযত কর। দেখ, আমি তো রয়েছি, আমাকে ধর।"

শ্রীদুর্গাস্তোত্র

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

নমি শৈলবাসিনি শুভ্রহাসিনি হিমগিরিসুতে অম্বিকে!
নমি সিন্ধুধারিণি জগত্তারিণি মহাদেবি সতি চণ্ডিকে!
নমি মঙ্গলে শ্যামে গৌরি শারদে পার্বতি শিবে শর্বাণি!
নমি ভুবনেশি মায়ে ভবে ও শক্তি শর্বে অভয়ে রুদ্রাণি!
নমি মুণ্ডমালিনি শঙ্করি দশমূর্তিধারিণি দণ্ডিনি!
নমি করুণারূপিণি তামসনাশিনি তুঙ্গে মেনকানন্দিনি!
নমি সিদ্ধসেনানি সিদ্ধিদায়িনি চন্দ্রসূর্যবর্ধিনি!
নমি অট্টহাসিনি খড়্গধারিণি মহিষাসুরমর্দিনি!
নমি সর্বাভরণভূষিতে জননি পয়োধরে সুধাবর্ষিণি!
নমি বিশ্বব্যাপিনি বিঘ্ননাশিনি কুমারি সর্বদর্শিনি!

জননী প্রকৃতিদেবী

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

কিছুকাল পূর্বে বর্তমান সময়ের পৃথিবীর সুবিখ্যাত তেইশ জন চিন্তাশীল পুরুষ ও মহিলা বিলাতের জর্জ এলেন এবং আন্‌উইন্ কোম্পানি-প্রকাশিত "I believe" নামক পুস্তকে তাঁহাদের দার্শনিক এবং বিশ্বাসমূলক মতবাদগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তকে সুলেখক এমিল লাডউইগ (Emil Ludwig) লিখিয়াছেন, "আমি একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতিদেবীকেই পূজা করি, যাঁহাকে বিশ্ববিশ্রুত জার্মান কবি গ্যেটে (Goethe) 'প্রকৃতিদেবী' (Gott-Natur) বলিতেন। তিনি তাঁহার যৌবনকালে এই ভাবটিকে একটি প্রশস্তি-কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেটি আমি আমার শয্যাপার্শ্বের দেওয়ালে বিশ বৎসর ঝুলাইয়া রাখিয়াছি।"

"What I worship is the creative power and that alone. Goethe called it Gott-Natur, seeking a way out by this compound expression. In the prime of his life, Goethe voiced this concept in an ode. For twenty years it has hung on the wall beside my bed."—Page 203, "I believe."

লাডউইগ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার কোন দার্শনিক মতবাদ নাই। ধর্মযাজকগণের ন্যায় বিশিষ্ট কোন ধর্মমতও তিনি পোষণ করেন না। তিনি যখন ভগবানের কার্যাবলীর অনুধ্যান করেন, তখন যে ভাবগুলি তাঁহার হৃদয়কে দৃঢ়ভাবে অভিভূত করে সেইগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি তাঁহার ভাব-গুরু গ্যেটের মতো মৃত্যুর পারে অমরত্ব লইয়া মাথা ঘামান না। সংসারে যাঁহারা নিতান্ত ভাবুক বা ভাবপ্রবণ তাঁহারা ঐ সকল লইয়া থাকুন। কিন্তু এ পৃথিবীতে যাঁহাদের কিছু করণীয় আছে, যাঁহারা দৈনন্দিন জীবনে সংগ্রাম ও কর্ম করিতে ব্যস্ত, তাঁহাদে 'পরে কি হইবে' অর্থাৎ 'মরিয়া অমর হইব কিনা' এসব চিন্তা করিবার দরকার নাই। বর্তমান জগৎ এবং বর্তমান জীবনই তাঁহাদের চিন্তার ও কর্মের একমাত্র ক্ষেত্র। গ্যেটে যখন অশীতি বর্ষ অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ তখনও তিনি ঐহিক জীবনের কর্ম এবং ধর্ম একীভূত করিয়া বলিতেন, "মৃত্যুর পরে আমি বর্তমান থাকিব—এ ধারণা আমার কৃত কর্মের উপর বিশ্বাস হইতে জাত। যদি আমি মৃত্যু পর্যন্ত অবিরত কর্ম করিতে থাকি, তাহা হইলে প্রকৃতি আমাকে আর এক রকম জীবন দিতে বাধ্য, কারণ বর্তমান জীবন আমার আত্মাকে ধরিয়া রাখিতে অক্ষম।"

লাডউইগ তাঁহার গুরুর এই উৎসাহপূর্ণ বাণীর প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন :

Belief and accomplishment were so allied in him that at eighty years of age he spoke the daring words, 'The conviction of my continuation after death springs from my belief in action. For if I continue to work ceaselessly until my death, then nature is obliged to give me another form of existence when the present one can no longer house my spirit.'

গ্যেটে তাঁহার এই মতটি দৃঢ় করিয়া আরও বলিতেন যে, প্রকৃতির পারে আমাদের কোন কিছুর সন্ধান করিবার দরকার নাই, কারণ প্রকৃতির কার্য ও ঘটনাবলী হইতেই আমাদের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয়—'Let us seek nothing behind the phenomena ; they themselves are the lesson.'

লেখক লাডউইগ তাঁহার প্রবন্ধে গ্যেটের যে 'প্রকৃতি-বন্দনা' বিশ বৎসর তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা এইভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন: "প্রকৃতি!—যিনি সর্বদা আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন এবং যিনি সর্বদা আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাঁহার সীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম। তাঁহার মধ্যে আমরা খুব বেশী গভীরে ডুবও দিতে পারি না। প্রকৃতি তাঁহার চক্রনৃত্যে আমাদিগকে কবলিত করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, যে পর্যন্ত না আমরা ক্লান্ত হইয়া তাঁহার বাহুপাশ হইতে পড়িয়া যাই।······যদিও আমরা অনবরত তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করি, তবু তাঁহার উপর আমাদের কোন শক্তি কাজ করে না। তাঁহার অগণিত সন্তানের মধ্যে প্রকটিতা—এই জননী! তিনি মায়াতেই পরিতুষ্টা; যে নিজের বা অপরের সেই মায়াকে ধ্বংস করিতে চায় তাহাকে কঠোর অত্যাচারীর মত তিনি শাস্তি দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সহিত তাঁহার অনুসরণ করে তাহাকে তিনি তাঁহার বক্ষের অতি নিকটে ধরিয়া রাখেন। তাঁহার সন্তান অসংখ্য। তিনি কাহারও প্রতি কৃপণতা করেন না। তাঁহার প্রিয় সন্তানদের উপর তিনি অজস্র কৃপা বর্ষণ করেন এবং তাহাদের জন্য অনেক কিছু বিসর্জন করেন; মহৎদিগকে তিনি রক্ষা করেন। তাঁহার নাটক সর্বদাই নূতন, কারণ তিনি ক্রমাগত নূতন নূতন দর্শক জোগাইতেছেন। জীবন তাঁহার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য আবিষ্কার এবং মৃত্যু তাঁর চূড়ান্ত কীর্তি, যাহা দ্বারা তিনি প্রচুর জীবন সৃষ্টি করেন। তিনি মানুষকে অন্ধকারে আবৃত রাখিয়া অনন্তকাল তাহাকে আলোকের দিকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। তিনি মানুষকে মন্থর ও অলস করিয়া পৃথিবীর উপর নির্ভরশীল করিয়াছেন, আবার সর্বদা তাহাকে উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য উদ্দীপিত করিতেছেন।······তিনি উদার, তাঁহাকে বন্দনা করি, তাঁহার সকল কর্মই প্রশংসনীয়। তিনি সর্বজ্ঞ এবং শান্ত।······তিনি আমাকে এতদূর আনিয়াছেন; তিনিই আমাকে ইহার বাহিরে লইয়া যাইবেন। আমি বিনা শর্তে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করি। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি আমাকে লইয়া তাহাই করুন। তিনি তাঁহার সৃষ্ট সন্তানকে বিদ্বেষপূর্বক কষ্ট দিবেন না। একমাত্র তিনিই—সকল দোষের আধার এবং সকল গুণেরও আশ্রয়।"

জীবন-সায়াহ্নে বহু মনীষী এবং মহান্ ব্যক্তি প্রকৃতির মধ্যে যে দেবীত্ব ও মাতৃত্ব লুক্কায়িত, তাহা উপলব্ধি করিয়া জীবন মৃত্যুর রহস্য ভেদ করিতে প্রয়াস পান। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দেহাবসানের পূর্বে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে এই মর্মে এক পত্র লেখেন: 'মা তাঁহার নিজের কার্য করিতেছেন। আমি এখন আর বেশী চিন্তা করি না। আমার মত পোকা হাজারে হাজারে প্রতিক্ষণে মরিতেছে। কিন্তু তাঁহার কার্য ঠিকমত চলিয়া যাইতেছে। মায়ের জয় হউক। মায়ের ইচ্ছাস্রোতে একাকী গা ভাসাইয়া আমি সারা জীবন চলিতেছি। যখনই আমি সেই ইচ্ছাস্রোত ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছি তখনই আমি আঘাত পাইয়াছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।' আবার লিখিয়াছেন, 'আমি মুক্ত। আমি মায়ের ছেলে। তিনিই কাজ করেন, আবার তিনিই খেলেন। আমি কেন নিজের মতলব করিতে যাই? কি মতলবই বা করিব? তাঁহার ইচ্ছায় সব আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার হাতের পুতুলমাত্র। তিনিই রজ্জুদ্বারা সকলকে পুতুলের মতো নাচাইতেছেন!'

গায়ত্রী

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

যাঁহারা সন্ধ্যাহ্নিক করেন তাঁহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে হয়। অর্থ না জানিয়া শুধু এই মন্ত্র জপ করিলে জপের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। শাস্ত্রে গায়ত্রী মন্ত্রের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। এই সকল অর্থের মধ্যে যেটি যাহার মনঃপূত হয় তিনি সেইটিই গ্রহণ করিতে পারেন।

ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ১০ম ঋক্‌ গায়ত্রী মন্ত্র। যে মন্ত্র জপ করিতে হয় সেখানে তাহার প্রথম অংশ "ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ" (প্রণব ও মহাব্যাহৃতি)-র উল্লেখ নাই। "তৎ সবিতু র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—ইহাই উপরি-উক্ত ঋক্‌। প্রণব ও মহাব্যাহৃতি পরে ঋক্‌ মন্ত্রের পূর্বে যুক্ত হইয়াছে। প্রণব ও ব্যাহৃতি-যুক্ত মন্ত্রের পরেও একবার প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়।

প্রাণায়াম-কালে সপ্রণব সব্যাহৃতি গায়ত্রী-মন্ত্রের পরে "গায়ত্রী-শিরঃ" নামক অংশও পাঠ করিতে হয়। সে অংশ এই: ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূ ভুর্বঃ স্বরোম্‌। প্রাণায়াম কালে মহাব্যাহৃতির সহিত আরও চারিটি ব্যাহৃতির নাম উচ্চারণ করিতে হয়। ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যম্‌—ইহারা সপ্তব্যাহৃতি; ইহাদের মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ মহাব্যাহৃতি।

যিনি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা—তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। মন্ত্রে যাঁহার কথা উক্ত হয়, তিনি সেই মন্ত্রের দেবতা। গায়ত্রী মন্ত্রে ওঁকারের ঋষি ব্রহ্মা, সপ্তব্যাহৃতির ঋষি প্রজাপতি এবং গায়ত্রীর (এই অংশকে শংকরাচার্য শুদ্ধাগায়ত্রী বলিয়াছেন) ঋষি বিশ্বামিত্র। গায়ত্রীর দেবতা সবিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই সবিতা কে?

ঋগ্‌বেদে কোনও কোনও স্থলে সূর্য ও সবিতা একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে ঐ দুই শব্দ দ্বারা বিভিন্ন দেবতা সূচিত হইয়াছেন। সায়নাচার্যের মতে উদয়ের পূর্বে সূর্যের যে মূর্তি, তাহাই সবিতা। সূর্য ও সবিতা যে একই দেবতার দুই মূর্তি, তাহা বলা যায়। এই সূর্যই কি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা উপাস্য দেবতা?

সায়নাচার্য গায়ত্রী মন্ত্রের চারি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক প্রকার ব্যাখ্যায় সবিতা-শব্দ তিনি সূর্য অর্থে, অন্যতর ব্যাখ্যায় "জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। মহীধর সবিতা-শব্দ "আদিত্যান্তর পুরুষ" অথবা ব্রহ্ম অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই—"দেবস্য সবিতুঃ (ভর্গস্বরূপান্তর্যামি-ব্রহ্মণঃ) বরেণ্যম্‌ (বরণীয়ম্‌, উপাসনীয়ম্‌) ভর্গঃ ধীমহি (সোঽহমস্মি ইত্যনেন চিন্তয়ামঃ)—তিনিই আমি—এই ভাবে চিন্তা করি।

আহ্নিকতত্ত্বে সমগ্র গায়ত্রী মন্ত্র এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে:

"দেবস্য সবিতুর্বর্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্‌।
ব্রহ্মবাদিন এবাহু বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি॥
চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তিং পুনঃ পুনঃ॥
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্য চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্‌।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসার-ভীরুভিঃ॥
আদিত্যান্তর্গতং যশ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ।
জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ॥
ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্যমণ্ডলে।
মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেব হি॥

সূর্যদেবের অভ্যন্তরে যে বর্চ্চকে ব্রহ্মবাদিগণ বিভু ভর্গ ও বরেণ্য বলেন, আমরা তাহার ধ্যান করি। যে ভর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন,

আমরা সেই ভর্গকে চিন্তা করি। যিনি বুদ্ধির প্রেরক তিনি চিদাত্মা, বিরাট পুরুষ। তিনি জন্ম-সংসারভীত জনগণ কর্তৃক বরণীয়। যিনি আদিত্যের অন্তর্গত ভর্গাখ্য পুরুষ তিনি জন্ম-মৃত্যু ও ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশের জন্য বরণীয়। যে পুরুষ ধ্যানে সূর্যমণ্ডলে দৃষ্ট হয় তিনিই বরণীয়। ইহাই মন্ত্রের অর্থ। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা উপাস্য সূর্য নহেন, সূর্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত চিদাত্মা বিরাট পুরুষ।

বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-পত্রিকায় এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন :

নিরপেক্ষ হইয়া বলিতে গেলে সূর্যই—আদিতে গায়ত্রীর উপাস্য দেবতা ছিলেন, পরে সবিতা-শব্দ 'পরমেশ্বর' অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় সবিতা-শব্দ সূর্য অর্থে গ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মপক্ষে সমগ্র মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এইরূপ :

"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ"—এখানে ওঁ-শব্দের অর্থ জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে জগৎ হইতে পৃথক্ নহেন, এই কথা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ভূঃ (পৃথিবী) ভুবঃ (অন্তরীক্ষ) ও স্বঃ (স্বর্গ)—এই তিন লোকে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইহার অর্থ—দেবস্য (দীপ্তিমান্) সবিতুঃ (সূর্যের) বরেণ্যং (প্রার্থনীয়) ভর্গ (জ্যোতিঃ-স্বরূপ) ধীমহি (আমরা চিন্তা করি)। তিনি যে কেবল সূর্যের অন্তর্যামী, তাহা নহে। যঃ (যিনি) নঃ ধিয়ো (আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে —আমাদের অন্তর্যামী হইয়া) প্রচোদয়াৎ (বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন)।

শংকর ব্রহ্ম-অর্থেই সবিতা-শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ৺সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিয়াছেন, "প্রথমে ছিল ইহা (গায়ত্রী) সূর্যের ধ্যান। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে ব্রহ্ম-ধ্যানে পরিণত করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিবার পক্ষে কারণ আছে।

গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতা-শব্দের অর্থ সূর্য, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাহা হইলেও এই মন্ত্রের উপাস্য সূর্য নহেন। যিনি সূর্যেরও বরেণ্য তিনিই এই মন্ত্রের উপাস্য। উপরি-উক্ত সকল ব্যাখ্যাতেই 'সবিতুঃ' ও 'দেবস্য' এই দুই শব্দে সম্বন্ধে ষষ্ঠী ধরিয়া "সবিতুঃ ভর্গো দেবস্য" এর অর্থ করা হইয়াছে দেব সবিতার ভর্গ বা তেজ। কিন্তু "সবিতুঃ" শব্দের এখানে যে কর্তায় ষষ্ঠী তাহার প্রমাণ 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদে পাওয়া যায়। শ্লোকটি এই :

যদা তমঃ তৎ ন দিবা ন রাত্রিঃ
ন সন্ ন চাসন্ শিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪।১৮

এই শ্লোকে যে কেবল "সবিতুর্বরেণ্যং" শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নহে। ইহার অর্থের সহিত গায়ত্রী অর্থেরও প্রচুর সাদৃশ্য আছে। ইহার অর্থ এই :

যখন তমঃ (মনুসংহিতার প্রথম শ্লোকে যে তমঃ বর্ণিত হইয়াছে তাহা) ছিল, তখন দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, ছিলেন কেবল শিব। তিনিই অক্ষর, তিনিই সবিতার বরেণ্য ; তাঁহা হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হয়। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলেই "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এবং "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী" যে একই অর্থবোধক তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অমর-কোষ অনুসারে প্রজ্ঞা, ধী ও বুদ্ধি সমার্থক। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে প্রেরণ করেন" কিন্তু ইহার অর্থ—যে অনন্ত ধী-সমুদ্র হইতে প্রতিজীবে

প্রতিক্ষণে ধী আগমন করিতেছে—ইহা বলিতে বাধা কি? পৃথিবীর উপরিভাগস্থ যাবতীয় কূপ যেমন পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অসীম জলভাণ্ডারের সহিত সংযুক্ত এবং সেই জলভাণ্ডার যেমন প্রতি কূপে অনুক্ষণ জল প্রেরণ (সরবরাহ) করিতেছে, তেমনি অনন্ত ধী-ভাণ্ডাররূপী ব্রহ্ম অনুক্ষণ প্রতি-জীবে তাঁহার ধী সরবরাহ করিতেছেন; ইহাই "ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ" শব্দদ্বয়ের অর্থ। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ আছে বা নাই, সে প্রশ্ন না তুলিয়াও বলা যায় আমরা জ্ঞানময় পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত। আমাদের ধী তাঁহারই ধী।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ"—তাঁহা হইতে স্মৃতি, জ্ঞান ও তাহাদের অপায় হয়। উপনিষদের "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী"-র অর্থও ইহাই। প্রসৃতা কোথায়? না জীবে। গায়ত্রীর সহিত এই শ্লোকের এতাদৃশ সাদৃশ্য দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে যে, উপনিষদের শ্লোকটিতে ঋষি গায়ত্রী-তত্ত্বই নিহিত করিয়াছেন। এই শ্লোকে "সবিতুর্বরেণ্যং"-এর অর্থ সবিতার বরেণ্য, সবিতা যাঁহার ভজনা করেন। এখানে ষষ্ঠী কর্তায়। গায়ত্রীতেও কর্তায় ষষ্ঠী ধরিলে অর্থ হইবে। সবিতা যে ভর্গের (জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের) উপাসনা করেন, আমরা তাঁহার ধ্যান করি। সেই ভর্গ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী যেমন, তেমনি আমাদের মধ্যেও অবস্থিত—অথবা আদিত্য ও আমরা সকলেই তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে সবিতা-শব্দ গায়ত্রীতে প্রথমে "সূর্য" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পরে জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত "ব্রহ্ম" অর্থে গৃহীত হইয়াছিল—ইহা কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয় না।

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং" ইহার তৎ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (১৭।২৩); ওঁ, তৎ ও সৎ—ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দেশ বা নাম। বেদে ও উপনিষদে বহুস্থলে তৎ-শব্দ ব্রহ্ম-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "তৎ ত্বমসি" এই বাক্যের তৎ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। গায়ত্রীর তৎ-শব্দও ব্রহ্ম-অর্থে গ্রহণ করা যায়। "দেবস্য সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গঃ তৎ ধীমহি" এই ভাবে অন্বয় করিলে অর্থ হয় "দীপ্তিমান্ সবিতৃদেবের ভজনীয় ভর্গস্বরূপ তৎ বা ব্রহ্মকে আমরা ধ্যান করি"।

'ছান্দোগ্য' উপনিষদে গায়ত্রীকে ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করিয়া বলা হইয়াছে—যাহা কিছু আছে সকলই গায়ত্রী। গায়ত্রীই এই পৃথিবী। গায়ত্রীর চারিটি চরণ। সমুদয় ভূত ইহার একপাদ, অবশিষ্ট তিন পাদ স্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত। এখানে উপনিষদের ঋষি ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত হইতে দুই পংক্তি উদ্ধার করিয়াছেন এবং গায়ত্রীকেই পুরুষ বলিয়াছেন॥ এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় উপনিষদের যুগেও ব্রহ্মই গায়ত্রীর লক্ষ্য ছিলেন।

গায়ত্রীর যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাই প্রাচীনতম। তিনি অদ্বৈত মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

ভূঃ ইতি সন্মাত্রং উচ্যতে। ভুবঃ ইতি সর্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপম্ উচ্যতে। সুব্রিয়তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বঃ ইতি সুষ্ঠু সর্বৈঃ ব্রিয়মাণং সুখস্বরূপম্ উচ্যতে।—ভূঃ-শব্দের অর্থ সৎ। ভুবঃ-শব্দের অর্থ চিৎ এবং স্বঃ-শব্দের অর্থ আনন্দ। সকল প্রকাশ করে বলিয়া ভুবঃ অর্থে চিৎ। সকলেই ভাল বলিয়া বরণ করে বলিয়া স্বঃ অর্থে আনন্দ। সুতরাং ভূর্ভুবঃ স্বঃ অর্থে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

তারপরে শঙ্কর বলিয়াছেন, "শুদ্ধগায়ত্রী প্রত্যক্ ব্রহ্মৈকবোধিকা" অর্থাৎ প্রত্যক্ আত্মা (জীবাত্মা) ও ব্রহ্ম যে এক—তাহাই শুদ্ধগায়ত্রী দ্বারা বোঝা যায়। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ) যঃ প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়েৎ) ইতি সর্ববুদ্ধি-সংজ্ঞান্তঃকরণ-প্রকাশকঃ সর্বসাক্ষী প্রত্যগ্

আত্মা ইতি উচ্যতে—অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধি-নামক অন্তঃকরণের প্রকাশক সর্বসাক্ষী প্রত্যক্ আত্মা অর্থাৎ প্রতি শরীরে অবস্থিত আত্মা—ইহাই কথিত হইয়াছে।

তস্য প্রচোদয়াৎ-শব্দনির্দিষ্টস্য আত্মনঃ স্বরূপ-ভূতং পরব্রহ্ম তৎসবিতুরিত্যাদি-পদৈঃ নির্দিশ্যন্তে—অর্থাৎ প্রচোদয়াৎ-শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট সেই প্রত্যক্ আত্মার স্বরূপভূত যে পরব্রহ্ম তিনি "তৎ সবিতুঃ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তত্র "ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (গীতা) ইতি তৎ-শব্দেন প্রত্যগ্‌ভূতং স্বতঃসিদ্ধং পরং ব্রহ্মোচ্যতে।—অর্থাৎ গীতোক্ত বচন অনুসারে তৎ-শব্দ দ্বারা প্রতিশরীরস্থ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে।

"সবিতুঃ" ইতি সৃষ্টিস্থিতিলয়লক্ষণস্য সর্ব-প্রপঞ্চস্য সমস্তদ্বৈতবিভ্রমস্য অধিষ্ঠানম্ লক্ষ্যতে। "সবিতুঃ"-পদ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যাঁহার লক্ষণ সেই সর্বপ্রপঞ্চের ও সমস্ত দ্বৈতভ্রমের অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম তিনিই লক্ষিত হইতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে শংকর সবিতা-শব্দ ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

"বরেণ্যমিতি সর্ববরণীয়ম্, নিরতিশয়ানন্দরূপম্" —'বরেণ্য' পদ সকলের বরণীয়, অসীম আনন্দ বাচক।

"ভর্গ ইতি অবিদ্যাদোষ-ভর্জনাত্মক-জ্ঞানৈক-বিষয়ত্বম্"—'ভর্গ' শব্দ দ্বারা অবিদ্যানাশক আত্ম-জ্ঞানের বিষয়ত্ব লক্ষিত হইতেছে।

"দেবস্য ইতি সর্বদ্যোতনাত্মক-অখণ্ড-চিদেক রসম্"—"দেবস্য" শব্দের অর্থ সর্বপ্রকাশক অখণ্ড একরস 'ব্রহ্মের'।

"সবিতুঃ দেবস্য ইত্যত্র ষষ্ঠ্যর্থো 'রাহোঃ শিরো'বৎ ঔপচারিকঃ"।—শির ভিন্ন রাহুর অঙ্গ অঙ্গ নাই। তবু "রাহুর শির" বলা হয়। রাহুর শিরই রাহু। তেমনি "সবিতুর্দেবস্য" এখানে যে ষষ্ঠী বিভক্তি তাহা ঔপচারিক। সবিতা ও ভর্গ একই।

"বুদ্ধ্যাদি-সর্ব-দৃশ্য-সাক্ষিলক্ষণং যৎ মে স্বরূপং তৎ সর্বাধিষ্ঠানভূতং পরমানন্দং নিরস্ত-সমস্তানর্থরূপং স্বপ্রকাশং চিদাত্মকং ব্রহ্ম ইত্যেবং ধীমহি ধ্যায়েম"—ইহাই শঙ্করের মতে গায়ত্রীর অর্থঃ আমার যে স্বরূপ বুদ্ধি-আদি সমস্ত দৃশ্য বস্তুর সাক্ষী, তাহা সর্বাধিষ্ঠানভূত পরমানন্দ নিরস্তসমস্তানর্থ স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম—ইহাই ধ্যান করি।

শঙ্কর গায়ত্রী-শিরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

"আপো জ্যোতিঃ রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওম্"। আপঃ=আপ্নোতি (ব্যাপ্নোতি) অর্থাৎ সর্ব-ব্যাপী। জ্যোতিঃ=প্রকাশস্বরূপ। রসঃ=সর্বোৎ-কৃষ্ট। অমৃতং=সংসার-নির্মুক্ত। ভূর্ভুবঃ স্বঃ=সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। সর্বব্যাপী জ্ঞানস্বরূপ সর্বোৎকৃষ্ট নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ ওঁ॥ তিনিই আমি।

শঙ্করের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হউক বা না হউক, বেদের যে অদ্বৈতবাদ পুরুষসূক্তে এবং উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত তাহাই যে গায়ত্রীতেও প্রতিফলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রণব-মহাব্যাহৃতি ও গায়ত্রীশিরঃ-সমন্বিত গায়ত্রীর মুখ্যার্থ এই :

(যিনি) ওঁ (তিনিই) ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-রূপে প্রকা-শিত। (বেদে যাঁহাকে "তৎ" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই) দীপ্তিমান্ সবিতারও সম্ভজনীয় ভর্গস্বরূপ (জ্যোতি বা জ্ঞান-স্বরূপ)। তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি। আমরা তাঁহার ধী-সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। যাঁহার অনন্ত ধী আমাদের সসীম ধী-রূপে প্রকাশিত। তিনি আপঃ (সর্বব্যাপী) তিনি জ্যোতিঃ (জ্ঞান), তিনি রস (রসো বৈ সঃ—উপনিষৎ) তিনি অমৃত, তিনি ব্রহ্ম, তিনি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ রূপে প্রকাশিত ওম্।

তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিরন্তন

শ্রীদিব্যপ্রভা ভরালী

তুমি আছ, আছ তুমি এই শুধু বাণী—
অনাদি কালের বুকে উঠে প্রতিধ্বনি।
যুগে যুগে পলে পলে দিবস রজনী
তুমি আছ, আছ—এই অনন্ত রাগিণী
ধ্বনিতেছে অবিরাম বিশ্বের বীণায়—
কত তানে, কত ছন্দে, কত মূর্ছনায়!

যেথা নাহি অন্ধকার নাহি রাত্রিদিন
সেথা তুমি আছ শুধু আদি অন্তহীন—
বিরাট চৈতন্যসিন্ধু অকূল অপার,
উদ্বেলিত ঊর্মি তব অনন্ত ইচ্ছার!
তুমি আছ, ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মহিমা
বিশ্বের শাশ্বত সুর, অক্ষর গরিমা!

তুমি আছ অপূর্ব এ সৃষ্টি-প্রেরণায়—
অনন্ত জীবন-স্রোতে অনন্ত ধারায়!
আপনার মায়াজালে জড়ায়ে আপনা
এ মায়া-সংসার তুমি করেছ রচনা!
জগত-ভাসক দীপ্ত অখণ্ড অরূপ!
রূপে রূপে বিভাসিত তোমারি স্বরূপ।

তুমি আছ হে অসীম! সসীমের মাঝে,
তোমারি বিচিত্র সাজে এ ভুবন সাজে
কত বর্ণে,কত গন্ধে, কত ব্যঞ্জনায়!
তুমি আছ প্রকৃতির সৌন্দর্য-সুধায়,
তুমি আছ গগনের ঘন নীলিমায়,
মধু-চন্দ্রিকার স্নিগ্ধ শুভ্র শুচিতায়।

আলো-ছায়া-বিজড়িত বিজন কাননে,
স্বপন রহস্য-ভরা নীরব লগনে,
বনানীর শ্যামাঞ্চলে পুষ্পের সৌরভে,
তটিনীর কলস্বনে গিরির গৌরবে,
রাজিছ সুন্দর তুমি আপন লীলায়
স্থূল, সূক্ষ্ম, কত তব অরূপ শোভায়!

তুমি আছ সুগভীরে মর্ত্য হৃদয়ের
নিষ্কল নির্মল শুভ্র জ্যোতি জ্যোতিষ্কের!
যেথায় আনন্দালোক সুধার বিকাশ
সেথা হে আনন্দ-রূপ! তোমারি প্রকাশ
তুমি আছ প্রজ্ঞাঘন অমৃত আভায়,
ধীর জন দেখে তোমা হৃদয়-গুহায়।

তুমি আছ নিত্যানন্দ শিশুর হাসিতে,
জাগিছ আপন সুরে কবির বাঁশীতে।
তুমি আছ মধুময় মহোৎসব-ক্ষণে,
তুমি আছ মুমূর্ষুর অন্তিম লগনে।
তুমি আছ বহু দূরে যুক্তি-বিতর্কের,
সন্নিকটে আছ তুমি ভক্ত-হৃদয়ের।

তুমি আছ সর্বব্যাপী, সবার অন্তরে—
বিরাজিছ হে বিরাট, বিশ্বের বাহিরে!
অখিল আধার তুমি শক্তি জগন্ময়ী—
সর্বভূতান্তরস্থিত শিব কালজয়ী!
'একমেবাদ্বিতীয়ম্' জগত-কারণ
তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিরন্তন!

ভারতীয় দর্শনের উদার ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোন কোন ধর্ম ও দর্শনের মতে মানুষ ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু ইতর প্রাণী হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ও উপাদান কি? অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও জীবন-যুদ্ধে লিপ্ত এবং জীবন-ধারণের জন্য নানা কাজে ব্যস্ত। অন্যান্য জীবজন্তুর মত মানুষও ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল এবং রৌদ্রবৃষ্টিতে আশ্রয়স্থল অনুসন্ধান করে এবং তাহা পাইলে সুখী হয়। তাহাদের মত মানুষও আহার করে, নিদ্রা যায় এবং সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে। ইতর প্রাণীরা প্রাণধারণের উপযোগী দ্রব্য পাইলে এবং তাহাদের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিতে পারিলে সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। তাহার মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা বলিয়া একটা প্রবল পিপাসা আছে। এ পিপাসা যেমন মানুষের চিরসাথী, তেমনি ভৌতিক দ্রব্যে বা ভোগবিলাসে ইহা চির অতৃপ্ত। জলে এ পিপাসা মিটে না, পরমান্নেও এ ক্ষুধা দূর হয় না। মানুষ তাহার জ্ঞান-পিপাসার শান্তি করিবার জন্য সব বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে চায়। ইতর প্রাণীরা জীবন-সংগ্রামে তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তিবলেই অন্ধভাবে কাজ করে। কিন্তু মানুষ জীবন-সংগ্রামের তাৎপর্য কি, তাহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উপায় কি এবং জীবনে চরম উন্নতি লাভের পথ কি—এসব বিষয় তাহার উচ্চতর চিন্তাশক্তির সাহায্যে জানিবার চেষ্টা করে। মানুষের জ্ঞানলাভের এই প্রয়াস তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত এবং বিচারবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। দর্শন-শাস্ত্র মানুষের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার একটি চিরন্তনী প্রচেষ্টা। উহা মানুষের অনাবশ্যক কল্পনা-বিলাস-মাত্র নহে, তাহার অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য বস্তু। আলডুস হাক্সলে নামক এক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীষী তাঁহার এক গ্রন্থে (Ends and Means) এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে 'মানুষ তাহার জীবনে একটা দার্শনিক মতবাদ অনুসরণ করিয়া চলে, জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা লইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। একথা শুধু চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই সত্য নহে। ইহা একান্ত চিন্তাবিমুখ ব্যক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য। ভাল হোক্, মন্দ হোক্—কোন একটা দার্শনিক মতবাদ অবলম্বন করিয়া মানুষকে জীবনে চলিতে হয়। কোনও দার্শনিক মত না মানিয়া জীবনে চলা যায় না।'

আমরা যে শাস্ত্রকে 'দর্শন' বলি, পাশ্চাত্ত্য দেশে তাহাকে 'ফিলসফি' বলে। 'ফিলসফি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য ব্যাপক অর্থ হইতেছে 'জ্ঞানানুরাগ'। মানুষের জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষের স্বরূপ কি? তাহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি? যে জগতে মানুষ বাস করে তাহার প্রকৃতি কি? জীবজগৎ জড় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, না ঈশ্বর বা পরমাত্মার জ্ঞান- ও ইচ্ছা-প্রসূত? জন্ম ও মৃত্যু কি? জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরপারে মানবাত্মার কোন অস্তিত্ব থাকে কি না? জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার আলোকে জীবনে কোন্ পথে চলা উচিত এবং কোন্ আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য? মানব-সভ্যতার আদিম কাল হইতেই এই প্রকার প্রশ্ন মানুষের মনে কতই উঠিতেছে। ফিলসফিতে এরূপ প্রশ্নগুলির বিচার-সঙ্গত সমাধান করিবার চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় দার্শনিকগণ এসব প্রশ্নের বিচার- ও যুক্তিসঙ্গত সমাধান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ফিলসফিতে

যে তত্ত্বের বিচার করা হয় তাঁহারা তাহার সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষানুভূতি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য ভারতীয় সাহিত্যে ফিলসফিকে 'দর্শন' বা দর্শনশাস্ত্র বলে। ভারতীয় দর্শনের সর্ব শাখাতেই এক বা অন্য ভাবে তত্ত্বদর্শনের সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে তত্ত্বদ্রষ্টাকে মুক্ত পুরুষ এবং তত্ত্বাদ্রষ্টাকে বদ্ধ জীব বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রাচীন সংহিতাকার মনু বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি সম্যক্‌দর্শন বা সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী তাঁহার কর্মবন্ধন হয় না, যিনি সম্যক্-দর্শন-বিহীন তিনি সংসারে আবদ্ধ হন'। (মনুসংহিতা, ৬।৭৪)

বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য দর্শন বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—যথা (১) তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান, (২) প্রমাবিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞান-সাধন, জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার-লব্ধ জ্ঞান, (৩) তর্কশাস্ত্র অর্থাৎ অনুমানের প্রামাণ্য ও সে সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ের বিচার, (৪) নীতিবিজ্ঞান অর্থাৎ মানুষের নীতি, নৈতিক বিচারের মান, পুরুষার্থ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান, (৫) সৌন্দর্যবিজ্ঞান অর্থাৎ সুন্দর ও অসুন্দরের বিচার ও তাহার মান-সম্বন্ধে জ্ঞান। আধুনিক কালে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মধ্যে আরও কয়েকটি বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটির নাম এক্‌সিওলজি (Axiology) বা ইষ্টবিজ্ঞান। ইহাতে মানুষ যে সমস্ত বস্তুকে তাহার ইষ্ট বা বাঞ্ছিত দ্রব্য হিসাবে মূল্যবান্ বলিয়া গণ্য করে (যথা সত্য, শিব, সুন্দর, ধর্ম, অর্থ, কাম ইত্যাদি) তাহার বিচার করা হয়। সেইরূপ সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানকেও দর্শনের শাখা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। অবশ্য বর্তমানে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পদার্থ-বিদ্যা বা রসায়ন-শাস্ত্রের মত দর্শন-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসাবেই আলোচনা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মূল সমস্যাগুলি একরূপ এবং অনেক স্থলে তাহাদের সমাধানও অনুরূপ। কিন্তু উভয়ের বিচার-পদ্ধতি ও চিন্তা-ধারার প্রগতির মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ভারতীয় দর্শন বিষয় হিসাবে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত নহে। দার্শনিক মত বা দর্শন-প্রণেতার নাম অনুসারে ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, যথা: বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেক শাখাতেই তত্ত্ববিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচ্য বিষয়গুলি একত্র আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ভারতীয় দর্শনে যে কোন দার্শনিক সমস্যার আলোচনা, সম্ভাব্য সকল দিক্ হইতেই করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই তত্ত্ববিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, প্রমা-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সমস্যাগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় নাই। এ জন্য ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক শাখাতেই তত্ত্ববিজ্ঞান, প্রমাবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতির একত্র সমাবেশ দেখা যায়। এরূপ দার্শনিক তত্ত্বগুলির একত্র আলোচনার পদ্ধতিকে কোন কোন ভারতীয় চিন্তানায়ক ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী বলিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শন বলিতে কেবলমাত্র হিন্দুদর্শন বুঝায় না। উহা হিন্দু বা অহিন্দু, আস্তিক বা নাস্তিক, সকল ভারতীয় চিন্তানায়কের দার্শনিক চিন্তাধারার সমষ্টি। কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতীয় দর্শন বলিতে মাত্র হিন্দুদর্শন বুঝায়। কিন্তু 'হিন্দু' শব্দের অর্থ যদি 'হিন্দুধর্মাবলম্বী' হয়, তবে এ ধারণা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিতে হইবে। অবশ্য 'হিন্দু' শব্দটি ভৌগোলিক অর্থে 'ভারতীয়' বুঝাইলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দুদর্শন বলা যায়। শ্রীমন্ মাধবাচার্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সর্বদর্শন-সংগ্রহে" বৈদিক বা আস্তিক দর্শন-শাখাগুলির সঙ্গে নাস্তিক চার্বাক দর্শন এবং অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন

দর্শনকে যথাযোগ্য স্থান দিয়াছেন এবং সমভাবে তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন।

ইহা হইতে ভারতীয় দর্শনের উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং অবাধ ও অদম্য সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শন বহু শাখা ও প্রশাখায় বিভক্ত এবং কোন কোন স্থলে তাহাদের মত অত্যন্ত বিভিন্ন। কিন্তু কোন এক শাখাতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অন্য শাখাগুলির মতবাদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। এই প্রকারে দার্শনিক আলোচনার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে। কোন দার্শনিক তাঁহার নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিপক্ষের মতবাদের অবতারণা করিতেন; ইহাকে 'পূর্বপক্ষ' বলা হয়। তাহার পর তাঁহাকে বিপক্ষের মতবাদ নিরসন করিতে হইত; ইহাকে 'খণ্ডন' বলা হয়। সর্বশেষে দার্শনিক তাঁহার নিজ মতের ব্যাখ্যা ও প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা উহার প্রতিষ্ঠা করিতেন; এ জন্য ইহাকে 'উত্তরপক্ষ' বা 'সিদ্ধান্ত' বলা হয়।

ভারতীয় দর্শন-শাখাগুলির এরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় তাহারা পরস্পরের মত যত্নসহকারে আলোচনা করিয়াছেন; ফলে প্রত্যেক শাখাই পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে এবং উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে বেদান্তের কোন প্রধান গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে তাহাতে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ও মীমাংসা দর্শনের মতগুলি সযত্নে ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করা হইয়াছে। সেইরূপ বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থে অন্যান্য দর্শনের মতগুলি আলোচনা করা হইয়াছে। এই ভাবে এক একটি দর্শনশাখা এক একটি দর্শনকোষে পরিণত হইয়াছে। এমনকি সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অনেক সমস্যার আলোচনা ভারতীয় দর্শন-শাখাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। মনে হয় এই জন্যই কেবলমাত্র ভারতীয় দর্শনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং ভারতীয় দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিরত এদেশীয় পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অতি দুরূহ ও দুর্বোধ্য সমস্যাগুলিরও এমন সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হন যে তাহাতে আমরা হর্ষ ও বিস্ময় বোধ করি।

অতীতকালে ভারতীয় দর্শনের মহত্ত্ব ও সমৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ—এই উদার ভাব ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী। ইহা হইতে আমাদের এবং ভবিষ্যদ্-বংশীয়দের একটি বিশেষ শিক্ষালাভ করা উচিত। ভারতীয় দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত এবং ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করিতে হইলে আগামীকালের ভারতীয় দার্শনিকদের—দেশ-বিদেশ হইতে যে সব নূতন চিন্তাধারা এদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে সেগুলির সম্যক্ আলোচনা এবং তাহাদের সহিত আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করা একান্ত কর্তব্য। তাহা করিতে পারিলে আপাতবিরুদ্ধ ধর্মমতগুলির সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হইবে এবং ধর্মদ্বন্দ্বের অবসান হইতে পারে।

বিশ্বজনীন পর-মতসহিষ্ণুতার মহা-ভাবটির জন্য পৃথিবী আজও প্রতীক্ষারত। সভ্যতার পক্ষে ইহা এক পরম লাভ। এইভাব ভিতরে প্রবেশ না করিলে কোনও সভ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত মার্কিন লেখক মামফোর্ড (Lewis Mumford) একটা বড় দামী কথা বলেছেন : 'পশ্চিমের সভ্যতা গত চার শতাব্দী ধ'রে যে ভাবে গড়ে উঠেছে তার সম্পর্কে চরম সমালোচনা হ'ল, এই সভ্যতা তৈরী করেছে একটা মেশিনের জগৎ যার মধ্যে না আছে সৃজনীশক্তি, না আছে হৃদয়। এ জগৎ প্রাণের বিরোধী এবং আধুনিক মানুষের অনিবার্য নির্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে সমস্ত জীবনের উপরে নিয়ে আসবে প্রলয়ের অভিশাপ।'

চোখ যার খোলা আছে সে দেখতে পাবে মামফোর্ডের কথার মধ্যে একটুও অত্যুক্তি নেই। কোন্ অন্ধ আবেগে আমাদের এই পৃথিবী মাতালের মতো টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে নিশ্চিত মৃত্যুর অন্ধকারে! বিজ্ঞানের সাধনা ক'রে যাঁরা স্বর্গ থেকে জ্ঞানের আগুন চুরি ক'রে এনেছেন তাঁদের দানে মানুষের সভ্যতা ঐশ্বর্যশালিনী হয়েছে নিশ্চয়ই। আমরা মানবতাকে সেই শক্তি দিয়েছি যে শক্তি ছিল দেবতাদের একচেটিয়া সম্পদ। কিন্তু হায়, আমরা যদি এই সঙ্গে দেবতাদের চরিত্র-সম্পদের অধিকারী হ'তে পারতাম! পরমাণুবোমা আবিষ্কৃত হ'ল এমনই একটা অশুভ লগ্নে যখন নীতিবোধের দিক দিয়ে আমরা প্রায় খ্যাঁকশিয়ালের পর্যায়ে নেমে গেছি। পরের মুর্গী মারতে তার বিবেকে যেমন একটুও বাধে না, অন্তরীক্ষ থেকে আগ্নেয় মারণাস্ত্র ফেলে নগরীর ঘুমন্ত শিশু এবং নারী হত্যা করতেও আমাদের বিবেকে তেমনি আজ একটুও বাধে না। আমাদের এই moral nihilism, নীতিবোধের এই একান্ত দৈন্য আজ আমাদিগকে নামিয়ে এনেছে চেঙ্গিস খাঁর পর্যায়ে, হয়তো আরও একধাপ নীচে।

এই প্রলয়ের তীরে আমাদের গড়িমসি করবার সময় কোথায়? 'We must think swiftly, plan swiftly, act swiftly'. দিগন্তপ্রসারী এই অন্ধকারের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত নিশ্চয়ই প্রদীপ্ত মশালের কাজ করবে। মামফোর্ড বলেছেন, ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তির পথ আছে : Power must become the willing servant of love. শক্তিকে আজ স্বেচ্ছায় হ'তে হবে প্রেমের দাসী! নতুন কোন নৈতিক আদর্শের দ্বারা হালে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। পলিটিক্সের রাস্তায় প্রলয়কে এড়াতে পারব—এ সম্ভাবনাও কম। পথ দেখাবে ধর্ম, যার মূল কথা হ'ল বাইবেলের ভাষায় : Love thy God with all thy heart and all thy soul and all thy might. And love thy neighbour as thyself. হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, কনফিউসাসের ধর্ম—পৃথিবীর সকল ধর্ম চেয়েছে মানুষের ধ্বংসের প্রবৃত্তিকে শান্ত করতে; অবাধ জিঘাংসাকে কোন ধর্মই প্রশ্রয় দেয়নি; প্রত্যেকে চেয়েছে মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখতে। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'—এই মানদ হবার আচরণকেই কি মহাপ্রভু বৈষ্ণবের লক্ষণ বলে প্রচার করলেন না? আজ আমাদের দরকার প্রেমধর্মের পুরাতন আদর্শকে পৃথিবীর এই নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করবার স্বচ্ছ বুদ্ধি এবং হৃদয়ের ঔদার্য।

বুদ্ধির দুর্বিনীত অহঙ্কারে আজ আমরা সর্বনাশের অতলে ডুবতে বসেছি। 'Mankind is afloat on a frail life-raft'. তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রের বুকে আমরা ভেসে চলেছি ক্ষণভঙ্গুর ভেলায়; জীবনের প্রতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি শ্রদ্ধা। 'Religion understands the mons-

ters of the deep and the storms that come up in the night'. সমুদ্রের গভীরে যে সকল জলচর হিংস্রপ্রাণীর বাসা তাদের সন্ধান রাখে ধর্ম। রাতের দিগন্তে ধেয়ে আসে যে ঝঞ্ঝা তারও সংবাদ রাখে ধর্ম।

পুরাতনের শাসনকে পর্যুদস্ত করতে গিয়ে আমরা আধুনিকতাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূল্য দিতে চলেছি। মাত্রাজ্ঞান হারানো নিশ্চয়ই কোন কাজের কথা নয়। মানুষ প্রগতির পথে এতখানি এগিয়ে এসেছে সংযমের সাধনা ক'রে—একথা ভুলে গেলে চলবে কেন? পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, যৌনজীবনে শৃঙ্খলার মূল্যকে যারা স্বীকার করেনি তারা প্রগতির পথে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারেনি। অগ্রসর হয়েছে তারাই যারা প্রবৃত্তির জীবনকে নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধেছে।

এই সংযমের প্রয়োজনকে আমরা যেন আজ অস্বীকার করতে বসেছি! আধুনিক মানুষ বিধি-নিষেধকে একদম স্বীকার করে না—এমন কথা বলা ভুল। স্বীকার করে—কিন্তু ছোট ছোট ব্যাপারে। যথা: গাড়ীর মধ্যে থুথু ফেলতে নেই, টিকিট কাটতে গিয়ে 'কিউ' দিতে হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে। কিন্তু সাধারণভাবে দেখতে গেলে, ভোগবাদই আজ আমাদের জীবনের মর্মমূলে শিকড় গেড়ে বসেছে। সিগার, শ্যাম্পেন, মোটর—এরই তৃষ্ণায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আজ আলজিরিয়ার মোহ ছাড়তে পারছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূলেও এই একই ভোগবাদ। সিগারের কামনা, শ্যাম্পেনের কামনা, মোটরের কামনা, ঐশ্বর্যের দুর্নিবার কামনা।

যাদের মধ্যে ভোগের তৃষ্ণা এত বলবতী তারা পরমাণুশক্তির ব্যবহারে সংযত হবে—এমন আশা করা দুরাশা। মাম্‌ফোর্ড ঠিকই বলেছেন: Morally, such people are unfit for control of atomic power as a chronic alcoholic would be for the inheritance of a vast stock of whisky. পাঁড় মাতালের হেপাজতে যদি একগাদা মদের বোতল রাখা যায়—সে বোতলগুলোকে খালি ক'রে ফেলবেই। ভোগবাদীদের হাতে আণবিক শক্তির অপব্যবহারও অনিবার্য। কোন সংযমেরই যারা ধার ধারে না তারা পরমাণুশক্তিকে সংযমের মধ্যে বেঁধে রাখবে—কেমন ক'রে আমরা এমন আশা করতে পারি?

তাই উচ্ছৃঙ্খল ভোগবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবার প্রয়োজন আজ বিপুল। আর এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ও বাণীর মধ্যে তো কাম-কাঞ্চনের বিরুদ্ধেই অভিযানের শঙ্খনির্ঘোষ! বিষয়-বুদ্ধিকে কোথাও তিনি প্রশ্রয় দেন নি; লক্ষ্মী-মারোয়াড়ীর দশ হাজার টাকা অবহেলায় ফিরিয়ে দিলেন; টাকাকে মৃত্তিকাজ্ঞানে গঙ্গার জলে ফেললেন। সোনার জন্যেই না ধনতন্ত্রে যুগযুগান্তের অত্যাচার! সোনার জন্যেই না আজও পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদে অভিশপ্ত! লেনিন বলেছিলেন, বিপ্লবোত্তর যুগে সোনা ব্যবহৃত হবে শুধু শৌচাগার নির্মাণের কাজে। ঠাকুর তাকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেছিলেন।

যুগাবতার ঠাকুর একদিকে অনাসক্তির, আর একদিকে দেখালেন প্রেমের পথ। শক্তি যদি প্রেমের কিঙ্করী না হয়, পরমাণুশক্তির ব্যবহার পৃথিবীকে রসাতলে ডুবিয়ে দেবে। কি বললেন তিনি? 'সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে, যতদূর পারো; আর ভালবাসবে।'

ঠাকুরের জীবনের মন্দিরে এই ভালোবাসার দীপশিখাই জ্বলছে। তাঁর প্রত্যেকটি বাণী প্রেমে দেদীপ্যমান। এ যুগের অন্যতম চিন্তাবীর সোরোকিনও একই সুরে কথা বলছেন: মানুষের বাঁচবার আজ শেষ আশ্রয় 'all-giving and all-forgiving reverence for life'. মানুষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাই আজ পৃথিবীকে সমস্ত সমস্যার পারে নবজীবনের উপকূলে পৌঁছে দিতে পারে। ঠাকুরের সেই কথা 'আর ভালোবাসবে।' "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" আর কোন পথ আছে কি?

শঙ্কর-দর্শনে "মিথ্যা"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

শঙ্কর-মতে জগৎ "মিথ্যা" বা জগতের কেবল-মাত্র "ব্যবহারিক সত্তাই" আছে, "পারমার্থিক সত্তা" নয়—এ বিষয়ে কিছু আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। (শ্রাবণ, ১৩৬৪)

"মিথ্যা" সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন অদ্বৈতবাদী নানা-ভাবে যে সকল সংজ্ঞা দান করেছেন, তা স্বতন্ত্রভাবে উদ্ধৃত করবার স্থান এ নয়। সেজন্য রামানুজ তাঁর সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য "শ্রীভাষ্যে" অদ্বৈত-মত-খণ্ডনার্থে মহাপূর্বপক্ষে অদ্বৈত-মত-সার সংগ্রহ ক'রে "মিথ্যাত্বের" যে সুন্দর সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সেইটিই এস্থলে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"মিথ্যাত্বং নাম প্রতীয়মানত্ব-পূর্বক-যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বম্। যথা, রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানক-সর্পাদেঃ। দোষবশাদ্ হি তত্র তৎকল্পনম্।" (১।১।১)

অর্থাৎ, যা সাক্ষাৎভাবে প্রথমে প্রতীতিগম্য, প্রত্যক্ষীকৃত বা দৃষ্ট হয়, কিন্তু পরে যথার্থ বস্তুর জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিবারিত হয়ে যায়—তা-ই হল "মিথ্যা"। যথা, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম-কালে দৃষ্ট সর্প। এস্থলে উপরের সংজ্ঞাটির প্রত্যেক শব্দেরই একটি বিশেষ অর্থ আছে। ("শ্রুতপ্রকাশিকা" টীকা)

প্রথমতঃ—বাহ্য বস্তুর সাহায্যেও নিবৃত্তি হ'তে পারে ; যেমন, দণ্ডাদির সাহায্যে ঘটাদি চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিলে ঘটাদির নিবৃত্তি বা ধ্বংস হয়। কিন্তু, "মিথ্যা" বস্তুর নিবৃত্তি হয় এই সাধারণ প্রণালীতে নয়, আন্তর প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানদ্বারাই কেবল—মিথ্যা সর্পজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় একমাত্র সত্য-রজ্জুজ্ঞান দ্বারাই। সেজন্যই এস্থলে "জ্ঞান" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ—ঈশ্বর অনন্ত শক্তিবলে কেবল সংকল্প দ্বারাই যে কোনও বস্তুর নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন। কিন্তু জীবের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়—তার মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হতে পারে সংকল্প বা ইচ্ছা দ্বারা নয়—সত্য, জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ দ্বারা। সেজন্য, যদি ভ্রান্ত ব্যক্তি এরূপ দৃঢ় সংকল্পও করেন যে, তিনি সর্প প্রত্যক্ষ আর করবেন না, তাতে ফল কিছুই হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর রজ্জু-প্রত্যক্ষের উদয় হয়। সুতরাং "জ্ঞানের" অর্থ এস্থলে "জ্ঞানমাত্র"। কেবলমাত্র জ্ঞান এবং জ্ঞান-দ্বারাই অর্থাৎ সত্যজ্ঞান বা সত্য প্রত্যক্ষ দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়।

তৃতীয়তঃ—এই জ্ঞান হবে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, সত্য জ্ঞান—সেই বিষয়েরই, অর্থাৎ যে অধিষ্ঠান অবলম্বনে ভ্রমের উৎপত্তি হয়েছে, তারই সত্যজ্ঞান, অন্য কোনও বিষয়ের নয়। সেজন্যই এস্থলে বলা হয়েছে "যথাবস্থিত"; অর্থাৎ মিথ্যা সর্প সম্বন্ধে জ্ঞান দূর হবে সত্য-রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্বারাই, রজতপ্রমুখ অন্যান্য সত্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্বারা নয়।

চতুর্থতঃ—"যথাবস্থিত" পদটি যে "জ্ঞান" পদের বিশেষণ নয়, সে কথা স্পষ্ট করবার জন্য বলা হয়েছে: "বস্তু"। অর্থাৎ, জ্ঞানই কেবল যথার্থ হ'লে চলবে না—যেহেতু ভ্রান্তিজ্ঞানও ভ্রমকালে সাময়িকভাবে যথার্থ ব'লেই প্রতীত হয়—জ্ঞান হওয়া চাই যথার্থ বস্তুরই জ্ঞান। সেজন্য অযথার্থ বস্তুর সাময়িকভাবে যথার্থরূপে প্রতিভাত জ্ঞানের দ্বারা নয়, যথার্থ বস্তুর শাশ্বতভাবে যথার্থ জ্ঞানই হ'ল "মিথ্যা"র নির্বতক।

পঞ্চমতঃ—যথার্থ বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের উদয়ে জ্ঞানের প্রাগভাবও নিবৃত্ত হয়, মিথ্যাজ্ঞানও নিবৃত্ত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে, জ্ঞানের প্রাগভাব নয়, মিথ্যা জ্ঞানই নিবৃত্ত হয়। সেজন্যই বলা হয়েছে—"প্রতীয়মানত্বপূর্বক"। অর্থাৎ "মিথ্যা" হ'ল নঞর্থক

যথার্থ জ্ঞানাভাবমাত্রই নয়, সেই সঙ্গে সদর্থক অযথার্থ-জ্ঞান। এস্থলে জ্ঞানের অভাব-মাত্রই নেই, উপরন্তু একটি বিশেষ জ্ঞানই রয়েছে, যদিও সেই জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান-মাত্র।

ষষ্ঠতঃ—"জ্ঞান-নিবৃত্তত্বম্" না ব'লে এস্থলে "জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বম্" বলা হয়েছে এইজন্য যে, যথার্থ-বস্তুর জ্ঞানের মিথ্যাজ্ঞানকে নিবারণ করবার যোগ্যতা আছে, অর্থাৎ যদিও বর্তমানে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়ে যায়নি, তথাপি ভবিষ্যতে তা হবার সম্ভাবনা আছে। এরূপে বর্তমানে সত্যরূপে দৃষ্ট, অথচ ভবিষ্যতে অসত্যরূপে দ্রষ্টব্য বস্তুই হ'ল "মিথ্যা"।

"মিথ্যাত্বের" আর একটি সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা হ'ল—"মিথ্যাত্বঞ্চ স্বাশ্রয়ত্বে নাভিমত-যাবন্নিষ্ঠা-ত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্।" (বেদান্তপরিভাষা, দ্বিতীয় অধ্যায়)—অর্থাৎ, যে অধিষ্ঠান বা বস্তুটির আশ্রয়ে ভ্রমের উৎপত্তি হয়েছে, সেই অধিষ্ঠানে এই ভ্রমদৃষ্ট বস্তুর অত্যন্তাভাব বা ত্রৈকালিক নিষেধ। "প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্ মিথ্যাত্বম্।" (পঞ্চপাদিকা)—অর্থাৎ, রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানের আশ্রয়ে রজ্জু-সর্প-ভ্রমের উদয় হয়, অথবা রজ্জুতে সর্পের আরোপ করা হয়। কিন্তু রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্ব কস্মিন্‌কালেও নেই, সেজন্যই সর্পটি মিথ্যা।

"মিথ্যা" বস্তুর লক্ষণ কি? এর উত্তর হ'ল এই যে, মিথ্যার লক্ষণ নির্দেশ করা অসম্ভব। কারণ, বস্তু-লক্ষণের প্রথম ও প্রধান কথাই হ'ল—সেই বস্তুটি সৎ অথবা অসৎ। কিন্তু মিথ্যা সৎও নয়, অসৎও নয়, সদসৎও নয়, সদসদ্-বিলক্ষণও নয়। প্রথমতঃ—মিথ্যা বস্তু সৎ নয়, যেহেতু সৎ বস্তু কদাপি বাধিত বা অসত্য ব'লে প্রমাণিত হয় না, যেমন—ব্রহ্ম। কিন্তু মিথ্যা বস্তু প্রথমে সত্যরূপে প্রতিভাত হলেও, পরে সত্য বস্তুর জ্ঞানোদয়ে বাধিত বা অসত্য ব'লে প্রমাণিত হ'য়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ—মিথ্যা বস্তু অসৎও নয়—যেহেতু অসৎ বস্তু কদাপি প্রত্যক্ষগোচরই হয় না; যেমন—আকাশ-কুসুম। কিন্তু মিথ্যা বস্তু প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ—মিথ্যা বস্তু সদসৎও নয়—যেহেতু একই বস্তু দুই বিরুদ্ধধর্মভাগী হ'তে পারে না। চতুর্থতঃ—মিথ্যা বস্তু সদসদ্-বিলক্ষণও হ'তে পারে না—যেহেতু সংসারের সকল দ্রব্যই হয় সৎ, না হয় অসৎ; সেজন্য সৎও নয়, অসৎও নয়—এরূপ সত্তা কল্পনা-মাত্রও করা যায় না। সেজন্যই মায়াকে, এবং তজ্জনিত মিথ্যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শঙ্কর বলেছেন: "অনির্বচনীয়"—

"তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ"। (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য—১।১।৫)

অর্থাৎ, 'নামরূপ' বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বও নয়, অতত্ত্বও নয়, সেজন্য অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় সংসারবীজই সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত থাকে, সৃষ্টিকালে ব্যক্ত হয়।

এই সত্তা-ত্রৈবিধ্য-বাদ যথাযথ উপলব্ধি করতে পারলে শঙ্কর-বেদান্তের সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হবে। সাধারণ ধারণা এই যে, শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বা মায়ামাত্র বলেছেন ব'লে তিনি জগতের অস্তিত্বই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নয়, তা উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই প্রমাণিত হবে। উপরে যে চারটি পক্ষের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা—সৎ বা পারমার্থিক সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা ও অসৎ—তাদের মধ্যে, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তা, প্রকৃতকল্পে 'মিথ্যা' হলেও, 'সত্তা'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যাবে যে, পরিশেষে বাধিত হ'য়ে অসত্য প্রতিপাদিত হলেও, প্রারম্ভে তাদের এক প্রকারের অস্তিত্ব আছে।

বিশেষ ক'রে জগৎ মিথ্যা হলেও শূন্য নয়, আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বা তুচ্ছ নয়, স্বপ্ন নয়, সাধারণ রজ্জু-সর্প-তুল্য ভ্রমও নয়। এরূপে

ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের পরিভাষায়—জগতের 'Phenomenal, empirical reality' আছে, 'Noumenal, absolute reality' নেই।

অর্থাৎ, সাধারণ জীবনের দিক থেকে, প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের দিক থেকে—দৈনন্দিন জ্ঞান অজ্ঞান, সুখ দুঃখ, আশা আশঙ্কা, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, প্রভৃতির দিক থেকে পারিবারিক ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থার দিক থেকে—এমনকি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও—এই পরিদৃশ্যমান জড় জগৎ—এই শ্যামলা শোভনা সুষমাময়ী ধরণী—যা যুগে যুগে কত কবি, কত জ্ঞানি-বিজ্ঞানী, কত সমাজ-সেবক ও রাষ্ট্রনায়ককে উদ্বুদ্ধ করেছে সাহিত্য-চর্চায়, জ্ঞানানুশীলনে মানব-সেবায়—তা নিশ্চয়ই সত্তাশীল, নিশ্চয়ই অর্থশূন্য নয়। উচ্চতম সত্তা ব্রহ্মতুল্য না হলেও, সংসার ক্ষণবিলয়ী স্বাপ্ন পদার্থ ও অল্পস্থায়ী ভ্রমকালীন দৃষ্ট পদার্থের অপেক্ষা বহু উচ্চতর, প্রকৃষ্টতরও স্থিরতর সত্তা। সেজন্য, তার মূল্য এবং প্রয়োজনও সমধিক। কারণ, পরিশেষে পরিত্যাজ্য হলেও প্রারম্ভে এই সংসারের মাধ্যমেই মুক্তিলাভ সম্ভব। এ সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা পরে করা হবে।

মানব-মন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মানব-মনের বিস্ময়-কর গতি,
কি যে উপাদানে গড়েছেন প্রজাপতি !
মানুষী তনুই ভুবনের বিস্ময়,
মানব-মনের সব রহস্যময়।
গড়িতে ও মন লাগিয়াছে কত দিন ?
কত বিদ্যুৎ, কত গুলা ইঞ্জিন ?
কত শত ভিসুভিয়সের উত্তাপ ?
কত শত হিম-গিরির হিমের চাপ ?

২

কয়টা সাহারা চেরাপুঞ্জী বা ক'টা—
লেগেছে কয়টা ইন্দ্রধনুর ছটা ?
কত তেজ কত রস আর কত ভাব,
লেগেছে ঘটাতে ইহার আবির্ভাব।
ও মন গড়িতে জোগায়েছে উপাদান
কতই কপিল, কত দধীচির দান ?
ও মন যেমন উচ্চ তেমনি নীচু
বাধা ও বিঘ্ন মানে না—মানে না কিছু।

৩

জগৎকে করে আলোড়ন বিলোড়ন,
আনে বিপ্লব ধ্বংস বিড়ম্বন।
আবার কখনো ভাবের বন্যা আনি
ধরণীতে করে অমৃতের আমদানি।
অবিনশ্বর তার সৃষ্টি ও বড়,
বিশাল সৃষ্টি—সৃষ্টি সূক্ষ্মতর।
শ্রীভগবানের মহিমা-উদ্ভাসিত
সেই গ'ড়ে দেয় অপূর্ব ধরণী তো।

৪

মানবের মন গড়েছে—শকুন্তলা
কত সুর, কত শিল্প, চিত্রকলা !
কতই পুরাণ দর্শন রীতিনীতি,
মহাকাব্য ও অমর স্তোত্র-গীতি
স্বর্গে মর্ত্যে সে করিতে পারে যোগ
চিন্তার শর পঁহুছায় ধ্রুবলোক।
বিচিত্রতার সেই তো প্লাবন আনে,
এক ক'রে দেয় ভুবনে ও ভগবানে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

আধুনিক পণ্ডিত সমাজের কোন কোন লোকের ধারণা আছে যে ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই; বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ এত গভীর যে উভয়ের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করা প্রায় অসম্ভব। বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল তাঁহার একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, আমাদের সম্মুখে একটি স্বর্ণযুগের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ তাহার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহায্যে এই স্বর্ণযুগের অধিবাসী হইতে পারে কিন্তু তাহার যাত্রাপথের সামনে এক বিরাট দানব বসিয়া আছে, সেই দানবটি হইতেছে ধর্ম। ইহাকে হত্যা করিতে না পারিলে মানুষের উন্নতির কোন আশা নাই।

রাসেল চিন্তাশীল লেখক, পণ্ডিত সমাজে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। রাসেল বলেন, একথা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে মানুষ সুখ চায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে সর্ববিধ সুখের পথে লইয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের বহুবিধ উন্নতির ফলে বহিঃপ্রকৃতি মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে, কাজেই এখন আর তাহার পক্ষে ধর্মের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, রাসেলের মতে, ধর্মের উৎস হইতেছে ভয়। বহু যুগ আগে, যখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কোন সূচনাই দেখা যায় নাই, তখন মানুষ নানা দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করিত। বহিঃপ্রকৃতিকে ভয় করিয়া চলিত এবং অন্ধ বিশ্বাসের বশে প্রকৃতির ভিতর নানারূপ কাল্পনিক দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিত। সেই দেবদেবীর সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিত না। কালক্রমে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ এই অন্ধ বিশ্বাস দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে; কাজেই এখনও ধর্মকে জীবনে স্থান দিলে মানুষ স্বভাবতই প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়িবে। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে—বিজ্ঞান যুক্তিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর ধর্ম কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির রুদ্ররূপকে শান্ত করা এবং কল্পিত পারলৌকিক আত্মাকে প্রসন্ন রাখা—ইহাই প্রধানতঃ ধর্মের কাজ। রাসেলের মূল যুক্তি এইরূপ।

আমাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে রাসেলের অভিমত যুক্তিনিষ্ঠ কিনা এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে প্রকৃতই কোন বিরোধ আছে কিনা। প্রথমে বিচার করিয়া দেখা দরকার বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ কি?

বিজ্ঞানের কাজ হইল বিশেষকে সামান্যের মধ্যে বিধৃত করিয়া দেখা; বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য 'বহু'কে 'এক'-এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করা। মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন মানুষের মনের সাধারণ ভাব বা প্রত্যয়গুলি বিশ্লেষণ করিয়া থাকে, তেমনি পদার্থবিজ্ঞান বিভিন্ন প্রকারের জড় পদার্থের ভিতর সাধারণ ধর্মগুলি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে।

একথা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে বিজ্ঞানের কাজ সীমাবদ্ধ। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ; একটি অপরের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান মনোরাজ্যের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না; তেমনি মনোবিজ্ঞান জড় পদার্থের লক্ষণ লইয়া আলোচনা করে না। বিজ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা কতকগুলি মৌলিক সূত্র—বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করিয়া নেয়। পদার্থবিজ্ঞান জড়জগতের অস্তিত্ব, দেশ-কালের অস্তিত্ব, কার্যকারণ-সম্পর্ক প্রভৃতি স্বীকার করিয়া নেয়। তেমনি মনোবিজ্ঞান—মন

আদৌ আছে কিনা, এ প্রশ্ন করে না; মনের কামনা, বাসনা ও অনুভূতিকে সত্য বলিয়া মানিয়া নেয়।

বিজ্ঞান আমাদের কাছে যে জ্ঞান পরিবেশন করে তাহা সুসংবদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ, সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কোন দিনই চরম সত্য নহে। বিজ্ঞান একটির পর একটি কল্পনার (hypothesis) সাহায্যে সত্যানুসন্ধানের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ কেন? পাশ্চাত্ত্য দেশে কি ভাবে এই বিরোধের সূত্রপাত হইল তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ কখনও প্রবল আকার ধারণ করে নাই। বৌদ্ধযুগে ধর্মযাজকগণ বৈজ্ঞানিকদিগকে বিশেষতঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে নানাপ্রকার উৎসাহ দিয়াছেন। নাগার্জুন যেমন একদিকে ধর্ম ও দর্শনের মৌলিক আলোচনায় পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তেমনি সাধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনে তিনি অপরিসীম দান করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন যুগে ধর্মযাজকেরা বৈজ্ঞানিকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন। ইটালিদেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্রুনোকে (খৃঃ অঃ ১৫৫০) জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল, যেহেতু তৎকালীন ধর্মযাজকদের মতানুসারে তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নাই। ব্রুনো ছিলেন নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। মৃত্যুর সময় তিনি বলিয়াছিলেন: "আমাকে যাহারা হত্যা করিল তাহারা আমার চাইতেও ভয়ার্ত। আমি সত্যের জন্য চিরকাল সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি। সেই সংগ্রামের জয়-পরাজয় ভাগ্যের হাতে। আমি অন্যায় ও অসত্যের পায়ে মাথা নত করি নাই—ভাবীকালের মানুষ এই কথা নিশ্চয় মনে রাখিবে।" ব্রুনোর জীবন আলোচনা করিলে জানা যায় যে তিনি সত্যনিষ্ঠা ও চিন্তার স্বাধীনতার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে যীশুখৃষ্টের সত্যনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ সত্যনিষ্ঠার অপরাধে ব্রুনোকে হত্যা করিল। নির্ভীকভাবে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের জন্য গ্যালিলিওকেও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে।

অতীতে ধর্মের নামে যেমন বিজ্ঞানের উপর অত্যাচার হইয়াছে, তেমনি বর্তমানকালে বিজ্ঞানের নামে ধর্মের উপর অত্যাচার চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার গর্বে গর্বিত হইয়া আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মানুষ হিন্দুধর্মকে কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর সমষ্টি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকেরা বলেন: ধর্ম একটি কুসংস্কার বা বুজরুকি মাত্র; যে ঈশ্বর ও পরলোকের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ আমাদের জানা নাই—তাহাই ধর্মের বিষয়-বস্তু। আধুনিক সন্দেহবাদীর মতে ধর্ম কাল্পনিক বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত আর বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাই উভয়ের মধ্যে বিরোধের সূচনা করে।

এই অভিযোগের বিশ্লেষণ করিতে হইলে ধর্মের লক্ষণ কি—তাহাই প্রথমে আলোচনা করিতে হইবে। 'ধর্ম' কথাটি 'ধৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; যাহা মানুষকে ধারণ করিয়া আছে তাহাই ধর্ম। 'Religion' কথাটির মূল অর্থ—যাহা মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের ঐক্য সাধন করিতে পারে। কালক্রমে religion কথাটির অর্থ হয় ঈশ্বরানুভূতি, ঈশ্বরপ্রীতি এবং ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য পূজা-প্রার্থনাদি আচার অনুষ্ঠান করা। আমরা ধর্ম বলিতে বুঝি এমন একটি সত্য, যাহা মানুষের একমাত্র আশ্রয়-স্থল—যাহা বাদ দিলে মানুষ মানুষ থাকে না। সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে, জলের ধর্ম যেমন তরলতা, আগুনের ধর্ম যেমন দাহিকা-শক্তি,

তেমনি মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বের লক্ষণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে পশুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কোথায় তাহাই আলোচনা করিতে হয়। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এই চারিটি গুণ মানুষ ও পশু—উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। তাহা হইলে, ইহার কোনটাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করিয়া যখন বলেন, "তুমি মানুষ হও" তখন তিনি বলিতে চান যে তোমার মধ্যে যে সুপ্ত মনুষ্যত্ব আছে তাহাকে উদ্বুদ্ধ কর, তুমি জীবনের জয়গান গাও, তুমি এগিয়ে চল, পিছিয়ে থেকোনা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রোহিতাশ্বের উপাখ্যানের মধ্যে সুন্দর কথাটি আছে—চরৈবেতি, চরৈবেতি—তুমি এগিয়ে চল, চল—এগিয়ে চল। এগিয়ে চলার মধ্যেই মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার আবরণ উন্মোচনের মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এক কথায়, 'ধর্ম' বলিতে বুঝিতে পারি মানুষের আত্মোপলব্ধি। এই বিষয়ে পৃথক্ প্রমাণ দেওয়া সম্ভবপর নয়; মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন সেই পথ অনুসরণ করিলেই ধর্মের তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্; মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।' উপনিষদের ঋষিরা বলিয়াছেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি'। আমি ও ব্রহ্ম অভিন্ন—ইহা অনুভূতির আলোকে প্রতিভাত সত্য, ইহা প্রমাণলভ্য নয়। সেখানে সংশয় ও সন্দেহ আছে সেখানেই প্রমাণের প্রয়োজন। আত্মা সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশয় থাকিতে পারে না; কাজেই প্রমাণের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। আমি ও ব্রহ্ম দুইটি পৃথক্ বস্তু নয়, কাজেই অপর কোন সত্তা বা পুরুষের সাহায্যে এই ঐক্য সাধিত হইতেছে, ইহাও সত্য নয়। ব্রহ্মানুভূতির অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই অবস্থায় প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয়—এই তিনটি ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়। শাস্ত্রে ব্রহ্মকে 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' বলা হইয়াছে। কিন্তু এ আলো কিসের আলো? উপনিষদ্ বলিয়াছেন,

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
> তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

—সেখানে সূর্যের ভাতি নাই, চন্দ্রতারকার ভাতি নাই, বিদ্যুৎও সেখানে প্রভান্বিত নহে, অগ্নি সেখানে কোথায়? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই তদনুযায়ী নিখিল জগৎ প্রকাশমান, তাঁহার দীপ্তিতে এই সমুদয় প্রকাশ পায়। কেনোপনিষদ্ বলিয়াছেন, 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ্ গচ্ছতি, নো মনঃ। ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ'॥—যেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্য যাইতে পারে না, মন যাইতে পারে না, বুদ্ধি যাইতে পারে না; তাঁহাকে আমরা জানি না, কিরূপে তাঁহার উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে? উপনিষদ্ আরও বলিয়াছেন, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?' যিনি সর্বজ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় সেই বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?

অনেক সময় দেখা যায়, আপাতবিরোধী বাক্যের সাহায্যেও পরম পুরুষকে বর্ণনা করা হইয়াছে:

'তদেজতি, তন্নৈজতি'—তিনি এগিয়ে চলেন অথচ এগিয়ে চলেন না; 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে'—তিনি দূরে আছেন, অথচ নিকটেও আছেন ইত্যাদি। আপাতবিরোধী বাক্য ব্যবহারের বিশেষ তাৎপর্য আছে। সাধকেরা বলিতে চান যে ঈশ্বর যুক্তিতর্কের বাইরে; ঈশ্বর অনুভূতি-সাপেক্ষ, উপলব্ধি-সাপেক্ষ; উপলব্ধির আলোকে যখন নিজের স্বরূপকে মানুষ অবলোকন করে তখন সে বুঝিতে পারে যে সে ক্ষুদ্র, খর্ব, দেহেন্দ্রিয়ধারী নশ্বর জীব মাত্র নয়; সে অমৃতের পুত্র, সে বিরাট ভাগবত জীবনের মধ্যে বিধৃত; সে সচ্চিদানন্দের মূর্ত বিগ্রহ। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে মানুষ স্বভাবতই ভয়মুক্ত

হয়, মৃত্যুভয়ে সে আর ভীত হয় না। সেইজন্য শাস্ত্রকারেরা "অভীঃ" মন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

উপনিষদের দৃষ্টি অনুসরণ করিলে 'ভয় হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে'—রাসেলের এই অভিযোগ আর যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন ঋষিরা ধ্যানদৃষ্টিতে সত্যের যে রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই ধর্মের মূল সুর খুঁজিয়া পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ এইজন্যই বার বার বলিয়াছেন: 'Religion is realisation......it is being and becoming'। মতামতের মধ্যে যুক্তিতর্কের মধ্যে ধর্মের সত্য নিহিত নাই; ধর্ম আসলে আত্মার স্বরূপ-উপলব্ধি। এই উপলব্ধির ফলে মানুষ মহত্তর, বৃহত্তর জীবনের অধিকারী হয়। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে প্রাচীনকালে কোন কোন সম্প্রদায় ভয় হইতে ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি এই উক্তি সার্বিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সমাজের অন্যান্য জিনিসের মত ধর্মবোধের এবং ধর্মানুষ্ঠানেরও বিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কাজেই একথা বলিলে ভুল হইবে না যে, যে ক্ষেত্রে ভয় হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানে প্রেমে তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে: "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"। যিনি রুদ্র তিনিই আবার প্রসন্ন। যস্য ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ—মৃত্যু ও অমৃত একই সত্তার দুই দিক্। ইংরেজীতে একটি কথা আছে 'There is more in the fruit than there was in the roots'। ফলের ঐশ্বর্য মূলের অপেক্ষা অনেক বেশী।

ধর্মকে যাঁহারা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বিজ্ঞানের মধ্যেও কল্পনার স্থান রহিয়াছে। বিজ্ঞান স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে চরম বলিয়া স্বীকার করে নাই; ব্যবহারিক জগতের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতম যে সত্তা আছে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা। পরমাণুকে বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক যে ইলেকট্রন্ ও প্রোটনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে তাহাদের অস্তিত্বের ধারণা করা হয় মাত্র।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মিলনের সেতু কোথায় এখন তাহাই আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ—ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে 'শব্দমূল' বলা হইয়াছে। সেইজন্য শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে ধর্মের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হন, একথা সত্য। কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধানের মূলে একটি বিশ্বাস কাজ করিতেছে—সেই বিশ্বাস হইতেছে এই যে, প্রকৃতির যাবতীয় জিনিস কার্যকারণ-সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃতির সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যাইবে। এই বিশ্বাস ছাড়া বৈজ্ঞানিক কোন মতেই অগ্রসর হইতে পারেন না।

Max Planck বৈজ্ঞানিকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি কথার উপর বারবার জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অপরিহার্য ধর্ম হইল ঐকান্তিক নিষ্ঠা (penetrating sincerity)। এই নিষ্ঠা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যেমন অপরিহার্য তেমনি ধর্মশীল লোকের পক্ষেও অপরিহার্য। আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা না থাকিলে যেমন বৈজ্ঞানিক তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না, তেমনি আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা ব্যতীত ঈশ্বরলাভও হয় না।

বৈজ্ঞানিক বিশেষকে সামান্যের (Universal) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। যেমন, পদার্থবিজ্ঞান সকল পদার্থের অন্তর্গত মূল সত্যটির অনুসন্ধান করে, প্রাণিবিজ্ঞান সকল প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি মৌলিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করে। ধর্মের কাজও বহুকে একের মধ্যে বিধৃত করিয়া দেখা। গীতায়

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "সূত্রে মণিগণা ইব"। মণির মালা গাঁথিবার জন্য সূতার প্রয়োজন; সূতা ছিঁড়িয়া গেলে সমস্ত মণি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে: একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। 'এক' বহুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং 'বহু' একের মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে—এই সত্য উপলব্ধি করাই ধর্ম ও দর্শনের প্রধান লক্ষ্য।

এ-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিজ্ঞান কখনও চরম সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। ইহা কেবল মানুষকে সত্যের বিভিন্ন সোপানের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেয়। ধর্ম মানুষকে শিখায় কেমন করিয়া চরম সত্তাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিতে হয়। বিজ্ঞান সেই চরম সত্তার বিভিন্ন প্রকাশকে নিজ নিজ প্রথানুযায়ী বিশ্লেষণ করিয়া থাকে। এই কথা স্মরণ রাখিলে বুঝিতে পারিব যে, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ নাই। জড়, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সচ্চিদানন্দের বিভিন্ন স্তর মাত্র। প্রকৃতির সুগভীর অন্তস্তলে যে প্রাণপুরুষ অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে অস্বীকার করিলে এই স্তরগুলি অর্থহীন হইয়া পড়িবে।

ধর্ম মানবপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্তাকে উপলব্ধি করে; বিজ্ঞান সেই অন্তর্নিহিত সত্যের বহিঃপ্রকাশকে ব্যাখ্যা করে। ধর্মশীল ব্যক্তি ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই সত্যের পূজারী। ধর্মশীল ব্যক্তি সত্যকে সামগ্রিকভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখেন; আর বৈজ্ঞানিক চরম সত্যের খণ্ডরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে কতকগুলি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে জেমস্ জীন্স্ বলিয়াছেন যে, জড়জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি এবং মনে হয় ইহার পিছনে এক Mathematical Mind—গণিতজ্ঞ মন আছে, যাঁহার নির্দেশে জগতের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা হইতেছে। এডিংটনও বহিঃপ্রকৃতির মূলে এক Universal Logos বা বিশ্বজনীন চিৎশক্তি মানিয়াছেন। গত যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ফ্যারাডে বলিয়াছেন, ইহা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বোধ হয় যে স্রষ্টা ঈশ্বরের পুঁথি না পড়িয়া মানুষ মানুষেরই লেখা পুঁথি পড়িয়া থাকে। পাস্তুর বলিয়াছেন: যে ঈশ্বরকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—শিল্পকলার আদর্শ, বিজ্ঞানের আদর্শ, ধর্মজীবনের আদর্শ—তাহার জীবন ধন্য; সে খণ্ডসত্যকে অনন্তের আলোকে প্রতিফলিত দেখিতে পায়।

ধর্ম যে-ঈশ্বরের সন্ধান দেয় সেই ঈশ্বর সত্য শিব সুন্দর। বিজ্ঞান এই অখণ্ড তত্ত্বকে খণ্ড করিয়া কেবল সত্যের সাধনা করিয়া থাকে। আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে যে বিভ্রাট ও বিপর্যয় দেখা দিয়াছে তাহা দূর করিতে হইলে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে এক অবিচ্ছেদ্য মঙ্গলসূত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষকে অসুন্দর ও অমঙ্গলের পথে লইয়া যায় তাহা বর্জন করিতে হইবে। সত্য যে শিব ও সুন্দরের একটি বিশেষ প্রকাশ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে। আজ ফ্র্যান্সিস্ বেকন্-এর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়: 'A little science makes man an atheist, whereas a great deal of science turns man's thoughts about to religion'.—বিজ্ঞানের সামান্য পরিচিতি মানুষকে নাস্তিক করিয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞানের সুগভীর অনুশীলন তাহাকে স্বভাবতই ধর্মের পথে লইয়া যায়।

বাংলাদেশে দুর্গোৎসব

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

বাংলাদেশে দুর্গোৎসব জাতীয় উৎসব। ওড়িস্যায় রথযাত্রা, উত্তরপশ্চিমে ও বিহারে দেওয়ালী, বোম্বে ও দাক্ষিণাত্যে গণপতি-উৎসব জাতীয় উৎসব। অবশ্য অন্য প্রদেশেও এই সব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু জাতীয় উৎসব বলিতে আবালবৃদ্ধ নরনারীর মধ্যে যে আনন্দের উন্মাদনা দেখা যায়, অন্যত্র ঠিক সেই ভাবের উচ্ছ্বাস দেখা যায় না।

হিন্দুজাতির মধ্যে সকল পর্বেই আনন্দানুষ্ঠান ও পূজার্চনা আছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ পর্বে বিভিন্ন প্রদেশে অনন্দোৎসবের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা প্রদেশগত ও জাতীয়। বর্তমানকালে ভারতের সর্বত্র এই সব পর্বে কতকটা সীমাবদ্ধ আনন্দোৎসব, পূজার্চনার উত্তম ও উৎসাহ দেখা যায়, কিন্তু সকলের প্রাণে সব পর্বে সাড়া দেয় না। বাংলাদেশে দুর্গোৎসবে প্রতি পল্লীতে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহে জাতিধর্মনির্বিশেষে যে উদ্বেল আনন্দের তরঙ্গে নরনারীর হৃদয় প্লাবিত হয়—অন্য প্রদেশে বাঙালী ব্যতীত অন্য কাহারও অন্তরে সেই উদ্দাম ভক্তির উচ্ছ্বাস কচিৎ দেখা যায়।

বাংলার আগমনী গান দুর্গোৎসবের মাসাধিক পূর্বে বাংলার প্রতি গ্রামে ভিখারী বৈরাগীদল পথে পথে গাহিয়া বেড়াইত। বাংলার নরনারী উৎকর্ণ হইয়া ভক্তি-রসাপ্লুত চিত্তে তাহা শুনিত। আমরা বাল্যকালে প্রত্যুষে শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজার বহুদিন পূর্বে গাহিতে শুনিয়াছি :

"গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে—'মা কৈ, মা কৈ' ব'লে
ডাকিছে মা তোর ঐ শশধর-বদনী।
মা তোর এই কন্তে ত্রিভুবন-ধন্তে
কভু এ সামান্তে নয় গো রাণী।
আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে
তিনি নাকি ভবের ভয়-হারিণী॥
মা তোমার এই তারা চন্দ্রচূড়-দারা
চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কারো, মনের অন্ধকার হরে
মা, তোর হর-মনোমোহিনী।"

এই গান শুনিয়া অনেক বয়স্ক নরনারীর চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিত। আমরা বালকের দল মনে করিতাম, মা দুর্গা আসিতেছেন, নূতন পোশাক পরিয়া দল বাঁধিয়া কত আনন্দ করিব। আজ বাঙালীর সেই আগমনী গান নেই—আগমনী গান আর শুনিতে পাওয়া যায় না। কত পরিবর্তন!

বোধনের দিন পল্লীর রমণীরা সমবেত কণ্ঠে গাহিত, ভিখারীরা বা গায়কের দল গাহিত :

এলো গিরিনন্দিনী,
ল'য়ে সুমঙ্গল ধ্বনি ঐ শোন রাণী।
চল, বরণ করিয়ে উমা আনি যেয়ে
কি কর পাষাণী রমণী!
অমনি উঠিয়ে পুলকিত হ'য়ে ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুণ্ডল, অঞ্চল লোটায় ধরণী॥
আঙিনার বাহিরে হেরিয়ে গৌরীরে,
দ্রুত কোলে নিল রাণী
অমিয়-বরষী, উমা-মুখ-শশী, চুম্বয়ে যেন চকোরিণী॥
গৌরী কোলে করি মেনকা সুন্দরী
ভবনে লইল ভবানী।
কমলাকান্তের পুলকে অন্তর, হেরি ও বিধুমুখখানি॥

সাধক কমলাকান্তের এই বোধন-সংগীত আর শোনা যায় না। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহে দুর্গা-মণ্ডপ থাকিত। দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের কুটীরে পূজামণ্ডপ ছিল—দুর্গোৎসবে লক্ষ্মীপূজায় শ্রীশ্রীশ্যামাপূজায় দোলপর্বে তাহা প্রতিমার আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল ছিল—ঢাক ঢোল

ঘণ্টা কাঁসির রবে শানাই-এর সুরে সমগ্র পল্লীটি মুখরিত হইত। বালক বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র সকলের মুখেই আনন্দের দীপ্তি। গীতবাদ্যে, নাম-গুণগানে, ভজন-সঙ্গীতে অনাবিল ভক্তির প্রবাহ বহিত। আর সেদিন নাই।

বোধনের দিন 'মা এসেছেন'—এইভাবে বিভোর হইয়া লোকে দাশরথির গান গাহিত; ভাবোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণও গাহিয়াছেন সেই গান—

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী—
চাঁদের মেলা যেন চাঁদ সারি সারি॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী
আসবে কত দণ্ডী জটাজুটধারী॥
মেয়ে কোলে, মেয়ে দুটি রূপসী
লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী,
সুরেশ কুমার গণেশ আমার
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন-বারি॥

আজ বোধনে সে গান আর শুনিতে পাওয়া যায় না—পূজামণ্ডপে। ঘরে ঘরে যে পূজা ছিল—তাহার সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এখন পল্লীতে সার্বজনীন পূজা—গ্রামোফোন রেকর্ডে "লারে লাপ্পা" প্রভৃতি গান লাউড-স্পীকার মুখরিত করে। আবার চিন্ময়ী মাতৃপ্রতিমার আবরণ উন্মোচন হয় মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দ্বারা—মাতৃপূজার এই অদ্ভুত বোধন! হায় মা!

মা তো মৃন্ময়ী নন—চিন্ময়ী; জড় মাটির মূর্তি নয় যে, আমরা রাম শ্যাম সামান্য পর্দার আবরণ উন্মোচন করিয়া লোক-সমক্ষে মাকে প্রকাশ করিতে পারি! এতো একটা সাধারণ অনুষ্ঠান নয়। এর উন্মোচন হয় জগজ্জননীর কৃপায়; কোন সাধারণ মানুষের বক্তৃতায় মহামায়ার আবরণ উন্মোচিত হয় না! শ্রীশ্রীঠাকুর ভাববিভোর হইয়া গাহিতেন—

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে।
ব্রহ্মাবিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জানতে পারে॥

তাই জগন্মাতার কাছে আকুলভাবে চাহিতে হয়: মা—তোমার কুণ্ডলিত শক্তিকে জাগাও! জীবের ভাব আরোপ করিয়া ঠাকুর প্রেমবিগলিত হৃদয়ে মায়ের আবাহন করিতেন—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিণী,
তুমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপিণী।
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী॥
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু,
মূলাধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভূ-শিব-বেষ্টনী॥
গচ্ছ সুষুম্নার পথ, অধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুর-অনাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী।
শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে,
ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দ-দায়িনী॥

জগজ্জননী মাকে সরল ভক্তি-বিশ্বাসে বাংলার নরনারী আপনার "মা" করিয়াছিল—এই দুর্গোৎসবে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে। অতি দীন দরিদ্র মূর্খও মনে করে—আমার মা জগজ্জননী আসিতেছেন, স্নেহ-করুণার অমৃত-পীযূষধারা পান করাইতে। মাতৃভক্ত বাঙালী প্রতিমায় চিন্ময়ী মাকে সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দময়ী মায়ের স্নেহসুধা আস্বাদন করিত। পিতৃগৃহে কন্যা আসিলে জননীর যেমন আনন্দ হয়—বিশ্বজননীর প্রতিমায় বাংলার অন্তঃপুরচারিণীরা মা দুর্গাকে সেই ভাবে বরণ করিত। এইভাব অন্য প্রদেশে দুর্লভ—বিশেষতঃ দুর্গোৎসবে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে দুর্গোৎসবের সময় শ্রীশ্রীমা যখন হলুদ-গুদাম বাড়ীতে ছিলেন তখন আমি প্রায়ই শনি-রবিবার তথায় বাস করিতাম। 'কথামৃত'কার 'শ্রীম' সেই সময়ে আসিয়া থাকিতেন—শনিবার সন্ধ্যায় আসিয়া রবিবার সন্ধ্যায় চলিয়া যাইতেন। তিনি ও আমি প্রায়ই হলঘরে দ্বিতলে একসঙ্গে পাশাপাশি শয়ন করিতাম—তখন আমার

ছাত্রজীবন—এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। পূজার কয়দিন 'শ্রীম' মায়ের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মহানবমীর সন্ধ্যায় আমরা দুইজনে বাগবাজারে প্রতিমা দর্শন করিতে একত্র বাহির হইলাম। বাগবাজারে গোঁসাই বাড়ীতে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হইত—প্রথমে আমরা সেখানে গেলাম। 'শ্রীম' তন্ময় হইয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে গাহিলেন।

বলরে শ্রীদুর্গা নাম—(ওরে আমার মন রে)
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে পথে চলে যায়।
শূল হস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়॥
তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি সে যামিনী।
কখনও পুরুষ হও মা, কখন কামিনী॥ ইত্যাদি

অদূরে দাঁড়াইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া 'শ্রীম' এই গান গাইতেছেন—আবার আমার দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, বাড়ীর মেয়েরা এসে মাকে কেমন অপলকদৃষ্টিতে দেখছেন, যেন মা—কত আপনার।" দুর্গোৎসবে আমরা বাঙালীরা মা'কে অতি আপনার করে ফেলেছি। প্রতিমা—মাটীর মূর্তি দেখি না—দেখি আমাদের "মা"; এমন আপনার-করা ভাব আর কোথাও দেখতে পাই না।

'শ্রীম'র সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে তাহা বলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। দুর্গোৎসবের কয়েক দিন সাধু ও ভক্তরা শ্রীশ্রীমার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। মহাষ্টমীর দিন আমরা কয়েকজন মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি—প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় 'শ্রীম' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন গোলাপ-মা ত্রিতল হইতে ডাকিলেন, "এস ভক্তরা, মাকে দর্শন করবে এস।" আমরা একে একে পুষ্পাদি লইয়া তেতলায় মাকে দর্শন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলাম; কিন্তু 'শ্রীম' দোতলায় বসিয়া রহিলেন—পুষ্পাঞ্জলি দিতে ও দর্শন করিতে গেলেন না; আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাষ্টার মশায়, আপনি দর্শন করিতে গেলেন না।" তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমার দর্শন হয়েছে"। আমি অবাকবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলাম "বাঃ! আপনি তো এই এলেন—কখন দর্শন করতে গেলেন?" তিনি মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন, "সিদ্ধেশ্বরীতলায়।" আমি উত্তর করিলাম, "মা তো কোথাও যান নি; আমি তো গত কাল থেকে এখানে আছি।" তিনি শুধু বলিলেন "আমার সেখানে দর্শন হয়েছে।" তাই বলিয়া শুধু গুন্‌গুন্ স্বরে গাহিতে লাগিলেন:

মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে!
ইহকালে পরকালে মা তারে আনন্দে রাখে॥
সদানন্দময়ী তারা, সদানন্দের মনোহরা
এই মিনতি করি মাগো, ওই রাঙা পায়ে মতি থাকে॥

'শ্রীম'র এই দর্শনের ঘটনাটি ছাত্রজীবনে মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল—বাস্তবিকই চিন্ময়ী রূপকে আমরা জড়রূপে ভাবিয়া থাকি। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার শ্রীকেশবচন্দ্রকে শ্রীদুর্গা-প্রতিমার কথায় বলিয়াছিলেন "কেশব, তোমরা প্রচার কর—ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, কিন্তু দুর্গা-প্রতিমা দেখে তোমাদের বাঁশ খড় মনে হয় কেন? সেখানে কেন চিন্ময়ী মাকে দেখ না?" বাস্তবিকই আমরা আধুনিকেরা দুর্গা-মূর্তির ধ্যান-অনুযায়ী মূর্তি গড়ি না—শিল্পকলার রুচি লইয়া আমরা দেবীকে মানবী আকারে পরিণত করিয়া মূর্তি গড়ি—কখনও কখনও কোন মূর্তি দেখিয়া মনে হয়—এ তো মায়ের দেবীমূর্তি নয়। পূজক যে ধ্যানমূর্তি সহায়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে—সেই ধ্যানের সঙ্গে প্রতিমার মিল নাই। শিল্প হিসাবে, আধুনিক কলা হিসাবে গঠিত মূর্তির নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য থাকিতে পারে—সেটা শিল্পীর কল্পনার সৃষ্টি—ঋষির ধ্যানমূর্তি নয়; পূজকের ধ্যানমূর্তি নয়। কিন্তু কালের ঘূর্ণিপাকে সেই ধ্যানী পূজকেরও অভাব; দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে

বক্তব্য, এই পূজাপার্বণে দেববিগ্রহে মূর্তি প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধমহাজন বা শাস্ত্রোক্ত ধ্যানানুযায়ী মূর্তি না হইলে পূজার কি অঙ্গহানি হয় না? ক্রমশঃ আমরা শিল্পের দোহাই দিয়া সাধনার ধ্যান-মূর্তি হইতে বিচ্যুত হইতেছি এবং পূজামণ্ডপে অধ্যাত্ম সাধনার পরিবর্তে বাহ্যকৌতুকের আড়ম্বরে মাতিয়া উঠিতেছি।

ভারতে মায়ের এই মাতৃমূর্তি স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা জোগাইয়াছে। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি জননী জন্মভূমির এই মাতৃমূর্তি শ্রীদুর্গা প্রতিমার ধ্যানে পর্যবসিত করিয়াছেন।

'ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্॥'

'কমলাকান্তের দপ্তরে' কমলাকান্তের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের অন্তরের কথাই বলিয়াছেন।

"এই কি মা? হাঁ—এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি, এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা, এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশদিকে প্রসারিত। তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত-বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব। দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ-প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়—কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। আমি সেই কালস্রোতে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।" আজ স্বাধীন ভারতে সার্বজনীন দুর্গামণ্ডপে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মায়ের পূজা বাংলার বালক যুবকদের দ্বারা কি রূপায়িত—প্রচারিত হইতে পারে না? কিন্তু এই সকল প্রেরণার মূল উৎস—ধর্ম। দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেম, মানব-সেবা, আত্মোন্নতি, ঐক্য-বুদ্ধি ও উদারতা এই ধর্মের অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—"ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব জাতির চরম সভ্যতা—ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছু উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে—সমস্ত স্বীকার করিয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হইবে।"

বাংলায় দুর্গোৎসব—বাঙালীর ধর্মের প্রেরণা—জাতীয়তায় প্রেরণা, আত্মজ্ঞানের চরম সাধনা! বাঙালীর রক্তমাংসে ইহার ভাব জড়াইয়া আছে। শবর প্রভৃতি বন্য জাতির উৎসব—ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার ভাবধারা ও উপাসনা—বাংলার সকল শ্রেণীর মানুষের সম্বন্ধ এই মহোৎসবে মহামায়ার পূজার অঙ্গীভূত—কেহ বাদ পড়ে নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে—প্রথম দুর্গোৎসব—প্রতিমায় পূজা করিয়া বাঙালীকে আধ্যাত্মিক জাতীয় উৎসবে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রশান্ত ভাবতন্ময়তা—সেই আনন্দ-মূর্তি দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। ১৩৬১ সালের 'উদ্বোধন' শারদীয়া সংখ্যায় উহা প্রকাশিত।

আজ দুর্গোৎসবে আমাদের প্রধান সাধনা সকলকে পরমাত্মীয় ভ্রাতৃজ্ঞানে অকপটে ভালবাসা। আমরা সকলেই শ্রীশ্রীমহামায়ার সন্তান—শুধু—ইহা মুখের একটা কথার কথা নয়—দৃষ্টান্তদ্বারা—সেবায় ব্যবহারে বাস্তবে তাহা দেখাইতে হইবে। যুগ-পরিবর্তনে ভাবের পরিবর্তন আসিবেই—অতীত কখনও ফিরিয়া আসে না. কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যাহাতে গৌরবমণ্ডিত হয়, তাহা করিতে হইবে—ঐ শোন, স্বামিজীর মেঘগম্ভীর স্বরে উদাত্ত আহ্বান—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"!

'মহাবিদ্যা মহামায়া'

[চণ্ডীর কথকতা-অবলম্বনে]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ চরাচর কারণ-সলিলে নিমগ্ন হ'লে ভগবান বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। সেই সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমল হ'তে মধু ও কৈটভ নামে অতি ভীষণাকার ও ভয়ানক দুর্ধর্ষ দুটি দৈত্য উৎপন্ন হয়। অখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা চারিদিক জলময় দেখে সৃষ্টির বীজসম্ভার নিয়ে বিষ্ণুর নাভি-কমলে অবস্থান করছিলেন।

মধু ও কৈটভ ব্রহ্মাকে দর্শনমাত্রই দারুণ ক্রোধ-ভরে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। প্রজাপতি এই মহা বিপদে ভাবতে লাগলেন: জগৎপাতা জনার্দন যোগ-নিদ্রায় অভিভূত। সুতরাং এই বিষম সঙ্কটে কে তাঁকে পরিত্রাণ করবেন? তিনি নিহত হ'লে প্রলয়শেষে সৃষ্টির নবকল্পারম্ভই বা কে করবে? তা ছাড়া, মহামায়ার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের লীলাও যে ব্যাহত হয়ে যাবে;—তাই প্রজাপতি ভয়ানক শঙ্কিত ও বিচলিত হলেন।

বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মহামায়া যোগনিদ্রা নারায়ণের নয়ন-কমল আশ্রয় ক'রে রয়েছেন। সেই অতুলা তামসী শক্তির অমোঘ প্রভাবেই বিষ্ণুর এই যোগনিদ্রা। সুতরাং ব্রহ্মা তখন বিষ্ণুর জাগরণের জন্য ভগবতী যোগনিদ্রার আরাধনা আরম্ভ করলেন। প্রজাপতি ভক্তিবিনম্র-ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে সুললিত ছন্দোবদ্ধ বাক্যে দেবীর স্তুতি বন্দনা করতে লাগলেন:

'মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥'

হে দেবি, তুমি মহাবিদ্যা—মহাবাক্যলক্ষণা ব্রহ্ম-বিদ্যারূপা, আবার তুমিই মহামায়া—সংসৃতি-কারিণী মহা অবিদ্যাস্বরূপা। তুমি মহামেধা—মহতী স্মৃতিরূপা, আবার তুমিই মহা অস্মৃতি—মহতী ভ্রান্তি বিস্মৃতিস্বরূপা। তুমি মহামোহা—ব্যাপক অজ্ঞানরূপা। তুমি মহাদেবী—মহতী দেবশক্তি, আবার তুমিই মহা অসুরী—মহতী অসুরশক্তি।

ব্রহ্মার এই স্তবে অনন্ত মহিমময়ী মহামায়ার একই সঙ্গে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব পরিকীর্তিত হয়েছে। বস্তুতঃ তিনি একাধারে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবরাশির এক অনবদ্য সমন্বয়-মূর্তি। রুদ্র-মধুরে, কোমল-কঠোরে সত্যই তিনি অনুপমা, অপরূপা।

নিঃস্ব সর্বহারা সুরথরাজা ও সমাধিবৈশ্য সংসারের দোষ দর্শন করেও তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন কেন—সংসার-স্থিতিকারী এই মায়া-মোহের কারণ অবগত হবার জন্য মহামুনি মেধসের শরণাপন্ন। সুরথ অগ্রণী হ'য়ে অতিশয় বিনীত ভাবে মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করলেন: জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা মূঢ়ের মত মায়া-মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছি। স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ ও রাজ্যাদি বিষয়ের দোষ দেখেও কেন এখনও আমাদের চিত্ত মমতাকৃষ্ট ও স্নেহাসক্ত?

মেধসমুনি তদুত্তরে তাঁদের বললেন: শাস্ত্র-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মানুষ মহামায়ার প্রভাবে মোহ-গর্তে ও মায়ার আবর্তে পতিত হ'য়ে অহরহঃ হাবুডুবু খাচ্ছে। মহামায়া—তাঁর আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবেই জগতের সকল জীবকে মায়ায় আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন, এমনকি বিবেকিগণেরও চিত্তকে তিনি বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহাবৃত করেন। এই মহামায়াই—তমঃপ্রধানা শক্তিই জগৎ-পাতা বিষ্ণুর যোগনিদ্রা; তাই তিনি তাঁকেও প্রলয়কালে মোহে আচ্ছন্ন করে রাখেন।

বন্ধন ও মুক্তি—উভয়েরই কর্ত্রী তিনি। তিনি

ইচ্ছাময়ী, লীলাময়ী। তিনিই অবিদ্যা-শক্তিরূপে বন্ধনকারিণী মহামায়া, আবার তিনিই বিদ্যা-শক্তি-রূপে মোক্ষদা বা মুক্তিদাত্রী, মহাবিদ্যা। তাঁর নিত্যলীলায় তিনি এই জগৎসংসার রচনা করেছেন এবং জগৎকে বিমুগ্ধ করে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের খেলা করছেন।

'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥'

তিনিই সংসারমুক্তির হেতু—পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী, আবার তিনিই ঘোর সংসারবন্ধনের কারণ—মহা অবিদ্যা-রূপিণী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—'সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে,—অবিদ্যা, যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন—মুগ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম—ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।'

আদ্যাশক্তি মহামায়াই সমস্ত জগতের মূলাধার। তিনি সনাতনী নিত্যা জগন্মূর্তি। এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ তিনিই ধারণ করেছেন। তিনি সর্বগতা এবং সর্বতোব্যাপ্তা হ'য়ে বিরাজ করছেন। তাঁর অস্তিত্ব বাদ দিয়ে চরাচর জগতের কোনও বস্তুরই পৃথক্ সত্তা নেই। বস্তুতঃ তিনি সর্বত্র এবং সর্বক্ষণ ওতপ্রোতভাবে বিরাজিতা। কিন্তু তথাপি তিনি দেবগণের কার্যসিদ্ধি ও বিশ্বজগতের পরি-পালনের নিমিত্ত মহাসঙ্কটময়কালে সমুৎপন্না হ'য়ে থাকেন।

মহামায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এঁদেরও নিয়ন্ত্রী বা ঈশ্বরী। তিনিই এই নিখিল বিশ্বচরাচর সৃজন, পালন ও সংহার করেন।

'ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥'

একাধারে তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী। আমরা মায়েদের সন্তান প্রসব ও পালন-কার্য দেখে জগজ্জননীর সৃজন- ও পালন-লীলার কিঞ্চিৎ ধারণা করতে পারি। কিন্তু তাঁর সংহার-লীলার কথা ভাবতে গেলে স্বভাবতই আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মাতা হ'য়ে তাঁর নিজের সৃষ্ট ও পালিত সন্তানকে তিনি কিরূপে সংহার বা বিনাশ করেন তা কল্পনাও করা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে জগন্মাতার সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের লীলা দিব্য নেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন—এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী-মূর্তি গঙ্গাগর্ভ হ'তে উত্থিতা হ'য়ে ধীরে ধীরে পঞ্চবটীতে আগমন করলেন। ক্রমে দেখলেন ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা। পরে দেখলেন ঐ রমণী তাঁর সম্মুখেই এক অতি সুন্দর কুমার প্রসব ক'রে গভীর স্নেহে ঐ শিশুকে স্তন্যদান করছেন। পরক্ষণেই তিনি দেখলেন ঐ নারী কঠোর করালবদনা হ'য়ে ঐ শিশুকে গ্রাস ক'রে পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হ'লেন।

মহামায়ার এই নিত্যলীলা গভীরভাবে অনুধ্যান করলে বোধ হয় যে, সৃজন পালন বা সংহরণ কোনটিতেই তিনি আসক্তা নন। তিনি মহামায়া, মহামোহা; কিন্তু তিনি নিজে কখনও মায়ামোহে বিমুগ্ধা নন। যেরূপ সর্প নিজ মুখের বিষ দ্বারা অন্যের জীবন বিনাশ করে, কিন্তু সে নিজের বিষে কখনও মরে না। মহামায়া অবলীলাক্রমে নিরন্তর তাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার লীলা করছেন।

অসুররাজ শুম্ভ যখন মহামায়া চণ্ডিকাকে বলল—'তুমি বলেছিলে, যে তোমায় সংগ্রামে পরাজিত করবে, যে তোমার দর্প চূর্ণ করবে, যে তোমার তুল্য বলশালী, তুমি তাকেই তোমার পতিরূপে বরণ করবে। কিন্তু হে চণ্ডিকে, তুমি ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা প্রমুখ দেবশক্তি মাতৃকাগণের সাহায্যে সংগ্রাম করছ; তুমি তাদেরই সাহায্যে চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ প্রভৃতি প্রবল পরাক্রমশালী মহাসুরকে অগণিত সৈন্যসহ নিধন করেছ। হে দুর্গে, এতে তোমার

নিজের কৃতিত্ব কতখানি। তুমি অন্যের বল আশ্রয় ক'রে যুদ্ধ করছ। সুতরাং তোমার গর্ব করা শোভা পায় না।

মহামায়া তখন শুম্ভকে বললেন—'রে দুষ্ট, রে মূঢ়, একমাত্র আমিই এ জগতে বিরাজিতা। আমা-ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেউ আমায় সাহায্য করার নেই। ব্রাহ্মী প্রমুখ এই অষ্টমাতৃকা আমারই বিভূতি, আমারই প্রকাশ, আমারই অভিন্নাশক্তি। এই দেখ্, তাঁরা এখনি সব আমাতে বিলীনা হ'য়ে যাচ্ছেন।' অতঃপর মহামায়া চণ্ডিকা ঐ মাতৃকাগণকে অবলীলাক্রমে নিজ মধ্যে সংহরণ বা বিলীন ক'রে নিলেন। তিনি তখন একাকিনীই রইলেন। যে সকল বিভূতি বা শক্তিকে তিনি বাহিরে বিস্তার ক'রে লীলা করছিলেন, তখন তিনি সে সকলকে অক্লেশে আত্মদেহে সংহরণ ক'রে নিলেন, গুটিয়ে নিলেন। সুতরাং এই 'সংহার' তাঁর অতি স্বাভাবিক লীলা।

শরণাগত ভক্তসন্তানগণের প্রতি প্রসন্না হ'য়ে তিনি বরদায়িনী হন, সর্বার্থসাধিকা হন; তখন তাঁরই বরে তাঁদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং তাঁরা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করেন। তাই দেবীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তাঁর অভয় চরণকমলে দেবগণের বারংবার কত কাতর প্রার্থনা, কত ব্যাকুল বিনতি—'হে দুঃখভয়হারিণী দেবি, তুমি প্রসন্না হও, হে অখিলবিশ্বজননি, তুমি প্রসন্না হও। হে দেবি, তুমি নিখিল বিশ্বচরাচরের অধীশ্বরী, তুমি বিশ্ব পরিপালন কর। হে বিশ্বার্তিহারিণী দেবি, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও। হে ত্রিভুবনবাসিগণের চির-আরাধ্যা দেবি, তোমার চরণে প্রণত জনগণের প্রতি তুমি বরদা হও। হে জননি ভগবতি, তুমি প্রসন্না হও। হে ভক্ত-বৎসলে, তুমি প্রসন্না হও। হে দেবি, তুমি কৃপা কর।'

অসুরাধিপতি মহিষাসুরকে নিধন ক'রে মহামায়া দেবগণকে পরিত্রাণ করলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভরে দেবীর স্তব-বন্দনা করেন। সুরগণ দেবীর অপার-মহিমা-কীর্তন-প্রসঙ্গে স্তুতি করেন:

'কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥'

হে দেবি, তোমার পরাক্রমের তুলনা আর কার সঙ্গে হ'তে পারে! তোমার রূপ শত্রুগণের নিকট অতিশয় ভীতিকারী অথচ অমরগণের নিকট সুমনোহর। এমন আর কোথায় আছে? হে বরদে, চিত্তে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং সমরে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা, ত্রিভুবনে একমাত্র তোমাতেই দৃষ্ট হয়।

মহামায়া দুর্বৃত্তগণের শাস্তিবিধানে যেরূপ সক্রিয়া, আশ্রিতগণের কল্যাণসাধনে সেইরূপই যত্নশীলা। তাঁতে সৃষ্টি-স্থিতিকারিণী সৌম্যরূপ এবং সংহারকারিণী রুদ্ররূপ একই সঙ্গে বিরাজিত। এই জন্য তিনি সৌম্য হ'তেও সৌম্যতরা, আবার ভীষণ হ'তেও ভীষণতরা। তিনি যেমন শুভঙ্করী, তেমনই ভয়ঙ্করী। একদিকে তিনি বরাভয়করা, অন্যদিকে তিনি অসি-মুণ্ডধরা।

মহাবিদ্যা-রূপে তিনি অতি সৌম্যা সুমনোহরা, মহা-অবিদ্যা-রূপে তিনিই অতি রৌদ্রা সুভীষণা। বিদ্যাশক্তিতে পুণ্যবান্‌দিগের গৃহে তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা, অবিদ্যা শক্তিতে তিনিই পাপাত্মাগণের গৃহে অলক্ষ্মীরূপা। পরিতুষ্টা হ'লে তিনি সকলপ্রকার দৈহিক ও মানসিক রোগ দূর করেন। কিন্তু রুষ্টা হ'লে তিনি সকল অভীষ্ট বিনষ্ট করেন। বস্তুতঃ মানবগণকে সকল ঐহিক বিদ্যায়, প্রবৃত্তিপর ধর্মশাস্ত্রসমূহে এবং নিবৃত্তিপর বেদান্তবাক্যসমূহে তিনিই প্রবর্তিত করেন। আবার গভীর অন্ধকাররূপ অজ্ঞান-আবর্তে ও মমতাপূর্ণ সংসার-গর্তে তিনিই পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করান। ভোগ এবং অপবর্গ, সংসার এবং মুক্তি—দুই-ই তাঁর ইচ্ছাধীন।

জননী বিরাটরূপিণী

স্বামী জীবানন্দ

সমষ্টির অস্তিত্ব ব্যষ্টির উপরেই নির্ভর করে। ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি। একটি একটি মানুষ নিয়ে মানব-সমাজ। উচ্চ-নীচ, ধনী দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, সুন্দর-কুৎসিত, বালক-বৃদ্ধ সবই রয়েছে মানব-সমাজে। আকৃতি-প্রকৃতি বল-বুদ্ধি সাহস-বীর্য সবেতেই দেখা যায় কত পার্থক্য। নানা প্রকার বৃক্ষ নিয়ে বনানী। অগণিত ছোট বড় তরঙ্গের সমষ্টিই তো সমুদ্র। প্রকৃতির সর্বত্রই বৈচিত্র্য—রূপে নামে। বিচিত্রতার মূলে নাম ও রূপ। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও মহা ঐক্য আছে। সে ঐক্য স্বরূপের একত্ব। নাম ও রূপ বাদ দিয়ে যদি চিন্তা করা যায়, যা থাকে তাই আমাদের স্বরূপ—সৎ-চিৎ-আনন্দ। সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন:

ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না, সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না, আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে বা শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, যখন তিনি এই সব কার্য করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি।

একই মহাশক্তি সর্বত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম্—এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত হ'য়ে রয়েছেন। আমাদের শরীরে যেমন অসংখ্য জীবকোষ রয়েছে—সেইরূপ সমুদয় জীব ও জড় জগৎ বিরাজিত রয়েছে সেই বিরাটের শরীরে। যেখানে যত শক্তির প্রকাশ, যত শক্তির খেলা তিনি তার অধিষ্ঠাত্রী, সমষ্টিরূপিণী। প্রাণরূপে, বুদ্ধিরূপে, দয়া-প্রেমরূপে নানা ভাবে তিনি বিরাজিতা। দেশ-কাল-নিমিত্তরূপা মহা-শক্তিই বিরাটরূপিণী জগজ্জননী।

সকলের মধ্যে আছেন জগন্মাতা, তা হ'লে সকলের সেবাই জগজ্জননীর সেবা। তাই সর্বভূতের—সর্বপ্রাণীর সেবাই বিরাটরূপিণী জননীর উপাসনা।

প্রকৃতিতে বিবিধ উপচারে নানা সৌন্দর্য-সম্ভারে—রূপে রসে রঙে, ছন্দে গানে—অপরূপভাবে তাঁর পূজা চলেছে। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র, আকাশ বাতাস, নদ-নদী বৃক্ষলতা—সকলেই এই বিরাটরূপিণী মহামায়ার উপাসক। আলোয় জলে ফুলে ফলে এই উপাসনা।

সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ এই পূজা করবে কি ভাবে? প্রধানতঃ তার পূজা হবে মানুষেরই সেবার মধ্য দিয়ে। আমাদের চারদিকে রয়েছে দারিদ্র্যপীড়িত অজ্ঞ, দুঃস্থ, রোগগ্রস্ত, গৃহহীন নিরন্ন মানুষ—তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাদের সেবাকে মহামায়ারই পূজারূপে ভাবনা করতে হবে।

বিরাটরূপিণী জননীর পূজা ভাবের পূজা। এই পূজা বাহিরের পঞ্চ বা ষোড়শোপচারে নয়—আন্তর উপচারে এই উপাসনা। সবই উৎসর্গীকৃত হবে অন্তরে, অন্তরেরই গুণসম্ভারে। ভাবরূপ পুষ্পের অঞ্জলি; এই পুষ্পগুলি: অমায়, অনহংকার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য, অলোভ; আরও পাঁচটি মহা-পুষ্প—অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান। আসল

পুষ্প চিত্ত—সেটি মায়ের চরণে উৎসর্গ করতে হবে; সন্তান যে জন্ম হ'তেই 'মায়ের জন্ম বলিপ্রদত্ত'!

যখন আমরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে জনসেবার মাধ্যমে জননীর উপাসনায় ব্রতী হব তখন যেন অনাসক্ত হ'য়ে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারি; আসক্তিই আনে বন্ধন; তাই অহংকার, রাগ, দ্বেষ, মাৎসর্য ও লোভশূন্য হ'য়ে আমরা করব সকলের সেবা—বিরাটরূপিণীর উপাসনা। হয়তো সফলতা দেখা যাবে না অনেক সময়, তবু চিত্তে ক্ষোভ যেন না আসে। পীড়নে অনিচ্ছা, সংযম, করুণা ও ক্ষমা—আমাদের পাথেয়। প্রকৃত সেবার ভাব নিয়ে যিনি কর্ম করবেন তিনিই বলতে পারবেন: 'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্'—তিনি লাভে অলাভে, জয়ে পরাজয়ে সমভাব—তাঁর সকল কর্মই উপাসনা! জনসাধারণের দারিদ্র্য-নিবারণ, অজ্ঞতা-দূরীকরণ, রোগপরিচর্যা প্রভৃতির মাধ্যমে জগজ্জননীর ঠিক ঠিক উপাসনা অত্যন্ত কঠিন।

মহামায়ার বিরাট রূপকেই হৃদয়ে সতত ধ্যান করেন মাতৃসাধক। বিশ্বজগৎ জুড়ে তাঁর পূজার উপচার: আকাশ তাঁর বস্ত্র, প্রাণবায়ু ধূপ, বিশ্বের সমস্ত তেজ তাঁর আরতির প্রদীপ, যাবতীয় শব্দ তাঁর স্তুতিগান,—তিনি মৃন্ময়ী অধিষ্ঠানে কি ভাবে আবির্ভূতা হ'তে পারেন—সত্যই অচিন্তনীয়। মহামায়ার সঙ্গে সকলের এবং সবকিছুরই নিত্য সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধবলেই জগৎ 'অস্তি'রূপে প্রতীত হয়, তাই যাঁর বাহিরে কিছুই নেই এবং যিনি ছাড়া আর কিছু নেই, তাঁর যে কোন আধারেই পূজা হ'তে পারে। আধারে উপাসনার নাম প্রতীকো-পাসনা। প্রতীক অর্থে অবয়ব—যিনি সর্বব্যাপক তাঁর একটি অংশকে অবলম্বন ক'রে সাধক অচিন্ত্য অব্যক্ত ভাবের সন্ধান পান। তাই মৃন্ময়ী, পাষাণ-ময়ী, দারুময়ী মূর্তিতেও চিন্ময়ীভাবে পূজিতা হ'য়ে জগজ্জননী সন্তানের উপর কৃপা বর্ষণ করেন। যুগে যুগে মাতৃসাধকগণ 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'কে মনোজগতে যে যে রূপে ধরতে পেরেছেন সেই সব রূপই পরবর্তী সাধকদের আরাধ্য দেবতা। মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী, দশ মহাবিদ্যা, নবদুর্গা প্রভৃতি আদ্যাশক্তি মহামায়ারই বিশেষ বিশেষ রূপ। আবার মহামায়া যখন মানবীরূপে লীলায় অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর চরণাশ্রয়ে অগণিত নরনারী দুঃখের পারে চলে যায়।

শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে মা ছাড়া আর কি আছে? সকল আশায়, সকল চেষ্টায়, সকল কর্মে—সাফল্যে ও ব্যর্থতায় মায়েরই খেলা! মাকে চিন্তা করতে পারলে ভাবনার কিছুই থাকে না। মা-ই সন্তানের একমাত্র ভরসা। মায়া থেকে মুক্তিলাভ মানুষের পরম পুরুষার্থ—মাকে আশ্রয় করতে পারলেই তা সম্ভব হয়। কেনোপনিষদে আছে, দেবতারা একে একে যখন পরব্রহ্মের সম্মুখীন হ'য়ে, তাঁকে চিনতে অসমর্থ হ'য়ে ফিরে এলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন ব্রহ্মময়ী মহামায়া—বহুশোভমানা হৈমবতী উমারূপে; ইনিই তাঁকে চিনিয়ে দিলেন যে, বিচিত্র রহস্যময় 'যক্ষ'—যিনি তাঁদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করেছেন তিনিই ব্রহ্ম। মাতৃরূপে তিনি যখন মায়ার আবরণ উন্মোচন করেন তখনই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। চিন্ময়ীশক্তি সকল প্রাণীর মধ্যে থেকে তাদের যেমন চালাচ্ছেন তারা সেই রকম চলছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কার হাতের ক্রীড়নক তারা—অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে! ফুটন্ত জলে আলু-পটলের মত লাফাচ্ছে—অহংকারে বিমূঢ়চিত্ত হ'য়ে নিজেদের কর্তা ও ভোক্তা ব'লে মনে করছে। আলু-পটলের লাফানোর কারণ যেমন অগ্নির শক্তি, সেইরূপ সকল ক্রিয়াশীলতার অন্তরালে অচিন্ত্য মহাশক্তি। গুণাতীতা মহামায়া যখন গুণময়ী হ'য়ে ব্যষ্টিরূপে সাধকের নিকট আবির্ভূত হন, তখন সাধক নিজের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র তাঁর বিরাট ভাবটি উপলব্ধি ক'রে পরম জ্ঞান ও পরম আনন্দ লাভ করেন। 'তস্মাৎ পরৈব জননী সমুপাসনীয়া'।

শ্রীশ্রীসারদামণিদেবীর স্বরূপরহস্য

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন :

'দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে'

পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দ লিখিয়াছেন : 'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে ? ঐশ্বর্যের লেশ নাই। একি মহাশক্তি ! জয় মা ! জয় মা !! জয় শক্তিময়ী মা !!!"

পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ প্রণাম-মন্ত্রে বলিতেছেন :

'যথাগ্নের্দাহিকা-শক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥'

—যেরূপ অগ্নির দাহিকা-শক্তি সেইরূপ রামকৃষ্ণে স্থিতা সর্ববিদ্যাস্বরূপা যে সারদা তাঁহাকে প্রণাম করি।

পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ স্তব করিয়াছেন :

'প্রকৃতিং পরমাম্ অভয়াং বরদাম্'

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন :

"ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।"

"ও জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী, ও কি যে সে ! ও আমার শক্তি।"

এই সকল উক্তির মধ্য দিয়া অজ্ঞানান্ধ জীব আমরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত পাই। শ্রীশ্রীমাও বিভিন্ন সময়ে ভক্তদের নিকট নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা ভাবে বলিয়াছেন। শিবুদাকে বলিয়াছিলেন, 'লোকে বলে কালী'। স্বামী তন্ময়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, "আমি আর কে ? আমিও ভগবতী"।

* * *

শ্রীশ্রীমার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক ষোড়শীরূপে পূজিতা হওয়া। বহু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সাধক-জীবনের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন এই পূজার দ্বারা। সাধনার ফল, জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীর পাদপদ্মে চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন "মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল।"

পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতি-সকলের মধ্য দিয়া আমরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যে জগন্মাতার মানববিগ্রহ—তাহা ধারণা করিতে পারি। তাঁহার জীবনে যে সকল লোকোত্তর সদ্‌গুণাবলীর প্রকাশ দেখি তাহা হইতে ইহা বেশ বুঝা যায় যে তাঁহার 'জন্মকর্ম' দিব্যভাবানুষঙ্গী। 'ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ'—তাঁহার জীবনের প্রভাতরলদ্যুতি এই মর-জগতের ধূলি-মলিনতা-সমুদ্ভূত নয়। শ্রীশ্রীমার জীবনের এই রহস্য বুঝিতে হইলে তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

তন্ত্র বলেন, এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মূলে আছেন মহাশক্তি মহামায়া।

চণ্ডীতেও ব্রহ্মা স্তুতি করিতেছেন :

দেবি, তুমিই এই সমস্ত ধারণ করিয়া আছ, তুমিই এই জগৎ সৃষ্টি কর, তুমিই ইহা পালন কর এবং সর্বদা প্রলয়কালে তুমিই ইহা সংহার কর।

দেবী ভাগবতেও কথিত হইয়াছে :

শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্॥

—শক্তিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তিনি অখিলকে পালন করেন এবং ইনিই ইচ্ছাদ্বারা এই চরাচর জগৎ সংহরণ করেন।

এই যে শক্তির ধারণা—এটি তন্ত্রের ধারণা। তন্ত্র বলেন, এই জগৎ এক মহাশক্তির প্রকাশ।

কিন্তু এই শক্তি কে ? এই প্রশ্নই সুরথ রাজা মেধা ঋষিকে করিয়াছিলেন :

'ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥'
—ভগবন্, যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? মুনিবর, তিনি কিরূপে উৎপন্না হন এবং তাঁহার কার্যই বা কি?

ইহার উত্তরে মেধা মুনি বলিতেছেন: 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।'—সেই মহামায়া নিত্যা এবং বিশ্বরূপা, তাঁহার দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত।

এই দৃষ্টিই তন্ত্রের বিশেষ দৃষ্টি। বেদান্তের মায়ার ন্যায় এই মহামায়া জ্ঞানবাধিতা নন—তিনি নিত্যা; শিবতত্ত্ব আর শক্তিতত্ত্ব নিত্যযুক্ত; শক্তি শিবের সহিত সন্তত-সমবায়িনী।

তন্ত্রের মতে শক্তির কৃপা-ব্যতিরেকে মুক্তি সম্ভব নয়। চণ্ডীতেও এই কথাই বলা হইয়াছে। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—তিনি প্রসন্না ও বরদা হইয়া মানবের মুক্তির কারণ হন। ভাস্কর রায় বলিয়াছেন "ন চ—মোচনস্য শিবকার্যত্বাৎ কথং তত্র দেব্যাঃ কর্তৃত্বম্?—ইতি বাচ্যম্, মোচকত্ব-শক্তিমন্তরেণ শিবস্য তদ্‌যোগেন মোচকর্তৃতায়া অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং শক্তাবেব স্বীকর্তুং যুক্তত্বাৎ"—মুক্তি শিবের কার্য বলিয়া সেই বিষয়ে দেবীর কর্তৃত্ব কেন হইবে, ইহা বলা ঠিক নয়; মোচকত্বরূপ শক্তি না থাকিলে শিবের উহা থাকিতে পারে না বলিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক ন্যায়ানুসারে শক্তির মোচনকর্তৃত্ব স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। সেইজন্যই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে 'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী'—তিনিই মুক্তির কারণস্বরূপা সনাতনী পরমা বিদ্যা।

এই যে সনাতনী বিদ্যা তিনি নিত্যা হইলেও তাঁহার বহুপ্রকারের সমুৎপত্তির কথা শ্রবণ করা যায়। তাই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে:

দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

যখন তিনি দেবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য আবির্ভূতা হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি পৃথিবীতে উৎপন্না হইলেন—এইরূপে অভিহিতা হন।

অবতারগণের সহিত তাঁহাদের লীলাসঙ্গিনী শক্তির আবির্ভাব যুগে যুগে ঘটিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতার, শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধিকার, শ্রীবুদ্ধের সহিত যশোধরার, শ্রীচৈতন্যের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাব সেই মহাশক্তিরই অবতরণ। লীলা-সঙ্গিনীদের আবির্ভাব-ব্যতিরেকে অবতারদিগের লীলা সার্থকতা ও পরিপুষ্টি লাভ করিত না।

এই দৃষ্টি শাস্ত্রবহির্ভূত নয়। লিঙ্গপুরাণে পাই:

শঙ্করঃ পুরুষাঃ সর্বে স্ত্রিয়ঃ সর্বা মহেশ্বরী।
পুংলিঙ্গশব্দবাচ্যা যে তে চ রুদ্রা প্রকীর্তিতাঃ॥
স্ত্রীলিঙ্গশব্দবাচ্যা যাঃ সর্বা গৌর্যা বিভূতয়ঃ।
এবং স্ত্রীপুরুষাঃ প্রোক্তাস্তয়োরেব বিভূতয়ঃ॥

—সকল পুরুষই শঙ্কর এবং সকল স্ত্রীই মহেশ্বরী। পুংলিঙ্গ শব্দবাচ্য যাঁহারা, তাঁহারা রুদ্র। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দবাচ্য সব কিছুই গৌরীর বিভূতি। এইরূপে স্ত্রীপুরুষ সকলেই মহেশ্বর মহেশ্বরীরই বিভূতি।

এইরূপে জগতের সব কিছু শঙ্কর-শঙ্করীর প্রকাশ হইলেও এই প্রকাশের তারতম্য আছে। এই তারতম্যকে অবলম্বন করিয়াই অবতার এবং সাধারণ জীবের প্রভেদ।

কিন্তু এই তারতম্য যে কেবলমাত্র অধিজাগতিক ক্ষেত্রে আছে তাহা নয়—অধ্যাত্মভূমিকাতেও এই প্রকাশ-তারতম্যের কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। কালী, তারা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ভেদে শক্তির বহু রূপ শাস্ত্রে উক্ত আছে। ইঁহারা সকলেই পরাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি। কিন্তু শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শী-বিদ্যা শক্তিদেবতার মধ্যে মুখ্যা বা প্রকৃতিস্বরূপা।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে 'ত্রিশতী' নামক স্তবে বলা হইয়াছে: 'মোক্ষৈকহেতুবিদ্যা তু শ্রীবিদ্যা নাত্র সংশয়ঃ', মোক্ষের একমাত্র কারণ শ্রীবিদ্যা,—ইহাতে কোন সংশয় নাই। বামকেশ্বরতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে:

ত্রিপুরা পরমা শক্তিরাদ্যা জ্ঞানাদিতঃ প্রিয়ে।
স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন ত্রৈলোক্যোৎপত্তি-মাতৃকা॥

হে প্রিয়ে, ত্রিপুরা অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা পরমাশক্তি। ইনি জ্ঞানের অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের আদি বলিয়া আদ্যা। ইনি স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের উৎপত্তির জনয়িত্রী।

পরশুরামকল্পসূত্রে বলা হইয়াছে, "ইয়মেব মহতী বিদ্যা সিংহাসনেশ্বরী সম্রাজ্ঞী"—ইনি শ্রেষ্ঠা বিদ্যা, পরশিব তাঁহার অধিষ্ঠান-ভূমি, ইনি সম্রাজ্ঞী অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ন্ত্রী। তাঁহার প্রধান সচিব শ্যামা অর্থাৎ কালী। কালী-সাধনা সমাপন করিয়া শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শীর উপাসনার বিধান কল্পসূত্রে দেওয়া হইয়াছে। কারণ—'প্রধানদ্বারা রাজপ্রসাদনং হি ন্যায্যম্'—প্রধান রাজপুরুষকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার দ্বারা রাজার প্রসন্নতা সম্পাদন করাই ন্যায়সঙ্গত।

কল্পসূত্রের এই দৃষ্টিতে যদি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্র-সাধনা আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণও কালী-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ষোড়শী-পূজা করিয়া তাঁহার সাধকজীবনের উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন; এবং যাঁহার দেহ-মনের উপাশ্রয়ে এই পূজা করা হইয়াছিল তিনি হইতেছেন শ্রীশ্রীসারদাদেবী। সুতরাং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মধ্যে যে শক্তির নিবাস তিনি যে শ্রীবিদ্যা—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবতার-বরিষ্ঠের লীলাসঙ্গিনীর দেহ ও মনকে আশ্রয় করিয়া যে শক্তির অবতরণ ঘটিয়াছিল তিনি 'মহতী বিদ্যা, সিংহাসনেশ্বরী, সম্রাজ্ঞী'। জগতের ধূলিমলিনতার মধ্যে শক্তির এত বিরাট অবতরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর ঘটে নাই।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে যে তাহা হইলে শ্রীশ্রীমাকে কখনও কালী, কখনও বগলা, কখনও সরস্বতী কেন বলা হইতেছে! ইহা কি সকল মাতৃশক্তিই পরমার্থতঃ এক বলিয়া? না, তাহা নয়। আদ্যা-শক্তি ত্রিপুরা জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়াময়ী। তাঁহার ত্রিকূট-মন্ত্রেও তিনটি তত্ত্ব আছে—বাগ্‌ভবকূট, শক্তিকূট ও কামরাজকূট। এই বাগ্‌ভবকূটই সরস্বতী, কামরাজকূট কালী এবং শক্তিকূট বগলা। ত্রিকূট-মন্ত্রের অধীশ্বরী দেবী ষোড়শীর—এই সকল দেবতাই অংশ বা বিভূতি। সুতরাং শ্রীসারদাদেবী এই ষোড়শীর মানববিগ্রহ বলিয়া তাঁহাকে কালী, সরস্বতী, বগলা, পরমাপ্রকৃতি প্রভৃতি সকল নামেই অভিহিত করা যায়।

আচার্যপ্রবর শঙ্কর অদ্বৈতমতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহে শ্রীচক্র স্থাপন এবং শ্রীবিদ্যার উপাসনা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। বিশ্ব-জননীর কৃপা-ব্যতিরেকে জ্ঞান বা মুক্তি সম্ভব নয় বলিয়াই বোধহয় তিনি ইহা করিয়াছিলেন। কাঞ্চীপুরের কামাক্ষীদেবীর মন্দিরেও শ্রীচক্রস্থাপন—শঙ্করাচার্য করিয়াছিলেন। এই দেবী পুরী-সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা। শ্রীরামকৃষ্ণও পুরী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। কাজেই তাঁহার ষোড়শীপূজা এই দিক হইতেও সমীচীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের ও পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সৌভাগ্যবশতঃ দেবী ষোড়শী এই সময়ে মানব-দেহাবলম্বনে প্রত্যক্ষভাবে পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহুদিন স্বহস্তে এই সঙ্ঘকে পরিচালিত করিয়াছিলেন ভারতের ও জগতের কল্যাণে।

এই আলোচনা হইতে আমাদের এই ধারণা দৃঢ় হইবে, শ্রীসারদামণিদেবী নামে যে মানবকন্যা এই জগতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন এবং যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক ষোড়শীরূপে পূজিতা হইয়াছিলেন, তিনি স্বরূপেও এই ষোড়শীদেবীই ছিলেন। অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে এই স্বরূপতত্ত্ব সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ফলহারিণী কালীপূজার দিন প্রতিমায় কালীপূজা না করিয়া অষ্টাদশবর্ষীয়া মানবীর দেহাবলম্বনে ষোড়শীপূজা করিয়াছিলেন।

যে বিরাট শক্তির অবতরণ শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে অবলম্বন করিয়া ঘটিয়াছে সেই শক্তির সম্বন্ধে আনন্দ-লহরীর একটি শ্লোকের অবতারণা করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি:

তনীয়াংসং পাংশুং তব চরণপঙ্কেরুহভবম্
বিরিঞ্চিঃ সঞ্চিন্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্।
বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেণ শিরসাং
হরঃ সংক্ষুদ্যৈনং ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিধিম্॥

জননি, ব্রহ্মা তোমার চরণপদ্মের অল্পমাত্র ধূলি লইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সেই জগৎকে সহস্র শিরের দ্বারা বিষ্ণু অনন্তরূপে কোনপ্রকারে বহন করিতেছেন, আর প্রলয়-সময়ে এই জগৎকে চূর্ণ করিয়া শিব ভস্মধারণবিধিতে বিভূতি লেপন করিতেছেন।

রাণী রাসমণি

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

গরীব ঘরের গোপন মণি, কাঁটার কেয়া, মকর ফুল,
গুণে স্বয়ং সরস্বতী, রূপে লক্ষ্মী সমতুল।
নতুন যুগের সত্যবতী, ব'লেই তোমায় আজ গণি,
বাঙালী আর বাংলা দেশের গরব তুমি রাসমণি।
আনুগত্যের দাসখতেতে নাম-লোভীরা এক কালে,
হ'ত যেমন 'রাজা, রাণী, রাজাধিরাজ' ফাঁকতালে,
তেমন রাণী হওনি তুমি, মান নহে সে—অসম্মান;
কর্ম তোমায় রাণী নামের সার্থকতা কর্‌ল দান।

"অর্থ সকল অনর্থ মূল"—এই বাণী যে সত্য নয়,
প্রমাণিত কর্‌ল তাহা তোমার দান ও কীর্তিচয়।
'ব্যবহারের দোষে গুণে ভালমন্দ'; তাই তোমার
'অর্থ' পরমার্থ-লাভের সহায় হ'ল বারংবার।
নিঃস্ব ও দীন কৃষাণ-মেয়ে, বিশ্বভরা তোমার দান
কালের দাবি ব্যর্থ ক'রে সগৌরবে বর্তমান
ঐ রয়েছে গঙ্গাতীরে মহাকালীর শ্রীমন্দির
পুণ্যকামীর বন্ধুসম বিন্ধ্যসম উচ্চশির।

উদয়-গিরির আড়াল হ'তে সূর্যসম শুভঙ্কর
উঠ্‌ল জেগে সেখান থেকে জ্ঞান-ভকতির যে ভাস্কর,
দীপ্তি তাহার উজল ক'রে তুল্‌ল সারা বিশ্ব-ধাম,
পুণ্য রামকৃষ্ণ-লীলার গোড়ায় লেখা তোমার নাম।
নরদেবের চরণধূলি পড়ল তোমার আঙিনায়,
সংশয়ীদের ভুল ভাঙিল পরিজ্ঞানের পূর্ণিমায়।
ভেদবাদীরা দেখ্‌ল চেয়ে 'গড়্-ভগবান্' ভিন্ন নয়,
সকল পথের, সকল মতের ঘট্‌ল শুভ সমন্বয়।

"জীবের মাঝে শিব বিরাজে" এ বিশ্বাসে তোমার মন
পূর্ণ ছিল কানায় কানায়,—মগ্ন ছিল অনুক্ষণ।
কাশী যেতে পথ দিয়ে তাই শুনলে যখন অকস্মাৎ
বাংলাদেশে অন্নহীনের দীন-দুখীদের আর্তনাদ,
বিশ্বনাথের পূজার কড়ি নিঃস্ব-হিতে করলে দান,
বিপন্নেরা শান্তি পেল নিরন্নেরা অন্নপান।
কাশী যেতে আর হ'ল না,—কাশীশ্বরীর কি নির্দেশ!
সেই তো এল তোমার কাছে, তীর্থ হ'ল বাংলাদেশ!

দশের হিতে ন্যায়ের পথে করলে কত রণোদ্যম,
দেখ্‌ল সেদিন জগদ্বাসী বঙ্গনারীর কি বিক্রম!
ভয় কারে কয় জানতে না তো, জয়ে বাধা হয়নি তাই,
জানতে শুধু "সত্যই শিব,"—সত্য যা তার ধ্বংস নাই।
হোক না স্বয়ং লাটবাহাদুর থাক না যতই শক্তি তাঁর
অধিকারে বাদ সাধিতে পারতো না যে কেউ তোমার।
শক্ত তোমার যুক্তি-বিচার পারতো না কেউ খণ্ডাতে,
ন্যায়ের দাবি আদায় ক'রে নিতে কড়ায় গণ্ডাতে।

অত্যাচার জানতে না তাই সইতে নাগো অত্যাচার,
অধীনতার সেই যুগেও স্বাধীন ছিলে সত্যিকার।
রাণী নামের দায়িত্ব কি, ভোলনি তা' ক্ষণ-তরে,
পরোপকার পরপ্রীতি ঢেউ খেলিত অন্তরে।
মরেও তুমি তাই মরোনি, রাণীর মতই গৌরবে
সকল ধরা আকুল ক'রে জয়-মহিমার সৌরভে
বেঁচে আছ আজও ভবে,—কীর্তিমতীর মৃত্যু নাই;
লক্ষ কোটি মানব-মনের মাঝখানে তাই তোমার ঠাঁই।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

স্বামী তেজসানন্দ

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই সেই প্রাচীন ভূমি, অন্যান্য দেশে যাইবার পূর্বেই ব্রহ্মবিদ্যা যে-দেশকে নিজ প্রিয় বাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন; এই সেই ভারতবর্ষ, যাহার আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগরসদৃশ প্রবহমান স্রোতস্বতীসমূহের তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া তুষারশিখররাজিদ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্য-নিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই সেই ভারত, যে ভারত-ভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ ঋষি-মুনিগণের চরণরজে পবিত্র হইয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎপ্রপঞ্চে ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব! ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শ সকল এখানেই চরম পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার তদ্রূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে।"

ভারতের এই সমুন্নত সাংস্কৃতিক জীবন একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। অশ্রুত ও অদৃশ্য নৈশ-শিশির-সম্পাতে রাশি রাশি গোলাপ-কলি যেমন অলক্ষিতে প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি যুগে যুগে মহামানবগণের অক্লান্ত নীরব সাধনা ভারতের এই আধ্যাত্মিক, তথা সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগের আর্য-ঋষিকণ্ঠে বহুত্বের মধ্যে যে একত্বের বাণী একদিন ধ্বনিত হইয়াছিল, জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ যে নৈতিক ধর্মকে জীবনের মুক্তিমন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, রামায়ণ-মহাভারতীয় যুগের শৌর্য-বীর্য-গাথা ও গীতার সমন্বয়বাদ যে সনাতন ধর্মকে ভারতের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া প্রচার করিয়াছে, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগের মর্মস্পর্শী-কাহিনীর মাধ্যমে বেদান্তের যে জটিলতত্ত্ব সহজ সরলভাবে নানারূপে, নানাছন্দে পরিবেশিত হইয়া সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল,—তাহাই ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনকে অতুলসম্পদে ভূষিত করিয়া আজও শত বিপ্লব ও বিপর্যয়ের মধ্যে বিশ্বের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্ভব, আদর্শ ও অবদান পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,—এই ভারত-সংস্কৃতিই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মূল উৎস ও প্রকৃত প্রাণ। ভারতীয় সংস্কৃতির এক সঙ্কট-মুহূর্তে যুগ-যুগ-সঞ্চিত এই অমূল্য আধ্যাত্মিক ভাবসমূহই—উনবিংশ-শতাব্দীর শেষে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘাকারে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

নিয়ত-পরিবর্তনশীল ভাগ্যচক্রের বিবর্তনে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের রাষ্ট্র-গগনে এক বিপদ-মেঘ সহসা আবির্ভূত হয়। প্রতীচ্য সভ্যতার অগ্রদূত ইংরেজ বণিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতে প্রবেশলাভপূর্বক অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গকে ছলে বলে কৌশলে পরাজিত করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিল। রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশী শক্তির নিকট এই পরাভব ভারতের কৃষ্টি-জগতেও এক যুগান্তর-কারী বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। বুদ্ধিমান ইংরেজ বুঝিয়াছিল ভারতের ন্যায় এক সুপ্রাচীন বিরাট জাতিকে কেবল বাহুবলে চিরদিন বশীভূত করিয়া রাখা সম্ভব নহে; স্থায়ী প্রভুত্ব স্থাপনের

জন্য প্রয়োজন হইবে তাহার অন্তর্জগতে কৃষ্টিগত আমূল পরিবর্তন-সাধন। তাই প্রতীচ্যের প্রকৃত বিজয়-অভিযান আরম্ভ হইল এক অভিনব পন্থায়। একদিকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রবর্তিত হইল প্রতীচ্য শিক্ষা, অপরদিকে শুরু হইল খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকগণকর্তৃক সমাজ-সেবকবেশে খ্রীষ্ট-ধর্মের অবাধ প্রচার। যুক্তিবাদী পাশ্চাত্ত্যের আপাতরমণীয় বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও শিক্ষায় বিভ্রান্ত হইয়া অনেকেই আচার-ব্যবহার, খাওয়া দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি ও চাল-চলনে প্রতীচ্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং ইহাও ভাবিতে শিখিলেন—এতদিন তাহারা যে ভারতীয় ধর্ম ও শাস্ত্র রত্ন-পেটিকার মত সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা পরস্পরবিরোধী মতবাদে পূর্ণ, অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বাগাড়ম্বর মাত্র। যদি তাহাই না হইবে তবে এত বড় একটা দেশ ক্ষুদ্র একটি বিদেশী শক্তির নিকট এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিবে কেন? এই বিভ্রান্তিকর প্রবল চিন্তাপ্রবাহ সমাজ-সৌধের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়া ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অস্তিত্বকেও বিপন্ন করিয়া তুলিল। কিন্তু প্রতীচ্য জড়-সভ্যতা যতই প্রভাবশালী হউক না কেন, ভারতবাসীর আন্তর জগৎ জয় করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। প্রবল আততায়ীর কবলে পতিত হইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইলে দুর্বল ব্যক্তিও যেমন আত্মরক্ষার্থে গর্জিয়া উঠে, ভারত-প্রতিভা তেমনি মর্ম-স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পরাক্রান্ত বিদেশী সভ্যতাস্বীকৃতির ভাবী বিষময় পরিণাম চিন্তা করিয়া জীবন-মরণের এই মৌন সন্ধিক্ষণে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিদেশীয় রাজশক্তির নির্যাতন ও নিষ্পেষণ, শোষণ ও তোষণনীতি এবং ভারতীয় সমাজ-দেহে প্রতীচ্যকৃষ্টির অলক্ষ্য অনুপ্রবেশ মোহ-গ্রস্ত মৃতপ্রায় জাতির আত্মরক্ষণ-শক্তিকে সহসা প্রবুদ্ধ করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল, যাহার ফলস্বরূপ দেখিতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও শেষভাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তিনটি প্রবল ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ভারতীয় নেতা ও সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা মহা নগরীতে 'ব্রাহ্ম-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে বোম্বাই শহরে 'আর্য-সমাজ' এবং উক্ত বৎসরই ম্যাডাম এইচ. পি. ব্লাভাটস্‌কে ও কর্ণেল অল্‌কটের প্রচেষ্টায়—প্রথমে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে এবং পরে ভারতবর্ষের মাদ্রাজ নগরীতে 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এই আন্দোলন-ত্রয়ের প্রত্যেকটি হিন্দুধর্মের মৌলিক ভাবধারার বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব পদ্ধতি অনুসারে উহাকে রূপায়িত করিয়া বিদেশীয় প্রভাব হইতে ভারতবাসীকে মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইল। ইহার ফলও কতকটা ফলিল। যাহারা পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই ধর্মান্দোলনপ্রসূত নবীন মতবাদসমূহের মধ্যে স্ব স্ব আত্মিক ক্ষুধা মিটাইবার সামগ্রীর সন্ধান পাইয়া প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যের প্রতি পুনঃ মুখ ফিরাইলেন। অবাধ পাশ্চাত্ত্য ভাবের স্রোতে এইরূপে একটা প্রবল বাধার সৃষ্টি হইল।

কিন্তু সমাজ-সংস্কারমূলক এই ধর্মীয় আন্দোলন-সকল একদেশী ও একাঙ্গী হওয়ায় ইহাদের কোনটিই জনসাধারণের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না; কারণ হিন্দুধর্মমত-সমূহের মধ্যে যে মূলগত ঐক্য বিদ্যমান এবং অধিকারি-ভেদে যে বিবিধ ধর্মেরই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নবধর্ম-প্রবর্তকগণ হিন্দুধর্মের সারভূত বহুলাংশকে নিষ্প্রয়োজন ও অন্ধকুসংস্কারবোধে পরিহার করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে সনাতনপন্থী হিন্দুমাত্রেই নবীন মতবাদ

ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি কোনপ্রকারেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। এই কারণে, যে মহদুদ্দেশ্য লইয়া এই সকল ধর্মীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সাফল্যলাভ করিতে না পারায় ইহারা স্ব স্ব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল।

সঙ্ঘ-স্রষ্টা

ইহা অনস্বীকার্য যে, হিন্দুধর্মের সর্বজনীনতা ও ঔদার্যসত্ত্বেও যুগ-যুগ-সঞ্চিত বিবিধ অপ্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ ইহার অঙ্গীভূত হইয়া সনাতন ধর্মের কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। তথাপি বৈদেশিক চিন্তাধারার আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে হইলে যে এই সকল অনাবশ্যক নিয়ম ও অনুষ্ঠানাদির বহুলাংশে সময়োপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্জন প্রয়োজন, তৎপ্রতি সনাতনপন্থী গোঁড়া হিন্দুসমাজ দৃক্‌পাত না করিয়া গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া ধীর মন্থর গতিতেই পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। হিন্দুসমাজের এই অপরিবর্তনশীল মনোবৃত্তিই তাহাদের ধর্ম ও কৃষ্টির প্রগতিমূলক সংস্কারের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। সময়ের আহ্বানে সাড়া দিতে না পারিলে ধূমায়মান আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ-বহ্নি যে একদিন সহসা প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র সমাজ-সৌধকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারে, তদ্বিষয়ে গোঁড়া সমাজ-নায়কগণ তখনও সচেতন হইয়া উঠিতে পারেন নাই। একদিকে রাজশক্তির সহায়তায় ধর্ম- ও কৃষ্টি-জগতে প্রতীচ্যের প্রবল আক্রমণের ফলে ভারতীয় হিন্দুসমাজের নিপীড়িত অনুন্নত ও অস্পৃশ্য জাতির ব্যাপক ধর্মান্তর-গ্রহণ, অপরদিকে একদেশী ধর্মীয় আন্দোলনসমূহের নগ্ন ব্যর্থতা। এই সঙ্কট-মুহূর্তে ভারত-রঙ্গমঞ্চে এমন একটি আন্দোলনের প্রয়োজন হইল—যাহা সনাতন-পন্থীর রক্ষণশীলতা ও সংস্কারবাদীর প্রগতিশীলতার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। কারণ হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতে না পারিলে এবং যুগপ্রয়োজনে যেখানে যতখানি পরিবর্তন ও পরিবর্জন প্রয়োজন তাহা না করিলে পূর্ববর্তী একাঙ্গী আন্দোলনত্রয়ের ন্যায়ই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

এই সন্ধিক্ষণে যুগপ্রয়োজন-সিদ্ধিকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের আবির্ভাব ভারত-তথা মানবেতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি হুগলী জিলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর নামক এক অখ্যাত পল্লীতে এক দরিদ্র নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পরিবারে তাঁহার জন্ম; কলিকাতার উপকণ্ঠে পবিত্র ভাগীরথী-তীরে দক্ষিণেশ্বর-তপোবনে তাঁহার সুদীর্ঘ কঠোর সাধনা ও সিদ্ধি—আজ কাহারও অবিদিত নাই। এমন ধর্ম নাই যাহা তিনি সাধন করেন নাই, এবং এমন সত্য নাই যাহা তিনি উপলব্ধি করেন নাই। তিনি তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির সাহায্যে আত্মবিস্মৃত ভারত-বাসীকে দেখাইলেন যে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টি একটা অলীক বা পরস্পরবিরোধী, কুসংস্কারপূর্ণ কল্পনা নহে। অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনা উহাতে নিহিত রহিয়াছে—যাহা ভারতের পুনরুত্থান ও মুক্তির কারণ হইবে, এবং বিশ্ববাসীকে প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিবে। তাঁহার জীবনে সমগ্র মানব-জাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদনকল্পে গাহিয়াছেন:

> "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
> ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা;
> তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
> নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে!
> দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি—
> সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।"

যুগযুগান্ত ধরিয়া বিভিন্ন দেশের সাধকবৃন্দ যে সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন,

শ্রীরামকৃষ্ণে তাহা মিলিত হইয়া তাঁহার জীবনকে এক মহান পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছে, যাহার স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত মানব-মন শাশ্বত আনন্দ ও শান্তির অধিকারী হইবে। তিনি এমন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছিলেন, যেখান হইতে তিনি সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রদর্শন করিতে পারিতেন। তিনি সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়া বলিলেন—যে-পথ দিয়াই তত্ত্বের সন্ধানে অগ্রসর হউক না কেন, পরিণামে সাধক চরম লক্ষ্যেই পৌঁছিবে। তিনি বলিলেন, "দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি ক'রে একটা মত আশ্রয় কল্লে, তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়।" "সকলেই তাঁকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষির দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকারে বিশ্বাস সে নিরাকারই চিন্তা করুক। আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল,—এই মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) ভাল নয়।" "হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন।"

হিন্দুধর্মের মর্মবাণী—সমন্বয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই কথাই বলিয়াছেন :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ (৪।১১)

—যে যে-ভাবেই আমাকে ভজনা করুক, আমি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দিয়া থাকি ; বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইলেও অন্তিমে সকলে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রে'ও এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই, "রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" ॥৭॥—নদীসমূহ ঋজু-কুটিল নানা গতি অবলম্বন করিয়া যেমন অবশেষে মহাসমুদ্রে মিলিত হয়, মনুষ্যসকল রুচির বৈচিত্র্যহেতু নানা মত নানা পথ অবলম্বন করিলেও অবশেষে অনন্ত-সাগর-সদৃশ পরমাত্মারূপী শ্রীভগবানকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে এই মহাসত্যই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই ধর্মসমন্বয় বিভিন্ন ধর্মের শুষ্ক সারসংগ্রহ বা একটা সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাস নহে। তিনি কঠোর সাধনার মাধ্যমে সকল ধর্মের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তাই তিনি আদর্শ-বাদী হইয়াও বাস্তববাদী এবং তজ্জন্যই তাঁহার বাণী সনাতনপন্থী ও প্রগতিবাদী সকলেরই মর্ম স্পর্শ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সচেতন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি সমস্যাসমাকুল ভারতের দুর্দিনে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত,—সকল দার্শনিক মতের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়া বিভ্রান্ত ভারতবাসীকে আত্মস্থ ও কেন্দ্রস্থ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার আহ্বানে বৈষ্ণব, শাক্ত, তান্ত্রিক, বৈদান্তিক, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রীষ্টান, পারসিক ও মুসলমান—সকলে এক নবীন আলোকের সন্ধান পাইয়া স্ব স্ব ধর্মে আরও অধিক আস্থাবান্ অথচ অপর ধর্মের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিল। দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে লক্ষ্য করিয়া ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছেন : Sri Ramakrishna was the consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people ; a great symphony composed of thousand voices and thousand faiths of mankind.—ত্রিশকোটি মানবের দ্বিসহস্রব্যাপী গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পরিণতিস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যেন সহস্র

সুরের একটি সমন্বিত ঐকতান, যেখানে মানব জাতির সহস্র ধর্ম ও মতবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। ব তঃ গভীর আধ্যাত্মিকতা ও উদার সর্বজনীনতার একত্র সমাবেশ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর অন্য কোথাও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। তাই তাঁহার সাধনা ভারতের তথা জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন: The story of Ramakrishna Paramahansa's life is a story of religion in practice. His life enables us to see God face to face. ...."শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত ধর্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধির একটি প্রকৃষ্ট ইতিহাস। তাঁহার জীবন আমাদিগকে ভগবানের সাক্ষাৎকার করিতে সহায়তা করে। তিনি দিব্য ভাবের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার বাণী শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি নহে—উহা স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রসূত জীবনবেদ। এই অবিশ্বাসের যুগে, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন্ত বিশ্বাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যাহা সহস্র সহস্র নরনারীকে আজ পরম শান্তি ও সান্ত্বনা দিতেছে—অন্যথা তাহারা কখনও আধ্যাত্মিক আলোকের সন্ধান পাইত না।"

সঙ্ঘের সূচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সর্বধর্মের মিলন-ও সমন্বয়-ভূমি। তাঁহার অক্লান্ত সুদীর্ঘ সাধনায় ভারতের যে সুপ্ত আধ্যাত্ম-চেতনা প্রবুদ্ধ হইয়াছিল তাহাই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘাকারে অচিরে রূপায়িত হইয়া উঠিল। এই সঙ্ঘগঠনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের মিলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত দত্ত-পরিবারে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি অলোকসামান্য মেধা ও মনীষা লইয়া নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরীর সযত্ন তত্ত্বাবধানে নরেন্দ্রনাথ ক্রমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন, কিন্তু ইওরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া তিনি কতকটা সংশয়বাদী (sceptic) হইয়া উঠিলেন! বিধাতার এক নিগূঢ় প্রেরণায় ঊনবিংশ শতাব্দীর এক শুভক্ষণে ভারতের এই দুইটি উজ্জ্বল প্রতিভা দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। একদিকে প্রাচ্য কৃষ্টির মূর্তবিগ্রহ—নিরক্ষর, নিরভিমান সিদ্ধসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ; অপরদিকে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাদৃপ্ত প্রতীচ্যের প্রতীকসদৃশ সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথ,—যেন কর্মচঞ্চল বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য আজ শান্ত সমাহিত অধ্যাত্মজ্ঞানগম্ভীর প্রাচ্যের সম্মুখে যুগসমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান। আগ্রহ-ব্যাকুলিত চিত্তে নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" ধীর অকম্প্রকণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "হাঁ, তাঁকে দেখেছি, যেমন তোমাকে দেখছি,—তার চেয়েও স্পষ্টতর ভাবে। তাঁকে উপলব্ধি করা যায়, দেখা যায় এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি। কে তাঁকে জানতে চায়?" স্মরণাতীত কাল হইতে মানব মনে এই একই প্রশ্ন কতবার জাগিয়াছে; আবার কতবার তাহার সমাধানও হইয়াছে। ভারতের ঋষিকণ্ঠে সুদূর অতীতেও এই একই সিদ্ধান্ত ধ্বনিত হইয়াছিল—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায়॥" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৩।৮॥ অধ্যাত্মিকতার জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্পর্শে ও শিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ ক্রমে আস্তিক ও শান্ত হইয়া উঠিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুইটি চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের যুগ্মজীবনে মিলিত হইয়া যে মহাশক্তি-সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছিল, বলা বাহুল্য, তাহা মানবের অপার শান্তি ও কল্যাণের স্থায়ী উৎস হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মহাপ্রস্থানের কিছুকাল পূর্ব হইতেই দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন নির্মলচরিত্র ভক্তিমান তেজস্বী যুবককে ভারতের সর্বোচ্চ সনাতন আদর্শ ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করিয়া নানাভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন ভোগবাদমুখর যুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে এমন একটি সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের প্রয়োজন যাহা "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। কাশীপুর উদ্যানে অন্তিম শয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সমীপে ডাকাইয়া অন্যান্য যুবক শিষ্যগণ সম্বন্ধে বলিলেন, "আমি ইহাদের ভার তোমার উপর অর্পণ করিতেছি।" এই বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। তাহাদের জাত্যভিমান দূরীকরণার্থে তাহাদিগকে একদিন জাতিনির্বিশেষে সকলের দ্বারে-দ্বারে 'মাধুকরী' ভিক্ষা করিতে পাঠাইলেন এবং অপর একদিন এই সকল চিহ্নিত অন্তরঙ্গ শিষ্যগণকে ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতীক গৈরিক বসন দিলেন। প্রকারান্তরে সকলকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ংই নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কাশীপুর উদ্যানে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সূত্রপাত করিলেন।

বেদান্তের বিজয়-অভিযান

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-সংবরণ করিলে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ সম্যক্‌ভাবে গড়িয়া তুলিবার গুরু দায়িত্ব নরেন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের অত্যল্পকাল মধ্যে বরাহনগরে এক জীর্ণ ভাড়াটিয়া গৃহে উক্ত বৎসরই অনাড়ম্বর ভাবে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম মঠ স্থাপিত হইল এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য, উৎসাহ, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রবল আকর্ষণী শক্তিদ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের কৌমারবৈরাগ্যবান শিষ্য-বৃন্দের প্রায় সকলকেই এই নবপ্রতিষ্ঠিত মঠে সঙ্ঘজীবন-যাপনোদ্দেশ্যে একত্র করিলেন। অতঃপর বরাহনগর-মঠেই কোন এক সময় ত্যাগী যুবকগণ আনুষ্ঠানিক ভাবে আচার্য-শঙ্কর-প্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়োচিত নাম ও গৈরিকবস্ত্র ধারণ করিলেন এবং তীব্র বৈরাগ্য, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, পূজা, ধ্যান, জপ ও স্বাধ্যায়াদির সহায়ে সকলে স্ব স্ব আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে যত্নপর হইলেন।

এতৎকালীন দুই একটি ঘটনা সঙ্ঘের তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তরকারী পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল—(১) সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) উত্তরাখণ্ডের পবিত্র প্রাচীন তীর্থ হৃষীকেশ হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে কঠোর তপস্যাদি করিয়া পরিব্রাজক-জীবনযাপনের অভিপ্রায়ে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত দুই বৎসরের অধিককাল একাকী ভ্রমণ করিলেন। শত গ্রন্থাগারের পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াও যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হয় না, এই পরিভ্রমণকালে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-পেরিয়া সকলের সঙ্গে সমভাবে মিলিত হইয়া তিনি ভারতের মর্মবাণী ও অখণ্ডতা, অন্তরের আকুতি ও বেদনা, অভাব-অভিযোগের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করিলেন এবং পরপদ-দলিত মৃতকল্প নিঃসহায় ভারতবাসীর মুক্তি-মন্ত্রেরও সন্ধান পাইলেন। (২) অতঃপর, পশ্চিমভারত ভ্রমণ-কালে তিনি শুনিতে পাইলেন আমেরিকার শিকাগো শহরে এক বিরাট ধর্মমহাসভার আয়োজন হইতেছে এবং বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতিনিধি সেই সভায় স্ব স্ব ধর্মালোচনার জন্য আহূত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, হিন্দুধর্মের পক্ষে এই ধর্মসভায় প্রতিনিধিস্বরূপ কাহাকেও পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ অন্তরে অনুভব করিলেন তদীয় গুরু-দেবের মহতী ইচ্ছা পূরণের জন্যই এই রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইতেছে। মাদ্রাজের কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত

উৎসাহী যুবক স্বামীজীর উদারতা, ত্যাগ, গভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া অর্থ-সংগ্রহপূর্বক হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকেই আমেরিকায় প্রেরণ করিতে চাহিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তিনি ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে বোম্বাই হইতে আমেরিকা যাত্রা করিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে সেই ধর্মমহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। সমুদয় পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী সভ্যজাতি পূর্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে, এই মহাসভায় খ্রীষ্টধর্মেরই বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতা চির-কালের জন্য প্রমাণিত হইবে। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। গুরুবলে বলীয়ান এবং আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদে গরীয়ান বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের উদার গম্ভীর তত্ত্ব বিশ্বসভায় দিনের পর দিন বিশ্লেষণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে তিনি বেদান্তের সার্বভৌমত্ব উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন, "যদি কখনও এক সর্ববাদিসম্মত ধর্মের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে তাহা কখনও দেশ-কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইবে না; যে অনন্ত ভগবানের বিষয় উপদেশ করিবে সে তদ্রূপ অনন্তই হইবে; সেই ধর্মসূর্য কৃষ্ণ-ভক্ত বা খ্রীষ্ট-ভক্ত, সাধু বা অসাধু সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান ধর্ম হইবে না; পরন্তু সকলের সমষ্টিস্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির অনন্ত পথ উন্মুক্ত থাকিবে; সেই ধর্ম এতদূর সার্বভৌম হইবে যে, তাহা অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে।······সেই ধর্ম এইরূপ হইবে যে, উহাতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না, প্রত্যেক নরনারীকে দেবস্বভাব বলিয়া স্বীকার করিবে এবং উহার সমুদয় শক্তি সমস্ত মনুষ্যজাতিকে স্ব স্ব দেবস্বভাবোপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্য সতত নিযুক্ত থাকিবে।" স্বামীজী ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার শেষ অধিবেশনে বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না; কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্য ধর্মের সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষাপূর্বক নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্ধিত হইবে। যদি এই সর্বধর্ম-মহাসম্মেলন জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তবে তাহা এই: সুন্দরভাবে ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মেই অতি মহানুভব উদারচরিত্র নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণসত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ কল্পনা করে যে, অন্যান্য ধর্মের বিনাশ হইয়া তাহার ধর্মই অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিবে, তবে সে বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাহার জন্য আমি বড়ই দুঃখিত; আমি তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, তাহার ন্যায় লোকেরা বাধা দিলেও অনতিবিলম্বে প্রতি ধর্মের পতাকার উপর ইহাই লিখিত থাকিবে—'বিবাদ করিও না, পরস্পর সহায়তা কর; বিনাশের চেষ্টা না করিয়া পরস্পরের ভাব গ্রহণ করিয়া ধারণা কর; কলহ ছাড়িয়া মৈত্রী ও শান্তি আশ্রয় কর।"

ধর্মমহাসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে বেদান্ত-ধর্মের অত্যুদার আদর্শ পরিবেশন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ আজ শুধু বিশ্ববরেণ্য হইলেন তাহা নহে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টিকে তিনি গৌরবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, কপর্দকশূন্য ভিক্ষাজীবী এক হিন্দু যুবক-সন্ন্যাসী পরাধীন ভারতের উপেক্ষিত সনাতন হিন্দুধর্মকে সর্বধর্মের পুরোভাগে এইভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে। স্বামীজী মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন

ভারতের প্রাণপুরুষ তদীয় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ আশীর্বাদই সুদূর পাশ্চাত্যের ধর্মমহাসভায় তাঁহাকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছে। তিনি কৃতজ্ঞতা-ভরা অন্তরে দেশবাসীকে জানাইলেন এই অসামান্য সাফল্য ভারতকৃষ্টিরই সাফল্য এবং এই বিপুল গৌরব ও সম্মান তাঁহার স্বদেশবাসিগণেরই প্রাপ্য, তাঁহার নিজের নহে। স্বামীজীর এই প্রতীচ্য-বিজয়কে অভিনন্দিত করিয়া পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, "যে শক্তিমান মহাপুরুষ পৃথিবী আলোড়ন করিয়া উহার সংস্কার সাধন করিতে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক নির্ধারিত, সেই স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য-বিজয়াভিযান ভারতের কেবল নবজাগরণ নহে, পরন্তু পুনরভ্যুদয় এবং বিশ্ববিজয়েরও প্রথম প্রত্যক্ষ নিদর্শন।"

বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা

১৮৯২ সালে বরাহনগর হইতে মঠ আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়। প্রতীচ্যখণ্ডে বেদান্তধর্মের বীজ বপন করিয়া ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অচিরে নূতন মঠে গুরুভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইলেন। তিনি ঐ বৎসরই ১লা মে রামকৃষ্ণ-দেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী-শিষ্যগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদের সমবেত সাহায্যে 'রামকৃষ্ণমিশন' নাম দিয়া একটি প্রচার-সমিতি গঠন করিলেন—যাহার প্রধান উদ্দেশ্য—(১) সকল ধর্মকে একই সনাতন ধর্মের বিকাশ মনে করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা; (২) উন্নতচরিত্র কর্মী তৈরী করা, যাহারা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া জনসাধারণের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানকল্পে আত্মোৎসর্গ করিবে; (৩) ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলাদির উন্নতি ও বিস্তারসাধন করা; (৪) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বজনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মের প্রকৃত আদর্শ প্রচার করা; (৫) এবং জাতিধর্মনির্বিচারে নরনারায়ণজ্ঞানে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বহুকাল-পোষিত এই পরিকল্পনা গুরুভ্রাতৃ-গণের সহায়তায় রূপায়িত করিয়া তুলিতে পারিয়া বিশেষ স্বস্তিবোধ করিলেন এবং সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দও স্বামীজীর ইচ্ছাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশ মনে করিয়া উৎসাহের সহিত বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

১৮৯৭ সালের ১২ই জুন প্রবল ভূমিকম্পে আলমবাজার মঠ নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে বেলুড় গ্রামে (বর্তমান বেলুড়মঠের দক্ষিণদিকে) ৺নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ মনোরম উদ্যানবাটীতে ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মঠ পুনরায় স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানেই সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীও কিছুকাল অবস্থান করিয়া পঞ্চতপাদি কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করেন। তাঁহার অবস্থিতি, তপস্যা, অপূর্ব অনুভূতি ও দর্শনাদি ঐ উদ্যানবাটীকে পবিত্র ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। স্থায়িভাবে নিজস্ব ভূমিতে মঠস্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বামীজী উক্ত সালের ৫ই মার্চ ইংরেজ ভক্তমহিলা মিস হেনরিয়েটা মুলার এবং মার্কিন ভক্তমহিলা মিসেস ওলি বুলের অর্থসাহায্যে (৩৯০০০৲ মুদ্রায়) যেখানে বর্তমান বেলুড় মঠ বিদ্যমান, সেই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের কিয়দংশ ক্রয় করিয়া নূতন মঠ নির্মাণ-কার্যে তৎপর হইলেন। নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইলে ১৮৯৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর স্বামীজী ৺নীলাম্বর মুখার্জীর উদ্যান-বাটী হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি ও অস্থি প্রভৃতি স্বয়ং শিরে বহন করিয়া এই নবনির্মিত মঠে প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বামীজীর বহুকালের ইচ্ছা আজ পূর্ণ হইল। ১৮৯৯ সালের ২রা জানুয়ারি হইতে ইহাই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের স্থায়ী প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইল। ১৯০১ সালে Trust Deed (অছিনামা)
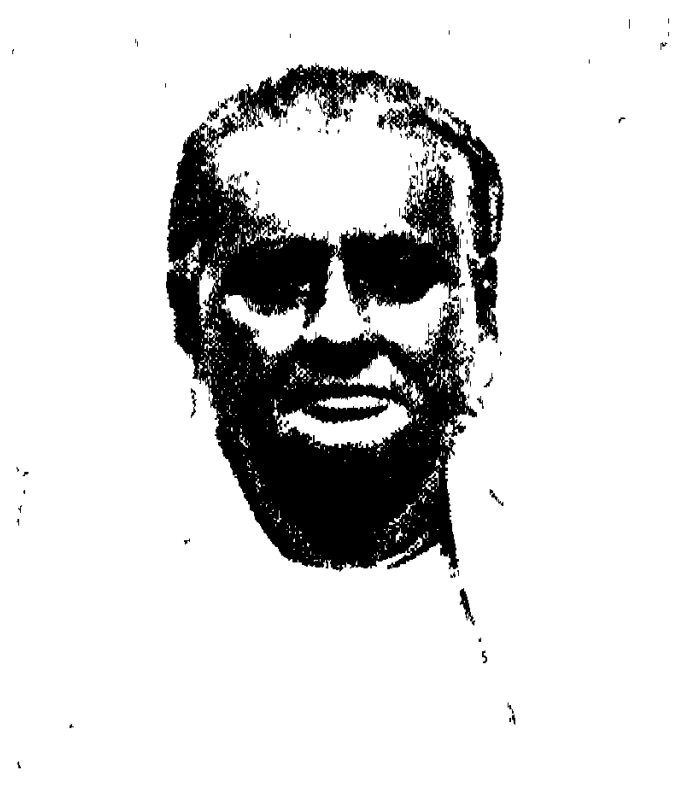
স্বামী ব্রহ্মানন্দ — স্বামী শিবানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দ — স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী শুদ্ধানন্দ — স্বামী বিরজানন্দ

স্বামী শঙ্করানন্দ

সম্পাদিত হইলে পূর্ব-প্রবর্তিত প্রচার-সমিতির সমগ্র কার্যভার বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ট্রাষ্টিগণই (Board of Trustees) সাময়িকভাবে গ্রহণ করিলেন।

ইতোমধ্যে অত্যধিক পরিশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের স্বাস্থ্য দিন দিনই ভাঙিয়া পড়িতেছিল। চিকিৎসকগণের নির্দেশে স্বামীজী স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ১৮৯৯ খৃঃ ২০শে জুন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করিলেন এবং তত্রত্য পূর্বারব্ধ কার্যসকল পর্যবেক্ষণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৯০০ খৃঃ ৯ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ইহার পর হইতে তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য আরও দ্রুত অবনতির দিকে চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই শুক্রবার তিনি সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মহাসমাধিযোগে লীলা-সংবরণ করিলেন। এই আকস্মিক তিরোধানে সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ অত্যন্ত মর্মাহত হইলেও দিশাহারা হইলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের নেতৃত্বে বিপুল উদ্যমে সঙ্ঘের কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় সঙ্ঘশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই সর্বত্র বিস্তৃতিলাভ করিল। অতঃপর প্রচার-বিভাগের কার্যকলাপ আরও শৃঙ্খলার সহিত নির্বাহের উদ্দেশ্যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় আইনের ১৮৬০।২১ ধারা অনুসারে তাঁহারা সঙ্ঘের প্রচার-বিভাগকে রামকৃষ্ণ মিশন নামে রেজেষ্ট্রি করাইলেন। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘেরই দুইটি দিক। ইহাদের উভয়ের মধ্যে আইনগত পার্থক্য থাকিলেও আদর্শ হিসাবে মূলতঃ ঐক্যই রহিয়াছে। মিশনের কার্যনিয়ন্ত্রণ সংসদ্ (Governing Body) বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণ (Board of Trustees) দ্বারাই সংগঠিত; উহার কর্মী প্রধানতঃ রামকৃষ্ণ-মঠেরই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং বেলুড়মঠই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্মিলিত প্রধান কেন্দ্র। ১৯২২ খৃঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের পর হইতে ক্রমান্বয়ে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ এবং স্বামী বিরজানন্দ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়া দেশ-বিদেশে বিভিন্ন মঠ ও মিশনের কেন্দ্রস্থাপন, বেদান্তধর্মের বহুল প্রচার ও বিবিধ জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া সঙ্ঘের প্রভূত বিস্তারসাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সঙ্ঘনায়ক স্বামী শংকরানন্দ পূর্ববর্তি-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ১৯৫১ খৃঃ হইতে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের আদর্শ ও প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।*

* রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ (পো: বেলুড়মঠ) কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের ইংরেজী পুস্তক 'Ramakrishna Movement : Its Ideal and Activities' অবলম্বনে লিখিত।

টানো আমায় তোমার পানে

শ্রীরবি গুপ্ত

এনেছি আজ অরুণ-রাঙা তোমার দুটি চরণতলে
হৃদয়খানি, জ্বালো তোমার চিরজ্যোতির পরশ-পলে।
লবো তোমার পাবক-বাণী
সকল তিমির বাধায় হানি',
দীপ্ত তোমার স্বপ্নখানি মূর্ত করো জীবন-দলে।

নীরব আমার বীণাখানি এবার লহ আপন হাতে,
ঝংকারো সুর মুখর যাহা তোমার মানসনিলীন প্রাতে।
টানো আমায় তোমার পানে
পূর্ণ করো তোমার গানে,
জীবন-নদীর অবাধ ধারা যেন তোমার দিশায় চলে।

স্বাধীনতা-শতাব্দী ও বিবেকানন্দ-যুগ

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

১৮৫৭-৫৯ সালে প্রায় দুটো বছরের বিপ্লবে যেন এক যুগ-প্রলয় হ'য়ে গেল, গঙ্গা ও যমুনার অববাহিকা প্রদেশগুলিতে রক্তের স্রোত ব'য়ে গেল; শাদায় কালোয় সেখানে ভেদ নেই—রক্তের রঙ সমান লাল! কিন্তু প্রতিহিংসায় কালো হ'য়ে উঠ্ল মিউটিনির ইতিহাস? স্বাধীনতার জন্ত যারা লড়েছে তাদের—কালা বিদ্রোহীদের দেহ কামানের মুখে বেঁধে সাদা সৈনিকরা ছিন্নভিন্ন কর্‌ল; একজন রুশ শিল্পী স্বচক্ষে দেখে ছবি এঁকেছিলেন।

অহিংসার ঋত্বিক্ মহাত্মা গান্ধী জন্মালেন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, এবং আগের দশকে (১৮৫৮-৫৯) জন্মেছিলেন কয়েকটি ভারত মাতার সন্তান,—যাঁদের আজ স্মরণ করা উচিত: জগদীশচন্দ্র বসু ও বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮), রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র (১৮৬১), নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩)—যাঁদের প্রতি গান্ধিজীর গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

১৮৯৩ খৃঃ গান্ধিজী যখন ভেসে চলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, সেই বছরেই বিবেকানন্দ সিংহল চীন অতিক্রম ক'রে জাপান দেখে পৌঁছলেন আমেরিকায়, এবং ৩॥ বছর পাশ্চাত্য দেশে কাটিয়ে দেশে ফেরেন—জানুয়ারি ১৮৯৭; প্রায় সেই সময়েই গান্ধিজীও আফ্রিকা থেকে কলকাতা আসেন। স্বামীজী আবার জুন, ১৮৯৯ খৃঃ বেরিয়ে ১॥ বছর ধরে ইওরোপ আমেরিকা—শেষ বার পরিদর্শন ক'রে ফেরেন মার্চ, ১৯০১; সে সময় গান্ধীজী কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের শোচনীয় অবস্থা বিষয়ে প্রস্তাব তোলেন এবং পদব্রজে বেলুড় গিয়ে স্বামীজীর সাক্ষাৎলাভের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর অসুস্থতা বা অনুপস্থিতির জন্ত দেখা হয়নি। ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই স্বামীজীর দেহত্যাগ—বুওর যুদ্ধের শেষে ও রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রারম্ভে।

সেই সঙ্কটের যুগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে বসেছেন, আর "নৈবেদ্য" রচনায় মগ্ন,—"হিংসার সমাপ্তি অপঘাতে"—যেন আগুনের অক্ষরে লেখা; এটি 'Sun-set of the Century' নামে ইংরেজী গদ্যে রূপান্তরিত ক'রে কবি তাঁর 'Nationalism' (১৯১৫) গ্রন্থে ছেপে বিশ্ব-যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান; তখন গান্ধিজী দক্ষিণ-আফ্রিকা ছেড়ে স্থায়িভাবে ভারতেই তাঁর আশ্রম স্থাপন করেছেন।

সেই আর এক বিপ্লব-যুগের সূচনায় (১৯১৭-৪৭) স্বামী বিবেকানন্দকে সশরীরে আমরা না পেলেও তাঁর দিব্য বাণীর প্রভাব (১৯০২-১৯১২) দেখেছি—অগণিত দেশ-সেবক ও সেবিকাদের জীবনে; তাদের কাছে জন্মমৃত্যু যেন 'পায়ের ভৃত্য'ই ছিল। সেই চরম আত্মাহুতির আদর্শ যেন মূর্ত্ত হয়েছিল যুবক সুভাষচন্দ্রের জীবনে, এবং তিনিই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত সগৌরবে আমাদের পৌঁছে দিয়ে-ছেন; তাঁরও প্রধান প্রেরণা বিবেকানন্দের বাণী।

সেকেলে যান্ত্রিক যুদ্ধ পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে (না পিছিয়ে?) চলেছি (Atomic) আণবিক যুদ্ধের চরম ধ্বংসের দিকে! মানব-জাতির ও মানবসভ্যতার এই বিষম সঙ্কটে ভাবলে ভাল হয় বিবেকানন্দ আমাদের কোন্ কোন্ দিকে সাবধান করে গেছেন—১৯০২ খৃঃ ৪০ বছর পূর্ণ হবার আগেই দেহত্যাগ করার সময়। সেই অতি সংক্ষিপ্ত অথচ অগাধ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রায় পাঁচ বছর বিবেকানন্দ ভারতের বাইরেই কাটিয়েছেন: আমেরিকায় ১৮৯৩-৯৬; মাঝে ইংলণ্ডে ১৮৯৫-৯৬;

আবার আমেরিকা ইওরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে ১৮৯৯-১৯০১ ; এই সব দেশের বহু নরনারী তাঁর কাছে এসেছে, তাঁদের গভীর সমস্যাগুলি নিয়ে প্রশ্ন করেছে—তাঁদের সমস্যার মীমাংসা কোথায় জানতে চেয়েছে। তাঁর অন্যতমা শিষ্যা নিবেদিতার রচনা থেকেই তার প্রচুর আভাষ পাই। তাঁর আরও কত আলাপ গুরুভাই ও সহকর্মীদের সঙ্গে—শিষ্য ও শিষ্যাদের উদ্ধৃতি থেকেও আমরা কিছু পেয়েছি ; কিন্তু তাঁর উপযুক্ত সূচী (Index এবং Bibliography) এখনও তৈরী হয়নি ; মায়াবতী সংস্করণ, পত্রাবলী ও তাঁর ডায়েরী (যদি থাকে) প্রভৃতি থেকে এখনই সে-কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। সেটি হবে 'বিবেকানন্দ-দর্শন',—বিবেকানন্দ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ ; সেদিন স্বামী তেজসানন্দের নিমন্ত্রণে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের ভাষণ দিতে গিয়ে এই কথাই বার বার মনে হয়েছিল।

এযুগের তরুণরা স্বাধীনতা কিছু পেয়েছে ; আরও দাবি করে ; কিন্তু বিবেকানন্দ-দর্শনে 'স্বাধীনতার' সংজ্ঞা ও তাৎপর্য কি ?—এবিষয়ে গবেষণা কেউ করেননি—এখনই শুরু করা দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে স্বামীজী—শুধু রাজনৈতিক নয়, সমাজ-নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন বিশ্বনৈতিক মুক্তি সাধনাকেই স্বাধীনতা বলেছেন ; তাঁর কাছে এই পরম তত্ত্বটি পেয়ে শুধু এদেশের মানুষ নয়, বিশ্বমানব উপকৃত হবে—এখনই এবং সুদূর ভবিষ্যতে। তাই আমাদের স্বাধীনতা-শতাব্দীর অনুধ্যানের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে বার বার মনে পড়ছে, আজও বিবেকানন্দ-'দর্শনে'র সূত্রপাত হয়নি ; শুধু তাঁর জন্মস্থানের নিকট একটি সড়কের উপর, আর দক্ষিণেশ্বর-বালি সাঁকোর গায়ে যদিও তাঁর নাম লেখা হয়েছে। আসল কাজ কিন্তু অনেক বাকী।

বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে 'মুক্তি'

জড় বা চেতন সমগ্র প্রকৃতির লক্ষ্য মুক্তি ; জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলে সেই লক্ষ্যে যাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। সাধুর আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি হইতে তস্করের ঈপ্সিত মুক্তি খুবই পৃথক, সাধুর বাঞ্ছিত মুক্তি তাহাকে অনন্ত আনন্দের ও অবর্ণনীয় শান্তির দিকে লইয়া যায়, আর তস্করের কামনা তাহাকে নূতন নূতন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে।

প্রত্যেক ধর্মেই দেখা যায়—এই মুক্তির সংগ্রাম। সকল নীতি ও স্বার্থত্যাগের মূলে এই মুক্তির ভাব,—ক্ষুদ্র দেহভাব হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা! যখন দেখা যায়—এক ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করিতেছে, অপরকে সাহায্য করিতেছে, তাহার অর্থ এই যে—ঐ ব্যক্তিকে 'আমি ও আমার' এই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। স্বার্থ-সংকীর্ণতার গণ্ডির বাহিরে বিস্তারের সীমা নাই।

সকল বড় বড় নীতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগকে চরম আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছে। মনে কর, একজন এই চরম নিঃস্বার্থ অবস্থা লাভ করিল—তারপর তাহার কি হইবে! সে আর ক্ষুদ্র ব্যক্তি শ্রীযুক্ত অমুক থাকিবে না,—সে অসীম বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাহার পূর্বেকার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব হারাইয়া গিয়াছে। সে অনন্ত হইয়াছে ; এবং এই অনন্ত বিস্তারই সকল ধর্ম, সকল নীতি ও সকল দর্শনের লক্ষ্যস্থল!

['কর্মযোগ' হইতে সংকলিত]

"আলো—আরও আলো—"

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শেষ হয়ে আসে বেলা—দিনমণি অস্তাচলে নামে।
দিবসের আলো ক্রমে মিলাইয়া আসে ;
কোলাহল থামে :
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ মনে
এখন ফিরিতে চাই আপন আবাসে।
অন্ধকার নামে ধরাতলে,
মাথার উপরে মেঘ,—পথ কোথা ?
আমারে কে পথ দেবে ব'লে ?
দিকহারা, লক্ষ্যহারা, আমি চলি—তবু পথ চলি,
পদে পদে বাধা জাগে, শক্তি মোর যায় ফুরাইয়া ;
দিগ্‌ভ্রষ্ট এ পথিকে কে দেখাবে পথ ?—কারে বলি,
"আলো দাও—ওগো আলো দাও"
চলিয়াছি কাহারে ডাকিয়া ?
সম্মুখে দুস্তর নদী, কুলু কুলু ঢেউ ব'য়ে যায়,
অন্ধকারে একাকার,—
তরী কোথা—নাবিক কোথায় ?
কাণ্ডারী, শুনেছি আমি মাতৃমুখে একদিন যেন :
ভালোবেসে তুমি জ্বালো আলো,
হাত ধ'রে নিয়ে যাও, বন্ধু কেহ নাহি তোমা হেন ;
তাই ডাকি, "জাগো তুমি,
মুছে দাও সূচীভেদ্য কালো
আলো দাও—জ্যোতির্ময় আলো !"
আমি একা—বন্ধু নাই, দিবসের সাথী ছিল যারা
কোথায় হারায়ে গেছে তারা।
কেহ এলো নাকো পাশে,—
আমি কাঁপি ত্রাসে :
মৃত্যুদূত ওই বুঝি আসে
পায়ে পায়ে অগ্রসরি'।
আজ মনে পড়ে মোর মায়ের সে কথা—
"বিপদে পড়িলে ডেকো তাঁরে
হাত ধরিবেন তিনি—"
তাই মোর এত ব্যাকুলতা
কোথা রামকৃষ্ণদেব—আলো দাও এই অন্ধকারে।
শক্তি দাও দুর্বল অন্তরে—
পথ চিনে যেতে পারি যেন
ফেলে-আসা আপনার ঘরে।

খুঁজে পাই নাকো

শ্রীচিত্ত দেব

খুঁজে পাই নাকো :
ঠিক কোন্‌খানে থেকে তুমি মোরে ডাকো ;
খুবই কাছে আছ মনে হয়।
তবুও তোমার-আমার পরিচয়
কেন যে হয় না তাই ভাবি।
মন বলে হারিয়েছি আমি সেই চাবি
তোমার ঘরের তালা যে চাবিতে খোলে।
যদি তুমি জানো চাবি কে রেখেছে তুলে
আমারে ঘোরাও কেন নানা পথে ঘাটে ?
তুমি জানো দিন মোর কি ক'রে যে কাটে—
এ-জীবন বৃথা কত দীর্ঘ মনে হয় !
না হ'লে তোমার-আমার পরিচয়
দেহ মোর হয় শুধু পাশব-মত্ততা !
এসো তুমি এসো আজ, তোমার মমতা
ছুঁয়ে থাক, ছুঁয়ে থাক আমার হৃদয়।
এ-আকাশে প্রতিদিন যে-অরুণোদয়
আড়ালে আড়ালে থেকে আঁকো
সে-তোমারে—
খুঁজে পাই না-কো !

ভারতের শিক্ষা-প্রগতিতে শিল্পের স্থান

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ (বিশ্বভারতী)

দেশের প্রচলিত বিদ্যালয়ে দেহ ও মনের সহযোগিতার শিক্ষার অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন:

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় আমরা সাধারণতঃ পুঁথিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই ক'রে নিয়ে আর সমস্তকে অস্বীকার করি। পাশ্চাত্ত্য সমাজে বিদ্যালয়ের বাহিরেও নানা উপায়ে স্কুল-কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব পূরণ ক'রে দেয়। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের বাহিরে ছাত্রদের অন্য শিক্ষার ক্ষেত্র নেই বললেই হয়। তাই নোট-নেওয়া মুখস্থ-করা বিদ্যায় তাদের মন যে পরিমাণ বস্তু পায়, সে পরিমাণ খাদ্য পায় না।

"দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহ'লে মনের শিক্ষার প্রবাহও বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি; তার কারণই এই যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবি কোনই আমল পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে।"

দেহের চর্চা ও হাতের কাজ সম্পর্কে তাঁহার অভিমত: দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে-সব কাজ করতে পারি সেইসব কাজের চর্চা—যে চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়—সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়—সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে। আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোন না কোন হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ ক'রে দেওয়া চাই। আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্বের চর্চায় মনও সজীব হয়ে উঠে। যে সব ছেলেকে আমরা নির্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্ত চিত্ত এই দৈহিক কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির স্পর্শ অপেক্ষা ক'রে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ ক'রে নেয়। তাছাড়া যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে যত বড়ো পণ্ডিতই হোক সংসারক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকে বাঁচাতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন কোন অভিভাবকের কাছ থেকে আমরা বাধা পাব; কিন্তু সে বাধাকে স্বীকার করা আমাদের কর্তব্য হবেনা।

শিক্ষাশিল্পের নবজীবন

আদর্শ, পূর্ণাঙ্গ ও আবশ্যিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্প-শিক্ষাদানের স্থান সকল সভ্য দেশে স্বীকৃত হইলেও এদেশে বুনিয়াদি শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পূর্বে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান সুনির্দিষ্ট ছিল না। পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকেরাই এ দেশবাসীর শিক্ষানীতি, পদ্ধতি ও প্রসার নিয়ন্ত্রণ করিতেন। আবশ্যিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনে তাহাদের দান সীমাবদ্ধ ও নগণ্য। বুনিয়াদি শিক্ষা দেশে প্রবর্তিত হইবার পর বিগত অল্পাধিক দেড় দশক মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান ও মান—সবেমাত্র বাস্তব ও ব্যাপক রূপ লইতেছে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশের স্থানে স্থানে 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ১৯২১ খৃঃ অসহযোগ-আন্দোলনকালে ভারতের সর্বত্র জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন স্বাধীনতাকামী স্বদেশ-হিতৈষী শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে জাতীয় বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদানের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা দেখা গিয়াছিল এবং বহু জাতীয় বিদ্যালয়ে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা-দানের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। তখনও শিল্পশিক্ষাকে

সাধারণ শিক্ষার অংশ হিসাবে গ্রহণ করিতে দেশ সক্ষম ছিল না। গান্ধীজীর নেতৃত্বে বুনিয়াদি শিক্ষার কার্যক্রম রচনার পর, স্বাধীন দেশে শিল্পমাধ্যমে শিক্ষার পথ অনেক সুগম ও সহজ হইয়াছে।

শিল্পদর্শন

শিল্পের যথাযথ চর্চা সাধারণ শিক্ষার কতখানি উৎকর্ষ সাধন করে তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে শিক্ষাব্রতীকে শিল্পজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতে হয়। শিল্পজ্ঞান যেমন একটি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে অবস্থিত, শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগও তেমনি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। এই স্বতন্ত্র বিজ্ঞান আবার শিল্পজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে; অর্থাৎ শিল্পবিশেষের জ্ঞান ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদিগকে ইহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি—এই দুইটি বিজ্ঞান একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষানীতি-সম্মত শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চাকে আমরা 'শিক্ষাশিল্প' বলিয়া অভিহিত করি।

যে রহস্যময় প্রকৃতির কোলে মানুষের বাস, সে প্রকৃতি হইতে মানুষের জীবনকে পৃথক করিয়া রাখা বা দেখা যায় না, আর সে প্রকৃতি হইতে আমরা বাঁচিবার জন্য খাদ্যবস্তু আহরণ করি, আমাদের সৌন্দর্য-পিপাসা চরিতার্থ ও প্রয়োজন মিটাইবার এবং গৃহাবাস-নির্মাণের উপাদান সংগ্রহ করি, সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতিদত্ত বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষাশিল্পের সহযোগে চর্চা করিলে আমাদের সমগ্র জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়; আমাদের জীবনের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিতে পারে; শিক্ষাশিল্পের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতা তখন উপলব্ধিতে আসে। শিল্পকার্যে যখন শিল্পীর চৈতন্যসত্তা ফুটিয়া উঠে তখনই শিল্প বিশেষ রূপ লাভ করে। বিদ্যার্থী কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞানময় প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, আনন্দের মধ্যে বিচরণ করিবে, ইহা শিক্ষাশিল্পের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

যাহারা শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট কাঠের কাজ শিখিয়াছে, তাহারা বনে জঙ্গলে অরণ্যে গাছের গঠন কিভাবে প্রকৃতি-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা বুঝিতে সমর্থ। ইহার চর্চা গভীর হইলে শিল্পশিক্ষার্থীর চিন্তা শুধু কাঠেই নিবদ্ধ থাকে না, তখন ইহা কোষময় বৃক্ষজীবন ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মনকে আকর্ষণ করে, প্রকৃতির বিচিত্র লীলার প্রত্যক্ষ অনুভূতি বিদ্যার্থীর জীবনে বহন করিয়া আনে। অজ্ঞ আদিম মানব হয়তো তাহা জানিত না; সেজন্য বন-জঙ্গল তাহার ভীতির উদ্রেক করিত। কাঠের কাজের উপাদান—গাছ সম্পর্কে ইহা যতখানি সত্য, অন্য সকল মৌলিক শিল্প সম্বন্ধেও ঠিক তাই। বস্ত্র আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য বস্তু। বস্ত্র ভিন্ন মানবসভ্যতা প্রায় কল্পনা করিতে পারা যায় না। বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্কার ও ইহাদের ব্যবহার মানবসভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আসল কথা এই যে, শিল্পচর্চা প্রকৃতিজাত বস্তুর সঙ্গে মানবজীবনের প্রকৃত সম্পর্ককে বাস্তব করিয়া তোলে। তা-ছাড়া শিল্পচর্চার মাধ্যমে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথার্থ ব্যবহার হয় আর এরূপ দৈহিক চর্চার মূল্য ব্যক্তির জীবনে অসাধারণ; কারণ ইহার ফলে সুপ্ত সৃজনী শক্তির উন্মেষ হয়। সেইজন্যই বোধহয় আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, বিশেষ যুগের শিল্প-প্রগতি সেই যুগের সভ্যতা বিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষের একটি মাপকাঠি বলিয়া বিবেচিত হয়। কর্মীর চৈতন্যসত্তা কর্মে প্রকাশিত হইলেই কর্মও সজীব হইয়া উঠে।

পুঁথিগত জ্ঞান ও কর্মবিজ্ঞান

যথাযথভাবে জীবনে কোন কর্মের চর্চা করিয়া জ্ঞানার্জন ও আনন্দ পাইতে হইলে সেই কর্মের চর্চা করিতেই হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনও সেইখানে; বিদ্যালয়ে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট এই 'অভ্যাস' আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

কিন্তু শিল্পজ্ঞান-চর্চার অভ্যাস নিছক পুঁথিগত হইলে কর্মবিজ্ঞানটির সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতার অভাব থাকিয়া যায়। অভিজ্ঞতা-দ্বারা কাজের গুণাগুণ ও উপকারিতা অনুভূত হইলে পুঁথির জ্ঞানও আলোকপ্রাপ্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়। আজ কর্ম-বিজ্ঞান ও পুঁথিজাত জ্ঞানকে পরস্পরের পরিপূরক করিয়া প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনক্ষেত্রে শিক্ষাকে, অন্য ভাষায় শিক্ষার্থীর জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার তাগিদ আসিয়াছে। কর্মচেতনা ও জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষানীতি-সম্মত পথে মৌলিক শিল্পসমূহকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিলে ব্যক্তির, দেশের ও সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জীবন সমৃদ্ধ হইবে, আর আমাদের প্রাচীন নিজস্ব ঐতিহ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি সহজ হইবে, মহত্তর অর্থনীতির ভিত্তি সমাজে সুদৃঢ় হইবে, সংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের ভবিষ্যৎ নূতন আলোকপ্রাপ্ত হইবে।

শিক্ষায় শিল্প-নির্বাচন

এক একটি শিল্পকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাজে যথার্থ প্রয়োগ করিতে যাইয়া এক একজন শিক্ষা-ব্রতীকে বহু গবেষণা ও মনন করিতে হইয়াছে। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্যদেশের শিক্ষাবিদ্ ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরি, সালোমন প্রভৃতির শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা একথার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শিল্প-নির্বাচনে দেখিতে হইবে, বিদ্যার্থীর বয়স, বিদ্যা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, তাহার কল্পনার বিকাশ ও রূপ এবং সেই সঙ্গে শিল্পবস্তুর সর্বজনীন মৌলিক ও শিক্ষানৈতিক আবশ্যকতা। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্প-নির্বাচনের ইহাই হইবে মাপকাঠি। যে শিল্পবস্তু সকলের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, যাহা করিতে গেলে হস্ত-নৈপুণ্যের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি সচল হয়, জ্ঞানের চর্চা হয় এবং যে শিল্পের উপাদান সহজলভ্য, সেই শিল্পকেই সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষাশিল্প বলা চলে।

হাতির দাঁতে মনোরম বস্তু তৈরী করা যায় এই শিল্পে শিক্ষণীয় উপাদান আছে, সৌন্দর্যের চর্চা ইহাতে হয়, কিন্তু দেশময় হাতির দাঁতের কাজ প্রবর্তন শিল্পশিক্ষা-দানের ক্ষেত্রকে কতখানি সীমাবদ্ধ করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সভ্যদেশসমূহের বিদ্যালয়ে কাঠের কাজ, লৌহ ও অন্যান্য ধাতুর কাজ, বয়ন, সেলাই ইত্যাদি শেখানো হইয়া থাকে। কারণ এইসকল শিল্পের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও জানা যায়—যে শিল্প-উপাদান যে দেশে যত সহজে প্রাপ্য, সেই দেশের শিল্পজীবনে সেই উপাদানই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেরুপ্রান্তবাসী ল্যাপদের শিল্পজীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ল্যাপরা সাধারণতঃ বল্‌গা হরিণ পালন করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে। ল্যাপদের শিল্পকলার প্রধান উপাদান বল্‌গা হরিণের শিং, হাড়, চামড়া ইত্যাদি। এমনকি বল্‌গার পাকস্থলীকে পর্যন্ত তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। সুইডেনের অন্তর্গত ল্যাপ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা সুইডদেরই অনুরূপ, কিন্তু বিদ্যালয়ের হস্তশিল্পের বেলায় বলগার শিংই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আসল কথা, যে দেশে প্রকৃতিজাত যে উপাদান যত সহজে লভ্য, তাহাই সাধারণতঃ সে দেশের জনশিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতের মত সুবৃহৎ দেশের স্থানে স্থানে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা জানি বিদেশী বণিক শাসকদের অত্যাচার ও কূটচালে এদেশের অতি-ব্যাপক কার্পাস-শিল্প ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। তা সত্ত্বেও ভারতের পূর্বাঞ্চলে আসামের ও মণিপুরের ঘরে ঘরে "মণিপুরী তাঁত" এখনও সক্রিয়। সেখানে গৃহকন্যাকে গৃহকর্মে সুনিপুণা করিবার জন্য যে সকল কাজকর্ম শিখিতে হয়, তন্মধ্যে মণিপুরী তাঁতের ব্যবহার একটি। সাধারণতঃ এইরূপ বিশেষ শিল্প দেশের স্থানবিশেষের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের

সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এদেশের কার্পাস-শিল্প একটি ব্যাপক শিল্প, এই শিল্পের ধারা এদেশবাসীর মজ্জায় মজ্জায় রহিয়াছে ; তা না হইলে কলের যুগে খাদি-আন্দোলন এত ব্যাপক হইতে পারিত না। এই দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বজন-শিক্ষণীয় শিল্প নির্বাচন করিতে গেলে কার্পাস-শিল্পের ন্যায় প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় শিল্প দেখা যায় না।

বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা উপস্থিত করা কালে গান্ধীজী নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে তকলি দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডক্টর জাকীর হোসেন তখন যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহাও এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"তকলির মাধ্যমে আমাদিগকে সকল বিষয় শিখাইতে গেলে আমরা অনভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা কাজ চালাইতে পারিব না। আমি নিজে একজন শিক্ষক, আজ যদি আমাকে তকলির মাধ্যমে সকল বিষয় শিখাইতে হয়, তবে আমাকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু আমার হাতে যদি এরূপ পুস্তক থাকে, যাহাতে কাপড় বোনার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ের সমন্বয় প্রদর্শিত, তবে সেই পুস্তকের সহায়তায় আমি আমার ছাত্রদিগকে শিখাইতে পারিব। এরূপ পাঠ্যপুস্তক-রচনা সময়-ও শ্রম-সাপেক্ষ।"

কার্পাস-শিল্পকে শিক্ষার বাহন করিতে যে সকল প্রতিবন্ধ রহিয়াছে, শিক্ষাবিদ্‌ ডক্টর সাহেব তখনই তাহা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় গত পনের বৎসরে কার্পাস-শিল্প সম্বন্ধে অনেক বই বাহির হইয়াছে, খানকতক পুরাপুরি আমারই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাও যথেষ্ট নহে। শিক্ষার উপযোগী সাহিত্য তখনই রচিত হইতে পারে, যখন গবেষণাত্মক কাজ সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত শিক্ষাদানের পথ দেখাইতে সমর্থ হয়।

বিবিধ শিল্পের সম্বন্ধ নির্ণয় ও ইহাদের সমন্বয়

শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান ও ইহাদের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ শিল্পই—যথা : মাটি, কার্পাস, কাঠ, বাঁশ, বেত ও বিভিন্ন ধাতুর (যেমন লৌহ, তামা, পিতল, ইস্পাত প্রভৃতি) কাজ একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। শিল্পের এই পারস্পরিক সম্বন্ধটি ভাল করিয়া বুঝিয়া শিল্পসমূহের মধ্যে সমন্বয় শিক্ষাশিল্পের ক্ষেত্রেই রূপায়িত হওয়া প্রয়োজন ; নতুবা শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পশিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

তূলা কোমল বস্তু, কিন্তু তূলার সূতা তূলার ন্যায় কোমল থাকে না। বয়নকে একটি পৃথক শিল্প বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ যিনি সূতা কাটিতে জানেন ও যথারীতি কাটিয়া থাকেন, তিনি আপন সূতা তাঁতির দ্বারা বয়ন করাইয়া লইতে পারেন, বয়ন তাহার না জানিলেও চলে। অর্থনৈতিক জীবনে প্রাপ্তবয়স্কদের শিল্পের এইরূপ আংশিক চর্চা বা কাজের এই শ্রেণীবিভাগ সমাজে পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। মনুর যুগেও সেইরূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এরূপ করিলে বস্তুর পূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রই সংকুচিত হইয়া যায়।

সূতাকাটার মুখ্য উদ্দেশ্য বয়ন ও বস্ত্র। সূতাকাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বয়ন না শিখিলে সূতা কাটার গুণাগুণ ও নৈপুণ্য সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ সঞ্চালন সহজ হয় না। সূতাকাটা শিক্ষা আরম্ভ করার পূর্বে কার্পাস চয়ন, তুলাই, ধুনাই, পাঁজ-প্রস্তুত-করণ যেমন শিখিতে হয় তেমনি সূতাকাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মুখ্য ব্যবহার বুঝা ও জানা প্রয়োজন হয়। সূতার সমগুণ, নির্দিষ্ট শক্তির প্রয়োজনীয়তা, অতিরিক্ত পাকের দোষ ইত্যাদি কাপড় বোনা কালেই আত্ম-

প্রকাশ করে এবং কাটুনীর বুদ্ধিবৃত্তিকে উৎকৃষ্ট গুণ-সমন্বিত সুতাকাটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ করিয়া তোলে। এই উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে যাহারা সুতা কাটিবে তাহারা নিজের সুতায় বয়নও করিতে শিখিবে। এরূপ করিলে অজ্ঞতাবশতঃ সুতাকাটায় তুলার যে অপচয় ঘটে, সুতার গুণবৈষম্যহেতু কাপড়ের জমির যে উৎকৃষ্ট বুনন হয় না, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হইবে, এবং ইহার আর্থিক দিকও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সেজন্য বিদ্যালয়ে সুতাকাটা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বয়নশিক্ষা ব্যবস্থাও করিতে হয়। কিন্তু বড় তাঁত পরিচালনা করা প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেই সম্ভব। সেইজন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে ছোট আকারের তাঁতে অনুরূপ বস্ত্র—যথা ফিতা, গামছা, গালিচা ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থাও করা যায়। তাঁত-শিক্ষককে বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিয়া চলিতে হইবে। সুতাকাটার ও তাঁতের শিক্ষক এরূপ ক্ষেত্রে এক হইলে শিক্ষার উৎকর্ষ বাড়িতে পারে। বিভিন্ন বয়নকৌশল সেই সঙ্গে আয়ত্ত হইবে।

একথা সত্য, আমাদের দেশে প্রচলিত প্রথায় তাঁতির পরিবারের বালকবালিকাও তাঁত চালানোর কাজে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে—কেহ বা সুতা ডবল করিয়া দেয়, কেহ বা নলি ভরিয়া দেয়—এইভাবে সকলেই ছোট ছোট আংশিক কাজের অংশ গ্রহণ করে, পরে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তাহারা নিজেরাই বৃহৎ তাঁত চালনা করিতে পারে। এইরূপ প্রথা পারিবারিক শিল্পে চলিয়া আসিতেছে এবং চলিতে বাধারও কোন কারণ নাই। কারণ সেখানে তাঁত পরিবারের জীবিকার সংস্থান করে। কিন্তু বিদ্যালয়ে তাহা অনুসৃত হইতে পারে না; যেখানে বিদ্যার্থী স্বয়ং আপন হাতে কাটা সুতায় তাঁতের কাজ শিখিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

বিদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাশিল্পের প্রগতি

স্থান ও কাল-ভেদে শিক্ষা-ব্যবস্থার তারতম্য হইয়া থাকে। ইওরোপীয় দেশসমূহের বিদ্যালয়ে (প্রাথমিক ও উচ্চ) শিক্ষাশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাশিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ও প্রথা সেইসকল দেশে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানি, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিদ্যালয়সমূহের যে শিক্ষাশিল্পের চর্চা হয়, সে সম্বন্ধে আমার বহু বৎসরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, প্রতিটি দেশ নিজের প্রয়োজন বুঝিয়াই বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। আবার এ-ও সত্য যে, শিল্পশিক্ষার সম্বন্ধে যে-সকল মতবাদ ও নীতি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহা যুদ্ধসংঘাতের ফলে দ্রুত পরিবর্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। শিক্ষানীতিকে সমগ্র দেশের সমাজনীতির আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা যায় না, তাহা সম্ভব নহে। সমাজনীতি ও অর্থনীতি পরিবর্তিত হইলে আবশ্যিক জনশিক্ষার নীতিতে পরিবর্তন অনিবার্য। বিশেষ করিয়া যুদ্ধের ফলে যে সকল দেশের সাংস্কৃতিক জীবন বার বার বিপর্যস্ত হইতেছে, তাহাদের তো কথাই নাই। বরং যে সকল দেশ যুদ্ধ এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে, সেইসকল দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি একটা স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডে এইরূপ পরিবর্তন গভীর হইয়াছে।

"In the United Kingdom profoundly important developments in every field of education took place or were set in motion as a result of the second world war. The need for increased food production greatly encouraged school gardening, and keeping of live stock, the work of numerous schools began to revolve around the school 'farm' which provided abundant matter for class-room study as well as out-door activity. Children were

released for limited periods to help farmers to prepare and harvest the crops. Evacuated children learned to launder and darn their clothes,…cook their meat, practise local handicrafts make local surveys and study local life in all its aspects"—British Education—By Dent.

আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষাশিল্পের চর্চা ও গবেষণা পরাধীনতার যুগে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সামান্যই হইয়াছিল। দেশ এখন উদ্বুদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা এখনও ইংলণ্ড বা আমেরিকাবাসীদের প্রয়োজনে রচিত পাঠ্যপুস্তকই আমাদের শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রে ও বিদ্যালয়ে অনুসরণ করিতেছি, তাহাও অবস্থার তারতম্য না বুঝিয়া। কিন্তু এরূপ আশা করা অন্যায় নয় যে, বুনিয়াদি আবশ্যিক শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাব্রতীদের চিন্তাধারা দেশের প্রয়োজনে ও বিদ্যার্থীদের প্রয়োজনে ক্রমশঃ নূতনভাবে স্ফূর্তি লাভ করিবে, শিক্ষার সাঙ্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাব্রতিগণ ক্রমশঃ উপলব্ধি করিবেন।

শিল্প-শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের কর্তব্য

আসল কথা এই যে সকল দেশেই যার যার প্রয়োজনে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সর্বমানবের জন্য একটি অখণ্ডনীতি ও ব্যবস্থা এখনও পৃথিবীতে স্থিতি লাভ করে নাই। পরশোষণনীতি যদি আমাদের ত্যাজ্য হয়, মানব-মৈত্রী যদি আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজগত ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয়, তবে এ দেশের চিরন্তন "ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা"র আদর্শই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আমাদের শিক্ষার প্রগতিকে সেই পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। আজ বিশ্বময় সংঘাত ও ভীতির প্রাবল্য দেখা গিয়াছে। মানবতার বিকাশই যদি ইওরোপ-আমেরিকার লক্ষ্য হইত (হয়তো তাহারাও একদিন সেই লক্ষ্যকে গ্রহণ করিবে) তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষানীতি সেই আদর্শেই গঠিত হইত; পৃথিবী হইতে যুদ্ধের ভীতিও হয়তো চলিয়া যাইত। যে দুর্নীতি এই সংঘাতের জন্ম দিয়াছে, সেই নীতির কুশলতা যতই হোক না কেন আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে নিঃসংকোচে তাহা বাদ হইতে হইবে।

ভারতের সনাতন শিক্ষার আদর্শ কি? এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতে গেলে বলিতে হয়ঃ মানবতার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সাধারণ শিক্ষা, বস্তুজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞানের চর্চা ও ইহাদের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস—এদেশের গৌরবময় যুগে যেমনটি প্রকটিত হইয়াছিল, তেমনটি অন্য কোন সভ্যতায় বড় দেখা যায় না। অঙ্ক-গণনা-পদ্ধতি, জ্যামিতি, সামাজিক অনুশাসন, অর্থনীতি, বহু দার্শনিক মতবাদ প্রভৃতির সামঞ্জস্য ও সমন্বয়-প্রচেষ্টা এদেশে হইয়াছিল। বিদ্যাদানের ক্ষেত্রে গুরুগণ যে আদর্শে প্রণোদিত হইয়া বিষয়-সম্ভোগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ আমাদের বস্তু-তন্ত্রময়, স্বার্থদ্বন্দ্ব বিক্ষিপ্ত জীবনের পক্ষে আবার আলোচনা ও বিচারের বিষয় সন্দেহ নাই। শিক্ষা-গ্রহণকালে সংযমাত্মক জীবনযাপন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই একালের শিক্ষাব্রতীদের বিচারের বিষয়। এদেশে বিদ্যার চর্চা এমন এক স্তরে পৌছিয়াছিল যে, শিক্ষক আপন বিদ্যার্থীর জন্য প্রার্থনা করিতেন—"ব্রহ্মচারিগণ শম অর্থাৎ মনঃ-স্থৈর্য লাভ করুক।" নিজের সম্বন্ধে প্রার্থনা করিতেন—"আমি যেন ধনবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই।" এদেশকে, এদেশবাসীকে মহত্তর সভ্যতার ধারক হইতে হইলে বুদ্ধের ন্যায় মহামানবের বাণীকে আমাদের শিক্ষানৈতিক জীবনে সফল করিয়া তুলিতে হইবে। বুদ্ধবাণী এদেশেরই প্রতিভার দান।

শিক্ষা- ও বিদ্যাভ্যাস-দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান-দ্বারা জীবন সম্পূর্ণ বিকশিত করার মহত্তর আদর্শ অন্য কোন সভ্যতা তেমনটি করিতে পারিয়াছে কিনা, তাহা দেশের শিক্ষাব্রতীদের যাচাই করার দিন আসিয়াছে। সৃষ্টির বিচিত্র বিকাশের মূলে যে শক্তি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এদেশের প্রাচীন শিক্ষা-গুরু বলিতে পারিয়াছিলেন—"হে ঐশ্বর্য, সহস্র-শাখা অর্থাৎ বহুরূপ যে তুমি, তোমাতে আমি আপনাকে পবিত্র করি।"—"তুমি আশ্রয়, আমাকে আলোকিত কর অর্থাৎ তন্ময় কর।" জ্ঞানের দ্বারা জীবনকে আলোকিত করার কি অদ্ভুত প্রচেষ্টাই না এদেশে হইয়াছিল। ত্যাগের শক্তি অসাধারণ, ত্যাগের মহিমায় এদেশের বিশেষ বিশেষ যুগ মহিমান্বিত হইয়াছে।

সারাদেশে জনসাধারণের প্রতিভাবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইলে দেশের গৌরব আমাদের প্রণম্য মহাজনদের আদর্শকে বিচার করিয়াই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। সত্য, ন্যায় ও নীতির প্রাণস্বরূপ মৈত্রী ও প্রীতির আদর্শকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে হইবে। যে শিক্ষা- ও সমাজ-ব্যবস্থা হিংসার উদ্রেক করে, তাহা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গী সেইদিকে ফিরাইতে হইবে। তবে আমরা শিক্ষার মাধ্যমে মহত্তর সভ্যতা রচনার অধিকারী হইব।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ*

স্বামী সিদ্ধানন্দ

পূর্ববঙ্গের জ্যোতিঃস্বরূপ মহাপুরুষ নাগ-মহাশয়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া শ্রীলাটু মহারাজ একদিন "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ"-প্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলিলেন "বেদ-বেদান্ত পড়বার ঢের সময় পাবেন, কিন্তু নাগমহাশয় পৃথিবী হ'তে চ'লে গেলে অমন মহাপুরুষের আর কোথাও কখনো সাক্ষাৎ পাবেন না, এ সময়ে তাঁর সেবা করার সুযোগ ছাড়বেন না"। শ্রীলাটু মহারাজের এই প্রেরণাতেই শরচ্চন্দ্রের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেই রাত্রেই নাগমহাশয়কে দেখিতে দেওভো-গ যাত্রা করেন এবং তথায় শেষ অবস্থায় তাঁর অনেক সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বিলাত হইতে প্রথমবার ভারতে ফিরিবার পরে শ্রীলাটু মহারাজ সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। স্বামীজী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়া, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। সেই সব কথা স্মরণ করিয়া শ্রীলাটু মহারাজ বলিতেন, "অমন গুরু ভাই কি আর হয়? কত যত্ন ক'রে আমায় নিয়ে গিয়ে সব জায়গা দেখালে, যাতে আমার কোনও অসুবিধা না হয়। স্বামীজীর তো আপন দুই ভাই আছে, তাদের কখনো তিনি এমন যত্ন করেন নাই। গুরু ভাই সহোদর ভাইএর চেয়ে খুব আপনার হয়।"

শ্রীলাটু মহারাজেরও গুরুভ্রাতৃগণের প্রতি ভালবাসা ছিল অগাধ। আলমবাজার মঠে যখন শ্রীকালী মহারাজের (শ্রীঅভেদানন্দ স্বামীর) পায়ে অসুখ (thread worm) হয় তখন তিনি তাঁহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন।

সংযমও ছিল তাঁর অপরিসীম। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ ঠাকুরের প্রধান উপদেশ ছিল; একটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে শ্রীলাটু মহারাজ কিরূপে উহা পালন করিতেন। কাশ্মীর ভ্রমণের সময় তিনি স্বামীজীর সঙ্গে বোটে (নৌকাতে) থাকিতেন। ঐ বোটের মাঝির একটি মেয়ে

* গ্রন্থাকারে শীঘ্র প্রকাশিতব্য পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে।

দেখিতে খুব সুশ্রী ছিল, সে তার বাপের সঙ্গে বোটেই থাকিত। শ্রীলাটু মহারাজের সহিত একটু রহস্য করিবার উদ্দেশ্যে স্বামীজী সেই মেয়েটিকে একদিন বলিলেন, "গ্যাখ্, এই পানটি ওধারে যে সাধু বসে আছে, তুই তার হাতে দিয়ে আয় দেখি"। বালিকা স্বামীজীর এই কথায় খুশী হইয়া লাটু মহারাজের নিকটে গিয়া তাঁকে পানটি দিতে গেল। তার পান দেবার আগ্রহ দর্শনে শ্রীলাটু মহারাজ প্রথমে বিরক্ত, তার পর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি এতদিন বোটে রয়েছি, কই! একদিনও তো এই মেয়েটি আমায় পান দিতে আসে নাই, আজই বা আসে কেন? এ দেখছি নিশ্চয়ই বিবেকানন্দের কারসাজি, বটে! আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে? না, এ বোটে আর থাকা হবে না, এ স্থান ত্যাগ করাই উচিত।—যেমন মনে মনে এই সংকল্প, অমনি সঙ্গে সঙ্গে লাটু মহারাজ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন,—ডুবে যাব, কি ভেসে যাব—সে চিন্তা তাঁর একেবারেই নাই! স্বামীজী আড়াল হইতে দেখিতেছিলেন লাটু কি করে। তিনি যে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন—এতটা তিনি মনে করেন নাই। তখন তিনি তাড়াতাড়ি, মাঝি-মাল্লাদের ডেকে লাটুকে জল হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লাটু মহারাজ তো কোনমতেই বোটে উঠিতে চান না। শেষটা বহু সাধ্যসাধনার পর স্বামীজী শ্রীলাটুকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করেন।

স্বামীজী ভারতের উত্তর-পশ্চিমদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে খেতড়ীতে আসিয়া কিছুদিন তাঁহার শিষ্য খেতড়ী-রাজের নিকট অবস্থান করেন। সেই সময়ে শ্রীলাটু মহারাজও তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ঐ রাজার ধারণা ছিল যে স্বামীজীর গুরুভাই লাটু মহারাজও ইংরেজীভাষা জানেন, তাই তিনি একদিন একটা বড় Globeএর (গোলাকার মানচিত্রের) সামনে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সেই মানচিত্রে অঙ্কিত কোন একদেশের বিষয় ইংরেজী ভাষায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীলাটু মহারাজ তো নিরুত্তর, কেবল দাঁড়াইয়া মানচিত্র দেখিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে স্বামীজী কিছু তফাতে বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। লাটুমহারাজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে সেই দেশ সম্বন্ধে কতকথা এমনভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে তিনিও খুব খুশী হইয়া গেলেন; অথচ স্বামীজী রাজাকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলেন না যে তাঁহার গুরুভাইটি ইংরেজী লেখাপড়া জানেন না। এইরূপে স্বামীজী রাজার নিকটে শ্রীলাটু মহারাজের মান সম্ভ্রম বজায় রাখিলেন। স্বামীজী তাঁহার এই গুরুভাইটির নিরক্ষরতার আবরণের ভিতরে এক অদ্ভুত গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ বলেন, শ্রীলাটু মহারাজ যে আমাদের গুরু-ভাই ছিলেন, ইহা যথার্থ ই আমাদের গৌরবের বিষয়।

স্বামী বিবেকানন্দের গুণ ও মহিমার কথা বলিতে বলিতে শ্রীলাটু মহারাজ আত্মহারা হইয়া যাইতেন। একবার তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীলাটু মহারাজ বলিতে লাগিলেন: গ্যাখ, প্রথমবার বিলাত হ'তে এসে একদিন সেই সাবেক বরানগর মঠের চালে মোটা চাদরখানি গায়ে দিয়ে স্বামীজী বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, 'ভাই লাটু! আমি সেই নরেন, তুইও যেমন ভিখারী, আমিও সেইরকম ভিখারী সন্ন্যাসী; গুরুভাইদের থাকবার জন্য মঠ স্থাপনা করতে হ'ল, আমার জন্য কিছু দরকার নেই, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই এত বড় ব্যাপার হ'য়ে গেল। আজ তোর কাছেই ভিক্ষা করা যাক্, আয় দুজনে একসঙ্গে খাই।'—আমি তখন খেতে যাচ্ছিলাম স্বামীজীও আমার সঙ্গে একপাতে খেতে বসে গেলেন, তাতে আমার মনে কোনো ভিন্ন ভাব হয় নাই, বরং আমার প্রাণ 'হরষিত' হ'ল।

অনুতাপ

[একটি প্রচলিত কাহিনী-অবলম্বনে]

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

রূপচতুর্ভুজ! কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশদাম-শোভিত বংশীধারী শ্যাম, কিশোর মূর্তি। যেমন বিগ্রহের রূপ পরিকল্পনা, তেমনি নাম পরিকল্পনা! এ কল্পনার মধ্যে একটি সুমধুর ভাবব্যঞ্জনা যেন সুষম ছন্দে স্থির হয়ে আছে।

রূপচতুর্ভুজের মন্দির—বিশেষ কোন তীর্থস্থানের বিখ্যাত কোনো দেবমন্দির নয়। উদয়পুরের নিকটবর্তী কোন একটি গ্রামের গ্রামদেবতা। প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরগুলির মতো এখানেও নিত্য-সেবার ব্যবস্থা আছে, এবং একটি পূজারী-বংশও আছে। পুরুষানুক্রমে এঁরাই দেবসেবার অধিকারী।

এ সময়ে পুরোহিত 'দেবা' ছিলেন বিগ্রহের সেবাইত। দেব-সেবা করতে করতে দেবার চুলে পাক ধরেছে, দেহে এসেছে দুর্বলতা, কিন্তু জীবিকা-নির্বাহের জন্য এ কাজ তাঁর না করলেও নয়।

একজন বৃদ্ধ পুরোহিতের নাম 'দেবা'! এ কেমন অশ্রদ্ধাপূর্ণ অসম্মানসূচক অভিধা? এমন কেন? কেন—সে কথা বলতে হ'লে বলতে হয়, দেবার নিজের বাল্যজীবনই এই নামের জন্য দায়ী।

কে জানে সম্পূর্ণ কি নাম ছিল দেবার! হয়তো দেবনাথ, হয়তো দেবরাজ, হয়তো দেবজীবন, হয়তো বা অমনি একটা কিছু। কিন্তু সে কথা এখন আর কারো মনে নেই। সবাই জানে 'দেবা'।

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেও ছেলেবেলায় তার আচরণ ছিল রাখাল ছেলেদের মতোই। বিদ্যাভ্যাসে আদৌ মন নেই, মাঠে জঙ্গলে পাহাড়ের কোলে কোলে খেলে বেড়ানোতেই দেবার একান্ত আনন্দ। কাজেকাজেই মূর্খ দেবার পক্ষে শাস্ত্রাধ্যয়ন বা পূজাপদ্ধতি শিক্ষা সম্ভব হ'লনা, পিতার মৃত্যুর পর কেবলমাত্র উত্তরাধিকার-সূত্রেই কিশোর দেবা দেবসেবার অধিকার লাভ ক'রল। উত্তরাধিকার-সূত্রে কর্মে অধিকার জন্মালেও, শ্রদ্ধা-সম্মানের অধিকার তো জন্মায় না। গ্রামের সকলে অবহেলায় উচ্চারণ করে "দেবা পূজুরী"। আজ পর্যন্ত সেই নামই রয়ে গেছে। কিন্তু আজীবন দেবসেবার ফলে মূর্খ দেবার অন্তরের অজ্ঞান-অন্ধকার কি এতোটুকুও দূর হয় নি? কে জানে সে কথা!

লোকে দেখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিত্য প্রভাতে এসে মন্দিরের দরজা খোলেন, মন্দিরতল মার্জনা করেন, বাসি ফুলপাতা বাইরে ফেলে দিয়ে নতুন মাল্য রচনা ক'রে বিগ্রহের হাতে গলায় মাথায় পরান, প্রদীপ জ্বালেন, ঘণ্টা নাড়েন, 'ভোগ' দেন। অতঃপর সেবাইতের প্রাপ্য লাড্ডু, মিঠাই ইত্যাদি প্রসাদটুকু পুঁটুলিজাত ক'রে মন্দির-দ্বারে শিকল তুলে দিয়ে গৃহে ফিরেন—এই পর্যন্ত।

সন্ধ্যাতেও সেই একই পদ্ধতি। তবে প্রভাতে যেমন সমগ্র জগৎ-সংসারে কর্মের ঝন্‌ঝনা বাজে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের অসংখ্য আহ্বানে চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, সন্ধ্যায় তো তেমন নয়! সন্ধ্যায় পাখীরা বাসায় ফিরে ডানা মুড়ে বসে, রাখালবালক-তাড়িত ধেনুর দল গোহালে এসে আশ্রয় নেয়, চাষী ধান কাটা বন্ধ করে, কুমোরের চাক থামে, কামারের 'নেহাই' শীতল হয়। সন্ধ্যায় গৃহস্থের মেয়েরা দিনের কাজ সমাপন ক'রে রাতের কাজ স্থগিত রেখে স্থির হ'য়ে বসে, শিশুরা গায়ের ধুলো ঝেড়ে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

সন্ধ্যার আকাশে অনন্ত অবসরের সুর বাজে।

তাই পুরোহিত দেবা সন্ধ্যা পূজা শেষ হ'য়ে গেলেও নিশ্চিন্ত চিত্তে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন্দিরে যাপন করেন। হয়তো কখনো পরদিনের পূজার

বাসনপত্র পরিষ্কার ক'রে রাখেন, কখনো মৃদু গুঞ্জনে গান গাইতে থাকেন, আর রাত্রি গভীর হ'লে বিগ্রহের রাজবেশ উন্মোচন ক'রে রাত্রিবেশ পরিয়ে 'শয়ান' দেন; প্রসাদী মালাটি মাথায় বেঁধে নিয়ে দুয়ারে তালা লাগিয়ে ফেরেন। এই নিত্যকর্ম দেবার।

গৃহস্থেরা মন্দিরে পূজা দিতে এলে দক্ষিণা দেন যৎসামান্য; হাস্যপরিহাসের ক্ষেত্রে বলেন "যেমন বামূনা, তেমন দক্ষিণা।" মেয়েরা কাঁদুনে ছেলেকে শাসায়: ওই দেবা আসছে! দেবা যেন জুজুবুড়ি।

কিন্তু এজন্য দেবার মনে কোন ক্ষোভ নেই। শান্ত স্বল্পবাক্ প্রসন্নচিত্ত ব্রাহ্মণ নিজের কাজ, নিজের সংসার নিয়েই আছেন। তথাপি বিড়ম্বনা আসে; এই নিজেকে নিয়েই বিড়ম্বনা।

এক সন্ধ্যায় ঘোরতর বিপদে পড়ে যান দেবা।

সেদিন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, সন্ধ্যাকালেও বাতাসের লেশ নেই, সন্ধ্যারতি সমাপনান্তে দেবা নিতান্ত তৃষ্ণা অনুভব করেন। এখনো মন্দিরে কিছু কাজ অসমাপ্ত আছে; গৃহ অনেকটা দূর, দেবা ঈষৎ ইতস্ততঃ ক'রে প্রসাদী লাড্ডু দুটির সহযোগে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত জলটুকু পান ক'রে ফেলেন। আজ আর মন্দিরে মধ্যে বসে সঙ্গীত সাধনা সম্ভব নয়, ভিতরে অসহ্য গুমোট; দেবা অন্যদিন অপেক্ষ আগেই প্রসাদী মালাটি মাথায় বেঁধে নিয়ে বিগ্রহকে 'শয়ান' দেন, এবং দ্রুতহস্তে অসমাপ্ত কাজগুলি সারতে থাকেন, সহসা মন্দির-দ্বারে অধীর করাঘাত!

এ কি! কার এই করাঘাত! এমন তো কোনোদিন হয় না। এতো রাত্রে গ্রাম-প্রান্তে অবস্থিত এই মন্দিরের দিকেও কেউ আসে না, পূজা ইত্যাদি যা কিছু দিনের বেলাই শেষ ক'রে যায়। কেন কে জানে, কী এক আতঙ্কে বুকটা কেঁপে ওঠে দেবার। তিনি ত্রস্তে ব্যস্তে মাথায় বাঁধা মালাটি নামিয়ে রেখে মন্দিরদ্বারে ছুটে আসেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ দেবার জ্ঞানচৈতন্য প্রায় লুপ্ত হবার উপক্রম হয়।

মন্দির দ্বারে শিকারীর বেশ পরিহিত অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত স্বয়ং মহারাণা বাহাদুর।

না, চিনতে ভুল হয়নি দেবার। মাত্র কিছুদিন আগেই মহারাণা পিতৃশ্রাদ্ধ-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের আয়োজন করেছিলেন, দেবা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। যদিও দেবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নন, তথাপি দেবমন্দিরের পুরোহিতের অধিকারেই রাজসভায় উপস্থিত হবার অধিকার লাভ করেছিলেন।

চিনতে ভুল হয় না, কিন্তু দেবার আর বাক্য-স্ফূর্তি হয় না। কে জানে কেন এই আবির্ভাব! দেবা যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ, সেই সংবাদটুকু কি কেউ রাজকর্ণে পরিবেশন করেছে? সেই অপরাধে কি বৃদ্ধ বয়সে দেবার এই ক্ষুদ্র জীবিকাটুকু যাবে? খুব সম্ভব তাই। গ্রামে হিতকামীর তো অভাব নেই!

দেবা নীরব, নতমস্তক—বদ্ধাঞ্জলি।

রাণা কিন্তু দেবার ভীতিকর কিছু বলেন না, তিনি যা বলেন তার সার মর্ম এই—তিনি শিকারের ঝোঁকে মৃগশিশুর পিছন পিছন ছুটে সঙ্গীদল থেকে বিচ্যুত, এবং পিপাসার্ত; এখানে দেব-মন্দিরের দীপশিখা দেখে, আশান্বিতচিত্তে পিপাসা নিবারণার্থে ছুটে এসেছেন। এখন পূজারী তাঁকে কিঞ্চিৎ জলদান ক'রে শান্ত করুন। তিনি বড়ো শ্রান্ত ক্লান্ত, এইদণ্ডে চাই—শুধু একটু জল!

জল! দেবার সমস্ত বুকটা রাজপুতনার মরু-ভূমির মতোই ধু ধু করে ওঠে। কণ্ঠে তালুতে সেই মরুভূমির শুষ্কতা। আজ সন্ধ্যাতেই দেবা বিগ্রহের পানপাত্রে জল ঢালার পর দেখেছেন কলসীতে আর বিন্দুমাত্র জল নেই। আজকের প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে মাটির কলসীটাই অর্দ্ধেক জল শুষে নিয়েছে। কাজ মিটে গেছে বলে রাত্রের অন্ধকারে আর

দূরবর্তী কূপ থেকে জল সংগ্রহ করতে যাননি দেবা, আর আজকেই এই দুর্বিপাক!

দেবা হাতজোড় ক'রে বলেন, "প্রভু একটু বিশ্রাম করুন, আমি জল আনি।"

অধীর রাণা বিরক্তস্বরে বলেন, "বিশ্রামের প্রয়োজন নেই পূজারী, সর্বাগ্রে জল আনো।"

দেবা দ্রুতগতিতে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে হতাশভাবে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন, নাঃ, কোথাও নেই একবিন্দু জল। অতএব আর করবার কি আছে? শূন্য কলসীটি উঠিয়ে নিয়ে দেবা মন্দিরের বাইরে পা বাড়ান। পিপাসার্ত রাণার ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় না।

মেজাজ সপ্তমে উঠে। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, "ঠাকুর কি মৃত্তিকা খনন ক'রে জল আনতে যাচ্ছেন?"

দেবার হাত পা অবশ হয়ে আসে, তথাপি তিনি কষ্টে সাহস সংগ্রহ ক'রে বলেন, "না, প্রভু, অদূরেই দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত নির্মল কূপ আছে, আমি এই দণ্ডেই—"

রাণা ব্যঙ্গহাস্যে বলেন, "আজ বোধ করি দেববিগ্রহের ভাগ্যেও পানীয় জল জোটেনি?"

দেবা বিস্মিতভাবে বলেন, "সে কী প্রভু?"

"অগত্যা আর কি ভাবা যায়! কেন, সেই প্রসাদী জলটুকু দান ক'রেই তো আমার তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারতেন?"

দেবা প্রমাদ গণেন। রাণা উত্তরের আশায় অপেক্ষমাণ, ভয়ে দেবার হাত পা থর থর করতে থাকে। 'জলটুকু আমি পান ক'রে ফেলেছি'—এ কথা কেমন ক'রে এই তৃষ্ণার্ত রাজ-অতিথির সামনে উচ্চারণ করা যায়? দেবা মনে মনে ভাবেন, লোকমুখে শুনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নাকি ভগবান বিরাজমান, তবে অবশ্যই আমার মধ্যেও তিনি আছেন। অতএব যা থাকে কপালে—

দেবা নতমস্তকে বলেন, "প্রভু দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত জল স্বয়ং দেবতাই গ্রহণ করেছেন।"

রাণা চমকে ওঠেন!

পরক্ষণেই ক্রোধে তাঁর আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। উঃ, কী পাপিষ্ঠ শয়তান এই ধড়িবাজ ব্রাহ্মণ! নিশ্চয়ই আলস্যের জন্য আজ জল আনয়ন করেনি, দেবতাকে উপবাসী রেখে দিয়েছে, আর এখন বিপদে পড়ে এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যাকথা অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করছে। তিনি হাতের তরবারি স্পর্শ ক'রে বলেন, "ব্রাহ্মণ, দেবতার স্থানে মিথ্যাকথা বলার শাস্তি কি জানো?"

দেবা বোঝেন আজ তাঁর জীবনের শেষ দিন, তবু ভয় এমন জিনিস যে তিনি সাহস ক'রে মাথা তুলতে পারেন না। রাণা গম্ভীরভাবে বলেন, "থাক্, ব্রাহ্মণরক্তে আমার তরবারি কলঙ্কিত করতে চাইনা। তোমার বিচার কাল হবে।"

রাণাকে প্রস্থানোদ্যত দেখে দেবা ভয় ভুলে ব্যগ্রভাবে বললেন, "প্রভু আগামী কাল যা হয় হোক—, আপনি জলপান না ক'রে যাবেন না। পিপাসার্তকে 'জল দান' না করতে পারলে আমার আজন্মের দেবসেবার ফল ব্যর্থ।"

মহারাণা গর্জন ক'রে বলেন, "মিথ্যাবাদীর হাতের জল আমি গ্রহণ করি না।"

মিথ্যাবাদী! দেবার সমস্ত দেহে সহসা এক অদ্ভুত সাহসের জোয়ার আসে, তিনি মাথা তুলে স্থিরস্বরে বলেন, "আমি মিথ্যাবাদী নই।"

"মিথ্যাবাদী নও?"

"না।"

রাণা সহসা কি ভেবে ক্রোধ সংবরণ ক'রে বলেন, "বেশ! তা'হলে জল আনো, আমি মন্দির মধ্যে অপেক্ষা করছি।"

ফাঁড়া কাটল ভেবে দেবা দ্রুতপদে জল আনতে যান, আর মহারাণা মন্দির মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখেন, দেবতা শয্যায় শায়িত, এবং নিকটেই একটি শূন্য জলপাত্র ও মিষ্টান্নের পাত্র অবস্থিত। মহারাণার ওষ্ঠে একটু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। ওঃ!

লোভী ব্রাহ্মণ নিজেই প্রসাদের সদ্ব্যবহার ক'রে রেখেছে।

দরিদ্র বৃদ্ধ গ্রাম্য ব্রাহ্মণের প্রতি একটু কৃপা অনুভব করেন মহারাণা। অতঃপর দেবা জল নিয়ে উপস্থিত হ'লে তিনি ক্রোধ প্রকাশ না ক'রে সহাস্যে বলেন, আগামীকাল তিনি রূপচতুর্ভুজের ভোগ চড়াবেন, এবং মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত উপস্থিত থাকবেন। কারণ তিনি দেবতার আহার ও জলপান দেখতে বিশেষ উৎসুক। বলা বাহুল্য দেবা নীরব।

রাণা বিদায়গ্রহণ-কালে হাত বাড়িয়ে বলেন, "পূজারী ঠাকুর, ওই প্রসাদী মালাটি আমাকে দাও।"

আবার! আবার সেই বিপদ!

হা ভগবান, হা রূপচতুর্ভুজ, দেবা আজ কার মুখ দেখে শয্যাত্যাগ করেছিলেন? এ মালা কেমন করে রাজ-শিরে অর্পণ করবেন দেবা, এ যে দেবার নিজের ব্যবহৃত মালা? মনে পড়ে রাণার ক্ষণপূর্বের অগ্নিমূর্তি। কম্পিত হাতে মালাটি তুলে দেন দেবা।

মহারাণা গলায় পরবার পূর্বে প্রদীপের আলোয় মালাটি নিরীক্ষণ করতে যান, পাছে পুষ্পে কীট ইত্যাদি থাকে, আর নিরীক্ষণ ক'রেই ঘৃণা ও ব্যঙ্গের সংমিশ্রণে গঠিত একটি ভয়াবহ হাসি হেসে বলেন, "রূপচতুর্ভুজের কেশকলাপে আজকাল বুঝি পাক ধরেছে ঠাকুর?" দেবা হতবাক্।

মহারাণা আবার বলেন, "দেবতার মালায় একগাছি পক্ককেশ জড়িত দেখছি। নারায়ণ বৃদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন, কেমন? তাই না?"

আবার সেই ভয়। বুদ্ধিভ্রংশকারী রাজভয়। দেবা মন্ত্রচালিতের মতো বলে ফেলেন, "হ্যাঁ, মহারাণা!"

উঃ! কী ধৃষ্টতা! কী দুঃসাহস! রাজরক্তে আর কতো সহ্য যায়! তবু মহারাণা দাঁতে দাঁত চেপে রোষ সংবরণ ক'রে বলেন "আচ্ছা! ওহে সত্যভাষী ব্রাহ্মণ, আগামী কাল গ্রামসুদ্ধ লোকের সামনে তোমার সত্যভাষণের বিচার হবে।"

মালাটি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলে দিয়ে মহারাণা বীরদর্পে মন্দির ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবাও লুটিয়ে পড়ল দেবতার সামনে।

'প্রভু চতুর্ভুজ, এ কী করলে!—কেন দেবার মুখ হ'তে এমন নির্লজ্জ মিথ্যাকথা উচ্চারণ করালে?'

না জানি আগামীকাল এই বৃদ্ধের কপালে কী লাঞ্ছনা আছে! মৃত্যুদণ্ড হ'লেও বা ভালো, কিন্তু যদি গ্রামসুদ্ধ সকলের সম্মুখে অপমানিত হ'তে হয়! প্রভু, শুনেছি তুমি নাকি লজ্জানিবারণ হরি, যুগে যুগে কালে কালে তুমি ভক্তের লজ্জা নিবারণ ক'রে আসছ, আজ কি তোমার সেই চিরকালের নাম আর একবার সার্থক করবে না?

কাতর প্রার্থনার মুহূর্তে আবার অন্য বোধ আসে দেবার। তিনি হতাশ চিত্তে চিন্তা করেন—আমি কোন্ মুখে বলছি, নারায়ণ ভক্তকে রক্ষা করো! কবে আমি তাঁ'তে অনুরক্ত হয়েছি? কেবলমাত্র উদরান্নের জন্যই তো আমার এই দেব-সেবা! এই দেবসেবার আবার অহঙ্কার!

চোখের জলে বুক ভেসে যায় দেবার। অনুতাপের অনলে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে ওঠে, অনন্তের ধ্যানে অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়মন্দিরে জ্ঞানের শিখা জ্বলে ওঠে। অনুতাপ আর আত্মচিন্তা! যেন দু'টি অরণি-কাষ্ঠ! যুগপৎ দুইয়ের সংঘর্ষে জ্ঞানালোক জ্বলে ওঠে। রাজভয়ে ভীত দেবার দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হয়। এ কী করলাম! এই শুধু চিন্তা দেবার।

রাজরোষ থেকে অব্যাহতি পাবার প্রার্থনা আর মনে ঠাঁই পায় না, অবিরত চোখের জলে বুক ভাসে। হে চতুর্ভুজ নারায়ণ, হে ত্রিলোকনাথ, যে মুখ হ'তে সামান্য মানুষের ভয়ে তোমার মূর্তিমান বিগ্রহের সামনে মিথ্যাবাক্য উচ্চারিত হয়েছে, সেই মুখ এই মুহূর্তে দগ্ধ হোক, ভস্ম হোক, অথবা ভয়াবহ—বিকৃত—কুৎসিত হ'য়ে যাক। গ্রামবাসীর সম্মুখে সেই বিকৃত দগ্ধ মুখ দেখিয়ে যেন আপন পাপ ব্যক্ত করবার সাহস জন্মায় দেবার।

কাঁদতে কাঁদতে কখন এক সময় ঘুম এসে যায় অনুতপ্ত হতভাগ্যের। ভোর রাত্রে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেন দেবা: বংশীধারী শ্যামকিশোর রূপচতুর্ভুজের কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামগুলি উজ্জ্বল রূপালী হ'য়ে গেছে। সেই শুভ্র উজ্জ্বল কুঞ্চিত কেশের নীচে অবস্থিত অপূর্ব সুন্দর আননে এক অদ্ভুত অভয় হাস্য!

প্রভাত হ'তে না হ'তে গ্রামে 'ঢেঁড়া' পড়ে গেছে—চতুর্ভুজের মন্দির-প্রাঙ্গণে সকলের জমায়েৎ হবার জন্যে। দেবার বিচার হবে। কৌতূহলী জনতা দলে দলে এসে হাজির হচ্ছে!

দেবা কিন্তু নিদ্রাতুর।

ভোরের সূর্য সাদা হ'য়ে উঠতে না উঠতেই বেজে ওঠে কাড়া নাকড়া—মহারাণা আসছেন! সঙ্গে জল্লাদ—জ্বলন্ত সাঁড়াশি দিয়ে দেবার জিভ ছিঁড়ে নেবার জন্যে। দেবমন্দিরের পূজারী হ'য়ে যে ব্যক্তি রাজ সকাশে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করে, এ ছাড়া আর কি শাস্তি দেওয়া যায় তাকে?

"এই বুড়ো ওঠ্!" প্রহরীদের চীৎকারে ধড়মড় ক'রে উঠে বসেন দেবা। অবাক হ'য়ে এদিক ওদিক চান, জনতার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায় সব কথা। কিন্তু দেবার হৃদয় থেকে ভয় দূর হ'য়ে গেছে। যে সমর্পিত-প্রাণ, তার কাছে ভয়ের বাসা! কোথায় বাসা নেবে? যেখানে ঈশ্বরানুভূতি, সেখানে ভয়ের মৃত্যু! যেখানে আত্মোপলব্ধি, সেখানে ভয়ের শেষ!

দেবা শিষ্টনীতি অনুসারে মহারাণাকে অভিবাদন করেন। মহারাণা তীব্রস্বরে বলে ওঠেন, "এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের জিভ জ্বলন্ত সাঁড়াশী দিয়ে ছিঁড়ে নাও! এ দেবতার সম্মুখে, রাজার সম্মুখে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করেছে।"

হিংস্র জনতা কোলাহল ক'রে ওঠে। একের অপমানে অপরের আনন্দ! একের লাঞ্ছনায় অপরের উল্লাস! শত্রু হোক বা না হোক, চোখের সামনে কাউকে অপমানিত হ'তে দেখলেই মানুষের ভিতরের হিংস্র পশুটা উল্লসিত হয়ে ওঠে।

দেবা কোনদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। শুধু স্থিরভাবে বলেন, "আমি মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করিনি মহারাণা!"

"ফের! ফের এই নির্লজ্জতা!...ওহে শুনছ তোমরা, এই ভক্ত ব্রাহ্মণ বলেছে: চতুর্ভুজ নারায়ণ বৃদ্ধ হ'য়ে গেছেন, তাঁর কেশ পাক ধরেছে। বলেছে: বিগ্রহ জলপান করেছেন! এখন আবার বলছে, সে নাকি সত্য কথা বলেছে। এর কি শাস্তি হওয়া উচিত?"

জনতার মধ্যে কোলাহল ওঠে—

"জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ!" "বন্য কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো!" "জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত করা!"—"মার, মার, মেরে ফেল!"

একজন গ্রাম্য বৃদ্ধ এগিয়ে আসেন। জনতাকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে দুই হাত তুলে বলেন, "আচ্ছা, শাস্তিদানের পূর্বে একবার সত্য মিথ্যা যাচাই হোক না! মশারির আবরণ থেকে উন্মুক্ত ক'রে রূপচতুর্ভুজকে দেখা হোক।"

"ঠিক ঠিক!"

"এই দেবা, ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোল্।"

দেবা ধীরে ধীরে বিগ্রহের সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হন, ধীরে ধীরে বিগ্রহের মশারি সরিয়ে দেন।

মন্দিরের ঘুলঘুলি পথে সকালের উজ্জ্বল আলো এসে ভিতরে ঝিকিমিকি করছে, ঝিকিমিকি করছে বিগ্রহের অঙ্গাভরণ, স্বর্ণালঙ্কার। আর সেই আলোয় ঝকমক করছে শুভ্র কুঞ্চিত কেশদাম। প্রস্তরময় দেবতার চুলগুলি রূপোর তারের মতো জ্যোতির্ময় হ'য়ে গেছে।

সেই কেশকলাপের নীচে অপূর্ব সুন্দর আননে অদ্ভুত এক অভয় হাস্য!

যাদু! যাদু! মায়া! কী দুঃসাহস! পাপিষ্ঠ দেবতাকে যাদু করেছে!

মহারাণা তীব্র গর্জনে বলে ওঠেন, "ভেবেছিলাম

ব্রাহ্মণের রক্ত গ্রহণ করবো না, কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর পাপিষ্ঠ লোককে জীবিত রাখাও মহাপাপ। রাতারাতি ও দেবতার মাথায় নকল কেশ পরিয়েছে, ওই নকল কেশগুলি উৎপাটন ক'রে এনে ব্রাহ্মণের গলদেশে জড়িয়ে দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে হত্যা করো।"

জল্লাদও কেঁপে ওঠে। কে পালন করবে এই আদেশ! হোক নকল, তবু কে উৎপাটন করবে দেবতার কেশ! কেউ না পারে, স্বয়ং মহারাণা আছেন!

সত্য-গর্বে গর্বিত মহারাণা নিজেই সদর্পে এগিয়ে যান, এবং সবলে বিগ্রহের ললাটের এক গোছা কেশ উৎপাটিত ক'রে নেন। সঙ্গে সঙ্গে রূপচতুর্ভুজের সুগঠিত ললাটের উপর গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত!

মূর্চ্ছিত হ'য়ে লুটিয়ে পড়েন মহারাণা!

* * *

কিংবদন্তী আছে অদ্যাবধি নাকি রাণা বা রাণা-বংশীয়দিগের উক্ত মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই।

জাগে ওই স্নেহের আহ্বান

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

আসিছেন জগৎ-জননী মৃত্তিকার ধরণীর 'পরে,
অম্লান স্বর্গীয় দ্যুতি ঝরিতেছে দিকে দিগন্তরে!
নেমে আসে অপার্থিব অলৌকিক রূপের প্রকাশ,
বনানী সাজিছে শ্যামা, গাঢ় নীল অসীম আকাশ!
ফুলে ফুলে ভ'রে গেছে মাঠ বাট বন উপবন,
মধুর সুরভি-শ্বাসে সুরভিত মৃদু সমীরণ!
জলে স্থলে জাগে সাড়া বিহঙ্গের সুমধুর গানে,
সুরে সুরে ভুবনের প্রাণ-ছন্দ বাজে সবখানে!
জড়েতে চেতনা জাগে, হাসি ঝরে দিগ্বধূ-অধরে,
ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে ত্রিদিবের সুধা-ধারা ক্ষরে!

আসিছেন দশভুজা, আসিছেন কল্যাণ-রূপিণী,
আসিছেন বরাভয়া, সর্বময়ী নিখিল-ব্যাপিনী!
আসিছেন আদি-মাতা, সন্তানেরে বক্ষে তুলে নিতে,
অপার স্নেহের উৎস পিপাসার্ত হৃদয়ে ঢালিতে!
আসিছেন মহাশক্তি শক্তিহীনে শক্তি দানিবারে,
শুনাতে সান্ত্বনা-বাণী দীনাতুর সকল-হারারে!
ওরে অন্ধ, ওরে মূঢ়, চেয়ে দেখ্ খুলিয়া নয়ন,
মায়ের রূপের ভাতি ছেয়ে গেছে আকাশ-ভুবন!
মায়ের আশিস্ ঝরে ধরণীর ধূলি-পঙ্ক 'পরে,
তুলে নে' মস্তক পেতে রিক্ত নিঃস্ব অন্তরে অন্তরে!

খুঁজিয়া ফিরিস্ তোরা মরুভূমে কোথা তৃষ্ণাবারি,
মা'র দশভুজে রাজে তৃষ্ণাহারী অমৃতের ঝারি!
ছুটে আয় একবার, ফিরে আয় মায়ের সন্তান,
অনন্ত আকাশে শোন্—জাগে তাঁর স্নেহের আহ্বান!
মরীচিকা-ভ্রান্ত হ'য়ে কোথা যাস্, আয় ফিরে আয়,
সঁপে দে' হৃদয়-মন জননীর দু'টি রাঙা পায়!

'টাহো'র তীরে বেদান্ত-কুটীর

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। আমেরিকায় এখন গ্রীষ্মকাল—প্রখর কর্মজীবন থেকে একটু ছুটি নিয়ে আমেরিকানদের নিজের নিজের সুযোগ- এবং সঙ্গতি-অনুযায়ী কিছুকাল কোন ঠাণ্ডা জায়গায় বেড়িয়ে আসবার বহু-প্রত্যাশিত সময়। এদেশে ঘরে আর এখন কারো মন টেকে না। তিন লক্ষ বিরাশী হাজার বর্গ মাইলের এই বিরাট রাষ্ট্রে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের অভাব নেই; তাই, উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই বেড়াবার জায়গা প্রচুর। লক্ষ লক্ষ নরনারী ঘরের চিন্তা, কাজের চিন্তা, রাজনীতি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান-চর্চা আপাতত শিকেয় তুলে রেখে পথে বেরিয়ে পড়েছে—ট্রেনে, মোটরে, এরোপ্লেনে, বাসে আবার জাহাজেও। যেমনভাবে হোক দৈনন্দিন চালু জীবনের একঘেঁয়ে চাপ থেকে কিছুদিনের নিষ্কৃতি চাই-ই চাই। স্কুল কলেজ এবং সরকারী ও বেসরকারী সব অফিসেই গরমের ছুটির ব্যবস্থা আছে। যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাঁরাও স্বেচ্ছায় কিছুদিন গরম কালে বাহিরে বেড়াবার আনন্দ ভোগ করবার অবসর করে নেন, আর্থিক ক্ষতির প্রশ্ন তোলেন না। আমেরিকার নানা অঞ্চলে 'ন্যাশনাল পার্ক' বা সংরক্ষিত বন রয়েছে। তাঁবু এবং কয়েক সপ্তাহের ভ্রাম্যমাণ সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মোটর বা ষ্টেশন-ওয়াগনে ভর্তি করে বহু শত পরিবার এই 'ন্যাশনাল পার্ক'গুলির উদ্দেশ্য চলেছে—বড় বড় রাস্তায় এই সময়কার এটি খুব সাধারণ দৃশ্য। আরণ্য প্রকৃতির মাঝখানে এদের গ্রীষ্মাবকাশ কাটবে। যান্ত্রিকতার শৃঙ্খল থেকে কয়েক দিন তো ওরা মুক্তি পাবে!

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বেদান্ত-সমিতির ভারতীয় সন্ন্যাসীদেরও গরমের ছুটি, কেননা, বেদান্তের ক্লাসে বা বক্তৃতায় যারা আসবে তাদের অনেকেই এ সময়ে বাইরে চলে যায়। তা ছাড়া সারা বছরই বেদান্ত-সমিতির কাজে সন্ন্যাসীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়—মাস দুই তাঁদের একটু বিশ্রাম খুবই প্রয়োজন। নিজ নিজ কর্মকেন্দ্রেই কেউ বিশ্রাম নেন, কেউ বা বাইরে কোথাও যান।

স্যানফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত-সমিতি ১৯৩৮ সালে ক্যালিফর্নিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে লেক টাহো (Lake Tahoe) নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ে একটি আশ্রম-গৃহ নির্মাণ করেন। ঐ বাড়ীটির সংলগ্ন দু'শ একর পাইন, দেওদার এবং সিডার গাছের বন ঐ সমিতির দখলে। অতএব এই আশ্রমটির নির্জনতা ব্যাহত হবার কোন আশঙ্কা নেই। স্যানফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত-সমিতির সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা এবং আমেরিকার অন্যান্য আশ্রম থেকেও কোন কোন সন্ন্যাসী লেক টাহোর এই আশ্রমে গ্রীষ্মের ছুটির পুরো বা খানিকটা অংশ কাটিয়ে যান। বাড়ীটি থেকে কয়েক শত ফুট নীচেই ২৩ মাইল লম্বা এবং ১২ মাইল চওড়া বিরাট হ্রদ—লেক টাহো। স্বচ্ছ নীল তার জল। হ্রদের চারিদিকে আট থেকে দশ হাজার ফুট উচু পর্বতমালার প্রাচীর। শীতকালে সমস্ত পাহাড়ই বরফে ঢেকে যায়। এখন এই জুলাইতে কোন কোন পাহাড়ের চূড়ায় কিছু বরফ রয়েছে। লেক টাহো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬২২৮ ফুট উচ্চে, আয়তন ১৯৩ বর্গমাইল, সর্বাধিক গভীরতা ১৬৪৫ ফুট।

টাহো হ্রদের এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড় ও অরণ্যানীর শোভা অতি সুন্দর। এই অঞ্চলটি

'সিয়েরা নেভাডা' (Sierra-Nevada) পর্বতমালার অন্তর্গত। বর্তমান ক্যালিফর্নিয়া প্রদেশের পূর্ব সীমায় উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪০০ মাইল ধরে এই পর্বতমালা বিস্তৃত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব বা মধ্য অঞ্চল থেকে সোজাসুজি প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে ক্যালিফর্নিয়া রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে 'সিয়েরা-নেভাডা' পর্বতশ্রেণী উল্লঙ্ঘন না করে উপায় নেই। আজ এই উল্লঙ্ঘন অতি সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়, কেননা, একাধিক প্রশস্ত রাজপথ এবং রেলপথও ঐ পর্বতমালার বুকের উপর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছে এবং মোটরে বা রেলগাড়ীতে বসে সিয়েরা নেভাডার শৈলমালা অতিক্রম করবার সময়ে ওর ভয়াবহতা সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তাই আজকাল-কার যাত্রীদের চিত্তে উঁকি মারে না। কিন্তু একশ' বছর আগে অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন এই পর্বতমালা ছিল একান্তই দুরতিক্রম্য। এর পূর্বদিক হাজার হাজার ফুট এত খাড়া এবং অনিয়তভাবে উঠেছে যে আরোহণেচ্ছুরা দূর থেকে দেখেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তো এবং উল্লঙ্ঘনের সঙ্কল্প ত্যাগ করতো। ফলে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইয়োরোপীয়, (বিশেষতঃ মেক্সিকো থেকে স্পেনদেশীয়) আগন্তুকগণ কর্তৃক আমেরিকার পশ্চিম উপকূলস্থ ক্যালিফর্নিয়া রাজ্য ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হতে আরম্ভ হবার পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্যালিফর্নিয়ার পূর্বসীমায় এই সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা একটি দুর্লঙ্ঘ্য রহস্য-প্রাচীরই রয়ে গিয়েছিল।

যবনিকা উঠবার সূত্রপাত হল ১৮৪৮ সালের ২৪শে জানুআরির অভিনব একটি আকস্মিক ঘটনার পর থেকে। ঐ তারিখে উত্তর ক্যালিফর্নিয়ায় জেম্‌স্ মার্শাল নামে জনৈক কাঠের কারখানার মালিক কারখানার কাজে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হলুদবর্ণ এক রকম ধাতব পদার্থের কিছু আঁশ পেয়ে যান। পরে প্রমাণিত হয় যে ঐ আঁশগুলি খাঁটি সোনা। কয়েক মাসের মধ্যেই এই খবর চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে এবং ফলে ১৮৪৯ সালে শুরু হয় ক্যালিফর্নিয়া, তথা আমেরিকার ইতিহাসের একটি চিহ্নিত ঘটনা—'স্বর্ণ-অভিযান' (Gold rush)। দলে দলে ভাগ্যান্বেষী উত্তর ক্যালিফর্নিয়ার ঐ অঞ্চলে সোনার খনি আবিষ্কারের জন্য রওনা হন। স্থলপথে ঐ বাঞ্ছিত ঐশ্বর্যভূমিতে পৌঁছুতে গেলে দুর্লঙ্ঘ্য সিয়েরা নেভাডা না ডিঙালে উপায়ান্তর নেই। অনাহার, অনিদ্রা এবং আরও বহুবিধ দুঃসহ কষ্ট বাধা বিপত্তি বরণ করে সিয়েরার গভীর জঙ্গল এবং উত্তুঙ্গ বরফাবৃত রূঢ় পাহাড়গুলির ভিতর ভাগ্যান্বেষীরা প্রবেশ করতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে পর্বতপ্রাচীরের পশ্চিমে নেমে পূর্বোক্ত স্বর্ণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই দুঃসাহসিক চেষ্টায় অবশ্য অনেকের মৃত্যুও ঘটেছিল। যাহোক ভাগ্যান্বেষীদের অভিযান সার্থক হয়েছিল। ক্যালিফর্নিয়ার ঐ অঞ্চল অচিরে এক বিস্তৃত সোনার খনি এলাকায় পরিণত হয় এবং ১৮৫০ সালে ক্যালিফর্নিয়া রাজ্য মেক্সিকোর স্পেনীয় আধিপত্য থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে আসে।

কিন্তু স্বর্ণ-অভিযানের আর একটি অবান্তর ফলও আমেরিকার ভূগোল ও ইতিহাসে কম চমৎকারী নয়। তা হল সিয়েরা নেভাডার শত শত বর্গ মাইল-ব্যাপী বিরাট দেহে ছোট বড় শত শত হ্রদের* আবিষ্কার। যে সোনা দিয়ে মানুষ পৃথিবীর ভোগৈশ্বর্য লাভ করতে পারে—পার্থিব মূল্য তার বিপুল সন্দেহ

* সিয়েরা-নেভাডার "যোসেমাইট পার্ক' নামক সংরক্ষিত বনে ৪২৯টি হ্রদ রয়েছে। টাহো হ্রদের দক্ষিণে ২২০ বর্গ-মাইলের মধ্যে ১০০ টিরও বেশী হ্রদ আছে। হ্রদগুলির সন্নিবেশও বড় বিচিত্র। কোনটি বৃক্ষপল্লবহীন কোন পাহাড়ের শিখর-দেশে, কোনটি বা রুক্ষ গিরিবর্ত্মের ভিতর, কোনটি বা গভীর জঙ্গলাকীর্ণ খাদের মধ্যে, কোনটি আবার কোন পার্বত্য তটিনীর নিম্নভাগে।

নেই ; কিন্তু এই যে পাইন, সিডার, দেওদার, ইউকেলিপটাস এবং আরও নানারকম সুশোভন বৃক্ষরাজির সবুজ-শ্রীর মাঝে মাঝে বিশ্বস্রষ্টা এক একটি স্বচ্ছ জলরাশি বসিয়ে রেখেছেন—এগুলি মানুষের এক উচ্চতর প্রকৃতির কাছে অপরিমেয় সম্পদ্। স্বর্ণমূল্যে এর দাম নিরূপণ করা যায় না। যাঁরা সোনা খুঁজতে এসে সিয়েরা নেভাডার হ্রদের সৌন্দর্য-রাজ্য আবিষ্কার করেছিলেন, মানুষ তাঁদের কাছে বেশী ঋণী শেষের আবিষ্কারটির জন্যে। ক্যালিফর্ণিয়ার সোনার খনি মানুষের উন্মত্ত লোভে আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ক্যালিফর্ণিয়ার সৌন্দর্য-উৎস এই হ্রদগুলি তাদের স্নিগ্ধগম্ভীর স্বচ্ছসুষমা এখনও সমানভাবে ধারণ করে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বহু শতাব্দী ধরে থাকবে। মানুষের ভিতর কাম-মোহ-লোভের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট যে রসময় পুরুষ রয়েছেন, তিনি যেমন অমর—তাঁর জন্যে প্রকৃতির এই নৈবেদ্যও তেমনি অফুরন্ত।

'স্বর্ণাভিযানের' শুরু হতে এক বৎসরের মধ্যে সিয়েরা নেভাডার অনেকগুলি হ্রদ আবিষ্কৃত হ'ল, কিন্তু টাহোকে তখনও পুরোপুরি খুঁজে পাওয়া যায় নি। কোন কোন অভিযাত্রী দূর থেকে এই বিরাট হ্রদের খানিকটা অংশ মাত্র দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু চারিপাশের খাড়া পাহাড় বেয়ে নীচে নেবে হ্রদটির প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভ করতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দুরতিক্রম্য পর্বত ও ঘন অরণ্যানীর মধ্যে লুকিয়ে-থাকা—কিন্তু 'এখনও-অনাবিষ্কৃত' একটি বিরাট হ্রদের কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ঐ সব লিখিত বিবরণ অন্যান্য সাহসিকদের মনে কৌতূহল উদ্রিক্ত করেছিল এবং এই সুগুপ্ত অতিকায় জলরাশির সম্বন্ধে বহুতর লৌকিক এবং অলৌকিক কথা-উপকথারও সৃষ্টি হয়েছিল। যাহোক, ১৮৬০ সালে টাহোতে পৌঁছুবার রাস্তা এবং এর ভৌগোলিক অবস্থানও নির্দিষ্ট হয়। হ্রদটির 'টাহো' নামকরণ হয় আরও দু বৎসর পরে। এই অঞ্চলের আদিম উপজাতীয় আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের ভাষার দুটি শব্দ থেকে এই নামের উৎপত্তি। 'টা' মানে উঁচু বা খুব বড়, আর 'হু' মানে জল।

টাহো হ্রদ
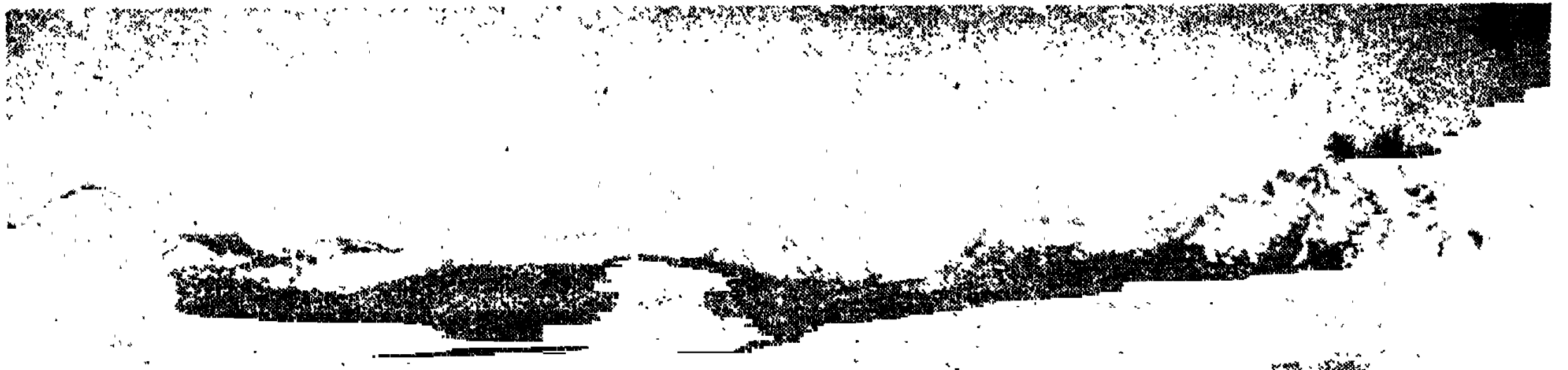
এর পরই আরম্ভ হ'ল 'সভ্য' অর্থাৎ অর্থগৃধ্নু মানুষের আর এক নূতনতর প্রচেষ্টা। টাহোর তটবর্তী অতিকায়বৃক্ষরাজি-শোভিত দূরবিস্তৃত যে পার্বত্য বনে হয়তো হাজার হাজার বৎসর বনের পশু এবং উপজাতীয় অরণ্যচারী মানুষ ছাড়া অপর কারো পদসঞ্চার হয়নি, সেই বনভূমি কেঁপে উঠলো কাঠের ব্যবসায়ী, মাছের কারবারী এবং ঘাস-উৎপাদকদের কল কারখানার শব্দে। জঙ্গল পরিষ্কার হতে লাগলো, বাড়ী ঘর রাস্তা তৈরী শুরু হ'ল, উপত্যকায় চাষের যন্ত্রপাতি চলতে আরম্ভ করলো। ভ্রমণকারীদেরও দেখা যেতে লাগলো এবং তাঁদের জন্যে খাড়া হ'ল সরাই, হোটেল ইত্যাদি। এ সত্ত্বেও এই বিরাট হ্রদ ও তার পারিপার্শ্বিকের শুদ্ধতা তখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষুণ্ণ হয়নি। রেভারেণ্ড টমাস স্টার কিঙ্ নামে একজন ধর্মযাজক ১৮৭০ সালের গ্রীষ্মে টাহোতে বেড়াতে আসেন। তিনি লিখে গেছেন :

"এই বিরাট হ্রদের তটভূমির অধিকাংশই অনধিকৃত রয়েছে, তীরের চারিপাশের পাহাড়ে বিরাট বিরাট বৃক্ষকুঞ্জের অনেকগুলিতে মানুষের পদচিহ্ন এখনও পড়েনি। এই হ্রদের সুদূরব্যাপ্ত স্বচ্ছ জলরাশি যেন বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তা ও নির্মলতার প্রতীক। হ্রদটির জন্মের প্রারম্ভ থেকে এর জল মর্ত্যমানুষের কোন কাজে উচ্ছিষ্ট হয়নি। এখানকার নিভৃত আরণ্য সৌন্দর্যের কখনও তিলমাত্র হানি হয়নি।"

কিন্তু টাহোর এই একান্ততা বেশী দিন অব্যাহত থাকেনি। বৎসরের পর বৎসর হ্রদের চারিপাশে বসতি গড়ে উঠতে লাগলো, ছোট ছোট শহর জমতে আরম্ভ করলো, হ্রদের এলাকায় পৌঁছুবার জন্য নানা দিক থেকে প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হ'ল, হ্রদের তটে জায়গায় জায়গায় বীচ্ (beach) বা সন্তরণ ও ভ্রমণের প্রশস্ত বালু-তট নির্মিত হ'ল, হ্রদের বিশাল বুকে ছোট বড় নানা বাষ্পীয় এবং তৈলচালিত পোত জুটতে লাগলো। ১৮৭৩ সালে টাহো শহরে মাত্র ৫০টি বাড়ী ছিল, ১৮৮৯ সালে এদের বিভিন্ন এলাকায় টাহো শহরের অনুকরণে ৭।৮টি বসতি গোনা যেত। আজ ১৯৫৭ সালে টাহো হ্রদকে বেড়ে ২৫টি শহর এবং কুড়িটি ডাকঘর রয়েছে। বাড়ীঘর হাজার হাজার।

* * * *

টাহো হ্রদের পশ্চিম কূলে একটি জায়গায় হ্রদের এক অংশ জমির দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। এই অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'কার্নেলিয়ান উপসাগর' (Carnelian Bay)। এখানকার তট থেকে যে পাহাড়টি উঠেছে তারই উপর আমাদের 'বেদান্ত-কুটির'। এই জুলাইতে স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সমিতির দুইজন ভারতীয় সন্ন্যাসী ও একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত-সমিতির স্বামী পবিত্রানন্দজী এখানে বিশ্রাম করতে এসেছেন। এর আগে জুন মাসে এসেছিলেন প্রভিডেন্স এবং বোস্টন বেদান্ত-কেন্দ্রদ্বয়ের পরিচালক স্বামী অখিলানন্দজী। ঐ সময়ে একটি বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে টাহোতে আমেরিকার প্যাসিফিক উপকূলের দার্শনিক-সম্মেলন আহূত হয়েছিল। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এসেছিলেন। অখিলানন্দজীকে বিশেষ আমন্ত্রণদ্বারা বোস্টন থেকে ডেকে আনা হয়েছিল, কেননা 'Hindu Psychology' (হিন্দু মনোবিজ্ঞান) এবং 'Hindu View of Christ' (হিন্দুর দৃষ্টিতে খ্রীষ্ট)—এই বই দুখানির লেখক হিসাবে এদেশের অনেক দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীর কাছে তিনি সুপরিচিত। প্রায় একমাস টাহোর 'বেদান্ত কুটিরে' বাস করে তিনি ঐ সম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও ক্লাসগুলি প্রভূত সমাদর লাভ করেছিল। ছাত্রছাত্রীরা বলতো, আমরা কলেজে পুঁথিতে আলোচনা তো বহুত শুনেছি, ওতে আমাদের প্রাণ ভরে না; we want to hear the

Swami—আমরা এই স্বামীজীর কথা শুনতে চাই। অখিলানন্দজীর সপ্রেম ব্যবহার এবং সদাপ্রফুল্ল স্বভাব তরুণদের মুগ্ধ করেছিল। তাঁর একটি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল 'মানসিক স্বাস্থ্য ও ধর্ম' (Mental Health and Religion)।

পূর্বোক্ত সন্ন্যাসিত্রয় বিকালে বনের মধ্যে বেড়াতে বেরিয়েছেন—পাইন, সিডার ও দেওদারের বন। ওঁদের মনে পড়ছে হিমালয়ের পরিবেশের কথা। প্রায় এক হাজার ফুট নীচে হ্রদের চারিপাশের 'হাই-ওয়েতে' অনবরত অসংখ্য মোটরগাড়ীর যাতায়াত এবং হ্রদের তটে তটে গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করতে আগত হাজার হাজার নরনারীর ভিড়ের কথা—উপরের এই জঙ্গলে অনায়াসেই ভুলে থাকা যায়। ওই-খানেই আমেরিকা—প্রচণ্ড রাজসিক প্রবৃত্তির তীব্রবেগে সদা-সঞ্চরণশীল মহাশক্তিমান্ 'ডলারে'র একনিষ্ঠ উপাসক আমেরিকা! কিন্তু এক হাজার ফুট উপরে এই শান্ত আরণ্য প্রকৃতি হিমালয়ের বনভূমির সহিত যেন এক ধর্মে বাঁধা। মানুষ তার অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের জন্যে মানুষের সঙ্গে ভেদ গড়ে তোলে, এই ভেদ যে কত কৃত্রিম তা সে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতিতে তো কোন ভেদ নেই। দশ হাজার মাইল দূরের নির্জন বনভূমিতে দশ হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত বৃক্ষ-লতা-পাতার একই শান্তি বিকীর্ণ হয়। সন্ন্যাসীরা তাই সাময়িকভাবে ভুলে গেছেন যে তাঁরা ভারতবর্ষের পাহাড়ে আসেন নি; ঝাউ দেবদারুর মাথায় হাওয়া বয়ে সেই মিষ্টি অনবচ্ছিন্ন সিরসির শব্দ, গাছপালার নীচে প্রবাহিত পাহাড়ী নদীর সেই একতান কলকল সঙ্গীত, এই জনহীন প্রশান্ত পারিপার্শ্বিকে হিমালয়ের তপোবনেরই মতো চিত্তে চরাচরাবগাহী পরম সমতার অনুধ্যান!

হাজার ফুট নীচে ওদের গ্রীষ্মাবকাশের জীবন-ধারা দেখতে সন্ন্যাসীরা একদিন দুপুরে বেরিয়েছেন। হ্রদের চারিপাশ বেড়ে প্রশস্ত রাজপথ—১০০ মাইলেরও উপর লম্বা। জর্জ গাড়ী চালাচ্ছে—৩২ বৎসর বয়স্ক আমেরিকান যুবক জর্জ জিলেট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকান পদাতিক-বাহিনীর একজন সৈনিক ছিল সে। বেলজিয়ামে শত্রুর বুলেট একদিন তার পাঁজর ভেদ করে দেয়—বাঁচবার কোনই আশা ছিল না, তবুও বাঁচে। দেশে ফিরে ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম্-এ পাশ করে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা অত্যাচার লোভ দম্ভ—জর্জ দুচোখে দেখেছে। জীবনের গভীরতর প্রশ্ন তাকে উন্মনা করে। এমন সময় পেল বেদান্তের সন্ধান; আকৃষ্ট হয়। জীবন-রহস্যের সমাধান জর্জ বেদান্তের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে এবং ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করেছে। ভারতীয় সন্ন্যাসীরা তার বড় আপনার জন।

একশ' মাইল দীর্ঘ রাস্তার ডান পাশে সুবিশাল টাহো হ্রদ—বামপাশে পাহাড় এবং উপত্যকা। রাস্তা যে বরাবর হ্রদের তট দিয়ে গেছে তা নয়, কোথাও তটের উপর—যেখানে কোন বন উপবন বসতি পড়েছে, সেখানে রাস্তা বামে সরে এসেছে। এক এক জায়গায় বিশেষ বিশেষ নাম নিয়ে স্নানের জায়গা বা বালুতট (beach)। এখানে শত শত নরনারী বালকবালিকা রৌদ্র সেবন এবং স্নানের জন্য ভিড় করেছে। আশ্চর্য, যে সভ্যতার একটি প্রধান স্তম্ভ হ'ল পোষাক সেই সভ্যতার মেয়েপুরুষরা গ্রীষ্মাবকাশে ছুটির জায়গাতে বেশভূষা সম্বন্ধে একেবারেই বেপরোয়া! যে রকম খুশি, যত কম খুশি পোষাক পরে দলে দলে সবাই বালুতটে উপস্থিত। কেউ কেউ ছোট মাদুর বা গালিচা নিয়ে এসেছে, বালুকার উপর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। এক ঘণ্টা এই রকম পড়ে থাকবে। উপরে অনন্ত আকাশ, সামনে দূর-প্রসারিত স্বচ্ছ নীল জলরাশি, নীচে পৃথিবীর মাটি। ওদের চেতনা বোধ করি একটা নতুন অনুভূতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। যন্ত্রের শৃঙ্খল নেই, লোকাচারের ভ্রুকুটিও

নেই, রাজনীতি সামাজিকতা, এ সবও যে বন্ধন—তাই যেন ওরা আজ বলতে চায়। কারাও বা শুধু বালির উপর শুয়ে পড়েছে। অনেকে জলে নেমে সাঁতার কাটছে। সন্তরণের অনেক ক্লাব জায়গায় জায়গায়। স্থানে স্থানে নানা ছাঁদের, নানা আকারের মোটর বোটের ঘাঁটি। ভাড়া নিয়ে একজন বা দুজন বা বেশী—টাহোর জলের উপর সেই বোট ছুটিয়ে চলেছে। সকাল থেকে আরম্ভ করে বিকাল পর্যন্ত টাহোর বুকে শত শত এই মোটর বোটের অভিযান চলে। তুমুল শব্দ। কোন কোনটির গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও উপর।

রাস্তার ডানপাশে হ্রদের তটে, অথবা বামপাশে কোন উপত্যকায় মাঝে মাঝে 'ট্রেলার ক্যাম্প' বা চলমান ঘরের ছাউনি। একটি সুবৃহৎ গাড়ীর মতো দেখতে, অ্যালুমিনিয়ম বা অপর কোন হালকা উপাদানে তৈরী, চাকা-বসানো ক্ষুদ্র ঘরের নাম 'ট্রেলার'। এই ঘরের মধ্যে একাধিক কক্ষ আছে; চেয়ার, টেবিল, শয্যা, খাবার সরঞ্জাম, মুখধোবার বেসিন—কোনটিরই অভাব নেই। মোটর কারের পেছনে জুড়ে ট্রেলারটি যেখানে খুশি নিয়ে যাওয়া যায়। গ্রীষ্মের ছুটি যারা কাটাতে আসে তাদের অনেকেই হোটেলে বা ভাড়াটে ঘরে না থেকে ট্রেলারে থাকে। এতে খরচ কম পড়ে। এক একটি ট্রেলার ক্যাম্পে ৫০।৬০, এমনকি একশ' পর্যন্ত ট্রেলার রয়েছে। ট্রেলার ক্যাম্প ছাড়া অন্য জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে ট্রেলার রাখবার নিয়ম নেই এখানে।

টাহো পরিক্রমার একশ' মাইল রাস্তার দুপাশে বহু হোটেল এবং ভাড়াটে বাড়ী। হোটেলগুলি এ সময়ে সরগরম। হোটেলগুলির পরিচ্ছন্নতা এবং হোটেল-কর্মচারীদের অমায়িকতা দেখবার মতো। টাহো হ্রদের খানিকটা অংশ ক্যালিফর্ণিয়ার অব্যবহিত পূর্বদিকের সংলগ্ন প্রদেশ নেভাডার মধ্যে পড়েছে। ক্যালিফর্ণিয়ায় জুয়া-খেলা বে-আইনী, কিন্তু নেভাডায় নয়। তাই পরিক্রমার রাস্তাটি ক্যালিফর্ণিয়ার সীমা পার হলেই দু'ধারে অনেক জুয়ার আড্ডা দেখা যায়। গ্রীষ্মাবকাশ কাটাবার এও একটা বড় আকর্ষণ। জায়গায় জায়গায় 'গিফট্ শপ'। যারা ছুটিতে এখানে আসে তারা প্রিয়-জনদের উপহার দেবার মতো নানারকমের দ্রব্যসম্ভার এই দোকানগুলিতে কিনতে পারে, শুধু আমেরিকান জিনিস নয়—চীন, জাপানী, মেক্সিকো এবং অন্যান্য নানাদেশের কুটীরশিল্পের নমুনা। ভ্রমণবিলাসীরা খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সব জিনিস কিনে নিয়ে যায়—টাহোর স্মৃতি।

রাস্তার বামপাশে মাঝে মাঝে এক একটি রাস্তা পাহাড় এবং উপত্যকার ভিতর দিয়ে হ্রদের বিপরীত দিকে বেরিয়ে গেছে। কোনটি বা কোন পর্বতশিখরে, কোনটি বা সিয়েরা নেভাডার আর কোন হ্রদের অভিমুখে। যারা গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে আসে তারা এসব রাস্তা ধরে এক একটি জায়গায় এক একদিন বেড়াতে বা চড়ুইভাতি করতে যায়। ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে চড়াই-উৎরাই করাও গ্রীষ্মাবকাশের একটি আনন্দ। ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়।

* * * *

ভারতীয় সন্ন্যাসীরা বেদান্ত-কুটীরে ফিরে এসেছেন—আমেরিকায় তাঁদের স্বকীয় ভারতবর্ষে। ফিরে এসে তাঁরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। হাজার ফুট নীচেকার জীবন থেকে হাজার ফুট উঁচুকার জীবনে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিপুল বই কি! আমেরিকার ঐশ্বর্য আছে, উদ্যম আছে, বহুমুখী কারিগরী-বিজ্ঞান আছে—সেই ধনবল, কার্যকারিতা ও বৈজ্ঞানিক কুশলতার প্রয়োগে এই দেশে টাহো এবং টাহোর মতো এমন শত শত হাজার হাজার স্থান বিরাম এবং প্রমোদের জন্য গড়ে

উঠেছে। কর্মব্যাপৃতির ফাঁকে ফাঁকে শরীর মনের বিশ্রাম ও বিনোদের প্রয়োজন অবশ্যই অনস্বীকার্য। কিন্তু সন্ন্যাসীরা ভাবছেন ভারতবর্ষে টাহোর মতো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীতে ভারতবাসী কি গড়ে তুলেছে এবং তোলে? গড়ে তুলেছে মন্দির; পূজা, উপাসনা এবং নিভৃত চিন্তার স্থান; গড়ে তুলেছে আধ্যাত্মিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কারুকলা, ভাস্কর্য। ভারতে এখনও সহস্র সহস্র নরনারী পাওয়া যাবে যারা জীবনের অবসর কাটাতে চায় অতি-জীবনের অনুসন্ধানে। আমোদ-প্রমোদ অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়। এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের উত্তেজনায় কেবলই ছুটে চলা মনুষ্যজীবনের গরিমাকে ক্ষুণ্ণ করে। এই গরমে টাহোতে হাজার হাজার আমেরিকান পুরুষ মেয়ে ছুটি কাটাতে এসেছে; তাদের কাছে ঐ উদার গম্ভীর পর্বতমালা, ঐ শ্যামল বনরাজি, ঐ নীল স্বচ্ছ প্রশান্ত জলরাশি—শুধু কি এই মর্ত্যলোকের ভাষাই শুনিয়ে যাবে? কেউ কি শুনবে না প্রকৃতির এই মহান দূতদের নিকট সত্যশিবসুন্দরের চিরন্তন বাণী, কেউ কি দেখবে না ওদের মূর্তির মধ্যে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'এর প্রতিচ্ছায়া?

ধ্যানের ঠাকুর

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মন্ত্র আমি জানিনাক, জপতপে নাহিক বিশ্বাস
পরের রচিত স্তোত্রে দেবতার চিত্তবিনোদন
অনাদিকালের রীতি, প্রাণায়ামে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস
হয়ত নিহিত তত্ত্ব আছে তাতে, আত্ম-উদ্‌বোধন।

কিছুমাত্র লাভ ক্ষতি নাহি তাতে জেনেছি নিশ্চয়
শুধু সত্য ধ্যানযোগ, তন্ময়তা নিরালা নির্জনে,
একান্ত প্রাণের মাঝে শিহরণে জাগিবে বিস্ময়
রূপ হতে অরূপের ব্যবধান রহিবে না মনে।

আমরা ঝড়ের শব্দে ছুটে যাই পথে ও প্রান্তরে
বিদ্যুৎ-চিহ্নিত পথে খুঁজে ফিরি শুধু অকারণ,
আকাশের বর্ণচ্ছটা লুটে নিই প্রলুব্ধ অন্তরে
কোথায় অস্তিত্ব তব? কোন স্বর্গে কর বিচরণ?

আমাদের কল্পনার বিচিত্র বিকাশ মাত্র তুমি
অপ্রত্যক্ষ হে দেবতা মানুষেরই মহিমা-সম্বল,
আকাশে উন্নত শীর্ষ পদতলে শ্যাম বনভূমি
স্বর্ণসিংহাসনে তবু আমাদেরি দীপ্তি অচঞ্চল।

তোমারে চিনিনা আমি, তবু আমি জানি একজনে
সে আমার মিশে আছে এ প্রাণের শোণিত-প্রবাহে,
ধ্যানের ঠাকুর সে যে, ফিরি আমি তারি অন্বেষণে;
শ্রাবণের বৃষ্টিধারা সে আমার মর্ম-দাবদাহে।

কৈলাস ও মানস-সরোবর

স্বামী নির্বৈরানন্দ

সংযোগটা আকস্মিক, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত। ৬ই জুন, ১৯৫৫। যথাসময়ে বেনারস এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম আমরা তিন জন। "জয় কৈলাসপতিকী জয়" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে ট্রেন হাওড়া ষ্টেশন ছাড়ল। পরদিন শিবপুরী কাশী। পুণ্যক্ষেত্রে ত্রিরাত্রি বাস করে গঙ্গাস্নান ৺বাবা বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করে অদ্বৈত-আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দজীর কাছ থেকে তাঁর পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা আহরণ করে আমরা লখনৌ হ'য়ে আলমোড়া পৌঁছে দেখি বাস-ষ্ট্যাণ্ডে আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য অনেকে উপস্থিত। অনুভব করলাম সর্বত্র আমাদের আত্মীয়, সর্বত্রই আমাদের ঘর। আলমোড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ আমাদের জন্য তিনটি 'বিশ্বাসী' কুলির ব্যবস্থা করে দিলেন। আলমোড়া থেকে গার্বিয়াংএর দূরত্ব ১৪৫ মাইল। প্রত্যেক কুলিকে ৬৩৲ হিসাবে দিতে হবে। আরও একটি দল আলমোড়ায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তাদের কুলির ব্যবস্থা না হওয়ায় আমরাই আগে গার্বিয়াংএর পথে রওনা হলাম—পদব্রজেই, ১১ই জুন। আমাদের তখন এক চিন্তা, কেমন করে নির্বিঘ্নে যাত্রা সফল হবে, কৈলাসপতির দর্শন কেমন করে লাভ করব।

কুলিদের নিয়ে প্রথমটায় বেশ একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল! একজন কুলি মাল বেশী বলে আপত্তি করে—আর একজন ৩।৪ মাইল চলার পর সরে পড়ল। তাই সহযাত্রী একজনের উপর ভার দিলাম ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসবার জন্য।

দারুণ রোদের তেজ। আলমোড়া থেকে ৮½ মাইল পথ চলার পর আমরা বেলা ২॥•টার সময় 'বেড়চিনা'তে এসে পৌঁছাই। এবার আমাদের চড়াই-উৎরাইএর পালা শুরু। এখানে যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দিরের স্থানটী বড়ই মনোরম, কাছেই নদী। আমরা খুব আনন্দে স্নান ক'রে কাপড় চোপড় কেচে নিলাম। সেরসিং-এর দোকানে ভাত, ডাল, তরকারি খেয়ে ভারি তৃপ্তি হল।

পরের দিন খুব ভোরে রওনা হয়ে ৫ মাইল হেঁটে 'ডালচিনা' পেলাম। সেখানে না থেমে আরও আগে 'কানারীচিনা'য় দুপুরের আহার ও বিশ্রামের কথা। এবার নিজেদের রান্নার পালা। দলের কেউ-ই রান্না জানেন না। আমিই এ গুরু দায়িত্ব মাথা পেতে নিলাম। কানারীচিনায় ডাকঘর আছে, জলের কিন্তু অত্যন্ত অভাব। কুলিরা বললে মাইল দুই এগিয়ে গিয়ে নদী পাওয়া যাবে। উৎরাই করে ত নেমে গেলাম—আবার চড়াই করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। দু মাইল অগ্রসর হলে দোকান পাওয়া যাবে শুনলাম। সহযাত্রী ইতিমধ্যে কুলিদের নিয়ে 'কানারীচিনায়' এসে হাজির। কুলিরা আর এগিয়ে যেতে চায় না। আমাদের বহু নীচে দেখতে পেয়ে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করছে। শংকর ফিরে যেতে রাজী নয়। কাজেই একটী দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। দোকানদার খাবারের ব্যবস্থার জন্য বাড়ীর ভেতর গেল। কিছু পরেই অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে এসে বললে, "মহারাজ, আমার ছেলেটিকে সাপে কামড়েছে—আপনারা দয়া করে কিছু ওষুধ দিন। ছেলেটিকে আমার বাঁচিয়ে দিন মহারাজ।" বেচারার এই বিপদ দেখে আমাদের ভারি দুঃখ হ'ল। সহযাত্রী একটা ওষুধ বলে দিলে, কিন্তু সেখানে পাওয়া গেল না। বেচারার জন্য দয়াল ঠাকুরের কাছে মৌন প্রার্থনা জানিয়ে ফিরে এলাম। এসে সঙ্গে শুকনো চিঁড়ে ফল, যা ছিল তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল।

দূর হইতে কৈলাস

তিনটি ফ্লাস্কের মধ্যে একটী পড়ে ভেঙে গেল। তাই মন খারাপ। সরযূ-নদীর তীরে সেরাঘাটে এসে উপস্থিত হলাম বিকেলে। এই সেই পবিত্র সরযূ, রামায়ণের আদিতে অন্তে প্রবাহিতা।
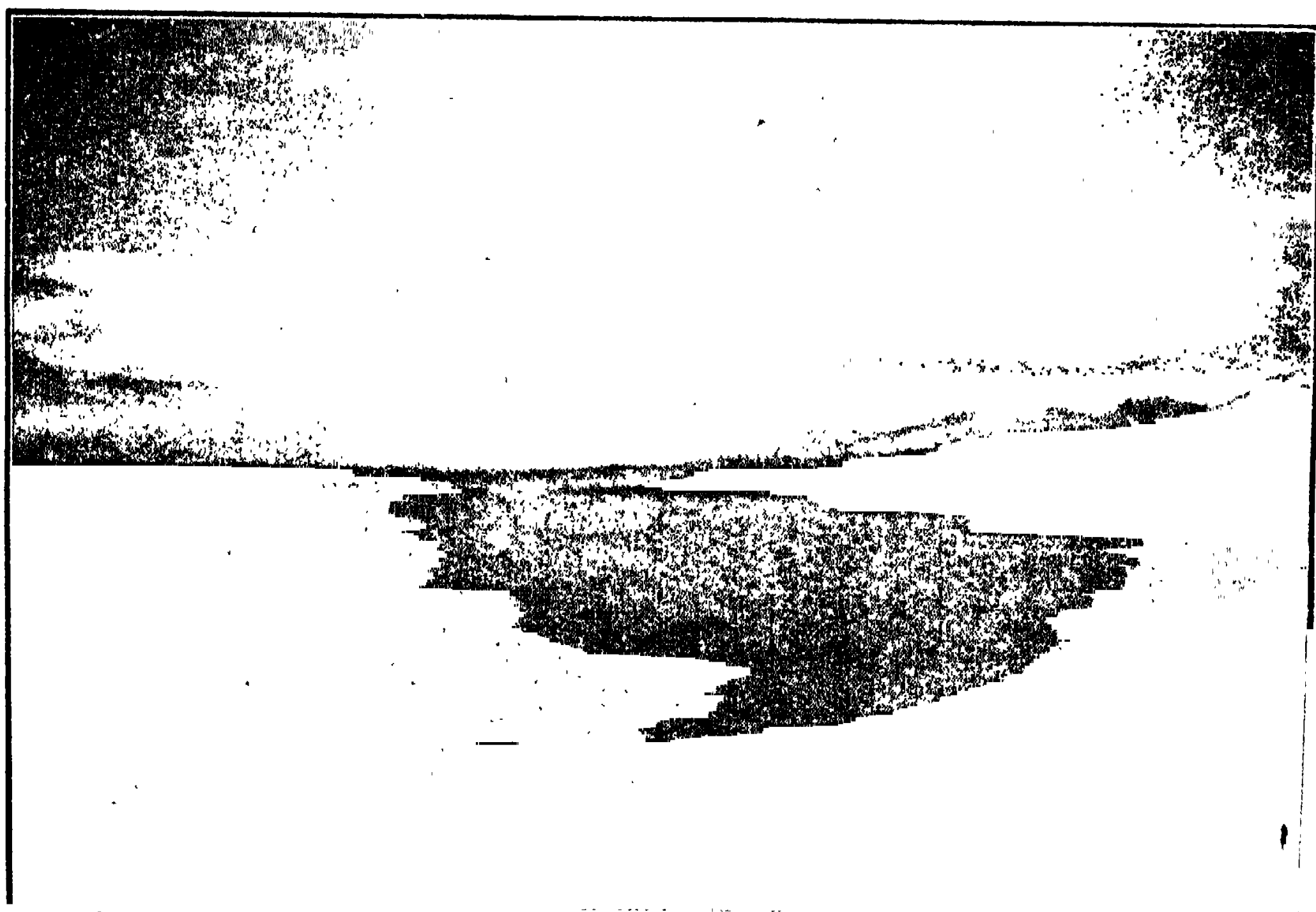
মানস-সরোবর

আমি কিছু পূর্বেই এখানে পৌঁছে রান্নাবান্না আরম্ভ করে দিয়েছি। দুপুরে ভাত খাওয়া হয়নি। সকলে বেশ তৃপ্তি করে নদীতে স্নান করে আহার করলাম। সেরাঘাটে একটীমাত্র ধর্মশালা। আমরা যাত্রী অনেকগুলি। রাত্রে বেশ গরম—ঘুম বড় একটা কারো হ'ল না। কেউ কেউ আবার নদীর তীরে গেলেন শুতে, কিন্তু হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আসায় ভিজতে ভিজতে ফিরে এলেন তাঁরা।

ভোরে রওনা হয়ে আমরা দুপুরে এক জায়গায় খাবার ব্যবস্থা করে 'বনস্‌পতম্‌'এ এসে উপস্থিত হলাম। স্থানটী ভারি মনোরম। চারিদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত—আর খুব সমতল জায়গা দেখে বাংলা-দেশের কথা মনে পড়ে গেল। দিনের আলো নিভে গেলে একজন সঙ্গী পেট্রোম্যাক্সটি জ্বালিয়ে দিল—আর সেই নির্জন অন্ধকার আলোয় ভরে উঠল।

আজ ভোর থেকেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আমরা বর্ষাতি-গায়ে রওনা হলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর এক দোকানে গিয়ে গরম দুধ কিনে দোকানদারকে জিগ্যেস্‌ করছি, দুধে জল মেশাওনি ত? সে ত চটে বললে, "কী, আমি গরীব হতে পারি কিন্তু অধর্ম করে পয়সা নেব?" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সপরিবারে এই লোকটী ব্রহ্মদেশ থেকে এসে এখানে বসবাস করছে। তার সততা দেখে ভারি

একটি তিব্বতী পরিবার

আনন্দ হ'ল ; বললাম কিছু মনে ক'রো না।" এই শুনে সে শান্ত হয়ে প্রাণ খুলে জীবনের সব সুখ দুঃখের কথা বলতে শুরু করে দিল। আমাদেরও শুনতে বেশ লাগল। আসার সময় তার ছেলেমেয়েদের হাতে কিছু বিস্কুট দিয়ে পরিতৃপ্ত হলাম।

রোজ পথ-চলার পরেও রান্নার ভার আমাকেই নিতে হয়েছে। 'থলে' রামগঙ্গার পুল দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটী পাহাড়ী যুবকের সঙ্গে দেখা, রোজ ১৷০ মজুরি নিয়ে সে পাচকের কাজে নিযুক্ত হয়ে গার্বিয়াং পর্যন্ত যেতে রাজী হ'ল।

এদিকে একটি কুলিকে নিয়ে আর এক বিভ্রাট। সে প্রথম থেকেই অসুস্থ, আমাদের কিছু না বলে ফাঁকি দিয়ে এত দূর চলে এসেছে। পথে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আর মাল নিয়ে এগোতে পারে না। তখন বেচারার এই বিপন্ন অবস্থা দেখে বললাম, 'তোমাকে আর মাল নিতে হবে না। এমনি আমাদের সঙ্গে চল। খাওয়া পাবে, কিন্তু মজুরি পাবে না। একটু সুস্থ হলে আবার মাল নেবে।' পথে ঘোড়াসমেত একটি লোক পাওয়াতে মালগুলি তার কাছে দিয়ে চলেছি। আমাদের সদয় ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে কুলিটা কিন্তু বেজায় গোলমাল আরম্ভ করল—বলে, আমাকে খাওয়া মজুরি দুইই দিতে হবে, কিন্তু মাল নিতে পারব না। তখন নিরুপায় হয়ে রাগের অভিনয় করে উগ্রমূর্তি ধরে তার প্রাপ্য চুকিয়ে তাকে বিদায় দিলাম। এই দেখে সঙ্গীদের হাসি আর থামতে চায় না।

আবার যাত্রা শুরু হ'ল। একটু চড়াই-উৎরাই করার পরে ঘোড়াগুলির আসল রূপ ধরা পড়ল। একটী ঘোড়া অত্যন্ত রুগ্ণ, সে ত আর এগোতে পারে না দু-পা যায়, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে, অথচ তার পিঠে কোন মালপত্র নেই, আমি তাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ভার নিলাম। কিন্তু যে চলবে না তাকে চালাব কেমন করে? অগত্যা তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললাম। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন ডিডিহাটে পৌঁছলাম তখন রাত ন'টা।

শঙ্কর নূতন পাচককে নিয়ে পূর্বেই পৌঁছেছিল। রান্নাও তৈরী, খাওয়াটা খুব তৃপ্তি করেই হ'ল। পরের দিন রুগ্ণ ঘোড়াটিকে মালিকের কাছে রেখে অন্ধকার থাকতেই যাত্রা করলাম। তখনও তারাগুলি একেবারে ম্লান হয়ে যায় নি। নবপ্রভাতের অরুণ আলোয় আবার নূতন আশার সঞ্জীবনী স্পর্শ পেলাম।

দুপুরে 'আসকোট'—পার্বত্য সহর। আলমোড়া থেকে 'আসকোট' ৭০ মাইল দূরে। এখানে রান্নাবান্নার পালা তাড়াতাড়ি সেরে রওনা হওয়া চাই; কেন না আজ জোলজীবি পৌঁছতে হবেই। জোলজীবি স্থানটী ভারি মনোরম। এখানে কালীগঙ্গা ও গৌরীগঙ্গা একত্র মিলিত হয়ে দ্বিগুণ বেগে সমতলের দিকে চলেছে। সঙ্গমস্থলে স্নান করার লোভ সংবরণ করা শক্ত! তাই নানা বাধা সত্ত্বেও স্নান সেরে দূরে একটী পাথরের উপর স্থির হয়ে বসে প্রকৃতির অপূর্ব শোভা দেখতে লাগলাম। বিরাটের চিন্তায় মনপ্রাণ আনন্দে ভরে উঠল।

চমক ভাঙতে দেখি সঙ্গীরা কখন উঠে গেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে উঠতে হ'ল। জোলজীবিতে রাত্রি বাস করে পরের দিন বাবলাকোট হয়ে ধারচুলার দিকে রওনা হলাম।

ধারচুলা আলমোড়া থেকে ৯০½ মাইল। রাত্রে খাবার ব্যবস্থা কিছু ছিল না। চেক পোষ্টের বারান্দায় রাত্রি যাপন করলাম। রাত্রেই আমাদের নাম ধাম সব লিখিয়ে ভোরে গার্বিয়াংএর দিকে রওনা হলাম মনের উল্লাসে।

এবারেই কঠিন পথ আরম্ভ হ'ল। কেবল চড়াই আর উৎরাই, পথও সঙ্কীর্ণ এবং বিপজ্জনক। পাশাপাশি দুজন লোক এক সঙ্গে যেতে পারে না। ধারচুলা থেকে গার্বিয়াংএর পথে পাল পাল ছাগল ভেড়া চলেছে। একদল পার হয়, আর একদল এসে পথ আগলায়। এরই মধ্যে পাশ কাটিয়ে পথ করে নিতে হবে—নইলে ঢেউ থামলে সমুদ্রে স্নান করার মত অবস্থা হবে। উপরের দিকে অনন্ত পাহাড়—আর নীচে, বহু নীচে গম্ভীর-নিনাদিনী কালীগঙ্গা, মধ্যে সরু পথ। একটু পা পিছলেছে তো—একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে হাজার ফিট নীচে, পার্বত্য নদীর স্রোতে।

পথের অবস্থা দেখে সঙ্গীরা ভয় পেয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন—ছাগলের দলটী শেষ হোক তারপর যাত্রা শুরু করব। কিন্তু এক একটী দল পার হতে এক ঘণ্টা, কাজেই বুঝিয়ে সুজিয়ে ধরাধরি করে সকলকে নিয়ে অগ্রসর হতে হ'ল।

প্রাণ তো ওষ্ঠাগত। দু মাইল পথ চলার পর তপোবনে এসে দেখি,—একটী সুন্দর আশ্রম; দেখে ভারি আনন্দ হ'ল। আরো এগিয়ে দেখি আমাদের আশ্রম একটী। স্বামী অনুভাবানন্দজী হিমালয়ের এই মনোরম স্থানে ছিলেন একদিন, কিন্তু আশ্রমটি আজ শূন্য পড়ে আছে।

প্রায় সাত মাইল হাঁটার পর আমরা 'এলা'য় এসে হাজির হলাম। একটী মাত্র ছোট্ট ধর্মশালা; কিন্তু যাত্রী আমরা অনেকগুলি। কালীনদীতে স্নান করে খাওয়া দাওয়া সারা হ'ল। রাত্রিটি ওখানে কাটিয়ে আবার আরো দুর্গম পথে যাত্রা শুরু। এই চড়াইটির নাম 'পঙ্গুর'। জানি না 'পঙ্গু' থেকেই পঙ্গুর নাম হয়েছে কি না। সঙ্গীরা সত্যি পঙ্গু হয়ে পড়লেন।

"জয় কৈলাসপতিকী জয়" ধ্বনি করে "মুখে হাসি বুকে বল"—এই সঙ্কল্প নিয়ে চলতে থাকি। সকলে অতি ধীরে ও সন্তর্পণে চলি। চড়াই শেষ করতে প্রায় ৫ ঘণ্টা লাগল। উপরে উঠে একটী চায়ের দোকানে সঙ্গীদের রেখে রান্নার ব্যবস্থায় গেলাম।

ভয়ঙ্কর মাছির উৎপাত। অতি কষ্টে খাওয়ার পর্ব শেষ করেই রওনা হতে হ'ল। বিশ্রাম করার উপায় নেই। তিন মাইল 'ছোসার' চড়াই শেষ করে সিরকাতে এসে হাজির হই। জায়গাটি ভারি সুন্দর। বহু আপেল ও নাসপতির বাগান রয়েছে। এই সিরকাতেই আমরা হিমালয়ের শীতের প্রথম প্রকোপ অনুভব করি।

রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় শীত আরো বেড়ে গেল। কনকনে শীতের রাত পার হয়ে সকালে আবার নবীন উৎসাহ নিয়ে রওনা হলাম। ২।৩ মাইল ক্রমাগত চড়াই-উৎরাই করে সকলে ক্লান্ত। এগার হাজার ফিটে উঠে পড়েছি। কি দারুণ ঠাণ্ডা! প্রস্তর-বহুল উৎরাই পথে—হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। ক্রমে বেলা ১০টায়—গার্বিয়াংএ এসে পৌছলাম। এই গার্বিয়াং ভারতের শেষ সীমায় একটি গ্রাম। কৈলাসের দুর্গম পথে এই হ'ল বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার শেষ পোষ্ট অফিস। গ্রামটির দুপাশে বিরাট পর্বত বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছে।

আজ এখানে বিশ্রাম। তিব্বতের পথ এখান থেকেই শুরু হবে। পরে শীত আরো বেশী। এখান থেকেই তাঁবু, ঘোড়া, জব্বু, খাবার দ্রব্য প্রভৃতি সব হিসাব করে সংগ্রহ করে নিতে হবে। এর পর আর কোথাও কিছু পাবার আশা নেই।

পঁচিশে জুন আমরা বুকে নবীন আশা উদ্যম নিয়ে—আবার যাত্রা শুরু করি। মনে হ'ল কৈলাসপতির আশীর্বাদে অসীম দুঃখকষ্ট ভোগ করেও গার্বিয়াং পর্যন্ত যখন আসতে পেরেছি তখন তিনি কৃপা করে বাকীটুকুও নিয়ে যাবেন। গার্বিয়াংএ আমাদের গাইড কীচথাম্পার বাড়ীতে সকলের আদর-যত্নে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

আমাদের দলে এবার হ'ল সবসুদ্ধ একুশ জন। বার জনের দল আগের দিনেই রূপসিংকে গাইড নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। এতগুলি যাত্রী তাদের ঘোড়া, তাঁবু, লোকজন সঙ্গে নিয়ে যখন পথ চলছে তখন দেখে মনে হচ্ছিল—যেন এক বিরাট বাহিনী কোন রাজ্য জয় করতে চলেছে। রাজ্য জয়ই বটে। জানা ছেড়ে অজানার রাজ্যে, শিবের সন্ধানে চলেছি!

কালীনদীর পুল পার হয়ে আমরা নদীর ধারে ধারে সংকীর্ণ পথে সন্তর্পণে চলেছি। সব সময়ে প্রাণটি যেন হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে যেতে হচ্ছে। কোন্ মুহূর্তে যে ঘোড়া আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলে দেবে—নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য, তার ঠিকানা কিছু নেই। একটি ছোট নদী পার হচ্ছি—হঠাৎ দেখতে পেলাম—সহযাত্রী একজন ঘোড়া থেকে উল্‌টে পড়ে ডান হাতখানি ভেঙে ফেলেছেন। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে কালাপানিতে যখন পৌঁছলাম তখন দেখি, আগের ১২ জনের দলও ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন।

পরের দিন আমাদের বিখ্যাত লিপুলেক অতিক্রম করতে হবে। আমরা দলবল নিয়ে এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা 'শিয়াংচুং'এ এসে পৌঁছেছি। কীচখাম্পার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুকুর চারিদিক পাহারা দিচ্ছে। একে একে সব তাঁবুগুলি পড়ল। তখনও বেলা আছে। পাশেই একটি বরফ-গলা ছোট্ট নদীর কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এদিকে ওদিকে যে দিকেই তাকাই শুধু দেখি বরফ—আর বরফের পাগাড়। আমরা যেন বরফের দেশে এসে পড়েছি।

লিপুলেকপাস্! দূর থেকে লিপুপাস দেখে মনে হয় না যে, ঐ স্থানটি অতিক্রম করা এমন কিছু কষ্টকর বা ভীতিজনক। ওখানকার আবহাওয়ার পরিবর্তন এত দ্রুত হয় যে আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুষার-ঝটিকায় আক্রান্ত হয়ে ঐ গিরিবর্ত্মে বিপদ্‌গ্রস্ত হতে হয়। তবে ভোরের দিকে স্থানটি অতিক্রম করা কিছুটা সহজসাধ্য, কেননা বরফ পড়া ভোরের দিকেই কিছু কম থাকে, যত বেলা বাড়ে ততই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

ভীষণ ঠাণ্ডা রাত্রি। যেন বরফের ঘরে বাস করছি। শ্বাসকষ্টও সকলকে বেশ ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। আকাশের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হয়ে উঠল। একটা বিরাট নিস্তব্ধতা সমস্ত পর্বত-গাত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধীরে ধীরে বরফানি হাওয়া আরম্ভ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি, শীতে শরীরের রক্ত যেন জমে গেল। মনে হ'ল এ দুর্যোগ রাত্রি আর শেষ হবে না। উনুনের কাছে যাই একটু আগুনের সন্ধানে। আগুনও যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—তারও তাপ নেই মোটেই, আবার ফিরে আসি। কম্বল বিছানাপত্র সব ভিজে-ভিজে, তাই সম্বল করে গায়ে জড়িয়ে বসি। সঙ্গে কফি ছিল—তাই একটু একটু খেয়ে সকলে শরীর গরম করি। কিন্তু ঘুম আর হ'ল না।

ভোরেই রওনা হতে হবে ঐ লিপুপাস পার হওয়ার জন্য। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে সকলে চলেছি, ধীর স্থির মন্থর গতি। সকলের মনে এক গভীর আতঙ্ক! হঠাৎ ঝিরঝির করে হিম-ঝঞ্ঝা আরম্ভ হ'ল। মল্লিকা ফুলের মত অজস্র হিমবিন্দু ধীরে ধীরে সমস্ত পথঘাট ছেয়ে ফেলল। ক্রমে সর্বাঙ্গ ঢেকে গেল তুষারে। বুঝি লিপুপাস আর পার হওয়া যাবে না। অতিকষ্টে কীচ্‌খাম্পা ও পাচক চংবুর সাহায্যে আমরা এই ভয়ঙ্কর লিপুপাস অতিক্রম করলাম।

কৈলাসপতির কৃপায় এই লোকগুলির যে সাহায্য পেলাম তা সারা জীবনে ভুলতে পারব না।

বেলা তিনটার সময় আমরা 'পালা' নামক স্থানে এসে পৌঁছাই। এখানে চেক্‌পোষ্ট-এ সমস্ত চেক্ করে। কাছে কোন গ্রাম নাই। দুটী ধর্মশালা আছে। আমরা চারটি দলই একত্র মিলিত হলাম। দলের প্রতিনিধি হিসাবে এক এক জন এগিয়ে গিয়ে চীনা চেক্ পোষ্টের অফিসারের কাছে গিয়ে নিজ দলের নাম ঠিকানা প্রভৃতি লিখিয়ে এলেন। পরে তারা প্রত্যেকটি জিনিষ তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগল। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বাদ গেল না। রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষার

জন্ম মাথার টুপি ও চশমা খুলতে হয়। ছাতাও বন্ধ করবার কথা—কিন্তু অত্যধিক রোদে সকলে ছাতা বন্ধ করলে না। চলে আসার সময় অফিসার বললে—'আপনাদের এইরকম পরীক্ষা করতে বাধ্য হলাম রাষ্ট্রের আদেশে'।

আমরা এবার তিব্বতের বিখ্যাত মালভূমির উপর দিয়ে চলেছি। এখন চড়াই উৎরাই আর বিশেষ নেই—শুধু কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় অধিকাংশ স্থানের আকৃতি। প্রথম যখন গিরিশৃঙ্গের উপর থেকে তিব্বতের মালভূমির দিকে তাকালাম তখন চারিদিকের মনোরম দৃশ্য দেখে কেবলই মনে হচ্ছিল, কি অপূর্ব মহিমা! অরূপের এ কি রূপের সজ্জা!

আমরা কিছুদুর অগ্রসর হয়ে একটা মোড় ঘুরতেই তাকলাকোট দেখতে পেলাম। কিছু পরে আমরা সেখানে এসে গেলাম। এখানে ভারত তিব্বতের মধ্যে জিনিষ পত্রের কেনা-বেচা ও বিনিময় হয়। এখানে আমাদের ঘোড়া, জব্বু প্রভৃতি নূতন করে ব্যবস্থা করে নিতে হবে। গার্বিয়াংএর ব্যবস্থা আর এ পথে চলবে না।

যাই হোক্ কীচখাম্পার চেষ্টায় সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের যোগাড় হয়ে গেল। এক দল যাত্রী তীর্থাপুরীর দিকে রওনা হ'ল। সহযাত্রীর হাত-ভাঙার জন্ম আমরা ও পথে যেতে আর সাহস করলাম না। খড়ি মাটির মত ধপধপে সাদা পাহাড়, বৃক্ষলতা বিশেষ নেই! পাহাড়ের নীচে নানাবর্ণের চিত্রিত গুম্ফা। তিব্বতের সব গুম্ফারই কারুকার্য প্রায় একই রকম।

কৈলাসপতির জয় দিয়ে তাকলাকোট থেকে বেরিয়ে পড়লাম; তিব্বতের রাজপ্রতিনিধির প্রতাপ এ সব অঞ্চলে খুব বেশী। কীচখাম্পা রাজপ্রতিনিধির নিকট আমাদের পরিচয় দেন! ভাইকে আমাদের দলের সঙ্গে দিয়ে তিনি নিজে তীর্থাপুরীর দলের সঙ্গে গেলেন।

আমরা মাইল দশেক অগ্রসর হওয়ার পর 'রিংগাইবু'তে উপস্থিত হয়ে তাঁবু খাটাবার ব্যবস্থা করলাম। এখানে প্রচণ্ড শীত। সামনেই 'মান্ধাতা' পর্বত। ওখান থেকে একটী বরফের নদী আমাদের তাঁবুর নিকট দিয়েই বয়ে গেছে। কোন রকমে দুপুরের আহারাদি সেরে বিশ্রাম লওয়া গেল। পরদিন ভোরেই কিছু জলযোগ করে আবার যাত্রা।

সামনে বেশ একটী উঁচু পাহাড়! ওটিকে ডিঙিয়ে না গেলে মানস-সরোবর পাওয়া যাবে না। ভয়ঙ্কর চড়াই-উৎরাই। পথে এক মালভূমিতে তাঁবু ফেলতে হ'ল। প্রচণ্ড বায়ুর বেগ দেখা দিল। তাঁবু ফেলাই এক সমস্যা! সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে চায়। রান্না করব কি, উনুন জ্বলতে চায় না! রান্না ত হ'ল, কিন্তু খাবারের উপর যত রাজ্যের ধুলো ও ময়লা উড়ে পড়তে লাগল!

গাইড বলে উঠল,—আর সাত আট মাইল হাঁটার পর শ্রীশ্রী৺ কৈলাস দর্শন হবে। এ কথা শুনা মাত্র আনন্দে হৃদয় নেচে উঠল। এত দুঃখ কষ্ট অনাহার অনিদ্রা—এতদিনে সার্থক হবে।

গাইড বলছে,—'আজ কৈলাস ও মানস দর্শন হবে।' বারে বারে শুধু ঐ কথাকটির ঝঙ্কার হৃদয়ে বেজে উঠছে, আজ কৈলাস দর্শন হবে! কেবলই মনে হচ্ছে সেই চিরদুর্লভ, জন্ম-জন্মান্তরের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ধন—যাঁর জন্ম এ দুর্গম পথ যাত্রা—এই প্রাণান্তকর তপস্যা—সেই রূপাতীত রূপের দর্শন মিলবে। কি এক অব্যক্ত আনন্দে যন্ত্রচালিতের মতো চলছি। কেবলই মনে হচ্ছে, আর কতক্ষণে তাঁকে দেখব—যাঁকে দেখবার জন্ম বেরিয়েছি।

চড়াই পথে উঠছি। বিহ্বল হয়ে চারদিকে তাকাই—কই, তুমি আর কতদূরে! পর্বতের

সানুদেশে এ সেই এক অনির্বচনীয় অপূর্ব দৃশ্য দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। ৭।৮ মাইল পথ কখন যে শেষ করে ফেলেছি তা আমরা কেউ টের পাই নি! ঠিক সামনেই দেখা গেল—শুভ্র তুষারমণ্ডিত কৈলাসপতির ভাবগম্ভীর রূপ, উজ্জ্বল সূর্যালোকে দেখাচ্ছিল আরো অপরূপ!

আকাশ আজ নির্মল স্বচ্ছ। এতদিন যা কল্পনা-রাজ্যে ছিল—আজ তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভক্তি-গদগদকণ্ঠে সকলে সমস্বরে "জয় কৈলাসপতিকী জয়" "জয় গঙ্গামাঈকী জয়" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললে। আমিও আপন ভাবে উদাত্ত কণ্ঠে 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্র' পাঠ করতে শুরু করে দিয়েছি। এইভাবে সকলেই যে যার মনের আকাঙ্ক্ষা প্রাণভরে মিটিয়ে নিলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। চার পাঁচ মাইল অগ্রসর হয়েই দেখতে পেলাম—অপূর্বশোভন মানস-সরোবর।

আজ কী পুণ্য দিন! কৈলাস ও মানস-সরোবরের দর্শন পেলাম। ক্রমে এসে পড়লাম মানসের তীরে।

মানস সরোবর! তিব্বতের মালভূমিতে পনের হাজার ফিট উপরে কি দেখছি! এ যে মহা সমুদ্র। চারিদিকে শুধু নির্মল অগাধ জলরাশি। উপরে সুনীল আকাশের চন্দ্রাতপ। নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ পড়াতে তারা অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে।

একবার তাকাই কৈলাসের দিকে, আবার দেখি মানস-সরোবরের অপরূপ রূপ। জল অতি স্বচ্ছ—তাই আকাশের নীল আভার সঙ্গে যেন মিশে গেছে। চারিপাশেই পর্বতগাত্র; তাই এই সুন্দর সরোবরের ৬০ মাইল পরিধি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গভীরতা কোন কোন স্থানে ৩০০ ফুট!

জল বরফের মত শীতল। প্রথম দিন স্নান করতে অনেকেই ইতস্তত: করছিলেন—আমি ত "জয় কৈলাসপতিকী জয়" বলে নেমে পড়লাম। জল প্রথমেই খুব গভীর নয়—তবে বেশ ঢেউ রয়েছে; দেখেই ভয় হচ্ছে; যাক্ সাহস করে নেমে এক ডুব দিলাম। সমস্ত শরীর যেন হিম-শীতল হয়ে গেল। কোন রকমে তীরে উঠে ভিজে কাপড়-জামা বদলে সর্বাঙ্গ কম্বল দিয়ে ঢেকে একটু রোদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। সূর্যদেব সেদিন উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। সেই রোদে কিছুক্ষণ থাকার পর শরীরে যেন সাড় এল। শান্ত আনন্দে মন প্রাণ ভরে গেল। শরীর মনে নব শক্তি, নবীন চেতনা জেগে উঠেছে। প্রাণে অপরিসীম আনন্দের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। আজ আর ক্লান্তি নেই, কষ্ট নেই, দুঃখ নেই; অন্তরে বাহিরে অপূর্ব শান্তি বিরাজ করছে।

এখানেই আমাদের তাঁবু পড়ল। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আর তেমনি ধূলো। তাঁবু আটকে রাখাই এক সমস্যা। পরের দিন গুরুপূর্ণিমা। সকলেই স্নানাদি করলেন। তীরে নানা রকমের পাথরের নুড়ি। প্রবাদ আছে মানস-সরোবরে 'পরশ পাথর' পাওয়া যায়। তাই সকলে এটা ওটা কুড়িয়ে লোহাতে ছুঁইয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন। কিন্তু লোহা ত সোনায় পরিণত হ'ল না!

কবি কালিদাসের বর্ণনাতে আছে মানস-সরোবরে কত কমল প্রস্ফুটিত! কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর একটী কমলেরও দর্শন পাওয়া গেল না। খবর নিয়ে জানলাম ওখানে কোন কালে পদ্ম ফোটে না। তবে সহস্র সহস্র রাজহাঁস রয়েছে। ঢেউ এর সঙ্গে সঙ্গে তারাও মনের আনন্দে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো বা বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে কোন রাজহংসী শৈবালদলের মধ্যে খাবারের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরছে। আর রয়েছে অনেক মাছ, দেখতে মহাশোল মাছের মত।

এখান থেকেও কৈলাস প্রায় ২০ মাইল। পথও অতি দুর্গম। আমরা কৈলাসপতির জয় দিয়ে এগিয়ে চললাম, একদিকে দর্শন করি কৈলাস—আর একপাশে মানস। যত এগোই ততই গভীর আগ্রহে হৃদয় মন ভরে উঠে। কিন্তু পথে প্রচণ্ড হাওয়া আর তার সাথে ধুলো। সর্বদেহ সাদা ধুলোতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল! এ যেন দর্শন দেবার পূর্বে শিবই কৃপা করে বিভূতিভূষিত করে দিচ্ছেন তাঁর দর্শন-ভিখারী সন্তানদের। আঠারো হাজার ফিট উপরে—কৈলাস শিখরের পাদদেশ দিয়ে আমরা চলেছি। পথ অতি দুর্গম ও বিপদসংকুল। কখনো গিরিখাতের ভেতর দিয়ে আবার কখনো প্রস্তরস্তূপের উপর পায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে চলেছি একটা নেশার ঝোঁকে। সামনে আশে পাশে সর্বত্রই বরফ। এই ঠিক ঠিক বরফের রাজ্য। বরফের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে চলেছি—একটু পা পিছলে গেলে ছিটুকে পড়তে হবে বহু দূরে। শৈলশিরার শেষ প্রান্তে ডেরাগুম্ফের সামনে এসে পড়েছি। ডেরাগুম্ফার লামা হলেন কৈলাসপতির পূজারী। আহা! এ কী দেখছি—অতি নিকটে বাবার বিরাট লিঙ্গমূর্তি—গৌরীপট্ট-সহ পূর্ণ দর্শন! এক অনুপম রূপমাধুরী দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মুগ্ধ নেত্রে পাথরের মত নীরব নিথর হয়ে জন্ম-জন্মান্তরের অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে বুভুক্ষুর মত চেয়ে আছি! যেন স্থান কাল পাত্র—সব কিছু চলে গিয়েছে। এক অপূর্ব অনুভূতি, বর্ণনার অতীত!

কৈলাসপতির আরাধনা শেষ করে আমরা ভাবের ঘোরে 'ডেরাফুক' গুম্ফার ভেতর গেলাম। গুম্ফাতে সকলেই ডাবা (ব্রহ্মচারী); লামা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) একজনও উপস্থিত নেই। আমাদের দেখে অল্পবয়স্ক 'ডাবা'রা ছুটে এসে বলে, 'লামাগুরু, পয়সা দেনা—খানা দেনা'। তাদের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। ডাবাদের হাতে কিছু বাদাম পেস্তা, কিশ্‌মিস্‌ ও খুচরা পয়সা দিয়ে কৈলাসের পূজারীর হাতে প্রচুর ধূপকাঠি কর্পূর প্রভৃতি দিলাম। গুম্ফার ভেতরে ছোট্ট গুহার মধ্যে প্রবেশ করে বহু দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পেলাম। প্রধান মূর্তি বুদ্ধদেবের—বেশ সৌম্যদর্শন।

আজ আমাদের দুরমালা অতিক্রম করে ১৮৭৫০ ফিট পর্যন্ত উঠে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছাতে হবে। আমরা বেশ হুঁশিয়ার হয়ে ঘোড়ায় যাচ্ছিলাম। রাস্তা এত দুর্গম যে পদে পদে সওয়ার-সমেত ঘোড়া পড়ে গিয়ে পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুরমালাতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফের এক পশলা বৃষ্টি ঝুরঝুর করে নেমে এল। আমাদের গায়ে মাথায় পড়ছে তুষার বৃষ্টি—এ যেন উমানাথের আশীর্বাদ!

একটু অগ্রসর হয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছলাম; কুণ্ডের পরিধি প্রায় আধমাইল। গাইড্‌কে সঙ্গে নিয়ে কুণ্ডের নীচে নেমে পবিত্র জল স্পর্শ করে উপরে উঠে এলাম। মাইলখানেক নামার পর অনেকটা সমতল; একপাশে চলেছেন কলকল ধ্বনি-মুখরিত গৌরীগঙ্গা।

নদী পার হয়ে আমাদের তাঁবুতে যেতে হবে। তুষার গলা জল। সহযাত্রী একজন জব্বু চড়ে নদী পার হতে গিয়ে ভেসে গেলেন। গাইড্‌ তার জীবন বিপন্ন করে তাকে খরস্রোত থেকে উদ্ধার করল। তাঁবুতে পৌঁছে বরফের জ্বালায় তিনি পুড়ে যাচ্ছিলেন। উপশমের জন্য ব্রাণ্ডি দেওয়া হ'ল।

রাত্রে কারও ঘুম হল না। পরদিন প্রত্যূষে চাপ চাপ বরফ তাঁবুর উপরে নীচে সর্বত্র পড়ে রয়েছে দেখতে পেলাম। বরফের বাড়াবাড়ি দেখে সহযাত্রীরা ফিরবার জন্য ব্যাকুল। বুঝিবা সকলকেই বরফে জমে যেতে হবে। অরুণদেবতার করুণামাখা আশিস গায়ে মাথায় পড়ামাত্র আমরা কৈলাস-পরিক্রমা সমাপ্ত করে বাবাকে বিদায়প্রণতি জানিয়ে মানসের দিকে যাত্রা করলাম।

একটি মৎস্যপূর্ণ নদীর তীরে তাঁবু ফেলা হল। মাছের খেলা দেখছি তার ফাঁকে কৈলাসপতিকে

প্রাণ ভরে দেখে নিচ্ছি। যত দিন যাবে ততই আমরা তাঁর থেকে দূরে বহুদূরে চলে যাব। থাকবে শুধু মধুর স্মৃতি। এক ঘণ্টা চলার পর আমরা আবার মানসের তীরে 'পড়াও' করলাম, মানে তাঁবু ফেললাম। প্রত্যুষে সকলেই তৃপ্তি করে মানসে স্নানাদি সেরে নিলাম। তাড়াতাড়ি আহারান্তে প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হ'ল। আমরা প্রাণের আবেগে কৈলাস ও মানসের উদ্দেশ্যে বার বার বিদায় প্রণতি জানালাম। এখন আমাদের উদ্দেশ্য তাক্‌লাকোট্‌। বেলা ১০টা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পর তুষার-ঝটিকার তাণ্ডব শুরু হল। প্রাণ যেন যায় যায়। আমরা অতিকষ্টে রাক্ষসতাল ও মানসকে দুপাশে রেখে পথ চলছি। দুটি পাহাড়ের মধ্যে একটি ছোট নদীর শ্যামল তীরে তাঁবু ফেলা হল।

সাংচুং-এ রাত কাটিয়ে বেলা দশটায় তাকলাকোট। তিব্বতের স্থানীয় শাসনকর্তা জংপং সাহেবের কাছ থেকে আমাদের তিব্বত ত্যাগের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হ'ল। এখানে রাত্রি যাপন করে জবু, ঘোড়া ইত্যাদির ভাড়া চুকিয়ে রওনা হলাম গার্বিয়াং। তিব্বত এখন মহাচীনের অন্তর্গত। তাকলাকোট থেকে গার্বিয়াং-এর পথে একমাইল এগোলেই মহাচীন ও ভারতে সীমান্তের মুখে চীনা 'চেক পোষ্টে' পৌঁছুলে তল্লাশ শুরু হল। অপর একটি দলের এক যাত্রীর নোট বই খুঁজে দেখে চীনা সান্ত্রীরা গম্ভীর ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। যাত্রীটি বৃন্দাবনী এক সাধুকে টুকরো কাগজে এঁকে রাক্ষসতাল, কৈলাস ও তীর্থাপুরীর রাস্তা দেখিয়েছিলেন, সেই টুক্‌রোটি নোটবুকের ভেতরে পাওয়া গেছে। একের ভুলের মাশুল—সবাইকে দিতে হবে। আমাদের দলটিও রাতের মত আটক্‌ পড়ল। শুনলাম কাল সকালে তাকলাকোট্‌ থেকে 'চেক্‌পোষ্টের' ভার প্রাপ্ত সেনানায়ক ফিরে এলে আমাদের বিচার হবে। আমাদের দলটীর পাসপোর্ট আলাদা, এই যুক্তিতে অনেক ওকালতি করা গেল, কিন্তু নিষ্ফল! সারা রাত প্রচণ্ড শীত এবং উদ্বেগে কাটিয়ে ভোরবেলা সবাই মিলে খোলা আদালতে হাজির হলাম। হাকিম রায় দিলেন, আমাদের দলটি নির্দোষ; অতএব অন্যদের সঙ্গে আমাদের আটকে রাখবার জন্য চীনরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তিনি দুঃখ প্রকাশ করছেন।

অপর দলকে সাবধান করে তিনি বললেন, "চীন ও ভারত মিত্র রাষ্ট্র। পরস্পরের সীমান্তের অভ্যন্তরে তীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্যে দুই দেশের ধর্মপিপাসুদেরই গতায়াত আছে। আপনারা আমাদের দেশে তীর্থ করতে এসেছেন, ভবিষ্যতে আরো অনেক আসবেন। আপনাদের চলাফেরা এবং আচরণে এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যার দ্বারা আমরা পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ হই। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আপনাদের এখানে একরাত্র আটকাতে হ'ল বলে কিছু মনে করবেন না।"

বিচারক নিজের আসন ত্যাগ করে এসে আমাদের সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

ছাড়া পেয়ে আবার নূতন উৎসাহ নিয়ে গার্বিয়াং-এর দিকে যাত্রা করলাম। দলের কয়েক জন, যারা গতকাল আমাদের আগেই সীমান্ত পেরিয়ে গিয়েছিলেন, দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে আজ পুনরায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে অভিভূত হলেন।

সম্মুখে লিপুলেক্‌-পাস আজই অতিক্রম করে কালাপানি পার হতে হবে। তুষারাচ্ছন্ন লিপুলেকের মাইল দুই অতিক্রম করার পর তিব্বতগামী এক বিরাট ব্যবসায়ীদলের ভেতর কীচথাম্পার মেয়ে ও জামাইকে দেখে খানিক দাঁড়িয়ে গল্প সল্প করা গেল।

ভারতীয় জবব ও ঘোড়ার পিঠে মালপত্র নিয়ে আমাদের সহযাত্রী শংকর প্রায় আধ মাইল

এগিয়ে পড়েছে। এদিকে এমন ঝেঁপে ঝড়বৃষ্টি এল যে আর এগোতে পারা যাচ্ছে না। অপর দলের তাঁবু পড়েছে, অগত্যা সেখানেই আশ্রয় নিলাম।

ভোরে উঠে আবার পায়ে চলার পথ। তিব্বতের উষর পর্বতমালা অতিক্রম করে আজ ভারত ভূমির প্রথম গ্রাম গার্বিয়াংএ পদার্পণ করব। তুষার-ঢাকা লিপুলেক-পাস্ পেরলে ভারতের সরস মৃত্তিকায় চোখে পড়ে দিগন্তব্যাপী গোলাপ, লিলি, এবং জানা-অজানা বিচিত্রবর্ণের অগণিত ফুলের সমারোহ! উপরে গাঢ় নীল আকাশ। আর নীচে যেদিকে যতদূর তাকাও শুধু ফুল, ফুল, আর ফুল—বহুবর্ণ ফুলের গালিচা যেন বিছিয়ে রেখেছে।

গার্বিয়াংএ পৌঁছে ভারতীয় চেক-পোষ্টে রিপোর্ট করলাম, পুনরায় আশ্রয় নিলাম কীচখাম্পার গৃহে। পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু। উদ্দেশ্য—ধারচুলার পথ দিয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম। বোধির চড়াই পেরিয়ে মালপাচে বৃষ্টির জন্য আটকে গেলাম।

পরদিন যখন যাত্রা করি তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। দু মাইল যেতে না যেতেই দেখি প্রবল বর্ষার চাপে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে ধ্বস নেমেছে। কালীগঙ্গার পাড় ধরে চলেছি, পথ অতি দুর্গম। জনপ্রাণীর গতায়াত নাই। ধাবমান ফেনায়িত জলকল্লোলে কর্ণ বধির হবার উপক্রম। ক্ষণপরেই নদীর উভয় তীরে শুরু হ'ল পাথর খসার শব্দ—যেন মহাযুদ্ধে কামান গর্জাচ্ছে! পেছনেও মৃত্যু—সম্মুখেও মৃত্যু! অতএব এগিয়ে চলাই ভাল। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছি। সামনেই হঠাৎ প্রচণ্ড বজ্রপাতের আওয়াজ—উপর থেকে এক বিরাট পাথর খসে পড়ে রাস্তার খানিকটা গুঁড়িয়ে নিয়ে নীচে কালীনদীতে অদৃশ্য হয়ে গেল। চতুর্দিকে মৃত্যুর তাণ্ডব—নীচে খরস্রোতা কালীনদীর গর্জন, পাশেই বর্ষা-ভেজা সু-উচ্চ পিচ্ছিল পর্বতগাত্র থেকে খসে-পড়া পাথরের কামান-ধ্বনি! আর সব দিকে সর্বত্র সহস্র ধারায় ফেনায়িত পাগলা ঝোরার আওয়াজে কানে তালা লেগে গিয়েছে।

কুলিরা সব জবাব দিল, আর একপাও এগোবে না। কি করা যায়—সত্যিই এই ধ্বস পেরিয়ে যাওয়ার সাহস যে কারো আছে, তা তাদের মুখ দেখে মনে হয় না। অগত্যা আমি শ্রীগুরুস্মরণ করে অতি সন্তর্পণে ধ্বসের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ালুম। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেওয়ার পর যেন কুলিরা বুকে বল পেল।

এক ফার্লং জুড়ে ধ্বস নেবেছে। অতি সন্তর্পণে সবাই মিলে সেটাকে পার হওয়া গেল। কিন্তু তবু কি বিপদের শেষ আছে? পথের স্থানে স্থানে রাস্তা ভাসিয়ে প্রবল খরস্রোত কালীনদীতে গিয়ে নেবেছে। এমন স্রোত যে পা রাখা দায়, তবু তারই ভেতর দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে। খরস্রোতগুলো ছুঁচলো লাঠির ডগা পুঁতে কোন প্রকারে পার হওয়া গেল—ছোটগুলো লাফিয়ে। অবশেষে ধারচুলা পৌঁছলাম। তিব্বতের প্রস্তরাকীর্ণ বরফ-ঢাকা উষর ভূমির পরে এতদিনে সবুজ শস্পাস্তীর্ণ বনভূমি ও সমতলে বায়ু আন্দোলিত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত দেখে চোখ জুড়ালো।

ধারচুলা থেকে পৌঁছলাম 'পিথরাগড়'। পিথরাগড় পূর্বে নেপালের অধীনে ছিল। ইংরেজের সঙ্গে বহুবার এখানে নেপালের যুদ্ধ হয়েছে। বেশ সমৃদ্ধশালী শহর—খৃষ্টান মিশনারীদের একটি প্রধান আড্ডা। পিথরাগড় থেকে পরদিনই মায়াবতীর রাস্তায় বাসে করে এসে পৌঁছলাম 'লোহাঘাট'।

দুর্গমের যাত্রা শেষ হ'ল। নানাদিক দেশ থেকে এসে সকলে একদা একত্র হয়েছিলাম—দূরের

লোক হয়েছিল পরম আত্মীয়, বিপদের বন্ধু। আজ এখানে হবে সকলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। জীবন-নাট্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র নাটকের একটি অঙ্ক এখানেই শেষ।

চলতি পথের পরিচয়—কিন্তু, তবু কি নিবিড় স্নেহবন্ধনে বাঁধা পড়েছি এদের সঙ্গে, কত তুহিন-শীতল হিম-রাত্রি, জন-মনুষ্যহীন বরফের প্রান্তরে এক তাঁবুতে একত্র রাত কাটানো, কত কুসুমাস্তীর্ণ পার্বত্য প্রদেশ, কত তুষারকীর্ণ মরুপথ, কত চড়াই-উৎরাই, দিক্‌চিহ্নহীন কঠিন নীরস পর্বতগাত্রে একত্র পথ চলা—সব আজ এখানে এসে শেষ হ'ল। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম; এবার মায়াবতীর পথে আমার একমাত্র সঙ্গী শঙ্কর।

গৌতম বুদ্ধের সাধনা

[যজ্ঞ-তপস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মত]

ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

"চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে।
বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাধিপ্রমোচকঃ॥"

হে বুদ্ধদেব! ক্লেশরূপ ব্যাধি-দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বহুকালযাবৎ জীবলোক আতুর অবস্থায় পতিত ছিল, তুমিই সর্বপ্রকার ব্যাধির প্রমোচনকারী বৈদ্যরাজ বা চিকিৎসক-প্রধান হইয়া সমুৎপন্ন হইয়াছ।

গৌতম বুদ্ধ এক বিরাট ব্যক্তিত্ব লইয়া ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বয়ং-আচরিত ও জগতে উপদিষ্ট ও প্রচারিত ধর্ম ছিল বহুলাংশে নীতিমূলক। ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে তাঁহার যুক্তিমত্তা ও মানবের মনস্তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার প্রজ্ঞা-বৈশারদ্য কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র জগতে সুবিদিত। সর্ববিশ্বহিতকর তদীয় ধর্মোপদেশের যতই প্রচার ও আলোচনা হইবে, ততই পৃথিবীতে সুখ ও শান্তিধারার প্রবাহ লক্ষিত হইবে। জগৎ হইতে দুর্নীতির বিলয় ঘটাইতে হইলে বুদ্ধের উপদিষ্ট সুনীতিসমূহের গ্রহণ বিধেয়। এমনকি, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ ধর্মের শীলাদির প্রভাব বিস্তারিত হইবার যোগ্য। শ্রীবুদ্ধের ব্রহ্মবিহারের কল্পনায় মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা—এই চারিটির যে আচরণ-নির্দেশ আছে, তাহা চিরকালই স্মরণীয়। এই সব কথা ভাবিয়াই এই মহাপুরুষ বা অবতারের জীবনচরিতের একটি বিষয় লইয়া এই প্রবন্ধ রচিত হইল।

প্রাগ্‌বুদ্ধ যুগের ভারতীয় ধর্মে পৌরোহিত্য ও কর্মকাণ্ডের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্-গুলি সেই প্রভাবের অনেকটা বিরোধিতা সম্পাদন করিয়াছে। তৎপরে বুদ্ধদেবও যজ্ঞ তপস্যাদি ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের কথাবস্তু সংগৃহীত হইয়াছে তিনখানি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, যথা: পালি ভাষায় রচিত 'নিদান-কথা', সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত তিন ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত গাথা-নামক ভাষায় রচিত 'মহাবস্তু-অবদান', এবং মহাকবি ও মহাদার্শনিক অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ-চরিত'।

পাঠকমাত্রই জানেন কেমন করিয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম স্নেহবান্ পিতা রাজা শুদ্ধোদন, স্নেহময়ী মাতৃসদৃশা মাতৃষ্বসা গৌতমী, রূপলাবণ্যবতী ভার্যা যশোধরা ও নবজাত শিশুপুত্র রাহুলকে এবং আত্মীয়স্বজনসহ সমগ্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংসারে ত্রিতাপের অভিঘাতে খিন্ন হইয়াই জগতের লোকেরা মুক্তিকামী হয়।

ছন্দককে বিদায় দিয়া গৌতম সর্বপ্রথম এক

তপোবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাই বশিষ্ঠ-গোত্রনামা এক ঋষির আশ্রম। আশ্রমবাসী বিপ্রেরা বোধিসত্ত্বের অলৌকিক শরীরলক্ষণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেখানে একটি তপস্বীকে তিনি তপস্যার তত্ত্ব ও সেই আশ্রমে প্রচলিত ধর্মবিধির আচরণ ও তৎফলবিষয়ক প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, কোন কোন তপস্বী অগ্রাম্য, সলিল-প্ররূঢ় অন্ন, বৃক্ষপর্ণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করেন; কেহ উঞ্ছবৃত্তিক হইয়া, কেহ বা বল্মীক মধ্যে ভুজঙ্গসহ বাস করিয়া, কেহ জটাকলাপধারী হইয়া, কেহ দুই সন্ধ্যায় অগ্নির উপাসক হইয়া, কেহ বা আবার মৎস্যসহ জলে বাস করিয়া কাল অতিবাহিত করেন। এইরূপ নানাভাবে তপস্যা করিয়া কেহ তৎফলে স্বর্গে যাইয়া বা মর্ত্যলোকেই সুখ অনুভব করেন। তখন রাজকুমার সন্ন্যাসী গৌতম নিজের কথা বলিতে যাইয়া এই প্রকার তপস্যাদির এইরূপ একটি সমালোচনা করিলেন :

"দুঃখাত্মকং নৈকবিধং তপশ্চ স্বর্গপ্রধানং তপসঃ ফলং চ।
লোকাশ্চ সর্বে পরিণামবন্তঃ স্বল্পে শ্রমঃ খল্বয়মাশ্রমাণাম্ ॥"
(বুদ্ধচরিত)

'এই অনেকবিধ তপস্যা দুঃখময়, তপস্যার ফলের মধ্যে স্বর্গই প্রধান; স্বর্গাদি-লোক-সকল পরিণাম-যুক্ত (অর্থাৎ পরিবর্তন ও ক্ষয়শীল), তাই দেখা যাইতেছে যে, আশ্রমবাসীদের এই শ্রম যেন অল্প-বস্তুলাভের জন্য (গুরুতর তত্ত্বলাভের জন্য নহে)।' তাঁহার মতে স্বর্গফলের জন্য নিয়মাদির আচরণ মহত্তর বন্ধনের হেতু হইতে পারে। ইহা তো দুঃখ-দ্বারা অন্য দুঃখ অন্বেষণমাত্র।

"ইহার্থমেকে প্রবিশন্তি খেদং স্বর্গার্থমন্যে শ্রমমাপ্নুবন্তি।
সুখার্থমাশাকৃপণোঽকৃতার্থঃ পতত্যনর্থে খলু জীবলোকঃ ॥"
(বুঃ চঃ)

'কেহ কেহ ঐহিক সুখাদি লাভের জন্য দুঃখপূর্ণ বিষয়ে প্রবেশ করে, অপর কেহ কেহ স্বর্গার্থে শ্রম অবলম্বন করে। কিন্তু, জীবলোক সুখের আশা করিয়া, নিজকে দীন বোধ করিয়া, অকৃতার্থ হইয়া অনর্থে পতিত হয়'। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এমন বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করা উচিত "যত্র পুনর্নকার্যম্"—যাহাতে আর কোন করণীয় করিতে হইবে না। কৃচ্ছ্রসাধনে বা শরীরপীড়া-দ্বারাই ধর্ম হয় না। চিত্তের বশেই মানুষের শরীর—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথে চলে, তাই চিত্তের দমনই তাহার উপযুক্ত কার্য, কারণ, চিত্ত-ব্যতিরেকে শরীর ত কাষ্ঠপ্রায়।

এইভাবে অনেক যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়া সে দিন বোধিসত্ত্ব সন্ধ্যাসময়ে তপঃপ্রশান্ত সেই তপোবনে প্রবেশ করিলেন। কয়েক রাত্রি সেখানে বাস করার পরে তিনি তপস্যার পরীক্ষা করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ তপস্বী সম্মান-সহকারে গৌতমকে বলিতে লাগিলেন—"হে বৎস! তুমি আমাদের আশ্রমে থাকাতে ইহা পূর্ণ প্রতিভাত হইতেছে; তুমি চলিয়া গেলে ইহা শূন্য বোধ হইবে। সুতরাং তোমার এখানেই থাকা উচিত। সম্মুখে তুমি যে হিমালয় পর্বত দেখিতেছ সেখানে কত ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিরা তপস্যা করিয়া থাকেন এবং সেখানে অনেক পুণ্যতীর্থ রহিয়াছে"। তপস্বিমুখ্য এইরূপ অনুরোধ করিলেও ভবপ্রণাশের জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ গৌতম তাঁহাকে বলিলেন—তপোবনের মুনিদিগের আমার প্রতি স্বজনভাবদর্শনে আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে আমারও দুঃখ হইবে। কিন্তু,

'স্বর্গায় যুষ্মাকময়ং তু ধর্মো মমাভিলাষস্ত্বপুনর্ভবায়।
অস্মিন্ বনে যেন ন মে বিবিৎসা ভিন্নঃ প্রবৃত্ত্যা হি নিবৃত্তিধর্মঃ ॥'
(বুঃ চঃ)

'আপনাদের ধর্মাচরণ স্বর্গলাভের আশায়; আমার অভিলাষ অপুনর্ভবের (অর্থাৎ জন্মান্তরচ্ছেদের) জন্য। এই কারণে, এই বনে বাস করিবার ইচ্ছা আমার নাই। যে হেতু প্রবৃত্তিপর ধর্ম হইতে নিবৃত্তিপর ধর্ম ভিন্ন রকমের।' পরিব্রাজক গৌতমের অর্থবৎ, ওজস্বী ও গর্বিত বচন শুনিয়া তপস্বীরা তাঁহার প্রতি অত্যধিক সমাদর প্রকাশ

করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একটি ভস্মশায়ী দ্বিজ গৌতমকে বলিলেন—"হে ধীমন্! তোমার সংকল্প উদার, যে-হেতু তুমি জন্মপরিগ্রহে দোষদর্শী হইয়া স্বর্গ ও অপবর্গের (মোক্ষের) বিচার করিয়া নিজে অপবর্গেই মতি রাখিয়াছ।

'যজ্ঞৈ স্তপোভির্নিয়মৈশ্চ তৈস্তৈঃ স্বর্গং যিযাসন্তি হি রাগবন্তঃ।
রাগেণ সার্ধং রিপুণেব যুদ্ধ্বা মোক্ষং পরীপ্সন্তি তু সত্ত্ববন্তঃ॥'
(বুঃ চঃ)

যাঁহারা (বিষয়-সুখে) রাগযুক্ত তাঁহারাই সর্বপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা ও নিয়ম আচরণ করিয়া স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক; কিন্তু, যাঁহারা সত্ত্বগুণী লোক তাঁহারা রাগ বা বিষয়াসক্তিকে শত্রু মনে করিয়া, ইহার সহিত সংগ্রাম করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন।

মহাবস্তু-অবদানে উক্ত হইয়াছে যে, যখন বোধিসত্ত্ব বশিষ্ঠের সেই ধর্মারণ্যে প্রথম প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেই নির্বাত সাগরের ন্যায় অব্যগ্র মুনিকে দর্শন করিয়া ধর্মাত্মা শাক্যরাজকুমার তৎসমীপে ভূমিতে উপবেশন করিলেন। কাঞ্চন-স্তম্ভসদৃশ, জন্মশত-সঞ্চিত গুণসঞ্চয়ে লব্ধ শুভ শারীরলক্ষণযুক্ত সন্ন্যাসী রাজকুমারকে সবিশেষ লক্ষ্য করিয়া ঋষি বলিয়াছিলেন—

"স্নিগ্ধগম্ভীরশব্দেন স্বরেণ অনুনাদিনা।
ত্রিলোকমর্হতে কৃৎস্নমাজ্ঞাপয়িতুমোজসা॥
ব্যঞ্জনানি হি যা যস্য লক্ষণানি চ লক্ষয়ে।
যুক্তোহয়ং সর্বভূতানাং ত্রিলোকপতিরীশ্বরঃ॥" (মহাবস্তু)

(এই ব্যক্তি) তাঁহার স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও অনুনাদকারী স্বরের শব্দদ্বারা নিজ তপোবলে সমগ্র ত্রৈলোক্যকে আজ্ঞা করিবার যোগ্য। তাঁহার (শরীরে) আমি যে-সব লক্ষণ ও ব্যঞ্জন (চিহ্ন)-সমূহ লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে (মনে হয় যে) তিনি ত্রিলোকে সর্বজীবের অধিপতি হইবার উপযুক্ত। কি কারণে তাঁহার তপোবনে আগমন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে গৌতম বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন,

"ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ শুদ্ধোদন-নৃপাত্মজঃ।
বিহায় পৃথিবীং রাজ্যং উজ্ঝিত্বা মোক্ষমাস্থিতঃ॥
লোকস্ত বহুভিদুঃখৈর্দৃষ্ট্বৈবং সমভিদ্রুতম্।
মোক্ষার্থমভিনিষ্ক্রান্তো জাতিব্যাধিজরাদিভিঃ॥
যত্র সর্বং ন ভবতে যত্র সর্বং নিরুধ্যতে।
যত্রোপশমমাতে সর্বং তৎপদং প্রার্থয়াম্যহম্॥"

—আমি ইক্ষ্বাকুবংশজাত ও শুদ্ধোদন রাজার পুত্র, পৃথিবী ছাড়িয়া ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া মোক্ষকে আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু, জন্ম ব্যাধি ও জরা প্রভৃতি বহুবিধ দুঃখদ্বারা এইভাবে লোককে সংপীড়িত দেখিয়া আমি মোক্ষের অন্বেষণে (গৃহ হইতে) অভিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। আমি সেই পদ বা স্থানই প্রার্থনা করি, যাহাতে কোন কিছুই ভব বা সত্তা লাভ করে না, যাহাতে সব কিছুই নিরোধ বা বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সব কিছুই উপশম বা নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। বশিষ্ঠ সর্বশেষে বোধিসত্ত্ব গৌতমকে এই কথা বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন:

ঈদৃশেন হি বৃত্তেন বৃত্ত্যা লক্ষণসম্পদা।
প্রজ্ঞয়া চ মহাভাগ ন কিঞ্চিদ্ যং ন প্রাপয়ে॥

—হে মহাভাগ! তোমার ঈদৃশ আচরণ, তোমার শরীরলক্ষণের উপযোগী ব্যবহার ও প্রজ্ঞাদ্বারা—তুমি না পাইতে পার' এমন কিছু নাই।

সেই আশ্রমের পূর্বোক্ত ভস্মশায়ী ব্রাহ্মণ তপস্বীর নির্দেশে, গৌতম বিন্ধ্যকোষ্ঠে (মহাবস্তুর মতে, বৈশালীতে) শ্রেয়োবিষয়ে লব্ধচক্ষুঃ নৈষ্ঠিক মুনি অরাড়কালামের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের আশায় তাঁহার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। এই ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী তত্ত্ববিৎ ব্রহ্মবাদী মুনিকে সাক্ষাৎ করার পথে, (মহাবস্তুর মতে, মুনির সহিত সাক্ষাৎকার লাভের পরে) গৌতম মগধদেশের রাজধানী রাজগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। এই রাজগৃহ নগর তখন 'পঞ্চাচলাঙ্ক' অর্থাৎ পাঁচটি গিরিদ্বারা পরিবৃত বলিয়া পরিচিত ছিল। গৌতম সেখানে শ্রেণ্য রাজা বিম্বিসারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন রাজগৃহ-প্রদেশের পাণ্ডবপর্বতের এক গুহায় বাস করিতেন এবং খাদ্য-সংগ্রহের জন্য নগর মধ্যে যাইতেন। রাজা ভিক্ষুবেশী শাক্য-

কুমারকে বাহিরের প্রাসাদ হইতে লক্ষ্য করিয়া রাজদূত পাঠাইয়া জানিলেন যে, ভিক্ষুটি শুদ্ধোদন রাজার পুত্র গৌতম, যাঁহার সম্বন্ধে পূর্বে বিপ্রগণ বলিয়াছিলেন যে, হয় তিনি শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান অথবা রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন—"জ্ঞানং পরং বা পৃথিবী-শ্রিয়ং বা বিপ্রৈর্য উক্তোঽধিগমিষ্যতীতি"।

রাজা অমাত্য ও পরিজন সঙ্গে করিয়া পাণ্ডব-পর্বতে যাইয়া দেখিলেন যে, সেই কাষায়ধারী কুমার-সন্ন্যাসী এক বৃক্ষমূলে পর্যঙ্কবন্ধে একাগ্রচিত্তে সমাধিনিমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাজা বিম্বিসার গৌতমের সহিত কথোপকথন-সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেন তিনি কুলধারা রক্ষা না করিয়া, এই বয়সে ভিক্ষাচরণে মতি দিয়া, রাজ্যপালন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে শাস্ত্রকারদিগের মতে ধর্মাচরণ কেবল স্থবিরদিগেরই আচরণীয়। রাজা গৌতমকে আরও স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে—যদি একান্তই ধর্মাচরণ করিতে হয়, তবে তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত; কারণ, অনেক রাজর্ষি ও মহর্ষি যজ্ঞ সম্পাদন-দ্বারাই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। গৌতম উত্তরে রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, অকল্যাণের হেতুভূত সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু ত্যাগ করিয়া, আত্মীয়-স্বজনকে কাঁদাইয়া, তিনি জরা ও মৃত্যুর ভয় বিশেষভাবে বুঝিয়া মুমুক্ষাবশতঃ ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাজা তাঁহাকে নিজ-রাজ্যের অর্ধভাগ দান করিতেও চাহিয়াছিলেন—কিন্তু, গৌতমের নিকট রাজ্য ও দাস্য সমান প্রতিভাত হইত, কারণ—

"নিত্যং হসত্যেব হি নৈব রাজা, ন চাপি সন্তপ্যত এব দাসঃ।"

—রাজাও নিত্যই হাসেন না, আর দাসও নিত্যই সন্তাপ ভোগ করে না। গৌতম রাজাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, রাজ্যব্যতিরেকেও তাঁহার মনস্তুষ্টি আছে। শান্তির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ধ্যান অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী হইয়াছেন; মানুষ-লোকের কথা দূরে থাকুক, তপস্যাদির আচরণের ফলে তিনি স্বর্গ-লোকেও রাজত্ব করিতে চাহেন না। ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের সেবা তিনি অনর্থ মনে করেন, এবং যাহাতে জন্ম, জরা, রোগ, মৃত্যু, ভয় ও মানসিক ব্যথা বিদ্যমান নাই এবং যাহার লাভে পুনঃ পুনঃ কোন কর্মই আর করিতে হয় না— সেই বস্তুকেই তিনি পরমার্থ বলিয়া মনে করেন। যজ্ঞসম্পাদনে দোষদর্শী হইয়া গৌতম বিম্বিসারকে এইরূপ বলিয়াছিলেন:

"নমো মখেভ্যো ন হি কাময়ে সুখং পরস্য দুঃখক্রিয়য়া যদিষ্যতে "

—'যজ্ঞসমূহকে আমি নমস্কার করি—তদ্দ্বারা আমি কোন সুখ আকাঙ্ক্ষা করি না—কারণ, এই-সবে অপর প্রাণীর দুঃখ-সম্ভাবনা আছে'। তিনি ভাবিতেন যে পরহিংসা ইহলোকে বা পরলোকে সুখবিধান করিতে পারে না।

মগধরাজ গৌতমকে আশীর্বাদ করিলেন:

'তং খো তথা ভোতু স্পৃশাহি নির্বৃতিং
বোধিং চ প্রাপ্তো পুনরাগমেসি।
মহ্যং ঋষি ধর্মং কথয়েসি গৌতম
যমহং শ্রুত্বা ন ব্রজেয় স্বর্গতিম্॥" (মহাবস্তু)

—(তুমি যেরূপ চাহ) তাহা যেন সেইরূপই হয়। তুমি যেন নির্বাণ স্পর্শ বা লাভ করিতে পার। বোধি বা সম্যক্‌সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় (এখানে) আসিও। হে গৌতম! (তখন) তুমি আমাকে ধর্মকথা বলিও—যাহা শুনিয়া আমি স্বর্গে যাইতে পারি। বোধিসত্ত্বও বিদায়কালে বলিলেন:

"তং খো মহারাজ তথা ভবিষ্যতি
বোধিং স্পৃশিষ্যামি ন মেঽত্র সংশয়ঃ।
প্রাপ্তো চ বোধিং পুনরাগমিষ্যং
ধর্মং চ তে দেশয়িষ্যং প্রতিশৃণোমীতি॥" (মহাবস্তু)

—হে মহারাজ! সেইরূপই হইবে। আমি যে বোধি প্রাপ্ত হইব সে-বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। বোধি প্রাপ্ত হইয়া আমি পুনরায় (এখানে) আসিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তখন আমি আপনাকে ধর্মের দেশনা বা উপদেশ প্রদান

করিব। পাঠক জানেন—গৌতম 'বুদ্ধ' হইয়া মগধরাজকে ধর্মদানরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

বিন্ধ্যকোষ্ঠেই হউক, আর বৈশালীতেই হউক, গৌতম বিমোক্ষবাদী ও আত্মাতে বিশ্বাসী অরাড় কালামের আশ্রমে যাইয়া মুনির সহিত পরমার্থ-বিষয়ক আলাপ করিয়াও সম্যক্ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। গৌতমের আশ্রমে আগমনের পরেই মুনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার রাজ্যভোগ ছাড়ার ও গৃহত্যাগের বিষয় অবগত আছেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি জ্ঞানপ্লবে চড়িয়া শীঘ্রই সর্বদুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিবেন। বোধিসত্ত্ব অরাড়মুনিকে জরা মরণ ব্যাধি প্রভৃতির হাত হইতে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি তাঁহার নিজ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গৌতমকে উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, অজ্ঞান, কর্ম ও তৃষ্ণা —এই তিনটিই সংসারের হেতু এবং মানুষ অবিদ্যার বশে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে। তিনি তাঁহাকে আরও বলিলেন যে, পরমব্রহ্মবাদীদিগের মতে মুমুক্ষুরা প্রথমে গৃহত্যাগ করিবেন এবং ভিক্ষার আশ্রয় লইবেন, শীলাচরণ করিবেন, নির্দ্বন্দ্ব হইয়া বিবিক্তসেবী হইবেন এবং তার পর প্রথম হইতে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মনির্বাণ—সুখ ও শান্তি অনুভব করিবেন। মুনি আকাশরূপী আত্মার উপলব্ধি ও আকিঞ্চন্যের কথাও বলিলেন এবং সর্বশেষে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গৌতমকে ইহাও বলিলেন :

> "এতৎ তৎ পরমং ব্রহ্ম নির্লিঙ্গং ধ্রুবমক্ষরম্।
> যন্ মোক্ষ ইতি তত্ত্বজ্ঞাঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ॥" (বুঃ চঃ)

—ইহাই সেই পরম ব্রহ্ম—যাহা নির্লিঙ্গ, ধ্রুব ও অক্ষর এবং যাহাকে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা মোক্ষ-নামে অভিহিত করেন। মুনি গৌতমকে বলিলেন, যদি তিনি ইহা বুঝিয়া থাকেন এবং যদি ইহাতে তাঁহার রুচি হইয়া থাকে, তবে এই মোক্ষবাদ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, গৌতম মনে করিলেন বিকারপ্রকৃতি হইতে মুক্ত হইলেও ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মায় প্রসবধর্ম ও বীজধর্ম রহিয়া যায়। তিনি আরও মনে করিলেন যে, অরাড়-প্রোক্ত অজ্ঞান, কর্ম ও তৃষ্ণার ত্যাগ হইতেই মোক্ষ উৎপন্ন বা উপলব্ধ হইতে পারে না, কারণ, "আত্মনস্তু স্থিতির্যত্র তত্র সূক্ষ্মমিদং ত্রয়ম্"—যে ক্ষেত্রে আত্মার স্থিতি স্বীকৃত হয়, সেখানে এই তিনটি সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যাদি ধর্মমতের মোক্ষে গৌতম দোষদর্শী হইয়া ভাবিলেন—"সত্যাত্মনি পরিত্যাগো নাহংকারস্য বিদ্যতে"—আত্মা থাকিলে অহংকার বা আমি-জ্ঞানের আত্যন্তিক পরিত্যাগ ঘটিতে পারে না। সত্ত্বের (জীবের) আত্মা 'জ্ঞ' বা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' হইলে, তাঁহার কোন না কোন জ্ঞেয় থাকিয়া যায়। আবার "জ্ঞেয়ে সতি ন মুচ্যতে"—জ্ঞেয় থাকিলে তাঁহার মুক্তি হয় না। কাজেই তিনি অরাড়মুনিকে বলিয়াছিলেন—"তস্মাৎ সর্বপরিত্যাগান্ মন্যে কৃৎস্নাং কৃতার্থতাম্"—এই প্রকার যুক্তি দ্বারা বলা যায় যে সর্ববিষয়ের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ বা বিলয় ঘটিলেই সমগ্র কৃতার্থতা লাভ সম্ভবপর হইতে পারে। তাই এই মুনি-প্রোক্ত ধর্মকে তিনি অসমগ্র মনে করিলেন, এবং দুঃখিত হইয়া অরাড়প্রোক্ত মার্গ বা ধর্ম-পথকে নির্বাণগামী মনে করিলেন না এবং সেই মুনির আশ্রম ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে চলিয়া গেলেন। গৌতম সেখানে রামপুত্র উদ্রক-নামক মুনির আশ্রমে যাইয়া "আত্মগ্রহাচ্চ তস্যাপি জগৃহে ন স দর্শনম্"—সেই মুনিও আত্মা স্বীকার করেন বলিয়া তিনি তাঁহার দর্শনও মানিয়া নিলেন না এবং সেই আশ্রম ছাড়িয়া গয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

চিত্র-পরিচয়

শ্রীশ্রীদুর্গার রঙীন ছবিখানি একটি প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত, উহা আমরা ২০, শ্যামপুকুর লেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের পৈতৃক বসতবাটী)-নিবাসী শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের উপরি-উক্ত গৃহে পদার্পণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য দেবদেবীর চিত্রের সহিত এই চিত্রটিও দর্শন করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে 'উদ্বোধন'—১৩২৯ পৌষ-সংখ্যায় বর্ণিত আছে: "যে ঘরে তাঁহাকে উপবেশন করান হয় সেই ঘরে দেবদেবীর কয়েকখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র বর্তমান ছিল, ঠাকুর সেগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হন ও ভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহাদের স্তবগান করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত প্রতীয়মান হয়।......"

স্বামী আত্মানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি—গত ৩০শে অগষ্ট রাত্রি ২ ঘটিকার সময় চণ্ডীগড় (পূর্ব পাঞ্জাব) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৬১ বৎসর বয়সে স্বামী আত্মানন্দজী দেহত্যাগ করিয়াছেন। সহসা তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রে তীব্র বেদনা অনুভূত হয় এবং পনের মিনিট মধ্যে উহাই তাঁহার জীবনাবসানের কারণ হয়।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, এবং ১৯২০ খৃঃ ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া ১৯২৬ খৃঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল রেঙ্গুন রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমেরও কর্মী ছিলেন। স্বামী আত্মানন্দ সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯২৮—১৯৩৩ খৃঃ)। ১৯৩৪ খৃঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচারকরূপে প্রেরিত হইয়া প্রায় এক বৎসর বিভিন্ন শহরে ও প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রচার করেন। সুবক্তা স্বামী আত্মানন্দ ভারতবর্ষেও নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯৩৯ খৃঃ লাহোরে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র স্থাপিত হইলে স্বামী আত্মানন্দ তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৭ খৃঃ দাঙ্গার সময় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ঐ কেন্দ্র বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। অতঃপর পূর্বপাঞ্জাবের নির্মীয়মাণ রাজধানী চণ্ডীগড়ে ঐ কেন্দ্র স্থানান্তরিত করিবার নির্দেশ পাইয়া তিনি প্রাপ্ত জমির উপর গৃহাদি নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিছুদিন যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না, কিন্তু ঐ বিষয়ে তাঁহার ঔদাসীন্য দেখা যাইত। তাঁহার দেহত্যাগে সংঘ একজন অভিজ্ঞ কর্মী হারাইল। সকলের প্রিয় স্বামী আত্মানন্দ আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুক্ত আত্মা পরমা শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্য-বিবরণী

কনখল : হরিদ্বারের নিকটে শান্ত পরিবেশে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবা প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আর্তসেবায় নিরত। মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ নিজেরাই রোগীদের সেবা পরিচর্যা করিয়া থাকেন। দুই জন অভিজ্ঞ এবং পাশ-করা ডাক্তার ত্যাগ ও সেবার ভাবে আশ্রমে থাকিয়া রোগীদের চিকিৎসা করেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৫৬ খৃঃ কার্যবিবরণীতে ইহার উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য : আন্তর্বিভাগে ও বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ১,৫৬৯ ও ৮৯,৭৫৪ জন ; ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-সংখ্যা প্রায় ৩০০০। এবারের নূতন সংযোজন এক্স্-রে ব্লক সেবাশ্রমের বহুদিনের একটি অভাব পূরণ করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সুসম্পন্ন এবং অর্ধকুম্ভ-সেবাকার্যও সুপরিচালিত হইয়াছিল। জনসাধারণ এবং সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গতার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

ভিত্তিস্থাপন

বৃন্দাবন : বহু বৎসর যাবৎ যমুনার বন্যার জন্য বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কাজকর্ম ব্যাহত হইতেছিল। সম্প্রতি আশ্রম হইতে ১¼ মাইল দূরে জয়পুর মন্দিরের সম্মুখে যে বিস্তৃত জমি পাওয়া গিয়াছে সেখানে গত ২১শে অগষ্ট বৈকালে যুক্তপ্রদেশের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী ভি. ভি. গিরি নূতন সেবাভবনের 'আধারশিলা' স্থাপন করিয়াছেন।

তৎপূর্বে তিনি বর্তমান সেবাশ্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হন, এবং ভিত্তিস্থাপনের পর তাঁহাকে প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে তিনি মিশনের বহুমুখী সেবার বিষয় উল্লেখ করেন। দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী নবপ্রচেষ্টায় বৃন্দাবন সেবাশ্রম যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন, তাহা বুঝাইয়া সাহায্যার্থ সকলকে অগ্রসর হইতে আহ্বান জানান।

বিদ্যার্থি-সংবাদ

বেলঘরিয়া : রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী-আশ্রমের প্রাক্তন ও বর্তমান বিদ্যার্থীদের অষ্টম মিলনোৎসব ১৫ই-১৮ই অগষ্ট বিশেষ আনন্দ-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পতাকা-উত্তোলন, পূজা, হোম প্রভৃতি প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর উৎসবের প্রকাশ্য অধিবেশনে স্বামী সন্তোষানন্দজী বিদ্যার্থী-আশ্রমের আদর্শ বুঝাইয়া দেন। ছাত্রদের ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শনী, বিচিত্রানুষ্ঠান, অভিনয়, নৈশবিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ প্রভৃতিও উৎসবের অঙ্গ ছিল। সম্মেলনের মূল সভাপতি স্বামী বীতাশোকানন্দজী বলেন, স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে ছাত্রদিগকে তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। সর্বপ্রকার বাধা জয় করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হওয়াই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ—এই জয় করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়া শক্তি অর্জন করার উপযুক্ত সময় ছাত্রজীবন।

বেলুড় বিদ্যামন্দির : গত ১০ই অগষ্ট বিদ্যামন্দিরে বাৎসরিক 'ভ্রাতৃবরণ' উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নবপ্রবিষ্ট বিদ্যার্থিগণ সকলে বিদ্যার্থি-ব্রত-হোমে অংশগ্রহণ করে, এবং পুরাতনের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাদের পরিচিত করাইয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত প্রীতি-সম্মলনে নূতন ছাত্রগণ বিদ্যামন্দিরের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়।

রাজপুর : গত ৮ই সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাত্রাবাসে নূতন ছাত্রদের 'স্বাগত' আমন্ত্রণ জানাইয়া একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষ্যে পূজা হোম ও প্রীতিসম্মেলনের ব্যবস্থা হয়, যাহাতে নবাগতেরা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের প্রকৃত রূপটি ধরিতে পারে। স্বামী নির্বাণানন্দজীর উপস্থিতিতে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

১৮৫৭-১৯৫৭

এ বৎসর ১৫ই অগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা-লাভের দশম বার্ষিক উৎসবের সহিত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের অভ্যুত্থানেরও শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে দেশব্যাপী নানা উৎসবের আয়োজনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীরদের প্রতি স্মৃতি-অর্ঘ্য নিবেদিত হয়। কলিকাতার মুজিয়ামে অন্যান্য চিত্রের সহিত ১৮৫৭ খৃঃ পটভূমিকায় অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র প্রদর্শিত হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে—বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐ আন্দোলন কিরূপ দেখাইয়াছিল, তাহার সংরক্ষিত চিত্রগুলি এবং ঐ সময়ের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দর্শনীয়। বেলভেডিয়রে জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রদর্শিত—এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া রচিত বিবিধ গ্রন্থ, এই সংগ্রামের প্রামাণ্যপত্র এবং দেশী ও বিলাতী শিল্পীর অঙ্কিত বহু পুরাতন চিত্র ও ফটো উল্লেখযোগ্য।

রনজি-ষ্টেডিয়মে প্রদেশ-কংগ্রেস-আয়োজিত প্রদর্শনীতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একটি রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। বিশিষ্ট বক্তাগণ বিভিন্ন দিনে বাংলার কৃষ্টি, সাহিত্য এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার অবদান সম্বন্ধে বলেন। পনেরই আগষ্টের পূর্বে ও পরে মোট ২৪ দিন ধরিয়া এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। একই সময়ে অনুষ্ঠিত শ্রীঅরবিন্দ-উৎসবও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পুরাতত্ত্বের নূতন তথ্য

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-বিভাগের বার্ষিক বিবরণে গত বৎসরের খনন-কার্যে নানাস্থানে এমন সব তথ্য ও নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যাহাদ্বারা ভারতের বহু-প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়।

রাজস্থানে চম্বলনদীর অববাহিকায় ব্যাপক খনন-কার্যের ফলে মালব-অঞ্চলে, তাপ্তীর তীরে এবং গোদাবরীর উৎসে প্রস্তরের কুঠার প্রভৃতি পুরাতন প্রস্তরযুগের দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বীরভানপুরের মৃত্তিকাজাত পদার্থ লইয়া তথ্যানুসন্ধানের ফলে দামোদর-অববাহিকার বহুপ্রাচীনতা প্রথম প্রমাণিত হইতেছে।

হরপ্পা-কৃষ্টির গুজরাটী রূপের পরিচয় পাওয়া যায় লোথালের নগরপরিকল্পনায়; সেখানে প্রাপ্ত শীলমোহর হরপ্পার অনুরূপ। প্রভাস-পাটন (সোমনাথ)-এ হরপ্পা-সভ্যতার রূপান্তরের এবং তাহার পরবর্তী কয়েকটি কৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায়। নর্মদার মোহনাতেও হরপ্পার শেষযুগের লাল-কালো-দগ্ধ মৃত্তিকাজাত পদার্থ পাওয়া যায়।

নূতন খনন-কার্য-দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে উজ্জয়িনী-নগরী খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথম-দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল, এবং চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতার বিচিত্র স্তরের সাক্ষ্য এখানে পাওয়া গিয়াছে। কৌশাম্বীর খনন-কার্যে কালো পালিশ-করা মৃত্তিকা-যুগের পূর্ববর্তী একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, এখানে বৌদ্ধযুগেরও বহু নিদর্শন ক্রমাগত পাওয়া যাইতেছে।

মধ্যভারতে ধানোরায় প্রস্তরাবৃত কবরের গর্ত পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণভারতেও এইরূপ দোতলা সমাধি-বিবর বিশেষ দ্রষ্টব্য। নাগার্জুন-কোণ্ডায় বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও প্রস্তর-কুঠার, তাম্রখণ্ড, মৃতের ভস্মাধার এবং বুদ্ধপূর্ব ধর্মের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মধ্যপ্রদেশে ও উত্তরপ্রদেশে নানা বর্ণে চিত্রিত পার্বত্য গুহাশ্রয়—বিচিত্র বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলির মধ্যে অন্যতম।

ভাদ্র-সংখ্যার ভ্রম-সংশোধন

. বিবিধ সংবাদে ১ম পঙ্‌ক্তিতে '১৮ই শ্রাবণ' স্থলে '১৬ই শ্রাবণ' পড়িবেন।

৪০৮ পৃঃ ২য় কলমে ২০ পঙ্‌ক্তিতে 'চৌরঙ্গী খাম্বা' স্থলে 'চৌরাশী খাম্বা' পড়িবেন।

উদ্বোধন

কালী করালী

ওঁ মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং
কর্ণালম্বিনৃমুণ্ডযুগ্মভয়দাং মুণ্ডস্রজাং ভীষণাং।
বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে
দানাভীতি বিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্॥

প্রলয়-মেঘের মতো যাঁহার গাত্রবর্ণ, সকল আবরণ যাঁহার অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, অচৈতন্যরূপে প্রতীয়মান—সাক্ষিচৈতন্য-স্বরূপ কল্যাণ-ধ্যানময় পুরুষের উপর যিনি প্রতিষ্ঠিত, বর্তমান অতীত অনাগত, তথা স্থূলসূক্ষ্মকারণ-প্রত্যক্ষকারী নেত্রত্রয়-সমন্বিতা পরমা প্রকৃতির ধ্যান করি! কর্ণে তাঁহার দোদুল্যমান নৃমুণ্ডগঠিত কর্ণকুণ্ডল। গলদেশে প্রলম্বিত নামরূপাত্মক জগৎ-প্রকাশক অকারাদি বর্ণমালার প্রতীকস্বরূপ মুণ্ডমালা; দেখিতে তিনি ভীষণা, বামদিকের অধঃকরে ধৃত কর্তিত মুণ্ড জীবের অহঙ্কারেরই প্রতীক, উর্ধ্বকরে ধৃত জ্ঞানের খড়্গ! করুণাময়ী দক্ষিণাকালীর দক্ষিণ করদ্বয়ে বরাভয় প্রদর্শিত!

সৃষ্টিস্থিতিলয়-লীলা-শীলা বিশ্বপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি সর্বগ্রাসী কালেরও ভক্ষয়িত্রী কালিকা মহামায়া মায়ার সকল পাশ বিমুক্ত করিয়া জন্ম-জীবন-মৃত্যুর—সৃজন-পালন-ধ্বংসের নগ্ন রূঢ় অনাবৃত সমগ্র সত্যরূপে সাধকের বৈরাগ্যময় শ্মশান-হৃদয়ে আবির্ভূতা হন! সেই কালিকাকে আমরা বন্দনা করি, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ভয়ে আনন্দে সর্বদা তাঁহার বন্দনা করি!

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করিতেছি।

বিজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান

একথা অবিসংবাদিত সত্য যে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মানব-কল্পনাকেও পরাভূত করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে; বায়ুর গতি, শব্দের গতি পিছনে ফেলিয়া মানুষ আজ আলোকের গতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে! কিন্তু চাকচিক্যময় গতিশীল এই যান্ত্রিক সভ্যতার সকল সুখসুবিধার অন্তরালে যখন দৃষ্টি পড়ে অনড় অচল পর্বতপ্রমাণ দুঃখরাশির ও ক্রমবর্ধমান অভাব ও অসন্তোষের উপর, তখন যেন প্রশ্ন জাগে এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় কোথায় যেন একটা ফাঁকি রহিয়াছে; মানব-মনের যুক্তি বুদ্ধি ও হৃদয় অনুভূতির মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক রহিয়াছে। মনে হয় বিজ্ঞানের পথে আমরা যত অগ্রসর হইতেছি নীতিজ্ঞানের দিক দিয়া যেন ততই পিছাইয়া পড়িতেছি! কোন কোন ক্ষেত্রে নীতি-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করিতেছি না, অথবা সুবিধামত নীতি সৃষ্টি করিতেছি। তাই প্রশ্ন জাগে জড়-বিজ্ঞানের জগতে যেমন বিশ্বজনীন নিয়ম আছে—মনের জগতে, সমাজ-নিয়ন্ত্রণে সেইরূপ সার্বজনিক সার্বকালিক কোন নীতি আছে কিনা?

মানবের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য, প্রকৃতির লুকানো রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য সমবেতভাবে বিজ্ঞানচর্চা চরমরূপ গ্রহণ করিয়াছে আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক গবেষণা-বৎসরে (International Geo-physical Year)। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এখনও যে সত্য অজানা রহিয়াছে, তাহাকে জানিতে হইবে, প্রকৃতির গোপন মণিকোঠায় এখনও কি শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে তাহাকে কাজে লাগাইতে হইবে। এই প্রচেষ্টায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের বৈজ্ঞানিক নির্দিষ্ট কর্মসূচী লইয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রচেষ্টা মহতী, সন্দেহ নাই, কিন্তু উদ্দেশ্য? সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়াছে!

কোন এক দেশ—আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা করিলেন, আর এক দেশ কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিয়া যেন তাহাকে পরাস্ত করিল। সমবেত ভাবে গবেষণা দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি ও মানব-সাধারণের কল্যাণই যদি লক্ষ্য ছিল, তবে কোথা হইতে 'জাতীয়' গৌরবের প্রতিযোগিতার ভাব জাগিল; মস্কো হইতে উৎক্ষিপ্ত ঘূর্ণায়মান গোলককে 'সোভিয়েট মুন' বা রাশিয়ার চন্দ্র মনে করি কেন? সমগ্র মানবজাতিই কি মাধ্যাকর্ষণ-বিজয়ী এই বৈজ্ঞানিক কীর্তির গৌরব অনুভব করিবে না? মানুষের গত তিন শতাব্দীর সাধনা আজ সফল হইয়াছে, কিন্তু এই আবিষ্কারের উপর সামরিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া তজ্জন্য যদি সম্ভাব্য বিপদের প্রতিরোধ-প্রস্তুতি শুরু হয়, অথবা ঐ কৃত্রিম উপগ্রহকে যদি ভবিষ্যতের দুর্গ্রহ মারণাস্ত্রবাহক মনে করিয়া তদপেক্ষা শক্তিশালী যন্ত্র আবিষ্কার করিবার প্রচেষ্টায় ধনজন নিযুক্ত করা হয়—কোন কোন দেশে যাহা হইতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ—তবে বড়ই পরিতাপের বিষয়, তবে আমাদের প্রস্তাবিত আশঙ্কাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত: মানুষ বিজ্ঞানের পথে যত অগ্রসর হইতেছে নীতিজ্ঞানের পথে সে ততই পিছাইয়া পড়িতেছে! সমবেত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় আজ পারস্পরিক বিশ্বাস বিনষ্ট; রাজনীতির কূটকৌশল বৈজ্ঞানিকের বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিচ্ছিন্ন করিতেছে!

বৈজ্ঞানিক স্বীয় প্রতিভাবলে পরমাণুশক্তি আবিষ্কার করিয়া আণবিক বোমা সৃষ্টি করিয়াছেন—রাজনীতিকের নির্দেশে, সামরিক প্রয়োজনে—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁহাকেই তাহা নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে নিরপরাধ লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশুর উপর। এইখানেই বর্তমান মানবের পরাজয়—মানবতার চরম অধোগতি! বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উজ্জ্বল গৌরব গ্লানি কলঙ্কিত! বিজ্ঞান আজ আনন্দের আশীর্বাদ না হইয়া অভিশাপের আতঙ্ক-রূপে দেখা দিয়াছে! বৈজ্ঞানিককেই আজ এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বিজ্ঞানের সহিত নীতিজ্ঞান সংযুক্ত করিয়া তাহাকে ঘোষণা করিতে হইবে, মানব-কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের শক্তি নিয়োজিত করিব না; প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে—কোনও কিছুর বিনিময়ে কাহারও নিকট স্বীয় প্রতিভা বিক্রয় করিব না! তবেই মানুষ বাঁচিবে এবং সভ্যতার পরবর্তী সোপানে উন্নীত হইবে; নতুবা ধ্বংস অনিবার্য এবং সভ্যতার সেই পশ্চাদপসরণের দায়িত্ব রাজনীতিকের সহিত বৈজ্ঞানিককেও ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

বর্তমানের যুদ্ধ তীর-ধনুকের যুদ্ধ নয়, বর্শা-বল্লমের যুদ্ধও নয়, কামান-বন্দুকের মতো ট্যাঙ্ক-বম্বারকেও এখন মুজিয়ামে রাখিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে; এবং ইহাই প্রতীয়মান হয় যে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে আগামী যুদ্ধেরই প্রস্তুতি চলিতেছে আন্তর্দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (Inter-Continental Ballistic Missiles) এবং কৃত্রিম উপগ্রহ-জাতীয় আবিষ্কারের মাধ্যমে। কে জানে, এই আন্তর্জাতিক গবেষণা-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে আরও কত ভয়াবহ আবিষ্কার হইবে! অবশ্য একথা ঠিক, এই সকল আবিষ্কারের অধিকাংশই বিশুদ্ধ-জ্ঞানের পর্যায়ে; এতদ্দ্বারা আমরা ঊর্ধ্বাকাশের তাপ, চাপ ও বৈদ্যুত ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিব। কিন্তু অগ্নির ধর্ম জানা এক, তাহাকে কাজে লাগানো আর এক, শক্তিকে কাজে লাগানো নির্ভর করে মানুষের বুদ্ধির উপর—বিবেকের উপর। বিবেকবুদ্ধি যদি শুদ্ধ হয় তবেই শক্তি নিয়োজিত হইবে কল্যাণকর্মে, নতুবা শক্তি অকল্যাণ বা ধ্বংসেরও কারণ হইতে পারে। সুবুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত হইলে অগ্নি রন্ধনাদি কল্যাণ-কার্যে সাহায্য করে, দুর্বুদ্ধি-নিয়োজিত হইলে গৃহ ও গৃহাভ্যন্তরস্থ সব কিছু ভস্মীভূত করিবারও কারণ হইতে পারে। আজিকার পৃথিবীর ও মানব-সমাজের অবস্থা মনে হয় নিম্নাঙ্কিত প্রতীকেই ফুটিয়া উঠিয়াছে! রন্ধনরতা জননীর দৃষ্টি এড়াইয়া দুরন্ত শিশু কিছুটা অগ্নি কুণ্ড হইতে বাহির করিয়া লইয়া খেলা করিতেছে, জানে না—এ খেলার পরিণাম কতখানি ভয়াবহ হইতে পারে। জননীর সতর্কবাণী, শাসনবাণী উপেক্ষা করিলে সে যে শুধু নিজেরই ধ্বংস টানিয়া আনিবে তাহা নহে—সকলের ধ্বংসের কারণ হইবে। প্রকৃতির শক্তি যাহারা সংগ্রহ করিতেছে, মহাপ্রকৃতির শাসনবাণীও তাহাদের শুনিতে হইবে। বিজ্ঞানের সহিত আজ নীতিজ্ঞান সংযুক্ত না হইলে সম্মুখে সমূহ বিপদ।

জাপান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে হংকং-এ ভারতীয় সমাজের অভিনন্দনের উত্তরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীজওহরলাল নেহরু বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারে বিমুগ্ধ বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন:

যান্ত্রিক অগ্রগতি যুদ্ধের সম্ভাবনাকে 'সেকেলে' করিয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধ এখন অতীতের একটা হাস্যকর ব্যাপার। (দিগ্দেশের) ত্রি-মাত্রিক চিন্তাধারা আর বর্তমানের সমস্যার সহিত খাপ খায় না। আমাদের ইহার বাহিরে যাইতে হইবে। চতুর্থ মাত্রা (মানসিক) নৈতিক মাত্রা! বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বা কৃত্রিম চন্দ্র—সমস্যার নৈতিক সমাধান প্রচেষ্টাকে পরিবর্তিত করিতে পারে না। যান্ত্রিক উন্নতি মন্দকে ভাল বা ভালকে মন্দ করিতে পারে

না। বড় বড় যন্ত্র ঘৃণাকে ভালবাসায় পরিণত করিতে পারে না। ....

জড়বিজ্ঞানের উন্নতির পর নৈতিক মানের উন্নতির আশায় তিনি বলিয়াছেন, 'পৃথিবী ধীরে ধীরে সভ্য হইবে; আজও মানুষ যথার্থ সভ্য হয় নাই; বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির ব্যবহারে মানুষ খুব অগ্রসর, কিন্তু সে এখনও সভ্য হয় নাই। তখনই মানুষ সভ্য হইবে যখন এই যন্ত্রবিজ্ঞান ধ্বংসকার্যে ব্যবহৃত না হইয়া মানুষের কল্যাণকার্যে নিয়োজিত হইবে।'

সর্বত্র পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যখন শান্তিপ্রয়াসী তখন আণবিক বোমার ও ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা কেন এবং কাহার কল্যাণে? ইহাও সর্বজনস্বীকৃত যে আণবিক যুদ্ধের শেষে জয়ী বা বিজয়ী বলিয়া কেহ থাকিবে না, তবু বিজ্ঞানগর্বিত রাজনীতিচালিত মানুষের আজ শক্তি নাই, সাহস নাই সামরিক উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপরায়ণ আণবিক পরীক্ষা বন্ধ করার। ইহার কারণ পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস। এগুলি কোন বৈজ্ঞানিক পদার্থ নয়; নিতান্তই মানসিক ব্যাপার। অতএব আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যাহত করার প্রচেষ্টা শুরু হওয়া উচিত এই মানসিক স্তরে।

বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের সহিত নূতনতর সুখসুবিধার সৃষ্টি হয়, তৎসহ নূতনতর সমস্যাও দেখা দেয়; এইগুলি সমাধানের শক্তিও মানুষকে অর্জন করিতে হইবে আরও শক্তিশালী মনের দ্বারা।

বিজ্ঞান আগাইয়া চলিয়াছে বিদ্যুদ্গতিতে, কিন্তু মানুষের মন পিছাইয়া পড়িতেছে, তাহার সহিত তাল রাখিতে পারিতেছে না। তাই আজ এই বিপর্যয়। এখন একান্ত প্রয়োজন—মানবমনের উন্নতির আয়োজন,—যাহাতে সে এই বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান ও শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া সভ্যতার রথ কল্যাণের পথে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারে। রথ রথী অশ্ব সারথি একযোগে অগ্রসর হইলেই তাহাকে অগ্রগতি বলা যায়, নতুবা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া বল্গাহীন অশ্ব দ্রুত ধাবমান হইল, উচ্চাসনচ্যুত সারথি পড়িয়া গেল, রথ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ভাঙিয়া গেল, আর রথের আরোহিগণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া খানায় পড়িয়া রহিল, এ অবস্থা অবশ্যই দুর্গতি।

এই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ এড়াইতে হইলে একান্ত প্রয়োজন শক্তিমান সারথির শান্ত সংযত রথচালনা-কৌশল। গোযান-চালক অপেক্ষা মোটরচালককে অবশ্যই অনেক নিয়ম কৌশল আয়ত্ত করিতে হয়, আবার মোটরচালক অপেক্ষা বৈমানিককে অনেক ধীর স্থির ও কৌশলী হইতে হয়। আদিম যুগের রাষ্ট্র বা সমাজ অপেক্ষা এ যুগের রাষ্ট্র বা সমাজ খুবই ব্যাপক এবং বহুল পরিমাণে জটিল; সেই জন্যই আমাদের বক্তব্য—তাহার সুষ্ঠু চালনার জন্য উন্নততর নীতির প্রয়োজন; পুরাতন নিয়ম নীতিকে বর্জন বা উপেক্ষা করিয়া ত নয়ই, বরং সেইগুলি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া, সময়োপযোগী পরিবর্ধন করিয়া রাষ্ট্র-চালকগণ মানব-সমাজকে কল্যাণের পথে আগাইয়া লইয়া চলুন। শ্রীকৃষ্ণ, মুশা, বুদ্ধ ও খৃষ্টের সুনীতিপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষা বর্জন করিয়া নহে, উপেক্ষা করিয়া নহে, পরন্তু সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া এবং নবযুগের উপযোগী নূতনতর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া—সর্বমতসহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও সংযম অবলম্বন করিয়া মানবজাতি এক উদার অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হউক।

মহিমান্বিতা শ্রীশ্রীদীপান্বিতা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভারতবর্ষের জাতীয় উৎসবরূপে এই 'মহিমান্বিতা দীপান্বিতা' স্মরণাতীত কাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে; উৎসবে বহিরঙ্গ লৌকিক আমোদপ্রমোদের প্রাধান্য থাকলেও কোন দেবতার অধিষ্ঠান ব্যতীত তা যেমন সফল হতে পারে না, এই দীপাবলী উৎসবেও সেই ভারতীয় রীতির কোনরূপ বৈপরীত্য ঘটেনি। তথাপি বলা যেতে পারে, অন্যান্য উৎসব অপেক্ষা দীপাবলীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। কারণ এ উৎসবটি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দেবতার অধিষ্ঠাতৃত্বে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এমন কি আপাত-প্রতীয়মান বিরুদ্ধ ভাবের দেবতা একই উৎসবের আরাধ্য হয়েছেন স্থানপাত্রাদি ভেদে। যেমন কোথাও জগজ্জননী দুর্গার অন্যতম রূপ কালিকা হয়েছেন এ উৎসবের দেবতা, আবার কোথাও লক্ষ্মীনারায়ণ। তথাপি এ উৎসবে দীপোৎসর্গের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে ব'লে সর্বত্রই 'দীপান্বিতা' আখ্যার সার্থকতা অব্যাহত আছে।

যদিও সমগ্র ভারতের একই হিন্দুজাতির মধ্যে স্থান ও পাত্রাদি ভেদে অনুষ্ঠেয় একই পর্বে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এ বিভিন্নতা বিস্ময়াবহ, তথাপি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা ক'রে দেখলে এসব আচরণের মূল খুঁজে পাওয়া কঠিন মনে হয় না। প্রধানতঃ বলা যেতে পারে, সর্বজন-স্বীকৃত নির্দিষ্ট কোন তথ্য বিভিন্ন পুরাণ ও ইতিহাসের মতভেদ রহিত হয়ে উপস্থাপিত হয়নি; যেমন শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল তথ্যটি আমরা কালিকাপুরাণ, মহাভাগবত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি থেকে একই-রূপে পেয়ে থাকি যে শ্রীরামচন্দ্রের জন্যই ব্রহ্মার এ পূজানুষ্ঠান। এমনকি, তিথিগুলির বিশেষত্বের সংবাদ ও প্রমাণরূপে পাওয়া যায় যে, মহাষ্টমী দেবীর আবির্ভাবের ও মহানবমী অসুরনিধনের দু'টি দিন, দশমী বিজয়োৎসবের তিথি। দীপান্বিতার ইতিহাসে এরূপ কোন অবতারের লীলাকাহিনীকে উপজীব্যরূপে উপস্থাপিত করা কঠিন; কারণ বিভিন্ন পুরাণের বিভিন্ন সংবাদ এ উৎসবের বিভিন্ন দেবতার অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রেরণা দান করেছে।

আরো একটি কথা—ভারতীয় সভ্যতায় বেদেরই প্রভাব। বেদবাহ্য কোন তত্ত্ব এখানে স্বীকৃত হতে পারে না। পুরাণাদিকে বেদমূল শাস্ত্র ব'লে অঙ্গীকার ক'রে অন্যান্য স্মৃতিপুরাণাদিকেও সম্মান দেওয়া হয়, তাদের অনুশাসন উপদেশাদি অনুসরণ ক'রে লোকযাত্রাপথে ভারতীয়দের পদক্ষেপ। তাই দেখা যায় এই ভারতের মাটিতে বেদ-পুরাণ, স্মৃতি-তন্ত্র—সকলের অনুশাসনই সংমিশ্রিত হয়ে যেন কর্তব্য নির্ধারিত হয়। সর্বত্র না হলেও এই এই সংমিশ্রণ অধিকতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে আমরা তার বিশেষ প্রমাণ পাই। এরূপ সমধিক সংমিশ্রণ অন্য কোনও মাঙ্গলিক তিথিকৃত্যে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

প্রসিদ্ধি আছে, "গৌড়ে তন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ"; কথাটায় অত্যুক্তি কিছুই নেই। তন্ত্রের শক্তিই বঙ্গদেশের প্রাণ—'কালিকা বঙ্গদেশে চ' আদ্যা-স্তোত্রের এ বাণীও তারই সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু গৌড় একটি বিচিত্র দেশ—সমগ্র ভারতের যেন প্রতিচ্ছবি বা 'মডেল'। সমগ্র ভারতের বিচিত্রতা একা গৌড় প্রকাশ করেছে। এখানে তন্ত্রের শক্তি, ভাগবতের কৃষ্ণ—মূলতঃ সব এক হয়ে গেছে। তাই দেখা যায়—এই গৌড়ে দীপাবলী উৎসবেও বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—এ তিনেরই সমন্বয় ঘটেছে। ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত এবং দেবীসূক্তের সঙ্গে জননীর পূজার্চনা কখনো সম্পর্কহীন ব'লে আমরা ভাবতে পারি না। জননীর আবির্ভাবে কৃষ্ণ এবং গৌর দুটি বর্ণেরই

ইতিহাস রয়েছে। যেমন শারদীয় দুর্গোৎসবে "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীম্"—এই গৌরোজ্জ্বলা জননীকে আমরা আহ্বান করি, তেমনি দীপাবলীর উৎসবে মায়ের আদিরূপে কৃষ্ণবর্ণোজ্জ্বলাকেও আমরা পূজা নিবেদন করে থাকি।

দীপান্বিতা কার্তিকী অমাবস্যা। এই কার্তিক মাসটি গৃহীত হ'ল কেন? তা'তে আমরা পুরাণকে মান্য করেছি। ব্রহ্মপুরাণ বলেছেন:

"ন কার্তিক-সমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগম্।
ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্॥

কার্তিক মাস শ্রেষ্ঠ হ'লেও উপাস্যদেবতা যে কালিকা, পুরাণ কি তা বলেছেন?—এর উত্তরে দেখা যায়, তন্ত্র আশ্রয় করা হয়েছে। কালীকুল-সদ্ভাব-তন্ত্রে বলা হয়েছে:

"দীপোৎসর্গশ্চতুর্দশ্যা সংমিশ্রা যা কুহূঃ স্থিতা।
তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে কালরাত্রিকা।
তস্যাং পূজা প্রকর্তব্যা কালী তারা প্রিয়ঙ্করী॥"

স্মৃতিসার-সংগ্রহ এবং ব্যোমকেশ-তন্ত্রেও কালীর অর্চনাই বিহিত হয়েছে। আবার ব্রহ্মপুরাণের দীপমালা-প্রদানের আদেশটিও গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণ বলেছেন:

"দীপমালাশ্চ কর্তব্যা শক্ত্যা দেবগৃহেষু চ।
রথ্যাপণাশ্মশানেষু নদীপর্বতসানুষু॥"

বাংলাদেশ দীপমালা প্রদান ক'রে দীপান্বিতা নামের সার্থকতা দ্বারা বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি প্রমাণ-বলে কালিকা-পূজার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—এ কথা বলা যায়। আসাম-প্রদেশেও কামাখ্যা-মায়ের প্রসাদে শক্তি-প্রাধান্য দ্বারা কালিকাপূজাই প্রচলিত হয়েছে। পশ্চিম ভারতের গুজরাট, বোম্বাই, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশেও শক্তিপূজারই প্রচলন রয়েছে। সেখানে কালভৈরবী ও কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মিথিলায় কিয়দংশে কালীপূজা এবং অপরাংশে লক্ষ্মীপূজা। উত্তর ও মধ্যভারতে লক্ষ্মী ও গণেশপূজা বিহিত। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মহীশূর, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও সঙ্গে হোলিকা ঐ দীপান্বিতা দিনে বিহিত। দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ অঞ্চলে ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও বলিরাজের পূজা প্রচলিত।

বাংলা দেশের ন্যায় অন্যান্য দেশের আচরণেও তন্ত্রের ন্যায় বেদমূল পুরাণাদির প্রভাবই এই বিভিন্নতার হেতু মনে হয়। ব্রহ্মপুরাণ সংবাদ দিচ্ছেন—

"অমাবস্যাং যদা দেবাঃ কার্তিকে মাসি কেশবাৎ।
অভয়ং প্রাপ্য সুপ্তাশ্চ ক্ষীরোদার্ণব সানুষু।
লক্ষ্মীর্দৈত্যভয় মুক্তা সুখং সুপ্তাহম্বুজোদরে॥
প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং পূজয়িত্বা যথাক্রমম্।
দীপবৃক্ষাস্তথা কার্য্যা ভক্ত্যা দেবগৃহেষ্বপি॥"

এ থেকে নিঃসংশয়ে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পূজা ঐ অমাবস্যাতে বিহিত রয়েছে বলা যেতে পারে। দেবতারা অভয় পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রিত হয়েছিলেন—অসুরের ভয়ে অনিদ্রায় জাগরণে যে মহাকষ্ট অনুভব ক'রে চলেছিলেন ঐ দিনে তা থেকে অব্যাহতি মিলেছিল। তাই ঐ দিনটি স্মরণীয় ও পূজানুষ্ঠানের দিন এবং দুঃখনিশার অবসানের প্রতীকরূপে দীপবৃক্ষও প্রজ্বলিত হয়।

এই সমুদয় বেদ, তন্ত্র, পুরাণাদির প্রমাণসংকলিত শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত ও প্রচলিত পূজা ও আচরণের মূলে তদ্দেশীয় নানাবিধ কিংবদন্তীও প্রভাব বিস্তার করেছে; যেমন এতে বলিরাজা অসুরের পূজা। এ যেন শারদীয়া পূজায় মহিষাসুরের পূজার ন্যায়। এর মূলে সেখানকার কিংবদন্তী অনুসারে বলিরাজার অবদান স্বীকৃত হয়েছে বলা যায়।

প্রচলিত কাহিনী হ'ল, ভগবান বিষ্ণু যখন বামনরূপ ধারণ ক'রে বলিকে ছলনা ক'রে তিন পায়ে ত্রিভুবন অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন, তখন বলিরাজ ভগবানকে বলেছিলেন, পাতালে বাস তাঁর অনিবার্য, কিন্তু তিন দিন আরো যেন তিনি পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারেন। ভগবান তাঁকে যে সময় দিয়েছিলেন—তা ঐ তিনটি দিন চতুর্দশী

থেকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তাই দীপান্বিতার তিনদিন-ব্যাপী উৎসবে শ্রীকৃষ্ণ ও বলিরাজের পূজা। দীপদানের নির্দেশও—ভগবানের যা আদেশ ছিল বলিরাজের প্রতি—এ তারই অনুসরণ।

দীপদানের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, দীপদান-বিধিটি কার্তিক মাসে প্রশস্ততম—একথা বহু শাস্ত্রে ব্যক্ত হয়েছে। কার্তিক মাসের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমরা ব্রহ্মপুরাণের উক্তি উল্লেখ করেছি। এজন্য ভারতের সর্বত্র এই কার্তিক মাসেই আকাশপ্রদীপ জ্বালানোর রীতি প্রতিপালিত হয়। ধর্মনিষ্ঠ ভক্তিপ্রাণ ভারতবাসী এই আকাশদীপ প্রজ্বালন অতিশয় পবিত্র কর্ম বলেই মনে করেন। এটি যেন হোমকর্ম। হোমের আহুতিই দীপদান। এই হোমকর্মে পূর্ণাহুতির দিন এই অমাবস্যা তিথি। অনাত্মজ্ঞ মানবের কর্মেতেই অধিকার। এই কর্মযজ্ঞের পরিসমাপ্তির নির্দিষ্ট দিনটি তাই এত পবিত্র ও প্রতিপালনীয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এ কর্মের আবশ্যকতাও ফলপ্রশংসার অবসরে সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করেছেন :

"তুলাং তিলতৈলেন সায়ংসন্ধ্যা সমাগমে।
আকাশদীপং যো দদ্যান্মাসমেকং নিরন্তরম্॥
লক্ষ্ম্যা সহ শ্রীপতয়ে স শ্রীমান্ ভুবি জায়তে॥"

এই ফল বর্ণনা করে মন্ত্রটিও প্রকাশ ক'রে বলেছেন :

"দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

আরো বলেছেন :

"বিষ্ণুবেশ্মনি যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে মাসি দীপকম্।
অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি নারদ॥"

শাস্ত্রপ্রমাণ এ বিষয়ে অনেক। অসংখ্য শাস্ত্র এ কথা বলেছেন—কার্তিকমাসে দীপদানের মত পুণ্য আর নেই। অমাবস্যায় শতসহস্র আলো জ্বালিয়ে এর পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়। ভগবান্ বিষ্ণু ও তাঁর প্রিয়া লক্ষ্মী হচ্ছেন এর ফলদাতা; এবং এই কারণে গণেশের পূজাটিও অনিবার্যরূপে এসে পড়েছে। পূজাতে গণেশের পূজা সর্বাগ্রে।

কর্মের দিক থেকে যজ্ঞরূপতা এতে আরোপিত ক'রে দীপদানের সার্থকতার কথা আমরা বলেছি। জ্ঞানের দিক্ থেকেও এর মূল্য অপরিমেয়। বেদোপনিষদের শিক্ষায় আমরা পাই উপাসনায় ভাবনা বা দৃষ্টিবিচারই উত্তরণের কৌশল। যেমন শিলাতে বিষ্ণুত্ব-বুদ্ধি। যে মাত্র শিলা—তার কি প্রাণসত্তা আছে? তা তো সকলেরই পরিজ্ঞাত; তথাপি তার মহিমা সকলেরই বিদিত বিষয়। তেমনি ভগবান্ সর্বত্র বিরাজমান থাকলেও হৃদয়-দেশে অনুধ্যানের ফল সর্বাতীত। তেমনি এই দীপটি অন্ধকার-বিনাশী। এটিকে লৌকিক দীপমাত্র ভাবনা না ক'রে জ্ঞানদীপের প্রতীকরূপে ভাবনাই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, জ্ঞানদীপ এরই মত সমুদয় মোহান্ধকার দূর ক'রে দেবে। এমনি ক'রে চতুর্দিকে যখন সহস্র শিখায় জ্ঞানদীপ জ্বলে উঠবে তখন সাধকের মনের সমুদয় অজ্ঞানান্ধকার নির্মূল হয়ে যাবে, জ্ঞানপ্রতিষ্ঠা তখনই সিদ্ধ হবে। তাই সকল দীপজ্যোতি অপেক্ষা এ জ্ঞান-জ্যোতি শ্রেষ্ঠ। এই দীপদানের মন্ত্রটি ব্রহ্মপুরাণ ব্যক্ত করেছেন :

"অগ্নির্জ্যোতীরবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ।
উত্তমঃ সর্বজ্যোতিষাং দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥"

অর্থাৎ অগ্নিও জ্যোতিঃ, রবিও জ্যোতিঃ, চন্দ্রও জ্যোতিঃ, এরা সবই জ্যোতি নিশ্চয়, কিন্তু সর্বজ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি হচ্ছে আমার প্রদত্ত এই 'দীপ'—তা তুমি গ্রহণ কর।

'দীপান্বিতা' নামের প্রাধান্য অনুসারে দীপদানের মাহাত্ম্য কীর্তিত হলেও তদুপলক্ষে পূজার্চনাটিও কখনো গৌণ নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে উৎসবের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে প্রতি দেশের ভক্তদের প্রিয় দেবতাকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। এতে স্ব স্ব প্রিয় আরাধ্যকে উপচার নিবেদনের যে পরিচয় দেখতে পাই, তাতে সাধকের

মনোগত ভাবের বিভিন্নতার প্রমাণ মিলে। কারণ দেবতারা বিভিন্ন হলেও মূল কর্ম দীপযজ্ঞের কোন বিচ্যুতি নেই। আরাধ্যদেবতার যে কোন নির্দিষ্ট রূপ বা প্রকৃতি নেই, একথা ভারতীয় সভ্যতার মূল শিক্ষা, কিন্তু সাধকের চিত্তগত ভাব-শক্তি-সামর্থ্যানুসারে সাধনার বস্তু নির্ধারণ ক'রে নিতে হয়। এজন্য যে মূর্তি যে ভাব তার চিত্তে স্বকীয় স্বভাবানুসারে প্রসন্নতা, আনন্দ উৎপাদন করে—সেই তার ইষ্টমূর্তি আরাধ্য দেবতা, সে যা-ই হোক্ তা ভগবানের রূপ। একই পরমেশ্বরের বিভিন্নরূপ। তাই ভারতবাসী জানে কালীপূজা বা কৃষ্ণপূজা—যা-ই বিহিত হোক্ তা তার প্রিয়েরই পূজা। কালী আর কালাচাঁদের পার্থক্য এদেশে নেই। তার কারণ ভারতবর্ষ উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই এই ভেদবাহুল্যে তাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই। সৃষ্ট্যাদি কার্যনির্বাহের জন্যই ভগবানের মূর্তিধারণ নানা-ভাবে। প্রথমে তাই তিনি প্রকৃতি আর পুরুষ। "যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ" সুতরাং একই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ, "অথ ভক্তানুরোধাদ্ বা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা" অর্থাৎ ভক্তের প্রয়োজনে এই যেখানে তত্ত্ব, সেখানে মহামায়া আর মহা-মায়াবীতে পার্থক্য কোথায়, সুতরাং এ তত্ত্বে অজ্ঞান দৃষ্টিতেই হয়েছে একেরই বহুরূপতা স্ত্রী-পুরুষভেদে। বস্তুতঃ স্ত্রীপুংভেদ বলে কিছু নেই; মানুষের জন্য তাঁকে ভক্তদের মনোভাব অনুসরণ ক'রে হতে হয়েছে, কোথায়ও স্ত্রী—কোথায়ও পুরুষ। তাই শাস্ত্র বলেছেন:

"অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে।"

এ থেকে দীপান্বিতায় আমরা আরো একটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই, তা হ'ল পূর্বোক্ত কর্মযজ্ঞ আর উপাসনা। দীপদানে মহাযজ্ঞের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে পূজার্চনারূপ উপাসনা মিশ্রিত হয়ে এ উৎসবটিকে কর্ম ও উপাসনার একটি মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এর মূল্য অপরিমেয়। কারণ শাস্ত্র বলেছেন দেহাভিমান থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানবিদ্ না হওয়া পর্যন্ত কর্ম অবশ্য করণীয়। কিন্তু কর্ম যদি উপাসনা-বর্জিত হয়—বন্ধনের হেতু হতে পারে। উপাসনাসহ অনুষ্ঠিত সূর্যদ্বারে সত্যলোকে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। তা হ'ল অমৃতের দ্বার, কারণ—আর দুঃখকর জন্মের আবর্তে পতিত হতে হবে না। বিশেষতঃ অনাত্মজ্ঞ মানবের এ হ'ল শ্রেষ্ঠ ফল এবং শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। দীপান্বিতা মহাতিথি এ অমূল্য সুযোগ দান করেছেন মর্ত্যবাসীদের, তাই এই মহিমান্বিতা দীপান্বিতার অধিষ্ঠাতৃদেবতার চরণে প্রার্থনা—"অভয়ং নঃ করোতু—"।

প্রতীক্ষা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মন্দির দ্বারে তব দণ্ডায়মান,
খোলো দ্বার খোলো দ্বার
ডাকি মোরা বার বার
ভক্তেরে কর দেব দর্শন দান॥
কাঠের কঠোর দ্বারে মন্দির-পাষাণে
মাথা কুটে মরি মোরা অস্থির পরাণে;
আসিয়াছি বহুদূর
আঁখি বড় তৃষাতুর
খোলো দ্বার করি অই রূপ-সুধা পান।

উবে যায় মৃগমদ, নিভে যায় দেউটি
কোথা হায় পুরোহিত শুনিবে না কেউ কি!
চন্দন হ'লো ধূলি পুড়ে যায় ধূপগুলি
পুষ্প তুলসী ডালি ঝলসিয়া প্রাণ॥
ক্রমেই বাড়িছে ভিড় তাই ভাবনা,
দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু ভিতরে কি পাব না?
কেহ যদি নাই আসে দয়া তবে করো দাসে
নিজেই দুয়ার তুমি খোলো ভগবান।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী তেজসানন্দ

সঙ্ঘের আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্বপ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার অসাধুতার প্রতিবাদ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন বলিতেছে,—সাবধান! ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে।······প্রাচীনকালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও এই ত্যাগই আবার ভারতকে জয় করিবে। এই ত্যাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ।" ভারতের বেদান্ত শিক্ষা দেয় ব্রহ্ম হইতে কীটপরমাণু সর্বভূতে পরমপ্রেমস্বরূপ এক ঈশ্বর বিদ্যমান। বৈচিত্র্যবহুল বিশ্বচরাচর সেই পরমাত্মা-রূপী ঈশ্বরেরই বিবিধ প্রকাশ। জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তাহা দয়া, প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধিতে জীবের যে সেবা করা হয় তাহাই প্রেম। এই আত্মাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাই স্বামীজী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরবুদ্ধিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর।··· তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই।······উহা তোমার পূজাস্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্রব্যক্তিকে দেখিতেছি, আমার নিজ মুক্তির জন্য আমি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি-রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি।······তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্নরূপে সেবা করিতে পারি। কাহারও কল্যাণ করিতে পার এ ধারণা ছাড়িয়া দাও।······ তোমাদিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে এবং যে কেহ তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে পরের সেবা শুভ কর্ম। এই সৎকর্ম-বলে চিত্তশুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন।" এই ত্যাগ ও সেবাধর্মই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াও সকলে এই মহান সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী নিজেদের জীবনে এই সেবাদর্শ জীবন্ত করিয়া তুলিয়া যুগ-প্রয়োজনে বনের বেদান্ত ঘরে আনিয়াছেন। বৈষ্ণব- ও বেদান্ত-ধর্মের চরম পরিণতি এই সেবাধর্মে হিংসা-দ্বেষের অবকাশ নাই—উচ্চাবচ ভাবের প্রসারতা নাই; আছে শুধু সমদর্শনাত্মক অনাবিল প্রীতি-ধারার সাবলীল গতি ও ছন্দ। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ এই সমুন্নত ত্যাগ ও সেবাধর্মেরই মূর্ত প্রতীক। বিভিন্ন ধর্মের ন্যায় যোগ-ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম এই চতুর্বিধ সাধনপদ্ধতিও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অতি সুন্দরভাবে সমন্বিত হইয়াছে। স্বামীজী তৎপরিকল্পিত সিল-মোহরে (monogram-এ) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই আদর্শকে অঙ্কিত করিয়া তাহার

ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তির পরিচায়ক। আর চিত্র-মধ্যস্থ হংস-প্রতিকৃতিটির অর্থ—পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটি, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মা লাভ হয়—ইহাই চিত্রের অর্থ।" প্রাচ্য ও প্রতীচ্য স্থাপত্যশিল্পের সমবায়ে নির্মিত বেলুড়-মঠস্থ সুবৃহৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির পুরোভাগে সঙ্ঘের আদর্শের এই অর্থপূর্ণ প্রতীকটি বহন করিয়া রামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্ম ও সর্বযোগের সমন্বয়ের প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সর্বধর্মের তথা সর্বতীর্থের সমাবেশে বেলুড়মঠ পরম পবিত্র সর্বজনীন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এমন কোন শাস্ত্র-সম্মত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাই যাহা এখানে সমাদৃত না হয়; বিশ্বের এমন কোন অবতারকল্প মহাপুরুষ বা ধর্মাচার্য নাই যাঁহারা এখানে পূজা ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত না হন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের এই উদার আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া দেশদেশান্তর হইতে আগত অগণিত নরনারী দিনের পর দিন ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যুগে যুগে যেখানেই কোন সন্ন্যাসিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানেই জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বালিত হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার-সমূহ এক সময়ে জ্ঞান-চর্চার অদ্বিতীয় আবাসভূমি ছিল। ইওরোপখণ্ডের অন্ধকার-যুগে ক্যাথলিক সন্ন্যাসিগণই গ্রীক সাহিত্য ও প্রাচীন প্রতীচ্য সভ্যতা রক্ষা করিয়া জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্তমান যুগেও রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তিস্বরূপ বেদবেদান্তাদি সংস্কৃতশাস্ত্রাবলম্বনে ভারতের মর্মবাণী কালোপযোগী করিয়া দেশদেশান্তরে বহন করিতেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাধীন ভারতের এই নবজাগরণের দিনে স্বকীয় সংস্কৃতির মূল উৎসের সঙ্গে ভারতবাসীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিলে, সাম-গান-মুখরিত প্রাচীন ভারতের সর্বজনীন আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রতি কুটীরে আবার নূতন করিয়া ঝঙ্কার তুলিবে, নূতনকে পুরাতনের পুণ্যস্পর্শে সার্থক করিয়া ভারতকে অধিকতর গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

নব্যভারত-গঠনে বিবেকানন্দ

মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ চিন্তাধারা সুপ্তিমগ্ন ভারতবাসীর শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া নবীন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। তাহার ফলে দেখিতে পাই ভারতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নবজাগরণের সাড়া এবং ভারত-ভাগ্যগঠনে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। তাঁহারই প্রেরণায় ভারতের পরাধীনতার যুগে সহস্র নিঃস্বার্থ যুবক স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিপুল উৎসাহে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। শুধু ইহাই নহে, তাঁহারই সৃজনীপ্রতিভা-প্রভাবে লুপ্তপ্রায় ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ললিতকলা, সঙ্গীত প্রভৃতিও পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। বিদ্যুদাধারে সঞ্চিত তড়িৎশক্তি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া যেমন সহসা চারিদিক আলোকিত করে, বিবেকানন্দের কর্মময় জীবন ও শক্তিময়ী বাণী যুগসঞ্চিত তামসিকতা বিদূরিত করিয়া তেমনই জাতির সুপ্তচেতনা জাগ্রত করিয়া তুলিল। সমাজনীতিক, রাষ্ট্রনীতিক, আর্থনীতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে আজ তাঁহারই বিপ্লবী চিন্তার চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ভারতের এই বহুমুখী জাগরণের মূলে বিবেকানন্দের অমূল্য অবদানকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অপরাপর পুরোহিতগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর অন্তর্ধানের পর শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন, "ভারতের বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—

নরকেশরী বিবেকানন্দ। আবার দেখিতেছি তাঁহার প্রভাব ভারতাত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। আমরা বলিব বিবেকানন্দ এখনও বাঁচিয়া আছেন তাঁহার দেশবাসীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের আত্মায়।" বাঙ্গালী বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার 'Indian Pilgrim' (ভারত-পথিক) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রতিকৃতি ও উপদেশ উভয়ের পরিপূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে সমস্যাসমূহ আমার মনকে অনিশ্চিতভাবে আলোড়ন করিতেছিল এবং যেগুলি সম্বন্ধে পরে আমি অবহিত হই, উহাদের সন্তোষজনক সমাধান তাঁহার মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম।" বর্তমান ভারতের জনপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুও বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া কিছুদিন পূর্বে বলিয়াছেন, "সাধারণ অর্থে রাজনীতিজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) তাহা ছিলেন না বটে, তথাপি আমি মনে করি তিনি ভারতের বর্তমান জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মহান প্রবর্তক ছিলেন। পরবর্তীকালে যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই আন্দোলনে কমবেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আধুনিক ভারতকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছেন।"

আজ আর্থনীতিক সাম্যকে ভিত্তি করিয়া যে সমাজতন্ত্রবাদ ভারতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং যে আদর্শে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনে দেশনায়কগণ তৎপর হইয়াছেন, তাহারও উজ্জ্বল চিত্র স্বামীজীর মানসপটে বহুপূর্বেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তবে স্বামীজী নিজেকে 'সমাজতন্ত্রবাদী' বলিয়া ঘোষণা করিলেও তাঁহার পরিকল্পনা বর্তমান জড়বাদীর নিরীশ্বর সাম্যবাদ হইতে মূলতঃ পৃথক। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন,—একমাত্র বেদান্তই সমাজতন্ত্রবাদের যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি হইবার উপযুক্ত। তিনি বলিয়াছেন, "মানবসমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ, অন্ততঃ তাঁহাদের পরিচালকগণ, বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তাঁহাদের ধনসাম্যাত্মক ও সমানাধিকারমূলক মতবাদসমূহের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকা সঙ্গত এবং একমাত্র বেদান্তই এই ভিত্তি হইবার যোগ্য।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, "কি সামাজিক, কি রাজনীতিক, কি আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই—যথার্থ মঙ্গল স্থাপনের একটি মাত্র সূত্র বিদ্যমান—যে সূত্র হইতেছে এইটুকু জানা যে, 'আমি ও আমার ভাই এক'। সর্বদেশে সর্বকালে সর্বজাতির পক্ষে এই মহাসত্য সমভাবে প্রযোজ্য।" তিনি বেদান্তের আত্মিক একত্বমূলক সাম্যকে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে 'রহস্য' রাখিলে চলিবে না। এখন আর উহা হিমালয়ের গুহায় বন-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট থাকিবে না; লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু-সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটীরে, সর্বত্র—এমনকি রাস্তার ভিখারী দ্বারাও উহা কার্যে পরিণত হইতে পারে।"

তিনি এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্রগঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন যাহাতে ব্রাহ্মণ-যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্য-আদর্শ সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে অথচ ইহাদের দোষরাশি থাকিবে না। তিনি বলিতেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যুগের প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়াছে; এবার শূদ্রযুগের আবির্ভাব হইবে; উহা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তাই তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে সম্বোধন করিয়া মর্মস্পর্শী ভাষায় বলিয়াছেন, "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙ্গল ধরে

চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে।" আজ ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনে ইহারই প্রতিফলন দেখিতে পাই না কি? তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক মহামহিমান্বিত ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।" অর্থাৎ বৈদান্তিক যেরূপ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল নরনারীকে একই ব্রহ্ম বা আত্ম-স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, ইসলামধর্মিগণ সমাজের দিক দিয়া তাহাদের ধর্মাবলম্বিগণকে সেইরূপ ভ্রাতৃ-ভাবে দেখিয়া থাকেন এবং তাহাদের সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করেন। বলাবাহুল্য, বেদান্তের এই আত্মিক ঐক্য ও অভেদত্বমূলক সাম্য-মৈত্রী ও সমদর্শন এবং ইসলামের সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সমদর্শিতা মিলিত হইয়া এক পূর্ণাঙ্গ ভারত গড়িয়া তুলিবে। সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম-ধর্ম সাধনার পূর্ণ সার্থকতাও ইহারই মধ্যে সুস্পষ্ট সূচিত হইতেছে। ভারতে যে ধর্মনিরপেক্ষ ঐহিক (secular) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে যেখানে সকল ধর্মই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া অবস্থান করিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্ম-সমন্বয়েরই রাষ্ট্রিক রূপায়ণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সমাজের প্রকৃত সংস্কার ও উন্নতির পন্থা নির্দেশ করিয়া বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহা সকল সমাজসংস্কারকগণেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। ভারত ধর্মমুখী বা অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্য বহির্মুখী। পাশ্চাত্যদেশ ধর্মের এতটুকু উন্নতি করিতে হইলে সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়; আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তিলাভ করিতে হইলে তাহা ধর্মের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়। ....আধুনিক সংস্কারকগণ প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করিয়া সংস্কারের কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা উহার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন—আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্মের প্রসূতিকে' বুঝিবার জন্য যে সাধনা প্রয়োজন সেই সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই। আমি বলি, হিন্দু সমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই এবং হিন্দুর ধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি ও আচারপদ্ধতি প্রভৃতি সমর্থন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া যে সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে; কিন্তু ধর্মকে সামাজিক ব্যাপারে যে ভাবে লাগানো উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা।......ঋষিচরিত্র, সত্যকার জীবন, যাহা শক্তির কেন্দ্র এবং দেবমানবত্বের মিলনভূমি—তাহাই পথ দেখাইবে। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন উপাদানসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হইবে এবং পরে প্রচণ্ড তরঙ্গের মত সমাজের উপর পতিত হইয়া সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে,—সমস্ত অপবিত্রতা দূর হইবে।......এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।......সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে; ইহাই আমার মত।" বলা বাহুল্য বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ স্বামীজীর এই উদার আদর্শ ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী

করিয়া তুলিবার জন্ম নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁহারই পতাকা দৃঢ়হস্তে বহন করিয়া চলিয়াছে।

সঙ্ঘের প্রসার

ভারতীয় নর-নারীর মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন শিক্ষার প্রবর্তন এবং প্রাচীন যুগের নালন্দা, তক্ষশিলা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার আদর্শে বর্তমানকালোপযোগী করিয়া একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলাও স্বামীজী এই সঙ্ঘের ব্যাপক কর্মসূচীর অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আনুকূল্যে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যে দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন স্তরের আধুনিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, শিল্পমন্দির, সংস্কৃত শিক্ষায়তন, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, সংস্কৃতি-ভবন, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশন, সাহায্যকেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয় সেবাভবন প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণের তত্ত্বাবধানে উহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

এস্থলে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত নারীশিক্ষার আদর্শকে ভারতে প্রথম রূপায়িত করিয়া তুলিলেন এক বিদেশী মহিলা,—স্বামীজীর মানসদুহিতা 'ভগিনী নিবেদিতা' (Miss Margaret Noble)। তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং ইংলণ্ডের পৌর পরিবেশে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও স্বামী বিবেকানন্দের পূতসংস্পর্শ ও শিক্ষাপ্রভাবে ভারতমাতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বামীজী-প্রদত্ত 'নিবেদিতা' নাম সার্থক করিয়া গিয়াছেন। বিপুল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি উত্তর কলিকাতার বাগবাজারে এক জনাকীর্ণ পল্লীতে ১৯০২ সালে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যাহা কালে 'রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়' নামে সুপরিচিত হইয়াছে। ক্রমে ভগিনী ক্রিষ্টীন (স্বামীজীর জনৈকা মার্কিন শিষ্যা—(Miss Greenstidel) এবং শ্রীমতী সুধীরা দেবীও এই বিদ্যায়তনের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে নিবেদিতাকে নানা প্রকারে সাহায্য করেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ে 'সারদা-মন্দির' স্থাপনা করিয়া ব্রতধারিণী নারীগণেরও থাকিবার ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। ইহার পর হইতে ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন স্থানেও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আনুকূল্যে ও আদর্শে নারীশিক্ষামূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে নারীজাতির ভবিষ্যৎ জাগরণকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন, "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হইবে না……মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাইতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মিবে।" তিনি আবার বলিয়াছেন, "স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু-গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাবে সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার, সেই জন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ।" স্বামীজীর শেষোক্ত পরিকল্পনাটি ১৯৫৪ সালে সঙ্ঘজননী শ্রীসারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের আনুকূল্যে উক্ত সালের ২রা ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের অনতিদূরে ভাগীরথী-তীরে "শ্রীসারদা মঠ" নামে একটি স্বতন্ত্র নারী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর যুগ্মজীবনের ত্যাগোজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক উচ্চশিক্ষিতা নারী ইতোমধ্যে উক্ত 'সারদা-মঠে' যোগদান করিয়াছেন। এই সকল ব্রতধারিণীগণের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে বর্তমানে পূর্বোল্লিখিত নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে

পরিচালিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহাদের ব্যাপক কর্মসূচী দেশবাসীকে আশান্বিত ও উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছে।

বর্তমানে ভারতে ও ভারতেতর দেশে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ১১৫টি কর্মকেন্দ্র বিদ্যমান। তন্মধ্যে ভারতে ৮৪টি এবং বিদেশে * ৩১টি। এই সকল মঠ ও মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে একদিকে যেমন মনুষ্য-সমাজের উন্নতিবিধায়ক বিবিধ কার্য সম্পাদিত হইতেছে অপর দিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সংযোগ-সেতু স্থাপন করিয়া সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ ভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শ প্রচার-পূর্বক মানবের চিন্তাজগতেও এক বিপুল পরিবর্তন আনিয়া বিশ্ব-শান্তির পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। আমেরিকার দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ অধ্যাপক Mr. Floyd H. Ross কয়েক বৎসর পূর্বে ভারত-ভ্রমণকালে অমৃতবাজার পত্রিকায় 'Vedanta and the West'-শীর্ষক এক সুচিন্তিত প্রবন্ধে ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছিলেন,

"One of the most vital contemporary religious and educational movements in India today is the Ramakrishna Movement. Under the leadership of men trained in the spirit of Ramakrishna and Vivekananda, the Ramakrishna Centres are living examples of how the timeless truths of the past have value when they are continuously re-lived and re-interpreted in the present.........These Ramakrishna Centres in the West are playing their own part quietly in helping to prepare the way for the united pilgrimage of mankind towards self-understanding and peace."

অর্থাৎ বর্তমান ভারতে শিক্ষা ও ধর্মসম্বন্ধীয় যে সকল সঙ্ঘের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘই সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত সন্ন্যাসিগণের নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রসমূহ প্রমাণ করিতেছে যাহা চিরন্তন সত্য তাহা তখনই কার্যকরী ও কল্যাণপ্রসূ হয় যখন উহা মনুষ্যজীবনে সদানিয়ত উদ্‌যাপিত হইয়া মানব-সমাজে যুগোপযোগী করিয়া পরিবেশিত হয়। প্রতীচ্যখণ্ডে অবস্থিত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কেন্দ্রসমূহ মানব-জাতির মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপনের পথ সুগম করিয়া এক মহান দায়িত্ব সম্পাদন করিতেছে।

বেদান্ত ও বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ভূমিকা

আজ প্রতীচ্য বিজ্ঞান এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যাহা মানবের অশেষ কল্যাণাস্পদ তাহাই আজ বিশ্ব-ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ব-শান্তির অজুহাতে কতিপয় হিংসোন্মত্ত শক্তি-শালী জাতি আণবিক-অস্ত্রহস্তে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। প্রশ্ন জাগিয়াছে—ইহাই কি প্রকৃত শান্তির পন্থা? বৈদিক যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সর্ব-দেশের ও সর্বযুগের ত্রিকালদর্শী মহামানবগণ মুক্তকণ্ঠে বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন, হিংসার দ্বারা কখনও হিংসার নিবৃত্তি হয় না। প্রেমাবতার ভগবান বুদ্ধ জগৎকে সনাতন শান্তির বাণী শুনাইয়া বলিয়াছেন, "ন বেরেণ বেরাণি সমন্তীধ কুদাচন। অবেরেণ হি সমন্তীধ এষ ধর্ম্ম সনন্তন।"—বৈরীভাব দ্বারা বৈরী-ভাব বিদূরিত হয় না। অবৈরীভাব দ্বারাই উহা (মৈত্রী) সাধিত হয়—ইহাই সনাতন ধর্ম। গুরুকুলতিলক ভগবান যীশুর প্রধান শিষ্য পিটার প্রভুর (যীশুর) রক্ষার্থে অসি উত্তোলন করিলে তিনি তাহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, "প্রতি-হিংসার উদ্দেশ্যে যে অসি উত্তোলন করে তাহাকে সেই অসির আঘাতেই প্রাণ হারাইতে হয়।" বিখ্যাত ঐতিহাসিক A. J. Toynbee ইহারই

* পাকিস্তানে—১১, রেঙ্গুনে—২, সিঙ্গাপুর, সিংহল, মরিসস, ফিজি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে এক একটি, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—১১ ও দক্ষিণ আমেরিকায়—১।

প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'Study of History'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"The sword which has once drunk blood cannot be permanently restrained from drinking blood again any more than a tiger which has once tasted human flesh can be prevented from becoming a man-eater doomed to death. ......Even if the tiger could foresee his doom, he would probably be unable to subdue his devouring appetite ; so, it is with a society which has once sought salvation through the the sword."

যে অসি একবার কোষমুক্ত হইয়া শোণিতের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে আর কোষবদ্ধ করা সম্ভব নহে ; যেমন, যে ব্যাঘ্র মনুষ্যরক্তের আস্বাদ পাইয়াছে সে শুধু মনুষ্যই ভক্ষণ করিবে ; (শিকারীর হস্তে) তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াও সে তাহার দুর্জয় মনুষ্য-রক্তপিপাসা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। মানব-সমাজের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। হিংসা ও অস্ত্রের সাহায্যে মুক্তি ও শান্তির সন্ধান যাহারা করে, তাহাদের পরিণাম এই মনুষ্যরক্তলোলুপ হিংস্র ব্যাঘ্রেরই মত। ইহা সর্বজন-বিদিত যে, বিশ্বধ্বংসে যে হস্ত উদ্যত হয়, মানবের অন্তরের প্রসুপ্ত দেবত্ব জাগ্রত হইলে সেই হস্তই আবার বিশ্বমঙ্গলে নিয়োজিত হয়। প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি চিরদিনই পাশবিক শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক শক্তিতে আস্থাবান শান্তিপ্রিয় কতিপয় দেশের রাষ্ট্রনায়কের কণ্ঠেও প্রাচীন পঞ্চশীল, অহিংসা ও সাম্যমৈত্রীর বাণী আজ উদ্‌গীত হইতেছে, যাহা ভীতিবিহ্বল মানবচিত্তে আশার সুবর্ণদীপ পুনঃপ্রজ্বালিত করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যদেশ ভ্রমণান্তে তাঁহার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া সকলকে বলিয়াছেন, "যাঁহারা চক্ষু খুলিয়া আছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য জগতের বিভিন্ন জাতির মনের গতি বুঝেন, যাঁহারা চিন্তাশীল এবং বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারা দেখিবেন ভারতীয় চিন্তার এই ধীর অবিরাম প্রবাহের দ্বারা জগতের এই ভাব, গতি, চাল-চলন এবং সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব আছে,......আমরা কখনও বন্দুক বা তরবারির সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই।...... লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত—অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ ঊষাকালীন ধীর শিশির-সম্পাতের ন্যায় এই শান্ত সহিষ্ণু 'সর্বংসহ' ধর্মপ্রাণ জাতি চিন্তাজগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে।"

আনন্দের বিষয়, সুদীর্ঘ সাধনার ফলে প্রতীচ্য জড়বিজ্ঞান স্থূল বহির্জগতের একত্ব সম্পাদন করিয়া ভারতীয় বেদান্তের সঙ্গে আজ হাত মিলাইতেছে। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত ও অবদান সম্বন্ধে স্বামীজীও বলিয়াছেন,—আধুনিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন—তুমি, আমি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এক অনন্ত জড়সমষ্টি-সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ। বেদান্ত আরও অগ্রসর হইয়া বহুশতাব্দী পূর্বে ঘোষণা করিয়াছে এই জড়সমষ্টির পশ্চাতে বিশ্বব্যাপী এক অদ্বিতীয় চেতনসত্তা বিদ্যমান যাহাকে আমরা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। বস্তুতঃ জড় চেতনেরই নামান্তর মাত্র। নাম-রূপ সংযুক্ত হইয়া একই জল যেমন ফেন-বুদ্‌বুদ-তরঙ্গাকারে প্রতিভাত হয়, তেমনি সেই এক অনাদি চিন্ময় সত্তা (সচ্চিদানন্দ) নামরূপের মাধ্যমে বৈচিত্র্যবহুল বিশ্বজগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরূপতঃ জড় ও চৈতন্যে কোন প্রভেদ নাই। বেদান্ত ও বিজ্ঞান বিভিন্ন দিক হইতে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আজ এমন এক মিলন-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছে যেখানে সমগ্র বিশ্ব এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্তারই বিবিধ বিকাশরূপে স্বীকৃত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিসহায়ে দেখিয়াছিলেন—প্রাচ্যের বেদান্ত ও প্রতীচ্যের বিজ্ঞানের সমবায়ে

অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি মহতী সংস্কৃতির উদ্ভব হইবে যাহা বিবিধ ধর্ম ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া একত্বের ভিত্তিতে অনন্ত বিস্তারের পথ উন্মুক্ত রাখিবে; যাহা পারস্পরিক হিংসা ও ধ্বংসাত্মক স্বার্থসংঘাত সৃষ্টি না করিয়া মানবজাতিকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। এই অভেদজ্ঞান বা একত্বানুভূতিই অনন্তপ্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও নৈতিকধর্মের মূল উৎস। শান্তিপ্রিয় মানব বেদান্তের এই উদার গম্ভীর অভয়বাণী শ্রবণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। বেদান্ত ও বিজ্ঞানের বিবাদ আজ তিরোহিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে শ্রীভগবানের কণ্ঠে একদিন যেমন সাম্যমৈত্রীর বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল, আজ এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বিশ্ববাসীকে বেদান্ত-বিজ্ঞান-সমন্বয়প্রসূত একত্বের তথা শান্তির বাণী সেইভাবে শুনাইতে হইবে। ভারতবাসীকে সেই সুমহান দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তস্বরে বলিয়াছেন, "অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্কারকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিকতার বন্যায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপর-দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে অমৃত-সলিলের প্রয়োজন, তাহা এখানেই বর্তমান। বন্ধুগণ! বিশ্বাস করুন, ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে। তিনি আবার বলিতেছেন, "জাগো ভারত, জাগো; তোমার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎকে জয় কর। তোমার নব জাগরণ ও জাতীয় জীবনের দায়িত্ব তখনই চরিতার্থতা লাভ করিবে, যখন তুমি তোমার যুগ-যুগ-সঞ্চিত আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা বিশ্বজয় করিতে পারিবে।"

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ অতি ক্ষুদ্রাকারে বাংলার বুকে একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর অফুরন্ত স্নেহ-পীযূষধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া যাহা বর্ধিত হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দের অক্লান্ত উদ্যম ও সাধনায় যাহা কালে একটি মহাশক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে, তাহাই আজ দেশদেশান্তরে বিপুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং সমগ্র মানবজাতির ঐহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ-সাধনোদ্দেশ্যে এবং ভারতের শাশ্বত শান্তির বাণী অনাড়ম্বরভাবে দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া চলিয়াছে।

কোথায়?

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

প্রচণ্ড সংশয়, অনন্ত সংঘাত,
অনিত্য সংসারে অনৃতের উদ্ভব;
অসহ্য বন্ধন, উল্কার উৎপাত,
বজ্রের গর্জন ভৈরব উৎসব।

রুদ্রের ধ্বংসের দাবাগ্নি-স্ফুলিঙ্গ
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে উদগ্র জীবন্ত,
স্বাজাত্য-গৌরবে বিলক্ষ্য তুরঙ্গ;
সুবর্ণ সায়াহ্ন মুমূর্ষু পড়ন্ত।

কোথায় হে স্রষ্টা অনাদি অনন্ত!
সন্ত্রস্ত সঙ্কটে করো প্রাণবন্ত?

প্রতিমাপূজার প্রয়োজন

শ্রীমতী স্নেহলতা দাশগুপ্তা

প্রতিমাপূজাকে কেহ কেহ পুতুলপূজা বলিয়াছেন। কথাটা যে নিছক মিথ্যা, তাহা নহে। পুতুলখেলার মধ্যে মনীষীরা জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ প্রভৃতির ছায়া দেখিতে পান, পুতুলখেলাকে তাঁহারা জীবনের প্রস্তুতি বলিয়াই বিবেচনা করেন। কাজেই ইহার পশ্চাতে কাজ করে যে আদর্শ তাহা অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্জাত নহে। যাহা সহজাত অথবা যাহা জীবনের প্রেরণাস্বরূপ সেই আদর্শ এবং যে আদর্শ প্রথমে থাকে মাত্র 'লাঞ্ছিত'*রূপে, তাহা জীবনের অভিজ্ঞতার সহিত ধীরে ধীরে রূপ লয়। কাজেই পুতুলখেলা উপেক্ষার বস্তু নহে। পুতুলখেলা সাংসারিক আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ লইয়া গঠিত। কিন্তু যাহা কিছু জীবনের মহান্ আদর্শ, যাহা কিছু অলৌকিক, যাহা কিছু হিতকর এবং দৈব—প্রতিমা তাহারই প্রতীক। তাই ইহার নাম প্রতিমা।

পুতুল যেমন জীবনের উৎস হইতে আসিয়াছে প্রতিমাও সেইরূপ। যতদূর বুঝা যায় প্রতিমার আকর্ষণ মনোবুদ্ধির আগোচর সংস্কার হইতে সঞ্জাত। সাধকের শুভমুহূর্তে ইহা সহসা আবির্ভূত হয়। তাই শাস্ত্র বলেন, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—সাধকের হিতের জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু এ কল্পনা কার? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ইহাতে মানুষের মনোবুদ্ধির হাত নাই। ৺শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে তর্কচুড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মই নিজের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই উত্তরে পরমহংসদেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

* চিত্রকর চিত্রাঙ্কনের পূর্বে পত্রে বা বস্ত্রে লাইন বা দাগ কাটেন। তাহা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বা অপর ব্যক্তি বুঝিতে না পারিলেও চিত্রকরের কাছে উহা ভাবী চিত্রের আভাষ, পরে তাহা তুলিকার ও বর্ণের সাহায্যে রূপ পরিগ্রহ করে।

তবে রূপকল্পনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা দেখিতে পাই সাধারণ মানুষ কেবল গুণমাত্রের কল্পনা করিতে পারে না। এই গুণকে বুঝিতে হইলে একটা আধার না হইলে তাহার বুদ্ধি প্রতিহত হয়। ব্যক্তিগত বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আদর্শ প্রভৃতি যাহা বিমূর্ত—তাহারও একটা রূপ আছে। কাজেই রুচিরও বৈচিত্র্য আছে। সেইজন্য একই গুণপদার্থ সম্বন্ধে সকলের এক ধারণা নাই, অথবা শুধু বীরত্বের আধার বা ঐরূপ যে কোনও গুণের আধার সম্বন্ধে বহুলোকের মত লইতে গেলে তারতম্য দেখা যায়। একই ব্যক্তিকে বা আদর্শকে সকলে একই চক্ষুতে দেখে না; সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সাধকের নিকট নির্দিষ্ট ধ্যেয়স্বরূপ প্রতিমা এবং তদনুযায়ী মন্ত্র ও ধ্যান থাকে। বলা বাহুল্য এখান হইতেই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি। তথাপি আমরা বলিব এই একাগ্র বুদ্ধিই সিদ্ধির সোপান। ইহা ব্যতীত সাধন অসম্ভব। এই ভূমি হইতে যাঁহারা আর একটু ঊর্ধ্বে অবস্থিত তাঁহাদের ইষ্টমূর্তি একটি থাকিলেও তাঁহারা নিজ ইষ্টকে বহুমূর্তির মধ্যে দেখিতে পান এবং গোঁড়ামি বর্জন করিয়া সর্বজনীনতার দিকে অগ্রসর হন। ইহার ঊর্ধ্বে যাঁহারা অবস্থিত তাঁহারা আর প্রতিমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না—কেবলমাত্র গুণবস্তুকে বা শক্তিকে বা জগদাধারকে অবধারণ করিয়া জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছিয়া যান। এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যাও যেমন বিরল তেমনি ইঁহারা জগদ্‌বরেণ্যও হন—তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহাদের যে আত্মগত বাসনা থাকে না—তাহা বলাই বাহুল্য। ইঁহারাই লোকসংগ্রহকার্যের উপযুক্ত। কিন্তু সাধারণ জীবের কি গতি হইবে?

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করিলাম তাহা কেবলমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু জগতে দীক্ষিত ব্যক্তি কয়জন? বহুলোক আছেন যাঁহাদের দেবভক্তি আছে, কিন্তু উপাসনার সুযোগ নাই—সাময়িক কর্মের মধ্যে তাঁহারা উৎসাহ দেখাইতে পারেন। আবার আরও লোক আছেন যাঁহাদের উৎসাহ নাই, কিন্তু জানেন দেবভক্তি প্রয়োজন। অপর এক শ্রেণী আছেন যাঁহারা দেবোপাসনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হয় উদাসীন, না হয় সন্দিহান।

গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন:

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥"

অর্থাৎ যদি আমাতে (শ্রীভগবানে) স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে পাইবার জন্য ইচ্ছা কর। আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তাহা হইলে আমার সেবারূপ কর্ম কর। আমার সেবারূপ কর্ম করিতে করিতে তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে, অর্থাৎ আমাকে পাইবে।

আমাদের মনে হয় সাধন-মার্গের ইহাই চরম উপদেশ। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহাদের চিত্ত প্রথমই হইতেই ধ্যেয়-স্বরূপে স্থির-ভাবে সমাহিত হয়। তন্নিম্নস্থ ব্যক্তিবর্গ দীক্ষালাভ করিয়া স্ব স্ব গুরূপদেশ-অনুসারে অভ্যাসযোগে রত হন। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে কর্মযোগই বিধেয়। এই কর্মযোগের বা বহিরঙ্গ-সাধনের মধ্যে প্রতিমাপূজার স্থান সর্বোচ্চ। অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য যে জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষে যে কর্মযোগ তাহা "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা সে কর্মযোগের কথা বলিতেছি না। সাধনার প্রথম ভিত্তি যে কর্মযোগ তাহারই কথা বলিতেছি—তাহা হইতেছে প্রতিমাপূজা।

প্রতিমাপূজার বিষয়ে কতকগুলি প্রণিধানযোগ্য বিষয় আছে। ঠিক ঠিক প্রতিমাপূজা কে করিতে পারে? ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির মন্ত্র হইতে আমরা দেখিতে পাই সমাধিসিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যতীত প্রকৃত প্রতিমা-পূজাও অসম্ভব। 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ' এই বাক্যটি সর্বদা প্রণিধান করা প্রয়োজন। ধ্যানের বিধিতে আমরা দেখিতে পাই প্রথমে পূজক আত্মপ্রাণ হইতে দেবতাকে প্রতিমায় আনয়ন করিয়া ধ্যান করিবেন। পূজা আরম্ভ করিবার পূর্বে ভূতশুদ্ধির সময়ে আত্মশোধন করিয়া দেবসাযুজ্য লাভ করিবার বিধি আছে।

প্রত্যেক প্রতিমার—বিশেষতঃ সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, শাক্ত এবং শৈব উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট যে প্রতিমা তাঁহার একটি না একটি বাহন বা আধার নির্দিষ্ট আছে। প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে তাহা হয় জীবস্বরূপ আর না হয় ব্রহ্মস্বরূপের প্রতীক—হংস, সিংহ প্রভৃতি জীব-স্বরূপের এবং শবাদি সম্ভবতঃ ব্রহ্মস্বরূপের প্রতীক।

প্রতিমাপূজায় যে উপচারদান-বিধি আছে তাহা সম্পূর্ণ মনুষ্য-জনোপযোগী অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে যেমন একদিকে অভেদভাবের আরোপ করে তেমনি অপর দিকে আমাদের যাহা কিছু কাম্য সুখপ্রদ ও শ্রেষ্ঠ উপাদান (অবশ্য সামর্থ্যোপযোগী) তাহাই প্রতিমাতে আরোপিত দেবতাকে উপহার দেওয়ার মধ্যে ত্যাগ, ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি শিক্ষা দেয়। সাধারণ মানুষ যাহারা দেবতার প্রীতির জন্য প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা করে, তাঁহার সেবারূপ কর্ম করে এবং এই প্রতিমাপূজার ফল যাহাতে বহুজনে লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিয়া ক্রমশঃ জীবনের—তথা সমাজের আদর্শের দিকে পৌঁছিতে থাকে। ক্রমে সাধনা সার্থক হয়। কাজেই প্রতিমাপূজার বৈশিষ্ট্য হইতেছে সম্মিলিত শুভবুদ্ধির সাহায্যে সমাজ-জীবনের উৎকর্ষ-লাভ।

শক্তির উৎস

রেজাউল করিম

শক্তি-মদে জগৎ আজ উন্মত্ত। যে যে-ভাবে পারিতেছে কেবলই শক্তিবৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। এই শক্তিবৃদ্ধির বিরাম নাই। "শক্তি চাই, শক্তি চাই" ইহাই প্রত্যেক জাতির প্রধান শ্লোগান। রাষ্ট্রনায়কগণ শক্তিবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক দেশে নূতন নূতন মারণাস্ত্র নির্মিত হইতেছে। দুই দুইটা বিশ্বসমরে শক্তিপ্রয়োগের পরিণতি দেখিয়াও কেহই কোন শিক্ষালাভ করিতেছে না।

শক্তির মূল উৎস কি, শক্তির প্রয়োজনীয়তাই বা কি—এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সঠিক ধারণা নাই। শক্তি চাই, এ কথা সত্য। কিন্তু কোন্ শক্তি চাই, কোন্ দেবকার্যে শক্তি নিয়োজিত হইবে, শক্তির দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার হইতে পারে, এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। জগদ্বাসীর জানা উচিত যে মানুষকে হত্যা করিবার জন্য, পরদেশ অধিকার বা লুণ্ঠন করিবার জন্য যে শক্তি, তাহা হইতেছে নিছক পশুশক্তি।

পৃথিবীতে ধ্বংসের মাধ্যমেও সৃষ্টিলীলাই চলিতেছে অহরহ। গ্রীষ্মের খরতাপে পৃথিবী যখন উত্তপ্ত হইয়া উঠে, যখন চারিদিকে জীর্ণ পাতা ঝরিয়া পড়ে তখনও দেখা যায় সেই উত্তপ্ত মাটি ভেদ করিয়া গজাইয়া উঠিতেছে নূতন গাছের চারা—চতুর্দিকে দেখি সবুজের কি অপূর্ব সমাহার! —প্রকৃতি ফুলে ফলে সুশোভিত। প্রত্যেক ঋতুতেই দেখি সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব সৃষ্টিলীলা।

শক্তিমদে মত্ত জাতির জানা উচিত যে, সমস্ত শক্তির উৎস হইতেছেন স্বয়ং ভগবান্। শক্তির গোপন রহস্য নিহিত আছে—ঈশ্বরের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক রাখার মধ্যে। যে ঈশ্বর নীরবে সমস্ত পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সমস্ত কার্য করিয়া যাইতেছেন—সেই ঈশ্বরের সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক রাখিবার যোগ্যতা অর্জন করিব ততটুকুই আমরা সীমার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিব, ততটুকুই প্রকৃত শক্তি লাভ করিতে পারিব।

কেন তবে শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য মানুষ পাগলের মত চতুর্দিক তোলপাড় করিতেছে? যেখানে মূল শক্তি নাই, আত্মাকে সবল করিয়া তুলিতে পারে তেমন শক্তি যেখানে নাই, কেন মানুষ সেইখানেই শক্তির সন্ধান করিতেছে? দেহের শক্তি অপেক্ষা আত্মার শক্তি বড়। এই আত্মার শক্তির সন্ধান না করিয়া কেন মানুষ কেবল দেহের শক্তি—তথা পশুশক্তি বৃদ্ধির জন্য, মারণাস্ত্র নির্মাণের জন্য এত সাধনা করিতেছে? জগতের মহামানবগণ এই আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়াছেন। আত্মাকে বাদ দিয়া কেহ কি শক্তিশালী হইতে পারে?

পৃথিবীতে বহু হিংস্র জীব আছে, মানুষের সাধ্য কি যে তাহাদের পরাভূত করে! কিন্তু আত্মিক ও মানসিক শক্তির প্রভাবে মহামানবগণ ইহাদের উপরও কর্তৃত্ব করিতে পারেন। যদি প্রত্যেক মানুষ আত্মার বলে বলীয়ান হইত তবে এ যুগেও তাহা সম্ভব হইত। একটা কথা বলা হয় যে, মহাপুরুষগণ অলৌকিক শক্তি বলে অলৌকিক কাজ করিয়াছেন। আর সেই জন্যই তাঁহারা পশুকেও বশীভূত করিয়াছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা Miracle বা অলৌকিক কার্য করেন তাঁহারা অতিমানুষ হইলেও মানুষ। তাঁহারা সাধনা-বলে অন্তরের পাশবিক বৃত্তিকে বশীভূত করিয়াছেন বলিয়া সৎ ও মহৎ হইতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের কাজকে আমরা বলি Miracle বা অলৌকিক। কিন্তু এই সব "মিরাক্‌ল্" মহৎ জীবনের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে মানুষ সত্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন

তিনিই শক্তির উৎস লাভ করিয়াছেন। আমরা সাধারণ লোক যে উচ্চতর জ্ঞান ও সিদ্ধি অর্জন করিতে পারি নাই, মহামানবগণ সাধনা-বলে সেই জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই জ্ঞান, সেই সত্য ও সেই শক্তির আধারের সঙ্গে একীভূত হইয়া যাওয়ারই অপর নাম "মিরাক্‌ল্‌"। যে কেহ সেই ভাবে সাধনা করিবে সেই শক্তির সন্ধান পাইবে। মহামানবগণ অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন সাধনালব্ধ শক্তি, সেই শক্তির তুলনায় আণবিক বোমা কিছুই নহে। আত্মার সেই শক্তি সাধনার দ্বারা লাভ করা যায়। আজ সেই আত্মশক্তির সন্ধান করিতে হইবে তবেই জগতের কল্যাণ। মানুষের বৈজ্ঞানিক মন "মিরাক্‌ল্‌" বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা বলে যে উহা প্রকৃতির নিয়মের বহির্ভূত কাজ। তাহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? সত্যই মহাপুরুষদের নামের সহিত বহু অদ্ভুত ও অবাস্তব ঘটনা জড়িত থাকে। ইহার অনেকগুলি সত্য নহে, এবং অনেকগুলি সাধারণ অবস্থায় মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। মিরাক্‌ল্‌ এই অর্থে Supernatural বা অতি-প্রাকৃতিক যে ইহা অনেক সময় স্বাভাবিক (Natural) অবস্থার ঊর্ধ্বে, সাধারণ মানুষ তাহার সাধারণ জ্ঞানদ্বারা যাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, মহাপুরুষগণ সাধনার দ্বারা এরূপ জ্ঞান লাভ করেন, যাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থার কিছুটা ঊর্ধ্বে থাকেন বলিয়া মহাপুরুষের কাজকে মিরাক্‌ল্‌ বলা হয়। যিনি নিজের সত্তার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং সর্বব্যাপী শক্তি ও জ্ঞানের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছেন তিনি সাধারণ মানুষের জ্ঞানের উপরে উঠিতে পারেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। ইহারই নাম মিরাক্‌ল্‌। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যাঁহারা এই ধরণের কার্য করেন তাঁহারা কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কিছু করেন না। সাধারণ মানুষ এইসব মহাপুরুষদের অলৌকিক কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইয়া ভাবে, কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল? কার্য্যকারণের সম্পর্ক বুঝিতে পারে না বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে বহু মিরাক্‌ল্‌ প্রচলিত আছে। একটির কথা উল্লেখ করি। একদিন তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল। দেখা গেল সত্যই তাঁহার পৃষ্ঠে পাঁচ আঙুলের দাগ আছে। অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল দূরে একজন মাঝি অপর এক মাঝির পৃষ্ঠে সত্যই চপেটাঘাত করিয়াছিল। ঠাকুর সকলের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন, তাই সেই চপেটাঘাত তাঁহার অঙ্গে আসিয়া লাগিল। যিনি সাধনশক্তি-বলে সকলের সঙ্গে এক হইয়া যান, তাঁহার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। আর ইহা এমন কোন অবাস্তব ব্যাপার নহে, যাহা বিজ্ঞান-বিরোধী। মহাপুরুষগণের বোধশক্তি প্রখর। তাঁহারা অপরের ব্যথা-বেদনাকে নিজের করিয়া লইতে পারেন। সেইজন্য সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সীমা ভেদ করিয়া তাঁহারা ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন। একজনের পক্ষে যাহা সম্ভব, অপরের পক্ষেও তাহা সম্ভব। তবে চাই উপযুক্ত সাধনা। উপযুক্ত সাধনার বলে মানুষ অসম্ভব শক্তির অধিকারী হইতে পারে। সেই শক্তির তুলনায় আণবিক শক্তি অকিঞ্চিৎকর।

মানুষের জীবন ও চরিত্রগঠনে Environments বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা প্রায় বলা হইয়া থাকে। মহাপুরুষগণ তাঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে যে কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারেন। তাঁহারাই সাধনা-বলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার শর্তাবলী সৃষ্টি করেন। তাঁহারা পুরাতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নূতন অবস্থা সৃষ্টি করেন এবং জগতে নব

যুগের প্রবর্তন করেন। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, হজরত-মহম্মদ—ইঁহারা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে লালিত হইয়াছেন তাহা সাধারণতঃ মহাপুরুষ সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু সাধনা-বলে তাঁহারা এত অসম্ভব শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা পুরাতন অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া নব যুগের প্রবর্তন করিলেন। পশুশক্তির প্রভাবে কেহ ঐরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে কি?

পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। হয়ত মানুষের ব্যক্তিত্ব-গঠনে বংশগত বৈশিষ্ট্য কিছুটা কার্যকরী হয়, কিন্তু সবটা নহে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে বংশগত প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য কি অতিক্রম করা যায়? উত্তরে বলিব, নিশ্চয় পারা যায়। মানুষ যে মুহূর্তে তাহার আসল সত্তা (true self) বুঝিতে পারিবে, তাহার আত্মার অসীম শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে সেই মুহূর্তে তাহার বংশগত বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব কমিতে থাকিবে। তাহার আত্মার শক্তি সম্বন্ধে তাহার বোধ ও চেতনা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে সেই পরিমাণ বংশগত প্রভাবও কমিতে থাকিবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে যদি বংশগত বৈশিষ্ট্যই আসল বস্তু হয়, তবে বহু মানুষের ভাল হইবার উপায় থাকিবে না। মানুষের স্বভাব-চরিত্রের উপর যে সব ক্ষতিকর বংশগত প্রভাব বিদ্যমান থাকে সেইগুলি দূর করিবার সাধনা তো মস্ত বড় সাধনা। এই সকল ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে যখন চেতনা জাগিবে, তখন হইতেই সেগুলি দূর হইতে থাকিবে। এমন কোন পাপ নাই যাহা মানুষ সাধনার দ্বারা অতিক্রম করিতে না পারে। সুতরাং একথা বলা ঠিক হইবে না যে, আমাদের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাবগুলি বংশগত। জন্মগত কোন বৈশিষ্ট্য আমার সমস্ত জীবনকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং আমাকে অন্যায়ভাবে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে—একথা বলার মত কাপুরুষতা আর কিছুই নাই।

ঈশ্বরের নিরাপদ আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। কবি ব্রাউনিং ঠিকই বলিয়াছেন, "উপরে ঈশ্বর আছেন, সুতরাং পৃথিবীতে সব ঠিক আছে।" এই একান্ত ঈশ্বর-নির্ভরশীলতা মনে যে শক্তি সৃষ্টি করে তাহাই প্রকৃত শক্তি। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা মানুষের আত্মার শক্তির সম্মুখীন হইতে পারে, মানুষ ঈশ্বর-রূপ অনন্ত উৎসের অংশ। সেই মানুষের তেজের (Spirit) নিকট কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। মানুষকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি পৃথিবীতে শক্তি অর্জন করিতে চাও? তাহা হইলে কৃত্রিম শক্তির উপর নির্ভর করিও না। আপনাকে চেন। আপনার আত্মার উপর বিশ্বাস কর। নিজেকে ক্ষুদ্র ও নগণ্য ভাবিও না। ক্ষুদ্র আদর্শকে অনুসরণ করিও না। তোমার মধ্যে যে উচ্চতম আত্মা আছে তাহাতে বিশ্বাসী হও। প্রথা, দেশাচার অথবা মানুষের তৈরী স্বেচ্ছাচারমূলক বিধি-ব্যবস্থার দাস হইও না। দেখিবে তোমার আত্মা ভিতর হইতে শক্তি পাইবে—আর সেই শক্তি সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও তোমাকে রক্ষা করিবে। আত্মার শক্তি পাইতে হইলে নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করিতে হইবে। ব্যক্তিত্ব হইতেছে শক্তির প্রধান কর্মকর্তা। এই ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র কাজে নিযুক্ত করিলে চলিবে না। যাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বের সন্ধান পায় নাই, তাহারাই প্রথা ও দেশাচারকে বড় মনে করে, এবং সেই গুলিকেই সার সত্য মনে করে। প্রথা ও দেশাচারের নিকট আত্মসমর্পণ করার অর্থ আত্মহত্যা। নিজের কাছে সত্য হইতে হইবে,—তাহা হইলে মানুষ কাহারও নিকট মিথ্যা হইবে না। নিজের কাছে সত্য হওয়াটাই শক্তির সুদৃঢ় ভিত্তি।

আমরা যখন সুমহান্ ঈশ্বরের নিকট আত্ম-সমর্পণ করি, তখন আমাদের জীবন একটা মহৎ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়। তখন আমরা ভয়, বা জনমতের দ্বারা পরিচালিত হই না। "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে"—এই বোধ জাগিলে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করেন। ঈশ্বর ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির মর্জিমত চলিবার জন্য মানুষের জন্ম হয় নাই। তুমি আর তোমার ঈশ্বর এই দুয়ের মধ্যে যদি অন্য কোন প্রভাব আসিয়া পড়ে তবে, তুমি অবিলম্বে পথ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। ঈশ্বরে অকুণ্ঠ বিশ্বাস হইতে যে শক্তি জাগ্রত হয় সেই শক্তির সাধনা করিতে হইবে।

এই যে ভিতরের শক্তি তাহাই হইতেছে ঈশ্বরের শক্তি। সেই শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। যে মানুষ এই শক্তিকে জাগাইতে পারিয়াছে সেই মানুষ সংসারের সকল অবস্থার মধ্যে উন্নত হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। সেই মানুষই প্রকৃত শক্তির অধিকারী।

ঈশ্বর আনন্দময় ও শক্তিময়। ঈশ্বরের এই অনন্তশক্তির কিয়দংশ প্রত্যেক মানুষের আত্মার মধ্যে বিদ্যমান। আত্মার মধ্যে যে অনন্ত শক্তির অংশ আছে সেইটাই হইতেছে মানুষের শক্তির উৎস। সেই শক্তিকে বহির্জগতে বিবিধ কর্মের দ্বারা প্রকাশ করাই হইল মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। চিত্রকর, গায়ক, কবি, লেখক—সকলের জন্যই ইহা দরকার। ভিতরের এই শক্তির উদ্বোধন হইলে জীবন সার্থক হয়। সে শক্তির অপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ হইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং জীবনব্যাপী সাধনা করিতে হইবে সেই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য।

লেখক বা কবিকে স্মরণ করিতে হইবে যে, হৃদয় হইতে ভাব না জাগিলে কোন লেখাই সার্থক হয় না। লেখক, যদি তুমি সার্থক লেখা লিখিতে চাও তবে হৃদয়ের দিকে তাকাও! নিজের কাছে সত্য হও, নির্ভীক হও! নিজের আত্মার নির্দেশ মানিয়া চল! তুমি নিজে যাহা, তাহা হইতে বেশী কিছু হইতে পারিবে না। তোমার ভাণ্ডারে যাহা আছে, তাহা হইতে বেশী কিছু দিতেও পারিবে না। যদি বেশী কিছু দিতে চাও, তবে তোমাকে আরও বড় হইতে হইবে—আরও কিছু অর্জন করিতে হইবে। সার্থক কবি নিজেই একটি আধ্যাত্মিক কবিতা—তাহা এক পাঠক হইতে অপর পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করে। লেখকের শক্তি আসে অন্তরের প্রেরণা হইতে। লেখক সেই শক্তি পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। লেখক পাঠকের মধ্যে সৃষ্টি করেন প্রাণপূর্ণ শক্তি; হৃদয়কে প্রসারিত করেন, মধুর করেন, জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করেন, উচ্চতর শক্তি ও মহত্তর আনন্দ দেন। পৃথিবীতে এমন বহু রচনা আছে যাহা একটা মৃতপ্রায় জাতিকে নূতনভাবে জাগাইয়া দিয়াছে। ফ্রান্সে 'লা মার্সাই' সঙ্গীত, আমাদের দেশে 'বন্দে-মাতরম্' সঙ্গীত সেই প্রকার সার্থক রচনা, যাহা মানুষের প্রাণে তেজ শক্তি ও আনন্দ উজ্জীবিত করিয়াছে। এই যে ভিতরের শক্তি, এই শক্তিকে জাগ্রত করিলে তবেই মানুষের, তথা জাতির মুক্তি। আমাদের এই শক্তির সাধনাই করিতে হইবে।

প্রকৃতির দ্বার দেশে আঘাত করিতে জানিলে প্রকৃতি তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেন, এবং সেই আঘাতের শক্তি ও তেজ, একাগ্রতা হইতেই আসে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই, উহা যতই একাগ্র হয়, ততই উহার শক্তি এক লক্ষ্যের উপর আসে এবং ইহাই রহস্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

জাগ্রত জাপান

ডক্টর শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর

প্রাচ্য জগতের বিস্ময় জাপান। নব-জাগ্রত এশিয়ার জাতি-সমুহ জাপানের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া নিজেদের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনা করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এশিয়ার অন্যান্য জাতি যখন পাশ্চাত্ত্য-সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত—জাপান তখন নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া যে কোন পাশ্চাত্ত্য শক্তিশালী জাতির ন্যায় নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য উদ্যত। বিগত মহাযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত জাপানের এই জাগরণ ও প্রসারকে সাম্রাজ্য-বাদেরই রূপান্তর বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদকে—বৃহত্তর শক্তিশালী জাতি কর্তৃক দুর্বল জাতির পীড়ন ও শাসনকে—সকল দেশের, সকল কালের সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন। সেই হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের শক্তিপ্রকাশকে আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই, এবং এখনও উৎপীড়ক যে কোন জাতির প্রতি ভারতবর্ষ স্পষ্ট ভাষায় তাহার ঘৃণা প্রকাশ করে ও অন্যায়ের প্রতিবাদ জানায়। জাপানের এই দানবীয় সাম্রাজ্য-লালসাকে বাদ দিয়া যদি তাহার জাতি ও ব্যক্তিজীবনের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে দেখি—এই জাতি হইতে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় আছে।

ভূমি-প্রকৃতি ও জন-সংখ্যা

লোকসংখ্যার অনুপাতে জাপানের আয়তন অতি ক্ষুদ্র। দ্বীপময় ও পর্বতবহুল জাপানের পক্ষে প্রায় নয় কোটি অধিবাসীর ভরণপোষণ করা একরূপ অসম্ভব। প্রকৃতির দানের কার্পণ্য জাপানী জাতিকে অধিকতর কর্মঠ ও অভিযান-প্রিয় করিয়াছে। দেশের সমগ্র ভূমির প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ কৃষিকার্যের উপযোগী। বাকি সব পর্বতময় অথবা শুধুমাত্র পশুচারণযোগ্য—বিশেষতঃ হোক্কাইডোর অনেকাংশ। জাপানী চাষ-প্রথা আমাদের দেশের তুলনায় খুবই উন্নত। এশিয়ার অনেক দেশই "জাপানী প্রথায়" চাষের প্রবর্তন ও জাপানী কৃষি-বিশেষজ্ঞকে আহ্বান করিয়া নিজেদের দেশের চাষের উন্নতি করিবার প্রচেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জাপানী চাষীর আপ্রাণ চেষ্টার পরও জাপান খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশের কোথাও এতটুকু জমিও পতিত নাই। ধানের ক্ষেতের আলের উপর পর্যন্ত কোন না কোন সবজির বা ফুলের চাষ। রেলের রাস্তার পাশে যেখানে কয়েক ইঞ্চিমাত্র ভূমি ফাঁক আছে সেখানেও অন্তত ২।৩টা পেঁয়াজের গাছ পোঁতা আছে দেখিতে পাওয়া যায়! পাহাড়ের কয়েক হাজার ফুট উপর পর্যন্ত সবজি বা ফলের চাষ। বছরের কোনও সময় জমিকে পতিত দেখা যায় না, তবু খাদ্যে জাপান স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য জাপানীরা শুধু মাত্র ভূমির উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়াছে। মৎস্য-চাষ ও সামুদ্রিক মৎস্য-শিকারে জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। নিজেদের দেশের সমুদ্র-উপকূলকে বাদ দিয়াও, আন্তর্জাতিক জলপ্রদেশের এমন স্থান নাই যেখানে জাপানী মৎস্য শিকারীরা মাছ ধরিতে না যায়। উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু, প্রশান্ত হইতে আটলান্টিক—সর্বত্রই ইহাদের গতি। টোকিও শহরে বসিয়া বঙ্গোপসাগরের মাছ খাওয়া যায়—জাপানী জেলেদের কল্যাণে। জাপানের মৎস্যচাষ ও মৎস্য-সংরক্ষণ প্রণালী শিক্ষার জন্য দেশবিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা

এখানে আসে। ক্ষুধার্ত জাপানীরা খাদ্যদ্রব্যের বিচার-সম্পর্কে খুবই উদার—তিমি হইতে আরম্ভ করিয়া শামুক, কাঁকড়া, ঝিনুক, অক্টোপাশ গুগ্‌লি প্রভৃতি যে কোন জল-জন্তুই ইহাদের উপাদেয়। স্থলচর প্রাণীর মধ্যেও খুব কমই বাদ যায়। মাংস অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য—তবে সর্বত্রই পাওয়া যায়। জনসংখ্যার সঙ্গে খাদ্যের অনুপাত ঠিক রাখার জন্য জাপানী বিজ্ঞানীরা শস্য মৎস্য ও মাংস উৎপাদনের মাত্রাকে বাড়াইবার জন্য গবেষণা-রত। বিদেশের বিনিময় বাণিজ্যের উপর নির্ভর না করিয়া খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা যুদ্ধোত্তর জাপানের প্রধানতম লক্ষ্য বলা যাইতে পারে।

কর্মক্ষমতা ও শ্রমের মর্যাদাবোধ

জাপানীদের কর্মক্ষমতা যে কোন জাতি অপেক্ষা বেশী। জাপানী শ্রমিক বা যন্ত্রশিল্পী একঘণ্টায় যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তেমন পারে না। ভারতীয় একজন শিক্ষার্থী বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্‌ সংক্রান্ত ব্যাপারে এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসেন। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিয়াছেন যে একই উপায় অবলম্বন করিয়া যেখানে ভারতীয় শ্রমিক একদিনে ১ শতটি দ্রব্যের নির্মাণ শেষ করিতে পারে সেই উপায়েই একজন জাপানী শ্রমিক ৫ শতের উপর দ্রব্য নির্মাণ করিতে পারে। উৎপাদনের এই দ্রুততা শ্রমিকের স্বভাবলব্ধ। জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পে জাপান বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রতিবৎসর জাপান সমানসংখ্যক শ্রমিক ও অর্থ নিয়োগ করিয়া পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক জাহাজ নির্মাণ করিতে পারে। রেল ও রেল-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিতেও জাপানের দক্ষতা পৃথিবীখ্যাত। বস্ত্রশিল্পেও শ্রমিক-প্রতি উৎ-পাদনের পরিমাণ পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা বেশী। আবহাওয়ার অনুকূলতা এবং উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতিতে জাপান অন্যদেশের সমকক্ষ হইয়াও যখন অন্যান্য দেশ অপেক্ষা মাথাপিছু বেশী উৎপাদন করিতে পারে তখন এই উৎপাদনের কৃতিত্ব শ্রমিকের ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া আর কি ?

জাপানী শ্রমিকের আর একটি গুণ ইহারা কাজে ফাঁকি দেয় না। যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ যন্ত্রবৎ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এখানে মজুর খাটাইবার সময় আর কাহাকেও তদারক বা খবরদারি করিতে হয় না। আমার বাসার পাশে একটা নতুন বাড়ী বেশ কিছুদিন যাবৎ তৈয়ারী হইতেছিল। শ্রমিকেরা ঘড়ি-বাঁধা একই সময়ে আসিয়া যে যাহার কাজে লাগিয়া যাইত। দুপুরে ১২টা হইতে ১টা পর্যন্ত ছুটি। ঠিক ১২টায় সবাই কাজ বন্ধ করিয়া নিজেদের সঙ্গে-আনা খাবার খাইতে বসিয়া গেল। ঠিক একটায় উঠিয়া আবার যে যাহার নির্দিষ্ট কাজে লাগিয়া যাইত। খোঁজ করিয়া জানিলাম ইহারা দিন-মজুর (চুক্তির মজুর নয়) এবং ইহাদের কাজের তদারকের জন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজন নাই। সততা ও কর্মনিষ্ঠা জাপানীদের জাতীয়তাবোধ হইতে উৎপন্ন। জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে ইহাদের দৃঢ়কর্মা ও সৎ হইতে হইবে—এইরূপ একটা স্বভাবজাত বিশ্বাস ইহাদের আছে। ইহাকেই জাতীয় চরিত্র বলা যায়। কাজের সময় আপন-পর বোধ নাই। কাজ কাজই, এবং যাহার উপর যাহা ন্যস্ত আছে সে তাহা করিবেই। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম—ইহারা জাতীয় প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন। একজন সেলাই-কলের মজুরের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তাহার সঙ্গে আলাপে জানিলাম, যাহাতে জাপানী সেলাইকল পৃথিবীর মধ্যে সেরা হয় এবং উৎপাদন মূল্য সবচেয়ে কম হয়—সেই সম্বন্ধে প্রত্যেকটি

মজুর সচেতন। আমার মনে হয় সব শ্রমিকের মধ্যেই এই জাতীয়তাবোধ ক্রিয়া করে।

জাপানীদের শ্রমের মর্যাদাবোধ আমাদিগকে বিস্মিত করে, এখানে সবাই সব কাজ করে। সমগ্র জাপানের বড় বড় ৫।৭টি রেল বা ষ্টীমার স্টেশনে ব্যতীত মুটে নাই। এই মুটেরা বিশেষতঃ বিদেশীদের বা অন্য কারণে অপারগ যাত্রীর মাল বহন করে। মেথর বা ঝাড়ুদার বলিয়া বিশেষ কোন শ্রেণী বা জাতি নাই। অফিসে দপ্তরী বা "চতুর্থ শ্রেণীর" কর্মচারী বলিয়া বিশেষ কোন স্তরের কর্মী নাই। একজন গ্রাজুয়েট কেরানী প্রয়োজনবোধে ঝাড়ুদারের কাজ করে, ফাইল কাগজপত্র বহন করে, লেখার কাজও করে। রেল ষ্টেশনের একটি দৃশ্য বড়ই সুন্দর। "স্টেশন মাষ্টার" বা "ষ্টেশন ক্লার্ক" এই জাতীয় লাল-ছাপমারা ব্যাজ পরিয়া ও একটি লাল ঝাণ্ডা কোমরে গুঁজিয়া একজন লোককে পাটকর্ম ঝাড়ু দিতে প্রায়ই দেখা যায়। যেই গাড়ী স্টেশনে প্রবেশ করিল অমনি ঐ ঝাড়ুদার লোকটি লাল ঝাণ্ডা দেখাইয়া গাড়ী থামাইল, গার্ডের সঙ্গে একটু কাজ সারিয়া লইল, আবার ঝাণ্ডা তুলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া ঝাড়ু লইয়া পরিষ্কারের কাজে লাগিয়া গেল। ঐ ঝাড়ুদার ভদ্রলোকটি একজন গ্রাজুয়েট এবং পদ-মর্যাদায় কেরানী বা তদূর্ধ্ব। যিনি গাড়ীর গার্ড (অবশ্যই একজন গ্র্যাজুয়েট!) তাঁহার অন্যতম কর্ম হইল গাড়ী শেষ স্টেশনে গিয়া থামিলে গাড়ীর প্রত্যেকটি কোঠা ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করা। খুব ব্যস্ততার সময় হোটেলের মালিক আসিয়া নিজে টেবিল পরিষ্কার করিয়া অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করেন। সেই হোটেলের কর্মচারীর সংখ্যা ১০০ বা তদূর্ধ্ব—সুতরাং মালিকের গৌরব উপলব্ধব্য। টোকিও শহরে রাস্তা ঝাড়ু দিবার কোন লোক দেখি নাই, অথচ রাস্তায় একটুও কাগজের টুকরা বা ফলের খোসা বা কাগজের ঠোঙা দেখা যায় না। প্রত্যেক বাড়ীর গৃহিণী বা পরিচারিকারা নিজের বাড়ী ঘর ঝাড়িয়া সর্বশেষে নিজেদের বাড়ীর সামনেটাও ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে। এই দৃশ্য আমাদের খুবই আনন্দ ও উৎসাহ দেয়। টোকিও শহরে যে গৃহিণী ৪।৫ খানা বাড়ীর মালিক তিনিও এইরূপ সাধারণ রাস্তা প্রকাশ্যে ঝাড়ু দিতে লজ্জা বা সংকোচবোধ করেন না। এখানে ভিখারী দেখি নাই। ভিক্ষুক-জাতীয় ব্যক্তিকে সাহায্য করা অথবা কাহারও নিকট ঐরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা—উভয়কেই ইহারা অগৌরবের বস্তু মনে করে; সুতরাং শ্রমশীলতাকে ইহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

শিক্ষা ও বেকার সমস্যা

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রির পঠন-পাঠন পর্যন্ত জাপানী ভাষার মাধ্যমে হওয়ায় জাপানে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৯৮। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে জাপানের শিক্ষাপদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং এখনও শিক্ষাসমস্যা লইয়া নানা গবেষণা ও পরিকল্পনা চলিতেছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ হওয়ায় এবং শিক্ষার ব্যয় সহজসাধ্য হওয়ায় কাহাকেও অশিক্ষার গ্লানি বহন করিতে হয় না। দিনমজুরকে যখন দুপুরের এক ঘণ্টা কাজের বিশ্রামের সময় পথের ধারে ঘাসের উপর শুইয়া পত্রিকা পড়িতে দেখি, তখন খুবই আনন্দ হয়। পত্রিকা ইহারা সকলেই পড়ে। রেলে বা বাসে খুব ভিড়ের মধ্যে ও সকাল-সন্ধ্যায় যাত্রীদের পত্রিকা-পাঠে নিবিষ্ট থাকিতে দেখা যায়। ছাত্রছাত্রীদের পোষাক একই রকম। হাই স্কুল পর্যন্ত পোষাকের সাম্য অবশ্য-পালনীয়। প্রত্যেক স্কুল এবং কলেজের আলাদা ব্যাজ আছে। ঐ ব্যাজ দ্বারাই ছাত্রছাত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষাকের সাদৃশ্যের প্রতি তেমন

জোর দেওয়া হয় না। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খুবই শৃঙ্খলাবোধ লক্ষিত হয়। গান গাওয়া ও চিত্রাঙ্কন প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ। সুতরাং প্রত্যেক জাপানীই গান গাহিতে ও ছবি আঁকিতে পারে।

হাই স্কুল পর্যন্ত পড়া শেষ করিয়া কেরানীর বা কারখানার কাজে প্রবেশ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় প্রত্যেক ছাত্রকে নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে হয়। এই নির্বাচনী পরীক্ষা খুবই কঠিন। শতকরা ৫০ জনেরও কম ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা নির্দিষ্ট। সুতরাং প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা হাই স্কুলে অনুত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা একবার প্রবেশ করিতে পারে তাহারা উত্তীর্ণ হইবেই ধরিয়া লওয়া যায়। পঠন-পাঠনের ও পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা এমনি যে, বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে কোন ছাত্রের অনুত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা থাকে না। আমাদের দেশে পরীক্ষায় শতকরা ৫০ জন উত্তীর্ণ হইলেও আমরা "ফল সন্তোষজনক" মনে করি। জাপানে যুব-শক্তির অপচয় নাই। প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে বয়স প্রায় নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং একই বয়সে একসঙ্গে সকলে গ্রাজুয়েট বা 'পারঙ্গম' হইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বা হাইস্কুলের পাঠ শেষ করিবার পূর্ব হইতেই কোন কোন ছাত্রছাত্রী কাজে যোগ দেয়। আংশিক কাজ করিয়া নিজেদের পড়ার ব্যয় বহন করার মত ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে আছে। পত্রিকা বিলি করার কাজ ছাত্রদের; ১১।১২ বছরের ছাত্র হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পর্যন্ত সকাল বিকাল পাড়ায় পত্রিকা বিলি করিয়া দিয়া কিছু উপার্জন করে। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশে ইহাদের কেহ কেহ কোন কোম্পানির জিনিসের প্রচার করিয়া বা কোন ইন্সুরেন্স্ কোম্পানির দালালি করিয়াও কিছু উপার্জন করে। কোন কোন ছাত্রছাত্রী বিকালে বা অন্য ছুটির দিনে দোকানে বিক্রেতার কাজ করে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে (আমাদের দেশের কলেজ) ছাত্রছাত্রী-পরিচালিত ক্যান্টিন ও ছাত্রদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান আছে। ইহার পরিচালনা ও ছাত্রছাত্রীরাই করিয়া থাকে।

বেকারসমস্যা জাপানেও আছে। তবে ইহা তেমন গুরুতর আকারে নয়। প্রত্যেক বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষার পূর্বে সম্ভাব্য স্নাতকদের পরিসংখ্যা ও সম্ভাব্য নিয়োগক্ষেত্রের পরিসংখ্যা গ্রহণ করিয়া সরকার প্রায় প্রত্যেকের জন্যই একটা ব্যবস্থা করেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের সময়ও প্রার্থীদের পরীক্ষা দিতে হয়। জাপানে এক জাতীয় কাজ হইতে অন্য জাতীয় কাজে যাওয়া কষ্টকর। আমাদের দেশে যেমন মাষ্টারি হইতে কেরানীগিরি বা অন্য কোন কাজে ইচ্ছামতো যাওয়া যায় এখানে তেমন নয়। জাপানে নারীও পুরুষের সমকক্ষ, তাহারা যে কোন কাজে যোগদান করে। তবে বাসের কণ্ডাক্টর, দোকানের বিক্রেতা, রেষ্টুরেণ্টের পরিচারিকা—প্রভৃতি কাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কেরানীর কাজেও নারীর সংখ্যা নগণ্য নয়। রেশমজাতীয় কারখানায়—যেখানে স্বয়ংক্রিয় মেশিন কাজ করে,—শুধুমাত্র একটু পর্যবেক্ষণের দরকার, সেখানে শুধুমাত্র নারী কর্মীই নিয়োগ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্যে নারী ও পুরুষ কর্মী সমানভাবেই কাজ করে। কৃষি-শ্রমিকরা প্রায়ই নিজের জমিতে কাজ করে। ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যা খুবই অল্প। শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান খুব উন্নত বলা যায় না।

সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও শিল্পবোধ

জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সমুদ্র

ও অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ঋতুভেদে গাছপালা নানা বর্ণ ও ফুল ধারণ করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জাপানী জাতিকে স্বাভাবিক শিল্পবোধ দিয়াছে। জাপানী "পুষ্পসজ্জা" একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ শিল্প। ফুল প্রতিদিনের গৃহস্থালির অপরিহার্য অঙ্গ। অতি সংক্ষিপ্ত সজ্জার মাধ্যমে জাপানীরা একটি শিল্পময় পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে। বাড়ীঘর সর্বদা তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। প্রত্যেকটি জিনিস অতি সুন্দরভাবে সাজানো। প্রত্যেকের বাড়ীর পাশে একটু বাগান—অন্ততঃ স্থানাভাবে টবে ২।১টি গাছ দেখা যায়। অতি সাধারণ জিনিসকেও সাজাইবার ভঙ্গীতে ইহারা শিল্পময় করিয়া তুলে। কচুগাছ, পেঁয়াজের ফুল, শুকনা গাছের ডাল, সরিষার ফুল প্রভৃতি যে কোন জিনিস হইতে ইহারা সজ্জার উপকরণ পায়।

জাপানের উদ্যানশিল্প পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। প্রস্তর ও গাছপালা দিয়া অতি সুন্দরভাবে বাগান ও পার্কগুলিকে সাজানো হয়। যে কোন বৃহৎ গাছকে বামন করিয়া রাখার কৌশল জাপানীদের বৈশিষ্ট্য। ছোট ছোট টবে এই জাতীয় "বামনবৃক্ষ" বিক্রয় হয়। পার্কে ও খোলা রাস্তার পার্শ্বে নানা জাতীয় ফুল ফুটে। জাপানী শিশুরা ফুল ছিঁড়িতে জানে না। সমগ্র জাপানের সমুদ্রের উপকূল ও পর্বতসমূহে সুন্দর সুন্দর "জাতীয় উদ্যান" (National Park) আছে। এই জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। বিদেশী ভ্রমণকারীদের নিকট এই জাতীয় পার্ক খুবই উপভোগ্য। পার্কের সৌন্দর্য-রক্ষায় সকলেই তৎপর।

মন্দির ও সমাধিস্থানগুলি সৌন্দর্য, নীরবতা ও পবিত্রতার লীলাভূমি। জাপানী মন্দিরগুলি দারু-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাঠের উপর এত সুন্দর কারুকার্য খুবই প্রশংসনীয়। মন্দিরগুলির চারিধারে সাধারণতঃ প্রশস্ত উদ্যান থাকে। সমাধিস্থানগুলিও সুরক্ষিত; ঐ সকল স্থানে গেলে মনে প্রশান্তি আসে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ সরোবর বা পর্বতের পার্শ্বে মন্দির অবশ্যই থাকিবে। এই সৌন্দর্যময় শান্ত পরিবেশ আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তার খুবই উপযোগী। জাপানের দর্শনীয় স্থানমাত্রেই এই জাতীয় মন্দির ও উদ্যানে পরিপূর্ণ। কিয়টো, নারা, নিক্কো, কামাকুরা, সেন্দাই প্রভৃতি সব স্থানই জাপানের জাতীয় চিন্তা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় দেয়।

আতিথ্য ও সততা

জাপানী জাতির সৌজন্য ও অতিথিপরায়ণতা যে কোন বিদেশীকে মুগ্ধ করে। জাপান সরকারের ও কয়েকটি বেসরকারী ভ্রমণ-নিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে এখন জাপানের যে কোন সাধারণ স্থানেও সুন্দর ও উচ্চশ্রেণীর হোটেল বা বিশ্রামাগার আছে। হোটেলে পয়সা দিয়া থাকিতে হয়—সব দেশেই। কিন্তু জাপানের হোটেলে যেরূপ হৃদ্যতাপূর্ণ পারি-বারিক পরিবেশ, সেবা যত্ন ও মনোযোগ পাওয়া যায়—অন্যত্র অর্থের বিনিময়েও তাহা দুর্লভ। হোটেলের মালিক হইতে পরিচারক পর্যন্ত সকলেই সাগ্রহে অতিথিদের সেবার প্রতি মন দেয়। ভারতে কামাখ্যার পাণ্ডা আর জাপানে হোটেলের কর্মচারীর ব্যবহার টাকা-পয়সার দেনাপাওনাকে বিস্মৃত করাইয়া একটা আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে—যাহা দীর্ঘকাল মনে থাকে। বাসে, ট্রামে, রেলে কণ্ডাক্টর প্রভৃতিও যে কোন যাত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। রাত্রির গাড়ীতে রেলের গার্ডের নিকট নিজের গন্তব্য ষ্টেশন জানাইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমানো যায়। রাত্রির যে কোন সময় গার্ড আসিয়া যাত্রীকে জাগাইয়া তাহার নামার সাহায্য করিবে। এমনকি যাত্রীর মালপত্র নিজে প্ল্যাটফর্মে নামাইয়া দিয়া মাথার হ্যাট খুলিয়া "অশেষ ধন্যবাদ" বলিয়া হুইসেল বাজাইয়া গাড়ী

ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। বাজারে দ্রব্যমূল্য প্রায়ই নির্দিষ্ট। সর্বত্র সমান দাম। বিদেশীর পক্ষেও ঠকিবার কোন কারণ নাই। বিদেশী দেখিয়া গাড়ীওয়ালা বা দোকানদার কখনও বেশী পয়সা আদায় করিবে না। হোটেলে কোন জিনিস ভুলিয়া ফেলিয়া আসিলেও হারাইবার ভয় নাই। উহা হয়তো হোটেলের কর্তৃপক্ষ নিজের পয়সায় ডাকে মালিকের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবে অথবা অতি বিনয়ের সহিত উহা ফিরাইয়া লইয়া যাইতে অনুরোধ করিবে। উপযুক্ত টিকিট না কিনিয়া স্টেশনে নগদ পয়সা দিয়া বাহির হইয়া আসা যায়।

গৃহস্থ বাড়ীতে নিমন্ত্রণের অতিথি হিসাবে গেলে গৃহিণী দরজার সামনে আসিয়া নতজানু হইয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা জানান। ঘরের বাহিরে রাখা অতিথির জুতাগুলিকে গুছাইয়া ও পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। অতিথির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার ভারতীয় "অতিথি-নারায়ণ" বোধকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। লৌকিকতার ঊর্ধ্বে যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা আছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

জিজ্ঞাসা ও আবিষ্কার

জাপানীদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রসারিত। আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারে জাপানীরা পৃথিবীর যে কোন অগ্রসর জাতির সমকক্ষ। মেরু-অভিযানে, পর্বত-অভিযানে, অলিম্পিকে জাপানীরা অগ্রগামীদের অন্যতম। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে ইহারা সুপটু। পৃথিবীর অন্যত্র যে কোন নূতন আবিষ্কার হয় জাপানী কৌশলীরা অল্প দিনের মধ্যেই তাহা নিজস্ব করিয়া লয়। দর্শন ও ধর্ম সংক্রান্ত চিন্তা ও গবেষণায়ও জাপানীরা পশ্চাৎপদ নয়। জাপানী পণ্ডিতগণ ভারতীয় ও চৈনিক দর্শন ও নানা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন জাপানী পণ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্রাদির এমন শাখা লইয়া চিন্তারত আমরাও যাহার খোঁজ রাখি না। জাপানী পণ্ডিতদের পারদর্শিতা ও তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থের পূর্ণতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, ও অভিযানে এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম, জড় ও অধ্যাত্ম উন্নতির সমন্বয় জাপানী জাতিকে বিশিষ্টতা দিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জাতির বিজ্ঞানের উন্নতিকে সমভাবে গ্রহণ ও পরিপুষ্ট করিয়াও জাপানী জাতি নিজস্ব "জাপানী বৈশিষ্ট্য" পরিত্যাগ না করিয়া কিভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহাই এশিয়ার অন্য জাতির পক্ষে শিক্ষণীয়। স্বামীজী দীর্ঘকাল পূর্বে এই জাতির জাগরণ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া ইহাদের অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। জাপানী কর্মকৌশল ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিত হইলে ভারত একটি আদর্শ আধুনিক জাতিতে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। ভারত-সম্পর্কে জাপানের জিজ্ঞাসা ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। ভারতবর্ষ এই সুযোগ গ্রহণ করিলে উভয় জাতির পক্ষেই কল্যাণকর হইবে।

"...জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথার উদয় হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ ক'রে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্য স্বরূপ।..."

[স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী হইতে]

শ্রীরামকৃষ্ণের বরাভয় মূর্তি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনন্ত ভাবময় মহাজীবন অভিনিবেশসহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ ক্ষণে ও স্থানে তাঁর মধ্যে বিশিষ্ট ভাব সমূহ প্রকটিত। শ্যামপুকুর-বাটীতে অবস্থান-কালে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৺শ্যামাপূজা-দিবসে তাঁর মধ্যে আদ্যা-শক্তি শ্রীশ্রীকালীর অতুল মাধুর্যমণ্ডিত 'বরাভয়'-রূপের মহাপ্রকাশ ঘটে। অপূর্ব আধ্যাত্মিক রহস্যে পরিপূর্ণ এই অভিনব ঘটনাটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ (দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (তৃতীয় ভাগ) ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—এই তিনটি প্রামাণিক গ্রন্থেই সবিস্তার বর্ণিত রয়েছে।

চিকিৎসার্থ উত্তর কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে ৫৫এ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবস্থান করছেন, ৺কালীপূজা সমাগতপ্রায় দেখে ভক্তবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ইচ্ছা হ'ল ঐ বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা করবেন। নিজ গৃহে প্রতিমায় কালীপূজা করার বাসনা পূর্বেও তাঁর হয়েছিল। কিন্তু এযাবৎ তাঁর ঐ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। তাই তিনি ভাবলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্যামপুকুর-বাটীতে ঐ পূজা করতে পারলে পরম আনন্দ হয়। কিন্তু উহাতে ভক্তগণ অমত করেন, কারণ ঐ বাটীতে পূজানুষ্ঠানাদি হ'লে গোলমালে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সকলের সিদ্ধান্তে দেবেন্দ্রনাথ নিরাশহৃদয়ে তাঁর শুভ বাসনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু—

'কালীপূজা কাছে কাছে আসিয়াছে প্রায়।
ডাকাইয়া মাষ্টারের কহিলেন রায়॥
অমাবস্যা-যোগে কালী-পূজা প্রয়োজন।
যুক্তি-যুক্ত লয় মনে কর আয়োজন॥
মাষ্টার মহেন্দ্রনাথ পরম উল্লাসে।
সেই কথা বলিলেন কালীপদ ঘোষে॥' —পুঁথি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট দেবেন্দ্র তাঁর ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ না করলেও অন্তর্যামী প্রভুর তা জানতে বাকী রইল না। তিনি অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। কত ভক্তের কত আশা-আকাঙ্ক্ষাই না তিনি অভাবনীয় উপায়ে পূর্ণ করেন। আশাতীত-রূপে ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই মনে হয় তিনি ৺কালীপূজা সমাগত-প্রায় দেখে শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয় প্রমুখ কতিপয় ভক্তকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজার্চনার উপকরণাদি সংক্ষেপে সংগ্রহ করতে বললেন। মাষ্টার মহাশয় পরম উল্লাসভরে ঐ সংবাদ ভক্তবর শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ (দানা কালী) মহাশয়কে জানালেন। অতি সন্নিকটেই শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে কালীপদ ঘোষের বাটী। সুতরাং সানন্দে তিনি পূজার উপকরণসমূহ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করলেন।

'তত্ত্বাবধায়ক কালী এখানে বাসায়।
প্রয়োজন যাহা হয় আনিয়া যোগায়॥
প্রভুদেব আখ্যা তাঁরে দিলা 'ম্যানেজার,'
নরেন্দ্র দিলেন পরে 'দানা' নাম তাঁর॥

* * *

আনন্দেতে কালীপদ আটখানা হ'য়ে।
পূজার জোগাড় করে দিনপানে চেয়ে॥' —পুঁথি

পূজা ষোড়শোপচারে, দশোপচারে না পঞ্চ-উপচারে হবে,—প্রতিমায়, পটে না ঘটে হবে—অন্নভোগ হবে কি হবে না—এ সমস্ত বিষয়ে ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হ'তে কোনো নির্দেশ পান নি। সুতরাং ঐ সকল বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হ'ল। অবশেষে স্থির হ'ল, শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বলেছেন, 'সংক্ষেপে'—তাহলে আপাততঃ পঞ্চোপচারের পূজার জন্য গন্ধ পুষ্প

ধূপ দীপ এবং ফলমূলমিষ্টান্নাদির আয়োজন করা হোক, পরে তিনি যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা আজ্ঞা করবেন সেইরূপ করা হবে।

ক্রমশঃ শ্রীশ্রীকালী-পূজাদিবস উপস্থিত হ'ল—৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। সকাল থেকেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীজগন্মাতার ভাবে ভাবস্থ, কখনও হঠাৎ চমকিত হচ্ছেন, আবার কখনও বা বাহ্যজ্ঞানশূন্য, একেবারে সমাধিস্থ। তিনি মাষ্টার মহাশয়কে বলেছিলেন, ঠনঠনের ৺সিদ্ধেশ্বরী কালী মাতাকে পুষ্প ডাব চিনি সন্দেশ দিয়ে সকালে পূজা দিতে। মাষ্টার মহাশয় অতিশয় শুদ্ধাচারে ৺মায়ের পূজা দিয়ে সকাল প্রায় নয়টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য প্রসাদ ও নির্মাল্য এনেছেন। মাষ্টার মহাশয় এসে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব দ্বিতলে দক্ষিণের ঘরে সহাস্যবদনে ভাবস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র, ললাটে চন্দনের ফোঁটা এবং শ্রীপদে চটি জুতা। পাদুকা খুলে অতিশয় ভক্তিভরে তিনি ঐ প্রসাদ কিঞ্চিৎ নিজ মুখে এবং কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ মতো মাষ্টার মহাশয় রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানের দুটি বইও কিনে এনেছেন। এই বই দুটির কয়েকটি গান শ্রীশ্রীঠাকুর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে শুনাবেন।

আজ শ্রীশ্রীকালীপূজা ; তাই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৺জগন্মাতার ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে রয়েছেন। পূজ্যপাদ কথামৃতকার শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ তন্ময়তার বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন—"ঠাকুর হঠাৎ চমকিত হইতেছেন। অমনি পাদুকা খুলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন ; একেবারে সমাধিস্থ। আজ জগন্মাতার পূজা, তাই কি তিনি মুহুর্মুহুঃ চমকিত ও সমাধিস্থ! অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যেন অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন।"

তখন বেলা প্রায় দশটা। শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বিতলে নিজ কক্ষে বিছানার উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে আছেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন, কালীপদ, রামচন্দ্র, মাষ্টার-মহাশয় প্রমুখ ভাগ্যবান ভক্তগণ ঐ ঘরে উপস্থিত রয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর মাষ্টার-মহাশয়কে বললেন—"আজ কালীপূজা, কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার ব'লে এস। পাঁকাটী এনেছে কি না, জিজ্ঞাসা কর দেখি।" মাষ্টার-মহাশয় বৈঠকখানায় গিয়ে ঠাকুরের আদেশ ভক্তগণকে জানালেন। শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ ও অন্যান্য ভক্তগণ পূজার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

"কাহারো আদতে এটি আসিল না মনে।
ঘট কিংবা পট কি প্রতিমা আনয়নে॥
অথচ সকলে জানে প্রভু গুণমণি।
কালীপূজা করিবেন আপনিই তিনি॥"—পুঁথি

পূজার আয়োজন কিরূপ হবে সে বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করার কোনো কথাই ভক্তগণের মনে এল না। বেলা প্রায় দুইটার সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখতে এসেছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, নিরঞ্জন, লাটু, গিরিশ, কালীপদ, নীলমণি, মাষ্টার, মণীন্দ্র এবং আরও অনেকে উপস্থিত রয়েছেন। ডাক্তারের সঙ্গে অসুখ ও ঔষধ-পথ্যাদি বিষয়ে একটু কথাবার্তা হ'লে পর শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে ডাক্তারকে বলছেন—'তোমার জন্য এই বই এসেছে।' মাষ্টার মহাশয় ঐ বই দুটি ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার গান শুনতে চাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে মাষ্টার এবং আর একজন ভক্ত কয়েকটি রামপ্রসাদী গান গেয়ে শুনালেন। ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ পরে বিদায় নিলেন।

ক্রমে সূর্যাস্ত হয়ে সন্ধ্যা হ'ল। সমস্ত বাটী দীপালোক-মালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখন রাত্রি প্রায় সাতটা। শ্রীশ্রীঠাকুর স্থিরভাবে শয্যায় উপবিষ্ট রয়েছেন, শ্রীযুক্ত কালীপদ প্রমুখ ভক্তগণ তাঁর শয্যাপার্শ্বে পূর্বদিকে কিছুটা স্থান গঙ্গাজলে মার্জনা

করলেন এবং সেই স্থানে পূজার জন্য সংগৃহীত উপকরণগুলি এনে সাজিয়ে দিতে লাগলেন।

'ফুলুকা ফুলুকা লুচি সুজির পায়েস।
নূতন খেজুর গুড়ে গোল্লা সন্দেশ॥
সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।
বিল্বপত্র গঙ্গাজল ধূপ দীপ ফুল॥
যাবতীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করি ঘরে।
শুভক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে॥
অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।
সুজির পায়েস আনে তাঁহার গৃহিণী॥'—পুঁথি

রক্তজবা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প, মাল্য, বিল্বপত্র, দূর্বা, চন্দন, ধূপ, দীপ, গঙ্গাজল, ভোগের নৈবেদ্য, ডাব, তাম্বূল প্রভৃতি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে রাখা হ'ল। ধূনা আনা হয়নি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর ধূনা আনতে আজ্ঞা করলেন। ধূপ, দীপ, ধূনা, মোমবাতি প্রভৃতি প্রজ্বালিত হওয়ায় গৃহ সৌরভে আমোদিত ও আলোক-মালায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'দুইটি মোমের বাতি দিলা দুই পাশে।
আসনে শ্রীপ্রভুদেব বসিলেন শেষে॥'—পুঁথি

স্থিরভাবে আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীজগন্মাতার ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান রয়েছে অথচ বহুক্ষণ নিঃস্পন্দভাবে বসে রয়েছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, রাম, গিরিশ, কালীপদ, মাষ্টার (শ্রীম কথামৃত-কার), দেবেন্দ্র, ছোট নরেন, চুনীলাল, অক্ষয় (পুঁথিকার), বিহারী প্রমুখ প্রায় ত্রিশজনেরও অধিক ভক্ত ঐ গৃহে উপস্থিত। কিন্তু গৃহমধ্য এরূপ নিস্তব্ধ ও নীরব যে একেবারে জন শূন্য বলে বোধ হচ্ছে। ভক্তগণও জগন্মাতার চিন্তা করছেন।

'মহা রঙ্গ ঠাকুরের শুন মন দিয়ে।
আসনে বসিয়ে প্রভু স্থিরভাব হ'য়ে॥
ভাবে মগ্ন নন বাহ্য চেঁঠা* আছে গায়।
এইরূপে বহুক্ষণ গত হ'য়ে যায়॥

তখন গিরিশে কন রাম পেয়ে টের।
প্রভুর এ পূজা নয়, পূজা আমাদের॥
আমাদের পূজা প্রভু লইবার তরে।
অপেক্ষায় উপবিষ্ট আসন-উপরে॥'—পুঁথি

বাহ্য পূজাদি না ক'রে ঐভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুক্ষণ বসে আছেন দেখে কেহ কেহ ভাবলেন, তিনি হয়তো বা আজ আত্মপূজা করছেন। দক্ষিণেশ্বরে কখনও কখনও তিনি আপনাকে জগন্মাতার অভিন্ন বিগ্রহ-জ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্ম-পূজা করতেন। যাহোক, ভক্তবর রামচন্দ্র তখন গিরিশবাবুকে বললেন—'ঠাকুর আজ কৃপা ক'রে আমাদের পূজা গ্রহণ করবেন তাই বোধহয় অপেক্ষায় উপবিষ্ট রয়েছেন।' গিরিশ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভৈরবভক্ত। তাঁর "পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস", অর্থাৎ ষোল আনার উপরে আরো চার পাঁচ আনা বেশী বিশ্বাস। রামবাবুর মুখে ঐ কথা শোনা মাত্র গিরিশচন্দ্র পরম উল্লাসে ও মহা বিশ্বাসে অধীর হয়ে উঠলেন।

'বল কি' বলিয়া শ্রীগিরিশ মহাবলী।
'জয় মা' বলিয়া দিলা পায়ে পুষ্পাঞ্জলি॥
কালীর আবেশে মগ্ন তখনি গোঁসাই।
বরাভয় করদ্বয় অঙ্গে বাহ্য নাই॥
ক্রমে পরে যাবতীয় মহাভাগ্যবান্।
পুষ্পাঞ্জলি শ্রীচরণে করিল প্রদান॥
কেহ হাসে, কেহ নাচে উন্মত্ত হইয়া।
বীর দম্ফে লম্ফে কেহ ছাদ কাঁপাইয়া॥
আনন্দময়ীর ভাবে প্রভুদেব রায়।
মহা আনন্দের স্রোত ঘরে বয়ে যায়॥—পুঁথি

গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পুষ্পপাত্র থেকে মাল্য নিয়ে 'জয় মা' 'জয় মা' ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে প্রদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সমস্ত দেহ এক বিচিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের আবেগে শিউরে উঠল এবং বাহ্যজ্ঞান-হারা হ'য়ে তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। শ্রীঅঙ্গে জগদম্বার

* চেতনা

মহাবির্ভাবের আবেশে তাঁর শ্রীহস্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা ধারণ করল এবং দিব্য হাস্যফুল্ল মুখশ্রী অপূর্ব জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হ'ল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-কারের ভাষায়—'দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছেন। কি আশ্চর্য! ভক্তেরা অদ্ভুত রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল! দুই হস্তে বরাভয়! ঠাকুর নিস্পন্দ, বাহ্যশূন্য! উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ জগন্মাতা কি ঠাকুরের ভিতর আবির্ভূতা হইলেন। সকলে অবাক হইয়া এই অদ্ভুত বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার মূর্তি দর্শন করিতেছেন।'

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁর মধ্যে বরাভয়করা সর্বার্থ-সাধিকা সাক্ষাৎ জগন্মাতা শ্রীশ্রীকালিকাকে প্রত্যক্ষ ক'রে সকলে 'জয় মা' 'জয় মা' বলে পরম ভক্তি-ভরে তাঁর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন 'ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মময়ী' বলে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রেখে পুনঃপুনঃ প্রণাম করছেন। সকলে সমস্বরে 'জয় মা' 'জয় মা' ধ্বনি দিচ্ছেন। কেহ কেহ ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে ৺জগদম্বার স্তব-স্তুতি আরম্ভ করলেন।

একজন দেবী-বিষয়ক সঙ্গীত গাইতে শুরু করেছেন। তখন সকলে সমস্বরে তাঁর সঙ্গে গাইতে লাগলেন। গিরিশ, বিহারী, মাষ্টার প্রভৃতি একে একে দেবীর মহিমা কীর্তন ক'রে গান গাইছেন। ঠাকুর ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হ'লে তিনি পর পর—দুটি গান গাইতে আদেশ করলেন। গান দুটি: 'কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী' এবং 'শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।'

> 'কিছুক্ষণ পরে হ'ল ভাব অবসান।
> দশ বার আনা প্রায় অঙ্গে বাহ্যজ্ঞান॥
> কোন ভক্ত দেখি তাঁর উন্মীলিত নেত্র।
> শ্রীমুখে ধরিল তুলে পায়েসের পাত্র॥'—পুঁথি

এখন ক্রমশঃ ঐ ভাবের উপশম হ'তে লাগল। ধীরে ধীরে তাঁর প্রেমপূর্ণ উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় উন্মীলিত হ'ল। তখন ভক্তগণ তাঁকে নানাবিধ ফল সন্দেশ পায়েস মিষ্টান্ন পানীয় তাম্বুল প্রভৃতি নিবেদন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ নৈবেদ্য গ্রহণপূর্বক ভক্তগণকে প্রসাদ ক'রে দিলেন এবং তিনি তাঁদের ভক্তি-জ্ঞান-বিশ্বাসবৃদ্ধির জন্য শুভাশীর্বাদ করলেন। ভক্তগণ এখন পরম ভক্তিভরে সকলে তাঁর শ্রীচরণে প্রণত হলেন। তাঁরা বরাভয়মূর্তি ঠাকুরের ঐ পূজার নির্মাল্য আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করলেন কেহ বা আঁচলে অথবা রুমালে সযত্নে ঐ নির্মাল্য বেঁধে নিলেন। ভক্তগণ ভাবলেন, ঠাকুরের দেহ ও মনে শ্রীশ্রীজগন্মাতার আবির্ভাব হওয়ার ফলে তাঁর গলার ব্যথা সেরে গেছে। সুতরাং তাঁদের আনন্দের মাত্রা এতে আরও বৃদ্ধি পেল।

> 'আনন্দের স্রোতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি।
> সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি॥
> শ্রীপদে অঞ্জ'ল দেয়া কুসুমের হার।
> কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার॥
> কেহ বা সঞ্চয় হেতু বাঁধিল বসনে।
> কেহ বা গরব ভরে পরে দুই কানে॥
> কেহ বা ঢলিয়া পড়ে অপরের গায়।
> হৃদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহায়॥' —পুঁথি

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ঐ দিবসের ঘটনাবলী-বর্ণনার উপসংহারে লিখেছেন—"এইরূপে ভক্তগণ সেই বৎসর অভিনব প্রণালীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিয়া যে অভূতপূর্ব উল্লাস অনুভব করিয়াছিলেন তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাহাদিগের প্রাণে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে এবং দুঃখ-দুর্দিন উপস্থিত হইয়া যখনই তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে তখনই ঠাকুরের সেই দিব্য হাস্যফুল্ল আনন ও বরাভয় যুক্ত করদ্বয় তাহাদিগের সম্মুখে উদিত হইয়া তাহাদিগের জীবন সর্বদা 'দেব-রক্ষিত'—এই কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।"

পুঁথির কথা দিয়াই এ পুণ্য প্রসঙ্গ শেষ করি:

> 'কেবা কালী, কেবা প্রভু, না পারি বুঝিতে।
> কালীতে কেবল তিনি, মা কালী তাঁহাতে॥'

ইতিহাসের সরণী,—কালান্তর ও বর্তমান ভারত

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, এম্-এ

সমাজের যে পরিবর্তন হয়, এত বড় সত্যটাকে আমরা প্রায়ই অস্বীকার করিয়া বসি। অস্বীকার করি আবার 'সত্য, শিব ও সুন্দরের' নামে। আমাদের ধারণা 'সত্য, শিব ও সুন্দর' একমাত্র অতীতেই ধরা দিয়াছে। অথচ, সত্য কথা এই যে যুগে যুগে বিপুল পরিবর্তন সমাজ-জীবনের রূপান্তর সাধন করে—'সত্য, শিব ও সুন্দর' নূতনতর বিষয়-বস্তুর মধ্য দিয়া নব মাধুর্যের সম্বল লইয়া প্রকাশিত হয়।

বস্তুতঃ, গতির মধ্যেই আছে জীবন। জীবনের রহস্যকে করায়ত্ত করিতে হইলে ক্রমাগত পথ চলিতে হয়—বহু আয়াসে তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। আজ তাহা একরূপে অস্পষ্টভাবে ধরা দেয়, কাল তাহা পরিস্ফুট হয় অভাবনীয় সুন্দরভাবে। সেইজন্য, জীবনের অর্থ অনুসন্ধানে পথে পথে মানুষের অভিযান অনন্তকালের। সেই পথচলার মাধ্যম সমাজ। সমাজ-জীবন তাই মানুষের চলার সহিত সঙ্গতি রাখিতে—সেই প্রয়োজনের উপযোগী হইতে—ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনের কোথাও শেষ নাই। পথে পথে চলিতে মানুষের কোথাও থামিয়া পড়িবার উপায় নাই, থামিয়া পড়িলেই জীবনের জয় হইতে সে বঞ্চিত হইবে।

কিন্তু, আমরা ইহা দেখি না; কারণ দেখিতে চাহি না। একযুগে যাহা 'ভাল' বলিয়া মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে, আমরা তাহা চিরদিনের 'ভাল' বলিয়া জানিয়া বসিয়া আছি। স্রোতস্বতীর স্রোতোবেগ রুদ্ধ হইলেই যে পঙ্কিলতা তাহাকে অব্যবহার্য করিয়া তোলে, তাহা আমাদের প্রায়ই মনে থাকে না। সমাজ জীবনেও তাহার গতিবেগ প্রতিহত হইলে, উত্তরোত্তর নব নব ভাবধারা প্রবাহিত না হইলে রুদ্ধ স্রোতে নানা পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয়। 'ভাল'র যে শেষ নাই, ক্রমাগতই যে তাহাকে নূতন ও নূতনতর রূপে অনুভব করা চলে এবং এইরূপ না করিলে যে চলে না, নানা শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণে একযুগের 'ভাল' যে অপরযুগের 'মন্দ' হইয়া দাঁড়ায়—ইহা আমরা সহজে বুঝিতে চাহি না। আমাদের জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের ধারণা পরিবর্তিত হয়; পরিবর্তিত হয় জীবনের মূল্যবোধ এবং তৎসহ পরিবর্তিত হয় আর্থিক সংগঠন, রাষ্ট্র-গঠন, পরিবার, গোষ্ঠী, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা ও ধর্ম। আমরা তো শুধু হাত দিয়া সৃষ্টি করি না, করি মন দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, অনুভূতি দিয়া। হৃদয়ের নব নব অনুভূতি আমাদের জীবনযাত্রা-সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে নব নব পথের অনুসন্ধান দেয়। সেই সকল পথে না চলিয়া আমাদের উপায় নাই—থামিয়া থাকা মানে ধ্বংস হওয়া। কারণ, পরিবর্তনের ধারাই এইরূপ। একবার কোনও এক দিক দিয়া সে ভাঙন আরম্ভ হইলে তাহা দুর্নিবার বন্যার জলের মত ছুটিয়া চলে সকল বাধাবিঘ্ন প্রবল বেগে অতিক্রম করিয়া। তাহাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, প্রতিরোধের ফলও ভাল হয় না।

অতএব, পরিবর্তন সমাজের ধর্ম বলিয়া মানিয়া লওয়াই ভাল। অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই, এক যুগের নীতিশাস্ত্র সে যুগে যত সুফলপ্রদই হইয়া থাকুক না কেন, আর এক যুগে তাহা নানা দোষযুক্ত হয়। কোন এক সময়ে সমাজে একাধিক পতি গ্রহণ করিলে নারী নিন্দিত হইতেন না, কিন্তু, বর্তমানযুগে কে তাহা সমর্থন করিবে? জাতিভেদ-প্রথা যদি বা অতীতের ভারতবর্ষে জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া থাকে, আজ তাহা আমাদের উন্নতির পথে বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সন্দেহ নাই।

কিন্তু, এই সমাজ-পরিবর্তন আকস্মিকভাবে ঘটে না—একযুগের অভিজ্ঞতা আর এক যুগে একেবারে পরিত্যাজ্য হইয়া যায় না। যুগের পর যুগ, ধাপের পর ধাপ জুড়িয়া নির্দিষ্ট রীতি ও ক্রম অনুসারে সমাজের বিবর্তন অগ্রসর হয়। এক যুগের জীবন পূর্ববর্তী যুগের জীবনকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে নূতন ব্যাখ্যা দিয়া, নূতন মূল্য তাহার সহিত সংযোজিত করিয়া নবরূপ ধারণ করে। এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত সমাজ-শাস্ত্রবিৎ লোয়ীর নিম্নোক্ত সুচিন্তিত অভিমত বিশেষ অনুধাবনযোগ্য :

"That Social phenomena have evolved i.e. are derived from other social phenomena by a process of manifestation is a generally accepted proposition·········Our political institutions are the modified documents of British antecedents. Islamic matrimonial law evolved out of the Mahomedan custom, partly preserved and partly modified by the Prophet" (Lowie—Social Organisation—P. 33). সাম্যবাদী বিপ্লব-নেতা লেনিনের একটি উক্তিও এ সম্পর্কে প্রভূত আলোকপাত করিবে। লেনিন বলিতেছেন, "Soviet culture is not the invention of experts, but a logical development of the culture of the past.

পূর্ববর্তী সমাজ-জীবনে প্রাপ্ত সত্যকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন নাই গতিধর্মে একান্ত আস্থাবান এই মানুষটি। এবং পূর্বতন ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ হইতেও যে মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহ করা উচিত—তাহাও উল্লেখ করিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এমনকি যাহারা এই সম্পদকে অগ্রাহ্য করিতে চাহিয়াছে, তাহাদের তিনি কঠোর ভাষায় নিন্দাও করিয়াছেন। তাঁহার এ বিষয়ে সুদৃঢ় মত V. Novikov এবং G. Silkin ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন :

"Lenin relentlessly frayed the so-called Proletkultists, who spurned the finest cultural creations of the past on the grounds that they were produced in a slave-owning, landlord or bourgeois society. He called them utopians, detached from real life, and said that their queer 'ideas' were capable of doing irreparable damage to the Soviet state and people" (Soviet Literature-Vol 1, 1951).

অগ্রগতি অসম্ভব, যদি না সমগ্র অতীত অভিজ্ঞতাকে আয়ত্তাধীন করা যায়। অতীত অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কে বর্তমানকে গড়িয়া তুলিতে পারে? কোনও সমাজ-সংগঠনকারীই মানব-জীবনের এই সহজ সত্যকে অস্বীকার করিতে পারেন না। বহু সাধনায় যে সম্পদ লাভ করা গিয়াছে তাহা অস্বীকার করা বাতুলতা মাত্র।[১]

সমাজ-জীবনে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়ই পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু বিভিন্ন শক্তির স্বকীয় পরিণতির মাধ্যমে মাঝে মাঝে তাহা একটি ভারসাম্য অবস্থায় (Equilibrium এ) উপস্থিত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের এই রীতি বিশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু, এই সাম্যাবস্থা সর্বতোভাবে আপেক্ষিক। সমাজ-জীবনে কোনও একটি অংশে পরিবর্তন শুরু হইলে পুরাতন সাম্যাবস্থা টিকিয়া থাকিতে পারে না। তখন নূতন অবস্থার সাম্য বা ইকুইলিব্রিয়ামের দিকে সমাজ অগ্রসর হয়। অর্থাৎ সমাজ-জীবনে সাম্যাবস্থার অবস্থান পরিবর্তনশীল (shifting)। এই সাম্যাবস্থার স্থায়িত্ব অবস্থাভেদে দীর্ঘকালীন বা স্বল্পকালীন। সাম্যাবস্থার স্থিতিকালে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-প্রণালী (Social controls) এবং আদর্শ-সমষ্টি (Social norms)

১ "A Society without a knowledge of the past which has made it, would be lacking in depth and dignity" University Commission's Report 1949,—P. 56.

গড়িয়া ওঠে। এবং এই স্থিতি যত দীর্ঘকালীন হয়, তত এই আদর্শ-সমষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠে দৃঢ়বদ্ধ প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমাজ-জীবনে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে আর্থিক রাষ্ট্রিক প্রভৃতি শক্তির সংঘাতে আর কিছুটা ঘটে সচেতন প্রয়াসের দ্বারা। মানুষ মননশীল জীব ; সে তাহার অতীতকে বিশ্লেষণ করিতে পারে, ভবিষ্যতের কল্পনা করিতে পারে এবং সেইজন্য বর্তমানকেও নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াস করিতে পারে। এইজন্য আমরা বিভিন্ন দেশের সমাজ-বিবর্তন ধারার মধ্যে পার্থক্য দেখি। সকল দেশে সমাজ বিবর্তন একই প্রথা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় নাই। যথা ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুরূপ প্রথা পৃথিবীর অপর কোথায়ও সমাজ-জীবনে দেখা যায় নাই। আবার সামন্ততন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে —অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রের পূর্ণ পরিণতির পূর্বেই সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। সচেতন প্রয়াসের বিভিন্নতায় সমাজ-বিবর্তনের রূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে।

আজ ভারতীয় সমাজ-জীবনে নানা পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটিতেছে। অনেকেই সেদিকে চক্ষু বুজিয়া 'স্বস্তি' অনুভব করিবার প্রয়াস পাইতেছি ; কেহ 'দেশ গেল,' 'ধর্ম গেল,' 'সব গেল' ভাবিয়া প্রাণপণ প্রতিরোধের প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু, পরিবর্তনের স্রোতোবেগ তাহাতে রুদ্ধ হইতেছে না, হইবেও না। আবার একদল পরিবর্তনের স্রোতোবেগে গা ভাসাইয়া দিয়াছে ; তাহার গতি-প্রকৃতি পরিচালনায় যে সচেতন প্রয়াসের কোনও মূল্য আছে, তাহাও স্বীকার করিতে চাহিতেছে না। কিন্তু, তাহাতে যে কল্যাণকর অনেক কিছুই হারাইয়া যাইতে পারে, এমনকি জাতীয়-ভাঙন (national disintegration) আরম্ভ হইতে পারে, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিতেছি না। অন্ধের মত পথ চলার কৃতিত্ব কি ? পথ হইতে বিপথে উত্তীর্ণ হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হওয়ার সম্ভাবনাই তাহাতে প্রকট হইয়া উঠে না কি ?

পুরাতন ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের ভিত্তি ছিল (১) বর্ণাশ্রম বিভাগ (২) যৌথ-পরিবার-প্রথা (৩) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। ইংরেজ-আগমনের সঙ্গে, যখন হইতে শিল্প-প্রধান ধনতন্ত্রের প্রসার এদেশে আরম্ভ হয়, এ সকল ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। কৃষিকর্ম আজ commercialised অর্থাৎ বাণিজ্য-প্রধান হইয়াছে, তাহার ফলে গ্রামের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা বিনষ্ট হইয়াছে। বর্ণবৈষম্যের মধ্যে অর্থনৈতিক জীবনের যে মেরুদণ্ডটি স্থাপিত ছিল তাহাও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সুপণ্ডিত সমাজতত্ত্ববিদ্ শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয় তাঁহার 'হিন্দু সমাজের গড়ন' নামক পুস্তিকাতে ইহার একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ দিয়াছেন।[২] এখন আর জাতিভেদ কুলগত কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ইহা এখন একটি অর্থহীন জন্মগত প্রথায় পরিণত হইয়াছে। আহার-বিহারেও আজ আর উচ্চকোটি সমাজে ইহা নিয়ন্ত্রণশীল নহে। শুধু তাহাই নহে, আর্থিক জীবনে শ্রমিক-প্রবাহে বাধার (immobility) সৃষ্টি করিয়া ইহা বিষম অনিষ্ট সাধন করিতেছে। একই কারণে আজ যৌথ-পরিবার প্রথাও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। যৌথ-পরিবার প্রথা কৃষি-সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্প-প্রধান সমাজে ইহা অচল। পূর্বে জমির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত বলিয়া সকলে একত্র থাকিত, এবং একত্রীভূত জমিতে বৃহদায়তনে (large-scale) চাষ চলিত। কিন্তু, বর্তমানে একই পরিবারের কেহ বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলে, কেহ দিল্লীতে সরকারী দপ্তরে, কেহ আবার কলিকাতায় পাটের কলে চাকরি করে। এ অবস্থায় যৌথ-

২ শ্রীনির্মলকুমার বসু প্রণীত হিন্দু-সমাজের গড়ন—দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়।

পরিবার-প্রথা সংরক্ষণ সম্ভবও নয়, তাহা সংরক্ষণে সার্থকতাও কিছু নাই। ইহা ছাড়া, প্রত্যেকের কুলগত বৃত্তি নষ্ট হওয়ায় জীবিকারও স্থায়িত্ব নাই। এইজন্য একে অপরের দায়িত্ব লইতে একেবারে অক্ষম। গৃহলক্ষ্মী কন্যা-বধূদেরই ভার লইতে পরিবারস্থ পুরুষেরা আজ অক্ষম হইয়াছে, জীবিকা অন্বেষণে মেয়েদেরও গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। ইহাতে শুধু যৌথ পরিবার-প্রথাই নয়, পরিবার-প্রথারই মূলে আঘাত পড়িতেছে।

আজ যৌথ-পরিবার-প্রথার স্থলে একক পরিবার-প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজে বর্ণের ভিত্তিতে জাতিভেদের দৃঢ়মূল উচ্ছেদের পথে। অর্থের ভিত্তিতে শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে। শ্রেণী-সংগ্রামও প্রকট হইয়া উঠিতেছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে, স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস পাইতেছে। এই বিপুল পরিবর্তন আর্থিক জীবনের পরিবর্তনের মাধ্যমে আসিয়াছে। এবং এই পরিবর্তনের ফলে পূর্বের মূল্য-বোধ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, সমাজ-নিয়ন্ত্রণ সকলই পরিবর্তিত হইতেছে। ভাবজগতে, জীবনাদর্শে, সাংস্কৃতিক জীবনেও তাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, সমগ্র দেশের মধ্যে এক বিপুল সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত পূর্বতন সাংস্কৃতিক কর্মের বিরোধ ও সংঘর্ষ প্রকট হইয়া উঠে। এই সঙ্ঘাতে সচেতন হইয়া ওঠে জাতির চিত্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নব যুগের সাংস্কৃতিক রূপ-মণ্ডলে একটি সচেতন প্রয়াস স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়।

ইংরেজ-আগমনের আদিকালে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ বণিক-সমাজের সংস্পর্শে বাংলা-দেশে এক অপূর্ব বস্তুর উদ্ভব হইয়াছিল। সাম্প্রতিক কালের খ্যাতিমান্ গবেষক শ্রীবিনয় ঘোষ তাহাকে কলকাতা 'কালচার' আখ্যা দিয়াছেন।[৩] সে অপূর্ব বস্তু না ভারতীয় না ইওরোপীয়। কিন্তু, তাহাতে ভারতীয় সমাজের ও ইওরোপীয় সমাজের যা কিছু অপকৃষ্ট তাহার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এক কথায় তাহা ছিল অশিক্ষিত বর্বর শাসক-সম্প্রদায়ের ও আত্মবিশ্বাস লুপ্ত শাসিতদের নির্লজ্জ নীতিহীন জীবন ধারার এক বিচিত্র সংযুক্ত প্রবাহ। তাহার মধ্যে গর্ব করিবার মত, আজিকার দিনে মূল্যবান বলিয়া দাবি করিবার মত বস্তু যৎসামান্যই আছে। এই নীতিহীন সংস্কৃতির প্রত্যুত্তরেই সম্ভবতঃ উনিশ শতকে এক নূতন জাতীয়তার অভ্যুত্থান দেখা গেল। রামমোহনের আবির্ভাব ঘটিল। উন্নত জীবনের সে অমৃত-ফল ইওরোপখণ্ড লাভ করিয়াছিল, তিনি তাহা দুই হাত প্রসারিত করিয়া এ দেশের জন্য বরণ করিয়া নিলেন। বিচার ও বিশ্লেষণপূর্বক ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের মূল্য নির্ধারণ করিয়া সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে এক প্রবল প্রবাহে দুর্নীতির পসরা ও অপকৃষ্টতার অনেক চিহ্ন ভাসিয়া গেল। 'কলকাতা কালচারের' এক নব রূপায়ণ আরম্ভ হইল। কিছুদিনের মধ্যেই সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-প্রসারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তরের পরিকল্পনা জ্ঞানদৃষ্টিতে লাভ করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার সাধনায় নবযুগের রূপ-মণ্ডলের কাজ বহু দূর অগ্রসর হইল। ঠিক এই শুভ মুহূর্তে কোন অদৃশ্য ভাগ্যবিধাতার নির্দেশে আবির্ভূত হইলেন ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ ও নূতন যুগের পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দ। অতীত ভারতবর্ষের সমগ্র সাধনা ও ঐতিহ্য ঘনীভূত হইয়া মূর্ত হইল শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়ী, বিজ্ঞান-বিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই নূতন যুগের

৩ শ্রীবিনয় ঘোষ রচিত 'কলকাতা কালচার' পুস্তকের তথ্যপূর্ণ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রতিনিধি। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করিলেন। পরে নূতন যুগের সকল জিজ্ঞাসার ও প্রয়োজনের কষ্টি পাথরে তিনি পুরাতন সমাজের ও জীবনাদর্শের ও মূল্য-সমষ্টির বিচার করিয়া যুগোপযোগী আদর্শ, মূল্য ও ভাবধারার রূপ-মণ্ডন করিলেন। তিনি যাহা সাধন করিলেন তাহাতে নূতন কালের সকল শক্তির সংহতি ঘটিল এক অপূর্ব নূতন চিন্তা পদ্ধতিতে; কিন্তু, তাহা সমগ্র অতীতকেও আত্মসাৎ করিয়া রূপ গ্রহণ করিয়াছে। নবীনের এই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির ফলে আমরা আমাদের সংস্কৃতি-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইলাম, নব সমাজ নূতন মূল্যমান লাভ করিল।

কিন্তু, তাহার সুদূর-প্রসারী, দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রভাব আজিও সমাজ-দেহের সর্বত্র সমান ভাবে ব্যাপ্ত হয় নাই। আজিও অনেক অর্থহীন পুরাতন প্রথা আমাদের সমাজ-অঙ্গকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। আবার কোন কোন দিকে অপ্রতিহত-গতি অতি দ্রুত ভাঙন সর্বনাশকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের যে সেজন্য বিশেষ সচেতনতার প্রয়োজন আছে, তাহাই বারবার স্মরণ করা প্রয়োজন।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আজও অর্থহীন, সার্থকতাহীন জাতিভেদ-প্রথা আমাদের জাতীয় জীবনে সম্প্রসারণশীলতায় বাধাস্বরূপ অবস্থান করিতেছে। আজিও জনসাধারণ—বিশেষ করিয়া পল্লী-অঞ্চলে অতি-মাত্রায় জাতি-সচেতন; এবং বৃত্তিগত সম্প্রসারণশীলতাও এই-জন্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণ-সন্তান যজন-যাজন-বৃত্তি দ্বারা জীবন-ধারণ না করিতে পারিলে কোনও প্রকার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, কিন্তু তবুও নিম্নতর বৃত্তি গ্রহণে সে সঙ্কুচিত। শহরাঞ্চলও এই মনোবৃত্তির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। অতি দুঃস্থ মধ্যবিত্ত ব্যক্তি শহরাঞ্চলেও কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ। সেখানেও 'আমি ভদ্রলোক, উচ্চবর্ণের সন্তান, এইরূপ ছোট কাজ কি করিয়া করি'—এইরূপ উক্তি প্রায়ই শোনা যায়। নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার আর হয়তো ব্রাহ্মণোচিত যজন-যাজন বৃত্তিতে স্পৃহা নাই। সেদিক হইতে তাহার মূল্য-বোধ পরিবর্তিত হইয়াছে; তাহার পরিবর্তে সে সামান্য বেতনে বুদ্ধিজীবীর যে কোনও বৃত্তি গ্রহণে উৎসুক, কিন্তু কায়িক পরিশ্রম তাহার পক্ষে পরম লজ্জার বস্তু বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ জাতি- ও বর্ণ-ভেদ সম্বন্ধে মূল্যবোধের যে পরিবর্তন আমাদের ঘটা উচিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ঘটে নাই। পরিবর্তনের ধারা এখানে কেমন করিয়া যেন পিছাইয়া গিয়াছে, অগ্রগতির ধারার সহিত তাল রাখিয়া সমাজ এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইংরেজীতে ইহাকে 'social lags' বা 'সামাজিক পিছিয়ে-পড়া' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

অবশ্য, ইহার কারণ আমাদের শহর ও গ্রামের মধ্যে পরিবর্তনের পার্থক্য। শহরাঞ্চলে পরিবর্তন অতিশয় দ্রুত গতিতে ঘটিতেছে, গ্রাম্যজীবনে শিল্পায়ন-ক্রিয়া না পৌঁছানোয়, তাহার পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটিতেছে। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বহুলোক শহরাঞ্চলে কর্ম-সংস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, গ্রাম হইতে যাহারা আসিতে পারে নাই, তাহাদের আর্থিক জীবনের দৃঢ় ভিত্তি দুর্বল হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি পুনর্গঠনের অভাবে সামাজিক জীবনে তাহারা এক অতি দূর অতীতের বিস্মৃত জীবনের রুদ্ধ কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছে। নূতন ভাবধারা, নূতন শিক্ষাদীক্ষা সেখানে প্রবেশ লাভ করে নাই; তাহারা সেই দূর অতীতের, আজিকার জীবনের অনুপযোগী সামাজিক নিয়ন্ত্রণনীতি (Social control) এবং আদর্শ ও মূল্য-সমষ্টি (Social norms) আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে পরিবর্তনের গতি অতি দ্রুত,

প্রতি দশ বৎসরে বোধহয় যুগান্তর ঘটিতেছে। ফলে শহর ও গ্রামের বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে। ইহা জাতীয় জীবনের পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে। গ্রামবাসীর কাছে শহর-বাসীরা অদ্ভুত জীব, ও ভাবাদর্শ আচার-আচরণের পার্থক্যের দরুণ তাহারা নিদারুণ ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের পাত্র। যে উন্নতির পরিকল্পনা আমরা অতি আগ্রহের সহিত একের পর এক করিয়া চলিতেছি, তাহার সহিত তাহাদের আত্মিক যোগ ও সহযোগিতা এইজন্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

গ্রামবাসীরা পুরাতন কুলগত বৃত্তিই শুধু হারায় নাই, তাহাদের কুলগত শিক্ষাও হারাইয়া গিয়াছে। গ্রামজীবনের এই একদিকে খুব ভাঙন লাগিয়াছে। নূতন কালের শিক্ষাও তাহাদের দ্বারে পৌঁছায় নাই। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইহার ফল বিষময় হইয়াছে। গ্রামের বহু শিল্পী-সম্প্রদায় শিল্প-কুশলতা ভুলিয়া গিয়াছে; বহু শিল্প লোপ পাইয়াছে। এই পশ্চিম বঙ্গেই সুদক্ষ 'পটুয়া'-শ্রেণী লুপ্তপ্রায়। গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ ও লোকশিক্ষার অঙ্গ এবং লোকশিক্ষার মাধ্যম যাত্রাগান, কথকতাও ক্রমশঃ অবনতি ও বিনষ্টির পথে চলিয়াছে। বহু লোক-উৎসব লুপ্ত হইয়াছে, বহু লোক-শিল্প ধ্বংস হইতেছে, বহু মূল্যবান ভাবধারা লুপ্তপ্রায়। গ্রাম-জীবনের এই ভাঙন রোধ না করিলে তাহা জাতীয় ভাঙনে পরিণত হইতে খুব বেশী সময় লাগিবে না। আমাদের শিল্পায়ন এত দ্রুতগতিতে সংসাধিত হইতেছে না যে, আমরা গ্রামকে আমাদের সমাজ-জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারি। তাহা ছাড়া শিল্প-প্রসার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিলেও আমাদের আর্থিক জীবনে কৃষিকর্মের ও কাজেকাজেই গ্রাম-জীবনের স্থান থাকিবেই। সেক্ষেত্রে গ্রাম-জীবনের এই সর্বাঙ্গীণ অবনতি ভীতির কারণ সন্দেহ নাই।

ইহার প্রতিকার করিতে হইলে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। পূর্বকালের ন্যায় বৃত্তি ও শিল্পগুলির দৃঢ় ভিত্তি চাই। আর চাই শিক্ষাপ্রসার, নূতন কালের নূতন আদর্শগত শিক্ষা। তবেই শহর ও গ্রামের এই বিষম অনৈক্য দূরীভূত হইবে ও গ্রাম-জীবনের ভাঙন প্রতিহত হইবে। শিল্প ও বৃত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। শহরকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের শিল্পজীবন যদি গড়িয়া উঠে, গ্রামগুলির আর্থিক দুর্গতির অবসান অসম্ভব হইবে না। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা অতি গুরুতর। কারণ গণশিক্ষার ভিত্তি জাতীয়তার উপর হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাতীয় শিক্ষা ব্যতীত অপর কোনও শিক্ষা জনগণের গ্রহণীয় নয়[৪]। বিদেশী ভাষা যতদিন শিক্ষা-পদ্ধতির মেরুদণ্ডস্বরূপ থাকিবে, ততদিন আমাদের শিক্ষা জাতীয় শিক্ষায় পরিণত হইতে পারে না; এবং বিদেশী শিক্ষার মাধ্যমে যতদিন শিক্ষা চলিবে, ততদিন শহর ও গ্রামের আত্মিক অনৈক্য কোনও মতেই যে ঘুচিবে না, ইহা সহজেই অনুমেয়। ইংরেজী ভাষার শিক্ষা মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রহণ করুক আপত্তি নাই, এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের জন্য তাহার একান্ত প্রয়োজনও আছে। কিন্তু তাহা কখনও শিক্ষার মেরুদণ্ড হওয়া উচিত নহে। তাহার পরিণাম শিক্ষার অসদ্ভাব। এ অতি আশ্চর্য,

৪ "Teach the masses in the vernaculars. Give them ideas! They will get informations but something more will be necessary. Give them culture. Until you can give them that, there can be no permanence in the raised condition of the masses". Swami Vivekananda, 'Education' P 62. পূর্বে শিক্ষা মুষ্টিমেয় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আজ তাহা সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ জনকতক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। এ উভয় অবস্থার ফল একই।

যে একটি সমগ্র জাতির শিক্ষা একটি বিদেশী ভাষার উপর নির্ভর করিয়া আছে। পৃথিবীর অপর কোনও দেশে এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভবতঃ নাই। শহর ও গ্রামের শিক্ষার মান এক করিতে হইলে শিক্ষাকে মাতৃভাষার ভিত্তির উপর গড়িতে হইবে ও সর্বতোভাবে জাতীয় শিক্ষায় পরিণত করিতে হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন শহর গ্রামের আত্মিক ঐক্য সংসাধিত হইবে না।

আমাদের ভারতীয় জীবনের অপর এক দিকেও কম সঙ্কট দেখা দেয় নাই। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে আমাদের নাগরিক জীবন যান্ত্রিক সভ্যতার নিয়মানুযায়ী অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল হইয়া উঠিয়াছে। শুধু দুই দুইটা মহাযুদ্ধ বর্তমান শতাব্দীতে যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত করিয়াছে তাহা শত শত বৎসরেও হইত কি না কে জানে। এই অতি দ্রুত পরিবর্তনের পরিণামও অতীব ভয়াবহ। ইহার ফলে সামাজিক সাম্যাবস্থা বা স্থিতি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কোনও সাম্যাবস্থা বা ইকুইলিব্রিয়ামই সে অবস্থায় সম্ভব হয় না, সমাজ-জীবনে "a state of perpetual disequilibrium" বিরাজ করে। তখন অতি প্রবলভাবে ওলটপালট ঘটে, যাহার পরিণাম বিশৃঙ্খলা ও এক নিদারুণ নৈরাজ্যিক অবস্থা। এ অবস্থায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক আদর্শ কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারে না; এবং আজিকার মূল্যায়ন, আজিকার আদর্শ কালই মহা ভ্রান্তিতে পরিণত হওয়ায়, ভাঙনের ছাপই মানুষের চিত্তে দৃঢ় হইয়া ওঠে। মানুষ কোনও আদর্শেই আর কোন আস্থা রাখিতে পারে না, কোনও কিছুতেই আর তাহার শ্রদ্ধা অর্পিত হয় না, অতীতের ঐতিহ্য তাহার কাছে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। সামাজিক আদান প্রদানও বন্ধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। শুধু যে তাহার মূল্য-মানে স্বার্থ ব্যতীত অপর কিছুই নাই—তাহা নহে, সমাজে পরিবারে কাহারও সহিত সম্প্রীতিও তাহার নাই। তা ছাড়া এই দ্রুত পরিবর্তনের তালে সকলে সমভাবে চলিতে পারে না। প্রত্যেকের বিশ্বাস, কর্ম, চিন্তা, ভাবধারা স্বতন্ত্র। সকলেই আপন অভিজ্ঞতার কোটরে আবদ্ধ, অন্য কাহারও সহিত তাহার অভিজ্ঞতার জগতে পরিচয়ও নাই। সেইজন্য সে বহুজনের মধ্যে থাকিয়াও একাকী, বহির্জগতে কোথাও তাহার আশ্রয় নাই। তখন তাহার একাকিত্ব ও নির্জনতা তাহাকে উন্মাদ করিয়া তোলে। এই একাকিত্বের অবসাদ তাহার সমগ্র জীবনে এমন ভয়াবহ ভার হইয়া ওঠে যে, তাহাকে এতটুকু বাঁচিবার সাধ বজায় রাখিবার জন্য ও এতটুকু আনন্দ সংগ্রহের জন্য বহু বিকৃত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যেখানে এইরূপ শুধু বাঁচিবার জন্য প্রতি মুহূর্তে উত্তেজনা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়, সেখানে নানারূপ স্নায়বিক রোগও অতি স্বাভাবিক। এইরূপ অশান্তি-পরিপূর্ণ হতভাগ্য মানব-জীবনের অবসান—হয় আত্মহত্যায়, না হয় উন্মাদ-আলয়ে। এ অবস্থায় সামাজিক ভাঙন ধ্বংসে না পৌঁছাইয়া থামে না।[৫]

আমাদেরও নাগরিক জীবনে সামাজিক ভাঙনের উপরোক্ত লক্ষণগুলি কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। আমাদের প্রাচীন সমাজে সামাজিক দায় দায়িত্ব নিয়ন্ত্রিত ছিল। সেই সকলের অতি অল্পই আজ অবশিষ্ট। নূতন করিয়া তাহার স্থলে তেমন বিশেষ কিছুই গড়িয়া ওঠে নাই। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যা ছিল দুইটি মহাযুদ্ধ ও দেশবিভাগের আঘাতের ফলে তাহাও ধ্বংসপ্রায়। শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্লাটফর্মে ও ফুটপাথ যাহাদের আশ্রয়, যাহারা আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরিয়া যাযাবর জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের জীবনে সামাজিক

৫ 'নির্জন পৃথিবী ও নিরাকার বুদ্ধিজীবী' (শনিবারের চিঠি—বৈশাখ, ১৩৬৪) শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে শ্রী বিনয় ঘোষ অতি তথ্যবহুল ও মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন।

নিয়ন্ত্রণ কতটা টিকিতে পারে? বাস্তুহারা মানুষের মনোজগৎ সামাজিক আদর্শ-সংরক্ষণের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। আজ আমাদের সামাজিক জীবনে স্বার্থসিদ্ধি, আরাম ও মুহূর্তের উত্তেজনায় বাঁচা—এ ছাড়া অন্য আদর্শই বা কোথায়? সাংস্কৃতিক জীবনে ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সর্বাঙ্গীণ অপকৃষ্টতার মধ্যে সুস্পষ্ট। সাহিত্য আজ প্রধানতঃ সিনেমার উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শিল্পের মধ্যেও সিনেমা-শিল্পই প্রধান। সিনেমার কোনও মূল্য সমাজজীবনে নাই, এ কথা বলা ভুল; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই শিল্পও যে অতিশয় অপকৃষ্টতা-দোষযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্য ও শিল্প জগতে আজ সাধনা লুপ্ত, মৌলিকতাও তাই পলাতক। সৃজনী প্রতিভা দিন দিন লুপ্ত হইতেছে। সর্বত্র দুর্নীতি, সর্বাঙ্গীণ নিকৃষ্টতা ও সর্বত্র ধর্মহীন, শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, সাধনাহীন একদল মানুষের অবাধ বিচরণ আজ সমাজজীবনের সর্বত্র প্রকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা যে শুভ লক্ষণ নহে তাহা বোধ করি ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। পরিণামে দেশ যদি উন্মাদাগারে ছাইয়া না যায় তো সে অতি আশ্চর্যের কথা।

এ ভয়াবহ পরিণাম হইতে রক্ষা চাই, মানুষ মাত্রেরই এই প্রার্থনা। কাজটি দুঃসাধ্য। কিন্তু আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের ঐতিহ্য তো আছে; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তা-সম্পদ তো আছে। অবশ্য এর মানে এই নয় যে অতীতের অভিমুখে ফিরিয়া যাইতে হইবে। 'ফিরে চল' বলিলেই ফিরিয়া চলা যায় না, এবং ফিরিয়া গিয়াই বা কি লাভ হইবে? পুরাতন জীবনে সবই যে ভাল ছিল তাহা নহে। অতএব সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য সচেতন প্রয়াস অবশ্যই করিতে হইবে। যে অভিজ্ঞতা-সম্পদ অতীতে লাভ করিয়াছি, তাহার সহায়ে অগ্রগামী জীবনকে ভূষিত করিয়া সংহত করিবার প্রয়াসের নামই তো সচেতন প্রয়াস। বিচারপূর্বক অগ্রসর হইলে মূল্যায়ন-দণ্ড আমাদের হাত হইতে চ্যুত হইবে না। সচেতন প্রয়াসের অর্থ পরিবর্তনের গতিরোধ নয়, তাহার অর্থ নব জীবনের রূপ-মণ্ডনে ইতিহাস-জ্ঞান ও ঐতিহ্য সম্পদসহ সহায়তা করা।

আজ প্রতিটি অসহায় মানুষকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমেই সাধ্য। শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তি হইবে সমাজের উপযোগী রীতি, নীতি ও আদর্শ। সামাজিক জীবন-গঠন তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন যান্ত্রিক ব্যাপারে পরিণত। তাহাকে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার ভিত্তি 'মানবিকতা' ও 'সামাজিকতা'র উপর হওয়া উচিত। শিক্ষার দ্বারা মানুষের মূল্যবোধে সামাজিক আদান-প্রদানের প্রধান স্থান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যে সামাজিকতা-বোধ হারাইয়া ফেলিয়া মানুষ মনুষ্যত্বহীন স্বার্থসর্বস্ব, আরাম-সর্বস্ব, আশ্রয়-হীন সঙ্গিহীন অমননশীল একটি জীবে পরিণত হইতেছে, সেই সমাজবোধই শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন হইলে অতীতের ঐতিহ্য স্মরণ করিতে হইবে। অতীতের জীবনে সামাজিক দায় দায়িত্ব অনুশীলন করিয়া তাহা হইতে যাহা কিছু গ্রহণযোগ্য, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত যে সকল শাশ্বত মূল্যের মধ্যে মানুষের সত্য পরিচয়, শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে তাহারা যেন স্থানচ্যুত না হয়—তাহাও দেখিতে হইবে। এ সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন (University Education Commission) একটি অতি সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন—"When there is a great empty space in the souls of man, supersitions fill the void. Belief in absolute values seems to be a condition of life". এ বিষয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁহারা পুনর্গঠন-পরিকল্পনা-কার্যে ব্রতী, যাঁহারা শিক্ষাদানে রত তাঁহাদের সচেতনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাঁহারা কি এ বিষয়ে অবহিত?

দূর ও নিকট

'অনিরুদ্ধ'

দূর ও নিকট মানুষেরি মনে—প্রীতির বিধানে চলে,
শতেক যোজন ক্ষণে আসে কাছে গাঢ় অনুরাগ-বলে।
মানুষের মন যদি চায় তবে ত্রিভুবনে রাখে ধরি,
উদাসীন হলে অতি পরিচিত নিমেষেই যায় সরি।

কালের গর্ভে বিলুপ্ত যারা মানুষের মনে রহে,
মানুষের ডাকে মৃত্যুশয়ন হতে তারা কথা কহে।
যাহারা এখনো আসেনি ধরায়—আগামীকালের ছায়া—
মানুষের মনে তারাও নাচিয়া রচিছে নিবিড় মায়া।

কোন্ সে অতীতে গাওয়া এক গান কখনো অলস সাঁঝে
পৃথিবীর শত কলরব ছাপি সে কেন সহসা বাজে?
কোন্ পথপাশে কাহারে একদা লেগেছিল বড় ভালো
যুগ যুগ পরে কত ভিড় ঠেলি সে কেন আনে রে আলো?

যদি ভালবাসো, প্রিয়জন তব দূরে কভু নাহি যাবে,
দেশ ও কালের বাধা লঙ্ঘিয়া তোমারি হৃদয়ে পাবে।
যদি অবহেলা, তামস দম্ভ প্রীতির বাঁধন কাটে—
নিকটের জনে হারাবে চকিতে এই সংসার-হাটে।

নিকটই সত্য, দূর শুধু ভ্রম সবারে নিকটে ডাকো
যত পার তাই, অবিচারে ঠাঁই সবাকার তরে রাখো।
প্রেমেরই সূত্রে অখিল সৃষ্টি গাঁথেন জগৎ-স্বামী
বিশ্ববীণায় মিলনেরই গীতি ধ্বনিছে দিবসযামী।

হারানো সহজ, পাওয়াই ভাগ্য, রাখা—সুকঠিনতর;
স্বার্থগন্ধ যদি রে মিলায় তবেই রাখিতে পারো।
তবেই সকল সুদূর সদাই থাকিবে নিকট হয়ে,
ঘুচিবে অন্ধ মোহের কালিমা জিনিবে মৃত্যুভয়ে।

দেখিবে অসীম কালের নৃত্য প্রতি মুহূর্তমাঝে
দেখিবে নিখিল রূপের আকার একটি প্রকাশে রাজে।
নাহি কিছু কালো, সকলি স্বচ্ছ শুভ্র জ্যোতির্ময়!
বিগতদ্বন্দ্ব শুদ্ধমানসে আপন-সত্তা রয়।

বৈদান্তিক যোগীর মহাপ্রয়াণ

[সাধু নিবৃত্তিনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী]

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর অন্যতম ত্যাগী শিষ্য সাধু নিবৃত্তিনাথজী গত ১৬ই শ্রাবণ, ১লা অগষ্ট, বৃহস্পতিবার সায়ংকালে গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ-মন্দিরে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। দেহে বার্ধক্যের কোন লক্ষণ ছিল না। নিজেকে তিনি ২৫ বৎসরের যুবক বলিয়া অনুভব করিতেন, এবং সেইভাবে চলাফেরা করিতেন। প্রতিদিন ৪ মাইল সবেগে হাঁটা তাঁহার নিয়মিত অভ্যাস ছিল। বাকী সময় তিনি বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলনে এবং ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মী ধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ-রসপানে অতিবাহিত করিতেন উপযুক্ত জিজ্ঞাসু পাইলে বেদান্ত-বিজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। অধিকার-অনুসারে সাধনার প্রণাল অনেককে শিক্ষা দিয়াছেন।

দেহত্যাগের দুই দিন পূর্বে বুকে একটু অস্বস্তি বোধ করেন। এক ভক্ত ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক-ভাবে হইতেছে না, কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। তিনি শুনিয়া যেন উল্লসিত হইলেন; সানন্দে আশ্রমের সব সাধুদের নিকট ঘোষণা করিয়া দিলেন, তাঁহার 'পূর্ণ বিশ্রামের' সময় উপস্থিত, গুরুজীর আহ্বান আসিয়াছে। দেহাসক্তি, ভোগাসক্তি ও কর্মাসক্তি হইতে তিনি অনেক কাল পূর্বেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; মৃত্যুভয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

তিনি প্রসন্নচিত্তে আসনে বসিয়া গেলেন। অবিরাম ব্রহ্মাত্মবোধের নিবিড় অনুশীলন চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে উপনিষদ্, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতির মহাবাক্যসমূহ উচ্চারণ করেন, অধিকাংশ সময় আপনার ব্রহ্মস্বরূপচিন্তনে ডুবিয়া থাকেন। সামনে কাহারা বসিয়া আছে, কী কথাবার্তা বলিতেছে, সেদিকে কোন খেয়ালই নাই। অর্ধনিমীলিতনেত্রে আপনার ভিতরে আপনি ডুবিতে লাগিলেন। প্রসন্নবদনে আনন্দের আভাস।

দেহে প্রাণক্রিয়া নিরুদ্ধ হওয়ার পূর্বে মনকে সম্পূর্ণরূপে দেহ হইতে বিমুক্ত করিবার জন্যই যেন ধীর প্রযত্ন চলিতে লাগিল। এই ভাবে দুই দিন কাটিল। হৃৎপিণ্ড যেন ধীরে ধীরে দুর্বল হইতে লাগিল, মহাত্মার চিত্তও যেন তৎসঙ্গে চৈতন্যে বিলীন হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীনাথজীর সান্ধ্য আরতি দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া চলে। আরতি যে মুহূর্তে শেষ হইল, সেই মুহূর্তে এই যোগী পুরুষের প্রাণক্রিয়াও নিরুদ্ধ হইল। আসনে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ছিলেন। মৃত্যুর মস্তকে পদক্ষেপ করিয়াই যেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বৈদান্তিক যোগী ব্রহ্মস্বরূপে পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিলেন।

পরদিন বেলা ১০টায় ভূগর্ভে সমাহিত করিবার সময় পর্যন্ত দেহ আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই রাখা হইয়াছিল, কেবলমাত্র চিবুকের নীচে একটি যোগদণ্ড দ্বারা মস্তকটিকে সমুন্নত রাখিতে হইয়াছিল; দেহে মৃত্যুর কোন লক্ষণ প্রকটিত হয় নাই। মহাযোগী যেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন! এইরূপই দর্শকবৃন্দের অনুভব হইতেছিল। বহু দর্শক সমবেত হইয়াছিল। সকলেই যোগীর অপূর্ব মহাপ্রয়াণ দেখিয়া নির্বাক বিস্ময়ে প্রণাম করিতে লাগিল। গুরুর সমাধি-মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে শিষ্যের দেহ সাম্প্রদায়িক রীতি-অনুসারে উপবিষ্ট ভাবেই সমাহিত করা হইল।

* * *

সাধু নিবৃত্তিনাথজীর পৈতৃক বাসভূমি ছিল পূর্ববঙ্গে ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরে। তাঁহার পিতা

৺শ্যামাচরণ গুহ ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন, বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ধনিপুত্র জিতেন্দ্রনাথ (তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম) যৌবনারম্ভে স্কুলে পড়িবার সময়ই তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় গৃহত্যাগী হন। তখন বাংলায় বিপ্লবের পথও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। ধনদৌলত, ভোগবিলাস, লেখাপড়া, মানসম্ভ্রম, কিছুই তাঁহার আকর্ষণের বস্তু ছিল না। সব ছাড়িয়া ঈশ্বরলাভই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হইল। ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই তিনি সংসারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

কোন উপায়ে গোপনে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া এবং কয়েকটি সমভাবাপন্ন বালককে সঙ্গী করিয়া তিনি সদ্‌গুরুর অন্বেষণে গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। নানা তীর্থস্থান ও সাধুদের তপস্যার স্থান ঘুরিয়া গোরক্ষপুর পৌছিলেন। সেখানে গোরক্ষনাথ-মন্দিরে যোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর অলোকসামান্য দিব্য মূর্তি দেখিয়াই তিনি তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। বালকের উন্নত অধিকার দেখিয়া যোগিরাজ তাঁহাকে দীক্ষাপ্রদান করিলেন, এবং কয়েক বৎসর পিতামাতার সেবা করিয়া এবং পড়াশুনার সহিত সাধনভজন করিয়া নিজেকে সন্ন্যাসের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য উপদেশ দিলেন। গুরুর আদেশে বালক গৃহে ফিরিলেন। পিতামাতার সেবা, ধর্মগ্রন্থপাঠ, ইন্দ্রিয়-মনের সংযম এবং গুরুদত্ত মন্ত্রের জপধ্যান, ইহাই তাঁহার কার্যসূচী হইল। পিতৃগৃহসংলগ্ন বাগানে এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহাতেই বাস করিতেন। বিনা প্রয়োজনে পরিবারস্থ কাহারও সহিত কোন সংযোগ রাখিতেন না। শহরের সর্ব প্রকার আন্দোলন হইতে তিনি দূরে থাকিতেন; গৃহে থাকিয়াও গৃহত্যাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

বালকপুত্রের তপস্যাময় সুসংযত জীবন দেখিয়া বৃদ্ধ পিতামাতার চিত্তেও আধ্যাত্মিক পিপাসা জাগ্রত হইল। পুত্র পিতামাতাকে গুরুসন্নিধানে উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদেরও গুরুকৃপালাভ হইল। পুত্রের মনে—ইহাই সর্বপ্রধান পিতৃমাতৃসেবা বলিয়া অনুভূত হইল। গুরুদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জিতেনকে বিবাহ করাইবে? অন্তর্যামীর প্রেরণায় স্নেহময় পিতা উত্তর করিলেন,—না, উহাকে আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম। সন্ন্যাস-গ্রহণে পিতার সাক্ষাৎ অনুমতিলাভ হইল। মাতাও তাহাতে সায় দিলেন। পিতামাতাকে গৃহে পৌছাইয়া দিয়া, তাঁহাদের আদেশ লইয়া পুত্র সন্ন্যাস-গ্রহণের উদ্দেশ্যে আবার গুরুর নিকট উপনীত হইলেন। দীক্ষালাভের কয়েক বৎসর পরে সন্ন্যাস লাভ হইলে তাঁহার নাম হইল নিবৃত্তিনাথ। তদবধি তিনি সর্বতোভাবে নিবৃত্তিমার্গের সাধক হইলেন।

যোগিরাজের অন্যতম বাঙ্গালী শিষ্য শান্তিনাথজীর সন্ন্যাসলাভ কয়েক বৎসর পূর্বেই হইয়াছিল। নিবৃত্তিনাথজীর সন্ন্যাসজীবনের শিক্ষার ভার শান্তিনাথজীর উপর শ্রীগুরু-কর্তৃক অর্পিত হইল। ইহার অল্পকাল পরেই ১৯১৭ খৃঃ মার্চ মাসে শ্রীগুরুর অন্তর্ধান হয়। নিবৃত্তিনাথজী জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শান্তিনাথজীর শিক্ষাধীনে থাকিয়া বেদান্ত-শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বেদান্তদর্শনের সকল মুখ্য গ্রন্থ তিনি গভীর মননের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' প্রভৃতি অনেক প্রকরণ-গ্রন্থের যুক্তিসমূহ তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। সন্ন্যাসজীবনে তাঁহার মেধা-শক্তির অপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শনসমূহে তো বটেই, পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই জ্ঞান-সাধনা ছিল তাঁহার সাধনার বহিরঙ্গ। তাঁহার সময় ও শক্তি মুখ্যতঃ নিয়োজিত হইয়াছিল অন্তরঙ্গ জ্ঞান-সাধনায়—নিবিড় ধারণা ধ্যান ও সমাধির অনুশীলনে। বহু বৎসর হৃষীকেশে ও হিমালয়ের অন্যান্য অনুকূল স্থানে লোকসঙ্গ পরিহারপূর্বক তিনি বৈদান্তিক ধ্যান-

যোগ-অভ্যাসে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আবু পাহাড়ে, নর্মদাতটে, সমুদ্রতীরে, নানা স্থানে তিনি সাধনা করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ সাধন দ্বারা তিনি তত্ত্বানুভূতির উচ্চস্তরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্‌ব্যতীত, ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে তিনি পরিব্রাজকভাবে পর্যটন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই গুরুর অনুমতি লইয়া তিনি শান্তিনাথজীর সহিত কৈলাস ও মানস-সরোবর গমন করিয়াছিলেন এবং অমরনাথ প্রভৃতি অনেক দুর্গম তীর্থও পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এই তেজস্বী সাধক যেমন অদম্য পুরুষকারের সহিত জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, সমাধি অভ্যাস করিয়াছেন, তেমনি তেজের সহিতই মৃত্যুকে জয় করিয়া ব্রহ্মলীন হইলেন।

আমার সুন্দর

শ্রীশান্তশীল দাশ

আমার সুন্দর আসে রাত্রি যবে নিস্তব্ধ নিঝুম,
কোথাও নেইকো সাড়া—নিদ্রামগ্ন শান্ত চারিধার।
আমি জেগে থাকি শুধু, আমার চোখেতে নেই ঘুম;
দু'টি চোখ ভরে দেখি সুবিশাল আকাশ অপার।

কী প্রসন্ন সুর ওঠে সুগভীর নৈঃশব্দের মাঝে;
প্রাত্যহিক জীবনের কোলাহল হতে বহু দূরে
নিয়ে যায় সেই সুর,—একটানা অবিশ্রান্ত বাজে;
সর্ব-গ্লানি-মুক্ত মন অনাহত সে প্রসন্ন সুরে।

সে-নির্জনে চেয়ে দেখি, আমার সুন্দর সমাসীন—
সে-বিরাট দৃশ্যপটে—একাকী আপন গরিমায়;
চেয়ে থাকি সবিস্ময়ে নিরুচ্চার কণ্ঠ বাণীহীন;
অপলক আঁখি দু'টি, শিহরণ জাগে সারা গায়।

আমার সুন্দর হাসে—করুণার ঝরে প্রস্রবণ;
অজস্র অশ্রুর ভারে ভারাক্রান্ত আমার নয়ন।

দেবীপূজার ধারাবাহিকতা

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে দেবীপূজা বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং ঋগ্বেদের দেবী-সূক্তে (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৫ সূক্ত) দেবীপূজার বীজ নিহিত রহিয়াছে। এই সূক্তে ঋষিকন্যা বাক্ পরব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তিকে উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন—'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং চিকিতুষী ...।' অর্থাৎ, আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনপ্রদাত্রী দেবী ও পরব্রহ্মশক্তি। ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তে (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৭ সূক্ত) দেবী ওঁকারময়ী, আবতী (সর্বত্র বিদ্যমানা), ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রী বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন। তিনি অমর্ত্যা, নিত্যা, অজ্ঞাননাশিনী, মোক্ষদাত্রী, পরমাত্মার কন্যা। রাতি (দদাতি) অভীষ্টং ইতি রাত্রিঃ, অর্থাৎ দেবী সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম রাত্রি। বৈদিক সাহিত্যে উমা, অম্বিকা, কাত্যায়নী, কন্যাকুমারী ও দুর্গার উল্লেখ দেখিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণ বৈদিক যুগ হইতে দেবীপূজার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করেন। বাজসনেয়ী সংহিতা (৩।৫) ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১।৮।৬।৪) রুদ্রের ভগ্নীরূপে অম্বিকার, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১৮) উমার, এবং উমাপতি ও অম্বিকাপতিরূপে রুদ্রের উল্লেখ আছে। সামবেদীয় কেনোপনিষদে (৩।২৫) স্বয়ং ব্রহ্ম উমা-হৈমবতীর রূপ ধারণ করিয়া বায়ু, অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অহঙ্কার নাশ করিয়াছিলেন এবং এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তি, সূর্য ও তাহার রশ্মি, দুগ্ধ ও উহার ধবলত্ব, মণি ও উহার জ্যোতি যেমনি অভেদ, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি তেমনি অভেদ। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ-উপনিষদে 'দুর্গা' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।' অর্থাৎ, আমি সেই পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট, অগ্নিবর্ণা, নিজের তাপে শত্রুদগ্ধকারিণী, কর্মফলদাত্রী 'দুর্গা' দেবীর শরণাগত হই। যে সুতারিণি, সংসারত্রাণকারিণি দেবি, তোমাকে প্রণাম করি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যাজ্ঞিকা উপনিষদের দুর্গা-গায়ত্রীটিতে আছে—'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।' বেদের ভাষ্যকার সায়ন বলেন, দুর্গি ও দুর্গা একই দেবী। দুর্গা শব্দের অর্থ—দুঃখেন (অষ্টাঙ্গযোগ-সর্বকর্মোপাসনারূপেণ ক্লেশেন) গম্যতে (প্রাপ্যতে) যা সা দুর্গা দুর্গমা দেবী ইতি। অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, শুদ্ধকর্ম ও উপাসনা প্রভৃতি তপস্যা দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায় তিনি দুর্গা বা দুর্গমা দেবী।

বাল্মীকি-কৃত রামায়ণে দেবীপূজার কথা নাই। কিন্তু কবি কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণে আছে, রাম ও রাবণ উভয়েই দেবীর ভক্ত। রাবণ-বধের জন্য রাম শরৎকালে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন।

দুর্গার উপাসনার প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ব্যাসকৃত মহাভারতের দুইটি দুর্গা-স্তোত্রে। এই স্তোত্র দুইটির একটি আছে বিরাট-পর্বে, আর অন্যটি ভীষ্মপর্বে। বিরাটপর্বের স্তোত্রে আছে—বিরাট নগরে প্রবেশ করিয়া যুধিষ্ঠির দেবী দুর্গাকে প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া দেবী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিয়া সাহায্য দ্বারা যুদ্ধে শত্রুবিনাশের এবং জয়লাভের আশ্বাস দিয়াছিলেন। এই স্তোত্রে বর্ণিত আছে—দেবী নন্দের

গৃহে যশোদার গর্ভে কংসবধের জন্য জন্মিয়াছিলেন। জন্মের পর দুরাত্মা কংস তাঁহাকে প্রস্তরের উপরে নিক্ষেপ করিলে দেবী আকাশে অন্তর্হিতা হন। তিনি নারায়ণের প্রিয়া, কৃষ্ণের ভগ্নী এবং খড়্গ, খেটক, পাশ, ধনু ও চক্রধারিণী রণদেবী। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ, হাত চারিটি ও মুখ চারিটি। তিনি শিবা, মহাদেবী, সুরেশ্বরী, কালী, মহাকালী, ইত্যাদি নামে সম্বোধিতা হইয়াছেন। 'দুর্গাৎ তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।'—হে দুর্গে, তুমি দুর্গ বা সঙ্কট হইতে ত্রাণ কর বলিয়া লোকসকল তোমাকে দুর্গা বলে। ভীষ্মপর্বে লিখিত স্তোত্রে আছে—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে শত্রুজয়ের ইচ্ছায় দেবী দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। দুর্গা প্রীতা হইয়া বলিলেন, 'পাণ্ডুপুত্র, তুমি শীঘ্রই শত্রু জয় করিবে, কারণ নারায়ণ তোমার সহায় এবং তুমি নরঋষির অবতার।' এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দেবী নন্দগোপের গৃহে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ-পিঙ্গল। তিনি খড়্গ-খেটক-শূলধারিণী রণদেবী। স্তোত্রে দেবী দুর্গা, কাত্যায়নী, ভগবতী, উমা, মহানিদ্রা, বেদমাতা, শাকম্ভরী, স্কন্দমাতা, কালী, মহাকালী, ভদ্রকালী, চণ্ডী প্রভৃতি নামে সম্বোধিতা হইয়াছেন। মহাভারতের অন্যত্র শিবের পত্নীকে শঙ্করী, অম্বিকা, পার্বতী, গৌরী, উমা, মহেশ্বরী বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবী যোগমায়া ও বিষ্ণুমায়ারূপে উল্লিখিত। ব্রজাঙ্গনাগণ নন্দগোপপুত্র কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য দেবী কাত্যায়নীকে আরাধনা করিয়াছিলেন। কাত্যায়নীই মহামায়া দুর্গা। হরিবংশে দেবীকে দুর্গা বলা হয় নাই—তিনি যোগকন্যা। ইহাতে দেবীর স্তোত্রের নাম আর্যাস্তব। দেবীকে আর্যা, কাত্যায়নী, কৌষিকী, নারায়ণী, পার্বতী, ব্রহ্মবাদিনী, ব্রহ্মচারিণী বলা হইয়াছে; কালী, করালী, চণ্ডী, দুর্গার নাম নাই। মহিষাসুর বা অপর কোন অসুরবধের কথাও হরিবংশের স্তবে নাই, লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীরূপে দানববধের কথা আছে।

বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে শক্তিবাদের কথা আছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন—হিন্দুদের কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার বর্ণনা বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। কালী, তারা, সরস্বতী, ভদ্রকালী, কামেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর অষ্টরূপের মন্ত্রসকলও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। জৈনদের মন্দিরে সরস্বতী ও অন্যান্য দেবীর মূর্তিসকল দেখা যায়—তাঁহারা সরস্বতীকে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও শাসনদেবীরূপে পূজা করেন।

শাক্ততন্ত্রে দেবীপূজার পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হয়। তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ স্যার জন উড্রফের মতে সমগ্র শাক্ততন্ত্র বীজাকারে দেবীসূক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, বৃহদ্দেবতা হইতে বচন তুলিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, বৈদিক দেবী অদিতি, বাক্ ও সরস্বতী এবং পরবর্তী কালের দুর্গা অভিন্না।

পুরাণগুলিতে দেবীপূজার খুব সমৃদ্ধি দেখা যায়। কোন কোন পুরাণে দেবী ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, উমা, লক্ষ্মী প্রভৃতি নামে বর্ণিতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে দুর্গার রণদেবীরূপের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায়। মহামায়া নিত্যা সনাতনী ও জন্মমৃত্যুরহিতা হইলেও দেবগণের কার্যসিদ্ধির অর্থাৎ দেবপীড়ক অসুরগণের বধের জন্য আবির্ভূতা হইয়া 'উৎপন্না' বলিয়া কথিতা হন। চণ্ডীতে বর্ণিত আছে—শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের পর দেবতারা নারায়ণীর স্তব করিয়াছিলেন এবং দেবী প্রসন্না হইয়া বলিয়াছিলেন,

'তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥'

অর্থাৎ, আমি আবার দুর্গম নামক প্রকাণ্ড অসুরকে বধ করিব, তখন আমার 'দুর্গাদেবী' এই নাম বিখ্যাত হইবে। 'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ।' 'দুর্গাসি দুর্গভবসাগর-

নৌরসজ্ঞা।'—দুর্গ বা সঙ্কট হইতে যিনি সকলকে রক্ষা করেন তিনি দুর্গা। চণ্ডীতে আছে, দুর্গা তিন রূপে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন—মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীরূপে। মহামায়ার মহা-শক্তিতে জগৎ মুগ্ধ; আবার তিনি উপাসকের আরাধনা দ্বারা প্রসন্না হইলে জীবকে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' 'সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।' তিনি আরাধনা দ্বারা প্রীতা হইলে জীবকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দান করেন। —'আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।' 'সাহযাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি।'

দেবীভাগবতেও আছে—মহামায়া অরূপা হইয়াও ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য রূপ ধারণ করেন—

'সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দদায়িনী।
রূপং বিভর্তি অরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে॥'

দেবী ও ব্রহ্ম এক, অভিন্ন—

'সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহং অহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥'

বেদ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির আলোচনা হইতে দেবীর বিভিন্ন রূপগ্রহণের কথা জানা যায়। দেবীসূক্তে দেবী সর্বব্যাপিনী বিশ্বের কারণীভূতা স্ত্রীদেবতা, কেনোপনিষদে ব্রহ্মের শক্তি উমা-হৈমবতী, মহাভারতে নন্দকুলোদ্ভবা বিন্ধ্যবাসিনী, চণ্ডীতে মহিষমর্দিনী পার্বতী ও দুর্গম-নামক অসুরমর্দিনী দুর্গা। কালিকা-পুরাণের মতে দেবীর মূল মূর্তি এক্ষণে অন্তর্হিত। মহিষাসুরবধের পর মহিষ-মর্দিনীরূপে দেবী পূজিতা হইতেছেন। ঋগ্বেদীয় দেবীর কল্পনা এবং মহাকাব্যের ও পৌরাণিক দেবীর কল্পনার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য বেশী নাই। পরবর্তী কালের কল্পনার মধ্যে নূতন কিছু উপাদান আসিয়াছে। পার্থক্য কেবল দেবীপূজার ধারার বিকাশের মধ্যে।

শ্রীশ্রীকালী

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি; যখন তিনি এই সব কার্য করেন—তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নামরূপ ভেদ। ···তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশান-কালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র সূর্য গ্রহ পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার—তখন কেবল মা—নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী; গৃহস্থবাড়ীতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব-শিবা ডাকিনী-যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। ···সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

স্রষ্টা

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কণ্ঠে তোমার কখনো যে শুনি
ভৈরব-সঙ্গীত,
নৃত্যচপল চরণে জাগাও
অশিবের ইঙ্গিত।
বন্যাপ্লাবন-মহামারীরূপে
তব আগমনী গাহ চুপে চুপে,
জীবনশরণ-কর-পরশন
হরে প্রাণ-সম্বিৎ।

নয়নে তোমার সৃজন-সুষমা
তুমি চিরসুন্দর!
তাই পুরাতন দলিত জীর্ণ
বিদায়ী নিরন্তর।
যাহা যায় ঝরি' তোমার ভুবনে
আনো তাহা পুনঃ নব-রূপায়ণে,
ভাঙিবার ছলে করিছ নিত্য
সৃষ্টিরে মনোহর।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-বন্দনা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

ললিত—ত্রিতালী (প্রভাতী সুর)

জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবন-মঙ্গল,
জয় মাতা শ্যামাসুতা অতি নিরমল।
জয় বিবেক-আনন্দ পরম দয়াল,
প্রভুর মানস-সুত জয় শ্রীরাখাল॥
জয় প্রেমানন্দ প্রেমময় কলেবর,
জয় শিবানন্দ জয় লীলা-সহচর।
যোগী যোগানন্দ জয় নিত্যনিরঞ্জন,
জয় শশী গুরুপদে গত-তনুমন॥
সেবাপর যোগিবর, অদ্ভুত-আনন্দ,
অভেদ-আনন্দ জয় গতমোহবন্ধ।
যোগরত ত্যাগ-ব্রত তুরীয় আখ্যাত,
শরত সুধীর শান্ত যেন গণনাথ॥

*জীবে শিব-সেবাব্রত গঙ্গাধর বীর,
জয় শ্রীবিজ্ঞানানন্দ প্রশান্ত গম্ভীর।
প্রধান গোপাল মাতৃসেবা-পরায়ণ,
সারদা সারদা-পদে গতপ্রাণমন॥ *
বালক-চরিত্র জয় সুবোধ সরল,
নাগবর ত্যাগ-বীর বিবেক-সম্বল।
কথামৃত-বরিষণ গৌর জলধর,
গিরিশ ভৈরব জয় বিশ্বাস-আকর॥
রামকৃষ্ণদাস-দাস জয় সবাকার,
রামকৃষ্ণ লীলাস্থান জয় বার বার।
রামকৃষ্ণ-নাম জয় শ্রবণমঙ্গল,
ভকত-বাঞ্ছিত জয় চরণ-কমল॥

[ভজনটি বহু পূর্বে রচিত এবং গীতাবলী, সঙ্গীত-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত। উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন ত্যাগী পার্ষদের নাম উল্লেখ ছিল না, তারকামধ্যস্থ স্তবকটি নূতন রচনা করিয়া লেখক এই বন্দনাটি সম্পূর্ণ করিলেন। উঃ সঃ]

সমালোচনা

গীতামাধুকরী—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ; ২০।১১, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড, পোঃ রিজেণ্ট পার্ক, কলিকাতা-৭০ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৬। মূল্য ১·২৫ টাকা। উৎকৃষ্ট পুরু কাগজে পাইকা টাইপে সুমুদ্রিত।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় যাহাতে অল্পশিক্ষিত সমাজেও গীতার মতবাদ প্রচারিত হয়—এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার সরল পদ্যে পয়ার-ছন্দে গীতার সারমর্ম "গীতামাধুকরী" নামে প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন—একথা অকুণ্ঠচিত্তে বলিতে পারা যায়। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে উক্ত হইয়াছে যে গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। গীতা পাঠ করিলেই সব শাস্ত্রপাঠের ফল লাভ হইয়া থাকে। গীতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সাধনা চাই।

গীতা সম্বন্ধে কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণা আছে যে গীতা শুধু কর্মের প্রেরণা যোগায়। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—ত্রিধারার সম্মিলন ঘটিয়াছে এই মহাগ্রন্থ গীতাতে। সুপণ্ডিত ও সাধক গ্রন্থকার নিম্নাধিকারিগণের জন্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় গীতাগ্রন্থ অবলম্বনে আত্মার অমরত্ব, মৃত্যুর অপরিহার্যতা, তপস্যা, দান, জ্ঞান, কর্ম, বুদ্ধি, সুখ, ত্রিবিধ ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ; এবং যাঁহাদের জন্য করিয়াছেন তাঁহারা উহা হইতে যথেষ্ট লাভবান হইবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অমৃতলোকের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি কী চমৎকার !

নাহি নিদ্রা অলসতা সেথা
মনে নাই নিদারুণ ব্যথা,
আছে চির বসন্ত মধুর
বায়ু গাহে আনন্দের সুর
কর মন অমৃত সন্ধান,
মতিমান, ওহে মতিমান !!

—শ্রীরাধাচরণ দাস, সাহিত্যরত্ন

ইউরোপের গান্ধী ডাঃ এ্যালবার্ট শুইৎজার—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বসুরায় ; পৃষ্ঠা ৯২, মূল্য টাকা ; ১·৫০ শৈবলিনী-কুটীর, যাদবপুর, কলিকাতা।

ডাঃ এ্যালবার্ট শুইৎজারের জীবনীকার শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন বসুরায় বাঙালী জাতির ধন্যবাদভাজন। সাম্প্রতিক কালে রাজনীতির দামামাধ্বনিতে সারা বিশ্বের স্নায়ুতন্ত্র যখন মুহ্যমান, অর্থ ও শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষের স্বাভাবিক মূল্যবোধ যখন বিপর্যস্ত, এমনই সময়ে যে কয়েকটি মানুষের আবির্ভাবে আমরা মনুষ্যত্বের প্রতি আমাদের আস্থা ফিরে পেয়েছি, ডাঃ শুইৎজার তাঁদেরই একজন। ইওরোপের পণ্ডিত সমাজের অগ্রণী ডাঃ শুইৎজার কেমন ক'রে জীবনের সকল ঐশ্বর্য-সম্ভাবনা ত্যাগ ক'রে ভগবান যীশুর মানবপ্রেমের আদর্শে আফ্রিকার সুদূর প্রদেশে রোগার্তদের সেবায় ব্রতী হয়েছেন, সে কাহিনী দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে চিরদিনের সম্পদ হ'য়ে থাকবে। আশা করি সুধী পাঠকমণ্ডলীর সাগ্রহ দৃষ্টির অভিনন্দনে এ জীবনীটি সুপ্রচারিত হবে। লেখকের শ্রদ্ধানত চিত্তের স্পর্শে সংক্ষিপ্ত পরিসরেও জীবনীটি হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু একটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। একদা বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার 'স্কট', নবীনচন্দ্রকে 'বায়রণ' এবং রবীন্দ্রনাথকে 'শেলী' বলার ফ্যাশন এদেশে ছিল। এ জাতীয় নামকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, এই কারণে যে এতে ক'রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্মান কিছুমাত্র বাড়ে না। 'ইউরোপের গান্ধী' এই বিশেষণটি আমাদের পূর্বকালীন ফ্যাশনেরই বিপরীত অনুবর্তন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও শুইৎজারের আদর্শগত ঐক্য আমাদের আকৃষ্ট করে, তবু সে সম্বন্ধে জীবনীর মধ্যে আলোচনা

করলেই চলত, নামকরণ স্বতন্ত্রভাবে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে, ছাপা ও বাঁধাইয়ের সুরুচির জন্য লেখক ও প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

শ্রীপ্রণব ঘোষ

পাথেয়—শ্রীস্নেহলতা দেবী ভারতী প্রণীত; শ্রীবিদ্যা পাবলিশিং হাউস, রঙ্গনাথপুর, পোঃ বড়িশা, কলিকাতা-৮ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৮; মূল্য তিন টাকা।

বর্তমানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহু কবিতার বই আত্মপ্রকাশ করলেও 'পাথেয়' শিরোনামে নতুন বইটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হ'য়ে কাব্য-রসিকদের কাছে ৩৪টি কবিতার অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সব কয়টি কবিতাই রসোত্তীর্ণ না হলেও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে 'পান্থ', 'জীবন-রহস্য', 'ভরত', 'মনের আগুন', 'কোন আমি দামী', 'শবরী', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'নির্বাসিতা সীতা'—কবিতাগুলি ভাব, ভাষা ও ছন্দে অনবদ্য। 'চাষী ভাই', কবিতায় যে দরদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে কৃত্রিমতার ছোঁয়াচ নেই।

কবীর-বাণী — শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার, প্রকাশক: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য দেড় টাকা; পৃষ্ঠা ৮৫+(৮)।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কবীর-দোঁহা-সংগ্রহ হইতে এক শতটি নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'One Hundred Poems of Kabir' নামে প্রকাশিত করেন। বর্তমান কাব্যগ্রন্থটিতে তাহার একটি বাদে সবগুলি আছে।

সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ অনূদিত 'ঝুলন'টির বদলে বর্তমান লেখক অন্য একটির অনুবাদ দিয়া শত সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি অনুবাদের শীর্ষে মূলের প্রথম পঙক্তি লিখিত আছে। ভাব ও ভাষার দিক দিয়া অনুবাদ স্থানে স্থানে দার্শনিক কাব্যে পরিণত হইয়াছে এবং বহু পাঠক—যাঁহারা মূল 'কবীর' পড়িতে পারেন না—তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন। ইংরেজীতে সম্ভব না হইলেও মনে হয় বাংলায় মূল দোঁহাগুলির অনুকারী ছন্দে অনুবাদ সম্ভব; হয়তো তাহাতে ভাবের গভীরত্ব ও যাথার্থ্য কথঞ্চিৎ ব্যাহত হয়।

A Practical Guide to Samadhi.—(Spiritual Teachings) by Swami Narayananda. Published by Messrs N. K. Prosad & Company, P. O. Rishikesh (U. P.) Price Rs 4/- Pages. 206+XII.

হৃষীকেশের স্বামী নারায়ণানন্দ আধ্যাত্মিক সাহিত্য-রচয়িতা হিসাবে ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও আজ সুপরিচিত। প্রাঞ্জল ইংরেজীতে লিখিত তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজি বহু সাধকের সাধনপথে সহায়তা করে। বর্তমান গ্রন্থে প্রার্থনা, ঈশ্বর, শেষ সত্য ও তাহার অনুভূতি—বিবেক, বৈরাগ্য, ইষ্টদেবতা, গুরুর প্রয়োজনীয়তা, সাধনা, শরণাগতি, মন্ত্র, জ্ঞানযোগ, সমাধি, জীবন্মুক্তি, তুরীয়াবস্থা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

পুস্তকের প্রথমে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাঁহার সংগ্রাম ও সাধনা লিপিবদ্ধ। এরূপ একখানি পুস্তকে হস্তরেখা-বিচারক-কর্তৃক বিচারও লেখক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নিতান্তই বিজ্ঞাপনের মতো লাগে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী-স্তবমালা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রণীত; ২৬বি, আর, জি, কর রোড কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৮৩+৮০; মূল্য দশ আনা।

শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় স্তব-পুস্তিকাখানির প্রকাশ অতি সুন্দর ও সময়োচিত হইয়াছে। যাঁহারা সমগ্র চণ্ডীখানি পড়িবেন না বা পড়িতে পারিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে চণ্ডীর অন্তর্গত

অত্যুৎকৃষ্ট স্তবচতুষ্টয়ের পাঠবিধি দেবীমাহাত্ম্যেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই দিক দিয়া বর্তমান সংকলক ব্রহ্মাকৃত-স্তুতি, শক্রাদি-স্তুতি, দেবগণকৃত-স্তুতি, নারায়ণী-স্তুতি অর্থসহ পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

স্তবগুলির পূর্বে অর্গলস্তোত্র, কীলকস্তব, দেবী-কবচ, এবং পরে দেবীসূক্ত, শ্রীশ্রীদুর্গাস্তবরাজ, ক্ষমা-ভিক্ষাস্তুতি প্রভৃতি সাজানোতে পুস্তকখানি একটি পঞ্চপুষ্পের সাজিতে পরিণত হইয়াছে।

দ্রুত প্রকাশনের জন্য কিছু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে আশা করি এগুলি নিশ্চয় দূরীভূত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

A Man of God. (Glimpses into the life and works of Swami Shivananda, a great disciple of Sri Ramakrishna)—by Swami Vividishananda of Ramakrishna Vedanta Center Seattle, Washington, U.S.A. Published by Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras 4. Price Board Rs 3.; Cloth Rs 4. Pages 352 & Foreword by Christopher Isherwood.

সিয়েট্‌ল্‌ রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্রের স্বামী বিবিদিষানন্দ-লিখিত গ্রন্থখানি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ) মহারাজের জীবন -ও সাধন কথা। এই মহাজীবনানুধ্যান বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত:

ব্যক্তিত্ব ও বাল্যজীবন, শ্রীগুরুর পদতলে, তপস্যা ও তীর্থপর্যটন, সেবায় আত্মনিয়োগ, মহাব্রতের পূর্বাভাষ, সংঘশীর্ষে, জাতীয়তার উপর সংঘের প্রভাব, গুরুরূপে, স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত জীবন, গৌরবময় অধ্যায় প্রভৃতি কয়টি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া সরল সতেজ ভাষায় পুণ্যজীবনের আলেখ্য রচিত হইয়াছে।

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সংকলিত; প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ, উত্তরপ্রদেশ। পৃষ্ঠা ১২০, মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ বা শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ সম্বন্ধে পূর্বে 'সৎকথা', লাটুমহারাজের স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান পুস্তকে আরও অনেক নূতন তথ্য ও কথাবার্তা সংগৃহীত। পুস্তকের প্রথমে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ লিখিত সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে লাটু মহারাজের জীবনকথা আলোচিত, দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন সমস্যা-বিষয়ক উপদেশাবলী ও শেষে বিবিধ প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত।

চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস ও মৃত-যতিসংস্কার—স্বামী কৈবল্যানন্দ (পুরী) প্রণেতা, শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম বারাণসী হইতে প্রকাশিত; দক্ষিণা ৮০, পৃষ্ঠা ৪২।

সন্ন্যাসী অবধূত প্রভৃতি মোক্ষমার্গী চতুর্থাশ্রমি-গণের দেহান্তে তাঁহাদের ভক্ত ও শিষ্যগণের কখন কি করণীয়—শাস্ত্রবিধি ও প্রচলিত আচার-অনুযায়ী তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরিশেষে মঠাম্নায় ও সন্ন্যাসবিধি প্রভৃতি নিবদ্ধ; অল্পের মধ্যে পুস্তকখানি একটি মূল্যবান সংগ্রহ-গ্রন্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী দিব্যানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা গভীর বেদনার সহিত জানাইতেছি গত ১২ই অক্টোবর (২৫শে আশ্বিন) ভোর ৫-৩৫ মিঃ সময় কলিকাতা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে স্বামী দিব্যানন্দজী ৬৭ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে তিনি ফুসফুসে ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন; চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া উপরি-উক্ত হাসপাতালে ভরতি করা হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভরতি হওয়ার পরদিনই তাঁহার দেহান্ত ঘটিল। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২৫ বৎসর বয়সে বেলুড়মঠে যোগদান করিয়া স্বামী দিব্যানন্দ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোর আশ্রমে কয়েক বৎসর পূজকের কাজ করার পর তপস্যার উদ্দেশ্যে ১৯২৮ খৃঃ কাশীবাস করিতে আসেন, এবং জীবনের শেষভাগ অবধি দীর্ঘদিন বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমেই কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে লীন হইয়াছে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

বেলুড়মঠে ঃ—যথাযোগ্য গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননীর উপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আকাশ পরিষ্কার থাকায় তিন দিনই সংখ্যাতীত লোক সমাগম হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন ৬,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান; এবং অন্য দুইদিন ১০,০০০ জনকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শাখাকেন্দ্রে ঃ—আসানসোল, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম, বোম্বাই, কাঁথি, ঢাকা, দিনাজপুর, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, মালদহ, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শিলং, শিলচর, সোনার গাঁ, বালিয়াটি ও শ্রীহট্টে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বোম্বাই আশ্রমের পূজায় অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ধর্মসম্মেলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডক্টর কে, এম, মুন্সীর সভাপতিত্বে বিভিন্নধর্মের একটি আলোচনা-সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

লণ্ডন কেন্দ্রেও দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ ভজন ও আনন্দের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

কার্য-বিবরণী

বোম্বাই ঃ রামকৃষ্ণ মিশন শাখা-কেন্দ্রের ১৯৫৫ ও '৫৬ খৃষ্টাব্দের সুমুদ্রিত কার্য-বিবরণী পাইয়াছি। ১৯২৩ খৃঃ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে শিক্ষা ও সেবামূলক কার্যের মধ্য দিয়া বেদান্তের সার্বভৌম ভাব বোম্বাই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হইতেছে। গত দুই বৎসরে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্‌গণ কর্তৃক গীতা, বেদান্ত দর্শন, উপনিষৎ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বাণী ও বিভিন্ন ধর্ম-বিষয়ে ২৭৫টি আলোচনা ও বক্তৃতাসভার ব্যবস্থা হয়। আশ্রমে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী ১৪৮টি বক্তৃতা দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি এবং শারদীয়া দুর্গাপূজা পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় অনুষ্ঠিত ও উদ্‌যাপিত হয়।

শিবানন্দ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা বর্ধিত করা হইয়াছে। প্রায় অর্ধশত দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত লওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রাবাসে ৭৪ ও ৮৬ জন বিদ্যার্থীকে ভরতি করা হইয়াছিল; পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ৩২ ও ৪১ জন, কয়েকটি ছাত্র বৃত্তি পায়।

আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক বিভাগে মোট ১৭৯, ৮৪৬ রোগী চিকিৎসালাভ করে।

বঙ্গ বিহার আসাম মহারাষ্ট্র কচ্ছ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বন্যা দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প ও বাত্যায় দুর্গত নরনারীর সেবায় প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর বক্তৃতা-সফর

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ হইতে আমন্ত্রিত হইয়া বোম্বাই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ—এবারও প্রায় দুই মাস ধরিয়া বহুস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী এবং ধর্ম, ভারতকৃষ্টি, নারীজাতির আদর্শ, বেদান্ত ও বর্তমানের প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন। আসানসোলকে কেন্দ্র করিয়া কুলটি, বার্নপুর, চিত্তরঞ্জন, মাইথান, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল প্রভৃতি স্থানের শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবে তিনি যোগ দিয়াছেন। জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে উৎসবের পর কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরেও তাঁহার দুইটি বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। পূর্বপাকিস্তানে কলমা সোনার-গাঁ, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বহু নরনারী বৎসরান্তে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বিশেষতঃ ঢাকা জেলাবোর্ড হলের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতা 'Where all religions meet' (সকল ধর্ম কোথায় মিশিয়াছে) শুনিবার জন্য বহু মন্ত্রী, অধ্যাপক, জজ, অন্যান্য উচ্চ রাজকর্মচারী এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাইকমিশনারও উপস্থিত ছিলেন।

মাদ্রাজ: পুনর্বাসন

মাদ্রাজ সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীএম. ভক্তবৎসলম্ সম্প্রতি বেদারণ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন হরিজন কলোনীর দ্বিতীয় ও শেষ দফায় ৭২টি গৃহের উদ্বোধন করিয়াছেন। সাত মাস পূর্বে মাদ্রাজের রাজ্যপাল প্রথম দফায় ১২৮টি গৃহের উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

দশ একর জমির উপর তিন লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়ে নির্মিত দুইশত পাকা ঘর বিশিষ্ট এই কলোনী রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ১৯৫৫ সালের ঝটিকায় পীড়িত হরিজনদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। এই কলোনী স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহাতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, উপাসনা-গৃহ, শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির, শিশুদের পার্ক, রেডিও, ৯টি পাকা কূয়া, ৮টি নলকূপ এবং ৪২টি আধুনিক শৌচাগার আছে একটি সমবায় মৌমাছি-পালন-সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী চিদ্‌ভবানন্দ ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মাদ্রাজ মঠের স্বামী কৈলাসানন্দ সমবেত জনমণ্ডলীকে স্বাগত জানান। রিলিফের ভারপ্রাপ্ত স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ তাঞ্জোর ও রামনাদ জেলায় প্রলয়ঙ্কর ঝটিকার পর মিশনের আর্তত্রাণ ও পুনর্বসতি সম্পর্কিত কার্যকলাপের বিবরণে বলেন:

এই ঝটিকায় আর্তত্রাণকার্যে এক তাঞ্জোর জেলাতেই মিশন অন্নদান ও দুগ্ধবিতরণ ব্যতীত ৩২,০০০ জনকে নূতন বস্ত্র, প্রায় সহস্র শিশুকে জামা, শ্লেটপেন্সিল, প্রায় ৭০০০ জনকে বাসনপত্র, ১৫০০ জনকে মাদুর, এবং ১২৮টি গৃহ নির্মাণের মালমশলা সরবরাহ করিয়া এবং বহু কারিগরকে যন্ত্রপাতিদ্বারা জীবিকার্জনের সহায়তা করিয়া পুনর্বাসন ত্বরান্বিত করিয়াছেন। কতকগুলি পুষ্করিণীরও সংস্কার করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণপুরম্ নামে অভিহিত কলোনীর জন্য মোট ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে; তন্মধ্যে মিশন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন এবং বিভিন্ন সুবিধার জন্য প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। মিশন বেদারণ্যম্ শহর হইতে কলোনী পর্যন্ত প্রায় ৭ ফার্লং দীর্ঘ একটি পাকা

রাস্তা নির্মাণ এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হরিজনগণ এই সমস্ত গৃহে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে পারিবে ; কিন্তু এই সমস্ত গৃহ বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করিতে কিংবা বন্ধক দিতে পারিবে না।

মিশন রিলিফ কার্যে নগদে ও জিনিসপত্রে মোট প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিশনের জনসেবার প্রশংসা করেন। সরকারী ও বেসরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতাঃ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান—এই সেবা-প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৬ খৃঃ পঞ্চবিংশ বর্ষের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ইহার উল্লেখযোগ্য পরিবিস্তার: ২৫টি শয্যাসমন্বিত ও অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থাযুক্ত পুরুষদের সাধারণ চিকিৎসালয় এবং ধাত্রীবিদ্যা-সহ সিনিয়র নার্সিং-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের উদ্বোধন। মাতৃসদনের প্রয়োজনীয়তা ও সন্তানপালনবিধি সম্বন্ধে জনসাধারণ যাহাতে অজ্ঞাত না থাকে এবং দেশে শিশুমৃত্যুর হার যাহাতে কমে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালিত হয়। সেবা ও পরিচ্ছন্নতাই প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ।

নাম-পরিবর্তন

সাধারণ হাসপাতালে পরিণত হওয়ায় শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের নাম ১৫ই মে '৫৭ হইতে পরিবর্তিত হইয়াছে: রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠান। যে রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত সেই ল্যান্সডাউন রোড কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শরৎ বোস রোড নামে পরিবর্তিত হইয়াছে।

গত ২৫.৯.৫৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅনাথবন্ধু রায় পুরাতন শিশুমঙ্গল ভবনের পূর্ব দিকের এক তলাটি—'প্রতিমা সেন মেমোরিয়েল ওয়ার্ড' নামে উদ্বোধন করেন। কলিকাতার সুধী-সমাজে সুপরিচিত শ্রী জে. কে. বিশ্বাস প্রদত্ত তাঁহার কলিকাতা বাসভবনটির বিক্রয়লব্ধ লক্ষাধিক টাকা তাঁহার একমাত্র স্বর্গতা কন্যার স্মৃতিরক্ষায় নিয়োজিত হইল। এই উদ্বোধন-সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার, কলিকাতা) সাপ্তাহিক ধর্মসভায় আলোচিত বিষয়:

জুলাই: শ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা, বাল্মীকি-রামায়ণ, গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির কথকতা।

অগষ্ট: শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথকতা।

সেপ্টেম্বর: বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বিশ্বসমস্যা, গীতা।

স্বামী পুণ্যানন্দ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, স্বামী সাধনানন্দ, বেতার-কথক সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, স্বামী ওঁকারানন্দ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী নির্জরানন্দ, অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী বিভিন্ন দিনে বলেন।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জঃ ১৯৩৭ খৃঃ হইতেই রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় ফিজিতে ভারতীয় সন্মার্গ ঐক্য সংঘম্-এর কার্য পরিচালিত হইতেছিল। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 'নাদি'তে স্থাপিত মিশনের কেন্দ্র ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মিত কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে।

ধর্মের ক্ষেত্রে—প্রার্থনা, ভজন, সাপ্তাহিক গীতা উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি প্রভৃতি উৎসব পালন এই কেন্দ্রের নিয়মিত কর্মসূচী।

শিক্ষার ক্ষেত্রে—সন্মার্গ ঐক্য সংঘম্ কর্তৃক আরব্ধ বিবেকানন্দ হাই স্কুল গত ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে মিশনের পরিচালনায় হস্তান্তরিত হয়, বর্তমানে এখানে ৩২৯ বিদ্যার্থী, তন্মধ্যে ৪৩ জন ছাত্রী। অধিকাংশই ভারতীয় বংশধর, ১২ জন ফিজিয়ান, একজন চীনা। ধর্ম-বিষয়ে ছাত্রেরা যাহাতে উদার ও বিশ্বজনীন ভাব গ্রহণ করিতে পারে তাহার

ব্যবস্থা আছে। 'স্কুল টাইমস্' সাপ্তাহিক পত্রিকায় হিন্দী, ইংরেজী, তামিল, তেলেগু, গুজরাতী, উর্দু ও ফিজিয়ান ভাষার বিভাগ আছে। খৃষ্টমাসের সময় বার্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। কয়েকটি ভারতীয় ও আমেরিকান প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কয়েকজন ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হইয়াছে। ফিজিতে মিশনের তত্ত্বাবধানে ছাত্রাবাস ও পৃথক ছাত্রীনিবাস আছে। ৪০০ সাময়িক পত্রিকা ও ৫০০০ পুস্তক-সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার ছাত্রদিগের ও জনসাধারণের পাঠের ক্ষুধা মিটায়।

মিশনের আদর্শানুযায়ী সর্বাঙ্গীণ মানবসেবার উদ্দেশ্যে তাইলেভুর নিকট বিস্তীর্ণ জমি ইজারা লওয়া হইয়াছে। এখানে দুঃস্থ ও পঙ্গুদের সেবা-ভবন, মাতৃমঙ্গল-কেন্দ্র (শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী-স্মৃতিভবন) প্রভৃতি নির্মিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ

বিজ্ঞান: ভাইরাস্

সম্প্রতি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহার প্রতিষেধক নির্ণয়ে বহু বৈজ্ঞানিক রত। এ রোগের মূল কারণ এক অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, যাহা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না,—যেমন দেখা যায় "ব্যাকটিরিয়া"। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "ভাইরাস"।

গলনালীর অসুখ, পলিও রোগ, বসন্ত, এমনকি এক প্রকার ক্যানসার রোগও ভাইরাস্ হইতে জাত হয়। ভাইরাস গরুর মুখে ও পায়ে ক্ষত উৎপন্ন করে। উদ্ভিদের নানা প্রকার রোগও ভাইরাস হইতে হয়, পাতা বা কাণ্ডের বিচিত্র গঠনে তাহা বুঝা যায়; ইহার জন্য কখন কখনও বহু বৃক্ষ ধ্বংস হয়। পোকা-মাকড় এমনকি "ব্যাকটিরিয়া"র ভিতরেও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি হয়।

তামাক পাতায় এক প্রকার চাকা চাকা রোগের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়াই ৬০ বৎসর পূর্বে ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহারা অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না, বা সাধারণ পদার্থের সাহায্যে পুষ্টিলাভ বা বংশবৃদ্ধি করে না। সে জন্য ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিশ বৎসর পূর্বে ইহাকে স্ফটিকীকরণের জন্য একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক নোবেল পুরস্কার পান।

বর্তমানে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ (ইহাতে আলোকরশ্মির পরিবর্তে ইলেকট্রন অর্থাৎ বিদ্যুৎকণা-রশ্মি ব্যবহার করা হয়) আবিষ্কারে এক সেন্টি-মিটারের এক কোটী ভাগের দুইভাগ পর্যন্ত দূরত্ব বিশ্লেষণ করা যায় ও ক্ষুদ্র বস্তুকে ৪০,০০০ গুণ বর্ধিত করিয়া দেখা যায়। এই যন্ত্রের ও এক্স্-রে যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে ভাইরাস লাঠি, বল বা অন্য কোনরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট হয় ও উহার মধ্যে সুতার মত সরু একটি পদার্থ আছে। লাঠিগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে প্রায় এক সেন্টিমিটারের এক কোটীভাগের ১৫ ও ৭ ভাগ, ও মধ্যের গর্তটি ৩ ভাগ। ভাইরাসের উপরিভাগ প্রোটিন দ্বারা গঠিত ও ভিতরের সুতার মত পদার্থটি nucleic acid (নিউক্লিক এসিড)।

ভাইরাসের সুতার মত পদার্থটি অন্য কোন কোষের মধ্যে ঢুকিয়া প্রোটিন সংগ্রহ করে ও ঐ নূতন প্রোটিন আবার nucleic acid (এসিড) তৈরী করে, ফলে নূতন ভাইরাস সৃষ্টি হয়; এই ভাবে বংশবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ঐ প্রতিপালক কোষটির তারতম্যে ভাইরাস প্রকৃতির সামান্য পরিবর্তন প্রায়ই

লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যৎ বংশধরগুলি কখনও অতিমাত্রায় ক্ষতিকারক হয়, বর্তমান ইনফ্লুএঞ্জা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির ইহাই কারণ। আবার কখনও নূতন ভাইরাসগুলির ক্ষতি-প্রবণতা লোপ পায়।

ভাইরাস রোগের প্রতিষেধক অন্বেষণে ঐ দ্বিতীয় ধর্মই কাজ লাগানো হয়। Benzimidole নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ ইনফ্লুএঞ্জা ভাইরাসের ক্ষতিপ্রবণ বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে বলিয়া জানা গিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন ভাইরাস রোগের প্রতিষেধক নিরূপণ এখন আর সুদূর-পরাহত নহে।

(Science & Culture, July 1957)

রায়পুর (মধ্যপ্রদেশ)—জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ ছাত্রদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আচরিত উদার ধর্মনীতি প্রচারকল্পে গত ৩০শে জুন রায়পুর দাগা বিল্ডিং-এ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে; প্রত্যহ প্রার্থনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কাজের সূত্রপাত হইয়াছে। সম্প্রতি ১৮, ১৯, ২০শে সেপ্টেম্বরে দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ইংরেজীতে ও নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী ব্যোমরূপানন্দজী হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী, শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপনিষদ ও গীতার মর্মকথা—প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন। সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য স্বামীজীর বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত রায়পুরে একটি আশ্রম স্থাপন করা। বিজ্ঞান কলেজের নিকটে নামমাত্র খাজনায় ৫.৬ একর সরকারী জমি পাইবার আশা আছে, সহৃদয় জনসাধারণকেও এতদুদ্দেশ্যে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে।

আজমীর (রাজস্থান)—গত ১০ই আশ্বিন আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর-মূর্তির অনাবরণ-কার্য রাজস্থানের রাজ্যপাল শ্রীগুরুমুখ নিহাল সিংহ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গণ্যমান্য বহু ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। স্থানীয় সরকারী অন্ধ-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভজন-গান করেন। আশ্রম-সেবক স্বামী আদিভবানন্দ তাঁহার 'স্বাগত' অভিভাষণে বলেন—আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ১৯৪৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজস্থানে সাধ্যমত স্বামীজীর ভাবপ্রচার ও সেবাকার্য করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী রাজ্যপাল মহোদয় তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বলেন, জগৎ-সভায় ভারতের মানমর্যাদা স্বামীজীই রক্ষা করিয়াছেন। বিবেকানন্দ-সাহিত্য ভারতবাসীর অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

উদ্বোধন

মায়ের স্বরূপ

ভবানী ভাবনাগম্যা ভবারণ্য-কুঠারিকা।
ভদ্রপ্রিয়া ভদ্রমূর্তির্ভক্তসৌভাগ্যদায়িনী ॥

ভক্তিপ্রিয়া ভক্তিগম্যা ভক্তিবশ্যা ভয়াপহা।
শাম্ভবী শারদারাধ্যা শর্বাণী শর্মদায়িনী ॥

শাংকরী শ্রীকরী সাধ্বী শরচ্চন্দ্রনিভাননা।
শাতোদরী শান্তিমতী নিরাধারা নিরঞ্জনা ॥

নিত্যমুক্তা নির্বিকারা নিষ্প্রপঞ্চা নিরাশ্রয়া।
নিত্যশুদ্ধা নিত্যবুদ্ধা নিরবদ্যা নিরন্তরা ॥

(ললিতাসহস্রনাম, তৃতীয়া কলা, ১২।১৩।১৪।১৬)

সৃষ্টির আদিভূতা সনাতনী শক্তি ভবানী সুগভীর-ধ্যান-শুদ্ধ হৃদয়েই প্রতিফলিতা, সাধক-চিত্তে সংসার-বাসনার অরণ্য ছেদন করিতে তিনি জ্ঞান-কুঠারসদৃশা। সেই শিবপ্রিয়া দেবী মঙ্গলময়ী, মঙ্গলমূর্তি, প্রণত ভক্তের সর্বসৌভাগ্যদায়িনী ॥

ভক্তিই তাঁহার একান্ত প্রিয়, ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়, শরণাগত ভক্তের তিনি আয়ত্তাগতা, সর্বপ্রকার ভয় তাঁহার স্মরণে মননে বিদূরিত, শান্তস্বরূপ শিবের শক্তি সেই শারদা সকলের আরাধ্যা, স্থাণুভূত শর্বের শক্তি স্থিতিরূপা পালনপরায়ণা শর্বাণী আমাদের সুখদায়িনী ॥

তিনি শংকরের শক্তি, বিষ্ণুরও শক্তি—শান্তি ও সৌভাগ্যদায়িনী ; তিনি সতীশিরোমণি, শরচ্চন্দ্রের মতো কৌমুদীশুভ্র আননযুক্তা, সুখদুঃখের অতীতা তিনি শান্তা, শান্তিময়ী ; তিনি জগতের আধারস্বরূপা, তাঁহার আর কোন আধার নাই ; জগৎ তাঁহা হইতে ব্যক্ত হইয়াছে, তিনি অব্যক্তা—নিরঞ্জনা ॥

তাঁহাকে কখনও কোন কিছু বন্ধন করিতে পারে না, তিনি নিত্যমুক্তা ; সেই মহাপ্রকৃতির স্বরূপতঃ কোন বিকৃতি নাই ; জগৎপ্রপঞ্চ—সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের মতো—তাঁহারই আশ্রয়ে ভাসমান, কিন্তু তিনি নিরাশ্রয়া। তিনি নিত্যশুদ্ধা, নিত্যবুদ্ধা,—অতুলনীয়া—সর্বব্যাপিনী ॥

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা

আধুনিক রাষ্ট্রনীতির অভিধানে 'ধর্ম' কথাটির অর্থ সাম্প্রদায়িকতা (Communalism)। এই প্রকার মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া জনৈক মনীষী বলিয়াছেন: ঐ অভিধানে 'সাহিত্যে'র অর্থ সাংবাদিকতা (Journalism), 'বিজ্ঞানে'র অর্থ যান্ত্রিকতা (Technology), 'কৃষ্টি'র অর্থ নৃত্যনাটক (Dance-drama)।

সত্যসত্যই চোখে পড়িল: একটি প্রসিদ্ধ প্রকাশক-প্রণীত 'সাধারণ জ্ঞানে'র পুস্তকে 'Facts about India' (ভারতবিষয়ক তথ্য)-অধ্যায়ে Indian culture (ভারতকৃষ্টি) শীর্ষকে প্রথমেই লিখিত—ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত, তারপর যন্ত্রসঙ্গীত; অতঃপর ভারতীয় নৃত্যকলা: ভারতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী! ভারতীয় কৃষ্টি শেষ!!

কৃষ্টি যেখানে নৃত্যগীতে পর্যবসিত সেখানে যে বিজ্ঞান বলিতে যন্ত্রপাতি, সাহিত্য বলিতে সংবাদপত্র বুঝাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আর সেখানে 'ধর্ম কি বা কেন?' —এত বুঝিবার সময় বা সামর্থ্য কোথায়? সেখানে ধর্মসম্মেলনের আলোচ্য বিষয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশ্বশান্তি, নিরামিষাহার, সমাজনীতি বা জাতিভেদ দূরীকরণের প্রস্তাব।

* * *

এরিষ্টটল বলিয়াছেন: মানুষ রাষ্ট্রনীতিক প্রাণী! যুক্তি তাহার পথ-নির্ণায়ক। যুক্তির বাহিরে কিছু অনুসরণ করিলে তাহার অবনতি হইবে। যুক্তি-বিরোধী সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি যাহা মানুষের মনকে চালিত করে তাহা ধর্ম-বিশ্বাস!

রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা ধর্মনীতিই আজ পর্যন্ত মানুষকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে। মধ্য-যুগীয় ইওরোপে ধর্মগুরু শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষাতেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান! যুক্তিবাদীরা ইহা মানিতে পারে নাই বলিয়াই নব-জাগরণের আন্দোলন (Renaissance), নূতন আধুনিক সমাজবোধের সূত্রপাত। তখন ধর্ম ছিল রাজনীতির অভিভাবক, এখন যুক্তি ও বিজ্ঞানপুষ্ট রাজনীতি সাবালক হইয়া ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে নির্বাসনে পাঠাইতে প্রয়াসী!

যে কোন কারণেই হউক ধর্মকে যাঁহারা মানব-জীবনে অনাবশ্যক বলিয়া, উন্নতি পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন—তাঁহাদেরও চিন্তার একটা ধারা আছে, হইতে পারে তাহা ভুল। তাঁহাদেরও যুক্তির একটা শৃঙ্খলা আছে, হইতে পারে তাহা দুর্বল। তাঁহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব ইহা গতিশীল মানুষের পায়ে নিগড়স্বরূপ, ইহা মানুষকে রক্ষণশীল করে, সর্বদা পিছনে তাকাইতে বলে। বর্তমান যুগ যুক্তির যুগ, মানব-মনের মুক্তির যুগ! প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল পশুপালক কৃষিজীবী কুটির-শিল্পী মানব একদিন সূর্যকে মেঘকে বায়ুকে দেবতা মনে করিয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের সে শৈশবত্ব ঘুচাইয়াছে, অতএব ঐ প্রকার আদিম বিশ্বাস এখন নিষ্প্রয়োজন। রাসেলের কথা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা বলেন, 'শিল্প-শ্রমিকদের কল্যাণ—প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষের চেষ্টার উপরই বেশি নির্ভর করে, আদিম-প্রথানুসারী অন্যান্য ব্যক্তিদের কথা স্বতন্ত্র।'

আধুনিক রাষ্ট্র—শুধু বহু ধর্মে বিশ্বাসী মানবের বাসভূমিমাত্র নয়, বহু জাতি সমুদ্ভূত ব্যক্তিরও সমাহার। অতএব এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সংহতি ও কল্যাণের জন্য ধর্ম সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়। ধর্ম-সম্বন্ধে কথা তুলিলেই তাহা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে পরিণত হইবে। কোন ধর্ম-মতকেই অভ্রান্ত বা পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অতএব রাষ্ট্রের কর্তব্য

মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতির চেষ্টা করা; ব্যক্তিচরিত্রের উন্নতি দ্বারাই সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত মন প্রাচীন দেবতা-বাদে (Theology) বিশ্বাস করিয়া জীবন গঠন করিতে চায় না, সে চায় সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও সহযোগিতা। কর্মের স্বাধীনতা ও সুযোগের সমানতার উপর ভিত্তি করিয়া সে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিতে চায়; বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় অর্থনীতি-চেতন মানুষের সমস্যা-সমাধানে ধর্ম বিফল হইতে বাধ্য। অতএব দেশের জননায়কদের কর্তব্য—সাধু-সন্তের ও ধর্ম-দর্শনের অলস আলোচনায় সময় নষ্ট না করিয়া পূর্বোক্ত নীতি ও চরিত্র-গঠনের উপযোগী সাম্য ও স্বাধীনতা-মূলক সমাজব্যবস্থা-রচনায় মনোনিবেশ করা।

*　　*　　*

উপরি-উক্ত চিন্তাধারার সহিত অল্পবিস্তর আমরা সকলেই পরিচিত, যুক্তিবাদী মনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই আমরা ইহা নিঃশব্দে মানিয়া লইতে পারি না; সন্দেহ উত্থাপন করিব, কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরও আশা করিব।

প্রথম প্রশ্ন: মানুষ রাষ্ট্রনীতিক বা আর্থনীতিক প্রাণী—তাহার প্রমাণ কি? যখন রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতি ছিল না তখনও ত মানুষ ছিল, আদিম মানবও ত মানব। সে ক্রমবিকশিত অ্যামিবা, না দেবতাসম্ভব—এ কথার কি শেষ নিষ্পত্তি হইয়াছে?

দ্বিতীয়: 'যুক্তির বাহিরে' হইলেই যে 'যুক্তির বিরোধী' হইবে—ইহা কি অনুভবসিদ্ধ? এমন ত কত সিদ্ধান্তে আমরা সহসা উপনীত হই, পরে যাহা যুক্তি দিয়া বুঝি।

তৃতীয়: মধ্যযুগীয় ইওরোপের ধর্ম এবং যুগে যুগে আচরিত ভারত চীন বা আরবের ধর্ম কি একই প্রকৃতির? একথা কি সত্য নয় যে, ইওরোপ এশিয়া হইতে ধর্ম লইয়াছে এবং এশিয়া ইওরোপ হইতে রাজনীতি ও বিজ্ঞান শিখিতেছে? একে অপরের জিনিসটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই বলিয়াই পরবর্তী কালের বিপর্যয় এবং আধুনিক কালে কৃষ্টির এই সঙ্কট। আমাদের মতে এই সঙ্কট হইতে ত্রাণের উপায়, স্বীয় ভাবের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া অপরের ভাবের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা। এই আদান-প্রদানের সাফল্যের উপরই নির্ভর করিতেছে আগামী যুগের সভ্যতা।

আমরা ভারতের অবস্থা অনুধ্যান করিয়া যদি ভারতের ভূমিতে সাফল্যের নিদর্শন দেখাইতে পারি—তবে তাহাই হইবে বর্তমান যুগের সমগ্র মানবজাতির দিগ্‌দর্শন।

বর্তমান ভারতেও যে কৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা অনেকের চোখে পড়িতেছে—তাহা সত্য না হইলেও প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে ইহা নানাভাব-তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় মনের স্বংচ্যুতি! আধুনিক বিবিধ পরস্পরবিরোধী মতবাদের ঘূর্ণাবর্তে প্রাচীন ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়াছে। বহুধা-বিভক্ত ভারতের চিন্তাধারায় আজ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সন্দেহই বেশী, প্রাচীন আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিকতা—সাধারণভাবে শ্রদ্ধার বস্তু হইলেও শিক্ষিত ব্যক্তিদের তাহাতে আস্থা নাই। তাহারাই দেশবিদেশে কৃষ্টি-প্রতিনিধিরূপে নিজ নিজ ভাব প্রচার দ্বারা ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতেছে; তাহারা পাশ্চাত্ত্যে ভারতের প্রতিনিধি নয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ভারতেই পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির প্রতিধ্বনি!

বর্তমান ভারতে অনবরত যে ভাবের ও কৃষ্টির সংঘর্ষ ঘটিতেছে তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন, ইওরোপ গত চারশত বৎসরে যে পথ অতিক্রম করিয়াছে, ভারত চল্লিশ বৎসরে তাহা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। সামন্ততন্ত্র (feudal) ও মরমিয়াবাদের (mysticism) সহিত গণতন্ত্র ও যুক্তিবাদ একই রঙ্গমঞ্চে একই

দৃশ্যে আবির্ভূত হইয়া পারস্পরিক সংলাপ দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অধিকাংশ নেতারই বক্তৃতা মাইকের মাধ্যমে জনগণের কানে প্রবেশ করিলেও প্রাণে পঁহুছায় নাই! বিভিন্ন দল ও মতের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা তাহারা বুঝে নাই, আর্থনীতিক উন্নতির প্রতিশ্রুতি তাহাদের ক্ষুধা মিটায় নাই। আধ্যাত্মিকতার হাল ধরিবার কেহ নাই, অর্থনীতির দাঁড়ও সমতালে চলিতেছে না। ভারতের সমস্যা জটিল সন্দেহ নাই, তাহা সমাধানের উপায় ভারতের জনগণের মনের ধারা-বাহিকতাকে উপেক্ষা করিয়া নহে; বহিরাগত জড়বাদ-ভিত্তিক কোন মতবাদ সহায়ে নহে—ভারতের মৃত্তিকাজাত আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা সহায়ে জনগণের উন্নয়নে যদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আগাইয়া আসেন—তবেই জাগ্রত জনগণ বর্ধিত গতিবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

এই প্রসঙ্গে শেষ প্রশ্ন: ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আদর্শ ব্যতীত কি নৈতিক বা চারিত্রিক উন্নতি সম্ভব? ধর্মকে বাদ দিয়া নৈতিক উন্নতির কথা কল্পনা করার অর্থ শকুন্তলাকে বাদ দিয়া 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নয় কি? ধর্ম বলিতে কি বুঝায়?—কতকগুলি প্রথা? কতকগুলি রীতি? কতকগুলি কথায় বিশ্বাস? ধর্মের এ সংজ্ঞা কে কবে দিল?

আজকাল আর একটি নবতম মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে: 'খৃষ্ট বা বুদ্ধের ধর্ম জানিবার বা মানিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের নীতি ও মানবতার জন্যই তাঁহাদের মূল্য।' এরূপ মূল্য নিরূপণ মন্দের ভাল, তবে তাঁহাদের ঐ নীতি ও মানবতাই যে ধর্মের ভিত্তি, এইটুকু বুঝিলেই মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন ধর্ম কি করিয়া আসিতেছে? বন্য বর্বর পশু-মানবকে ধর্ম সামাজিক মানবে পরিণত করিয়াছে! মানবের ক্রমবিকাশের প্রধান শক্তি হিসাবে ধর্ম অনস্বীকার্য এক ঐতিহাসিক সত্য। কে বলিয়াছে যে এই মহাশক্তির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে?

ধর্ম ব্যতীত মানুষের বর্তমান সমস্যার সমাধান করিবার শক্তি আর কোন কিছুরই নাই, কারণ ধর্মই মানুষের মনুষ্যত্বের, তথা সমাজের কর্তব্য-বোধের ধারক ও চালক;—মানুষের শরীর মন ও আত্মার—সমগ্র সত্তার স্বাস্থ্য, শক্তি ও শান্তির উৎস এবং আধার! ধর্ম জীবনের ক্রমবিকাশের বিজ্ঞান, এবং প্রকৃত জীবন যাপনের কৌশল! এই বিজ্ঞান ও কৌশলই বংশপরম্পরা বা শিষ্যপরম্পরা আচরিত হইয়া কতকগুলি রীতি ও নীতির আকার ধারণ করিয়া থাকে। পরবর্তীকালে যখন কেহ এগুলি লইয়া তর্ক বিচার করে না, তখন এগুলি প্রথায় পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে উদ্ভুত এই রীতিনীতি বিভিন্ন ধর্মনামে আচরিত হয়, এবং কখনও কোন শক্তিশালী মহাপুরুষ বা সাধকের আবির্ভাব হইলে ঐ ধর্ম নূতন শক্তিলাভ করিয়া বহু মানবকে প্রভাবিত করে এবং দূর দুরান্তরে প্রচারিত হয়। ঐ সাধকের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করিয়া যে শক্তি সঞ্চিত হয়—তাহারই আকর্ষণে যাঁহারা আকৃষ্ট হন—তাঁহারাই পরবর্তী-কালে নিজেদের সংঘবদ্ধ করিয়া সেই ধর্ম প্রচার করেন—এই ভাবেই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি! সম্প্রদায় বলিতেই আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি সংকীর্ণতা মনে করেন, বস্তুতঃ 'সম্প্রদায়' শব্দের অর্থ গুরুপরম্পরা আগত সদুপদিষ্ট ব্যক্তিসমূহ।

কালক্রমে সাধনবিহীন সম্প্রদায়ে ধর্মান্ধতা, মতবাদের মোহ, 'আমার ধর্মই সত্য, আর সব মিথ্যা' এই সকল সংকীর্ণতা আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজনীতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইবার উদ্দেশ্যে ছলে বলে কৌশলে অপর-ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করিয়া স্বীয় দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তিই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জননী,

ইহা কখনই ধর্ম নহে, ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিকৃত অবস্থা! পর্যুষিত পরমান্ন দেখিয়া পরমান্নের প্রকৃত আস্বাদ নির্ণয় করা যায় না।

সাম্প্রদায়িকতা-দোষের জন্য ধর্মকে দায়ী করা চলে না, বরং বলা চলে ধর্মের এই বিকৃতির জন্য অসাম্যমূলক সমাজ ও রাজনীতিই দায়ী। বিকৃতি সম্ভব বলিয়া ধর্মকে পরিত্যাগ করা আর পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইবে ভাবিয়া খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া একই কথা।

ধর্মের উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য সম্প্রদায় প্রয়োজন, কিন্তু তাহাকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে ধর্মবিজ্ঞান-লব্ধ কৌশলে। বেদান্তই ধর্মের সেই বিজ্ঞান, যাহার শিক্ষায় আমরা জানিতে পারি 'এক সত্য বহুরূপে প্রতিভাত'—যাহার সহায়ে আমরা বুঝিতে পারি—বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়নিচয় প্রতিটি বিচিত্র—কিন্তু এক প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত! বৈচিত্র্য হইলেই যে সংঘাত অনিবার্য তাহা তো নয়—বিচিত্র সুরের সামঞ্জস্যেই সঙ্গীতের সার্থকতা, বিচিত্র বর্ণের সুষমায় প্রকৃতির সৌন্দর্য, বিচিত্র মানুষের বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়ে—মানব-কৃষ্টির নিত্য নব রূপায়ণ!

অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়

বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় এবং একমাত্র এতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করতে পারে, এই পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত; কিন্তু এতে আবার গোঁড়ামি আসবার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে।

জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু এতে আশঙ্কা এই—পাছে শুষ্ক পাণ্ডিত্যে দাঁড়ায়। ভক্তিও খুব বড় জিনিস, কিন্তু এতে নিরর্থক ভাবপ্রবণতা এসে আসল জিনিসটাই নষ্ট হবার যথেষ্ট ভয় আছে।

এই সবগুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এরূপ সমন্বয়পূর্ণ ছিল। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষ কালে ভদ্রে জগতে এসে থাকেন, তবে তাঁর জীবন ও উপদেশ আদর্শস্বরূপ সামনে রেখে আমরা এগোতে পারি।

আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে সেই আদর্শে পূর্ণতা লাভ করতে না পারে, তবু আমরা এক একজন জীবনে এক এক ভাবের বিকাশ ক'রে এমন ক'রে তুলতে পারি, যাতে একঘেয়ে ভাবটা দূর হয়, যেন সবগুলি মিলে একটি পূর্ণ জীবন, একজনের যেটা অভাব, যেন অপরের জীবনের দ্বারা তা পূর্ণ হচ্ছে। এতে প্রত্যেকের জীবনে সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হ'ল না বটে, কিন্তু এতে কতকগুলি লোকের মধ্যে একটি সমন্বয় হ'ল; আর সেটি অন্যান্য প্রচলিত ধর্মমত হ'তে সুনিশ্চিত উন্নতি-সোপানে প্রতিষ্ঠিত,—তাতে সন্দেহ নেই।

কোন ধর্ম যদি মানুষের বা সমাজের জীবনে কিছু কাজ করতে চায়, তাহ'লে তাই নিয়ে একেবারে মেতে যাওয়া দরকার, একথা ঠিক;—কিন্তু যেন উহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব না আসে, এটি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা এই জন্যে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হ'তে চাই। সম্প্রদায়ের যে সকল উপকারিতা তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্বভৌম ধর্মের উদার ভাবও থাকবে।

* * *

যাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে—তাই পাপ বা অধর্ম, আর যাতে আদর্শের মত হবার সাহায্য করে, তাই ধর্ম।

—পত্রাংশ, স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য

রামনাথপুরম্‌, মাদ্রাজ

আবেদন

জনসাধারণ দুঃখের সহিত অবগত আছেন যে, গত সেপ্টেম্বরের শেষার্ধে মাদ্রাজের রামনাথপুরম্‌ জেলায় শোচনীয় দাঙ্গার ফলে বহুলোকের প্রাণহানি, বহু গৃহ ও সম্পত্তি দগ্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য ঐ জেলায় কয়েকটি তালুকে জনগণ অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে।

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের দুইজন সন্ন্যাসী দাঙ্গাবিধ্বস্ত স্থানগুলি পরিদর্শনান্তে দুর্গতসেবার প্রয়োজনবোধে ইতোমধ্যেই মনমাদুরাই নামক স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি সাময়িক কেন্দ্র খুলিয়া সেবাকার্য চালাইতেছেন। যত শীঘ্র সম্ভব অপর বিধ্বস্ত স্থানসমূহেও এই সেবাকার্য বিস্তৃত করা হইবে।

যে সব বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে সেইগুলি পুনরায় তৈয়ারী করিবার জন্য সরঞ্জাম সর্বাগ্রে আবশ্যক। অনেক কাঁচা দেওয়ালের বাড়ী ঠিকই আছে, কিন্তু চাল বা ছাদ সত্বর নির্মিত না হইলে আগতপ্রায় শীতঋতুর বৃষ্টিতে সমস্ত পড়িয়া যাইবে। চালা তৈয়ারীর জন্য যে সমস্ত মালমশলার প্রয়োজন সেগুলি এখনই সরবরাহ করা দরকার। যেখানে গৃহগুলি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেখানে সেগুলি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে প্রয়োজন। উপরন্তু যাহারা সর্বহারা হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে চাল, বস্ত্র ও জীবনধারণোপযোগী অন্যান্য দ্রব্যও দিতে হইবে।

বলা বাহুল্য মিশন-কর্তৃক এই আরব্ধ সেবাকার্যে উপযুক্ত অর্থ আবশ্যক। রিলিফকার্য যত শীঘ্র সম্পাদিত হইবে জনসাধারণের দুর্গতি লাঘব করা ততই সহজ হইবে। আমরা সেই কারণে এই দুর্গত জনগণের নামে সহৃদয় ও বদান্য দেশবাসীর নিকট এই সেবাকার্যে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য আবেদন জানাইতেছি।

যাঁহারা দান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ম্যানেজার, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ-৪, এই ঠিকানায় টাকা পাঠাইলে ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ ও প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, এখানে আমরা কোন জিনিসপত্রের জন্য আবেদন করিতেছি না, উপদ্রুত অঞ্চলের নিকটেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র শীঘ্র ক্রয়ার্থে কেবলমাত্র অর্থ-সাহায্যের জন্যই আবেদন করা হইতেছে।

৭.১০.৫৭
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ-৪
ফোন: ৭১২৩১

নিবেদক—
স্বামী কৈলাসানন্দ
সভাপতি
মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

জেগেছ জগন্মাতা !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

পুণ্য তিথির মধুর লগ্নে জেগেছ জগন্মাতা,
লক্ষ কণ্ঠে হতেছে ধ্বনিত তোমার স্তোত্র-গাথা !
শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল-ধ্বনি
পূর্ণ করিছে নিখিল অবনী,
ভক্ত তোমার যাচিছে শরণ, চরণে নোয়ায়ে মাথা !
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, জেগেছ জগন্মাতা !

স্থল-জল-নভ ব্যাপ্ত করিয়া, জুড়ি' বহিরন্তর,
নামিয়া এসেছ তুমি মা ভদ্রা, বিশ্ব-আঙিনা 'পর !
সব দিকে মাগো, তোমার প্রকাশ,
আজি চিন্ময় আকাশ-বাতাস,
ঊর্ধ্ব হইতে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে অমৃতের নির্ঝর !
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, জুড়ি' বহিরন্তর !

জেগেছ তুমি মা ভূভার-হারিণি, আর্তি-নাশিনি শিবে,
করুণা তোমার বিলায়ে দিতেছ নিখিল আর্ত-জীবে !
নিঃস্ব কাঙাল আছে যে যেথায়,
সবারে ডাকিছ—"আয় আয় আয়",
স্নেহ-স্তন্য বক্ষে এনেছ—অধরে ঢালিয়া দিবে !
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, আর্তি-নাশিনি শিবে !

জেগেছ সারদা, বরদা, জ্ঞানদা, শান্তি-শুভংকরি,
তব সুস্মিত-পদ্ম-আননে আনন্দ পড়ে ঝরি !
ছড়ায়ে তোমার অঙ্গের দ্যুতি,
বিশ্বে ভরেছ দিব্য বিভূতি,
অন্তরীক্ষে তোমার চেতনা-দীপ্তি গিয়াছে ভরি' !
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, শান্তি-শুভংকরি !

জেগেছ অপার মমতাময়ি গো, সন্তান-গত-হিয়া,
সুপ্তি-জড়িত তিমির টুটিছ জ্ঞানের আলোক দিয়া !
ব্যাকুল প্রাণের শুনি' ক্রন্দন,
উথলি' উঠিল তোমার বেদন,
এসেছ তাই গো ত্রস্ত-চরণ, দুই বাহু প্রসারিয়া !
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, সন্তান-গত-হিয়া !

জেগেছ ব্রহ্ম-শক্তি-রূপিণি, করুণা-মূর্তিমতি,
সচ্চিদ্-ঘন—আনন্দময়ি, বোধ-নির্মল-জ্যোতি !
সন্তানে দিতে পূত-পদ-ছায়া,
জেগেছ জননি, তুমি মহামায়া,
মানবীর বেশে এসেছ শিবানি, সনাতনি, ভগবতি !
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, করুণা-মূর্তিমতি !

জেগেছ কালিকা, হুতাশ-ভালিকা, শাণিত খড়্গ-পাণি,
জেগেছ বগলা, বলোন্মত্তা, বিদ্যাশক্তি—বাণি !
জেগেছ তুমি মা বিপত্তারিণি,
দুঃখ-বেদনা-বিঘ্ন-বারিণি,
জেগেছ অভয়া, সতত-সদয়া, রাজ-রাজেন্দ্রাণি !
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, পরমা প্রকৃতি, বাণি !

* * *

নবযুগে নবোদ্যমে সনাতনী শক্তি আবার জাগরিতা ! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ত্যাগ তপস্যা ও নিরন্তর সপ্রেমাহ্বানে ইনি প্রবুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরদেব শ্রীবিবেকানন্দের গুরুগত-প্রাণতার প্রসন্ন হইয়া পরমকল্যাণে নিযুক্তা হইয়াছেন !

অতএব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র পৃথিবীও যে ইঁহার পবিত্র স্পর্শে নবভাবে পূর্ণা হইয়া একদিন কৃতার্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ব্রহ্মসদ্ভাবে ব্রহ্মশক্তি সর্বদা অমোঘ, অবিনাশী,—সর্বান্তর্নিহিত থাকিয়া সর্বদা সকলের নিয়মনকারী।

আবার জগতে নবপ্রবোধিতা শক্তির পূজা প্রসারিত হইবে ! আবার ভারত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সনাতনী ব্রহ্মশক্তির পূজা করিয়া নিজে ধন্য হইবে এবং অপরকে ধন্য করিবে !

—স্বামী সারদানন্দ

শান্তির উপায়*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহাধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

'মন ধোবাঘরের কাপড়—যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে ছুপবে।'

একটা ঘটনা বলি। নিজের জীবনের কথা; বয়স তখন বছর বার। স্কুলের ছুটি। পূজায় শহর ছেড়ে বাড়ী এসেছি। বাড়ীতে মার পূজা। বিজয়ার দিন প্রতিমার সঙ্গে চলেছি, সমবয়সী বহু ছেলেও যাচ্ছে। পাড়াগাঁর রাস্তা একে সরু, তার ওপর জল কাদা, কাজেই সব খালি পা। হঠাৎ পায়ে কি একটা কামড় দিলে। জ্বালাও খুব শুরু হ'ল। মশালধারী একজনকে ডাকলাম। আলোতে দেখি রক্ত বেরুচ্ছে একটু একটু। এমনি মন—ধারণা হ'ল, নিশ্চয় সাপে কামড়েছে। পরক্ষণে মনে হ'ল, ওটা নিশ্চয় বিষাক্ত সাপই হবে। মনের ক্রিয়া আরম্ভ হ'য়ে গেল। মনটা ক্ষততেই পড়ে রইল। যত ভাবি, ততই দেহ অবসন্ন হয়। ঐ তো অবস্থা! সঙ্গের লোকজনদের কিন্তু কিছু বললাম না—আনন্দের ভেতর তাদের নিরানন্দ করতে চাইলাম না। এক বন্ধুর গায়ে ভর দিয়ে অবসন্ন মনে দেহকে কোনও রকমে নিয়ে তুললাম গাঁয়ের একমাত্র রোজার কাছে। মনে হ'তে লাগল চৌদ্দ আনা শক্তি অন্তর্হিত—অন্তিমকাল আসন্ন। রোজা তখন ঘুমোচ্ছে—ডেকে তোলা হ'ল। সে এসে দাওয়ায় আঁকজোক এবং মন্তর টন্তর শুরু ক'রে দিলে। যেটুকু জ্ঞান আছে, তাতে সবই দেখছি ও শুনছি। একটা থমথমে ভাব। ক্ষতের কারণ রোজা কি বলে, সেই দিকেই সবার মন। সে শুনে বললে,—'কৈ সাপের কামড় ব'লে তো মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, আবার ভাল ক'রে দেখি।' আবার আরো কত আঁকজোক এবং মন্তর টন্তর পড়া চললো। আমিও আশা-ভয়মিশ্রিত ক্ষীণ আনন্দে দেখছি ও শুনে চলেছি। কিছুক্ষণ পরে দেখি অজান্তে কখন একটু উঠে বসেছি, খানিকটা বলও যেন শরীরে এসেছে। মনে হচ্ছে ওটা তো পোকা-মাকড় হ'তে পারে? রোজা কাজ শেষ ক'রে বললে, 'না, ওটা সাপের কামড় মোটেই নয়—অন্য কোন পোকা-মাকড়ের কামড়ই হবে। ও কিছু না।' ওর কথা শুনে মন খুশিতে ভরে গেল এবং ফেলে-আসা দলের সঙ্গে মেশার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। উঠে পড়লাম। আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম—একেবারে পাড়ি দিলাম পুকুরধারে মার প্রতিমা বিসর্জনের আনন্দ আস্বাদন করতে।

দেখ দেখি—কতকগুলি প্রতিকূল চিন্তা মনটায় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করলে যে দেহের মধ্যে স্নায়বিক নিষ্ক্রিয়তা এনে দিলে এবং দেহকে ধরাশায়ী ক'রে দিলে। পরক্ষণে চিন্তাধারা বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে এমন এক অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ল যে, দেহের স্নায়ুগুলি সজীব ও সতেজ হ'য়ে উঠল—দেহ সুস্থ ও সবল ক'রে দিলে। এই চিন্তাধারাগুলিই তো রঙ—যে রঙে যেমনি ভাবে মন রাঙাও।

মনটাই তো সব। মনেতেই সব। ত্যাগও মনে, গ্রহণও মনে। ঠাকুর বলতেন, জনক রাজা একসঙ্গে দুখানা তরবারি ঘুরাতেন। সংসারী হয়েও ত্যাগী ছিলেন তিনি। সংসারে সব কাজ করবে, কিন্তু মনটা রাখবে আড়ায়—কচ্ছপের মত।

কত উপদেশই না ঠাকুর দিয়েছেন! তেল

* রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২০-৮-৫৭ তারিখে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ শ্রীশচীন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক অনুলিখিত।

মেখে কাঁঠাল ভাঙতে বলেছেন। তাঁর দিকে মন রেখে সংসার করলে সংসারে আসক্তিরূপ আঠা লাগবে না।

সংসারের অবস্থা কি দেখ। পাওয়ার জন্য কত চেষ্টা। মান, যশ, ঐশ্বর্য—আরও কত কিছুর পেছনে কি ছুটোছুটি। দেখছ না, লোকে কি এক নিবিষ্ট মন দেয় মাছ ধরার সময় ফাতনার দিকে। পাশ দিয়ে হয়তো একটা বাজনা বাদ্যি ক'রে বর গেল, হয়তো বা কেউ এসে কত প্রশ্ন ক'রে নিরুত্তর দেখে চলে গেল। সে জানতেও পারলে না এ সব। কী একাগ্রতা! এই একাগ্রতা তো বহু জিনিসের ওপর দিচ্ছে লোকে। এটা তো বিরল নয়। যে মনটাকে বিক্ষিপ্ত ক'রে বহু জিনিসে রেখেছ সেই মনটাকেই তো নিবিষ্ট করছ বিশেষ একটা বস্তু লাভের জন্য। একাগ্রতার ফল আছেই। ঐ ফল লাভেই কত আনন্দ! এ আনন্দ কত দিনের জন্য? এ পাওয়া তো ক্ষণিকের পাওয়া!

মনটাকে বাহিরের জিনিস থেকে কুড়িয়ে ভেতরে আনো দেখি? হৃদয়ে যিনি চিরবিরাজমান, সেই দেবতাকে নিবিষ্টভাবে চিন্তা কর দেখি। ঐ দিকে মনকে একাগ্র কর দেখি। মনকে এই ভাবে ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত করাই যোগ।

'ত্যাগ' কথাটির তাৎপর্য কি? 'গ্রহণ' কথার সঙ্গে 'ত্যাগ' কথাটি না মিলে 'ত্যাগ' কথার অর্থ ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা যাবে না। একদিকে গ্রহণ, আর একদিকে ত্যাগ। পূব দিকে যত এগোবে, পশ্চিম দিক ততটা পিছিয়ে যাবে।

জীবনে ত্যাগ তো সব সময়েই করতে হচ্ছে। ছোটকে ত্যাগ ক'রে বড়কে গ্রহণ তো করছ-ই। দুঃখকে ত্যাগ ক'রে সুখকে গ্রহণ করার চেষ্টা তো প্রতিনিয়ত চলছে। পরম সুখ চাও তো মিথ্যাকে ত্যাগ কর, সত্যকে গ্রহণ কর। পাপকে ত্যাগ কর, পুণ্যকে গ্রহণ কর। মন্দকে ত্যাগ কর, ভালোকে গ্রহণ কর। অসৎকে ত্যাগ কর, সৎকে গ্রহণ কর। তবে সাবধান! ঘৃণার পাত্র যেন কেউ না হয়। ঘৃণা কাকে করবে? তুমি তার কতটুকু জান? তার কোটী কোটী পূর্ব জন্মের হিসাব কি তোমার জানা আছে? জগাই-মাধাইকে মহাপ্রভু কি ক'রে গেলেন? বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণির কথা ভাব—তার কথা তার প্রেমাস্পদকে কি ভাবে ফেরাল। মা বলতেন—কীটপতঙ্গকে পর্যন্ত ঘৃণা করতে নেই। কি তাঁর শিক্ষা! তুলসীদাসের কথা ভাব দেখি। পত্নীর প্রতি কী তার আকর্ষণ! কিন্তু যখন পত্নীর মুখ দিয়ে ভর্ৎসনা-বাক্য বেরিয়ে এল, তখন তুলসীদাসের মনে ধিক্কার এল—জীবনের মোড় ফিরে গেল। পত্নী তার গুরুর কাজ করলে। তুলসীদাস তার প্রেমের ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দিলে পরম প্রেমময়ের শ্রীচরণে।

মন বড় চঞ্চল। মনের ধর্মই ছুটোছুটি করা। 'জরু, জমি ও টাকা'—এ সবে তো মনকে বন্ধক দিয়েছ। ও সব থেকে মনকে ওঠানো কি সহজ ব্যাপার? ঠাকুরের পাদপদ্ম পেতে হ'লে—আনন্দের খনিতে যেতে হ'লে তা করতেই হবে। কিভাবে হবে? গীতা বলেছেন, 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।' সৎ-অসৎ বিচার ক'রে তম ও রজ পার হ'তে হবে। যত অভ্যাস করবে তত এগোবে। ক্রমশঃ সত্ত্ব, শুদ্ধ সত্ত্ব এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বের অবস্থায় আসবে। এই তপস্যা।

তপস্যা কি? উপোস করাই কি তপস্যা? শুধু দেহের নিগ্রহই কি তপস্যা? তপস্যা ওকে বলে না। বুদ্ধদেব এমনই অনশন আরম্ভ করেছিলেন যে, তাঁকে অস্থিচর্মসার হ'তে হয়েছিল। এত দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলেন যে একদিন চলতে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি ভুল পথে চলেছেন। তখন তিনি পরিমিত আহার শুরু করলেন। বীণার তার পরিমিতভাবে বাঁধা থাকলেই শ্রুতিমধুর সুর ঝঙ্কৃত

হয়। বেশী আলগা হলেও বেসুরো, বেশী টান হলেও বেসুরো। গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ :

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

সব কিছু পরিমিত চাই। ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ করার অভ্যাসই তপস্যা।

গীতা, চণ্ডী, উপনিষৎ প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থপাঠ, সাধুসঙ্গ, সাধুমুখে উপদেশ শ্রবণ—সবই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের সহায়ক। শুধু পাণ্ডিত্যে হবে না।

একটা গল্প বলি। ষড়্‌দর্শনে বিশারদ এক পণ্ডিত ছিলেন। সব জানা সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। শান্তি না পেয়ে এক সাধুর উপদেশপ্রার্থী হলেন। সাধুজী তাঁকে আশ্রম-সংলগ্ন পুকুরে স্নান ক'রে আসতে বললেন। স্নানের পূর্বে তিনি একটি বড় মাছকে পুকুরে ভাসতে দেখলেন। মাছ পণ্ডিতজীকে বললে—'শুনেছি তুমি বড় পণ্ডিত—বলতে পার কি, কিসে আমার পিপাসা দূর হয়?' পণ্ডিতজী দুই কারণে আশ্চর্যান্বিত হলেন। প্রথমতঃ তাঁর মনে হ'ল মাছ কি ক'রে কথা বলছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি আরও বিস্মিত হলেন এই ভেবে—মাছ সর্বদা জলে বাস করে, তবুও তার পিপাসা মেটে না কেন? কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে তিনি কারণ বুঝতে পারলেন এবং মাছকে বললেন, 'তুমি যদিও জলেই বাস কর এবং সতত জলপান কর, কিন্তু তবু সব জল তোমার মুখ দিয়ে ঢুকে কানের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। এবার তুমি জল মুখে নিয়েই উলটে যাও। তাহ'লে তোমার পিপাসার নিবৃত্তি হবে। সব জল বেরিয়ে যায় বলেই তোমার পিপাসা দূর হয় না।' মাছটি তখন পণ্ডিতকে বললে, 'আমারও তোমার প্রতি এই উপদেশ। তুমিও উলটু (উলটে) যাও।' ফিরে এসে পণ্ডিতজী সাধুকে সব ঘটনা বললেন। সাধুজী মৃদুহাস্যে বললেন, 'আমি মৎস্যরূপে তোমায় ঐ উপদেশ দিয়েছি। যদিও তুমি বই-পড়া জ্ঞানের সাগরে ডুবে আছ, তথাপি তোমার তৃষ্ণার নিবারণ হচ্ছে না। মনে শান্তি পাচ্ছ না, তার কারণ তোমার বিদ্যা পরিপক্ক হয় নাই। সব যদি বের হয়েই যায়, তবে কাজ হবে কিরূপে? ভিতরে গ্রহণ ক'রে অনবরত মনন করতে হয়, মনন ব্যতীত ধারণা হয় না। তাছাড়া, অধিক বিদ্যালাভ হওয়ায় তোমার মনে অহংকার জন্মেছে। আত্মম্ভরিতা ও মমত্ববুদ্ধি—এই দুইটি আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায়। এই দুটিই তোমার অশান্তির কারণ। সুতরাং এদের ত্যাগ করা প্রয়োজন। এই কারণেই তোমাকে আমার উপদেশ—'তুমি উলটু (উলটে) যাও'।

তাই বলি একবার উলটে যাও দেখি! কত বই পড়েছ, কত উপদেশ শুনছ ও শুনেছ। মনে মনে শ্রুত এবং অধীত বিষয়ের চিন্তা কর। একেই বলে মনন। মনন না হ'লে ধ্যান কি ক'রে হবে? রসে না ডুবলে 'রসো বৈ সঃ'-কে কেমন ক'রে পাবে? তাই বলি রসস্বরূপকে পেতে হ'লে তুমি রসপিপাসু হও।

এ জন্মে যা কিছু করছ তা পুরুষকার; পূর্ব পূর্ব জন্মে যা করেছ, তা তোমাদের সংস্কার। এ জন্মের সুখ ও দুঃখ পূর্ব জন্মের সংস্কারের ফল। শুধু পুরুষকার ও সুসংস্কার দিয়েই তাঁকে পাবে না। শুভ কর্মের অনুষ্ঠান ক'রে শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। মনটাকে শুচিশুভ্র ক'রে না তুললে মনোমন্দিরে মাধব অধিষ্ঠিত হবেন না। শাঁখ বাজিয়ে শুধু গোল বাঁধানই সার হবে।

তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন কর। মহাপুরুষ ও অবতারপুরুষগণ তো পথ দেখানোর জন্যই আবির্ভূত হন।

তাই বলি, প্রীতি দিয়ে তাঁর পূজা কর। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক—কেঁদে ভাসিয়ে দাও। নামে মাতো, আর মাতাও। তাঁর কৃপা হবেই হবে। বিশ্বাস কর। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে ঝাঁপ দাও। শুভ্র জ্যোতির্ময় তাঁর মূর্তি হৃদয়ে উদ্ভাসিত দেখতে পাবে।

মা সারদা

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সারদামণি, সারদামণি, সারদামণি মা !
গৃহিণী, তবু সন্ন্যাসিনী, নাহি যে উপমা।
জ্ঞানদা, জ্ঞান-বিভূতি জ্যোতি,
মূরতিমতী সাধ্বী সতী,
ভকতি-ধারে গঙ্গা তুমি,
প্রেমেরি যমুনা।
সারদামণি মা !

গোলোকে কি মা লক্ষ্মী ছিলে ?
ত্রেতাতে সীতা রূপটি নিলে,
দ্বাপরে হ'লে শ্রীরাধা তুমি
গোপেরি ললনা।
সারদামণি মা !

কলিতে হ'লে বিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়া ধামেতে ;
এবারে তুমি এলে কি মাগো সারদা নামেতে ?
আঁখি যার আছে চিনেছে তোমা,
লক্ষ্মী তুমি হ্লাদিনী গো মা,
কত যে রূপে, কত যে সাজে
করিছ করুণা ;
সারদামণি মা !

বিভব সব লুকায়ে মা গো নিজেরি মাঝেতে
জগতে তুমি শিক্ষা দিলে যোগিনী সাজেতে।
শিখালে সংযমের সাথে
বাঁধিতে সব কঠোর হাতে,
শিখালে তুমি নারীতে আছে
কি মহাচেতনা।
সারদামণি মা !

শিখালে তুমি জগতজনে আপন করিতে,
শিখালে তুমি সবার হৃদি প্রেমেতে ভরিতে।
যাওনি কভু সুখের পাছে,
দেখালে দুখে কি সোনা আছে,
চাওনি তুমি 'মায়ের' কাছে
লঘিমা, অণিমা।
সারদামণি মা !

তোমারে নমি ভকতি-খনি, সারদামণি মা
নমি মা নারী-মুকুট-মণি লক্ষ্মী-স্বরূপা।
গৃহিণী-রূপা সন্ন্যাসিনী,
স্নিগ্ধ-স্নেহ-মন্দাকিনী
বহালে তুমি জগতজনে
করিতে করুণা।
সারদামণি মা !

নমি মা মহাশক্তি, মহাভক্তি-স্বরূপা।
নমি মা স্নেহ-পয়োধি-ঘন-মূর্তি অনুপা।
তোমারি পূত চরণ-পাতে
লভিল ধরা আশিস্ মাথে
দুঃখী-দীন-শরণ তুমি
করুণাখনি মা,
সারদামণি মা !

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

স্মরণের মণিমঞ্জুষায় মাত্র গুটিকত রত্ন সযত্নে রক্ষিত ছিল। ক্লান্ত দিনের শেষে কুলায়ে ফিরে আসা মন নিয়ে নিভৃত মন্দিরে ব'সে তাই দেখছিলাম—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পবিত্র গুটিকত স্মৃতিকথা, অল্প কয়েক দিনের পরিচয়ে যা আমার জীবনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল।

প্রথম যেদিন গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই আমার নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে, সে কি আগ্রহ—সে কি উদ্বেগ নিয়ে সেদিন বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম, ভাষাতীত সে অনুভূতি! দেখলাম যেন হিমাচলেরই নিভৃত এক অংশে স্থিত প্রশান্ত গম্ভীর এক বিরাট মূর্তি। ঘরে গিয়ে প্রণাম করতে তিনি বললেন, 'বসুন'। বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে আমরা তাঁর দিকে চেয়ে বসে রইলাম। কোন কথা মুখে এল না।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথা থেকে আসছেন?' বললাম, 'বালিগঞ্জ থেকে।' তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপ। মনের মধ্যে কি এক অভূতপূর্ব পবিত্র নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল।

আমাদের মনের ইচ্ছার কথা বোধহয় আগেই শুনেছিলেন, কিংবা বুঝতে পেরেছিলেন; আমাদের আগ্রহান্বিত অবস্থা দেখে সহসা নিজেই বললেন, 'শুধু মন্তোর নিলে হবে না, সেই রকম কাজ করতে হবে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'পবিত্র হতে হবে।'

আবার নিস্তব্ধ হ'য়ে আমরা ব'সে আছি। তিনি সেই ঘরে তাঁর সেবককে বললেন, 'এঁরা কবে আসবেন একটা দিন বলে দাও।'

সেবক দিন স্থির ক'রে সেই তারিখ আমাদের বলে দিলেন। আমরা আবার প্রণাম ক'রে উঠছি, এমন সময় আবার বললেন, 'সাবধান হ'য়ে আসবেন যেন, অতদূর থেকে আসবেন।'

সেবক বললেন, 'আজকাল আসবার কিছু অসুবিধা নেই, সোজা বাস হয়েছে।' তখন বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া পর্যন্ত প্রথম বাস চলাচল আরম্ভ হয়েছিল।

গুরুদেব তখনি উত্তর দিলেন, 'বাস হলেই তো হয় না, অতদূর থেকে আসা, একবার ওঠা, একবার নামা।'

অভিভূত মনে আমরা ঘর থেকে বিদায় নিলাম। জানা নেই, চেনা নেই, আলাপ নেই তাদেরই প্রতি এই অহেতুকী দরদ,—উদয়াস্ত নিজের কথা-ভাবা মানুষ আমরা ভাবতে পারিনে। কোন লোককে কাজে পাঠিয়েছি, ফিরে আসতে তার দেরি হ'লে বিরক্ত হ'য়ে কত কটূক্তি করি। মনে আসে না, তার কিছু অসুবিধা হয়েছিল কি না। আর আমাদেরই প্রয়োজনে আমরা যাব, তাতে তাঁর চিন্তা হচ্ছিল, ব্যাকুল মন নিয়ে ভাবছিলেন, অতদূর থেকে যেতে বাসে একবার ওঠা, একবার নামা, কোন দুর্ঘটনা না ঘটে—বললেন, 'সাবধানে আসবেন'। সেই দিনই ধারণা হ'য়ে গেল ওই হিমাচল-সদৃশ বহিঃকঠোর মূর্তির মধ্যে কি পরিমাণ স্নেহপ্রেমের মন্দাকিনী ব'য়ে চলেছে।

জানি এই অপরের কথা ভাববার স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণ-প্রেরণা থেকেই বিশ্বসৃষ্টির আদিম কাল থেকে জীবকুল পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে। তবু সম্যক ধারণা করতে পারলাম কি? যাঁর অংশ-প্রসূত এই বিরাট হৃদয়াধার, সমগ্র হিমালয়রূপী সেই বিশাল মহামানবটি কেমন ছিলেন। কি এক অপূর্ব পুলকের আবেগে চোখে জল এসে গেল।

আগুনের তাপে ফুটন্ত জলের ময়লা উপরে ভেসে ওঠে। গুরুদেবের সান্নিধ্যে যাওয়া আসা

করি, আর চঞ্চল মনে কত দ্বন্দ্ব, কত প্রশ্ন বিগত দিনের জানা-অজানা কত ভুল-ত্রুটির বেদনা সমস্ত চিত্ত জুড়ে আলোড়িত হ'তে থাকে। মনে হয় মন উজাড় ক'রে সব কথা বলি, প্রশ্ন করি। যখন যাই, তখন প্রশান্ত গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে যাই; কিছু আর বলা হয় না। তা-ছাড়া বেলুড় মঠে তখন অসম্ভব ভিড় হ'ত গুরুদেবকে দর্শনের জন্য। কথা বলবার সময়ও পাওয়া যেত না। শুধু অভূতপূর্ব এক ভাব-সম্ভারে মন পরিপূর্ণ ক'রে ফিরে আসতাম।

একদিন ঐ কথাই ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণ মন নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়েছি। ঠাকুর প্রণাম শেষ ক'রে সবুজ মাঠটা পার হ'তে হ'তে ভাবছি এই সব মহাপুরুষের দেহত্যাগের পর তাঁদের প্রতিকৃতি নিয়ে কত উৎসবের আয়োজন! আর তাঁরা সশরীরে থাকতে তাঁদের দেখতে পাওয়া, একটু মুখের উপদেশ শোনা এত দুর্লভ,—এ কেমন কথা?

পৌঁছে যখন ঘরের মধ্যে গেলাম, সেদিন দেখি ঘর ফাঁকা, সুস্মিত মুখে গুরুদেব বসে আছেন। আমি প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—"কি, উপদেশ?" একটু থেমে বললেন, "সহ্য ক'রবে। প্রথম ভাগে দেখছো না তিনটে 'স' আছে, শ, ষ, স। সহ্য করবে।"

আবেগের সঙ্গেই বলে ফেললাম, "শুধু সহ্যই ক'রবো, কোন সার্থকতা আসবে না?"

গুরুদেব গম্ভীর অন্তর্মুখ ভাবে বললেন, "সার্থকতা, ভগবান লাভ হ'লে।"

আবার একদিন গুরুদেব এসেছেন শুনে মঠে গেলাম। প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলাম, পুজোটুজো কি রকম ভাবে করব? উত্তরে বললেন, যখন যে ভাবে ইচ্ছে।

বললাম—কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ সব দেবতার পূজাই ক'রব কি?

ব'ললেন—হ্যাঁ, তা করবে বৈ কি।

পূজা-আরাধনার কোন জ্ঞানই তো ছিল না। মনে হ'ত ঠাকুরের মধ্যেই যদি সব দেবতা আছেন, তবে আর তাঁদের ভিন্ন নামে ডাকা কেন? এক ঠাকুরের নামে ডাকলেই তো হয়। বললাম —অন্য দেবতাদের কি ঠাকুরের নামেই ডাকব, না তাঁদের নামে ডাকব?

গুরুদেব বললেন, যাঁর যে নাম, তাঁকে সেই নামে ডাকাই তো ভালো। যার নাম হ'ল রাম, তাকে শ্যাম ব'লে ডাকলে সে সাড়া দেবে কেন?

এমন সহজ কথাটা ভাবি নি। যেমন লজ্জিত হলাম, তেমনি আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে ফিরে এলাম সেদিন।

কিসে ধর্ম লাভ হবে প্রশ্ন করায় আর একদিন বলেছিলেন,—সত্যকে আঁট ক'রে ধরবে। একেবারে ঠিক ঠিক চলা। যা মুখে বলা, তাই কাজে করা। ঠাকুর সত্যস্বরূপ।

কিসে আনন্দ পাব, প্রশ্ন করায় বলেছিলেন, আনন্দ তো রয়েছেই, দেখে নিতে পারলেই হয়।

আর এক দিন মঠে গিয়ে দেখি, গুরুদেব সহাস্যে বসে আছেন। ঘরের এক পাশে স্তূপাকার মিষ্টি ছিল। সেবক বললেন, এগুলি সব এঁদের দিয়ে দাও। আমার ছোট্ট ছেলেকে নিজ হাতেই মিষ্টি দিলেন।

তাঁর এলাহাবাদ ফিরে যাবার সময় হয়েছিল; বললাম, আপনাকে চিঠি দেব।

তিনি সহাস্যে বললেন,—হ্যাঁ, আমি কিন্তু জবাব দেব না।

—যদি কিছু দরকার হয়!

—দরকার হ'লে দেবো।

শুনেছিলাম, তিনি প্রায় চিঠির জবাব দিতেন না। আমাদের সাধারণ মানুষের মন, প্রথম দিকে কেমন আশাহত হ'ত। পরে তাঁর বিষয়ে বিশেষ ভাবে জেনে বুঝেছিলাম, তিনি সর্ববিষয়ে কি কঠোর সংযমী ও তপস্বী ছিলেন। লোকালয়ে

এসে সরল শিশুর মত অকপট সান্নিধ্য সকলকে দান করলেও—যখন তিনি এলাহাবাদে তাঁর নিজের সাধনপীঠে ফিরে যেতেন, তখন কিরূপ নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনায় সমাহিত হ'য়ে থাকতেন। ভক্ত শিষ্য প্রমুখ জগতের যাবতীয় মানবের কল্যাণ-কামনা ও আশীর্বাদ সে সাধনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশে শ্রাবণের ধারার মতই নিয়ত বর্ষিত হ'ত। চিঠি লেখা বা তার উত্তর দেবার তাঁর প্রয়োজন কোথায়? তবে বিশেষ প্রয়োজন ও ইচ্ছাবশে কখনও ব্যতিক্রম করতেন। আমাদের একবার মাত্র তাঁর চিঠি পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

যাঁরা সব সময় তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন তাঁদের কাছে শুনেছি, সময়ে সময়ে তিনি কি অপূর্ব কৌতুকপূর্ণ বাক্যালাপে সকলকে আনন্দরসে ভাসিয়ে দিতেন।

এর পর একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-পূজায় মঠে গিয়েছি। সন্ধ্যার দিকে একজন সেবক গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ ক'রে দিলেন। ঘরের মধ্যে মৃদু আলো জ্বালা। আধ-অন্ধকারে তিনি দক্ষিণ দিককার জানালাটি ধ'রে উৎসবের জনতার দৃশ্য দেখছেন। উন্নত দেহে জানালার সবটুকুই প্রায় ঢেকে গিয়েছে। বইয়ে পড়েছি স্বামী বিবেকানন্দ এমনই ভাবে ওই দক্ষিণের জানলা ধ'রে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের জন্মোৎসবের দৃশ্য দেখেছিলেন।

ভিতরে গিয়ে প্রণাম করতে কুশল প্রশ্ন করলেন, কিছুক্ষণ পরেই বললেন,—সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, এখন এসো।

পরের বারের দর্শন বড়ই বিষাদের। গুরুদেবের শরীর খারাপ। খবর দেওয়াতে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শুয়ে ছিলেন, ঘরে যেতে উঠে বসলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি শরীর খারাপ?

বললেন, হ্যাঁ আমার শরীর খারাপ।

আর কিছু কথা বলা উচিত মনে করলাম না। নীরবে মাটিতে প্রণাম ক'রে চলে এলাম।

তিনি একটু সুস্থ হ'য়ে আবার এসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নবনির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়। তিনদিনব্যাপী উৎসবের মধ্যেই আর একদিন গিয়ে দেখি গুরুদেবকে দর্শন ও প্রণামের জন্ম ভীষণ ভিড় হয়েছে ঘরে। শরীর খারাপ, সেবক পায়ে হাত দিতে দিচ্ছেন না; তাড়াতাড়ি পায়ে মোজা পরিয়ে দিলেন। আমিও প্রথমে পায়ে হাত দিতে গিয়ে বারণ করাতে হাত সরিয়ে নিলাম। ঠিক তখনই গুরুদেব তাঁর বড় বড় চোখের চাহনিতে আমার দুঃখ-ম্লান চোখের দিকে তাকালেন।

সেই শেষ দর্শন। এলাহাবাদে তাঁর দেহ রক্ষার সংবাদ পাওয়ার পর অবলম্বন-শূন্যের মত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। একজন পূজনীয় মহারাজ সান্ত্বনা দিলেন, "ওরা কি কখনো ছেড়ে যান? দেহ যাবার পর ওঁদের সত্তা আরও ব্যাপক ভাবে অবস্থান করে। তাই শক্তি আরো বেশী হয়। ওঁদের আরো বেশী নিকটে পাওয়া যায়। ওঁদের জন্ম শোক বা দুঃখ করার কারণ নেই।"

সেই সান্ত্বনা নিয়ে আর গুরুদেবের পদচিহ্ন বুকে ধারণ ক'রে বাড়ী ফিরে এলাম। জীবনের আকাশে যখন দুঃখের ঘোর ঘনঘটা ঘনিয়ে আসে—অন্ধকারে ছেয়ে যায় হৃদয়াকাশ, তখন মনে পড়ে শ্রীমুখের সেই সব কথাগুলি, আর শেষ দিনের সেই বড় বড় চোখের কৃপা-ঘন দৃষ্টি সেখানে ধ্রুব তারার মতই জ্বলতে থাকে—অমৃতবর্ষী, অচপল।

গৌতম বুদ্ধের সাধনা

[তাঁহার সম্বোধিলাভে সুজাতার সহায়তা]

(আশ্বিন-সংখ্যার পর)

ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

পূর্বে বর্ণিত অবস্থাভেদে যজ্ঞ ও তপস্যাদিতে দোষদর্শী হইয়াও গতানুগতিক রীতি অবলম্বন করিয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হইতে অভিলাষী হইলেন। নিজ সংকল্প স্থির রাখিয়া তিনি গয়া নগরীর আশ্রমের নিকটে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে কৌণ্ডিন্যপ্রমুখ পাঁচ প্রব্রজিত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগদ্বারা সংপূজ্যমান হইয়া জন্ম ও মৃত্যুর অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে —'কোটিপ্পত্তং দুক্করকারিকং করিস্সামীতি' (নিদানকথা)—শেষসীমায় উপগত দুষ্কর তপস্যাদি) ক্রিয়া সম্পাদন করিব—বলিয়া ধার্য করিলেন। তৎপর তিনি এমন ভাবে আহারচ্ছেদ আরম্ভ করিলেন যে, একটি তিল বা একটি তণ্ডুলমাত্র গ্রহণ করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। অনশনাদি দ্বারা তাঁহার ছয় বৎসর চলিয়া গেল। একদিন এমনও হইল যে, তিনি প্রাণবায়ুরোধকারক তপস্যা-কালে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় কাষ্ঠবৎ আসীন হইলে লোকেরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়াছিল। শমপ্রত্যাশী বোধিসত্ত্ব উপবাসাদি আচরণ করিয়া অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়িলেন—তাঁহার সুবর্ণবর্ণ দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার শরীরস্থ দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ-লক্ষণ অদৃশ্য হইতে লাগিল। অপার-পার সংসারের পারপ্রাপ্তি তাঁহার ঘটিল না। তাঁহার শরীরের মেদ, মাংস ও রক্ত শুকাইয়া গেল। ত্বগস্থিশেষ হইয়া তিনি ভাবিলেন :

"নায়ং ধর্মো বিরাগায় ন বোধায় ন মুক্তয়ে।
জম্বুমূলে ময়া প্রাপ্তো যস্তদা স বিধির্ধ্রুবঃ॥"
(বুদ্ধচরিত)

—(কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা আচরিত) এই ধর্ম বৈরাগ্য, সম্যগ্‌জ্ঞান বা মুক্তি—কোনটাই আনিতে পারিবে না। (পূর্বে পিতার রম্যোদ্যানে) জম্বুবৃক্ষমূলে আমি যে (ধ্যান) বিধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাই ধ্রুব বা ঠিক বিধি।—এই কঠোর তপস্যাসাধনকে অমার্গ মনে করিয়া তিনি উত্তম উত্তম আহার্য বস্তু গ্রহণে মতি স্থির করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীর হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া আসিয়া অল্পমাত্র খাদ্যের জন্য উরুবিল্বা গ্রামে যাইয়া (মহাবস্তুর মতে) গ্রামিকের কন্যা সুজাতার (বুদ্ধচরিতের মতে গোপ-কন্যা নন্দবালার) প্রদত্ত মধু-পায়স গ্রহণ করিয়া সন্তর্পিত ষড়িন্দ্রিয় হইয়া ক্রমশঃ বোধিপ্রাপ্তির সামর্থ্য লাভ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বকে দুষ্করচর্যা দ্বারা সর্বজ্ঞতালাভের চেষ্টায় বিরত দেখিয়া এবং পুনরায় সুখাদ্য গ্রহণে প্রবৃত্ত লক্ষ্য করিয়া সেই ভিক্ষুপঞ্চক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বিরক্তিসহকারে দূরবর্তী কাশীরাজ্যের ঋষিপত্তনে (মৃগদাবে) চলিয়া গেলেন। তৎপর যিনি অরাড় ও উদ্রক ঋষির ধর্মমতবাদে অপরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি আজ পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের নিষেবিত এই গয়াপ্রদেশে যাইয়া বোধিলাভের উদ্দেশ্যে কৃতনিশ্চয় হইয়া অশ্বত্থমূলে সমাসীন হইয়া এই এক দুর্জয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই আসনে বসিয়া তাঁহার শরীর শুষ্ক হইয়া যায় যাউক, তাঁহার ত্বক্‌, অস্থি ও মাংস লুপ্ত হয় হউক, কিন্তু, বহুকল্পেও দুর্লভ বোধি বা প্রজ্ঞা-পারমিতা লাভ না করিয়া তিনি নিজ শরীর এই আসন হইতে চালিত করিবেন না। পাঠক জানেন যে, তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা ফলমণ্ডিত হইয়াছিল এবং

এই বোধিবৃক্ষমূলে সেই আসনে বসিয়াই সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি 'সম্যক্‌সম্বুদ্ধ' হইয়াছিলেন।

অতঃপর অতিসংক্ষেপে মধুপায়সদাত্রী সুজাতার আখ্যানবস্তু 'নিদানকথা' ও 'মহাবস্তু' হইতে চয়ন করিয়া নিম্নে প্রদান করিতেছি। নিদানকথাতে বর্ণিত আছে যে, শ্রীবুদ্ধের উরুবিল্বায় ছয়-বৎসর-ব্যাপী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যাপৃত থাকাসময়ে সেই সেনানী-নিগমে সেনানী কুটুম্বীর গৃহে সুজাতা-নাম্নী বয়ঃপ্রাপ্তা এক দুহিতা বাস করিত। সে এক ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে বৃক্ষদেবতার নিকট এই প্রার্থনা করিতে গেল যে, যদি সমজাতিক কুলঘরে বিবাহিত হইবার পর প্রথম-গর্ভে সে পুত্র লাভ করে, তবে প্রতিবৎসর শতসহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া বৃক্ষদেবতার জন্য বলিকর্ম সম্পাদন করিবে। যখন বোধিসত্ত্ব গৌতম তদীয় দুষ্কর তপস্যার ষষ্ঠ বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন, তখন বৈশাখী পূর্ণিমা আগত হইয়াছে। সুজাতা বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্যে সেই দিনই বলিকর্ম সম্পাদন করিতে অভিলাষ করিল এবং প্রাতঃকালে নবভাজনে (পাত্রে) ধেনুদিগের স্তনমূল হইতে স্বতঃপ্রসৃত অপর্যাপ্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিল। আশ্চর্যের বিষয় যে সেই দুগ্ধ সুজাতা স্বয়ং জ্বাল দিবার সময়ে দেখিল যে একবিন্দু দুগ্ধও পাকের সময় উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়া গেল না। এরূপ আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করিয়া সে তাহার পূর্ণা-নামক দাসীকে ডাকিয়া বলিল যে, নিশ্চিতই তাহাদের দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন এবং তাহাকে ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে দ্রুত যাইয়া দেবতাস্থান পরিষ্কৃত রাখিতে বলিল। বোধিসত্ত্ব গৌতমও পূর্বরাত্রিকালে পঞ্চস্বপ্নদর্শনে জানিয়াছিলেন যে, আগামী রাত্রিতেই তিনি নিঃসংশয়ে 'বুদ্ধ' হইবেন। তাই তিনি সেই রাত্রি প্রভাত হইলে পর সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া আসীন হইয়া চারিদিক নিজ শরীরপ্রভায় উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। সুজাতার দাসী পূর্ণা বোধিসত্ত্ব গৌতমের প্রভায় সেই বৃক্ষকে সুবর্ণবর্ণ দেখিয়া মনে করিল যে, তাহাদের বৃক্ষদেবতা প্রসন্ন হইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্বহস্তেই সুজাতার বলিকর্ম স্বীকার করিবেন। পূর্ণা বেগে যাইয়া সুজাতাকে এই সংবাদ জানাইল। তখন সুজাতা তাহার নিজহস্তে প্রস্তুত মধুপায়স সুবর্ণপাত্রে ঢালিয়া লইয়া সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বকে দেখিয়াই তাঁহাকে বৃক্ষদেবতা বলিয়া জ্ঞান করিল। সুজাতা পাত্রসহ পায়স সেই মহাপুরুষ গৌতমের হস্তে প্রদান করিল এবং বলিল,—"আপনি ইহা লইয়া যথারুচি চলিয়া যাউন—যেমন আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, তেমন আপনার অভীষ্টও সিদ্ধ হউক"। সেই পায়স লইয়া বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনানদীর তীরে গেলেন এবং তাহা ঘাটের সোপানে রাখিয়া নদীতে স্নান করিয়া প্রথমতঃ সেই মধুপায়স উনপঞ্চাশ ভাগে ভাগ করিয়া একভাগ আহার করিলেন। বোধিলাভের পর এই পায়স তিনি সাত সপ্তাহ-কাল পরিভোগ করিয়াছিলেন, অন্য কোন আহার গ্রহণ করেন নাই।

উপরি-বর্ণিত 'নিদানকথা'য় উল্লিখিত এই আখ্যান হইতে খানিকটা পৃথগ্‌ভাবে বর্ণিত 'মহাবস্তু-অবদানে' উল্লিখিত আখ্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ :

অরাড় কালাম ও উদ্রক ঋষির উপদিষ্ট তত্ত্ব-কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া বোধিসত্ত্ব গৌতম উরু-বিল্বায় চলিয়া আসিলেন। সেখানে গ্রামিকের (গ্রামপতির) সুজাতা-নাম্নী বিদুষী কন্যা রাজ-পুত্রকে দেখিয়া প্রীতিবেগে কাঁপিতে লাগিল; অশ্রুপাত করিয়া তাঁহাকে বলিল,—"হে নরবর! তুমি আজ এই নিগম (ক্রয়বিক্রয়ের নগর) হইতে ফিরিয়া যাইও না। তোমাকে দেখিয়া আমার নয়নদ্বয় অতৃপ্ত রহিয়াছে; তুমি চলিয়া গেলে আমার হৃদয় সর্বতোভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে"। সেই সময়ে সুজাতা দেববাণী শুনিল—"এই ব্যক্তি কিন্তু কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের শ্রেষ্ঠ পুত্র"।

সে ভাবিল—কেমন করিয়া এই বরপুরুষ বান্ধবদিগকে ছাড়িয়া বনবাস করিতেছেন। তৎপর কুমারকে পুনরায় বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুজাতা রোদন-সহকারে বোধিসত্ত্বের অনুগমন করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিল—"তোমার কমলদলসদৃশ কোমল চরণদ্বারা তৃণকুশাদিময় দুর্গম ভূমির উপর দিয়া তুমি কিরূপে চলিবে? মিষ্টান্ন ও অন্যান্য রসময় দ্রব্যদ্বারা বর্ধিতদেহ তুমি কেমন করিয়া বনের ফলমূলাদি ভক্ষণ করিবে? পুষ্পাকীর্ণ শয্যায় শুইতে অভ্যস্ত তুমি কি প্রকারে তৃণকুশাদি-সংস্তৃত তলভূমিতে শয়ন করিবে? রাজভবনে পটহাদির সঙ্গীত শুনিয়া এখানে তুমি কি প্রকারে রুষ্ট শ্বাপদ জন্তুদিগের গর্জন শুনিবে? হে বনেচর সন্ন্যাসী! তুমি যেন তৃষ্ণায় ও ক্ষুধায় কাতর না হও। দেবশিশুর ন্যায় তোমার শরীরটিকে যেন দেবযোনিরা রক্ষা করেন"। বোধিসত্ত্ব গৌতম এইরূপে সেই ভয়ঙ্কর বনমধ্যে তপস্যায় নিরত রহিলেন। ইহাও বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে সত্ত্বসার তপস্বী গৌতম যেরূপ নিজের জন্য, তদপেক্ষা অধিকভাবে জগতের সর্ব সত্ত্বের জন্য, হিত কামনা করিতেছেন। তাঁহার মনে এই প্রকার উদার ভাব উদিত হইল—(এইরূপ ভাব পরবর্তী কালে মহাযানী বৌদ্ধদিগের মতসম্মত):

একৈকসত্ত্বমোক্ষণে যদি কল্পসংখ্যাং সর্বসত্ত্বানাং।
দুঃখমনুভোমি তারেষ্যং সর্বসত্ত্বানাং ব্যবসিতমিদম্॥
(মহাবস্তু)

'এক একটি সত্ত্ব বা জীবের মোক্ষের জন্য যদি আমি অসংখ্য কল্পে সর্ব সত্ত্বের দুঃখ অনুভব করি, তথাপি আমি সর্ব সত্ত্বের উদ্ধার সাধন করিব—ইহাই আমার ক্রিয়াসঙ্কল্প'। কর্মক্ষয়ের জন্য ছয় বৎসর ব্যাপিয়া বনমধ্যে দুষ্কর তপস্যাদির আচরণ করিবার পর বোধিসত্ত্বের এই জ্ঞান লব্ধ হইল—"যত্র পথাস্মি গতো নায়ং মার্গো মোক্ষায়"—'আমি যে পথে গমন করিয়াছি তাহা মোক্ষের মার্গ নহে'। বরং শাক্যরাজের উদ্যানে বহুপূর্বে জম্বুবৃক্ষমূলে বসিয়া আমি যে প্রথম ধ্যান সম্পাদন করিয়াছিলাম—"স ভবিষ্যতি বোধয়ে মার্গো"—'সেই ধ্যানমার্গই বোধি বা সম্যক প্রজ্ঞার মার্গ হইবে'। যে ব্যক্তি দুর্বল ও কৃশ এবং যাহার রুধির ও মাংস পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে বোধিলাভ সম্ভবপর নহে; তাই আমি পুনরায় আহার্য বস্তু ভক্ষণ করিব"। এই সময়ে এক দেবতা তাঁহাকে আহার্য গ্রহণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"তুমি পুনরায় আহার করিও না, তোমার যশঃ পরিহীন হইবে—আমরাই তোমার গাত্রে বল সঞ্চার করিব।" গৌতমের বিশ্বাস, এই বচন সত্য হইতে পারে না, তাই তিনি ভীতভাবে দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিন্দা করিলেন—"তোমাদের সেই চেষ্টায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।" ইহার পরেই তিনি মুদ্গ (মুগ) ও অন্যান্য কলায় ও গুড়মিশ্রিত যূষ ভোজন করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমশঃ শরীরে শক্তি ও বল অনুভব করিতে লাগিলেন এবং আহার অন্বেষণে উরুবিল্বাগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে পূর্বে কোন জন্মে তাঁহার জনয়িত্রী (জননী) সেই সুজাতা-নাম্নী উচ্চকুলসম্ভূতা ও পণ্ডিতা নারী ন্যগ্রোধ-বৃক্ষমূলে মধুপায়স গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গৌতমকে সেই পায়স দান করিয়া সে তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিল। তিনি সুজাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিমর্থমেতং দদাসি দানম্"—তুমি কি কারণে আমাকে এই (পায়স) দান দিতেছ? গৌতমের শত শত জন্মের জননী সুজাতা উত্তরে বলিলেন—"তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহা গ্রহণ কর। শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের পুত্র ভয়ঙ্কর বনে ছয় বৎসর ঘুরিয়া তপস্যা-দ্বারা যাহা অন্বেষণ করিতেছেন সেই উদ্দেশ্য যেন পূর্ণতা লাভ করে। আমিও তাঁহার পথেই যাইতে চাই।" অন্তরীক্ষ হইতে তখন এক অমানুষী বাণী প্রাদুর্ভূত হইল:

'সুজাতে এষো সো ধীরো শাক্যরাজকুলোদিতো'—হে সুজাতে! এই ব্যক্তিই সেই শাক্যরাজকুলে উদিত ধীর বা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। এই ব্যক্তি নিজের শোণিত ও মাংস শুষ্ক করিয়াও তপোবনে দুষ্কর ও রোমহর্ষণ তপস্যা করিয়াছেন। তাহা নিরর্থক বলিয়া ত্যাগ করিয়া তিনি এখন ন্যগ্রোধমূলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—যেখানে অতীত সংবুদ্ধগণও উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপর সুজাতা আনন্দে অশ্রুপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই নরশ্রেষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন—হে কমললোচন মহাপুরুষ! আমি তোমাকে উগ্র তপস্যা হইতে উত্থিত হইতে দেখিয়াছি; এখন আমার শোকমথিত হৃদয় প্রীতি অনুভব করিতেছে। বিগত ছয় বৎসর আমি নিজে যে সুখশয্যাসমূহে ঘুমাইয়াছি, সে সব আমার কোন সুখই উৎপাদন করিতে পারে নাই—কারণ, আমি তোমার কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের কথায় শোকশরের আঘাত-তাপে ক্লিষ্ট হইয়া সর্বদা চিন্তা করিয়াছি। এখন তোমাকে চিনিতে পারিয়া এই বলিতেছি যে, তোমার সেই রাজ্য ও প্রজারা, তোমার পিতা ও স্নেহকাতরা মাতৃষ্বসা (গৌতমী) তোমার সেইরূপ কঠিন তপস্যার অবসানের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন। কপিলবস্তুর নরনারীরা এখন হাস্যপূর্ণবদনে আনন্দে প্রমুদিত হইয়া উঠিবে। আমার প্রদত্ত মধুপায়স উপভোগ করিয়া পূর্বজন্মের আকাঙ্ক্ষাসমূহের নির্ঘাতক বা নাশকারী হও এবং এই দ্রুমরাজমূলস্থ ভূমিখণ্ডে বসিয়া—"অমৃতমধিগতো পদমশোকম্"—শোকাতীত অমৃতপদ (নির্বাণ) প্রাপ্ত হও। তখন বোধিসত্ত্ব গৌতম ব্যক্ত করিলেন—পাঁচ শত জন্মে তুমি আমার জননী ছিলে। ভবিষ্যৎকালে তুমি জৈনব্রত ধারণপূর্বক প্রত্যেক-বুদ্ধপদ লাভ করিতে পারিবে (অর্থাৎ স্বয়ংই বুদ্ধত্বলাভের অধিকারিণী হইতে পারিবে)!

ইহাই সুজাতা-সম্বন্ধীয় আখ্যান-বস্তু। জননী-সদৃশা সুজাতার প্রদত্ত পায়স আহার করিয়া নিরর্থক কঠোর তপস্যার অন্তে বোধিসত্ত্ব গৌতম সম্যক্ সংবোধিলাভের চেষ্টায় কৃতকৃত্য হইতে পারিয়াছিলেন। পাঠক জানেন যে, সংবুদ্ধ হইয়া গৌতম ঋষিপত্তনে ধর্মচক্র প্রবর্তন সময়ে ভিক্ষুগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, প্রব্রজিতের পক্ষে দুইটি 'কোটি' বা অন্ত পরিত্যজ্য—(১) সংসারের কামসুখভোগে আত্মসমর্পণ ও (২) কঠোর তপস্যায় নিরত হইয়া আত্মক্লেশভোগ। তাই তিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ-নামক মধ্যম প্রতিপদা বা মধ্যমপথের আবিষ্কার করিয়া জনগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই পথই সম্বোধি ও নির্বাণের পথ। জ্ঞান, শান্তি, অভিজ্ঞা প্রভৃতি এই পথেই পাওয়া যায়।

কবীর-বাণী

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

("আজ মেরে প্রীতম্ ঘর আয়ে" বাণীর অনুবাদ)

প্রিয়তম মোর এসেছেন গৃহে
আনন্দ আজ নাহি ধরে,
গৃহ অঙ্গন করিনু মুক্ত
মুক্তাধারায় অশ্রু ঝরে!
প্রেমের সলিলে প্রভুর চরণ
করিব ধৌত পরাণভরে,
সফল হইবে জীবন আমার
পাইব প্রভুরে নূতন ক'রে।

পঞ্চ সখীরা সকলে মিলিয়া
গাহিছে নিত্য নূতন গীতি,
তাহাদের সাথে অন্তর মোর
মিলায় তাহার চরম প্রীতি!
প্রেমের অর্ঘ্যে আরতি করিব
করিব আরতি পরাণ ভরি,
আপনারে বলি দিব বার বার
কিছুতেই আর নাহি ডরি!
কহিছে কবীর ধন্য আমি যে
পরম পুরুষ হৃদয়ে ধরি!

শঙ্কর-দর্শনে "মিথ্যা"

(আশ্বিন-সংখ্যার পর)

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

পূর্ব প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা ক'রে দেখান হয়েছে যে, শঙ্করের মতে, বিশ্ব-সংসার পারমার্থিক দিক থেকে 'মিথ্যা' হ'লেও, সম্পূর্ণ 'তুচ্ছ' বা 'অসৎ' নয়। বস্তুতঃ, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, পরিশেষে পরিত্যাজ্য হ'লেও প্রারম্ভে এই জগৎই মোক্ষের প্রথম সোপান।

ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি কর্মবাদ, তদনুসারে জাগতিক ক্ষেত্রে যেরূপ প্রত্যেক কারণেরই একটী বিশেষ কার্য এবং প্রত্যেক কার্যেরই একটী বিশেষ কারণ থাকে—সেরূপ মানসিক ক্ষেত্রেও, নীতির ক্ষেত্রেও প্রত্যেক কার্যেরই একটী বিশেষ ফল থাকে। পুনরায়, সেই কর্মটী যদি কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় এবং বুদ্ধিবিচার-পূর্বক সম্পাদন করেন, তা হ'লে তিনি হবেন তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। সেজন্য সেই কর্মের ন্যায্য ফলটীও—ভালই হোক আর মন্দই হোক, আজই হোক আর কালই হোক—তাঁকে ভোগ করতেই হবে। এই তো ন্যায়ের অমোঘ বিধান—যেমন কর্ম, তার তেমনি ফল; তার তেমনি ভোগ কর্মের কর্তা-কর্তৃক। স্বেচ্ছায় ও যথোচিত চিন্তা-আলোচনার পরে, কর্ম ক'রেও যদি আমরা তার ফল ভোগ না করি, তা হ'লে তা ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত কোনোটাই নয়—এই হ'ল ভারতের ঋষিদের সুদৃঢ় অভিমত।

কিন্তু এক্ষেত্রে, একটী সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হ'তে হয়। এই জন্মে, বর্তমান পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি সাধারণতঃ অসংখ্য কর্মে লিপ্ত হন, যার প্রত্যেকটীর ফলভোগ করবার তাঁর সময়-সুযোগ-সুবিধা হয় না। নানা কারণে, প্রত্যেকটী কর্মই তার ন্যায্য, যথোপযুক্ত ফল প্রসব করতে পারে না বর্তমান জীবনেই। এরূপ কর্মের ফলভোগ হবে কি উপায়ে?

এই সমস্যার সমাধানরূপে ভারতীয় দার্শনিকগণ অবতারণা করেছেন—ভারতীয় দর্শনের আরেকটী মূলীভূত ভিত্তি—'জন্মান্তরবাদের'। ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারেই যখন প্রত্যেক কর্মের ফলভোগ অনিবার্য, তখন এ জন্মে না হ'লেও পরজন্মে সেই সকল অভুক্ত কর্মের ফলভোগ কর্মকর্তাকে করতেই হবে। এরূপে, সেই নূতন সৃষ্টিতে, জীব প্রাক্তন কর্মানুসারে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করে; প্রাক্তন কর্মের ফলভোগ করে। সেজন্য 'কর্মবাদ' ও 'জন্মান্তরবাদ' একই কেন্দ্রীভূত দার্শনিক তত্ত্বের দুটী দিক মাত্র।

কিন্তু সকল সমস্যার সমাধান তো এক্ষেত্রেও হ'ল না। কারণ, এই নূতন জন্মে জীব যে কেবল প্রাক্তন কর্মের যথোপযুক্ত ফলভোগ করে, তা-ই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই সে নানাবিধ নূতন কর্মেও প্রবৃত্ত হয়, যে সকল কর্মের ফলও সেই একই জন্মে ভোগ করা সম্ভবপর হয় না।

এর উত্তর হ'ল এই যে, পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে, জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে অভুক্ত কর্মের ফলোপভোগের জন্য। সেই নূতন জন্মেও সে নূতন কর্মে রত হবে। যার জন্য তাকে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করতে হবে। এই ভাবে, জন্ম→কর্ম→জন্ম→কর্ম এই প্রণালীতে তাকে নিরন্তর বিঘূর্ণিত হতে হবে। এরই নাম 'অনাদি সংসারচক্র।' এই হ'ল জীবের শোকদুঃখপূর্ণ 'বদ্ধাবস্থা।'

কিন্তু এই সংসার-চক্র থেকে মুক্তির উপায়

কি? মুক্তির উপায় নিষ্কাম-কর্ম-সাধন। কর্ম-দুই প্রকার: সকাম ও নিষ্কাম। সকাম কর্ম বা ভোগেচ্ছাজনিত কর্মের ফল-ভোগ স্বভাবতই কর্মকর্তাকে করতেই হয়, এবং সেজন্য পূর্বোক্ত রীতিতে জন্মজন্মান্তর বা সংসার চক্রে বিঘূর্ণন তার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম, বা শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম সম্পূর্ণ কামনাশূন্য, ভোগেচ্ছা-বিহীন ভাবে পর-সেবার্থে সম্পাদন করলে, সেই কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না, এবং সেজন্য কর্ম-কর্তাকে জন্মান্তর-ভাগীও হ'তে হয় না। এরূপে একটী নূতন জন্মে, প্রাক্তন সকাম কর্মের ফলভোগমাত্র ক'রে, নূতন কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে সম্পাদন ক'রে, চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে মুমুক্ষু অন্যান্য সাধনাবলম্বনে মুক্তি লাভ করেন।

সেজন্য নীতির দিক থেকে, মুক্তির দিক থেকে এই হেয় সংসারের প্রয়োজনও অল্প নয়। প্রথমত: নীতির দিক থেকে, সকাম কর্মের ফল-ভোগ অনিবার্য, এবং একমাত্র সংসারেই এরূপ ফলভোগ সম্ভব হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত: মুক্তির দিক থেকে, সকল কর্মের ক্ষয় অত্যাবশ্যক, এবং কর্মফল ক্ষয় হয় কেবলমাত্র কর্মফলোপভোগের দ্বারাই, অভুক্ত কর্মের ফল পূর্বোক্ত প্রকারে সঞ্চিত হ'য়ে ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারেই জীবকে জন্মান্তর-ভাগী ও সংসারবদ্ধ করে। এরূপে, কর্ম→ফলভোগ→কর্মফলক্ষয়—এই হ'ল মোক্ষের প্রণালী। সংসারে এইভাবে কর্মফল-ভোগ সমাপ্ত হ'লে, কর্ম-বিমুক্ত হ'য়ে সাধক অবশেষে সাধনাভ্যাস-দ্বারা মুক্তিলাভে ধন্য হন।

সুতরাং, জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ-স্বরূপ সংসার তার মোক্ষাবস্থারও প্রথম সোপান; যেহেতু সকামকর্ম যেরূপ করা হয় এই সংসারে, তাদের ফলভোগও সেরূপ করা হয় এই সংসারেই; পুনরায়, নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তিপ্রমুখ বিভিন্ন সাধনের অনুশীলনও সেরূপ করা হয় এই সংসারেই—অন্যত্র কোথাও নয়। সেজন্য, ভারতীয় দর্শন মতে, সংসার পরিশেষে পরিত্যাজ্য হলেও, প্রারম্ভে অবশ্য প্রয়োজনীয়—এই সংসার থেকে নিষ্কৃতির উপায় এই সংসারই আমাদের ক'রে দিতে পারে,—অন্য কিছু নয়।

এই কারণে, অদ্বৈতবাদী শঙ্করও সংসারের পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করলেও, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তার ব্যবহারিক সত্তা স্পষ্টতমভাবে স্বীকার করেছেন।

যথা: ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (২।১।১৪), শঙ্কর এ বিষয়ে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন। পূর্বপক্ষীয় প্রতিবাদী এস্থলে একটী অতি স্বাভাবিক আপত্তি উত্থাপন ক'রে বলছেন যে, বিধিপ্রতিষেধ-শাস্ত্র ভেদসাপেক্ষ; ভেদ না থাকলে তার ব্যাঘাত হয়; সমভাবে, মোক্ষশাস্ত্রও ভেদমূলক—গুরু-শিষ্যপ্রমুখ নানাবিধ ভেদ এতে আছে। সেজন্য, অদ্বৈতবাদ-অনুসারে যদি একমাত্র অভেদকেই সত্য ব'লে গ্রহণ করা হয়, তাহলে মোক্ষশাস্ত্রও অসত্য হ'য়ে যাবে, এবং এরূপ অসত্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট একাত্মবাদও অসত্য হবে। এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন:

"অত্রোচ্যতে—নৈষ দোষঃ। সর্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ স্বপ্ন-ব্যবহারস্যেব প্রাক্ প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্ব-প্রতিপত্তিঃ, তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ফল-লক্ষণেষু ব্যবহারেষ্বনৃতবুদ্ধির্ন কস্যচিদুৎপদ্যতে। বিকারানেব ত্বহং মমেত্যবিদ্যয়াত্মাত্মীয়-ভাবেন সর্বো জন্তুঃ প্রতি-পদ্যতে, স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতা-প্রবোধাদুপপন্নঃ সর্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ। যথা, সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য জনস্য স্বপ্ন উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি—প্রাক্ প্রবোধাৎ, ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়স্তৎকালে ভবতি, তদ্বৎ।"

অর্থাৎ, অপরের আপত্তি এক্ষেত্রে উত্থাপিত করা চলে না; যেহেতু, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পূর্বে সমস্ত

ব্যবহারাদি বা পার্থিব জীবনযাত্রা-প্রণালীকে সত্য-রূপে গ্রহণ করলে, দোষের হয় না; যেরূপ স্বাপ্ন-ব্যবহারও জাগরণের পূর্বে সত্যরূপেই গৃহীত হয়। বস্তুতঃ, যতদিন না পর্যন্ত অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, ততদিন কোনো ব্যক্তিই প্রমাণ-প্রমেয়, ফলাদিপ্রমুখ সকল ব্যবহারিক বা জাগতিক বিষয়কে মিথ্যারূপে গ্রহণ করে না। সেই সময়ে, সকলেই নিজদের স্বরূপগত ও স্বাভাবিক ব্রহ্মত্ব উপেক্ষা করে; অবিদ্যার বশীভূত হ'য়ে 'অহং মম'-ভাবের দাস হ'য়ে পড়ে। সেজন্য ব্রহ্মাত্মতাবোধের পূর্ব পর্যন্ত সকল লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। যেমন নিদ্রিত সংসারী ব্যক্তি জাগরণের পূর্ব পর্যন্ত স্বপ্নদৃষ্ট বিবিধ পদার্থ, ভাব, ব্যবহার প্রভৃতিকে সত্য ব'লেই নিশ্চিন্তে গ্রহণ করে, সে সময়ে সে ঐ সকলকে অসত্য ব'লে উপলব্ধি করতেই পারে না—এক্ষেত্রেও ঠিক তাই।

এই একই সূত্রের ভাষ্যে অন্যত্রও তিনি বলেছেন:

"প্রাক্ চাত্মৈকত্বাবগতেরব্যাহতঃ সর্বঃ সত্যানৃত-ব্যবহারো লৌকিকো বৈদিকশ্চেত্যবোচাম।"

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের অপর এক স্থলেও শঙ্কর এই একই কথা বলেছেন।

এক্ষেত্রেও সেই একই আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, ব্রহ্মই যদি একমাত্র তত্ত্ব হন, অভেদই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হয়, তা হ'লে উপাসনা ও উপাসকের মধ্যে ভেদও বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে; এবং ভক্তি শাস্ত্রোপদিষ্ট ভক্তি,, উপাসনা প্রভৃতি অসম্ভব হ'য়ে পড়বে। উত্তরে একই ভাবে শঙ্কর বলছেন:

"প্রাক্ প্রবোধাৎ সংসারিত্বাভ্যুপগমাৎ, তদ্-বিষয়ত্বাচ্চ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্য।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৪।১।৩)—অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম ও জীবজগতের একত্ব ও অভিন্নত্ব উপলব্ধি করবার পূর্বে, জীবের সংসারিত্ব বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকে—সে কথা স্বীকারে বাধা নেই। সেই অবস্থায় সাধারণ প্রত্যক্ষাদি-মূলক ব্যবহারাদিও সত্যরূপেই গৃহীত হয়।

ব্রহ্মের তুলনায় মিথ্যা হ'লেও, স্বাপ্ন জগতের তুলনায় যে বিশ্ব-জগৎ পারমার্থিক—এ কথাও শঙ্কর স্পষ্টভাবে বলেছেন—

"পারমার্থিকস্তু নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদি-সর্গবদিত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদি-সর্গস্যাপ্যাত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাদিতং হি তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বম্। প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদি প্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি, সন্ধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চ, প্রতিদিনং বাধ্যত—ইত্যতো বৈশেষিকমিদং সন্ধ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩।২।৪)।

অর্থাৎ স্বাপ্ন সৃষ্টি আকাশাদি-সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক সত্য নয়। অবশ্য আকাশাদি-সৃষ্টিরও আত্যন্তিক বা শাশ্বত সত্যতা নেই। সমগ্র বিশ্ব-প্রপঞ্চই যে মায়ামাত্র—এ কথা প্রতিপাদিত করাই হয়েছে। ব্রহ্মাত্মদর্শনের পূর্বে, আকাশাদি-প্রপঞ্চ যথাযথরূপেই বিরাজ করে, কিন্তু স্বাপ্ন প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত হ'য়ে যায়—এই হল স্বাপ্ন জগৎ ও জাগ্রৎ জগতের মধ্যে প্রভেদ। সেই জন্যই স্বাপ্ন জগৎকে মায়ামাত্র বলা হয়েছে।

এই সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা পরে করা হবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

দক্ষিণেশ্বর সর্বধর্মের সর্বপ্রকার সাধনার মহাতীর্থ। এরই তীর্থদেবতা মহাশক্তি—শ্রীশ্রীমা সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মর্ত্যলীলা পরিক্রমার স্তরে স্তরে যে সব তত্ত্ব অধ্যাত্মসাধনার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রূপদান করেছিলেন, সে সব তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বহিঃপ্রকাশ শ্রীশ্রীমা। যে ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে তমসার পারে সর্বশক্তিমান পুরুষ এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, সেই ইচ্ছাশক্তিই আদ্যাশক্তি ও মহামায়া। এই মহামায়াই মর্ত্যকায়া গ্রহণ ক'রে মহাযোগীশ্বর পরমপুরুষ পরমহংসদেবের লীলা-সঙ্গিনী হয়েছিলেন। মাতৃ-ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় ভগবানের অবতরণ হয়েছিল এই বঙ্গভূমিতে। এবারে তিনি এসেছিলেন মহাশক্তিকে পূর্ণভাবে প্রকাশ ক'রে তাঁরই মহিমার বাণী বিশ্ববাসীকে শোনাতে,—তিনি এসেছিলেন মানুষের অন্তর্লোকের সকল দ্বন্দ্ব সংশয় দূর করতে, সকল জটিল সমস্যার সমাধান ক'রে দিয়ে মানুষকে ঠিক পথে চলবার নির্দেশ দিতে।

মূর্তিমতী মহাশক্তি শ্রীশ্রীমা সারদার সঙ্গে তিনি ছিলেন অভিন্ন ও একাত্মা। দক্ষিণেশ্বরে এঁদের অবস্থানকালে বহু সাধনার বহু সাধকের ধারা যুগল চরণ স্পর্শ ক'রে গেছে। তাই এঁদের তপোভূমি দক্ষিণেশ্বর শুধু আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র নয়—নবতম মহাপীঠস্থান। আজও এখানে দেবতাদের বিহার হয়—কোন কোন ভাগ্যবান তা দেখে থাকে।

ভারতীয় দর্শনের মূলকথা ঈশ্বরদর্শন, পরমার্থ-সত্যজ্ঞান বা সত্য বস্তুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও দিব্যানুভূতি। বিশ্বোত্তীর্ণ বস্তুর ধারণা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে নেই বললেই চলে—বস্তুবিশ্বকে কেন্দ্র ক'রে তার মননের পরিক্রমা। মন ও বুদ্ধির ওপর পাশ্চাত্ত্যদর্শন বোধির স্থান নির্ণয় করেছে বটে, কিন্তু বুদ্ধির সীমা পেরিয়ে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' ব্রহ্মবিহারের রসঘন স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। ব্যক্তি মনের চিন্তা, ধারণা, রুচি ও উপলব্ধির সঙ্গে বিশ্বমনের কোথায় যোগসূত্র, এর সন্ধান দিয়েছে ভারতীয় দর্শন। এই দর্শনের মূর্তবিগ্রহ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও আদ্যাশক্তির অবতাররূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদা। দক্ষিণেশ্বরে যে প্রদীপ জ্বেলে পরমহংসদেব নীরাজন করেছিলেন, সে প্রদীপে ছিল মায়েরই আলোক শিখা, যে আসন তিনি পেতে নির্জনতার মন্দির থেকে এনে দিয়েছিলেন সত্যধন, সে আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন শ্রীশ্রীমা। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার দিব্যলীলা অচিন্ত্যরহস্যময়। পূর্ব অবতার-পুরুষগণের জীবন-কাব্যে এরূপ ছন্দের কোন পরিচিতি নেই—এইটেই হচ্ছে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-গরিষ্ঠতা।

শ্রীশ্রীমা সারদাসুন্দরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন জয়রামবাটীতে ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ। ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ তাঁর তিরোভাব। সাতষট্টি বৎসর ধরে তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন দেহের ভিতর আত্মার মতো। তাঁরই জন্মস্থান থেকে অনধিক দুই ক্রোশ দূরে প্রভু গদাধরের জন্ম হয়—দুইটি জেলার মিলনের মোহানায় প্রকৃতি ও পুরুষের লীলা-কেন্দ্র।

মায়ের আবির্ভাবের পশ্চাতে আছে তাঁর সঙ্কেত ও বাণী—এখানে সেটি বলার প্রয়োজন আছে। একদা বসন্তের গোধূলি-নির্ঝরে যে সময়ে মায়ামৃগ স্নান করছিল, সে সময়ে আমোদরের তীরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করলেন জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টি হঠাৎ কেন্দ্রীভূত হ'য়ে গেল দিক্‌চক্রবালের দিকে।

ব্রাহ্মণ দেখলেন চক্রবালের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে বিরাটকায় একটি সিংহ, পৃষ্ঠে তার আরূঢ়া জ্যোতির্ময়ী যজ্ঞোপবীতধারিণী মহাশক্তি দেবী জগদ্ধাত্রী। সিংহবাহিনীকে তিনি প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় বিস্মিত হ'য়ে দেখেন দ্বিভুজা মানবী রূপ ধারণ ক'রে প্রসন্নবদনা মা মধুরহাস্যে তাঁকে বললেন—'বাবা, এবার হেমন্ত শেষে তোমার বাড়ী যাব' ; ব্রাহ্মণ পুলকিত হলেন।

শ্রীশ্রীমা অতি সাধারণের মধ্যেই দীন ব্রাহ্মণ পরিবারের পর্ণকুটীরে জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু শৈশবেই তিনি দেখিয়েছেন নিজের অসাধারণত্ব তাঁর পল্লীবাসীকে। সকলে লক্ষ্য করেছে শৈশবেই তাঁর ধ্যান-তন্ময়তা, জননী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে তাঁকেও পূজায় বিভোর হ'তে অনেকেই দেখেছে।

জগদ্ধাত্রী পূজার সময় হলদে পুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল পূজো দেখতে এসেছিলেন দেবীকে প্রণাম করতেই সম্মুখে দেখতে পেলেন প্রতিমার সম্মুখে সারদামণি ধ্যান করছিলেন। খানিকক্ষণ এক পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ বালিকা সারদার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন শেষে ভয় পেয়ে চলে এলেন, বললেন—কে সারদা, কে জগদ্ধাত্রী—কিছু ঠাহর ক'রতে পারলাম না।

শৈশব থেকে তিরোভাবের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা সরলভাবে সকল জীবের সেবা ক'রে গেছেন মহাজীবনের করুণার প্রস্রবণ-ধারায় প্রাণিমাত্রকেই নিষ্ণাত ক'রে আর জগৎকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন এই কথাই ব'লে—'যত্র জীব, তত্র শিব।' এই উপলব্ধি বাল্যে তাঁর পক্ষে কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল এটা ভেবে দেখবার বিষয় নয় কি ?

ছেলেবেলায় তাঁকে গলা-সমান জলে নেমে গাভীর জন্যে দলঘাস কাটতে হয়েছে। ধানের ক্ষেতে কখনও রৌদ্রদগ্ধা—কখনও বারিস্নাতা হ'য়ে গিয়েছেন তিনি 'মুনিষদের' জন্যে মুড়ি নিয়ে, শেষে পঙ্গপালে ধান নষ্ট করছে দেখে তিনি ছুটে গিয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে ধান সংগ্রহ করেছেন। মা সারদার পর শ্যামাসুন্দরীর পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে হ'য়েছিল—ছেলেবেলায় ভাইবোনদের লালন পালন করতে মাকে তিনি সাহায্য করতেন। পশুপালনও ছিল তাঁর দৈনন্দিন কার্য। তাঁর গুণে খেলার সঙ্গিনীরা মুগ্ধ হ'ত। বাল্যকালে শ্রীশ্রীমার প্রধান খেলা ছিল কালী বা লক্ষ্মী মূর্তি গড়ে পূজা করা—পূজা করতে করতে তিনি ভাবে বিভোর হ'য়ে যেতেন। শান্ত সরলতার সঙ্গে গাম্ভীর্যভাব, সচরাচর বালিকাদের মধ্যে দুর্লভ। আমাদের গদাধর যাঁর সঙ্গে তাঁর মর্ত্যলীলা প্রকট হয়েছিল, তিনিও শৈশবে শ্রীকৃষ্ণ ও নিমাই-এর মতো দুরন্ত ছিলেন ; অবশ্য চঞ্চলতার মধ্যেও তাঁর প্রকৃতিতে পরিস্ফুট হ'ত নির্জনতা-প্রীতি, একাগ্রতা ও ভাবতন্ময়তা।

মা দুঃখের বেশ ধরে দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে জন্ম নিয়েছিলেন, তাই তাঁর মা শ্যামাসুন্দরীর সকল প্রকার সংসারের কাজে তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করতে হয়েছে,—চরকায় সুতো পর্যন্ত কেটেছেন। ছয় বছরের মেয়ে যখন বিবাহের পর কামারপুকুরে পতিগৃহে যাত্রা করলেন তখন শ্যামাসুন্দরী তাঁর নয়নের মণি সারদার অভাবে সংসারের সকল দিকে অন্ধকার দেখেছিলেন—তাঁর মৌনম্লান মুখে হাসি ফুটতে বেশ বিলম্বই হয়েছিল।

পাঁচ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমার বিবাহ হ'ল দক্ষিণেশ্বরের ভাবোন্মাদ পূজারী ঠাকুরের সঙ্গে। পাত্রের বয়স যখন চ'ব্বিশ তখন পাত্রী হ্লাদিনী শক্তির জীবন্ত বিগ্রহরূপিণী মা সারদা ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করেছেন। ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে এই দুইটি হৃদয়ের পার্থিব লীলাঘর রচনা করবার জন্যে শুভ বিবাহের দিন নির্ধারিত হ'ল। বিবাহ-রাত্রেই গদাধরের হাতের মাঙ্গলিক সূত্র বরণ-ডালার প্রদীপ-শিখায় দগ্ধ হ'য়ে যায়। অপ্রসন্না পুরনারীদের তীব্র মন্তব্য ও সর্বপ্রকার অমঙ্গলের

দুঃশ্চিন্তা দূর ক'রে তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন সুকণ্ঠ গদাধর সুমধুর শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে।

বাসর-কক্ষ থেকেই শ্রীশ্রীমার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাতীত আত্মিক সম্বন্ধ—এইখান থেকেই মায়ের আজীবন মহাব্রতের সূত্রপাত। তার পর পতিগৃহে এসে চন্দ্রমণির লক্ষ্মীর ঝাঁপি মাথায় ক'রে নিয়ে শ্রীশ্রীমা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করলেন। গদাধর দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে গেলে বালিকাবধূ স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে স্বামীর চরণ ধৌত ক'রে স্বহস্তে পাখার বাতাস দিয়ে তাঁর শ্রান্তি দূর করেছিলেন। মায়ের বুদ্ধিমত্তা, প্রীতির নিদর্শন ও পতি-ভক্তি, যা শৈশবে প্রকাশ পেয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে পরম বিস্ময়।

শ্বশুরালয়ে কয়েক দিন থেকে গদাধর নববধূকে নিয়ে কামারপুকুরে ফিরে গেলেন। মাতৃভক্ত গদাধর জননীর ইচ্ছানুসারে কিছু কাল কামারপুকুরে ছিলেন; আর পারলেন না, তাঁর সাধনভূমি দক্ষিণেশ্বর তাঁকে ডাক দিল। এর পর থেকে বিরহিণী বধূকে কখন পতিগৃহে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছে, কখনও বা পিত্রালয়ে অবস্থান করতে হ'ত।

মা ছেলেবেলায় কয়েকদিন মাত্র পাঠশালায় গিয়েছেন, শ্বশুরালয়ে অবসর-সময়ে পাঠাভ্যাস করতেন, এতেও তাঁকে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে, তবু তাঁর উৎসাহ হ্রাস পায় নি। পরবর্তীকালে মা অল্প স্বল্প পড়তে পারতেন এবং আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছেন কত সঙ্গীত ও ছড়া; আর আমরা পেয়েছি তাঁর বহু অমূল্য বাণী।

তন্ত্র ও বেদান্ত সাধনার শেষে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে এলে জয়রামবাটী থেকে লোক পাঠিয়ে শ্রীশ্রীমাকে আনা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আনয়নের ব্যাপারে আপত্তি করেন নি, উল্লসিতও হন নি; কিন্তু ভৈরবী ব্রাহ্মণী চিন্তিত হয়েছিলেন। দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থেকে ব্রাহ্মণী তাঁকে অবতার-পুরুষ জেনেও মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হয়েছিলেন, কিন্তু তোতাপুরী নিঃশঙ্ক ছিলেন—তিনি বলেছিলেন, 'বিয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে, যার আত্মসংযম আর আত্মজ্ঞান পাকা, তার মন টলাতে কেউ পারে না'—মনে যে গেরুয়া পরেছে, তারই তো হয়েছে আসল সন্ন্যাস—ব্রাহ্মণী হয়তো ভেবেছিলেন এই দম্পতীর সংযমের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। যা হোক ব্রাহ্মণী ভৈরবীর দুশ্চিন্তাও উদ্বেগ অচিরে অপসারিত হ'য়ে গেল। ব্রাহ্মণীর অন্তরে যে চিন্তার আলোড়ন উঠেছিল, শ্রীশ্রীমা তা অনুমান করেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণীর এ রকম আচরণ সম্পর্কে তিনি নীরব ছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীমুখ থেকে ব্যক্ত হয়েছে—'বামনী-ঠাকরুণের আচরণ প্রথম প্রথম কেমন খাপছাড়া মনে হ'ত, কিন্তু তাতে আমার মনে কোন ক্ষোভ হয় নি। তিনি যে ঠাকুরের গুরু-মা গো। আমি তাঁকে নিজের মা আর শাশুড়ী ঠাকরুণের মতই ভক্তি করতুম।'······সন্তানের মঙ্গলের জন্যেই গুরুজনেরা সময় সময় কঠোর আচরণ করেন। গুরুজনের কোন কাজেই দোষ দেখতে নেই।

তাঁহার অক্লান্ত সেবা-যত্ন পেয়ে ঠাকুরের ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হ'লে মা বলেছেন—'ঠাকুরের সঙ্গে কামারপুকুরে এই কয়মাস নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে কেটেছে; কত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, কত রঙ্গরসের কথা হ'ত, দিনরাত যে কোন্ পথে চলে গেছে তা বুঝবারও অবসর পাওয়া যেত না।

কামারপুকুরে ছয় সাত মাস এমনিভাবে কাটিয়ে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। মা সারদাও জয়রামবাটীতে ফিরে গেলেন। তাঁর চিত্ত স্বামীর ধ্যানে মগ্ন থাকত; তিনি অনুভব করতেন 'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট' পূর্বের মতই রয়েছে। পিত্রালয়ে তাঁকে গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকতে দেখা যেত—তাঁর মন ছিল নির্লিপ্ত, দিব্যভাবে মগ্ন।

এমনিভাবে দু'বছর চলে গেল। মথুরবাবু ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এদিকে যখন মায়ের

কানে এসে পৌঁছল—ছোট ভটচায পাগলের মতো হয়েছে, কোমরে কাপড় থাকে না, কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন বেহুঁশ থাকে, কখনও কথা বলে না, তখন তিনি চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন—ধীরা স্থিরা অচঞ্চলা কিশোরীর মন দিব্য পুরুষের জন্যে ব্যাকুল হ'ল—এই ভেবে যে, কে তাঁর সেবা করছে, আর কেই বা তাঁকে দেখছে! পল্লীমেয়েরা তাঁর কাছে আসতে লাগল পাগলা স্বামীর জন্যে সমবেদনা জানাতে, মা গম্ভীর হ'য়ে থাকতেন।

১২৭৮ সাল, দোল-পূর্ণিমা আগতপ্রায়। এই উপলক্ষে শ্রীসারদামণির কয়েকজন দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়া গঙ্গাস্নানের জন্যে কলকাতায় যাত্রা করছেন শুনে মা তাঁদের সঙ্গী হবার অভিপ্রায় জানাতে, রামচন্দ্র স্বয়ং তাঁকে নিয়ে কলকাতার দিকে রওনা হলেন, পথ প্রায় ত্রিশ ক্রোশ। পায়ে-চলা পথ ধ'রে সকলে দলবদ্ধ হ'য়ে তারকেশ্বরের পথে যাত্রা করলেন। পদব্রজে দুই ক্রোশের অধিক পথ মা সারদা কখন অতিক্রম করেন নি। দুদিন চলবার পর তিনি দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। এই অবস্থায় তাঁর দিব্যদর্শন হয়েছিল। গভীর রাত্রে তিনি এক শ্যামাঙ্গী নারীর স্নেহশীতল স্পর্শ অনুভব করলেন। মা বলেছেন—'বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল—এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে গেল। বললে, আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।' ঠাকুরের দর্শনলাভের ব্যাকুলতা প্রকাশ ক'রে যখন শ্রীশ্রীমা জ্বরে পীড়িতা হওয়ার জন্যে আক্ষেপোক্তি করলেন, তখন সান্ত্বনা দিয়ে সেই নারী বললেন—'সেকি, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি, ভালো হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে, তোমার জন্যেই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি'।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সেই নারী বললেন—'আমি তোমার বোন হই'। এই সব শুনতে শুনতে মা ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন মেয়েকে সুস্থ দেখে রামচন্দ্র আবার যাত্রা আরম্ভ করলেন আর মেয়েকে পালকিতে তুললেন। যথা সময়ে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বর এলেন। ঠাকুর তাঁকে সাদরে আহ্বান ক'রে ব'লে উঠলেন—'এতদিন পরে এলে? আর কি সেজো বাবু আছে যে, তোমার যত্ন হবে' সেজো বাবু মথুরানাথের অকাল বিয়োগে ঠাকুর কাতর হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সহৃদয় দাক্ষিণ্য পেয়ে পরম প্রীতি লাভ করলেন। ঠাকুরের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও ঔষধ-পথ্যাদিতে মা আরোগ্যলাভ করলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে নিজের ঘরেই পৃথক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন,—কখন কখন উভয়ে এক শয্যাতেও শয়ন করতেন। ঠাকুর প্রায়ই দিব্যভাবে মগ্ন হতেন। এসময়কার রাত্রির কথায় শ্রীশ্রীমা বলেছেন—'সে কি অপূর্ব দিব্যভাব! কখনও ভাবের ঘোরে কথা, কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও একেবারে সমাধিতে স্থির—এই রকম সমস্ত রাত। দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে'।

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে এক ঘরে এক শয্যায় শুয়েও দৈহিক সম্পর্কশূন্যতা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন, 'ও যদি এত ভালো না হ'ত, তবে দেহবুদ্ধি আস্‌ত কিনা—কে বলতে পারে?'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদামণির অতীন্দ্রিয় দাম্পত্য জীবন-লীলার অনুরূপ ছবি ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। আহারের সময় ঠাকুর শিশুর ন্যায় আবদার-আপত্তি জানাতেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করতেন না। মা তাঁকে অতিশয় যত্নের সঙ্গে এবং অনেক অনুরোধ ও কৌশলের দ্বারা ভোজন করাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একদা রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন—'আমার মতো লোকের স্ত্রী কেন প্রয়োজন? এই দেখছ না, পেটে যা সয়, এমন সব খাবার ইনি না থাকলে এমন যত্ন ক'রে কে রেঁধে খাওয়াত? কে এই দেহের যত্ন করত?—নহবতখানার ক্ষুদ্র কক্ষে শ্রীমাকে কত অসুবিধার

মধ্যেই না থাকতে হয়েছে? তার মধ্যেই বিছানাপত্র, চালডাল, তরিতরকারি, থালাবাটি ইত্যাদি সংসারের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস রাখতে মেঝেতে স্থান হ'ত না বলে দড়ির শিকাতে মাথার ওপরও নানা জিনিস ঝুলিয়ে রাখতেন শ্রীমা। একটু অসতর্ক হ'লেই মাথায় আঘাত লাগবার সম্ভাবনা ছিল, কখন মাথায় লেগে কষ্টে সংগৃহীত জিনিষপত্র মাটিতে পড়ে যেত। এই অপ্রশস্ত ঘরে ও অবস্থা-বিশেষে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির নীচেও রান্না হ'ত। আহারাদির পর আবার ধুয়ে মুছে এই ঘরের মধ্যেই শয়নের ব্যবস্থা—এত কষ্ট মা সহ্য করেছেন! এখানেই আশ্রয় পেত আত্মীয় অনাত্মীয় ভক্ত নারীরা। ছোট সঙ্কীর্ণ ঘরেই মাকে পূজা জপ-তপ করতে হয়েছে। আবার রাত্রি তিনটার সময় শৌচস্নানাদি অন্ধকারে সমাপ্ত করতে হ'ত। শ্রীশ্রীমা নিজেই বলেছেন—'রাত চারটায় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত—তাইতে চুল শুকাতুম তখন মাথায় অনেক চুল। একটুখানি ঘর, তা আবার জিনিষপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি মাথার উপরে মাছের হাঁড়ি কলকল করছে, ঠাকুরের জন্যে সিঙ্গিমাছের ঝোল হ'ত কিনা। তবু আর কোন কষ্ট জানিনে—কেবল যা শৌচে যাবার কষ্ট। দিনের বেলায় দরকার হ'লে রাত্রে যেতে হ'ত। কেবল বলতুম, হরি হরি।' বোধহয় অশোকবনে সীতাদেবীরও এরূপ কষ্ট ছিল না। কখনও কখনও দু'মাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতেন না! মনকে বোঝাতেন, 'মন তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি?'

শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবী অনেক সময়ে মায়ের সঙ্গে নহবতখানায় বাস করতেন ও মাকে কাজে-কর্মে সাহায্য করতেন। গৌরীমা বহু তীর্থে তপস্যার পর দক্ষিণেশ্বরে আসলে ঠাকুর তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন—'ওগো, ব্রহ্মময়ী, সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন সঙ্গিনী এলো—'। বয়সে গৌরীমার অপেক্ষা শ্রীশ্রীমা চার বছরের বড় ছিলেন। মা অত্যন্ত লজ্জাশীলা; তাঁকে অবগুণ্ঠনবতী দেখা যেত—কোন পুরুষ মানুষের, এমনকি অন্তরঙ্গ সন্তানদের সামনেও বাহির হ'তে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন। একটি সঙ্গিনী পেয়ে শ্রীশ্রীমার নানা প্রকার সুবিধা হ'ল—বাইরের কাজে সংবাদ আদান-প্রদানে, ঠাকুরের পরিবেশনে মা-ঠাকরুণ গৌরীমার সাহচর্য পেয়েছিলেন। গোপালের মা, কৃষ্ণভাবিনী, গোলাপ-মা প্রভৃতিও মাঝে মাঝে এসে মায়ের কাছে থাকতেন।

শেষদিকে লোকজনের আনাগোনা এত বেড়ে গেল যে, তাঁর পক্ষে একটিবার ঠাকুরের দেখা পাওয়াই দুর্ঘট হ'য়ে উঠত। মা বলেছেন, 'অনেক দিন দেখাই পেতুম না, একবার দেখা পেলে ভাবতুম—আহা, আবার দর্শন পাবো তো?'

'কোন দিন ঠাকুরের ঘর একটু ফাঁকা দেখলেই গোপালের মা ছুটে এসে বলতেন,— ও বৌমা, শিগ্‌গির চলো, গোপালকে একটু দেখা দিয়ে এসো; তোমাদের একত্তর না দেখতে পেলে মনে আমার তৃপ্তি হয় না। ওঠ, শিগ্‌গির চলো, আবার কে কখন এসে পড়বে।—আমার আনন্দের জন্যে তাঁর মনে এত ভালোবাসা জমা ছিল!'

লক্ষ্মীমণি একদা বেলতলায় দেখেছিলেন—ঠাকুর শিবের মত যোগাসনে বসে আছেন, তাঁর বাম পাশে বসে মাতাঠাকুরাণী হাসছেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—'একি হ'ল?' এইমাত্র খুড়িমাকে ন'বতে দেখে এলাম, দিনের বেলায় খুড়িমা এখানে এলেন কি করে? বিস্ময়াবিষ্টা হ'য়ে লক্ষ্মীমণি নহবত-খানায় ছুটে গিয়ে তাঁর খুড়িমাকে দেখলেন রন্ধনের আয়োজন করতে, পরনে সেই রকমই একখানা শাড়ী। তাঁকে কিছু না বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে তিনি বেলতলায় সেই দৃশ্যই দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন।

একবার জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসবার সময়ে তারকেশ্বরের পথে তেলোভেলো মাঠের কাছে অতি বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তরে সন্ধ্যার পর মা-ঠাকুরাণী ডাকাতের সম্মুখে পড়েছিলেন। এই সব ডাকাত শুধু যাত্রীদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত না, সময়ে সময়ে খুনও ক'রত—কালীর সম্মুখে নরবলিও দিত। মা ডাকাতকে যাদুমন্ত্রে যেন করায়ত্ত করেছিলেন। ভীতিবিহ্বল প্রান্তরের মধ্যে একাকিনী শ্রীশ্রীমাকে ডাকাতগৃহিণী আশ্বস্ত ক'রে, আদর-আপ্যায়নের দ্বারা চটির কুটীরে রেখে দিয়ে পরদিন তারকেশ্বরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। পরবর্তীকালে এই ডাকাত-দম্পতী দক্ষিণেশ্বরে তাদের কন্যা ও জামাতার জন্যে ফল মিষ্টান্ন এনেছে—আর এনেছে তাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ডাকাতের পিতাপুত্রী সম্বন্ধ হয়েছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী সেবার উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকা ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত করলে ঠাকুর সে টাকা মাকে নিতে বলেছিলেন। মা উত্তরে বলেছিলেন—'সে কি হয়? আমি নিলেও তোমার নেওয়া হবে, সে টাকা তোমার সেবাতেই খরচ হবে। তুমি যে-টাকা নেবে না, আমি তা কি ক'রে নেব? ও টাকা আমাদের চাইনে'।

পরমহংসদেব বলতেন—'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই; যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন শক্তি বলি, কিন্তু একই বস্তু। অগ্নি বললে অগ্নি দাহিকাশক্তি বুঝায়, দাহিকাশক্তি বললে, অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে অন্যটাকে চিন্তা করবার যো নেই'— এই কথারই তিনি রূপ দিয়ে গেছেন শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তাঁর জীবন-লীলার মধ্য দিয়ে। মাতৃতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। বাইরের মানুষ দেখেছে তাঁকে অবগুণ্ঠনবতী, তাঁকে চিনতে পারে নি, তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারে নি, তাঁর রূপের বিভূতিকে প্রত্যক্ষ করেনি। মাতৃশক্তি দ্বার না খুলে দিলে পরমপুরুষের কৃপা কেমন ক'রে হবে? আর কেমন ক'রেই বা জ্ঞান-প্রজ্ঞানের ভেতর প্রবেশ করবার অধিকার পাওয়া যাবে! এ কথা ক'জনই বা বুঝেছে, আর ক'জনই বা ভেবেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ বিভ্রান্ত বিশ্ববাসীকে সত্য উপলব্ধি করাবার জন্যে আত্মতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের মূল সূত্রটি দেখিয়ে দেবার জন্যে আর বিশ্বের সমগ্র নারীজাতিকে শ্রেষ্ঠস্থানে বসিয়ে পৃথিবীর পূজা অর্পণ করবার জন্যে আজীবন মাতৃসাধনা ক'রে গেছেন; আর মাতৃপূজায় পূর্ণাহুতি দিয়েছেন ষোড়শী-পূজায়। জগতের কল্যাণ কামনা ক'রে তিনি শ্রীশ্রীমাকে আত্মপ্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—'হে মহাশক্তি, তুমি প্রকাশিত হও!'

তাঁর পূজা বন্দনা ব্যর্থ হয় নি। তাঁর পূজিতা অবগুণ্ঠনবতী সহধর্মিণী আবরণ উন্মোচন ক'রে ধীরে ধীরে নিজেকে বিশ্বকল্যাণের জন্যে জগজ্জননীরূপে প্রকাশ করেছিলেন। ভাবীযুগের জনক-জননীর রূপ ধারণ ক'রে ভিন্ন দেহে মহাশক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে ভাবে দক্ষিণেশ্বরে লীলা ক'রে গেছেন তা কোন যুগে হয়নি, কখনও হবে কি না জানিনে। পার্থিব-সম্পর্কভাব-বিবর্জিত দেহাত্মবোধ-বিস্মৃত এক অতীন্দ্রিয় লোকের রহস্যঘন আবরণে আবৃত ব্রাহ্মণদম্পতী দেখার অতীতরূপে আপনাদের মর্ত্যলীলা দেখিয়ে গেছেন। ভবতারিণী মন্দিরের অনতিদূরে প্রাঙ্গণসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীফলহারিণীর পূজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণীকে পূজা ক'রে বারংবার প্রণত হয়েছিলেন এবং তাঁর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি ও নানা উপচার নিবেদনের পর সাধনার জপমালা অর্পণ ক'রে বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছিলেন। পূজা-সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর উভয়েই সমাধিমগ্ন—এ চিত্র সম্পূর্ণ অভিনব! সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও এরূপ মহিমময় ঘটনার অবতারণা হয়-নি।

শ্রীশ্রীমা একদিকে ঠাকুরের সহধর্মিণী, সেবিকা, শিষ্যা ও অনুগতা উপাসিকা, অপরদিকে তাঁর

উপাস্য ইষ্টমূর্তি ; ব্যবহারিক জীবনে বরণীয়া শ্রদ্ধেয়া গৃহিণী আর পারমার্থিক সাধনায় জাগ্রতা কুল-কুণ্ডলিনী। ঠাকুরের ভাবাবস্থায় সারদামণি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'বল দেখি আমি কে ?'—ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন—'যে মা ঐ নহবতখানায় আছেন—যিনি এই দেহের জন্ম দিয়েছেন, যে মা ঐ মন্দিরে জগজ্জননীর প্রতিমারূপে রয়েছেন—সেই মা এইরূপে এখানে সেবা করছেন'।

শ্রীশ্রীমাও স্বামীর মধ্যে জগন্মাতার দিব্যলীলা দর্শন করতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট ঠাকুর মহাসমাধিমগ্ন হ'লে তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন—'মা কালী গো, কোথায় গেলে গো ?'… ঠাকুরের মহাপ্রস্থানের পর শ্রীশ্রীমাই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রাণশক্তিদাত্রীরূপে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন—তাঁর সন্তানেরা মাতৃস্নেহে পুষ্টিলাভ ক'রে বিশ্বজগতে রামকৃষ্ণ-মহিমা প্রচার-দ্বারা ভারতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেছেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা বহুতীর্থে গিয়েছেন, কিন্তু বৃন্দাবনেই তাঁর মন খুব বসেছিল। এখানে প্রায়ই তাঁর সমাধি হ'ত; বার বার সমাধি হওয়ায় অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন, মাও বুঝি মর্তলীলা সংবরণ করতে উদ্যতা।

মাতাঠাকুরাণী যে সময়ে বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়ির এক বাড়ীতে বাস করছিলেন, সে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রব্রজ্যায় যাত্রার পূর্বে এই স্থানে এসে সর্বার্থসাধিকা মায়ের চরণ বন্দনা ক'রে প্রার্থনা করেছিলেন—ঠাকুরের নাম যেন সারা পৃথিবীতে জয়যুক্ত হয়।

বরপুত্রকে শ্রীশ্রীমা প্রাণভরে আশীর্বাদ করে-ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' -রূপে দেখতেন। বাবুরাম মহারাজের মা দুর্গা-পূজা করবেন শুনে তিনি লিখেছিলেন—'বাবুরামের মার কি ভীমরতি হয়েছে, জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির প্রতিমা পূজো করতে যাচ্ছে।' গিরিশচন্দ্র ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর বাড়ীতে দুর্গাপূজা করবার সময়ে শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী থেকে এনেছিলেন। শ্রীশ্রীমা বলরামবাবুর বাড়ীতে এসে অবস্থান করতে লাগলেন। মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার কিছু আগে গিরিশচন্দ্র শুনতে পেলেন যে, মা আসতে পারবেন না—জ্বর হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের অন্তর ভেঙে পড়ল। বললেন—মা না এলে কার পূজা হবে ? সন্ধিপূজার সময় হ'য়ে এল, গিরিশচন্দ্রকে উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকবেন না ব'লেই ঠিক করেছিলেন, এমন সময়ে শুনতে পেলেন—'ও গিরিশ, মা এসেছেন, শিগগির এসো।' আনন্দে দৌড়ে নীচে গিয়ে গিরিশচন্দ্র দেখলেন—মা প্রতিমার সম্মুখে। গভীর রাত্রিতে ছিল সন্ধিপূজা। বলরামবাবুদের বাড়ীর পাশের গলি দিয়ে মা হেঁটে এসেছিলেন আর গিরিশচন্দ্রের বাড়ীর পিছনের দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে করাঘাত ক'রে ডেকেছিলেন, 'ওগো, আমি এসেছি, দরজা খোলো।' ঠিক সেই সময়ে সন্ধিপূজা শুরু হয়েছে।

জীবনের নানা বিচিত্র সত্যকে মা গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেছেন—প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁর অন্তরে কত ভাবই না ফুটিয়ে তুলত ! শ্রী ও হ্রীর পরিপূর্ণতাই লক্ষ্য করা গেছে মায়ের মধ্যে।

শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে শ্রীশ্রীমা রামলালদাদার পত্নীকে বলে-ছিলেন—'ওর কি কম দুঃখু বৌমা ! ব্যথায় ওর বুকটা যে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। দেবতা আর অসুরে মিলে যে যার লভ্যগণ্ডার জন্যে সমুদ্দুরকে মন্থন করলে ; ওর অতলগর্ভে লুকিয়ে রাখা ধনরত্ন, অমৃত, কত কি লুটে নিলে, শেষে কিনা ওর প্রাণাধিক কন্যা কমলাকেও কেড়ে নিলে ! পিতার এ বুক-চেরা দুঃখু কি কম গা ? মেয়েকে একবারটি ফিরিয়ে পাবার জন্যে সমুদ্দুরের এত আর্তনাদ।' এরূপ মৌলিক চিন্তাধারাই বা কজনের মধ্যে পাওয়া গেছে !

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীশ্রীমা গোপাল

চন্দ্র নিয়োগী লেনে (বর্তমান ১নং উদ্বোধন লেনে) আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহপ্রবেশ করেন। এই দেবী-পীঠেই জ্ঞানভক্তির যুগল ধারায় নিত্য নিষ্ণাত হ'য়ে 'উদ্বোধন' এ যুগের শক্তি-উপাসনায় আত্মসমাহিত। এখানে বসেই শ্রীশ্রীমা দিয়ে গেছেন ভাবী মানুষের পথনির্দেশ; এখানেই তাঁর অর্চনা ক'রে গেছেন সিষ্টার নিবেদিতা, সিষ্টার ক্রিশ্চিয়ানা, ধীরামাতা, দেবমাতা প্রভৃতি সাগরপারের জ্ঞানগরিষ্ঠা মহিলারা; মাতৃরূপে এখানেই মা অধিকাংশ থেকেছেন, দীক্ষা ও উপদেশ দিয়েছেন ও স্নেহাঞ্চল পেতে সন্তানদের আশ্রয় দিয়ে ভাবস্তন্য পান করিয়েছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য মহিলাদেরও ভাবের আদানপ্রদান চলত। এ প্রসঙ্গে কালা-বৌ জিজ্ঞাসা করেছিল—'হ্যাঁ মা, আপনি তো ইংরেজী জানেন না, তবে দেবমাতাকে বোঝাচ্ছেন কি ক'রে?' মা হেসে বলেছিলেন—'প্রাণের একটা আলাদা ভাষা আছে কিনা, তাই প্রাণে প্রাণে সব বোঝা যায়!' পাশ্চাত্ত্য মহিলারা রামকৃষ্ণ-সাধনায় তন্ময় হ'য়ে থাকতেন, আর মায়ের কাছে তাঁরা জপ ধ্যান পূজা প্রভৃতির ক্রিয়াপদ্ধতি শিখতেন।

মা বলতেন—'খুব জপ করবে। সংসারের কাজের শেষ নেই, কাজ করতে করতে জপ করবে।' 'জপাৎ সিদ্ধি', জপ হ'তেই সিদ্ধি আসে...... নারীর সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'কন্যারূপে, পত্নীরূপে, মাতৃরূপে সকলরূপে সেবা করাই নারীর ধর্ম। মেয়েমানুষের পবিত্র থাকা কি কম জিনিস! সতী-মেয়েমানুষেরসা মনে মুনি ঋষি দেবতা গন্ধর্ব হাত জোড় ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।'—মেয়েদের বিদ্যাবুদ্ধি বড় কথা নয়, রূপ-গুণও বড় কথা নয়, মেয়েরা মঙ্গলঘট—পবিত্রতার। জামা সেমিজ সাজসজ্জায় কিছুতে শুচিতা রক্ষা হয় না—নারী শুদ্ধ থাকে যদি তার দেহ মন শুদ্ধ থাকে।

মা আরও বলেছেন—'স্বামীর ভালোমন্দর প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন স্ত্রীর কর্তব্য, তেমনি স্ত্রীর ধর্ম রক্ষা করাও স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। সংসারে নানা অশান্তির কারণ আছে, মনকে যতটা তাঁর ওপর রেখে থাকতে পারো ততই প্রাণে সুখ ও শান্তি, না হ'লে অশান্তি; যে কদিন সংসারে থাক কেবল ভগবানকে ডাক। ভালবাসাতেই ভক্তি হয়। কোন জিনিসকে নাড়াচাড়া করতে করতে—ভালবাসা আসে, কালো কুচ্ছিৎ একটা ছেলেকেও নাড়তে চাড়তে আরম্ভ করলে আস্তে আস্তে তার ওপর টান আসে, ভালোবাসা আসে।

বহু সন্তানের অসঙ্গত আবদার তাঁকে রাখতে হয়েছে, অনেকের অবিবেচনার জন্যে তাঁকে অনেক অসুবিধাও ভোগ করতে হয়েছে। তিনি বলেছেন—'আমার কাছে এসে যে মা ব'লে দাঁড়ায়, তাকে যে আমি ফেরাতে পারিনে।' এই তো মায়ের প্রকৃত-মহিমা, বৃহত্তম পরিবার পেতে মা প্রত্যেক সন্তানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁর স্নেহের ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছে। আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি।

১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ঘনিয়ে আসবার কয়েকদিন আগে যখন শ্রীমার জীবন-সূর্য অস্ত-দিগন্তের কোলে আত্মগোপন করবার জন্যে উদ্যত হ'ল, তখন তিনি করুণার্দ্র-কণ্ঠে বললেন—'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানকেই জানিয়ে দিও মা—আমার ভালোবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে'।

তারপর এল সেই বিদায়ের মহালগ্ন। শ্রাবণের রাত্রে বাদলের ধারার মত ব'য়ে গেল চতুর্দিকে অবিশ্রান্তবেগে অশ্রুধারা। বিদায়ের ক্ষণেই কি এল মিলনের পরম মুহূর্ত! প্রকৃতিও প্রণতা হ'য়ে রইল। পূর্ণাহুতির শেষে শুরু হ'ল বর্ষণমুখর শ্রাবণের আর্তনাদ—মাতৃহারা সন্তানেরা কাতর হ'য়ে ডেকে উঠল—'মা, মা—'!

মা এসেছিলেন কল্যাণী কৌমারী শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে, আর দেবীত্বকে জাগ্রত করতে নারীর

মধ্যে, সে কাজ সম্পূর্ণ ক'রে রূপের ঘর থেকে বিদায় নিলেন—আমাদের হৃদয়ের আসনে বসে রইলেন শ্রীশ্রীমা সারদেশ্বরী হ'য়ে, জাতিধর্ম ও দেশকালের অতীতলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা সারদার করুণা আজও বর্ষিত হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পর যতবারই শ্রীশ্রীমা বৈধব্যের বেশ ধারণ করতে গেছেন লৌকিক আচারের মর্যাদা দিতে, ততবারই ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে নিষেধ করেছেন, তাঁর পক্ষে সধবার বেশ ত্যাগ করা কোন দিনই হয়নি। এজন্যে অজ্ঞ গ্রামবাসীরা বক্রোক্তি করেছে, শেষে যখন তারা বুঝতে পারল তখন সমালোচনা থেকে বিরত হ'ল।

প্রথমে যে দিন শ্রীশ্রীমা সোনার বালা খুলছিলেন, ঠাকুর তাঁর হাত ধ'রে বলেছিলেন—'আমি কি মরেছি যে, বিধবার বেশ ধরবে? গৌরীকে জিজ্ঞাসা করো, সে ও-সব শাস্ত্র জানে।' ঠাকুর অদৃশ্য হওয়ায় মনে তাঁর দৃঢ় ধারণা হ'ল— না না, তিনি আছেন, আজও আছেন, আমার কাছেই আছেন।

আমাদের মনে অনুরূপভাবে দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে শ্রীশ্রীমা আছেন, আজও আছেন, আমাদের কাছেই আছেন। আজ যদি এসে থাকে বিশ্ব-মন্দিরে আমাদের প্রদীপ তুলে ধরার পরম ক্ষণ, তাহ'লে সে প্রদীপে যেন জ্বলে জনক-জননী রামকৃষ্ণ-সারদার আলোকবর্তিকা। আজ যদি এসে থাকে আমাদের ফসল তোলার দিন, তা হ'লে সে দিনকে সুন্দর ক'রে তুলতে যেন আমরা সন্ধান করি কোন্ সে ক্ষেত্রে কোন্ বর্ষণমুখর ক্ষণে অমৃতের বীজ বপন করা হয়েছিল—যার ফলে প্রত্যক্ষ হয়েছে দিকে দিকে ছায়াশীতল মেঘচুম্বী বনস্পতি, আর দিগন্তবিস্তৃত ফলভারে নুয়ে-পড়া সুরম্য বীথি-বিতান।

পূর্ববর্তী অবতার পুরুষদের জীবন-কাব্যে উপেক্ষিতা হ'য়ে রয়েছেন তাঁদের সহধর্মিণীরা। নিজদের স্বামীর ব্যক্তিত্বের অন্তরালে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্বকে নিঃশব্দে লুকিয়ে রেখে আত্মবিলোপের সাধনা ক'রে গেছেন—কত নিদ্রাবিহীন রাত্রি গেছে তাঁদের প্রতীক্ষায় কেটে, পদধ্বনি শুনবার আশায় কত মুহূর্তই না তাঁদের কেটে গেছে উৎকণ্ঠায়, কত দুশ্চর তপস্যাই না তাঁরা ক'রে গেছেন স্বামী-দেবতার চিত্র বুকে ক'রে—কত ত্যাগ, কত মায়ামমতার অভিব্যক্তি, কত আত্মনিবেদন ব্যথাবেদনার ইতিহাস, কত নিঃশব্দে ধ্যান-মৌনা তপস্বিনীর মত জীবনযাপনই না তাঁদের ভেতরে অনুক্ত রয়ে গেছে—কে তার সংখ্যা করবে, আর কে-ই বা করবে সন্ধান!

কিন্তু রামকৃষ্ণ-অবতারে তাঁর ব্যতিক্রম। শ্রীশ্রীমাকে তিনি কাছে রেখে রূপায়িত ক'রে গেছেন স্বচ্ছ মধ্যদিনের মত। তাঁর বিচিত্র সাধনার চৈতন্য-শক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী, নিত্যলীলাসঙ্গিনী, সহচরী, সেবিকা—মায়ের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন ভবতারিণীকে। এই ব্রহ্মময়ী সারদাসুন্দরী মানব-সভ্যতার ইতিহাসের এক অপূর্ব বিচিত্র অভিব্যক্তি—বিশ্বের অনন্যসাধারণা শ্রেষ্ঠা মহীয়সী নারী। তাঁরই লীলার ভাষ্য করেছেন পার্থিব ও আধ্যাত্মিক লোকের বিশিষ্ট কৃতী পুরুষগণ।

শ্রীশ্রীমা যে সত্যধন আমাদের জন্যে রেখে গেছেন, নিজেদের সাধনার দ্বারা সেই ধনের যেন গৌরব ও মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখে যেতে পারি, আর যুক্তিবাদীদের ব'লে যেতে পারি, বস্তুবিশ্বের অন্তরালে বহু রহস্যই প্রতিভাত হ'য়ে থাকে, যা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির আগোচর; সেখানে যুক্তিতর্ক মূক ও নাস্তিকতা নীরব।

শরণাগতি

স্বামী জীবানন্দ

ধর্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ সখা অর্জুনকে জ্ঞান ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মের কত উপদেশ দিলেন—উপনিষৎ-অরণ্য থেকে শ্রেষ্ঠ পুষ্পগুলি চয়ন ক'রে মালা গেঁথে সখার গলায় পরালেন, তবু তো অর্জুনের বিষণ্ণতা গেল না—তাই সর্বশেষে অতি গুহ্য কথা তাঁর শ্রীমুখ থেকে উদ্গত হ'ল :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—এই অভয়বাণী অর্জুনের প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করল—তিনি পরম নিশ্চিন্ততায় শ্রীভগবানের শরণাগত হ'লেন।

সাধকের অমূল্য সম্পদ 'শরণাগতি' গীতার শেষ কথা : হে জীব, সব কিছু ছেড়ে একমাত্র ভগবানকেই আশ্রয় করো। শরণাগতি-লাভের উপায় কি? উপায়—ঈশ্বরলাভের পক্ষে অনুকূল কর্ম করা এবং প্রতিকূল অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্নকর কর্ম না করা, সকল অবস্থায় শ্রীভগবানকেই একমাত্র সহায়, আশ্রয় ও রক্ষাকর্তা ভাবা।

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন, সাধনের অভ্যাসের তারতম্যবশতঃ শরণাগতির তিন প্রকার ভূমিকাভেদ হয় : 'ঈশ্বরের আমি', 'ঈশ্বর আমার' এবং 'আমিই ঈশ্বর'।

তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥

শরণাগতির প্রথম ভূমিতে বোধ হয় 'আমি তাঁহার' —এখানে শরণাগতি মৃদু। উদাহরণ :

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ।

—শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত-ষট্পদী

"হে নাথ, ভেদ চ'লে গেলেও চিরকাল 'আমি তোমার', 'তুমি যে আমার' ইহা কখনও নয়। সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ না থাকলেও সকলেই বলে 'সমুদ্রের তরঙ্গ', 'তরঙ্গের সমুদ্র' কেউ তো বলে না!"

ভক্ত ও ভগবান স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু শরণাগতির প্রথম অবস্থায় ভক্ত নিজেকে ভগবানের অংশ ছাড়া চিন্তা করতে পারেন না। নিজের যা কিছু সব ঈশ্বরের উপর সমর্পণ ক'রেই তাঁর আনন্দ। তাঁর ইহকাল পরকাল, সুখদুঃখ, ভালমন্দ, ধর্ম অধর্ম ভগবানের উপর দিয়ে—ভগবান যখন যেভাবে রাখেন, সেইভাবেই থাকতে চান তিনি—যেন 'ঝড়ের এঁটো পাতা' হ'য়ে!

শরণাগতির প্রাথমিক ভাবটি ঘনীভূত হ'য়ে পরিপক্বতা লাভ করলে সাধক দ্বিতীয় ভূমিতে আরোহণ করেন। এখানে শরণাগতি মধ্যবলযুক্ত—বোধ হয় 'ভগবান আমার'। উদাহরণ :

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ৩।৯৭

"হে কৃষ্ণ! জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছ, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? আমার হৃদয় থেকে যদি চলে যেতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝতে পারি।"

অন্ধ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের পথে নিঃসঙ্গ হ'য়ে চলেছেন, লীলাময় শ্রীভগবান খেলাচ্ছলে বালকবেশে তাঁকে পথের নির্দেশ দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বড়ই ইচ্ছা বালকবেশী কৃষ্ণের সুকোমল শ্রীহস্তখানি একটি বার স্পর্শ করেন। কোন রকমে একদিন হাত

ধ'রে ফেললেন—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল; কিন্তু লীলাময় সম্পূর্ণরূপে ধরা দিলেন না, সবলে হাত ছিনিয়ে নিয়ে লুকোচুরি খেলতে লাগলেন।

ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে। 'আমি তোমার'—এই ভাবটি অন্তর্হিত; তার স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে 'তুমি আমার' এই ভাব—তুমি আমার অন্তরের অন্তস্তলে। হৃদয়ের মধ্যে যে তোমাকে পুরে রেখে দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়েছি—পালাবে কোথায়, কেমন ক'রে? প্রথম স্তর থেকে আরও নৈকট্যবোধ—অধিকতর আত্মীয়তা! পূর্বের অবস্থায় ছিল ঈশ্বরের উপর নিজেকে ছেড়ে দেওয়া—তাঁর উপরে জোর করা চলেনি—'এইটি করতে হবে' ব'লে। দ্বিতীয় স্তরে ভগবানের উপর জোর চলে—ভক্তের চিত্ত কুসুম অনুরাগের রঙে রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে,—ভক্ত ভগবানের অপূর্ব লীলা আস্বাদন ক'রে ধন্য হন।

শরণাগতির তৃতীয় ভূমিতে অধিমাত্র অর্থাৎ শরণাগতির অবধি—সর্বোত্তম অবস্থা। এখানে সাধকের অদ্বৈতানুভূতি হয়—বোধ হয় 'আমিই তিনি'। উদাহরণ:

> সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ,
> পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
> ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে,
> হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥
>
> —বিষ্ণুপুরাণ, যমগীতা, ৩।৭।৩২

"স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ ও আমি এবং বাসুদেব-স্বরূপ পরমপুরুষ একই, অদ্বিতীয়—এই প্রকার স্থিরনিশ্চয়ভাব যাঁদের হৃদয়ে সদা বিদ্যমান, হে দূত! তাঁদের কাছে তুমি কখনও যেও না। ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্ববেত্তাদের দূর থেকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যেও।" (দূতের প্রতি যমের উক্তি)

তৃতীয় স্তরে সাধকের যে উপলব্ধি তা অবাঙ্-মনসোগোচর—বোধে বোধমাত্র। যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মস্বরূপ, সকলের সার ও আনন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্ত ও নিত্যসত্তাস্বরূপ তিনিই সাধকের অন্তরে বাহিরে এবং সর্বত্র।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ প্রথমে শ্রীভগবানের স্তব আরম্ভ করলেন:

> নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
> নমস্তে সর্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥
> নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
> জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

কিন্তু এইভাবে স্তব করতে করতে তন্ময় হ'য়ে অবশেষে একেবারে তাদাত্ম্য লাভ ক'রে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলতে লাগলেন:

> সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
> মত্তঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে॥
> অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
> ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥
>
> (বিষ্ণুপুরাণ)

—সেই অনন্ত সর্বগত, তিনিই আমি। আমার থেকে সমস্ত উৎপন্ন, আমিই সমস্ত, আমাতেই সমস্ত; আমিই অক্ষর, নিত্য, পরমাত্মা, ব্রহ্ম; সৃষ্টির পূর্বেও আমি, পরেও আমি। এখানে ভক্তের 'তিনি' জ্ঞানীর 'আমি'তে পরিণত হ'য়ে গেল—দ্বৈত অদ্বৈত, জ্ঞান ভক্তি, বেদান্ত ভাগবত—সব একত্ব লাভ করল।

শরণাগতির মূল উৎস ভালবাসা। জীবের অভয় আশ্রয় ভগবানকে ঐকান্তিকভাবে ভালবাসতে না পারলে আত্মসমর্পণ সম্ভব হয় না—সে যেমন তেমন ভালবাসা নয়, 'ভালবাসি ব'লে ভালবাসি, কেন ভালবাসি জানি না'—এইভাবের ভালবাসা!

শরণাগতির মূলে অনুরাগ হ'লেও ইহা যে ঈশ্বর-কৃপা-সাপেক্ষ, তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গিরিশচন্দ্রের 'বকলমা' দেওয়ার ঘটনাটি থেকে বেশ বোঝা যায়:

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কয়েকবার আসা-যাওয়ার পর গিরিশচন্দ্র নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ চাইলে ঠাকুর তাঁকে সকাল সন্ধ্যায় ভগবানকে স্মরণ করতে

বললেন। গিরিশবাবু কোন নিয়ম-কানুনেরই ধার ধারেন না—স্নানাহারেরও কোন নিয়ম নেই তাঁর, কেমন ক'রে গুরুবাক্য পালন করবেন! নিরুত্তর রইলেন তিনি—উপদেশ-পালনে অসমর্থ হবেন কিনা কিছুই বলতে পারলেন না। করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শোবার আগে শুধু একটিবার মাত্র ভগবৎস্মরণের নির্দেশ দিলেন। গিরিশচন্দ্রের পক্ষে তাও সম্ভব নয় যে! চিন্তা ভয় নৈরাশ্যে তাঁর চিত্ত ব্যাকুল। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধবাহ্যদশা, মধুরহাস্যে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত; তিনি ভাবমুখে বললেন, "তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি'—আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা দে।"

'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাসের অধিকারী গিরিশবাবু মনে প্রাণে অনুভব করলেন, করুণার বিগ্রহ নররূপী নারায়ণ তাঁর ইহপরকালের সব ভার নিলেন;—আর ভাবনা কি? এখন থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। আনন্দে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হ'য়ে উঠল।

গিরিশচন্দ্র এখন নিশ্চিন্ত, কিন্তু শয়ন ভোজন উপবেশন সমস্ত কর্মের মধ্যেই ঐ এক চিন্তা 'শ্রীরামকৃষ্ণ আমার ভার নিয়েছেন,—কী অপার করুণা তাঁর!' নিয়মের বন্ধন এড়াতে গিয়ে ভালবাসার কঠিন বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন! "সাধন-ভজন-জপ-তপ-রূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকল্‌মা দিয়েছে তার কাজের অন্ত নেই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় ভগবানের উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটি করলে?"—গিরিশবাবুর এই ধরনের উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে কি ভাবে শরণাগতি বা ভগবানে আত্মসমর্পণের ভাবটি দিয়ে তন্ময় ক'রে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের হাত ধরে-ছিলেন; পিতা যেমন পুত্রের হাত ধ'রে থাকলে তার পতনের ভয় থাকে না—তেমনি গিরিশচন্দ্রেরও আর পদস্খলনের ভয় ছিল না।

সহস্র প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন কৃতকার্যতার আভাস দৃষ্টিগোচর হয় না, সব দিকেই শুধু ব্যর্থতার পরিহাস ও পুরুষকারের অক্ষমতার পরিচয়,—তখন শরণাগতি অবলম্বন ছাড়া কোন উপায়ই থাকে না! অনন্যোপায় অবস্থাতেই যে অনন্যশরণের আশ্রয়গ্রহণ! মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (Free will)-র শক্তি আর কতটুকু। অসহায় অবস্থাতেই মানুষ আপন ক্ষুদ্র মনের ক্ষুদ্র ইচ্ছাটিকে ঈশ্বরের বিরাট মনের বিরাট ইচ্ছার সঙ্গে এক তানে মিলিয়ে দিতে চায় আর তার অন্তর-বীণায় যেন এই বাণী ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে:

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥

—যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করার পর তাঁকে বেদ প্রদান করেছিলেন, মুক্তির ইচ্ছায় (সুখ-দুঃখের পারে যাবার জন্যে) সেই আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক দেবতার শরণ নিলাম।

মহাপুরুষ-বাণী

'নাহং, নাহং; তুঁহু, তুঁহু; শরণাগত, শরণাগত';
এ কথাগুলি ঠাকুরের উচ্চারিত,—মহাবাক্য;
জপ করলে সিদ্ধি হয়।

দুনিয়ার নরনারী—যা দেখে এলাম

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

ভ্রাম্যমাণের জীবনে সব চেয়ে বড় লাভ—আত্মীয়তার বোধ—যে বোধে দূর নিকট হয়, পর আপন হয়। দুই দুই বার নানা জাতির ও নানা ভাষাভাষীর সংস্পর্শে এসেছি—তার থেকে এই কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি বর্ণের বৈষম্য, ভাষার অন্তরাল, আহার ও বেশভূষা বিভিন্নতা মানুষকে দূর করে না; সব মানুষের অন্তরে রয়েছে এক সরল ও সহজ মানবতার বোধ যা সমস্ত ব্যবধান ও সমস্ত আড়ালকে অতিক্রম ক'রে পথিককে বুঝিয়ে দেয়:

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।'

কিছুদিন পূর্বে বিশ্বরাষ্ট্র-পরিষদে এক তদন্ত সভা বসেছিল—সেই সংসদে বড় বড় বৈজ্ঞানিক, নৃতত্ত্ববিদ্, ঐতিহাসিক প্রভৃতি ছিলেন। তাঁদের গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হয়েছে—জগতে মানুষের সমস্ত বৈষম্যসত্ত্বেও মানুষ এক জাতি। ককেশাস, নিগ্রো, মঙ্গোল প্রভৃতি নাম দিয়ে এই সাধারণ মানবত্বকে অস্বীকার করা মূঢ়তা।

আমি পণ্ডিত নই—হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছি—দেশে দেশে মানুষে মানুষে রয়েছে যে এক অখণ্ড সত্তার যোগ। নানা দেশের, নানা মানুষের মধ্যে আমরা পাই এক সর্বব্যাপী আত্মার স্পর্শ—যে আত্মা প্রিয়, সুন্দর, প্রেমপূর্ণ।

এটি বোঝাতে একটি গল্প বলি—গল্প নয়, সত্য ঘটনা। ইস্তানবুলের স্বপ্নময় প্রাসাদের পাশ দিয়ে নেমে চলেছি—'গোল্ডেন হর্ন' জাহাজ-ঘাটের দিকে—যাব এশিয়ার উপকূলে একটি শহরে—বসফোরাস প্রণালী পার হ'য়ে। এক জায়গায় কতকগুলি তুর্কী বসে চা পান করছিলেন। তাঁদের সম্বোধন ক'রে প্রশ্ন করলাম, আপনারা কেউ কি ইংরেজী জানেন?

একজন মলিন-বেশ বৃদ্ধ তুর্কী উঠে বললেন—অল্প অল্প জানি, আপনার কি প্রয়োজন?

বললাম, জাহাজ-ঘাটের রাস্তাটি বাতলে দেন যদি, বড়ই সুখী হই।

বৃদ্ধ হয়তো জাহাজের শ্রমিক, নয়তো ঐ ধরনের কোনও কাজ করেন—পানপাত্র সরিয়ে রেখে বললেন, চলুন, আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব।

এই ব'লে বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন।

সেখান থেকে জাহাজ-ঘাট দু' ফার্লং হবে। বৃদ্ধের সাথে সাথে চললাম—তিনি তুর্কীতে অন্য এক জনকে প্রশ্ন ক'রে টিকিট-ঘর জেনে নিলেন; তারপর টিকিট দিতে বললেন, আমি পকেট থেকে পয়সা বার করছি—বৃদ্ধ বললেন, রাখুন, আমিই টিকিট কাটছি।

তারপর তিনি আমাকে জাহাজে নিয়ে একটি সুন্দর আসনে বসিয়ে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। টিকিটের দাম নিলেন না—আমিও জোর ক'রে তা দিতে পারলাম না।

পথে চলতে চলতে বৃদ্ধ জেনে নিয়েছিলেন—আমি ভারতীয় হিন্দু—তাঁর পরিচয়ে বলেছিলেন তিনি তুর্কী মোসলেম। এ স্বজাতীয় বা স্বধর্মীর প্রতি আতিথেয়তা নয়। এখানে দেখে এলাম—মানুষের মহান্ দেবতাকে, যাঁর মহানুভবতা দেশোত্তর ও কালোত্তর।

তাই ভারতবর্ষের প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণতার মধ্যে রোজই শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিই এই নাম-পরিচয়-হীন ক্ষণিকের পথপ্রদর্শককে, আর স্মরণ করি কবিগুরুর কবিতা:

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,

নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা যে ভুলে যাই।

এখানেই তো দেখা পাই সেই বিশ্বদেবের—যিনি মানুষের জীবনে মহামহিমায় দীপ্তি পান।

ভারতবর্ষের বাহিরে যে জিনিসটি সব চেয়ে চোখে পড়ে সেটি হ'ল মানুষের জীবনের প্রতি প্রীতি। বহু শতাব্দীর দারিদ্র্য, পরাধীনতা ও অশিক্ষা আমাদের দেশের মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে,—এখানে মানুষ যেন বাঁচতে চায় না—কোনও প্রকারে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে বৈতরণীর শেষ খেয়া পার হওয়ার জন্য সে ব্যগ্র। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ বলছে—তারস্বরে বলছে :

মরিতে চাহিনা আমি, সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

তাইতো তাদের কাজের অন্ত নেই, চেষ্টার সীমা নেই।

মরুকে তারা মরু ব'লে মানতে চায় না—তাকে করবে শস্য শ্যামল। দুরারোহ গিরিকে তারা সমীহ করবে না—তাকে করবে আরাম নিকেতন। প্রকৃতির সমস্ত বিরূপতা তারা সুশ্রী, শোভন ও সুন্দর ক'রে তুলতে চাইছে।

এই জীবন-প্রীতি আছে ব'লেই তারা কেবলই কাজ করছে—তাদের কাছে অসময় নেই। নিউ ইয়র্কের একটি কলেজে আমি 'বুদ্ধের জীবন ও বাণী' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানকার সকল ছাত্রছাত্রীই পরিণতবয়স্ক। প্রথমে মনে করেছিলাম—তারা শুধু সেদিনের শ্রোতা। কিন্তু যে অধ্যাপকের শ্রেণী, তিনি আমার ভুল ভেঙে দিয়ে বললেন, তারা সবাই পড়ছে।

আমি আশ্চর্য হ'য়ে এই সব বয়স্ক নরনারীর আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করি। প্রথম জীবনে দেবী সরস্বতীর যে কৃপা লাভ হয় নি, পর জীবনে সেটা তারা সংশোধন ক'রে নিচ্ছে। বৈদিক ঋষি প্রার্থনা করেছিলেন—জীবনে এক শত বৎসর বাঁচবেন; কিন্তু সে বাঁচা আমাদের মতো জীবন্মৃতের বাঁচা নয়—বাঁচার মতো বাঁচা, আয়ুর পূর্ণতাকে তাঁরা পরিপূর্ণ করবেন প্রাত্যহিক সাধনায়, রোজই নূতন নূতন কিছু জানবেন—নূতন নূতন কিছু শিখবেন। এটা আমেরিকার নরনারীর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি।

এই জীবন-প্রীতির ফলে কর্মের প্রতি দেখেছি এদের অফুরন্ত অনুরাগ—সানফ্রানিসকো বিমান-ঘাঁটিতে আমায় নিতে এসেছিলেন—মহাবিদ্যা-ভবনের একজন পি. এইচ-ডির ছাত্র—অথচ তিনি অবলীলাক্রমে কুলির মত আমার সমস্ত জিনিস ব'য়ে মোটরে তুললেন। এটা কোনও বিজ্ঞাপনী দৃষ্টান্ত নয়—এটা তাঁর স্বাভাবিক নিত্যকৃত্যের অঙ্গ।

পরে দেখেছি নিকট ও নিবিড় সাহচর্যে—এই সুন্দর তরুণটি কেমন সহজে বিদ্যাভবনে কত রকমের তথাকথিত ছোট কাজগুলি করেন—এর জন্য অর্থ নেন না। শুধু সেবাব্রতের খাতিরে তিনি সেই বিদ্যামন্দিরের ঘর ঝাঁট দেওয়া, ধোওয়া-মোছা, আসবাবপত্র ঠিক করা, রান্না করা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করেন।

আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয়—তপস্যার তন্ময়তা! তপস্যার আদর্শটি আমাদের দেশের; আমাদের সুধীরা বলেছেন, সত্য এবং তপস্যায় বিশ্বের সৃষ্টি—তপস্যার ফলে মানুষ যা চায়, তাই পেতে পারে। কিন্তু এ ভাবনা এ দেশে আজ আর নেই। ভাব-তন্ময় হ'য়ে আদর্শের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করবার যে সাধনা—সে সাধনা দেখে এলাম আমেরিকায়।

একটি মাত্র লোকের কথাই বলি। তার নাম গেনস্‌বরো—তিনি সানফ্রানিসকো সহরে American Academy for Asian Studies (এশিয়া গবেষণা-পরিষদ) প্রতিষ্ঠা করেছেন একক অধ্যবসায়ে, নিষ্ঠায় ও বিশ্বজিৎ যাজ্ঞিকের ত্যাগব্রতে। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী; কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ

তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করল—তিনি তাই তাঁর সর্বস্ব দিয়ে এই মহাবিদ্যাভবন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আতিথেয়তার কথা একটু বলি। একদিন অবশ্য ভারতবর্ষে এমন অবস্থা ছিল, যখন বিনা সম্বলে হিমালয় হ'তে কুমারিকা পরিভ্রমণ সম্ভব ছিল, কিন্তু আজ আমাদের হৃদয় ছোট হ'য়ে গেছে। ক্ষুদ্রত্বের চাপে আমরা অতিথি-সেবার আদর্শকে একপ্রকার ভুলেই গেছি। সানফ্রানিসকো থেকে যখন চিকাগো যাই তখন ওখানকার এক ভদ্রলোককে চিঠি লিখি, আমি চিকাগোয় সাত দিন থাকব তাঁর বাড়ীতে, যদি তিনি আমায় স্থান দিতে পারেন—তবে পত্রপাঠ যেন আমায় জানান।

পত্রোত্তর পাই নি; চিকাগোয় কোনও হোটেলে থাকব এই ঠিক ক'রে চলেছি। আমার প্লেন নামলে বিমান-অফিসের লোক বলল: ডক্টর দাশ, আপনার একটি সংবাদ আছে।

বিদেশ-বিভুঁই—কে দেবে সংবাদ। উৎসুক বিস্ময়ে তার দিকে চাইলাম। বক্তা বললেন, 'মহিলার নাম মিসেস উইলসন, তাঁর ফোন নম্বর—'

বললাম, আপনি তাঁকে ডেকে দিন না।

ভদ্রলোক ফোন করলেন। আমি ফোন ধ'রে বললাম, আমি ডক্টর দাশ কথা কইছি। ওপার থেকে ভেসে এল প্রীতি-সরস কণ্ঠস্বর—ডক্টর দাশ, পৌছেছেন—?

হাঁ।

দেখুন, আপনার চিঠি দেরিতে আসায় উত্তর দেওয়া হয় নি—আপনি আমাদের অতিথি।

আপনাদের বাসায় কি ক'রে পৌছাব?

ভদ্রমহিলা বললেন—আমরা দুঃখিত, বিমান-ঘাঁটিতে আসতে পারছি না, আপনি ওদের এয়ার-টার্মিনাসে আসুন, সেখানে আমরা আসছি; —আপনাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসব সেখান থেকে।

সমস্যার সমাধান হ'ল—তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। তারপ
তাঁরা কত ভাবে
এই মাধুর্য কখনই

ওদেশের সব
মানুষের স্বতন্ত্র ব্য
মানুষ ব্যক্তিত্বহীন; ত
না—তারা গতানুগতিক

কিন্তু ওদেশে প্রতিটি ম
কথা ভাবছে। শুধু ভাবছে তা নয়,
পরিস্ফুরণের জন্য কত চেষ্টা, কত সাধনা;

নিউইয়র্কের থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতার শেষে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে আলাপ করল, বলল—এমন মর্মস্পর্শী কথা বহুদিন শুনি নি। আমার নাম এলিন—আসুন না একদিন আমার ওখানে···

বললাম—চেষ্টা করব। দুঃখের বিষয় সেখানে যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি।

মেয়েটি একটি চিঠি দিয়েছিল আমার হাতে। সে গায়িকা—গানের প্রতি তার রয়েছে দরদ; শুধু দরদ নয়—ভক্তি। সেই ভক্তির উচ্ছ্বাসে সে পরিচয়-পত্রে লিখেছে:

Music has ever been the link between the universal harmony and the harmony of the individual. To promote harmony and to establish love is to heal. Singing is a spiritual experience, we sing with the mind through the body; skill in singing is a form of self-control. Learn the principles of singing and diligently discipline your body to the music of the spheres.

মেয়েটির আনন্দ-ভাস্বর মুখের কথা মনে পড়ে, —তার লিখিত এই কথাগুলি তার অন্তরের উপলব্ধ সত্য মনে হয়।

সেই তরুণী সঙ্গীতকে আধ্যাত্মিক সাধনা ব'লেই

আনন্দের সাথে
—সঙ্গীত। সেই
ই তার গান না
-সেই তপস্বিনী গান
। অধ্যাত্মসাধনা।
ছিল : ধর্ম করে
সমস্ত অকল্যাণ, দূর করে
উপরে সে দিয়েছিল এই চিঠি।
ব'সে সেই কল্যাণময়ীর তপস্যার
র স্মরণ করি।

যারা স্বাধীন, যারা দৃপ্ত, তাদের কাছে সৌজন্য স্বাভাবিক—সৌজন্য সেখানে অন্তরেই ফোটে—তাই মানুষের কাজে লাগবার জন্য সেটা স্বাভাবিক।

নিউইয়র্কের National Manufacturers' Association একটি বই বিনামূল্যে দেবে ব'লে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—আমি সেই পুস্তিকাটি আনতে গিয়েছিলাম। পুস্তিকাটির নাম : 'তোমার ভবিষ্যৎ তুমি গড়তে পার'।

আমেরিকা সত্যই গণতন্ত্রের দেশ, সেখানে মানুষ আপনার জীবন আপনি গড়ে তোলে। তাই এরা আশায় ও আনন্দে লেখে :

'As a people, our future is bright with promise. By making the most of your opportunities now, in school, and by planning your own future carefully, with the help of your teachers and parents, you will be able to play your part in building a better America.'

একটি বয়স্কা মহিলার উপর বিতরণের ভার ছিল। তিনি একান্ত সমাদরে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। আমি বললাম, আপনাদের বিতরিত অন্যান্য বইগুলিও আমি চাই।

সেগুলি তো এখন আমার কাছে নেই—বসুন আমি ব্যবস্থা করছি।

তখনই মেয়েটি ফোন করলেন—খানিক পরে বই এল। বই দিয়ে মেয়েটি বললেন, আপনি আমাদের বিষয় যদি আরও জানতে চান—তবে আমাদের সম্পাদকের সাথে দেখা করতে পারেন।

আমি সাগ্রহে স্বীকৃতি জানলাম।

সম্পাদকও একজন নারী ; মিস হার্নের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছিল—ভারতবর্ষ থেকে চারজন ছাত্রকে তাঁদের আওতায় ডেকে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই তাঁকে। তিনি বলেছিলেন, আপনি আমার সাথে চিঠিপত্র লিখবেন।

* * *

স্পেনের পথ দিয়ে চলছি—সেদিন রবিবার। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি ইংরেজী জানেন ।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—হাঁ, কি চান বলুন।

আমি আমার জ্ঞাতব্য প্রশ্ন বললাম। ভদ্রলোক শুনে জানালেন—তিনি হাঙ্গেরীয়ান, ভারতের প্রতি তাঁর একান্ত শ্রদ্ধা, তারপর—তিনি ভারত সম্বন্ধে শুনতে চান।

দুজনে তখন নিকটবর্তী উদ্যানে গিয়ে বসলাম। ভদ্রলোক গান্ধী ও নেহেরুর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন, 'জাতিভেদ নিশ্চয়ই এতদিনে উঠিয়ে দিয়েছেন !'

এ কথার জবাব দেওয়া মুস্কিল। বিদেশে দুটি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে—জাতিভেদ আর শিক্ষা। আমরা কাগজে কলমে যতই বড়াই করি না কেন, স্বাধীন ভারতবর্ষেও দুইটি বৃহৎ কলঙ্ক—জাতিভেদ আর অশিক্ষা। আর তার চেয়ে বড় কথা—এই দুই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য সত্যকার চেষ্টা আমরা করছি না। কিন্তু তাঁকে বললাম,—'আইনের চোখে ভারতবর্ষে আজ সবাই সমান।'

ভদ্রলোকের অসীম কৌতূহল। ভারতের অর্থ-নৈতিক সমস্যা—দারিদ্র্য, শিক্ষা, জনসেবা প্রভৃতি বিষয়ে খুঁটিনাটি অনেক প্রশ্ন করলেন ; তারপর

আমাকে সঙ্গে ক'রে মাদ্রিদের পশুশালার দ্বারে পৌঁছে দিলেন।

*　　*　　*

এথেন্স শহরে যখন 'ভারত-ধর্মের সজীবতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই তখন বক্তৃতা-শেষে এক ভদ্রলোক দেওয়ালে বিলম্বিত একজন গ্রীকের ছবি দেখিয়ে বলেন—ইনি ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী হ'য়ে বাস করেন, পরে দেশে ফিরে মহাভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন। তখন এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বললেন, আমি ভগবদ্গীতার গ্রীক অনুবাদ করেছি—আপনাকে একখণ্ড দেব।

আমি বললাম—গ্রীক ভাষা আমার নিকট 'গ্রীক'—তবে যদি দেন, সে দান গ্রীসের প্রীতির স্পর্শ ব'লে মাথায় নেব।

ভদ্রলোক তার গৃহে যেতে বললেন—পরদিন। কিন্তু আমার সময় ছিল না তাই বললেন, পাঠিয়ে দেব ডাকে।

এই ধরনের মিষ্টি কথা ভাবাবেগে বলি আমরা, কিন্তু হয়তো পরক্ষণেই ভুলে যাই। হঠাৎ সেদিন পেলাম ডাকে সেই ভগবদ্গীতা; পড়তে পারি না, কিন্তু তবু গ্রীক বন্ধুর প্রেমের প্রতীক হিসাবে সেটা রেখে দিয়েছি পরম কৃতজ্ঞতায়।

*　　*　　*

আমেরিকার আন্তর্জাতিক ছাত্রভবনে কয়েকদিন থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। টিউবে করে যখন আসি—তখন আমার সুটকেশ প্রভৃতি একা একা বইতে পারছিলাম না, এক ভদ্রলোক যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিলেন সেই অপরিচিত মহাত্মা অবলীলাক্রমে আমার সুটকেশ বহন করলেন। এই মহানুভবতার সাথে আমাদের দেশের ব্যবহার তুলনা করলে বেদনা পাই। এই আন্তর্জাতিক ভবন থেকে এক কোয়েকার দম্পতীর গৃহে অতিথি হই। যাওয়ার সময় এক ভারতীয় অধ্যাপক—যিনি কলম্বিয়ায় Ph. D.র জন্য পড়ছেন; তাকে বলেছিলাম, আমার একটি সুটকেশ রেখে যাই আপনার ঘরে, দুদিন পরে নিয়ে যাব। প্রথমে তিনি রাজি হ'তে চান নি।

*　　*　　*

করাচীতে Y. M. C. A. হোটেলে উঠি। যাওয়ামাত্র একজন মুসলমান যুবক সঙ্গে ক'রে নিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ঘরে নিয়ে গিয়ে বেয়ারা বলল, 'হুজুর, এহি আপকা হ্যায়'। সেখানে কোনও বিছানা ছিল না; বললাম, 'বিস্তারা কাঁহা?' সে বলল, 'বিস্তারা নেহি মিলেগা।'

পাশে যে পাঠান যুবকটি ছিল—অযাচিতভাবে সে আপনার ঘরে গেল, নিজের বালিশ বিছানা চাদর ও কম্বল এনে দিল। আমার ঘরের পাঞ্জাবী মুসলমান যুবক দিল আর একটি কম্বল।

তারপর ফিরবার পথে ভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠানে কয়দিন ছিলাম। যিনি প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক তাঁকে বললাম, 'ভারতসংস্কৃতি' প্রচার করতে দুনিয়া ঘুরে এলাম; সঙ্গে বিছানা নেই, যদি একটু ব্যবস্থা করেন। প্রথম দুদিন একটি সতরঞ্চি এসেছিল, তৃতীয় দিন সেটা চলে গেল, কাজেই শুধু খবরের কাগজ পেতে ও ওভারকোট গায়ে দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল। একজন পরিচিত পদস্থ বন্ধুকে এই দুরবস্থার কথা জানিয়েছিলাম, তিনি সে দিকে উচ্চবাচ্য না ক'রে অন্য গল্পের মিষ্টালাপে আপ্যায়িত করেছিলেন।

দুনিয়ায় জীবন্ত ও প্রাণবন্ত নরনারীর পাশে দাঁড়ালেই আমরা যেন মলিন হ'য়ে পড়ি। সব দেশে ভাল মন্দ আছে, এ কথা সত্য; কিন্তু আমাদের দেশে প্রাণের অভাব দেখা দিয়েছে। আমরা যেন জাগ্রত জাতিগুলির সমকক্ষ হ'য়ে উঠতে পারছি না।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—স্বাধীনতা যেন আমাদের বলিষ্ঠ ক'রে তোলে। আমরা যেন প্রেমদৃঢ় কর্মী, আশিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ মানুষে পরিণত হই।

সমাজ-জীবনে গীতা

স্বামী মহানন্দ

'গীতা পড়েছ কিনা?'—এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলে থাকেন, 'আমি ত ধর্মজীবন যাপন করতে চাই না; আমি চাই,—এই সংসারে সমাজে সুন্দররূপে বাঁচতে।' তার উত্তরে বলা যায়, ভারতের প্রায় সব ধর্মই সর্বাঙ্গীণ; সমগ্র জীবনেরই পথিকৃৎ, তাই প্রায় সকল ধর্ম গ্রন্থেই ঐ সুন্দররূপে বাঁচার উপায় বলে দেওয়া রয়েছে, গীতাতেও তাই আছে। সন্দিগ্ধচিত্ত আবার প্রশ্ন করে, 'আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সহায়ক হবে—এমন কথাও কি গীতায় আছে?' ছোট বয়স থেকেই আমরা শুনে আসছি: বৃদ্ধবয়সে শুধু গীতা পড়তে হয়; মুমূর্ষুকে গীতা পড়ে শোনাতে হয়; আর শ্রাদ্ধবাসরে গীতা দান করতে হয়। সেই গীতায় আবার কি ক'রে দৈনন্দিন জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর, তথা জীবনের সর্বাবস্থায় চলার নির্দেশ থাকবে? শতকরা আশীভাগ লোকেরই এই ধারণা!

কিন্তু গীতার উৎসমুখেই দেখছি অর্জুন যুদ্ধ করতে চলেছেন; তিনি রাজত্ব ফিরে পেতে চান। তপোবনের একান্তে ধ্যানে-বসা ঋষি তিনি নন, সংসারত্যাগী হিমালয়পথের যাত্রীও নন তিনি। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, সমরক্ষেত্রে তিনি এক যোদ্ধা। জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিনব্রত যুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন; কে মরবে, কে বাঁচবে, কে জয়ী হবে—কিছুই জানা নেই। অথচ ঐ তীব্র পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে—যখন তিনি বিচলিত, যখন তিনি কর্মকুণ্ঠ, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন; বলছেন, 'যুদ্ধ কর'; বলছেন:

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

—হে অর্জুন, ক্লীব হ'য়ে যেও না। এই কাতরতা তোমার শোভা পায় না। হৃদয়ের ঐ ক্ষুদ্র দুর্বলতা ছেড়ে, হে শত্রুদমন, ওঠ, যুদ্ধ কর। এই ভাবেই নানা উপদেশ দিয়ে শেষে সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে নিযুক্ত করলেন; বনে পাঠালেন না। কর্ম ও সমস্যাবহুল জীবন-প্রশ্নের সমাধানকারী উপদেশ সংগ্রহ ক'রেই গীতার সৃষ্টি হ'ল;— অথচ তার মধ্যে জীবনযাত্রার কথা থাকবে না, এ কি ক'রে হ'তে পারে? একটু অবহিত হ'য়ে পাঠ করলেই, কেবলমাত্র বৃহত্তর জীবনের নয়, সাধারণ জীবনযাত্রার ইঙ্গিতও গীতায় পাওয়া যায়।

জগতের দিকে দিকে আজ যে কথাটাকে সবচেয়ে বেশী বার লোকে উচ্চারণ করছে, সেটি হচ্ছে—শান্তি; সর্বপ্রকার বিদ্বেষ বর্জন করার কথা। বারে বারে প্রশ্ন উঠছে—'কি করলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ থাকবে না? জাতিতে জাতিতে বৈরভাব ঘুচে যাবে। মানুষে মানুষে অসদ্ভাব মুছে যাবে? শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে এর উত্তর শুনেছি, 'যখন বাইরের লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে। মিশে যেন এক হ'য়ে যাবে—বিদ্বেষভাব আর রাখবে না। ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান—এই ব'লে নাক সিটকে ঘৃণা করো না।...রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, সবগরু মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়। এক পালের গরু। যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, আবার পৃথক হয়ে যায়। নিজের ঘরে, আপনাতে আপনি থাকে।' বারে বারে শুনি আমাদের মধ্যে এমন সব দেবোচিত গুণের সমাবেশ করতে হবে। যাতে শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীটাই এক সখ্য-সূত্রে গাঁথা হ'য়ে থাকবে। কিন্তু সে গুণগুলি কি? অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন:

অর্জুন, যারা সাত্ত্বিক হবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের ভয়শূন্যতা, পবিত্রতা, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, সামর্থ্যানুরূপ দান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, অসচ্চিন্তা ও অসৎকর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচাদি, অবৈরভাব ও অভিমান-রাহিত্য এই সব গুণ লাভ হয়।

এই কথা শুনলে মনে হয়, এক মহাকুরুক্ষেত্র সমরের পূর্বে দাঁড়িয়ে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরূপী মানবাত্মাকে বলেছিলেন: অক্রোধ চাই, অদ্রোহ চাই, অহিংসা চাই, তা না হ'লে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিকে—হে মানব, তুমি কিছুতেই সরাতে পারবে না। কিন্তু শান্তি আনবার জন্য হ'তে হবে 'নির্মমো নিরহঙ্কারঃ'; মমতাশূন্য, অহঙ্কারশূন্য ও নিঃস্পৃহ হ'লে তবেই শান্তি পাবে। নতুবা শত সহস্র ধনাগারেও মানুষের স্পৃহা মিটবে না, বৈরভাব যাবে না। কেবল প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকলেই নিজের প্রবৃত্তিগত স্বভাব কি যায়? শুধু তাই নয়, স্বার্থের খাতিরে, নিজের জন্য, আমরা যেভাবে নিজেকে নিয়োজিত করি, পরার্থে তা করি না। ব্যবহারের বিভিন্নতায় আর স্বার্থপূর্ণ কাজের জন্যই যে শেষে আমরা শান্তি হারাই, নিজেদের মধ্যে হানাহানি করি, তাও গীতায় রয়েছে: 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে'—আসক্তি থেকেই কামনা, কামনা থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি।

যখন দেশের লোক. সহজ ধনাগমের আশায় মনুষ্যত্বকে ভুলে নিকৃষ্টতম কালোবাজারে ঘোরা-ফেরা করছে, যখন জীবনধারণের শ্রেষ্ঠত্বকে টাকার পরিমাপে যাচাই করতে চায়, তখন সে ভাবে না যে এই শ্রেষ্ঠত্ব, এই উচ্চতা একটি হাল্কা জিনিস মাত্র—দাঁড়িপাল্লার হাল্কা দিকটাই উঁচু হয়। এতে সে শুধু নিজে নয়, তার পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সমুখে কি এক ঘৃণ্য আদর্শের পচা-কঙ্কালটাকেই না দাঁড় করাচ্ছে! ঘরের হাওয়া শুদ্ধ হ'লে তবেই ত সেই ঘরে শুদ্ধসত্ত্ব, সত্যিকারের মানুষ জন্মাবে: 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ-ভ্রষ্টোঽভিজায়তে।' জন্মান্তরের সাধক, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন ধনীর গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। তাই সাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অন্যায় অর্থ সঞ্চয় থেকে সাবধান ক'রে দিতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন:

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

—অসংখ্য আশাপাশে বদ্ধ ও কামক্রোধের বশবর্তী হ'য়ে তারা বিষয়ভোগের জন্য অসদুপায়ে অর্থ-উপার্জনের চেষ্টা করে। আর ভাবে, আমার এই লাভ হয়েছে, ভবিষ্যতে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে; এই ধন আমার আছে, এই ধনও ভবিষ্যতে আমার হবে;...আমি ধনী,—অভিজাত, আমার সমান আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, ভোগ করব। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই সব মূঢ় অভিমানী লোককে তাদের অধর্মদোষের জন্যই বাসনাময় সংসারপথে অশুভ যোনিতে বার বার নিক্ষেপ করি।

প্রশ্ন উঠবে—যারা ঐ ভাবে অর্থোপার্জন করে, তারা নিজের মনে ঐ সব দোষ দেখতে পাচ্ছে না ত? তার উত্তরে বলতে হয়, ওর ভেতরে অনেকদিন থাকলে হুঁশ চলে যায়। মনে হয় বেশ আছি। প্রথম প্রথম অবশ্য খারাপ কাজ করলেই খারাপ লাগে, মন্দ কাজটি করলেই মন ধুক ধুক করে; পরে আর করে না। আমাদের বিবেক-হীনতাই লোভাদি এনে দেয়, এবং ঐগুলি যে খারাপ, এ বোধও পরে হারিয়ে যায়।

গীতায় বার বার চরিত্র গঠনের উপর এত

জোর দেওয়া হয়েছে। মানুষ তার সকল শত্রুর থেকে দূরে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পারে না তার স্বভাবের কাছ থেকে পালাতে। তাই পৃথিবীর যেখানেই সে যাক না কেন, তার চরিত্র—ভাল হোক, মন্দ হোক, তার সঙ্গে যাবেই। এই চরিত্র যে তার নিজস্ব সৃষ্টি। ভাস্কর যেমন তার মূর্তিকে লোহার ছেনিতে ঠুকে ঠুকে, কেটে কেটে রূপ দেয়, তেমনি আমাদের নিজস্ব চিন্তার ছেনিতে আমাদের চরিত্র-ভাস্কর্য ফুটে ওঠে। ইংরেজ কবি পোপ এক জায়গায় তাই বলেছেন: এই সুন্দর চরিত্র সৃষ্টির জন্য আমাদের ভোগ-বাসনাকে ছেড়ে, বিবেককে আঁকড়ে ধরতে হবে।[১]

এই চরিত্রগঠন প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনেক বছর আগে একবার শত্রুপক্ষ একটি শহর অবরোধ করেছিল, তখনকার নিয়মানুযায়ী তারা এক বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঐ শহরের দেওয়ালে অনবরত আঘাত করছিল, দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলবার জন্য। অবরুদ্ধ সৈনিকেরা দেখল, দেওয়াল একবার ভেঙ্গে গেলে আর রক্ষা নেই; তারা তখন ঐ দেওয়ালের গায়ে আর একটি অধিকতর শক্ত দেওয়াল গেঁথে দিল। শত্রুপক্ষ বাইরের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলল বটে, কিন্তু ভিতরের সুদৃঢ় দেওয়াল ভাঙ্গতে পারল না। সেই রকম, সমাজের শক্ত প্রাচীর আমাদের অনেকখানি রক্ষা করে বটে, কিন্তু নিজ-চরিত্রের সুদৃঢ় প্রাচীর না তুললে, আমাদের মাঝে মাঝে সমূহ বিপদ দেখা দেবে।

আমরা সত্যকার চরিত্রবান কিনা, তা আমাদের চিন্তা, আমাদের ব্যবহার, আমাদের কথাবার্তা অহরহ প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে। একই অবস্থায় দুই বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিকে তাই বিভিন্নরূপে দেখতে পাই। একবার সুবিখ্যাত গায়ক মোজার্ট ও আর একজন শিকারী একই বনপথে, একই সঙ্গে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি চাতক সুমিষ্ট গান গাইতে গাইতে তীব্রবেগে সোজা আকাশে উঠে গেল। তা দেখে শিকারী ব'লে উঠল, 'কি চমৎকার তীরন্দাজ!'—আর মোজার্ট বললেন, 'আমি যদি ঐ রকম গানের গলা পেতাম, তাহ'লে কি সুন্দর হ'ত!' তাঁরা ঐ বনপথে আরো এগিয়ে চললেন। মাঝে জোর বাতাস উঠল; গাছপালায় শন্ শন্ শব্দ হ'তে লাগল। তা শুনে শিকারী বলল, 'বাঃ, এই শব্দে খরগোস ভয় পেয়ে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে।' আর মোজার্ট বললেন, 'ঐ শোন, শোন, ঈশ্বরের এই বিরাট বাদ্যযন্ত্রে কি অপরূপ সুর ফুটে উঠছে!' শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, 'যেমন আকর তেমনি কথাও বেরোয়! মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর বেরোয়।' তবুও যে আমরা এইসব কথা ভুলে যাই, তার কারণ, আমাদের মনের ময়লা আর্শিতে আমাদের যথার্থ স্বরূপের ছায়া পড়ে না। 'ঘোলা জলে নির্মলি ফেললে পরিষ্কার হয়। তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আর্শিতে মুখ দেখা যায় না।' এইসব অবস্থায় কুতর্ক ছেড়ে যথার্থ বিচার করতে হবে।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সম্মোহনে আমরা আমাদের অন্তরের স্বচ্ছ পূত প্রবৃত্তিকে শেষে অবাস্তব ব'লে মনে করি, স্বপ্নে যেমন বাস্তব জীবনের স্বভাবকে ভুলিয়ে দেয়—অবাস্তব ব'লে মনে করায়। তাই স্বপ্নে ভয় দেখে জেগে উঠলেও বুক দুড়্ দুড়্ করে! বিকারের অবস্থায় রোগীর সত্যকার স্বরূপ ধরা পড়ে না। ছায়া কিছু আলোকের অংশ নয়, শুধু আলোককে বাধা দিয়েই ছায়ার সৃষ্টি। তেমনি আত্মা কিছু পাপময় নয়। আমরা মিথ্যার আচরণ দিয়ে ঐ ভাবে আলোতে ছায়ার সৃষ্টি করছি মাত্র,[২]

১ 'On life's vast ocean diversely we sail,
Reason is the card, but passion is the gale.'

২ 'The stain of sin is not something positive existent in the soul......It is like a shadow which is the privation of light.'
—St. Thomas Aquinas

এবং ঐ মিথ্যার সৃষ্টিকেই সত্য মনে ক'রে ভাবছি, সত্যটাই ভুল। ভূতে যাকে পায় সে জানে না যে তাকে ভূতে পেয়েছে।

মানুষমাত্রই শুদ্ধ। বিবেকের আলোক উদ্ভাসিত হ'লেই এটা ধরা পড়ে—অতি বড় পাপীর আত্মাতেও কোন ছাপ পড়েনি; আকাশবৎ আত্মার ব্যাপ্তিতে কোন ছায়া নেই। সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, এসব আত্মার কোন অপকার করতে পারে না। গীতায় পাচ্ছি:

'যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥

যেমন সর্বব্যাপী আকাশ সূক্ষ্ম ব'লে কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেই রকম সকল প্রকার দেহে থেকেও আত্মা দোষগুণে লিপ্ত হন না। তবে সংসারের ভেতর থাকতে গেলেই, ঐ আত্মাকে ভুলে মানুষ নিজেদের কলঙ্কিত মনে করে।

এ যুগের আর একটি প্রধান ব্যাধি—অসন্তোষ; কোন অবস্থাতেই মানুষ আজ সন্তুষ্ট হ'তে পারছে না। বাইরে নিস্তব্ধ আগ্নেয়গিরির মাঝে অন্তরের দহন ধিকি ধিকি জ্বলছে। বারে বারে সে তাই ছুটতে চায় দিকে দিকে—সন্তোষের আশায়। কিন্তু মানুষ তার অন্তরের এই দাহের প্রথম ও প্রধান কারণ খুঁজতে চায় না। বোঝে না, পরশ্রীকাতরতা ও ঈর্ষা না ছাড়লে, বিলাস-লিপ্সা ও অপব্যয় না ত্যাগ করলে, কিছুতেই মনের সেই প্রগাঢ় স্থৈর্য, চিত্তের প্রশান্তি আনতে পারবে না।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥

যে লোক যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বের অতীত, মাৎসর্য-বর্জিত লাভালাভে সমদর্শী, সে কর্ম ক'রেও কর্মে আবদ্ধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন 'বিমৎসর' হ'তে—মাৎসর্যহীন হ'তে, ঈর্ষাশূন্য হ'তে। শুধু তাই নয়, ঐ সন্তোষ আনতে গেলে, আমাদের পরচর্চা পরনিন্দাও ছাড়তে হবে; ছাড়তে হবে বিলাসিতাও। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখের জন্যই অর্থাহরণ বর্জন করতে হবে, কারণ এই সুখ আপাতমধুর হ'লেও পরিশেষে বিষবৎ হ'য়ে উঠে। গীতায় পাচ্ছি:

'বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎতদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥'

বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগ থেকে যে সুখ হয় তা প্রথমে অমৃততুল্য কিন্তু পরিণামে বিষবৎ মনে হয়। এই সুখ রাজসিক সুখ।

অহঙ্কারও ত্যাগ করা একান্ত দরকার। অবিনশ্বর আত্মার উজ্জ্বল প্রশান্ত আলোয় ঐ অহমিকাই নানা রঙের ফুলঝুরি ফোটাচ্ছে। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ আছে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। তাই আমাদের জীবনে অহঙ্কারাদি ছেড়ে সত্যকার চরিত্র-মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা চাই। 'অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।' উৎকর্ষ-সত্ত্বেও আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভশূন্যতা, অহিংসা, ক্ষমা ও সরলতা আনতে হবে। শুধু সংসারত্যাগীদের ভেতরে নয়, সমাজে সংসারের মধ্যেও আত্মশ্লাঘারাহিত্যের উদাহরণ আমরা ইতিহাস থেকেই চয়ন ক'রে নিতে পারি। একবার রোম সম্রাট জুলিয়াস সীজার, নগর ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন। পথের ধারে এক গরীব লোক তাঁকে প্রণাম করল। সীজার তাকে তখন আনত হ'য়ে প্রত্যভিবাদন করায় তাঁর সঙ্গের পার্ষদরা বলল, সম্রাট ঐরূপ সামান্য ব্যক্তিকে আপনার অত নীচু হ'য়ে প্রণাম করা ঠিক হয়নি। সীজার উত্তর দিলেন, বল কি হে, আমি সকল বিষয়েই ওর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর প্রণতি-বিষয়ে খাট হব কেন?

সমাজে বাস করতে গেলে প্রত্যেককে দেখা উচিত। একের অভাবে তাই অন্যের দান করারও প্রয়োজন আছে। এই দান 'অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্' অর্থাৎ প্রিয়বচনাদিশূন্য অবজ্ঞার দান হ'লে চলবে না। সত্যকারের দানে অহমিকার কোন স্থান নেই। যে নিচ্ছে সে-ই সেখানে প্রধান—যে দিচ্ছে সে নয়। স্বামীজী তাই বলেছেন: উচুঁতে

দাঁড়িয়ে পাঁচটা পয়সা হাতে নিয়ে কোন গরীবের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাচ্ছিল্য ক'রে বোলো না, 'ঐ নে'; বরং একজন দেবতারূপী গরীব যে তোমার সমুখে আসায় তুমি কিছু দান ক'রে তোমার নিজ সদ্‌গুণের বৃদ্ধি করতে পারলে, সেজন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ হবে। গীতায় রয়েছে:

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥

দান করা কর্তব্য—প্রত্যুপকারের আশা না ক'রে উপযুক্ত পাত্রে, স্থানে ও সময়ে দান করাই সাত্ত্বিক দান। কিন্তু প্রত্যুপকারের বা কোন পারলৌকিক ফল পাবার আশায় এবং অনিচ্ছায় যে দান করা যায় তা রাজসিক দান। আমাদের এই সাত্ত্বিক দানের কথাই চিন্তা করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: 'দানাদি কর্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়—সে ভাল নয়। তবে নিষ্কাম করলে ভাল। নিষ্কাম করা বড় কঠিন।...তবে দয়ার কাজ, দানাদির কাজ কি কিছু করবে না? তা নয়। সামনে দুঃখকষ্ট দেখলে, টাকা থাকলে দেওয়া উচিত।'...মহাপুরুষরা জীবের দুঃখে কাতর হ'য়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন। অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আরও বড়। স্বামীজীর বীরবাণী:

'দাও আর ফিরে নাহি চাও,
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল'।

একমাত্র মানসিক উৎকর্ষের কথাই গীতায় রয়েছে, তা মনে করা ভুল। দেহের উন্নতি করার কথাও আছে। কারণ প্রথমেই বলেছি, ভারতের ধর্ম—সর্বাঙ্গীণ ধর্ম; সমস্ত জীবন ঘিরেই সেখানে উৎকর্ষের তাগিদ। তাই ভারতের কোন ধর্ম-সাধন দেহকে বাদ দিয়ে নয়; বরং বলেছে 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম-সাধনম্।' স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন: তোমার স্নায়ুকে দৃঢ় কর, আমাদের দরকার লোহার মত পেশী, ইস্পাতের মত স্নায়ু ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি। গীতায় আছে, কি কি আহার করতে হবে; কি কি আহার করলে সাত্ত্বিকগুণ-সম্পন্ন হওয়া যায়, সুস্থ শরীরে শুদ্ধ মন পাওয়া যায়:

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

কি কি আহার শরীর-মনের অনিষ্টকারী?

'কট্‌বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥'

শুধু মন, চরিত্র ও দেহকে সুষ্ঠুভাবে তৈরী করাই উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব নয়; মানবকে মৃত্যুভয় জয় করতে হবে, এবং তা করতে হ'লে তাকে 'বিজ্ঞানে'র জন্যও যত্নবান হ'তে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখেই এই বিজ্ঞান-অবস্থা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'বিজ্ঞান, কিনা বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে শুনেছে সে অজ্ঞান। যে দেখেছে সে জ্ঞানী, যে খেয়েছে তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বরকে দর্শন ক'রে তাঁর সহিত আলাপ—যেন তিনি পরমাত্মীয়; এরই নাম বিজ্ঞান।' আরও উদাহরণ টানা যেতে পারে: 'বিজ্ঞান' কিনা তাঁকে (ভগবানকে) বিশেষরূপে জানা। কাঠে আছে অগ্নি, এই বোধ—এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রেঁধে খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে.বোধ, তার নাম জ্ঞান; তাঁর সঙ্গে আলাপ—তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্য ভাবে, মধুর ভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন—এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। তাই ধর্মশাস্ত্রের ভাষায় মানুষ বিজ্ঞানী না হ'লে কিছুই হ'ল না। বিজ্ঞানী না হ'লে শুধু সঙ্গগুণেই ভাল হওয়া যায় না। 'সাধুর

কমণ্ডলু চারধাম ক'রে আসে, কিন্তু যেমন তেতো তেমনি [illegible]।'

[illegible]র্থ উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত জ্ঞানের দিকে ধাবিত; এবং এইটি যে শ্রেষ্ঠ তাও গীতা বলেছে।

'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাদ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥

হে অর্জুন, দ্রব্য দিয়ে যে যজ্ঞ হয় তার চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ নিরবশেষ যজ্ঞাদি সকল কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়। তাই মানবজীবনে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ঐ জ্ঞান লাভ করা। যদিও ঐ উদ্দেশ্যের পেছনে, ঐ আদর্শে আলোক-বর্তিকার দিকে ছোটার লোক মুষ্টিমেয়। গীতায় স্বীকৃত আছে:

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

—হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজন কেউ আত্মজ্ঞান লাভ করতে প্রয়াসী হয়। আবার যারা প্রয়াস করে তাদের মধ্যে একজন কেউ ভগবানের স্বরূপ জানতে পারে, অর্থাৎ 'বিজ্ঞানী' হ'তে পারে। 'ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেঁসে দাও মা, হাত চাপড়ি।' ঐ ভাবে ঘুড়ি কাটলেই তবে আমরা মৃত্যুভীতিকে দূরে সরাতে পারব। তখনই বুঝতে পারব, মৃত্যুকে দূর করা নয়, মৃত্যু ধরেই জীবন, মৃত্যু দিয়েই জীবন গড়া, মৃত্যুকে নিয়েই জীবনের পূর্ণত্ব। এর জন্য আমাদের জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে। ঋষি ও সন্ন্যাসীদের কথা না হয় ছেড়েই ছিলাম, কিন্তু এই পার্থিব জীবনে যাঁরা বাঁচার মত বেঁচেছেন, সংসারে সমৃদ্ধ হ'য়েও যাঁরা সমাজকে সাবধানবাণী শুনিয়েছেন—তাঁদের কথা দিয়েও আমরা এ কথা বুঝে নিতে পারি। কবি ব্রাউনিং শেষ সময়ে বলে-ছিলেন, কখনও বোলো না, আমি মৃত।[৩] ভিক্টর হুগোও এ কথাটি বড় মধুর ক'রে বলেছিলেন: যতই সেই শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই সহজ-ভাবে বুঝতে পারছি, আমার চারিদিকে নানা জগৎ থেকে আমাকে আহ্বান ক'রে অমর সুর ভেসে আসছে—এই সুর কত সহজ, কত মহান![৪] নিজের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা, জীবনের মূল্যবোধ ও কত বেশী আত্ম-সচেতন হ'লে তবে আমরা কবি টেনিসনের মত বলতে পারি: সমস্ত সৃষ্টিই সেই এক আইন, সেই এক বস্তু এবং সেই একমাত্র সুদূর-প্রসারী ঘটনাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে।[৫]

হয়তো প্রশ্ন হবে, ঐ কথা শুনেই কি আমরা আদর্শকে পেয়ে যাব। তাহলেই কি মহাবাগ্মী সিসিরোর[৬] মত বলতে পারব, আদর্শই অমরত্বের সন্ধান দেয়? না তা নয়। আমাদের স্বীকার করতে হবে একটি আদর্শকে, মানতে হবে একজনকে, করতে হবে সেই চাতুরী যে চাতুরীতে ভগবান পাওয়া যায়, 'সা চাতুরী চাতুরী'। একজনকে যেমন ক'রেই হোক মানতে হবে। এই মানার প্রথমে বিচার নয়, বিশ্বাস বড় কথা। ঐ বিশ্বাসের জোরেই আমরা যথার্থ পাওয়ার আস্বাদন পেয়ে যাই। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে: একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ডাক্তার, মৃত্যুর পারে কি আছে আমি জানি না। তাই সেখানে যেতে আমার ভয় করছে; তোমার কি কিছু জানা আছে?' ডাক্তার উত্তর দিল, 'আমারও জানা নেই।' মুমূর্ষু সে কথা

৩ "Never say that I am dead.'—R. Browning.

৪ "The nearer I approach the end, the plainer I hear around me the immortal symphonies of the worlds which invite me. It is marvellous, yet simple."—Victor Hugo.

৫ "One law, one element and one far off divine event, To which the whole creation moves."—Tennyson.

৬ "Ideals are overtures of immortality." —Cicero

শুনে ভয়চকিত নেত্রে সেই স্বল্পান্ধকার ঘরের চারিদিকে তাকাতে লাগল। এমন সময় ডাক্তারের পোষা কুকুরটা খোলা দরজা দিয়ে এসে প্রভুর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডাক্তার তখন রোগীকে বলল, 'হ্যাঁ, উত্তর পেয়েছি ; এই কুকুর এর আগে কখনও এ বাড়িতে আসে নি। এই ঘরেও ঢোকে নি ; এমনকি এখানে কি আছে তাও তার জানা ছিল না। তবুও সে একমাত্র তার প্রভুর গায়ের গন্ধ পেয়েই নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এইরকম প্রভুকে স্মরণ ক'রেই আপনিও ঝাঁপিয়ে পড়ুন, মৃত্যুর পারে কি আছে জানবার তাহ'লে আর দরকার হবে না।' মুমূর্ষু তখন হাসতে হাসতে মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়ল।

এই আদর্শকে ধরার কথা আমাদের আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে যখন আমরা পড়ি : 'প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ ; সেইজন্য মানবপ্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক ক'রে দেখার চেষ্টা হয়। কিন্তু আমরা তো প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখতে পাচ্ছি—সে তো জড়-যন্ত্রের মতো একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্তকাল অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করছে না। এ পর্যন্ত তাকে তো পথের কোন একটা জায়গায় থেমে থাকতে দেখিনি। সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্প-সংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মানুষে এসে পৌঁছেছে ; এবং এখানেই তার চলা শেষ হ'য়ে গেল, এমন মনে করার কোন হেতু নেই।···যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভাল ক'রে নির্ণীত হয়নি, তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ, কত অদ্ভুত পাখী, কত আশ্চর্য জন্তু কোন্ নেপথ্য গৃহ থেকে এই সৃষ্টি রঙ্গভূমিতে এসে তাদের জীবনলীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্ধরাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে তো যায়নি।··· একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন ব'লে আকর্ষণ ক'রে চলেছে··· তার বর্তমান এমন একটি অব্যর্থ ··· মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে।··· ঐই জন্যই এত দুঃখ, এত মৃত্যু। কিন্তু সামঞ্জস্যেরই একটি সুমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোট ছোট সামঞ্জস্যের বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হ'য়ে থাকতে দিচ্ছে না, কেবলি ছিন্ন ক'রে ক'রে কেড়ে নিয়ে চলছে।··· এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে সুন্দরকে দেখা। মানব, সংসারের মধ্যে সেই ভীষণকে সুন্দর ক'রে দেখতে চাও ? তা হ'লে নিজের স্বার্থপর ছয়রিপুচালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এসো। মানব চরিতকে যেখানে বড়ো ক'রে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও।'[৭]

এই 'মহাপুরুষ' শেষ বিচারে একমাত্র ঈশ্বর বা ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিকে স্বীকার করেই দাঁড়াতে পারে ; এবং এইরূপ মহাপুরুষকে স্বীকার করতে হ'লে আমাদের অন্তরের বোধিতে তার সুর বাজা চাই। শুধু আমাদের দেশের কবিমনই এই উপলব্ধিতে ভাস্বর হ'য়ে উঠেনি, ওদেশের সমাজ-চেতন মনেও তার ঝঙ্কার উঠেছে দেখতে পাই।

কবি ব্রাউনিং বলেছেন : আমি যে ক'রেই হোক জেনেছি, আমি বুঝেছি (ক্ষুদ্র বুদ্ধির কিংবা সঙ্কীর্ণ অনুভূতির অগম্য এ বোধি ; যদিও এ বোধি চিত্তের নানা স্পন্দনে এবং দেহের প্রতি লোমকূপে ছন্দিত হচ্ছে)—ঈশ্বর কে ? আমরা কে ? জীবনের অর্থ অর্থ কি ? ঈশ্বর কেমন ক'রে সহস্রভাবে সহস্র আনন্দকে উপভোগ করছেন, কেমন ক'রে একই শাশ্বত আশীর্বাদের অসীম আনন্দবার্তা থেকে, সকল জীব সৃষ্ট হ'য়ে, আবার সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে। জীবনোদ্বেলিত অসীমতা তথা অতিক্ষুদ্র

৭ রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, বৈশাখ, ১৩৪২, পৃঃ ৪৭৫-৪৭৮।

প্রাণস্পন্দনের মধ্যেও সেই 'এক' সদা জাগ্রত। যেখানেই আনন্দ সেখানেই তিনি।[৮]

এই সর্বব্যাপ্তি, এই আনন্দময়কেই আমাদের আশ্রয় করতে হবে। এঁকে ধ'রে থাকলেই ইনি আমাদের রক্ষা করবেনই। যে যাকে ধ'রে থাকে সে তাকে রক্ষা করেই, ইনি ত আরো মহান্ আরো বিরাট, আরো আপনার। তুলসীদাসের অনুভূতি:

৮ 'What God is, what we are,
What life is—how God tastes an infinite joy
In infinite ways—one everlasting bliss
From whom all beings emanate, all power
Proceeds ; in whom is life for evermore,
Yet whom existence in its lowest form
Includes ; where dwells enjoyment there
is He !'
—R. Browning, Paracelsus.

উজান জলেও শরণাগত মাছ অনায়াসে চলাফেরা করে; মহাবল হস্তী সংগ্রাম করে, তাই স্রোতে ভেসে যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন:

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

মায়া অতিক্রম করা শক্ত। কিন্তু যে একমাত্র আমাতেই (ঈশ্বরেতেই) নির্ভর করে, সেই কেবল এই মায়া অতিক্রম করতে পারে। সব কাজই যদি আমাকে ধ'রে করা যায়—হোক্ না সে আহার, হোক্ দান বা তপস্যা—তাহ'লে আর কোন ভয় নেই। আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দেব—দুঃখ কি? শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্বাস-বাণী অনবরত উদ্ঘোষিত হচ্ছে! কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে মত্ত হ'য়ে আছি, তাই তো সেই মহাজীবনের স্পর্শ পেয়েও পাচ্ছি না।

রাধা-হিয়া

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কৃষ্ণের মঞ্জীরে— মন্দ মৃদু সমীরে
ধায় কালিন্দী-তীরে
রাধা-হিয়া অভিসারে।
মন্থর আশাকুঞ্জে নন্দনফুল মুঞ্জে,
মর্ম-ভৃঙ্গ গুঞ্জে
বসন্ত-ঝংকারে।

দোল্ দোল্ দোল্ গানে, জয় জয় জয় তানে
উধাও অলখ পানে
রাধা-হিয়া সুখস্বপ্নে।
অচিনের অনুরাগে ঘুমন্ত প্রেম জাগে,
মধুরের ঢেউ লাগে
[illegible]া-লগ্নে।

অম্বর গন্ধে পুলকে, দ্যুলোক নামিল ভূলোকে,
সন্ধ্যার ছায়া-অলকে
জ্যোৎস্না দুলায় মালা।
অদেখা বঁধুর বাঁশি বাজিল চিত উদাসী:
"আয় আয় ব্রজবাসী,
আয় আয় ব্রজবালা!"

রাধা-হিয়া গায় উছলি': "লহ বল্লভ, সকলি,
শুনি ঘরছাড়া মুরলী
চিনেছি তোমারে স্বামী!
তোমারেই চিরসুন্দর! চেয়েছি যুগযুগান্তর,
তনু মন প্রাণ অন্তর
চরণে সঁপি প্রণামী।"

সন্ত জ্ঞানেশ্বর

ব্রহ্মচারী তেজচৈতন্য

আমাদের দেশ সাধু ও সন্তের দেশ, ত্যাগী ও ভক্তের দেশ। মানবপ্রকৃতির দুটি দিক্—একটি এই জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের উপর নির্ভরশীল, এবং অপরটি এই জগতের অন্তরালে ইন্দ্রিয়াতীত শাশ্বত সত্তার উপর অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই দুটি দিক্ই রয়েছে, কারও মধ্যে প্রথমোক্ত ভাবটি বেশী প্রকাশ পায় ও কারও মধ্যে দ্বিতীয়টি। প্রথমোক্ত স্বভাবের খেলা যার মধ্যে বেশী তাকে আমরা স্বার্থপরায়ণ, ইন্দ্রিয়লোলুপ ও জড়বাদী বলি; আর দ্বিতীয়ের প্রকাশ যার মধ্যে বেশী তাকে বলা হয় পরমার্থপরায়ণ, সংযমী ও আধ্যাত্মিক। যার আধার ক্ষণস্থায়ী সে স্বভাবতই ক্ষণস্থায়ী, আর যে শাশ্বত আধারে দণ্ডায়মান সে শাশ্বত। সুতরাং প্রথমোক্ত প্রকৃতির উপর স্থাপিত সংস্কৃতি জড়-প্রধান হয়, বেশী দিন টিকে না; এবং শাশ্বত প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠিত সংস্কৃতি চিরস্থায়ী। মানুষে মানুষে ভেদ এবং তজ্জন্য বিরোধ প্রথমোক্ত প্রকৃতিটিকে নিয়ে, শাশ্বত প্রকৃতিতে ভেদের কোনো প্রশ্নই নেই; কারণ সেখানে এক অদ্বয় পারমার্থিক সত্তাই বিরাজ করেন। আমাদের দেশে যখন ইতিহাসের আরম্ভ হয় নি, তখন থেকে মানুষ এই ইন্দ্রিয়াতীত মানবপ্রকৃতিকে পাবার জন্য চেষ্টা করেছে। সে রাজাই হোক্ বা পথের ভিখারী হোক্, ব্রাহ্মণ হোক্ বা চণ্ডাল হোক্, তার ভিতরের সেই শাশ্বত জ্যোতি বহিঃপ্রকাশের জন্য সতত চেষ্টা করেছে। মানুষ স্থূল দৃষ্টিগোচর ইন্দ্রিয়াভিরাম পদার্থসকলের প্রতি যতই আসক্ত ও আগ্রহশীল হোক্ না কেন, জীবনে এমন একটা সময় আসে—যখন ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য বস্তুসকল তার আদৌ ভাল লাগে না, যখন মন এই রাগ-দ্বেষময় সংসারের বহুমুখা প্রলোভন হ'তে উপরে উঠে এমন একটি জিনিস চায়, যা চিরকালের মত থাকবে, যা হ'তে আর বিচ্ছেদ নেই, যা মনে প্রাণে শাশ্বত শান্তি আনয়ন করবে।

আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ সন্ত জ্ঞানেশ্বরের পিতা বিট্‌ঠলপন্তের জীবনে মনের এই রূপান্তর খুব শীঘ্রই এসে উপস্থিত হয়। ধর্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত বিট্‌ঠলের প্রাণ সেই শাশ্বত শান্তি-লাভের জন্য আকুল হ'য়ে উঠল। নবযৌবনা পতিপরায়ণা সুন্দরী ভার্যা ও জীবনের নানাবিধ প্রলোভন তাঁর অন্তরে প্রজ্বলিত বৈরাগ্যানলকে আর বেশী দিন ঢেকে রাখতে পারল না। তিনি চান অমৃতের আনন্দ, আর জগৎ দেয় গরলের বিষাদ! তিনি চান তুরীয় শান্তি, আর সংসার দেয় জীবনের দ্বন্দ্ব! তৃপ্তির পরিবর্তে আসে বাসনার উদ্দাম নর্তন। ভাবেন তিনি—এ সংসারে শান্তি নেই। শান্তির জন্য সংসার হ'তে উপরে উঠতে হবে। দেহ রয়েছে 'আলন্দী'গ্রামে—পুনা হ'তে ১৪ মাইল দূরে, কিন্তু মন যেন সর্বদা কাশীধামে, হিমালয়ে বিচরণ করছে; কানে যেন ডাক এসেছে সেই ঋষি-মুনিদের ধ্যানপূত হিমানীমণ্ডিত শৈল-শিখরের। তিনি আর নিজেকে আটকে রাখতে পারছেন না। কিন্তু শাস্ত্র যে নিষেধ করছেন! শাস্ত্রে আছে—একটি পুত্র না হওয়া পর্যন্ত গৃহস্থের পক্ষে সংসার ত্যাগ করা ধর্ম-বিরুদ্ধ। বিট্‌ঠলের একটিও ছেলে নেই যে শাস্ত্রের এই বিধান রক্ষা করবে। এদিকে পত্নীও সম্মতা নয় তাঁকে ছেড়ে দিতে। তিনি বিমূঢ়ের মতো অবশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আশার আলো নিয়ে শাস্ত্রের সেই বাণীটিও তো আসে মনের কাছে—'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'। যেন কেউ প্রাণে অমৃত ঢেলে দেয়। স্থির করলেন বিট্‌ঠলপন্ত: জগতের মায়া-মো[illegible] সব ত্যাগ

ক'রে চলে যাবেন সেই শিবক্ষেত্রে, সেই স্বর্ণময়ী বারাণসীতে যেখানে সাক্ষাৎ পরাৎপর শিব সূক্ষ্ম দেহে সর্বদা বিরাজ করেন।

একদিন গঙ্গাস্নানের নাম ক'রে বেরিয়ে পড়লেন বিট্‌ঠলপন্ত বাড়ী থেকে; এলেন প্রয়াগে, ত্রিবেণী-সঙ্গমে মাঘ-স্নান ক'রে মুমুক্ষু বারাণসী চলে যান। সেখানে তখন ছিলেন স্বামী রামানন্দ, বিখ্যাত সাধু। লোকেরা বলে, মহাত্মা কবীর এঁরই শিষ্য। বিট্‌ঠলপন্ত এই সন্ন্যাসীর খোঁজ ক'রে তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত হন এবং সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভের জন্য প্রাণের আকুল প্রার্থনা তাঁকে জানালেন। স্বামী রামানন্দ বিট্‌ঠলের আগ্রহ ও বৈরাগ্য দেখে প্রীত হলেন। কিন্তু সন্দেহ জাগল মনে, এর যদি কোনো সাংসারিক দায়িত্ব থাকে, তা হ'লে তো আর সন্ন্যাস দেওয়া চলবে না। সেজন্য স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, 'সাংসারিক কোন দায়িত্ব নেই?' নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন বিট্‌ঠলপন্ত, 'না'। সন্দেহের আর কারণ রইল না। প্রসন্নমনে স্বামীজী তাঁকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে 'চৈতন্যাশ্রম' নাম দিলেন।

কথা কানে হাঁটে। বিট্‌ঠলপন্তের স্ত্রী রুক্মিণী বাঈ কালক্রমে জানতে পারলেন যে, তাঁর স্বামী কাশী গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন। রুক্মিণীবাঈ-এর দুঃখের আর সীমা রইল না, চারদিক্ যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠল। দুঃখের প্রবল স্রোতে জীবনের কূল কিনারা ভেসে গেল। নীড়হারা পক্ষিণীর ন্যায় নিরীহা রুক্মিণী হৃদয় জুড়াবার কোনো ঠাঁই-ই খুঁজে পেলেন না। কিন্তু কান্না-কাটি ক'রে আর কি হবে? ধৈর্য ধরতে হবে এবং যাতে স্বামীরই মতো—জীবনের প্রতি অভিনিবেশ ত্যাগ ক'রে মন ভগবানের দিকে যায়, তারই চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর তাঁর বারোটি বছরের জীবন তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর তপস্যার জীবন। সোনা আগুনে পুড়ে সমধিক উজ্জ্বল, সমধিক পবিত্র হ'য়ে গেল।

এদিকে স্বামী রামানন্দ ৺রামেশ্বর দর্শন করবার মানসে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন। দৈববশে পথে তিনি আলন্দী গ্রামে এসে উপস্থিত হন এবং ওখানকার দেবালয়ে উঠেন। যোগাযোগ এমনই, রুক্মিণীবাঈ দেবদর্শন করতে এসে সেই দেবালয়ে একজন সন্ন্যাসী দেখলেন। ও দেশের প্রথানুযায়ী তিনি সাধুকে প্রণাম করলেন। স্বামীজীও আশীর্বাদ করলেন, 'পুত্রবতী ভব'। এই শুনে রুক্মিণীবাঈ হাসি চাপতে পারলেন না। স্বামীজী অপ্রতিভ হ'য়ে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর দিলেন রুক্মিণীবাঈ, 'আমার স্বামী কাশী গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন। সুতরাং আপনার আশীর্বাদ কেমন ক'রে পূর্ণ হবে, তাই ভেবে আমি হেসে উঠলাম।' স্বামীজীর মনে সন্দেহের একটা অস্পষ্ট ছায়া এসে পড়ল। তিনি তন্ন তন্ন ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, আর যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, তাঁর শিষ্য বিট্‌ঠলপন্ত এই নারীর স্বামী, তখন আর তাঁর চিন্তা ও মানসিক উদ্বেগের সীমা রইল না। বিট্‌ঠল আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে, আর এবংবিধ সন্ন্যাস-দীক্ষাদানে শাস্ত্রের চক্ষে আমিও দণ্ডনীয়, এইরূপ ভেবে তিনি অস্থির হ'য়ে উঠলেন। রামেশ্বর যাওয়া আর হ'ল না। তিনি রুক্মিণী ও তার পিতার সহিত কাশী ফিরে এলেন এবং তাঁদের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা ক'রে মঠে গেলেন।

গুরুদেবকে এত শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত দেখে বিট্‌ঠল আশ্চর্যান্বিত হলেন। এমন সময় গুরু তাঁর কাছে এসে ব্যথায় ও রাগে অবরুদ্ধকণ্ঠে ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, 'আমি আলন্দী গিয়েছিলাম, শুনছ?' কণ্ঠস্বর উগ্র হ'য়ে উঠল, 'কিছু বলবার আছে?' বিট্‌ঠলপন্তের সমস্ত চেতনা আলন্দীর নাম শুনে যেন একেবারে লোপ পেল। ভয়ে জড়সড় হ'য়ে তিনি গুরুর শ্রীচরণে পতিত হলেন এবং সমস্ত কথা জ্ঞাপন ক'রে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গুরু যা কিছু দণ্ডবিধান করবেন, তা তিনি সহর্ষে

স্বীকার করবেন। গুরুও এই কথা শুনে আজ্ঞা দিলেন, 'তবে তোমার স্ত্রীকে পুনরায় স্বীকার কর, বাড়ী ফিরে যাও, গৃহস্থ হ'য়ে থাক।'

বিট্ঠলের উপর যেন বজ্রপাত হ'ল। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি, গুরুদেব এরূপ দণ্ডবিধান করবেন। তাঁর দারুণ পরীক্ষার সময় এল। একদিকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা, আর অপরদিকে আজীবন সমাদৃত উচ্চতম আদর্শের পরিসমাপ্তি। শেষে নিরুপায় হ'য়ে তিনি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করলেন এবং ১২৬১ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন।

বিট্ঠলপন্তের পরবর্তী জীবন লাঞ্ছনা ও অপমানে ভরা। আলন্দীর পণ্ডিতশাসিত সমাজ গৃহস্থাশ্রমে পুনঃপ্রবিষ্ট এই পতিত সন্ন্যাসীকে গ্রহণ করল না। বিট্ঠলপন্তকে জাতিচ্যুত ক'রে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দেওয়া হ'ল। বন্ধুরা ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। বাকী সকলে তিরস্কার করে, লাঞ্ছিত করে। এই দম্পতির দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। কিন্তু তবুও বিট্ঠলপন্তের মুখে প্রতিবাদস্বরূপ একটিও শব্দ নেই। তিনি ভাবেন: আমি তো আর নিজে থেকে স্ত্রীকে স্বীকার করিনি। এ তো গুরুর আজ্ঞাই পালন করছি। কিন্তু পণ্ডিতেরাই বা কি করবেন, যখন আমার মতো গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত সন্ন্যাসীর জন্য শাস্ত্রে কোনো বিধান নেই। এইরূপ ভেবে বিট্ঠলপন্ত সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনার জন্য যেন গা পেতে দিয়েছেন; শান্ত মনে নীরবে সব সহ্য ক'রে যাচ্ছেন। এই ভাবে দীর্ঘ বারো বছর কেটে গেল।

এই দুঃখময় পরিবেশে, বর্ষাকালের নিবিড় অন্ধকারে সূর্যের প্রাণপ্রদ রশ্মির ন্যায় পিতা-মাতার শুষ্ক সিক্ত ও অন্ধকার জীবন আলো ক'রে নিবৃত্তিনাথ ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। এর দু'বছর বাদে জ্ঞানদেবের জন্ম হ'ল, যিনি পরবর্তীকালে 'জ্ঞানেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হন। তারপর সোপানদেব ও মুক্তাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। একদিকে এই চারিটি সোনার ছেলেমেয়ের মুখ ক'খানি দেখে পিতামাতার যেমন হর্ষ হ'ল, তেমনি অপরদিকে তাদের ভবিষ্যতের দুঃখ কল্পনা ক'রে তাঁদের অন্তর বিষম বিষাদে ভ'রে গেল। পিতা-মাতা এত বছর ধ'রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছেন, কিন্তু তা তাঁরা সহ্য ক'রে নিয়েছিলেন। এখন এই নির্দোষ বাছাদের কি সমাজ গ্রহণ করবে? পাড়ার ছেলেরা এদের সঙ্গে খেলাধুলা করে না, মেলামেশা করে না, 'সন্ন্যাসীর ছেলে' ব'লে এদের ঠাট্টা করে, এটা বাবা-মার চোখে পড়েছে। তাঁদের অন্তরে দুঃখাগ্নি হুহু ক'রে জ্বলে উঠল। আর কোনো সঙ্গী না পেয়ে ভাই-বোনেরা একসঙ্গেই থাকে, ফলে তাদের মধ্যে একটা দৃঢ়তর প্রেম-বন্ধন গড়ে উঠল। তারা সর্বদা বাবা-মার কাছে থাকে, বাবার বৈরাগ্য ও ভক্তিভরা বাণী শোনে, মায়ের সর্ববিধ কাজে একটা নির্লিপ্ততার ভাব দেখে, আর সর্বোপরি দেখে দুঃখে দ্বন্দ্বে বাবা-মার মনের অদ্ভুত সাম্য—সেখানে আর যেন জগতের কোলাহল নেই; মান-অপমানে, সুখ-দুঃখে কঠোর উদাসীনতা। বাড়ীর বায়ু পর্যন্ত যেন ধর্ম-ভাবে ভরা। সেজন্য, যদিও তাদের কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ল না, তবুও পিতা-মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে তারা যে শিক্ষা-লাভ করল, তাই তাদের পরবর্তী ধর্ম-জীবনের দৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াল।

নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বরের বয়স এখন দশ ও আট বছর হয়েছে; ব্রাহ্মণ-বালকের জীবনে উপনয়ন-সংস্কার অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। এই সংস্কার না হওয়া অবধি যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব আসে না। সুতরাং ছেলেদের এই সংস্কার-কার্যের জন্য বিট্ঠলপন্ত ও তাঁর পত্নী উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন। বিট্ঠলপন্ত ভাবলেন, স্বামী-স্ত্রী আমরা উভয়ে এতদিন তিরস্কৃত হ'য়ে পর্যাপ্ত ফলভোগ করেছি, হয়তো গ্রামবাসীদের রাগ এতদিনে দূর হয়েছে; সুতরাং ছেলেদের এই মঙ্গল-কার্যে আর কেউ বাধা দেবে না। এই

ভেবে তিনি গ্রামের পণ্ডিতদের সমীপে গেলেন এবং এই অনুরোধটি জানালেন। পণ্ডিতদের গোঁড়ামি ও নিষ্ঠুরতা সমস্ত সীমা অতিক্রম করল; তারা বলল, 'গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত সন্ন্যাসীর ছেলেদের উপনয়ন কোনো মতেই হ'তে পারে না।' বিট্‌ঠলপন্তের এতদিনের যত্নে বর্ধিত আশার উপর যেন সহসা বজ্রপাত হ'ল, হৃদয় ভগ্ন হ'য়ে গেল, দু'চোখ হ'তে প্রাণের বেদনা বিগলিত হ'য়ে ঝরতে লাগল। ছেলেদের ভবিষ্যৎ দুঃখের একটা অস্পষ্ট ছবি চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তিনি কাতর হ'য়ে পণ্ডিতদের পায়ে পতিত হলেন ও আকুল-কণ্ঠে মিনতি করলেন যে, যে রকম ক'রে হোক্ তাঁরা যেন দয়া ক'রে তাঁর ছেলেদের ব্রাহ্মণ-ধর্মে স্বীকার ক'রে নেন; প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে যা কিছু দণ্ডবিধান করা হবে, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সানন্দে তা স্বীকার করবেন; কিন্তু বাবা-মার একটা অধর্ম আচরণের ফলভোগ যেন তাঁদের ছেলেদের না করতে হয়। কঠোরহৃদয় পণ্ডিতদের অধরে কিন্তু একটা বিদ্রূপের হাসি ও মুখে একই বাক্য—"প্রায়শ্চিত্ত? এর প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু!"

বিট্‌ঠলপন্তের চোখে সঘন অন্ধকার নেমে এল। দুঃখ-দারিদ্র্যে আজীবন তাড়িত অসহায় বিট্‌ঠলপন্ত চোখ মেলেও কিছু দেখতে পেলেন না। ভাবলেন, আর বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি আমাদের মৃত্যু ছেলেদের জীবনের পথ থেকে কণ্টক দূর ক'রে দেয়, তো আমরা আর বেঁচে কি করব? এস মৃত্যু, এস! এস কাল! আমাদের সন্তানদের যা কিছু কলঙ্ক ধুয়ে দাও। তুমি তো সর্বসংহারক, এইটুকু কলঙ্ক কি সংহার করতে পারবে না? বিট্‌ঠলপন্ত দেহত্যাগের জন্য কৃতসঙ্কল্প হলেন।

ছেলেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক্ এই তো বাবা-মা চান। যদিও বিট্‌ঠলপন্ত ও রুক্মিণীর দৃঢ় ধারণা ছিল যে তাঁদের সন্তানরা সামান্য নয়, তবুও মায়ায় আবৃত তাঁদের মন চিন্তায় বিহ্বল হ'য়ে গেল।

বিট্‌ঠলপন্ত সে দিনটা ভুলেন নি, যখন বিয়ের আগে তীর্থাটন করতে করতে তিনি আলন্দী গ্রামে এসে উপস্থিত হন ও সেখানে রুক্মিণীর পিতা সিধোপন্তের বাসায় দিনকতক বাস করেন। সিধোপন্তের স্বপ্নের কথাটিও তাঁর বেশ মনে ছিল। তাঁর ওখানে থাকাকালে সিধোপন্ত একদিন স্বপ্ন দেখেন ও আদেশ পান—'বিট্‌ঠলপন্তের সাথে তোমার কন্যার বিয়ে দিয়ে দাও। ওর গর্ভে এমন দৈবীগুণসম্পন্ন সন্তানদের জন্ম হবে যারা তোমার কুল উদ্ধার ক'রে দেবে।' যখন সিধোপান্ত আপনার এই স্বপ্ন বিট্ঠলপন্তকে জানান, তখন তিনি বলেনযে, এখন তিনি কিছু ঠিক বলতে পারবেন না। কিন্তু সেই রাতে এবার বিট্‌ঠলপন্ত স্বপ্ন দেখেন, পণ্ঢরপুরের শ্রীবিগ্রহ এসে বলছেন, 'তুমি সে কন্যাকে স্বীকার কর। তার গর্ভে ভগবৎ-শক্তি অবতীর্ণ হ'য়ে তোমার কুলের ও জগতের কল্যাণ করবেন।' বিট্‌ঠলপন্ত ও রুক্মিণী এ সব কথা ভুলে যান নি।

তারপরে রামানন্দ স্বামীর সেই আশীর্বাণীও যেন তাঁদের কানে ধ্বনিত হয়। যখন তিনি বিট্‌ঠলপন্তকে পুনরায় গৃহস্থ-ধর্ম অঙ্গীকার করতে আদেশ দেন, তখন তিনি বলেছিলেন, এই স্ত্রীর সন্তান-সন্ততি ত্রিভুবন-বিজয়ী হবে।

মাঝে মাঝে এই সব কথা এই ভক্তিপরায়ণ সাধুপ্রকৃতি দম্পতির মনে পড়ে। কিন্তু মায়ার খেলা এমনই যে সব কিছু ভুল ক'রে দেয়। নন্দ ও যশোদা কি জানতেন না যে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার? দশরথ ও কৌশল্যার কি এই জ্ঞান ছিল না যে রাম নরদেহে নারায়ণ? কিন্তু মায়ার প্রভাবে স্বীয় সন্তানের মধ্যে তাঁরা ছোট্ট শিশু ছাড়া আর কিছু দেখতে পেতেন না।

এই অবস্থা বিট্‌ঠলপন্ত ও রুক্মিণীর হ'ল। শেষে আর কোনো উপায় না দেখে ভগবানের আশ্রয়ে ছেলে-মেয়েদের রেখে তাঁরা প্রয়াগের পথে যাত্রা করলেন, এবং ত্রিবেণী-সঙ্গমে উভয়ে একসঙ্গে দেহ-রক্ষা করেন।　　(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথ প্রসঙ্গ (২য় সংস্করণ)—শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ. বি. টি. এ. আফিস, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—৩৬৬+১৬। মূল্য—৩া৹।

কোন জাতির যথার্থ ভাবসম্পদের সহিত পরিচিত হইতে গেলে তাহার ভাবরাজ্যের পথিকৃৎ সাধকদিগের জীবনালোচনা একান্তই অপরিহার্য। ভারতবর্ষকে জানিতে গেলেও ভারতীয় ধ্যান-ধারণায় ও সাধ্য-সাধনায় সিদ্ধ মহামানবদের চরিতানুধ্যান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অধ্যাত্ম সাধনাই ভারতীয় ভাবধারার প্রাণস্রোত। যুগে যুগে ইহাই ভারতজীবনকে রূপে রসে উজ্জীবিত করিয়া আসিতেছে। সাধক-ঋষি এবং কবি-মনীষীদের জীবনালোকে আমরা এই তথ্যটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। যদিও বিভিন্ন জীবনে প্রকাশ-তারতম্য আছে, তথাপি মূল সত্যটি এক।

দীপ দিয়া দীপ জ্বালিতে হয়। সিদ্ধসাধকের জীবন-জ্যোতিঃ আরও বহু জীবনকে উদ্দীপিত করে। এক একটি মহাজীবন অগণিত পথিকের পথ চলায় সহায়ক হইয়া থাকে।

ভারতের ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে যোগিবর গোরক্ষনাথজীর অবদান অবিস্মরণীয়। মহর্ষি পতঞ্জলি-নির্দেশিত যোগসূত্র অবলম্বনে বৈরাগ্য, ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসযোগের দ্বারা মানুষ যথার্থ শান্তির অধিকারী হয়, এমনকি সমাধি পর্যন্ত লাভ করিতে পারে—গুরু গোরক্ষনাথজীর জীবন যেন এইরূপ একটি সপ্রত্যয় ঘোষণা। বিষয়মত্ত মানুষকে মোক্ষপ্রদ যোগপথে আনয়ন করিবার জন্যই যোগি-গুরু গোরক্ষনাথ নাথ-যোগি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। যোগ ও জ্ঞানের গভীর তত্ত্ব-সমূহ ভক্তিপ্রেমে অভিসিঞ্চিত করিয়া এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণ দেশব্যাপী এক আধ্যাত্মিক আলোড়ন জাগাইয়া আসিতেছেন। ভারতের বাহিরে তিব্বত, আফগানিস্তান, প্রভৃতি দেশেও এই নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশ্বের নাথই সকল জীবের হৃদয়মন্দিরের অধিদেবতা—সর্ব-লোকনাথ। তিনি নিত্য নির্গুণ হইয়াও নিত্য সগুণ, নিত্য নিষ্ক্রিয় হইয়াও নিত্য সক্রিয়, নিত্য এক হইয়াও নিত্য বহু, নিত্য সর্বাতীত হইয়াও নিত্য সর্বব্যাপী, সকল নামরূপের ঊর্ধ্বে থাকিয়াও সকল নামে ও সকল রূপে বিরাজমান। এই এই নাথই যোগী ও জ্ঞানীর পরমারাধ্য জীবনাদর্শ—সমগ্র জীবনকে নাথময় করিয়া সংসারের সকল বন্ধনের পারে যাওয়াই লক্ষ্য। গোরক্ষনাথজীর দার্শনিক মত 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত' বলিয়া প্রচারিত। ইঁহার অনুবর্তী সাধকগণ সকল দেবদেবী, সকল মত ও উপাসনায় সমান শ্রদ্ধাবান।

শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথজী এই নাথ-সম্প্রদায়েরই অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ—গোরক্ষনাথজীর ভাববাহী সুযোগ্য উত্তরসাধক। আলোচ্য গ্রন্থ যোগী গম্ভীরনাথের অনুপম ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সাধনার এক হৃদয়গ্রাহী আলেখ্য। লেখক স্বয়ং এই মহা-পুরুষের কৃপাধন্য,—তাঁহার ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভে কৃতার্থ। সেদিক হইতে গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। নাথ-যোগিগণের সাধন-প্রণালী ও তত্ত্ব সম্পর্কেও চিন্তাশীল লেখক 'জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ' শীর্ষক একটি অধ্যায়ে অতি সরল-সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থ-গৌরব যথেষ্টই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহার দ্বারা নাথ-সম্প্রদায় সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পরিস্ফুট হইবে সন্দেহ নাই।

গোরক্ষনাথ-মন্দিরে তরুণ যোগার্থিরূপে আগমন-কাল হইতে শুরু করিয়া মহাপ্রস্থান-ক্ষণ পর্যন্ত

গম্ভীরনাথজীর জীবনকে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করিয়া লেখক শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ একখানি সার্থক চিত্র অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছেন বলা চলে। গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহে লেখকের নিষ্ঠার পরিচয় পাই। যোগিরাজের সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুরাগী ভক্তদের স্মৃতি-কথাই মূল উপাদানরূপে ব্যবহৃত। কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তবে অলৌকিকত্বের চোখ-ঝলসানো ছটায় মহামানবের আসল জীবনকে আচ্ছন্ন করা হয় নাই। গ্রন্থরচনায় গম্ভীরনাথজীর উদ্দেশ্যে রচিত স্তব দুইটি সুখপাঠ্য। চারখানি সুন্দর ছবি পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রচ্ছদপটে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কাগজ ও ছাপা ভাল; তবে মাঝে মাঝে ছাপার ভুল চোখে পড়ে।

দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত। লোকোত্তর মহাপুরুষের এ-জীবনী সমাদৃত হইবে আশা করি। আগামী সংস্করণে গম্ভীরনাথজীর উপদেশাবলী হইতে সংকলিত একটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইলে ভক্তসমাজে গ্রন্থখানির মূল্য আরও অধিক হইবে।

—শ্যামাচৈতন্য

বিদ্যাপীঠ (ছাত্রদের বার্ষিকী—১৯৫৫-৫৬)। প্রকাশক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর; সম্পাদনায় ব্রহ্মচারী আগমচৈতন্য, শ্রীমান প্রতীক বসু প্রভৃতি। পৃষ্ঠা—১২৭।

বৃহত্তর আকারে প্রকাশিত পঞ্চদশ ও ষোড়শ বর্ষের সুমুদ্রিত 'বিদ্যাপীঠ' পাইয়া ও পড়িয়া আমরা আনন্দিত। বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও পরিকল্পনায় 'বিদ্যাপীঠ' পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বাংলা ইংরেজী প্রবন্ধ ও কবিতা নির্বাচন প্রশংসার্হ; দুইটি হিন্দী ও একটি সংস্কৃত প্রবন্ধ পত্রিকার মর্যাদা বর্ধিত করিয়াছে। শিশুবিভাগের অংশ 'কিশলয়ে'র লেখাগুলি কিশলয়ের মতই কচি ও সবুজ।

স্বামী বোধাত্মানন্দের সরল ভাষায় লিখিত 'হিন্দুধর্ম' ও শ্রীসমীর গুহঠাকুরতার 'বিদ্যাপীঠের ইতিকথা' প্রবন্ধ দুইটি উল্লেখযোগ্য। 'আশ্রমিকী'তে বিদ্যাপীঠের দুই বৎসরের ঘটনা-স্রোতের একটি রেখাচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে কয়েকটি ফটো। ছেলেদের আঁকা ছবিগুলিতেও কলা-চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী ধ্যানেশানন্দজীর দেহত্যাগ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৮শে অক্টোবর, সকাল ৭টার সময় বারাণসীধামে ৬৩ বৎসর বয়সে স্বামী ধ্যানেশানন্দ (সনৎ মহারাজ) দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯২৪ খৃঃ ভুবনেশ্বর আশ্রমে যোগদান করিয়া ১৯২৯ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল তিনি কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অনলস কর্মী ছিলেন। ঐখানে থাকা কালেই তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। স্যানেটোরিয়ামে দীর্ঘ দিন সুচিকিৎসার ফলে কিছুটা সুস্থ হইয়া তিনি কাশীতেই বাস করিতেছিলেন। শেষে ঐ রোগেই তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

স্বাভাবিক কর্তব্যানুরাগ ছাড়াও সঙ্গীতানুরাগের জন্য কাশীতে উভয় আশ্রমে তিনি প্রিয় ছিলেন; তাঁহার নিষ্ঠাপূর্ণ সেবাভাব ও অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। সেবাব্রতীর দেহমুক্ত আত্মা মাতৃ-অঙ্কে চির-বিশ্রাম লাভ করিয়াছে'।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

রামকৃষ্ণ মিশন বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী

গত ৩রা নভেম্বর বেলুড় মঠে স্বামী নির্বাণানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হয় নিম্নে তাহার সারানুবাদ প্রদত্ত হইল।

রামকৃষ্ণ মিশনের ৪৮তম বার্ষিক বিবরণী উপস্থাপিত হইতেছে, ইহা হইতে গত বছরের অগ্রগতি-সম্বন্ধে একটি ধারণা হইবে। প্রথমেই নূতন সম্প্রসারণ-মূলক কার্যাবলী উল্লিখিত হইতেছে:

নূতন কার্য

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় বেলুড় সারদাপীঠে জানুআরি মাসেই S. E. O. T. C. (Social Education Organisers' Training Centre) বা সমাজশিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রের কার্য আরম্ভ হয়। নবনির্মিত একটি ত্রিতল ছাত্রাবাসে থাকিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৮০ জন শিক্ষক এখানে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

(২) ঐ মাসেই রেঙ্গুন সেবাশ্রমে বহির্বিভাগের ও পরিচালন-বিভাগের প্রশস্ত গৃহের উদ্বোধন করেন বর্মার প্রধান মন্ত্রী; অস্ত্রোপচার-বিভাগের কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে।

(৩) এপ্রিলে কলিকাতা শিশুমঙ্গল-প্রতিষ্ঠানে ২৫টি সাধারণ বেড লইয়া পুরুষ-বিভাগ সংযুক্ত হওয়ায় উহার নাম পরিবর্তিত হইয়া 'সেবা প্রতিষ্ঠান' হইয়াছে।

(৪) রহড়ায় নবনির্মিত ভবনে গত জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 'বহুমুখী বিদ্যালয়ে'র উদ্বোধন করেন। জানুআরি মাসে জেলা গ্রন্থাগারের কার্য শুরু হয়।

(৫) অক্টোবরে মাদ্রাজ 'বিবেকানন্দ কলেজে'র ৯০ জন ছাত্রের বাসোপযোগী নূতন ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ মহাশয়। তিন বৎসর ডিগ্রিকোর্সের নূতন বিজ্ঞান ভবন নির্মিত হইতেছে।

(৬) দিল্লীতে গ্রন্থাগার ও বক্তৃতাগৃহের শুভারম্ভ করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী। আপাততঃ গ্রন্থাগারে ২৫,০০০ পুস্তক ধরিবে এবং একই সময়ে ১০০ জন বসিয়া পড়িতে পারিবে। বক্তৃতাগৃহে ৭৫০টি আসন আছে, প্রয়োজন হইলে আরও ১০০টির ব্যবস্থা করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ-কাজ সমাপ্তপ্রায়; ২৮শে নভেম্বর ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস।

(৭) পাথুরিয়াঘাটা আশ্রম কলিকাতার দশ মাইল দক্ষিণে রাজপুরের নিকট 'নরেন্দ্রপুরে' ৪০ একর জমি ক্রয় করিয়া সেইখানে নূতন ছাত্রাবাস নির্মাণে রত।

(৮) বেলঘরিয়া ছাত্রনিবাস নিজেদের জমিতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

(৯) ইণ্টালিতে জনৈক বন্ধু-প্রদত্ত গৃহে নারী-কল্যাণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ব্রহ্মচারিণীগণ তাহার কার্য চালাইতেছেন।

কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

গত ডিসেম্বর পর্যন্ত মিশনের তত্ত্বাবধানে ৭২টি কেন্দ্র ছিল, তন্মধ্যে ৮টি পাকিস্তানে, ২টি রেঙ্গুনে; ফিজিতে, সিংহলে, সিঙ্গাপুরে, মরিশাসে ও ফ্রান্সে ১টি করিয়া; বাকী ভারতে: পশ্চিমবঙ্গে ২৫, মাদ্রাজে ৮, উত্তর প্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, ওড়িষ্যায় ২, অন্ধ্রে ২; দিল্লী, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরালায় ১টি করিয়া।

এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনায় ৯টি (মোট ৭৬২ বেড্-সম্বলিত) অন্তর্বিভাগ-যুক্ত হাসপাতাল, ৪৮টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়, ২টি সাধারণ কলেজ, ২টি শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্র, ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল,

৩২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি কৃষি ও ১টি হোমিওপ্যাথিক স্কুল, ২টি চতুষ্পাঠী, ৪২টি ছাত্রাবাস, ৫৭টি গ্রন্থাগার—মোট ৩১৭টি প্রতিষ্ঠান চলিতেছে।

কার্যধারা

মিশনের কার্য প্রধানতঃ রিলিফ, চিকিৎসা, শিক্ষা, অর্থসাহায্য ও কৃষ্টি—এই পাঁচটি ধারায় প্রবাহিত।

রিলিফ ঃ আলোচ্য বর্ষে জুন মাস হইতে বেলুড় মঠের নির্দেশে ও সাহায্যে শিলং, শিলচর, করিমগঞ্জ, সারগাছি, পাথুরিয়াঘাটা (কলিকাতা), আসানসোল কেন্দ্র ও সারদাপীঠ (বেলুড়) হইতে বিভিন্ন জেলায় বন্যাত্রাণ-কার্য এবং তমলুক ও কাঁথি কেন্দ্র হইতে মেদিনীপুর জেলায় ঘূর্ণিবাত্যায় সেবাকার্য পরিচালিত হয়। মাদ্রাজের মিশন কেন্দ্র হইতে তাঞ্জোর জেলায় বেদারণ্যমে রামনাদ জেলায় পরমকুড়িতে ঘূর্ণিবাত্যায় যে বিরাট সেবাকার্য ১৯৫৫ ডিসেম্বরে শুরু হইয়াছিল—তাহা ১৯৫৬ খৃঃ শেষ হয় নাই। অন্নবস্ত্র বাসনপত্র বিতরণের পর গৃহনির্মাণ-কার্য চলিতেছে। গত জুলাইএ রাজকোট আশ্রমের সহযোগে বোম্বাই আশ্রম কচ্ছের ভূমিকম্পে সেবাকার্য আরম্ভ করে। প্রাথমিক সেবার পর তিনটি গ্রাম নির্মাণের ভার লওয়া হইয়াছে; বছরের শেষ পর্যন্ত তাহা শেষ হয় নাই।

চিকিৎসা ঃ বিভিন্ন দেশে ও রাষ্ট্রে অবস্থিত মিশন-পরিচালিত ৯টি হাসপাতালে ৭৬২ শয্যায় ১৭,৮৫৫ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে (তন্মধ্যে শিশুমঙ্গলে ৫,৪২০, রেঙ্গুনে ৩,৯৭৬)। রেঙ্গুন, কাশী ও বৃন্দাবনে মহিলা-বিভাগ আছে। রাঁচির নিকট ডুংরীতে যক্ষ্মা-আরোগ্যনিবাসে ১৬২ শয্যায় ১৪৪ রোগী চিকিৎসিত হয়। দিল্লী আশ্রম দ্বারা পরিচালিত যক্ষ্মা-ক্লিনিকে ২৩৪ রোগী দেখা হয় এবং পর্যবেক্ষণ-শয্যায় ২৮ জন পরীক্ষিত হয়। বিভিন্ন আশ্রমের তত্ত্বাবধানে ৪৮টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২১,৮৪,১৪৪ রোগীকে এলোপ্যাথিক, হোমিও ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করা হয়।

শিক্ষা ঃ মাদ্রাজে প্রথম শ্রেণীর কলেজে ছাত্রসংখ্যা ১,৫৬৫, বেলুড় দ্বিতীয় শ্রেণীর আবাসিক কলেজে ছাত্রসংখ্যা ২০৯। কৈম্বাতুর জেলায় ১টি ও ২৪ পরগনার সরিষায় (মেয়েদের) ১টি শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্র; কৈম্বাতুর, মাদ্রাজ ও বেলুড়ে ১টি করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, ২টি চতুষ্পাঠী (ছাত্র ৪৪), ৩টি সমাজশিক্ষা-কেন্দ্র ও ১টি অনাথাশ্রম পরিচালিত হইতেছে।

৪২টি ছাত্রাবাসে	২,৩৩৩	ছাত্র ও	২৭৯ ছাত্রী
৩২ „ হাই স্কুলে	১০,৪৭০	„	৪,১৭৩ „
১১৯ „ প্রাথমিক „	১২,৬২৭	„	৭,১৯৪ „

অর্থ সাহায্য ঃ বেলুড় মঠ হইতে ৬৬টি পরিবার ও ১৩১ ছাত্র নিয়মিতভাবে এবং ১৬৭টি পরিবার ও ৪৪ ছাত্র সাময়িক সাহায্য লাভ করে।

কৃষ্টি ঃ প্রায় সকল কেন্দ্রই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে রূপায়িত ভারত-কৃষ্টি প্রচারে যত্নশীল; ক্লাস, সভা, উৎসব, প্রকাশন প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহারা ৫৭টি গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ পরিচালনা করিয়াছে। দেশ-বিদেশের কৃষ্টির একটি মিলনভূমিরূপে কলিকাতা ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের কর্মপ্রণালী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ক্ষেত্রে দিল্লী কেন্দ্রের কার্যও প্রশংসনীয়।

ভারতের বাহিরে

পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলি কোনও রকমে তাহাদের কাজ বজায় রাখিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে রেঙ্গুনে সেবাশ্রম (হাসপাতাল) ও সোসাইটি (লাইব্রেরি) প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। সিংহল শাখার বিভিন্ন কেন্দ্র ২৪টি বিদ্যালয় (তন্মধ্যে ৪টি হাই স্কুল), ২টি ছাত্রাবাস ও ৩টি অনাথাশ্রম—সিঙ্গাপুর কেন্দ্র ২টি মিড্‌ল্ স্কুল, ১টি ছাত্রাবাস—

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে নাদিতে মিশন-শাখা একটি হাই স্কুল (২৭৫ ছাত্র, ৩৭ ছাত্রী) এবং ২টি ছাত্রাবাস (১টি ছাত্রীদের জন্য) পরিচালনা করিয়াছে।

উপসংহার

পরিশেষে স্মরণীয় এই বৎসর মিশনের ৬০ বৎসর পূর্ণ হইল। স্বামীজীর নেতৃত্বে ও শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে যাহার আরম্ভ, সেই সংঘ এই কয়েক বৎসরেই জাতীয় সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত; স্বদেশে ও সারা পৃথিবীতে 'বহুজনহিতায়' বহু কাজ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। 'ওঠ, জাগ, যতক্ষণ না লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ ততক্ষণ থামিও না'—স্বামীজীর এই বাণী আমাদের সেই আদর্শলাভে উৎসাহিত করুক। প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য—স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস কলিকাতা 'অদ্বৈত আশ্রম' হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত গ্রন্থপাঠে সংঘের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জনসাধারণের একটি ধারণা জন্মিবে। আমাদের শক্তির উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন ও তাঁহার পতাকা বহন করিবার যোগ্য করুন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শান্তিরাম ঘোষ—গত ১০ই কার্তিক (২৭.১০.৫৭) বাগবাজারে বলরাম বসু-ভবনে ৯৩ বৎসর বয়সে ভক্ত শান্তিরাম ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারী-বংশে শান্তিরাম জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তারাপ্রসাদ ও মাতা মাতঙ্গিনী ঘোষের এক কন্যা ও তিন পুত্র। কন্যা কৃষ্ণভাবিনীই ভক্ত বলরাম বসুর জায়া; তিন পুত্র: জ্যেষ্ঠ তুলসীরাম, মধ্যম বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) ও কনিষ্ঠ শান্তিরাম। ঘোষ এবং বসু উভয় পরিবারই শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভক্তিমতী জননী ভক্তিমূলেই সন্তানগুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে সমর্পণ করেন।

শান্তিরাম বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া ধন্য হন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন, এবং আজীবন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসি-গণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

তাঁহার সন্তানদের মধ্যে একমাত্র কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী বসু ও একমাত্র পুত্র শ্রীভগবান্‌রাম ঘোষ—উভয়েই বিদ্যমান। বিয়োগব্যথিত এই ভক্ত পরিবারকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—নিবেদন—

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনে'র নূতন (৬০তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ও ঠিকানা-সহ বার্ষিক ৫৲ টাকা ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি-তে কাগজ পাঠাইবার অযথা অতিরিক্ত বিলম্ব এবং অতিরিক্ত ডাকব্যয় বাঁচিয়া যায়। কুপনে **গ্রাহক-সংখ্যা** অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। পাকিস্তানের চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ উয়ারী, ঢাকা। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ

১, উদ্বোধন লেন,

বাগবাজার, কলিকাতা-৩

উদ্বোধন

"এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ—"

এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি॥
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত—৬।১০।৯, ১০

বিপন্ন দেবতাগণ পালনপরায়ণ নারায়ণ-নির্দেশে তপোমগ্ন দধীচির নিকট গমন করিয়া অশুভ শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য বজ্রনির্মাণের উদ্দেশ্যে তাঁহার তপস্যাদৃঢ় পবিত্র দেহাস্থি ভিক্ষা করিলে লোককল্যাণৈক-মানস দধীচির মুখে সেদিন শাশ্বত ধর্ম এক অপরূপ ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল :

প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যচরিত্র মহাপুরুষগণের দ্বারা উপাসিত আচরিত—ইহাই সেই অব্যয় ধর্ম, অপরিবর্তনীয় চিরন্তন লোককল্যাণকারী মহাশক্তি : এই ধর্ম যিনি পালন করেন তিনি প্রাণিগণের দুঃখে দুঃখিত হন এবং তাহাদের আনন্দে আনন্দিত হন। যাহা পরকীয় অর্থাৎ যাহার উপর নিজের কোনই আধিপত্য নাই, শৃগালকুকুরের ভক্ষ্য এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ এবং যাহা পরম স্বার্থের অনুপযোগী সেই ধন ও আত্মীয় স্বজন দ্বারা যে মৃত্যুশীল মানব সকলের উপকার করে না তাহার কী দুর্ভাগ্য, কি কষ্ট!

শরীর ক্ষণভঙ্গুর, সংসার ক্ষণস্থায়ী। স্বার্থ-সুখভোগে এই অমূল্য জীবনের অপব্যয় না করিয়া সকলের সুখদুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদের কল্যাণে দেহমন ধনজন—সব কিছু উৎসর্গ করাই যথার্থ ধর্ম। ইহাই মানুষকে মৃত্যু অতিক্রম করিবার শক্তি দেয়, অমরত্ব দেয়। ত্যাগ ও সেবারূপ ধর্ম কোন দেশে, কালে বা সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়, ইহা এক অনস্বীকার্য সার্বকালিক সার্বভৌম ধর্ম,—চিরকাল আছে ও থাকিবে, ইহার ক্ষয় নাই—ব্যয় নাই।

কথাপ্রসঙ্গে

প্রশস্ত পথের সন্ধানে

চৌমাথার মোড়ে আসিয়া পথিক বিহ্বল হইয়া পড়ে—কোন্ দিকে যাইবে, কিভাবে যাইবে! লাল হলদে সবুজ সিগন্যাল আছে—পুলিস আছে—ডোরা-কাটা ক্রসিং-এর রাস্তা আছে, সব দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া তবে নিরাপদে রাস্তা পার হওয়া সম্ভব, একটু ব্যতিক্রম হইলেই লরী, বাস বা মোটরে চাপা পড়িবার ষোল-আনা সম্ভাবনা!

* * *

নানা মত ও পথের চৌমাথায় মানুষ আজ দিগ্‌ভ্রান্ত, বিহ্বল!—কোন্ দিকে যাইবে, কিভাবে যাইবে? একদিন ছিল—ভৌগোলিক সীমানায় ঘেরা দেশ, নদ-নদী গিরি-মরু—ইহাই ছিল এক দেশ হইতে অন্য দেশকে পৃথক্ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। নদী-বেষ্টিত, পাহাড়-ঘেরা অথবা মরুর বুকে—এতটুকু দেশে অনেক বড় মন লইয়া মানুষ বিরাট আকাশ দেখিত, বিশাল পৃথিবী দেখিত, নিজের মনের গভীরে ডুবিয়া যাইত, সেখানকার দুর্জ্ঞেয় রহস্য অপূর্ব ভাষায় অপরূপ ছন্দে প্রকাশ করিত!

এইভাবেই গড়িয়া উঠিল যুগযুগান্ত ধরিয়া কাব্য, সঙ্গীত ও দর্শন! এক এক দেশের বহিঃ-প্রকৃতি অনুযায়ী সেই সেই দেশের মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতিও স্পন্দিত বিকশিত হইল; সেই সেই দেশের সমাজে রাষ্ট্রে সাহিত্যে শিল্পে তদনুরূপ ছাপ পড়িতে লাগিল, এক একটি ছাঁচ সৃষ্ট হইল; ইহাই তাহার কৃষ্টি, সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্য।

তাহার পর শুরু হইল সংযোগ ও সংঘর্ষ—সমাজের স্তরে স্তরে, জাতিতে জাতিতে, কৃষ্টিতে কৃষ্টিতে। আজও তাহা শেষ হয় নাই, গতিবিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত মানুষ আগাইয়া চলিয়াছে তাহার বেড়াভাঙার অভিযানে; নদী পর্বত সমুদ্রও পারে নাই কোন দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে। চীনের প্রাচীর ডিঙাইয়া মানুষ আসিয়াছে মানুষের কাছে, হিমালয়ের পর্বত-প্রাচীরও তাহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জও আজ ইওরো-আমেরিকার ভাষায় ভূষায় অধুনায়িত! আফ্রিকার অন্ধকার ঘন জঙ্গলেও চলিয়াছে বর্তমানের দিবালোকের অভিযান!

সংঘাত ও সংঘর্ষকে এড়াইবার আজ আর কোনও উপায় নাই। নানা আকারে, নানা প্রকারে—নানা নামে, নানা রূপে—ইহা আজ দেখা দিতেছে ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, সভায় সম্মেলনে! কোথাও সংঘাত নূতন ও পুরাতনে, কোথাও বিতর্ক ধর্ম ও বিজ্ঞানে, কোথাও সংগ্রাম শ্রমিক ও মালিকে, কোথাও দ্বন্দ্ব জড়বাদ ও চৈতন্য-বাদে অথবা বাস্তববাদ ও আদর্শবাদে।

এই দ্বন্দ্বময় পৃথিবীতে দ্বন্দ্বাতীত হইবার একটি গোপন অথচ উন্মুক্ত রহস্য রহিয়াছে—আমরা তাহারই সন্ধানে চলিয়াছি।

সংঘাত জীবনের সূচনা করে সত্য, সংগ্রামই জীবনের লক্ষণ—একথাও সত্য; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য কি?—অবিরত সংঘাত? অফুরন্ত সংগ্রাম? এ সিদ্ধান্তে পরিণত মানব-মন কখনও বিশ্রাম করিতে পারে না, পূর্বপ্রাপ্ত গতির ছন্দে সে আগাইয়া চলিবেই।

সমুদ্রে তরঙ্গতাড়িত মজ্জমান ব্যক্তি যেভাবে ভূমিস্পর্শ কামনা করে, বিমানের আরোহী যেমন সর্বক্ষণ মনে করে—কতক্ষণে নিরাপদ মাটির পৃথিবীতে নামিব, তেমনি সংগ্রামশীল মানুষ সর্বদা কামনা করে সংগ্রামের অবসান। সংঘাত কখনও লক্ষ্য নয়—সংযোগই তার অভিপ্রেত।

বর্তমানে বিভিন্ন কৃষ্টির বিশ্বব্যাপী সংঘাতে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্ট হইতেছে—পরিণামে তাহা এক বিশাল বিশ্বমানব-কৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইবে—

এরূপ কোনও সম্ভাবনা আছে কি? বর্তমানের দিগন্তে তাহার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি?

সম্মুখে তো দেখিতেছি, যুযুৎসু প্রতিদ্বন্দ্বী—জড়বাদ ও চৈতন্যবাদ বা নিরীশ্বরবাদ ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধর্ম। ঈশ্বরবাদ বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত! অতএব জড়বাদ বা নিরীশ্বরবাদকে যাঁহারা মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর মনে করেন, তাঁহাদের প্রথম কর্তব্য ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া একমুখী করা, নিজেরা নির্বিরোধ হওয়া; সম্মিলিত ব্যূহ রচনা করিয়া যদি তাঁহারা যুদ্ধ করিতে পারেন তবেই জয় সুনিশ্চয়, নতুবা পৃথক যুদ্ধে প্রত্যেককে ছিন্ন ভিন্ন হইতে হইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদের লব্ধ অনুভূতিগুলির কোনটিকে তুচ্ছ বা হেয় না মনে করিয়া সবগুলির একটি সাধারণ ভূমি আবিষ্কার করিয়া তবেই জড়বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। ঈশ্বরবাদিগণ নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ দূর করিতে না পারিলে নিরীশ্বরবাদীকে কখনই নিরস্ত করিতে পারিবেন না।

'শুধু আমার মতই সত্য—আর সব মত মিথ্যা, ভুল'—এই জাতীয় সংকীর্ণ বুদ্ধি বা শূন্য আত্মস্তরিতাকে আজিকার যুক্তির যুগে টিকিয়া থাকিতে হইবে না! তোমার মত যদি সত্য হয়, তবে আমার মতও সত্য, তোমার মত যতখানি সত্য—আমার মতও ততখানি সত্য। কোন কথার উত্তরে 'আমার শাস্ত্রে বা কেতাবে এই বলিয়াছে' বলিলে তাহার উত্তরে অপর পক্ষও ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিবে। শেষ পর্যন্ত যদি বাক্যবলের পরিবর্তে বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তরবারির সিদ্ধান্তই যদি মানিয়া লইতে হয়, তবে—জড়বাদী হাসিবে! সে বলিবে,—'ঐ জন্যই তো আমি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মানুষকে ধরিয়াছি,—তোমার ঐ মধ্যযুগীয় মনোভাবে আমার আস্থা নাই। তোমার ঈশ্বরকে লইয়া আমার কাজ নাই, আমি মানুষকে ভালবাসিব, মানুষের উন্নতির জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করিব।' একথার উত্তরে ঈশ্বরবাদী কি বলিবেন? তিনি কি বলিতে পারিবেন, হাঁ ভাই, আমিও তোমার মতো মানুষকে ভালবাসিব, মানুষের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিব; তবে তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য—তুমি মানুষকে জড়ের পরিণতি মনে কর, আমি তাহার মধ্যে চৈতন্যকে অনুভব করি; নতুবা কি করিয়া সম্ভব হইল এই বিচারবুদ্ধি—এই হৃদয়ানুভূতি?

নিরীশ্বর জড়বাদকে নিরস্ত করিতে গেলে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্মের বিরোধের অবসান। ধর্মে ধর্মে সংঘাত বহু হইয়াছে। কি তাহার ফল হইয়াছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মনীতির স্থানে রাজনীতি বসিয়াছে। ধর্মনীতিকে মানুষ আজও সমাজনীতিতে পরিণত করিতে পারে নাই, তাই এই অশান্তি, অসন্তোষ, অসাম্য ও সংগ্রাম!

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কালে বিভিন্ন ধর্ম উদ্ভূত হইয়া তত্তদ্দেশে তত্তৎসময়ে যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছে—পরবর্তী কালে বিকৃত হইয়া প্রভূত অকল্যাণও সাধন করিয়াছে। অব্যবহিত অতীতে বিভিন্ন ধর্ম পারস্পরিক সংগ্রামে ক্লান্ত। ইসলাম একদিন মনে করিয়াছিল তরবারির জোরে সে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিবে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। খৃষ্টধর্ম-প্রচারক মনে করিয়াছিল—সারা পৃথিবী সে যীশুর জন্য জয় করিবে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা বুঝিতে শুরু করিয়াছেন, যীশু তাঁহাদের চিন্তা ও কল্পনাকে ছাড়াইয়া রহিয়াছেন—"তাঁহার স্বর্গীয় পিতার অট্টালিকায় অনেক ঘর আছে"—ঈশ্বর অনন্ত ভাবময়! ঈশ্বর কোন জাতির মধ্যে, ভাষার মধ্যে, পুস্তকের মধ্যে, এমনকি কোন মহামানবেও সীমাবদ্ধ নন। ঈশ্বরীয় ভাব বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার মূলগত ভাব এক। সর্বোচ্চ দর্শন ও অনুভূতির কথা যেখানেই

লিপিবদ্ধ—সেখানেই দেখা গিয়াছে, 'সব শেয়ালের এক রা' ; সত্যদ্রষ্টাদের কথায় ভাবে—কোন বিরোধ নাই, ভাষায় ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য স্বাভাবিক।

এখন, যখন পৃথিবী নানা কারণে সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে—তখন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মানবের আধ্যাত্মিক অনুভূতির যদি তুলনামূলক অধ্যয়ন করা যায় তবেই দেখা যাইবে—অন্যান্য মৌলিক বহির্বৃত্তির মতো ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাও এক মৌলিক বৃত্তি ; তবে পার্থক্য এই যে ইহা প্রথমে—সাধনাবস্থায় অন্তর্মুখী, পরে সিদ্ধাবস্থায় লোককল্যাণে বহির্মুখী।

বিভিন্ন ধর্ম যাহাতে পরস্পরকে বুঝিতে পারে এবং নিরীশ্বরভাব দূর করিবার জন্য সহযোগিতা করিতে পারে—তদুদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক আয়োজন আজ একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশ্বব্যাপী চেষ্টা যতটুকু চলিতেছে তাহা আশাপ্রদ, কিন্তু যথেষ্ট নয়।

পর পর দুইটি যুদ্ধের পর সর্বত্র মানুষ ধর্ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছে, বিশ্বব্যাপারে আজ ধর্ম একটি মহাশক্তি ; প্রায় প্রত্যেক দেশেই ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত ভাবে আধ্যাত্মিক-শক্তি লাভের প্রয়াস দেখা যায়। জাপানে বৌদ্ধ এবং শিণ্টো ধর্মেরও পুরাতন গুঁড়ি হইতে নূতন অঙ্কুর উদ্‌গত হইতেছে। যতটুকু জানা যায় চীনেও খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম উন্নতিশীল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাতীয় অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেরও জাগরণ দেখা দিয়াছে। ব্রহ্মে ও সিংহলে বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ। ভারতে—কলকব্জা ও বিজ্ঞানের দিকে রাষ্ট্রের ঝোঁক যথেষ্ট ; কিন্তু সেজন্য জনসাধারণ ধর্মবিমুখ নয়। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং প্রাচীনধর্মকে নবীন ব্যাখ্যার অলঙ্কারে ভূষিত করার চেষ্টাও স্পষ্ট। সর্বোপরি নূতন গণতন্ত্রের একটি পুরাতন চিরন্তন আধ্যাত্মিক ভিত্তি রচনার প্রচেষ্টাও দৃষ্টি এড়ায় না, ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজনীতিতে কাঙ্ক্ষিত সাম্যের উৎস-সন্ধানে আমাদের চিন্তানায়কদের অনেকেই উপনিষদের হিমালয়ে—গীতার মানস-সরোবরে গিয়া থাকেন। আরব রাষ্ট্রগুলিতেও ইসলামকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা চলিয়াছে। আফ্রিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রাচীন গোষ্ঠী-ধর্মের মধ্যে নূতন শক্তির সন্ধান করিতেছেন, প্রয়োজন ক্ষেত্রে কিছু কিছু আদিম রীতিনীতি বর্জন করিতেছেন। আমেরিকায় ধর্মের পুনরুজ্জীবন প্রত্যক্ষ, কোন ধর্মের প্রবক্তাকে শ্রোতার অভাবে চুপ করিয়া থাকিতে হয় না ; বেদান্তকেন্দ্রগুলিতে নিত্য নূতন অনুরাগী আসিতেছে, ইহুদী ধর্মও বৎসরে ২০০০ নূতন অনুগামী লাভ করিতেছে। ইওরোপে নানা স্থানে 'নবজীবন-কেন্দ্র' ক্রিয়াশীল ; দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত ধর্মকে খাপ খাওয়াইবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

এই সকল ধর্মীয় পুনরুত্থানে দুইটি ভাব লক্ষণীয়, —একটি নিছক জাতীয় জাগরণ, আর একটি বিশ্ব-মানবতা। যথাসময়ে সাবধান হইতে না পারিলে প্রথমটিতে রাষ্ট্র ও ধর্ম এক স্বার্থে পরিচালিত হইয়া অনিষ্টের কারণ হইতে পারে, কোথাও কোথাও তাহা হইতেছেও ; আর দ্বিতীয়টির উপযুক্ত ভিত্তি না থাকিলে উহা শূন্যে সৌধনির্মাণের মত হইবে। প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক নীতি ভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতি শক্তিহীন, এবং জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বমানবতা নিরর্থক কথামাত্র।

প্রত্যেক জাতির একটি সাধারণ আদর্শের ভিত্তি প্রয়োজন, তাহা দ্বারাই জাতীয় কৃষ্টি নির্ণীত হয় ; কিন্তু 'সত্য' এক বলিয়া 'ধর্ম' বিশ্বজনীন। আণবিক যুগে শুধু জাতীয় স্বার্থ নয়, মানবিক স্বার্থই বিপন্ন। অতএব জাতীয়তা অপেক্ষা আজ ধর্মেরই প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ এক সুরে চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেছে ; এখন আর নাৎসীর বিরুদ্ধে ইংরেজের আত্মরক্ষা নয়—জাপানের বিরুদ্ধে চীনার আত্মরক্ষা নয়, এখন মানুষের

আত্মরক্ষাই বড় প্রশ্ন। সমগ্র মানব-জাতির এক সাধারণ উদ্দেশ্য—সাধারণ নিয়তি—যেন স্পষ্টভাবে ধরা দিতেছে। শুধু বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও ভোগ্য-পণ্যের উপর জীবনের বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি রচনা করা যাইতেছে না। শুধু রুটি দিয়া প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না। জাতি ও ব্যক্তির সম্মানের জন্য মানুষ আইন রচনা করিয়া আজ তাহারই জালে জড়িত। দলীয় রাজনীতিতে সংখ্যাধিক্যের যে গণতন্ত্র—তাহাতে যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বা সম্মান থাকে না—তাহা মানুষ বুঝিয়াছে। সম্মিলিত জাতিসংঘেও সংখ্যাধিক্যের প্রহসন।

মানুষের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথায় কি একত্ব, তাহারই সন্ধান আজ শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাঁহারই সন্ধানে সম্মিলিত ভাবে বাহির হইতে হইবে অনাদি কালের সত্য ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক—ধর্ম-সাধকদের। বিভিন্ন দেশে ও কালে যত ধর্ম বিকশিত হইয়াছে—তাহাদিগকে সযত্নে একত্র করিয়াই মানুষ পাইবে এক অখণ্ড সত্যের সন্ধান; প্রত্যেকে বুঝিতে পারিবে—প্রত্যেকের দৃষ্টিতে সত্যের এক একটি দিক প্রকটিত হইয়াছিল; প্রত্যেকের কিছু নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আছে, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ নয়।

হিন্দু মনে করে—সত্য ও মুক্তি সম্বন্ধে তাহার ধারণাই শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধের ধারণা—যুক্তির যুদ্ধে সেই বিজ্ঞানের সমকক্ষ, এবং বিশ্বশান্তি ও বৌদ্ধধর্ম একার্থক। ইসলামের গর্ব তাহার সাম্য ও বিশ্বাস। খৃষ্টান জানে, যে যাহাই বলুক একমাত্র পরিত্রাতা যীশু; কারণ তিনি ঈশ্বরের 'একমাত্র পুত্র' এবং তিনিই মানুষের জন্য নিজেকে 'বলি' দিয়াছিলেন।

'আমার ধর্ম সত্য, আর সকল ধর্ম ভুল ও ভ্রান্ত' এই ধরনের চিন্তা মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবে। মিলনের জন্য প্রথম প্রয়োজন পরস্পরকে সম্মান, তারপর প্রীতিপূর্বক হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া ভাব-বিনিময়। দলগত ভাবেই নয়, ব্যক্তিগত ভাবেও প্রত্যেককে শুনিতে হইবে প্রত্যেকের কথা; পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া নয়, একে অপরকে বিচ্যুত করিয়া নয়—পরস্পরের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া, ভাব বিনিময় করিয়া, অপরের উৎকর্ষ দ্বারা নিজের অপূর্ণতা দূর করিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা এক পূর্ণতর ধর্ম সহায়ে প্রশস্ত যাত্রার পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে—যে পথে নিজ নিজ ধর্ম, বিশ্বাস ও আদর্শ লইয়া নিরাপদে চলিতে পারিবে আগামীকালেরউন্নততর মানবজাতি।

স্বামী ওজসানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৮ই ডিসেম্বর দ্বিপ্রহর ১২টার সময় দিল্লীতে স্বামী ওজসানন্দজী করোনারি থ্রম্বোসিস্ রোগে ৬০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। রোগের লক্ষণ দেখা দিবামাত্র তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যমুনা-তীরে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে।

স্বামী ওজসানন্দ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৩ খৃঃ ২৬ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন পাশ করিবার পর সংসার ত্যাগ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে তিনি যোগদান করেন; শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস লাভ করিয়া তিনি সাধন-ভজনে নিমগ্ন হন।

১৯২৩-১৯৩৮ পর্যন্ত ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের উন্নতিকল্পে কাজ করিয়া—স্বামী ওজসানন্দ মহীশূর আশ্রমে আসেন, এবং সেখানে বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। ১৯৪৫ খৃঃ হইতে উতকামণ্ড আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত ঐ কার্য সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরিচালনায় আশ্রম খুব জনপ্রিয় হয় এবং স্নেহপূর্ণ সদয় ব্যবহারের জন্য তিনিও সকলের বড় প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে নূতন তথ্য

[জনৈকা আমেরিকান ভক্ত-সংগৃহীত। ইংরেজী হইতে সংকলিত]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্যবৃন্দ-লিখিত জীবন-চরিতে স্বামীজীর আমেরিকায় প্রথমবারের অবস্থিতি-প্রসঙ্গ কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদগুলিতে স্বামীজীর প্রচারের প্রথম-দিককার কয়েকটি উদ্দীপনাপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর প্রতি স্বামীজীর বাণীর কথা সেখানে বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিবৃত হইয়াছে কী প্রভূত পরিমাণ শক্তি ও করুণা তিনি ঢালিয়া দিয়াছিলেন এই দেশে—যেখানে ধর্মের ক্ষুধা ছিল, কিন্তু খাদ্য ছিল না। গ্রন্থ-রচনাকালে চরিতকারগণ স্বামীজীর জীবন যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ও যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তবু মনে হয় ঘটনাগুলি মোটামুটিভাবেই বর্ণিত হইয়াছে; খুঁটিনাটি অনেক কিছু সংযোজনের অবকাশ এখনও রহিয়াছে।

ধর্মমহাসভার পরে যখন স্বামীজী সমগ্র মধ্য-পশ্চিম প্রদেশে বক্তৃতারত ছিলেন তখনকার কথা খুব কমই জানা যায়। আবার ধর্মমহাসভার পূর্বে যখন তিনি কয়েক সপ্তাহ নিউইংলণ্ডে কাটাইয়া-ছিলেন—তখনকার বিষয়ও অজানা। বোস্টনে তিনি যে অনেকবার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এ কথা জানা থাকিলেও বক্তৃতার বিষয়বস্তু ও তারিখ, সবই অজ্ঞাত। প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে স্বামীজী নিশ্চয়ই আরও অনেক বক্তৃতা ও ঘরোয়া আলোচনা করিয়াছিলেন—যাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আমাদের জানার বাহিরে নিশ্চয় তাঁহার অনেক বন্ধু ছিল—যাঁহাদের চিঠিপত্রে ও দিনলিপিতে তাঁহার জীবন ও বাণীর অনেক কথাই লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলি হয়তো এখনও ধূলি-ধূসরিত কোন চিলাকুঠিতে পড়িয়া রহিয়াছে। বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ পরিচ্ছদ ও আকৃতি দর্শনে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল—এখনও তাহা সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। স্বামীজীর মত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ একদিকে গভীর বিদ্বেষ, অপর দিকে অন্তরের শ্রদ্ধা জাগরিত করে। সেই কালের উপর স্বামীজীর প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহার পরিচয় ব্যতীত তাঁহার জীবন-চিত্র সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়াও স্বামীজীর সম্বন্ধে নূতন ঘটনাগুলি—যতই ছোট হউক, তাঁহার অনুরাগী-দিগের নিকট উহা কম আদরের নয়; কালক্রমে এগুলি আরও সত্যরূপে প্রতিভাত হইবে। খুঁটিনাটিভাবে তথ্যসংগ্রহের কাজ ক্রমশঃ দুরূহ হইয়া উঠিবে। যাঁহারা স্বামীজীকে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের পরিচয়লাভে যথেষ্ট দেরি হইয়া গিয়াছে, যেসব স্থানে তিনি ছিলেন সন্ধান করিয়া সেই সব স্থানে যাওয়া এখনই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষ মরিয়া যায়, স্মৃতি ক্রমশঃ মুছিয়া যায়, অট্টালিকা ভাঙিয়া পড়ে, কিন্তু আমেরিকায় স্বামীজী আধ্যাত্মিকতার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা হইতে উৎপন্ন বৃক্ষশিশু তাঁহার ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টিতে উদ্‌ভাসিতরূপেই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, যদিও সেই বপনকালের স্মৃতি বিলীয়মান।

আমেরিকায় স্বামীজীর জীবনের আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত কতকগুলি ঘটনা আবিষ্কার করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে; এইগুলি এখন মূল জীবনী-গ্রন্থে সংযোজিত হইতে পারে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত স্বামীজী-সংক্রান্ত অনেক চিঠিপত্র এবং সাময়িকী ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মুদ্রিত, এখন বিনষ্টপ্রায় আমেরিকার সংবাদ-পত্রগুলি এই গবেষণা কার্যের উৎস। মূল সংবাদ-পত্রগুলিতে যেরূপ তথ্য পাওয়া গিয়াছে, সেরূপই প্রকাশ করা হইল, বানানগুলি অপরিবর্তিত

রাখা হইল,—ইহাতে ভারত-সম্বন্ধে তৎকালীন আমেরিকার কাগজগুলির যেরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহাও সেইরূপই রাখা হইল। স্বামীজীকে কিরূপ সাংস্কৃতিক পরিবেশের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, এগুলি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। কয়েকটি সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি আংশিকভাবে স্বামীজীর জীবনীতে প্রদত্ত হইলেও পরিপূর্ণতার জন্য সমগ্র বিবরণীর প্রয়োজন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে স্বামীজী ভারত হইতে আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করেন—এই সময় হইতে ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভা পর্যন্ত তথ্য মুখ্যতঃ ভারতে স্বামীজীর লেখা দুই-একটি পত্র হইতেই পাওয়া যায়।

ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য তিনি চিকাগো হইতে বোস্টনে চলিলেন—কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন বোস্টনে জীবনযাত্রার ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। স্বামীজীর চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, 'ঈশ্বর আশ্চর্য-ভাবেই তাঁহার কাজ করিয়া থাকেন'। সত্যই চিকাগো হইতে বোস্টনে ট্রেনে যাইবার সময় স্বামীজীর সহিত এক বৃদ্ধা মহিলার আলাপ হয়, তিনি স্বামীজীকে ম্যাসাচুসেট্স্-এ অবস্থিত তাঁহার 'ব্রিজি মেডোজ্' (Breezy Meadows) নামক পল্লীনিবাসে কিছুদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভগবৎ-প্রেরিত এই মহিলার মাধ্যমেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট্ (J. H. Wright)-এর সহিত তাঁহার দেখা হয়। প্রথম দর্শনেই অধ্যাপক রাইট্ স্বামীজীর প্রতিভার পরিচয় পান এবং অর্থাভাব-বশতই চিকাগোয় ফিরিতে তাঁহার অনিচ্ছা জানিয়াও অধ্যাপক তাঁহাকে প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতে সম্মত করান। অধ্যাপক রাইট্ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং পরিচয়পত্রে লিখিলেন, 'স্বামী ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি হইবার যোগ্যতম পাত্র—ইনি এমন এক ব্যক্তি, যাঁহার নিকট নিদর্শন চাওয়া আর সূর্যকে কিরণ দিবার অধিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা একই কথা।' ডক্টর রাইট্ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে স্বামীজী ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতেন কিনা সন্দেহ।

স্বামীজীর ২০.৮.৯৩ তারিখের পত্রে ধর্ম-মহাসভার পূর্বের আরও কিছু জানা যায়। অতিথিপরায়ণা ঐ মহিলা তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া 'ভারত হইতে আগত অদ্ভুত জীব'কে দেখাইতেন। স্বামীজীর অদ্ভুত পোষাকের দরুনই তাঁহাকে বিস্ময়কর মানুষ ভাবিয়া লোকে তাঁহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। এই কারণে তিনি বোস্টনে পাশ্চাত্য পোষাক ক্রয় করিতে বাধ্য হন। স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া একটি বৃহৎ মহিলা-সভায় বক্তৃতা দেন। মহিলা-সমিতির সভ্যেরা রমাবাঈকে খুব সাহায্য করিতেন। এই সমিতির উদ্যোগে নারীজাতির উন্নতিমূলক কার্যাবলীর পরিচয় পাইয়া স্বামীজী খুবই প্রীত হন। এই বিবরণীর সঙ্গে আরও কিছু কথা যোগ করা আবশ্যক,—বিশেষ করিয়া ২০শে আগস্ট হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের অপ্রকাশিত কাহিনী।

যেখানে স্বামীজী গিয়াছেন সেখানেই তিনি সংবাদের বিষয়ীভূত হইতেন, মনে হয় নিউইংল্যাণ্ডও বাদ যায় নাই। ধর্মমহাসভার পূর্বে যে সব শহরে স্বামীজী পদার্পণ করিয়াছেন, সেখানকার সংবাদ-পত্রসমূহে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না কিছু উল্লেখ থাকিত। ব্রিজি মেডোজের নিকটতম শহর মেট্কাফ, অনুসন্ধানে জানিয়াছি শহরটি ছোট হওয়ার দরুন এখানে কোন সংবাদপত্র ছিল না। মেট্কাফের পরবর্তী বড় শহর হলিস্টন, কিন্তু ইহাও নিজস্ব সংবাদপত্র চালাইবার উপযুক্ত ছিল না। পরবর্তী ফ্রেমিংগাম পুরাপুরি একটি বড় শহর—এখানে সংবাদপত্রও প্রকাশিত হইত, অতএব আমি ফ্রেমিংহামে যাই। এখানকার 'ফ্রেমিংহাম ট্রিবিউন' নামে একখানি সংবাদপত্র পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের

উল্লেখযোগ্য সংবাদ সরবরাহ করিত। স্বামীজীর গতিবিধিও উহাতে অবশ্যই প্রকাশিত হইত। সেই সময়ে 'ফ্রেমিংগাম ট্রিবিউন' সাপ্তাহিক-রূপে প্রতি শুক্রবারে বাহির হইত।

পত্রিকার মাত্র কয়েকখানি সংখ্যা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল বলিয়া আমার পক্ষে এই কার্য বিশেষ আয়াসসাধ্য হয় নাই। এই তথ্য সংক্ষিপ্ত হইলেও অদ্ভুত বলিয়াই রূঢ় বাস্তবতাপূর্ণ।

ফ্রেমিংহাম ট্রিবিউন

শুক্রবার, ২৫শে আগষ্ট, ১৮৯৩। হলিস্টন: পশ্চিম হইতে সদ্যপ্রত্যাগতা মিস কেট স্যানবরন গত সপ্তাহে ভারতীয় রাজা স্বামী বিবেকানন্দ (Vivikananda)-কে সংবর্ধিত করেন। ফিপসের অশ্বযুগলবাহিত যানে মিস্ স্যানবরন এবং রাজা নগরের মধ্য দিয়া হান্‌ওয়েলের পথে অগ্রসর হন।

এই দৃশ্য কিরূপ বিস্ময়কর হইয়াছিল! মাথায় পাগড়ী ও ঝলঝলে পোষাক-পরিহিত তরুণ সন্ন্যাসীকে কে না 'রাজা' বলিয়া মনে করিবে! নিউইংল্যাণ্ডের শান্তিপূর্ণ গ্রামের মধ্য দিয়া রাজকীয় সমারোহে অশ্বযানে চলিয়াছেন,—পার্শ্বে 'ব্রিজি মেডোজে'র কর্ত্রী। ইহা ১৮ই আগষ্ট শুক্রবারের ঘটনা। পরের রবিবার স্বামীজী বোস্টনে পাশ্চাত্ত্য পোষাক কিনিতে যাইতেছেন, ভারতে চিঠি লিখিয়াছেন: শত শত লোক আমাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় জড় হইতেছে, সেই জন্য লম্বা কাল কোট পরা দরকার মনে করিতেছি, কিন্তু বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ীই পরিব।

উপরি-উক্ত সংবাদ হইতে জানিতে পারা যায় স্বামীজী প্রথমে যাঁহার আতিথ্যলাভ করেন সেই মহিলা—মিস কেট স্যানবরন। কোন সন্দেহ নাই যে, মিস স্যানবরন তাঁহার অতিথি 'ভারতের অদ্ভুত মানুষ'টিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন ব্রিজি মেডোজ হইতে দশ মাইল দূরে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে।

স্বামীজী কিন্তু আত্মসমর্পণের ভাবে লিখিয়াছেন, '...এই সমস্তই সহিতে হইবে।' বাস্তবিকই কেট স্যানবরনের সামাজিকতা ও তাঁহার 'রাজা'কে (Rajah) লোকসমক্ষে দেখাইয়া বেড়ানোর ক্ষমাই আমোদের মধ্য দিয়াই স্বামীজী ডক্টর রাইটের দেখা পান এবং পরে সমগ্র আমেরিকায় পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহা সুনিশ্চিত যে, স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানের প্রথম দিকে অমায়িক মিশুক ও সর্বজন-পরিচিতা মিস স্যানবরন তাঁহাকে আতিথ্য প্রদান করিবার ঠিক উপযুক্ত ব্যক্তি, যেহেতু এই মহিলা স্বামীজীকে শুধু ডক্টর রাইটের সহিতই পরিচিত করেন নাই, তাঁহাকে আমেরিকার দৃশ্যপটের ভূমিকা ভালরূপে প্রদর্শন করিবার যন্ত্রস্বরূপও হইয়াছিলেন। মিস স্যানবরন সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে যে, বহুমুখী কর্মময় পরিবেশের মধ্যে এই মহিলা শুধু উৎসাহপূর্ণ এবং অতিথিবৎসলা ছিলেন না, তিনি বক্তা এবং লেখকও ছিলেন। বহু এবং বিচিত্র ছিল তাঁহার আলোচ্য বিষয়। স্বামীজী তাঁহাকে 'বৃদ্ধা মহিলা' বলিয়া উল্লেখ করিলেও স্বামীজীর সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে তখন আমেরিকার হিসাবে তিনি বৃদ্ধা ছিলেন না; তখন তাঁহার বয়স ৫৪, এবং তিনি খুব উৎসাহপূর্ণা ছিলেন। কাজে কর্মে কথাবার্তায় সপ্রতিভতার জন্য তিনি সুবিদিত ছিলেন।

নিউ হ্যাম্পশায়ার হইতে আসিয়া তিনি ম্যাসাচুসেটসে এই পরিত্যক্ত খামার (ব্রিজি মেডোজ) কিনিয়া এটিকে বাসোপযোগী করেন। তাঁর লেখা দুইটি পুস্তকে এখানকার জীবন লিপিবদ্ধ আছে; তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, স্বামীজী কি পরিবেশে এখানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, কি সব দৃশ্যাবলী দেখিয়াছিলেন। বাড়ীটির কাছে পাইন বার্চ এল্‌ম্ গাছগুলি তাঁহার লেখায় সস্নেহে বর্ণিত। একটি পুস্তকে বাড়ীটির ছবিও আছে। ব্রিজি মেডোজ আজ অনেক পরিবর্তিত; খানিকটা অংশে নিগ্রো ছেলেদের শিক্ষাশিবির, খানিকটা জাভেরিয়ান পাদ্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পুরাতন বাড়ীগুলি জীর্ণ, বড় বড় গাছগুলি অদৃশ্য।*

* সম্পূর্ণ প্রবন্ধের জন্য 'Prabuddha Bharata, 1955 দ্রষ্টব্য।

মা সারদামণি ও নবযুগ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নারীতে শক্তির প্রকাশ। নবজীবন জাগাতে হ'লে শক্তি ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্বামীজী বলেছিলেন, 'মা-ঠাকরুণ ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছিলেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'

গৃহ-প্রাচীরের অন্তরালে ঘরের ছোটো-খাটো নানা কাজে ব্যস্ত ঐ আমাদের মায়েরা আর বোনেরা, আমাদের কন্যারা আর অবগুণ্ঠিতা কুল-বধূরা! সুতো কাটছে, সল্‌তে পাকাচ্ছে, কুটনো কুটছে, কাপড় কাচছে, সেলাই করছে, বড়ি দিচ্ছে, উঠান নিকাচ্ছে, ঝুল ঝাড়ছে, ধান ভানছে, গম পিষছে, বাটনা বাটছে, জল তুলছে। আমরা পুরুষেরা মনে করি, আমাদের তুলনায় ওরা কত না তুচ্ছ! ওরা অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করে না, তুষার-ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই ক'রে হিমালয়ের শিখরে ওঠে না, কালিদাসের মতো কাব্য লিখে কালজয়ী হয় না, ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে নদীর দুরন্ত জলধারাকে পাষাণ-শৃঙ্খলে বাঁধে না। ওরা রাঁধে আর প্রিয়জনের শোকে কাঁদে! ওরা ছোট, আমরা বড়! বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই,—ওরা অবলা মেয়েমানুষ! আমরা দিগ্বিজয়ী করিতকর্মা পুরুষ! আমাদের সঙ্গে ওদের তুলনা হয়?

দুর্বিনীত অহঙ্কারে পুরুষ নারীকে সরিয়ে রাখল একান্তে। যে তাকে শক্তি দেবে, প্রেরণা দেবে সে হ'য়ে থাকল খেলা-ঘরের পুতুল। দামী দামী শাড়ীতে আর গয়নায় নারীকে সাজিয়ে পুরুষ তাকে ব্যবহার করতে লাগল মনের ভোগেচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্যে। এই নির্বুদ্ধিতার ফলে যে-সভ্যতা আজ গড়ে উঠেছে হৃদয়হীন পুরুষের নীরস বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে—তার রূপ কী কদর্য! কী হিংস্র! প্রগল্‌ভ যন্ত্র-সভ্যতার এই গর্বোদ্ধত সমারোহ তো দরিদ্রকে দরিদ্রতর এবং বিত্তশালীকে আরও বিত্তশালী ক'রে তুলছে। আর আমরা যে বিজ্ঞানের এত বড়াই করছি—এই বিজ্ঞান-চর্চাই বা আমাদের কোন্ স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে? বৈজ্ঞানিকদের মগজের শক্তিকে আজ ব্যবহার করা হচ্ছে নব নব মারণ-অস্ত্র আবিষ্কারের জন্যে। এই সব মারণ-অস্ত্রের ধ্বংস করবার শক্তি কি অপরিসীম—গত মহাযুদ্ধে হিরোশিমার শ্মশানভূমি তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত ক'রে দিয়েছে।

আমরা পুরুষেরা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং কর্মশক্তির এত অহঙ্কার ক'রেও পৃথিবীকে কি নরকেরই সামিল ক'রে তুলিনি? কল্যাণময় জীবন তো সেই জীবন, যার মধ্যে মিলে গিয়েছে জ্ঞান আর প্রেম। জ্ঞানের দিক দিয়ে সভ্যতা এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। কিন্তু প্রেমের দিক দিয়ে আমরা কতটুকু আগাতে পেরেছি? আমরা পুরুষেরা তো সেই আনাড়ির হাতের রুটির মতো—যার একটা দিক সেঁকা হয়েছে ভালোই, আর এক দিকটা একদম কাঁচা ময়দা। আমাদের বুদ্ধির দিকটা প্রখর হ'লে কি হয়? হৃদয়ের দিকটা যে ময়দা হ'য়ে আছে। আণবিক বোমা দিয়ে নারী-হত্যা, শিশুহত্যা করতেও তাই আমাদের কোন কুণ্ঠা নেই!

হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথ্বীর রূপান্তর ঘটতে পারে, যদি সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে নারী—তার হৃদয়ের করুণ কোমলতা নিয়ে। বুদ্ধির দৌড় তো দেখা গেল। হাইড্রোজেন বোমার হাত থেকে জলের গভীরে মাছগুলো পর্যন্ত নিস্তার পেল না! আকাশপথে উড্ডীয়মান বোমারু-বাহিনী—একটি

বারের জন্যেও ভূমি স্পর্শ না ক'রে আট হাজার মাইল উড়ে যাবার ক্ষমতা রাখে। আর সেই সব বোমারু থেকে যে সকল বোমা বর্ষিত হয় তারা শহরের পর শহরকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে পারে যেমন ছাই ক'রে দিতে পারে পিঁপড়ের বাসাকে বোতলের ফুটন্ত গরম জল। পুরুষের গড়া এই পৃথিবীতে আজ আশা কোথায়? আলো কোথায়? আশ্রয় কোথায়?

তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে নারীশক্তির উদ্বোধনের মধ্যে আশার কনকরশ্মি দেখেছিলেন বিবেকানন্দ! তাই তিনি বললেন: মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass (জনগণ)কে জাগাতে হবে,—তবে তো দেশের কল্যাণ।

প্রয়োজন—জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। আমরা পুরুষেরা আমাদের মগজের বুদ্ধি দিয়ে মেশিন-গান বানিয়েছি, হাইড্রোজেন-বোমা আবিষ্কার করেছি, যমের পায়ে অর্ঘ্য দিয়েছি। জীবনকে তো আমরা শ্রদ্ধা দেখাইনি, প্রাণকে তো আমরা ভালো বাসিনি। নারী পরম বেদনায় জীবনকে সৃষ্টি করেছে, আর দেশে দেশে মহারথীরা সেই জীবনকে ব্যবহার করেছে সমর-ক্ষেত্রে 'যোগাতে যমের খাদ্য'।

এযুগের প্রলয়-পারাবারের পারে নবজীবনের উপকূলে পৌঁছে দেবার শক্তি রাখে জীবনের প্রতি সর্বব্যাপী শ্রদ্ধা। নারীই এই জীবনকে পরম বেদনায় সৃষ্টি করে মরণের মুখে এগিয়ে গিয়ে। তাই জীবনের প্রতি মমতা নারীর মজ্জাগত। জীবনকে যারা শ্রদ্ধা করতে জানে প্রাণকে সৃষ্টি করে ব'লে—মানুষের ইতিহাসে গৌরবময় নবযুগ আসবে তাদেরই শক্তিকে আশ্রয় ক'রে। এই কথাই এ যুগের দেশবিদেশের বড় বড় মনীষীদের কথা।

পূজার আসনে মাতা সারদামণিকে বসিয়ে ঠাকুর ষোড়শী পূজা করেছিলেন, তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করেছিলেন নিজ সাধনার ফল এবং জপের মালা। পত্নীর পদপ্রান্তে এইভাবে অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে ঠাকুর স্বীকার করলেন নারীর মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তারই অপরিমেয় মহিমাকে।

একথা সত্য যে পশ্চিম ক্ষমতার মদিরা পান ক'রে ভুলে গিয়েছে জীবনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। ওর কণ্ঠে শান্তির বাণী নেই, আছে রণ-হুঙ্কার। শান্তির বাণী ভারতবর্ষের কণ্ঠে। ভারতবর্ষই আজ পৃথিবীকে দেখাতে পারে শান্তির শুভ্রপথ-রেখা। কিন্তু দুর্বলের কথা কে শোনে? শক্তিতে তাকে হ'তে হবে অপরাজেয়। আর এই শক্তি ভারতবর্ষের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত হবে তার গার্গী আর মৈত্রেয়ীদের নীরব সাধনাকে অবলম্বন ক'রে। ভারতের দিগ্বিজয়ের এই নব অভিযানের পুরোভাগে থাকবে তার নারীশক্তি। মাতা সারদামণির জন্ম এই নূতনতর শক্তিকে জাগাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনালব্ধ সমস্ত ফল শ্রীমাকে সমর্পণ করলেন, তিনি সর্বসিদ্ধির অধিকারিণী হলেন।

ভারতবর্ষে এই নারীশক্তি কোন্ আদর্শকে অনুসরণ ক'রে বিকাশ লাভ করবে, তার পথ দেখিয়ে গেছেন শ্রীমা তাঁর পবিত্র জীবনের শুভ্র আলোয়। পুরুষ এবং নারী—এদের মধ্যে মৌলিক ঐক্য থাকলেও উভয়ের স্বভাব বিচিত্র ধাতুতে গড়া এবং সেইজন্যে উভয়ের কর্মক্ষেত্রও বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। নারীকে ভগবান তৈরী করেছেন জীবনকে সৃষ্টি ও পালন করবার জন্যে। সর্বাগ্রে সে মা। পুরুষকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন সন্তান ধারণ এবং তাকে লালন করবার দায়িত্ব থেকে। সে মাটিকে করবে হলমুখে বিদীর্ণ, পৃথিবীকে করবে ফলে শস্যে ফলবতী। পুরুষের স্থান বাহিরে যেখানে জড়-প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার নিরবচ্ছিন্ন লড়াই; নারীর স্থান ঘরে, যেখানে ক্লান্ত পুরুষ পাবে বিশ্রাম, কল্যাণ-হস্তের পরিচর্যা; তার সন্তান পাবে মাতৃ-বক্ষের স্নেহসুধা।

শ্রীমা গৃহস্থালির কাজে কোনদিন শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। ভোর রাত্রে তিনি প্রতিদিনই শয্যাত্যাগ করতেন। আর কেউ উঠবার আগেই গঙ্গায় গিয়ে তিনি স্নান ক'রে এসে জপে বসতেন। তারপর আরম্ভ হ'ত ঘরের কাজকর্ম। দুপুরের রান্না রাঁধতেন, সামনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে খাওয়াতেন, তাঁকে তেল মাখিয়ে দিতেন, পান সাজতেন, সলতে পাকাতেন, সংসারের খুঁটিনাটি সব কাজই নিজে হাতে করতেন। ঠাকুরের সংসার বৃহৎ ছিল। শিষ্যেরা অনেক সময়ে ঠাকুরের কাছে থাকতেন। তাঁদের আহার্য শ্রীমাকেই প্রস্তুত করতে হ'ত। আনন্দের সঙ্গেই তিনি তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্যগুলি ক'রে যেতেন।

নহবৎখানার অতটুকু ঘরের মধ্যেই তাঁকে প্রতিদিনের কর্তব্যগুলি সম্পাদন করতে হ'ত! একটু হাত-পা ছড়িয়ে শোবারও জায়গা ছিল না। খাঁচার মতো একটা ক্ষুদ্র পরিসর ঘরে এক আধদিন নয়, বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন ভোরবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত সংসারের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন ক'রে। ঘরে মানুষ আছে—বাইরের লোক কখনো তা টের পায় নি। এতই লজ্জাশীলা, নম্র এবং নীরব ছিলেন তিনি।

একটা শুষ্ক কর্তব্যবোধ থেকে এইভাবে নিঃশব্দে দিনের পর দিন কাজ ক'রে যাওয়া সম্ভব নয়। স্বামীর প্রতি অন্তহীন শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা তাঁকে শক্তি দিয়েছিল ক্লান্তিহীন সেবায় নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করবার। ঠাকুরের দেহকে কেমন ক'রে সুস্থ রাখা যায়—সেই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ভাবনা। রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে ছিলেন ঠাকুর। দক্ষিণেশ্বরে তাঁকেই কেন্দ্র ক'রে চলেছিল এ যুগের সর্বোত্তম লীলা। স্বভাবতই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর উপরে। নেপথ্যের নিভৃতে দাঁড়িয়ে যে-নারী নিপুণ হস্তের ক্লান্তিহীন স্নিগ্ধ পরিচর্যায় ঠাকুরের দেহকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁর চরিত্রের মহিমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করবো। তিনি না থাকলে ঠাকুর কতদিন শরীর ধারণ করতে পারতেন—কে জানে?

শ্রীমা নিজের জীবন দিয়ে নারীর কর্তব্যের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সংসারের কেন্দ্রে থেকে সেবার মাধুর্যে সে সকলকে করবে পরিতৃপ্ত। সে হবে নিরলস, নম্র, নীরব, লজ্জাশীলা, সেবাপরায়ণা। তার ব্যক্তিত্বে বুদ্ধির দীপ্তি থাকবে; কিন্তু উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যের উত্তাপ থাকবে না। সে আপনাকে সকলের মধ্যে বিতরণ ক'রে দেবে যেমন ক'রে ফুল নিঃশব্দে নিজের সৌরভকে বিলিয়ে দেয়।

কী শিখিয়ে গেছেন তিনি—নারীসমাজকে—তাঁর জীবনের আচরণ দিয়ে? জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে মর্যাদা দিতে হবে—কারণ নরের মধ্যেই তো নারায়ণ। আমজাদ মুসলমান মজুর, তাকে খেতে দেওয়া হয়েছে। শ্রীমার ভাইঝি নলিনীর কুণ্ঠিত হাত থেকে অন্ন ব্যঞ্জন পাতে পড়ছে। পরিবেশনের মধ্যে শ্রদ্ধার অভাব রয়েছে। মা থাকতে পারলেন না। পরিবেশনের ভার নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। আপন হাতে আমজাদকে তিনি খাওয়ালেন। শুধু খাইয়েই ক্ষান্ত থাকলেন না। তার উচ্ছিষ্ট নিজের হাতে তিনি পরিষ্কার করলেন। জীবনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল এমনই অপরিসীম। যারা জপ করে না, তাদের জন্যে রাত জেগে তিনি জপ করেছেন। পাপীর জন্যে দরজা তাঁর সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। বলতেন, ছেলে যদি ধুলাকাদা মেখে নোংরা হ'য়ে থাকে, মা হ'য়ে আমি তাকে দূরে রাখব?—না, ময়লা ধুইয়ে দিয়ে কোলে তুলে নেব?

মেয়েরা যদি শ্রীমার আদর্শকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ ক'রে তা অনুসরণ করে—ভেদবুদ্ধির শাসন থেকে দেশ মুক্তি পাবে, অস্পৃশ্যতার কালিমা হিন্দু-সমাজের ললাট থেকে চিরতরে মুছে যাবে, সাম্প্রদায়িকতার মহাপাপ অচিরে বিলুপ্ত হবে,

প্রেমের ভিত্তিতে নূতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে, যার শক্তি হবে অপরাজেয়।

নারীসমাজ গৃহের চতুঃসীমানার মধ্যে তার কর্মধারাকে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ রাখবে,—এমন কথা কোন চিন্তাশীল লোক বলবেন না। সমাজ সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ যুগের নারীর ডাক পড়েছে। যুগের এই আহ্বানে তাকে সাড়া দিতেই হবে। পর্দার আড়ালে নিশ্চয়ই সে আপনাকে অবগুণ্ঠিত ক'রে রাখবে না। কিন্তু এই প্রগতির যুগে একটা কথা মনে রাখা দরকার! লেখাপড়া-জানা মেয়েরা সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে নারী হৃদয়ের করুণা নিয়ে যদি না আসে—তার অবস্থাটা হবে সেই কৃষকের মতো যে মাঠে গরু এনেছে, লাঙল এনেছে কিন্তু বুনবার জন্যে বীজ আনে নি। জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধাই তো পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের অস্তিত্বকে আজ অভিশপ্ত ক'রে রেখেছে। আজকের এই দানবীয় যন্ত্র-সভ্যতার স্রষ্টা পুরুষ। জীবন তাকে সৃষ্টি করতে হয় না। বহু বেদনায় জীবন সৃষ্টি করে নারী নিজের জীবনকে বিপন্ন ক'রে। পুরুষ নারীর সৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিয়ে তোপের মুখে তাকে অনায়াসে উড়িয়ে দেয়। জীবনকে যে সৃষ্টি করে সেই দিতে পারে জীবনকে মর্যাদা। শ্রীমার জন্ম নারীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে, আর এই শক্তির উদ্বোধন হবে যে আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে তা হচ্ছে—জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা!

মা

শ্রীমতী দিব্যপ্রভা ভরালী

দেখি নাই এ জীবনে, শুনি নাই বাণী তব অমিয়-স্যন্দিনী
স্নেহ-সুকোমল কোনো কালে হায়,—তবু যে তোমায় আমি চিনি।
বিগত কালের বক্ষে জেগে ওঠে ওই কার প্রেমময়ী বাণী—
যে বাণী জাগাল আজি প্রাণ মোর—নব আলোকের বার্তা আনি!
সে কোন্ অতীত জন্মে স্নেহভরে তুমি মোরে করেছ আপন,
মানসনয়ন পথে আজি পুনঃ তোমারে করিনু দরশন।
লভিনু পরশ দুটি অভয় করের তব সুধা-সুশীতল,
ওই দুটি রাঙ্গা পায় নোয়াইনু মাথা আমি আনন্দ-বিহ্বল;
প্রীতি-পুলকিত মন শুনি তব স্নেহাশিস্ বাণী সুমধুর!
সে সুদূর বিস্মৃত মাধুরী আজি জাগাইলে এ জীবনে মোর।

জননী সারদামণি! কত নামে ডাকে তোমা কত নরনারী—
কেহ বলে মহামায়া, কেহ বলে কালী, কেহ দেবী-মহেশ্বরী,
পরমা-প্রকৃতি বলে কত জনে, আর কত বলে সরস্বতী,
নিজ ভাবভক্তি অনুযায়ী কত জনে গাহে কত তোমার প্রশস্তি!
আমি সবাকার পিছে থাকি—ডাকি যে তোমায় শুধু 'মা, মা' ব'লে!
'মা' এই একটি অক্ষরই শুধু আমি জানি—তব পদতলে
তাই আজি দিনু আনি, লবে কিগো মোর এই দীন উপচার?
আমি জানি না বন্দনাগীতি, স্তোত্র-মন্ত্র কিছু জানি না যে আর!
নামরূপাতীতা—একা, অনির্বচনীয়া, প্রেম-করুণা-আধার,
হে চির-কল্যাণময়ী সন্তান-বৎসলা, মা আমার, মা আমার!

রাজর্ষি ডেভিড ও তাঁহার গীতসংহিতা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

বাইবেলের Old Testament (পুরাতন নিয়ম)-এ রাজর্ষি ডেভিডের কথা আছে। ইহুদী মেষপালকের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বেথলেহেম নামক পবিত্র পল্লীতে ইনি তাঁহার পিতার মেষগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। মেষগুলি মাঠে চরিত, আর ডেভিড তাঁহার বাদ্যযন্ত্র (Harp) লইয়া অতি সুমিষ্ট স্বরে এবং ভাবের সহিত ভগবানের গুণগান করিতেন।

যৌবনে ডেভিড একজন নির্ভীক বীরপুরুষ ও একান্ত ভগবদ্ভক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহুদীদের রাজা স্যামুয়েল ভগবানের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া ডেভিডকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ডেভিড রাজা হইয়া নিজের অন্তরে ভগবানের আশিস্ ও দিব্যজ্ঞান অনুভব করিলেন।

রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও ডেভিড সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করিতেন এবং ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতেন। অপূর্ব ছন্দে ও ভাবে তিনি যাহা গাহিতেন, তাহাই পুরাতন বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে, এবং উহা The Book of Psalms বা গীতসংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। গীতসংহিতাটি Old Testament (পুরাতন নিয়ম)-এ সর্বাপেক্ষা আদরণীয় পুস্তক (Best loved Book in the Old Testament) বলিয়া খ্যাত। এই ক্ষুদ্র গীত-পুস্তক সম্বন্ধে W. E. Gladstone (গ্ল্যাডষ্টোন) বলিতেন, গ্রীক্ সভ্যতার সকল বিস্ময় একত্র করিলেও উহা এই ক্ষুদ্র গীতসংহিতার চেয়ে কম আশ্চর্যজনক মনে হয়।

"All the wonders of Greek Civilization heaped together are less wonderful than is this simple book of Psalms."

যীশুখ্রীষ্ট এই গীতগুলি খুব ভাল বাসিতেন এবং সেগুলি তাঁহার অন্তরে এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তাঁহার মর্মন্তুদ মৃত্যু-সময়ে গীতসংহিতার দ্বাবিংশ গীতটির একটি কলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন: হে ভগবান্! হে আমার ভগবান্! কেন আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? "My God, My God, why hast Thou forsaken me?" যীশু একত্রিংশ গীতটিও আবৃত্তি করিয়াছিলেন, হে সত্যস্বরূপ ভগবান্! আপনার নিকট আমি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতেছি। আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

"Into thine hand I commit my spirit:
Thou hast redeemed me,
O Lord God of Truth."

Christian Smart নামক একজন কবি তাহার "A Song to David"—ডেভিডের প্রতি একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে গেলে রাজর্ষির গীতসংহিতাটি হৃদয়ে উচ্চ ভাব আনয়ন করিয়া সৎকার্যে প্রেরণা দান করে। যে ব্যক্তি নতজানু হইয়া এই গীতগুলি পাঠ করিবে, সে তাহার ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিতে পারিবে এবং ক্ষুধার্ত আত্মাকে খাদ্য এবং পীড়িত আত্মাকে ঔষধ দান করিতে পারিবে।

"For adoration, David's Psalms
Lift up the heart to deeds of alms;
And he, who kneels and chants,
Prevails his passions to control
Finds meat and medicine to the soul,
Which for translation pants."

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ডেভিড তাঁহার গীতগুলিতে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রধান কাম্য ছিল—তিনি যেন সারাজীবন ভগবানকে লইয়া থাকিতে পারেন।

"One thing have I asked of God, that will I seek after; that I may dwell in the house of God all the days of my life." 97 : 4

তিনি রাজকীয় নানা আড়ম্বরে পরিবেষ্টিত থাকিলেও পৃথিবীর কোন পদার্থে আস্থা পোষণ করিতেন না। তাঁহার এক গীতে তিনি বলেন: কেহ রথে, কেহ অশ্বে আস্থা স্থাপন করেন, কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বরের নামই করিব।

"Some trust in chariots; some trust in horses; but we will make mention of the name of our God." 20 : 7

ঈশ্বরই রাজা। তাঁহার রাজত্বে সমস্ত জাতি বাস করিতেছে এই মনোবৃত্তি লইয়া তিনি অভিমান-শূন্য অন্তরে রাজকার্য সম্পন্ন করিতেন।

"God sits as king forever; let the nations know themselves to be but men." 9 : 7,20

বর্তমান যুগে জাতিতে জাতিতে যে অভিমানপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে তাহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এই কথাগুলি সর্বদা স্মরণীয়।

মেষপালকের কাছে মেষগুলি যেরূপ নির্ভরশীল, ঈশ্বরের কাছে ডেভিডের ব্যক্তিত্ব সেইরূপ নির্ভর করিত। অপূর্ব ভাষায় তাঁহার এক গীতে তিনি এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন:

"The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil; for thou art with me." 23 : 1,4

এই নশ্বর মনুষ্যজীবনে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আশ্রিত হইয়া থাকার মত আনন্দের জিনিস আর কিছুই নাই। ডেভিড তাঁহার গীতগুলিতে এক এক সময় একান্ত উল্লাস-সহকারে আনন্দের অভিব্যক্তি করিয়াছেন।

'Let those that take refuge in God shout for joy." 5 : 11

কঠিন রাজকার্যে দুশ্চিন্তা ও দুর্যোগবশতঃ ঈশ্বরে আস্থাহীন রাজাদের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, দিবাতে ক্ষুধার হ্রাস পায়। তাহাদের মত সর্বদা চিন্তাকুল হইয়া জীবন যাপন করার নিদারুণ দুর্ভোগ ডেভিডের জীবনে ছিল না। ডেভিড গান গাহিয়া বলিতেন—হে ভগবান্! শান্তিতে আমি শয়ন করি ও নিদ্রা যাই, কারণ তুমিই আমাকে সর্বদা নিরাপদে রাখিয়াছ।

"In peace will I lay me down and sleep, for Thou, Lord, alone, makest me to dwell in safety." 4 : 8

ভগবানে নির্ভরশীল হইলেও ডেভিডের শত্রুর সংখ্যা খুব বেশী ছিল। সর্বদা যুদ্ধের জন্য এবং শত্রুদের পরাজিত করার উৎসাহ তাঁহার কম ছিল না। তিনি একটি গীতে গাহিয়াছেন:

"I will not be afraid of ten thousands of people that have set themselves against me round about." 3 : 6

ঈশ্বরকে বাদ দিয়া কোন কিছু করা ডেভিডের জীবনে সম্ভবপর ছিল না। ইহা তাঁহার এক গীতে এইভাবে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বর ছাড়া ঘর তৈরী করিলে সে পরিশ্রম ব্যর্থ হয়।

"Except God build the house, they labour in vain that build it." 127 : 1

রাজকার্যে ব্যস্ত থাকিয়া বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলেও রাজা ডেভিড শিশুর মত নিজেকে ভগবানের দ্বারা রক্ষিত মনে করিতেন। পরিণত বয়সে এবং বৈষয়িক কার্যে থাকিয়া মনটিকে শিশুর মত রক্ষা করা—খুব বড় আধার না হইলে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে তিনি নিজের শিশু-প্রকৃতি স্বীকার করিয়া গাহিয়াছেন: মার কাছে শিশু যেমন স্থির ও শান্ত থাকে আমিও নিজেকে সেইরূপ শান্ত করিয়াছি।

"I have stilled and quieted my soul in God, as a child with his mother." 131 : 2

স্নেহশীল পিতা যেমন নিজের সন্তানদের প্রতি

কারুণ্য প্রকাশ করেন, সেইরূপ জগৎপিতাও তাঁহার শরণাগত সন্তানদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন। এই ভাবটি তিনি তাঁহার গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন :

"Like as a father pities his children, so the Lord pities them that fear him. For he knows our frame ; he remembers that we are dust." 103 : 13, 14

ডেভিডের গীতসংহিতার প্রতি ছত্রে ঈশ্বরে বিশ্বাস, জীবনের প্রতি পদে তাঁহাকে স্মরণ করা বা ডাকা এবং মানুষের প্রতি ভগবানের স্নেহপূর্ণ কারুণ্য এবং তাঁহার নামে আনন্দে থাকা—এইগুলি পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হইয়াছে। 'Trust' (বিশ্বাস), 'Praise' (বন্দনা), 'Loving kindness of God' (করুণা), 'Rejoice' (আনন্দ), 'Sing' (গান), এবং 'Shout for joy' (হর্ষধ্বনি)—এই শব্দগুলি তাঁহার গীতাবলিতে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট স্বয়ং এই গীতগুলি ভালবাসিতেন ; অন্যে পরে কা কথা ! St. Augustine (সাধু অগাষ্টিন) অতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন ; তিনি তাঁহার জীবনে আধ্যাত্মিক অবসাদের সময় এই গীতটি গাহিতেন :

হে ভগবান্ ! তুমি আমার অপরাধবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিও না, অথবা তুমি অত্যন্ত অসন্তোষসহকারে আমাকে শাস্তি দিও না। তোমার বাক্যগুলি বাণের মত আমাকে বিদ্ধ করে এবং তোমার দণ্ডযুক্ত হস্ত আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়।

"O Lord, rebuke me not in thy wrath : neither chasten me in thy hot displeasure. For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore." 38 : 1, 2

নিজের জীবনের গ্লানি অসহ্য হইলে অগাষ্টিনের হৃদয় রাজর্ষি ডেভিডের সুরেই কাঁদিত। হে ভগবান্ ! তুমি আমাকে ছাড়িও না। তুমি আমাকে দূরে রাখিও না। হে প্রভু ! আমার সাহায্যের জন্য ত্বরান্বিত হও, তুমি আমার মুক্তিধাম।

"Forsake me not, O Lord : O my God, be not far from me. Make haste to help me, O Lord, my Salvation." 38 : 21-22

Master George Sandys (জর্জ স্যাণ্ডিজ) ডেভিডের হিব্রু গীতসংহিতার ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে বিখ্যাত কবি Thomas Crew (টমাস ক্রু) তাঁহার বন্ধু ছিলেন তিনি বন্ধুর অনুবাদ পাঠ করিয়া এতদূর মোহিত হন যে, তিনি তাঁহাকে একটি ইংরেজী কবিতাতে অভিনন্দিত করেন এবং নিজের জীবনের উপর ধিক্কার দিয়া এইভাবে কবিতায় ঝংকার দিয়া বলেন : হে বন্ধু ! তোমার অনুবাদ পড়িয়া আমি আমার জীবনের পট-পরিবর্তন করিতে চাই। মাটির প্রতিমায় (রক্তমাংসের দেহে) মুগ্ধ হইয়া আমি তাহাতেই ভগবানের পূজা করিয়াছি। এখন এই সকল প্রতিমা হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাই এবং ভগবৎপ্রেমে প্রেরণা লাভ করিয়া কবিতা রচনা করিতে চাই।

'Prompted by thy example then, no more,
In moulds of clay will I my God adore ;
But tear those idols from my heart, and write
What His blest Sp'rit,
not fond love shall indite."

রাজর্ষি ডেভিডের গীতসংহিতা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অতি প্রিয়। তাঁহার প্রার্থনাগুলি হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত এবং পাঠকের প্রাণে নব জীবন আনয়ন করে। গীতগুলির ভাষা ও প্রকাশ করিবার প্রণালী কখনও একঘেয়ে হইবার নয়। ভক্তের হৃদয়ে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাগুলি যে ভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত সেই ভাবেই গীতসংহিতায় অমর ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে ! এই ক্ষুদ্র দিব্য সংহিতাটি মানব-সমাজে রাজর্ষি ডেভিডের শ্রেষ্ঠ অবদান। যেখানে প্রাণের ভাষায় মনোভাব প্রকটিত হইয়াছে, সেইখানে দার্শনিক মস্তিষ্কের কষ্টকল্পনা পরাভব স্বীকার করে। গীতসংহিতায় কবির রচনা-চাতুর্য, ভাষার পারিপাট্য, এবং ছন্দের মোহিনী শক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে এমন এক প্রাণস্পর্শী অমর ধ্বনি আছে—যাহা দ্বারা কি দার্শনিক, কি কবি, কি সাহিত্যিক, কি সাধারণ মানুষ সকলেই দিব্য প্রেরণা লাভ করিতে পারে।

কেমনে চাহিব সুখ?

শ্রীমতী সুজাতা হাজরা

যুগে যুগে তুমি কত না বেদনা সহেছ ভকত তরে,
স্মরি সেই কথা আজিকে আমার নয়নে অশ্রু ঝরে।

বল্কলবাসে বনবাসে আহা কাটায়ে দীর্ঘদিন,
রাজার কুমার কৃচ্ছ্রসাধনে করিয়াছ তনু ক্ষীণ।
কলুষদৃষ্টি মানব মনেরে ক্ষমাভরে দিয়া মান—
সীতারূপধারী আপনার সুখ দিয়াছিলে বলিদান।

প্রেমঘন দেহ ক্রুশের আকারে ক্ষতবিক্ষত ক'রে—
পরমতদ্বেষী নিঠুর মানব হাসে উল্লাস ভরে।
করুণাকাতর ছলছল আঁখি তবু কর নাই রোষ,
নীরবে যাতনা সহিয়া শুধুই মাগিয়াছ সন্তোষ।

জরামরণের ব্যথায় পীড়িত আর্তমানব লাগি
ভ্রমিয়াছ পথে রাজগৃহ ত্যজি—হে মহাবৈরাগী!
হাসিমুখে নিলে ভকত-হাতের বিষমাখা উপহার!
স্মরি সে কাতর ম্লান মুখছবি ঝরিছে অশ্রুধার!

ভক্তহৃদয় প্রেমরস-ঘন করুণা কোমল দেহ—
কৃষ্ণবিলাসী রাধিকাপ্রেমের মূর্ত সে বিগ্রহ!
ধূলিশয্যায় অশ্রুপাথারে শচীর স্নেহের ধন,
দারা-গৃহ ছাড়ি, হে প্রেমভিখারী করেছ আকিঞ্চন।

কামকাঞ্চন-বাসনাদগ্ধ দিক্‌হারা যত প্রাণ,
হের সম্মুখে তব সান্ত্বনা—কাশীপুর উদ্যান।
নিদারুণ ব্যাধি রুদ্ধকণ্ঠ চক্ষু নিদ্রাহীন,
নিরুপায় সবে দেখিয়াছে চাহি দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ।

কথা নাহি মুখে—তবু ব'লে গেল ক্ষমাসুন্দর আঁখি,
'দেহের দুঃখ দেহ শুধু জানে, মনে আনন্দ রাখি'।
আপনি প্রভু যে আপন জগতে বদ্ধ বেদনা-পাশে,
কারে অভিযোগ জানাবে মানব শোক-তাপ-মোহত্রাসে?

বেদনা-পাথারে সদা ভাসে তব প্রেম-উজ্জ্বল মুখ,
তোমার বক্ষে রক্ত ঝরায়ে কেমনে চাহিব সুখ?

সন্ত জ্ঞানেশ্বর

ব্রহ্মচারী তেজচৈতন্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

পণ্ডিতেরা যে প্রায়শ্চিত্ত চেয়েছিল তা সম্পন্ন হ'ল! পিতা-মাতার এইরূপ করুণ জীবনান্ত ভাই-বোনদের প্রাণে যে কত মর্মান্তিক আঘাত করল তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। তখন নিবৃত্তিনাথের বয়স দশ বছর ও জ্ঞানেশ্বরের আট। জন্মাবধি নিষ্ঠুর সমাজের কঠোর অনুশাসনে নিপীড়িত নিবৃত্তিনাথের চিত্তে সমাজের নির্মম আইন-কানুনের বিরুদ্ধে একটা হেয় ভাব জাগা খুব স্বাভাবিক। তাই পিতা-মাতার মৃত্যুর পর যখন তাঁদের উপনয়ন-সংস্কারের কথা উঠল, নিবৃত্তিনাথ তা গ্রাহ্য করলেন না; ভাবলেন, এই সমাজে পুনরায় ফিরে গিয়েই বা কি হবে? যজ্ঞোপবীত নাই বা হ'ল!

কিন্তু জ্ঞানেশ্বর কোনও নিয়ম-শাসন ভাঙতে আসেন নি। তিনি এসেছিলেন শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করতে—সাধারণ লোকদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারময় জীবনে শাস্ত্র-মর্যাদা-সম্পন্ন জীবনের আলো বিকীরণ করতে। তিনি দাদার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন। এই প্রতিবাদ থেকেই যেন তাঁদের জীবনের গৌরবময় যাত্রা শুরু হ'ল। এই সময় থেকেই মহারাষ্ট্রদেশে ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যার কর্ণধার আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ সন্ত জ্ঞানেশ্বর।

অনেকেই বলে থাকেন, জ্ঞানেশ্বর যে আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন তা জাতিপ্রথা ও ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি সামাজিক অসাম্য ও বিবেকহীন নিপীড়নের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করেন। নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বরের এই সময়ের মনোভাব আলোচনা ক'রে দেখলে আমরা এই জিনিসটি সম্যকরূপে বুঝতে পারব।

নিবৃত্তিনাথ খুব উচ্চ ভূমিকার সাধক ছিলেন। তিনি সর্বদাই নিজেকে শিবস্বরূপ মনে করতেন। দৈবাৎ সাত বছর বয়সে তাঁর শ্রীগৈনীনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। গৈনীনাথ আদিনাথ-প্রবর্তিত নাথ-সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। নিবৃত্তিনাথের মতো অত উচ্চ আধার দেখে গৈনীনাথ খুবই প্রীত হন এবং তাঁকে যোগ-রহস্যে দীক্ষিত করেন। গুরুকৃপা লাভ ক'রে নিবৃত্তিনাথ দ্রুতবেগে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। জ্ঞানেশ্বর ছোট ভাই ও বোন সহ বড় ভাইয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে সাধনভজন সম্বন্ধীয় নির্দেশ নিয়ে কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হলেন। দুঃখের বিষয়, এঁদের সাধনেতিহাস লিপিবদ্ধ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে এঁদের উপলব্ধিসকল দেখে বেশ অনুমিত হয় যে, এঁরা গভীর সাধনা ও তপস্যার জীবন অতিবাহিত করতেন। সকল সময় ভগবানের চিন্তা ও ভগবৎ-প্রসঙ্গ নিয়েই থাকতেন। এই ছোট বয়সে এঁদের উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি দেখে আশ্চর্য হ'তে হয়!

জ্ঞানের উচ্চতম ভূমিকায় জাতি বর্ণ বা কোনও রকম ভেদ থাকে না—সাধক তখন বিধি-নিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে এমন এক রাজ্যে উপস্থিত হন যেখানে কর্তব্যাকর্তব্য থাকে না; থাকেন একমাত্র সর্বভেদাভেদের পারে অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন বস্তু। নিবৃত্তিনাথ এই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই যখন তাঁকে উপনয়ন-সংস্কারের সম্বন্ধে বলা হ'ল, তিনি বললেন, "উপনয়নের আমার কি দরকার? আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মস্বরূপ! আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই। আমি মহত্তত্ত্ব বা বিরাট্—কিছুই নই। আমি কুল-অকুলের পারে, ত্রিগুণাতীত। আমি নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপ

আত্মা। আমার ধর্মাধর্ম বা বিধি-নিষেধের কোনও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু জ্ঞানেশ্বরের দৃষ্টিতে অজ্ঞান সাধারণ লোকদের হীন দশা দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল; তিনি দেখতেন, তারা অজ্ঞান ও কুসংস্কারের পঙ্কে পোকার মত কিলবিল করছে; ভাবতেন, আমরা জ্ঞানী হ'য়ে যদি এরূপভাবে পাশ কাটিয়ে যাই তো কি ক'রে চলবে? তাদের কে বোঝাবে? আমরা যদি শাস্ত্রের মর্যাদা ভাঙি, তা হ'লে এই অজ্ঞানদের কী হবে? হই না আমরা পূর্ণকাম, আত্ম-দর্শনে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তাতে এই অজ্ঞান জনসমাজের কী হ'ল? সুতরাং আমাদের উচিত, নিজেরা শাস্ত্র-মর্যাদা রক্ষা ক'রে তাদের পথ দেখানো।

এই ভেবে তিনি প্রত্যক্ষে নিবৃত্তিনাথকে বললেন, "দাদা, তুমি যা বলছ, সত্য; তুমি সত্য সত্যই শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মস্বরূপ। তোমার পবিত্রতায় কে সন্দেহ করতে পারে? সত্যই আত্মার সহিত বিধি-নিষেধের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এটাও তো শাস্ত্রে আছে যে, অবৈধ আচরণ নিতান্ত দূষিত। স্বধর্ম, অধিকার ও জাতিভেদানুযায়ী যা কর্তব্য, তার অনুষ্ঠান অবশ্যই করতে হয়। সুতরাং লোকসাধারণকে এই শিক্ষা দেবার জন্য সাধুদের এই নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এতে অনাচারের কোন আশঙ্কা থাকবে না। আমরা যতই উচ্চ অবস্থা লাভ করি না কেন, শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা দোষযুক্তই হবে। চল, ব্রাহ্মণদের পায়ে পড়ি ও মিনতি ক'রে উপনয়ন-সংস্কার করিয়ে নিই।"

জ্ঞানেশ্বরের এই কথা হ'তে এটা বেশ বুঝতে পারা যায় যে, তিনি কি ধরনের সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এবং তাঁর জন্ম-গ্রহণের তাৎপর্য কী ছিল।

শেষে ভাই-বোনেরা পণ্ডিতদের সমীপে গেলেন। তারা বলল, "আমরা শাস্ত্রাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করতে পারি না। তোমাদের উপনয়ন হওয়া অসম্ভব। তবে যদি পৈঠনের পণ্ডিতদের কাছ থেকে শুদ্ধি-পত্র আনতে পার, তা হ'লে আমরা তোমাদের ব্রাহ্মণ-ধর্মে অঙ্গীকার করব।" জ্ঞানেশ্বর বললেন, "আচ্ছা, তাই করব।" এই ব'লে ভাই-বোনদের সঙ্গে নিয়ে তিনি পৈঠনাভিমুখী যাত্রা করলেন।

তখনকার দিনে পৈঠন সংস্কৃত-বিদ্যার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। লোকে উহাকে দক্ষিণের বারাণসী বলত। যথাসময়ে পৈঠনে ব্রাহ্মণদের সভা হ'ল। নিবৃত্তিনাথ তাঁদের সম্মুখে আলন্দীর ব্রাহ্মণদের পত্রখানি রাখলেন এবং শুদ্ধি-পত্র দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা সন্ন্যাসীর এই ছেলেদের শুদ্ধির জন্য কোন বিধান খুঁজে পেলেন না। শেষে এই নির্ণয় দেওয়া হ'ল যে, এই ছেলেদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। সুতরাং তারা যে অবস্থায় আছে তাতেই থাকুক, ভগবানের নাম জপ করুক, সংসারের মায়া না বাড়িয়ে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করুক এবং বৈরাগ্য-যোগের অভ্যাস ক'রে সর্বত্র সর্বাবস্থায় শ্রীহরিকেই দেখতে চেষ্টা করুক।

'সন্ন্যাসীর ছেলেদের' দেখবার জন্য সেই সভায় শত শত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোক জমেছিল। যখন নির্দেশ দেওয়া হ'ল তারা ভাবল যে, নিবৃত্তিনাথ উহার প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, নির্দেশ শুনে ভাই-বোনদের মনে দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক—বরং তাঁদের আনন্দই হয়েছে, তখন তাদের আশ্চর্যের আর সীমা রইল না! তারা বুঝল না যে, যাঁরা জন্মাবধি পবিত্র, অল্পবয়স থেকেই যাঁরা বাইরে ও ভিতরে সেই এক অদ্বয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অনুভব করছেন, তাঁদের জন্যে ব্রহ্মচর্য-ব্রতের বিধান দেওয়া—ঠিক যেন স্রোতস্বিনীকে সর্বদা প্রবাহিত হ'তে বলা! ভাই-বোনেরা সমবেত ব্রাহ্মণদের প্রণাম করলেন এবং তাঁদের এই নির্দেশের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

সভা বিসর্জনকালে কেউ রহস্যচ্ছলে তাঁদের জিজ্ঞাসা করে, "ওহে, তোমাদের নামের অর্থ কী?"

নিবৃত্তিনাথ বললেন, আমি নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির সহিত আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি রাজযোগী—অখণ্ড স্বরূপানন্দ ভোগ করি।

জ্ঞানদেব বললেন, আমি জ্ঞানদেব—সর্বত্র আমার গতি ও জ্ঞান, জিগ্‌গেস করলে আমি বার বার এই কথাই বলব।

সোপানদেব উত্তর দিলেন, ভগবানের নামে রুচি উৎপন্ন করা ও ভক্তদের বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়ে দেওয়া আমার কাজ। আমি বৈকুণ্ঠের সোপান।

মুক্তাবাঈও পশ্চাৎপদ হলেন না—বললেন, আমি মুক্তির দ্বার খুলে দিই। ইহলোকে ভগবানের লীলা দেখবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি।

ছোটদের মুখে এইরূপ বড় বড় কথা শুনে অনেকেই হেসে উঠল। এমন সময় রাস্তায় একটা মহিষ যাচ্ছিল। তার দিকে আঙুল দেখিয়ে কেউ একজন জ্ঞানদেবকে উপহাস ক'রে বলল, "দেখ, দেখ, ওই জ্ঞানদেব যাচ্ছে। নামে আর কি আছে? ঐ মোষটাও তো জ্ঞানদেব!" সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠল। কিন্তু জ্ঞানেশ্বর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হ'য়ে ধীর গম্ভীরস্বরে বললেন, "হাঁ, আপনি ঠিকই বলছেন। বাস্তব পক্ষে উহাতে আর আমাতে কোন ভেদ নেই। ঐ মোষটাও আমার আত্মস্বরূপ। সকল দেহে একই চিৎসূর্য প্রকাশমান।"

জ্ঞানেশ্বরের এই কথা শুনে কেউ একজন মহিষের পিঠে চাবুক দিয়ে জোরে আঘাত করল। কি আশ্চর্য! সকলেই চোখ মেলে দেখল, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেশ্বরের পিঠের উপর কালশিরা পড়ে গেছে এবং তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তও পড়ছে! জ্ঞানেশ্বর দেখিয়ে দিলেন যে, একাত্মভাব শুধু মুখের বা বইয়ের কথা নয়, বরং উহা বাস্তব জীবনেও আনতে পারা যায়। যথাযথ সাধনা করলে জীবনে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন জীবমাত্রে কোন ভেদ আর অনুভূত হয় না। সে অবস্থায় মানুষের ক্ষুদ্র অহং সেই 'মহান্ অহং'-এ এত দূর লয় পায় যে নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব মোটেই বোধ হয় না। তখন চরাচরে সেই এক অদ্বয় 'আমি'ই অনুভূত হয়।

কিন্তু এইখানেই কথা শেষ হ'ল না। উপহাস করতে বদ্ধপরিকর যারা, তারা এত সহজে ছাড়বে কি ক'রে? বিদ্রূপ ক'রে বলল একজন, "যখন এই মোষটাও জ্ঞানদেব, তখন সেও বেদের ঋক্‌মন্ত্র বলবে!" জ্ঞানেশ্বরের স্বরে যেন মেঘ গর্জন ক'রে উঠল, "কেন বলবে না? আপনারা ব্রাহ্মণ। আপনাদের বাণী কখনও মিথ্যা হবার নয়।" এই বলে তিনি মহিষের সমীপে গেলেন ও তার মাথার উপর হাত বুলাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিষের মুখ দিয়ে বেদের ঋক্‌সকল বহির্গত হ'তে লাগল—কেমন নির্দোষ উচ্চারণ! কি নির্ভুল মন্ত্রপাঠ!! শ্রোতারা তো শুনে স্তম্ভিত!—নয়ন পলকহীন, মুখ শব্দহীন! তারা কাঠবৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ পরে তাদের চমক ভাঙল। যা দেখছি তা কি সত্য? যা শুনছি তা ভ্রম তো নয়? চোখ মেলে দেখল আবার, কান দিয়ে শুনল পুনরায়। না, সব সত্যই। সামনেই মোষটি দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে অনর্গল ঋক্‌সকল—ধীরবাহিনী স্রোতস্বিনীর মত। পণ্ডিতেরা লজ্জায়, ক্ষোভে আড়ষ্ট হ'য়ে গেলেন, তাঁদের অভিমান চূর্ণ হ'ল। বুঝলেন যে এই চারজন সামান্য লোক নন। তাঁদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী হ'য়ে পৈঠনের ব্রাহ্মণেরা তাঁদের শুদ্ধি-পত্র প্রদান করলেন।

জ্ঞানেশ্বরের পরবর্তী জীবন আধ্যাত্মিক আলো বিকীরণের জীবন। কিছুকাল পৈঠনে থাকার পর তাঁরা চারি ভাই-বোন নেবাসায় এলেন। নেবাসা প্রবরা নদীর তীরে এক প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্র—মহালয়াক্ষেত্র বা ক্ষালসাপুর নামেও প্রসিদ্ধ। এখানে আসার সময় আর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। যখন তাঁরা নেবাসায় পৌছলেন, জ্ঞানেশ্বর দেখেন,

এক সাধ্বী স্ত্রী মৃত স্বামীর শবের কাছে বসে করুণ ক্রন্দন করছে। তিনি খোঁজ-খবর করে যখন জানতে পেলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম 'সচ্চিদানন্দ', তখন বিস্ময়ে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "একি? সৎ-চিৎ-আনন্দ? সৎ-চিৎ-আনন্দকে কি কেউ কখনও মেরেছে? সচ্চিদানন্দের কোন উপাধি হয় না, মৃত্যু কস্মিন্‌কালেও তাকে স্পর্শ করতে পারে না।" এই ব'লে তিনি শবের গায়ে হাত বুলালেন, অমনি মৃত ব্যক্তির চেতনা ফিরে এল; সে উঠে দাঁড়াল; পুনঃ পতিত হ'য়ে জ্ঞানেশ্বরের চরণ দু'খানি জড়িয়ে ধরল। এই লোকটিই পরে 'সচ্চিদানন্দ-বাবা' নামে বিখ্যাত হন, ইনি 'জ্ঞানেশ্বরী' লিপিবদ্ধ করেন।

'জ্ঞানেশ্বরী' শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার উপর জ্ঞানেশ্বরের ভাষ্য। তখন জ্ঞানেশ্বর মাত্র পনেরোয় পড়েছেন। নেবাসায় থাকাকালে শ্রীগুরু নিবৃত্তিনাথের সম্মুখে জ্ঞানেশ্বর লোকসাধারণের কল্যাণের জন্য মারাঠী ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেন। সে এক অপূর্ব ব্যাখ্যা—অপূর্ব ভাষায়। যেন অন্তরের অনুভূতিসকল শ্রীগুরু-প্রদত্ত উপদেশ ও গীতোক্ত বাণীর সহিত মিলিত হ'য়ে এক ত্রিবেণী সৃষ্টি করল। সেই ত্রিবেণীতে অবগাহন ক'রে সহস্র সহস্র লোকের জীবন ধন্য হ'য়ে গেল। তারা যেন একটা নূতন আলোক পেল। এতদিন বেদান্তের সত্যসকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরই অধিগম্য সংস্কৃত ভাষায় লুক্কায়িত ছিল। ভাগীরথী যেন এতদিন নিজেকে পণ্ডিতদের ভাষা ও ভাবের জটিলতায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখন কিন্তু জ্ঞানেশ্বর সকলের কল্যাণের জন্য সেই ধর্ম-ভাগীরথীকে আহ্বান ক'রে সমতল প্রদেশে আনলেন, যাতে ধর্মপিপাসুগণ নিজেদের পিপাসা তৃপ্ত ক'রে সেই এক সত্যে উপনীত হ'তে পারেন। এই কার্যে কিন্তু বাধাও কম হ'ল না। গোঁড়া পণ্ডিতেরা এতে বাধা দিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না। বেদান্তের সত্য শূদ্র শ্রবণ করবে? না, তা কখনই হ'তে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতদের সকল চেষ্টা বিফল হ'ল। যেখানে ভগবানের ইচ্ছা, সেখানে মানুষের ইচ্ছা আর কী করবে? অমিতাভ বুদ্ধের ন্যায় জ্ঞানেশ্বর পণ্ডিতদের মিথ্যা গর্বে আঘাত ক'রে লোকসাধারণের ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা করলেন। এই ব্যাখ্যার মাধুর্য তাঁরাই অনুভব করতে পারেন যাঁরা মূল মারাঠীতে 'জ্ঞানেশ্বরী' পাঠ করেছেন। কাব্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে পর সে এক আদর্শ কাব্য-গ্রন্থ, তত্ত্বজ্ঞানের বিচারে এক গভীর তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থ, ধর্মের দিক দিয়ে দেখলে ধর্মের সূক্ষ্ম রহস্যোদ্‌ঘাটনকারী এক অপূর্ব ধর্মগ্রন্থ ও ভাষার দিক দিয়ে সে এক অনুপম অভিনব ভাষার গ্রন্থ। যে কোনো দিক দিয়ে দেখা যাক্, এমন আর একটিও মারাঠী গ্রন্থ নেই যা এর সমকক্ষ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।

'জ্ঞানেশ্বরী' লেখা পূর্ণ হবার পর নিবৃত্তিনাথ একদিন জ্ঞানেশ্বরকে বললেন, "জ্ঞান, অনেক কিছু লেখা, বলা ও বিবেচনা করা হ'ল। এখন কিছু মৌলিক রচনা হোক।" গুরুস্থানীয় দাদার এই আদেশে জ্ঞানেশ্বর 'অমৃতানুভবে'র রচনা শুরু করলেন, যাতে নিজের সমস্ত অনুভূতি ঢেলে দিলেন। এও এক অপূর্ব গ্রন্থ।

তারপরে আমরা জ্ঞানেশ্বরকে দেখতে পাই পরিব্রাজকরূপে—নানা ক্ষেত্রে, নানা তীর্থে। সাথে আছেন নিবৃত্তিনাথ, সোপানদেব, মুক্তাবাঈ এবং অন্যান্য ভক্তগণ। এই ভ্রমণকালে জায়গায় জায়গায় ধর্মপিপাসুদের ভিড় লেগে যেত। জ্ঞানেশ্বরের কীর্তির কথা—পৈঠনের সেই অলৌকিক ঘটনার পর থেকে মহারাষ্ট্রের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং যেখানেই তাঁরা যেতেন, সেখানেই স্থানীয় জনগণ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। সে এক অপূর্ব জাগরণ—যেন সাক্ষাৎ ধর্ম জ্ঞানেশ্বরের রূপ ধরে একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির স্রোতোধারা

বইয়ে দিচ্ছেন। জ্ঞানেশ্বর নিজে নির্গুণ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েও জনসাধারণের জন্য সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা ও নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা দিতেন তাঁর চোখে ঈশ্বর-লাভে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের কোন ভেদ ছিল না। সকলেই সমানভাবে ভগবৎকৃপার অধিকারী। তাঁর ভক্তদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত নামদেব দরজী, নরহরি সেকরা, গোরা কুমোর, সাংবতা মালী যাঁদের নাম আজও গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে নিয়ে থাকেন। এতে আমরা সে জাগরণের পরিমাণ বেশ ধারণা করতে পারি।

এই পর্যটনকালে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কিন্তু এখানে স্থানাভাবে ওসব চর্চা করা হবে না। শুধু দু-একটি মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ ক'রে এই প্রবন্ধটি শেষ করব।

যখন ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান ক'রে জ্ঞানেশ্বর সদলবলে বারাণসী পৌঁছেছেন, তখন মণিকর্ণিকাঘাটে মুদ্‌গলাচার্য কোন এক মহান্ যজ্ঞের উদ্‌যাপনে ব্যস্ত ছিলেন। সেজন্য সেখানে বহু বড় বড় বৈদিক শাস্ত্রী ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা সমবেত হয়েছিলেন। সে সময় এক বিবাদ হয়—সেই যজ্ঞে সর্বপ্রথম কাকে বরণ করা হবে? কোন সমাধানই সকলের মনঃপূত হয় না। শেষে মুদ্‌গলাচার্য এক উপায় ঠিক করলেন। তিনি একটি হাতী আনালেন এবং তার শুঁড়ে একটি পুষ্পমাল্য ঝুলিয়ে দিলেন। ঠিক হ'ল, হাতি যার গলায় সেই মালাটি পরিয়ে দেবে, তাকেই অগ্রে বরণ করা হবে। প্রত্যেক পণ্ডিতই চাইছে, মালা তারই গলায় এসে পড়ুক, কিন্তু সকলে আশ্চর্য হ'য়ে দেখল, হাতি সেই মালাটি জ্ঞানেশ্বরের গলায় পরিয়ে দিল। ভক্তদের প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। যেখানেই জ্ঞানেশ্বর গেছেন সেখানেই তিনি বন্দিত হয়েছেন। সিংহ-শাবক যেখানেই যাক না কেন, পশুরাজ ব'লে গণ্য হবে। সূর্যকে আপন গরিমা প্রচার করতে হয় না। যখন যেখানে উঠবে, সকলে চিনে নেবে যে, এই সূর্য!

নানা তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ ক'রে শেষে জ্ঞানেশ্বর ভাই-বোনদের সহিত আলন্দী ফিরে এলেন। তাঁর অলৌকিকত্বের সুগন্ধ সর্বত্রগ মহান্ বায়ুর সাথে সাথে চারিদিকে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সেই গৌরব সকলের হৃদয়ে একরূপ আহ্লাদের তরঙ্গ উত্থাপিত করল না। অনেকেরই মনে জেগে উঠল পুরাতন হিংসার বিষ। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চাঙ্গদেব। ইনি একজন মস্ত বড় যোগী, যৌগিক সমস্ত সিদ্ধিতে পারদর্শী, যোগবলে তিনি মৃত্যুকে চৌদ্দ বার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৪০০ বছর বয়স হলেও তিনি দেখতে ছিলেন যুবকের মতো। কালক্রমে তিনি শুনতে পেলেন জ্ঞানেশ্বরের কথা—তাঁর জীবনের বহুবিধ অলৌকিক ঘটনাবলী।

কেউ এসে একদিন জানিয়ে গেল: পৈঠনে জ্ঞানেশ্বর মোষের মুখে ঋগ্‌বেদ বলিয়েছেন; আমি তখন ওখানেই হাজির ছিলাম।—শুনে চাঙ্গদেবের অভিমানে ধাক্কা লাগল। ভাবলেন, আমি ১৪০০ বছরেও যা করতে পারলাম না, এই ছেলেটা তা ক'রে দেখিয়েছে। একবার ওকে দেখা চাই। কিন্তু দেখা কি ক'রে হবে? আমার যাওয়া ঠিক হবে না। সে ওইটুকু ছেলে, আর আমি এত বড় লোক! আমি কি ক'রে যাব? শেষে ঠিক করলেন, একখানা চিঠি পাঠাই। কিন্তু চিঠিতে কি ভাবে সম্বোধন করি? 'কল্যাণবরেষু' লিখতে পারি না; সে এত বড় লোক, এত সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়েছে। সুতরাং তা লেখা চলবে না। তবে কি 'শ্রীচরণেষু' লিখি? ছিঃ, তাও কি ক'রে হবে? আমি ১৪০০ বছরের বুড়ো, আর ও সেদিনকার ছেলে।

শেষ পর্যন্ত তিনি কাগজে কিছু না লিখে সাদা কাগজখানিই শিষ্যদের হাতে জ্ঞানেশ্বরের কাছে আলন্দী পাঠিয়ে দিলেন। তাদের দেখামাত্রই জ্ঞানেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "সাদা কাগজই কি চাঙ্গদেব আমার জন্য পাঠিয়েছেন?" শিষ্যেরা

তো শুনে অবাক্! কি ক'রে জানতে পারলেন ইনি? প্রণাম ক'রে কাগজখানি সামনে রাখলেন। মুক্তাবাঈ সহজভাবে কাগজখানি হাতে নিয়ে দেখলেন—কাগজটি একেবারে সাদা; বললেন, "১৪০০ বছর মাথা কেটে তপিস্যে করেও সে এই কাগজের মত সাদাই থেকে গেল!" সকলেই এই রহস্যোক্তি শুনে হেসে উঠল। নিবৃত্তিনাথ জ্ঞানেশ্বরকে বললেন, "জ্ঞান, সে এত তপস্যা করেও ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধে একেবারে শূন্য। সিদ্ধির গর্ব ও অহংকার ওকে গ্রাস করেছে। তুমি এখন কিছু লিখে পাঠাও যাতে ওর অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন অন্তঃকরণে কিছু আলো আসে।" শ্রীগুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য ক'রে জ্ঞানেশ্বর চাঙ্গদেবকে ৬৫ শ্লোকে একখানি চিঠি লিখলেন। এই ছন্দকে মারাঠীতে 'ওবি' বলা হয়। ঐ চিঠিখানি "চাঙ্গদেব পাসষ্টী" নামে বিখ্যাত। পাসষ্টী অর্থে পঁয়ষট্টি। এতে সংক্ষেপে জ্ঞানেশ্বরের সমস্ত দর্শনের নিদর্শন আছে। এটি আত্মজ্ঞানে ভরা—উপনিষদুক্ত 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অনুপম ব্যাখ্যা ও বিবেচনা।

চাঙ্গদেবের শিষ্যেরা জ্ঞানেশ্বরের সেই চিঠিখানি নিয়ে গিয়ে গুরুর হাতে দিলেন। কিন্তু চাঙ্গদেব তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। স্থির করলেন, জ্ঞানেশ্বরের জ্ঞান পরীক্ষা করা যাক। সহস্রাধিক শিষ্য সহ তিনি সিংহারূঢ় হ'য়ে, হাতে সাপের চাবুক নিয়ে আলন্দীর দিকে রওনা হলেন।

এদিকে চার ভাই-বোন বাড়ীর বাইরের ভাঙা দেয়ালের উপর বসে আনন্দে গল্প করছিলেন। নিবৃত্তিনাথ চাঙ্গদেবের আসার খবর পেয়ে জ্ঞানদেবকে বললেন, "চাঙ্গদেবের মত বড় মহান্ত দেখা করতে আসছেন। চল, একটু এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করি।"

কিন্তু কিসে চড়ে যাওয়া যায়? জ্ঞানেশ্বর সেই জড় নির্জীব প্রাচীরকে চলতে আদেশ করলেন, অমনি প্রাচীরটি দ্রুতবেগে চলতে লাগল। এই অসম্ভব ব্যাপার দেখে চাঙ্গদেব বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেলেন। তিনি নিজে এত বড় সিদ্ধ পুরুষ, কিন্তু তাঁর জড় নির্জীব বস্তুর উপর কোনই জোর ছিল না। জ্ঞানেশ্বর যেন এক আঘাতে তাঁর গর্ব খর্ব ক'রে দিলেন।

জ্ঞানেশ্বরকে বললেন চাঙ্গদেব রুদ্ধকণ্ঠে, "ওরে ছোট্ট ছেলে, আয় তাড়াতাড়ি। এত মহত্ত্ব তুই পেলি কোত্থেকে? তোকে দেখলে তো একেবারে ছোট্ট ছেলেই মনে হয়!"

জ্ঞানেশ্বর: ব্রহ্ম কি কখনো ছোট বা বড় হয়?
চাঙ্গ: ব্রহ্ম কি, তুই জানিস্?
জ্ঞানে: ঘটে ঘটে তো তিনিই রয়েছেন। তাঁতে ভেদ কই? চারি বেদ এই কথাই বলেন।
চাঙ্গ: তোর ভেদভাব কিসে দূর হ'ল?
জ্ঞানে: সদ্‌গুরু চোখ খুলে দিয়েছেন।
চাঙ্গ: চোখ খোলার অর্থ কী রে ভাই?
জ্ঞানে: ওরে বোকা, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
চাঙ্গ: এইটুকু ছেলে, আর তোর এত বুদ্ধি!
জ্ঞানে: এত বড় লোক, আর এইটুকু কথা!
চাঙ্গ: আমার মন কি ছোট হয়ে গেছে?
জ্ঞানে: অজ্ঞানে গর্ব হয়েছে।
চাঙ্গ: তা কিসে যাবে?
জ্ঞানে: সদ্‌গুরুর শরণ নে।
চাঙ্গ: সদ্‌গুরুর কৃপা কি তুই-ই পেয়েছিস?
জ্ঞানে: ভূতমাত্রে উহা ভরা, তবুও অশেষ।
চাঙ্গ: তবে বাকী সকলকে যমরাজ কেন টেনে নিয়ে যান?
জ্ঞানে: তারা অবিশ্বাসে হাবুডুবু খাচ্ছে যে!
চাঙ্গ: কি, বিশ্বাসই সার?
জ্ঞানে: পুরাণ তো এই বলেন।
চাঙ্গ: যদি আমি সদ্‌গুরুর শরণ না নিই?
জ্ঞানে: তো চুরাশির চক্রে পড়বি।

চাঙ্গ : বুড়ো হ'লে পর যদি ভক্তি করি ?

জ্ঞানে : কিন্তু 'কাল' তোর আজ্ঞা মানবে, তবে তো ?

চাঙ্গ : তবে ভজন কোন্ সময়ে করি ?

জ্ঞানে : 'সোঽহং মন্ত্রে' সময়ের কোন নিয়ম নেই।

চাঙ্গ : জপ কোন্ দিন কোন্ মুহূর্তে করা চাই ?

জ্ঞানে : দিন ও রাতের কোন ঝগড়া নেই।

চাঙ্গ : কিন্তু ছেলেমানুষ তুই, বল দেখি ভাই, কত লোক এইভাবে নিস্তার পেয়েছে ?

জ্ঞানে : তার কি ইয়ত্তা আছে রে বোকা ? যেটা বলবার নয় তাই বলে যাচ্ছিস ! চুপ কর ! বেশী বক্‌বক্ করিসনে। নইলে ডাণ্ডা মেরে তোর সব অজ্ঞান বের ক'রে দেব। 'আমার-তোমার' অনেক হ'ল। পাঁচটি ছেলে কি গণ্ডগোলই না করেছে !

চাঙ্গ : পাঁচটি ছেলে কার ?

জ্ঞানে : আত্মারামের।

চাঙ্গ : এ সমস্ত খেলা কি তাঁরই ?

জ্ঞানে : হাঁ, খেলা খেলেও তিনি সকল থেকে আলাদা।

চাঙ্গ : তুই কি ক'রে বুঝলি এই খেলাটিকে ?

জ্ঞানে : নিবৃত্তিনাথের প্রসাদে।

চাঙ্গদেবের গর্ব দূর হ'ল। তিনি জ্ঞানেশ্বরের শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন এবং 'পাসষ্টি'র অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু প্রত্যেকবার জ্ঞানেশ্বর চাঙ্গদেবের এই কথা এড়িয়ে যান। একদিন চাঙ্গদেব ধরেই বসলেন। তখন নিরুপায় হয়ে জ্ঞানেশ্বর বললেন, "বেশ, তা হবে। কিন্তু তোমাকে একটি প্রাণ বলি দিতে হবে।" চাঙ্গদেব নিজ শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ আমার জন্য প্রাণ দিতে রাজী আছ ? যদি কেউ থাক, সকালে এস।" এই কথা শুনেই শিষ্যদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। তারা সকলেই রাত্রে ওখান থেকে পলায়ন করল। সকালে সহস্রাধিক শিষ্যদের মধ্যে একজনকেও না দেখে, ব্যাপারটি বুঝে চাঙ্গদেব নিজেই প্রাণ দেওয়ার সংকল্প করলেন। তাঁর এই সংকল্প শুনে জ্ঞানেশ্বর বললেন, "আমি অন্য কারও প্রাণ চাইনি তো, তোমারই প্রাণ চেয়েছিলুম। নিজের 'অহং' —যাকে তুমি এত ভালবাসো, ও যার সঙ্গে তুমি জড়িয়ে রয়েছ—তাকেই বলি দাও ; তবে 'পাসষ্টী'র মর্ম বুঝতে পারবে। এই আমার অভিপ্রায়।" চাঙ্গদেব তাই করলেন। গুরুবাক্যে বিশ্বাসী হ'য়ে, গুরুকৃপা লাভ ক'রে তিনি শেষে জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করেন।

জ্ঞানেশ্বরের অবতার-গ্রহণের কার্য শেষ হ'য়ে এল। ভগবানের প্রিয় যাঁরা, তাঁরা এ সংসারে আর বেশী দিন থাকেন না। তিনি স্বেচ্ছায় ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর মর্ত্যলীলা সংবরণ ক'রে মহাসমাধিতে লীন হলেন। প্রিয় ভাইয়ের বিয়োগে এ সংসারে থাকা অর্থহীন বুঝে বাকী তিন ভাই-বোনও এক বছরের ভিতরেই দেহত্যাগ ক'রে সেই অখণ্ড ব্রহ্মে লীন হ'য়ে গেলেন।

(সমাপ্ত)

'অমৃতানুভবে'র একটি 'ওবি'

ভেদু লাজোনি আবডী। য়েকরসী দেত বুড়ী।
জো ভোগণয়া ঠাব কাটী। দ্বৈতাচা জেঁথে॥

ভেদ লজ্জা পাইয়া প্রেমবশতঃ একরসে ঝাঁপ দিল,
যে (ভেদ) ভোগের সন্ধানে দ্বৈতের কাছে গিয়াছিল।

—শ্রীজ্ঞানেশ্বর

নরেন্দ্র-ব্রজেন্দ্র-প্রসঙ্গ

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলকে নরেন্দ্র-প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত; তিনি নরেন্দ্রের এক বছরের কনিষ্ঠ (১৮৬৪ জন্ম) হলেও দুজনে একই সময়ে একই কলেজে (General Assembly) F.A. (১৮৮০) ও B. A. (১৮৮২) পাশ করেন। দুজনেই সেকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অধ্যাপক (Dr. Hastie) হেষ্টি সাহেবের কাছে ইওরোপীয় দর্শন (কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি) অধ্যয়ন করেন। তাঁর কাছেই Trance বা 'সমাধি' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নরেন্দ্র শুনেন:

"I have seen only one person—Sri Ramakrishna Paramahansa—who has experienced this blessed state of mind; …you can understand if you go there (Dakshineswar) and see for yourself".

বিদেশী অধ্যাপকের এই উক্তি দুই ছাত্র-বন্ধুর জীবনেই গভীর রেখাপাত করে, তাঁরা দু'জনেই জীবন ভরে প্রমাণ ক'রে গেছেন যে বিশ্ব-দর্শনের ইতিহাসে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা ও সিদ্ধি অত্যুচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ আমায় বলেছেন যে সেই সময় থেকে তিনি ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র মূল সংস্কৃতে পড়তে শুরু করেন ও সে কাজে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁকে উৎসাহ দেন।

সেই তপস্যার প্রথম ফল ছাপার অক্ষরে পেয়েছি ব্রজেন্দ্রনাথের ১৮৯৯ খৃঃ রোমের ভাষণে; সেখানে সে বছর International Congress of Orientalists—প্রাচ্যবিদ্‌দের আন্তর্জাতিক অধিবেশন হয়, সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করেন:

(১) Foundation of the Science of Mythology in Yaska: "Nirukta" with Greek parallels.

(২) Origin of Law (ধর্মশাস্ত্র), Hindu founders of the social sciences.

(৩) Vaishnavism and Christianity —an essay on the study of Comparative Religion.

এর মধ্যে শেষ পুস্তিকাটি আমি বহু কষ্টে পেয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এখন তা প্রায় দুষ্প্রাপ্য। অন্য দুটি রচনার সারাংশ হয়তো রোম থেকে আনা সম্ভব। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও বৈদিক উপাখ্যানের তাৎপর্য নিয়ে সেকালে ব্রজেন্দ্রনাথ গভীর অধ্যয়ন করেন। ১৯১১ খৃঃ লণ্ডনে Race Congress-এর ভাষণে তাঁর দিব্যদৃষ্টির আর এক আভাস পাই— ভগ্নী নিবেদিতা দেহত্যাগের আগে সে বিষয়ে কিছু লিখে গেছেন।

ভগ্নী নিবেদিতার মৃত্যুর পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে "প্রবাসী"তে যে অপূর্ব অর্ঘ্য নিবেদন করেন তা থেকে আমরা বুঝি ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য বিষয়ে রবীন্দ্র-নরেন্দ্র-ব্রজেন্দ্র-যুগের অবদান কত বিশাল ও গভীর। এঁদের সঙ্গে নিবেদিতা (মৃত্যুকাল ১৯১১ খৃঃ পর্যন্ত) বহু আলাপ-আলোচনা করেছেন। তাই নিবেদিতা-রচনাবলীরও ভাল নির্ঘণ্ট (Index) তৈরী করা দরকার; তাঁর গুরু বিবেকানন্দের সহসা দেহত্যাগের পর নিবেদিতা (১৯০২-১১) অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে কত কথাই না লিপিবদ্ধ রেখে গেছেন সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের আহ্বান করি—শীঘ্র তাঁর সটীক জীবনী প্রকাশ করতে। "উদ্বোধন" এবং "অমৃতবাজার পত্রিকা" অফিসেও এ সম্বন্ধে বহু তথ্য মিলবে।

রবীন্দ্র-নরেন্দ্র-ব্রজেন্দ্র-যুগের শেষ চিহ্ন আমরা পেয়েছি যখন স্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে, শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী-উৎসবে কবিগুরুর অপূর্ব ভাষণ (ইংরেজী থেকে আমি অনুবাদ করি "বসুমতী"র আহ্বানে) ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের শেষ উক্তি। এই সব তথ্য ও ভাষণাদি সংগ্রহ ক'রে ইতিহাস রচনার সময় এসেছে।

১৮৯৭ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে বেদান্ত প্রচার ক'রে বাঙলায় ফিরে আসেন সে তো আজ থেকে ৬০ বছর আগে; তার হীরক-জয়ন্তী স্মরণ ক'রে বিবেকানন্দ-ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ করি যে স্বামীজীর শেষ অসমাপ্ত ইচ্ছা—বৈদিক ও সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় বেলুড়ের গঙ্গাতীরে গড়ে তোলার ব্রতে সর্বতোভাবে সহযোগ ও সাহায্য করুন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অনুমোদনে এই নিখিল-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা শুরু হয়েছে—সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান চিরস্মরণীয়।

এই প্রসঙ্গে দেশবাসীকে স্মরণ করাই—স্বামী বিবেকানন্দের এবং উদ্বোধন গ্রন্থাবলীর "Subject-index" বা বিষয়-সূচী সংকলিত হ'লে ভবিষ্যৎ গবেষকদের প্রভূত সাহায্য করা হবে।

আকাঙ্ক্ষা*

শ্রীহিমাংশু গঙ্গোপাধ্যায়

হে প্রভু! আমারে শান্তির দূত কর;
দিই যেন প্রেম যেথা ঘৃণা হ'ল জড়।
যেখানে হয়েছে ক্ষতির অঙ্ক জমা
আমি যেন সেথা বিতরিতে পারি ক্ষমা।
সন্দেহ যেথা তুলিতে চাহিছে মাথা
বিশ্বাস-বারি সিঞ্চিতে পারি তথা।
হতাশার বিষ-নিঃশ্বাস যবে বহে
আশার প্রদীপ মোর হাতে যেন রহে।
আঁধার যেখানে ঘনাইয়া আসে কালো
আমি যেন হই সেথায় ক্ষুদ্র আলো!
দুঃখ যেখানে আসে নব নিতি নিতি
সেথা যেন আনি সান্ত্বনা, প্রেম, প্রীতি।

* সেণ্ট ফ্রান্সিসের ভাবাবলম্বনে

জনপদ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

সীমাহারা এক মহাসাগরের তীরে,
নিথর নিবিড় নীল আকাশের তলে
ছোট জনপদ,—রহস্যে রাখে ঘিরে;
মুখরিত হয় জীবনের কোলাহলে।
মাঠে-মাঠে সেথা সোনার ফসল ফলে;
আহার-নিদ্রা, দুঃখ-সুখের ভিড়ে
রঙ ধরে শুধু তনু-মনে পলে পলে;
আনাগোনা সেথা অনিবার ফিরে-ফিরে।
ছোট জনপদ—অথই পাথার পারে;
নিথর নীলিমা—উপরেও পারাবার;
জীবন-মরণ সেথা শুধু বারে বারে
কী যে খেলা খেলে! রহস্য বুঝা ভার।
জোয়ারে ভাঁটায়, আলোয় আঁধারে দেখি,
সিন্ধুর বুকে বিন্দুর লীলা এ কী!

স্বপ্ন-সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মত

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

মাণ্ডূক্যোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে : "সর্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম। সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।" অভিব্যক্ত প্রপঞ্চের সর্বাত্মক রূপ শ্রুতি চতুষ্পাদ রূপে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন : "জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।" এর পরের শ্লোকে বলেছেন : "স্বপ্নস্থানো-ঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।" পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে : "যত্র সুপ্তো ন কশ্চন কামং কাময়তে ন কশ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥" বৈশ্বানর বহিঃপ্রজ্ঞ স্থূলভুক্; তৈজস অন্তঃপ্রজ্ঞ, প্রবিবিক্তভুক্; প্রাজ্ঞ হলেন একীভূত ও আনন্দভুক্। বৈশ্বানর ও তৈজসাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম অন্ন-প্রাণ-মনোময় কোষে উপাধিযুক্ত, কিন্তু প্রাজ্ঞ হলেন বিজ্ঞানাত্মা। ইনি চেতোমুখ, জ্ঞানময় প্রকাশশীল যাঁর মুখ। সপ্ত অঙ্গ দুই হাত, দুই পা, মস্তক, বক্ষ ও উদর এই সাত অঙ্গ। একোনবিংশতিমুখ, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই চার বৃত্তি-বিশিষ্ট। বৈশ্বানর অপেক্ষা তৈজসাত্মার প্রকাশ অধিক, সেজন্য তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। আধুনিকদের মতে শ্রুতি যে স্বপ্নের দ্রষ্টাকে তৈজস শব্দে অভিহিত ক'রে বৈশ্বানর অপেক্ষা উচ্চস্থান নির্ণয় করেছেন, এটা সমীচীন হয়নি। স্বপ্নের জ্ঞান জাগ্রৎকালীন জ্ঞান অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। স্বপ্নের দ্রষ্টাকে উচ্চস্থান দেওয়া যায় না।

স্বপ্ন বিষয়ে এক বিশেষ আলোচনা প্রশ্নোপনিষদে আছে। গার্গ্য মুনি প্রশ্ন করলেন, 'কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি?' মহর্ষি পিপ্পলাদ উত্তর দিলেন : "অত্র এষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি। দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি। দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ, শ্রুতং চাশ্রুতং চ, অনুভূতং চাননুভূতং চ, সচ্চাসচ্চ, সর্বং পশ্যতি, সর্বঃ পশ্যতি।—অর্থাৎ এই দেব স্বপ্নে মহিমা (বিভূতি) অনুভব করেন। (জাগ্রদবস্থায়) যা কিছু বার বার দেখেন, শুনেন, অনুভব করেন, স্বপ্নে তা-ই বারংবার দেখেন, শুনেন, অনুভব করেন। দিগ্‌দিগন্তে (দেশ-বিদেশে) বার বার অনুভূত বিষয় (স্বপ্নে) পুনঃপুনঃ অনুভব করেন। (আরও) দেখা অদেখা, শোনা না-শোনা, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ ও অসৎ, সকল বিষয়-বস্তু দেখেন, এবং স্বয়ং রূপায়িত হয়েও দেখেন।

মহর্ষি পঞ্চমুখে এই দেবের মহিমা কীর্তন করেছেন। এ আমাদের প্রাকৃতিক সৃষ্টির কথা, ব্রহ্মার মানস সৃষ্টি অথবা তৈত্তিরীয়োপনিষদের ষষ্ঠ অনুবাকের সৃষ্টিতত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।

দুটি প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন হয়েছে! 'এষ দেবঃ' বলতে কাকে বুঝায়? মহর্ষি পিপ্পলাদ কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই দেবের বিভূতি বর্ণন করেছেন? সাধারণতঃ সকলে সক্রিয় মনকেই স্বপ্নের দ্রষ্টা মনে করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য ভাষ্যে লিখেছেন :

এই দেবতা, অর্থাৎ মন-উপাধিক জীব, আপনার মধ্যে ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গ সমাহৃত ক'রে বিষয়-বিষয়ি-ভাবাত্মক বিচিত্র মহিমা দর্শন করেন। প্রবিবিক্তভুক শব্দের অর্থ : যিনি কেবল বাসনারূপ প্রজ্ঞাকে ভোগ করেন। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গ, দৃশ্য বিষয়বস্তু এবং বিষয়ী মন একীভূত অবস্থায় থাকে। আমরা ইহাকে নিষ্ক্রিয়, স্থিতিশীল (static) অবস্থা বলতে পারি।

এই দেবতা যে আমাদের জাগ্রৎ সক্রিয়, গতিশীল মন নয়, তা সহজেই বুঝা যায়। মন দশ ইন্দ্রিয়ের রাজা। জাগ্রদবস্থায় আমরা দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে বিষয়ের ভোক্তারূপে দেখি। অন্তঃকরণের চারিটি বৃত্তিঃ মন সংকল্প ও বিকল্পাত্মক, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, চিত্তবৃত্তি স্মরণাত্মক এবং অহংকার অভিমানাত্মক বৃত্তি। স্থূল দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলির অভিমানী অহংকার ও মন আমাদের অণু-পরমাণুদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রয়েছে। অহরহঃ সকলে 'অহং অহং' করছে। এইটে আমি, আর ঐটে তুমি; এই সব আমার। কিন্তু মনের ন্যায় এই সম্মাননীয় 'অহম্'বৃত্তি—আসলে মাত্র একটি ইন্দ্রিয়, তা নিজেকে তিনি যতই বড় মনে করুন না কেন। ভাতের হাঁড়ির নীচে আগুনের মতো বৈশ্বানর পিছনে আছেন, তাই এঁদের লম্ফ ঝম্প। যেমন কারণ-শরীরের মূল 'অহংকার' ব্যষ্টি জীবকে পরমব্রহ্ম থেকে পৃথক ক'রে দেখায়, তেমনি জাগ্রৎকালে স্থূল শরীরাভিমানী আমাদের আটপৌরে অহংবৃত্তি অপর সকল স্থূল বস্তু থেকে আমাদের পৃথক্ জ্ঞান জন্মায়।

সাধারণতঃ আমরা দেখি জাগ্রদবস্থায় কর্মরত দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ রাত্রে নিদ্রার সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন মনের সংকল্প, বুদ্ধির নিশ্চয়, অহংকার-বৃত্তির অভিমান, সব বৃত্তিই প্রবৃত্তির তমোগুণে আচ্ছন্ন হ'য়ে স্তব্ধ থাকে। শ্রুতি বলেছেন, তখন এই দেহপুরে জেগে থাকেন কেবল মাত্র প্রাণাগ্নি। "প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি।" (প্রশ্ন ৪।৩) মহর্ষি পতঞ্জলি ১০ ও ১১ সূত্রে লিখেছেনঃ নিদ্রা অভাবাত্মক বৃত্তি। জীবের অনুভূত বিষয়সমূহ চিত্তহ্রদে যে তরঙ্গ উঠায়, তা স্মৃতি বা স্মরণাত্মক বৃত্তি। নিদ্রাবৃত্তি চিত্তহ্রদে যে তরঙ্গ তোলে তাই স্বপ্ন। দেহেন্দ্রিয়াদি, অন্তঃকরণ ও মনের প্রহরী সব নিদ্রিত। এই সময়ে চিত্তভাণ্ডারের উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে অবচেতন মনের গহ্বর থেকে চিত্ত-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়—দৃষ্ট অদৃষ্ট, শ্রুত অশ্রুত, অনুভূত অননুভূত, দিগ্‌দেশের, জন্ম-জন্মান্তরের স্পষ্ট-অস্পষ্ট, সৎ ও অসৎ, রূপায়িত প্রাকৃত দৃশ্যাবলীঃ শ্রুতির স্বপ্ন এই প্রকার মহিমান্বিত, বিভূতিময়। শ্রীশঙ্করাচার্য 'অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুভূত' প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, একেবারে অদেখা, অননুভূত বিষয়ে বাসনা জন্মে না, শ্রুতি জন্মান্তরীণ সংস্কাররূপে অবস্থিত বাসনার ছবি চিত্তদর্পণে যে ছাপ রাখে, তার কথাই বলেছেন।

স্বপ্নসম্বন্ধে মোটামুটি আমাদের জ্ঞান এই রকমঃ

(১) কঠোর শ্রমজীবীরা শয়নমাত্রেই গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। স্বপ্নের কোন স্মৃতি তারা জেগে জ্ঞানভূমিতে আনতে পারে না। কেহ যদি অসময়ে সুখনিদ্রা ভেঙে দেয়, তবে মানুষ বিরক্ত হ'য়ে বলে—"সুখমহমসাপ্সং, ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্"—বড় সুখে ঘুমাচ্ছিলাম, কিছুই জানতে পারিনি। এই সুখের স্মৃতি কোথা হ'তে আসে? শ্রুতি বলেন, "উদানঃ এনম্ অহরহঃ ব্রহ্ম গময়তে।" (প্রশ্ন ৪।৪) পূর্বে লিখেছি, প্রাণাগ্নি দেহপুরে নিদ্রাকালে জেগে থাকে। উদান বায়ু প্রত্যহ তেজোভিভূত জীবকে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ, আনন্দ-ভুক্ প্রাজ্ঞের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। সেজন্য সুষুপ্তি (গাঢ় নিদ্রা)-মগ্ন জীব কিঞ্চিৎ নির্মল আনন্দের স্মৃতি নিয়ে জেগে ওঠে। আচার্য শঙ্কর লিখেছেন, বিদ্বান ও অবিদ্বান, আপামর সকল জীবই সুষুপ্তিকালে এই সুখ প্রাপ্ত হয়। তবে স্বপ্নে মহিমা দর্শন এবং সুষুপ্তিকালে সুখপ্রাপ্তি দৈনন্দিন প্রাকৃতিক ব্যাপার; এর সঙ্গে চরম জ্ঞানের সংস্পর্শ থাকে না।

(২) বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন, স্বপ্ন খুব কমই দেখি, আর সে সব মনেও থাকে না।

(৩) আবার অতিরিক্ত স্বপ্নাতুর দু' চার জন আছেন, যাঁদের নিদ্রা মানে স্বপ্ন দেখা। আর সে স্বপ্নের বিষয় ভাব ও ভঙ্গি বিচিত্র এবং বহুমুখী।

মনে থাকুক আর নাই থাকুক, স্বপ্ন সকলেই দেখেন। ডাঃ ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষকেরা স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে যে সকল বিচিত্র কাহিনী প্রকাশ করেছেন, তা এমন প্রামাণ্য যে অবিশ্বাস করার উপায় নেই। তবে এঁরা স্বপ্ন-কাহিনীর মধ্যে সামাজিক ও অসামাজিক নানা ঘটনা ফলাও ক'রে লিখেছেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা পরব্রহ্মের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। স্বপ্নের বৈচিত্র্য ও মহিমা তাঁরা অনাদি প্রকৃতির খেলারূপে বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্মা হ'তে কীট পরমাণু, স্থাবর জঙ্গম, সর্বভূতের স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণশরীর, সমস্তই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি নিজে অচেতন ও জড়; কিন্তু যখন পুরুষের সান্নিধ্যে আসেন তখনই বিপুলবেগে তাঁর মধ্যে পরিণাম ঘটতে থাকে। সৃজনধর্মী প্রকৃতির পরমাণুপুঞ্জ বায়ুতাড়িত সমুদ্রের জলকণার ন্যায় তরঙ্গায়িত হয়।

"সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি কে করে গণন!
কোটী চন্দ্র, কোটী তপন,
লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহা ঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক্ জ্যোতি মগন।"
(সৃষ্টি,—বিবেকানন্দ)

প্রকৃতিদেবীর এই বিভূতির অতি ক্ষুদ্রাংশও যদি স্বপ্নে উদ্ঘাটিত হয়, তবে তা মহিমার নিদর্শন নিশ্চয়ই। ক্রমোন্নতিবাদ এবং আমাদের শাস্ত্র বলেন, লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে এই মানবজন্ম লাভ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ-লিখিত রাজযোগের বাংলা অনুবাদের ৩০২ পৃষ্ঠায় পাই:

"আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি··· আত্মবিস্মৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ করান।···যত প্রকার বিকার আছে, সব দেখান··· ক্রমশঃ তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যান···।"

শাস্ত্র বলেন, জন্ম-জন্মান্তরীণ অনুভূতি সংস্কার-রূপে চিত্তভাণ্ডারে পুঞ্জীভূত থাকে। এর মধ্যে অনেক চিত্র হয়তো মুছে গিয়েছে, আরো বহু ছবির উপর ছাপ পড়েছে। জীব যত অভিজ্ঞতা দিগদিগন্তে সঞ্চয় করেছে—কাম-কামনার ছবির আশপাশে তার ছবিও ছড়িয়ে থাকে। এর উপরে বর্তমান জন্মের অনুভূতিগুলি নিশ্চয়ই জীবন্ত আছে।

সাধক যোগী ধ্যানকালে প্রথমে নিজেকে উপাধি-মুক্ত ভাবেন। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন:

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর।

এর পরের অবস্থা: তৈজসাত্মা দেখছেন—

অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ-সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর।

এখনও অহংস্রোত রয়েছে, প্রকৃতির সাথে সংযোগ আছে: তার পরে—

ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল···।

মাণ্ডূক্যের ঋষি তাঁর 'বৈশ্বানর'কে উপাধির সঙ্গে অভিন্ন বোধে স্থূল জগতের জ্ঞান লাভ এবং বিষয় ভোগ করতে দেখেন। নিদ্রাকালে বৈশ্বানর স্বপ্নে চরাচর মনোহর বিশ্বের ছবি দেখেন। লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে প্রকৃতিদ্বারা উপহিত হ'য়ে তিনি যে সব খেলা খেলেছেন, মুগ্ধ হ'য়ে তাই সমগ্রভাবে দেখেন। তখনও কিন্তু—অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ-সংসার ভাসে, ডুবে, পুনরায় ভাসে, এই স্রোত চলে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না। ঋষি দেখছেন, জীব প্রত্যহ সুষুপ্তি-কালে উপাধি-মুক্ত হন ও স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। শ্রুতি বলেছেন, ইনিই ব্যষ্টি জীবাত্মা, প্রাজ্ঞ; ইনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, বোদ্ধা, মন্তা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। (প্রশ্ন ৪।৯)

ঋষি প্রতি প্রাণীর জীবন-নাট্যে প্রত্যহ

জাগরণ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি-পুরুষের খেলা এইভাবে অভিনীত হ'তে দেখেছেন। আমারই এই তিন অবস্থা, তিন স্তরেই নাম-রূপের খেলা। সাধক ধ্যানে যা উপলব্ধি করেন, সর্ব সাধারণের দৈনন্দিন জীবনে অজ্ঞাতসারে তা চিত্রিত হয়। ইহাই জীবকে উচ্চ থেকে উচ্চতর জীবন-লাভের প্রেরণা যোগায়।

দেহের দৈনিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য নিদ্রার প্রয়োজন। কিন্তু স্বপ্নের প্রয়োজন কি? শ্রুতি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থায় আত্মার ঐক্যভাব দেখাবার প্রসঙ্গে স্বপ্নের মহিমা কীর্তন করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্রহ্মোপলব্ধির দিক থেকে বর্ণিত। পাশ্চাত্ত্য মনোবিদেরা স্বপ্নকে বিচার করেছেন, প্রধানতঃ মানসিক ব্যাধির দৃষ্টি নিয়ে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলেন, স্বপ্নে নিজেদের স্বভাব-চরিত্রের দুর্বলতা, বিশেষ ক'রে ভয়, কাম এবং কাঞ্চনাসক্তির চিত্রই বেশী দেখা যায়। স্বপ্নে বলবান ব্যক্তিও অসহায়, সংযমী পুরুষও বিপন্ন।

কঠোর শ্রমজীবীরা স্বপ্নের কথা ভাবেই না। স্বপ্নে নিজ চরিত্রের বিকৃতি দেখে সংস্কৃতি-অভিমানী ব্যক্তিরাই বিব্রত হন। সদসৎ উপায়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পত্তি অর্জন করেছেন যাঁরা তাঁরাই এই ভাবের স্বপ্ন বেশী দেখেন যে স্বপ্নে ধনসম্পত্তি ডাকাতি হ'য়ে গেল, এই ভ্রমজ্ঞানে তাঁরা এতই বিচলিত হন যে জেগেও তাঁদের কান্না থামে না। এঁদের মধ্যে অনেকে ধর্ম-জীবনের আশ্রয় নিয়ে দান ধ্যান ক'রে বিবেকের তাড়না থেকে রক্ষা পান। স্বপ্নের এই এক মহান প্রয়োজন দেখা যায়। এই ভাবের তাড়না তাঁদের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক; আত্ম-সংশোধনের দিকে দৃষ্টি পড়ে। বিদ্বান্ ব্যক্তির অহংকার-ত্যাগেরও ইহা সহায়ক। সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞেরও চরিত্রে যদি বিন্দুমাত্র গলদ থাকে, স্বপ্ন তার আবরণ খুলে দেয়। নিবৃত্তি-মার্গের পথিকের সাধনকালে এক সময়ে জন্ম-জন্মান্তরের পশুভাবগুলি সহস্র ফণা নিয়ে তাড়া করে। সাধক বিমূঢ় হ'য়ে ভাবেন, অদেখা, অননুভূত, সদসৎ এই সকল উৎকট ভাব তাঁর ভিতরে এতকাল ছিল কোথায়? শ্রীবুদ্ধের সাধনকালে মায়া ও মারের আবির্ভাব—এই পর্যায়ের চিত্র।

স্বপ্ন-জগতের এক পরম কল্যাণের দিক আমি পাঠকের গোচরে আনছি। স্বপ্নে কঠিন প্রশ্নের সমাধান, ভবিষ্যতের হুবহু চিত্র, দিব্য মূর্তির দর্শন, ইষ্টমন্ত্র লাভ, কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার ইঙ্গিত —অনেকেই তাঁদের জীবনে পেয়েছেন। এই রকমের কল্যাণময় চিত্র কোথা থেকে চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত হয়? কারণ-জগৎ থেকে এই চিত্রসকল আসে: এবং ইহা জগদ্‌গুরুর কৃপার নিদর্শন। দিব্য জীবনলাভের প্রেরণাও এই পথে আসে।

স্বপ্নে কঠিন অঙ্কের সমাধান, নূতন তথ্যের সন্ধানলাভ, ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানতে পারা অনেকেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে।

পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের মধ্যে ডাঃ ফ্রয়েডই প্রথম স্বপ্ন ব্যাপারটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। বহু মানসিক ব্যাধির মূলে তিনি নিরুদ্ধ কামনার অবস্থান দেখে মনঃসমীক্ষণ (সাইকো-এনালিসিস) প্রণালীতে চিকিৎসা করেন ও বিশেষ সুফল লাভ করেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক-মাত্রেই তাঁর গবেষণাকে সম্মানের আসন দিয়েছেন। এখন স্বপ্ন-বিষয়ে তাঁর মত উল্লেখ করছি। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের 'স্বপ্ন'-নামক পুস্তক থেকে ফ্রয়েডবাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করলাম।

"মনের প্রহরী (সেন্সর) অসামাজিক কামাদি ইচ্ছাকে অবদমিত করিয়া নির্জ্ঞানে (অবচেতন মনে) অবরুদ্ধ রাখে। নিদ্রাবস্থায়, বা মানসিক অবসাদ অথবা উত্তেজনা-কালে এবং কতকগুলি মানসিক রোগে, এই প্রহরী অসতর্ক হইতে পারে। এই সময়ে অবদমিত রুদ্ধ ইচ্ছা, স্বপ্নে—নানা

প্রতীকের সাহায্যে এবং বিভিন্ন ছদ্মবেশে সংজ্ঞানে আসিতে চেষ্টা করে ; তখনি আমরা স্বপ্ন দেখি।"

এই প্রতীক ও ছদ্মবেশ যে কত বিচিত্র বর্ণে, রসে, গন্ধে ও অদ্ভুত কল্পনায় মণ্ডিত হ'য়ে ফুটে বের হয়, ওঁদের পুস্তকে তার বিবরণী পড়লে, শ্রুতির 'মহিমা'-দর্শনকে খুব অতিশয়োক্তি মনে হবে না। মনঃসমীক্ষকের কাছে রোগী যখন স্বপ্ন-কাহিনী বর্ণনা করে, তখন কত নদনদী উপত্যকা, পাহাড় জঙ্গল, আকাশমার্গে বিচরণের বৃত্তান্ত ব'লে যায়, তা উপন্যাসের গল্পের চেয়েও সরস। এই সকল মনঃসমীক্ষকেরা প্রথমতঃ মানসিক ব্যাধির গোপন রহস্য অনুসন্ধানে রত হন ; শেষে স্বপ্নদর্শন-তত্ত্বে মন দিয়েছেন। এঁরা সেজন্য স্বপ্নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নি। মানুষের জীবনে ভোগই প্রধান স্থান জুড়ে আছে। এই প্রেয়-তাত্ত্বিকদের নিকটে উচ্চতর জীবনের কোন মীমাংসাও আমরা আশা করি না।

সাংখ্য বলেন, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের জন্য অনাদি প্রকৃতি জগৎ রচনা করেন। পূর্বে এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধৃত করেছি। ডার্‌উইনের ক্রমোন্নতিবাদ পশু-মানবে এসেই শেষ হয়েছে। যে মানুষ আরও উচ্চস্তরে উন্নীত হ'য়ে সুপার-ম্যান ও দেবমানবের পর্যায়ে এসেছে, তাদের জীবনের ব্যাখ্যা পাশ্চাত্ত্য মনোবিদেরা বিশেষ করেন নি।

ফ্রয়েডবাদ কামবীজকে স্বপ্নের মূল প্রতিপন্ন করবার তাগিদে শিশুর স্তন্যপান থেকে ভয়, ভক্তি, ভালবাসা, সকল ভাবের মধ্যেই তার অঙ্কুর দেখেছেন। শ্রুতি সৃষ্টির মূলে, 'সোঽকাময়ত, বহুস্যাম্ প্রজায়েয়' থেকে শুরু ক'রে প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রকৃতির সৃজন-ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রবিদেরা এই সৃষ্টি-কামনায় পুরুষের ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের মহান ভাবের দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁদের মতে ত্যাগেই আনন্দ, ত্যাগের দ্বারা সেই অমৃতস্বরূপের উপলব্ধি ঘটে। ভয়ও স্বপ্ন-জগতের এক বড় স্থান জুড়ে আছে : স্বপ্নে বোমায় বিধ্বস্ত হওয়া, ভূমিকম্পে বাড়ি-চাপা পড়া, আততায়ীর ছোরার আঘাতে রক্তাপ্লুত হওয়া—প্রভৃতি স্বপ্নও সাধারণ।

স্বপ্নে ভয় দেখার কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডবাদীরা প্রধানতঃ ঐ আদিম রিপুটিকেই সনাক্ত ক'রে থাকেন ; আমাদের শাস্ত্র দেহাভিমানী অহমিকাকে কারণ ব'লে নির্দেশ করেন। যখন জীবের সর্বভূতে আত্মার উপলব্ধি হয়, তখনই একজন আর এক জনকে ভয় করে না।

সংক্ষেপতঃ এই প্রবন্ধে স্বপ্ন-বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য মতবাদ উক্ত হয়েছে। এই বিষয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ডাঃ ফ্রয়েড মানসিক ব্যাধির নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান-কালে অতৃপ্ত কামনার খোঁজ পান। পরে তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা স্বপ্নতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। এদেশে ডাঃ বসু মহাশয় তাঁর 'স্বপ্ন' পুস্তকে গুরুকেও ছাড়িয়ে গেছেন, তিনি কামবীজের দর্শন আধ্যাত্মিক ভূমিতেও পেয়েছেন। উপরন্তু স্মৃতি ও তন্ত্র থেকে উক্তি উদ্ধৃত ক'রে তাঁর মত সমর্থন করেছেন। তিনি ঐ সুর সপ্তমে চড়িয়ে, সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের মধ্যেও ফ্রয়েডবাদের কীটাণু দেখেছেন।

'স্বপ্ন-তত্ত্ব' আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ফ্রয়েডবাদ ভোগে আরম্ভ এবং ভোগেই শেষ হয়েছে। শ্রুতির স্বপ্নদর্শন মোক্ষ মার্গের সোপান। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা প্রবৃত্তিমার্গের চাবি-কাঠি ; শ্রুতির তৈজসাত্মা স্বপ্ন থেকে স্বরূপে আরূঢ় হন। ফ্রয়েড-তত্ত্ব যেখানে শেষ হয়েছে, শ্রুতির তত্ত্ব সেখান থেকে আরম্ভ। ফ্রয়েড পশুধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ ক'রে ভোগবিলাসীদের নিকট যশস্বী হয়েছেন ; শ্রুতি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির মধ্যে কার্যপরম্পরা নির্ণয় ক'রে দিব্য জীবনের সন্ধান দিয়েছেন।

মুক্তির প্রার্থনা

শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার ফিরায়ে দাও সেই শৈশব আশ্রয়, ওগো মাতৃসমা,
বিস্মরিয়া যাই সব পূর্বজ্ঞান, দয়াময়ী বিস্মৃতি পরমা !
সুখ ? স্বপ্ন শুধু, জানি মায়া-মৃগ নাহি দিবে ধরা, তবু ছুটে।
প্রেম প্রীতি আশা ? মৃগতৃষা বারংবার মরীচিকা মাঝে টুটে—
শুধু অবসাদ, পরাজয় ! শত ব্যর্থতার জ্বালা ক'রে ক্ষয়,
তিলে তিলে হয় জীবনের সকল শক্তির পূর্ণ অপচয়—
আকাঙ্ক্ষার অনির্বাণ অগ্নিমধ্যে। এবে টুটি নীড় বাসনার
চূর্ণ করি জীবনের ভোগপাত্র বাহিরিব ভাঙি রুদ্ধ-দ্বার।
চিনিয়াছি স্বরূপ ইহার ; এই সেই প্রজাপতি-মনোদেহ,
আপনারি লাগি রচে—রোগ, শোক, মায়া, মোহ—অনিত্যের গেহ
সৃষ্টির বিধাতা এই ; তাই যোগারূঢ় প্রাণ। হে মোর মৃন্ময়ী !
চিন্ময়ীরূপেতে তুমি জাগ করুণায়, কর মোরে মৃত্যুঞ্জয়ী।

বীরা, বীর্য দাও, দাও জ্ঞান-অসি, ক্ষমাহীন হস্তে ছিন্ন করি—
দলি অরি অন্ধকার কারাগারে, বদ্ধ প্রাণ চিরমুক্ত করি,
এই জীবনেই হোক অমারাত্রি অবসান। যাই ভুলি যত
ব্যথাময় অনুভূতি, সুখ-দুঃখরূপে সম-অন্তরাল মত
যাহা রহে সদা এ অন্তরে। জরা-ব্যাধি-শোক জনম-মরণ
বহি আনে জন্মান্তরে সহস্র সংস্কার বিষ-কীটের দংশন :
দুঃসহ ব্যথার দাহ, অতীত স্মৃতির বন্ধন বেদনা শোক—
দুঃখের রাত্রির দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের মত ত্যজি, হই বীতশোক।
কিবা সত্য মিথ্যা, ধন-মান, জ্ঞানাজ্ঞান সব করি সমর্পণ,
হে প্রবুদ্ধ ! তোমারি প্রসাদে ; শাশ্বত আনন্দ শিশু নিরঞ্জন—
অক্ষয় আনন্দলোকে, চলি পূর্বে মঙ্গল উষার পানে চাহি
বীতকাম বিমুক্ত বিহঙ্গসম, যথা আর জন্ম মৃত্যু নাহি।

সামঞ্জস্য—কেন এবং কোথায়?

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ব্রজবল্লভবাবু কীর্তন শুনিতে বসিয়াছেন। সারাদিনের বৈষয়িক কর্ম এবং সংসারের নানা প্রকার ঝামেলার পর হরিসভায় সন্ধ্যা হইতে দুইটি ঘণ্টা তাঁহার চমৎকার কাটে। নিজে গাহিতে পারেন না, চোখ বুজিয়া শুনেন। স্নায়ুগুলি যেন জুড়াইয়া যায়, প্রাণে কে যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখাইয়া দেয়; যখন বাড়ী ফিরেন সমস্ত হৃদয়ে এক অপূর্ব প্রসন্নতা বিরাজ করে। কিন্তু আজ ব্রজবল্লভবাবু কিছুতেই কীর্তনে মন দিতে পারিতেছেন না। সকাল বেলায় খুড়তুতো ভাই শ্যামকিশোরের সহিত একটি পারিবারিক ব্যাপার লইয়া বড় বচসা হইয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া সেই কথাটাই মনে আসিতেছে। কীর্তনের কথাগুলি কানে ঢুকিতেছে, কিন্তু প্রাণে বাজিতেছে না। গৃহে প্রত্যাগমনের সময় ব্রজবল্লভবাবু আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—কী আপদ, একটু শান্ত মনে ভগবানের নাম ক'রব তা আজ আর হ'ল না।

ব্রজবল্লভবাবুর এই স্বগতোক্তিটি অত্যন্ত মূল্যবান। মনের শান্তি না থাকিলে কীর্তনশ্রবণ সার্থক হয় না। কীর্তন শোনা কেন, কোন কাজই ঠিক ঠিক সম্পন্ন হয় না। আবার শুধু মনের শান্তিও পর্যাপ্ত নয়, দেহের শান্তিও চাই। এই বিষয়েও ব্রজবল্লভবাবুর একটি অভিজ্ঞতা উদাহরণ-স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। একদিন হরিসভায় যাইবার পূর্বে তাঁহার খুব মাথা ধরিয়াছিল। প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যাইবেন না, পরে মনের জোরে গেলেন। কিন্তু সেদিনও বড় ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। যে মন ভগবানে নিবিষ্ট করিবেন সেই মন বার বার পীড়িত শিরোদেশে ঘুরিতে লাগিল।

ব্রজবল্লভবাবুর আর একদিনকার একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলে এই প্রসঙ্গ শেষ হয়। সেদিন তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, মনেও কোন গোলমাল ছিল না। তথাপি কীর্তনানন্দ উপভোগ না করিয়াই তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে হইয়াছিল। কারণটি এই:—

আসর করিয়া সকলে বসিয়াছেন। খোলবাদক বাজনা শুরু করিয়াছেন, করতালও বাজিতেছে, গায়ক গৌরচন্দ্রিকা প্রায় ধরিতে উদ্যত—এমন সময় অকস্মাৎ বাহিরে ভীষণ চীৎকার শোনা গেল—'সাপ' 'সাপ' 'সাপ'। আট দশ জন লোকের চীৎকার। 'ঐ, ঐ হরিসভার ভিতর ঢুকছে, ঐ যাচ্ছে, ঐ ঐ।' গায়ক আর গান ধরিতে পারিলেন না। খোল করতালও বন্ধ হইল। সকলে বাহিরে আসিলেন। হরিসভার সামনে কলুবাড়ী। ওখান হইতেই নাকি বিরাট একটি গোখুরা সর্প হরিসভার মধ্যে ঢুকিয়াছে। অনেকক্ষণ হৈ চৈ ও অনুসন্ধান চলিল, কিন্তু সাপকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তা নাই পাওয়া যাক—কিন্তু কীর্তন আর সে রাত্রিতে হইল না। অত্যন্ত বিষণ্ণ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া ব্রজবল্লভবাবু গৃহে ফিরিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, মনের শান্তি ও দেহের শান্তির ন্যায় পরিবেশের শান্তিও কীর্তনানন্দ উপভোগের জন্য প্রয়োজন।

শুধু কীর্তনানন্দ কেন, যে কোন সুনিয়ত সুষ্ঠু কার্যের সফলতার জন্য এই তিন প্রকার শান্তি বা সামঞ্জস্য কম বেশী অবশ্যই চাই। যে কাজ যত গভীর উহার জন্য সামঞ্জস্য তত অধিক প্রয়োজন। মাথাধরা লইয়া বাজার করা চলে, কিন্তু কীর্তন শোনা চলে না; মনে দুশ্চিন্তা থাকিলেও অফিস করিয়া আসা যায়, কিন্তু প্রবন্ধ বা কবিতা লেখা সম্ভব হয় না। বাড়ীর পাশে গোলমাল হইলেও কতকগুলি কাজ করিতে বাধা হয় না। কিন্তু কোন কোন কাজ বন্ধ রাখিতে হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে এই তিন প্রকার সামঞ্জস্য যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা আমরা উপাসনার প্রারম্ভিক নিয়মগুলি হইতেই বুঝিতে পারি। স্নান, আচমন, হস্তপদাদি প্রক্ষালন প্রভৃতি দেহশৌচের উপর জোর দিবার উদ্দেশ্য শরীরের ভিতর স্নায়বিক প্রবাহ, রক্তপ্রবাহ এবং বায়ু-প্রবাহকে সুসমঞ্জস রাখিতে সহায়তা করা। মনের সাম্য আনিবার জন্য শান্তিপাঠ, কল্যাণভাবনা প্রভৃতির ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি বৈদিক শান্তিবচনের ভাব কী বলিষ্ঠ! "কানে যেন আমরা মঙ্গল-বাক্য শুনিতে পাই, চক্ষুতে যেন শোভন দৃশ্যই দেখিতে পারি, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শরীর সবল ও সুস্থ রাখিয়া আমরা যেন দেবতার জয়গান করিতে পারি।" (ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃনুয়াম—ইত্যাদি)

"বাতাস মধুর হউক, নদীর জলধারা, বৃক্ষলতা গুল্ম, মধুর হউক, প্রভাত এবং রাত্রি মধুর হউক। ধূলিকণায় এবং আকাশে যেন শান্তি ছাইয়া থাকে। সূর্যকিরণ যেন লইয়া আসে প্রাণপ্রদ মাধুর্য। সারা প্রকৃতিতে যেন আমরা মাধুর্য খুঁজিয়া পাই।" (মধু বাতা ঋতায়তেই—ত্যাদি)

ধ্যান করিবার পূর্বে আসনে বসিয়া মৈত্রী ও কল্যাণ-ভাবনার তাৎপর্যও মনকে সামঞ্জস্যের স্তরে লইয়া যাওয়া। ধ্যানরূপ সুকঠিন ব্যাপারটি —মনের সামঞ্জস্য না থাকিলে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তাই আসনে বসিয়া এই ধরনের চিন্তা আনিবার চেষ্টা করিতে হয়—'এই পৃথিবীতে কাহারও সহিত আমার বিদ্বেষ নাই। নিকটে বা দূরে যে যেখানে আছে সকলে সুখী হউক, সকলের মঙ্গল হউক। সকলেই আমার মিত্র। সকলের আনন্দে আমার আনন্দ।' এই প্রকার কল্যাণ-ভাবনা দ্বারা মনের পটভূমি তৈরী হয়। পটভূমি ঠিক ঠিক যদি তৈরী হয় তবেই সার্থক ধ্যান করিতে পারা যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের কৌতুকভরে উদাহৃত 'বানরের ধ্যান' নয়, তিনি নানা উপমা দিয়া যথার্থ ধ্যানের লক্ষণ যেরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন সেইরূপ। যথা—

"গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে; সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই বাজনা গাড়ী ঘোড়া—কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁশ নাই, সে জানতে পারলে না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল।

"একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হ'তে লাগল। সে তখন ছিপ হাতে ক'রে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে মহাশয়, অমুক বাড়ুয্যের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন? কোন উত্তর নাই। সে ব্যক্তির হুঁশ নাই। তার হাত কাঁপ্‌ছে, কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। * * *

"ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না—শোনাও যায় না। স্পর্শবোধ পর্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জানতে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না, সাপটাও জানতে পারে না।

"গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না—যেন বা'র বাড়ীতে কপাট পড়ল।"

শরীরের সমতা, মনের সাম্য এবং পরিবেশের শান্তি এই তিন প্রকার সামঞ্জস্যকে আমরা একটি ত্রিভুজের (triangle) তিনটি বাহুরূপে কল্পনা করিতে পারি। এই ত্রিভুজই যেন আমাদের ভাবী সফলতার বিকাশ-ক্ষেত্র। ক্ষেত্রের বেড়ার কোন অংশ ভাঙিয়া গেলে যেমন ভিতরকার ফসলের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, সেইরূপ সামঞ্জস্য-ত্রিভুজের কোন বাহুতে ঘাটতি থাকিলে জীবনের উন্নতি-বিধায়ক কাজ যথাযথ নিষ্পন্ন হয় না। অতএব কাজ আরম্ভ করিবার আগে সার্থক কাজের এই পরিবেষ্টনীটি ভাল করিয়া গড়িয়া তোলা বিধেয়। কীর্তন-শ্রবণ, ধ্যান ও উপাসনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এগুলি আধ্যাত্মিক কাজ। কিন্তু লৌকিক কাজের ক্ষেত্রেও এই সামঞ্জস্য-পরিবেষ্টনী চাই। পড়াশোনা, চাকরি, চিকিৎসা, ব্যবসা-

বাণিজ্য, অধ্যাপনা, সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাপৃতিগুলির সফলতা অনেকাংশে ঐ ত্রিবিধ সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে। সামঞ্জস্যের বেড়ার বাহিরে গিয়া কাজ করিতে গেলে হাত পা ভাঙিবার সম্ভাবনা!

কিন্তু এই বেড়া নিখুঁতরূপে নির্মাণ সম্ভবপর কি? সামঞ্জস্য-ত্রিভুজের বাহুত্রয়কে ঠিক ঠিক মিলানো যায় কি? আমাদের প্রাত্যহিক সংসারের অভিজ্ঞতা বলে,—না। একটি বাহু যদি ঠিক করিলাম তো অপর বাহুটি নড়িয়া যায়। এক দিককার বেড়া যদি বহুকষ্টে বাঁধিলাম তো আর একদিকের বেড়া মাপে ছোট পড়ে। শরীর যদি অনেক চেষ্টায় সুসমঞ্জস করিলাম তো মনের আঙিনায় যুদ্ধ থামাইতে পারি না। মনের একটি দুর্ভাবনার যদি নিবৃত্তি হইল তো সঙ্গে সঙ্গে আর চারটি দুশ্চিন্তা উপস্থিত। সুস্থ শরীর ও শান্ত মন লইয়া কীর্তন শুনিতে বসিলেও কলুবাড়ীর ফটক হইতে সহসা 'সাপ সাপ' কলরবের সম্ভাবনা থাকিয়াই যায়। ব্রজবল্লভবাবু একান্তই নিরুপায়। আমরা প্রত্যেকেই নিরুপায়। পুরাপুরি সামঞ্জস্যের বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া জীবনের ব্যাপৃতিগুলি সাধন করিয়া যাইব—এমন সৌভাগ্য হাজার জনের মধ্যে একজনের ঘটে কিনা সন্দেহ। সামঞ্জস্য চাই, কিন্তু পাই না।

আলোক-অন্ধকারময় এই সংসারে সামঞ্জস্য-প্রতিষ্ঠা বড়ই কঠিন সমস্যা। ধরিলাম আমার নিজের শরীর-মনের হেফাজতি আমার হাতে, কিন্তু পরিবেশ? যে গৃহে যে পাড়ায় যে গ্রামে আমি বাস করি, যে রাজ্যের আমি অধিবাসী, যে রাষ্ট্রের আমি প্রজা—তাহাদের সাম্য-বৈষম্যের সুখ-দুঃখের সহিত আমার নিজের শান্তি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পাড়ায় আগুন লাগিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাই কি করিয়া? আমার জাতির কোন ব্যাপক দুর্দশার সম্মুখে আমি কি পলায়ন করিতে পারি? আমার সমাজে কোন দুর্নীতি বা দুর্ঘটনা আমার মনকে চঞ্চল করিতে বাধ্য। রাষ্ট্রের বিপদ বা বিপর্যয়ে আমি নিজেকে পৃথক করিয়া ভাবিতে বা পৃথক্ রাখিতে পারি না, নিজেও বিপন্ন বোধ করি।' অতএব সামঞ্জস্য সম্বন্ধে পাকা রায় বোধ করি দাঁড়ায় যে, আদর্শ সামঞ্জস্য সংসারে নাই।

ঢেউ জানিয়াই সমুদ্রে নামিতে হইবে, ফাঁক মতো ঢেউ কাটাইয়া স্নান সারিয়া লইতে হইবে। শরীর মন ও পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখিব, কিন্তু ঐ আনুকূল্য ব্যাহত দেখিলে নিরুৎসাহ হইব না। 'সংসরতীতি সংসারঃ, গচ্ছতীতি জগৎ'—'যাহা সরিয়া যায় তাহারই নাম সংসার, যাহা অনবরত চলমান তাহাই জগৎ।' সরিয়া পড়া, চলিয়া যাওয়াই যেখানকার রীতি—সেখানে কায়েমী খুঁটি বসাইব কোন দাবিতে? দেহ বল, মন বল, আর কর্মক্ষেত্রই বল—পুরা সামঞ্জস্য কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, এইটি হৃদয়ঙ্গম করাও একটি মস্ত বড় শিক্ষা। শুধু শিক্ষা নয়, শক্তিও। এই তথ্যটি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলে সামঞ্জস্যের দিকেই আগাইয়া যাওয়া যায়। মজার কথা, কিন্তু সত্য কথা।

এই হেঁয়ালির গূঢ় মর্ম এই যে, সামঞ্জস্য জিনিসটি আদপে বেড়া বাঁধিয়া সৃষ্টি করিবার জিনিস নয়। ইহা মূলতঃ একটি অসীম অনন্ত বস্তু। সামঞ্জস্য মানবাত্মার ধর্ম, জগদাত্মারও ধর্ম। সামঞ্জস্যেই মানুষের সত্য নিহিত, সামঞ্জস্যেই সংসার ওতপ্রোত। সামঞ্জস্য দেহ ও মনের অতীত এবং জগৎপ্রপঞ্চেরও অতীত, কিন্তু দেহ মন ও জগৎ সামঞ্জস্যকে ধরিয়াই বাঁচিয়া আছে। জগৎ ও জীবনের এই গভীর পটভূমি জানিতে পারিলে, অসীম ও অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সামঞ্জস্যকে দেখিতে পাইলে উহাকে কাছে পাইতেও দেরি হয় না। তখন আর আলাদা আলাদা করিয়া দেহ-মনের সমতা সাধন করিতে হয় না। দেহ-মন

সাম্যের উপরই সর্বদা সুস্থির থাকে। পরিবেশের ব্যাঘাতও তখন শান্ত হইয়া আসে। নিরুপদ্রব পরিবেশ আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে, উঠিয়া আর তিরোহিত হয় না।

শরীর, মন ও জগৎ-সংসারের যিনি নির্মায়িক স্বচ্ছন্দ দ্রষ্টা তিনিই মানুষের আত্মা। তাঁহাতে কোন চঞ্চলতা নাই, কোন মলিনতা নাই, কোন বৈষম্য নাই, কোন ক্ষুদ্রতা নাই। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'—সেই কালুষ্যহীন পরম সমতারই নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অনাবিল অক্ষোভ্য প্রশান্তিতে মানুষের জন্মগত দাবি। এই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা যত সচেতন হইব ততই ঐ সম্পদ আমাদের হাতের মুঠায় আসিয়া যাইবে। সামঞ্জস্যের জন্য তখন আর হাহাকার করিতে হইবে না। তখন—

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমা
গাঙ্গ্যং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃত-সংস্কৃতাঃ শ্রুতিশিরো বারাণসী মেদিনী
সর্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরব্রহ্মণি ॥

ধন্যাষ্টকম্—শ্রীশঙ্করাচার্য।

"সারা জগৎ নন্দনবনের ন্যায় মনোরম, সকল বৃক্ষই কল্পতরুর ন্যায় মহান, সমস্ত জলই গঙ্গাজল, সমস্ত কাজই পুণ্যকাজ। কি কথ্য, কি লেখ্য সকল বাক্যই বেদ-বাক্য, সারা পৃথিবী বারাণসীর তুল্য তীর্থ বলিয়া প্রতীয়মান। যে কোন অবস্থায় থাকা যায় উহা পরম সত্যকে অবলম্বন করিয়াই থাকা।"

এইরূপ একটি সামঞ্জস্য যদি জীবনে নামিয়া আসে তাহা হইলে বাঁচিয়া সুখ, কাজ করিয়াও সুখ। স্বামী বিবেকানন্দ ঐরূপ কাজকে বলিয়াছেন 'অসীম প্রশান্তির পটভূমিকায় প্রখর কর্মপ্রবৃত্তি।' (Intense activity in the midst of eternal calmness)—কঠিন কথা, কিন্তু অসম্ভব কথা নয়,—কেননা উপনিষদের মতে ঐ সামঞ্জস্য আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। আমরা চোখ খুলিয়া দেখিলেই হয়। শুধু আমাদের নিজেদের আবিষ্কারের অপেক্ষা!

আবিষ্কারের বাধা কি? বাসনা। মনের অনন্ত বাসনা। চাওয়ার আর সীমা নাই। চাওয়ার অভ্যাস যত আমরা বর্জন করিতে পারিব তত ভিতরের দৃষ্টি খুলিবে, সামঞ্জস্যকে দেখিতে পাইব। ঐ সামঞ্জস্যই তো পরিপূর্ণতা! অতএব বাসনা-ত্যাগে আমাদের লোকসান নাই, বরং দশগুণ লাভ।

সামঞ্জস্য-লাভের ইহাই রাজপথ। যদি এই রাজপথে চলিতে ভয় হয়, সংশয় জাগে তো অগত্যা শরীর, মন ও পরিবেশকে বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী আলাদা আলাদা সামলাইয়া এই তিনটি দ্বারা একটি ত্রিকোণ কর্মবেষ্টনী রচনা করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। সংসারের নিয়মে নিখুঁত বেষ্টনী হইতে পারে না। ফাঁক থাকিয়া যাইবে, বারে বারে জোড় ভাঙিবে। তবুও তো নিরুদ্যম হইলে চলিবে না। কেননা, সামঞ্জস্যের বেড়ার মধ্যে না থাকিলে সংসার আমাদিগকে একেবারেই গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অতএব সামঞ্জস্য চাইই চাই। যতটুকু পাই ততটুকুই লাভ, ততটুকুই শক্তি।

এই শক্তি দিয়াই আমরা যুঝিব, উন্নতি করিব—কি লৌকিক, কি আধ্যাত্মিক। সামঞ্জস্য-বিযুক্ত কর্ম—অকর্ম। সে কর্মে নিজেরও কল্যাণ নাই, অপরেরও কল্যাণ নাই। সামঞ্জস্যাশ্রিত কর্ম যথার্থ কর্ম, সৎকর্ম। সৎকর্মে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই কল্যাণ।

শূদ্র-যুগ ও সেবাধর্ম

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন শর্মা রায়

হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়—প্রাচীন সমাজে চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ ছিল না। পরবর্তীকালে সংস্কারানুযায়ী বৃত্তি অবলম্বনে ব্যক্তির বিকাশের পথ প্রশস্ত হওয়ায় সমাজে চাতুর্বর্ণ্য আপনিই সৃষ্টি হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে বা সত্যযুগে সমগ্র মানবজাতি ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়াই অনুমিত হয়। অতএব ঋগ্বেদের কাল হইতে পৌরাণিক যুগের পূর্ব সময় পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়কে ব্রাহ্মণ্যযুগ বলা যাইতে পারে।

গুণকর্মানুসারে চারিটি বর্ণ নির্দিষ্ট হইত, এরূপ বহু প্রমাণ পুরাণেতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। মানবের জন্মগত সংস্কারানুযায়ী বর্ণ-সকল নির্ধারিত হইত বলিয়া উহারা প্রাকৃত বর্ণবিভাগ, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সমাজপতি কিংবা আর্য-ঋষিগণের দ্বারা বর্ণ-বিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছিল এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা নিরসনকল্পে শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে বলিয়াছেন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" —অর্থাৎ গুণ ও কর্মানুসারে চতুর্বর্ণ আমাদ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।

চারিটি বর্ণ সৃষ্ট হইবার কয়েক সহস্র বৎসর পর ক্ষত্রিয়গণ ক্রমশঃ সমগ্র সভ্য সমাজে রাষ্ট্রনায়ক, ধর্মরক্ষক, এমনকি অনেকক্ষেত্রে অধ্যাত্মতত্ত্বেও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া রাজর্ষি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রাজর্ষিগণের নিকট তপস্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য আসিতেন, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। সেই যুগই ক্ষত্রিয়যুগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

বৌদ্ধযুগের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রকৃতপক্ষে বৈশ্যযুগের উদ্ভব হইয়াছিল। এযুগে ধর্ম ও রাজশক্তি যাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, তাঁহাদের বৃত্তি প্রধানতঃ ব্যবসাবাণিজ্য; এই বৈশ্যযুগে বণিক-শক্তিই সভ্যতা ও কৃষ্টি দেশদেশান্তরে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

গণতন্ত্রের যুগ শূদ্রযুগ। শূদ্র অর্থে নিকৃষ্ট বা হীন নয়। গভীর অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী না হইলেও দৈহিক শ্রমশক্তি, অপরাবিদ্যা বা বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ, একতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সঙ্ঘশক্তি শূদ্র-যুগকে মহিমান্বিত করিয়াছে, উহার ফলস্বরূপ আজ সমগ্র বিশ্বে শূদ্রযুগ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে যেমন চারিটি যুগ পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়া আসে—সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে চারিটি বর্ণও পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে; ইহা প্রাকৃতিক বিধান, চতুর্বর্ণান্তর্গত মানবমাত্রেরই স্বীয় সংস্কারানুযায়ী এক একটি ধর্ম আছে, প্রতিটি যুগেরও এক একটি বিশেষ ধর্ম বর্তমান।

মানবেতিহাস সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিশ্বময় শূদ্র-যুগ আসিতেছে। শূদ্রবর্ণের ধর্ম যেমন সেবা, শূদ্র যুগের আচরণীয় ধর্মও "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"। তাই যুগোপযোগী ধর্মকে বরণ করিয়া লইবার নিমিত্ত তিনি পূর্ব হইতেই বিশ্ববাসীকে সচেতন হইতে পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাইয়াছেন।

হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্র-সংস্কারসম্পন্ন মানবকে বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্মে অধিকার দেয় নাই, কিন্তু দ্বিধাহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়াছে, শূদ্রের আচরণীয় একমাত্র ধর্ম 'সেবা'। ধর্মনির্দেশ সম্বন্ধে হীনদৃষ্টি কদাপি বিধেয় নহে। যুগধর্মকে কেন্দ্র করিয়া তত্তৎ যুগে অগ্রসর হইলে মানবজীবনের চরম সার্থকতা যে অতি সহজে সংসাধিত হইবে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই স্বামীজী সেবাধর্মকে পরামুক্তির উপায়স্বরূপ বলিয়া বার বার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণ

বর্ণের ধর্ম ; রাষ্ট্রসংরক্ষণ, আশ্রমধর্মের প্রতিপালন, যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা, ও ঈশ্বরভক্তি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ; গোরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্ম ; সেবা ও সঙ্ঘবদ্ধতা শূদ্রের ধর্ম। শূদ্রযুগে অর্থাৎ গণতন্ত্রযুগে সেবা ও সঙ্ঘবদ্ধতাদ্বারা মানব ব্যষ্টি ও সমষ্টির উন্নতি করিবে, তাহাদ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার কিংবা মোক্ষলাভেও সক্ষম হইবে ; ইহাও গীতাদি শাস্ত্রের নির্দেশ।

শূদ্রযুগের শাসনতন্ত্র একনায়কত্ব নহে, উহা জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষক, মজুর, শ্রমিক প্রজাসকলের সম্মিলিত একীভূত শক্তিদ্বারা পরিচালিত, শূদ্রযুগের ধর্মও সর্বজনীন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধার্মিক কেবল স্বীয় মুক্তিলাভে তৎপর হইবেন না, সমগ্র জনগণকে সেবা করার যে মহৎ আদর্শ—তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন এবং সমগ্র জগতের মুক্তির প্রয়াস করিবেন! ইহাই শূদ্রযুগের বৈশিষ্ট্য।

সঙ্ঘবদ্ধতা বা একতা বিস্তৃত আকারে প্রতি মানবাত্মার সহিত পরস্পর পরস্পরকে আত্মবোধে সহায়তা করে। সঙ্ঘবদ্ধতার মূল সূত্রটি অনুধাবন করিলে ও যথার্থ সেবার ভাবে উহা পরিচালিত করিলে অদ্বৈত সাধনের গূঢ় তত্ত্বও যে উপলব্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক আত্মাই সর্বভূতে বিরাজ করিতেছেন এবং এক আত্মাই বহুরূপে জীব, জন্তু, স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেতনরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইহাই বৈদিক ধর্মের মূলতত্ত্ব। তাই একাত্মবোধই হিন্দুধর্মে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া বিঘোষিত। একতা বা সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব গভীর হইতে গভীরতম অবস্থায় উপনীত হইলেই উহা জীবভাবকে বিশ্বাত্মবোধে রূপায়িত করিবে। উক্ত সাধনাকে স্বামী বিবেকানন্দ বাণী দিয়া রূপ দিয়াছেন :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

সেবা বলিতে আমরা কি বুঝি? নিজের অথবা অপরের অভাব মোচন, প্রীতি উৎপাদন কিংবা বিপদ্ হইতে উদ্ধারকল্পে যাহা কিছু করা যায় তাহাই সেবা। সেবা ত্রিগুণভেদে তিনপ্রকার : তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক।

আপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত উত্তম আহার, উত্তম পানীয় বা বহুমূল্য দ্রব্যাদি গ্রহণ আত্মসেবা বা স্বার্থপরতা ; ইহা তমোগুণী, ইহাতে স্বীয় নিম্নতম প্রয়োজনের অধিক সামগ্রী আহরণ করিবার প্রয়াস বর্তমান, তাহাতে অপরের নিম্নতম প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব ঘটিতে পারে। কর্তব্য-বুদ্ধিতে আত্মীয়গণের সেবা, দেশসেবা প্রভৃতির পশ্চাতে কতিপয় যুক্তি বর্তমান। আমাদের আত্মীয়গণ বিপৎকালে, আমাদের শিশুকালে কিংবা আতুর অবস্থায় সেবা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের অনুরূপ সেবা করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য ; এরূপ কর্তব্যের পরিধি বর্ধিত হইয়া সমাজান্তর্গত বা দেশান্তর্গত মানবগণের সেবার প্রেরণা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা রাজসিক সেবা নামে অভিহিত হইতে পারে। যে সেবায় আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই, ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই, নামযশের কামনা নাই, প্রতিদানে পাইবার কিছু আশা নাই, কর্তব্যাকর্তব্যের বিচারও নাই, একমাত্র সেব্য বস্তুর বা ব্যক্তির প্রীতির জন্যই সাধিত হইয়া থাকে, উহাই সাত্ত্বিক সেবা বলিয়া কথিত। তাই ভগবৎসেবা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, জননী ও জন্মভূমিকে দেবীজ্ঞানে সেবা করা, দেশবাসী এমনকি সমগ্র বিশ্ববাসীকে আত্মবোধে সেবা করা সাত্ত্বিক সেবার আদর্শ।

শ্রীমদ্ভাগবতে সেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; কারণ, সেবাদ্বারা সেবকের হৃদয় নির্মল ও স্বার্থশূন্য হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥১২।৪

অর্থাৎ যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, অখিল বিশ্বে আমিই অবস্থিত জানিয়া সর্বত্র সমদর্শী এবং সর্বজীবের কল্যাণ সাধনে তৎপর, সেই সাধকগণ পরমাত্মারূপী আমাকেই প্রাপ্ত হন।

স্বামী বিবেকানন্দ এই সেবাধর্মকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে এই সাত্ত্বিক সেবাধর্মের আদর্শ মানব উপলব্ধি করিতে ও যথার্থভাবে পালন করিতে সমর্থ হয়, তন্নিমিত্ত "শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ" স্থাপন করত শিবজ্ঞানে জীবসেবার প্রবর্তন করিয়াছেন। গৃহস্থ-ভক্ত, জনসাধারণ ও মুমুক্ষু সন্ন্যাসিগণকে সমবেত-ভাবে এই সেবাধর্ম পালন করাইবার মানসে তিনি সঙ্ঘ প্রবর্তন করিয়া গেলেন। ইহাতে যুগধর্মই প্রকটিত হইয়াছে।

নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম জগতে সংঘবদ্ধভাবে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয় করুণাবতার শ্রীবুদ্ধের দ্বারা; কিন্তু তৎকালে উহা একমাত্র নৈষ্কর্ম্যসাধন ও হৃদয়ের প্রসারতাই নির্দেশ করিত। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত শিবজ্ঞানে জীবসেবা বা নরনারায়ণ-সেবা সকল ধর্ম-মার্গীর, এমনকি নিরীশ্বরবাদিগণেরও অবলম্বনীয় এক সর্বজনীন নীতিপথ নির্দেশ করিয়াছে।

সেবাধর্ম প্রচার দ্বারা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাই যে জগতে প্রসারিত হইতেছে, এ বিষয়ে অদ্যাবধি অনেকের সন্দেহ বিদ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণের যে সহজ সরল ভাগবত জীবন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সহিত স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত কর্মধারার স্থানে স্থানে অনৈক্য আছে, অনেকে এরূপ মনে করেন। এমনকি, স্বামীজীকে ব্যাপকভাবে সেবাধর্ম প্রচার করিতে দেখিয়া তাঁহার জীবন্মুক্ত অপাপবিদ্ধ কোন কোন গুরুভ্রাতার মনেও এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। শিবজ্ঞানে জীবসেবা যে "যত মত তত পথের"ই অপর এক ব্যবহারিক ভাষ্য তাহা স্বামীজী প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত সেবাধর্মের মাধ্যমে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবান যদি প্রেমস্বরূপ হইয়া থাকেন তবে সেবা সেই প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মৃন্ময় প্রস্তরময়, ধাতুময় বিগ্রহে বা প্রতীক প্রভৃতিতে অর্থাৎ জড় বস্তুতে ভগবৎজ্ঞানে সেবা-পূজাদ্বারা যদি তন্মধ্যে পরম-চৈতন্যের দর্শন লাভ হইতে পারে, চৈতন্যময় জীবদেহে শিবজ্ঞানে সেবা করিলে তাহাতেও শ্রীভগবানের পূর্ণ চিন্ময়-মূর্তির প্রকাশ হওয়া কখন অসম্ভব নয়, ইহাতে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।

একমাত্র সেবাধর্ম দ্বারাই জগতের সর্ব সমস্যার নিরসন হইতে পারে। কি রাজনীতিক সমস্যা, কি সাম্প্রদায়িক সামাজিক, আর্থনীতিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল সমস্যাই সেবাদ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে। আজকাল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু মানব-হিতৈষী অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন—মানব-সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলেই মানবের সকল সমস্যার সমাধান হইবে। এই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মূলে আর্থনীতিক বিষয়ই মুখ্য, কিন্তু উহা মানব-জীবনের বহিরঙ্গ মাত্র। কোন রাষ্ট্র বা সমাজে আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সমগ্র মানব-মনে সমতা বা সাম্যভাব আনয়ন করা সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ মানবমাত্রেরই যুগপৎ দুইটি জগতে বাস করিতে হয়—একটি বহির্জগৎ ও অপরটি অন্তর্জগৎ। কোন দেশের অধিকাংশ নরনারী আপন অন্তরে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠার সহিত সেভাব গ্রহণ করিলেই বাহিরে ও অন্তরে যথার্থ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অন্যথায় প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া একরূপ অসম্ভব।

অর্ধশতাব্দীরও কিয়ৎকাল পূর্বে, যখন সাম্য-বাদের ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় নাই, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজী তৎকালেই এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, বৈশ্যযুগ শেষ হইয়া শূদ্রযুগ আগত-প্রায়—অর্থাৎ ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়ই যুগধর্ম (গণতন্ত্র) দ্বারা পরিচালিত হইবে। যাহাতে বিশ্ববাসী শূদ্রধর্মের কেবল সাত্ত্বিক ভাবটিকে গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রে, ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়, শিল্পে

অগ্রসর হয় এবিষয়ে অবহিত হইতে স্বামীজী পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। সেই নিমিত্তই অসাম্প্রদায়িক সঙ্ঘস্থাপন ও অনাসক্ত সেবাকর্ম প্রবর্তন তাঁহার মুখ্য আদর্শ ছিল।

সেবাধর্ম যথার্থভাবে প্রতিপালিত হইলে মানবজীবনে কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই যোগচতুষ্টয়ের চরমফলও অনায়াসে লাভ হইতে পারে। সেবা নৈষ্কর্ম্যসাধনে বা অনাসক্ত কর্মযোগের এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কেননা আর্ত, বুভুক্ষু, দুর্গত বা পতিত জীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার কালে প্রতি জীবকে শিবজ্ঞানে চিন্তা করিতে পারিলে কর্মফল ঐ জীবরূপী শিবে অর্পিত হয়। ইহাতে হৃদয় দীনতায় পূর্ণ থাকে। তখন সেবকের অহংকার হৃদয়ে স্থান পায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "দাস আমি হ'য়ে থাকলে তাতে কোন দোষ নেই।" স্বর্ণময় অস্ত্র যেমন অস্ত্রের আকার লইয়াই বর্তমান থাকে, উহাদ্বারা কখনও কোন হনন-কার্য সাধিত হয় না, সেবাভাবে মন মগ্ন থাকিলে উহা আপনিই অনাসক্ত ও নিরহংকার হইয়া যায়। সেবাকার্য নিঃস্বার্থ হইলে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে উহা দ্বারা ভালমন্দ কোন ফলই অর্জিত হয় না। ইহাতে মানবাত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মলাভের কারণ আপনিই বিদূরিত হয়, এবং মুক্তি লাভ হয়।

শিবজ্ঞানে জীবসেবায় অর্থাৎ সেব্য জীবে আপন ইষ্ট আরোপিত হইলে তন্মধ্যে ভগবৎশক্তি প্রকটিত হয়। এইভাবে সেব্য জীবে ইষ্টদর্শন করত ভক্তিযোগের চরমফল ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। তাই স্বামীজী বলিতেন, "সেবা একাধারে তোর ইষ্টপূজা ও আত্মনিবেদন।"

জ্ঞানীর আদর্শ সর্বজীবে, সর্ববস্তুতে আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন। সর্বত্র আত্মা (পরমাত্মা) বিরাজ করিতেছেন বিবেচনা করিয়া আপামর সাধারণকে সেবা করিলে যথার্থ আত্মসেবাই যে সাধিত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহারই ফলস্বরূপ সর্ববস্তুতে আত্মোপলব্ধি দ্বারা ব্রহ্মনির্বাণ বা সমাধিলাভে মানব অবশ্যই ধন্য হইবে। তাই জ্ঞানযোগীর পক্ষেও সেবাধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ পথ।

রাজযোগীর পক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব বা অভেদাত্ম-প্রতিপাদন করাই আদর্শ। সেব্য জীবে আপন মনপ্রাণ যোগ করিতে পারিলে অর্থাৎ অপরের সুখদুঃখ আপন সুখদুঃখের মতই অনুভব করিতে পারিলে অর্থাৎ অপরের সুখদুঃখের মতই অনুভব করিতে পারিলে সেব্য জীবে আত্মবোধ জাগ্রত হইবে। এইরূপ জীবরূপী শিবের সহিত সেবকের আত্মিক সংযোগ সাধিত হইলেই যোগীর পরামুক্তি বা মহানির্বাণ আপনিই লাভ হইবে।

সেবাধর্ম যেমন কোন জাতি সম্প্রদায় বর্ণে, কোন দেশ কাল পাত্রে আবদ্ধ নয়, যেমন চির উদার ও অনন্ত, তেমনই সর্বযুগোপযোগী—সর্বজনোপযোগী, অতি সহজ ও সরল পথ এবং গৃহী ত্যাগী নির্বিশেষে সকলেরই গ্রহণযোগ্য। ইহাতে কোন যোগকৃচ্ছ্রতা নাই, যাগ-যজ্ঞাদির জটিল পদ্ধতি নাই, সুকঠিন প্রাণায়ামাদি নাই, তন্ত্রমন্ত্রাদির দুরূহ অনুষ্ঠান নাই; শুধু চাই—গভীর হৃদয়ানুভূতি ও অনলস কর্মপ্রচেষ্টা। সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বাবস্থায় সকলের ইহা এক সর্বজনীন মানবতার ধর্ম। বিশেষভাবে সেবাধর্ম বর্তমান যুগের দুঃখতাপহারী সুখশান্তিবিধায়ক কল্যাণসাধক যুগধর্ম।

জীবসেবার চাইতে আর ধর্ম নাই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কাটিয়া যায়—"মুক্তিঃ করতলায়তে"।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীসারদা-স্তুতি

মিশ্র ভীমপলশ্রী (একতালা)

কথা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, টি,

সুর—সঙ্গীতাচার্য রাজেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বরলিপি—কুমারী আভা সরকার, গীতিভারতী

ভকত-হৃদয়-বাঞ্ছিত মাতা শরণাগতের গতি।
জননী সারদা জগত-ধাত্রী দেহ পদে মম মতি॥
যাহা কিছু আছে অর্পণ করি, সকল কর্মে সদা যেন স্মরি,
শয়নে স্বপনে তোমারই চরণে, করি যেন সদা নতি।
দেবতা-সেবিত চরণ-পরশে কত জড়ে দিলে প্রাণ।
তোমার করুণা-সলিলে ভাসালে চেতনা করিলে দান॥
পঙ্গু লভিল শকতি নবীন, পূর্ণ হইল যেবা ছিল দীন।
মূক লভি বাণী হইল ধন্য নিরখিয়া ভগবতী॥
সারাটি জীবন বেদনা সহিলে ধরিয়া মানবী কায়া।
সন্তান-দুখে বিগলিত হিয়া স্নেহময়ী মহামায়া॥
নাই মাগো কিছু পূজা উপচার, অন্তর-ভরা শুধু হাহাকার,
ভক্তি-অশ্রু-মালিকাটি মোর নিবেদিনু শিব-সতী॥

স্বরলিপি

০	১	+	৩	০	১
{ পা পা মা	ণা পা পা	মা জ্ঞা জ্ঞা	মা মা মা	ণ্‌া সা মা	জ্ঞা জ্ঞা মা
ভ ক ত	হৃ দ য়	বা ন্ ছি	ত মা তা	শ র ণা	০ গ তের

+	৩	০	১	+	৩
পা পা -া	মমা জ্ঞা মা ॥}	{ পধা পধা ণা	ণা ণা ণা	ধণা ধণা র্সা	র্সা । র্সা }
গ তি ০	০০ ০ ০	জ০ ন০ নী	সা র দা	জ০ গ০ ত	ধা ০ ত্রী

০	১	+	৩
ণ্‌া সা সা	মজ্ঞা জ্ঞা মা	পা পা -া	মমা জ্ঞা মা ॥
দে হ প	দে০ ম ম	ম তি ০	০০ ০ ০

০	১	+	৩	০	১
পা ধা র্রা	র্রা র্রা র্রা	পা ধা র্সা	র্রা জ্ঞা র্রা	র্সা র্সা র্সনা	ধনা পা পা
যা হা কি	ছু আ ছে	অ ০ র্প	ণ ক রি	স ক ল০	ক০ ০ র্মে
প ং গু	ল ভি ল	শ ক তি	ন বী ন	পূ ০ র্ণ০	হ০ ই ল
না ই মা	গো কি ছু	পূ জা উ	প চা র	অ ন্ তঃ	র০ ভ রা

+	৩	০	১	+	৩
ধা ণা র্রা	র্সা ণা ধা	ণা ণা ণা	ণা ণা ধা	পা ধা ণা	ধা পা পা
স দা যে	ন স্ম রি	শ য় নে	স্ব প নে	তো মা রই	চ র ণে
যে বা ছি	ল দী ন	মু কু ল	ভি বা ণী	হ ই ল	ধ ০ ন্য
শু ধু হা	হা কা র	ভ ক্ তি	অ ০ শ্রু	মা লি কা	টি মো র

০	১	+	৩
ণ্া সা মা	জ্ঞা জ্ঞা মা	পা পা -া	মমা জ্ঞা মা
ক রি যে	ন স দা	ন তি ০	০০ ০ ০
নি র খি	য়া ভ গ	ব তী ০	০০ ০ ০
নি বে দি	নু শি ব	স তী ০	০০ ০ ০

০	১	+	৩	০	১
সরা সরজ্ঞা জ্ঞা	জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা	সরা রা জ্ঞা	রা সা সা	প্া সা সা	সা সা সা
দে০ ব০০ তা	সে বি ত	চ০ র ণ	প র শে	ক ত জ	ড়ে দি লে
সা০ রা০০ টী	জী ব ন	বে০ দ না	স হি লে	ধ রি য়া	মা ন বী

+	৩	০	১	+	৩
ন্সা ন্সা রজ্ঞা	রা -া রা	সা গা গা	গা মগা রসা	সা রা মা	রা মা মা
প্রা০ ০০ ০০	০ ০ ন্	তো মা র	ক রু০ ণা০	স লি লে	ভা সা লে
কা০ ০০ ০০	য়া ০ ০	স ন্ তা	ন দু০ খে০	বি গ লি	ত হি য়া

০	১	+	৩
সা রা মা	রা মা পা	ণদা ণদা না	পা -া পা
চে ত না	ক রি লে	দা০ ০০ ০	০ ০ ন্
স্নে হ ম	য়ী ম হা	মা০ ০০ ০	য়া ০ ০

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জীবানন্দ

কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়—এই প্রবাদ প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। কল্পতরু তো কবির কল্পনা—বিচারশীল মনে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কল্পতরুর অস্তিত্ব বাস্তবে কি সম্ভব ?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরু দেখিয়েছিলেন তাঁর সখাদের। গোচারণের সময় শীতল ছায়াপ্রদ বৃক্ষ-রাজি দেখে তিনি বলেছিলেন, 'এই সব মহাভাগ কল্পবৃক্ষ পরার্থেই একান্তজীবিত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অক্লেশে সহ্য ক'রে যুগ যুগ ধ'রে অবস্থান করছে বরজন্ম মহাভাগবত এই বৃক্ষসকল,—কোন যাচকই এদের কাছে প্রার্থনা ক'রে বিমুখ হয় না—সর্বস্ব দিয়ে অপরের কল্যাণ-সাধনেরই জন্যে এদের জন্ম।'

কল্পতরুর বাস্তবতা অবাস্তবতা নিয়ে বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন তাঁকেই 'কল্পতরু' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

ঈশ্বরই অন্তর্যামী রূপে সকলের হৃদয়মন্দিরে অবস্থিত থেকে সকলের সব কামনা-বাসনা পূরণ করেন। ধন জন মান বিদ্যা বুদ্ধি যা চাওয়া যায় তাঁর কাছে, ঐকান্তিকতা থাকলে নিশ্চয়ই তা পাওয়া যায়। সুখ-দুঃখের পারে শাশ্বত আনন্দের রাজ্যে যেতে চাইলে তিনিই তার উপায় ক'রে দেন। আমাদের অভাব বুঝে ও মনের ভাব জেনে যখন যেটি প্রয়োজন সেটি তিনি দিয়ে থাকেন। অন্তর্যামীর কাছে মুখের প্রার্থনার চেয়ে মনের ভাবই বড় কথা।

ঈশ্বর যখন তাঁর মায়াশক্তিকে আশ্রয় ক'রে লীলাবিগ্রহ ধারণ করেন তখন সমগ্র লীলাকালটিতে লোককল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেন। তাই দেখা যায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কৃপার এত বিচিত্র প্রকাশ। তাঁর সারা জীবনে অযাচিত কৃপা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষে প্রকাশ পেলেও অন্ত্যলীলার একটি বিশেষ দিনে তাঁর কৃপাবারি অজস্র ধারায় ঝ'রে পড়েছিল, ভক্ত অভক্ত ধনী নির্ধন যোগ্য অযোগ্য—সকলেই সমভাবে তাতে অভিসিঞ্চিত হয়েছিল। সেদিন অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ 'কল্পতরু' হয়েছিলেন, ভক্তদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন, আত্মপ্রকাশে অভয় প্রদান করেছিলেন।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবস্থান করছেন। যে সব ত্যাগী যুবক-ভক্ত শ্যামপুকুরে নিজেদের বাড়ী থেকে এসে পালা ক'রে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন তাঁদের অনেকে সংসার-মায়া বিসর্জন দিয়ে পরমারাধ্য শ্রীগুরুর সেবায় নিরত হয়েছেন। অগ্রহায়ণের শেষ (২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫) অর্থাৎ শীতঋতুর প্রারম্ভ থেকে ঠাকুর উদ্যানবাটীতে আছেন —লোকসমাগমের বিরাম নেই—তাঁর অমৃতময়ী কথারও অন্ত নেই। ভক্তগণের প্রাণপণ সেবাযত্নে ও উপযুক্ত চিকিৎসায় শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু সুস্থ বোধ করতে লাগলেন; সকলের মনে হ'ল তিনি এবার অল্পদিনেই পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হ'য়ে উঠবেন।

ক্রমে পৌষ মাসের অর্ধেক অতীত হ'য়ে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরি উপস্থিত।

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙিব হাঁড়ি যাইব যখন॥
সেই হাঁড়ি-ভাঙা রঙ্গ আজিকার দিনে।
কিভাবে ভাঙিলা হাঁড়ি শুন একমনে॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি)

ঠাকুর ঐদিন বিশেষ সুস্থবোধ করায় কিছুক্ষণ উদ্যানে বেড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইংরেজী

নববর্ষ উপলক্ষ্যে ছুটির দিন ব'লে গৃহী ভক্তেরা মধ্যাহ্নের কিছু পরেই একে একে বা দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হচ্ছেন। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের মাতুল হরিশ মুস্তফী ঠাকুরের ঘরে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। ইনিই সেই ভাগ্যবান পুরুষ যিনি সর্বপ্রথম এইদিন ঠাকুরের দেব-বাঞ্ছিত কৃপা লাভ করেন। হরিশের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'ল, পরম পুলকে অবিরল ধারায় তাঁর নয়ন দুটি দিয়ে প্রেমাশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল।

হরিষে হরিশচন্দ্র মুখে মাত্র স্ফুরে।
কৃপায় আনন্দ কিবা হৃদয়ে না ধরে॥

হরিশকে কৃপা করার পর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাসিন্ধু উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন অন্তরঙ্গ দেবেন্দ্রকে ডেকে বললেন:

স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে।
রাম কি কারণে মোরে অবতার বলে॥ (পুঁথি)

কিন্তু এ-কথার অর্থ কেউই বুঝতে পারলেন না:

কথার সুগূঢ় মর্ম কথায় রহিল।

বিকাল ৩টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ উপর থেকে নীচে এলেন। ত্রিশ জনেরও বেশী ভক্ত এসেছেন—কেহ কেহ ঘরের মধ্যে কেহ কেহ বা গাছের তলায় বসে কথাবার্তায় রত। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে ঘরের সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম ক'রে তাঁর অনুগমন করতে লাগলেন। ঠাকুর নীচের হলঘরের পশ্চিমের দরজা দিয়ে উদ্যানপথে নামলেন, তারপর ধীরে ধীরে দক্ষিণমুখে ফটকের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন, বসতবাটী ও ফটকের মধ্যস্থলে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন গিরিশ রাম অতুল প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। ঠাকুরকে দেখতে পেয়ে গিরিশ প্রভৃতি তাঁর কাছে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঠাকুরের এই দিনের রূপ-বর্ণনা পুঁথিকারের অনবদ্য ভাষায়:

আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার।
বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার॥
পরিধান লালপেড়ে সুতার বসন।
গায়ে বনাতের জামা সবুজ বরণ॥
সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা।
মোজা পায়ে চটিজুতা লতাপাতা আঁকা॥
শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল॥
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল॥
দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর॥
মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয়া খুলি॥
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি॥

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্বেই ঠাকুর সহসা গিরিশচন্দ্রকে বললেন, 'তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) ব'লে বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখেছ ও বুঝেছ?'

সত্যই গিরিশ এখানে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নানা কথা ব'লে বেড়াতেন। ঠাকুরের প্রশ্নে গিরিশ বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'লেন না, নতজানু হ'য়ে ঊর্ধ্বমুখে তাঁর শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে গদ্‌গদস্বরে ব'লে উঠলেন, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেন নি, আমি তাঁর বিষয়ে আর কি বলতে পারি!'

গিরিশচন্দ্রের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতিটি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে হাত তুলে সমবেত সকলকে বললেন, 'তোমাদের কী আর বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।' জীবের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হ'য়ে তিনি ঐ কথাগুলি মাত্র উচ্চারণ করেই ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পড়লেন।

সেই গভীর আশীর্বাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবলভাবে আঘাত করল, সকলের চিত্ত আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠল। চারিদিকে 'জয় জয়' রব পড়ে গেল—চৈতন্যের ঢেউ খেলে যেতে লাগল। দেশ কাল দিগ্বিদিক্ মুছে গেল নিমেষে! ভক্তেরা স্থান-কাল ভুলল, ঠাকুরের ব্যাধির কথা বিস্মৃত হ'ল,

ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞাও ভুলে গেল। সকলের মনে হ'ল —এ যেন সেই শাশ্বত চৈতন্য—যাতে একটুও মালিন্য নেই, যা সর্বদা সর্বাবস্থায় বিশুদ্ধ! মনে হ'ল যেন পরমকারুণিক দেবতা স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সস্নেহে আহ্বান করছেন—কে কোথায় আছ স্পর্শ ক'রে যাও এই চৈতন্য-প্রবাহ, হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হ'য়ে যাবে—বন্ধ্যাভূমিতে প্রবাহিত হবে প্রবল জলধারা—জাগ্রতা হবে কুলকুণ্ডলিনী।

সকলেই তাঁর পদধূলি গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। প্রণামের প্রেমপুষ্পাঞ্জলি পড়তে লাগল ঠাকুরের শ্রীচরণে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা—অর্ধবাহ্যদশায় দিব্য শক্তিস্পর্শে একের পর এক ভক্তকে কৃতার্থ করছেন। ভক্তগণের আর আনন্দের অবধি নেই।

সকলেই বুঝল শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের দেবত্বের বিষয় আর কারও কাছে গোপন রাখবেন না, পাপী তাপী যে যেখানে আছে এখন হ'তে সকলে তাঁর অভয়-পদে আশ্রয় লাভ ক'রে ধন্য হবে।

এই অপূর্ব ঘটনায় কেহ নির্বাক্ নিস্পন্দভাবে অবস্থান করতে লাগলেন, কেহ বা মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঠাকুরকে নিষ্পলক নেত্রে নিরীক্ষণে রত হলেন, কেহ নিজে ধন্য হ'য়ে অপর সকলকে তাঁর কৃপালাভে ধন্য করবার জন্যে ব্যাকুল, আবার কেহ পুষ্প-চন্দনে শ্রীঅঙ্গের পূজা করতে লাগলেন। সুমধুর স্তব-স্তুতি ও জয়ধ্বনি চতুর্দিক থেকে উত্থিত হ'তে লাগল: 'চৈতন্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস ছুটে আয়—জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য চেয়ে নে। কৃপার পাত্র উজাড় ক'রে দিচ্ছেন প্রভু!'

'এ কাকে দেখছি!'—শিউরে উঠলেন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল। ইষ্টমূর্তির ধ্যানে বসে কখনও তাঁকে সর্বাঙ্গ পূর্ণ ক'রে দেখতে পান নি। যখন পাদপদ্ম দেখেছেন তখন মুখখানি মানস-নয়নের গোচর হয় নি! যখন মুখ দেখেছেন তখন কোথায় বা তাঁর শ্রীচরণকমল! এখন মনে হ'ল সে মূর্তি যেন আপাদমস্তক স্পষ্ট ও অচঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—হ'য়ে উঠেছে বরাভয়প্রদ ও সর্বাঙ্গসুন্দর!

ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে ফুল নিয়ে বার বার ঠাকুরের পায়ে দিলেন, ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ ক'রে ধন্য করলেন।

দুটি জহুরি চাঁপা নিয়ে এসে অক্ষয় সেন শ্রীপাদপদ্মে দিলেন, ঠাকুর তাঁকেও স্পর্শ করলেন। অক্ষয় সেন এই দিন ঠাকুরের কাছে মহামন্ত্রও লাভ করেছিলেন। হারাণচন্দ্র পায়ের কাছে নতজানু হ'য়ে প্রণাম নিবেদন করতেই ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁর পাদপদ্ম রাখলেন হারাণের মাথার উপর।

যাঁর চরণযুগল সকল কর্ম ও মঙ্গলের নিদান সেই অমৃতের অধিপতির অভয় স্পর্শ লাভ করলেন উপেন্দ্র, অতুল, নবগোপাল, হরমোহন ও কিশোরী।

বৈকুণ্ঠ প্রণাম ক'রে বললেন, 'আমায় কৃপা করুন।'—স্মিতমুখে ঠাকুর বললেন, 'তোমার তো সব হ'য়ে গিয়েছে।' 'আপনি যখন বলছেন হয়েছে তখন নিশ্চয় হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি যাতে অল্পবিস্তর বুঝতে পারি তা ক'রে দিন'—বললেন বৈকুণ্ঠ। 'আচ্ছা বেশ' ব'লে ঠাকুর মাত্র ক্ষণেকের জন্যে বৈকুণ্ঠের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করলেন।

ক্ষণকালের স্পর্শে অপূর্ব ভাবান্তর হ'ল বৈকুণ্ঠের। দেখতে পেলেন চতুর্দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসন্ন হাস্য-উজ্জ্বল মূর্তি। আকাশ বাড়ীঘর গাছপালা মানুষ সবেই সুহাস শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুনের ভয় হয়েছিল। সর্বতো-ব্যাপী মূর্তি প্রতিসংহার করবার জন্যে বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে ভীতিবিহ্বল অর্জুন। সরল সুন্দর সৌম্য মানুষ-মূর্তি যা দেখতে অভ্যস্ত তাই দেখতে চেয়েছিলেন অর্জুন। বৈকুণ্ঠও ভয় পেয়েছেন—তাঁর সর্বাঙ্গ যেন দীর্ণ বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে—ভাবাবেগ সইতে পারছেন না। ভাবের উপশম প্রার্থনা করলেন বৈকুণ্ঠ।

করুণাময় ঠাকুর তাঁকে শান্ত করলেন।

বেলা যে ব'য়ে যায়—আর কে কোথায় আছ, ছুটে এস—অন্ধ খঞ্জ আতুর বঞ্চিত বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট সকলে এস, এই মহাভাগবত বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আসন পাত, করুণার নিকেতনে উপবেশন কর—স্পর্শমণিকে একটিবার স্পর্শ ক'রে লৌহ-তনুকে উজ্জ্বল কাঞ্চন করিয়ে নাও।

কে কে আসল—কে কে তাঁর পুণ্য স্পর্শে চৈতন্যময় হ'ল সকলের নাম জানা যায় নি ; তবে রান্নাঘরে কর্মরত রাঁধুনি বামুন পর্যন্ত সেই মহাস্পর্শে ধন্য হয়েছিল এইরূপে সেদিন।

'রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রভু ভগবান।
উপরে দ্বিতল ভাগে করিলা পয়ান॥
নিম্নতলে ভক্তদের আনন্দের মেলা।
এখানে শ্রীঅঙ্গে উঠে নিদারুণ জ্বালা॥
শ্রীঅঙ্গেতে জ্বালা কেন শুন বিবরণ।
যে যে পাপীদের আজি করিলা মোচন॥
তে সবার জীবনের যত পাপভার।
সকল লইয়া প্রভু অঙ্গে আপনার॥
গঙ্গাজলে অঙ্গখানি করিলে মোক্ষণ।
তবে না হইল পরে জ্বালা নিবারণ॥
গলায় দারুণ ব্যাধি অন্য কিছু নয়।
জীবের মোচন কর্মে পাপের সঞ্চয়॥' (পুঁথি)

কী আশ্চর্য ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের একজনও কিন্তু সেদিন নিকটে ছিলেন না। এর মধ্যে কি রহস্য আছে ? তাঁদের অনেকে তাঁর সেবার যোগাড়ে ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন স্বরূপ প্রকাশ ক'রে সকলকে অভয় দিলেন—নিজেকে নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিলেন সেদিন সংসারের আবিলতামুক্ত তাঁর চিরকুমার 'হোমাপাখীর' দল তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হলেন ? তাঁরা তাঁকে পরিপূর্ণভাবে পেয়েছেন, পেয়েছেন বলেই তো তাঁর জন্য সব ছেড়েছেন—আত্মীয় পরিজন সবকিছু, সব ছেড়ে আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁর সেবায়। তাই নতুন ক'রে দেওয়া-নেওয়ার আর প্রয়োজন হ'ল না। তিনি তাদের কাছে পরিপূর্ণভাবে ধরা দিয়েছেন—তিনিই যে তাঁদের ইহকাল পরকাল। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ তাঁদের কাছে সদা প্রকটিত। অন্তরঙ্গদের সম্বন্ধে তিনি নিজ মুখেই বলেছেন, ওদের—আমি কে, আর ওরা কে—জানলেই হ'য়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ত্যাগী সন্তানদের কিভাবে তৈরী করেছিলেন তা একটি মাত্র ঘটনা থেকেই বোঝা যায় :

একবার দক্ষিণেশ্বরে হাজরা-মহাশয় অল্পবয়স্ক কয়েকটি যুবককে নানা উপদেশ প্রসঙ্গে বোঝাচ্ছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধ মহাপুরুষ—তাঁর নিকট সিদ্ধাই প্রভৃতি নানা শক্তি প্রার্থনা করা চলে। তা না ক'রে শুধু ভাল খাবার-দাবার খেয়ে তাঁর সঙ্গে সুখে বাস ক'রে ফল কি ?' ঠাকুর পাশেই ছিলেন—হাজরার কাণ্ড দেখে শুদ্ধসত্ত্ব বাবুরামকে কাছে ডেকে বললেন, 'আচ্ছা, তোরা কি চাইবি ? আমার যা কিছু তা সবই তো তোদেরই জন্যে। ভিখারীর মতো ক্যাঙলামি করিস নে—ওতে মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক ক'রে দেয়। বরং আমার সঙ্গে তোদের সম্বন্ধ ভাল ক'রে বুঝে নে এবং সমস্ত ধনের অধিকারী হবার চেষ্টা কর।'

পূজ্যপাদ লীলাপ্রসঙ্গকার ১লা জানুআরির ঘটনাটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু হওয়া' না ব'লে 'আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান' বলেছেন ; এই নাম-করণই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ; কারণ প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ যে যা প্রার্থনা করে কল্পতরু তাকে তাই প্রদান ক'রে থাকে ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তো ঐরূপ করেন নি, নিজ দেব-মানবত্বের পরিচয় এবং সকলকে নির্বিচারে অভয় আশ্রয় প্রদান ঐ ঘটনায় সুব্যক্ত করেছিলেন। সংসারের মায়ামোহে মুগ্ধ মানুষ কি চাইতে কি চেয়ে ফেলবে তাই পরমকারুণিক ঠাকুর সকলের কিছু চাওয়ার

আগেই তাদের সকলের স্বার্থ-চিন্তা ঘুচিয়ে দেবার জন্যে 'তোমাদের চৈতন্য হোক' ব'লে আশীর্বচন উচ্চারণ করেছিলেন।

বৎসরান্তে এই দিনটি আমাদের দ্বারে করাঘাত ক'রে বলে, ওঠ—জাগ। সংসারের অজস্র দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমোঘ আশীর্বাণী কালের গণ্ডি ভেদ ক'রে মোহাচ্ছন্ন মানুষের চৈতন্য সম্পাদন ক'রে চলেছে—সেই ভাবতরঙ্গ সাধকচিত্তে লীলায়িত ভঙ্গিমায় নানাভাবে রূপায়িত হ'য়ে তাকে সর্ববিধ ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উন্নীত ক'রে দিচ্ছে।

জন্মান্তর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পাখী উড়ে যায় আকাশে ঊর্ধ্বে—শাখীও উড়িতে চায়,
মাটি টেনে রাখে, করে তাই হায় হায়।
জল উড়ে যায় উপরে বাষ্পাকারে,
তপন শুধুই সহায়তা করে তারে।
উঠে অম্বরে বহ্নির শিখা ধূমময় রূপ ধরি'—
অথবা হাউইয়ে চড়ি।
মানুষ বিমানে উঠে
যতদূর পারে মেঘের ওপারে ছুটে।
ঝরা পাতা সেও উপরের দিকে ধায়
বৈশাখী ঝঞ্ঝায়।

এই উত্থানে 'উঠা' বলা নাহি চলে
সকলেই নেমে আসে পুন ধরাতলে।
অনিবার্য যে ধরণী মাতার টান,
পতনেরই তরে সকল সমুত্থান।
মানুষ মরিয়া যায়,
জ্ঞানিগণ বলে আত্মা তাহার ঊর্ধ্বের পানে ধায়।
হারায় তাহারে যাহারা—তাহারা উপরেরই দিকে চায়,
আর করে হায় হায়।
আত্মা তাহার একদিন ধরাধামে
নব জাতকের রূপে কি আবার নামে?

শ্রীশ্রীশিবানন্দ-স্মৃতিকথা

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

স্থান বেলুড় মঠ, ১৯শে মার্চ, ১৯২৭ সাল।

আজ মঠে আসিয়া পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিয়া বসিলাম, তিনি কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভক্ত: মহারাজ, যতক্ষণ আপনাদের নিকট থাকি, ততক্ষণ সংসারের সকল কথা ভুলে যাই।

মহারাজ: হ্যাঁ এইরূপ যত আমাদের সঙ্গ করবে, সাধু সঙ্গ করবে, তত তোমাদের কল্যাণ হবে। কারণ অবতারপুরুষকে বিশ্বাস করা তো সহজ কথা নয়? তবে আমরা প্রত্যেকে তাঁকে দেখেছি—আমাদের মুখে তাঁর কথা শুনলে ক্রমে তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাস পাকা হ'য়ে যাবে। তোমাদের দিন দিন আরও ভগবানলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগবে।

ভক্ত: মহারাজ, 'কথামৃত' পড়ে কত আনন্দ পাই, 'কথামৃত' পড়ে বড়ই উপকৃত হয়েছি।

মহারাজ: হ্যাঁ, তা হবে না? 'কথামৃতে' সব আছে।

পঞ্চানন বাবু: 'মাষ্টার মহাশয়' কত কষ্টে এই 'কথামৃত' লিখেছেন। একদিন আমি তাঁর নিকট গিয়েছিলুম, দেখি তিনি 'কথামৃত' লেখবার জন্য সেই নোট বুকখানা রেখেছেন। খানিকক্ষণ বাদে তিনি বাইরে গেছেন, আমি তখন খুলে পড়লুম, কিন্তু একটি কথাও বুঝতে পারলুম না।

মহারাজ: হ্যাঁ, তিনি খুব মেধাবী ছিলেন; ঠাকুরের নিকট যেতেন ও সব নোট করতেন। তিনি তাঁর নিজের জন্যেই লিখেছিলেন, ভেবেছিলেন ভবিষ্যতে পড়বেন। কিন্তু ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি ঐ সব কথা নির্জন জায়গায় গিয়ে, ধ্যান করে, পরে লিখেছেন। তাই তাঁর দিনের দিনের সব কথা মনে পড়ত, তারপর লিখতেন, তাই তো এত চমৎকার হয়েছে। এখন কত লোক শান্তি পাচ্ছে।

ভক্ত: 'শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে ব্রজের লীলা মিলে' এই বলিয়া মাষ্টার মশাই একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। (মহাপুরুষজী অতি মনোযোগের সহিত শ্লোকটি শ্রবণ করিলেন)

মহারাজ: হাঁ, ঠিক, ঠাকুরের সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে। আহা! গোপীদের কি ভাব! মান, সুখ, দুঃখ, লজ্জা বোধ নাই। গোপনে তাঁকে দেখবার জন্যে পাগল, প্রেমে বাস্তবিকই মানুষের এইরূপ অবস্থা হয়।

জনৈক ভক্ত: আচ্ছা, যীশুখৃষ্ট—যেমন ত্যাগ প্রচার করেছিলেন, ঠাকুর সেইরূপ করেছিলেন কি?

মহারাজ: কি ক'রে জানলে ঠাকুর করেন নাই? অবশ্য, সকলকে তিনি ত্যাগের কথা বলতেন না, কারণ তিনি জানতেন, সকলের ভাগ্যে ত্যাগ হয় না। তিনি যখন আমাদের উপদেশ দিতেন, তখন অন্যলোক সামনে থাকত না, তুমি কি মনে কর, ঠাকুরের ত্যাগের ভাব আমাদের সেই ক'জনের মধ্যেই থাকবে? কেন দেখছ না—এখন তো ঠাকুরের নামে কত ত্যাগী সন্তান সব সাধু হ'তে আসছে। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ভদ্রঘরের সন্তান, তারা দলে দলে আসছে। পেটের দায়েতে এরা সাধু হয় না! Universityর (বিশ্ববিদ্যালয়ের) বড় বড় degree (উপাধি) পেয়েছে। সেই সব ত্যাগ ক'রে এখানে আসছে। এই কি ঠাকুরের জন্য নয়? অবশ্য দেশ শুদ্ধ লোক তো আর ত্যাগ করতে পারবে না? তবে তারা ঠাকুরের এই ত্যাগের mould (ছাঁচ)কে ideal (আদর্শ) নিয়ে চলবে। নিশ্চয় ক্রমে ক্রমে এই সব হবে। ঠাকুরের জীবনের ত্যাগের ভাব এ

দেশের লোকের ideal (আদর্শ) হতেই হবে, এই বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

এই সব কথা যখন হইতেছিল, তখন উপস্থিত ছিলেন পঞ্চাননবাবু, চক্রবর্তী মহাশয়, নরসিংহ বাবু, নির্মলবাবু ও মহাপুরুষ মহারাজজীর পূর্ব-বঙ্গবাসী জনৈক ভক্ত শিষ্য। সকলে নিস্তব্ধ। ঘর যেন শান্তির নিকেতন হইয়াছে। সকলেরই মন এখন এক ধর্মরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। কোন ভক্ত বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে আর মহাপুরুষজীর কথাগুলি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে—তাহাতেও বিমল সুখ। এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন জগদ্বন্ধু দাদা আসিয়া। তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম মিস ম্যাকলাউড বোম্বাই হইতে করিয়াছেন। মহাপুরুষজী উহা যত্নের সহিত পড়িয়া খুশী হইয়া বলিলেন, 'চলল এবার, জয় গুরু মহারাজ।' পূজনীয় বিশ্বানন্দ মহারাজের চিঠি (বোম্বাই) হইতে আসিয়াছিল—কি ভাবে মিস ম্যাকলাউড সেখানে স্বামীজীর উৎসবের সভা পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইলেন।

জনৈক ভক্ত : আচ্ছা মহারাজ, আমরা তো সংসারী লোক, আমরা জপ-ধ্যান বেশী করতে পারি না—আমরা ঠাকুরের নাম করেই মুক্তি পাব কি ?

মহারাজ : নিশ্চয়ই তাঁর নাম আর তিনি কি পৃথক ? নাম করলেই ত সব হ'য়ে যাবে, আবার কি ? নামই সব, নামই সত্য, নাম করবে, আবার কি ?

এবার ননীলালবাবু প্রণাম করিয়া বিদায় নিতেছেন। তাহাকে বলিলেন, 'ঠাকুর ঘরে যাও, প্রসাদ নাও। আহা—ননীলাল তুমি বেশ আছ। ঠাকুর তোমায় কোন ঝঞ্ঝাটে রাখেন নাই, বেশ মুক্ত, বিয়ে কর নি। কোন ঝঞ্ঝাটও নেই—কেন আর রয়েছ ? এসে পড় না এইখানে। আমরা জানি তুমি বেশ মুক্ত আছ। আর কেন, তুমি এসে পড় '—কথাগুলি সব জোরের সহিত বলিলেন।

ননীলাল বাবু : হ্যাঁ মহারাজ, এবার একটা বন্দোবস্ত ক'রে এসে পড়ব। আপনার কৃপা।

মহারাজ : হাঁ এসে পড়।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পূর্বোক্ত ভক্তটি মহারাজের জন্য একখানা কাপড়, একটি আম ও একটি খরমুজা আনিয়াছিলেন। তাহা মহারাজের পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিলেন, আপনি এই গরীবের কাপড়খানা পরিবেন।

মহারাজ : আর কাপড় এনেছ কেন ? কত কাপড় রয়েছে। মহারাজ সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ এই কাপড়খানা বেশ পাতলা, কাল ছুপে দেবে। গরমের দিনে বেশ হবে, ফলগুলি ঠাকুর ঘরে দাও।

মশা খুব জ্বালাতন করে, তাই শঙ্কর মহারাজ বেলা থাকিতেই মশারি টাঙাইতেছেন ও মশা তাড়াইতেছেন।

মহারাজ : মশা বড় জ্বালাতন করে। তুই একটি মশারির ভিতর থেকেই সারা রাত্রি জ্বালাতন করবে।

ভক্ত : মশা পায়ে বড় কামড়ায়।

মহারাজ : উহারা যে ভক্তলোক, তাই পায়ে কামড়ায়। (সকলের হাস্য)

ভক্ত : আচ্ছা মহারাজ, মশা কেন ভগবান সৃষ্টি করিলেন।

মহারাজ : এ কি ক'রে বলব ? এ সব দুর্বোধ্য। ভগবান কেন করলেন, এই সবের উত্তর দেওয়া যায় না। তাঁর ইচ্ছা। (একটি ভক্ত এবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন) আসুন, আপনার গলাটা সারুক, একদিন পদাবলী শুনতে হবে।

ঐ ভক্ত : হ্যাঁ, আমি একদিন শুনাব।

এবার সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরের একটু প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মহারাজ নানা ঠাকুরদেবতাদের নাম করিতে লাগিলেন। আমি প্রণাম করিলাম।

মহারাজ: এসো, তুমি কি এখনই যাবে?

আমি: না মহারাজ; আরতির পরে যাব। আরতি দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজজীর ঘরে আসিলাম।

মহারাজ: তুমি এখন যাবে?

আমি: না, আমরা একসঙ্গে যাব।

কথাপ্রসঙ্গে ৺কাশীধামের কথা উঠল। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, হাঁ, আমরা যখন ৺কাশীধামে ছিলুম, তখন গরম পড়লে খুব ক্ষুধা হ'ত, কি আর করি, রান্নার সময় কয়েকখানা রুটী তৈরী করে রাখতুম, সন্ধ্যাবেলা তাই খেতুম। তখন তথাকার আয় খুব কম, তাই ঐ ব্যবস্থা করতে হত।

চন্দ্র মহারাজের কথায় বলিলেন, ও বড় চমৎকার লোক, এমন ভক্তি বিশ্বাস দুর্লভ। দেখ তো, ঐ পঙ্গু শরীর। বসে বসেই ১৫।১৬ জনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ওকে করতে হয়। অতি চমৎকার লোক, বড়ই আশ্চর্য হই।

ভক্ত: মহারাজ, এবার যখন কাশীতে ছিলাম তখন তিনটি রোগীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তা আমরা যে মঠের ভক্ত তা জানতে দিই নাই—তোমাদের এখানে কেমন চিকিৎসা হয়? সাধুরা কেমন যত্ন করেন? তারা উত্তর করল, বাবু, এমন চিকিৎসা কোথাও পাই নাই। সাধুরা বড়ই যত্ন করেন।

মহারাজ: হাঁ, সাধুরা তো আর হাসপাতালের মত সেবা করে না। প্রাণের টানে করে—নিজেদের উন্নতির জন্য।

ভক্ত: শুনেছি, আপনাদের নাকি মাত্র চার আনা সম্বল ছিল।

মহারাজ: না হে না—চার আনাও ছিল না। তবে গল্পটা শোন—একদিন চারুবাবু আর একজন গঙ্গার ধারে বিকালে বেড়াচ্ছিলেন। তারা দেখে—রাস্তায় একজন বৃদ্ধ কি বৃদ্ধা পড়ে আছে। অন্তিমকাল উপস্থিত। একটু জল খেতে চাইছে। কিন্তু কারো ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় চারুই বোধহয় ঐ রোগীর নিকট গিয়ে দেখে যে হাঁ ক'রে জল চাইছে। চারু গিয়ে জল দেয়। এবং দেখে যে কাপড়ও নষ্ট হয়ে রয়েছে। তখন ভিক্ষা ক'রে একখানা পুরানো কাপড় আনে। একটি মেয়ে ঘাটে যাচ্ছিল। তাঁকে বলল, আপনার কলসীটা দেবেন, আমি একঘড়া জল এনে এই রোগীকে পরিষ্কার ক'রে দেব। স্ত্রীলোকটি দয়া ক'রে নিজেই জল এনে দিলেন। ওরা রোগীকে পরিষ্কার ক'রে কাপড় পরিয়ে বোধহয় পরিচিত কারো বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেই সময় বাজারে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে এই রোগীর কথা ব'লে কিছু ভিক্ষা চাইলেন। ঐ ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি সিকি দিলেন। তাই দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থা হ'ল। কেদার বাবা ও চারুবাবু ভিক্ষা ক'রে প্রায় ১৫ দিন এই ভাবে সাহায্য করলেন। রোগী আরোগ্য লাভ করল। এরপর থেকে মাঝে মাঝে ঘাটে এরূপ রোগী যে সব দেখতে পেত, তাদের সেবা যত্ন করত। তার পরে বাড়ী ভাড়া ক'রে এইরকম সেবা করত। এখন দেখ এই আশ্রমে ১৫০ বেড্ (শয্যা) হয়েছে, তবু কুলায় না।

এইবার আমরা ঘড়ি দেখিলাম। চৈত্র মাস হইলেও ঐদিন বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। দোল পূর্ণিমার পরের দিন—বেশ চাঁদের আলো। আমরা উঠিব এমন সময় মহাপুরুষজী আমাকে বলিলেন—তুমি আলোয়ান আন নাই?

ভক্ত: না মহারাজ, গতকাল সব গরম জামা তুলে রেখেছি। চৈত্র মাসেও গরম কাপড় লাগবে মনে হয় নি। (মহারাজ হাসিতে লাগিলেন) শনিবার হলেই ছটফটানি হয় কখন আসব?

মহারাজ: দেখ এই ছটফটানিই আসল জিনিস। এইটি যেন থাকে। এবার আমরা প্রণাম করিয়া চাঁদের আলোয় নয়টার সময় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া বাসের জন্য দাঁড়াইলাম।

মেরী মাতা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

যবে মেরী মাতা ঝুঁকে প'ড়ে আকাশ হ'তে
চাহিল আমার নীল কানন পানে,
না জানি শীতের সেই কুহেলী ক্ষণে
জাগিল কী স্তুতিরব তরুবিতানে।

শাখায় শাখায় ঝরে তুষাররাশি
ভূমির মাঝারে ঢাকা শতেক মাণিক
গুঁড়ি গুঁড়ি বরফের ঝরিছে হাসি,
ছায়ায় ছায়ায় মায়া জাগিছে ক্ষণিক !

মেরী মার মুখে ওই জাগিল আলো,
মেরী মাতা ঝুঁকে পড়ে পৃথিবী 'পরে,
শুভ্র শরীর তার দেখায় ভালো,
অঙ্কুর জাগিল কি জীবন ভরে !

মেরী মাতা যবে হ'ল মলিনা দুখে
নিবে গেল আকাশের রামধনু ওই,
ভায়োলেট ফুলদল ফুটিল কোথা—
দুঃখ ও ক্ষতি ছাড়া তৃপ্তি সে কই ?

মনোরম স্বপ্ন যে ফুলে ও ফলে,
মেরী মাতা পুনঃ ও কি জাল বুনিল ?
মরে-যাওয়া লতাগুলি ফাল্গুনে যে
পুনরায় জীবনের ডাক শুনিল।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

গঙ্গায় যে কত অপবিত্র জিনিস ভেসে যায়, তাতে গঙ্গা কি কখন অপবিত্র হয় ?
দেখ মা, শরণাগত হ'য়ে পড়ে থাকতে হয় তবে ত তাঁর কৃপা হয়।
(জপ) যেমন ভাবে করবে তেমনি ভাবেই হবে। ঠাকুরকে সর্বদাই আপনার ভাববে।

*

প্রার্থনা করেছিলুম 'ঠাকুর আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও, আমি যেন কারও দোষ না দেখি।' দোষ ত মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।···দোষ কারও দেখ না, শেষে দূষিত চোখ হ'য়ে যাবে।

*

অবিশ্বাস ত আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এই রকম করেই ত বিশ্বাস হয় ! এই রকম হ'তে হ'তে পাকা বিশ্বাস হয়।

*

ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ বিশেষ লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এই নরেন সপ্ত ঋষির মধ্যে প্রধান ঋষি। তিনি ত শত ঋষির মধ্যে বলতে পারতেন, তা না বলে সেই বড় সাতজনের মধ্যে একজন বললেন।

সমালোচনা

গীতা-ধ্যান (দ্বিতীয় খণ্ড)—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রকাশক—'শ্রীসুদর্শন'-সম্পাদক অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩; পৃষ্ঠা—১২৩; মূল্য—২৲।

গীতা-ধ্যান পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে যজ্ঞ, লোকসংগ্রহ, নৈতিক সমস্যার সমাধান, দ্বাদশ যজ্ঞ, কর্মসংন্যাস, সমদৃষ্টি, ধ্যান মনঃসংযম আলোচিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের মতই দ্বিতীয় খণ্ডও সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। আশা করি, গীতার বাকী অংশগুলি অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ষট্‌ক অচিরেই প্রকাশিত হইবে।

লোকশিক্ষা সমাচার: লোকশিক্ষা-পরিষদ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর থেকে শ্রীঅনন্ত-কুমার রাণা-সম্পাদিত এবং শ্রীবিবেকানন্দ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ৬টি ফুলস্ক্যাপে সাইক্লোষ্টাইলে ছাপা নূতন পত্রিকাটি পেয়ে এবং পড়ে মনে হয়েছে এতদিনে বুঝি শিক্ষিত ও তথাকথিত অশিক্ষিতদের মধ্যে বেড়া ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে।

প্রথম পৃষ্ঠায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 'সমাজশিক্ষা' প্রবন্ধে এই পত্রিকাটির দিঙ্‌নির্ণয় ক'রেছেন: সমাজশিক্ষার দায়িত্ব ও কল্যাণব্রত। প্রসঙ্গক্রমে সম্পাদক লিখেছেন: আমরা এদেশের সাধারণ মানুষের শিক্ষা দীক্ষা ও কার্যের কাহিনীকে রূপ দিতে চলেছি 'লোকশিক্ষা সমাচারে'র মাধ্যমে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিষদের সমাজ-শিক্ষামূলক সমাচার-পাঠে আমরা উৎসাহিত। জনৈক গ্রামসেবকের সঙ্গে আমরাও আশা করি 'লোক-সমাচার' শীঘ্রই ছাপার অক্ষরে লোকের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব-প্রকাশিত পুস্তক

History of the Ramakrishna Math and Mission—by Swami Gambhirananda, with a foreword by Christopher Isherwood, Published by Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Pages xii+433+19 (with appendix and index) Price Rs. Ten.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাস, স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত, বিখ্যাত লেখক ক্রিষ্টোফার ঈশারউড-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক: অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া। [কলিকাতা অফিস: 4, Wellington Lane, Calcutta —13] পৃষ্ঠা xii+৪৫২, মূল্য দশ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থরূপে এই ইতিহাস রচিত হইয়াছে। ইহাতে ১৮৯৭ হইতে ১৯৫৭ এপ্রিল পর্যন্ত মিশনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ, সঙ্গে সঙ্গে মঠের ইতিহাসও বিবৃত হইয়াছে।

অধ্যায় পরিচয়: Inspiration, Inception, Preparation, Bursting Forth, On the March, In the Leader's Footsteps, In Tune with the Past, Weathering a Political Storm, Balanced Evolution, A Quinquennium of Progress. A New Order in Travail, Expansion and Consolidation, Centenary Tributes to the Master, Through National Calamities, Under Independence, Current events, Appendix, Index.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দিল্লীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা

গত ২৮শে নভেম্বর (১২ই অগ্রহায়ণ) বৃহস্পতিবার সকালে স্তোত্র ও ভজন-মুখরিত পরিবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ দিল্লী আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে শুভ্র শতদলের উপর উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্ণাবয়ব মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ভারত, সিংহল ও পাকিস্তানে অবস্থিত মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সমাগত শতাধিক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী অধ্যক্ষ মহারাজকে পুরোভাগে লইয়া পুরাতন মন্দির হইতে শোভাযাত্রার আকারে বাহির হইয়া নূতন মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে পর অধ্যক্ষ মহারাজ মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিপ্রহরে ২৯০০ ভক্ত প্রসাদ পান এবং সন্ধ্যায় সমবেত জনগণ মন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া অনন্দিত হন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন (বুধবার) বাস্তুপূজা ও হোম, এবং পরদিন (শুক্রবার) রুদ্রপাঠ ও রুদ্রহোম অনুষ্ঠিত হয়। চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচীর শেষ দিন শনিবার ৩০শে নভেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ আশ্রম গ্রন্থাগার ও মন্দির দর্শনান্তর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জনসাধারণের একটি সভায় সভাপতিরূপে বলেন: শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার একটি বিশ্বজনীন আবেদন আছে। তিনি ও তাঁহার অনুগামীরা সেবাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে তত নয়—নিঃস্বার্থ সেবার জন্যই তিনি মিশনের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য যে কোন কারণে হউক, যেখানেই দুঃখকষ্ট—মিশনের কর্মীরা সেখানেই মানুষের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য অক্লান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আজ ভারতের চারিদিকে মিশনের শাখা প্রসারিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন: দেশ যখন পুরাতন কৃষ্টিধারা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল এমনই এক যুগে তিনি সশরীরে ছিলেন; তাঁহার ভাবের ভাবুক নয়—এমন ব্যক্তিও তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গে অবশেষে প্রভাবিত হইত।

সভার প্রারম্ভে সকলকে স্বাগত জানাইয়া স্থানীয় মিশনকেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেন: শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মের ঐক্য, সহযোগিতা, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের প্রতীক। সভাপতির ভাষণের পর সাহিত্য আকাদামির সহকারী সম্পাদক ডক্টর জর্জ, অধ্যাপক ত্রিলোচন সিং এবং স্বামী চিদাত্মানন্দ কিছু বলেন। অতঃপর ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ মন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থদাতা, মন্দিরের স্থপতি, পরিদর্শক ইঞ্জিনিয়র ও প্রধান মিস্ত্রী—প্রত্যেককে মন্দির-সংক্রান্ত একখানি করিয়া সুন্দর ছবির এলবাম প্রদান করেন। রাত্রি ৮-৩০ মিঃ সময়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিওযোগে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সর্বত্র প্রসারিত হয়।

মাদ্রাজঃ দাঙ্গায় রিলিফ

গত সেপ্টেম্বরের শেষার্ধে রামনাথপুর জেলার কয়েকটি তালুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু গৃহ ভস্মীভূত হওয়ায় অনেকে নিরাশ্রয় নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছে। অনেককেই একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে।

মাদ্রাজ হইতে মিশনের সেবকগন ৪ঠা অক্টোবর হইতে পর্যবেক্ষণ-কার্য শুরু করিয়া মনমতুরাই ও পরমকুড়ি তালুকে প্রথমেই বস্ত্রবিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন; তিনটি গ্রামে ৬০১ শাড়ী ৪৯৬ ধুতি ও ৩১৪ মাদুর বিতরিত হইয়াছে। শিবলিঙ্গ তালুকে ৪০টি গ্রাম পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে, তিনটি গ্রামে প্রায় ১৪৫০ গৃহ ভস্মীভূত; মিশন ৩৫২৫টি

বাঁশ ও ১৮৫০০ নারিকেল পাতার ছাউনি বিতরণ করায় আর্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গৃহ পুনর্নির্মাণ করিয়া লইতেছে। এখনও ৩৭টি গ্রাম বাকী। অতঃপর আরপ্পকোট্টাই তালুকে পর্যবেক্ষণের পর সেবাকার্য সেখানে বিস্তৃত হইবে।

মাদ্রাজ সরকার ও সর্বদলীয় নেতৃগণ নানা ভাবে সাহায্য করিতেছেন; জনসাধারণের সাহায্য আরও প্রয়োজন, সমাগত বর্ষার পূর্বে গৃহনির্মাণ শেষ না হইলে কষ্টের সীমা থাকিবে না।

ভুবনেশ্বরঃ রবিবারীয় বিদ্যালয়

ভুবনেশ্বরের রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে ছাত্রদের ধর্ম ও নীতিবিষয়ক শিক্ষা দিবার জন্য রবিবাসরীয় অধ্যাপনার সূত্রপাত-প্রসঙ্গে গত ২০শে অক্টোবর (রবিবার) ওড়িষ্যার রাজ্যপাল বলেন: আপনাদের এই প্রচেষ্টায় আমি আনন্দিত, এরূপ বিদ্যালয়ে বালক-বালিকারা যথার্থ ই উপকৃত হইবে। এখানে ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৪টি শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রার্থনা, ভজন, সাধুসন্তের জীবন-প্রসঙ্গ, শেষে সংস্কৃত ভাষায় প্রার্থনা প্রভৃতি দ্বারা ছাত্রাবস্থাতেই বালক-বালিকাদের মনে একটি নৈতিক আধ্যাত্মিক ভিত্তি রচনার চেষ্টা করা হইবে। উচ্চতর দার্শনিক বা কৃষ্টির আলোচনার মাধ্যমে নয়, ভজনগান ও জীবনকথার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মনে স্থায়ী ছাপ পড়িবে বলিয়া আশা করা যায়।

কার্য-বিবরণী

রেঙ্গুনঃ রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির কর্মধারা প্রধানতঃ ধর্ম সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ে জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করার কাজে সীমাবদ্ধ। এখানকার সুবৃহৎ গ্রন্থশালা ও পাঠাগার সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য উন্মুক্ত। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: বর্তমানে গ্রন্থাগারে সংস্কৃত, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার পুস্তক-সংখ্যা ১৬ হাজারেরও অধিক ('৫৬ খৃঃ তিন সহস্রাধিক পুস্তক সংযোজিত)। পঠনার্থে প্রদত্ত ১৮১৭৪ ('৫৫ খৃঃ—৯০৭৪)। পাঠাগারে দৈনিক গড়ে দুইশত ব্যক্তি অধ্যয়নরত থাকেন। ৭টি বিভিন্ন ভাষার ২৪টি দৈনিক এবং ৯৭খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। লাইব্রেরির উল্লেখ-যোগ্য কর্মবিস্তার সাধারণের মধ্যে পাঠানুরাগ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ্ সম্বন্ধে ৭৮টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক আলোচনা, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন এবং পাঠচক্রের কাজ যথারীতি চলে। বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষগণের স্মারক উৎসবগুলিও সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

জলপাইগুড়িঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৬ খৃঃ (২৭তম বর্ষের) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমে কার্যপ্রণালী তিন ভাগে বিভক্ত: চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রচার।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথি ও এ্যালো-প্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থায় শহরের ও দূরবর্তী পল্লবাসীর যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে ১৬ হাজারের অধিক নরনারী চিকিৎসিত হইয়াছেন। মিশনের মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল বিভাগ ১৮ বৎসর যাবৎ সেবাকার্যে নিযুক্ত। এ বছর ১২৮ জন প্রসূতি ভরতি হইয়াছিলেন, এবং ৩২০টি শিশু ও ৫৯৪ জন জননী চিকিৎসার্থে আগমন করেন। ৪৭ হাজারেরও অধিক জনকে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়।

আশ্রম-ছাত্রাবাসে ১০টি ছাত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছে। সমাজের অনুন্নত নিরক্ষরগণকে লেখা-পড়া শিখানো ও তাহাদের চরিত্র গঠনের জন্য একটি হরিজন ও একটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। লাইব্রেরি এবং পাঠাগার বিশেষ জনপ্রিয়।

আশ্রমে প্রতি রবিবার এবং স্থানীয় ভাগবত সভায় প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পাঠ ও আলোচনা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসবাকারে অনুষ্ঠিত হয়; জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা এবং যীশুখৃষ্টের জন্মদিনও পূজাপাঠ এবং আলোচনার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

দেওঘর: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ৩৫তম বার্ষিক (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের) কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যাপীঠে চতুর্থ হইতে দশম শ্রেণীতে ২৩১টি ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ১৯টি ছাত্র বাহির হইতে আসিয়া অধ্যয়ন করিয়াছে, বাকী আবাসিক। ১৭জন বিদ্যার্থী স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেয়, সকলেই উত্তীর্ণ হয়, ৫ জন প্রথম বিভাগে। বার্ষিক পরীক্ষার পর চারদিনব্যাপী শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় ভাগলপুরে, ৭৭টি বালক ইহাতে যোগদান করে। শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৭ জন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে ফ্রি বা কম খরচে থাকিয়া পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দরিদ্র গ্রাম্যবাসীদিগকে সেবা করা হয়, দৈনিক রোগিসংখ্যা ছিল গড়ে ৬০।

বিদ্যাপীঠের নবরূপায়ণ

দেওঘর বিদ্যাপীঠ বহুমুখী বিদ্যালয়ে (Multi-purpose School) রূপান্তরিত হইবে, এবং ইহার উপরের তিনটি শ্রেণী (৯ম, ১০ম, ১১শ) পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হইবে,—কর্তৃপক্ষ এইরূপ স্থির করিয়াছেন। তদুদ্দেশে গত ১৪ই অক্টোবর পুরুলিয়া শহর হইতে দুই মাইল দূরে পুরুলিয়া-বরাকর রোডের উপর সুবিস্তীর্ণ আম্রকানন-সংযুক্ত ১৩০ বিঘা ভূমিখণ্ডের উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব ডাঃ ডি. এম. সেন মহাশয় বিদ্যাপীঠের নূতন শাখার ভিত্তিস্থাপন করেন। এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে পূজনীয় স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ পুরুলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার উপস্থিতিতে শুভানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়।

চণ্ডীগড়: আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন

গত ২৭শে নভেম্বর সকালে এক বিশিষ্ট জন-সমাবেশের মধ্যে রাজ্যপাল শ্রীসিং চণ্ডীগড়ে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন।

এতদুপলক্ষে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী বক্তৃতা দেন। সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য বিস্মৃত হইয়াই বর্তমানে নানা ধর্ম বাহিরের আচার-অনুষ্ঠান লইয়া বিবাদ করে—মুখ্যমন্ত্রী এই মনোভাবের নিন্দা করেন। তিনি আরও বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দই বলিয়াছেন—ভারত নিজের উন্নতির জন্য অন্যান্য কৃষ্টি হইতে শুধু গ্রহণ করিবে না, বর্তমান সভ্যতার বিকাশে দান করিবারও তাহার কিছু আছে।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টার

স্বামী নিখিলানন্দ ও স্বামী ঋতজানন্দ প্রতি রবিবার নিম্নলিখিত সূচী অনুযায়ী আলোচনা করেন:

জুন: চেতনার স্তর, প্রয়োগক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম, ধ্যানের অভ্যাস, ধর্ম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঈশ্বরদর্শন বলিতে কি বুঝায়।

সেপ্টেম্বর: মনের শক্তি, ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজিব? ভালবাসা ও ভগবৎ-প্রেম, মায়া ও সত্য।

অক্টোবর: অতি-মানসিক জ্ঞান, ধর্মানুভূতির সোপানশ্রেণী, সাধনা।

স্বামী ঋতজানন্দ প্রতি মঙ্গলবার গীতা এবং স্বামী নিখিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপনিষদ অধ্যাপনা করেন। দুর্গাপূজার সময় বিশেষ উপাসনা ও সঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল, এবং স্বামী নিখিলানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃরূপে ঈশ্বর ভাবনা' সম্বন্ধে বলেন।

সানফ্র্যান্সিস্কো: বেদান্ত সোসাইটি

প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় সমিতির ভাষণগৃহে স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন :

জুন: ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন; বেদান্ত-দৃষ্টিতে ব্যক্তি, বুদ্ধের বাণী, অসীম ডাকিতেছে, নিবেদিত জীবন, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তগণ, মনের লুকানো শক্তি, কেমন করিয়া ডাকিব? মানসিক স্বাস্থ্য ও ধর্ম।

জুলাই: স্বামী বিবেকানন্দের মন ও হৃদয়, গুরু ও শিষ্য, তবে ধর্ম কি? শক্তি-রূপে চিন্তা, পবিত্র উপায়, চেতনার বিভিন্ন স্তর।

সেপ্টেম্বর: যা কিছু—সবই ঈশ্বর, তাঁকে খুঁজো না—তাঁকে দেখ। হারানো সামঞ্জস্য—কিভাবে ফিরে পাওয়া যায়, কুণ্ডলিনী বা সর্পশক্তি।

অক্টোবর: মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা, মন কেন এত চঞ্চল? ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজছ? মৃত্যুর রহস্য, মানুষের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের কাছে চল, নিয়তি কি নিয়ন্ত্রণ করা যায়? গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, মরবার আগেই যা ক'রে যেতে হবে, নিম্ন থেকে উচ্চতর সত্তায়।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়, এবং প্রতি রবিবার শিশুদের মধ্যে উদার সর্বজনীন ধর্মের সাধারণ ভাবগুলি সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা আছে।

জন্মতিথি: পৌষ মাসে যাঁহাদের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইবে:—

স্বামী শিবানন্দ —	২রা পৌষ,	১৭ই ডিসেম্বর,	মঙ্গলবার	
,, সারদানন্দ	১২ই ,,	২৭শে ,,	শুক্র ,,	
,, তুরীয়ানন্দ	২০শে ,,	৪ঠা জানুআরি	শনি ,,	
,, বিবেকানন্দ	২৮শে ,,	১২ই ,,	রবি ,,	

বিবিধ সংবাদ

ভারত-সংস্কৃতি-পরিষদ: বেদপ্রকাশের ব্যবস্থা

ঋগ্বেদ সম্বন্ধে বাংলায় ভাল পুস্তক নাই বলিলেও চলে; এইজন্য ভারত-সংস্কৃতি-পরিষদ্ ৬৪ খণ্ডে বেদ প্রকাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে গত ২রা নভেম্বর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় রাজা শ্রীনাথ হলে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের পৌরোহিত্যে পরিষদের এক অধিবেশন হয়। শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া স্বস্তিবাচন করিলে পর সভায় ঋগ্বেদ-সম্পাদনার জন্য বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া এক পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়। সম্পাদক ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশের ঠিকানা: পি ৪৬৭ নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৩৩।

এ যুগের নিরক্ষরতা

জাতিসংঘের নিরক্ষরতা-গবেষণার বিবরণে (United Nation Illiteracy Study Report) প্রকাশ লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু লোকসংখ্যাও এমন ভাবে বাড়িতেছে—যে অদূর ভবিষ্যতে অশিক্ষিতের সংখ্যা না কমিয়া বাড়িতে পারে।

UNESCO (জাতিসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-কৃষ্টি সমিতি)র ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর লুথার ইভ্যান্স্ বলিতেছেন: নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যাপারে আমরা অতি অল্পই অগ্রসর হইতেছি। পৃথিবীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ লোক সংবাদপত্র পড়িতে ও বুঝিতে পারে। নিরক্ষরের সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করিতে হইলে—

শিশুদের জন্য আরও বেশি বিদ্যালয় প্রয়োজন, এবং শিক্ষিত হইতে যতদিন লাগে ততদিন তাহাদের বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে।

আফ্রিকার অধিকাংশ জায়গায়, মধ্যপ্রাচ্যের বহু স্থানে এবং এশিয়ার ব্যাপক অংশে বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে লিখিতে বা পড়িতে পারে না—এমন লোকের সংখ্যা শতকরা ৮০—১০০।

আফ্রিকার বাকী অংশে, এশিয়ার এক তৃতীয়াংশ ইওরোপের এক কোণে, ল্যাটিন আমেরিকার অর্ধেকাংশে নিরক্ষরতা শতকরা ৫০—৮০।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা ৭০ কোটি। অর্থাৎ শিক্ষাবিস্তারের এই যুগেও বয়স্ক লোকসংখ্যার শতকরা ৪৪ ভাগ নিরক্ষর।

১৯৪৬ খৃঃ এই সমিতির ডিরেক্টর জেনরেল রূপে জুলিয়ন হাক্স্‌লি বলিয়াছিলেন :

বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য, স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে, কৃষি ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে, মানসিক বিকাশের জন্য, গণতন্ত্র ও জাতীয় অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক চেতনা ও অন্যান্য জাতিকে বুঝিবার জন্য প্রথম প্রয়োজন অক্ষরজ্ঞান।

ইওরোপ এবং ইংরেজী-বলা আমেরিকার পরই অক্ষরজ্ঞানের উচ্চহার দৃষ্ট হয় দক্ষিণ প্যাসিফিক অঞ্চলে; মাত্র এক শতাব্দী পূর্বে তাহারা ছিল একেবারে আদিম জাতি। আফ্রিকায় এই হার নিম্নতম, তবে এই ভূখণ্ডের বহুস্থানে যেরূপ শিক্ষা-প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, আশা করা যায় শীঘ্রই আশ্চর্য রূপান্তর দেখা দিবে।

শিক্ষা-বিস্তার-ব্যবস্থায় একটি গুরুতর ব্যাপার বিশেষ বিবেচনার বিষয় : পৃথিবীর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। বর্তমান বৃদ্ধির হার—শতকরা ১½-এর কিছু বেশী, অর্থাৎ বৎসরে ৪ কোটি ৩ লক্ষ।

ভারতের ১৭ কোটি ৪০ লক্ষ বয়স্ক নিরক্ষরের মধ্যে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ পুরুষ, ৯ কোটি ৫০ লক্ষ নারী; শহরে বয়স্ক নিরক্ষরের হার শতকরা ৭৫, গ্রামে প্রায় ৯২।

উত্তর আফ্রিকায় বয়স্ক নিরক্ষর—৩ কোটি ৪০ লক্ষ, মধ্য ও দক্ষিণে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ; এশিয়ায় চারিটি অঞ্চলে ৫১ কোটি। উত্তর-(শতকরা ৪) মধ্য-(শতকরা ১২) দক্ষিণ-(শতকরা ২৮) আমেরিকায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ; ইওরোপে—২ কোটি ২০ লক্ষ; চীনের লোকসংখ্যা ৫৮ কোটি, নিরক্ষর শতকরা ৫০-এর উপর; সোভিয়েট রাশিয়ার লোক-সংখ্যা ২০ কোটি, নিরক্ষর শতকরা ৫—১০।

দেখা গিয়াছে—অনেক দেশেই শিল্পাঞ্চলে লেখাপড়ার চর্চা বেশি এবং কৃষি-অঞ্চলে নিরক্ষরতা অধিক। গড়ে মাথাপিছু বেশি আয় অপেক্ষা জাতীয় আয়ের সম-বণ্টনই শিক্ষাবিস্তারের সহায়ক।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ বা প্রতিরোধের উৎকৃষ্ট উপায় : সকল শিশুর জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা ও সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। এ সম্পর্কে UNESCO নিজের তত্ত্বাবধানে ল্যাটিন আমেরিকায় বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। অন্যত্র যে সকল স্থানে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম সেখানেও গ্রাম্য, বহিরাগত, ধর্মীয় ও সাধারণ নরনারীদ্বারা মৌলিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে।

[World Illiteracy at Mid-Century, UNESCO হইতে সংকলিত]

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৮শে পৌষ, ১২ই জানুআরি রবিবার, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে।